সমরেশের সেরা

১০১

সমরেশ মজুমদার

সমরেশের সেরা ১০১

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল ঃ patrabharati@vsnl.net
ওয়েবসাইট ঃ patrabharati.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩

SAMARESHER SERA 101
by
Samaresh Majumder

ISBN No. 81-8374-054-5

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সায়ন চক্রবর্তী

মূল্য
৩০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009 Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabharati@vsnl.net Website : patrabharati.com
Price Rs. 300.00

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

মাতৃদুগ্ধের কাল শেষ হয়ে গেলে
মুখে বোল ফোটে, মায়ের ভাষায়।
আমৃত্যু সেই শব্দমালায় দুধের গন্ধ
মিশে থাকে,
বর্ণমালা তাই মা হয়ে যায়।

বাংলা বর্ণমালা যাঁদের কাছে মায়ের
মতন, সেই সব পাঠকপাঠিকাদের
উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি
নিবেদিত।

নিবেদন

চল্লিশ বছর আগে সাতষট্টি সালে 'দেশ' পত্রিকায় যে গল্পটি ছাপা হয়েছিল তার নাম 'অন্তর আত্মা'। সে সময় আমাদের আজকের জীবন ছিল শেকড়ছেঁড়া। ভাসছি কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না। একটা নাটকের দল করেছিলাম। প্রতিষ্ঠিত নাট্যকাররা নাটক দেননি। তাই বন্ধুদের উৎসাহে নাটক লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ওই গল্পটি লিখে ফেলেছিলাম। ছাপা হওয়ার পর পারিশ্রমিক পেয়ে লিখে ফেললাম দ্বিতীয় গল্প।

শেষপর্যন্ত চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেল। এতগুলো বছরে ছোটগল্পের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে গেছে। জীবন স্থায়ী করেছিলাম ডুয়ার্সের চা-বাগানে, জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা নদীর পাশে। ওইসব জায়গায় কত গল্প ছড়িয়ে ছিল, এবং তারা বারংবার আমার কলমে উঠে এসেছে। যা দেখেছি এবং মন দিয়ে জেনেছি তাই লিখতে আমার স্বস্তি।

লক্ষ করছি গত পাঁচ বছরে ছোটগল্প লেখার প্রবণতা কমে গেছে, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। উপন্যাস লিখে যেতে হচ্ছে। বড় পটভূমিতে বোধহয় অনেক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু ছোটগল্পে কারচুপি চলে না। পাঠকের চোখ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো কাজ করে। তাই এখন লেখার আগে অনেকটা সময় ভাবনায় চলে যায়। মুশকিল হল, ভেবেটেবে আমি একদম লিখতে পারি না।

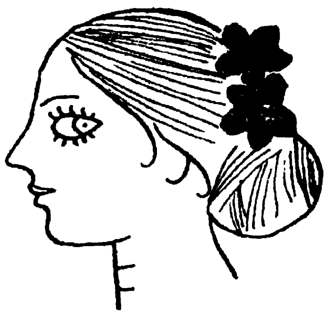
ছোটগল্পের সংজ্ঞা কী হবে, এই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। মোপাসাঁ বা ও-হেনরির চমক অথবা কিমিতিবাদীভাবনা নাকি রবীন্দ্রনাথের 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'? আমি ফর্ম নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি, বিষয়টাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে লিখতে। সেই গল্পগুলো যে পাঠকের পছন্দ হয়েছে তা আগের গল্পগ্রন্থগুলোর বিক্রিতে প্রমাণিত।

ভ্রাতৃপ্রতিম ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় আমাকে দিয়ে সেরা একশো একটি গল্প বাছাই করিয়ে নিয়েছেন। পিতার পক্ষে কোন সন্তান সেরা, কোনটা নয় তা বাছাই করা খুব মুশকিল ব্যাপার। তবু নির্দয় হয়েছি। আর এই বিশাল গ্রন্থটি ছেপে ত্রিদিব বিস্তর ঝুঁকি নিয়েছেন বলে কুণ্ঠিত আছি।

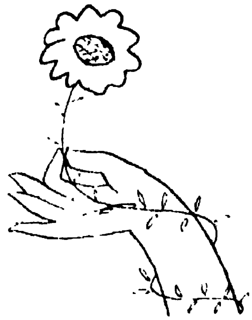
তবে একটাই ভরসা, পাঠক একশো এক রকমের জীবনের ঘ্রাণ পাবেন।

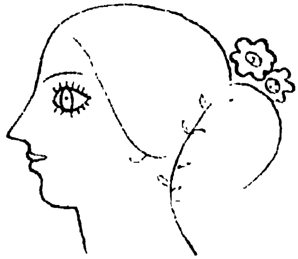
সমরেশ মজুমদার

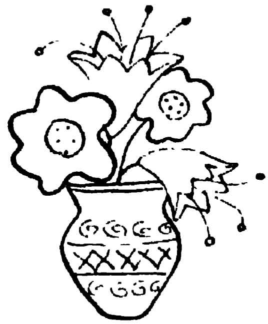
কলকাতা বইমেলা

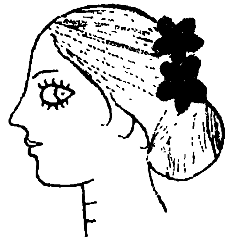


সূ চি









সে এবং জীবনানন্দ দাশ

এখানে হাওয়ারা হাওয়াদের মতো বয়ে যায়। ভোর হব-হব রাতে তার শরীরে জড়িয়ে থাকে শিশিরের ঘ্রাণ, খানিক রোদ্দুর জমলে তাতে মেশে ঘাসের গন্ধ যার আস্বাদ বুক ভরে নেয় এক বিরহী ডাহুক। বিরহী, কারণ ওকে কখনও দোকা দ্যাখেনি এই প্রান্তর। বিরহী, কিন্তু আদৌ দুঃখিত দেখায় না ওকে যতক্ষণ না বিকেলের শেষ আলো নিভে আসা মোমের আলোর মতো দপদপ করে।

কাগজে জ্ঞাপিত হয়েছিল একটি মানুষ দরকার। শর্ত ছিল, সহজ লোকের মতো বলতে হবে, তাদের ভাষায় কইতে হবে। জলের, মাটির গন্ধ পেলে যার প্রাণ আহ্লাদে ভরে যাবে। পরে জেনেছিল দ্বিতীয় আবেদন না পৌঁছানোয় তাকেই ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন নির্বাচকরা। অবশ্য এক কঠিন মুখের বিচারকের সামনে তাকে বসতে হয়েছিল, যিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'বলুন তো ভাই, কেউ যদি বলেন, অনেক তো হল, এবার মরণের পাশে শুতে চাই, তাহলে কী দাঁড়াবে?'

হেসে গড়িয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছিল সে। তারপর সরল গলায় জবাব দিয়েছিল, 'বীজ বুনলে ফসল হয়, মরণও গর্ভবতী হবে।'

'অ্যা?' চমকে উঠেছিল শিক্ষিত মুখ, 'ব্রেশ! তা যে শিশু জন্মাবে সে কে, ভগবান না শয়তান?'

শরীরের স্বাদ যে বোঝেনি তখনও সে উত্তর দিয়েছিল, 'না! জীবন।'

নিমেষে এক বিশাল অচেনা পৃথিবীর দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে গেল সে। তারপর ট্রেন, বাস, ভ্যানরিকশা আর নৌকোয় দুলতে-দুলতে চলে এসেছিল এখানে, চাকরির দায়িত্ব নিয়ে।

থাকার জায়গা বলতে একটা টঙের ওপর ঘর। পাশেই নদী তাই জলের প্রাচুর্য সবসময়। প্রতি পক্ষে নৌকো এসে তার প্রয়োজনীয় বস্তু পৌঁছে দিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে টঙের ওপর উঠে সে যখন প্রথম তার কর্মক্ষেত্র দেখল তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল অস্বস্তিতে। এত সবুজ সে এর আগে কখনও দ্যাখেনি। সবুজ আর ন্যাড়া মাঠ। কার্তিকের ধান কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিছু আগে। অপরাহ্নের রোদ সদ্য প্রসূতির মতো এলোমেলো। একদিকে সীমাহীন জল আর একদিকে ফসল আর গাছগাছালির ভূমি আর টঙের ওপরে তৈরি শক্তপোক্ত ঘরে সে;

এর বাইরে আকাশ আর মাটি ছাড়া অন্য কোনও মানুষ নেই। সে দু-হাত মুখের পাশে এনে চেঁচিয়েছিল, 'আ' শব্দটা যেন তার শরীর থেকে বেরিয়ে আবার শরীরেই ঢুকে গেল।

রাত আসছে গুঁড়ি মেরে। দ্রুত খাওয়া শেষ করে নিল সে। কাল থেকে নিজের জন্য রাঁধতে হবে, আজ পথ থেকে আনা খাবারে রাত কাটানো। তারপর নদীর জলে মুখ ধুতে গিয়ে অবাক হল। ওটা কী! স্বচ্ছন্দ সাঁতরে চলে গেল খানিক গভীরে, তারপর এগিয়ে এল খানিকটা। লম্বা শরীর, চকচকে তেলানো গা, এমনভাবে মুখ তুলল যে মনে হল বলল, কে তুমি ভাই?

'আমি কে তাই জানতেই তো আসা।' সে বিড়বিড় করল। সঙ্গে-সঙ্গে মাছটা, যদি ও মাছ হয়, মিলিয়ে গেল নদীর গভীরে।

টঙের ঘরে উঠে বসল সে। নিরাপদে থাকার জন্যেই বোধহয় এই উঁচুতে ঘর। তার মানে এখানেও আপদ আছে। কোথায় নেই। বয়স পঁচিশ অথচ রোজগার নেই যার, তার তো চারপাশে আপদের ভিড়। এতদিন যত আবেদনপত্র পাঠিয়েছে তা জুড়লে নিজের জন্য মায়া হত। সেই আপদের কাছে এই আপদ নিতান্তই তরল। হঠাৎ সুইচ টিপে আলো নেভাবার মতো কেউ সূর্যটিকে নিভিয়ে দিল।

জীবনের এই প্রথম রাত, যে রাতটাকে তার মনে হল অসংখ্য নক্ষত্রের রাত। আর এমন গভীর হাওয়ার রাত যে পৃথিবীতে নামে তাও তার জানা ছিল না। ঘুম ছিল না যতক্ষণ না স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে কোনও সাদা রাতপাখি উড়ে গিয়েছিল আর এক আশ্চর্য পৃথিবীতে। কিন্তু এই উঁচুতে, মাটি থেকে অনেক ওপরে সে যখন সন্ধে পেরিয়ে গেলে বিছানায় শরীর এলিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল মশারি নিয়ে আসার কথা ওরা তাকে কেন বলেনি। মশারা এত ওপরে স্বচ্ছন্দে উড়ে আসে পেট ভরাতে? কিন্তু তারপর সারা আকাশ থেকে নেমে এল যখন হাওয়ারা, বিছানা থেকে তাকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল নক্ষত্রের দিকে তখন ওই অন্ধকারের প্রাণীরা মুখ লুকিয়েছে মাটিতে অথবা আছড়ে পড়েছে চৌদিকে। নিজেকে সামলে নিতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল সে। তারপর সেইসব হাওয়ারা ভিন-সাগরের বুকে মিশে গেলে ঝাউ-এর সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে চাঁদ দেখা দিল। তাই দেখে মেঠো প্যাঁচা খুঁজে মরে সঙ্গীকে নাকি সঙ্গিনীকে তা সে জানে না। শুধু জানে কাল রাতে ঘুমে চোখ চায়নি জড়াতে। কিন্তু চাঁদ ডুবে যেতে-যেতে কিছু মরা জ্যোৎস্না নেতিয়ে পড়ল তার চোখের পাতায়, চোখের পাতাদুটো নেমে এল দুই চোখে, ঠিক কখন তার জানা নেই।

মাছির গানের মতো অলস শব্দে তার ঘুম ভাঙল। উঠে বসল সে। মাঠে-মাঠে ঝরে পড়ছে কাঁচা রোদ, রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল। মুহূর্তে শরীরের ভেতর অথবা ভেতর-শরীরের যাবতীয় অন্ধকার ফুৎকারে উড়ে গেল যেখানে যাওয়ার। আহ্লাদে ভরে ওঠে শরীর। এতদিনের জ্বালাযন্ত্রণা, প্রতিটি দিনের বেঁচে থাকতে চাওয়ার বেদনা ভুলে গিয়ে সে জানল মনের সব ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, চোখ মেলে থাকলে।

শুরু হল কাজ। অন্তত দশ একর জমির ওপরে গাছগাছালি আর চাযের মাঠ। একপাশে বিশাল নদী। নদী জমি থেকে অনেক নিচে। নিচ থেকে সেটা উঠে গেছে উতরাই ভেঙে। তার কাজ সারাদিন ঘুরে গাছগুলো দ্যাখা। ফল পাকলে তাদের তুলে সঞ্চয় করা। প্রতি পক্ষে নৌকো যখন আসবে তখন সেই সঞ্চিত ফলগুলো নিয়ে যাবে মালিকের জন্যে। ওপাশে, টিলা ছাড়িয়ে জঙ্গলের গভীরে আছে কয়েকটা গ্রাম। কাজ দেওয়ার সময় তাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল সেইসব

পাড়াগাঁর মানুষদের সম্পর্কে। বলা হয়েছিল যেন ভুলেও ওদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করে।

ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাঠ থেকে, সেখানে এখন ইঁদুরের উৎসব। কিন্তু গাছে ফলের বুকে রস ঘন হচ্ছে। কী নেই এখানে। আতা, পেয়ারা থেকে বেতের ফলও চোখে পড়ল। সেই ফল খাদ্য কি না তা তার জানা নেই।

দুপুর নামার আগে ফিরে এল সে। থাকার ব্যবস্থা আকাশে কিন্তু টঙের নিচের কুঁড়েঘরে রান্নার সরঞ্জাম। সেখানে ঢুকে দেখল যাবতীয় জিনিস ঠিকঠাক রয়েছে তার অপেক্ষায়। স্টোভ জ্বেলে চাল-ডাল সবজি একসঙ্গে ফুটিয়ে নিলেই পেটের প্রয়োজন মিটে যাবে। সেগুলো সাজিয়ে নিয়ে জল আনতে নদীর দিকে পা বাড়াতেই ছিপখানা দেখতে পেল। সুতো বঁড়শি ফাতনা মজবুত রয়েছে তার। বেরিয়ে এসে গোটা পাঁচেক ফড়িং ধরে ছিপ আর বালতি নিয়ে চলে এল নদীর কাছে। এই নদীর অন্য পাড় ঝাপসা। ঢেউ প্রবল। তবু একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া জল বেশ শান্ত। বড়শিতে ফড়িং ঢুকিয়ে জলে ফেলল সে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। ফাতনাটা সোজা হয়ে আকাশ দেখছে। হঠাৎ প্রবল আলোড়ন শুরু হল জলে। ঠাওর করল সে, ওরা শুশুক। দু-তিনটে নয়, ঠিক কত তা বুঝতে পারল না সে। শিস-এর শব্দ বাজছে জলে। ওটা কি শুশুকদের চিৎকার? ফাতনা বঁড়শি তুলে নিল সে। সঙ্গে-সঙ্গে শুশুকগুলো এক ছুটে চলে এল কিনারে, তারপর ডিগবাজি দিয়ে চলে গেল নদীর গভীরে।

শুশুকেরা এরকম আচরণ করল কেন? ওদের বড় শরীর নিশ্চয়ই এই বঁড়শির টোপের জন্য লালায়িত হবে না। ধরা পড়বার কোনও সম্ভাবনা ওদের নেই। তাহলে? ওরা কী ছোট মাছদের হয়ে প্রতিবাদ জানাল! বিষণ্ণ অথচ কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে যখন ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছে ঠিক তখন একটি শুশুক দ্রুত চলে এল পাড়ের কাছে। শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল শুশুকের মুখে একটি পুরুষ্ট মাছ যা প্রাণীটি ছুঁড়ে দিল মাটির ওপরে। দিয়ে ফিরে গেল জলে। মাছটা লাফাবার চেষ্টা করল বারকয়েক কিন্তু ততক্ষণে মধ্যাহ্নের রোদ তার শরীরে রুপো ঝরাতে শুরু করায় অবসাদ এসে গেল তার।

মাছটাকে তুলল সে। শ-পাঁচেক গ্রাম বয়স্ক মাছ। মাছ ধরতে না দিয়ে নিজেরাই তাকে দিয়ে গেল শুশুকরা? অদ্ভুত ব্যাপার তো। তার ভেতরে কম্পন শুরু হল। এরকম অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কারও কী হয়েছে?

শরীর খাওয়ার চায়, পেয়ে গেলে কিছুটা সময় সে নির্লিপ্ত। মনের হাঁ-মুখ যে বন্ধ হয় না কখনও। রাবণের চিতা অবিরাম জ্বলে যায় সেখানে। টঙের ওপর তৃপ্ত শরীর নিয়ে উঠে এসে রোদে-জ্বলা সাম্রাজ্য দেখতে-দেখতে কত না নবীন কৌতূহল তিরতির করে তার মনে। অথচ এখানে চকিত হতে হবে না, ত্রস্ত হয়ে থাকার সময় এখন নয়। এখন এখানে কাজ এসে হাত জুড়ে নেই। সমস্ত পড়ন্ত রোদ চারদিকে ছুটি পেয়ে ভিড় জমিয়েছে গাছে-গাছে, ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া প্রান্তরে। তাই চেয়ে-চেয়ে দ্যাখা। দেখে-দেখে দেখার আয়ু শেষ হয়। বাতাসের শীতলতা চুপি-চুপি বলে তাকে, 'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে।'

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন; খেতে মাঠে পড়ে আছে খড়। উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যাওয়ার আগে কিছু লোক ছুটে এল পাতা, কুটো, ভাঙা ডিম মাড়িয়ে। টঙের নিচে দাঁড়িয়ে তারা বিলাপ ছুঁড়ে দিচ্ছিল ওপরে। কাঁচা ঘুম চটকাতে-চটকাতে সে নেমে এল নিচে। ওরা এসেছে ওপাশে জঙ্গুলে গাঁ থেকে। ওরা জানে এই জমি, ফসলের বাগান, এই টং শহরের মানুষের সীমানা। এও জানে, যা তারা জানে না, তা শহরের মানুষের জানা। গ্রামবৃদ্ধ কাতর হন, তাঁর একমাত্র মেয়ের শরীরের তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ওঝার শেকড়ের সাধ্য হচ্ছে না তার তাপ কমানোর। নিদান

হেঁকে গিয়েছে সে। তাপ আরও বেড়ে গেলে শরীরের সব জল বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেলে কন্যাহারা হবে গ্রামবৃদ্ধ। শহুরে মানুষের কাছে কি জিয়নকাঠি আছে?

এখানে আসার সময় কিছু প্রাথমিক ওষুধ এনেছিল সে। হঠাৎ শরীর বিকল হলে যদি কাজে লাগে। অনুমানে বুঝে নিল কন্যা জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু সেটা কী ধরনের জ্বর তা আবিষ্কারের ক্ষমতা তার নেই। প্রাথমিক ওষুধ যা আছে তাই সম্বল করে পা মেলাল সে। বিকেলের কমলা আলোয়, সাপের খোলস আর নিড়ানো খেত মাড়িয়ে, বুনো গাছেদের গন্ধ পেরিয়ে ওরা পৌঁছে গেল জঙ্গুলে গাঁয়ে। উদ্বিগ্ন সারি-সারি মুখ, যাদের শাশ্বত মানবজাতির প্রতিনিধি ভাবা যায়, তাদের মুখ, কী উদাসীন!

গ্রামবৃদ্ধ তাকে নিয়ে এল যে নারীর পাশে তাকে দেখে তার মনে হল এই পৃথিবী বুঝি একবারই দেখা পায় তার। শরীর এলিয়ে আছে, হাঁ-মুখে মরুর বাতাস। প্রাণ আছে যায়নি বলেই। কপালে আঙুল ছোঁয়াতেই রক্তে ছ্যাঁকা লাগল তার। জ্বরের শহুরে নামগুলো মনে এল একের-পর এক যার ওষুধ তার সঙ্গে থাকার কোনও কারণ নেই। প্রাথমিক ট্যাবলেট গুঁড়িয়ে মুখে ঢেলে একটু-একটু করে জল ছড়িয়ে দিল সে ওখানে। কয়েক সেকেন্ড বাদে জিভ নড়ল, হয়তো অস্বস্তিতে। আবার ঈষৎ জল ঢালতেই ঢোঁক গিলল নারী। ওষুধ চলে গেল কণ্ঠনালীতে।

তারপর হলুদ পাতার ভিড়ে মুখ লুকোল রোদ্দুর। ইঁদুর পেঁচারা চাঁদহীন জ্যোৎস্নায় খেতে-খেতে খুঁজে এল গেল। চোখ বুজে কতবার ডান আর বাঁদিকে ঘুমিয়ে পড়ল কত-কেউ। সে জেগে রইল একা। দিঘির অতলে চাঁদ ডুবে আছে স্থির, কোনও ডুবুরির সাধ্য নেই তাকে টেনে তোলার. এই নারীর মুখ ফেলে সেই দৃশ্যও নীরক্ত মনে হয়। মাঝরাতে, যখন কুয়াশা ভাসছে চতুর্দিকে তখন আর একবার ওষুধ ঢেলেছিল সে, ওই মুখে। এবার জিভের সপ্রতিভতা বেড়ে গেল। এক ঢোঁক জল পান করে নারীর ঠোঁট জুড়ে গেল। তারপর অনেক লবণজল ঘেঁটে মাটির ঘ্রাণ পাওয়া সারেঙের মতো ভোরের স্পর্শ পাওয়ার মুখে সে, হাত রাখল নারীর কপালে। আঃ। স্বস্তির আস্বাদ পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই গ্রামবৃদ্ধ জড়িয়ে ধরল দু-হাত। কৃতজ্ঞতা সরিয়ে রেখে ধীরে-ধীরে মাঠ খেত বনানী আর নিটোল রোদ্দুর শরীরে জড়িয়ে সে ফিরে গেল টঙে। প্রসবযন্ত্রণার শেষে পৃথিবীর সব গর্ভধারিণীর যে সুখ, এখন তাদের থেকে সে কম খুশি নয়।

দিন যায়। তবু রেখে যায় দিনগতসুখ। ভোর এলে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হৃদয়ের পদ্মপাতার জল। যেন অনেক জন্ম ধরে ছিল যে ব্যথা রাতের শিশির, এতদিনে তাই হয়ে গেছে পদ্মপাতায় জল। এই পদ্মপাতায় সেই জল আটকে রাখতে চায় সে। আকাশ নীল, পৃথিবী কী মিঠে! রোদ ভেসেছে, বুকের ভেতর ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে। পদ্মপাতায় জল শুধু যে নড়ে। এ জল আটকে রাখা দায়।

তারপর একদিন, দুপুরের জনবিরল বাতাস দূর শূন্য চিলের পাটকিলে ডানার ভেতর অস্পষ্ট হয়ে গেলে, চুপিসারে বিকেল চলে এলে, সে এল। আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তি হয়ে বিকেলটাকে করে তুলল অসম্ভব বিষণ্ণ।

মনে হল জীবনের সব দেনা শোধ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। সে নেমে এল টঙের ওপর থেকে। গাঢ় গলায় শুধিয়েছিল, 'ভালো আছ তো এখন?'

মাথা নেড়েছিল নারী, না, ভালো নেই।

'সে কী? কেন? কী করতে পারি তোমার ভালোর জন্যে?' সে ব্যস্ত হল।

নারী তাকাল, 'আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন, আপনার কাছে প্রার্থনা, এবার আমাকে প্রাণ দিন।'

যেন ঘুলঘুলাইয়ায় পাক খেল সে, 'কীভাবে?'

'যাকে ছাড়া আমি নিষ্প্রাণ তাকে গ্রহণ করছেন না পিতা। শুধু একমাত্র আপনার কথাই তিনি মানতে পারেন।'

এই কথা বলে নারী ফিরে গেল।

এখন তার চারপাশে চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ, আগুনে-ঘিয়ের ঘ্রাণ।



বুঝেসুঝে বেঁচে থাকা

কর্তামশাই জমিটা কিনে দিয়ে বলেছিলেন, 'হারা, সারাজীবন আমাদের বাড়িতে চাকরি করলি, এবার একটু স্বাধীনভাবে থাক। তোর তিরিশ বছরের যত মাইনের টাকা, তা পোস্ট অফিসের খাতায় আছে। খাতাটা নে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, কবে হুট করে চলে যাব। তুই বুঝেসুঝে বেঁচে থাকিস।'

জমির দলিল, পোস্ট অফিসের পাসবুক তার হাতে তুলে দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কর্তামশাই। বাড়ির বউদের একটুও সম্মতি ছিল না, তাঁরা চাইছিলেন হারা বাড়িতেই থাকুক। কিন্তু কর্তামশায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস তাঁদের ছিল না। তখন কর্তামশায়ের ছিল শেকড় তোলার সময়। খাঁচায় পোষা সুন্দর পাখিগুলোকে একে-একে ছেড়ে দিলেন। জামা-জুতো কেনা বন্ধ করে দিলেন। বড়ছেলে সাহস করে বলেছিল, 'হারা তো দশ বছর বয়স থেকেই এ-বাড়িতে, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ওই জমি আর টাকা নিয়ে একা সামলাতে পারবে কি? বেহাত না হয়ে যায়।'

কর্তামশাই বলেছিলেন, 'সাইকেলে চড়তে গেলে পড়তে হয়, সাঁতার শিখতে গেলে জল খেতে হয়। ওর না হয় সেরকম একটু হবে। তাই বলে একটা মানুষ আর কতকাল গোলাম হয়ে থাকবে!'

মোট দেড় বিঘে কাঠা জমি। বাস রাস্তা থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। জমিটা উঁচুতে, নিচে জলঢাকা নদী। জংলা হয়ে পড়েছিল। কর্তাবাবু লোক দিয়ে সেটা পরিষ্কার করিয়ে একটা সুন্দর চালাঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'জমির পেছনে পরিশ্রম দে হারা। জমি তোকে খাওয়াবে।'

দু-বছর ধরে হারা সেই পরিশ্রম করে গেছে দাঁতে দাঁত চেপে। ভোর থেকে জমির সঙ্গে লড়াই। তাকে তৈরি করতে, শান্ত করতেই কয়েক মাস কেটে গিয়েছিল। তারপর শহর থেকে বীজ কিনে এনে যত্ন করে লাগানো। কাজ করতে-করতে বিকেল হয়ে যেত। তখন কাঠের উনুনে ভাত চাপাত, সঙ্গে আলু আর ডিম। ডিম তার ভারি পছন্দ। কর্তাবাবুর বাড়িতে সপ্তাহে মাত্র একটা দিন ডিম হত।

তারপর মাটি ছেড়ে গাছগুলো আকাশ দেখতে চাইল। আট কাঠা জমি তখন সবুজে সবুজ। জলঢাকার ওপর থেকে হাওয়ারা ছুটে এসে ওদের সঙ্গে খেলা করে অবিরাম। জলঢাকার জলে ওদের

স্বাস্থ্য বেশ পুরুষ্টু। কর্তামশাই দেখতে এলেন। গাড়ি জমি অবধি আসে না। ধরে-ধরে নিয়ে আসতে হল। গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো হাসলেন, চোখের ওপরে হাত তুলে দেখলেন, 'ওরে হারা, সবুজ হয়ে আছে রে তোর বাগান। কী-কী লাগিয়েছিস?'

হারা হাতজোড় করে বলেছিল, 'আজ্ঞে কর্তা, উচ্ছে, বেগুন, পালং, সিম, বরবটি, পেয়ারা, ঢ্যাড়শ। বর্ষা চলে গেলেই পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর আলু লাগাব। তারপরে কপি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি। ওদিকে কয়েকটা আমগাছ লাগিয়েছি। লিচুও। তালগাছ।'

'সর্বনাশ! তুই তালগাছ লাগাতে গেলি কেন হারা?' কথা শেষ করতে না দিয়ে কর্তামশাই গলা তুললেন।

'আজ্ঞে, ও-বাড়িতে ছিল—!'

'হতভাগা! এই গাছের তাল তুই মরার আগে খেতে পারবি? তালগাছ যে লাগায় তার নাতি খায়! তোর নাতি কোথায়, যে খাবে?' কর্তামশাই মাথা নাড়লেন, 'শোন, জীবন থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। তার মধ্যে একটা হল, যে-কাজের ফল বেঁচে থাকতে-থাকতে তুই ভোগ করতে পারবি সেই কাজটাই কর। লোকে বারো ইঞ্চি দেওয়ালের বিশাল বাড়ি বানিয়ে ভাবে নাতি-পুতিরা সব একসঙ্গে থাকবে সেই বাড়িতে। এক পুরুষ পরেই দেখা যাচ্ছে সেই বাড়িতে ঘুঘু চরছে। নাতি-পুতিবা যে-যার কাজ নিয়ে বাইরে গিয়ে বাসা নিয়েছে।'

'আজ্ঞে, ও-দুটোকে তুলতে মায়া লাগবে কিন্তু আর ওরকম গাছ লাগাব না।' হারা বলেছিল।

'কিন্তু হারা, তোর জমিতে ফুলের গাছ নেই কেন?'

'ফুল?'

'হ্যাঁ, গোলাপ, টগর, নয়নতারা, সূর্যমুখী?'

'আজ্ঞে—।'

'ওগুলো খাওয়া যায় না বলে লাগাসনি?'

কথাটা ঠিকই বলেছেন কর্তাবাবু। যে-গাছের কাছে কিছু পাওয়া যাবে তাদের কথাই ভেবেছিল সে। ফুলেদের কথা মাথায় আসেনি।

কর্তামশাই বলেছিলেন, 'শুধু পেটকে খাওয়ার দিবি হারা? মনেরও তো খাওয়ার দরকার। গোলাপ যখন ফুটবে মৌমাছি ভিড় করবে, তখন দেখবি মন ভালো হয়ে যাবে। আর বেশি যদি ফুল ফোটে তাহলে ব্যাপারিরা এসে তোর কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাবে। উপরি রোজগার করতে পারবি!'

পরের দিন পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে ছ'রকমের ফুলের গাছ লাগাল হারা। গাছগুলোর জায়গা হল তার জমির একপাশে।

প্রথমবার যখন ঢ্যাড়শ-উচ্ছে-বেগুন-পালং পুরুষ্টু হল তখন বুক জুড়ে থই-থই আনন্দ। একটা ব্যাগে পুরে সেগুলো নিয়ে হাজির হল পুরোনো বাড়িতে। বউরা সেসব দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কর্তাবাবু বিছানা ছেড়ে আসতে পারবেন না শুনে হারা নিজেই গেল তাঁর কাছে। হাত-জোড় করে তার জমির প্রথম ফসল নিবেদন করল প্রাক্তন মনিবের কাছে।

কর্তা আরও দুর্বল হয়েছেন, শরীর ছোট হয়ে গেছে। তবু উজ্জ্বল চোখে সেসব দেখে বললেন, 'আমি জানতাম তুই পারবি হারা। মাটিকে ভালোবাসবি, সময়ে তাহলেই মাটি দেবে তোকে। ভালোভাবে থাকিস হারা। আর শোন, কাছে আয়!'

অবাক হয়ে সাদা-কালো খোঁচা-দাড়ি মুখ নিয়ে হারা কর্তামশায়ের মুখের কাছে এগিয়ে গেল। কর্তামশাই বললেন, 'আর একা থাকিস না। দেখেশুনে বুঝে একটা ভালো মেয়েকে বিয়ে করে একসঙ্গে থাক। শলাপরামর্শ করার জন্যেও মানুষের মানুষ দরকার হয়।'

ঠিক পাঁচ দিন পরে ভোরবেলায় কর্তামশাই দেহরক্ষা করেন। দুটো গোলাপ ফুটেছিল সেই

ভোরে। কর্তামশাইকে দেওয়ার জন্যে পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এ-বাড়িতে এসে খবর পেল হারা। সবাই কান্নাকাটি করছে। কান্না পেল হারারও। কিন্তু দৌড়ে কর্তামশায়ের বাড়ির পিছনে গোয়ালঘরের সামনে গিয়ে সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ খেয়াল করে কালীগাই তার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হারা তাকে বলল, 'জানিস কালী, কর্তামশাই নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ভগবানের কাছে।'

কালী মুখ নামাল। হারা তার মাথা জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল।

আজ যা চোখের সামনে, কাল তা স্মৃতি হয়ে যায়। কর্তামশাই চলে যাওয়ার পরেও সূর্য উঠেছে, রাত নেমেছে, বৃষ্টি ঝরেছে, তার বাগানে যেমন ফল ফলেছে তেমনই একটা দিক ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। এখন ফুলগুলোর দিকে তাকালে মন ভালো হয়ে যায়। ঠিকই বলেছিলেন কর্তামশাই। এত মৌমাছি কোথায় ছিল কে জানে, সবাই ভিড় করেছে ফুলগুলোর চারপাশে। সেই সঙ্গে এসেছে একটা ভ্রমর, একা-একা। বেচারা যে-ফুলে বসতে চাইছে সেই ফুলের মধু খেয়ে গেছে মৌমাছি। উড়তে-উড়তে সেটা চলে এল নয়নতারার কাছে। সেখানে কোনও মৌমাছি যায়নি এখনও। হারা খুশি হল, অতগুলো ফুলের মধু সবুজ ভ্রমর একাই খেতে পারবে। কিন্তু এ কী। নয়নতারার বুকে শুঁড় ঢুকিয়েই বের করে নিচ্ছে ভ্রমরটা। নয়নতারার মধু হয় না নাকি! ভ্রমর সেখান থেকে উড়ে গেলে হারা গুটিগুটি এগিয়ে গেল। একটা ফুল ছিঁড়ে তার ভেতরবুকে চটচটে যে রস দেখতে পেল সেটা জিভে ঠেকাতেই হেসে ফেলল সে। মধুর স্বাদও কখনও তেতো হয়।

দিনটা কেটে যায় গাছগাছালির সঙ্গে। কার একটু অসুখ হয়েছে, কার ডাল ভেঙেছে, কার শরীরে পোকা কামড়াচ্ছে তার খবরদারি করা আর সবাইকে স্নান করাতেই দিন শেষ হয়ে যায়। জলঢাকা থেকে জল বালতিতে তুলে ওপরে আনতে বড় কষ্ট। শেষপর্যন্ত একটা পাতকুয়ো তৈরি করিয়ে নিয়েছিল সে। মুশকিল হল গরম পড়লে পাতকুয়োর জল নিচে নেমে যায়। জমতে সময় লাগে। তাই কপিকলের ব্যবস্থা করেছে হারা। পরিশ্রম তেমন করতে হয় না। নদী থেকে জল তুলে ঢেলে দিতেই সেটা আপনি জমিতে এসে পড়ে।

মুশকিল হয় রাতের বেলায়। সন্ধের পর থেকেই এখানে শনশন হাওয়া বয়। মাঝে মাঝে তার জোর এত বাড়ে যে ঝড় বলে মনে হয়। তখন নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কীরকম অসহায় লাগে। ঘরে ঢুকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও সহজে ঘুম আসে না। আর যদি বৃষ্টি নামে তো কথাই নেই। আকাশ ফাটিয়ে বাজ পড়ে, ঝমঝম বৃষ্টি অন্ধকারকে চটকায়। তখন মনে হয় পৃথিবীতে কেউ নেই। আর প্রতি মুহূর্তে ভয় হয় গাছগুলোর ক্ষতি হল না তো! ভোর হতে না-হতে মাথায় বস্তা ঢেকে বাইরে বেরিয়ে চোখে জল এসে যাওয়ার উপক্রম হয়। যেন বুনো মোষ কাল রাত্রে বাগানে ঢুকে তছনছ করে গেছে। আহত গাছেরা নিঃশব্দে আর্তনাদ করে যাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও।

দশ মিনিট হাঁটাপথের পরে পিচের রাস্তা। দিনভর বাস-ট্রাক যায়। পিচের রাস্তার ওপাশে মাইলখানেক গেলে মাঝারি গ্রাম। কাছাকাছি লোকালয় বলতে ওটাই। ওই গ্রাম থেকে দু-চারজন মাঝে-মাঝে আসে হারার বাগান দেখতে। ওরা জানে কর্তামশাই হারাকে বাগান করে দিয়েছেন। তাই সমীহ করে কথা বলে। বাগানের একপাশে বসে বিড়ি খেতে-খেতে সুখদুঃখের গল্প করে। হারার ত্রিভুবনে কেউ নেই শুনে সমবেদনা দেখায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, প্রচুর কাজ বাকি আছে বলে হারা তাদের বিদায় করে। মাঝে-মাঝে সে বিরক্ত হয়। মানুষের কথা বলার পুঁজি বড্ড কম। দুদিন কথা বললেই একই কথা শুনতে হয়। তার বেশিরভাগই হা-হুতাশ। সে হাবেভাবে বোঝাতে চায়, আমি বেশ আছি, তোমরা তোমাদের মতো থাকো। গতকাল এক বুড়ো এল, সঙ্গে কাগজে মুড়ে চা-পাতা। বলল, 'একজন দিলে তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম। বাড়িতে তো অনেক মুখ, কার গলায় দেবো এটুকু। জল ফুটিয়ে ভিজিয়ে দাও, চা খাই দুজনে জুত করে।'

ব্যাপারটা পছন্দ হল না হারার, 'দুধ নেই, চা হবে কী করে?'

'আহা, দুধের কী দরকার! ওই তো গাছে লেবু ঝুলছে, ওর রস কয়েক ফোঁটা দিলে জব্বর স্বাদ হবে হে।'

বুড়োমানুষ বলে মেনে নিল হারা। গ্লাসে চা ঢেলে নিজেও নিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বুড়ো বলল, 'আহা, চমৎকার হয়েছে। তা বাবা হারাধন, কিছু কি ভেবেছ?'

চা খেতে ভালোই লাগছিল। হারা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপারে?'

'এইসব জায়গায় একা থাকা ঠিক নয়। দিনের বেলায় তবু এক কথা, রাত নামলে হাওয়া বয়। সেই হাওয়া সবসময় ভালো হয় না হে। তোমার এই জমি, এত বছর এমনি পড়ে ছিল কেন? নাড়ু মণ্ডল তো খদ্দের পাচ্ছিল না। কর্তামশাই সস্তায় তোমাকে কিনে দিতে পেরেছেন। কেন জানো?' বৃদ্ধ চায়ে চুমুক দিল।

মাথা নেড়ে 'না' বলল হারা।

'চার-পাঁচ বছর অন্তর এখানে ডাইনির কুদৃষ্টি পড়ে।'

'ডাইনি?'

'না। তাকে কেউ দ্যাখেনি। বাতাসে তার কুদৃষ্টি ভেসে আসে। তখন তো এখানে বুনো ঝোপ আর লম্বা ঘাস ছাড়া কিছু ছিল না। সকালে হঠাৎ দেখা যেত সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম আমরা ভাবতাম কেউ বোধহয় আগুন দিয়েছে। কিন্তু কে দেবে? লোক কোথায়! এসব খুব রহস্য।' বুড়ো বলল।

'আমার কোনও ক্ষতি হবে বুঝলে কর্তামশাই এই জমি কিনতেন না।' বেশ জোরের সঙ্গে বলল হারা।

'তা বটে। তবে ভয় হয়। হঠাৎ একদিন দেখব, এই সুন্দর বাগান ছাই হয়ে পড়ে আছে। তুমি তো একা থাক, তোমার কী হল তা জানতেও পারব না। কর্তামশাই কি কিছু বলেছেন?'

'কী ব্যাপারে?'

'এই এখানে কীভাবে থাকলে ভালো হয়?'

হাসল হারা, 'ছেড়ে দিন ওসব কথা।'

'তোমাকে পছন্দ করি বলেই তো বলি। আসলে কী জানো, এই জমিতে কোনওদিন লক্ষ্মীর পা পড়েনি। লক্ষ্মী এলে কু-বাতাস আর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তুমি বাপু আর লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থেকো না।' কথাগুলো বলে বুড়ো চলে গেল।

ক'দিন থেকে ঝুপঝুপ বৃষ্টি আর হাওয়া চলছিল। জলঢাকার জল বাড়ছে। প্রতি বছর বর্ষার সময় বাড়ে। তখন সিকি মাইল চওড়া নদীটাকে ভয়ঙ্কর দেখায়। ঢেউয়ের ছোবলের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু নদীর জল যতই বাড়ুক তা থাকে জমির অনেক নিচে। ওপাশের নিচু জমিগুলো এখন জলঢাকার জলে ডুবে থাকলেও হারার কোনও ভয় নেই। এরকম এক বৃষ্টির রাত্রে ঘরে বসে হারার মনে হল বাতাসে অন্যরকম শব্দ বাজছে। হ্যারিকেনের আলোটাও দপদপ করছে, যদিও ঘরে বাতাস ঢোকার কোনও সুযোগ নেই। বুড়ো বলেছিল কু-বাতাসের কথা। এটা কি তাই। বাইরে বেরুতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না। এইসময় বৃষ্টি থামল কিন্তু বাতাসের শব্দটা বেজে যাচ্ছে সমানে। সাহস করে বাইরে [illegible] হারা। চারধারে নীলচে কুয়াশা স্থির হয়ে আছে অথচ বাতাস বইছে। এই বাতাস উঠে আসছে জলঢাকার বুক থেকে। লাউ, কুমড়ো, চালকুমড়োর লতাগুলো মাচা আঁকড়ে কোনও মতে ঝুলছে কিন্তু ছোট গাছগুলো গিয়েছে কাত হয়ে। হঠাৎ শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠল। নীল কুয়াশারা ছুটোছুটি শুরু করল জমির ওপর। দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হারা।

কর্তামশাই বলেছিলেন, শলাপরামর্শ করার জন্যেও মানুষের মানুষ দরকার হয়। বুড়ো বলে

গেল, তুমি বাপু আর লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থেকো না। ব্যাপারটা ভাবতেই চোখ বন্ধ করে হাসল হারা। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে এ কথাটা কর্তামশায়ের বাড়িতে কাজ না করলে জানতই না। খাটো শরীর, মুখচোখ ভদ্রালোকের মতো নয়, হাফপ্যান্টের তলায় পা দুটো দিনকে দিন সরু হয়ে যাচ্ছে। এইসব নিয়ে সে বিয়ে করতে চাইলেই কোনও মেয়ে রাজি হবে? কর্তামশায়ের বাড়িতে কাজ করার সময় এসব চিন্তা মাথায় ছিল না। মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছে হত না। একবার একটা মেয়ে ও-বাড়িতে এসেছিল ক'দিনের জন্যে বড়বউকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে। অন্য বউরা যে-যার বাপের বাড়িতে গিয়েছিল তখন, বেড়াতে। সেই মেয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'গাইগুলো যখন পাল খায় তখন তুমি দ্যাখো?'

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল হারা, 'দেখতে হয়।'

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল মেয়ে। হাসতে-হাসতে বলেছিল, 'তা ওসব দেখে তোমার ইচ্ছে জাগে না?'

উত্তর দেয়নি হারা কিন্তু বড়বউকে বলে দিয়েছিল কথাগুলো। সেদিনই মেয়েকে বিদায় করেছিল বড়বউ।

সকাল হল। সঙ্গে-সঙ্গে হারা লেগে গেল চিকিৎসা করতে। জলকাদা মেখে চেহারাটার কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। কাদা শুকিয়ে চামড়ায় সেঁটে গেছে। এগারোটা নাগাদ কাজ যখন শেষ তখন বুড়োর গলা কানে এল, 'আয়, ইদিকে আয়।'

আবার কাকে নিয়ে এল। গাছের আড়ালে থেকে দেখতে চাইল হারা। বুড়ো তখন ঘরের সামনে চলে গেছে, 'ও হারাধন, কোথায় গেলে! দ্যাখ কে এসেছে, তুমি না ডাকলে ভেতরে আসতে চাইছে না। হারাধন!' বুড়োর গলায় আজ স্নেহ মাখামাখি।

'না ডাকতেই ভিড় জমছে, ডাকলে তো চোখে অন্ধকার দেখব।' কথা না বলে পারল না হারা।

'ও, তুমি ওখানে। কাল রাত্রে ঝড় হয়েছিল বটে। খুব চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে। সেই কু বাতাসের কথা মনে আসছিল। তাই আমার ছোটশালির মেয়ে বেড়াতে আসতেই বললাম, চল, হারাধনকে দেখে আসি। সারা রাত মুখ বুজে থাকে বেচারি!' বুড়ো হাসল, 'আয় মা, হারাধনের মুখ শুনে মন বিচার করিস না।'

'বলেছি তো, যার জায়গা সে না ডাকলে পা বাড়াব না।'

বেশ খসখসে মেয়েদের গলা শুনতে পেল হারা। ব্যাপারটা কী? বুড়ো একে নিয়ে এল কেন? উঠে দাঁড়াল হারা।

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল। ও হারাধন, অতিথিকে বিমুখ কোরো না।'

হারা ইতস্তত করে বলল, 'ঢোকার পথ খোলাই আছে, এলেই হয়। তবে কিনা আমি কাজে ব্যস্ত।'

এবার তিনি ঢুকলেন। পরনে হলুদ শাড়ি হলুদ জামা। শাড়ি নেমেছে হাঁটু আর গোড়ালির ঠিক মাঝ বরাবর। বড় মুখ, ছোট চোখ কিন্তু নাকখানি বেশ টিকোলো। গায়ের রং মাজা আর শরীর-স্বাস্থ্য দেখলে মনে হবে আধ সের চালের ভাত স্বচ্ছন্দে মেরে দিতে পারে।

এই মেয়ের বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। বাগানে ঢুকে কোমরে হাত রেখে বলল, 'বাঃ। জব্বর বাগান তো! ও মেসো, কতদিন এমন বাগান দেখিনি। আমাদের ওখানে তো ভালো বাগান হয় না।'

বুড়ো ধমকাল, 'আঃ। ওখানকার কথা বলার কী আছে। ওখানে অনেক কিছুই হয় না। এই

বাগান আমাদের হারাধনের হাতে গড়া।'

'ও মা! ওপাশে নদী বুঝি।' দৌড়ে গেল মেয়ে নদীর দিকে, 'বাব্বা! কী ঢেউ। রাগে ফুঁসছে, খুব গতর বেড়েছে যে!'

বুড়ো হাসল, 'তোর মুখ বড় আলগা। ও হারাধন, এটি আমার শালির মেয়ে, পদ্ম। দেখতে-শুনতে কেমন সেটা তো বুঝতেই পারছ, গৃহকর্ম নিপুণা, স্বভাবচরিত্র ভালো তবু স্বামীর ঘর করা ওর হল না।'

মাথা নাড়ল বুড়ো।

'কেন? যার এত গুণ তার দোষ কোথায়?'

'মারে হরি রাখে কে? সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সাতাশেও যখন বংশরক্ষা করতে পারল না তখন শ্বশুর-শাশুড়ি আবার ছেলের বিয়ে দিতে চাইল। পঞ্চায়েতের কাছে গিয়েছিল। তারাও বিধান দিল, বংশরক্ষা করার জন্যে দ্বিতীয় বিবাহে কোনও অপরাধ হয় না। কিছু টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বাপের বাড়িতে ওকে পাঠিয়ে ওর স্বামী আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ল। কী আর বলব?' বুড়ো শ্বাস ফেলল।

'তারও তো দু-বছর পেরিয়ে গেল। কই, বাচ্চা হয়েছে? তাহলে তো ডুমুরগাছেও ফুল ফুটতে দেখত লোকে।' মুখ ঘুরিয়ে বলল পদ্ম। তারপর খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'কী হল? অ্যাই পদ্ম!' বুড়ো ধমকাল।

'তুমি না বলেছিলে মেসো, চল, তোতে আমাতে চা খেয়ে আসি! তা যেরকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে, চা তোমার কপালে নেই। বরং পেয়ারা পেকেছে, তাই খাও।' পদ্ম ঘুরে নদীর দিকে তাকাল।

বুড়ো বলল, 'যাও হে হারাধন, চান করে এসো। মুখে গায়ে কাদামাটি শুকিয়ে আছে তোমার।'

পদ্ম বলল, 'রান্নাঘরটা কোথায়? চা বানাই।'

বুড়ো বলল, 'ব্যাটাছেলে, একা থাকে। শোওয়া, রান্না একই ঘরে হয়। যা, ঘরে গিয়ে দ্যাখ।'

হারা দেখল পদ্ম তার শরীর দুলিয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এম্মা! এ তো আঁস্তাকুড়, মেসো, বলে দাও, যেখানে খাবে সেখানেই হাগবে—এ চলবে না, তিন দিনের মধ্যে রান্নাঘর বানাতে বলো।'

বুড়ো বলল, 'হবে হবে। সব হবে। অত তাড়াহুড়ো করলে চলে! এই নে, চা-চিনি। গাছ থেকে লেবু পেড়ে দিচ্ছি। চা বানা।'

ওরা যখন বিদায় হল তখন সূর্য মাঝ-আকাশ ছাড়িয়েছে। ওদের এড়াবার জন্যে সারাক্ষণ বাগানের কাজ করে গেছে হারা। আরও আগাছা পরিষ্কার করেছে, মাটি কুপিয়েছে। যাওয়ার সময় পদ্ম চোখ ঘুরিয়ে বলে গেছে, 'বুঝলে মেসো, গাছেদের সঙ্গে বাস করলে মানুষও যে গাছের মতো বোবা হয়ে যায় জানতাম না।'

সেই ছেলেবেলা ইস্তক হারা কর্তামশায়ের বাড়ির ছেলেমেয়ে দেখেছে। বড়মা যেমন, বাড়ির বউরাও তেমনই কখনও গলা তুলে কথা বলত না। এরকম বেঁকিয়ে, চিমটি কেটে কথা বলার অভ্যেস তাঁদের ছিল না। মেয়েমানুষের জিভে যদি এত ধার হয় তাহলে তার পক্ষে ঘর করা কী করে সম্ভব! হারার মনে হল, বংশরক্ষার জন্যে নয়, ওই মুখ সহ্য করতে না পেরে ওকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়েছে।

জলঢাকার জলে এখন সাপের ছোবল। দেখলেই ভয় করে। সাঁতার কাটার কথা চিন্তাও করা যায় না। ভাত চড়িয়ে দিয়ে নিচে নেমে কোনওরকমে কাদামাটি ধুয়ে একটা ডুব দিয়ে ওপরের

দিকে তাকাতেই চোখ ছোট হল হারার। ঢেউয়ের ধাক্কায় মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। বেশ বড়-বড় চাঙড় খসে পড়ছে। এভাবে চললে একদিন-না-একদিন তার জমি নদী খেয়ে ফেলবে। কী করা যায়? মনে অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি সেদ্ধভাত খেয়ে হারা বড় রাস্তায় চলে এল। কিছু লোক জটলা করছে রাস্তার পাশে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে।

একজন বলছিল, 'আমি নিজের কানে শুনে এলাম নিচের একটা গ্রাম, জলঢাকায় জলের তলায় চলে গেছে। স্যাতজন মানুষ সেই জলে ভেসে গেছে।'

আর একজন বলল, 'কান মিথ্যে শোনে আর চোখ সত্যি দ্যাখে। চোখে যখন দ্যাখোনি তখন বিশ্বাস করো না।'

দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। ওদের একজন হারাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'তোমার খুব সাহস ভাই। একা থাকো। তা নদী কত দূর? মাটি ভাঙছে না তো?'

'ভাঙতে শুরু করেছে। গেল কয়েক বছর এরকম হয়নি।' হারা বলল, 'কী করা যায় বুঝতে পারছি না।'

'সেচ দপ্তরে চলে যাও। ওদের ডিউটি হল নদীকে সামলে রাখা। আজই যাও।' লোকটা উপদেশ দিল। আর একজন বলল, 'ঘরে মেয়েমানুষ থাকলে নদী ঘেঁষত না। জানো তো, নদীও যে মেয়েমানুষ, সতীন সহ্য করতে পারে না। দূরে-দূরে থাকে।'

সেচ দপ্তরের অফিসে বাসে চেপে যেতে হবে। আধ ঘণ্টার পথ। সঙ্গে বাসভাড়া আনেনি, তা ছাড়া সন্ধে হতেও দেরি নেই। হারা ঠিক করল কাল সকালেই সেখানে যাবে।

সন্ধে থেকেই ঝুপঝুপ বৃষ্টি। মাথায় বস্তার ঘোমটা চাপিয়ে নদীর ধারে এল হারা। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও জলের ফোঁসফোসানি শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও মাটির চাঙড় ভেঙে পড়ল জলে। ঝপাং শব্দ কানে এল।

কর্তামশাই খুব বুঝেসুঝেই এই জমি তাকে কিনে দিয়েছেন। তখন নদী ছিল বেশ দূরে, জমিটাও উঁচুতে। এতগুলো বর্ষা গেল কিন্তু কোনওবারই নদী এমন খেপে ওঠেনি। এই জমি যদি নদী খেয়ে নেয় তাহলে তার কী হবে? কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই তার। ও-বাড়িতে নতুন লোক কাজে লেগে গিয়েছে বহু দিন।

বৃষ্টিটা ধরল। বস্তা সরিয়ে রেখে বাগানে ঢুকল হারা। সূর্যমুখী গাছটা ক'দিন থেকেই নেড়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাকি গাছগুলো শরীরে ফোঁটা-ফোঁটা জল নিয়ে যে-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তা দেখে বুক ছ্যাঁত করে উঠল হারার। কর্তামশায়ের শরীর যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন শ্মশানযাত্রীরা এইভাবে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

প্রায় দৌড়েই ঘরে চলে এল সে। অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালতে ইচ্ছে করছে না। মাটিতে বেশ জোরে লাথি মারল সে। কী শক্ত! এর জমি ও দখল করলে মারপিট হয়, পুলিশ আসে। কিন্তু যদি নদী জমি খেয়ে নেয় তাহলে সবাই মেনে নেয়। নদী নাকি মেয়েমানুষ। আজ বিকেলে লোকটা বলেছিল। মেয়েমানুষের এত তেজ কি ভালো?

হঠাৎ যেন মনে হল কয়েকজন কথা বলছে। ফিসফিস করে। এত রাত্রে কে এল এখানে? কারা এল? মাঝে বাতাসে গলার স্বর মিলিয়ে যাচ্ছে। যারাই আসুক তাকে ডাকছে না কেন? সন্তর্পণে দরজার কাছে এসে বাইরে মুখ বাড়াল। অন্ধকারে কারও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বাতাসে ভেসে আসছে অস্পষ্ট শব্দ। কান পাতল হারা। না কথা নয়, চাপা, অস্পষ্ট কান্না। তার বাগানে সেই কান্নাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে? সে ঘরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে বাইরে পা রাখতেই কান্নাটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। যেন তাকে দেখতে পেয়ে চুপ মেরে গেল যারা কাঁদছিল। হারা লণ্ঠন হাতে নিয়ে

পুরো বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজল। নাঃ, কেউ নেই। হঠাৎ তার নজর গেল লাউগাছটার দিকে। আজ বিকেলেও লাউলতা মাচা আঁকড়ে ছিল। এখন কুমড়োগাছের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মাটিতে। এটা কী করে সম্ভব হল। দুটো গাছের শেকড় তো বেশ তফাতে। তাহলে ব্যবধান ঘোচাল কী করে?

হারার মনে হল গাছেরাই এতক্ষণ কাঁদছিল। ওরাও টের পেয়ে গেছে, এই বাগান নদীর পেটে চলে যাবে। যদি মাঝরাত্রে ব্যাপারটা হয় তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেও নদী ওদের সঙ্গে খেয়ে ফেলবে। লাউলতাকে কুমড়োলতার শরীর থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল হারা। কিন্তু শুঁড়গুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে তবু ওরা আলাদা হচ্ছে না।

রাতটা কেটে গেল কিন্তু জলঢাকার জল বেড়ে গেল অনেকটা। এরকম বাড়লে আজ রাত্রেই কর্তামশায়ের কিনে দেওয়া জমি বাগানসমেত গিলে ফেলতে পারবে নদী। সকালে সেচ দপ্তরে গিয়েছিল হারা। গিয়ে জানতে পারল নদীর জল না কমলে কিছুই করা যাবে না। পাহাড়ে নাকি একটা বাঁধ ভাঙব-ভাঙব হয়েছে, সেটা ভাঙলে আর দেখতে হবে না। ওরা উপদেশ দিল, জমির মায়া ত্যাগ করে হারা যেন নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। বাঁধ ভাঙলে নদীকে রোখা যাবে না।

আজ সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। গালে হাত দিয়ে গাছগুলোকে দেখতে-দেখতে কান্না পেয়ে গেল হারার। এদের ফেলে কোথায় যাবে সে! না। ইচ্ছে করলে ও-বাড়িতে যেতে পারে। বউরা খুশি হবেন। কিন্তু এরা তার ছেলেমেয়ের মতো। বাপ হয়ে পালিয়ে বাঁচবে?

বিকেলে আর একবার নদী দেখে এসে সূর্যমুখীর পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাল হারা। ঠিক তখনই গলা কানে এল, 'দুপুরে ডিমের ঝাল রেঁধেছিলাম। মেসো বলল ওটা নাকি অমৃত। তার পরেই স্নেহ উথলে উঠল মেসোর, যা পদ্ম, ছেলেটাকে দিয়ে আয় একটা ডিম। হাত পুড়িয়ে খায়, খেলে জিভের স্বাদ পালটাবে। তা যেখানে ইচ্ছে রেখে বাটিটা ফেরত দিলে ফিরে যেতে পারি।'

আদিখ্যেতা! মনে-মনে বলল হারা। আজ রাত্রেই যার সর্বনাশ হতে পারে, তাকে ডিম খাওয়াতে এসেছে! আর ডিমের ঝোল কি করে অমৃত হয়! ন্যাকামি।

'কী আমাকে বকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি?' পদ্মার কণ্ঠস্বর আরও ঝাঁঝাল হল।

ফেরত দেওয়া যেত। কিন্তু বুড়োটা হয়তো দুঃখ পাবে। মরার আগে কাউকে দুঃখ দিয়ে কী লাভ। ঘরে ঢুকে একটা বাটি নিয়ে এল হারা, এনে উঁচু করে ধরল।

গম্ভীর মুখে ঝোল আর দুটো ডিম তাতে ঢেলে দিল পদ্ম। তারপর বালতিতে রাখা জলে ধুয়ে নিল সেটা।

'দুটো কেন? একটা হলেই তো হত।' হারা বিড়বিড় করল।

'কীসে কী হয় আমার জানা নেই। সেদ্ধভাত খেয়ে-খেয়ে পেটে নিশ্চয়ই চড়া পড়ে গেছে। তাই ভাবলাম। অবশ্য খেতে না চাইলে ফেলে দিলেই হয়। পাশেই তো নদী।' চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে-দেখতে বলল পদ্ম।

আজ পদ্মার শরীরে নীল শাড়ি, নীল জামা। খোঁপা বেঁধেছে আলগা করে, তাতেও নীল ফিতে। নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে পদ্ম বলল, 'সর্বনাশ, এ কী চেহারা! সবাই বলছে বান আসবে বড়। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবী, মেসোর বাড়ি তো উঁচুতে। সেখানে জল যেতে পারবে না। এখানে থাকতে ভয় লাগছে না?'

'ভয় কীসের? বড়জোর মরে যাব, তার বেশি কী হবে?'

'ডিম দুটো খেয়ে মরলেই খুশি হব।' হঠাৎ গলার স্বর পালটে গেল পদ্মার, 'আরে! ছুটে গেল একটা জুঁইফুলের গাছের পাশে, কী সুন্দর কুঁড়ি ধরেছে। কাল সকালেই ফুল হয়ে যাবে।'

যদি নদীর পেটে না যায়! মনে-মনে বলল হারা। আর তখনই আচমকা মন হালকা হয়ে গেল। এই ফুল-ফলের গাছ নদীর বুকে চলে গেলেও ভাসতে-ভাসতে কোথাও গিয়ে ঠেকবে। জল নেমে গেলে সেখানেই হয়তো শেকড় ঢোকাবে মাটিতে। অথবা বীজ ছড়াবে ফলগুলো। আবার নতুন

গাছ জন্মাবে পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষের প্রাণ চলে গেলে তার আর নতুন জন্ম হয় না। অতএব মায়া করে কী লাভ। যা হওয়ার তাই হোক। চুপচাপ তাই মেনে নেবে সে। বিধিলিপি মেনে নেওয়াই ভালো।

এই সময় বৃষ্টি শুরু হল আর পদ্ম চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রে!'

জলের ছাঁট থেকে বাঁচতে সে দৌড়ে চলে গেল ঘরের ভেতরে। বৃষ্টি পড়ছিল গায়ে মাথায়। হারা মাথা নাড়ল। আবার বৃষ্টি মানে পাহাড়ে বাঁধ ভাঙবে। জলের ঢল নামবে নদীতে। আজ রাত্রেই হারিয়ে যাবে তার জমি-বাগান।

'তাপ-উত্তাপ নেই তা দেখেই বুঝেছিলাম। তাই বলে বৃষ্টির জলও টের পাচ্ছে না, জ্বর হলে দেখার কেউ নেই। মনে রাখলে ভালো।' পদ্ম চেঁচিয়ে উঠল।

হারা ঘরের দরজায় এল। গামছা টেনে মাথা মুছল। 'আঁধার হয়ে আসছে, বৃষ্টিও বাড়বে। এইবেলা বাড়ি ফিরে যাওয়াই মঙ্গল।'

'ছাতি থাকলে ভালো হয়।'

'ছাতি নেই, বস্তা আছে। তাই মাথায় দিয়ে—।'

'এম্মা! বস্তা মাথায় রাস্তায় হাঁটব!'

'কিন্তু অন্ধকার হয়ে এল বলে!'

'হোক। তেমন বুঝলে মেসো ছাতা নিয়ে আসবে।'

অগত্যা হ্যারিকেন জ্বালাল। বেশি তেল নেই। নাই থাক। কাল তেল কেনার দরকার হবে না। বাঁচলে তবে তো আলো!

বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। দরজা ভেজিয়ে ঘরের একপাশে তক্তাপোশের কোণে বসল হারা। পদ্ম বসেছে অন্য প্রান্তে।

'তবু ভালো এই ঘরে জল পড়ে না।' পদ্ম বলল।

'বান আসতে পারে। কোনওরকমে চলে যাওয়াই ভালো।'

'ভিজলেই জ্বর আসে। আমার জন্যে কাউকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক আছি।' পদ্ম ঠোঁট বেঁকাল।

কেউ যদি সেধে মরতে চায় তো মরুক। পকেট থেকে বিড়ি বের করে সযত্নে তার মুখে আগুন দিল হারা। সঙ্গে-সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠল, 'ঘর বন্ধ তার ওপর বিড়ি ধরানো হচ্ছে! গন্ধে গা গুলিয়ে যায়। অতই যখন নেশা তখন সিগারেট খেলেই তো হয়। ম্যাগো!' আঁচল তুলে নাকে চাপা দিল পদ্ম।

হারা নির্বিকার। বিড়ি শেষ করে বলল, 'বাতিতে তেল কম। ভাত রাঁধতে হলে এইবেলা রেঁধে নেওয়া ভালো।'

'আমি কি এ-বাড়ির বউ যে স্বামীর জন্যে ভাত রাঁধব? যার দরকার সে রেঁধে নিক।' পদ্ম শুয়ে পড়ল তক্তাপোশে। 'আর পারি না বাবা। এমন হাড়বজ্জাত বৃষ্টি জন্মে দেখিনি।'

হারা উঠে দাঁড়াল। বিকেলের ভাত এখনও কিছুটা হাঁড়িতে জল মেশানো রয়েছে। সঙ্গে ডিমের ঝোল। নিজের জন্যে রাঁধার কোনও দরকার নেই। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকল, বাজ পড়ল কোথাও। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল পদ্ম। দু-হাতে কান ঢেকে অদ্ভুত গলায় বলে উঠল, 'বাড়ি যাব।'

'গেলেই হয়, দরজা খোলাই আছে।' হারা বলল।

ধপ করে তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়ল পদ্ম। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে।

যে-মেয়ে বিকেল-সন্ধেয় বারংবার বলা সত্ত্বেও যেতে চায়নি, সে এরকম তুমুল বৃষ্টিতে চলে

যাবে ভাবতে পারেনি হারা। ঘনঘন বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নিশ্চয়ই ভিজতে-ভিজতে পৌঁছে যাবে। ভালোই হয়েছে। নইলে আজ রাত্রে মেয়েটা তাদের সঙ্গে নদীর তলায় চলে যেত।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মন খামচাতে লাগল কেউ। শেষপর্যন্ত বুড়োর বাড়িতে পৌঁছুতে পারল তো? কাদাপথে যদি কোনও অঘটন হয়? বস্তা টেনে নিয়ে মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল হারা বাইরে। আকাশ যেন সমুদ্দুর । আর সেই সমুদ্দুর ধেয়ে আসছে পৃথিবীকে। নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে থতমত হয়ে গেল সে। নদী থেকে ঢেউয়ের সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজটা এখন ভেসে আসছে না কেন? জল বয়ে যাচ্ছে গম্ভীর হয়ে। শিকার ধরার আগে জানোয়ারেরা যেমন ওত পেতে থাকে সেইরকম অবস্থা নাকি?

বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকাতে পারল না হারা। তাও অন্ধকার বলে ওরা অনেকটা চোখের আড়ালে। ধীরে-ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল সে। পথ বলে যেটা ছিল সেটা এখন জলে-কাদায় চুপসে আছে। হাঁটে কার সাধ্যি! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় পথ দেখে দেখে, টলতে-টলতে পিচের রাস্তায় উঠে এল হারা। না, কোথাও পদ্ম পড়ে নেই। তার মানে সে ঠিকঠাক মেসোর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সে-বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে ইচ্ছে হল না তার। বুড়ো জিজ্ঞাসা করতেই পারে, এমন বৃষ্টিতে ওকে একা ছেড়ে দিলে কী করে হারাধন?

ফিরে এল হারা। ঘরের সামনে পৌঁছে অবাক হয়ে দেখল পদ্ম ভেজা চুল থেকে জল ঝাড়ছে! তার শাড়ি জামা ভিজে চপচপে।

'এ কী!' মুখ ফসকে শব্দটা বেরিয়ে এল হারার।

'কাদায় পিছলে পা মচকে গেছে। নইলে কে ফিরত এখানে! কিন্তু এই ভেজা কাপড় পড়ে থাকলে নির্ঘাত জ্বর হবে, ফুলু হতেও পারে। তাতে যদি কারও খারাপ লাগে তাহলে একটা শুকনো কাপড় দেওয়া হোক।' পদ্ম হ্যারিকেনের দিকে তাকাল। সেটা দপদপ করছে।

'এখানে মেয়েদের কাপড় কী করে থাকবে? তাহলে আমাকে যেতে হয়—।'

'কোথায়?'

'যাকে মেসো বলা হয় তার বাড়িতে। গিয়ে চেয়ে নিয়ে আসি।'

'থাক। কী বুদ্ধি! ঢাক পিটিয়ে পাড়ার লোককে না জানালে চলছে না। মেয়েদের জামা না থাক, নিজের কিছু শুকনো নেই?' পদ্ম ঝাঁঝিয়ে উঠল।

চিরকাল বাড়িতে খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে এসেছে হারা। তাই আছে গোটা দুয়েক। আছে শার্ট আর তিনটে ধুতি। তক্তাপোশের নিচ থেকে টিনের স্যুটকেস বের করে একটা ধুতি বের করে দিল সে।

'এম্মা এ যে মিলের ধুতি। বিধবা না হয়েই থান পরবো নাকি?' ধুতি খুলে উলটোদিকে মুখ করল পদ্ম, 'মেয়েমানুষের কাপড় ছাড়ার সময় ব্যাটাছেলের থাকতে নেই। বৃষ্টিতে বেরুতে হবে না, দরজার দিকে মুখ করে থাকলেই চলবে।'

অগত্যা দরজার দিকে মুখ ফেরাল হারা। জামা-কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে পদ্ম চাপা গলায় বলল, 'খবরদার এদিকে তাকাবে না। তাকালে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। বলব তুমি আমার ইজ্জত নষ্ট করেছ, হ্যাঁ। মুশকিল হল এই বৃষ্টিতে চিৎকার কারও কানে যাবে না। সত্যি, বৃষ্টি বলতে বৃষ্টি! তাই মেসো ছাতা নিয়ে আসতে পারেনি এখনও। নিজে যখন পারেনি তখন আমি যে যেতে পারলাম না তা ঠিক বুঝবে। অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। মেসো জানে তার হারাধন বড় ভালো ছেলে। তিনকাল গেছে তবু শালগ্রাম শিলা হয়ে আছে। এঃ, একে মিলের ধুতি তারপর ছোট। কী জ্বালা! হ্যাঁ, মুখ ফেরাতে ইচ্ছে করলে আপত্তি নেই, তবে আমার দিকে না তাকালে খুশি হব।'

হারা ফিরল, 'আমি আজ সারারাত জাগব। ইচ্ছে হলে খাটে ঘুমানো যেতে পারে। কিছু ভাত আছে, ডিমের ঝোল দিয়ে খেয়ে নিলেই হয়।'

'রাত জাগতে হবে কেন? কী মতলব?'

'নদীকে বিশ্বাস নেই। ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। যদি মাঝরাতে গিলে খায় তাহলে ঘুমিয়ে পড়লে টের পাব না।' পদ্মর দিকে তাকাল হারা। সঙ্গে-সঙ্গে ধুতির ছোট্ট আঁচল বুকের দিকে টানল পদ্ম। আর তার ফলে কোমরের ওপরের অংশ থেকে কাপড় সরে গেল। হ্যারিকেনের আলো অনেকক্ষণ দপদপ করছিল এবার টুক করে নিভে যেতেই কানে তালা পড়ার মতো শব্দ করে বাজ পড়ল।

চিৎকার করে উঠল পদ্ম, 'ওরে মাগো, বাবাগো!'

'আরে কিছু না, এখানে কিছু হয়নি।'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার মেঘের গর্জন হতেই তড়াক করে লাফিয়ে নামল পদ্ম। থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। অন্ধকারেও মনে হচ্ছিল হারার পদ্ম পড়ে যাবে। সে হাত বাড়াল শূন্যে, 'ভয়ের কিছু নেই। হাত ধরলে ভয় কমে।'

'কোথায় হাত? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' কাতরে উঠল পদ্ম।

এই সময় হারার হাত ভেজা চুল স্পর্শ করতেই পদ্ম তাকে জড়িয়ে ধরল। হারা বলল, 'আঃ, এত জোরে কেন? উঃ।'

'আমি মরে যাব।' পদ্ম কেঁদে উঠল।

'শব্দ শুনলে কারও মরণ হয় না। মরবে নদী এই ঘর খেয়ে নিলে।' শ্বাস ফেলল হারা।

'নদী এই ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জেনেও পড়ে থাকা কেন?'

'নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাছগুলোকে ফেলে যাব কেমন করে? ওরা তো আমার ছেলেমেয়ের মতো।' হারা বলল।

মিনিট দুয়েক স্থির থেকে আস্তে-আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পদ্ম বলল, 'তুমি সত্যি ভালোমানুষ।'

হারা হাসল শব্দ করে।

'এই অন্ধকারে মেয়েমানুষের শরীর পেয়েও শালগ্রাম শিলা হয়ে থাকলে। নাকি মরবে ভেবে ঠান্ডা হয়ে গেছ।'

'আমি তো মরেই আছি। মরে গেলে মানুষের শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। কর্তামশায়ের শরীরও হয়ে গিয়েছিল মরার পরে।'

'এসো, খাটে এসে বসো।

ঘুম ভাঙল শেষপর্যন্ত। ভাঙতেই হারা দেখল পাশে পদ্ম হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ধুতি নেই। হালকা আবছা একটা আলো ঘরে তিরতিরিয়ে চলে এসেছে। হঠাৎ হারার শরীর থরথরিয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বাইরে বের হল। আশ্চর্য! গাছগুলো আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে যেন ঝকমকিয়ে উঠল ওরা। দৌড়ে নদীর কাছে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল হারা। নদীর জল এখন অনেক নিচে নেমে গেছে ঢেউয়ের ছোবল আর নেই। শান্ত হয়ে মাথা নিচু করে বয়ে যাচ্ছে জল।

তার বাগান বেঁচে গেল। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল সে। এবং তখনই মনে পড়ল লোকটার কথা। 'ঘরে মেয়েমানুষ থাকলে নদী কাছে ঘেঁষত না। নদীও যে মেয়েমানুষ, সতীন সহ্য করতে পারে না। দূরে-দূরে থাকে।'

হেসে ফেলল হারা। তারপর বড়-বড় পা ফেলে চলে এল ঘরে। পদ্ম তখনও ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ওপর ঝুঁকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই মেয়ে, আমার ঘরের বউ হবে?'

ঘুম ভেঙে যাওয়ার হকচকিয়ে তাকাল পদ্ম।

হারা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ঘরের বউ হবে?'

দু-কান ছোঁয়া একটা হাসি হাসল পদ্ম। তারপরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'কী হবে? কাকে বিয়ে করব? শালগ্রাম শিলাকে।'

সাঁতার না-জানা বালকের মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল হারা। নাকানিচুবুনি খেতে-খেতে বলল, তোমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে কিন্তু—।'

'ওমা! সে কোথায়?'

'পাশেই।' ডুবে যাওয়ার আগে উচ্চারণ করল হারাধন।



তিন পবিত্র আত্মা এবং চোরাপথে অপ্সরা

সরকারি হাসপাতাল হলেও ঘরে এককুচি নোংরা পড়ে নেই। বিছানাও ধবধবে। চিকিৎসকরাও ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে জানেন না। নার্সরা নিবেদিতপ্রাণ সেবায়। এই রকম এক হাসপাতালের বড় কেবিনে তিনটি বিছানায় শুয়ে আছেন যে তিন জন মানুষ তাঁদের আজই আই সি ইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে। তিনজনেরই স্যালাইন এবং অক্সিজেন চলছে। এঁদের বয়স পঁচাশি থেকে ছিয়াশির মধ্যে। কাকতালীয় ভাবে এঁদের একটি মিল আছে। প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর হল 'ম'। মতিন, মনোরঞ্জন এবং ম্যাকডোনাল্ড। চিকিৎসকরা খুবই চেষ্টা করছেন এঁদের সুস্থ করে তুলতে, কিন্তু তাঁরা জেনে গেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে-কোনও লড়াই-এ মানুষ হার স্বীকার করতে বাধ্য। তবু আজ সকালে পরীক্ষার পর একটু আশার আলো দেখা পাওয়ায় তিন জনেরই অক্সিজেন মাস্ক খুলে দেওয়া হল। তিন জনেই হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ ডাক্তার'।

একটু বেলা হলে বালিশে হেলান দিয়ে মতিন বললেন, 'ভাইরা, আমি মতিন। আল্লার অনুগত সেবক মাত্র। সারাজীবন কোরান মেনে চলেছি, আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল যেন কোনও মানুষকে আঘাত না দিই। এমনকী পশুদের ওপরও অত্যাচার করতাম না। ডাক্তার যতই চেষ্টা করুন, আমার অন্তিম দিন এসে গিয়েছে। আজ আমি মানুষ হিসেবে শেষ নিশ্বাস ফেলব, আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।'

মতিন চুপ করলে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। আমিও সারাজীবন বাইবেলের নির্দেশ মান্য করেছি। প্রতিবেশি তো বটেই, অচেনা মানুষকেও সাধ্যমত সাহায্য করেছি। হ্যাঁ, আমি এই জীবনে কোনও পাপ করিনি। বন্ধু, আমিও অনুভব করছি, আজই আমার শেষ দিন।'

মনোরঞ্জন একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড! খুব ভোরে কেউ যেন আমায় বলল, আজই তোর শেষ দিন। তৈরি হয়ে থাক। আমিও তৈরি। এই পৃথিবীতে অনেক দিন বাঁচলাম। না, আপনাদের মতো কোরান বা বাইবেল আমাদের নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। বাংলাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ওগুলো পড়ে মনে হয়েছে, এ আমার জন্য নয়। শেষপর্যন্ত ঠিক করেছিলাম—ভালো কাজ কাকে বলে জানি না, কিন্তু কখনওই খারাপ কাজ করব না। আজ অবধি তাই মেনে চলেছি। রোজ রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজেকে প্রশ্ন করেছি কোনও খারাপ কাজ করিনি তো? যদি মনে হত কোনও কাজে একটু ধন্দ আছে, তাহলে পরের দিনই ছুটে যেতাম সেই

মানুষটার কাছে যাকে জড়িয়ে কাজটা করেছি। আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে নিতাম। আর, এসব করেছি বলেই আজ, জীবনের শেষ দিনে আপনাদের সঙ্গ পেলাম। ভগবান!'

শেষ শব্দটি স্বগোতক্তির মতো উচ্চারিত হল। মতিন বললেন, 'আমি আল্লাকে স্মরণ করি সবসময়। তিনি নিরাকার। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই সৃষ্টি। আপনার ভগবানের কোন সঠিক রূপ আপনি এই মুহূর্তে কল্পনা করবেন?'

মনোরঞ্জন বললেন, 'ভগবানেরও কোনও রূপ নেই, তিনিও নিরাকার, আমরাও বলি এই জগৎ তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর রূপ কল্পনা করা অসম্ভব।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'বাঃ, আমার গড-এরও কোনও অবয়ব নেই। তিনিও নিরাকার, এই জল-স্থল-আকাশ তাঁরই সৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন, 'আলো জ্বলুক, তাই আলো জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু বন্ধুগণ, গড কীরকম দেখতে তা কল্পনাই করতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, এই দেহ ত্যাগ করার পর তিনি নিশ্চয়ই আমাকে হেভেন-এ নিয়ে যাবেন। জানি না সেখানে তাঁকে দেখতে পাব কি না। তবে নিশ্চয়ই যিশু আর মাদারকে দেখতে পাব। আমি এখনই রোমাঞ্চিত বোধ করছি।'

মতিন বললেন, 'আল্লা নিশ্চয়ই আমাকে বেহেশ্‌তে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। সেখানে অনন্ত শান্তি স্থির হয়ে আছে। সমস্ত ধর্মপ্রাণ, যাঁরা পৃথিবীর মানুষের উপকার করে গিয়েছেন তাঁরা কোরান পাঠ করছেন, নামাজ পড়ছেন, আল্লার দয়ায় শান্তিতে বিরাজ করছেন। আমি তাঁদের পেছনে যদি একটু জায়গা পাই তাহলে ধন্য হয়ে যাব।'

মনোরঞ্জন চুপচাপ শুনছিলেন। এবার শ্বাস ফেললেন। ম্যাকডোনাল্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অভিপ্রায় জানতে পারি কি?'

'আপনারা পবিত্র মানুষ। সারাজীবন কত ভালো কাজ করে এসেছেন। আমি ভালো কাজ করেছি কি না জানি না, কিন্তু কোনও খারাপ কাজ করিনি। শুধু এইটুকু সম্বল নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে কি না তাও জানি না। ভগবান যা চাইবেন তাই হবে। স্বর্গে গিয়ে কী করব তা কল্পনা করতে তাই চাই না', মনোরঞ্জন মাথা নাড়লেন।

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আপনি কারও খারাপ করেননি এরচেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে। আপনার ভগবান নিশ্চয়ই আপনাকে স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। আচ্ছা, আপনার স্বর্গের চেহারা কীরকম?'

মনোরঞ্জন বললেন, 'সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখে শুনেছি, বই-এ পড়েছি স্বর্গ মানে অপার শান্তির জায়গা। সেখানে কোনও জাগতিক দুঃখ কষ্ট নেই। সেখানকার ফুলের নাম পারিজাত। একশো আট জন দেব-দেবী সেখানে অবস্থান করেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের রাজসভায় অপরূপা অপ্সরীরা নৃত্যগীত করেন। এই স্বর্গ দখল করার জন্য অসুররা চেষ্টা করেছে, কিন্তু সক্ষম হয়নি।

মতিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু, আপনি বললেন না, স্বর্গে ধর্মালোচনা হয় কি না। সেখানে আপনাদের ভগবান থাকেন কি না।'

'এই ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। পুরাণ বা অন্য বইতে যা পড়েছি তাতে দেখেছি দেবতারা ধর্ম নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। আমার অনুমান তাঁরা সংস্কৃত কথা বলেন, আমি আবার সংস্কৃত জানি না। যদি সেখানে যাই তাহলে ভাষার সমস্যা হবে। তবে নিশ্চয়ই ইনটারপ্রেটার পাব। থাকতে-থাকতে শিখেও নিতে পারব ভাষাটা। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে এই কারণে। ওখানে গেলে দেবতাদের দেখা পাবই। কিন্তু ভগবান তো জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নরক-মর্ত-স্বর্গ নিয়ে জগৎ। তা ছাড়া মহাকাশে অনেক গ্রহ-নক্ষত্র আছে। সবই তাঁকে দেখতে হয়। শুধু স্বর্গে থাকলে তাঁর পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'একই সমস্যা আমাদের গড-এর। তিনিও হেভেন-এ থাকতে পারেন না। যিশু, সেন্টরা, ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানরা তাঁর মহান সান্নিধ্য পেয়ে প্রতি মুহূর্তে আনন্দিত। আপনাদের স্বর্গে দেবতারা বিবাহিত বলে দেবীরা আছেন, কিন্তু অপ্সরা কেন? তাঁরা তো কোর্ট ড্যান্সার।'

মনোরঞ্জন বললেন, 'ওঁরা আছেন য়াতে দেবতারা বিনোদিত হন। তাঁদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই ওঁরা নৃত্যগীত করেন।'

'কিন্তু কোনও কারণে ওঁরা যদি সমস্যা তৈরি করেন?'

'না। এ ব্যাপারে ওঁরা খুব সতর্ক। তবে মন দুর্বল হলে ওঁরা লুকিয়ে-চুরিয়ে পৃথিবীতে যে আসেননি তা নয়। এসে কেউ-কেউ মা হয়েছেন, কিন্তু সন্তানকে জন্ম দিয়েই ফিরে গেছেন স্বর্গে। তবে ধরাও পড়েছেন কেউ-কেউ। তখন শাস্তি হয়েছে। মর্তে থাকতে হয়েছে হাজার বছর। কিন্তু যেহেতু ওঁদের বয়স বাড়ে না, রূপ একই থাকে, তাই মর্তের স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলের বয়সিরা যুবক হয়েই তাঁদের প্রেম নিবেদন করত। অনেক কান্নাকাটির পর তাঁরা শাপমুক্ত হয়েছেন। অবশ্য এসব বহু কাল আগের ঘটনা। ইদানীং পৃথিবীতে সুন্দরী মেয়েদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ওঁরা হালে পানি পাবেন না জেনে আর স্বর্গ ছেড়ে আসেন না।'

মতিন বললেন, 'যাই বলুন, এই অপ্সরাদের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'হেভেনেও ওঁরা নেই। শুধু মাদারই হলেন একমাত্র মহিলা।'

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেহেশ্‌তের মহিলারা কি সবসময় ধর্ম পাঠ করেন?'

মতিন হাসলেন, 'আপনি কোনও খারাপ কাজ করেননি ঠিকই, তবে ভালো কাজ যে করেননি তা বুঝতে পারছি। আপনার প্রতিবেশীর ধর্ম সম্পর্কে তাই উদাসীন। বেহেশ্‌তে নারী বলতে আছেন হুরিরা। তাঁরা সেবিকা। সেবাই তাঁদের কাজ!'

'সর্বনাশ!' মনোরঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা।

'তার মানে?' মতিন তাকালেন।

'ওখানে আনন্দিত হওয়ার কোনও উপাদান নেই বলে মনে হচ্ছে?'

'বন্ধু, আনন্দিত হওয়া বলতে আপনি কী বোঝেন জানি না। আল্লার আশীর্বাদে যে আনন্দ, তা আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সর্বনাশ নয়, সর্বময় বলুন। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে যে সব সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়, তা থেকে মুক্ত হয়ে যাব বেহেশ্‌তে গেলে। তখন আরও নিবিড় করে নিজেকে আল্লার কাছে সমর্পণ করতে পারব। সেটাই তো প্রকৃত আনন্দ।' মতিন চোখ বন্ধ করলেন।

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'ঠিক কথা। আপনাদের ওই অপ্সরাদের নৃতগীত ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। শুনেছি যেখানেই ওসব হয় সেখানেই গোলমাল ঘটে যায়। এইজন্য কোনও-কোনও হাইকোর্ট বারড্যান্সারদের নাচ বাতিল করে দিয়েছেন। অবশ্য এ আপনাদের ব্যাপার।'

মনোরঞ্জন চুপ করে গেলেন। তিনি কোনও খারাপ কাজ করবেন না তাই কোনও খারাপ কথাও বলতে পারেন না।

সেদিন বিকেল পাঁচটা তিন মিনিটে ম্যাকডোনাল্ডের শরীর সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল। মতিন বা মনোরঞ্জন দৃশ্যটি দেখতে পেলেন না, কারণ তখন তাঁরা সংজ্ঞাহীন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁদের শরীরের অবস্থা এক হয়ে গেল। চিকিৎসকরা বললেন, তিনজন মানুষ প্রায় একই সময়ে একই ঘরে মারা গেলেন, এটা কাকতালীয় হলেও এই হাসপাতালের রেকর্ড হয়ে রইল।

তিনজনের আত্মা আগুপিছু পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠে যেতে লাগল। যেতে-যেতে তাঁরা অনেক স্তর দেখতে পেলেন। বিভিন্ন সেই স্তরে অনেক আত্মা কাতর হয়ে রয়েছেন প্রতীক্ষায়। তাঁদের

আবার পৃথিবীতে গিয়ে জন্মাতে হবে। কবে কখন কোনও মায়ের গর্ভে জন্মাবেন তা জানেন না। কিন্তু এই তিন আত্মাকে কেউ থামাল না। সব স্তর অতিক্রম করে যখন তাঁরা স্থির হলেন তখন মতিন বললেন, 'বন্ধুরা, এবার আমাকে যেতে হবে।'

ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি বেহেশ্‌তে যাচ্ছেন?'

'সেখানে যাওয়ার যোগ্যতা আছে কি না সেটা জানা যাবে একটা পরীক্ষার পর। একটা সরু পুলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। যদি আমি অযোগ্য হই তাহলে পুলের নিচে পড়ে যাব, জায়গা হবে দোজখে। আচ্ছা, আদাব।'

মতিনের আত্মা সেই পুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আল্লাকে স্মরণ করে তিনি ধীরে-ধীরে পুল পার হয়ে আসতে-আসতে আজানের মধুর ধ্বনি শুনতে পেলেন।

ম্যাকডোনাল্ডকে হেভেন-এ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। বলা হল, এখন থেকে তুমি শুধু একটি সমর্পিত প্রাণ যার স্ত্রী বা পুরুষ পরিচয় নেই। পৃথিবীর সেন্ট অ্যাগনেশ বা জোয়ান অব আর্ক এখানে রসাস্বাদন করেন ওই সমর্পিত প্রাণ হিসেবেই। ম্যাকডোনাল্ড বিড়-বিড় করলেন, তাহলে আমি যে জানতাম হেভেন-এ মাদার ছাড়া কোনও মহিলা নেই, সেটা ভুল? উত্তরে জানলেন, অনেক মহিলা সেন্ট তাঁদের অর্জিত পুণ্যের জন্য হেভেন-এ এসেছেন। অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টবিশ্বাসিনী হেভেন-এ এসেছেন যোগ্যতা দেখিয়ে। কিন্তু আসার পর কেউ পৃথিবীর পরিচয়ে নারী বা পুরুষ নন, তাঁরা সবাই এক। ম্যাকডোনাল্ডের ধন্দ তবু যাচ্ছিল না। তবে যে পড়েছি হেভেন-এ সাধুরাই থাকেন। সাধ্বীদের কথা কোথাও লেখা হয়নি। উত্তরে বুঝলেন, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার-এর মতো সাধু শব্দটি লিঙ্গমুক্ত পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। ম্যাকডোনাল্ড নত মস্তকে হেভেন-এ প্রবেশ করলেন।

স্বর্গের দরজায় পৌঁছলে মনোরঞ্জনকে চিত্রগুপ্তের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। নাম-ধাম জানার পর চিত্রগুপ্তের সহকারি কম্পিউটারের বোতাম টিপলেন। আগত আত্মা পৃথিবীতে কী-কী ভালো কাজ করেছেন তার তালিকা দিতে পারল না কম্পিউটার। উলটে জানিয়ে দিল, কোনও ভালো কাজ করেনি। এরকম আত্মাকে সোজা নরকে চালান দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কোন নরকে পাঠানো হবে জানতে খারাপ কাজের তালিকা জানতে চাইলেন চিত্রগুপ্ত। আশ্চর্য হয়ে জানালেন, মর্তে থাকার সময় এই আত্মা একটিও খারাপ কাজ করেনি।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে গভীর সমস্যায় পড়লেন তিনি। যে খারাপ কাজ করেনি তাকে তো নরকে পাঠানো যায় না। আবার পুণ্য অর্জন না করে এলে স্বর্গে ঢুকতে দেন কী করে, এই আত্মা যখন সব স্তর পেরিয়ে এসেছে তখন তা আবার জন্মানোর জন্য পৃথিবীতে পাঠানো যায় না।

এইসময় কম্পিউটার ঘোষণা করল, স্বর্গে আপাতত কোনও নবাগতের জায়গা নেই। স্বর্গ তৈরি হওয়ার পর তার আয়তন বাড়েনি। ফলে স্বর্গে এখন প্রচণ্ড স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। চিত্রগুপ্ত স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'তোমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। যখন কোনও প্রাচীন পুণ্যাত্মা মহাকাশে বিলীন হয়ে স্বর্গে নতুন জায়গা তৈরি করে দেবেন তখনই তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে।'

'তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?' হকচকিয়ে গেলেন মনোরঞ্জনের আত্মা।

'স্বর্গের চারপাশে ঘুরে বেড়াও।'

'কিছু মনে করবেন না, এরকম কি প্রায়ই হয়?'

'হয়। তবে খুব কম। আশঙ্কা হচ্ছে, এবার ঘন-ঘন হবে।'

'একটা কথা, আপনি সংস্কৃত না বলে বাংলা বলছেন কেন?'

'হিন্দুরা যতগুলো ভাষায় কথা বলে তার সবগুলোই আমি বলতে পারি। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই

সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা বলা নিষেধ।'

মনোরঞ্জন বিষণ্ণ হলেন। এত দূরে এসেও তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। একবার বেড়াতে গিয়ে শুনেছিলেন যে ঘর তাঁর নামে বুক করা আছে সেখানে আগের অতিথি এখনও আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চেক আউট করবেন। মনোরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশ্য তারজন্য একটুও রাগ করেননি।

আজও করতেন না। দেখলেন আকাশছোঁয়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে স্বর্গ রাজ্য। ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না। স্বর্গাশ্রিত আত্মারা এই প্রাচীরের বাইরে কখনওই আসেন না। হঠাৎ তাঁর কানে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে এল। ভক্তিগীতি। কে গাইছেন? রম্ভা না মেনকা? নিশ্চয়ই মেনকা। অল্প বয়সে বিশ্বামিত্র নামে একটি ফিল্ম দেখেছিলেন তিনি। সেখানে মেনকার গলায় এই গানটি ছিল। গান শেষ হলে নূপুরের আওয়াজ কানে এল। এই প্রাচীরের কাছাকাছি বোধহয় ইন্দ্রের সভা।

মনোরঞ্জন হাঁটছিলেন কিন্তু তাঁর আত্মা ভেসে যাচ্ছিল। স্বর্গের প্রাচীর শেষ হওয়ার পর তিনি আর একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। সেই প্রাচীরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ ভেসে আসছে। অর্থাৎ ওটি নরক। স্বর্গের এত কাছাকাছি নরকের অবস্থান জানা ছিল না মনোরঞ্জনের। ওদিকে না যাওয়াই ভালো ভেবে ফিরে আসছিলেন তিনি, হঠাৎ চোখে পড়ল, নরকের প্রাচীরের নিচটা নড়ছে। কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখতে পেলেন প্রাচীরের নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে এল চারটি কালো আত্মা। বেরিয়েই তারা ছুটে গেল স্বর্গের প্রাচীরের দিকে। একজন বলল, 'এইখানে খোঁড়, গতবার এখানেই সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলাম।'

মনোরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কারা?'

লোকগুলো একটু ঘাবড়ে গেল, 'তুমি কে হে?'

'আমি নবাগত। স্বর্গে যাব। স্থানাভাব বলে অপেক্ষা করছি।'

একজন আর একজনকে বলল, 'নতুন এসেছে, ঠিক চুকলি কাটবে। এখনই তড়পে দে, নইলে বিপদ হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে একজন এগিয়ে এল, 'যা দেখছ, তা কাউকে বললে মুণ্ডু ছিঁড়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। বুঝলে?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কী করছ তোমরা?'

'আজ আমাদের ওখানে এ্যানুয়াল ফাংশন। এখানে সুড়ঙ্গ কাটব। ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সুড়ঙ্গ দিয়ে নরকে ঢুকে সেই ফাংশন মাতাবে অপ্সরারা। বোম্বাই নাচ, ব্যান্ডের গান সব করবে ওরা। শেষে মুক্তবস্ত্র হবে। তারপর রাত শেষ হওয়ার আগেই যেমন এসেছিল তেমন সুড়ঙ্গে-সুড়ঙ্গে ফিরে যাবে স্বর্গে। তখন সুড়ঙ্গ এমন ভাবে বুজিয়ে দেব যে, ভগবান টের পাবে না। হ্যা হ্যা।'

'কিন্তু অপ্সরা আসবেন কেন?'

'ওইসব ভক্তিগীতি গেয়ে কারও মন ভরে? খ্যামটা চাই খ্যামটা। হট ব্যাপার।'

'তা তোমরাও তো ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে স্বর্গে ঢুকে যেতে পার।'

'পাগল। চরিত্র বলে কিছু থাকবে না ওখানে গেলে। ভদ্দরলোকে যায়। ছ্যা।'

তিনটে কালো আত্মা মহানন্দে স্বর্গে ঢোকার সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। মনোরঞ্জনের মনে হল, স্বর্গে বি এস এফ নেই। অবশ্য থাকলেই বা কী? রোজ তো লোকে সীমান্ত পেরোচ্ছে। কিন্তু অপ্সরাদের রুচি এত নেমে গেছে! না। ভুলেও ইন্দ্রসভায় যাবেন না মনোরঞ্জন।



নিশির ডাক

টেলিফোনটা যেন আর্তনাদ করছিল। ওটা আছে হল ঘরে। একদিকে খাওয়ার টেবিল অন্যদিকে সোফা, মাঝখানে একটা খাটো দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ওপর। নিজের ঘর থেকে চেঁচালো সাগ্নিক, 'মাসি, শুনতে পাচ্ছ না?' তারপরেই খেয়াল হল, তাকে দরজা খুলে দিয়েই মাসি জিভ কেটেছিল, 'এই যাঃ!'

'কী হল?'

'তোমার রসগোল্লা আনা হয়নি!'

'ভালো হয়েছে। তোমাকে তো বলেছি মিষ্টি খাব না।'

'না বললে হবে? মা আমার মাথা খেয়ে ফেলবে। আমি চট করে নিয়ে আসছি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও।'

মাসি বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রিসিভারটা তোলার আগেই আর্তনাদ থেমে গেল। মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পরও যখন শব্দ বাজলো না, তখন পা বাড়াল সাগ্নিক আর যেন সেটা লক্ষ করেই আবার রিং শুরু হল। খপ করে রিসিভার তুলে সাগ্নিক বলল, 'হাই।'

'হাই,' একটি মেয়ে শব্দটা বলে হাসল।

বেশ অবাক হল সাগ্নিক। এই ফোন নিশ্চয়ই তার জন্য নয়। কোনও মেয়ের কারণ নেই তাকে ফোন করার।

'কার সঙ্গে কথা বলছি?'

'বাব্বা! তুমি বাংলা এত ভালো বলো? কার সঙ্গে কথা বলছি?' শব্দ করে হাসল মেয়েটি, 'তুমি আমার গলা চিনতে পারছ না, না? মেজাজটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। টেল মি, ক'টা মেয়ে তোমাকে রোজ ফোন করে?'

'একজনও না।'

'লায়ার। আমাকে ট্রিলা বলেছে। তোমার মা অফিস থেকে ফেরার আগে ও রোজ তোমাকে ফোন করে! সত্যি কথা বলতে ভয় পাও কেন? শোনো, তুমি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আইনক্সের সামনে চলে এসো, প্লিজ।'

লাইনটা কেটে গেল ও-প্রান্ত থেকে। কয়েক সেকেন্ড পরে রিসিভার রাখল সাগ্নিক। কে এই মেয়েটা? যাদবপুরের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রীরা ভীষণ মুডি। পড়াশোনার বাইরেও পৃথিবী আছে, এটা ভাবতেই চায় না। প্রত্যেকেই খুব শান্ত এবং কেউ ইংরেজি মিডিয়াম থেকে আসেনি। এই মেয়েটি তার স্বগোত্রের, অর্থাৎ বাংলা মিডিয়ামে পড়েনি। তা ছাড়া সে ট্রিলা নামের কোনও মেয়ের নামও শোনেনি। নামেই মনে হচ্ছে খুব মড মেয়ে। অবশ্য মা একটা কথা প্রায়ই বলে। কথাটা মনে করার চেষ্টা করল সে। কানা ছেলের শখ, নাঃ, কী যেন? রিসিভার তুলে মা-র মোবাইলে ফোন করল সাগ্নিক। মা-র গলা পেতেই জিগ্যেস করল, 'তুমি একটা কথা প্রায়ই বলো না, ওই যে কানা ছেলের নাম কী যেন?'

'পদ্মলোচন।'

'ইয়েস! পদ্মলোচন? লোচন মানে চোখ। তাই তো?'

'হ্যাঁ। রাখছি।'

হাসল সাগ্নিক। এই ট্রিলা মেয়েটাকে হয়তো আদতে হিপোর মতো দেখতে! কিন্তু এই মেয়েটা, যার নাম সে জানে না, তার সঙ্গে দেখা করতে আইনক্সে যাবে কেন? প্রথমত, তার কোনও দরকার নেই। দ্বিতীয়ত, মেয়েটাকে সে চিনতেই পারবে না। খামকা যাওয়া আসাই সার হবে। কিন্তু যত সময় এগোল, তত কৌতূহল বাড়ল ওর। সোওয়া পাঁচটা নাগাদ বারমুড়া আর লাল গেঞ্জি পরে বাড়ি থেকে বেরোল সাগ্নিক। ওদের বাড়ি থেকে সিটি সেন্টার বেশি দূরে নয়। হেঁটে আট মিনিটে চলে এল সে। এসময়ে বেশ ভিড় থাকে, আজও আছে। এপাশ-ওপাশ দেখতে-দেখতে সাগ্নিক আইনক্সের সামনে এসে দেখল, ছোট-ছোট দলে ভাগ হওয়া দর্শকরা গল্প করছে। আগের শো ভেঙে গিয়েছে। একটু পরেই ডাক আসতে সকলে লাইন দিয়ে ঢুকতে লাগল। চারপাশে তাকিয়েও কোনও একা মেয়েকে দেখতে পেল না। অবশ্য এমনও হতে পারে, যে ফোন করেছিল, সে তাকে লক্ষ করছে কোনও দোকানের ভিতর থেকে অথবা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে। তবে তার উচিত সামনে এসে দাঁড়ানো। সাগ্নিক একটু হতাশ হয়েই পা বাড়াল। সামনের সিঁড়িতে তিনটে মেয়ে বসে আছে পরনে প্যান্ট আর গেঞ্জি। যে ফোন করেছিল, সে নিশ্চয়ই ওদের কেউ হবে না। 'হাই কিড!' শব্দ দুটো ছিটকে আসতেই অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকাল সাগ্নিক। তিনটে মুখের ভিতর তখন চিউইংগাম চর্বিত হচ্ছে। তিনজনের নজর দূরের কোনও কিছুর দিকে। কিন্তু শব্দদুটো ওদের একজনই বলেছে। সাগ্নিক দাঁড়াল। একজন ওর দিকে তাকাল। তারপর সঙ্গিনীদের বলল,

'এনি প্রবলেম?'

'নট অ্যাট অল। ইউ আর ফাইন। তাই না?'

'শিওর,' তৃতীয়জন বলল।

'কেন, হোয়াট ডাজ হি ওয়ান্ট?'

তিনজন একসঙ্গে তাকাল সাগ্নিকের দিকে।

প্রথমজন বলল, 'ও মাই, মাই! ইট্‌স হরিবল। আই কান্ট স্ট্যান্ড হেয়ারি লেগস।'

'মে বি ফুটবলার,' দ্বিতীয়জন বলল।

'হেই! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' একজন চেঁচাল।

'নাথিং,' বেশ জোরের সঙ্গে বলল সাগ্নিক।

'না-থি-ং!' মেয়েটা ভ্যাঙচাল, 'ভাঁড়মে যাও।'

'তোমাদের কেউ আমাকে ফোন করেছিল?'

'মাই ফুট! গেট লস্ট।'

এই সময় একজন ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে?'

'হি ইজ টিজিং আস।' তিনজনের একজন বলল।

'তাই নাকি?' সাগ্নিকের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'একা তিনজনকে টিজ করছ? সাহস তো কম নয়। কোথায় থাকো?'

'পাশের ব্লকে,' সাগ্নিক বলল, 'আমি ওদের টিজ করিনি। ওরাই আমাকে যা-তা বলছিল। এখন পালটি খেয়েছে।'

'হয়তো ঠিক বলছ। কিন্তু এখনও মেয়েরা অভিযোগ করলে সেটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তোমরা কি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ রেকর্ড করতে চাও?'

একজন দ্রুত মাথা নাড়ল, 'গিভ হিম অ্যানাদার চান্স।'

'ওকে। তুমি যেতে পারো। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফর্মেশন, তোমরা যেখানে বসে আছ, সেটা

বসার জায়গা নয়।'

তিনজনে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক চোখের আড়াল হতেই যেন জিতে গিয়েছে এমন মুখ করে হাতে হাত বাড়াল।

প্রচণ্ড খেপে গিয়েছিল সাগ্নিক। এখন সে নিঃসন্দেহ, এই তিনজনের কেউ-ই তাকে ফোন করেছিল। একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল সে। মেয়ে তিনটে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'খুব ঝাড় দিয়েছে তো? এরা ডেঞ্জারাস মেয়ে।'

মুখ ফিরিয়ে সাগ্নিক দেখল, তার বয়সি একটা ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'ডেঞ্জারাস কেন?' সে প্রশ্ন করল।

'পাবলিকের সামনে যারা বেইজ্জত করে, তারা ডেঞ্জারাস নয়?'

'তোমাকে করেছে?'

'তিনদিন আগে। রোজ এসময় এখানে আসে। আমি বদলা নেবই!'

'কী করেছিলে তুমি?'

'ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, আলাপ করতে চায়। এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতেই আমাকে ইভটিজার বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! পাবলিক জমে গেল। এই মারে কী সেই মারে! আমি টিজ করিনি বললেও বিশ্বাস করে না। তবে ভিড় হালকা হওয়ার আগেই ওরা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।' ছেলেটার মুখ বলছে ওর কথাগুলো সত্যি।

'কীভাবে বদলা নেবে তুমি?'

'ভাবছি। মাথায় যেগুলো আসছে, সেগুলো ঠিক জোরাল না। হ্যাঁ, আমার নাম শঙ্খ, তোমার?'

'সাগ্নিক।'

'কোনও ভালো আইডিয়া থাকলে বলো তো!'

'সবচেয়ে ভালো সিটি সেন্টারের সিকিউরিটি অফিসারের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা। দুজনে একসঙ্গে যেতে পারি,' সাগ্নিক পরামর্শ দিল।

খোঁজখবর করে চিফ অফ সিকিউরিটির ঘরের সামনে হাজির হল ওরা। ভদ্রলোক পাঁচ মিনিট পরে ডাকলেন। প্রবীণ মানুষটি ওদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এনি প্রবলেম?'

সাগ্নিক শঙ্খর দিকে তাকাল। শঙ্খ বলল, 'তিনটে মেয়ে সিটি সেন্টারে রোজ বিকেলে আসে। ওরা ছেলেদের অপমান করে মজা দেখতে চায়।'

'কীরকম?'

সাগ্নিক বলল, 'উলটোপালটা কমেন্ট করে। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলে তিনজনেই চিৎকার করে বলে ওদের টিজ করা হয়েছে। আপনি বলুন, আমি একা তিনটে মেয়েকে টিজ করতে পারি?'

'নর্মালি পারো না। আগে বলো, তোমরা কোথায় থাক?'

সাগ্নিক বলল, 'পাশের ব্লকে। আমার নাম সাগ্নিক মিত্র।'

'কী পড়ছ?'

'কম্পিউটার সায়েন্স।'

'তুমি?'

'আমি শঙ্খ মুখোপাধ্যায়। থাকি সেবা হাসপাতালের সামনে। স্কটিশে পড়ি। এখানে বেড়াতে ভালো লাগে বলে আসি।'

'কিন্তু এটা শপিং কমপ্লেক্স। বেড়ানোর জায়গা নয়। ওঁরা কোথায় থাকে তা নিশ্চয়ই জানো?'

'না। কি করে জানব?'

'বেশ। চলো, আমাকে দূর থেকে দেখিয়ে দাও।'

এখন সন্ধের মুখ বলেই সিটি সেন্টার জমজমাট। ভিড় বেড়ে গিয়েছে অনেক। প্রচুর সুন্দর-সুন্দর মানুষ দোকানে-দোকানে ঘুরছে। কিন্তু আইনক্সের কাছের সিঁড়িতে এখন অন্য ছেলেমেয়ে বসে আছে। সেই মেয়ে তিনটে নেই।

শঙ্খ বলল, 'ওই ওখানে বসেছিল ওরা। আপনার কাছে যেতে যে সময় লাগল, তার মধ্যেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটাকে তোমরা ভুলে যেতে চেষ্টা করো, ওকে?' এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, 'দেখলে? কোনও মেয়ে যদি ওঁর কাছে কমপ্লেন করত, তাহলে তাদের কি বলতেন ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

সাগ্নিক চারপাশে চোখ ঘুরিয়েও ওদের দেখতে পেল না। সে জিগ্যেস করল, 'ওরা কি রোজ এখানে আসে?'

'কি করে বলব? আমি আজ দ্বিতীয়বার ওদের দেখলাম।'

আস্তে-আস্তে হেঁটে ওরা সিটি সেন্টারের সামনের গেটের কাছে চলে এল।

সাগ্নিক বলল, 'ঠিক আছে। কাল এখানে বিকেল পাঁচটায় আসতে পারবে?'

'পারব।'

'এসো। কালও ওদের খুঁজব।'

'তোমার মোবাইল নম্বর কত?'

'আমার মোবাইল নেই,' কথাটা বলতে একটুও খারাপ লাগল না সাগ্নিকের। কথা বলার মতো লোকের সংখ্যা তার বেশি নয়। মোবাইলের কোনও প্রয়োজনীয়তা সে এখনও টের পাচ্ছে না।

'ল্যান্ড লাইন?' শঙ্খ জিগ্যেস করল। ল্যান্ড লাইনের নম্বর বলল সাগ্নিক। সেটা মোবাইলে স্টোর করে শঙ্খ বলল, 'আচ্ছা চলি। না আসতে পারলে কাল সাড়ে বারোটার মধ্যে তোমার বাড়িতে ফোন করব। বাই।'

শঙ্খ চলে যাওয়ার পরেও মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকল সাগ্নিক। তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ওদের বাড়ি সিটি সেন্টারের পাশের গলি দিয়ে হাঁটলে মিনিট আটেক লাগে। হঠাৎ নিজের নামটা শুনতে পেল সে। কেউ তাকে ডাকছে। একটা মারুতি ৮০০ ব্রেক চেপে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টুটুলকে। স্টিয়ারিংয়ে বসে হাসছে। ওর পাশের সিটে একটা কায়দাবাজ মেয়ে।

'উঠে আয়,' টুকুল ডাকল।

'নাঃ। বাড়ি যাব।'

'আমরা সকলেই বাড়ি যাব। তার আগে একটা কফি হোক।'

'নাঃ। মেজাজ ভালো নেই,' বলেই খেয়াল হল।

এই সল্টলেকে যত সুন্দরী মেয়ে আছে, টুটুল তাদের সকলকে চেনে। ওকে বললে নিশ্চয়ই

হদিস দিতে পারে। তারপরই খেয়াল হল, ওর গাড়িতে উঠলে মা খেপে যাবে। টুটুলকে একদম দেখতে পারে না মা। ওরা সেই ক্লাস ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়ে আসছে, তবু না। মা-র কোনও পরিচিত মহিলা টুটুল সম্পর্কে কিছু বলার পর মা তাকে গম্ভীরমুখে বলেছে, 'অনেক নতুন বন্ধু হচ্ছে। এখন ওর সঙ্গে না মিশলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

'উঠবি?'

অতএব উঠল সাগ্নিক। পিছনের দরজা খুলে বসতেই গাড়ি ছোটাল টুটুল।

সাগ্নিক বলল, 'অ্যাই, আস্তে চালাবি!'

মেয়েটির দিকে একটু ঝুঁকে টুটুল বলল, 'আমার গার্জিয়ান! সেই ছেলেবেলা থেকে জ্ঞান দিয়ে আসছে। ওর নাম সাগ্নিক। সাগ্নিক, তুই একে চিনিস?'

'না,' গম্ভীর গলায় বলল সাগ্নিক।

'ওহো, তুই তো আবার মেয়েদের থেকে হাজার মাইল দূরে!'

সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠল মেয়েটি, 'কেন? তোমার কি মেয়েদের ব্যাপারে অ্যালার্জি আছে?'

'না। সময় নেই।'

টুটুল গাড়ি থামাল কাফেতে। মেয়েটি বেশ লম্বা।

ওরা যখন ভিতরে ঢুকল তখন সাগ্নিকের মনে হল, কমপক্ষে পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি তো হবেই।

কফির অর্ডার দিয়ে টুটুল জিগ্যেস করল, 'মেজাজ খারাপ কেন?'

মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল সাগ্নিক। সেটা লক্ষ করে টুটুল বলল, 'তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ও নয়নতারা। আর এ সাগ্নিক। এবার বল।'

ঘটনাটা বলল সাগ্নিক। শঙ্খর কথাও বলল।

চোখ বন্ধ করল টুটুল, 'তিনটে মেয়ে? বর্ণনা দে।' যতটা কাছাকাছি পারে বলল সাগ্নিক।

নয়নতারা জিগ্যেস করল, 'কী পরেছিল? প্যান্ট না হিপ্‌স্টার?'

'পার্থক্য কী?'

'পেট, আই মিন, নাভি দেখতে পেয়েছিলে?'

'ঠিক বুঝতে পারিনি। বলছিল ওরা।'

'ওপরে টপ বা স্প্যাগেটি।'

'কী করে বলব?'

'আমি যেটা পরে আছি, তাকে নর্মাল টপ বলে।

সরু ফিতের মতো স্ট্র্যাপ লাগানো জামা পরেছিল না আমার মতো।'

চোখ বন্ধ করল সাগ্নিক। মুখ তিনটে মনে আসছে, পোশাক অস্পষ্ট। শরীরের দিকে তো তাকায়নি।

টুটুল বলল, 'অন্তত একটা ক্লু দিবি তো!'

'ইংরেজি ভালো বলে।'

'দূর। ও আজকাল সকলেই বলে। মুশকিল হল তুই বলছিস ওরা তিনজন ছিল। দুজন হলে অন্তত সেরকম তিনটে পেয়ারকে আমি চিনি। ছেলেদের টিজ করে আনন্দ পায়। কাছে ঘেঁষতে দেয় না।'

'রাবিশ!' নয়নতারা বলল।

'সত্যি। ওরা নিজেদের প্রেমিক-প্রেমিকা বলে।'

'তাই?' চিৎকার করল নয়নতারা।

'ইয়েস! টম ক্রুজ এলেও পাত্তা পাবে না,' টুটুল বলল, 'তিনটে লেসবি একসঙ্গে ঘুরবে, সেটা তো ঠিক ভাবতে পারছি না।'

'আমি সিটি সেন্টারে খুব একটা যাই না। ওই ফোন পেয়ে কৌতূহল হল।'

'হ্যাঁ। ফোনের ডায়লগগুলো বল তো।'

কফিতে চুমুক দিয়ে কথাগুলো বলে গেল সাগ্নিক।

'ট্রিলা! ট্রিলা কে? চিনিস?'

'জন্মেও না। ওই নামের কেউ কখনও ফোন করেনি আমাকে।'

'তা হলে ট্রিলার নাম করল কেন?'

'পুরোটাই তো বানানো।'

নয়নতারা বলল, 'এমন হতে পারে, যে ফোন করেছিল সেই ওই তিনজনের কেউ নয়। আলাদা কেউ। সে জানে সাগ্নিকের মা চাকরি করেন। উনি অফিস থেকে ফেরার আগে টেলিফোন করলে সাগ্নিককে পাওয়া যায়।'

'কারেক্ট। তা ছাড়া ওরা লেসবি হলে ফোন করত না। তিনজন বলে লেসবি না হওয়ার চান্স বেশি। কিন্তু ফোনে বলেছে আইনক্সের সামনে অপেক্ষা করবে। সেখানে অন্য কোনও মেয়ে ছিল?'

'না। আর কেউ ছিল না।'

'দাঁড়া,' পকেট থেকে চ্যাপটা ডিজিটাল ডায়রি বের করে টুটুল বলল, 'সব নাম তো মনে থাকে না। কিন্তু এটার মধ্যেও যদি না থাকে, তাহলে জানবি আমার কিছু করার নেই।'

'এখানে কী আছে?' নয়নতার জিগ্যেস করল।

'মেয়েদের নাম।'

'আমার নামও আছে।'

'কী করে থাকবে? আজই তো তোমার সঙ্গে আলাপ হল। কাল থেকে থাকবে। আচ্ছা বলো, এন, এন, হ্যাঁ, নয়নতারা, মোবাইল...?'

নম্বর বলল নয়নতারা।

'গুড। হ্যাঁ। কী যেন নামটা? ট্রিলা। টি, টি। টিয়া তিতির, তিয়াস, তৃষ্ণা, ট্রিলা...মাই গাড! ট্রিলা নামটা স্টোরে আছে রে!' বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল টুটুল।

'তার মানে তোর সঙ্গে আলাপ আছে?'

'ছিল। অথবা কেউ রেফার করেছিল। একদম ভুলে গিয়েছি। হয়তো একবারের বেশি দেখা হয়নি।'

'নম্বর নেই?'

'হ্যাঁ। আছে। মোবাইলে।'

নয়নতারা বলল, 'কিন্তু ওই ট্রিলা যে এই ট্রিলা, তা নাও হতে পারে। একই নামের মেয়ে একজনই থাকবে?'

টুটুল মাথা নাড়ল, 'ঠিক কথা। তবে ট্রিলা নামটা এত রেয়ার যে, সল্টলেকে দু-তিনজনের বেশি ট্রিলা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কীভাবে নামটা এখানে ঢুকল? ধুত, মনেই আসছে না।'

'টেলিফোন কর না,' সাগ্নিক বলল।

টুটুল তাকাল নয়নতারার দিকে, 'তুমি ওকে সাহায্য করবে?'

'কী বলব?'

'ওর সঙ্গে মিট করতে চাও।'

'জিগ্যেস করবে, কেন?'

'আমার নাম করবে। বলবে, আমার ডিজিটাল ডায়রিতে ওর নম্বর আছে। সেখান থেকেই নম্বর নিয়ে তুমি কথা বলছ। সাগ্নিকের ব্যাপারে যদি সে কিছু জানে, তাই দেখা করে জানতে চাও।'

'যদি বলে সে কিছুই জানে না?'

'তা হলে জিগ্যেস করবে সাগ্নিককে চেনে কিনা?'

সাগ্নিক আপত্তি করল, 'আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাবে।'

টুটুল মাথা নাড়ল, 'কিচ্ছু হবে না। আমরা কোনও ক্রাইম করছি না। আজকাল কেউ এই রকম ফোন পেলে গার্জিয়ানদের কাছে জানায় না!'

নয়নতারা হাত বাড়াল, 'মোবাইল!'

টুটুল বলল, 'নিজেরটার বোতাম টেপো। একটু খরচ করো।'

'অদ্ভুত!' ঠোঁট বেঁকাল নয়নতারা। তারপর মোবাইল বের করে বলল, 'নম্বর কত?'

টুটুল কেটে-কেটে সংখ্যাগুলো বলল। কানে সেট চেপে ইশারায় নয়নতারা বলল, 'এনগেজড টোন।'

'ফিসফিসিয়ে বলছ কেন? ল্যান্ডলাইনের নম্বর। ফ্যামিলি প্রপার্টি। রি-ডায়াল করে যাও।'

দ্বিতীয়বারে নয়নতারা চাপা গলায় বলল, 'রিং হচ্ছে!' তারপরেই ঢোঁক গেলার মতো করে বলল, 'হ্যালো! আমি ট্রিলার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

স্পিকারটা অন করে দিয়েছিল নয়নতারা। তাই ওরাও স্পষ্ট শুনতে পেল, 'কে বলছ?'

'আমি নয়নতারা।'

'নয়নতারা! ঠিক চিনতে পারলাম না তো!'

'কী করে চিনবে? তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি!'

'ওয়েল, কী বলতে চাও?'

'দ্যাখ ট্রিলা, আমি মরিয়া হয়ে ফোন করছি।'

'কেন করছ?'

'সাগ্নিকের জন্য,' নয়নতারা সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে হাসল।

সাগ্নিক অবাক। সে হাত নেড়ে কিছু বলতে গেল, ইশারায় শান্ত হতে বলল টুটুল।

'সাগ্নিক?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে ভালোবাসি, প্রচণ্ড ভালোবাসি। ওর জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মুশকিল হল ও আমায় পাত্তা দিতে চায় না,' নয়নতারা বলল।

'আশ্চর্য! এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?'

'তুমিই পার। আমি যতবার সাগ্নিককে অ্যাপ্রোচ করেছি, ও নিষ্ঠুরের মতো বলেছে, সম্ভব নয়। ও একজনকে ভালোবাসে। সেই একজন তুমি।'

'আমি?' ট্রিলার গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ। তুমি যদি ওকে বুঝিয়ে বলো, তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়, তা হলে সাগ্নিককে আমি পেতে পারি। প্লিজ।'

কয়েক সেকেন্ড ট্রিলার গলা শোনা গেল না।

নয়নতারা একবার তার হাতে ধরা মোবাইল সেটটা দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যালো?'

'আমার নম্বর তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'সাগ্নিক দেয়নি। ও তোমাকে সবসময় আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়। ওর এক বন্ধু আছে, টুটুল, তার কাছ থেকে পেয়েছি।'

'টুটুল? মানে...'

'সল্টলেকেই থাকে। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে।'

'আশ্চর্য! আমার নম্বর ওর কাছে ছিল!'

'না থাকলে আমি পেলাম কী করে! তাহলে আমি তোমার সাহায্য পাচ্ছি তো?' নয়নতারা

সাগ্নিকের দিতে তাকাল।

'কীভাবে সাহায্য করব? এই সাগ্নিক কে, তাই তো বুঝতে পারছি না,' ট্রিলা বলল।

'সে কী? তুমি সাগ্নিককে চিনতে পারছ না?'

'না।'

'যে ছেলে তোমার জন্য আমাকে উপেক্ষা করছে, তাকে তুমি চিনতেই পারছ না? এটা সম্ভব?'

'তাই তো দেখছি। আমি ওকে দেখতে চাই।'

'তারপর?'

'তুমি যা চাইছ, তাই হবে। বলব, নিজের রাস্তা দ্যাখো।'

'গুড। তা হলেও চলবে। আমি টুটুলকে বলব কাল বিকেল পাঁচটায় ওকে নিয়ে সিটি সেন্টারে আসতে। তার আগে আমরা দেখা করে নেব।'

'ওখানে নয়। ছ'টার সময় কাফেতে। চেনো?'

'হ্যাঁ চিনি। বাই।'

ফোন অফ করে খিলখিলিয়ে হাসল নয়নতারা,

'বাপ্‌স, কী অ্যাক্টিং করলাম বলো!'

'দশে বারো!' টুটুল হাত তুলল, 'ফাটাফাটি!'

'কিন্তু এই ট্রিলা তো আমাকে চিনতেই পারল না,' সাগ্নিক মাথা নাড়ল।

'কী বলতে চাইছিস?'

'আমাকে যে চেনে না, সে ওই তিনটে মেয়ের হদিশ দেবে কী করে?'

নয়নতারা বলল, 'উঁহু। আমার মনে হচ্ছে চেনে। না চিনলে তোমার নাম শোনামাত্রর বলে দিত চেনে না। অনেকটা সময় নিয়ে ভেবে বলেছে চেনে না। মনে হচ্ছে, মিথ্যে কথা বলেছে।'

'মিথ্যে কথা?'

'বাঃ। আমি যদি পুরোটা মিথ্যে বলতে পারি তাহলে ও এক-আধটা মিথ্যে বলতে পারে না?'

নয়নতারা হাসল, 'আচ্ছা, সত্যি যদি আমার মনে হয় তোমার জন্যে জীবন দিতে পারি, তাহলে কী হবে?'

'ভ্যাট!' চেঁচিয়ে উঠল সাগ্নিক।

'ওকে, ওকে! তাহলে কাল ছ'টায় এখানে', উঠে পড়ল টুটুল। কফির দাম ওই মিটিয়ে দিল। বাড়ির কাছে ওকে নামিয়ে দিয়ে যখন টুটুল গাড়ি ঘোরাচ্ছে তখন নয়নতারা হাত নেড়ে বলল, 'কাল কিন্তু একদম সেজেগুজে ফিট হয়ে আসবে না।'

সন্ধের পর বাড়ি ফিরছি বলে মা কিছুক্ষণ ঘ্যান-ঘ্যান করলে। মা-র ওই এক দোষ। বলা শুরু করলে আর থামতে পারে না। এক-আধদিন দেরি হতেই পারে, রোজ তো হয় না। তা ছাড়া সে এখন স্কুলের ছাত্র নয়, একথা মা মনে রাখতে চান না। আজ বাবাকেও বলতে হল, 'কোথাও থামতে হয় সেটাই তুমি ভুলে যাচ্ছ!'

সটান ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সাগ্নিক। তারপর কম্পিউটারের সামনে বসল। কিছুতেই মন স্থির হচ্ছিল না। আচ্ছা, ট্রিলা বা নয়নতারা যদি শোনে মা দেরি করার জন্যে ম্যারাথন বকুনি শুরু করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। বাইরে থেকে মা-র গলা ভেসে এল, 'এই এক শুরু হয়েছে। কিছু বললেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। অদ্ভুত।'

মিনিটখানেক পরে বাড়ি যখন চুপচাপ, তখন আর একটা ভাবনা মাথায় এল। ট্রিলাদের ব্যাপারটা মা-র কানে গেলে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে? উঃ, পাগল করে দেবে তো! কিন্তু তার দোষ কোথায়? এসব মেয়েদের সে চেনেই না। এরা যদি গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে গল্প বানায়, তো সে কি করতে পারে! কিন্তু আজ মোবাইলে নয়নতারা যখন ট্রিলাকে অনুরোধ করছিল তাকে ছেড়ে দিতে, তখন হাঁ হয়ে গিয়েছিল ও। মনে হচ্ছিল, সত্যি নয়নতারা তাকে ভালোবেসে পেতে চায় আর ট্রিলা ভিলেনের মতো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে! এখন পর্যন্ত কোনও মেয়ে তাকে প্রেমপত্র লেখা দূরের কথা, কাছে আসারও চেষ্টা করেনি। নয়নতারা যা বলেছে তার সবটাই বানানো। ও নিছক অভিনয় করছিল, তা জেনেও এখন কম্পিউটারের সামনে বসে এক ধরনের আরামে আক্রান্ত হল সাগ্নিক।

ঠিক পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরল সাগ্নিক। সকাল থেকে মা নর্মাল। কালকের প্রসঙ্গ যেন একেবারেই ভুলে গিয়েছে। এমনকী, বেরনোর সময় যখন সাগ্নিক বলল, 'একটু ঘুরে আসছি,' তখন মা শুধু বলল, 'বেশি দেরি করিস না।'

শঙ্খ নামের ছেলেটা বলেছিল সাড়ে চারটের সময় ফোন করবে। কিন্তু করেনি। এখন সাগ্নিক চায় না শঙ্খর সঙ্গে জড়িয়ে ওই মেয়েগুলোর মুখোমুখি হতে। ওরা যে সাধারণ মেয়ে নয়, তা গতকালই বুঝে গিয়েছে সে।

সিটি সেন্টারে এসে দূর থেকে আইনক্সের সামনেটা দেখল সাগ্নিক। এখন শো চলছে বলে সামনে তেমন ভিড় নেই। তিনটে মেয়ের একজনকেও সেখানে দেখা গেল না। তা ছাড়া যা ভিড়, সেখানে কাউকে খুঁজে বের করাই মুশকিল। ঘুরতে-ঘুরতে একটা আইসক্রিম পার্লারের কাছাকাছি এসে সে দাঁড়াল। চটপট নিজেকে একটা থামের আড়ালে নিয়ে গেল। কালকের মেয়ে তিনটে। তিনজনই খুব মন দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে। ওদের পরনে কালকের জিন্‌স, কিন্তু টপ পালটেছে। শঙ্খ কি এখানে কোথাও দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে? দুটো ছেলে ওদিক থেকে এসে ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। এবার মেয়েরা ওদের দেখল। তারপর আইসক্রিম খেতে-খেতে পাশাপাশি হাঁটা শুরু করল। ছেলেদুটোও আসছে পিছন-পিছন। সাগ্নিক একটা নাটক দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল কৌতূহলী হয়ে। ছেলেদুটোর একজন কিছু বলতেই তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যে মেয়েটা কাল তাকে শাসিয়েছিল, সে গলা তুলে বলল, 'অ্যাই, ফুটে যা। এখানে এখন পুলিশ ইভটিজার খুঁজছে। পিছনে এলে ধরিয়ে দেব।' ছেলেদুটো সঙ্গে-সঙ্গে উধাও। ওরা পা বাড়াতেই চতুর্থ মেয়েটিকে দেখতে পেল সাগ্নিক। বেশ মিষ্টি দেখতে, লম্বা, প্যান্ট আর টপ পরা। দেখামাত্রই এই তিনজন যেন কিলবিল করে উঠল। তিনজন জড়িয়ে ধরল নবাগতাকে। সাগ্নিকের মনে পড়ল টুটুলের কথা। ওরা ছেলেদের পছন্দ করে না।

তিনজন শুনে টুটুল একটু ধন্দে পড়েছিল। চতুর্থজন আসায় বোঝা গেল ওরা জোড়ায়-জোড়ায় আছে। আর তাহলে টুটুলের কথাই ঠিক। সাগ্নিক বেরিয়ে এল সিটি সেন্টার থেকে। একটু হেঁটে শেয়ারের অটোয় চেপে কাফেতে চলে এল সে। এখন সন্ধে নামব-নামব করছে। বাইরে টুটুলের গাড়ি দাঁড় করানো দেখে বুঝে গেল ওরা এসে গিয়েছে।

টুটুল আর নয়নতারা পাশাপাশি বসে কথা বলছিল। ওকে দেখে টুটুল বলল, 'আয়। নতুন কোনও খবর?'

'এখানে আসার আগে সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। কাল ওরা তিনজন ছিল, আজ চারজনকে দেখলাম। মনে হচ্ছে, তোর কথাই ঠিক,' সাগ্নিক বলল।

'কোন কথা?' টুটুল চোখ ছোট করল।

'ওরা পুরুষবিদ্বেষী!' বাকিটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সাগ্নিক।'

নয়নতারা হাত নাড়ল, 'ছাড়ো তো ওদের কথা। আমি একটু আগে ট্রিলাকে ফোন করেছিলাম। এই চারটে নাগাদ। ও আসছে। টেলিফোনে নাটক শোনানো যায়, কিন্তু সামনাসামনি বসে কী বলা হবে ভেবে নাও।'

টুটুল বলল, 'যা বলেছ, তাই বলবে। লাইন এক।'

সাগ্নিক আপত্তি জানাল, 'না, না। আমার সঙ্গে নয়নতারার কোনও সম্পর্ক নেই। গতকালই আমি ওকে প্রথম দেখেছি। আমার জন্যে ও জীবন দিয়ে দেবে বলার মতো কোনও সিচুয়েশন তৈরি হয়নি। টেলিফোনে নাটক করেছে বলে সামনাসামনি তাই করতে হবে, এর কোনও যুক্তি নেই।'

নয়নতারা অদ্ভুত মিষ্টি হাসল, 'কিন্তু আমার যে বলতে ইচ্ছে করছে।'

সাগ্নিক হাত নাড়ল, 'প্লিজ, ওরকম ইচ্ছে করার কোনও দরকার নেই। তুমি টুটুলের বন্ধু, সেই সুবাদে আমার সঙ্গে আলাপ। যাকে চেনো না, তার জন্য ওসব বলা ঠিক না।'

টুটুল বলল, 'এক সেকেন্ড, তুই যে অর্থে আমার বন্ধু, নয়নতারা সেই অর্থে আমার বন্ধু নয়। পরিচয় হয়েছিল, দু-দিন একটু আড্ডা মারলাম, ব্যস। ওর নাম-নম্বর আমার ডিজিটাল ডায়রিতে রয়েছে। এরপর কবে দেখা হবে, জানি না। দেখা হলে সময় থাকলে গল্প করব। অবশ্য ওর যদি আপত্তি না থাকে।'

অবাক হয়ে সাগ্নিক দেখল নয়নতারা মাথা নাড়ছে।

সে বলল, 'যাক গে!'

'খুব হতাশ হলে মনে হচ্ছে!' নয়নতারার ঠোঁটের কোণ একটু কোঁচকালো।

'হতাশ হওয়ার কথা উঠছে কেন?'

'তাহলে বলতে হবে, তুমি মেয়েদের পছন্দ করো না। ওই ওরা যেমন ছেলেদের পছন্দ করে না।'

নয়নতারা গম্ভীর গলায় একথা বলতেই টুটুল শব্দ করে হেসে উঠল, 'আমাকে একথা কেউ বলতে পারবে না সাগ্নিক।'

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সাগ্নিকের। এই সময় দরজার দিকে তাকাতেই হকচকিয়ে গেল সে। কাফেতে ঢুকে চারপাশে তাকাচ্ছে যে, তাকে একটু আগে সে সিটি সেন্টারে দেখে এসেছে। সেই চতুর্থ মেয়েটি।

টুটুল বলল, 'আরে এই তো ট্রিলা। দু-বছর বাদে দেখছি। আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে।' সে হাত নাড়তেই ট্রিলার চোখ ওদিকে পড়ল।

টুটুল উঠে দাঁড়াল, 'কেমন আছ? চিনতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ। কঙ্কাদের বাড়িতে আলাপ হয়েছিল,' শান্ত গলায় বলল ট্রিলা।

'প্রথম দিন। পরের দিন ভি আই পি বাসস্ট্যান্ডে। অটো স্ট্রাইক ছিল, আমি তোমাকে কোয়ালিটি পর্যন্ত লিফট দিয়েছিলাম। একদম ভুলে গিয়েছিলাম, তোমাকে দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে। বসো। এই হল ট্রিলা আর এ নয়নতারা আর ও আমার বাল্যবন্ধু সাগ্নিক,' টুটুল পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, 'কফি চলবে?'

'এখানে তো চা পাওয়া যায়।'

'যায়,' টুটুল উঠে গিয়ে অর্ডার দিয়ে এল।

নয়নতারা বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা নাড়ল ট্রিলা, 'কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাই! তাহলে সাগ্নিক আমাকে রিফিউজ করছে কেন?'

'এটা ওর ব্যাপার। আমি কি করতে পারি?' ট্রিলা মাথা নাড়ল, 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব বলে এখানে এসেছি,' সাগ্নিকের দিকে তাকাল ট্রিলা। ওর মুখ এখন বেশ শক্ত। চোখ স্থির।

সাগ্নিক তাকাল।

'তুমি আমাকে এসবের মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?'

পরিষ্কার জিগ্যেস করল ট্রিলা।

'সরি। আমি তোমাকে কিছুর মধ্যে জড়াইনি, তোমাকে আমি চিনিই না,' সাগ্নিক বলল।

'তাহলে কি অন্য কোনও ট্রিলার কথা ভেবে বলেছ সাগ্নিক?' নয়নতারা প্রশ্ন করল।

'ফর ইওর ইনফরমেশন, সল্টলেকে ট্রিলা নামে আর কোনও মেয়ে নেই,' টুটুল বলল।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' ট্রিলা মাথা নাড়ল।

'তাহলে কৈফিয়ত দিতে হবে সাগ্নিক।'

টুটুল হাত তুলল, 'আমি বলছি। সাগ্নিক তোমাকে দূর থেকে দেখেছে। ধরো, সিটি সেন্টারেই দেখতে পেয়েছিল। তোমার বান্ধবীরা নাম ধরে ডাকতে ও নামটা জেনে ফেলেছিল। কিন্তু তোমাকে ও বিন্দুমাত্র বিরক্ত করেনি। নিজের মনে ভালোবেসে গিয়েছে। সেটা বুঝতে পারেনি নয়নতারা। পরিচয় হওয়ামাত্র প্রেমে পড়ে গেল ওর। কিন্তু সাগ্নিক ওকে জানিয়ে দিল, সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব নয়। কারণ, ওর মনে ট্রিলা নামের একটি মেয়ে আছে। অন্য মেয়ে হলে সরে যেত, কিন্তু নয়নতারা নাছোড়বান্দা! আমাকে বলল ব্যাপারটা। তোমার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু এই যন্ত্রটা সাহায্য করল। ওকে তোমার নম্বরটা দিয়েছিলাম। ক্লিয়ার!'

অবাক হয়ে শুনছিল সাগ্নিক। চমৎকার গল্পের নায়ক হিসেবে নিজেকে ভাবতে হঠাৎ বেশ ভালো লাগল।

সে বলল, 'দেখলে তো, আমি তোমাকে জড়াইনি। ওরাই টেনেছে। ইট'স নট মাই ফল্ট।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, যাকে চেনো না তাকে এত ভালো লেগে গেল যে, ওর মতো সুন্দরী মেয়েকে রিফিউজ করলে? স্ট্রেঞ্জ!' ট্রিলা বলল।

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই না? হাসল সাগ্নিক।

'তুমি জানো না, আমি অলরেডি এনগেজড।'

'হতেই পারে। তাতে আমার কী এসে গেল! তুমি খুনি হতে পারো, লেসবিয়ান হতে পারো, আমি যা ভেবেছি, তাই ভেবে যাব। ডিসটার্ব করব না।'

'লেসবিয়ান? কী বলতে চাইছ তুমি?' সোজা হয়ে ফোঁস করল ট্রিলা।

'এটা কথার কথা। লেসবিয়ান মেয়েরা ছেলেদের এড়িয়ে যায়। তুমি যদি তাই হও, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না,' সাগ্নিক উদাস।

ট্রিলা উঠে দাঁড়াল, 'আর এখানে থাকা যাচ্ছে না!'

'তোমাকে আমি কিছু বলিনি। শুধু কী-কী সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই জানাচ্ছিলাম। যদি আঘাত দিয়ে থাকি, তা হলে দুঃখিত,' সাগ্নিক উঠে দাঁড়াল।

'দয়া করে আমার কথা কাউকে বলো না,' ট্রিলা ঠোঁট কামড়াল।

'বলতে চাইনি। বিশ্বাস করো। আপনার বান্ধবীরা বাধ্য করল বলতে।'

'তার মানে?' বাঁকা চোখে তাকাল ট্রিলা।

'গতকাল একটি মেয়ে ফোন করে বলল, তুমি রোজ নাকি ফোনে আমার সঙ্গে গল্প করো। সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসাহিত হয়েছে একথা শুনে। আমি গেলাম। তিনজনে মিলে অকারণে আমাকে অপমান করে খুব মজা পেল। আমি জোর পেলাম এই ভেবে, তুমিও আমাকে নিয়ে বানিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করেছ। তুমি পারলে আমি পারব না কেন?' সাগ্নিক হাসল।

'মাই গড। ওরা তোমাকে ফোন করছিল? নম্বর পেল কোথায়?' ট্রিলা সত্যি অবাক।

'আমি জানি না। তোমার বান্ধবী ওরা? জিগ্যেস করে জেনে নিও।'

'আমার বান্ধবী কী করে জানলে?'

'আজ এখানে আসার আগে ওদের সঙ্গে দেখা করে এসেছ সিটি সেন্টারে গিয়ে। ভুল বলছি?'

ট্রিলা তাকাল। তারপর আচমকাই হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল কাফে থেকে।

টুটুল বলল, 'আমার বিশ্বাস, ট্রিলা সত্যি কথা বলছে।'

'কী করে বিশ্বাস করছ?' নয়নতারা জিগ্যেস করল।

'মুখ দেখে। সমবয়সি ছেলেদের নম্বর জোগাড় করে ফোন করে রাগানো, এই মেয়েগুলো মজা বলে ভাবে। সাগ্নিকের নম্বর পেয়ে গিয়েছিল কোনওভাবে, ট্রিলার নাম বলেছে। আবার অন্য কাউকে ফোন করার সময় ওদের একজনের নাম বলবে। তবে ট্রিলা নিশ্চয়ই ওদের একজন। তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে সুস্থ হত মেয়েটা।'

নয়নতারা কপট ধমক দিল, 'অ্যাই চুপ। আমি কত কষ্ট করে ট্রিলার হাত থেকে বের করে আনলাম সাগ্নিককে আর তুমি এখন ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বলছ? মরুক মেয়েটা। চলো।'

কফির দাম মিটিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠল ওরা। সামনের সিটে টুটুলের পাশে নয়নতারা। গাড়ি চললে নয়নতারা জিগ্যেস করল, 'তাহলে কি তোমার সঙ্গে খুব শিগগির দেখা হচ্ছে না?'

'নাঃ। বেশি দেখাদেখি হওয়া বিপজ্জনক।' টুটুল বলল।

পিছন ফিরে হাত বাড়াল নয়নতারা, 'হাতটা মেলাও।'

'কেন?'

'মেলাও না?'

সাগ্নিক হাত বাড়াল। তার হাত আচমকা কাঁপছে!

'এ কী! হাত কাঁপছে কেন?'

'ঠিক আছে।'

'আমি একটা কথা বলি?' নয়নতারা বলল।

'আমি গাড়ি চালাচ্ছি, খেয়াল থাকে যেন?' টুটুল হাসল।

'কী কথা?' সাগ্নিকের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল।

'এখন থেকে আর তুমি নয়, তুই। ঠিক আছে?'

হাত সরিয়ে নিল সাগ্নিক।

'আমার সঙ্গে তোর অন্যরকম সম্পর্ক হতে পারে না, তা তোর চোখ দেখে বুঝে গিয়েছি,' নয়নতারা বলল।

'চোখ দেখে?' সাগ্নিক অবাক।

'যখন ট্রিলার সঙ্গে কথা বলছিলি।'

সাগ্নিককে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে টুটুল বলল, 'চলি! নয়নতারা মুখ বের করে বলল, 'ভালো থাকিস।' গাড়ি চলে গেল।

বাড়ি ফিরতেই মা বলল, 'আজও দেরি করলি? বললাম বলে, আবার রাগ করে দরজা বন্ধ করিস না যেন!'

'সরি মা।'

'ও হ্যাঁ। একটা মেয়ে ফোন করেছিল। বলল, তোকে বলতে সমস্ত ব্যাপারটার জন্য সে দুঃখিত। কী অদ্ভুত নাম মেয়েটার। ইলা না টিলা! কী ব্যাপার রে?'

'বুঝতে পারছি না। আমারও অদ্ভুত লাগছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এল সাগ্নিক। তার মনে হচ্ছিল ওই ফোনটা আবার আসবে! আসবেই!



ভিত মজবুত

এখনও এই পরিবারের সদস্যসংখ্যা আঠারো। কাজের লোকদের ধরলে রোজ বিয়াল্লিশজন দুবেলা ভাত-তরকারি মাছের ঝোল খায়। সপ্তাহে একদিন, রবিবার সকালে, প্রত্যেকের জন্য লুচি বেগুনভাজা এবং তরকারি বরাদ্দ থাকে। অন্যদিন যে যার ঘরে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নেয়। এই ঝামেলা থাকলে অফিসের ভাত ঠিক সময়ে নামবে না, পাড়ার লোক তো বটেই, তিনটি টিভি চ্যানেল এসেছিল অবাক হয়ে। এখনও এই দু-হাজার ছয় সালে এতবড় একান্নবর্তী পরিবার কী করে চলছে? কী করে এত লোকের জায়গা হচ্ছে? খেয়োখেয়ি হচ্ছে না, কাকপক্ষী বসছে, কেমন করে? বড়কর্তা, ভবতোষ, যাঁর বয়েস পঁচাত্তর, চোখ বন্ধ করে হাসেন, দূরদৃষ্টি! আমার পিতামহ ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। খোদ কলকাতার বুকে তখন পনেরো কাঠা জমি কেনা এমন কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি তখনই বাড়ির যে প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে রেখেছিলেন যে আজ পর্যন্ত আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

'কীরকম?'

'প্রথমে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ছয়টি ঘর নিয়ে। কিন্তু প্ল্যান করা হয়েছিল চব্বিশটার। চারতলা। এখন অবধি আমাদের পরিবারের ইউনিট পাঁচটি। আমরা চারতলা বানিয়ে নিয়েছি। ইউনিট পিছু চারটে ঘরের পরে যেগুলো খালি থাকছে তাতে অন্য কাজ হয়েও থাকছে।' ভবতোষ বললেন।

'এই যে এত বড় সংসার, খাওয়াদাওয়া, অন্যান্য খরচ, পাঁচটি ইউনিট ঠিক সমানভাবে টাকা দিচ্ছে?' কৌতূহলী প্রশ্ন।

'প্রত্যেক ইউনিটকে পাঁচ হাজার করে মাসে দিতে হয়।' ভবতোষের উত্তর, 'সারা মাসে কুড়ি হাজার টাকায় চলে যায় এত বড় পরিবারের খরচ?'

'তা কি যায়?' ভবতোষ নির্বিকার, 'পিতামত, পিতা রোজগার করে যা রেখে গেছেন তাতে সুদ আসে। শেয়ার কিনেছিলেন, তা থেকে ডিভিডেন্ড পাওয়া যায়। তাছাড়া এদিক-ওদিক থেকেও কিছু টাকা আয় হয়। সবমিলিয়ে আগামী পঞ্চাশ বছর দিব্যি চলে যাবে আমাদের।'

'পার্সোনাল খরচ?'

'ওই পাঁচ হাজার দেওয়ার পরে যে-যার মতো। পাঁচটা গাড়ি আছে আমাদের। পাঁচ ইউনিটের জন্যে। ই এম আই মাসে ছ-হাজার টাকা। দু-হাজার ইউনিটকে দিতে হয় বাকি চার হাজার ফান্ড থেকে।'

কেউ যদি আলাদা হতে চায়? গল্পে যেমন জায়ে-জায়ে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যায়। তাহলে?

'পাগল! আলাদা হলে পাঁচ গুণ খরচ বেড়ে যাবে। কেউ বোকা নয়।'

এই বাড়িতে এখন বিবাহযোগ্যা কোনও মেয়ে নেই। শেষ মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচ

বছর আগে। সে ছিল মেজকর্তা সন্তোষের মেয়ে। তারপর শুধুই ছেলে। এই নিয়ে পাঁচ বউ-এর বেশ হা-হুতাশ আছে। ভবতোষের নাতনির বয়েস সাত। সে-ই এখন একমাত্র মেয়ে। তাকে নিয়েই সবার সাধ-আহ্লাদ। সেজছেলে প্রিয়তোষের কোনও সন্তান নেই। চতুর্থ মনোতোষ বছর আটেক আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান এখানে থাকেন। ছোটছেলে অনুতোষ তিন সন্তানের পিতা। সবাই বিবাহিত এবং পুত্রসন্তানের জনক। লোকে বলে দেশে যখন মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তখন ওই বাড়িতে শুধু ছেলে জন্মাচ্ছে। ছেলে মানে ক্যাপিটাল আর মেয়ে হওয়া মানে লায়াবিলিটি বাড়া। বিয়ে দিতে হাত খালি। কিন্তু যাদের নিয়ে এত কথা তারা চাইছে মেয়ে আসুক। বাড়িটার শ্রীবৃদ্ধি হবে তাহলে।

মনোতোষের ছেলে বিশ্বতোষ ছাত্র হিসেবে ভালো ছিল। একবারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করেছে। এখনই বড় ফার্মে চাকরি করছে। বয়েস পঁচিশের নিচে। বাবা নেই বলে এই পরিবারের সবাই ওর প্রতি একটু বেশি স্নেহশীল। বিশ্বতোষের মা শ্রাবণী একটু শান্ত প্রকৃতির। এক দুপুরে তার জায়েরা খাওয়ার টেবিলে বসে কথাটা তুলল। এবার বিশ্বতোষের বিয়ে দেওয়া দরকার। বাড়িতে ওই বয়েসের মেয়ে নেই কিন্তু বাইরে থেকে তো আনা যেতে পারে। নতুবা বউ এলে খাঁ-খাঁ ভাবটা দূর হয়ে যাবে।

'শ্রাবণী মাথা নাড়ল, আমি একবার বলেছিলাম, ও রাজি হয়নি।'

'কী বলে?' বড়বউ জিজ্ঞাসা করলেন।

'উন্মাদ না হলে কেউ বিয়ে করে।'

'বাঃ।' মেজবউ ফুট কাটলেন, তাহলে ওর জেঠা-বাবা-কাকা সব উন্মাদ। শ্রাবণী বলল, 'কী বলব আমি?'

বড়বউ বলল, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার বলব আমরা।'

সেই সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে যখন বিশ্বতোষ বিশ্রাম করছে তখন ভবতোষের নাতনি গিয়ে তাকে খবর দিল।

একটু অবাক হল সে। বড়বউ-এর ঘরে গিয়ে দেখল সেখানে তিন কাকিমা এবং জেঠিমার সঙ্গে মা-ও বসে আছে।

বড়বউ বলল, 'এখানে বসো।'

বিশ্বতোষ বসল। বড়বউ জিজ্ঞাসা করল, 'তোর এত বড় আস্পর্দা হয় কী করে?'

'কেন? আমি কী করলাম?' হতভম্ব বিশ্বতোষ।

'কী করলাম?' মেজবউ চোখ পাকাল। 'তুমি আমাদের পাগলের বউ বলেছ!' 'আমি? তোমাদের। কখনও না!'

'ফের মিথ্যে কথা।' বড়বউ বললেন, তুই তোর জ্যাঠা-বাবা-কাকাকে পাগল বলিসনি? একথা শুনলে ওদের মনের অবস্থা কী হবে? ওরা পাগল হলে তো আমরা পাগলের বউ ছাড়া আর কী!'

'তোমরা কী বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না।' বেশ জোরে বলল বিশ্বতোষ।

'ঢুকছে না?' কাকিমা বলল, 'তুমি বলনি, উন্মাদ না হলে কেউ বিয়ে করে? কী, বলনি একথা?'

বিশ্বতোষ মায়ের দিকে তাকাল। শ্রাবণীর মুখ স্থির।

'ওকথা আর একথা এক হল!' বিশ্বতোষ প্রতিবাদ করল,

'আলবত এক।' বড়বউ বলল, 'এত খারাপ কথা তুই বললি কী করে?'

'তোকে এই অন্যায়ের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'বেশ। কী করতে হবে বলো'—বিশ্বতোষ মিনমিন করে বলল।

'তিনমাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে।'

'বিয়ে?' চোখ বড় করল বিশ্বতোষ, 'অসম্ভব। আমাকে এক বছরের জন্যে হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালোর করতে হতে পারে। তা ছাড়া—।'

'তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও, বউ আমাদের কাছে থাকবে।' মেজবউ রায় দিলেন, 'কোনও কথা শুনছি না।'

'কী বলি—।'

'কিছু বলতে হবে না। আমরা মেয়ে দেখছি।' বড়বউ বললেন, 'হ্যাঁ, তোর কোনও বক্তব্য থাকলে বল, কীরকম বউ চাস?'

'আমি জানি না।' বিশ্বতোষ উঠে বেরিয়ে যেতেই বউরা হেসে উঠলেন। শ্রাবণীও।

খোঁজ-খোঁজ। বউ চাই। চার বউ তো বটেই, শ্রাবণীর বাপের বাড়িতেও খবর পৌঁছে দেওয়া হল। কুড়ি-একুশের মধ্যে সুন্দরী, মার্জিত স্বভাবের পাত্রী চাই। সম্বন্ধ আসতে দেরি হল না। এখন রোজ দুপুরে বউরা ভাবী পাত্রীদের ছবি নিয়ে বসেন। কিন্তু একটা না একটা খুঁত চোখে পড়ছেই। কারও চোখ ছোট তো কারও গোরুর মতো বড়। কারও মুখ একটু চৌকোনা। কারও গলা নেই, কাঁধের ওপর মুখ বসানো। এরা সবাই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়দের মেয়ে। তা হোক, তবু জেনেশুনে অন্ধ হতে পারবে না ওরা। মেজবউ-এর বউদির মাসতুতো বোন দিল্লিতে থাকে, তার মেয়ের ছবি এল। বেশ সুন্দরী। মোমের মতো গায়ের রং। কিন্তু—। বউরা পরস্পরের দিকে তাকাল। মেজবউ জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, বলুন!'

'কী বলব। তোমরা সবাই যা বলবে তাই হবে।'

সেজ বলল, 'সালোয়ার-কামিজ পরে আছে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

মেজবউ বলল, 'আমি তো দেখিনি কখনও। বড্ড ভারী বুক। নাঃ, থাক।'

ছোটভাই অনুতোষ পরামর্শ দিল, 'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। তা ছাড়া ম্যারেজ ডটকমে খোঁজ করলে ভালো মেয়ে পাওয়া যেতে পারে।'

ছোটবউ বলল, 'আচ্ছা ছেলে। একটা ভালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারল না!'

দিনটা ছিল কাজের। বিজ্ঞাপনের জবাবে যেসব চিঠি এবং ছবি এসেছে তাই নিয়ে বসেছিল ওরা। হঠাৎ একটা ছবিতে পাঁচজনের চোখ আটকাল। আহা! কী ঢলো-ঢলো মুখ, নাক, ঠোঁট, চুল, সব সুন্দর। ছোটবউ বলল, 'বেঁটে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'ছবিতে কী করে বোঝা যাবে। কোথায় থাকে? কলকাতার মধ্যে?' বড়বউ একটু খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

মেজবউ চিঠির ঠিকানা দেখে অবাক, 'ওমা, এ যে আমাদের পাড়ার মেয়ে। বায়োডাটা পাঠিয়েছে, কোনও চিঠি লেখেনি।'

'সে কী?' বড়বউ অবাক, 'দেখি, দেখি।'

সত্যি তাই। মেয়ের নাম অঞ্জনা। ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে এখন এম.বি.এ পড়ছে। বাবা দিল্লিতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আছেন। মা, দিদিমা এবং বোনকে নিয়ে সে কলকাতায় থাকে। বাবার বদলির চাকরি। টেলিফোন নাম্বার, ঠিকানা দেওয়া আছে কাগজে।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অঞ্জনার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। কিন্তু ভদ্রমহিলা চিঠি না লিখে এরকম বায়োডাটা কেন পাঠিয়ে দিলেন তা ওরা বুঝতে পারছিল না।

সঙ্গে-সঙ্গে ছোটবউ ফোনের বোতাম টিপল। রিং হচ্ছে।

'নমস্কার। আমি অঞ্জনার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি।'

'ও। আমি, মানে, আমরা কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম।'

'কীসের বিজ্ঞাপন?'

'পাত্রী চাই কলমে বিজ্ঞাপন, যার জন্যে আপনি অঞ্জনার ছবি আর বায়োডাটা পাঠিয়েছেন।' ছোটবউ বিরক্ত হল। বড়বউ ইশারা করল, যেন শান্ত হয়ে কথা বলে। অঞ্জনার মা বললেন, 'দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কাউকে ওসব পাঠাইনি।'

'পাঠাননি? তাহলে এটা কী? আপনার স্বামী দিল্লিতে থাকেন না?'

'হ্যাঁ' ভদ্রমহিলা অবাক।

'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় আপনি মা আর দুই মেয়েকে নিয়ে থাকেন?'

'এসব তো সবার জানা। কিন্তু আমি আপনাকে কোনও কিছুই পাঠাইনি।'

ছোটবউ অন্যদের দিকে তাকাল. 'অদ্ভুত ব্যাপার, অঞ্জনার মা বলছেন উনি কিছুই পাঠাননি। তাহলে এটা এল কী করে?'

বড়বউ বললেন, 'ব্যাপারটা খুলে বল।'

ছোটবউ মাথা নাড়ল, 'শুনুন, আমাদের বাড়ির ছেলের জন্যে পাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ছেলে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অল্প বয়েস, ভালো চাকরি করে। তার জবাবে যেসব চিঠি এসেছে তার মধ্যে আপনার মেয়ে অঞ্জনার ছবি এবং বায়োডাটা আছে। ওর ছবি দেখে পছন্দ হওয়াতে আমি এই ফোনটা করেছি। আমি ছেলের মেজজেঠিমা।'

'এতক্ষণে বুঝলাম। বিশ্বাস করুন আমি কিছুই জানি না। আপনারা কোথায় থাকেন?'

'আপনার বাড়ি থেকে বড়জোর দশ-বারো মিনিট দূরে।' ছোটবউ গর্বের হাসি হাসল, 'আমাদের বাড়ির কথা সবাই জানে।'

'কেন? মানে—।'

'একমাত্র একান্নবর্তী বাড়ি। এই সময়ে এরকম বাড়ি আর খুঁজে পাবেন না।'

'ওমা। তাই বলুন। আপনি বিশ্বতোষের জেঠিমা।'

যেন জিভ কামড়াল ছোটবউ, 'সে কী! আ-আ-আপনি বিশু, বিশ্বতোষকে চেনেন?'

'কেন চিনব না? মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসে, গল্প করে যায়। আপনারা ওর তিন জেঠিমা আর এক কাকিমা, সবাই মায়ের মতো। খুব বলে।'

'অ।'

'কিন্তু কে পাঠাল ওসব। কিছু মনে করবেন না ভাই। আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি!' টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

ছোটবউ-এর মুখের অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করল। কী হয়েছে?'

ছোটবউ বলল, 'কী কাণ্ড! আমরা কিছুই জানি না।'

'কী হয়েছে বলবি তো?' বড়বউ ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'বিশু ওদের বাড়িতে প্রায়ই যায়।'

'সে কী!' চারটি গলা থেকেই একটি শব্দ ছিটকে উঠল।

'শুধু যায় না, বসে গল্প করে, আমাদের কথাও বলেছে।'

বড়বউ বলল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যে ছেলে সাতসকালে অফিসে গিয়ে সন্ধের পরে

বাড়ি ফেরে, তার ওসব জায়গায় যাওয়ার সময় কোথায়?'

মেজবউ বলল, 'তার মধ্যে সময় বের করে নেয়। ওরকম সুন্দরী মেয়ে। তুমি তো ওকে পেটে ধরেছিলে, তুমি জানো না কিছু?'

শ্রাবণী মাথা নাড়ল, 'না। বিন্দুবিসর্গ না।'

ছোট বলল, 'তাহলে বোঝো! বিয়ে উন্মাদে করে! উঁ! তলে-তলে কত জল। ওই ছবি, বায়োডাটা ওই মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।'

'ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনুমানে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।' বড়বউ মাথা নাড়ল, 'হয়তো একদিন গিয়েছিল, তাই রোজ বলে চালাচ্ছে ওরা।'

মেজবউ শ্রাবণীকে বলল, 'এখনই ফোন কর ওকে।'

সেজবউ বলল, 'না-না। ও এখন অফিসে। বাড়ি ফিরুক, তারপর।

কিন্তু তার আগেই ফোন এল।

ফোনটা ধরল ছোটবউ, 'হ্যালো।'

ওপাশে একটু চুপচাপ। ছোটবউ গলা তুলল, 'কে ফোন করছেন?'

'আমি।' মিষ্টি কিন্তু গলায় কাঁপুনি।

'কে?'

'আমার নাম অঞ্জনা।'

'ওমা!' ফোনের মুখ চাপা দিল ছোটবউ, 'ওই মেয়েটাই ফোন করছে।'

চার বউ বিচলিত। বড়বউ বলল, 'আমাকে দাও তো।'

মেজবউ-এর ইচ্ছে ছিল না, তবু রিসিভার এগিয়ে দিল।

বড়বউ বলল, 'হ্যাঁ, বলো, কাকে চাই!'

'না, মানে, ঠিক কাউকে,—কী যে বলি।'

'যা বলতে চাও তা গুছিয়ে বলো।'

'মা আমাকে খুব বকছেন। মা কিছুই জানেন না।'

'তাহলে তুমিই পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি দেখছি খুব বেহায়া মেয়ে—!'

'না না। আমি বাধ্য হয়েছি, বিশ্বাস করুন—।'

'বাধ্য হয়েছ মানে?'

'আপনারা, আপনারা ওর বিয়ের সম্বন্ধ করছেন অথচ ও আমার কথা আপনাদের বলতে পারছে না। তাই ভাবলাম যদি ছবি পাঠালে কাজ হয়—।'

'ওর সঙ্গে কতদিনের সম্পর্ক?'

'ঠিক সম্পর্ক নয়—।'

'তবে?'

'আমার খুব ভালো লাগে। আমি আর কারও কথা ভাবতে পারি না।'

'ও জানে?'

'জানত না, শোনার পর আমি বলে ফেলেছি।'

'শুনে কী বলল?'

'বলল, সর্বনাশ। আপনাদের বাড়িতে সম্বন্ধ না করে বিয়ে হয় না। আমি কী করব ভেবে না পেয়ে চিঠি আর বায়োডাটা পাঠালাম।' অঞ্জনা বলল।

'তুমি এখন কি বাড়িতে আছ?'

'হ্যাঁ।'

'দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের বাড়িতে চলে এসো।'

'মানে?'

'ভয় পেয়ো না। তোমাকে আমরা বকব না। যা পরে আছ তাই পরেই আসবে। সাজগোজ করার কোনও দরকার নেই।' ফোন রেখে দিলেন বড়বউ। অঞ্জনার কথাগুলো জা-দের জানিয়ে বললেন, 'সামনাসামনি দেখাই ভালো।'

শ্রাবণী বলল, 'ওর সঙ্গে বিশুর—!'

'বিশুর দিকে দিয়ে কিছু হয়নি, যা হওয়ার ওর দিক থেকে হয়েছে।'

ছোটবউ বলল, 'তাহলে তো বলতে হবে এই মেয়েটা হ্যাংলামি করেছে। মা-বাবা জানল না, নিজের বিয়ের জন্যে নিজেই উদ্যোগ নিয়েছে।'

আলোচনায় যেসব মতামত পাওয়া যাচ্ছিল তা অঞ্জনার পক্ষে যাচ্ছিল না। এই সময় কাজের মেয়ে এসে বলল, 'একজন মেয়ে দেখা করতে এসেছে।'

'এখানে নিয়ে আয়।' কাজের মেয়ে চলে গেল।

মেজবউ বলল, 'দিদি, তুমি যেন বেশি উদার হয়ো না।'

'না-না।' মাথা নাড়ল বড়বউ।

যে এল তার দিকে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল পাঁচ বউ। পরনে জিনসের ওপর কাজ করা টপ, চুল কাঁধের নিচে নেমেই থেমেছে। বেঁটে নয় এবং মুখ খুব সুন্দর। বড়বউ বললেন, 'বসো।' মেয়ে বসল।

মেজবউ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বাড়িতে প্যান্ট পরে ছিলে।'

'হ্যাঁ।' মাথা নড়ল সামান্য।

'সে কী! বাঙালি বাড়ির মেয়ে—।'

'কী করব! আমি তো সালোয়ার-কামিজ পরতাম। ও বলল, ওসব এখন ব্যাকডেটেড। তা ছাড়া আপনারা নাকি প্যান্ট খুব পছন্দ করেন। আমাকে তাই সবসময়ে প্যান্ট পরা অভ্যেস করতে হবে।'

'অ্যাঁ!' পাঁচ বউয়ের চোখ বড় হল।

'সত্যি বলছ?' বড়বউ ধমকালেন।

'ওমা, মিথ্যে বলব কেন?'

মেজবউ বললেন, 'তুমি যা করছ তাকে হ্যাংলামি বলে, জানো?'

'আমি করতে চাইনি, ও আমাকে করতে বলেছে।'

মেজবউ বলল, 'মিথ্যে কথা। তুমি তো বলেছ, ওর দিক থেকে কিছু নেই, যা আছে, তা তোমার দিক থেকে। তাহলে ও বলবে কেন?'

'আমায় বলল, আমি এসবের মধ্যে নেই। যদি ওঁরা পছন্দ করেন তবে তুমি আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারবে। অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দ্যাখো।' অঞ্জনা বলল।

কাকিমা বলল, 'আর শোনামাত্র তুমি পাঠিয়ে দিলে! কেন? তোমার সম্মান নেই।'

হাত তুললেন বড়বউ, 'শোনো, আমাদের পরিবার একান্নবর্তী। সবাই একসঙ্গে চলি। বিশু আমাদের ছেলে। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে বলব সে খুব অন্যায় করেছে। তোমাকে উৎসাহ দিচ্ছে অথচ আমাদের কিছু বলেনি।'

'আপনারা রেগে যাবেন, তাই।'

'থাক, আর ওর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। হ্যাঁ, ও আমাদের ছেলে, কিন্তু সবাই মিলে তো ওকে পেটে ধরতে পারি না, ধরেছে একজন। এখন বলো তো, আমাদের মধ্যে কে ওর

গর্ভধারিণী?' বড়বউ জিজ্ঞাসা করলেন।

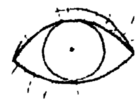
'আমার মনে হয়,' মুখ নামাল অঞ্জনা, 'আমাকে যিনি একটাও প্রশ্ন করেননি তিনি বোধহয়।'

বড়বউ হেসে ফেলল, 'শ্রাবণী, ওকে একটু মিষ্টি দাও, প্রথম এল।'

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অঞ্জনা, প্লিজ, আমাকে মিষ্টি খেতে বলবেন না। আমি ওর কথায় মিষ্টি ছেড়ে দিয়েছি। আমি যাই?'

অঞ্জনা যেন চলে যেতে পেরে বেঁচে গেল। পাঁচ বউ হাঁ হয়ে তাকিয়েছিল। তারপরেই পাঁচটি কণ্ঠ থেকে হাসির ফোয়ারা ছিটকে উঠল।

দোতলার ঘরে দিবানিদ্রা থেকে উঠে এসে ভবতোষ সেই হাসি শুনতে পেয়ে খুশি হলেন। পাঁচ বউ একসঙ্গে হাসলে এই পরিবারের ভিত মজবুত হবে।



জীবন যখন উদাস

অস্বস্তি শুরু হয়েছিল দিন পাঁচেক আগে। তখন কলকাতা শহর রাত জাগছে। বিশ্বকাপের খেলা শুরু হয় মাঝরাতে, শেষ হবে আড়াইটে। বাসুদেব রাত জাগতে পারে না। ফলে এগারোটার মধ্যেই টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়ে সে। সি আই টি রোডের দোতলায় দু-ঘরের ফ্ল্যাটের কোথাও এক ফোঁটা ধুলো নেই, সবকিছুর মধ্যে যত্নের ছাপ স্পষ্ট। সকালে মতির মা এসে যাবতীয় কাজ এবং রান্না সেরে যায়। তাই খেয়ে বাসন ধুয়ে অফিসে যায় বাসুদেব। সন্ধেবেলায় বাজার করে নিয়ে এসে ফ্রিজে ঢোকায়। রাত সাড়ে ন'টায় ফ্রিজ থেকে সকালের রান্না বের করে ঢুকিয়ে দেয় মাইক্রোতে। দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ। তারপর কিছুক্ষণ টিভির সামনে বসা। তাতেই ঘুম এসে যায়। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে মোটামুটি এই রুটিনের পরিবর্তন হয় না।

সাতদিন আগে প্রবল চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসল বাসুদেব। লোকগুলো পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। বাসুদেব জানলায় এল। রাস্তার উলটোদিকে টিভি বসিয়ে এতক্ষণ খেলা দেখছিল যারা তারা প্রিয় দলের সাফল্যে নৃত্য করছে। খুব বিরক্ত হল বাসুদেব। কোথায় জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে আর কলকাতার পাগলগুলো তাই দেখে নৃত্য করছে। ব্রাজিল দেশটা কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলে নব্বুইভাগ লোক ঠিকঠাক বলতে পারবে কিনা সন্দেহ।

ঘুম চলে গিয়েছিল। টিভি খুলে খুব বিরক্তিকর কোনও প্রোগ্রাম দেখলে যদি ঘুম আসে এই আশায় রিমোট টিপে চ্যানেল ঘোরাতে লাগল। খেলা ছিল তাই ওরা টিভি দেখছিল নইলে এই রাত্রে এত প্রোগ্রাম হচ্ছে, কারা দ্যাখে। হঠাৎ একটা হিন্দি সিরিয়ালে আটকে গেল সে। নির্জন পাহাড়ে একজন সাধক সাধনা করছেন। তাঁর সাধনা ভঙ্গ করতে ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রবলভাবে শুরু হল। সাধক তবু অবিচল। হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল। তখন আকাশবাণী হল, 'হে সাধক, তোমার নিষ্ঠা দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমার অভিষ্ট বরদানে অক্ষম।'

সাধক হাতজোড় করল। আমার অপরাধ কী পরমাবতার?

'নিজেকে যাচাই কর। এই জীবনে তুমি যদি একটি ক্ষুদ্র অন্যায়ও করে থাক তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত তুমি সাধনায় সিদ্ধি পাবে না।' আকাশবাণী হওয়া মাত্র সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেল।

বাসুদেব টিভি বন্ধ করে বিছানায় এল। হঠাৎ তার মনে হল এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে সে নিজে কী-কী অন্যায় করেছে? আজ পর্যন্ত জ্ঞানত সে কোনও অন্যায় করেনি। একটিও মিথ্যে কথা বলেনি। এই মিথ্যা না বলার জন্য অনেকবার বিপদে পড়তে হয়েছে তাকে। ক্লাসের বন্ধুরা তো বটেই, মাস্টাররাও তাকে যুধিষ্ঠির বলে ডাকত। সেভেনে ওঠার পর সে বন্ধুসঙ্গ ত্যাগ করেছিল। সেই বয়স থেকে ওরা অশ্লীল কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, সিগারেট খাওয়া ধরেছিল। মাধ্যমিক পাশ করেই বাবা তাকে কলকাতায় কলেজে ভরতি করেন। হোস্টেলে থাকতে হত। কিন্তু সেখানে সে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি। প্রথম দিনেই সে বুঝে নিয়েছিল অবসর সময়ে ওদের একমাত্র কাজ মেয়েদের নিয়ে আলোচনা।

পরবর্তীকালে চাকরি জীবনেও সে কারও বন্ধু হতে পারল না। তার সহকর্মীরাও তাকে এড়িয়ে যায়। সে ঘুষ নেয় না। সন্ধের পরে বারে গিয়ে ওদের সঙ্গে মদ খায় না। বিবাহিত সহকর্মীরা ট্যুরে যাচ্ছি বলে বাইরের মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে দীঘায় যায়। এগুলো মেনে নিতে পারে না বাসুদেব। হোস্টেলের জীবন থেকে একা থাকতে অভ্যস্ত হওয়ায় আজকের একাকিত্ব তার কাছে আদৌ বড় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই জীবনে সে কি কোনও অন্যায় করেনি? অনেক চেষ্টা করেও মনে পড়ল না তার। তাই বাকি রাত জেগেই কাটিয়ে দিল বাসুদেব।

তারপর আর রাত নয়, দিনের বেলায় কাজ না থাকলে ওই ভাবনাটা তাকে ছোবল মারে। পরিচিত মুখগুলোকে সে মনে করতে চেষ্টা করে। বাবাকে সে একটি বারের জন্যেও অশ্রদ্ধা করেনি। বেশি বয়সে তাঁর সঙ্গে সহমত না হলেও তাঁকে অবজ্ঞা করেনি। মা মারা গিয়েছেন বছর দশেক হল, বাবার মৃত্যুর দু-বছর পরে। মায়ের জীবদ্দশায় প্রত্যেক সপ্তাহে সে সিউড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

এই অবধি ভাবতেই একটা অস্বস্তি মনে এল। মায়ের শেষ ইচ্ছেটা সে পূর্ণ করতে পারেনি। এটা কি অন্যায়? মা নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিলেন কিন্তু—। তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ। ওই বয়সে তো বটেই দীর্ঘকাল ধরে নিজের মনকে তৈরি করে ফেলেছিল বাসুদেব। তাই মাকে অনেক বুঝিয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত মা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এখন একটু-একটু করে বাসুদেবের মনে হচ্ছিল সে অন্যায় করেছে। সন্তান হয়ে মাকে কষ্ট দেওয়া অবশ্যই অন্যায় কাজ। তখন সরাসরি মাকে না বলে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বললেও কি লাভ হত? মা সান্ত্বনা পেত হয়তো কিন্তু এই ঘুরিয়ে মিথ্যে বলার জন্যে যুধিষ্ঠিরও তো নিষ্কৃতি পাননি।

সিউড়িতে তাদের তিনটি বাড়ির পরে থাকতেন কমলামাসিরা। ওঁর স্বামী সিউড়ি কোর্টের উকিল ছিলেন। কমলামাসি আর মা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রোজ বিকেলে দুজনে একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যেতেন বই আনতে। যেহেতু বাসুদেব কারও সঙ্গে মিশত না, তাই কমলামাসিদের বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল না। কিন্তু কমলামাসির মেয়ে অদিতি তাদের বাড়িতে আসত। মায়ের সঙ্গে গল্প করত। অদিতি রীতিমতো সুন্দরী। তাকে নিয়েও বাসুদেবের সহপাঠীরা রসালাপ করত যেটা খুব খারাপ লাগত বাসুদেবের। বন্ধুদের সে যেমন এড়িয়ে যেত তেমনি অদিতির মুখোমুখি হতে চাইত না। অদিতিরও যে তার সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বাসুদেব যখন বি. এ. পাশ করে কলকাতায় পড়তে আসবে তখন মা কথাটা বললেন। কমলামাসি আর তাঁর বাসনা বাসুদেব চাকরি পেলে অদিতির সঙ্গে বিয়ে দেবেন। লজ্জা পেয়েছিল বাসুদেব। প্রতিবাদ করেনি কারণ মায়ের ইচ্ছে তার কাছে আদেশ। যেদিন তার কলকাতায় পড়তে যাওয়ার কথা সেদিন অদিতি চলে এল তার ঘরে। তখন মা গিয়েছেন কমলামাসির সঙ্গে লাইব্রেরিতে। ঘরে ঢুকে অদিতি বেশ রাগত গলায় বলল, 'শোনো, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।'

হকচকিয়ে গিয়েছিল বাসুদেব, 'মানে'?

'তোমাকে আমার মা পছন্দ করেছে বলে উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'আমি তো উল্লসিত হইনি।'

'ও। তাহলে ভালো কথা। যা বললাম তা মনে থাকবে?'

'কিন্তু-।'

'কোনও কিন্তু নয়। আমি আর একজনকে পছন্দ করেছি।'

'ও।'

'মা তাকে জানে। তার কুষ্ঠি বিচার করিয়ে জেনেছে সে নাকি বিয়ের দশ বছরের মধ্যে মারা যাবে। যত্ত বাজে কথা। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে নাকচ করে আমাকে এ-বাড়ির বউ করে পাঠাতে চাইছে।'

'আমায় কী করতে হবে।'

'এড়িয়ে যাবে। বিয়ের কথা উঠলেই সময় নেবে। দু-বছর কাটাতে পারলেই ও চাকরি পেয়ে যাবে। মা রাজি না হলে আমরা সই করে বিয়ে করব। যদি মাতৃভক্ত রামচন্দ্র হও তাহলে আমার মরামুখ দেখবে। কানে ঢুকছে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়েছিল বাসুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে হাতের পার্স খুলে পাঁচটা দশ টাকার নোট অদিতি টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এই নাও।'

'একী! টাকা দিচ্ছ কেন?'

'শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না। টাকা নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে নরকেও জায়গা হবে না। টাকা দিলে তবে চুক্তির দাম হয়। চলি।'

কথাগুলো গিলে ফেলতে অসুবিধে হয়নি কিন্তু টাকাগুলো নিয়ে খুব বিব্রত হয়েছিল বাসুদেব। ফিরিয়ে দিতে গেলে যে অদিতি নেবে না তাতে তার সন্দেহ ছিল না। একটা খামে টাকাগুলোকে ভরে রেখে দিয়েছিল আলমারিতে।

যখন পাশ-টাশ করে চাকরি পেয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তিনি খুশি হয়ে কমলামাসিকে বিয়ের প্রস্তাব নতুন করে দিলেন। তারপর ঝড় শুরু হল। শেষপর্যন্ত কমলামাসি এসে মায়ের কাছে খুব কাঁদলেন। মেয়ে নাকি ইতিমধ্যে তার পছন্দের ছেলের সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসে আছে গোপনে। মা চুপ করে থাকলেন।

বাসুদেবের যখন ঊনত্রিশ বছর বয়স তখন থেকে মা তার বিয়ের উদ্যোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু প্রতিবারই বাসুদেব তাঁকে নিরস্ত্র করেছে। বলেছে সে সংসারি হতে চায় না। মা-বাবা যতদিন পৃথিবীতে আছেন ততদিন সে তাঁদের সঙ্গে থাকতে চায়, তারপর যা হওয়ার তা হবে। বাবা কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে খুব বিনীত হয়ে বলেছিল, 'তোমরা ছাড়া অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারি না। যে কারণে আমার সঙ্গে কারও বন্ধুত্ব হয়নি।' অচেনা একজন মহিলাকে বিয়ে করলে দূরত্ব থেকেই যাবে। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর পছন্দের কেউ যদি থাকে তো বল।'

বাসুদেব হেসেছিল, 'আমার কী পছন্দ তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না মা।'

আমৃত্যু মা মাঝে-মাঝে এই নিয়ে আফশোস করে গেছেন।

কিন্তু এটা যদি অন্যায় হয়, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করা সম্ভব?

মা নেই। মায়ের সঙ্গে যদি সে অন্যায় করে থাকে তাহলে সেটা সংশোধনের কোনও রাস্তা নেই। তা ছাড়া, তিনি যদি থাকতেনও তাহলে সে কীভাবে সংশোধন করত? পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসে লোক হাসিয়ে? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল! আলমারি খুলে লকারের এক

কোণ থেকে খামটা বের করল। প্রায় তিরিশ বছর আগে খামটাকে যেভাবে রেখেছিল তা অবিকল রয়েছে। খামের ভেতর পাঁচটা দশ টাকার নোট। এই নোটগুলো আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। মাকে জানায়নি সে এই টাকাগুলোর কথা। অদিতি দাম দিতে চেয়েছিল। দাম না ঘুষ? আজ মনে হল এটাও তার জীবনের একটা বড় অন্যায়। এর প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে নোটগুলো যে দিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে দিয়ে।

তিরিশ বছর বড় কম সময় নয়। বিয়ের পরে অদিতি এখন কোথায় তা বাসুদেবের জানা নেই। প্রায় পঞ্চাশে পৌঁছে যাওয়া অদিতি নিশ্চয়ই অন্য পাঁচজন প্রৌঢ়াদের মতো সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এখন তাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? বাসুদেব ঠিক করল অদিতির ঠিকানা জোগাড় করে খামের ওপর ডাকটিকিট সেঁটে টাকাগুলো পাঠিয়ে দেবে। কে পাঠাল তা অন্য কেউ না বুঝলেও অদিতি নিশ্চয়ই একটু ভাবলে ঠিক বুঝতে পারবে।

সিউড়িতে এখন ছোটকাকা কাকিমা থাকেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা চাকরি এবং বিয়ের সূত্রে বাইরে। বহু বছর পরে বাসুদেব সিউড়িতে পৌঁছে গেল। তাকে পেয়ে কাকা-কাকিমা বিহুল। ছেলেদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ করলেন। কাকিমা বললেন, 'তুই বিয়ে করিসনি বলে তোর মাকে শেষ সময় নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলি। বউমারা তো ছেলেদের এখানে আসতেই দেয় না।' বিকেলে বাড়ি থেকে বেড়াতে বের হল বাসুদেব। তাদের পাড়াটা প্রায় একইরকমের রয়েছে। স্কুল ছাড়ার সময়টা যেন এখানে স্থির হয়ে আছে। হাঁটতে-হাঁটতে কমলামাসির বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল সে। আবছা মনে পড়ছে, অদিতির একটা ভাই ছিল। সেই নিশ্চয়ই এখন সংসারের কর্তা।

বারান্দার ওপাশে মূল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পাশের খিড়কি দরজায় শব্দ করল সে। দ্বিতীয়বারে গলা কানে এল 'কে? কে এসেছে?'

গলাটা, এতবছর বাদেও কমলামাসির বলে মনে হল। সে জবাব দিল, 'আমি।'

কয়েক সেকেন্ড পরে দরজা খুলল একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

বাসুদেব হাসল, 'কমলামাসি।'

'আপনি।'

'আমার নাম বাসুদেব। তুমি কে?'

'আমি ওঁর নাতনি।'

'কে রে পয়া?' ওপাশ থেকে কমলামাসির গলা ভেসে এল।

পয়া দ্রুত ভেতরে চলে গেল। ইতস্তত করছিল বাসুদেব কিন্তু তার মধ্যেই কমলামাসি নেমে এসেছেন। খুব রোগা হয়ে গেছে শরীর, চুল প্রায় সাদা। বাসুদেব এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই বৃদ্ধা কেঁদে উঠলেন সশব্দে।

মিনিট পাঁচেক বাদে যখন কমলামাসি শান্ত হলেন তখন আক্ষেপ শুরু হল। বাসুদেবের মা চলে গেছেন অথচ তিনি পড়ে আছেন, ইত্যাদি। বাসুদেব এইসময় জানল অদিতি বিধবা হওয়ার পরে মায়ের কাছে চলে এসেছে চার বছরের মেয়েকে নিয়ে। সেই মেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে দিন কাটছে। ওপাশের দুটো ঘর থেকে মাসে মাত্র দু-হাজার টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। এ ছাড়া অদিতি চারটে ছাত্রীকে পড়িয়ে মাসে দু-হাজার পায়। এই চার হাজার টাকার তিনহাজার সংসার চালাতে হচ্ছে। নাতনির জন্যে একটা প্রাইভেট টিচার রাখার ক্ষমতা তাদের নেই। তারপর কমলামাসি কান্না মেশানো গলায় অনুশোচনা শুরু করলেন, 'তোর মায়ের ইচ্ছে ছিল, আমিও কত আশা করেছিলাম, কিন্তু মেয়ে নিজের পায়ে জেনেশুনে কুড়ুল মারলে আর কে আটকাবে! হ্যাঁ-রে, তোর বউকে এনেছিস?'

মাথা নাড়ল বাসুদেব, 'না।'

'আনলি না কেন? দেখতাম।'

'থাকলে তো আনব।'

'সেকি? তুই বিয়ে করিসনি? কেন?'

হাসল বাসুদেব। তারপরে দূরে দাঁড়ানো পয়াকে ডাকল, 'তোমার নাকটা বেশ সুন্দর। পয়া নামের কোনও মেয়েকে আমি আগে দেখিনি।'

কমলামাসি বললেন, 'ওর ভালো নাম পয়মন্তী। আমিই রেখেছিলাম। কিন্তু ওর কপাল দ্যাখ!' শ্বাস ফেলল কমলামাসি।'

'তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

পয়মন্তী তাকাল, তারপর চোখ সরাল।

বাসুদেব বলল, 'কমলামাসি, ওর পড়াশুনার জন্যে যা লাগবে তার জন্যে আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনি ভালো টিচার দেখুন।'

'কিন্তু—।'

'কোনও কিন্তু নয়। আপনার বান্ধবীর যা টাকা ছিল তা ব্যাংকে পড়ে আছে। আমি স্পর্শ করিনি। মায়ের আত্মা খুব খুশি হবে যদি সেই টাকায় ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। আপনার নাতনি তো মায়েরও নাতনি।'

বাসুদেবের হাত ধরলেন কমলামাসি, 'দীর্ঘজীবী হও বাবা। উঃ, বুক থেকে পাথর নামল।'

বাসুদেব পয়মন্তীর দিকে তাকাল, 'কি, খুশি তো?'

পয়মন্তী মাথা নাড়ল।

বাসুদেব বুঝে নিয়েছিল অদিতি বাড়িতে নেই। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা কোথায়?'

'টিউশনিতে গিয়েছে।' পয়মন্তী জবাব দিল।

'তুই তোদের বাড়িতে উঠেছিস?' কমলামাসি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।'

'ওর মা এলে বলব দেখা করে আসতে।'

ফেরার আগে আর একবার কমলামাসির সঙ্গে দেখা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাসুদেব যখন ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়াল তখন পয়মন্তী তাকে এগিয়ে দিতে এল। মেয়েটা দেখতে সুন্দর, লম্বা। হঠাৎ বাসুদেবের মনে হল, আঠারো বছরের অদিতি প্রায় এইরকমই দেখতে ছিল।

'তুমি কলেজে কী নিয়ে পড়বে?' খিড়কি দরজায় পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল সে।

'আমি, আমি কলেজে পড়ব না।'

'কেন? আর তো কোনও অসুবিধে নেই।'

'আমার পড়তে ভালো লাগে না।' পয়মন্তী নিচের দিকে তাকাল।

'কেন?'

'ইচ্ছে করে না।'

'তাহলে কী করবে?'

হঠাৎ মুখ তুলল সে, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব?'

'বলো।'

'দিদাকে রাজি করাবেন? ওরা এস সি বলে দিদা-মা রাজি হচ্ছে না।'

'ওরা কারা?' থেমে গেল বাসুদেব।

জবাব দিল না পয়মন্তী। মুখ তুলল না।

'কারও সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হয়েছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মেয়েটি।

'সে কী করে?'

'এল আই সি-তে চাকরিতে ঢুকেছে।'

'যদি তোমার দিদা-মা রাজি না হন?'

'আঠারো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তদ্দিনে পরীক্ষাও হয়ে যাবে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল বাসুদেব। অবিকল অদিতির কথা।

'তোমার মাকে তো দেখছ। দেখেও বুঝতে পারছ না?'

'মা ভুল করেছিল। বাবার কুষ্ঠিতে আয়ু নেই জেনেও বিয়ে করেছিল। ওর কুষ্ঠিতে আছে আশি বছর পর্যন্ত বাঁচবে।' বলে পয়মন্তী ফিরে গেল ভেতরে।

ঠিক তখনই অদিতিকে দেখতে পেল সে। জীবনে আর একটা ধাক্কার জন্যে কি তৈরি হচ্ছে এই বিগতযৌবনা মহিলা?

'তুমি?' অদিতি হাসল।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে, খুব জরুরি।'

'কী কথা?' অদিতি উদাস চোখে তাকাল।

কী কথা বলবে বাসুদেব? এত বছর পরে যে কথা বললে ভুল সংশোধন করা যায় সেকথা বলার কি সময় আছে? ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কেনা টিকিট ফিরিয়ে দিলে তো পুরো দাম ফেরত পাওয়া যায় না। তবু যেটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়েই তো সন্তুষ্ট থাকে মানুষ।



খেয়ালি

জংশন স্টেশন থেকে দুপুর সাড়ে বারোটার ট্রেন ধরলে ঠিক পৌনে চারটের সময় গমনপুরে পৌঁছে যাওয়া যায়। অগ্রিম জানতে পারলে ভদ্রলোক স্টেশনে লোক রাখবেন। গমনপুর থেকে খেয়ালি গ্রাম গাড়িতে পনেরো মিনিটের পথ। ওই চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিয়েছিলাম কবে যাচ্ছি। মুশকিল করল মেল ট্রেনটা। সারাটা পথ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে যখন জংশন স্টেশনে ঢুকল তখন দুটো বেজে গেছে। গমনপুরের ট্রেন তার অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে।

কথা বলে জানা গেল ওই লাইনে দিনে দুবার ট্রেন যায়, আসে। দ্বিতীয় ট্রেনটি ছাড়বে পৌনে ছ'টায়, গমনপুরে পৌঁছবে ন'টায়। তা না হলে আজকের রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে, সেক্ষেত্রে কাল সাড়ে বারোটার আগে ট্রেন নেই। স্থির করলাম সন্ধের ট্রেনই ধরব। রাত ন'টায় পৌঁছে পনেরো মিনিটের বাসপথ নিশ্চয়ই ম্যানেজ করা যাবে। ধরে নেওয়া যাচ্ছে অরুণেশ্বরবাবুর লোক অত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।

ট্রেনের চেহারা এবং গতি ছ্যাকরা গাড়িকেও হার মানায়। যাত্রীরাও কোনও বিশেষ পরিচয়ের নয়। টুকরো-টুকরো কথাবার্তায় জানা গেল দিন দুয়েক খুব বৃষ্টি হওয়ায় এদিকের অনেক রাস্তা এখন প্লাবিত। জানা গেল, গমনপুরে কোনও হোটেল নেই।

ট্রেন ঠিকঠাক সময়ে স্টেশনে পৌঁছলে আবিষ্কার করলাম আমাকে নিয়ে মাত্র দুজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পা দিল। টিমটিমে আলোর বাইরের পৃথিবীটায় ঘন অন্ধকার। একজন কর্মচারী গম্ভীর মুখে লুঙির ওপর ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে দেখছেন যেন ট্রেনটি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে বললাম, 'নমস্কার'।

ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা উঁচু করে তাকালেন যে তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মনে হল।

'আমি খেয়ালি গ্রামে যেতে চাই। কোথায় বাস পাওয়া যাবে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখানে কোনও হোটেল নেই, ধর্মশালা নেই, স্টেশনের ওয়েটিং রুমের অবস্থা খুব খারাপ। তাই হাঁটতে শুরু করুন। দু-ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।' ভদ্রলোক তাঁর অফিস ঘরের দিকে লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন।

স্টেশনের বাইরে এলাম। দুটো দোকান দেখতে পাচ্ছি তারার আলোয়, যাদের ঝাঁপ বন্ধ। লোকজন নেই। পাশেই রেল কোয়ার্টার্স। সেখানে রেডিওতে হিন্দি গান বাজছে। ওই ভদ্রলোক সম্ভবত ওখানেই থাকেন। এই সময় একটা সাইকেল দ্রুত চলে এসে ব্রেক কষল, 'ট্রেন চলে গেল?'

আমার উদ্দেশ্যে নয়, তবু উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'যাঃ শালা! আজও সটকে গেল। রাস্তার যা অবস্থা কিছুতেই জোরে আসতে পারলাম না।'

'আপনি এখানে থাকেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'এখানে মানে, আরামপুরে। চার মাইল দূরে। আপনি?'

'ওই ট্রেন থেকে নেমেছি। যেতে চাই খেয়ালি গ্রামে।' বিনীত ভঙ্গিতে বললাম।

'ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। এত রাত্রে হাঁটতে পারবেন?'

'রাস্তাটা যদি বলে দেন—!'

'উঠুন, পেছনে বসুন। এক মাইল এগিয়ে দেব, তারপর আমি বাঁদিকে আপনি ডান দিকে। খেয়ালিতে কার বাড়িতে যাবেন?'

ততক্ষণে স্যুটকেশ নিয়েই ক্যারিয়ারে উঠে বসেছি। বললাম, 'অরুণেশ্বরবাবু, অরুণেশ্বর বিশ্বাস।'

'ও। ভদ্রলোকের জলজ্যান্ত ছেলেটা হুট করে মরে গেল। তা খবর দেননি কেন? দিলে নিশ্চয়ই লোক পাঠাতেন স্টেশনে!' প্যাডেল ঘোরাতে-ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল লোকটা। জবাব দিলাম না। দিলে অনেক কিছু বলতে হত। আমি অন্ধকার দেখছিলাম। শহরে বসে এই অন্ধকার কল্পনা করা যাবে না। লক্ষ করলাম একটু-একটু করে মেঘ ছড়াচ্ছে আকাশে, ফলে তারার আলো নিভতে শুরু করেছে। খারাপ রাস্তায় চাকা পড়ায় শরীর লাফাচ্ছে। লোকটা একসময় থামল, 'এবার আপনি ডান দিকের রাস্তা ধরে চলে যান। খেয়ালির আগে কোনও গ্রাম নেই।'

আমি নেমে দাঁড়াতেই সে নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। চারপাশে একটা পাক দিয়ে দেখলাম কোথাও আলো নেই। যেটাকে রাস্তা বলে গেল লোকটা সেটা মাটির। যা কাদা হয়ে আছে এবং পাঁচ হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না, এর চেয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা অনেক বেশি স্বস্তির ছিল।

হাঁটা শুরু করলাম। প্রায়ই কাদায় জুতো ডুবে যাচ্ছে। প্রথম দিকে জুতোর জন্যে যে মায়া হচ্ছিল পরে তা থাকল না। যা হচ্ছে হোক, পৌঁছতে যখন হবে তখন এসব ভেবে লাভ নেই। কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ আওয়াজটা কানে এল। দু-পাশের মাঠ অন্ধকারে ঢাকা। ডান দিকের মাঠে একটি ব্যাং প্রবল আর্তনাদ করছে। ব্যাঙের ডাক শুনেছি, আর্তনাদ এই প্রথম। সম্ভবত সাপের-পেটে যাচ্ছে ওটা। তখনই খেয়াল হল এই অন্ধকারে পায়ের সামনে সাপ পড়লেও তো বুঝতে পারব না। দ্রুত হাঁটলে ছোবল মারার সুযোগ পাবে না সাপ। সেই চেষ্টা করলাম। তারপরেই চলে এলাম বড়-বড় গাছের মাঝখানে। ওগুলো কী গাছ এখন চেনা সম্ভব নয়। তবে বেশ ঝাঁকড়া। গাছের নিচে আসতেই কান্না কানে এল। যেহেতু ওটা ওপর থেকে ভেসে আসছে তাই পাখির কান্না বলেই বোধ হল। পাখিও যে মানুষের গলার কাছাকাছি গলায় কাঁদতে পারে তা আগে জানতাম না। শরীরে কাঁটা ফুটল।

আমি ভূতপ্রেত নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অনুভব করিনি। ভূত এবং ভগবান, দুটোই দুর্বলচিত্ত মানুষের কল্পনায় তৈরি। কিন্তু পরিবেশ কখনও-কখনও এদের অস্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। এই অন্ধকারে ওই গোঙানি, পাতার খসখস শব্দ, পায়ের তলার কাদা মাটি একত্রিত হয়ে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা ভূতের গল্পগুলোকে মনে আনতে সাহায্য করল। আমি দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কানের পরদা থেকে গোঙানির আওয়াজটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। বুঝলাম আমি একটি গ্রামে ঢুকেছি। এই গ্রামের নাম খেয়ালি হলেও হতে পারে। কিন্তু বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। আলো জ্বলছে না। এখন রাত বারোটার কাছাকাছি। গ্রামের মানুষ এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন! বিস্তর ডাকাডাকির পর সাড়া মিলল। দুজন বেরিয়ে এলেন। একজনের হাতে হ্যারিকেন; দ্বিতীয়জনের লাঠি। আমার অবস্থা দেখে বোধহয় ওঁরা বুঝতে পারলেন আমি দুর্বৃত্ত নই। হ্যাঁ, গ্রামের নাম খেয়ালি। আর অরুণেশ্বরবাবু থাকেন দক্ষিণপাড়ায়। সামনের মোড় থেকে ডান দিকে হাঁটলেই দক্ষিণপাড়া। সবচেয়ে বড় বাড়িটাই তাঁর। ওঁর পিতামহ জমিদার ছিলেন। সেইসঙ্গে ওঁরা আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। ফাঁপরে পড়লাম। বানিয়ে বললাম, 'আমি ওঁর সঙ্গে ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।' ওঁরা আমাকে বিদায় দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। লক্ষ করেছিলাম, কথা বলার সময় দুজনই চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারপাশে দেখছেন। সেই দৃষ্টি স্বাভাবিক ছিল না।

দক্ষিণপাড়ায় ঢুকেও একই দৃশ্য। কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। বই-এর পাতায় ভূতুড়ে গ্রামের যে বর্ণনা থাকে হুবহু তাই। শেষপর্যন্ত অন্ধকারেও বিশাল বাড়িটাকে ঠাওর করলাম। কোথাও কোনও আলো নেই। ছাদের দিকে তাকাতেই একটা সাদা বস্তুকে নড়তে দেখলাম। তার মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না। শুধু ছাদের এক পাশ থেকে সেটা অন্য পাশে চলে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আমি দ্রুত বাড়ির গেটে আওয়াজ করতে লাগলাম, 'বাড়িতে কেউ আছেন? দরজা খুলুন।'

বেশ কয়েকবার চিৎকার করার পর হঠাৎই দোতলা থেকে একটা টর্চের তীব্র আলো আমার ওপর এসে পড়ল। আমি চোখের ওপর হাতের আড়াল রেখে দেখার চেষ্টা করতেই গলার স্বর শুনতে পেলাম 'কে? কে ওখানে? কী চাই?'

'আমি শহর থেকে আসছি। অরুণেশ্বরবাবু আমাকে আসতে লিখেছিলেন!' চেঁচিয়ে বললাম।

'নাম বলুন!'

বললাম। তারপরেই হুকুম হল, 'কার্তিক, দরজা খুলে ওঁকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

মিনিট দুয়েক বাদে দরজা খুলল। একটা হ্যারিকেন এগিয়ে এসে গেটের তালা খুলে সরে দাঁড়াতে আমি ভেতরে ঢুকলাম। আবার তালা লাগিয়ে লোকটা হাত বাড়াল, 'ওটা দিন।'

এতটা পথ যখন বইতে পেরেছি তখন এটুকু পারব। বললাম, 'থাক।'

'না। কর্তার হুকুম। ওর ভেতরে অস্ত্র থাকতে পারে।' তর্ক না বাড়িয়ে লোকটা আমার স্যুটকেশ হস্তগত করল। কেউ এই বাড়িতে লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা আছে নাকি?

ভেতরে ঢোকার পর হ্যারিকেনের আলোয় বাঁধানো উঠোন চোখে পড়ল। দু-পাশে বারান্দা। যে ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর পরনে ফতুয়া এবং ধুতি। বয়স ষাট পেরিয়েছে। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার চিঠিটা কি সঙ্গে আছে?'

ছিল, দিলাম। সেটার ওপর চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোকের গলার স্বর বদলে গেল, 'ও হো! আমার লোক গিয়েছিল স্টেশনে। দুপুরের ট্রেনে আসার কথা, না দেখে ফিরে এসেছে। আপনি এই অন্ধকারে কাদাভরা রাস্তায় কী করে এলেন?'

অল্প কথায় ঘটনাগুলো জানালাম। স্টেশনে বসে রাত না কাটিয়ে হেঁটেই আসতে পারব ভেবে এগিয়েছিলাম। রাস্তার অবস্থা জানলে পা বাড়াতাম না।

'আপনার খুব ভাগ্য ভালো তাই সশরীরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাক, এখন পোশাক পালটে

থিতু হয়ে বসুন। রাতের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে কাজের কথা হবে। কার্তিক, বাবুকে স্নানঘর দেখিয়ে দে।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। ওঁর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র বাড়িটা কী ভয়ঙ্কর চুপচাপ হয়ে গেল!

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর আমার জন্যে খাবার নিয়ে এল কার্তিক। মাছভাজা গোটা তিনেক, রুটি, ডাল বেগুনভাজা আর সামান্য ক্ষীর। কার্তিক বিনীত ভঙ্গিতে বলল, হেঁশেল তুলে দিয়েছিল, সবার খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, এইটুকু কোনওরকমে—আপনার খুব অসুবিধে হবে।'

'আমাকে তো সারারাত মাঠেঘাটে বসে থাকতে হত। এ তো অমৃত পাওয়া!'

'আপনি খুব ভাগ্যবান বাবু।'

'কেন?'

'এত রাত্রে কুলকুলির মাঠ ভেঙে সশরীরে এলেন—!'

'কেন? ওখানে কী হয়?'

'আত্মারা থাকেন।'

'ও। না, তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।' খাওয়া শুরু করলাম, 'আচ্ছা কার্তিক, তোমাদের গ্রামের মানুষরা এত তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে কেন বলো তো? মনে হচ্ছে, বাইরের কাউকে ভয় করছে সবাই?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি এসব বড়বাবুর মুখে শুনবেন!' কার্তিক নড়ে উঠল, 'আপনি খাওয়া হয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। থালাবাসন কাল সকালে নিয়ে যাবে। হ্যারিকেনটা অসুবিধে হলে জ্বেলে রাখবেন। আচ্ছা!' কার্তিক চলে গেল।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। অতটা কাদাজলে হাঁটাহাঁটি করে শরীর বোধহয় আরাম চাইছিল। দেখলাম, বেশ রোদ উঠেছে। বাথরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। কথাগুলো যদি সকালেই হয়ে যায় তাহলে দুপুরের ট্রেন ধরে ফিরে যাব।

ঘোমটা দেওয়া এক কাজের মহিলা চা নিয়ে এল ট্রেতে। শুধু চা নয়, সঙ্গে ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা আর ক্ষীর। বুঝলাম এ-বাড়িতে দুধের কোনও অভাব নেই। কিন্তু সকালে প্রথম কাপ চায়ের সঙ্গে এত ভাজাভুজি খাওয়া অভ্যেস আমার নেই। তাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্তত করছিল। বললাম, 'এখন আমি ওসব খাই না।'

'বউদিমণি রাগ করবেন।'

বউদিমণি কে আমি জানি না। বললাম, 'তাঁকে বুঝিয়ে বলো।'

অনিচ্ছা নিয়ে সে চায়ের কাপ নামিয়ে ট্রে তুলে চলে গেল।

চা শেষ হতেই কার্তিক দরজায় এল, 'বড়বাবু বাগানে অপেক্ষা করছেন।'

বাগানটি ফুলের নয়। নানান ধরনের সবজি চারপাশে। তার মধ্যে দুটো বড় বেঞ্চি যার একটায় বসে ছিলেন অরুণেশ্বরবাবু। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুম হল?'

'হ্যাঁ। খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই—'

'বসুন। হ্যাঁ, প্রথমে আপনার পরিচয় একটু বিশদে শুনি।'

'আমি যা লিখেছি তার বেশি তো কিছু বলার নেই।' বললাম।

'আপনার বয়স উনচল্লিশ। এতদিন বিয়ে করেননি কেন?'

উদ্যোগ নেওয়ার কেউ ছিল না, নিজেরও ইচ্ছে হয়নি।'

'বাড়িতে কে আছেন?'

'বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। একজন কাজের লোক, অবশ্য তাঁকে কাজের লোক বলা চলে না। আমার

বাল্যকাল থেকেই তিনি আছেন। বাবা-মা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতে চাননি। ওখানেই মারা গিয়েছেন বয়স হওয়ায়। কাশীদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি চাকরি করার পর।'

'আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর করার তাহলে ওই কাশীদা ছাড়া কেউ নেই?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'আপনি একটি বড় ওষুধের কোম্পানির ওই জেলার প্রতিনিধি। চিঠিতে যে মাইনের কথা লিখেছেন তা খুবই ভালো। একা লোক, কী করেন অত টাকা দিয়ে?'

'বছরে একবার ভারতবর্ষ দেখতে যাই। বড় হোটেলে উঠি। বেশ খরচ হয়ে যায়।'

'এবার বলুন, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন উনি আপনার মেয়ের মতো, ব্যাপারটা কী?'

'আর?'

'কত বয়স? কী করেন? ছবিতে বয়স বোঝা যায়নি। মনে হয়েছে খুব কমবয়সি। সেক্ষেত্রে আমার আপত্তি আছে। কিন্তু আপনি লিখেছেন যে আপনার বয়স এখন ছিয়াত্তর। ছবির মেয়েটি আপনার মেয়ে হওয়া একটু অস্বাভাবিক। তাই—।'

'ঠিকই। ওটা আমার মায়ের বছর সাতেক আগে তোলা ছবি। এখন ওর বয়স তিরিশ।'

'ও।'

'এই সাত বছরে সে কিছুতেই ক্যামেরার সামনে যেতে চায়নি বলেই ওটা পাঠাতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য বয়স বাড়া ছাড়া চেহারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি।' বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন।

আমি চুপ করে ওঁকে দেখছিলাম। বার্ধক্যেও উনি সুপুরুষ।

বললেন, 'বছর সাতেক আগে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সন্তান। মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েটিকে পুত্রবধূ হিসেবে নিয়ে এসেছিলাম এ-বাড়িতে। সেদিন ওদের কালরাত্রি। আলাদা থাকতে হয়। ছেলে গেল বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রে যাত্রা শুনতে। ওই স্টেশনের ধারে। মাঝরাতে ফেরার সময় ওই জঙ্গলের পথে সে খুন হয়ে গেল।' বৃদ্ধ চুপ করলেন, করে থাকলেন কিছুক্ষণ।

'সে কী? কেন?'

'ভুল করেছিল। যে পার্টি খুন করে তারা অন্য কাউকে খুন করতে চেয়েছিল, অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। ওরা পরে খুব অনুতপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমার ছেলে চলে গেল। এই হত্যার বদলা নিতে মারামারি চলল কিছুদিন। তারপর রাজনৈতিক খুনোখুনি বলে পুলিশ হাত গুটিয়ে নিল। আমার পুত্রবধূর ফুলশয্যা হল না। তার মামা এসেছিলেন খবর পেয়ে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই অবস্থায় মেয়েটির কী হবে? আমি বলেছিলাম, বউমা যদি আপত্তি না করেন তাহলে আমি তাঁকে আমার মেয়ে ভেবে মাথায় করে রাখব। আমার তো কোনও মেয়ে নেই। স্ত্রী চলে গেছেন, ছেলেও গেল, তিনি থাকলে আমি বাঁচতে পারব। সেই থেকে তিনি এখানে আছেন। কিন্তু আমার বয়স হচ্ছে। আমার পরে তাঁর কী হবে? এই ভাবনা থেকেই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।'

'কিন্তু বিজ্ঞাপনে বা তার পরে চিঠিতে এসব প্রকাশ করেননি!'

'কারণ আমার পুত্রবধূকে আমি বিবাহিতা বলে মনে করি না। বিয়ের লগ্ন ছিল মধ্যরাতের পরে, সেসব চুকতে ভোর হয়ে আসে। দিনের বেলায় ফিরে আসে এ-বাড়িতে। সেই রাত কালরাত্তির। সব অর্থেই। সে শেষ হয়ে যায়। মেয়েটা নিজেকে বিবাহিতা ভাবার অবকাশই পায়নি।' বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন, 'অবশ্য আপনি আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।'

আমি সত্যি কৌতূহলী হয়েছিলাম। পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে মনে করে ইনি আবার বিয়ে দিতে চাইছেন, এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

বললাম, 'এই ছবি সাত বছর আগের। এখন—!'

'নিশ্চয়ই।' বৃদ্ধ গলা তুললেন, 'কার্তিক!'

কার্তিক হাজির হলে বললেন, 'মাকে একবার এখানে আসতে বলবে?'

মাথা নেড়ে সে চলে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা প্রশ্ন। কাল রাত্রে এই গ্রামে ঢোকার পর লক্ষ করেছি সবাই যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরুচ্ছেন। কোথাও কোনও আলো জ্বলছিল না। ব্যাপারটা কী?'

অরুণেশ্বরবাবু মাথা নাড়লেন, 'মানুষ ভয় পেয়েছে।'

'কীসের ভয়? ডাকাতের?'

'না। রাজনৈতিক দলগুলো জঙ্গিভাব দেখানোর পর এ অঞ্চলে কেউ ডাকাতির কথা ভাবতে পারে না। বছর পাঁচেক আগে একরাত্রে আটজন ডাকাতকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল পার্টির ছেলেরা। তারপর থেকে ওই ভয় দূর হয়েছে।' অরুণেশ্বরবাবু বললেন।

'তাহলে?'

'গত ছয় মাসে এই গ্রামে তিনটি বাইরের মানুষ মারা গিয়েছে। গুলি বা ছুরিতে মৃত্যু হয়নি, শরীরের কোথাও সামান্য ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে রাত্রে। পুলিশ তদন্ত করে রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে গুজব ছড়িয়েছে, গ্রামের রাস্তায় দুষ্ট আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে সন্ধের পরেই দরজা-জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে সবাই। আজ সকালে কয়েকজন খোঁজ করতে এসেছিলেন, কাল রাত্রে সত্যি কোনও অতিথি এ-বাড়িতে এসেছে কি না এবং যদি আসে তাহলে বেঁচে আছে কি? দেখুন, এসব আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি গোয়েন্দা নই।' অরুণেশ্বরবাবুর কথার মাঝখানেই তাকে দেখতে পেলাম। বাগানের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। বিন্দুমাত্র সাজগোজ ছাড়াই সে চোখ টানছে। না, ছবির সঙ্গে তার খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে একটু শীর্ণ আর বেশি ফরসা মনে হচ্ছে। এত ফরসা যে রক্তে হেমোগ্লোবিন নিশ্চয়ই বেশ কমে গেছে।

'ডেকেছেন?' তার গলাটি বেশ মিষ্টি।

'ও হ্যাঁ। বসো মা।' বেঞ্চির একটা পাশ দেখিয়ে দিলেন অরুণেশ্বরবাবু। সে বসলে বৃদ্ধ বললেন, 'ইনি আমাদের অতিথি। শহর থেকে এসেছেন।'

সে হাতজোড় করল, 'নমস্কার।'

আমি নমস্কার জানালাম।

'গত রাতে আপনার খেতে অসুবিধে হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।' সে বলল।

'ছি-ছি। দোষ তো আমারই। না জানিয়ে মাঝরাতে এসেছি। অবশ্য খেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।' মাথা নাড়লাম।

অরুণেশ্বরবাবু বললেন, 'আপনার আসার কথা ছিল বিকেলে। রাত্রে আসছেন জানলে নিষেধ করতাম। তেমন হলে স্টেশনেই রাত কাটাতে বলতাম।'

সে আমার দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ। কাল ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করেছে।'

প্রতিবাদ করলাম, 'এ কী বলছেন? অকারণে আমাকে কেউ খুন করবে কেন?'

'ঠিকই। কোনও যুক্তি নেই। থানার দারোগা যখন অনেক অনুসন্ধান করেও কিছু পেলেন না তখন উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন বাড়ির ভেতর থাকলে যখন বিপদ হচ্ছে না তখন রাত-বিরেতে বাইরে না গেলেই ভালো। যাক গে, আপনারা কথা বলুন, আমার কিছু কাজ আছে, সারি গিয়ে।' কথাগুলো বলে উঠে গেলেন অরুণেশ্বরবাবু।

ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম সে স্থির চোখে আমাকে দেখছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাকে কেন উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন!'

'জানি। আপনাদের চিঠিগুলো উনি আমাকে পড়িয়েছেন।' সে নিচু গলায় বলল।

'তাহলে আপনার আপত্তি নেই!'

'আমার কথা পরে। এখানে আসার পরে বাবা নিশ্চয়ই আপনাকে আমার সব কথা বলেছেন। চিঠিতে লিখলে কি আসতেন?'

'জানি না। তবে কৌতূহল নিশ্চয়ই হত। শ্বশুর পুত্রবধূকে নিজের মেয়ে বলে ভেবে নিয়ে আবার তাকে সংসারী করতে চাইছেন, এই ব্যাপারটা একটু অভিনব।'

'আপনি আর কী জানতে চান?'

'সাধারণত বিধবা হওয়ার পর মেয়েরা বাপের বাড়িতে ফিরে যান। আপনি তো তার সঙ্গে একটি রাতও থাকেননি। আপনি এখানে রয়ে গেলেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্রথম কথা, আমার কোনও বাপের বাড়ি ছিল না। থাকতাম মামার বাড়িতে। এখানে আমি পিতৃস্নেহ পেলাম। আমার নিজের বাবার স্মৃতি ঝাপসা। বিয়ের আগে আমার সম্মান নিয়ে কেউ ভাবেনি, এখানে সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে।' সে বলল।

'আমার কথা আপনি চিঠিতে পড়েছেন, আজ দেখলেন। আমাকে কি আপনার গ্রহণীয় বলে মনে হচ্ছে।' সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

'গ্রহণ তো করে পুরুষেরা, মেয়েদের সেটা মেনে নিতে হয়। দেখুন, বিয়ের বাসনা আমার চলে গেছে। কিন্তু বাবাকে সন্তুষ্ট করতে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' সে বলল।

'বুঝলাম। আপনাদের এখানে এক অদ্ভুত আতঙ্ক রাত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ খুন হচ্ছে অথচ কীভাবে এবং কে খুন করছে বোঝা যাচ্ছে না। আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

সে হাসল, 'দুটোই। বিশ্বাসও করি, অবিশ্বাসও। ঠিক ভগবানের বেলায় যা হয়ে থাকে।'

'কিছু মনে করবেন না, কাল রাত্রে আপনি এ-বাড়ির ছাদে ছিলেন?'

'কেন?' তার চোখ ছোট হল।

'কাল রাত্রে এ-বাড়ির কাছে এসে দেখলাম ছাদে সাদা কিছু হাঁটছে। হয়তো সাদা শাড়ি পরা মহিলা। আপনি কি কাল সাদা শাড়ি পরেছিলেন?'

'না, সাদা শাড়ি পরতে নিষেধ করেছেন বাবা। কিন্তু কথাটা আপনি ওঁকে বলেছেন?'

'না।'

সে উঠে দাঁড়াল, 'আমার মনে হয় দিনের আলো থাকতেই আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। ওঁকে বললে উনিও একই কথা বলবেন।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'যাঁরা রহস্যজনকভাবে মারা গিয়েছেন তাঁরা নাকি মৃত্যুর আগের রাত্রে সাদা কিছুকে অন্ধকারে হাঁটতে দেখেছিলেন।'

সিরসির করল মেরুদণ্ড, সেটাকে থামাতে বললাম, 'আপনার কি মনে হয় না এটা নেহাতই গপ্পো? কষ্টকল্পনা!'

'যা ঘটেছে তাই বললাম।'

এই সময় অরুণেশ্বরবাবু ফিরে এলেন, 'কি, কথাবার্তা হল?'

উঠে দাঁড়ালাম, 'আলাপ হল।'

'মা আমার বড় ভালো মেয়ে।'

'বাবা, আমি এখন যেতে পারি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'এসো মা।' অরুণেশ্বরবাবু মাথা নাড়তেই সে চলে গেল গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাড়ির দিকে।

অরুণেশ্বরবাবু বললেন, 'এখনই আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ফিরে গিয়ে ভেবে-চিন্তে জানালেই হবে। যদি আপত্তি থাকে তাহলেও জানাবেন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে তৈরি হই?'

'সে কী কথা! স্নান খাওয়া না সেরে যাবেন কেন? আপনি আমার অতিথি।'

‘ট্রেন পাব তো?’

‘স্বচ্ছন্দে। বিকেল তিনটের সময় জংশনের ট্রেন আছে। কার্তিক তুলে দিয়ে আসবে। তা এখান থেকে আড়াইটে নাগাদ বের হলেই চলবে। ওই কথা থাকল। আমি একটু বেরুব।’

আমি মাথা নাড়তে অরুণেশ্বরবাবু চলে গেলেন।

বাগানটি বেশ বড়। ফলের গাছ ছাড়াও শাক-সবজির চাষ হয়েছে। তাদের নধর চেহারায় চোখের আরাম হল। ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে খুব। বাড়ির এক পাশে গিয়ে পুকুরটাকে দেখলাম। মাছ আছে বলেই মনে হল। ফেরার পথে গাছটা চোখে পড়ল। তার ডালে-ডালে পাকা ফল ঝুলছে। আঙুরের আকৃতি ডাবল হলে যা দেখাবে এই ফলগুলো সেইরকম। টুকটুকে লাল হয়ে আছে। প্রচুর মৌমাছি ঘুরছে গাছটাকে ঘিরে, পাখিরা কিন্তু এই গাছে বসেনি। এই ফলের নাম জানি না। এই রকম গাছ কখনও দেখিনি। মৌমাছিরা যখন আকর্ষণ বোধ করছে তখন নিশ্চয়ই ফলটি মিষ্টি। বিষফলের গাছ কেউ বাগানে রাখবে কেন?

হাত বাড়িয়ে একটা পাকা ফল ছিঁড়ে সামান্য চাপ দিতেই রস গড়াল। জিভ ঠেকাতে বেশ মিষ্টি লাগল। ফলটা মুখে পুরলাম। মিষ্টি রসে মুখ ভরে গেল। তারপরেই সমস্ত শরীরে অদ্ভুত ঝিমঝিম ভাব ছড়িয়ে পড়ল। কোনওরকমে ফলটি বাইরে ফেলে দিতেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে গেল। ঘাসের ওপর বসে পড়লাম আমি। এই বসাটাও টের পেলাম না। আমি তাকিয়ে আছি কিন্তু কিছুই দেখছি না, চিৎকার করছি কিন্তু শব্দ বের হচ্ছে না এমনকি আমার কানেও কোনও শব্দ ঢুকছে না। অথচ আমার বোধশক্তি নষ্ট হয়নি। হাত-পা নাড়াতে পারছি না।

কতক্ষণ পরে জানি না, আমাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল। কার্তিক আর একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বাড়িতে নিয়ে এল। বিছানায় শুইয়ে দিল যত্ন করে। তারপরেই অরুণেশ্বরবাবু এলেন হন্তদন্ত হয়ে। ঘটনাগুলো যে ঘটছে তা আমি টের পাচ্ছি না, কিন্তু অনুমান করতে পারছি। চোখে দেখতে পাচ্ছি না চোখ খুলেও কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে।

পরে শুনেছি ডাক্তার এসেছিল। গ্রামের ডাক্তার। লোকটা ওষুধ খাইয়ে বমি করিয়েছিল অনেকটা। তারপরেই আমি মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙলে দেখলাম আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। আর মশারির বাইরে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। আমাকে চোখ ঘোরাতে দেখে মূর্তি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই আবার ঘুমে চোখ জুড়িয়ে গেল। কিছুতেই জেগে থাকতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি মশারির বাইরে চলে এলাম। দ্রুত বাইরে আসতেই সেই ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলাম। ধীরে-ধীরে হাঁটছে। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। মূল বাড়ির ভেতর ঢুকে একটা সিঁড়ির ওপর পা রাখতেই কেউ একজন ওর সামনে এসে দাঁড়াল, ‘আজ আর ছাদে যেও না মা।’

‘আমাকে বাধা দেবেন না বাবা।’ তার কণ্ঠস্বর।

‘অতিথি অসুস্থ। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন। ওঁর পাশে একজনের থাকা দরকার।’

‘ওখানে বসে থেকে আমি ওঁর কোনও উপকারে লাগব না। তাই না?’ সে চলে গেল।

অরুণেশ্বর বললেন, ‘কার্তিক খেয়াল রাখিস, ভালো ঘুম হলে ঠিক হয়ে যাবে।’

আশেপাশে কোথাও কার্তিককে দেখতে পেলাম না।

সিঁড়ি যখন জনশূন্য হল তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। সে ছাদে গিয়েছে, গত রাতেও নিশ্চয়ই গিয়েছিল। যেভাবে সে ছাদে গেল তা স্বাভাবিক নয়। মনে হচ্ছিল সেখানে যাওয়ার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হাওয়া বইছে বাগানে। শব্দ হচ্ছে। ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দরজায় চলে আসতেই তাকে দেখতে পেলাম। ছাদের ঠিক মাঝখানে বাবু হয়ে বসে আছে, কিন্তু মেরুদণ্ড টান-টান। মুখ আকাশের দিকে। শূন্য বিশাল ছাদে এইরকম ভঙ্গির একটি মূর্তিকে মোটেই লৌকিক

বলে মনে হচ্ছিল না।

আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। সময় বয়ে যাচ্ছে। মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে সে মুখ নামাল। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। মাথার ওপর দিয়ে একটি নাম না জানা রাতপাখি চিৎকার করে উড়ে গেল। সে কাঁদছে। তার কান্নার শব্দ সে গোপন করার চেষ্টা করছে না।

এই সময় সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে আমি দ্রুত সরে গেলাম। কোণের দিকে ফেলে রাখা ড্রামের আড়ালে যেতে না যেতেই অরুণেশ্বরবাবুকে দেখতে পেলাম। বড়-বড় পা ফেলে ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'কি হচ্ছে কী? অ্যা? তুমি এভাবে কাঁদছ জানলে লোকটা তোমাকে বিয়ে করবে? ওর আগে তিনজনকে ভাগিয়েছ তুমি, এবার কথা দিয়েছিলে বাধ্য হয়ে।'

সে মাথা নাড়ল। 'না, আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।'

'পারতে তোমাকে হবেই। আমি তো বেশিদিন বাঁচব না। তখন শেয়াল-কুকুর তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমার কর্তব্য আমি করে যেতে চাই। ওঠো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'না। ওরা আসবে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সে উঠে দাঁড়াল।

'আঃ। ওসব তোমার মনের ভুল। কেউ কখনও আসে না। তুমি নিজের মনে কথা বলো। শোনো, এরকম করলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।' অরুণেশ্বর থামলেন, একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ঘরে যাবে, এ আমার আদেশ।' জুতোয় শব্দ তুলে অরুণেশ্বর নেমে গেলেন ছাদ থেকে।

সে দাঁড়িয়েছিল, একা। দূর থেকেই বুঝতে পারলাম সে কাঁপছে। অসহায় এক কিশোরীর মতো এখনই ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছিল। আমি দ্রুত তার কাছে গেলাম। সামনে দাঁড়াতেই সে তাকাল। ফিসফিস করে বলল, 'আমি এখন কী করব!'

'আপনি যেমন থাকতে চান তেমনই থাকুন।' বললাম।

'সত্যি?' তার মুখে হাসি ফুটল। তার পরেই সে হাঁটতে শুরু করল। দ্রুতগতিতে ছাদের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে চলল। লক্ষ করলাম হাঁটার সময় সে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে চলেছে। কী বলছে শোনার জন্যে আমি ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে যখন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তখন অস্পষ্ট উচ্চারণ বুঝতে পারলাম না।

আমার সামনে নির্জন রাতের গ্রাম। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। রাস্তা শুনশান। এই গ্রামে তিনজন মানুষ খুন হয়েছেন কিন্তু তাদের মৃত্যুরহস্য আজও অন্ধকারে। এটা কী করে সম্ভব? হঠাৎ কানে এল, 'শুনতে পাচ্ছ? তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আমি যেমন আছি তেমন থাকব।' বলতে-বলতে সে ছাদের মাঝখানে গিয়ে বাবু হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছিল সে? কোনও অশরীরীর অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না। ওর মন কি একা থাকতে-থাকতে নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে? ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

'আপনি খুব একা?'

সে তাকাল। মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আপনাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেলে আমি খুশি হব।' বললাম।

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যে বললেন, যেমন আছি তেমনই থাকতে পারব।'

'এরকম থাকলে আপনি মারা যাবেন।'

'আমি বাঁচতে চাই না।' শব্দে কান্না জড়ানো।

'কেন?'

হাঁটুতে মুখ রেখে সে কাঁদতে লাগল।

এই সময় অরুণেশ্বরবাবুর গলা কানে এল, 'তুমি নিচে যাও।'

বলার ধরনে এমন কর্তৃত্ব ছিল যে সে এক মুহূর্ত দেরি করল না।

'আপনি অসুস্থ, এখানে আসা আপনার উচিত হয়নি।' ভদ্রলোক জানালেন।

'যাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে এসেছি তাকে জানতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়।'

'তাই? বেশ, আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারি?'

'উনি কেন, কী কারণে ছাদে এসে এমন আচরণ করেন জানতে পারলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

'সেটা না জানলে—?'

'আমার পক্ষে ওঁকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'বেশ। আপনাকে আর আটকাতে চাই না। ভোর-ভোর একটা ট্রেন জংশনে যায়। সেটা ধরতে রাত তিনটে নাগাদ আপনাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তৈরি থাকবেন, কার্তিক আপনাকে জানিয়ে দেবে।' কথাগুলো বলে তিনি নেমে গেলেন।

এখন আমি একা ছাদে দাঁড়িয়ে। হাওয়ারা শব্দ তুলছে। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। অরুণেশ্বরবাবু আর আমাকে আতিথ্য দিতে চান না। তাই রাত তিনটে নাগাদ এই বাড়ি থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে ট্রেন ধরতে। তখন চারপাশ অন্ধকার, রাস্তায় আরও একাকিত্ব। নেমে এলাম। তিনটে বাজতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। ঘুমটুম মাথায় উঠল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এই যাওয়াটা সুখের হবে না।

ঠিক তিনটের সময় দরজায় শব্দ হল, কার্তিক এসে দাঁড়াল। আমি তৈরি ছিলাম, ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটাও কথা না বলে কার্তিক আমাকে গেটের কাছে পৌঁছে দিল।

'দাঁড়ান। আপনাকে এগিয়ে দেব আমি।' অন্ধকার ফুঁড়ে সে বেরিয়ে এল।

'আপনি!'

'হ্যাঁ, এই গ্রামে আর একটা খুন হোক আমি চাই না।'

'আমাকে কে খুন করবে? আর যদি করে, তাহলে আপনি কী করতে পারেন।'

'যারা খুন হয়েছিল তাদের সঙ্গে কোনও সঙ্গী ছিল না। চলুন।'

'এ কী! আপনি যাবেন না, বড়বাবু খুব রাগ করবেন।' কার্তিক প্রতিবাদ করল।

সে জবাব দিল না। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা ফিরবেন কী করে? আপনার উচিত হয়নি আমার সঙ্গে আসা।'

'এতদিন ধরে শুধু উচিত কাজগুলো মেনে চলেছি, আজ না হয়—।'

আমরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলেছি। চারপাশের বাড়ি নিঝুম। কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। গ্রামের প্রান্তে এসে থামলাম, 'দেখলেন কেন কিছুই হল না। এবার আপনি ফিরে যেতে পারেন।'

সে মাথা নাড়ল, 'না। আপনাকে কুলকুলির মাঠের পাশ দিয়ে যেতে হবে। চলুন।'

সেই ঝাঁকড়া গাছ, জঙ্গুলে পরিবেশ যখন ছাড়াচ্ছি তখন অন্ধকার অনেক পাতলা। যে মোড়ে এসে সাইকেলওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে বললাম, আর এগোতে হবে না। আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট করলেন!'

সে কথা না বলে হেঁটে চলছিল।

আমি দাঁড়ালাম, 'স্টেশন আর দূরে নেই। অনেকটা পথ আপনাকে ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি ফিরব।'

'সে কী!'

'মন থেকে ভয়টাকে সরাতে পারছি না।'

'আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।'

'না। যে তিনজন মারা গিয়েছে তারা আমাকে দেখতে এসেছিল। সমস্ত কথা জানার পর আপনার মতো রাজি না হয়ে ফিরে গিয়েছিল। প্রত্যেককেই গভীর রাতে বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এবার আমি মরিয়া হলাম। আপনাকে আমি কিছুতেই এখানে মরতে দেব না।' হাঁটতে-হাঁটতে সে বলছিল।

'কেন তাদের মরতে হয়েছিল? শুধু প্রত্যাখ্যান করার কারণে?' আমি নার্ভাস।

'কিছুটা। আর বাকিটা হল, তারা অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল।' সে বলল, 'সেই জানাটা বাইরে প্রচারিত হোক তা কাম্য ছিল না।'

'কার কাছে?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই।'

আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। টিকিটঘর এই ভোরে বন্ধ। সূর্য এখনও ওঠেনি।

হেসে বললাম, 'আর কোনও চিন্তা নেই। এখানে আপনার গ্রামের ছায়া পড়বে না।'

সে মাথা নাড়ল।

বললাম, 'অরুণেশ্বরবাবু নিশ্চয়ই খুব রাগ করবেন আপনার ওপর।'

'আমি পরোয়া করি না। কী করবে? বড়জোর খুন করবে।'

'একথা বলছেন কেন? উনি তো আপনাকে সংসারী করতে চান!'

সে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বিধবা হওয়ার পর মামার বাড়িতে ফিরে গেলে ওঁরা ভালো মনে নিতেন না। ঠিক। কিন্তু আমি কি বেওয়ারিশ ছিলাম? মেয়ের মতো তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন সবার বাহবা পেতে অথচ প্রতি রাত্রে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে গেছেন তিনি কত একা। কতদিন নারীসঙ্গ পাননি। রাতের পর রাত তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছি। আমাকে কত লোভ দেখিয়েছেন। পুত্রবধূকে বিয়ে করা যায় না কিন্তু দুজনের শরীরকে তো তৃপ্ত করা যায়! যখন কিছুতেই রাজি হলাম না, রাত নামতেই ছাদে চলে যাই তখন বললেন তোমার বিয়ে দেব। বিয়ের পর তুমি আমার বউমা থাকবে না। তখন তোমাকে ঋণশোধ করতে হবে। আমি মেনে নিলাম। কিন্তু তিন-তিনজন পাত্র যখন আমার চেহারা দেখে সম্মতি জানালেন তখন আমাকেই সত্যি কথাটা বলতে হল। শোনার পর প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন।'

'কেন? বিয়ে হয়ে গেলে তো আপনাকে ওই বাড়িতে থাকতে হত না?'

'আসতে হত। কারণ ওটা তখন আমার বাপের বাড়ি হয়ে যেত আর উনি ঠিক আমাকে আসতে বাধ্য করতেন। আপনার ট্রেন আসছে। ট্রেনে উঠে টিকিট কাটবেন।'

'এর পরে ফিরে গেলে কী হবে বুঝতে পারছেন?' বললাম 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

সে মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। আমি পারব না। ওই বাড়ি ছেড়ে আমি যেতে পারব না। মাত্র একটা রাত, পাশে অনেক মানুষ, তবু একটা রাত ধরে তাকে দেখেছিলাম। ও-বাড়ির ছাদে গেলেই তাকে দেখতে পাই। হোক সেটা কল্পনায়, তবু পাই তো।'

ট্রেনের জানলায় বসে তাকে দেখলাম। সবে ওঠা রোদ গায়ে মেখে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। খেয়ালির দিকে। হঠাৎ মনে হল, অরুণেশ্বরবাবুর শত্রু কি তাঁর মৃত সন্তান?

যাকে এ জীবনে তিনি কখনই হারাতে পারবেন না।



ভাসানের সুরে বোধনের গান

এই বাড়িটা তার পিতামহের তৈরি। সেকেলে বাড়ি, কিন্তু ভারি মজবুত। বাড়ির গায়ে যে মেহগিনি গাছদুটো তিনি লাগিয়েছিলেন সত্তর বছর আগে, তাদের স্বাস্থ্য এখন উপচে পড়ছে। ওই গাছের কাঠ খুব মূল্যবান। দুটো গাছ বিক্রি করলে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে বলে বড়ছেলে তাঁকে জানিয়ে দিয়ে গেছে। তবে এখন ওইসব গাছ ইচ্ছেমতো লাগানো যায়, কিন্তু কাটা যায় না। তার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি নিতে হয়। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান তিনি একদা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। অতএব এক কলম লিখে দিলেই চেয়ারম্যান অনুমতি দিয়ে দেবেন বলে বড়ছেলের বিশ্বাস।

তিনতলায় তাঁর ঘর। সামনে অনেকটা খোলা ছাদ। বছর আটেক আগে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছিল। চিকিৎসার পর ব্যথা কমেছে, কিন্তু হাঁটতে গেলেই ভয় হয় পড়ে যাবেন। তাই লাঠি ব্যবহার করেন। লাঠি নিয়ে ছাদে ঘুরে বেড়ান। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে ইচ্ছে করে না। ফলে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হল টেলিফোন। তবে আজকাল তাঁর ফোন কদাচিৎ বাজে। বিরাশি বছরের বৃদ্ধকে ফোন করার মতো মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

একটা টিভি আছে, আছে প্রচুর বইপত্র। খবরের কাগজ আসে দুটো। দিব্যি চলে যাচ্ছে। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর পনেরো আগে। দোতলায় দুই ছেলে বাস করে। পুত্রবধূরা পালা করে আসেন। কোনও প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে যান। কাজের লোক তাঁর দেখাশোনা করে। না। ছেলেদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। বরং এই একাকী থাকাটাই তাঁর ভারি পছন্দ। বিরাশি বছর পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। এখন শেষ সময়ের প্রতীক্ষা। নিজেকে তৈরি রাখার জন্যে একাকিত্বের বড় প্রয়োজন।

আজ সকালে চমৎকার রোদ উঠেছে। ক'দিন থেকেই দুটো চড়ুই একটু-একটু করে সাহসী হয়ে তাঁর কাছাকাছি চলে আসছে। পাখিরাও বুঝতে পারে মানুষ কখন গাছ হয়ে যায়। ওদের নামকরণ করেছেন তিনি, পাখি-পাখিনী। পাখিনী বড় আদুরে।

বড়বউমা এলেন জলখাবার নিয়ে। টেবিলে পাত্রগুলো সাজিয়ে ডাকলেন, 'আসুন বাবা। কাল বলেছিলেন নিরামিষ খাবেন, তাই এনেছি।'

'ভালো করেছ।' লাঠি হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে খাবারের টেবিলে এলেন তিনি। ঘড়ি দেখলেন, ঠিক পৌনে ন'টা। বড়বউমা সময় রাখতে জানেন।'

'একটা কথা বলব বাবা?'

তাকালেন তিনি।

বড়বউমা বললেন, 'আপনার ছেলে বলছিল ওর পরিচিত একটা সংস্থা আছে, যারা খুব যত্ন করে বেড়াতে নিয়ে যায়। আপনি তো অনেকদিন বাইরে বের হননি। দিন দশেকের জন্যে ঘুরে এলে একটু পরিবর্তন হবে।'

'দেখছ এই ছাদের ওপর হাঁটাহাঁটি করি, নিচে নামতে ভরসা পাই না—।'

'আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। ওরাই সব ব্যবস্থা করবে। হরিদ্বারে তো কখনও যাননি। এখন ওখানে আবহাওয়াও বেশ ভালো।'

'না-না। আমার তীর্থ করতে যাওয়ার কোনও বাসনা নেই।'

'তীর্থ করতে যাবেন কেন? হরিদ্বারে গঙ্গার পাশে বসলে মন ভালো হয়ে যায়। ওরকম দৃশ্যের সামনে গেলে সময় কখন কেটে যাচ্ছে টের পাওয়া যায় না।' বড়বউমা বললেন, 'আমরা তো বছরে দুবার বেড়াতে যাই। আপনি যেতে চান না শরীরের জন্যে। এদের সঙ্গে গেলে সেটা সমস্যা হবে না।'

'বলছ যখন তখন ভেবে দেখি।' কথা শেষ করেছিলেন তিনি।

ভেবে দেখলেন। ভালো ভ্রমণসংস্থা হলে চিন্তার কারণ নেই। তবু বঙ্কুবাবুকে ফোন করলেন তিনি। ভদ্রলোক এখন চুরাশি, একই অফিসে কাজ করতেন। বিয়ে করেননি, সারাজীবন শুধু ঘুরে বেড়িয়েছেন ছুটি পেলেই।

'বঙ্কুদা, আমি প্রশান্ত বলছি। প্রশান্ত সেন।'

'আরে! কী খবর? খুব ভালো সময়ে ফোন করলে। আমি একটু বাদেই বেরিয়ে যাচ্ছি। এবার বাংলাদেশ। সেই কোন কালে চলে এসেছিলাম, এবার গিয়ে দেখব স্মৃতির সঙ্গে মেলে কিনা। তা কী ব্যাপার বলো?' বঙ্কুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি তো জানেন, আমার একটা পায়ে একদম জোর নেই। লাঠি ছাড়া হাঁটা মুশকিল। ছেলে-বউমা বলছে ভ্রমণসংস্থার সাহায্য নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে। আপনার কোনও ধারণা আছে ওদের সম্পর্কে?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'অবশ্যই আছে। দুটো সংস্থার নাম বলছি, ট্যুর এবং সি অর স্কাই। এদের ওপর চোখ বন্ধ করে নির্ভর করতে পারো।' বঙ্কুদা বললেন।

যাত্রার দিন স্থির হয়ে গেল। টাকাটা তিনিই দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেরা কিছুতেই রাজি হল না। এরমধ্যে ভ্রমণসংস্থা থেকে টেলিফোন করে জেনে নিয়েছে তিনি কী-কী খাবার অপছন্দ করেন, কোন খাবার পছন্দের। কোন সময়ে খেলে শরীর ঠিক থাকে। একা থাকতে চান, না কারও সঙ্গে রুম-শেয়ার করতে আগ্রহী? এসব তথ্য দিয়ে খুশি হলেন তিনি। ওরা যখন আগাম জেনে নিচ্ছে তখন কোনও সমস্যা না হওয়ারই কথা।

সেদিন বিকেলে ছোটছেলে একটি ভদ্রলোককে নিয়ে এল।

'বাবা। এর নাম প্রদীপ, ওর বাবাকে তুমি চিনতে। অনিরুদ্ধ মুখার্জি।'

'ও। তোমাকেও দেখেছি, চেহারা অনেক বদলে গেছে।'

প্রদীপ বলল, 'শুনলাম আপনি হরিদ্বার বেড়াতে যাচ্ছেন।'

'আর বোলো না। ল্যাংড়া মানুষকে এরাই পাঠাচ্ছে। কী যে হবে কে জানে।'

ছোটছেলে বলল, 'এখনও ওই কথা ভাবছ? কিছুই হবে না।'

প্রদীপ বলল, 'আমার পিসিমা বিধবা হওয়ার পর বাবা আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সে-অনেক কাল হয়ে গেল। বাবাও চলে গেছেন। পিসিমা সেই যে বাড়িতে ঢুকেছেন আর বের হননি। ওঁকে ফেলে আমরা কোথাও যেতে পারি না। ওঁরও কোথাও যাওয়া হয় না। অনেক কষ্টে পিসিমাকে রাজি করিয়েছি ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে হরিদ্বারে যেতে। ওরাই সব দেখাশোনা করবে, তবু আপনি যদি একটু খেয়াল রাখেন তাহলে নিশ্চিন্ত হব আমরা।'

'তিনি কি অসুস্থ?'

'না-না। এমনি ঠিক আছেন, তবে মাঝে-মাঝে পেটে যন্ত্রণা হয়।'

'কেন?'

'আর কেন? একবেলা খাবেন, তাও আবার আতপ চাল। ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছেন,

আলসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওষুধ দিয়েছেন।'

'দিয়েছেন।'

'এসব কথা সংস্থাকে জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'দ্যাখো, আমি খোঁড়া মানুষ। কতটুকুই-বা করতে পারব। ঠিক আছে—।'

ওরা চলে গেলেও নড়তে পারলেন না তিনি। এটা কী হল? জীবনের নাটক ঈশ্বর লেখেন, কিন্তু নাট্যকারের এ কী রসিকতা?

ষাট বছর আগের কথা। তখন বাইশ বছর বয়স। পাড়ার এক রবীন্দ্রজয়ন্তীর সন্ধ্যায় বাইশ বছরের প্রশান্ত আঠারো বছরের নিরুপমাকে একটু আড়ালে পেয়ে বলেছিল, 'আমি যে-কথাটা বলতে চাই, সে-কথা কি তুমি বুঝেছ?'

নিরুপমা ঠোঁট মুচড়ে হেসেছিল, 'হুঁ।'

'কী বুঝেছ বলো?'

নিরুপমা তাকিয়েছিল, 'চিৎকার করে বলব?' তারপর সুখ। বুকের গভীরে টলটলে ঢেউ। দূর থেকে চোখে চোখে কথা, দু-তিনটি চিরকুট। এক-দুপুরে দুজনে ভিক্টোরিয়ায় গাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসা। প্রশান্ত হাত ধরেছিল নিরুপমার। ফরসা লম্বা আঙুল, কী নরম!

'জানো, মা আমাকে সন্দেহ করছে।' নিরুপমা বলেছিল।

'কেন?'

'জানি না। আজকাল আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়।'

'আজ কী বলে বেরিয়ে এলে?'

'এখন তো আমার কলেজে থাকার কথা।'

'দাঁড়াও। আর একটা বছর। চাকরি পাওয়ামাত্র তোমার মায়ের কাছে যাব।'

'গিয়ে কী বলবে?'

'বলব, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

প্রশান্তর হাত আঁকড়ে ধরেছিল নিরুপমা।

সারাজীবনে ওই একবারই স্পর্শ। অথচ এই বয়সেও সেই স্পর্শটিকে স্পষ্ট অনুভব করেন তিনি। কিন্তু মুখ? মুখ যে কীরকম ঝাপসা হয়ে গেছে। সেই আঠারো বছরের মুখটাকে মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। ফর্সা, আদুরে, নাকটি বড় সুন্দর। চুল ছিল প্রচুর। কিন্তু সব মিলিয়ে গোটা মুখটাকে মনে করতে তিনি পারছেন না। না। তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে।

সময়ে তো এমনই হত। কারও সঙ্গে মেয়ের প্রেম হচ্ছে জানলে ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন অভিভাবকরা। তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায়। প্রশান্ত যে ভয়ানক ক্রাইম করেছে, তা পাড়ার লোকের মুখ দেখে মনে হত তখন। অনিরুদ্ধ, যে এতদিন বন্ধু ছিল, আঙুল তুলে শাসিয়ে গেল। নিরুপমার বাবা এসে দেখা করলেন প্রশান্তর বাবার সঙ্গে। ওদের বংশে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। তা ছাড়া তাঁরা ব্রাহ্মণ। নিচু জাতির মানুষকে জামাই হিসেবে ভাবতে পারেন না। অতএব ছেলেকে যেন শাসন করেন।

আশ্চর্যজনকভাবে নিরুপমা পরদার আড়ালে চলে গেল। মাসছয়েক বাদে সানাই বাজিয়ে বিয়ে হয়ে গেল তার। বরের বাড়ি কলকাতা থেকে বহুদূরে।

বঙ্কিম লিখেছিলেন বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে। প্রশান্ত ভাবলেন, মানুষের বাল্যকাল কতদিনে শেষ হয়?

না। আর দেখা হয়নি। চাকরি নিয়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। বিয়ের পর ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। নিরুপমা নামের তরুণীর খোঁজ রাখার দরকার মনে হয়নি। বিধবা হওয়ার খবর

পেয়েছিলেন বন্ধুদের মুখে। খারাপ লেগেছিল।

বহুকাল বাদে বাড়ির বাইরে এলেন তিনি। ভ্রমণসংস্থার লোক খুব যত্ন করে তাঁকে ওপর থেকে নামিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল স্টেশনের ভেতরে। কামরার সামনে গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটতে কষ্ট হল না তাঁর। ওরাই ট্রেনে উঠতে সাহায্য করল। দুজনের কুপে। বয়স্করা ওপরে উঠতে পারবেন না, শোবেন নিচের বার্থে, তাই এই ব্যবস্থা। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'এই রইল বেল। যখনই দরকার হবে বেল বাজাবেন, বাজালে আমি চলে আসব। এখন কিছু খাবেন দাদু?'

'না। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ছেলেটি চলে গেলে একটি পত্রিকা বের করে চোখ রাখলেন তিনি। জানালা বন্ধ, কারণ কামরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পড়া হল না। ভাবনাটা আবার মাথায় ফিরে এল। সকাল থেকে কয়েকবার ভেবেছেন। প্রদীপ যা বলে গিয়েছিল তা যদি সত্যি হয়, তাহলে নিরুপমা এই ট্রেনেই হরিদ্বার যাচ্ছে। ভ্রমণসংস্থা দুটো কামরা রেলের কাছ থেকে নিয়েছে। এই দুটোর কোনও একটায় তার থাকার কথা। দ্বিতীয় কামরাটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত নয়। প্রদীপ যদি পিসির যাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করে, তাহলে ওখানেই তার জায়গা হয়েছে। এই সময়ে স্যুটকেশ নিয়ে ঢুকল কুলি, ভ্রমণ-সংস্থার ছেলেটির নির্দেশে সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছেলেটি ডাকল, 'আসুন দিদিমা। এই বার্থ আপনার। এই রইল বেল। কোনও প্রয়োজন হলেই বেল বাজাবেন, আমি চলে আসব। বসুন।'

ছেলেটি চলে গেল। একজন অপরিচিত বৃদ্ধাকে তাঁর কুপেতে দেখে বিরক্ত হলেন তিনি। এদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই। মহিলার মাথাভরতি পাকা চুল, চশমা, গায়ের রং ময়লা, মুখ গম্ভীর। তিনি বেল বাজাতেই ছেলেটি চলে এল, 'বলুন দাদু?'

'অনেকটা পথ। ওঁর অসুবিধে হতে পারে। কোনও মহিলার কুপেতে ওঁর ব্যবস্থা করতে পারবে না? নাহলে আমাকে কোনও ছেলের সঙ্গে দাও।' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'আপনাদের অসুবিধে হবে? দেখুন কাণ্ড। যাঁরা আপনাদের টাকা দিতে এসেছিলেন। তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন একসঙ্গে ব্যবস্থা করতে। আচ্ছা দেখি—।'

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেটিকে, 'প্রদীপ কেন বলেছে জানি না, ওঁর মনে হচ্ছে অসুবিধে হবে। দেখুন যদি অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন!'

'প্রদীপ? প্রদীপ মানে—।'

'আমার ভাইপো।'

স্থির হয়ে গেলেন তিনি। শেষপর্যন্ত ছেলেটিকে বললেন, 'থাক। তুমি যেতে পারো। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

ছেলেটি চলে গেলে তিনি হাসলেন, 'তোমাকে চিনতে পারিনি নিরুপমা।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠলেন নিরুপমা, 'তুমি?'

'হুঁ।' মাথা নাড়লেন তিনি।

'একী চেহারা হয়েছে তোমার?'

'কেন? আমি তো ঠিকই আছি।' তিনি বললেন, 'তুমিই একদম বদলে গেছ।'

কথাটায় আমল দিলেন না নিরুপমা, 'প্রদীপ জানে আপনি হরিদ্বারে যাচ্ছেন? কী আশ্চর্য! সে তো একবারও আমাকে একথা বলেনি।'

তিনি শুনলেন, নিরুপমা প্রথমে তুমি বলেছিলেন, এবার আপনি।

'বললে কি তুমি আসতে না?'

এবার হাসলেন নিরুপমা, 'অদ্ভুত!'

'কীরকম?'

'ষাট বছর আগে সম্পর্ক হচ্ছে জেনে ওদের মাথায় বাজ পড়েছিল। তাড়াতাড়ি পাত্র খুঁজে বিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তি পেয়েছিল ওরা। অথচ ষাট বছর পরে ওই বাড়ির ছেলে জেনেশুনে একসঙ্গে হরিদ্বারে বেড়াতে পাঠাচ্ছে। এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হতে পারে!' নিরুপমার কথা শেষ হতেই ট্রেন ছাড়ল।

'তুমি কেমন আছ নিরুপমা।'

'একজন বাঙালি বিধবা, যার কোনও সন্তান নেই, যেমন থাকে তেমন আছি।' গম্ভীর মুখে বললেন নিরুপমা।

তিনি উঠলেন। ছেলেটা যে বেল বাজাবার কথা বলে গিয়েছিল, তা ভুলে গিয়ে লাঠি টেনে নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ট্রেনের ঝাঁকুনিতে টলমল হলেন।

নিরুপমা দ্রুত ধরে ফেললেন তাঁকে, 'একী! তোমার পায়ে কী হয়েছে?'

'ভেঙেছিল। বুড়ো হাড় ঠিকঠাক জোড় মেনে নেয়নি।'

'কোথাও যাবে?'

'টয়লেটে।'

'দাঁড়াও, ওই ছেলেটিকে ডাকি।' নিরুপমা বেল টিপলেন।

তিনি বললেন, 'ট্রেনটা দুলছে বলে, প্লেন জায়গায় হাঁটতে অসুবিধে হয় না।'

ছেলেটি ছুটে এল, 'বলুন দাদু।'

'একটু টয়লেটে যাব।'

'আসুন।' হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ধীরে-ধীরে বের করে নিয়ে গেল ছেলেটি।

তিনি ফিরে এসে দেখলেন এরমধ্যে সংসার গুছিয়ে ফেলেছে নিরুপমা। ভ্রমণসংস্থার দেওয়া শোওয়ার সরঞ্জাম সাজিয়েছে দুটি বার্থে।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করল, 'কখন খাবে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল?'

'ওদের তো সময় দেওয়া আছে।' তিনি বিছানায় গেলেন।

তাঁকে ভালো করে দেখলেন নিরুপমা, 'আর কী-কী বাধিয়েছ?'

'তেমন কিছু না। হৃদয় এখনও অটুট আছে।'

'চশমার পাওয়ার মনে হচ্ছে বেশ।'

'ও হ্যাঁ। ছানি কাটিয়েছি, তবু—।'

'ব্লাডসুগার?'

'বোধহয় নেই।'

'বোধহয় কেন? ছানি কাটাবার আগে পরীক্ষা করাওনি?'

'সে তো অনেক বছর আগের কথা। তোমার কথা বলো।'

'আমি? যমেও ছোঁবে না।'

'পেটে তো আলসার বাধিয়েছ। ওষুধ এনেছ তো।'

অবাক হয়ে গেলেন নিরুপমা, 'তুমি কী করে জানলে?'

'একবেলা খেলে তো আলসার হবেই।'

'প্রদীপ বলেছে নিশ্চয়ই। আর লোক পেল না।'

'তার মানে?'

'কাছাকাছি থেকেও ষাট বছরে যে খোঁজ নিল না একবারও, তাকে এসব কথা বলার কোনও

মানে হয়?' ছোট্ট হাসল নিরুপমা।

'একজন বিবাহিতা মহিলাকে বিরক্ত করা ভদ্রতায় বেধেছে।'

'তারপরে?'

'আমার ঘরে যে এসেছিল তাকে অসম্মান করা হত।'

'আমি তাকে দেখেছি।'

'ও।'

'তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাত। কয়েকবার দেখেছি।' নিরুপমা বললেন, 'যেদিন শুনলাম উনি চলে গেছেন, সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল।'

'তার মানে তুমি আমার খবর রাখতে?'

'না। কানে এলে শুনতাম।'

ছেলেটি এল, 'এবার আপনাদের ডিনার দিতে বলি?'

নিরুপমা বললেন, 'কী দেবে বাবা?'

'আপনার জন্যে রুটি, দুটো নিরামিষ তরকারি, সন্দেশ। আর দাদুর জন্যে রুটি-তরকারি আর চিকেন কারি। মিষ্টি।' ছেলেটি হাসল।

'তুমি ওসব না দিয়ে আমাকে শুধু একটা মিষ্টি দিও।' নিরুপমা বললেন।

'সেকি! শুধু একটা মিষ্টি খেয়ে সারারাত থাকবেন?' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

'শোনো ভাই', তিনি বললেন, 'আমাকেও ওই একটা মিষ্টি দিও। একজন না খেয়ে থাকবে আর তার সামনে বসে আমি পেট ভরাতে পারব না।'

'আশ্চর্য!' নিরুপমা রেগে গেলেন, 'বিকেল তিনটের সময় খেয়েছি। রাত্রে আমি কখনওই খাই না। যে-যার নিয়মে তো চলবে।'

'চলে তো চেহারার ওই হাল হয়েছে। চিনতেই পারিনি। দাঁড়িয়ে কী দেখছ? যাও, দুটো মিষ্টি নিয়ে এসো।' ধমকালেন তিনি ছেলেটিকে।

'দাঁড়াও।' ছেলেটিকে হাত তুলে থামতে বলে তাকালেন নিরুপমা, 'তুমি কি আমাকে জব্দ করতে চাইছ?'

'না তো।'

'তাহলে?'

'তুমি তো চিরকাল একবেলা খেয়ে থাকনি! নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে এই অভ্যেসটা করেছ। এইটে মানতে পারছি না।' তিনি বললেন।

ছেলেটি হাসল, 'তাহলে দিদিমা, দুজনের খাবার নিয়ে আসছি।'

সে চলে গেলে নিরুপমা বলল, 'আজ রাত্রে ঘুম হবে না। পেটে যন্ত্রণা হবেই।'

'কিস্যু হবে না। আমি তো তোমাকে চিকেন খেতে বলিনি। জানি, বললেও খাবে না। তোমার স্বামী নেই বলে তুমি শরীরটাকে কষ্ট দিচ্ছ, আমি তো স্ত্রী চলে যাওয়ার পর সে-কথা ভাবিনি।'

উত্তর দিলেন না নিরুপমা। মুখ গম্ভীর করে বসে রইলেন। এই বিশেষ ভঙ্গিটিকে তিনি চেনেন। স্ত্রীর সঙ্গে কোনও ব্যাপারে দ্বিমত হলে তাঁকে দেখতে হত এই ভঙ্গিটিকে। অনেক অনুনয়ে সেই মুখ সহজ হত। আজ এই বয়সে ওসব ভাবলে হাসি পায়।

ছেলেটি এল। খাবার দিয়ে গেল।

তিনি ডাকলেন, 'এসো, খাওয়া যাক।'

'আমাকে খেতেই হবে? মুখ ফেরালেন নিরুপমা।

'তুমি খেলে আমার খেতে ভালো লাগবে।'

'কেন? রোজ তোমার খাওয়ার সময় কে থাকেন?'

'বউমারা।'

'আমি একা খাই। সবারই কাজ থাকে।'

'অসময়ে খেলে তো একা খেতে হবেই। খাও।'

শেষপর্যন্ত হাত বাড়ালেন নিরুপমা. 'কতদিন পরে রাত্রে খাচ্ছি।'

'কতদিন পরে ট্রেনে উঠেছ? কখনও কি এই সন্ধের পরে আমার সঙ্গে একা এভাবে গল্প করেছে?'

'কল্পনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে অনেক দূরে চলে যাবে। বিয়ের আগের দিনও ভেবেছিলাম। বাঃ, তরকারিটা ভালো করেছে।'

'তুমি যে ওরকম ভেবেছিলে তা আমি বুঝতে পারিনি।'

'ওটা কী দিয়েছে? চিকেন?' নিরুপমা আঙুল তুলে বাটি দেখালেন।

'হ্যাঁ।'

'ওমা। এ তো একেবারে সাদা ঝোল।'

'আমি রিচ রান্না খাই না।'

'টেস্ট পাও?'

তিনি তাকালেন, 'মন্দ লাগে না। তুমি এক টুকরো নেবে?'

'আমি?' চোখ বড় হয়ে গেল নিরুপমার।

'আমি তো আমিষ খাই না।'

'কেন? কেউ খেতে বলেনি?'

'না। বিধবাদের খেতে নেই বলেই বলেনি।'

'এই নেই কথাটা কোথায় লেখা আছে? নিশ্চয়ই জানো আজকাল ওটা উঠে গেছে।'

'জানি।'

তিনি একটা টুকরো ঝোলসমেত চামচে তুলে নিরুপমার প্লেটে রাখলেন।

'তুমি আমার সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছ।'

'এই তো ক'টা দিন—! তারপর আবার যে কে সেই।' তিনি বললেন।

রাতের ট্রেন একনাগাড়ে ছুটে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। কুপেতে নীল আলো জ্বলছে। মুখ ফিরিয়ে অবাক হলেন। নিরুপমা চুপচাপ বসে আছেন।

'একি! ঘুমাওনি?'

নিরুপমা উত্তর দিলেন না।

'শরীর খারাপ লাগছে? পেটে কি ব্যথা শুরু হয়েছে? ওষুধ খেয়েছ?'

'আমার শরীর ঠিক আছে।'

'তাহলে?'

'আমি ভাবতে পারছি না।'

'কী?'

'যখন চেয়েছিলাম তখন ওরা জোর করে আলাদা করেছিল। তোমার কাছে যেতে দেয়নি। আর এখন ওরাই একসঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কেন? সেই তুমি আর আমি তো একই আছি। তখন যৌবন ছিল আর এখন বার্ধক্য এসেছে। মানুষ যৌবনকে ভয় করে আর বার্ধক্যকে অবহেলা? এখন আমরা এমনকিছু করতে পারব না, যাতে ওরা বিপদে পড়তে পারে। ওদের অসম্মানিত করার ক্ষমতা আর আমাদের নেই, এটা জেনেই কি এই কাজটা করল। আমার আর

ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। কাশীর মতো হরিদ্বারের কোনও আশ্রমে কি বাকি জীবনটা আমি থেকে যেতে পারি না?' নিরুপমার গলার স্বরে কান্না মিশল। তিনি উঠলেন। লাঠি ছাড়াই টলতে-টলতে চলে এলেন নিরুপমার পাশে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এসব ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমি তোমার পাশে বসছি। তুমি শুয়ে পড়ো।'

প্রায় জোর করেই শুইয়ে দিলেন নিরুপমাকে। তারপর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়।'

'এই ক'টা দিন চলে গেলে কী হবে?' নিরুপমা ফিসফিস করে বলল।

তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। কপালে হাত বুলাতে-বুলাতে একসময় বুঝলেন নিরুপমা জেগেই আছেন। তাঁর হাত ব্যথা করছিল। হাত সরাতে নিরুপমা বললেন, 'যাও, শুয়ে পড়।' লাঠিটা দূরে পড়ে আছে। আসার সময় মনে হয়নি, নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার সময় খুব ভয় হল। লাঠিছাড়া ফিরবেন কী করে!



সল্টলেকের বাড়ি

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর আর কিছু করার থাকে না। যে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন তাঁরা ফিরে গেলেন যে-যার সংসারে। আগামীকাল সকালে বড়মেয়ে-জামাই যাবে ম্যানচেস্টারে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে চটজলদি চলে এসেছিল স্বাতীকে নিয়ে। কোনওরকমে ছুটি ম্যানেজ করেছিল জামাই। আর থাকতে পারছে না। ছোট্ট মেয়ে এসেছিল কানাডা থেকে। সেও ফিরে যাচ্ছে কাল। দিল্লি হয়ে। তার স্বামী আসেনি।

সন্ধের মুখে দোতলায় ব্যালকনিতে বসেছিলেন বিমলকান্তি। আর কয়েকদিন পরে বিরাশি পূর্ণ হবে তার। প্রত্যেক বছর ওই দিন শুরু হলেই মেয়েদের ফোন আসত। স্ত্রী পায়েস করে দিত দুপুরে। সামনের বার হয়তো ফোনদুটো আসবে, পায়েস তৈরি হবে না। প্রায় বাহান্ন বছর একসঙ্গে থাকলে যত ঝগড়াঝাঁটি হোক না কেন, কিছু অভ্যেস এমনভাবে শেকড় বসায় যে তার অস্তিত্ব একজন চলে যাওয়ার আগে বোঝা যায় না। এই বাড়িও তো তৈরি হয়েছিল স্ত্রীর ইচ্ছায়। তখন সল্টলেকের নাম শুনলে কলকাতার মানুষের নাক কুঁচকে যেত। বালি আর আগাছায় ভরতি। রাস্তাঘাট নেই, জলের অভাব, দুদিনেই বাড়ি ধ্বসে যাবে। কিছুটা গেলেই বিদ্যেধরী নদী। শেয়াল ডাকে দিন-দুপুরে। এগার হাজার টাকা কাঠায় সরকার লিজে জমি দিচ্ছে। সেই লিজের মেয়াদ শেষ হতে কত পুরুষ চলে যাবে। লিজ তো নামকো ওয়াস্তে, ওটা মালিকানার কম নয়। স্ত্রী জোর করেছিলেন অ্যাপ্লিকেশন দিতে। ভাড়া বাড়িতে থাকার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর। নকসালরা যখন আন্দোলন শুরু করেছে তখন লটারিতে নাম উঠল।

একটু-একটু করে বাড়ি হল। মনের মতো বাড়ি। মেয়েদের বিয়েও হল এই বাড়ি থেকে। সল্টলেকের চেহারাটা এখন বদলে গেছে। এগারো হাজার টাকার জায়গায় চার লাখ দিলেও জমি পাওয়া যাচ্ছে না। আর কিছু না পান বাড়ির ব্যাপারে তৃপ্তি পেয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা।

'কী ভাবছ বাবা?'

বিমলকান্তি লক্ষ করেননি কখন দুই মেয়ে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হাসার চেষ্টা

করলেন, 'ভাবছিলাম এই বাড়ি তোদের মায়ের ইচ্ছায় হয়েছিল।'

মেয়েরা কথা বলল না কিছুক্ষণ। শেষপর্যন্ত বড়মেয়ে বলল, 'আমরা তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'হঠাৎ অনুমতি নেওয়ার দরকার হল? সামনে আয়।'

মেয়েরা চেয়ারে বসল। বড়মেয়ে বলল, 'আমরা ফিরে গিয়েই স্পনসরশিপ পাঠাব। তুমি ভিসা করে চলে এসো।'

'কী করব ওখানে গিয়ে?'

'কিছু করবে না। তুমি নিজের মতো থাকবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকবে। ছয় মাস আমার কাছে, ছয় মাস ছোটর কাছে।' বড়মেয়ে বলল।

হাসলেন বিমলকান্তি, 'দ্যাখ, তোদের নিজস্ব সংসার হয়েছে। তার একটা আলাদা চেহারা হয়েছে যা তোরাই দিয়েছিস। সেখানে আমি গিয়ে থাকলে তোদেরই অস্বস্তি হবে।'

ছোটমেয়ে প্রতিবাদ করল, 'বিন্দুমাত্র নয়! আমাদের সংসারের সবকিছু মায়ের আদলে তৈরি। গিয়ে দেখবে কিছুই অপরিচিত ঠেকছে না।'

কথা চলল অনেকক্ষণ। শেষপর্যন্ত বিমলকান্তিকে ওরা প্রশ্ন করল, 'তুমি একা এই বাড়িতে কী করে থাকবে? কার সঙ্গে কথা বলবে? রান্নার লোক কামাই করলে কী খাবে? তুমি কখনও রান্নাঘরে ঢোকনি। যদি অসুখ করে কে তোমাকে দেখবে?'

বিমলকান্তি হাসলেন, 'রান্নার লোক কামাই করলে হোম ডেলিভারিকে ফোনে খাবার দিতে বলব। অসুস্থ হলে নার্সিংহোমে চলে যাব।'

বড়মেয়ের গলা বুঁজে এল, 'এভাবে তুমি বলতে পারলে?'

এবার হাল ছেড়ে দিলেন বিমলকান্তি, 'বেশ! তোদের ইচ্ছে মেনে নিলাম কিন্তু এই বাড়ির কী হবে?'

ছোটমেয়ে বলল, 'আপাতত তালা বন্ধ থাক।'

বিমলকান্তি বললেন, 'সম্পর্ক এবং বাড়ি ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর সল্টলেকে চোরের সংখ্যা প্রচুর। খালি বাড়ি দেখলে ওরা দু-হাত তুলে নাচবে।'

বড়মেয়ে বলল, 'তাহলে ভাড়া দিয়ে দাও।'

বিমলকান্তি বললেন, 'ভাড়া দিলে সমস্যা বাড়বে। বাড়ির সমস্যা হলে আমাকে জানাতে পারবে না ভাড়াটে। জানালেও আমি তো ওদেশে থেকে সুরাহা করতে পারব না। তা ছাড়া নিয়মিত ভাড়া আমার হয়ে কে নেবে?'

'তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবে।' ছোটমেয়ে বলল।

'যদি না দেয়?' বিমলকান্তি মাথা নাড়লেন।

এবার বড়মেয়ে বলল, 'এত ঝামেলা করে কী লাভ? বাড়িটা বিক্রি করে দাও।'

'বিক্রি?' চোখ তুললেন বিমলকান্তি।

'হ্যাঁ। দ্যাখো বাবা, তুমি বলবে এটা মায়ের ইচ্ছেয় হয়েছিল। একটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। যার জন্যে হয়েছিল সেই মানুষই যখন চলে গেল তখন ওসব ভাবার কোনও কারণ নেই।' বড়মেয়ে বলল, 'তোমার জামাই বলল, এই বাড়ির দাম এখন অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।'

'দেখি। একটু ভাবি।' বিমলকান্তি মাথা নাড়লেন।

একটু বাদে পরিচিত একজন অ্যাটর্নিকে ফোন করলেন বিমলকান্তি। ভদ্রলোকের নাম রতু মুখার্জি। শ্রাদ্ধে এসেছিলেন। রতুবাবুকে মেয়েদের ইচ্ছের কথা জানালেন।

রতুবাবু হাসলেন, 'দাদা, আমরা যারা সল্টলেকে বাড়ি করেছি তাদের এই সমস্যায় পড়তেই হবে। হয় স্বামীকে নয় স্ত্রীকে। কিন্তু আপনার জামাই একটু ভুল বলেছেন।'

'কীরকম?'

'সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আপনি লিজে পাওয়া জমি বিক্রি করতে পারেন না। ফলে ওই জমির ওপর তৈরি বাড়িও সরাসরি বিক্রি করতে পারছেন না।'

'সে কি! এই বাড়ি আমার টাকায় তৈরি। প্রয়োজনে বিক্রি করতে পারব না?'

'পারবেন। বাড়ি আপনি বিক্রি করতে পারবেন কিন্তু জমি ছাড়া।'

'জমি ছাড়া বাড়ি কী করে বিক্রি করব?'

'ওইটাই তো ফ্যালাসি।'

'কী বলছেন রতুবাবু! আমাদের পাড়ার তিনটি বাড়ি অবাঙালিরা কিনেছে।'

'সরকার প্রথম দিকে কিছু জমি সরাসরি বিক্রি করেছিল। তাদের মালিকের সেই জমি বাড়ি বিক্রি করতে বাধা নেই। কিন্তু লিজের জমিতে তৈরি বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে রেজিস্ট্রি হবে না। সরকার ট্যাক্স নেবে না। কিন্তু আইন যেখানে কড়া সেখানে ফাঁকও তৈরি হয়। যিনি আপনার বাড়ি নেবেন তিনি আপনাকে একশো বছরের জন্যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে সেই ভাড়ার টাকা দিয়ে দখল নিতে পারেন। সরকারের আপত্তি নেই। আপনি গিফ্‌ট করে দিতে পারেন ব্ল্যাকে টাকা নিয়ে। তবে সেই গিফ্‌ট কার্যকর হবে আপনি মারা গেলে। সরকারের আপত্তি নেই। আপনি পাওয়ার অফ অ্যার্টনি দিতে পারেন সারা জীবনের জন্যে, সরকারের আপত্তি হবে না। কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন না। যারা কিনছে তারা এইভাবে মালিক হচ্ছে।' অ্যার্টনি বললেন, 'ফলে ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত বাড়িওয়ালা তার থেকে অনেক কমে দিতে বাধ্য হচ্ছেন?'

'কিন্তু এটা তো বেআইনি ব্যাপার।' বললেন বিমলকান্তি।

'অর্ধেক আইনি। আপনি একজনকে একশো বছরের জন্যে ভাড়া দিতেই পারেন। ইচ্ছে করলে কাউকে বাড়ি দান করতে পারেন।'

'কিন্তু দান করলেই সে মালিক হবে না, তাই তো বললেন?'

'হ্যাঁ। আপনার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

মেয়েরা চলে গেল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না বিমলকান্তির কোনও অধিকার নেই ওই বাড়ি সরাসরি বিক্রি করার। জামাইরা দলিল দেখল। তাদের মুখও গম্ভীর হল। ছোটমেয়ে বলল, 'রতুবাবু যেমন বলছেন তেমন করো। সবাই তো তাই করছে। আইন নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা গিয়েই স্পনসরশিপ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েরা চলে গেলে রতুবাবুকে ওদের ইচ্ছে কথা জানালেন বিমলকান্তি।

পরের রবিবার সকালে রতুবাবু দুজনকে নিয়ে দেখা করতে এলেন। লোকদুটো পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখে বলল, 'আপনার কাজের লোক নেই?'

'আজ আসেনি।' বিমলকান্তি বিমর্ষমুখে জানালেন।

রতুবাবু উদ্বিগ্ন হলেন, 'তাহলে?'

'হোম ডেলিভারির খাওয়ার খাব।'

রতুবাবু এবার লোকদুটোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল বাড়ি?'

'ভালোই। বেশ যত্ন করে তৈরি হয়েছে।' একজন বলল।

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'দামটা—?'

বিমলকান্তি জামাইয়ের মুখ মনে করে বললেন, 'পঞ্চাশ।'

'অসম্ভব'। প্রথমজন যেন আগুনের ছোঁয়া খেল, 'অসম্ভব'।

দ্বিতীয়জন বলল, 'দেখুন, বাড়ি নিচ্ছি কিন্তু কিনতে পারছি না। কী বিরাট রিস্ক। আপনাকে

তো কোনও রিস্ক নিতে হচ্ছে না। আমাদের টাকা যে-কোনও মুহূর্তেই জলে চলে যেতে পারে।' বিধাননগরের চেয়ারম্যান তো হুমকি দিয়েছেন বেআইনিভাবে নেওয়া বাড়ির লিস্ট বানাবেন।

মিইয়ে গেলেন বিমলকান্তি, 'তাহলে?'

'দেখুন। আমরা ভদ্রলোক। পঁচিশের বেশি পারব না।'

অনেক বলার পর রতুবাবুর কথা মেনে ঠিক হল আঠাশ। মাসে দু-হাজার টাকা ভাড়া হলে বছরে চব্বিশ হাজার, একশো বছরে চব্বিশ লাখ। এটা চেকে দেওয়া হবে। বাকিটা ক্যাশে। হঠাৎ দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বয়স কত?'

'বিরাশি হতে চলল।'

'বিরাশি। আপনার বাবা কত বছরে গত হয়েছেন?'

'আশিতে।'

'তাহলে ঠিক আছে।'

'মানে?'

'আপনি মারা না গেলে তো উইলের প্রবেট নিতে পারব না। হে-হে। খারাপ শোনাচ্ছে। কিন্তু যা সত্যি তা বলাই ভালো।'

খুব রাগ হয়ে গেল বিমলকান্তির, 'যদি আমি একশো বছর বেঁচে থাকি? নীরদ সি চৌধুরী তো বেঁচে ছিলেন।'

'যাঃ। আপনি এত নিষ্ঠুর হতে পারবেন না।' লোকটি হাসল।

লেনদেন সইসাবুদ চুকে গেল। মেয়েদের পাঠানো কাগজ এসে গেছে। দরখাস্ত করতেই দুই কনস্যুলেট ভিসা দিয়ে দিলেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে দ্বিধায় ছিলেন বিমলকান্তি। এই সময় রতুবাবুর ফোন এল, 'কবে যাচ্ছেন?'

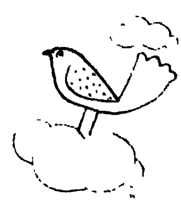
'দেখি।'

'আর দেখবেন না। নেক্সট ফ্লাইট ধরুন। আমি টিকিট করিয়ে দিচ্ছি।'

'হঠাৎ?'

'আপনার একশো বছর বাঁচার ইচ্ছেয় ওরা ভয় পেয়েছে। আমার এক ক্লায়েন্ট গতকাল খুন হয়ে গেল বাহাত্তরে পা দিয়ে। তিনিও গিফ্‌ট করেছিলেন। যারা নিয়েছিল তাদের আর মালিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। তাই বলছিলাম আপনার এদেশে না থাকাই ভালো।'

রতুবাবুর কথায় শিড়দাঁড়া কনকন করে উঠল বিমলকান্তির। এই বাড়ি দান করে খুন হওয়ার চেয়ে বিদেশে গিয়ে মরা ঢের ভালো।



স্বপ্ন নম্বর একশো বাইশ

প্রায় আঠারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজ শেষ রাত্রে সাফল্য অর্জন করলেন বিকাশকলি। ঘুমের মধ্যেই তিনি আনন্দে এমন লাফিয়ে উঠলেন যে খাটের বাজুতে গোড়ালি আছড়ে পড়ল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে বসলেন তিনি। গোড়ালি চেপে ধরে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ বাদে নড়ার চেষ্টা করলেন খাট থেকে। গোড়ালি চিনচিন করে

উঠল 'যা বাবা, ভাঙেনি! ভাঙলে সোচ্চারে জানান দিত।' কিন্তু হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরের দরজা খুলে একবার ভাবলেন স্ত্রী এবং ছেলেকে ডেকে তোলা যাক। বলা যাক আমি পায়ে খুব চোট পেয়েছি। তখনই জানতে চাইবে, কী করে চোট পেলে। স্বপ্নে একটা দারুণ কাণ্ড করে পা ছুঁড়েছিলাম, একথা বললে ছেলে হেসে ঘরে ফিরে যাবে। বউমা বলবেন, 'তোমার বাবা একটি কচি খোকা।' স্ত্রী বলবেন, 'মরণ!'

অতএব কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে আধবালতি জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট পাঁচেক। এই দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিনি কিছু সারসত্যি উপলব্ধি করলেন। একটা বিশেষ বয়সে পৌঁছাবার পরে পুরুষ মানুষের কোনও বন্ধু থাকে না, ভাই-বোনের মধ্যে যে সম্পর্ক তার থেকেও দূরের সম্পর্ক হয়ে যায় স্ত্রীর সঙ্গে। স্বামী বুড়ো হলে স্ত্রীর মুখ খুললেই ঠেস-দেওয়া কথা, বিদ্রুপ ইত্যাদি গলগল করে বেরিয়ে আসে। অথচ এই স্ত্রী বিয়ের পর থেকে দশ বছর কি মধুর ছিল। তারপরের দশ বছর ছিল চাটনির মতো। কখনও খুব টক, কখনও তিত্‌কুটে। তারপর কখন কেমন করে বুনো ওল হয়ে গেল কে জানে! ছেলেটার দিকে তাকালেই মেজাজটা গরম হয়ে যায়। একটা যুবক একইসঙ্গে মায়ের খোকা আর স্ত্রীর হাতা কী করে হতে পারে, ভেবে পান না বিকাশকলি। পড়াশুনায় ভালো তাই ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি পেয়েছে। সেই সুবাদে দারুণ সুন্দরী বউ। সেখানেও লেঙ্গি খেয়েছেন বিকাশকলি। প্রেমে পড়ার কিছুদিন পরে ছেলে এসে তাঁকে বলল, 'বাবা আমি, আমি, বুঝতেই পারছ।'

'কিছুই পারছি না। তুমি কী করেছ?' বিকাশকলি অবাক।

'একটা প্রমোশন হয়েছে। আর পয়া, মানে পয়াকে কথা দিয়েছি।'

'পয়া? সে কে? কী কথা দিয়েছ?'

'কি কথা দিয়েছি বুঝতে পারছ না। ওকে তোমার বউমা করব।'

'অ। কে পয়া?'

'আমার কলিগ। তবে অন্য ব্রাঞ্চে কাজ করে।'

'তোমার জননী জানেন!'

'মা খুব খুশি। বলল, যেমন মা চেয়েছিল পয়া তেমনি। কিন্তু—।'

'এরপরে আবার কিন্তু আসছে কেন?'

'পয়ার খুব আপত্তি। ও বলেছে তোমার বাবাকে প্যান্ট পরতে হবে।'

'অ্যাঁ! আমি কী পরবো তা তোমার বউ ঠিক করবে?'

'না না। যতক্ষণ ও বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ তুমি প্যান্ট পরে থেকো, ও বেরিয়ে গেলেই আবার ধুতি।' বুদ্ধি দিল ছেলে।

'অসম্ভব, আমি কখনও প্যান্ট পরিনি। ধুতি বাঙালির প্রধান পোশাক। আজ বাঙালি তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। আমি চরিত্রভ্রষ্ট হতে পারব না।'

'তার মানে তুমি পয়ার অনুরোধ রাখবে না।'

'কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'তার মানে তুমি চাও না এই বিয়ে হোক।'

'আমি ধুতি না-খুললে যদি তোমার বিয়ে না-হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই। এবার আমাকে শান্তিতে কাগজটা পড়তে দাও।'

তবু বিয়ে হয়েছিল। সেই রাত্রেই স্ত্রী ঘরে ঢুকেছিল, 'তুমি খোকার বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছ? কী করে ভাবলে এ-বাড়িতে তুমি যা চাইবে তাই হবে?'

'আমি কিছুই ভাবিনি।'

'ভেবেছ।'

'ভেবেছি?'

'হ্যাঁ। খোকা পছন্দ করে বিয়ে করলে আমি মেনে নেব না তা তুমি ভেবেছ' তাই আমার সঙ্গে জোট বাঁধতে চেয়েছ। কিন্তু তুমি ডালে ঘোরো আমি ঘুরি পাতায়, আমি খোকাকে অনুমতি দিয়েছি। দেখি তুমি কী করো!' স্ত্রী চলে গিয়েছিল ঘর থেকে।

কিছুই করেননি। করার মতো ক্ষমতা তাঁর যে নেই একথা এ-বাড়ির সবাই জানে, ছেলের বউ বাড়িতে এল। সুন্দরী কিন্তু লবঙ্গলতিকা নয়। ধুতির মায়া ছাড়লেন না তিনি। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালেও বাড়ির ছাদে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বউমা এলেন।

'আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাই না।'

বউমা বললেন।

'কেন? আমি তো আমার ঘরেই থাকি।'

'জানি। আসলে যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকি ততক্ষণ আপনার ছেলে আর ওর মা এমনভাবে আটকে রাখে যে সময় বের করতে পারি না।'

'ও।'

'আপনাকে একটা কথা বলব। আমরা বাঙালিরা নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে কী উদাসীন হয়ে যাচ্ছি দিন-দিন, নিজেদের সংস্কৃতিও ভুলছি। এই যেমন ছেলেদের ধুতি পরা, এটা ছিল একান্ত আমাদেরই। অথচ এখন রাস্তায় গেলে এক হাজার লোকের মধ্যে একজনকে মাঝে-মাঝে ধুতি পরা অবস্থায় দেখা যায়। তাই এ-বাড়িতে এসে আপনাকে দেখে আমার মন ভরে গিয়েছে। আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতেই ছাদে চলে এলাম। বউমা বললেন।

চমকে উঠেছিলেন বিকাশকলি, 'সে কি! এই যে শুনলাম তুমি ধুতি পছন্দ করো না।'

'আমি? কে বলেছে আপনাকে?'

'বিয়ের আগে তোমার পতিদেবতা বলেছে।'

'উঃ। ও এত গুল মারে যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বুঝতে পারি না, এগুলো বিয়ের পর ধরা পড়ছে।' মাথা নাড়লেন বউমা।

'এই যে শুনলাম বাড়িতে আমাকে ধুতি পরা অবস্থায় দেখলে তুমি বিয়ে করবে না?'

'আমিও শুনেছি আপনার ছেলে আমাকে বিয়ে করুক আপনি চাননি!'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'প্রথমে আপনার ছেলে, তারপর তার মা।'

'উঃ। এই ভদ্রমহিলা, থাক।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি, থাক। এখন থেকে আমার মুখে কিছু না শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনার ছেলের মুখে শুনলে তো নয়ই।'

'তুমিও, অন্তত স্বামীর মায়ের মুখে শুনলে তো নয়ই।'

হাসলেন বউমা, 'আচ্ছা!' বউমা নেমে গেলেন নিচে।

আজ রাত্রে ভেজা গোড়ালি তোয়ালেতে মুছতে-মুছতে বিকাশকলি ব্যথাকে উপেক্ষা করলেন। এরকম জব্বর আবিষ্কারের কথা কাউকে না জানিয়ে থাকা যায়? কাকে জাগাবে? ও ঘরে ছেলের মা কুম্ভকর্ণ হয়েছেন। নাসিকা প্রবলভাবে আলোড়ন তুলছে। এ-পাশের ঘরে কোনও শব্দ নেই। হ্যাঁ, বউমাকে জানানো যায়, খুবই রুচিশীলা মেয়ে। কিন্তু ছেলের ঘুম না ভাঙিয়ে বউমাকে কী করে জাগাবেন? নাঃ ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে। শ্বাস ফেললেন বিকাশকলি।

আঠারো বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর গবেষণার বিষয় হল স্বপ্ন। কোনও-কোনও মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্ন দ্যাখে। আবার এমন মানুষ আছেন যিনি গোটা জীবনে একটিও স্বপ্ন দ্যাখেননি। এঁদের জন্যে মায়া হয় বিকাশকলির।

অল্পবয়স থেকেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই স্বপ্ন দেখতেন। অদ্ভুত সব স্বপ্ন যার কোনও মা-বাবা নেই। ঘুম ভাঙার পর তার অধিকাংশই স্মরণ করতে পারতেন না। স্বপ্নে যদি গোলাপ ফুল দেখে থাকেন তাহলে তার রং নিয়ে মাথা ঘামাননি। ঘুম ভাঙার পর ভেবে পেতেন না ফুলটার রং কী ছিল। এভাবেই চলছিল। বিয়ের 'পর স্বপ্ন দেখা কমেছিল। স্বপ্ন দেখলেই তিনি নাকি কথা বলার চেষ্টা করতেন এবং তখন তাঁর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের হত। সেই আওয়াজে পাশে শোওয়া স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যেত, চেঁচামেচি করে জানিয়ে দিত তাঁকে। তারপর শুরু হত বকুনি। তোমায় এত বোবায় ধরে কেন? আর কারও তো এমন হয় না। এটা একটা রোগ। এই রোগ চেপে বিয়ে করতে লজ্জা করেনি?'

শেষে আলাদা শোওয়ার ঘর হল দুজনের। পরদিন স্ত্রী বললেন, 'এত আরামে বিয়ের পর কখনও ঘুমাইনি।'

সেটা আঠারো বছর আগের কথা। একলা ঘুমানোর কারণে স্বপ্নগুলো টিভির ছবির মতো দ্রুত আসতে থাকল। এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলেন, স্ত্রী ঝাঁটা কিনছেন, কোনওটাই পছন্দ হচ্ছে না। দেখতে-দেখতে বিকাশকলি মনে-মনে ঘুমের ঘোরেই বললেন, 'দূর এই স্বপ্নটা দেখব না।' সঙ্গে-সঙ্গে রিমোটে চ্যানেল পালটানোর মতো স্বপ্ন পালটে গেল। একটা দারুণ স্বপ্নর বাগানে অপরূপা যুবতী ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। কিন্তু একি পোশাক? ওপরে খুব দামি কাঁচুলি আর নিচে রঙিন ঘাগরা। এরকম পোশাক তো মুনিদের আমলে মেয়েরা পরতেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে অপরূপা বললেন, 'বাঃ, কী সুন্দর পোশাক। ওটাকে কী বলে?'

'আজ্ঞে ধুতি। শান্তিপুরের। আপনি?'

'আমি তিলোত্তমা। স্বর্গ থেকে বেড়াতে এসেছি।'

'এটা কোন যুগ?' নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিকাশকলি।

'কেন? সত্যযুগ। পৃথিবীতে আসার পর আপনিই প্রথম পুরুষ যাকে আমি দেখলাম। হে আর্যপুত্র, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।'

'গ্রহণ? আমি?' নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না এবার।

'হ্যাঁ ধীমান। শচীমাতা আদেশ দিয়েছেন, আমি এক শর্তে পৃথিবীতে যেতে পারি এবং শর্ত পূর্ণ না হলেই স্বর্গে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

'কী শর্ত?'

'প্রথম যে পুরুষকে আমি দেখব তাকেই পতি হিসেবে বরণ করতে হবে। খুব ভয়ে ছিলাম, যদি কুৎসিত অথবা বৃদ্ধ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়! কিন্তু আমার মন এখন আনন্দে উজ্জ্বল। আপনার মতো সুপুরুষকে এখানে পাব ভাবতে পারিনি। আপনার পরনে, কী যেন বললেন, ধুতি, আচ্ছা কী সুন্দর। আসুন, এগিয়ে আসুন।'

'কিন্তু, আমি যে বিবাহিত।'

হাসল তিলোত্তমা, 'তাতে কী হয়েছে? বীর্যবান পুরুষ তো একাধিক স্ত্রীর সাথি হতে পারেন, রাজা দশরথের তিন পত্নী, অর্জুনের তো কথাই নেই, আপনার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?'

'না, তা নয়। একদমই নয়। তুলনাই চলে না।'

'তাহলে দ্বিধা কেন? আপনার নাম জানতে পারি?'

'বিকাশকলি?'

'বাঃ, আপনি আমাকে তিলু বলে ডাকবেন। আর আমি ডাকব 'বিকু' বলে।

তিলোত্তমা দু-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে ডাকল, 'এসো, বিকু।'

সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় বিকট শব্দ। ঘুম ভেঙে গেল বিকাশকলির। কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে?'

তখন পুত্র আট-নয় বছরের। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে বোবায় ধরেছে, মা বলল পাশ ফিরে শুতে।'

যাচ্চলে। এত রাগ হচ্ছিল তাঁর। কিছুক্ষণ সময় নিলেন রাগ হজম করতে। তারপর পাশ ফিরে শুলেন। ঘুম এল। এক স্বপ্ন। এবার একটা সাপের ব্যাং ধরার দৃশ্য দেখলেন। কোথায় তিলোত্তমা!

কুড়ি বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন বিকাশকলি। এরমধ্যে কয়েক হাজার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। প্রতিটি স্বপ্নের ডিটেলস পরদিন খাতায় লিখে রেখেছেন। সারাদিন ধরে তিলোত্তমাকে ভেবেছেন যাতে রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পায়। কোথায় কী! হ্যাঁ, প্রতিরাত্রেই স্বপ্ন দ্যাখেন তিনি। কখনও ফুলের, কখনও পাখির, মৃত আত্মীয়রাও বারবার আসেন স্বপ্নে, কিন্তু তিলোত্তমার দেখা নেই। স্বপ্নের খাতাটা বেশ মোটা হয়ে গেছে, প্রতিটি স্বপ্নের আলাদা নম্বর দিয়েছেন। তিলোত্তমার স্বপ্ন একশো বাইশ নম্বরে।

রোজ রাত্রে শোওয়ার সময় একশো বাইশ নম্বরকে স্মরণ করেন বিকাশকলি। কিন্তু কোনওভাবেই স্বপ্নটা ফিরে আসে না। আজ রাত্রে হঠাৎ একটা সুন্দর ফুলের বাগান স্বপ্নে দেখতে পেলেন। দেখেই মন চঞ্চল হল, খানিকটা এগোতেই হাড় জিরজিরে এক সাধুকে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতে দেখলেন। ওরকম কুৎসিৎ, কঙ্কালপ্রায় সাধুকে দেখতে তাঁর একটুও ইচ্ছে করল না। মনে-মনে বললেন, বাগানের অন্য প্রান্তে চলে যাই। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যেখানে এলেন সেখানে একটা সরোবর চোখে পড়ল। মৎস্যকন্যারা খেলা করছিল, তাঁকে দেখামাত্র ওরা ডুব দিয়ে অদৃশ্য হল।

মন খারাপ হল না তাঁর। মনে-মনে একশো বাইশ-একশো বাইশ বলতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখলে অপরূপা এক যুবতী তাঁর দিকে পেছন ফিরে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'তিলু তিলু, তোমাকে শেষপর্যন্ত দেখতে পেলাম।' আর আনন্দটা এত উদ্দাম ছিল যে লাফিয়ে উঠেছিলেন ঘুমের ঘোরে। খাটের বাজুর ওপর পড়ল গোড়ালি, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়েও খোঁড়াতে হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কোনওই দুঃখ ছিল না বিকাশকলির। নিশ্চয়ই হাড় ভাঙেনি। ভাঙলে হাঁটতে পারতেন না। অতএব ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে নিজের খাটে বসে তিনি হাঁটুর ওপর তবলা বাজালেন। শেষপর্যন্ত তিনি নিজের ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারছেন? পৃথিবীর কেউ পেরেছে? কয়েকদিন আগে হঠাৎ চৌরঙ্গির ফুটপাথে একটা বই দেখে কিনে ফেলেছিলেন বিকাশকলি, বইটার নাম 'ড্রিম অ্যান্ড রিয়েলিটি' লেখকের নাম ক্লিন গ্র্যান্ট। মানুষ কত রকমের স্বপ্ন দ্যাখে, কেন দ্যাখে, বাস্তবের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার, এ-নিয়ে দারুণ লেখা। কিন্তু লেখক বারংবার বলেছেন, কেউ তার ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারে না। দেখলে সেটা রেকর্ড হবে।

গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। কিন্তু মুশকিল হল, তিনি যে ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারেন সেটা প্রমাণ করবেন কী করে? মিস্টার গ্রান্ট অবশ্য লিখেছেন, স্বপ্ন দেখার সময় মানুষ কী ধরনের আবেগে আক্রান্ত হয় তার গ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায়। তাই যদি হয়, একই গ্রাফ কয়েকবার স্ক্রিনে পড়লে বোঝা যাবে ঘুমন্ত মানুষ একই স্বপ্ন দেখছেন। তাহলেই তো প্রমাণিত হয়ে যাবে। কাল সকালেই তিনি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর কর্তাদের চিঠি লিখে দাবী জানাবেন।

সকালে দেখা গেল গোড়ালির কাছটায় একটু ফুলেছে। পেইন কিলার খেয়ে ব্যথাটা গেলেও খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কাজের মেয়ে গিন্নিকে খবরটা জানাল। গিন্নির গলা কানে এল, 'হবে না যত বয়স হচ্ছে তত ভীমরতি বাড়ছে! নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে কাউকে লাথি মেরেছে। বেশ হয়েছে। এরপর যদি স্বপ্ন দেখে বোবা চিৎকার বন্ধ হয় তাহলে বাঁচি।'

বউমার নরম গলা কানে এল, 'একবার ডাক্তার দেখালে হত না? যদি ভেঙে গিয়ে থাকে।'

'ভাঙবে না, ভাঙবে না। ওই হাড় ভাঙার নয়। খোকার যখন তিন বছর বয়স তখন আমার ধুম জ্বর এল ভর দুপুরে। উনি তখন অফিসে, জ্বরে অন্ধকার দেখছি আর ভাবছি বিকেলে অফিস থেকে এলে আমার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই ডাক্তার ডেকে আনবে, তিনি এলেন রাত দশটায়, অফিস

ক্লাবে তাস পিটিয়ে। এসেই বাথরুমে ঢুকে গেলেন। তারপর জ্বর হয়েছে শুনে বললেন, 'বাড়িতে তো জ্বরের ওষুধ আছে, খাওনি? আজকাল এরকম জ্বর খুব হচ্ছে।' বোঝো! কাকে নিয়ে এতদিন ঘর করছি।' গিন্নির গলা।

দুপুরের পর থেকে ব্যথা কমে গেল। হাঁটাটাও অনেক স্বাভাবিক। পা-কে বিশ্রাম দিলেন বিকাশকলি।

রাতের খাওয়া শেষ করে দরজা বন্ধ করলেন তিনি। সন্ধের পর মনটা ভালো হয়েছিল। অফিস ফেরত বউমা এসেছিলেন ঘরের দরজায়। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখন কেমন আছেন?'

'ঠিক আছি।'

'ব্যথা নেই তো?'

'না-না।'

বউমা চলে গিয়েছিলেন।

আজ ঘুমাবার আগে মনে-মনে একশো বাইশ নম্বর স্বপ্নটাকে দেখতে চাইলেন বিকাশকলি। পাশ ফিরে ঘুমোলে স্বপ্ন দেরিতে আসে বলে চিত হয়ে শুলেন। মিনিট দেড়েকের মধ্যে ঘুম এসে গেল। আর তারপরেই স্বপ্ন। আর, কী আনন্দ! সেই সুন্দর ফুলের বাগানটায় হাঁটছেন তিনি। তার মানে ইচ্ছে করলেই যা চাইবেন তাই দেখতে পাবেন স্বপ্নে। আরে মাটির কলসির ঘষা লেগে পুকুর পাড়ের বাঁধানো চাতালে গর্ত হয়ে যায়, আঠারো বছরের চেষ্টায় কি এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন না।

বাঁক নিতেই দেখতে পেলেন তাকে, ফুলে ঘ্রাণ নিচ্ছে। পরনে কাঁচুলি আর ঘাগরা। কিন্তু মুখ মাথা ওড়নায় ঢাকা। আকাশি নীল ওড়না।

আর একটু এগিয়ে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকাল তিলোত্তমা, কিন্তু সামনে ঘুরে দাঁড়াল না। মিহি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন।'

আবছা মুখ দেখা যাচ্ছে। বিকাশকলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সেই প্রথম দেখা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছ তিলু?'

'কী করব! আর কারও দিকে তাকালেই স্বর্গে ফিরে যেতে হবে যে।' তিলোত্তমা বলল, 'বিকু আমাকে গন্ধর্ব মতে গ্রহণ করো।'

'সেটা কীভাবে করব?' হৃদয় শরীর রোমাঞ্চিত হল বিকাশকলির।

'ফুল-পাখি-আকাশকে সাক্ষী রেখে। আমি ঘাসের শয্যা পেতে রেখেছি।

তিলোত্তমা এগিয়ে এল, 'আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছি না প্রিয়, ধীরে-ধীরে ওড়না সরিয়ে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করল তিলোত্তমা। কিন্তু ওড়না সরে যেতেই চমকে উঠেছিলেন বিকাশকলি। তিলোত্তমার মুখটা বউমার মুখ হয়ে গেছে কী করে?' অবিকল বউমা। তিনি চিৎকার করলেন, 'তুমি, তুমি কে?' তিলোত্তমা বলল, 'আঃ বিকু, আমি তিলোত্তমা।'

'মা তুমি মা।' তিন হাত পিছিয়ে গেলেন বিকাশকলি।

'কি? আমাকে মা বলে ডাকলে! হায়, আমাকে ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। যাওয়ার আগে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি এ-জীবনে তুমি আর কখনও স্বপ্ন দেখতে পাবে না।'

লাফিয়ে উঠলেন বিকাশকলি। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা, মাটিতে শুয়ে গোঙাতে-গোঙাতে বুঝলেন এবার সত্যি তাঁর হাঁটুর হাড় ভেঙে গেছে।

পিতা-পুত্র উপাখ্যান

ডুডুয়ার সতীশ রায় মুখের ওপর বলে দিলেন, 'দূর মশাই, খাঁটি সোনার গয়না হয় না, তার সঙ্গে ভেজাল মেশাতে হয়। তবেই সেটার চেহারা খোলে। তেমনি মেয়েমানুষের স্বভাবে যদি একটু নষ্টামির ঝোঁক না থাকে তাহলে তাকে আলুনি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারব না। কি বল হে?'

কথা হচ্ছিল সতীশ রায়ের বাগানের বেঞ্চিতে বসে। পাশে বয়ে যাচ্ছে ডুডুয়া নদী। পেছনে সতীশ রায়ের দোতলা বাড়ি। সামনে, বাগানের শেষে কিছুটা হাঁটতেই ন্যাশনাল হাইওয়ে। যাঁরা শুনছিলেন তাঁদের দুজন সতীশের স্তাবক, তৃতীয়জন একজন নামকরা ঘটক।

স্তাবকরা মাথা না নেড়ে বলল, 'তা ঠিক।'

ঘটক যজ্ঞেশ্বর মুখুজ্যে হাত কচলালেন, 'আজ্ঞে কোন বাপ বলবে যে তার মেয়ের স্বভাবে একটু নষ্টামি করার ঝোঁক আছে?'

'বাপ না বলুক মা বলবে, আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা বলবে আর কেউ যদি না বলে মেয়ের দিকে তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন। তা যদি না পারেন তাহলে আপনি কীসের ঘটক?' মুখ বন্ধ করলেন সতীশ রায়।

যজ্ঞেশ্বর বিনীত গলায় বললেন, 'এরকম পাত্রীর কথা আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বলেনি। আপনি কেন এমন পাত্রীকে পুত্রবধূ করতে চাইছেন—!'

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন সতীশ রায়, 'আমার ছেলেকে দেখেছেন? শান্ত শিষ্ট। দেখলেই বোঝা যায়, এক ফোঁটা ব্যক্তিত্ব নেই। তা তার বউ যদি ঘোমটা মাথায় গুড়ের বস্তা হয়ে বসে থাকে, লজ্জায় নেতিয়ে থাকে সর্বক্ষণ তাহলে ছেলেটা কখনও মানুষ হবে? আমি চলে গেলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে সব। ওহে, ঘটকমশাইকে বলে দাও লোকে আমাকে কী বলে?'

একজন স্তাবক বলল, 'ডুডুয়ার সতীশ রায়।'

দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, 'সতীশ রায় ছাড়া এই ডুডুয়া গ্রামকে ভাবা যায় না।'

যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন, 'দেখি চেষ্টা করে।'

'তা বলে এমন কোনও সম্বন্ধ আনবেন না যার বংশের কোনও পরিচয় নেই।'

'এ তো একেবারে সোনার পাথরবাটি!' বিড়-বিড় করলেন যজ্ঞেশ্বর।

'কত উঁচু বংশে ভদ্র পণ্ডিত বাবার সন্তান লম্পট যদি হতে পারে তবে সেরকম পরিবারের মেয়ের একটু নষ্টামি করার ঝোঁক থাকবে না কেন?'

'ওই ঝোঁক কথাটাই যে গোলমালে ঠেকছে।'

'জলে নেমেছে কিন্তু বেণি ভিজায়নি। হল? যান।' সতীশ রায় হাত নাড়লেন।

পনেরো দিনের মাথায় হাসিমুখে ফিরে এলেন যজ্ঞেশ্বর মুখার্জি। বিকেলের চা খাচ্ছিলেন সতীশ রায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সন্দেশ?'

'একেবারে নলের গুড়ের জল ভরা তালশাঁস।' যজ্ঞেশ্বর বললেন।

'তাই নাকি? তাই নাকি? ওরে কে আছিস, ঘটকমশাইকে চা দে।'

'একেবারে আপনাদের পালটিঘর। মালবাজারের হরিদাস সেনের নাতনি। কী রূপ-কী রূপ। মুখে খই ফুটছে। বাপ মরা মেয়ে। হরিদাসবাবু নাতনিতে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। তিন-তিনটি পাত্রপক্ষ ওর কথা শুনে কেটে পড়েছে।' যজ্ঞেশ্বর জানালেন।

'কেন? খিস্তি খেউড় করে নাকি?'

'না-না। শেষ পাত্রপক্ষ ওকে যা-যা জিজ্ঞাসা করেছে তার উত্তর সব ঠিকঠাক দিয়েছিল সে। পাত্রপক্ষ খুব খুশি। হঠাৎ মেয়ে বলে বসল, 'আচ্ছা, আপনাদের ছেলে ম্যাদামারা নয় তো?' ব্যস, দুধে চোনা পড়ল।'

'বাঃ। চমৎকার। বয়স কত?' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

'একটু বেশি। এই ধরুন তেইশ।'

'ধরব কেন? বার্থ সার্টিফিকেট না থাক কুষ্ঠি আছে তো?'

'তা নিশ্চয়ই আছে।'

'বেশ, ওদের বলুন ছেলেকে যদি দেখতে চায় তাহলে দিন ঠিক করে চলে আসতে।'

'না-না। ওরা ছেলে দেখতে চান না।' যজ্ঞেশ্বর বললেন।

'কেন?'

'হরিদাসবাবু বললেন, ডুডুয়ার সতীশ রায়ের ছেলেকে দেখতে যাওয়ার দরকার নেই।'

'মানে বুঝলাম না।' মাথা নাড়লেন সতীশ রায়।

'আজ্ঞে আপনার ছেলে যখন, তখন দেখার দরকার আছে বলে মনে করেন না ওঁরা।'

'ওঁরা? এই বললেন হরিদাসবাবু কথাটা বলেছেন।'

'হ্যাঁ। উনিই বলেছেন। তবে বলার আগে অন্দরমহলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে যখন বললেন কথাটা তখন মনে হল বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করেই বলেছেন। বাড়িতে ওঁর স্ত্রী আছেন, বিধবা মেয়ে, মানে পাত্রীর মা আছেন।'

'হুম। বাড়ির মহিলারা আমার নাম জেনে বসে আছেন? কেন? আমি কি খুনি না ডাকাত? আমার চাটুকারদের আপনি হার মানালেন।'

যজ্ঞেশ্বর মুখার্জি নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাদের আজ দেখছি না?'

'ছেলেকে পাঠিয়েছি সদরে, উকিলবাড়িতে। সে একা যাবে না। তাই ওরা সঙ্গে গেছে। তা আমরা মেয়ে দেখব কবে?' জিজ্ঞাসা করলেন সতীশ রায়।

'যেদিন ইচ্ছে। একদিন আগে বললেও চলবে। তবে তার আগে একটা সমস্যার সমধান করে নিতে হবে।' যজ্ঞেশ্বর হাসলেন।

'কী সমস্যা?'

'হরিদাসবাবু জানতে চেয়েছেন আপনার দাবি কতটা আর সেটা তিনি দিতে পারবেন কিনা। সক্ষম বোধ করলে মেয়ে দেখাবেন।'

'দাবি? দাবি তো একটাই। মেয়ের স্বভাবে একটু নষ্টামির ঝোঁক থাকতে হবে। আপনার মুখে যা শুনলাম তাতে তো দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে।' একটু চুপ করে থেকে হো-হো করে হাসলেন সতীশ রায়, 'ম্যাদামারা! আহা, অপূর্ব।'

'তাহলে তো হয়েই গেল। সামনের মঙ্গলবারে যাব বলি?'

'বলে দিন। তবে পৌঁছাব বিকেলবেলায়। সন্ধের আগেই চলে আসব। আমার মিষ্টি খাওয়া ডাক্তারের নিষেধে বন্ধ। তেতো চা এক কাপ খেতে পারি।'

*

মঙ্গলবার দুপুরের পর বেশ কিছুটা সময় সাজগোজ করলেন সতীশ রায় যাতে পাত্রের বাবার সম্মান বজায় থাকে। বাইরে গাড়ি, দুই স্তাবক এবং ঘটকমশাই অপেক্ষা করছে। তৈরি হয়ে পুত্রকে ডাকলেন সতীশ রায়, সে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

'তোমার বয়স এখন কত?'

'আজ্ঞে—।'

'বয়স জিজ্ঞাসা করছি!'

'সাতাশ বছর হতে তিনমাস দেরি আছে।'

'আজ আমি তোমার সহধর্মিণী হবে এমন একটি মেয়েকে দেখতে যাচ্ছি। যদিও জানি তুমি বিয়ের আগে তাকে দেখতে চাইবে না, তবু জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি দেখতে চাও?'

'না-না।' যেন এটা ভাবাও অন্যায়, ওর কথার ধরনে মনে হল।

'তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য কি জানো? আমি দেখতে চাইতাম।' কথা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। স্তাবকরা এবং ঘটক চাপাচাপি করে বসল ড্রাইভারের পাশে, পেছনে সতীশ রায় একা। গাড়ি ছাড়া মাত্র তিনি মাথার ওপর দু-হাত তুলে ঈশ্বরকে প্রণাম জানালেন। স্তাবকরা তাই দেখে হাতজোড় করে নুইয়ে পড়ল। তাতে স্থানসঙ্কুচিত হওয়ায় ঘটক বলল, 'এই, কী হচ্ছে কি!'

ডুডুয়া থেকে মালবাজার যেতে সময় লাগল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। পথে কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করেনি। মালবাজারে ঢোকার মুখে গাড়ি থামাতে বললেন সতীশ রায়। পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে একজন স্তাবককে দিলেন, 'হরি ময়রার দোকান থেকে আমার নাম করে রাজভোগ নিয়ে এসো। মাটির হাঁড়িতে করে আনবে।'

ঘটক বলল, 'আমি ভাবছিলাম—।'

'কী ভাবছিলে?' সতীশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'একেবারে খালি হাতে যাবেন মেয়ে দেখতে?'

'তুমি এখন কী ভাবছ?'

'আমি আর কী বলব! এইজন্যেই লোকে আপনার সুখ্যাতি করে।' যজ্ঞেশ্বর মুখার্জি বিনয়ে নুয়ে পড়ল।

হরিদাস সেনের বয়স হয়েছে। দেড়বিঘে জমির ওপর বাগানওয়ালা বাড়ি। আপ্যায়ন করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেব বলুন? চা, কফি বা ঠান্ডা কিছু?'

'আপনি আমার পিতৃতুল্য। দয়া করে আপনি বলবেন না। না, এখন নয়। সব কথা শেষ হলে এক কাপ চিনি এবং দুধ ছাড়া লিকার চা পেলেই খুশি হবো।'

'বেশ। আমার এই নাতনি মেয়ের পক্ষে। জামাই মারা গিয়েছিল দুর্ঘটনায়। তিন বছর বয়স থেকেই ও আমার কাছে আছে। এখানকার স্কুলে পড়েছে। পড়াশুনায় তেমন ভালো নয় বলে উচ্চমাধ্যমিকের পর আর পড়াইনি। তবে গৃহকার্যে অতীব নিপুণা।'

মাথা নাড়লেন সতীশ রায়। কিছুটা দূরে বসা যজ্ঞেশ্বর মুখার্জি বললেন, 'সেন মশাই, এবার নাতনিকে যদি আসতে বলেন।'

হরিদাসবাবু উঠে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন যাঁকে নিয়ে সে ডানাকাটা সুন্দরী নয়, কিন্তু খুবই সুশ্রী। পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে বলে তাকে সাজানো হয়েছে। গলায় পাউডারের দাগ। চুল বেশ সময় নিয়ে বাঁধা। তাতে তাকে একটু আড়ষ্ট লাগছে।

হরিদাস সেন বললেন, 'প্রণাম কর ওঁকে।'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। সতীশ রায় বললেন, 'থাক-থাক, প্রণাম করতে হবে না। তোমার নাম কী?'

'সুরঞ্জনা।'

'সুরঞ্জনা, তুমি ভেতরে যাও। ভালো করে মুখ ধুয়ে, বাড়ির শাড়ি পরে, খোলা চুলে চটপট চলে এসো।' সতীশ রায় বলা মাত্র মেয়ে ছুটল ভেতরে।

হরিদাস সেন বললেন, 'ওর গায়ের রং কিন্তু ধুলেও একই রকম দেখাবে।'

'আমি সেই সন্দেহে ধুয়ে আসতে বলিনি। ও সেজেগুজে সহজ হতে পারেনি বলেই বললাম। মেয়ের বাবার নাম কী ছিল?'

'জগন্নাথ বর্মন। শিলিগুড়িতে চাকরি করত। যাক গে, আপনার ডুডুয়াতে আমার এক ভাইপোর বাড়ি ছিল। সেসব বিক্রি করে সে কুচবিহার চলে গেছে।'

'মধুর কথা বলছেন? মধুসূদন সেন।'

'বাঃ। মধুকে আপনি চেনেন?'

'চিনব না। ওর জমি-বাড়ি তো আমিই বিক্রি করিয়ে দিয়েছি!'

'আমি কখনও যাইনি কিন্তু আমার স্ত্রী এবং কন্যা ওর বাড়িতে মাসখানেক ছিল। তা সে অনেকদিন আগের কথা।'

কথাটা শুনে ভাঁজ পড়ল সতীশ রায়ের কপালে। কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগেই সুরঞ্জনা ফিরে এল। এখন তাকে খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

সতীশ রায় বললেন, 'বাঃ। বসো। রান্নায় কষে ঝাল দিতে পারবে?'

ফিক্ করে হেসে ফেলল সুরঞ্জনা, 'কেন পারব না?'

'তুমি কী পড়েছ, কী পারো তা তোমার দাদু বলেছেন। আমি তোমাকে অন্য প্রশ্ন করছি। তার আগে বলো, আমি কেন এসেছি?

'আমি কেমন তাই দেখতে।'

ভেতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ ভেসে এল, 'পা দোলাবি না!'

পা স্থির হল। হাসলেন সতীশ রায়, 'বাইরে থেকে দেখে কী করে বুঝব তুমি কীরকম?'

'তাই তো ভাবছিলাম।'

'বাঃ। আচ্ছা, তুমি গালাগালি করতে জানো?'

'ওমা, কে না জানে?'

'বেশ, তুমি কী-কী গালাগাল জানো?'

সুরঞ্জনা তার দাদুর দিকে তাকাল। বৃদ্ধ অস্বস্তিতে পড়েছেন দেখে যজ্ঞেশ্বর মুখার্জি বলল, 'আসুন সেনমশাই, আমরা বাইরে গিয়ে বসি।'

হরিদাস সেন যেন রক্ষা পেলেন।

ওঁরা বেরিয়ে গেলে সুরঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বলব?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বন্ধ করে মনে করল সুরঞ্জনা। তারপর বলল, 'উল্লুক, অসভ্য, ঢ্যামনা, মাকাল, আমি তো মেয়ে তাই শালা বলি না।'

ভেতরের দরজায় শব্দ হল।

'ঠিক কথা। আর একটা শব্দ, ম্যাদামারা, বল না?' সতীশ রায় তাকালেন।

'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে।'

'আমি কে জানো?'

'ডুডুয়ার সতীশ রায়।'

'এটা তোমাকে কে বলেছেন? তোমার দাদু?'

'না। মা। মা যখন ছোট ছিল তখন দিদার সঙ্গে এক মামার বাড়িতে গিয়েছিল ডুডুয়ায়। তখন আপনাকে দেখেছিল?'

'এবার মনে পড়ে গেল, তোমার মায়ের নাম কি শিউলি?'

'ওমা, আপনার মনে আছে?'

'হুম। তিনি কি একবার এখানে আসতে পারবেন?'

'মা,' চেঁচিয়ে উঠল মেয়ে, 'তোমাকে উনি ডাকছেন?'

চিৎকার শুনে হরিদাস সেন আর যজ্ঞেশ্বর ঘরে ঢুকলেন। তারপর মাথায় ঘোমটা দেওয়া সাদা শাড়ি পরা যে মহিলা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর ফাঁক থেকে চিবুক দেখা যাচ্ছে।

সতীশ রায় উঠে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার পুত্রবধূ করে নিয়ে যেতে চাই, সম্মতি দেবেন?'

'আপনি তো মাকে তুমি বলতেন, মা বলেছে—'

'আঃ কথা না বলে পারো না! সব কথা সবার মনে থাকে না।' চাপা স্বরে বললেন মহিলা, 'আপনার বাড়িতে ও গেলে এই প্রথম মনে হবে ভগবান আছেন।'

বাড়ি ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'এত রাত্রে বাস পাব না।'

সতীশ রায়ের মন তখন ফুরফুরে। বললেন, 'রাতটা এখানেই থেকে যান। আপনার জন্যেই এই অভাব পূর্ণ হল। চিন্তা করবেন না, ঘটকবিদায় ভালো ভাবেই হবে।'

'তা কি আর আমি জানি না।' যজ্ঞেশ্বর উৎফুল্ল।

স্তাবকদুজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সন্ধের পর তিন পাত্র খাওয়া সতীশ রায়ের অভ্যেস। স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই এটা আরম্ভ হয়েছিল। তখন থেকে প্রতি সন্ধের সঙ্গী এরা। তবে দুরকম বোতল থাকে। সতীশ রায়ের জন্যে দামি বোতল, ওদের জন্যে সস্তার। তাতে কিছু মনে করে না ওরা। যজ্ঞেশ্বর পান করেন না। চা খেতে-খেতে বললেন, 'মেয়েটিকে কেমন লাগল?'

'আপনি কি মাকাল? ঢ্যামনা না ম্যাদামারা?' বলে হো-হো হাসিতে ভেঙে পড়লেন সতীশ রায়। তাঁর হাসিতে গলা মেলাল স্তাবকরা। সতীশ রায় বললেন, 'বিয়ের দিন ঠিক করতে কি বলতাম পছন্দ না হলে? এখন বলুন, এই কথাগুলোর মানে কী? ঢ্যামনা মানে কী?'

'বদমায়েস লোক কিন্তু ভং করে থাকে।' যজ্ঞেশ্বর বলল।

'মাকাল?'

'ওপরটা সুন্দর ভেতরটা নয়।'

'ম্যাদামারা?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'দেখতে চান? অ্যাই, ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দে। আমার পুত্র, আসছে। ওকে দেখলেই বুঝবেন ম্যাদামারা কাকে বলে। এই বাড়িতে বউমা এলে তবে যদি ওর চরিত্র বদলায়।' সতীশ রায় বললেন।

একজন কর্মচারী বললেন, 'ছোটবাবু বাড়িতে নেই।'

'নেই?' এত রাত্রে তো সে বাইরে থাকার ছেলে নয়! খোঁজ, খুঁজে দ্যাখ।'

যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'মেয়ে দেখতে গেছেন, শুনে বোধহয় মনে আনন্দ হয়েছে—।'

'সেটা আর পাঁচটা ছেলের হতে পারে, ওর হওয়ার কথা নয়। ম্যাদামারা।'

আধঘণ্টা পরে চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নইলে মেরে ফেলব।

আমাকে চেনো না তোমরা? শালা, ফাটিয়ে দেব সবাইকে।'

সতীশ রায় বললেন, 'কে? কার এত সাহস?'

যজ্ঞেশ্বর মাথা নাড়লেন, 'জড়ানো গলা। মাল খেয়ে চেঁচাচ্ছে।'

ততক্ষণে কর্মচারীরা ধরে নিয়ে এসেছে এই ঘরের দরজায় যাকে তাকে দেখে সতীশ রায়ের চক্ষুস্থির, 'তুমি?'

পুত্র বলল, 'ইয়েস আমি। বাংলা খেয়েছি।'

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বভাবের বাইরের কাজ করলে কেন বাবা?'

'আমি দেবদাস হব।' টলছিল পুত্র।

'দেবদাস?' যজ্ঞেশ্বর হতভম্ব।

'আই লভ স্বপ্না। স্বপ্নাকে বিয়ে করতে পারিনি। আমি দেবদাস হব।'

'জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদা। তলায়-তলায় এত? আমাকে ভুল বুঝিয়েছ ঢ্যামনা? কে স্বপ্না? কোথায় থাকে,' চিৎকার করলেন সতীশ রায়।

একজন স্তাবক বলল, 'পোস্টমাস্টারের মেয়ে। গত মাসে বিয়ে হয়ে গেছে।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন সতীশ রায়। বললেন, 'ভালো, বিয়ের আগে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া ভালো। বউমার কাজটা সহজ হয়ে গেল।'

পুতুলের খেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বড় অফিসারকে ধরে দিল্লির বঙ্গভবনে থাকার সুপারিশপত্র জোগাড় করে ফেলল সুদীপ্ত। রাজধানী এক্সপ্রেসে টিকিট কাটা হয়েছে। তিনটে দিন দিল্লিতে থাকলে একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে বলে তার ধারণা।

ল্যান্সডাউনে পিনাকী মিত্রের বাড়ি। মিনিবাস ধরে সেখানে চলে এল সুদীপ্ত। পিনাকী বড় ব্যাবসায়ী, বছর তিনেক হল সিরিয়াল ব্যাবসায় নেমেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতা সুখের নয়। তখনও প্রাইভেট চ্যানেলের রবরবা শুরু হয়নি। অনুষ্ঠান দেখতে হলে দূরদর্শনই ভরসা। পরিচালক হরেন ঘোষ তাঁকে ডিডি-টুতেই সিরিয়াল চালাতে বলেছিল। ডিডি-ওয়ানে এত বড় লাইন যে পাঁচ বছরেও জায়গা পাওয়া যাবে না। কিন্তু ডিডি-টু-তে যে বিজ্ঞাপন কম পাওয়া যায়, তার দামও কম এবং সেই টাকা ফিরে পেতে হিমসিম খেতে হয়, এসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ব্যাবসা গুটিয়ে সরে দাঁড়ালেন না পিনাকী। তদ্দিনে তিনি জেনে গিয়েছেন ডিডি-ওয়ানের প্রাইম টাইমে স্লট পাওয়া মানে রোজ সোনার ডিম পাওয়া। কলকাতায় কোনওরকম প্রশ্রয় পাচ্ছিলেন না। কিন্তু দূরদর্শনের করিডোরে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা জানাল দিল্লির মান্ডি হাউসের মেজকর্তার অনুমতি আনলে এক্ষুনি ডিডি-ওয়ানে স্লট দিতে বাধ্য হবেন স্টেশন ডিরেক্টার।

দিল্লির মান্ডি হাউসে কোনও বাঙালি অফিসার আছেন কিনা খোঁজ নিতে থাকলেন পিনাকী। তদ্দিনে সুদীপ্তর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্র ছেলে। পুণে থেকে পাশ করেছে। ইতিমধ্যে দুটো তেরো পর্বের সিরিয়াল করে পরিচিতি পেয়েছে। এই সুদীপ্তই তাঁকে খবরটা এনে দিল, 'মান্ডি হাউসের দু-নম্বর কর্তার নাম রতিকান্ত যাঁর ওপর বাংলা বিহার অসমের দায়িত্ব দেওয়া আছে।'

'রতিকান্ত? বাঙালি?' কপালে ভাঁজ পড়ল পিনাকীর।

'হ্যাঁ। তাই তো শুনলাম।'

'আমি এক রতিকান্তকে চিনতাম। রতিকান্ত চৌধুরী। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি।'

'ইনিও চৌধুরী।' সুদীপ্ত আশার আলো দেখল। ডিডি-ওয়ানে একটা বড় সিরিয়াল না করলে এই লাইনে টিকে থাকাই মুশকিল হবে।

সাতদিন বাদে সুদীপ্তকে ডেকে পাঠালেন পিনাকী। বললেন, 'দিল্লি যেতে হবে হে। তুমিও সঙ্গে চলো। কাল রাত্রে রতিকান্তর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল।'

'তার মানে উনি সত্যি আপনার সহপাঠী ছিলেন?'

'অফকোর্স। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে-করতে শেষপর্যন্ত জানতে পারলাম ও আমাদের রতি। আমার পয়সায় কয়েক ডজন চা আর মোগলাই পরোটা খেয়েছে সেসময়। কিন্তু খুব অলস ছিল। অনার্সে অর্ডিনারি মার্কস পেয়েছিল। তারপর কী করেছে এতদিন জানতাম না। ও আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করেছে, এস সি বলে দ্রুত প্রমোশন পেয়েছে তা গতকাল জানার পর কাল রাত্রে ফোন করেছিলাম।'

'চিনতে পারলেন?' সুদীপ্ত উত্তেজিত।

'একেবারেই। বলল, চলে আয় দিল্লিতে, ফোনে কথা হয় না। আমি তো টেকনিক্যাল দিকটা ঠিক জানি না, তুমিও চলো প্রপোজাল নিয়ে। আমি উঠব বড় শালির বাড়িতে, তুমি হোটেলে। যদি বঙ্গভবনে ম্যানেজ করতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়।'

এক বন্ধুর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই অফিসারের কাছে পৌঁছে সে অবাক হয়েছিল, ভদ্রলোক তার নাম জানেন। এ দেশে একশোটা ভালো গল্প লিখেও যে নাম করা যায় না, একটি মাঝারি মাপের ছবি করে সারাজীবন তাই ভাঙিয়ে পরিচালক সেজে থাকা যায়। সুপারিশপত্র পেয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু পিনাকীবাবুর কথা শুনে একেবারে মিইয়ে গেল সে। ভদ্রলোক যেতে পারবেন না। উনি না গেলে দিল্লিতে যাওয়ার কথাই ওঠে না। রতিকান্ত ওঁর সহপাঠী কিন্তু জনসাধারণের কাছে তিনি জবরদস্ত অফিসার। আর দিল্লিতে না যাওয়া মানে তার একটা বড় কাজের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়া। চেষ্টা করলে ডিডি-টু-তে স্লট জোগাড় করে সিরিয়াল তৈরি করা যায় কিন্তু এখন আর কোনও প্রযোজক ওই চ্যানেলে টাকা ঢালতে রাজি হবেন না। খবরটা ভালো ভাবে প্রচারিত যে ডিডি-টু-এর সিরিয়ালে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিতে রাজি নন। তার কারণ ডিডি-টু-র প্রচারসীমা খুবই সীমিত। এখন একমাত্র ভরসা ডিডি-ওয়ান। পিনাকীবাবু না গেলে তার দরজাও বন্ধ।

পিনাকীবাবু জানালেন তাঁর শাশুড়িকা খুব অসুস্থ। থাকেন ভাগলপুরে। কাল সকালে কলকাতায় ওঁকে নিয়ে আসছেন ভায়রাভাই। সম্ভবত বাইপাস করাতে হবে। তিনি ছাড়া ওঁদের কোনও আত্মীয় নেই কলকাতায়। ডাক্তার, নার্সিংহোম ইত্যাদি ঠিক করার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। এই অবস্থায় দিল্লিতে যাওয়া সম্ভব নয়। রতিকান্তর সঙ্গে তিনি টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থির করেছিলেন-এই খবর আসার আগে। পিনাকী বললেন, 'সুদীপ্ত তুমি কাল একাই চলে যাও।'

হকচকিয়ে গেল সুদীপ্ত, 'আমি একা যাব?'

'আমি রতিকান্তকে ফোন করে দিচ্ছি। ও কী বলে শুনে এসো।'

'আমি গেলে কোনও কাজ হবে না দাদা।' সুদীপ্ত বলল।

'কাজ যে আমি গেলেই হবে তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে? এবার তুমি গিয়ে সব শুনে এস, পরের বার আমি তোমার সঙ্গে যাব।' পিনাকী নির্দেশ দিলেন।

*

সুদীপ্ত জানে সে গেলে কোনও কাজ হবে না। বহু বছর না দেখা বন্ধু সামনে এলে রতিকান্তবাবুর যে প্রতিক্রিয়া হত, তার বিন্দুমাত্র তাকে দেখে হবে না। যাতায়াতের টিকিট ছাড়া পিনাকীবাবু তাকে যে তিন হাজার টাকা থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ দিয়েছেন সেটাও জলে যাবে। বেশ কিছুকাল কাজের খোঁজে থাকায় পকেটের অবস্থা সঙ্গীন। দিল্লি না গিয়ে ওই টাকা নিয়ে কলকাতায় থেকে গেলে কিছুকাল স্বস্তি মিলত। কিন্তু তাতে নতুন কাজ পাবেই এমন নিশ্চয়তা ছিল না। রাজধানী এক্সপ্রেসের কামরায় বসে সুদীপ্ত নিজেকে বলল, 'কখন কার কপালে কী জুটবে তা আগে থেকে কি বলা যায়!'

ট্রেনটা একটু দেরিতে পৌঁছাল। স্টেশন থেকে অটো নিয়ে বঙ্গভবনে যেতেই ঘর পেয়ে গেল। স্নান সেরে তৈরি হয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াতেই ওদের দেখতে পেল। প্রচণ্ড সেজেছে মেয়েটি। একটু খাটো, তেমন ফরসা নয় কিন্তু যৌবনসর্বস্ব শরীর। চোখে রোদ চশমা। সঙ্গের প্রৌঢ়টির হাতে চামড়ার ব্যাগ। মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'কেন যে এখানে ওঠা হল, দিল্লিতে কি আর হোটেল ছিল না?'

'এমনিতে তো খারাপ না। মন্ত্রীরা তো এখানেই ওঠেন।'

'আমরা যেজন্যে এসেছি মন্ত্রীরা তো সেজন্যে আসেন না।'

লিফট এসে গিয়েছিল। ওদের পেছন-পেছন সুদীপ্তও লিফটে ঢুকল। মেয়েটি একবার মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিল।

নিচে নেমে ওরা বেরিয়ে গেলে সুদীপ্ত রিসেপশনে গিয়ে জানতে চাইল মান্ডি হাউস কতদূরে? জানল, বেশিদূরে নয়। তবে প্রথমবার গেলে অটো নিলে সুবিধে হবে।

বঙ্গভবনের রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সেরে অটো নিয়ে সে যখন মান্ডি হাউসে পৌঁছাল তখন দুপুর দুটো। গেট পেরিয়ে বাঁ-দিকে রিসেপশন। সেখানে বেজায় ভিড়। স্লিপ হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। আধঘণ্টা বাদে সুদীপ্ত সুযোগ পেল। রিসেপশনিস্ট স্লিপটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে? রতিকান্তজির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করা যায় না!'

সুদীপ্ত ঘাড় নাড়ল। স্লিপের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'ইনি ওঁর খুব বন্ধু। ওঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। টেলিফোনে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ইন্টারকমে যাচাই করলেন রিসেপশনিস্ট। তারপর একটা পাস ইস্যু করে বললেন, 'ওপাশের দরজা দিয়ে চলে যান। ফিফথ ফ্লোর।'

সুদীপ্ত পাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চমকে উঠল, ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গভবনের সেই সুন্দরী। খানিকটা তফাতে তাঁর সঙ্গী প্রৌঢ়।

রিসেপশনিস্ট তাঁকে বললেন, 'আজকের ভিজিটার্স লিস্টে আপনার নাম নেই। আপনি ফোনে কথা বলে কালকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন।'

'আশ্চর্য! উনি তো টেলিফোন ধরছেন না।'

'কী বলছেন আপনি! এই ভদ্রলোক তো টেলিফোনে কথা বলেছেন।' সুদীপ্তকে দেখিয়ে দিলেন রিসেপশনিস্ট।

এবার ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন, 'আপনি কি বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ। খুব ভালো হল। আমার একটা উপকার করবেন?' মহিলার মুখে নয়, গলায় উদ্বেগ।

'বলুন।'

'আপনি তো রতিকান্তবাবুর কাছে যাচ্ছেন, ওঁকে বলবেন আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

খুব জরুরি দরকার। উনি যদি রিসেপশনে ফোন করে বলে দেন—।'

'চেষ্টা করব!'

'প্লিজ!'

সুদীপ্ত পা বাড়াল। কয়েক পা যেতেই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'ও মশাই, শুনছেন! এই যে, আপনাকে ডাকছি।'

সুদীপ্ত পেছনে তাকাতেই দেখতে পেল সুন্দরী মহিলার সঙ্গী বয়স্ক মানুষটি এক হাত মাথার ওপর তুলে দোলাচ্ছেন।

'আমাকে বলছেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল সুদীপ্ত।

'অদ্ভুত ব্যাপার মশাই। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না রতিকান্তকে কী নাম বলবেন, আর ইনিও সেটা আপনাকে জানাতে ভুলে গেলেন। রতিকান্তবাবুকে তো ওঁর নামটা বলতে হবে!'

'কী নাম?' বিরক্ত হচ্ছিল সুদীপ্ত।

'কুসুম।' ভদ্রলোক বললেন, 'কুসুম মিত্র।'

শোনামাত্র হাঁটা শুরু করল সুদীপ্ত। অসম্ভব, এরকম কোনও সিনে সে যাবেই না। কলকাতা থেকে মান্ডি হাউসে এসে রতিকান্তর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন তা বোঝার মতো বয়স হয়েছে তার। মিছিমিছি যারা নিজের সর্বনাশ নিজেই করে তাদের দলে সে নেই। তবে কুসুম নামটা খারাপ না। কুসুম শুনলে আজকাল ডিমের কুসুম মনে পড়ে। তবে দিশি মুরগির ডিম, ব্রয়লারের নয়। আগে ওই কুসুমের পাশে কুমারী অথবা সুন্দরী বসিয়ে দিয়ে ভারী নাম তৈরি হত। কিন্তু আর যাই হোক, এটা বলতে হবে, পিনাকীবাবু জিন্দাবাদ। সেই কলকাতায় বসে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করে ফেলেছেন ভদ্রলোক।

দুজনকে জিজ্ঞাসা করে লিফটে চেপে ওপরে এল সুদীপ্ত। সামনেই সিকিউরিটি। তাকে স্লিপটা দেখাতে হল। সেটা দেখার পর লোকটা আঙুল তুলে ভিজিটার্স কর্নার দেখিয়ে দিল। সেখানে দাঁড়ানো একজন পিওন তাকে বসতে বলে স্লিপ নিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুদীপ্ত দেখল দরজার গায়ে বিরাট নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে 'রতিকান্ত চৌধুরী'।

চেয়ারে বসে চারপাশে তাকাল সুদীপ্ত। দুজন মানুষ খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে আলোচনায় ব্যস্ত। বোঝাই যাচ্ছে এঁরা রতিকান্ত চৌধুরীর সাক্ষাৎপ্রার্থী। মহিলাকে খুব চেনা-চেনা মনে হল সুদীপ্তর। রোগা, ফরসা, বয়স্কা মহিলাকে সে কোথায় দেখতে পারে? চমৎকার উচ্চারণে ইংরেজি বলছেন শুনতে পেল সুদীপ্ত, সেই গলা কানে আসতেই মনে পড়ে গেল। ইনি একজন বিখ্যাত অ্যাঙ্কার। ইংরেজিতে দারুণ-দারুণ প্রোগ্রাম করেন।

বেয়ারা এসে ওঁদের সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গী ভদ্রলোককে ইশারায় বসতে বলে এগিয়ে গেলেন বন্ধ দরজার দিকে। ভদ্রলোক উসখুস করতে লাগলেন। ঘড়ি দেখলেন। তারপর সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ আর ফ্রম?'

সুদীপ্ত বলল, 'কলকাতা।'

'ও, খুব ভালো শহর।' ভদ্রলোক ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি প্রোডিউসার না ডিরেক্টার?'

'ডিরেক্টার।'

'অদ্ভুত। সাধারণত প্রোডিউসাররাই এখানে আসেন। দিস ম্যান, রতিকান্ত, ইজ এ টাফ গাই। ওঁর সঙ্গে আগে আলাপ হয়েছে?'

মাথা নাড়ল সুদীপ্ত, না।

'খুব শক্ত লোক। এই যে আমরা, একটার-পর-একটা হিট প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি—তবু ওঁকে খুশি করতে পারছি না।' ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে চোখ রাখলেন।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন গম্ভীর মুখে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী বললেন উনি?'

'উনি তো কখনও না বলেন না। সাতদিন পরে ফোন করতে বলেছেন।' বেশ বিরক্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে-বলতে লিফটের দিকে হাঁটতে লাগলেন মহিলা। পড়ি কী মরি করে ভদ্রলোক তাঁকে অনুসরণ করলেন। এবং তখনই বেয়ারা এসে জানাল সুদীপ্তর ডাক পড়েছে।

বেশ বড় ঘর। টেবিলটি পরিষ্কার। টেবিলের ওপাশে ষাটের কাছাকাছি যে মানুষটি বসে আছেন তিনি বহুদিন ট্রামবাস চড়েননি, রাস্তায় হাঁটেননি, চওড়া কপাল, চুল সেঁটে আছে মাথায় পিছনমুখী হয়ে। ফরসা গোলমুখ তুলে তাকালেন সুদীপ্তর দিকে। কয়েক মুহূর্ত, তারপর মোহনহাসি হাসলেন, 'আসুন ভাই, বসুন। বলুন, আমি কী করতে পারি!'

'পিনাকীদা—!' সুদীপ্তর গলা শুকিয়ে গেল।

'সিগারেট খান?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল সুদীপ্ত।

'আমি সিগারেট খাই এটা আমার স্ত্রী চান না। কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমার খেতে ইচ্ছে করে, এই এখন যেমন করছে। আছে?' হাত বাড়ালেন রতিকান্ত।

বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিল সুদীপ্ত। সে মাঝারি দামের সিগারেট খায়। কিন্তু দেখল ভদ্রলোক প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বেশ গুছিয়ে ধরিয়ে টান দিলেন, 'আঃ, অনেকদিন বাদে পরিচিত গন্ধ পেলাম। তা ভাই, আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?'

'উত্তর কলকাতায়। বাগবাজারে।' সুদীপ্ত জবাব দিতে টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে রতিকান্ত বললেন, 'ইয়েস! ও, কী সব আজেবাজে সিরিয়াল দেখাচ্ছেন? প্রাইম টাইমটা দু-মাসের মধ্যে খালি করে ফেলুন। না, না, দু-মাস অনেক সময়, চল্লিশটা এপিসোড দেখাতে পারবেন। কি? না, আজও ডিসিশন ফাইনাল হয়নি। যেমন চলছে চলতে দিন।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রতিকান্ত আবার ধোঁয়া টানলেন, 'বাগবাজারের রসগোল্লাকে এখন অনেকেই পেছনে ফেলে দিয়েছে কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট তেলেভাজা? বেগুনি, আলুর চপ, এখন স্ট্যান্ডার্ড কীরকম?'

প্রাইম টাইমের সিরিয়াল দু-মাস পরে বন্ধ হয়ে যাবে শোনার পর বেশ উত্তেজিত হয়েছিল সুদীপ্ত। ওই স্লটটা যদি রতিকান্ত তাদের দেন—। কিন্তু শেষ প্রশ্ন কানে আসতেই কীরকম মিইয়ে গেল ব্যাপারটা। কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল, 'ভালো, বেশ ভালো।'

'গুড। বাঙালির সব কিছুই তো হারিয়ে যাচ্ছে, এটা আছে শুনে ভালো লাগল। আপনি বাগবাজারের লোক, হেদোর কাছে নকুড়ের দোকানের নাম শুনেছেন?'

মাথা নাড়ল সুদীপ্ত, হ্যাঁ।

'ফ্যান্টাস্টিক সন্দেশ করত ওরা। জলভরা তালশাঁস। উঃ! আছে এখনও?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'কেসি দাস, গাঙ্গুরাম, জলযোগের পয়োধি, কত নাম মনে পড়ছে।' বলতে-বলতে চোখ বন্ধ করলেন রতিকান্ত। যেন স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়েছেন।

'স্যার!' শেষপর্যন্ত না ডেকে পারল না সুদীপ্ত।

চোখ খুললেন রতিকান্ত, 'পিনাকীর খবর কী?'

'উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে টিকিট কেটেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ওঁর এক আত্মীয়া ভাগলপুর থেকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আসায় আটকে গিয়েছেন। আমাকে বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' সুদীপ্ত বলল।

'কেন?'

'স্যার, আমরা চেষ্টা করেও কলকাতায় কাজের সুযোগ পাচ্ছি না।'

'সেটা তো অনেকেই পাচ্ছে না। জায়গা নির্দিষ্ট অথচ কাজ করতে চাইছেন অনেকে। সবাইকে

তো সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।' রতিকান্ত কথা শেষ করতেই টেলিফোন বাজল। ইংরেজিতে কয়েকটা কথা বলে রিসিভার রেখে বললেন, 'আমাকে যে এখনই উঠতে হবে ভাই। কোথায় উঠেছেন।'

'বঙ্গভবনে।'

'একলা এসেছেন না সঙ্গে কেউ আছে?'

'আমি একলাই এসেছি।'

'সন্ধের পরে ওদিকে আমার যাওয়ার কথা আছে। ঘরে থাকবেন, যদি সময় পাই গিয়ে কথা বলব। উত্তর কলকাতা নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে।' উঠে দাঁড়ালেন রতিকান্ত। সুদীপ্ত হতভম্বের মতো বেরিয়ে এল।

তড়িঘড়ি মান্ডি হাউসের বাইরে এসে একটা এসটিডি বুথ খুঁজে বের করে সে পিনাকীবাবুর নাম্বার ঘোরাল। দিল্লি থেকে কলকাতার ফোনের সংযোগ এত চটজলদি হবে আশা করেনি সুদীপ্ত। পিনাকীবাবুর গলা শুনল, 'হ্যালো।'

'আমি দিল্লি থেকে সুদীপ্ত বলছি।'

'ও, হ্যাঁ, বলো, কী খবর? দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কীরকম ব্যবহার করল?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আশ্চর্য! একটা লোক কথা বলল, নিশ্চয়ই বাংলায় বলেছে, আর তুমি তার মানে বুঝতে পারলে না?'

'উনি প্রথমে বললেন সবাইকে সুযোগ দেওয়ার জায়গা নেই। তার আগে কাউকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রাইম টাইমের স্লটের একটা সিরিয়াল বন্ধ করে দিতে। ওই ব্যাপারে কথা বলার সুযোগই পেলাম না। অবশ্য উনি বলেছেন হয়তো আজ সন্ধের পরে আমার সঙ্গে কথা বলতে বঙ্গভবনে আসতে পারেন। এটা কথার কথা!' সুদীপ্ত বলল।

'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। তুমি সন্ধে থেকে ঘরেই থাকবে। তার আগে এখন এক বোতল দামি হুইস্কি আর কাজুবাদাম কিনবে রাত্রে আমি ফোন করব।' পিনাকীবাবু লাইন কেটে দিলেন।

টাকা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। সর্বনাশ! এখন সে হুইস্কি কিনবে কোত্থেকে? তার সমস্ত খরচ মিটিয়ে দিয়েও পিনাকীবাবু তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি বোঝো কাজ হবেই তাহলে এটা থেকে খরচ করতে পারো।'

এখন পর্যন্ত টাকাটা কাউকে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। রতিকান্ত চৌধুরী পিনাকীবাবুর বন্ধু। বন্ধুর কাছে কেউ ঘুষ নেয় না। তা ছাড়া ভদ্রলোককে দেখে মনে হয়েছে অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির মানুষ। অতগুলো টাকা সঙ্গে থাকায় অস্বস্তি আছেই, যেমন এনেছিল তেমনি ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তবে অস্বস্তি দূর হবে।

সুদীপ্ত চারপাশে তাকাল। এটা অফিস পাড়া। মদের দোকান থাকার কথা নয়। সে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। মিনিট পনেরো বাদে সে যেখানে পৌঁছাল তার দু-ধারে নানান ধরনের দোকান এবং রেস্টুরেন্ট। সে সাইনবোর্ডগুলো লক্ষ করল। না মদের দোকানের কোনও চিহ্ন নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গোবিন্দর কথা। গোবিন্দ একজন সিনিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার। কুড়ি বছরের ওপর লাইনে আছে কিন্তু এখনও নামের আগে ডিরেক্টার শব্দটা বসেনি। অথচ খুব ভালো কাজ জানে। অনেকে পরিচালনা করতে আসে কিছু না জেনে, শুধু গোবিন্দর ওপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে গোবিন্দর কোনও আক্ষেপ নেই। মজা করে কথা বলে, নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে বাধে না। সেই গোবিন্দর কাছে গল্পটা সে শুনেছিল। রোজ রাত্রে চার পেগ হুইস্কি না খেলে

গোবিন্দর ঘুম আসে না। গোবিন্দ বলেছিল, 'বুঝলে ভাই, নতুন শহরে গিয়েছি, মালের দোকান কোথায় জানি না। এসব ব্যাপারে রিকশাওয়ালারা বেশ সাহায্য করে। সেদিন আবার রিকশা স্ট্রাইক। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করব, দাদা, মালের দোকান কোথায়, তাতেও আটকাচ্ছে। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে জানি না বলল যেন আমি কোনও সংক্রামক রোগের রুগি। শেষপর্যন্ত মাথায় এল। দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক কথা বলছিলেন। তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অধ্যাপক পি কে ভট্টাচার্যের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

শুনে ওঁরা চিন্তিত হলেন। একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলুন তো? প্রণব কুমার ভট্টাচার্য? উনি তো মারা গিয়েছেন!'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাড়া বা রাস্তার কোনও নাম জানেন?'

'আমাকে লিখে দিয়েছিল। কাগজটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'এভাবে তো খুঁজে পাবেন না। শহরটা তো ছোট নয়। কোন কলেজের অধ্যাপক?'

'লোক্যাল কলেজের।'

'তাহলে কলেজে যান। দুটো কলেজ আছে এখানে। তবে এখন তো বন্ধ।'

'মুশকিলে পড়লাম।'

'কলেজের কাছে থাকেন? একজন জানতে চাইলেন।'

'না-না। ও, মনে পড়েছে। উনি যে গলিতে থাকেন তার মোড়ে একটা ফরেন লিকারের দোকান আছে। হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি।'

এবার প্রথম ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'সোজা চলে যান। ডান দিকে নয়, মোড় থেকে বাঁ-দিকে ঘুরে একটু হাঁটলেই দোকানটা দেখতে পাবেন। কিন্তু তার পাশে তো কোনও গলি নেই। দেখুন, ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে হয়তো লোকে বলে দেবে।'

ওঁদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি সোজা মালের দোকানে পৌঁছে গেলাম। বুঝলে হে!'

সুদীপ্তর মনে হল এখন এখানে গোবিন্দর ফর্মুলা ব্যবহার করা যেতে পারে। সে চারপাশে তাকিয়ে একটু দূরে একজন লোককে দেখতে পেল যাকে গোবেচারা বলে ভাবা যেতে পারে। লোকটির দিকে এগিয়ে যেতেই সে মদের দোকান দেখতে পেল। ছোট দোকান কিন্তু সাইনবোর্ড পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না।

লোকটিকে পাশ কাটিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে সে বোতলগুলোর দিকে তাকাল। কোনও খদ্দের ছিল না সেই সময়। দোকানদার হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নিতে চান বলুন।'

বোতলগুলোর ওপর সাঁটা লেবেলে তখন সুদীপ্তর চোখ। বলল, 'হুইস্কি।'

'কী হুইস্কি নেবেন?'

ফাঁপড়ে পড়ল সুদীপ্ত। সে মদ্যপান করে না। মদ বলতে হুইস্কি, জিন, ভদকা, রাম অথবা বিয়ারের কথাই সে জানে। অথচ এই লোকটি তাকে অজ্ঞ ভাববে সেটাও ঠিক নয়।

সুদীপ্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'মোটামুটি দামি কী আছে?'

লোকটি দেখালো বোতল, 'খুব ভালো স্বাদ। টেস্ট করে কেউ খারাপ বলেননি।'

কড়কড়ে সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে বোতলটি কিনল সুদীপ্ত। লোকটি ক্যারিব্যাগের ভেতর বোতলটি দেওয়ায় রাস্তায় হাঁটতে অসুবিধে হল না সুদীপ্তর।

রোদ পড়ে গিয়েছিল। দিনের বেলায় বুঝতে পারেনি, বঙ্গভবনে ফেরার মুখে টের পেল সুদীপ্ত, ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে। অর্থাৎ দিল্লিতে শীত তাহলে যাই-যাই করছে। লিফটে চেপে ওপরে উঠে তালা খুলে ঘরে ঢুকল সে। আলো জ্বালল। এই ঘর বেশ সভ্যভব্য, যে-কোনও লোককে আপ্যায়ন করা যায় এখানে। কিন্তু চেয়ার একটা, আর একটা আনাতে হবে। বোতলটা টেবিলে রাখতে খেয়াল

হল তার। কাজুবাদাম কেনা হয়নি, আবার বেরুতে হবে। তারপরেই গ্লাসের দিকে নজর গেল। কীরকম মোটাসোটা গ্লাস। মুশকিল হল, রতিকান্ত চৌধুরী আদৌ আসবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক স্রেফ আড্ডা মারতে তার কাছে আসবেন কেন? তা ছাড়া উনি বঙ্গভবনে এসে কার খোঁজ করবেন? সে ওঁর ঘরে ঢুকে নিজের নাম বলার আগে বলতে যাচ্ছিল, পিনাকীদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি সুদীপ্ত। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিগারেটের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। অতএব এখানে এলেও তার নাম বলে খোঁজ নিতে পারবেন না সে কোন ঘরে আছে। হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়তেই খেয়ালে এল। সে তো নিজের নাম লিখে স্লিপ দিয়েছিল বেয়ারার হাতে। রেফারেন্স হিসেবে পিনাকীদার নাম দিয়েছিল। রতিকান্ত যদি স্লিপটা ফেলে না দিয়ে থাকেন তাহলে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারেন।

সে বেল বাজাল। বেয়ারা এলে বলবে কাজুবাদাম কিনে আনতে আর একটা ভালো গ্লাস দিতে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। এত তাড়াতাড়ি লোকটা এসে গিয়েছে বলে খুশি হল সে। সুদীপ্ত চেঁচিয়ে বলল, 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে যিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে মোটেই আশা করেনি সুদীপ্ত। তারপরে দ্বিতীয়জনও দেখা দিলেন।

'নমস্কার। আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে আমার কথা বলেননি!' ভদ্রমহিলার মুখ-চোখ থমথমে। গলার স্বরও ঈষৎ রাগত।

সুদীপ্ত কিছু বলতে গিয়েও কথা খুঁজে পেল না।

এবার ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা একটু কথা বলতে চাই, ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, আসুন।' সুদীপ্ত বাধ্য হল বলতে।

ভদ্রমহিলা সোজা চলে এসে চেয়ারে বসলেন। ভদ্রলোক বিছানায়। সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে।

'আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?' ভদ্রমহিলা সুদীপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'ঠিক আছে, বলুন।'

দ্বিতীয় চেয়ার নেই, বসতে হলে খাটে বসতে হয়, সুদীপ্ত মনে-মনে বলল, 'ন্যাকা।'

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'তুমি বলো।'

'না। তুমি শুরু করো।' ভদ্রমহিলা মাথা দোলালেন।

'দেখুন ভাই, আপনি এবং আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। আমরা বাঙালি। এই প্রবাসে এসে আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য না করি তাহলে খুব আক্ষেপের ব্যাপার হবে।'

'আমি কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।'

'বলছি। আপনি তো বাংলা সিরিয়ালের ব্যাপারে রতিকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? তাই না? আপনি কী করেন?'

'সিরিয়াল পরিচালনা করি।'

'তার মানে আপনি কোনও প্রযোজকের হয়ে সিরিয়ালের জন্যে এখানে এসেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার প্রযোজক টেলিফোনে ওটা করে দিয়েছিলেন।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

ভদ্রলোক বললেন, 'তা আজ কাজের কাজ কিছু হল?'

'না। এখনও হয়নি।'

'সহজে হবে না। এই লোকটি গভীর জলের মাছ।' ভদ্রলোক বললেন।

'আঃ। বড্ড বাজে কথা বলো।' ভদ্রমহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আপনাকে কি আবার যেতে বলেছেন উনি?'

সুদীপ্ত কী বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখলেন, 'ও বাবা। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তুমি যাও, নিয়ে এসো।'

'তুমি?'

'আমি একটু পরে ঘরে যাচ্ছি।' ভদ্রমহিলা বললেন।

ভদ্রলোক চলে গেলে ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'আপনাকে খুব বিরক্ত করেছি, না? আসলে আমরা খুব সমস্যায় পড়েছি। আমার একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আছে, অন্যের হয়ে নানান রকমের কাজ করে দিই আমরা। তিনজন সিরিয়াল-প্রযোজক আমার কাছে এসেছেন। এঁদের দুজনের মেগা সিরিয়াল চলছিল কিন্তু আচমকা সেটা বন্ধ করার জন্যে একমাসের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিশাল ক্ষতি হবে প্রযোজকের। তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ওপর তলার মন পেতে। তাই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। যদি আমরা বন্ধ করার নোটিশ তুলে নিতে কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে পারি তাহলে ওঁরা উপযুক্ত দক্ষিণা দেবেন আমাদের। এখন এটা আমাদের প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ব্যাবসার ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই কেসে সাফল্যের ওপর।' ভদ্রমহিলা চুপ করলেন।

সুদীপ্ত অবাক হয়ে শুনছিল। প্রায়ই কানে আসত, ওই সিরিয়াল সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে, ওই সিরিয়ালকে আর এক্সটেনশন দেওয়া হবে না মান ভালো নয় বলে। কিন্তু সেইসব সিরিয়ালকে আবার সক্রিয় করতে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এগিয়ে এসেছে তা তার জানা ছিল না।

সুদীপ্ত নিচুস্বরে বলল, 'আমি কী করতে পারি বুঝতে পারছি না।'

'কাল কখন ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন?'

'এখনও ঠিক হয়নি। উনি ফোনে বলবেন।'

'ফোনে? আপনাকে করতে বলেছেন?'

মাথা নেড়ে মিথ্যে কথা বলল সুদীপ্ত, 'উনি নিজে করবেন বলেছেন।'

'মাইগড। আপনি তো খুব লাকি। একটা রিকোয়েস্ট করব?'

'বলুন!'

'আমি আপনার সঙ্গে ওঁর কাছে যাব!'

'বেশ। উনি ফোন করলে ওঁকে বলব।'

'না, বলবেন না। না বলে গেলে উনি কথা বলতে বাধ্য হবেন।'

'কিন্তু যদি আমার ওপর রেগে যান?'

হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'যাতে না রাগেন সেই দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। শুধু এই উপকারটুকু করার জন্যে আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব।'

অবাক হল সুদীপ, 'এসব না করে আপনি সোজা ওঁর বাড়িতে চলে যান না।'

'অনেকে সেই চেষ্টা করেছেন। মিস্টার চৌধুরী তাঁদের চিরদিনের জন্যে বাতিল করেছেন।' ভদ্রমহিলা উঠলেন, 'আমি তিনতলার প্রথম বাঁ-দিকের ঘরে উঠেছি। আড্ডা মারতে ইচ্ছে করলে চলে আসতে পারেন।' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

শেষপর্যন্ত সুদীপ্ত প্রশ্নটা না করে পারল না, 'আপনার নাম কুসুম, তাইতো?'

মিষ্টি হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'মেয়েদের নাম একবার শুনলে দেখছি ভোলেন না।'

চুপচাপ শুয়েছিল সুদীপ্ত। কলকাতায় থাকলে এই ভরসন্ধেতে শুয়ে থাকার কথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু দিল্লিতে সে কোথায় যাবে। পিনাকীবাবুর সহপাঠী রতিকান্ত, শুধু এটুকু তথ্য তাকে আশান্বিত করেছিল। ভেবেছিল দিল্লিতে এলেই কাজ হয়ে যাবে। সে একটা ভালো সিরিয়াল পরিচালনা

করতে চায় যা দেখে দর্শকরা খুশি হবে। কিন্তু আজ রতিকান্তর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে খালি হাতেই ফিরতে হবে।

কলকাতায় যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সংস্থা সিরিয়াল বাঁচানোর বা নতুন সিরিয়াল বের করার দায়িত্ব নিয়েছে তা জানা ছিল না। পিনাকীবাবুও জানতেন না। জানলে তাকে দিল্লিতে পাঠাতেন না। এরা অর্ডার বের করে নিয়ে গেলে দক্ষিণা দিয়ে দিতেন। কুসুমদেবী যে সহজে রণে ভঙ্গ দেবেন না তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দরজায় শব্দ হল। তন্দ্রা এসেছিল সুদীপ্তর। তবু শব্দটা কানে যেতে শুয়ে-শুয়েই বলল, 'কাম ইন, দরজা খোলা আছে।'

যিনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তাঁকে আশাই করেনি সুদীপ্ত। এক লাফে উঠে বসল সে, 'আপনি? আসুন, আসুন।'

'সেকি! আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, আসতে পারি।' রতিকান্ত চৌধুরী চেয়ারটা টেনে বসে চারপাশে চোখ বোলালেন, 'ঘরে এসি নেই!'

'না। মানে এখন তো গরম তেমন নেই—।'

'গরমেই যে এসি চালানো হয় এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ধুলো, ধুলোর অ্যালার্জি থেকে বাঁচার জন্যে গভীর শীতেও আমি হালকা এসি চালাই। যাক গে। বাবু পিনাকীর খবর কী?' রতিকান্ত হাত বাড়ালেন।

'ভালো!' কিন্তু কেন হাত বাড়ালেন বুঝতে পারল না সুদীপ্ত।

'সিগারেট—!'

তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে বিছানা থেকে নেমে এল সুদীপ্ত। প্যাকেট নিয়ে সিগারেট বের করতে-করতে রতিকান্ত হাসলেন, 'অনেকদিন পরে সিগারেট খাচ্ছি। বেড়ে লাগে। কলকাতায় এখন কোনও ব্র্যান্ডের সিগারেট বেশি চলে?'

'মানে?' ধন্দে পড়ল সুদীপ্ত।

'আমাদের ছাত্রাবস্থায় চারমিনার খুব চালু ছিল। তারপর এই উইলস ফিল্টার। আপনি কীরকম পরিচালক? বাজারের খবর রাখেন না?' খিঁচিয়ে উঠলেন রতিকান্ত।

'এখন ঠিকঠাক বলা মুশকিল। সিগারেট খাওয়া তো খুব কমে গিয়েছে।'

রতিকান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, একটু আরাম করি। বিছানার চাদরটা নিশ্চয়ই আপনি আসার পর পালটেছে?'

'হ্যাঁ। আমি আজ দুপুরে ঘরে ঢুকে দেখেছি ওরা পালটাচ্ছে।'

'গুড।' বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে সিগারেট ঠোঁটে রাখলেন রতিকান্ত। ওটা এখনও ধরাননি।'

সুদীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, দেশলাই দেব?'

'একটু পরে। তামাকের গন্ধটা আর একটু নিই। হ্যাঁ, কী নিয়ে এসেছেন?'

খেয়াল হল সুদীপ্তর। দ্রুত আড়ালে রাখা মোড়কে মোড়া বোতলটা বের করে টেবিলে রাখল। সযত্নে মোড়ক খুলল।

'মাই গড! আপনি ইন্ডিয়ান হুইস্কি নিয়ে এসেছেন। লোকে ব্ল্যাক লেভেল, শিভার্স, ব্লুলেভেল নিয়ে লাইন দিয়ে বসে আছে। আর আপনি! এই জন্যেই বাঙালির কিছু হল না। কিছুতেই নজর বড় করতে পারলেন না আপনারা। কলকাতায় যে ক'টা বাংলা মেগাসিরিয়াল চলছে তার আশি পার্সেন্ট মালিকানা অবাঙালিদের। কেন? ওরা জানে কাউকে কী করে খুশি করতে হয়।' নাকে শব্দ তুললেন রতিকান্ত।

'আসলে এখানে তো আমি নতুন। দোকানদারকে বলেছিলাম বেস্ট হুইস্কি দিতে। লোকটা

বলল, এটাই নাকি বেস্ট। দামও নিল সাড়ে চারশো টাকা।' সুদীপ্ত অপরাধীর গলায় বলল।

রতিকান্ত হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?'

'না।' মাথা নাড়ল সুদীপ্ত।

'তাই দোকানদার আপনাকে টুপি পরাতে পেরেছে। পঞ্চাশ টাকা বেশি নিয়েছে। যাক গে, কী করা যাবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট করা যাক। গ্লাস ধোওয়া আছে?'

তখন মনে পড়ে গেল সুদীপ্তর। সে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকেছিল কিন্তু বেয়ারা আসার আগেই ওই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা এই ঘরে এসেছিলেন। বেয়ারা আসেনি।

এবার বেল বাজতেই বেয়ারা চলে এল। সুদীপ্ত তাকে জিজ্ঞাসা করল, এর আগে তাকে ডাকা সত্ত্বেও কেন আসেনি! লোকটি জানাল সে একটু বাইরে বেরিয়েছিল।

রতিকান্ত বললেন, 'ভালো গ্লাস আছে তোমার স্টকে?'

'আছে স্যার।'

'দুটো নিয়ে এসো আর দু-বোতল বিসলারি। আমি খোলা জলকে বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'ও হ্যাঁ। দুশো গ্রাম কিসমিস আর অল্প বাদাম আনবে। তাড়াতাড়ি।'

বেয়ারা মাথা নেড়ে হাত বাড়াতেই সুদীপ্ত চটপট একশো টাকার নোট দিয়ে দিল, 'এতে হবে না?'

রতিকান্ত বললেন, 'আলবাত হবে। বাকিটা ফেরত দিতে হবে না। চটপট করো।'

দরজা ভেজিয়ে দিতেই রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'উত্তর কলকাতার গঙ্গার ঘাট হল ফ্যান্টাস্টিক জায়গা। ওখানে যাওয়া হয়?'

'না। আমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে।'

'তাকে কী হয়েছে? আমরা দলবেঁধে রবিবারের সকালে যেতাম বেদিং বিউটি দেখতে। এককালে বাঙালি মহিলাদের কী ফিগার ছিল! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। আর এখন? মনে হয় দেশলাই কাঠি হাঁটছে।' মাথা নাড়লেন রতিকান্ত।

সুদীপ্ত সাহস সঞ্চয় করছিল। এবার বলে ফেলল, 'স্যার, আমরা খুব আশা করে আছি। পিনাকীবাবু বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সুযোগ দেবেন। এই সুযোগ পেলে আমার একটা বড় ব্রেক হয়। আপনি যদি একটু কনসিডার করেন!'

'দেখুন ভাই, এই কথাগুলো নানান মুখে এত শুনেছি যে এখন ইরিটেশন তৈরি হয়। আমাকে একা পেলে মানুষ কেন যে অন্যকথা বলতে পারে না। যাক গে, পিনাকীর স্ত্রীকে চেনেন?'

ঢোল গিলল সুদীপ্ত, 'না, আমি ঠিক—।'

'তার মানে ওর বাড়িতে আপনার যাওয়া-আসা নেই!'

'হ্যাঁ। আমি ওঁর অফিসেই যাই—।'

'পিনাকীর বউ শুনেছি দারুণ দেখতে ছিল। সিনেমার নায়িকা হতে পারত। বিয়ের পর পিনাকী ওকে বাইরে বের করেনি। ওর মতো কনজারভেটিভ লোক কী করে সিরিয়াল বানাতে এল আমি ভেবে পাই না। যাক গে, মন্দিরার খবর কী?'

'মন্দিরা?'

'দূর মশাই। পরিচালক হতে চান অথচ নায়িকার নাম শোনেননি?'

'ও হ্যাঁ। কিন্তু উনি তো অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন।'

'সেটা জানি। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। ত্রিপাঠী ওকে নায়িকা বানিয়ে ছেড়েছিল। দিল্লিতে কতবার এসেছে আমার কাছে ত্রিপাঠীর জন্যে। বাপের বয়সি লোকটা ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাত। শেষের দিকে হুইস্কি খেত খুব। শুনেছি একজন সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করে কলকাতা ছেড়ে

চলে গিয়েছে। খুব ভালো করেছে।'

বেয়ারা এল জলের বোতল, গ্লাস, কিসমিস-বাদাম নিয়ে। টেবিলে রেখে চলে গেল।

রতিকান্ত বললেন, 'বিলম্বের আর দেরি করে লাভ নেই। শুরু করো।'

জীবনে কখনও গ্লাসে মদ ঢালেনি সুদীপ্ত। কিন্তু বন্ধুদের দেখেছে। সেই আন্দাজে মদ ঢেলে রতিকান্তর দিকে তাকাল। রতিকান্ত মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে। স্কচ হলে নিট খেতাম কিন্তু প্রায় ভরতি করে দাও গ্লাস।'

বিসলারির বোতল খুলে জল ঢেলে গ্লাস এগিয়ে ধরল সুদীপ্ত। এবার উঠে বসলেন রতিকান্ত, 'একটা কথা স্বীকার করতেই হয় খাওয়াটাও একটা পরিশ্রম। তুমি নাও।'

'আমি, আমি খাই না।'

'কেন? তোমার কি লিভার খারাপ?'

'না। মানে—।'

'শোনো, মদের আসরে যে গ্লাস হাতে না নেয় সে ক্রিমিনাল।' রতিকান্ত বললেন, 'আমি মদ খেয়ে যা যা বলব তুমি সুস্থ মাথায় তা মনে রেখে দেবে, নো, এটা চলবে না। ঢালো মদ গ্লাসে। হুঁ-হুঁ। আমার কথা না শুনলে পস্তাবে।'

গ্লাসটা ধরে রাখলেন রতিকান্ত, চুমুক দিলেন না।

হাত কাঁপছিল। কোনওমতে খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে শ্বাস ফেলল সুদীপ্ত। রতিকান্ত চুমুক দিয়ে বললেন, 'ইন্ডিয়ান হুইস্কি প্রথম দিকে চুমুক দিলে গন্ধে গা গোলায়। কিন্তু পরে আর গন্ধটা যে খাচ্ছে সে পায় না। উল্লাস। বলো, উল্লাস।' গ্লাস ওপরে তুললেন রতিকান্ত।

'উল্লাস!' মিনমিনে গলায় বলল সুদীপ্ত। রতিকান্ত যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন শুরুর সময়ে তা লক্ষ করে খুশি হল সে। তুমি কেন, তুই বলুক লোকটা। কিন্তু প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করে স্লট দিয়ে দিক।

মুঠোয় কিসমিস আর বাদাম তুলে মুখে চালান দিচ্ছিল লোকটা। সুদীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, কাল কখন যাব?'

'কোথায়?' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে গলা ভেজালেন রতিকান্ত।

'আপনার কাছে।'

'যাওয়ার কী দরকার? আমি তো নিজেই এসেছি।' আর একটা বড় চুমুক নিলেন রতিকান্ত, 'বেশ ভালো লাগছে হে। পরিচিত কেউ ভাবতেই পারবে না এরকম স্যাবি ঘরে তোমার সঙ্গে বসে আমি ড্রিঙ্ক করছি! ইচ্ছে হলে আমি যে-কোনও ফাইভস্টারে অথবা ক্লাবে বসে স্কচ খেতে পারতাম। মাঝে-মাঝেই করি। বড় একঘেঁয়ে লাগে। যে লোকগুলো সঙ্গে থাকে তাদের ধান্দা থাকে আমার মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে। আরে, তোরা আমাকে টাকা দিবি মুখ খুললেই। কিন্তু টাকা নিয়ে আমি কী করব? এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের অন্তত আটটি মেগাসিরিয়াল থেকে বছরে দু-কোটি টাকা পাচ্ছি। চার বছর গেল। এখন আর ভালো লাগে না। এত টাকা রাখার জায়গাই নেই। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে এই ঘরে বসে নিশ্চিন্তে ড্রিঙ্ক করায় যে আরাম তা কেউ বুঝবে না।' চোখ বন্ধ করলেন রতিকান্ত। তারপর গান ধরলেন। রবীন্দ্রনাথের গান। ভদ্রলোকের গানের গলা ভালো। ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইতে লাগলেন হুইস্কি খেতে-খেতে।

এই সময় দরজায় শব্দ হতেই গান থামালেন রতিকান্ত। ইশারায় সুদীপ্তকে বললেন কে এসেছে দেখতে। সুদীপ্ত উঠল। সে যে তখন থেকে একটা হুইস্কি নিয়েই বসে আছে তা রতিকান্ত দেখার প্রয়োজন মনে করেননি।

সে দরজার একটা পাল্লা সামান্য খুলতেই বেয়ারাকে দেখতে পেল।

'কী দরকার?' সুদীপ্ত জিজ্ঞাসা করল।

'নিচের তলার মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করছেন আপনি যাবেন কিনা?'

'না।'

বেয়ারা চলে গেলে দরজা বন্ধ করল সুদীপ্ত। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেমসাহেবটি কে? কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছ নাকি?'

'না না। আজ মান্ডি হাউসে উনি যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন।'

'মান্ডি হাউসে?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছেন না।'

'কেন? কী দরকার?'

'দুটো সিরিয়াল নাকি বন্ধ হতে চলেছে, আপনাকে রিকোয়েস্ট করবেন বাঁচাতে।'

'উনি প্রোডিউসার? তা কী করে হবে? অবাঙালি?'

'না। বাঙালি।'

'ইম্পসিবল্। ও দুটো বাঙালি প্রোডিউসারের নয়।' রতিকান্ত মাথা নাড়লেন, 'নির্ঘাত দালাল। আমি তোমার কাছে আসব তা জানে না তো?'

'না-না।'

'গুড। এসেছিলাম যে তাও বলার দরকার নেই।'

'কেন বলব? ওই সিরিয়াল দুটো বন্ধ হলে তবেই তো সুযোগ হবে আমাদের।'

'বাঃ। বেশ বুদ্ধি।' বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতে একটু টলে গেলেন রতিকান্ত। তারপর হাত বাড়ালেন, 'কই, দাও।'

'কী দেব?' হকচকিয়ে গেল সুদীপ্ত।

'ন্যাকামি করো না। দেরি হয়ে গেছে বেশ। পিনাকী আমাকে দেওয়ার জন্যে কিছু দেয়নি তোমাকে?' হাতটা বাড়ানোই ছিল।

পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিলটার কথা মনে পড়ল সুদীপ্তর। কিছুক্ষণ আগে লোকটা বলল তার টাকার দরকার নেই!

হাসলেন রতিকান্ত, 'আমি টাকাটা না নিলে পিনাকী খুব দুঃখ পাবে।'

সুদীপ্ত স্যুটকেস খুলল। পঞ্চাশটা হাজাব টাকার নোট। আজ মদ কিনতে খরচ হয়েছে, থাকা-খাওয়ার টাকাও লাগবে। সে দ্রুত পাঁচটা নোট সরিয়ে এগিয়ে ধরতে রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কত আছে ওতে?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'অ্যাঁ! পিনাকী ওই পাঠিয়েছে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে বলেছে আমাকে? ছিঃ। এই জন্যে বাঙালির কিছু হয় না। যে-কোনও অবাঙালি প্রোডিউসার মিনিমাম এক লাখ দিয়ে বউনি করত। টাকাটা পকেটে পুরে আমার সঙ্গে চলো।'

'পকেটে পুরব?'

'হ্যাঁ। পিনাকীর নাম করছ বটে কিন্তু তুমি কে তা আমি জানি না। দরজা খুলে বেরুতেই সি বি আই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ওগুলো ধরলে নোটের ওপর আমার আঙুলের ছাপ পেয়ে যাবে ওরা। সারাজীবনের জন্যে ফেঁসে যাব। তোমার মতলব কী তা তো আমি জানি না। চলো।'

দরজার বাইরে এসে দু-পাশে তাকিয়ে রতিকান্ত সুদীপ্তকে নিয়ে লিফটে ঢুকলেন, 'আমার গাড়িতে উঠে বসে দেবে।'

পার্কিং-এ গাড়ি ছিল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতেই রতিকান্ত পেছনের দরজা খুলে উঠে বসলেন, 'এসো।'

তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন হিন্দিতে, 'রাতের দিল্লিটা এই সাহেব দেখতে চান। একটু ঘুরে বেড়াও।' তারপর চাপা গলায় বললেন, 'বান্ডিলটা পকেট থেকে বের করে আমার পাশে সিটের ওপর রেখে দাও। ড্রাইভার যেন সন্দেহ না করে।'

সুদীপ্ত আদেশ পালন করল। মিনিট দশেক ফালতু ঘোরাঘুরির পর রতিকান্ত নির্দেশ দিলেন ড্রাইভারকে বঙ্গভবনে ফিরে যেতে।

নামবার আগে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কখন যাব?'

'সকাল আটটায় আমাকে বাড়িতে ফোন করো।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে সুদীপ্তর হাতে ধরিয়ে দিলেন রতিকান্ত।

বঙ্গভবন থেকে পিনাকীকে ফোন করল সুদীপ্ত, 'উনি এসেছিলেন। ওই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি। আপনার দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে গিয়েছেন।'

পিনাকীর গলা শুনল। 'ভালো খবর। পুরোটাই?'

'না। ক-দিন থাকতে হবে জানি না, তাই—।'

'ও কে! কবে দেখা করতে বলেছে?'

'কাল সকালে ফোন করলে জানাবেন।'

'গুড লাক্।' পিনাকী ফোন কেটে দিলেন।

ফোনের বিল মিটিয়ে সুদীপ্ত লিফটের দিকে যাচ্ছিল, লোকটা পেছন থেকে ডাকল, 'এই যে, আপনি এই কার্ডটা ফেলে যাচ্ছেন।'

সুদীপ এগিয়ে গিয়ে কার্ডটি নেওয়ার আগেই লোকটি নাম পড়ে ফেলেছে, 'রতিকান্ত চৌধুরী? দূরদর্শনের?'

মাথা নাড়ল সুদীপ্ত।

'উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দেখছি কলকাতা থেকে লোকজনের আসা বেড়ে গেছে। কুসুম দেবীও তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'তা হবে।' সুদীপ্ত আর দাঁড়াল না।

সকালে ঘুম ভাঙল দরজায় শব্দ হওয়ায়। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই কুসুমকে দেখতে পেল সুদীপ্ত। কুসুমের পরনে হাতকাটা ম্যাক্সি।

দেখামাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মহিলা, 'এটা কী হল? আপনি—আপনি—।'

'এক মিনিট, টয়লেট থেকে আসছি।' সুদীপ্ত দ্রুত সরে এল।

দাঁত মাজতে-মাজতে মনে করার চেষ্টা করল সে। কাল রতিকান্ত চৌধুরী তার ঘরে এসেছিলেন একথাটা আর কারও জানার কথা নয় রাত্রে বেরুবার সময় কুসুম ছিলেন না ধারে কাছে। তাহলে এত সকালে ছুটে এলেন কেন?

ঘরে ফিরে সুদীপ্ত দেখল কুসুম এরমধ্যে তিনভাগ শেষ হওয়া মদের বোতল এবং গ্লাস দুটো আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

'কে এসেছিল কাল রাত্রে।' চোখের কোণে তাকালেন কুসুম।

'আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক।'

'দুজনে মিলে দশ পেগ খেয়ে ফেলেছেন? আপনাকে দেখে মনে হয় না তো এত মদ খেতে পারেন। অতটা খাওয়ার পর ভদ্রলোককে এগিয়ে দিতে নিচে নামতে পেরেছিলেন? স্বীকার করছি, ক্ষমতা আছে। এখন বলুন তো কে ওই ভদ্রলোক?'

এইবার ঠাহর করল সুদীপ্ত। কুসুম ওই রিসেপশনিস্টের কাছে শুনেছেন। বেশি কথা বলার

অভ্যেস থাকায় লোকটা ওই কার্ডের গল্প নিশ্চয়ই এঁকেও করেছে। চট করে ঘড়ি দেখল সুদীপ্ত। আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি আছে।

সে হাসল, 'আপনার অনুমান ঠিক।'

'আর অত করে বলা সত্ত্বেও আমাকে ডাকলেন না আপনি। আমি কলকাতা থেকে স্কচ নিয়ে এসেছি ওঁকে গিফ্‌ট দেব বলে। ইস! এই ঘরে উনি অতক্ষণ ছিলেন, ড্রিঙ্ক করেছেন, তার মানে আপনার সব কাজ হয়ে গেছে? তাই না?'

'না। গতরাত্রে ও-বিষয়ে কোনও কথাই হয়নি। আমাকে একটু নিচে যেতে হবে।'

'চা ঘরেই দিয়ে যায়।'

'চা নয়। একটা ফোন করতে হবে আটটার সময়।'

'আমার মোবাইল থেকে করুন। মোবাইল ফোন টেবিলের ওপর রেখে বেল টিপলেন কুসুম, 'আমারও সকালে চা খাওয়া হয়নি।'

বেয়ারা এলে চায়ের হুকুম দিয়ে বসলেন কুসুম, 'কলকাতার কোন পাড়ায় থাকেন?'

'শ্যামবাজারে।'

'আমি আলিপুরে। আপনাদের সিরিয়ালের নাম কী?'

একটু ইতস্তত করল সুদীপ্ত। নামটা বললে যদি কলকাতায় চাউর করে দেয়। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'প্রোডাকশন নাম্বার টু।'

'বাংলা সিরিয়ালের এরকম নাম হয় নাকি?'

'নতুনত্ব হবে বলে রাখা হয়েছে।'

চা এসে গেল। চুপচাপ চা খাচ্ছিল ওরা। কুসুম বললেন, 'সময় হয়ে যাচ্ছে।'

ঘড়ি দেখল সুদীপ্ত। আটটা বাজতে তিন। কার্ডটা বের করে নাম্বার দেখে ডায়াল করল সে। রিং হচ্ছে। তারপর একজন মহিলার গলা পেল, 'হ্যালো।'

'মিস্টার চৌধুরী আছেন?'

'কে বলছেন?'

'সুদীপ্ত। কলকাতা থেকে এসেছি।'

'আমি মিসেস চৌধুরী। আমাকে আধঘণ্টা পরে ফোন করবেন? প্লিজ!'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু—।'

'একটু ধরুন।' ভদ্রমহিলা বোধহয় টেবিলের ওপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। সুদীপ্ত বুঝতে পারছিল না কেন মিসেস চৌধুরী তাকে আধঘণ্টা বাদে ফোন করতে বললেন। কুসুম ইশারায় জানতে চাইলেন, কী কথা হয়েছে? সুদীপ্ত মাথা নেড়ে জানাল কথা না বলতে।

রতিকান্তর গলা কানে এল, 'হ্যালো!'

'আমি সুদীপ্ত।'

'কে, কোন সুদীপ্ত।' বোঝা গেল রতিকান্ত বিরক্ত হয়েছেন।

'পিনাকীবাবু পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে, কাল রাত্রে বঙ্গভবনে—।'

'অ। সকালেই তো ফেরার ট্রেন, দেরি না করে স্টেশনে চলে যাও।'

'কিন্তু—।'

'হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।'

'কিন্তু আপনাকে তো প্রপোজাল দেওয়াই হয়নি। আপনি তো কিছুই জানেন না।'

'আমার জানার দরকার নেই। কলকাতার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, আমি ওদের বলে দেব। ওকে!'

'স্যার। ওখানে কোনও কাজ হবে না আপনি তো সব জানেন।'

'পিনাকীকে বলবে আমার সঙ্গে কথা বলতে।' এবার লাইনটা কেটে দিলেন রতিকান্ত চৌধুরী। হতভম্ব হয়ে রিসিভারটার দিকে তাকাল সুদীপ্ত।

'কী বলল?' কুসুম আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না।

'কলকাতায় ফিরে যেতে বললেন।' সুদীপ্ত হতাশ গলায় বলল।

'তার মানে? আপনার তো কাজ হয়নি।'

'হয়নি।'

'আপনার কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়েছেন।'

'না। দেওয়ার সুযোগ পাইনি।'

'তাহলে? চলে যেতে বললেই চলে যাবেন?'

'কী করব? কী করতে পারি?'

'আবার দেখা করুন।'

'যদি এবার ঢুকতে না দেয়।'

একটু ভাবলেন কুসুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে অতক্ষণ ছিলেন ভদ্রলোক, ঠিক কী-কী কথা হয়েছিল। বলুন তো!'

সুদীপ্ত ভাবল। টাকার কথা এই প্রায়-অচেনা ভদ্রমহিলাকে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যা বলা যায় তাই বলল।

মাথা নাড়লেন কুসুম। তারপর বাঁ-হাতে কানের পাশের চুল সরালেন, 'সুদীপ্ত, এটা একটা যুদ্ধ। আমরা একসঙ্গে না লড়লে হার অনিবার্য। আপনার আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোকের কাছে এরা নিজেদের বাঁধা রেখেছে। চলুন, এগারোটা নাগাদ অফিসে যাই। আমি একজনকে ধরেছি! তিনি আমাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অছিলায় আমরা মিস্টার চৌধুরীর চেম্বারে যাব।'

'আমরা মানে?'

'আপনি আর আমি।'

'আপনাব সঙ্গে উনি আছেন—।'

'উনি আজ না গেলে কোনও ক্ষতি হবে না। উনি সঙ্গে থাকবেন রিসেপশন পর্যন্ত।'

কুসুম উঠলেন। তাঁর ওঠার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে সুদীপ্ত চমৎকৃত হল। ভদ্রমহিলার ফিগার খুবই আকর্ষণীয়। মুখচোখের সৌন্দর্য মাঝারি হলেও সব মিলিয়ে আলাদা চটক আছে।

কুসুম চলে যাওয়ার পর ঘড়ি দেখেই মনে পড়ে গেল। আধঘণ্টার বেশি সময় চলে গিয়েছে। সে চটপট দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে এল।

টেলিফোনের সামনে আজ অন্য লোক। রিসিভার তুলে বোতাম টিপল সুদীপ্ত। রিং হচ্ছে। চারবারেব পর মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'আমি, আমি, সুদীপ্ত, একটু আগে ফোন করেছিলাম—!'

'ও, হ্যাঁ। আপনি তো বঙ্গভবনে উঠেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসছি। ধরুন মিনিট পঁচিশ লাগবে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিসেস চৌধুরী। হকচকিয়ে গেল সুদীপ্ত। রতিকান্ত চৌধুরীর স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কেন? সিরিয়াল অ্যাপ্রুভালের ব্যাপারে ওঁর তো কোনও হাত নেই।

অযথা কল্পনা করে কোনও লাভ নেই। ভদ্রমহিলা এলেই তো সব শোনা যাবে। এগারোটা বাজতে দেরি আছে। কিন্তু মিসেস চৌধুরী যে আসছেন তা কি কুসুমকে জানানো ঠিক হবে? অথচ এগারোটার সময় মান্ডি হাউসে যেতে চেয়েছেন মহিলা। নিশ্চয়ই তার ঘরে আসবেন তাড়া দিতে।

সুদীপ্ত বঙ্গভবনের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক দশটার সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। মধ্যবয়সিনী এক মহিলা ড্রাইভারকে কিছু বলে দরজা খুলতে যেতেই সুদীপ্ত এগিয়ে গেল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মিসেস চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। সুদীপ্ত?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরে লোকজন আছে। হয়তো আপনার অসুবিধে হবে। তাই—।'

'ও।' ভাবলেন মহিলা, 'উঠে আসুন।'

সুদীপ্ত উঠল। হিন্দিভাষীর মতো উচ্চারণে তিনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ট্যাক্সি একটা কফির দোকানের সামনে পৌঁছে গেল। এই সময়টায় একটাও কথা বলেননি মহিলা।

ভাড়া মিটিয়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত দোকানে ঢুকে একটি কোণের টেবিলে গিয়ে বসলেন মিসেস চৌধুরী। সুদীপ্তকে উলটোদিকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন। টিভি সিরিয়ালের জন্যে তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? ওখান থেকে পাওয়া যায় না?'

'অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়। যারা তাড়াতাড়ি পায় তারা দিল্লিতে এসে স্যাংশন করিয়ে নিয়ে যায়।' সুদীপ্ত বলল।

দু-কাপ কফির অর্ডার দিয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'আপনি কী করেন?'

'আমি পরিচালনা করি। কিন্তু কাজ না থাকলে—।'

'রতিকান্ত আপনাকে কাজ দিতে পারে?'

'হ্যাঁ। সবই তো ওঁর হাতে।'

'কিন্তু কেন ও আপনাকে কাজ দেবে?'

'আসলে, সিরিয়ালটি প্রযোজনা করবেন পিনাকীদা, পিনাকী মিত্র। উনি রতিকান্তবাবুর সঙ্গে কলেজে পড়তেন। সেই সুবাদেই ওঁর কাছে এসেছিলাম।'

'কী বললেন তিনি?'

'বলেছেন কলকাতায় ফিরে যেতে। চেষ্টা করবেন কিছু করতে।'

হাসলেন মিসেস চৌধুরী, 'একথায় আপনি আদৌ ভরসা পাচ্ছেন না, তাই তো?'

'কী করব বুঝতে পারছি না। আসলে আমার একজিসটেন্সের জন্যে একটা মেগাসিরিয়াল এখনই পাওয়া দরকার। খুব ভরসা করে এসেছিলাম।' সুদীপ্ত বলল।

'কাল ওকে কত টাকা দিয়েছেন?' সরাসরি তাকালেন মিসেস চৌধুরী।

'মা-মানে!' থিতিয়ে গেল সুদীপ্ত।

এই সময় বেয়ারা এসে কফি দিয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী বললেন, 'কফি খেতে-খেতে কথা বলুন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, যা বলছি তাই করুন।'

গরম কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে সামলে নিল সুদীপ্ত।

'কত দিয়েছেন?'

'পঁয়তাল্লিশ।' কোনওমতে বলল সুদীপ্ত।

'কম দিলেন কেন?'

'কম? মানে?'

'পিনাকীবাবু আপনাকে পঞ্চাশ দিতে বলেছিলেন। তাই না?'

পা ঠান্ডা হয়ে গেল সুদীপ্তর। কথাটা ইনি জানলেন কী করে? কফিতে চুমুক দিয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'কাল রাত্রে কানে এল ও টেলিফোনে বাংলায় কথা বলছে। যাকে বলছে সে যে

বন্ধুলোক তা বুঝলাম। তাকে ধমকে বললে, 'তুই আমাকে ভেবেছিস কী? তোর কাছ থেকে আমি টাকা নেব? তুই আমাকে এতটা আন্ডার-এস্টিমেট করলি যে পরিচালকের হাত দিয়ে পঁয়তাল্লিশ পাঠালি।' বলে ও-পক্ষের কথা শুনে বলেছিল, 'নো পিনাকী, তোর লোক আমাকে পঞ্চাশ দেয়নি, পঁয়তাল্লিশ দিয়েছে। প্রথমেই যে টাকা মারছে তাকে তুই বিশ্বাস করবি কী করে? না-না, তুই পরিচালক চেঞ্জ কর, আমি তোকে দুটো নাম বলতে পারি, তারপর এসে কথা বল, আমি কথা দিচ্ছি তোকে।'

অসাড় হয়ে গেল সুদীপ্ত। রতিকান্তবাবু পিনাকীদার কাছে তাকে চোর প্রমাণ করেছে? পিনাকীদা নিশ্চয়ই মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তার কী হবে? সে দেখল মিসেস চৌধুরী তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

ঠোঁট কামড়াল সে। মিসেস চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পাঁচ সরাতে গেলেন কেন?'

'পিনাকীদা আমার যাতায়াত আর দু-দিনের বঙ্গভবনের থাকা-খাওয়ার টাকা দিয়েছিলেন। কাল যখন রতিকান্তবাবু আমার কাছে আসতে চাইলেন, তখন দামি মদ কিনে রাখতে বলেছিলেন। আমি কখনও মদ খাইনি, কিনিনি। সেটা কিনতে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। আমার ওখানে এসে উনি এত আন্তরিক ভাবে গল্প করছিলেন যে মনে হচ্ছিল আমাকে আরও কয়েকটা দিন এই দিল্লিতে থেকে স্যাংশন লেটার নিয়ে যেতে হবে। আর ততদিনের মধ্যে উনি যদি দু-দিনও আবার আসেন তাহলে দামি মদ কিনতে হবে, সঙ্গে খাবার! এসবের টাকা আমি কোথায় পাব? তা ছাড়া আরও কয়েকদিন থাকলে তার জন্যে খরচও বাড়বে। পিনাকীদার এক আত্মীয়ার বাইপাস করানো হচ্ছে। উনি তাই নিয়ে ব্যস্ত। এই অবস্থায় ওঁর কাছে টাকা চাওয়া ঠিক নয়। পঞ্চাশের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ পেলে রতিকান্তবাবুর কিছু এসে যায় না। কম যে দিয়েছি, পিনাকীদাকে জানিয়েছি, কেন কম দিয়েছি কলকাতায় ফিরে সেটা ওঁকে জানিয়ে দিতাম।'

'কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে যাওয়ার আগে আপনি স্যাংশন লেটার পেয়ে যাবেন।'

'বিশ্বাস করুন দিদি, এর একটাও মিথ্যে নয়।'

'আপনাকে আমি সাহায্য করছি। এই কাগজটা দেখুন, লেখাগুলো মুখস্থ করুন।' ব্যাগ থেকে একটা চিরকুট বের করে সুদীপ্তকে দিলেন মিসেস চৌধুরী।

সুদীপ্ত দেখল পরপর পাঁচটা ব্যাঙ্কের নাম লেখা আছে। সবগুলোই বিদেশি ব্যাঙ্ক। তাদের পাশে পাঁচজন মহিলার নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কী?'

'আপনি আগে মুখস্থ করুন।'

প্রাণপণে মনে রাখতে চাইল সুদীপ্ত। ব্যাঙ্কের নাম এবং মহিলাদের নাম সহজেই মনে গেঁথে গেল কিন্তু অ্যাকাউন্ট নাম্বার কিছুতেই মনে রাখতে পারছে না সে।

সেটা বুঝতে পেরে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'বুঝেছি। প্রথম অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা যেটা সুধা রায়ের নামের পাশে আছে মনে রাখুন।'

তিনবার পড়ে মাথা নাড়ল সুদীপ্ত, 'ঠিক আছে।'

'এবার যান মান্ডি হাউসে। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। অ্যাপিল করুন স্যাংশন লেটারের জন্যে। যদি দিতে না চায় তাহলে ব্যাঙ্কের নামগুলো এবং অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামগুলো ওঁকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো উনি শুনতে চান কিনা—। আপনার কাজ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এগুলো উনি শুনলে কাজ হবে কী করে?'

'ওঁর কোটি-কোটি টাকার কিছুটা এইসব অ্যাকাউন্টে রাখা আছে।'

'ও।'

'যদি জানতে চান আমি কী করে জানলাম?'

'বলবেন, সোর্স বলতে আপনি বাধ্য নন। খবরদার, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে

একথা ভুলেও বলবেন না।'

'না-না।'

চিরকুটটা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে অ্যাশট্রেতে ফেলে তার ওপর কিছুটা কফি ঢেলে দিলেন মিসেস চৌধুরী।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময় মিসেস চৌধুরী বললেন, 'আপনি একটা অটো ধরে চলে যান। আমার সঙ্গে না যাওয়াই ভালো।'

'ঠিক আছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলুন।'

'এত সব গোপন তথ্য দিয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন কেন? আপনি তো আমাকে চেনেন না। রতিকান্তবাবু তো আপনার স্বামী।'

শেষ করতে দিলেন না সুদীপ্তকে, মিসেস চৌধুরী বললেন, 'স্যাংশন লেটার হাতে পেলে আমাকে ফোন করবেন. উত্তরটা তখন দেব।'

ট্যাক্সি চলে গেলে আর একবার নাম এবং নাম্বার ঝালিয়ে নিল সুদীপ্ত। এখন এগারোটা বেজে পনেরো। সর্বনাশ। কুসুমেরা নিশ্চয়ই তার জন্যে বসে না থেকে মান্ডি হাউসে চলে গিয়েছেন। একটা অটো নিয়ে মান্ডি হাউস চলে এল সুদীপ্ত।

রিসেপশনে আজ ভিড় নেই। তাকে দেখেই কুসুম উঠে এলেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন? বঙ্গ ভবনের কেউ বলতে পারল না?'

'একটু কাজ ছিল!'

'এখানে এসেছেন যে কাজটা করতে সেটা না করে কী করে যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুনুন আমি স্লিপ দিয়েছি, আর একজনের নামে। যদি তিনি ডাকেন তাহলে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন!'

'তাঁর কাছে গিয়ে আমি কী করব?'

'উঃ, আপনার কিছু মনে থাকে না। ওর কাছে যাচ্ছি বলে ভেতরে ঢুকে রতিকান্তবাবুর কাছে চলে যাব। রতিকান্ত তো যেতে অনুমতি দেবে না এরা ফোন করলে।'

তখনই কুসুমের নাম ধরে ডাকলেন রিসেপশনিস্ট। কুসুম এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় জানাতে আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাওয়া হল। সেটা দেখার পর একটা পাস ইস্যু করলেন রিসেপশনিস্ট। কুসুম বললেন, 'আমরা দুজন।'

লোকটি একটু বিরক্ত হলেও 'টু' লিখে দিলেন।

'আসুন সুদীপ্ত।' ভেতরের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন কুসুম, তাঁকে অনুসরণ করল সুদীপ্ত। কুসুমের সঙ্গে যে লোকটি কলকাতা থেকে এসেছেন তিনি বেশ হতাশ হলেন।

পাস দেখিয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মিলল। প্রথমে লন, রাস্তা।

কুসুম বললেন, 'প্রথমটা আমি ম্যানেজ করলাম, দ্বিতীয়টা করার দায়িত্ব আপনার।'

'মানে?'

'আমাকে নিয়ে রতিকান্তর চেম্বারে ঢোকার ব্যবস্থা করুন।' কুসুম বললেন, 'তার আগে একটু এলোমেলো ঘুরি যাতে কেউ বুঝতে না পারে।'

শেষপর্যন্ত রতিকান্ত চৌধুরীর ফ্লোরে উঠল ওরা। কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে রতিকান্তর সামনে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ওঁকে কীভাবে কাটানো যায় ভেবে পাচ্ছিল না সুদীপ্ত। একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটছেন ভদ্রমহিলা। এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ওঁকে সহ্য হচ্ছিল না তার।

রতিকান্তর অপেক্ষাগৃহে গিয়ে শুনল সাহেব মিটিং-এ গেছেন।

স্লিপ দিল সুদীপ্ত। কুসুম বলল, 'পাশে আমার নামটাও লিখে দিন।'

তাই লিখল সে। চারজন অবাঙালি ভদ্রলোক তাদের আগে থেকে অপেক্ষা করছেন ওখানে।

কুসুম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সিমলায় গিয়েছেন?'

'না।'

'যদি স্যাংশন লেটার পেয়ে যাই তাহলে আপনাতে আমাতে সিমলায় যাব। ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার হবে। রাজি।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন—।'

'দূর। মোস্ট বোরিং। ওকে ভাবছি আজই কলকাতায় ফিরে যেতে বলব।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর রতিকান্তর দর্শন পাওয়া গেল। হন-হন করে নিজের চেম্বারের দিকে আসছেন। সুদীপ্ত উঠে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল। রতিকান্ত ঘরে ঢোকার আগে সেটা দেখতে পেয়ে চোখ ছোট করলেন। বোঝা গেল খুব বিরক্ত হয়েছেন। ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

কুসুম জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুখটা ওরকম করল কেন?'

সুদীপ্ত জবাব দিল না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বেয়ারা বেরিয়ে এসে সুদীপ্তর সামনে দাঁড়াল, 'আপনি সুদীপ্ত? সাহেব আপনাকে এখনই ভেতরে যেতে বললেন।'

সুদীপ্ত নার্ভাস বোধ করল। সে পা বাড়াতে কুসুমও সঙ্গ নিল। বেয়ারা তাকে বলল, 'আপনি অপেক্ষা করুন। এখন আপনাকে ডাকেনি।'

'আমি ওর সঙ্গে আছি।' প্রতিবাদ করল কুসুম।

'উনি গিয়ে কথা বলার পর সাহেব ডাকলে যাবেন।'

কুসুম কাতর গলায় বললেন, 'সুদীপ্ত, ওঁকে আমার কথা বলবেন!'

ভেতরে ঢুকল সুদীপ্ত। সোজা হয়ে বসেছিলেন রতিকান্ত চৌধুরী, দেখামাত্র ফোঁস করে উঠলেন, 'তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে পারমিশন দিয়েছে ভেতরে ঢুকতে?'

'আর একজনের সঙ্গে দরকার ছিল, ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই!'

'লায়ার। চিট! তুমি মিথ্যে কথা বলে আমার এখানে এসেছ! আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। এখানে মিথ্যে কথা বলে ঢোকা মানে তুমি স্যাভোটাজ করতে এসেছ! আমার সঙ্গে চিটিং করে আবার দেখা করতে এসেছ?' ফুঁসলেন রতিকান্ত।

'স্যার! আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না! কাল তুমি পাঁচ হাজার সরিয়ে রাখনি? গেট আউট। বেরিয়ে যাও।'

'আপনি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছেন।'

'কোনও কথা শুনতে চাই না।'

'এক মিনিট। একটা কথা বলতে দিন।'

'কী বলবে তুমি?'

'একটা কাগজ দিন, প্লিজ। না থাক। সিটি ব্যাঙ্ক, স্ট্যান চার্টার্ড, এইচ এস বি সি, আমেরিকান এক্সপ্রেস, ব্যাঙ্ক অফ সুদানের নাম তো আপনার জানা, তাই না?'

'ইয়ার্কি মারছ আমার সঙ্গে?'

'আপনি কী করে ভাবলেন? আমার সাহস আছে? আচ্ছা, এই নামগুলো ওইসব ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িয়ে দিলে কেমন হয়? সুধা রায়, শর্মিলা ডাট, সরস্বতী সেন, মাওবী গুপ্তা, কুন্তী দাস।' সুদীপ্ত তাকাল।

সঙ্গে-সঙ্গে কীরকম মিইয়ে গেলেন ভদ্রলোক। চোয়াল ঝুলে পড়ল। মুখের চেহারা বদলে গেল আচমকা, 'এসব কী? কে এঁরা?'

'এদের নামে ওইসব ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে।'

'অ্যাকাউন্ট?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি, তুমি জানলে কী করে?'

'জেনেছি। আপনি বলুন ওই পাঁচ হাজার যা আপনি বলেছেন আমি চুরি করেছি, তা কার অ্যাকাউন্টে রাখব? সুধা রায়ের অ্যাকাউন্টে রাখি?' একটা কাগজ টেনে নিয়ে অ্যাকাউন্ট নম্বর লিখে এগিয়ে দিল সুদীপ্ত, 'এই নম্বর তো?'

'অসম্ভব!' নাম্বারটা দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন রতিকান্ত, 'তুমি কী করে জানলে?'

'যে করেই হোক জেনেছি। আপনি পুলিশ ডাকবেন বলছিলেন। ডাকুন। আমার না হয় দিন সাতেক জেল হবে। কিন্তু আমি নম্বরগুলো সি বি আইকে দিতে বাধ্য হলে আপনি আমাকে দোষ দেবেন না স্যার।' সুদীপ্ত এই প্রথমবার হাসল।

ইশারায় বসতে বললেন রতিকান্ত। সুদীপ্ত বসল।

চোখ বন্ধ করে বললেন, 'প্রপোজাল সঙ্গে এনেছ?'

'হ্যাঁ স্যার। এই যে।'

ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে এগিয়ে দিল সে। পাতা ওলটালেন রতিকান্ত। 'বাঃ, নামকরা লেখকের গল্প। দুশো যাট পর্যন্ত পাবে। তারমধ্যে টি আর পি ভালো থাকলে এসে কথা বলবে।' বেল বাজালেন রতিকান্ত।

বেয়ারা ঢুকল। রতিকান্ত বললেন, 'রিসিভিং থেকে সিল মেরে নিয়ে এসো।'

বেয়ারা চলে গেলে রতিকান্ত বললেন, 'এই পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না হে। নাঃ, টাকার ওপর আজ থেকে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কাল তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ঠিক হয়নি। যাক গে। মন দিয়ে কাজটা করবে। পিনাকীকে এসব বলার দরকার নেই। বুঝেছ?'

মাথা নাড়ল সুদীপ্ত।

'এই স্লিপে কুসুম বলে কার কথা লিখেছ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যার কথা কাল বলেছিলাম।' বেল বাজালেন রতিকান্ত। ওঁর সেক্রেটারি ঘরে এল, 'ইয়েস স্যার।'

'বেয়ারাকে কাজে পাঠিয়েছি। এক ভদ্রমহিলা, নাম কুসুম, বাইরে অপেক্ষা করছেন, একটু দেখুন তো!'

কুসুম ঘরে এসে মিষ্টি হাসলেন, 'আমার কী সৌভাগ্য, আপনার দেখা পেলাম। এত আপনার নাম শুনেছি।'

'শুনুন। দুটো সিরিয়ালকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কোনটাকে এক্সটেনশন দিলে আপনার লাভ হবে চটপট বলুন।'

'আমার লাভ!' বুকে হাত দিলেন মহিলা।

'সুদীপ্তর অনুরোধে একটাকে এক্সটেনশন দিতে পারি।'

'প্লিজ, দুটোকেই দিন।'

'অসম্ভব।'

'তাহলে!' একটু ভেবে নাম বললেন মহিলা, 'অন্তত একশো কুড়িটা দিন।'

'কত থাকবে আপনার?'

'কী যে বলেন?' লজ্জায় নুইয়ে গেলেন মহিলা।

এই সময় বেয়ারা প্রপোজালটা ফেরত নিয়ে এল ট্যাম্প মেরে। ভালো করে দেখে নিয়ে রতিকান্ত বেয়ারাকে বললেন, 'সেক্রেটারিকে দিয়ে এসো।' দেওয়ার আগে একটা টিক মারলেন ওপরে।

বেয়ারা চলে গেলে রতিকান্ত কুসুমকে বললেন, 'আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন, আধঘণ্টা পরে অর্ডারের কপি পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' কুসুম বেরিয়ে গেলেন।

'নাউ সুদীপ্ত। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। টেল মি, কে তোমাকে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে?' রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

'জেনে আপনার কী লাভ স্যার?'

'শত্রুদের সম্পর্কে সজাগ হতে পারব।'

'আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি এসব কথা তৃতীয় ব্যক্তি জানবে না।'

'সুদীপ্ত, তোমাকে স্যাংশন লেটার দিচ্ছি, সামনের মাস থেকে তোমার টেলিকাস্ট ডেট পেয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে পঁচিশ বা পঞ্চাশ এপিসোডের পর ওটাকে বন্ধ করা যাবে না। আমাদের আইন অনুযায়ী যে-কোনও সিরিয়ালকে সাবস্ট্যান্ডার্ড মনে করলে বন্ধ করতে পারি। সেটা হবে কিনা তা নির্ভর করছে তোমার আচরণের ওপর। যাও, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। সেক্রেটারি তোমাদের ডাকবেন।' রতিকান্ত রিসিভার তুলে নিলেন কারও সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

দেড়ঘণ্টা পরে ওরা ফিরে এল বঙ্গভবনে। ঘরে ঢোকামাত্র কুসুম সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমি আজই রাজধানী ধরব।'

সুদীপ্ত হাসল, 'সেকি? সিমলায় যাওয়ার কথা ছিল না?'

'দুটো হলে যেতাম। তা ছাড়া ওই ভদ্রলোককে কাটিয়ে দিলে কলকাতায় ফিরে গিয়ে বদনাম করবেন। যাই, তৈরি হই।' কুসুম বেরিয়ে গেলেন।

নিচে নেমে ফোন করল সুদীপ্ত। মিসেস চৌধুরীর গলা পেয়ে বলল, 'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব? স্যাংশন লেটার পেয়ে গেছি!'

'কীসের স্যাংশন লেটার?'

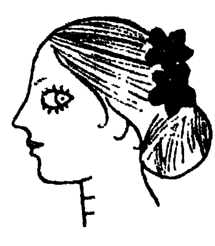
'মেগাসিরিয়ালের।' অবাক হল সুদীপ্ত, 'আপনি বলেছিলেন ফোন করতে।'

'আমি? আপনি ভুল করছেন।'

'আপনি মিসেস চৌধুরী, মানে রতিকান্ত চৌধুরীর স্ত্রী নন?'

'অবশ্যই। কিন্তু সুদীপ্ত নামে কাউকে আমি চিনি না ভাই।'

লাইন কেটে গেল। হতভম্ব সুদীপ্ত। এটা কী হল? তারপর একটু-একটু করে মিসেস চৌধুরীর আচরণের মানে তৈরি করে নিল। ভদ্রমহিলার ওপর শ্রদ্ধা জন্মাল তার মনে।



পত্রজাত প্রেম

সকালের ডাকে চিঠিটা এসেছিল। অফিসে বেরুবার সময় লেটার বক্সের কাচে সেটার অবস্থান দেখে বিপ্লব চেঁচিয়ে বলে গিয়েছিল, 'লেটার বক্সে চিঠি আছে।'

এই বাড়িতে চিঠি মানে হল ইলেকট্রিক বা টেলিফোন কোম্পানির বিল অথবা ইনসুরেন্স কোম্পানির রিমাইন্ডার। হাতের কাজ শেষ করে চিঠি দেখতে বসেছিল অঞ্জনা। এখন অফুরন্ত সময়। বেলা একটা নাগাদ ধীরে সুস্থে স্নান সেরে ভাত খেয়ে আবার সিরিয়াল দেখা। দুপুরে ঘুমায় না শরীরে চর্বি জমার ভয়ে। বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক, বাচ্চা হয়নি। প্রথমদিকে ওষুধ খেতো অঞ্জনা। সেটা বছর দেড়েক। তারপর যখন বাচ্চার সখ হল তখন সেটা বন্ধ। কিন্তু তবু কিছুই হচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত মাসখানেক হল পরীক্ষা করিয়েছে বিপ্লব ভালো ডাক্তারণীকে দিয়ে। তিনি বলেছেন অঞ্জনার কোনও ত্রুটি নেই। এবার বিপ্লবকে করাতে হবে।

স্বামীর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল অঞ্জনা খুব অস্বস্তিতে আছে। অফিসে কাজের চাপ বেড়ে গেছে বলে আপাতত এড়িয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভেবেছে অঞ্জনা। যদি দেখা যায় বিপ্লবেরই ত্রুটি তাহলে কী হবে? ফোন করেছিল সে ডাক্তারণীকে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তাহলেও মা হতে পারবে অঞ্জনা। নলজাত শিশুদের তো ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে সমাজ।

স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়ল। চাবি বের করে দরজা খুলে রাস্তাটা দেখল অঞ্জনা। সুনসান রাস্তা। একেই পাড়াটা নির্জন, দুপুরের দিকে নির্জনতা আরও বেড়ে যায়। তালা খুলে মাথা বাড়াল অঞ্জনা। ইলেকট্রিকের বিল এসেছে সেটা বের করতেই খামটাকে দেখতে পেল। খামটা তুলতেই নিজের নাম ঠিকানা লেখা দেখে অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাক্সে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে সে খামটাকে উলটে-পালটে দেখল। হাতের লেখা তার অচেনা। ইলেকট্রিকের বিল বিপ্লবের টেবিলে রেখে চেয়ারে বসে সন্তর্পণে খামের মুখ খুলে ভাঁজ করা কাগজটা বের করল সে।

'অনু শেষপর্যন্ত তোমার ঠিকানা পেলাম। এ যেন বছরের-পর-বছর গভীর জলের নিচে দমবন্ধ করে পড়ে থাকার পর হুস করে ওপরে উঠে বুক ভরে বাতাস নেওয়া। অনু, তুমি এখন কেমন আছ? তোমার ওই চোখ দুটো আমি আজও ভুলতে পারি না। তোমাকে ভালোবেসে যাব শেষ শ্বাস ফেলা পর্যন্ত। স।'

শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। কে এই স? কে তাকে অনু বলে ডাকত? নিশ্চয়ই বিয়ের আগে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বারাকপুরের নোনা চন্দনপুরের কত ছেলেই তো যেচে তার সঙ্গে কথা বলত। কেউ-কেউ প্রেমের প্রস্তাবও দিয়েছিল। মনে করে তিনজনের মুখ দেখল অঞ্জনা। নামগুলো হুট করে মনে এল। পরিমল, তপন, গৌতম। কারও নামের প্রথম অক্ষর স নয়। তাহলে এই স কে?

খেতে বসেও অস্বস্তি গেল না। তবে কি বারাকপুরের কেউ নয়। কলেজে পড়ায় সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে দাদার ওখানে বেড়াতে গিয়ে দিন-কুড়ি থেকেছিল সে। দিল্লিতে। কিন্তু সেখানে তো কেউ তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি। একটা ছেলে, তখনই চাকরি করে, নাম সন্তোষ। দূর সন্তোষ কী করে হবে! সন্তোষকে নিয়ে সে দিদির সঙ্গে হাসাহাসি করত। মায়ের সঙ্গে থাকত পাশের বাড়িতে। বউদি তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'কী ব্যাপার? কবে বিয়ের নেমন্তন্ন খাব?'

একগাল হেসে সন্তোষ জবাব দিত, 'মা তো মেয়ে দেখছে, পছন্দ হলেই—।'

'কার পছন্দ? আপনার না আপনার মায়ের?'

'কী যে বলেন? আমি মেয়েদের কী জানি যে পছন্দ করব! মা যাকে বলবেন। তবে কলকাতার মেয়ে নয়। মা বলেছেন কলকাতার মেয়েদের আমি ম্যানেজ করতে পারব না।'

'সেকি? কেন এমন ধারণা হল?'

'শুনেছি কলকাতার মেয়েরা খুব দেমাকি হয়।'

সন্তোষ চলে যেতে বউদির কী হাসি। থামতেই চায় না। অঞ্জনাও না হেসে পারেনি। তবে সেই সময় একটু রাগও হয়েছিল। অযথা কলকাতার মেয়েদের বদনাম করছে লোকটা।

না...। কে তার জন্যে এত ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে আছে? বিপ্লব শুনলে চিঠিটা দেখতে চাইবে। আচ্ছা হাতে সময় থাকলে লেটারবক্স খুলে খামটা বের করে বিপ্লব বলত, 'তোমার চিঠি?' খামের মুখে ছিঁড়ে নিজে চিঠিটা বের করত না কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকত শোনার জন্যে, কে চিঠি লিখেছে তারপর প্রশ্নের-পর-প্রশ্নে জেরবার করে তুলত তাকে।

চিঠিটাকে ছিঁড়তে গিয়ে ছিঁড়ল না অঞ্জনা, ঠিকানা দূরের কথা পুরো নামই যে চিঠিতে নেই

—সেটা রাখার কোনও যুক্তি নেই। তবু রাখল সে। আলমারি খুলে সবচেয়ে নিচের শাড়ির ভাঁজ। এই আলমারিতে হাত দেয় না বিপ্লব।

সন্ধের পর বিপ্লব বাড়ি ফিরল চাইনিজ খাবারের প্যাকেট নিয়ে। মেজাজ ভালো থাকলে ও মাঝে-মাঝে খাবার আনে। হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পালটে বা খেতে খেতে অফিসে যা-যা হয়েছে সব বলে গেল। ওর এক সহকর্মিনী, যিনি বিবাহিতা এবং সন্তানের মা, আর একজন সহকর্মীর প্রেমে পড়েছেন, ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন সহকর্মীর স্ত্রী। এ নিয়ে জোর নাটক চলছে।

শুনতে-শুনতে অঞ্জনা ফস করে বলে ফেলল, আচ্ছা কোনও মেয়ে যদি এসে দাবি করে যে সে তোমাকে ভালোবাসে তাহলে কী হবে?

'দূর! এরকম দাবি করার সুযোগই দিইনি কাউকে।'

'আহা, তুমি দাওনি, সে হয়তো মনে-মনে ভালোবেসেছে তোমাকে।'

বউ-এর মুখের দিকে তাকাল বিপ্লব, 'দুপুরের বাংলা সিরিয়াল?'

'ধরে নাও তাই। তুমি জানতে না কেউ তোমাকে ভালোবাসে। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। তুমি যখন নিজেকে খুব একা ভাবছ তখন সেই মেয়েটির কথা জানতে পাবলে সে এখনও তোমাকে ভালোবাসে। তুমি কী করবে?'

'কতদিন পরে জানা গেল?'

'ধরো, কুড়ি বছর!'

'তাহলে তো সে বুড়ি হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আমাকে কেউ ভালোবাসে শুনলেই আমার মনে তার জন্য প্রেম আসবে কেন? যত্তসব?'

আলোচনা শেষ করে দিয়েছিল বিপ্লব। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সংসার গুছিয়ে অঞ্জনা যখন বিছানায় এল তখন বিপ্লবের চোখ বন্ধ। খুব রাগ হয়ে গেল অঞ্জনার। স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সক্রিয় করতে চাইল সে। বিপ্লব বিরক্ত হল। কিন্তু শেষপর্যন্ত রোবটের মতো আচরণ করে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই সে তৃপ্ত হয়ে যেন নিষ্কৃতি পেল। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অঞ্জনার শরীরে তখন আগুন. যা নেভানোর ক্ষমতা বিপ্লবের নেই। কিংবা শরীরে-শরীরে যে আগুন জ্বলে তা নিভিয়ে দেওয়ার কথা পৃথিবীর অনেক পুরুষের মতো বিপ্লবও জানে না। চুপচাপ থাকল অঞ্জনা।

সাতদিন বাদে দ্বিতীয় চিঠিটা এল। এল বিকেলের ডাকে যখন বিপ্লব আসে। একই হাতের লেখা, সম্বোধনও একই। 'অনু, তুমি নিশ্চয়ই আবার আমার চিঠি পেয়েছ। ধরে নিচ্ছি সেই চিঠি তোমার স্বামী পড়েননি, তোমার বাড়িতে কি ফোন নেই? নাম্বারটা পেলে আর চিঠি লিখতে হত না। চোখ বন্ধ করলেই তোমাকে দেখতে পাই। তোমার তাকানোর ভঙ্গিমা, এত দিন পরেও মনে আছে, অন্যসব মেয়েদের থেকে আলাদা। এখনও সেভাবেই তাকাও তো! তোমার স।'

আজ খুব রাগ হল। লোকটা পেয়েছে কী? মেঘের আড়ালে থেকে তীর ছুঁড়ে মজা দেখবে? বিপ্লব বাড়িতে ফেরামাত্র সে প্রথম পাওয়া চিঠিটা বের করে সামনে রাখল।

বিপ্লব অবাক হল, 'কী?'

'পড়ে দ্যাখো।'

চোখ বুলিয়ে বিপ্লব হতভম্ব, 'কে এই স?'

'জানি না। এরকম কোনও লোকের সঙ্গে আমার কখনও আলাপ হয়নি।'

'তাহলে তোমাকে এই চিঠি লিখল কেন?'

'এর উত্তর আমি কি করে দেব? আমিই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

'লোকটা ফোন করেছিল?'

'না।'

'বিয়ের আগে তুমি কি কারও সঙ্গে—?'

'না। স আদ্যক্ষরের কাউকে আমি চিনি না।'

'মহা মুশকিল। একেবারে উটকো লোক তোমাকে প্রেমপত্র পাঠাল!'

'তার মানে তুমি কি ভাবছ আমি ওই লোকটাকে চিনি, চেপে যাচ্ছি এখন, আচ্ছা, ও যদি আমার প্রেমিক হত তাহলে চিঠিটা তোমাকে দেখাতাম?'

'তা ঠিক, দ্যাখো, ওয়েট করো, আর চিঠি লেখে কিনা—।'

যে চিঠিটা আজ এসেছে সেটার কথা বলল না অঞ্জনা। মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'একটা বাচ্চা হয়ে গেলে বেঁচে যেতাম।'

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। চলো, কালই ডাক্তারের কাছে যাই।'

'তোমার ব্যাপার আমি যাব কেন?'

'না। আমার একা যেতে অস্বস্তি হচ্ছে তুমিও চলো।'

পরীক্ষা শেষ হলে ডাক্তার রায় দিলেন বিপ্লবের পক্ষে কখনওই বাবা হওয়া সম্ভব নয়। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আপনার স্ত্রী ইচ্ছা করলেই টেস্টটিউব বেবির মা হতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি বাবা হতে পারবেন।'

গুম হয়ে গেল বিপ্লব। ওর দিকে তাকিয়ে যাবতীয় হতাশা, আক্ষেপ একটু-একটু করে গিলে ফেলল অঞ্জনা। বিপ্লবকে শুনিয়ে বলল, 'বাঁচা গেল। চারপাশ তো দেখতে পাচ্ছি, কষ্ট করে বড় করতাম, তারপর স্বার্থপরের মতো চলে যেত। তার চেয়ে এই ভালো।'

কয়েকদিন বিপ্লব একটু বেশিরকমের চুপচাপ ছিল। তার সহকর্মী বন্ধু সব শুনে পরামর্শ দিল, 'দ্যাখ ভাই, বউ বলেছে ছেলেটা আমার তাই জানছি আমি। একটার বেশি তো সন্তান নেই, তাই ওর ওপর বিশ্বাস রাখা ছাড়া উপায় নেই। তুই চিন্তা করছিস কেন? মহাভারতের দিকে তাকা। পাঁচ পাণ্ডবের বাবা কুন্তীর স্বামী নয়। রাম-লক্ষ্মণদের বাবা দশরথ নয়। বংশ রক্ষার জন্য তখন স্ত্রীর সন্তানকে নিজের সন্তান বলে মেনে নিত পুরুষরা। এখন তো আমরা চাই না অন্য পুরুষের কাছে স্ত্রীকে পাঠাতে। কিন্তু তার বদলে টেস্টটিউব বেবি পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। একেবারে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। রাজি হয়ে যা।' বিপ্লব মৃদু প্রতিবাদ করেছিল, 'কিন্তু কার না কার—!'

'সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরি হয়। সেই ওষুধ নেওয়ার সময় আমরা কি জানতে চাই কোন সাপের বিষ থেকে তৈরি হয়েছে? এও তেমনি। তোরা কেউ জানতেই পারবি না কি থেকে কী হল!' বন্ধু উপদেশ দিল।

অঞ্জনারও চোখ মুখে হতাশার ছায়া। বিপ্লবের কথা শুনে বলে উঠল, 'যা। অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব?' বিপ্লব মরিয়া হল।

'চিনি না জানি না, কী যে বলো! তা ছাড়া বাচ্চা বড় হলে তাকে কী জবাব দেব?'

'জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই হবে না কারণ সে জানতে পারবে না। তা ছাড়া চেনাজানা লোকের তো দরকার নেই। তার পরিচয় ডাক্তার তোমাকে দেবেনই না।'

একটু-একটু করে নিমরাজি হল অঞ্জনা। বিপ্লব তাকে নিয়ে দুবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। তিনি ওদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

তৃতীয় চিঠিটা এল এই সময়, 'অনু কাল তোমাকে দেখলাম। একঝলক। তুমি জানলায় দাঁড়িয়েছিলে। চোখ পড়তেই সরে গেলে। তুমি কি আমাকে দেখেছিলে? কী জানি? দেখলাম তুমি সেই আগের মতনই আছ। বড় ইচ্ছে করছে, একদিন তোমার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে। দাঁড়ালে দরজা কি খুলবে না অনু? তোমার 'স।'

নেকু! শব্দটা আপনা থেকেই মনে উঠল। পুরুষ মানুষই এরকম ন্যাকামি করতে পারে। যে চিনতে পারছে না তাকে প্রেমপত্র দিচ্ছে! ছ্যা। তবে চিঠির কথা বলল না বিপ্লবকে, শেষপর্যন্ত

ডাক্তার খবর দিয়েছেন, আগামী পরশু সকালে যেতে হবে নার্সিংহোমে, সন্ধেবেলায় বাড়ি এসে বিপ্লব জানাল, নার্সিংহোম থেকে ফিরে এসে ঠিক কী ভাবে চলতে হবে সব তিনি অঞ্জনাকে বুঝিয়ে দেবেন। রাত্রে পাশে শুয়ে অঞ্জনা বুঝতে পারছিল বিপ্লব বেশ নার্ভাস। সে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বিপ্লব অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে অঞ্জনা যখন টিভির সামনে তখন বেল বাজল। সেলস গার্লগুলো এসময় প্রায়ই বিরক্ত করে, দ্বিতীয়বার বেল শোনার পর ব্যাজার মুখে উঠে দরজা খুলল অঞ্জনা। সঙ্গে-সঙ্গে তিনজন ছেলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে: অঞ্জনা চিৎকার করল ঃ একী? কে আপনারা? কেন ঢুকছেন?'

'চিৎকার করবেন না। আপনার কোনও ক্ষতি করব না।' একজন বলল।

'কে আপনারা?'

'চিনবেন না। আমাদের বউদি পাঠিয়েছেন।'

'বউদি?' অবাক হল অঞ্জনা।

'যার স্বামী আপনাকে চিঠি লেখে। সেই চিঠিগুলো চাই। বুঝতেই পারছেন আমরা বেকার ছেলে। তিনজনের তিন হাজার পকেটে আসবে।'

'কার চিঠির কথা বলছেন আপনারা?'

'সত্যরঞ্জন মিত্র। বউদি জানতে পেরেছেন উনি আপনাকে প্রেমপত্র লেখেন।'

'কী করে জানলেন?'

'ওর নাকি প্রেমপত্র লেখা অভ্যেস। আপনার কথা আমরা চাপ দিয়ে বের করেছি। এখন চুপচাপ চিঠিগুলো দিয়ে ভাইদের উপকার করুন।'

'কিন্তু আমি ওকে চিনি না। ওই নামের কেউ—।'

'তাও বলেছে সত্যদা! আপনাকে জানলায় দেখে প্রেমপত্র লিখেছে।'

নির্দ্বিধায় চিঠি তিনটে দিয়ে দিল অঞ্জনা। তারপর কীরকম জীবনে খালি-খালি লাগছিল তার। হঠাৎ মনে হল তার জীবনে এখন প্রেম নেই। বিপ্লব প্রেমের কথা বলতে জানে না। নকল বাবা হওয়ার জন্য সে এখন মরিয়া। এই চিঠিগুলো তাকে বিরক্ত করলেও কোথাও একটা ভালো লাগা তৈরি করত। নলজাত সন্তানের মতো চিঠিজাত প্রেমও যে জরুরি তা এই প্রথম উপলব্ধি করল অঞ্জনা।



কাঠঠোকরা

দপ্তর থেকে ইস্যু করা পাশ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তেও একটা বার্থ পেয়ে গেল হরিপদ। এই ট্রেনের নাম দার্জিলিং মেল। আগে ছাড়ত সন্ধেবেলায়, এখন দশটার পরে। নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যায়। অর্থাৎ কাল ট্রেন থেকে নেমে আবার তাকে বাস ধরতে হবে।

বারোটা বছর যেন হুস করে চলে গেল।

চালসার মোড়ে ফটিকের মুদির দোকানে গিয়েছিল হরিপদ। লিস্ট অনুযায়ী জিনিস কিনতে হবে। লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বিড়ি বের করে কানের কাছে টিপতেই কথাগুলো শুনতে পেল, 'আমার যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকত তাহলে জলপাইগুড়িতে চলে যেতাম।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'দুর। অত কষ্ট আমাদের জন্যে নয়। মিলিটারিতে ঢুকবে পাঞ্জাবি, গোর্খারা। আমাদের জন্যে কেরানির চাকরি ভালো।'

দুজনকেই চেনে হরিপদ। কাজকর্ম নেই, দিনরাত মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার গোরাদা?'

প্রথমজন বলল, 'আজ এগারটা থেকে জলপাইগুড়ির চাঁদমারির মাঠে মিলিটারিতে সেপাই-এর চাকরির জন্যে লোক নেবে। খাওয়া-থাকা ফ্রি, প্লাস মাইনে। তোমার তো চেহারা ভালো। যাও না, কপালে থাকলে চাকরি পেয়ে যেতে পারো। আর কতকাল লোকের বাড়িতে চাকর হয়ে থাকবে!'

কথাটা একটুও ভালো লাগেনি হরিপদর। তাকে চাকর হিসাবে দ্যাখে না বুড়ো কর্তা। বুড়ো কর্তার মেয়ে, যিনি বিয়ে-থা করেননি, স্কুলে দিদিমণির কাজ করেন, সবাই তাঁকে বড়দি বলে তাই হরিপদও বড়দি বলে ডাকে, খুবই স্নেহ করেন। সেই আট বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসার সময় সে দলছুট হয়ে গিয়েছিল। আজ অবধি নিজের বাবা-মাকে খুঁজে পায়নি। চ্যাংড়াবান্ধা থেকে চালসা চলে এসেছিল বাসে চেপে। খিদের জ্বালায় এবং ভয়ে কাঁদছিল ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। লোকজন অনেক প্রশ্ন করেও হদিশ না পেয়ে বুড়ো কর্তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। বুড়ো কর্তা বলেছিলেন, 'দেখে-শুনে চোর-ছ্যাঁচোড় বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতই উদ্বাস্তু। থাক এ-বাড়িতে।' দিদিমণি—মেয়েকে ডেকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, মানুষ করতে পারো কিনা।'

হ্যাঁ, নাম সই করা আর অ আ ক খ এবং এ বি সি ডি-র বেশি বিদ্যে মেরে-ধরেও শেখাতে পারেননি বড়দি। কিন্তু ফাইফরমাস খাটার ব্যাপারে দক্ষতা দেখাতে লাগল হরিপদ। তেরো-চৌদ্দতে ওই বাড়ির অপরিহার্য হয়ে উঠল। সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তখন থেকে তার ওপর। সেই সঙ্গে তার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পেল। বুড়ো কর্তা তাকে ব্যায়াম করতে শেখালেন। চৌদ্দ বছরেই তাকে সতেরো বলে মনে হত। বিড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোনও শখ নেই। বুড়ো কর্তা প্রত্যেক মাসের এক তারিখে তার হাতে দশটা টাকা দিতেন। বলতেন, 'পরিশ্রম করছ তার বদলে পারিশ্রমিক তোমার প্রাপ্য।' কিন্তু বড়দি সেটা নিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলতেন, 'এটা তোর নামে পোস্ট অফিসে জমাব।'

সে বড় সুখের দিন ছিল। পাঁচ টাকায় রাজার মতো থাকা যেত। দুটো টাকার বিড়িতেই মাস চলে যেত। বাকি তিনটে টাকা খরচ করার জায়গা পাওয়া যেত না। সবই তো বাড়িতে প'ওয়া যেত। মাসে চারদিন সোওয়া পাঁচ আনার টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে শুরু করল সে। আর সেখানেই বাসন্তীর সঙ্গে আলাপ।

সে সিনেমা দেখতে যেত প্রত্যেক শুক্রবার ম্যাটিনি শো-তে। ওই সময় বুড়ো কর্তা ঘুমোন। বড়দি স্কুলে থাকেন। হাতের কাজ শেষ। তাই পাজামা শার্ট পরে সিনেমা হলে পৌঁছে সোওয়া পাঁচ আনার লাইনে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখল তেমন দর্শক নেই। সামান্য ভিড়। একজন মধ্যবয়সিনী আর তরুণী একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হরিপদর মনে হল সিনেমাটা ভালো নয় বলে লোকে দেখতে আসেনি। সে কী করবে ভাবছিল এই সময় ওই মধ্যবয়সিনী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি টিকিট কিনবেন?'

সতেরো বছরের অভিজ্ঞতায় কেউ তাকে আপনি বলেনি। সে ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নেড়েছিল, 'না-না। আমি সোওয়া পাঁচ আনায় সিনেমা দেখি।'

'আহা। আপনার কাছে টিকিটের দাম চাইছি নাকি! একটা টিকিট বেশি হয়েছে। কাউন্টার ফেরত নেবে না। কাকে বিক্রি করব, সেই লোক কেমন হবে, অন্ধকারে পাশে বসবে তো, তাই বাসন্তী আপনাকে দেখে বলল, বউদি, ওকে সরল বলে মনে হচ্ছে।' মধ্যবয়সিনী বললেন।

বিনা পয়সায় সিনেমা দেখার সুযোগ কে ছাড়ে! মধ্যবয়সিনী তার হাতে টিকিট গুঁজে দিয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। সোওয়া পাঁচ আনা যখন বেঁচে গেল তখন সিনেমা হলের পাশের দোকান থেকে একটা চারমিনার সিগারেট দুই পয়সা দিয়ে কিনে ফেলল হরিপদ। বিড়ির

বদলে সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে হল।

হলে ঢোকামাত্র আলো নিভে গেল। লোক হয়নি বলে যারা টর্চ জ্বেলে সিট দেখিয়ে দেয় তারাও নেই ধারে কাছে। সোওয়া পাঁচ আনায় নাম্বার থাকে না, যে যেখানে পারে বসে পড়ে। কিন্তু দশ আনার টিকিটে—

'এই যে, এদিকে, এখানে।'

ডাক শুনে তাকাল হরিপদ। একেবারে প্রান্ত-সিটে বসে আছেন মহিলা, পাশে মেয়েটি। আধা অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে সিটে গিয়ে বসতেই নাকে পাউডারের গন্ধ পেল হরিপদ। গন্ধটা আসলে মেয়েটির শরীর থেকে। সে দু-হাত গুটিয়ে একটু সরে বসল যাতে মেয়েটির শরীর দূরত্বে থাকে।

এখন সরকারি খবর দেখাচ্ছে। ইংরেজিতে ধারাবিবরণী চলছে যার বিন্দুবিসর্গ সে বুঝবে না। মেয়েটি বলল, 'আপনি ভালো ভাবে বসুন না।'

'ঠিক আছি।'

মধ্যবয়সিনী হাসলেন, 'একে ঠিক বলে বুঝি! মনে হচ্ছে আমাদের অসুখ আছে, ছোঁয়া বাঁচাচ্ছেন আপনি!'

সোজা হল হরিপদ।

মধ্যবয়সিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

'হরিপদ।'

'ওর নাম বাসন্তী, আমি ওর বউদি।'

সিনেমা আরম্ভ হল। জঙ্গলের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে গান গায়, খেলা করে। কিন্তু ছেলে দেখলেই খেপে গিয়ে তাড়া করে, শাস্তি দেয়। বাসন্তীর পাশে বসে হরিপদর বেশ লজ্জা করছিল, রাজকন্যার পরনের পোশাক যতটা না থাকলে নয় ততটা থাকায়। কোনও ছেলে তাকে প্রেম নিবেদন করতে এলেই তাকে শাস্তি দিত রাজকন্যা।

'কী নিষ্ঠুর!' ফিসফিস করে বলেছিল বাসন্তী।

'হুঁ।' মাথা নেড়েছিল হরিপদ।

'সব মেয়েই ওরকম না।' বাসন্তী কানেব কাছে মুখ এনে বলেছিল।

'আমি জানি না।'

'সেকি! জীবনে কোনও মেয়ে আসেনি?'

'না।'

বাসন্তী সেকথা তার বউদিকে জানাতেই চাপা হাসি শুনতে পেল হরিপদ। হঠাৎ বাসন্তীর ডান হাত অন্ধকারে হরিপদর বাঁ-হাত ধরল। ওরকম নরম তুলতুলে হাতের স্পর্শ জীবনে কখনও পায়নি সে। ঠিক সেই সময় জঙ্গলের পাশের নদীতে কাঠ ধরে ভেসে আসা নায়কের জ্ঞানহীন শরীর আবিষ্কার করে ফেলল রাজকন্যার সখীরা। খবর পেয়ে রাজকন্যা এল। এই অবস্থায় কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। ভেজা পোশাক খুলে নায়ককে জাগাতে চেষ্টা চলল। কিন্তু পোশাক খোলার পর নায়কের সুগঠিত শরীর দেখে রাজকন্যার মুখ-চোখ বদলে গেল। পাশে বসে সে বুকে ঠোঁট ছোঁয়াতেই নায়কের জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গে-সঙ্গে বাসন্তী হরিপদর হাত টেনে তুলে নিজের বুকে ছুঁইয়ে আবার নামিয়ে আনল পায়ের ওপর। হরিপদর কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছিল। শরীরের সব রক্ত তখন তার মুখে। ওদিকে জ্ঞান ফিরে আসার পরে নায়ক রাজকন্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করল। সে দ্বীপ থেকে চলে যেতে চায়, কিন্তু রাজকন্যা তাকে ছাড়তে নারাজ।

'বাসন্তী! উঠে আয়। উঠে আয় বলছি।'

অন্ধকারে কেউ একজন চাপা গলায় গর্জন করতেই বাসন্তী স্প্রিং-এর মতো উঠে হন-হন করে বেরিয়ে গেল হল থেকে। সেই লোকটাও চলল ওর পেছন-পেছন।

হরিপদ খুব ঘাবড়ে গেল। সে যে মেয়েটার হাত ধরেনি, মেয়েটাই তার হাত ধরেছিল একথা নিশ্চয়ই লোকটা জানবে না। কিন্তু অন্ধকারে কি লোকটা দেখতে পেয়েছিল? নিশ্চয়ই বাসন্তীর বাবা জানত না মেয়ে সিনেমা দেখতে এসেছে। লোকটা যদি তাকে চিনতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই দিদিমণির কাছে নালিশ করবে। হাত-পা শিরশির করতে লাগল তার। সে চটপট হল থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। ঠিক তখনই মধ্যবয়সিনী বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। তুমি এপাশে সরে বসো।'

'লোকটা কে?'

'বাসন্তীর মামা। হাড়ে বজ্জাত লোক। আমার ওপর খুব রাগ তাই ভাগনিকে ধমকে নিয়ে গেল।' খুক-খুক শব্দে হাসলেন মধ্যবয়সিনী।

'আপনার ওপর রাগ কেন?'

'বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইলে আছাড় খেতেই হবে।' মধ্যবয়সিনী হাসলেন, 'আরে! এখনও তুমি ওখানে বসে আছ? লোকে কী ভাববে?'

অতএব বাধ্য হল হরিপদ। কানের কাছে মুখ এনে মধ্যবয়সিনী বললেন, 'তুমি আমাকে বউদি বলে ডেকো।'

পুরো সিনেমা দ্যাখা হল না। হাফ টাইমে বউদি বললেন, 'ভাল্লাগছে না। তুমি কি পুরোটা দেখতে চাও?'

মাথা নেড়েছিল, 'না।'

'তাহলে চলো, বাড়ি যাই।'

বাইরে বেরিয়ে বউদি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। বেশি দূর নয়, আধঘণ্টা লাগবে।'

বাসে চেপে নাগরাকাটায় পৌঁছাবার আগেই বউদি নেমে পড়লেন। পাশেই ফরেস্টের কোয়ার্টার্স। বেশ নির্জন জায়গা। কোয়ার্টার্সের পাশে কাঠের বাগানওয়ালা বাড়ি।

গেট খুলে ভেতরে ঢোকামাত্র একটা টেকো লম্বা লোক বেরিয়ে এল, কী ব্যাপার, সিনেমা দেখলে না?'

'ইস! কী বিশ্রি ছবি! বসে থাকা যায় না।'

'এটি কে?'

'হরিপদ। খুব ভালো ছেলে।' বউদি বললেন।

'হরিপদ কী?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'হরিপদ ভট্টাচার্য।' জবাব দিয়েছিল সে।

'ও বামুনের ছেলে। বয়স কত?'

'সতেরো।'

'তাই। এখনও গোঁফ-দাড়ি ওঠেনি। শোনো, আমাকে এখনই মালবাজারে যেতে হবে। কাজ আছে।'

'বেশি গিলো না।'

'না-না।'

লোকটা বেরিয়ে গেল।

বউদি হাসলেন, 'কাঠের ব্যাবসা করে। মালবাজারে যায় মাল খেতে।'

বাইরের ঘরে বসে বউদি জিজ্ঞাসা করল, 'তা বলো, বাসন্তীকে কেমন লাগল?'

'ভালো।'

'প্রেম-প্রেম করে পাগল হয়ে গিয়েছে মেয়েটা অথচ কোনও ছেলেকেই ওর পছন্দ হচ্ছিল না। তোমাকে আজ দেখামাত্র আমাকে বলল আলাপ করিয়ে দাও। দেখলাম, তোমার সঙ্গে মানাবে।' বউদি হাসলেন, 'কী খাবে বলো?'

'কিছু না। আমি এখন বাড়ি যাব।' হরিপদ বলল।

'বাড়িতে কে-কে আছেন?'

'দিদিমণি, বড়বাবু।'

'বড়বাবু?' বউদি অবাক হলেন, 'বড়বাবু মানে?'

'ওঁকে সবাই বড়বাবু বলে। অনেক বয়স হয়েছে তো। আগে এদিকের জমিদার ছিলেন। দিদিমণি ওঁর মেয়ে। বিয়ে করেননি, স্কুলে পড়ান।' হরিপদ বলল।

'তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক?' বউদির কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমি ওঁদের সব। আমার ওপর ওঁরা নির্ভর করেন।'

'তোমার বাবা-মা কোথায়?'

'জানি না। পাকিস্তান থেকে আসার সময় আমি হারিয়ে গেছি।'

'মেয়েটা মরল! এখন কী করি!' বিড়বিড় করলেন বউদি, 'শোনো, তোমার এই পরিচয় যেন বাসন্তী জানতে না পারে। ও তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কিন্তু তুমি খাওয়াবে কী? কাজকর্ম করো না, পেটেও বিদ্যে নেই। আমি ভেবেছিলাম তুমি কলেজে পড়ো। শুধু চেহারা থাকলেই কি হয়? বরং চেষ্টা করবে বাসন্তীকে এড়িয়ে যেতে।'

'আমার সঙ্গে ওর দেখাই হবে না। কোথায় থাকে তাই জানি না।'

'মেয়েমানুষের মনে প্রেম এলে ঠিক খুঁজে বের করে। একবার তো দেখলাম তোমার হাত তুলে বুকে ছোঁয়াল। আগে রোজগার করো, টাকা জমাও তারপর এগোবে।'

'ঠিক আছে।' হরিপদ উঠে দাঁড়াল।

সে যখন বারান্দায় চলে এসেছে তখন বউদি পেছন থেকে ডাকলেন, 'শোনো, সামনের রবিবারের দুপুরে এখানে এসো তো।'

'কেন?'

'বাসন্তীর আসার কথা। একটু ফস্টিনস্টি করে ও যদি সুখ পায়, তো পাক। আমার হয়েছে জ্বালা।'

কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গিয়েছিল কয়েক দিন। দিদিমণির সন্দেহ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অ্যাই, তোর কী হয়েছে রে?'

'আমার? কেন? কিছু হয়নি তো।'

'কিছু হয়নি? সবসময় অন্য কথা ভাবছিস। বাইরে-বাইরে আর আগের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস না। সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকছিস?'

'না, ভাবছি এখন থেকে আমাকে রোজগার করতে হবে।' বলেছিল সে।

দিদিমণি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর কী মুরোদ আছে রে রোজগার করবি?'

কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে তো কিছুই জানে না। পেটে বিদ্যে নেই কিন্তু গাড়ি চালাতে পারে এমন লোক এখানে ড্রাইভারি করে টাকা বানাচ্ছে। ড্রাইভারিটা যদি শিখতে পারে! খালাসির চাকরি করলে বাসন্তী যে তাকে পাত্তা দেবে না একথা হরিপদ বোঝে।

বুড়ো কর্তার কাছে গিয়ে মনের কথা বলল হরিপদ।

বুড়ো কর্তা তাকালেন, 'এ তো ভালো কথা। পুরুষমানুষের তো রোজগারের চেষ্টা করা উচিত। ঠিক আছে, কথা বলব। চা-বাগানের গাড়ির খালাসির চাকরি পেলে ড্রাইভারের কাছ থেকে শিখে নিতে পারবে।'

আনন্দ হল খুব। প্রথম দিকে যদিও খালাসি হয়ে ঢুকতে হবে কিন্তু সেটা খুব বেশি হলে বছর খানেকের জন্যে। তারপর চা-বাগানের ড্রাইভারের পাকা চাকরি, কোয়ার্টার্স, আঃ।

*

পরের রবিবার দুপুরে বউদির বাড়িতে গিয়ে দরজায় শব্দ করল হরিপদ। কীরকম ভয় অথচ আনন্দ একসঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। দরজা খুলল বাসন্তী, 'এসো। তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো না।'

ভেতরে ঢুকে হরিপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে কী ভাববে! বউদি তো বাড়িতে নেই।'

'নেই? কেন?' ঘাবড়ে গেল হরিপদ।

'বানারহাটে গিয়েছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ও।'

'চলো, ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি। বউদি বলে গিয়েছে কেউ এলে তুই জানলা দিয়ে কথা বলবি, হরিপদকে যেন কেউ দেখতে না পায়।' হাসল বাসন্তী।

ওর পেছন-পেছন ভেতরের ঘরে এসে দেখল একটা খাটে সুন্দর বিছানা পাতা আছে। তার একপাশে বসে পা ঝুলিয়ে বাসন্তী বলল, 'তোমার সব ভালো শুধু নামটা ছাড়া।'

'আমি কী করব।'

'সত্যি, তোমার তো হাত নেই। আচ্ছা, সেদিন তুমি কিছু মনে করোনি তো? আমার মামাটা ওরকম। রাগলে চাঁড়াল। তোমাকে চিনতে পারেনি। কে তুমি জিজ্ঞাসা করছিল, আমি বলেছি চিনি না। টিকিট কেটে যারা সিনেমা দেখতে যায় তাদের সবাইকে আমি কী করে চিনব!' হেসে গড়িয়ে পড়ল বাসন্তী। তারপর সোজা হয়ে বসে গম্ভীর মুখ করে বলল, 'আই লাভ ইউ।'

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এই তিনটে ইংরেজি শব্দ সিনেমা দেখার দৌলতে হরিপদর জানা।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি?'

মাথা নাড়ল হরিপদ 'হ্যাঁ।' বলতে খুব আনন্দ হল।

'আমাকে বিয়ে করবে তো?'

'বিয়ে?'

'আমি যাকে ভালোবাসব তাকে আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো এখনও রোজগার করি না।'

'করো। একবছর টাইম দিলাম। তোমাকে ভালো লেগেছে বলে টাইম দিচ্ছি। নইলে আমার হ্যাঁ শুনতে চার-পাঁচজন লাইন দিয়ে আছে। একবছর পরে রোজগার করে বিয়ে করতে পারবে তো? তাহলে আমি সীতার মতো প্রতীক্ষা করব।' বেণী নাড়াচাড়া করতে-করতে বলল বাসন্তী।

'হ্যাঁ, পারব।' বেশ জোরে জবাব দিল হরিপদ।

'তুমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? এখানে এসে বসো।' হাত দিয়ে বিছানার একটা জায়গা দেখিয়ে দিল বাসন্তী।

হরিপদ পায়ে-পায়ে এসে বসল। দুজনের মধ্যে দূরত্ব আধ হাত।

বাসন্তী বলল, 'সবাই বলে আমি ঠোঁটকাটা। সত্যি কথা স্পষ্ট বলা ভালো, তাই না?'

'হুঁ।'

'তাহলে বলি। বিয়ের আগে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।'

'ও!'

'সিনেমার হিরোদের মতো অসভ্যতা যদি করতে হয় বিয়ের পরে করবে। তবে আমার ইচ্ছে হলে আমি হাত দিতে পারি। তখন তোমাকে একদম বাচ্চা হয়ে থাকতে হবে। রাজি।'

'হুঁ।'

'তুমি খুব ভালো।'

এই সময় বাইরের দরজায় আওয়াজ হল। বাসন্তী উঠে দাঁড়াল, 'চুপ করে বসে থাকো। আমি দেখছি কে এল!'

বাসন্তী প্রায় উড়ে গেল। ফিরেও এল চটপট, 'সব্বোনাশ হয়েছে। বাবা এসেছে। আমি বলে এসেছিলাম মাকে যে বউদির কাছে যাচ্ছি। সত্যি কিনা দেখতে এসেছে। তুমি, তুমি, পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। ওদিকে জঙ্গল আছে, আড়ালে-আড়ালে চলে যাবে। সামনের রবিবারের পরের রবিবার এখানে এসো।'

ঝটপট দরজা খুলে দিল বাসন্তী। হরিপদ পা বাড়াতেই হাত ধরে টানল সে। হরিপদ দাঁড়িয়ে পড়তেই কাঠঠোকরার মতো দুটো ঠোঁট ওর ঠোঁটে ঠুকে দরজা বন্ধ করল। জঙ্গলে ঢোকার পর হরিপদ শিহরিত। সে বারংবার নিজের ঠোঁট আঙুলে ছুঁয়ে নিচ্ছিল। ওরকম চুমু খাওয়ায় তার ঠোঁট টনটন করলেও নিজেকে নায়ক বলে মনে হচ্ছিল।

রাত্রে গোরাদার কথা মনে এল। জলপাইগুড়ির চাঁদমারির মাঠে মিলিটারিরা চাকরি দিচ্ছে। গোরাদা বলেছিল তার যে চেহারা তাতে চাকরিটা হয়ে যাবে। এই তল্লাটে তো একটাও মিলিটারি নেই কিন্তু ড্রাইভার প্রচুর। সে ড্রাইভার হলে লোকে ডাকবে তাকে হরি ড্রাইভার বলে। এমন কিছু আহামরি ব্যাপার নয়। কিন্তু মিলিটারিতে চাকরি করলে লোকে সমীহ করতে বাধ্য। সিনেমায় সে দেখেছে। কিন্তু গোরাদার মুখে খবরটা সে শুনেছে বেশ কয়েকদিন হল। এখনও কি ওরা চাকরি দিচ্ছে? দেওয়া নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। মন খারাপ হয়ে গেল হরিপদর। চাকরিটা পেলে একবছর কেন, ছ-মাসের মধ্যে বাসন্তীকে বিয়ে করে ফেলত সে।

পরের সকালে মোড়ে যেতেই গোরাদাকে দেখতে পেয়ে খুশি হল হরিপদ। তার প্রশ্ন শুনে গোরাদা খ্যা-খ্যা করে হাসল, 'তুই বেটা একটা গাধা। এতদিন ধরে ওরা জলপাইগুলির চাঁদমারিতে বসে থাকবে চাকরি দেওয়ার জন্যে?'

'চলে গেল?' মিইয়ে গেল হরিপদ।

'এক জায়গায় কেন থাকবে? ঘুরে-ঘুরে লোক খুঁজছে। এই তো, আজও ওরা সেবকের কাছে মিলিটারি ক্যাম্পে লোক নেবে।' গোরাদা বলল।

পকেটে দশটা টাকা ছিল। হরিপদ দেখল একটা বাস এসে দাঁড়াল যেটা সেবক ব্রিজ হয়ে শিলিগুড়িতে যাবে। দৌড়ে গিয়ে উঠে বসল সে বাসে। কন্ডাকটারকে জিজ্ঞাসা করল 'এটা সেবকের কাছে মিলিটারি ক্যাম্পের কাছে যাবে?'

'যাবে।'

অনেক শারীরিক পরীক্ষা, দৌড়, লাফের পর একজন বাঙালি অফিসার তার নাম-ঠিকানা লিখে ফর্ম এগিয়ে দিল সই করার জন্যে। কাঁপা-কাঁপা হাতে সই করল হরিপদ। খাওয়া-দাওয়া, থাকা এবং ইউনিফর্ম বিনা পয়সায়। মাস গেলে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা বারো আনা ছয় মাস পর্যন্ত। ততদিন ট্রেনিং চলবে। ট্রেনিং-এ পাশ করলে মাইনে বাড়বে। কিন্তু ট্রেনে উঠতে হবে আজ বিকেলে। অফিসার তাকে রেলের পাশ ধরিয়ে দিলেন সঙ্গে তিরিশ টাকা, রাস্তায় খাওয়ার জন্যে। আজই ট্রেন ধরে যেতে হবে মীরাটে।

'মীরাট? সেটা কোথায়?'

'ওঃ। ওখানে দাঁড়াও। আজ যারা রিক্রুট হয়েছে তাদের নিয়ে গাড়ি যাচ্ছে স্টেশনে। ওদের

সঙ্গে চলে গেলে মীরাট কোথায় দেখতে পাবে। সেখানেই ট্রেনিং হবে।'

'আজই যেতে হবে?' হঠাৎ চৈতন্য ফিরল হরিপদর।

'হ্যাঁ। না গেলে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের করা হবে তোমার নামে। জেলে যেতে হবে।'

তখন দুপুর দুটো। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। ওদিকে বাড়িতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হইচই পড়ে গেছে। কোথাও খুঁজে না পেয়ে মাথায় হাত দিয়েছে বড়দি। আজ যদি মীরাটে যেতে হয় তাহলে খবরও পাবে না ওরা। মীরাট থেকে কি সামনের রবিবার ফেরা যাবে? রবিবার তো সব চাকরিতেই ছুটির দিন। একবার ভাবল, দরকার নেই চাকরির। ফিরেই যাই। সঙ্গে-সঙ্গে বাসন্তীর মুখ মনে পড়ল। বিয়ের আগে ওকে ছোঁয়া যাবে না। বিয়ে করতে হলে চাকরি চাই। তাছাড়া ফিরে গেলে মিলিটারিরা তাকে ধরে এনে জেলে পুরে দেবে।

সেই সন্ধেবেলায় ট্রেনে বসে হরিপদ তারই মতো চাকরিতে ঢোকা শিলিগুড়ির একটি ছেলের মুখে শুনতে পেল মীরাটে পৌঁছাতে তিনরাত দু-দিন লেগে যাবে। আগামী একবছরের মধ্যে বাড়ি ফেরা যাবে না। মনে হয়েছিল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে। একবছর তাকে না দেখতে পেয়ে বাসন্তী যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলে?

আজ ফেরার ট্রেনে বসে মনে হচ্ছিল, বারোটা বছর যেন হুশ করে কেটে গেছে। প্রথমে মীরাট, তারপর পাকিস্তান-সীমান্ত। শেষে জাহাজে চেপে মধ্য এশিয়ায়। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনিতে ভারতীয় সেনা হিসেবে থেকেছে এতকাল। বছরের ছুটি নেয়নি। নিলেও ঘুরে বেড়িয়েছে আশেপাশে। ধীরে-ধীরে পালটে গেছে হরিপদ। তাকে এখন সবাই হ্যারি বলে ডাকে, সে খুশিও হয়। বারো বছর পর তার চাকরি শেষ। অনেক-অনেক টাকা জমে গেছে ইতিমধ্যে। তা ছাড়া প্রাক্তন জোয়ান হিসেবে ব্যাবসা করলে সরকারি সুযোগ পাবে, পাবে কোনও সংস্থায় সিকিউরিটিব চাকরি। সবে তিরিশে পড়া শরীরটা এখন লোহার মতো শক্ত, হিলহিলে।

বড়দি তাকে দেখে কী বলবে? বুড়ো কর্তা কি বেঁচে আছে? দুবাই থেকে একটা চিঠি লিখেছিল সে। বাংলা-ইংরেজিতে মিলে মিশে লেখা চিঠিতে বড়দিকে সব জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল। সেই চিঠির কোনও উত্তর সে পায়নি।

শিলিগুড়ি থেকে বাস বদলে যখন সে চালসায় পৌঁছাল তখন দুপুর। দুটো বড় স্যুটকেশ নিয়ে বাস থেকে নেমে সে হতভম্ব। একদম বদলে গিয়েছে জায়গাটা। কত দোকান, কত ঘরবাড়ি। একটা রিকশাওয়ালা চলে এল পাশে, 'যাবেন বাবু?'

স্যুটকেস নিয়ে রিকশায় উঠল হরিপদ। ওই তো বংশীদার চায়ের দোকান। সে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বংশীদা কেমন আছে?'

'কোন বংশী? চা-ওয়ালা?'

'হ্যাঁ।'

'মরে গেছে। চার-পাঁচ বছর আগে। দোকান কিনেছে গোরাদা।'

'গোরাদা? গোরাদা চা-ওয়ালা হয়ে গেছে?'

'আপনি চেনেন?' প্যাডেল ঘোরাতে-ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল রিকশাওয়ালা।

'বাঁ-দিক দিয়ে চলো। আমি বারো বছর আগে এখানে থাকতাম।'

'বাপস। এরমধ্যে যে কত লোক মরে গেছে।'

বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড় করাল হরিপদ। বিরাট বাড়িটার সব দরজা-জানলা বন্ধ। বহুদিন

মেরামত দূরের কথা, রং করা হয়নি।

'এই বাড়িতে যাবেন নাকি?' রিকশাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তো কেউ নেই।'

'তার মানে?' হাঁ হয়ে গেল হরিপদ।

'পাঁচ বছর হল এরকম তালা বন্ধ পড়ে আছে।'

'বুড়ো কর্তা?'

'তিনি গত হয়েছেন বহুকাল আগে। পাঁচ বছর আগে বাড়িতে ডাকাতি হয়। মাঝরাত্তিরে। দিদিমণিকে ডাকাতরা মেরে পালিয়ে যায়। পুলিশ আসে পরের দিন। বডি তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় দরজায় তালা দিয়ে গেছে। আর কেউ আসেনি। তা আপনি যদি ওদের কেউ হন তাহলে থানায় চলেন।' রিকশাওয়ালা বলল।

ওপাশ থেকে এক প্রৌঢ় আসছিলেন। হরিপদ চিনতে পারল, জগন্নাথ কাকা।

রিকশাওয়ালা তাঁকে ডাকল, 'ইনি এ-বাড়িতে এসেছিলেন।'

'কে? মানে, পরিচয়টা?'

'আমি হরিপদ।'

'হরিপদ? ও হো, তুমি! তুমি তো পালিয়ে গিয়েছিলে।'

মুখ নামাল হরিপদ। জগন্নাথবাবু বললেন, 'তুমি থাকলে দিদিমণি এমন অঘোরে মারা যেত না। মাঝরাত্রে ডাকাত এসেছিল। আমরা কেউ টের পাইনি।'

'দরজা ভেঙেছিল?'

'না। বোধহয় চেনা লোকের নাম বলেছিল। তাই শুনে দিদিমণি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কিছু মনে করো না, লোকে বলে তোমার নাম বলেছিল ডাকাতরা।'

'সেকি! আমি তো তখন দুবাইতে ছিলাম।'

'তা থাকতে পারো। কেউ যদি নাম ব্যবহার করে তো কি করা যাবে।' জগন্নাথবাবু বললেন তুমি বরং থানায় যাও, ওরা যদি এখানে থাকতে দেয় তো দেবে।'

রিকশা ঘুরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এল হরিপদ। মনে হচ্ছিল তার পৃথিবী এখন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কী হবে থানায় গিয়ে! যদি পুলিশ অনুমতিও দেয় তাহলে ওই বাড়িতে সে একা কী করবে? কিন্তু সত্যি কি ডাকাতরা তার নাম বলে দরজা খুলিয়েছিল? তার নাম জানবে কী করে? এটা নেহাতই লোকের কল্পনা।

দরজা খুললেন যে প্রবীণা তিনিই যে বউদি তা ঠাহর করতে সময় লাগল। পরিচয় দিতে অনেক চেষ্টায় মনে করতে পারলেন মহিলা, 'ও। তুমি? এতকাল কোথায় ছিলে? সঙ্গে স্যুটকেশ দেখছি। তোমার সেই মেয়ে, বাসন্তী, এখন জোড়হাটে। ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে? তাতে কী! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি? আমার হাতে গোটা চারেক আছে। তারা শরীর চাইলে শরীর দেবে হাজার টাকায়, মন দেবে না বোকা বাসন্তীর মতো!'

স্যুটকেশ দুটো নিয়ে হাইওয়ের পাশে চলে এল হরিপদ। দূরে বাস দেখা যাচ্ছে। কোথাকার বাস, কোথায় যাচ্ছে জানার দরকার বোধ করল না। উঠে পড়ল।

জনতোষণ

আমাদের পাড়ার শিবু ঘোষ এখন ফিল্ম লাইনে ভালো টাকা করেছে। প্রথমে ট্রাম বাস তারপর ট্যাক্সি শেষে পুরোনো মডেলের অ্যাম্বাসাডার চাপতে শুরু করেছিল। এখন একটা মারুতি ডিল্যাক্সে ওকে দেখি। এসব বদল হলেও শিবুর কথাবার্তা চালচলন বড় একটা পালটায়নি। ওর বাবার একটা কারখানা ছিল ভালো জায়গায়। কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় সেটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। অনেক চেষ্টা করেও শান্তি না আসায় একদিন হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়েছিল তাঁর। শিবু তখন কারখানা বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা পেল। তার পড়াশুনা বেশিদূর নয়। কিন্তু কলকাতার জল পেটে থাকলে নিরক্ষর ছেলেও এসে পাশের ভঙ্গি করতে পারে। এই শিবু, বোধহয় লিখি বলেই, আমায় খানিক সমীহ করত। বাড়িতে আসত। একদিন তেমনি এসে বলল, 'দাদা ব্যাবসা শুরু করছি।' 'কীসের?' ভাবলাম আর একটা কারখানা বোধহয় খুলতে যাচ্ছে। 'ফিল্মের। ঝটপট পয়সা আসবে। বাবার মতো ঠুকুর-ঠুকুর ব্যাবসা করা আমার পোষাবে না। আমি নগদা-নগদি হাতে গরমে বিশ্বাসী।'

বললাম, 'কিন্তু শিবু, ফিল্মের ব্যবসায় সব ঝুঁকি আছে। অনেকে শেষ হয়ে গেছে।'

'না দাদা, আমি শেষ হওয়ার জন্যে জন্মায়নি।'

এরপর বছরখানেক তার দেখা পাইনি। শুনেছিলাম ধর্মতলা স্ট্রিটে শেয়ারে টেবিল ভাড়া করে বসেছে শিবু। যেসব ছবি প্রোডিউসারের টাকায় কোনও মতে শেষ হয়, ডিস্ট্রিবিউটার কোনও আকর্ষণ বোধ করে না, প্রিন্ট পাবলিসিটির অভাবে রিলিজ বন্ধ থাকে সেইসব ছবিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছে সে। নিজের পয়সায় প্রিন্ট পাবলিসিটি করিয়ে হলে ছবি রিলিজ করে। এই হলের ডেট পেতে যে ধরাধরির খেলা চলে সেটা সে-ই খেলে। ছবির বিক্রি থেকে প্রথমে নিজের টাকা তুলে নিয়ে পরে প্রযোজককে টাকা ফেরত দেয় কমিশন কেটে রেখে।

এক বছরে তিনটে ছবি রিলিজ করিয়েছে শিবু, কোনওটাই তিন সপ্তাহের বেশি চলেনি। তার মধ্যে একটা অবশ্য ইন্ডিয়ান প্যানোরমায় নির্বাচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি হিসেবে। অবশ্য দর্শক দেখেনি। শিবুর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। বোধহয় পথে বসল ছেলেটা।

এই সময় শিবু ট্যাক্সিতে চলাফেরা করত। একদিন রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখি শিবু ট্যাক্সি থেকে ডাকছে। সে যাচ্ছে শ্যামবাজারে, সুবিধেই হল। কিছু বলার আগে শিবু বলল, 'এখন দাদা আমার নাম এ-লাইনে শিবু বুকার। ডিস্ট্রিবিউটার হওয়ার ক্ষমতা নেই তো। ডিস্ট্রিবিউটার হতে গেলে ছবির তৈরির সময় প্রোডিউসারকে টাকা দিতে হয়। হিট হলে লাল হয়ে যায় ডিস্ট্রিবিউটার। আমি মরা ছবি নিয়ে ব্যাবসা করছি, জ্যান্ত ছবি কে দেবে আমাকে?'

'খুব লস হল তোমার।'

'না দাদা, আপনার আশীর্বাদে এখনও বেঁচে আছি।'

'সেকি! তোমার ছবিগুলো তো চলেনি।'

'ঠিক কথা। প্রোডিউসার মরেছে কিন্তু আমি বেঁচে গেছি।'

শিবু আমাকে হিসেবটা বোঝাল। কলকাতার তিনটে হল আর দমদম গড়িয়ার দুটো হলে ছবি রিলিজ করিয়েছিল। ধরা যাক তিনটে হলের সাপ্তাহিক ভাড়া ন-টাকা। তিন সাতে একুশটি শো হাউসফুল গেলে ট্যাক্স বাদ দিয়ে হল ভাড়া বাদ দিয়ে থাকবে আরও ন-টাকা। তা ওর ছবি হাউসফুল দুরের কথা প্রথম সপ্তাহে বারো টাকার ব্যাবসা করেছিল, দ্বিতীয় সপ্তাহে দশ টাকার, তৃতীয়তে সাড়ে আট টাকার। ডেফিসিট কেটে হলের মালিক টাকা দেওয়ামাত্র সে ছবি তুলে নিয়েছে। কিন্তু বাড়তি যে টাকা পাওয়া গেল তা প্রিন্ট পাবলিসিটির খরচ হিসেবে সে কেটে রেখেছে। এর ফলে প্রোডিউসার এক পয়সাও পায়নি। সে বলল, 'দাদা এই প্রোডিউসার কোনও মতে ছবি শেষ করেই জানত পয়সা পাবে না। তাই ওদের নিয়ে দুঃখ নেই। আর্ট ফিল্ম বানালে পয়সা আসে? আর যে-দুটো কর্মাশিয়াল ফিল্ম তার গল্প যেমন ডাইরেকশন অ্যাক্টিংও তেমন। কলকাতার হল থেকে আমি কুড়িভাগ খরচ পাইনি কিন্তু জেলার হলগুলোতে আন্ডার রেটে ছবি পাঠাচ্ছি। যা পাচ্ছি তাই ঘরে তুলছি।'

'প্রযোজক তার হিসেব রাখেন না?'

'পাগল! বেলকোবা কোথায় জানেন?'

'না।'

'তবে? সেখানে এক সপ্তাহ ছবি চললে তার হিসেব আপনি পাবেন?'

'তোমার তো হিসেব দেওয়ার কথা।'

'নিশ্চয়ই। দেব। দু-লাখ প্রিন্ট পাবলিসিটিতে গিয়েছে সেটা আগে তুলি, অফিস খরচ আছে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যে সুদ পেতাম তা উঠুক তারপর যা আসবে তার ওপর কমিশন কেটে প্রোডিউসারকে ফেরত দেব।'

'শেষপর্যন্ত প্রোডিউসার কত পাবে বলে তোমার মনে হয়?'

'বিশ-পঁচিশ হাজার পেলে চৌদ্দ পুরুষের পুণ্য।'

লোকটা তো মরে যাবে হে!'

'দাদা যারা এদের টুপি পরিয়ে ফিল্ম প্রোডিউস করতে নামায় দোষটা তাদের। আর জেনেশুনে সেই টুপিটা যারা পরে তাদের জন্যে কোনও মায়া-মমতা নেই।'

আমি আর কিছু বলিনি। সত্যি কথা, যার ব্যাবসা সে ভালো বুঝবে। শিবু যদি আগে নিজের টাকা তুলে নিতে চায় তাহলে তাকে দোষ দিতে পারি না।

শিবুর সঙ্গে আমার দেখা মাস ছয়েক বাদে। এক প্যাকেট সন্দেশ নিয়ে এল সে। হেসে বলল, 'দাদা, একটা বড় ছবি পেতে যাচ্ছি।' '

'কীভাবে?'

'এক বোম্বাইয়ের প্রোডিউসার বাংলা ছবিতে টাকা ঢালতে চায়। আমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে। বাজেট বেশি নয় কিন্তু খারাপও বলব না। ডিস্ট্রিবিউটার চায় না। বলেছে, শিবু বুকার তুম হামারা বিজনেস দেখভাল করো।'

'এতো খুব ভালো কথা।'

'কিন্তু আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।'

'বলো।'

'আপনার সঙ্গে সঞ্জিতদার আলাপ আছে। বলে-টলে ডেট পাইয়ে দিন না। এখন তো ওঁকে ছাড়া ছবি চলে না।'

সঞ্জিত বাংলা ছবির একজন সফল নায়ক। প্রথম দিকে খুব পাত্তা পায়নি এখন অবস্থা বদলেছে। খুব ভদ্র ছেলে। আমার সঙ্গে যথেষ্ট সখ্যতা আছে। কিন্তু তবু আমি ইতস্তত করছিলাম। শিবু ঘোষ সেটা বুঝেই বলে ফেলল, 'আমাকে ওই বাজেটের মধ্যে ছবিটা করিয়ে নিতে হবে। না

পারলে ছবি হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি গেলে সঞ্জিতবাবু হেভি টাকা চাইবে, ডেটও দেবে না। বাঙালি যুবক ব্যবসায় নেমেছি, আপনি আমাকে বাঁচাবেন দাদা?'

অগত্যা সঞ্জিতকে ফোন করলাম। শুনলাম সে ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে শ্যটিং করছে। শিবুকে বললাম সে কথা। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে একবার ওখানে যান তাহলে কি ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে?'

বললাম, 'শিবু, আমার যাওয়া ঠিক হবে না।' কিন্তু এমনই কপাল সঞ্জিতকে টেলিফোনে ধরাই যাচ্ছিল না। এদিকে বাড়িতে রোজ মিষ্টির প্যাকেট আসছে। নিষেধ রাগারাগিতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত প্রায় বাধ্য হয়েই শিবুর সঙ্গে স্টুডিওতে গেলাম। এর আগেও লক্ষ্য করেছি স্টুডিও-র ফ্লোরে যখন নানান ছবির শুটিং হয় তখন একটা চাপা রাখো-ঢাকো ভাব থাকে পরস্পরের সঙ্গে। ফ্লোরে ঢোকার সময় কাকে চাই, কেন চাই ইত্যাদি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। শিবু সেসব সামলে ভেতরে নিয়ে গেল। তখন শট নেওয়া হবে। পরিচালক সাইলেন্স বলে ধমকে উঠলেন। আলো জ্বলছে। সঞ্জিত গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেল নায়িকার দিকে। নায়িকা মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্জিত দুই আঙুলে চিবুক তুলে বলল, 'তুমি কেন আমাকে বারবার ভুল বোঝো? পৃথিবী রসাতলে গেলেও এই আমি তোমার।' সঙ্গে-সঙ্গে নায়িকা ঠোঁট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?' পরিচালক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কাট্। লাইটস্ অফ।'

যেন রাজ্য জয় করা হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে শ্যটিং জোন থেকে বেরিয়ে আসছিল সঞ্জিত, পেছনে ব্যস্ত পরিচালক। সঞ্জিত বলছিল, "না, না, আপনার সঙ্গে কথা ছিল হাফ শিফট কাজ করব। ওদিকে এক নম্বরে 'প্রাণ চায়' ছবির সবাই আমার জন্যে বসে আছে। আর আমাকে বলবেন না।"

অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে সঞ্জিত বেরিয়ে আসছিল সদর্পে। এই সময় সে আমাকে দেখতে পেল, 'আরে আপনি?'

'তোমার খোঁজে আসতে হল।'

'আসুন-আসুন।' সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তার মেকআপ রুমে। সেখানে বসে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এখন কেমন ব্যস্ত?'

'খুব। দিনে তিন শিফট করে কাজ করছি।'

'ও।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আমার ভাই-এর মতো এই ছেলেটি। ছবি করছে। তুমি যদি ওকে একটু সাহায্য করো তাহলে ওর উপকার হয়।'

সঞ্জিত শিবু ঘোষকে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, 'আপনি ভাই সকাল সাড়ে সাতটায় আমার বাড়িতে আসুন। দাদার গল্প?'

শিবু কিছু বলার আগেই আমি মাথা নাড়লাম, 'নাহে। এখন চলি, তুমি তো আবার একটা কাজে বেরুবে।'

শিবু খুব বিগলিত। এর তিনদিন বাদে সঞ্জিত নিজেই আমাকে টেলিফোনে জানাল সে তারিখ দিয়েছে।

ছেলেটির কথাবার্তা তার ভালো লেগেছে। আমার কথা মনে রেখে সে এখন যা নেয় তার অর্ধেকে কাজ করে দেবে। শিবুকে আমি আর দেখতে পাইনি অনেকদিন। হঠাৎ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম অমুক রাম আগরওয়াল প্রযোজিত অমুক ছবি মুক্তি পাচ্ছে, বুকিং শিবু ঘোষ। রিলিজের আগের দিন শিবু এল বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে, 'দাদা, আশীর্বাদ করুন যেন পার হয়ে যাই।'

'ছবি কেমন হল।'

'আপনার ভালো লাগবে না তবে পাবলিক খাবে। কিশোরের চারখানা গান আছে, ফাইট

আছে, মায়ের কান্না আর প্রেমিকার আত্মত্যাগ—সবই আছে। দেখা যাক। আপনি আসুন প্রেস শোয়ে।' যেতে পারিনি কাজ থাকায়। তবে তার পরের সোমবার হলের সামনে হাউসফুল বোর্ড ঝুলতে দেখলাম, ম্যাটিনি ইভনিং নাইট। পরের সপ্তাহে কাগজে সমালোচনা বের হল খুব বাজে ছবি বলে। কিন্তু আমার বাড়ির কাজের মেয়েটি এরমধ্যে দুবার দেখে এসেছে ছবিটা। শিবু একদিন অ্যাম্বাসডার চড়ে আমার কাছে এল। এলে বলল, 'দাদা, মনে হয় উতরে গেছি। প্রথম দিন অ্যাডভান্স খুলে দেখি মাছি তাড়াচ্ছে। ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল। পাঁচটার বদলে ন'টা প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছে প্রোডিউসার, পাবলিসিটির খরচ বেড়েছে। শেষে নিজেই তিনটে হলের ম্যাটিনি ইভনিং টিকিট অ্যাডভান্স কেটে নিয়ে হাউসফুল বোর্ড ঝুলিয়ে দিলাম।'

'সেকি! নিজের পয়সায় টিকিট কিনলে, হল ফাঁকা গেল?'

'না না। সব টিকিট আত্মীয়স্বজন সেলসট্যাক্স ইনকামট্যাক্সের লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। কিন্তু পাবলিক শো-এর আগে গিয়ে টিকিট না পেয়ে পরের দিনেরটা অ্যাডভ্যান্স কেটে ফিরে গেল। এখন দাদা ছবি লেগে গিয়েছে।'

'তোমার কেমন থাকবে?'

'এই ভাবে যদি চলে তাহলে কলকাতা থেকেই প্রিন্ট পাবলিসিটি উঠে যাবে। লাখ পঞ্চাশেক বিজনেস যদি করে তাহলে আমি পাব সাড়ে সাত লক্ষ।'

'প্রোডিউসার তাহলে টাকা ফেরত পাবে?'

'পাবে মানে? হেভি প্রফিট করবে।'

'সব টাকা দেবে ওকে?'

'না দিয়ে উপায় নেই। ওর লোক রোজ বসে থাকে আমার অফিসে।' ভাবলাম একটা বাঙালি ছেলে নিজের জোরে পায়ের তলায় মাটি পেল। এ-লাইনের সব নিয়মকানুন শিখে ফেলেছে সে। কিন্তু বিস্ময় আরও অবশিষ্ট ছিল আমার জন্যে।

মাস ছয়েক বাদে শিবু এল অ্যাম্বাসাডার চেপেই মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে। বললাম, 'তুমি মিষ্টি আনো কেন বলত?' ওটা আমি একদম খাই না।'

'কাউকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনার বাড়িতে এটা হাতে নিয়ে এলে আমার খুব ভালো হয়। লাকি ব্যাপার বলতে পারেন?'

'তাহলে ফিল্ম করে এখন তুমি বড়লোক।'

'না-না। এতো সামান্য। দাদা, এবার ভাবছি নিজেই ছবি করব।'

'মানে?'

'প্রোডাকশন-ডিস্ট্রিবিউশন আমার। অজিত গুহকে সাইন করিয়েছি।'

'সে আবার কে?'

'ওঃ, আপনি কোনও খবর রাখেন না। টপ হিট ডিরেক্টার। আমার খুব ইচ্ছে আপনার গল্প নিয়ে ছবি করার। তবে এখনই না। দুটো ছবির পর।'

হেসে বললাম, 'কেন?'

'না, দুটো হিট হওয়া পর একটা ফ্লপ করানো উচিত।'

'আমার গল্প নিয়ে ফ্লপ হবে ভাবছ কেন?'

'দাদা রাগ করবেন না। আপনি সাহিত্য লেখেন। ফিল্মের জন্যে তো গল্প লেখেন না। এটা আলাদা ওটা আলাদা।'

'তোমার এই গল্পের লেখক কে?'

লজ্জায় মুখ নামাল শিবু, 'আজ্ঞে, আমিই।'

'তুমি গল্প লেখো নাকি?'

'না দাদা কক্ষনো না। সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি। ধরুন একটা সুখের পরিবার। তিন দাদা, দুই বউদি, মা, বোন আর অবিবাহিত ভাই। বউতে-বউতেও খুব ভাব। হঠাৎ বড় ভাই লটারির প্রাইজ পেল। পাঁচ লাখ। মানুষটা ভালো। সংসারের জন্যে টাকাটা খরচ করতে চায়। কিন্তু স্ত্রী রাজি নয়। এই নিয়ে দুই বউতে মন কষাকষি। ছোট ভাইকে সবাই যে-যার দলে টানতে চাইছে। মা নির্দল। ছোট বোন প্রেম করছে একটা লাফাঙ্গার সঙ্গে। ছোট ভাই গান গায়। তার সঙ্গে একটা বড়লোকের মেয়ে প্রেম করতে চাইছে। মানে একেবারে পারিবারিক সোস্যাল ড্রামা। ঘরে-ঘরে যা হয়। তার সঙ্গে আছে ভাই-এর সঙ্গে বোনের লাফাঙ্গা প্রেমিকের ফাইট। সেই বদমাশ মেয়েটাকে আরবে পাচার করছে চেয়েছিল। আউটরাম ঘাটের জেটিতে শুটিং করব ফাইটিংটার। বোনকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করবে হিরো। তার প্রেমিকা ভুল বুঝে সিমলায় চলে যাবে বাবার পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করতে। সেখানে বরফের ওপর আর একটা ফাইটিং। এবার প্রেমিকার ভাবী স্বামীর সঙ্গে। এদিকে দুই ভাই পরস্পরকে সহ্য করতে না পেরে আলাদা হয়ে গেল। মা নামল পথে। প্রচণ্ড জ্বর। শুধু ছোট ছেলের নাম করছে আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কী জল কী জল। হিরো একাই কলকাতায় ফিরে মাকে না পেয়ে আকাশবাণীতে গিয়ে গান গাইতে লাগল। সেই গান রাস্তার রকে শুয়ে জ্বরগ্রস্ত মা শুনল, কুটিল মেজদা মেজোবউদি শুনল, মহান বড়দা আর বড়বউদিও। এমনকী নায়িকাও। সিমলায় কলকাতা রেডিও ধরা যায় না। ভাবছি রেডিও না করে দিল্লি টি.ভি. করে দেব। দিল্লির প্রোগ্রাম সারা দেশে একসঙ্গে শোনা যায়। এবার শেষটা একটু করে দিন দাদা।'

হেসে বললাম, 'বেশ তো লিখছ। বাকিটাও লিখে ফেল না।'

'একটু গোলমাল হচ্ছে। মেজদাকে করেছি অসৎ পুলিস অফিসার। ঘুষ নেয়, হৃদয় নেই। শেষে তাকে সততার পথে ফেরাব। নায়ক শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যাবে। একদম শেষে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

দয়ালু বড়দা তখন সবাইকে নিয়ে ওদের কাছে আসবে। মা বলবে, 'আমি আদেশ করছি তুই রমাকে বিয়ে কর।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রমা কে?'

'ওঃ, রমা হল সেই বড়লোকের মেয়ে। যার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

'ও। তারপর।'

'শেষ দৃশ্য। রমা এগিয়ে আসছে। হিরো এগোচ্ছে। একটা স্বপ্নের দৃশ্য। ধোঁয়া-ধোঁয়া চারধার। আ যা রে টাইপের গান।'

'এ ছবি দর্শকের ভালো লাগবে।'

'একশোবার। শরৎচন্দ্র থেকে সবাই নিয়েছে। একসময় খোকন দাস ওই লাইনেই হিট করে গিয়েছিল। এখন বিজন চৌধুরীর অবস্থা জানেন? লাখ টাকার গল্প বেচে। এই একই ফর্মুলা। ভাবছি ওকে দিয়ে সংলাপ লেখাব। চোখা-চোখা সংলাপ।'

শিবু ঘোষ তারপর দীর্ঘদিন আসেনি। এবার এল মারুতি চেপে। হেসে বলল, 'ছবি শেষ। পরশু সেন্সর হবে। সামনেব সপ্তাহে রিলিজ। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।'

'কি ব্যাপার?'

'যখন সব ভাগাভাগি হয়ে গেল তখন মায়ের মুখে একটা সংলাপ থাকা দরকার। খুব ইমোশনাল। ওটা নেই ছবিতে। মনে হচ্ছে না থাকলে পাবলিক পাম্প খাবে না।'

'কি আর করবে। সব যখন শেষ।'

'না দাদা, আজ দুপুরে রেকর্ডিং করে লাগিয়ে দেব।'

'লাগিয়ে দেবে মানে? কোনও চরিত্রের মুখে নতুন সংলাপ বলাতে হলে তোমাকে রিশ্যুট করতে হবে। সেটার একটা প্রসেস আছে, এডিটিং আছে। সময় লাগবে না।'

'লাগবে। তাই শ্যুটিং করব না। একটা দৃশ্য আছে যেখানে মা ব্যাক টু দ্য ক্যামেরা, একবার সাইড ফেস আছে। মায়ের ডায়লগটা সেইসময় ছুঁড়ে দেব। পাবলিক ভাববে মা পেছন ফিরে বলছে। অজিত, মানে ডাইরেক্টার আজ কলকাতায় নেই তাই আমিই করে নিচ্ছি ব্যাপারটা। ডায়ালগটা শুনবেন? আজ লিখলাম।'

'কেন? বিজন চৌধুরী লেখেনি?'

'আহা পুরো ছবির সংলাপ লিখে পঞ্চাশ হাজার নিয়ে নিয়েছে আগেই। এখন যদি এক্সট্রা ডায়লগ লেখাতে যাই আবার টাকা চাইবে। আরে আমি প্রমাণ করব যে আমিও কিছু কমতি নই। অবশ্য লোকে মনে করবে ওর ডায়ালগ, নাম হবে ওর।'

'সংলাপটা কি?'

'হ্যাঁ, ভাই-এ ভাই-এ ভাগাভাগি হচ্ছে। দারুণ টেনসন। এমনসময় মা বলবে কাঁদো-কাঁদো গলায়, 'ওরে, তোরা টাকাপয়সা, জমি-জমা বাড়ি-ঘর সব টুকরো-টুকরো করে নিতে পারিস কিন্তু আমি তোদের আমার বুকের ভালোবাসা কি করে ভাগ করে দেব! তোরা যে আমার পাঁজর। ব্যাস দাদা, হাততালিতে হল ফেটে যাবে। এক্সট্রা রুমাল সাপ্লাই করতে হবে।'

'ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে শব্দ ঢোকানো যাবে?'

'যাবে দাদা। রিলিজ করেও ছবিতে যোগ-বিয়োগ করা হয়।'

কৌতূহল হল। শিবু ঘোষের প্রেস শো-তে ছবি দেখতে গেলাম। ভিড়ে চারপাশ ফেটে পড়ছে। ম্যাটিনি শো-এর রিপোর্ট পেয়েছে দর্শকরা। পাঁচগুণ দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। শিবু এগিয়ে এসে হাত ধরল, 'খুব খুশি হলাম দাদা। আসুন আলাপ করিয়ে দিই।'

সঞ্জিতদা ভালো বড় ভাই করছেন, ওঁর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছেই। মেজো ভাই করছেন পেলব চ্যাটার্জি, ছোট ভাই হিরো অভিজিত, নায়িকা দেবশ্রী, আর ওদের মা উষারাণী, বাংলা ছবির সুপারহিট মা! আর উনি হলেন কালী ব্যানার্জি। আসলে এই টিম একসঙ্গে থাকলে ছবি ফ্লপ করে না।'

দেখলামও তাই। হাততালিতে হল ফাটছে। সেইসঙ্গে ফোঁসফোঁসানি। মেয়েরা নাকের জল টানছেন।

বোম্বাইয়ের কাউকে দিয়ে হিরোর গলায় গান বাজল, 'আমার বুকের পাঁজরে আঁকা তোমার ছবি, ওগো মা, তুমি আমার সবি।' শুনতে-শুনতে আমারই মন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। তারপর এল সেই সংলাপ। মা মুখ ফিরিয়ে বলছে, তোদের আমার বুকের ভালোবাসা কি করে ভাগ করে দেব? এত হাততালি এর আগে কখনও শুনিনি।

গত পাঁচ বছরে মুক্তি পাওয়া ছবির তালিকায় সুপারহিট ছবি 'স্নেহের শেকল'। তিন মাসেও হাউসফুল বোড নামছে না। বিজ্ঞাপনে দেখছি একসঙ্গে পঁচিশটি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলছে। রজত, স্বর্ণ শেষে হীরক জয়ন্তী পার করে শিবু এল আমার কাছে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে।'

বললাম, 'ওটা আবার কেন?'

'না দাদা, এটা আমার লাকি ব্যাপার। আপনার আশীর্বাদে দেড় কোটি টাকার বিজনেস করবই। আপনি যদি সঞ্জিতদাকে ঠিক করে না দিতেন তাহলে আজ এখানে দাঁড়াতে পারতাম না।'

'পরের ছবি কি?'

'গল্প ভাবছি দাদা।'

'ডাইরেকশন?'

শিবু হাসল, 'ওটা আমিই করব।'

'তুমি?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

'দেখলাম তো। কিস্যু না। ভালো গল্প, ভালো স্ক্রিপ্ট, ভালো সংলাপ, ভালো অভিনেতা

অভিনেত্রী, ভালো ক্যামেরাম্যান এডিটার আর ভালো অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার সঙ্গে থাকলে ছবি ডাইরেক্ট করা কিছু না। মিছিমিছি ঘরের টাকা অন্য লোককে দেবো কেন?'

'তাহলে মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়—।'

মাথায় হাত ঠেকাল শিবু, 'সেটাও ভেবেছি। ওরা মহান, ঠাকুরঘরের মানুষ। এর পরে যে ফ্লপ ছবি করব সেটা আপনার গল্প। আগেই বলেছি। দেখবেন ঠিক প্যানোরমায় যাবে, আপনার দৌলতে ডিরেক্টার-প্রোডিউসার হয়ে আমি বার্লিন ফেস্টিভ্যাল ঘুরে আসব। তার আগে বার্লিন নয়, বালির জন্যে একটা ছবি করে ফেলি।'



একটি ডলফিন শিশু এবং বলরামের বউ

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আকাশে মেঘ দেখে তথাগত ঠিক করলেন একটি লাইনও লিখবেন না। প্রত্যেকদিন লেখার টেবিলে তার সাত-আট ঘণ্টা কেটে যায়। লিখতে বসলেই লেখা হুড়মুড়িয়ে আসে না তাঁর কলমে। ভাবতে হয়, কাটাকুটি, পাতা ছিঁড়ে ফেলা এসব তো আছেই। কলকাতা থেকে প্রকাশক ফোন করেছিলেন, বইমেলার এক মাস আগে বই বাজারে ছাড়বেন। অতএব যত তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পাণ্ডুলিপি পৌঁছাবে তত কাজটা সহজ হবে। বলেছেন, দু-চারদিনের মধ্যে উপন্যাসটার নাম যদি বলে দেয় তাহলে এখনই আর্টিস্টকে প্রচ্ছদ আঁকতে দিয়ে দিতে পারি। এরা এত দেরি করে আঁকে যে সমস্যায় পড়তে হয়।

প্রকাশক জানেন যে তথাগত উপন্যাস শেষ করে দু-তিনদিন ভাবেন নাম নিয়ে। সঞ্চয়িতা হাতড়ান। শব্দ খোঁজেন। জীবনানন্দও বাদ দেন না। কোনও একটা শব্দ মনে লেগে গেলে সেই শব্দ ভেঙে আচমকা একটা নতুন শব্দ তৈরি হয়ে যায়। তখন আর নামকরণ করতে কোনও অসুবিধে নেই। লেখা শেষ হওয়ার আগেই এমন অনুরোধ করলে তিনি যে অস্বস্তিতে পড়বেন জেনেও কেন করা?

ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে নিজে চা বানিয়েছেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে হালকা মনে টেবিলে বসার আগে জানলার সামনে যেমন রোজ দাঁড়ান তেমনি দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল আজ। সমুদ্রের রং কালচে। মাথার ওপরের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। সে-কারণেই সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন একটু বেশি নাচানাচি করছে। এসব দেখার পর আর লিখতে ইচ্ছে হল না তার। বেরিয়ে এসে বারান্দার ডেক-চেয়ারে বসলেন তিনি।

সমুদ্রের চেহারাটা দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল তথাগতর। টিলার গায়ে এই বাংলো-বাড়িতে এসেছেন মাস দশেক হল। প্রায় সবক'টা ঋতুকেই এই চেয়ারে বসে দেখে গেছেন তিনি। কিন্তু রাগি বাইসনের মতো মনে হয়নি কখনও ঢেউগুলোকে। আধ-মাইল দূরে যে জেলেদের গ্রাম, যেখানকার যুবকরা সারারাত মাছ ধরে সকালে ফিরে এসে তুলে দেয় পাইকারদের হাতে, তারা কি সমুদ্রে গিয়েছিল? ঘরের ভেতর থেকে দূরবিনটা নিয়ে এসে চোখের ওপর তুললেন। অন্য দিন, রোদ বা ছায়া থাকলেও, সমুদ্রের অনেকটাই এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। আজ মনে হল আকাশ খুব কাছাকাছি সমুদ্রে মিশে গেছে।

কটকের বিশ্বনাথ ঢড়ের বাংলো এটা। বিশ্বনাথবাবু বড় ব্যবসায়ী নন, অত্যন্ত অভিজাত ব্যক্তি। ইংরেজি, ওড়িয়া এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠকও। বছর পাঁচেক আগে কটকে প্রজাপতি পত্রিকার

বিষুব মেলা উৎসবে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যোগাযোগ রাখতেন ভদ্রলোক। এই বাংলোর কথা জানতে পেরে ভাড়া নিয়ে থাকতে চাইলে এককথায় রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ভাড়াটা তাঁকে টাকায় না দিয়ে এই বাংলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় করতে হবে ওই শর্ত দিলেন। দশ মাস তাই করে আসছেন তথাগত। জল, বিদ্যুৎ, পরিষ্কার করার লোকের পেছনে যা খরচ হয় তা নামমাত্র। কিন্তু বাংলোটি অসাধারণ। উঁচু টিলার গায়ে বাংলো। ও-পাশে বালি-পাথরের আড়াল, এ-পাশে সমুদ্র। পেছন দিক থেকে রাস্তা নেমে মিশেছে পিচের পথে। সমুদ্র অন্তত চল্লিশ ফুট পায়ের নিচে।

হঠাৎ হাওয়া বইল। বাড়তে-বাড়তে রেগুলেটার ফুল স্পিডে নিয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি শোঁ-শোঁ আওয়াজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূখণ্ডে। মজবুত বাংলোটা একটু নড়ে উঠল বলে মনে হল তথাগতের। এবং তারপরেই তিনি দৃশ্যটি দেখলেন। এতক্ষণ যে ঢেউগুলো রাগে ফুঁসছিল সেগুলো আচমকা গুটিয়ে গিয়ে বড় হতে-হতে যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। তারপর তীব্র গতিতে ছুটে এল এক পাড়ের দিকে। নড়ে উঠল বাংলো থরথরিয়ে। ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পারলেন তথাগত।

ভয়ঙ্কর শব্দে সেই ঢেউ ভেঙে পড়ছে বাংলোর দু-পাশের জমিতে। সেটাকে টপকে ঢুকে পড়েছে ওপাশে। একটা নয়, বারবার ধেয়ে আসতে লাগল ওরা। চল্লিশ ফুট উঁচুতে ছুড়ে মারতে লাগল জল প্রবল আক্রোশে। শেষপর্যন্ত একটা ঢেউ এত ওপরেও উঠে এল তীব্র গতিতে। বাংলোর পিলারগুলো থরথর করছে এবার। তথাগত এইবার ভয় পেলেন। মনে হল মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ সমুদ্র গ্রাস করবে পৃথিবীকে। কোনও মানুষকে নোয়ার মতো পৃথিবীর সব প্রাণীদের নিয়ে জাহাজ ভাসানোর অবকাশ দিল না। দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই বারান্দা পেরিয়ে জল ধাক্কা মারল দরজায়। গলে এল ঘরে। তথাগত দৌড়ে পেছন দরজায় এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। নিচের রাস্তা, ওপারের চালাঘরগুলো এখন জলের তলায়। এই বাংলো থেকে নেমে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। শোঁ-শোঁ শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। সাঁতার জানলেও কোনও মানুষের পক্ষে এই জলে নামা সম্ভব নয়। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। নড়বড়িয়ে উঠল বাংলো, তারপর একপাশে কাত হয়ে গেল। কোনও মতে দরজা ধরে নিজেকে সামলে নিতে পারলেন তথাগত। আবার ফিরে গিয়ে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াবার সাহস তাঁর হল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন আর একটা বড় ধাক্কা পেলেই বাংলোটা চল্লিশ ফুট নিচে গড়িয়ে পড়বে। দরজার এপাশের দেওয়ালে একটা রাবারের টিউব ঝুলছিল। বাংলো কাত হয়ে গেলে সেটা মেঝের ওপর পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল ঢালুর দিকে। হাওয়া ভরতি বড় টিউবটাকে তুলে নিলেন তথাগত। এরকম টিউব চড়ে অনেকেই সমুদ্রে স্নান করে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে টিউবটাকে শরীরের মধ্যভাগে নিয়ে এসে তৈরি থাকলেন তিনি। বাংলো জলে পড়লেই তিনি বাঁচার জন্যে চেষ্টা করবেন এর সাহায্যে। এই মুহূর্তে তাঁর মনে টাকাপয়সা, জামাকাপড় তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপির কথাও মনে এল না।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন তথাগত। চরাচর ভাসিয়ে যে জল ফুঁসছিল তারা ফণা গোটাল। তারপর হু-হু করে ফিরে যেতে লাগল সমুদ্রের দিকে। তার টানে ভাঙাচোরা গাছপালা থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস ধেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হতে। একসময় জল চলে গেলে আঁতকে উঠলেন তথাগত। পিচের পথটায় বিশাল-বিশাল গর্ত, মনে হচ্ছে কেউ যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কোনও গাছপালা কখনও যেন এখানে ছিল না। বালির ভেতর বড়-বড় গর্ত এবং সেখানে সমুদ্রের জল জমে আছে।

কোনওমতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন তথাগত। যত দূর চোখ যাচ্ছে শুধু সমুদ্রের তাণ্ডবলীলার স্মৃতি। এবং তখনই তাঁর চোখে পড়ল, টিলার ওপরের অংশ যা বাংলোর গায়ে ছিল তা ভেঙে পড়েছে বাংলোর ওপরে। পড়ার ফলে বাংলোটা আটকে গেছে শক্তভাবে।

ওপরে উঠলেন তিনি। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে গিয়ে দেখলেন বিদ্যুৎ নেই। থাকাটাই যে

অস্বাভাবিক হত তা তিনি বুঝে গেছেন। ঘরে যে জল ঢুকেছিল তা এরমধ্যে বেরিয়ে গেলেও মেঝে ভিজে চপচপ করছে। তাঁর জুতো জোড়াকে দেখতে পেলেন না। বাইরের ঘরে, যেখানে বসে তিনি লেখেন, সেখানে পৌঁছে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লেখার টেবিলটা উলটে পড়েছে মেঝেতে। যাবতীয় কাগজ, এমনকী লেখা হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির ফাইলও সেখানে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত দিতেই বুঝলেন, সব শেষ হয়ে গেছে। জলের তলায় কিছুক্ষণ থাকায় কাগজগুলো প্রায় কাদার পর্যায়ে চলে এসেছে।

যেভাবে অসুস্থ শিশুকে মায়েরা কোলে তুলে নেন, ঠিক সেইভাবে পাণ্ডুলিপির ফাইলটা তুললেন তথাগত। সেটাকে চেয়ারের ওপর রেখে টেবিলটাকে সোজা করে ফাইল খুললেন। ওপরের মোটা কাগজই ভিজে এত নরম হয়ে গেছে যে খুলতেই খসে গেল। আশিটি ফুলস্কেপ পাতা এখন জড়িয়ে আছে গায়ে-গায়ে। ওপরের পাতার কালি জলে ভিজে ঝাপসা করে দিয়েছে লেখাগুলো।

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলেন প্যাকেটটাকে। সযত্নে একটা-একটা পাতা তুলে খাটের ওপর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। জলে ঝাপসা হয়ে গেলেও চেষ্টা করলে পড়া যাবে অক্ষরগুলো। শুকিয়ে যাওয়ার পরে কী অবস্থা হয় তাই দেখার। এতদিনের পরিশ্রম, ভাবনা সব এক নিমেষেই খেয়ে ফেলল সমুদ্র। যে ছিল চল্লিশ ফুট নিচে সে এমন সর্বনাশ করবে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তথাগত। আশিটি পাতাকে খাট জুড়ে আলাদাভাবে রাখা সম্ভব নয়। কোনও-কোনওটা একটু ওপর-ওপর রইল। করুণ চোখে নিজের সৃষ্টির প্রায় ধ্বংসাবশেষ দেখতে লাগলেন তথাগত।

সহ্য হল না তাঁর। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। এসেই অবাক হয়ে গেলেন। মেঘ এখনও রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা উধাও। জল নেমে গেছে যেখানে রোজ থাকে। একেবারে শান্ত ভঙ্গিতে ঢেউগুলো নড়াচড়া করছে এখন। মাঝে-মাঝে গড়িয়ে এসে চল্লিশ ফুট নিচে বালিতে আছড়ে পড়েই নিস্তেজ ভঙ্গিতে ফিরে যাচ্ছে আবার। কে বলবে এই সমুদ্রই কিছুক্ষণ আগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল এবার। হঠাৎ তথাগত দেখতে পেলেন বারান্দার সামনে বালিতে মাঝারি আকারের গর্তে যে জল জমে গেছে সেখানে কিছু একটা ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে চোখ বড় হয়ে গেল তাঁর। ওটা যে ডলফিনের বাচ্চা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাচ্চাটার বয়স দিন সাতেকের বেশি নয়। এখনও ভালো দৃষ্টিশক্তি হয়নি। ওই অল্প জলে সে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাংলোয় ঢুকে কোদাল খুঁজতে লাগলেন তথাগত। ছোট্ট স্টোররুমে ও ধরনের জিনিস দেখেছিলেন আগে। আজ পেয়ে গেলেন। বারান্দার নিচে বালিতে একটা বেশ বড় গর্ত খুঁড়লেন তিনি। কলে জল আছে এখনও। অর্থাৎ ওপরের ট্যাঙ্কের জল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জল পাবেন খাওয়ার জন্যে। কিন্তু এই শিশুটিকে বাঁচাতে সমুদ্র থেকে যদি জল বয়ে আনতে হয় তাহলে যে সময় যাবে ততক্ষণ কি ডলফিনটা বাঁচবে? তারপরেই খেয়াল হল, বেচারা জন্মেছে লোনা জলে। ট্যাঙ্কের মিষ্টি জল ওর পছন্দ হবে তো? সেই জলে সামুদ্রিক প্রাণী বাঁচবে কি সেটাও জানা নেই।

তবু ট্যাঙ্কের জল কল থেকে বের করে সদ্য খোঁড়া গর্তে ঢাললেন তথাগত। তারপর সন্তর্পণে তুললেন ডলফিন শিশুকে। স্পর্শ পাওয়ামাত্র বেচারা স্থির হয়ে গেল। দেখা বা দেখার মধ্যে না গিয়ে মুখ নামাল। দ্রুত ওকে বড় গর্তে নামিয়ে দিলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল প্রাণীটি। তারপর হঠাৎই যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। ওর শরীরের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা আছে এই গর্তে। তথাগত লক্ষ করলেন, ডলফিনশিশুর শরীরের বাঁ-দিকে একটু থেঁতলে যাওয়ার দাগ আছে। ওই দিকটা বেচারা নাড়তে পারছে না। সমুদ্রের ঢেউ এতটা ওপরে ওকে তুলে দেওয়ার সময় নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছিল।

এর চিকিৎসা কীভাবে করা যায় ঠাওর করতে পারলেন না তিনি। তারপর উঠে গেলেন ঘরে। একজন ডাক্তার, যদিও মানুষের ডাক্তার, মাইল দশেক দূরে থাকেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলা

যেতে পারে। রিসিভার কানে চেপে ডায়াল করতে যেতেই থেমে গেলেন তিনি, ডায়াল টোন নেই। টেলিফোন একেবারে মৃত।

অর্থাৎ আলো নেই, টেলিফোন নেই। জল যা ওপরের ট্যাঙ্কে আছে তা বেশি ব্যবহার না করলে দিন দুই-তিন চলবে।

আহত ডলফিনশিশুর সুস্থতা প্রকৃতির ওপর ছেড়ে না দিয়ে কোনও উপায় নেই। ভাগ্যিস মাথায় চোট পায়নি, তাহলে আর এমন ফুর্তিতে সাঁতার কাটতে হত না। কিন্তু ডলফিনরা খায় কী? ফ্রিজ থেকে দুধ বের করলেন তথাগত। কাজের লোকটি সাতসকালে আসে না। আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। গতকালের এনে দেওয়া দুধ পেয়ালায় ঢেলে চামচ দিয়ে তথাগত চলে এলেন ডলফিনশিশুর কাছে। ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে ছিল সে। তাকে দেখামাত্র এই দিকে মুখ ঘোরাল। বালির ওপর বসে দুধের কাপ রেখে ডান হাত বাড়াতেই সরে গেল ডলফিনশিশু। তথাগত কথা বললেন, 'আয়, কাছে আয়, তোকে দুধ খাওয়াব। আয়।' ডলফিনশিশু দূরে সরে গিয়ে পাক খেতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে ওকে হাতের নাগালে পেলেন তথাগত। ধীরে-ধীরে জলের ধারে নিয়ে এসে মুখটাকে উঁচু করে ধরতেই হাঁ করল। সঙ্গে-সঙ্গে এক চামচ দুধ ওর মুখে ঢেলে দিয়ে অপেক্ষা করলেন একটু, দুধটা গিলে ফেলল ও। ছেড়ে দিতেই দূরে সরে গেল কিন্তু ফিরে এল আরও দ্রুত। এসে হাঁ করল। এবার না ধরে দু-চামচ দুধ ঢেলে দিলেন ওর মুখে। তথাগত হাসলেনও, মানবশিশুর সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু যেমন মুখে খাবারের গ্রাস নিয়ে টলমলে পায়ে দৌড়ে পালাতে চায় এ-ও তেমনি করছে। ধীরে-ধীরে পেয়ালার দুধ শেষ হয়ে গেল। ওর পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট কিনা বুঝতে পারলেন না তথাগত। এখানে ডলফিনদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কিনা খোঁজ নিতে হবে। ওদিকে ফিশারিজ বিভাগের দপ্তর আছে, ওরা নিশ্চয়ই কিছু খবর দিতে পারবে।

খোলা আকাশের নিচে ডলফিনশিশুকে রেখে দেওয়া কি ঠিক হবে যদিও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তেই জোর বর্ষণ হতে পারে। তা ছাড়া বড়-বড় পাখিও জুটে যেতে পারে। বাংলোর ওপাশে খসে পড়া একটা বড় টিন টেনে এনে এমনভাবে গর্তের ওপর চাপা দিলেন যাতে ভেতরে বাতাস স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে।

একটা ছাতি নিয়ে কোনওমতে রাস্তায় নামলেন তথাগত। কিন্তু রাস্তা কোথায়? যেদিকে তাকান শুধু দুমড়ে যাওয়া প্রকৃতি। সমুদ্রের ঢেউ স্থলভূমির ছালচামড়া ভয়ঙ্কর শক্তিতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। সেই চালাঘরগুলো নেই। গর্ত বাঁচিয়ে কোনওমতে সিকি মাইল হেঁটে আসার পরে একটা বিশাল বটগাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় গোটা চারেক মানুষকে দেখতে পেলেন তিনি।

কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকির পরেও ওদের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে তাঁর শরীর কেঁপে উঠল। ওদের কেউ জীবিত নেই। জল ওদের ওই ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। প্রাণহীন শরীরগুলো আটকে আছে গাছের ডালে। গাছটাও হেসে পড়েছে একদিকে। গুঁড়ির ওপরে কিছুটা জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে।

তথাগতর মনে হল তিনি এখন মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে আছেন। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা গর্জন ছাড়া কোথাও কোনও প্রাণের ইঙ্গিত নেই।

ধীরে-ধীরে ফিরে এলেন বাড়িতে। আসার পথে কিছু মাছ চোখে পড়ল। ছোট-ছোট পারশে, তপসে। ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে এসেছিল, ফিরে যেতে পারেনি। এখনও টাটকা রয়েছে। ফিরে এসে বাংলো থেকে ব্যাগ নিয়ে মাছগুলোকে সংগ্রহ করলেন তথাগত। ছুরি দিয়ে পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফ্রিজে ঢোকাতে গিয়ে খেয়াল হল, বিদ্যুৎ নেই, আর কিছুক্ষণ বাদেই ফ্রিজের ভেতরটা গরম হয়ে যাবে। তখন ওই মাছগুলোকে আর খাওয়া যাবে না।

অতএব এক প্লেট মাছ ভেজে নিয়ে লাঞ্চ সারলেন তিনি। দুটো সিলিন্ডার ভরতি গ্যাস আছে কিচেনে। আগুন জ্বেলে রান্না করার সমস্যা নেই। আছে চাল আর আলু পেঁয়াজ। ডালও কিছু থাকা উচিত। অর্থাৎ তাঁর নিজের খাওয়া নিয়ে কোনও চিন্তা আপাতত নেই।

সমস্যা হবে এই ডলফিনশিশুর। টিনের আড়াল সরাতেই শিশুটি চলে এল তাঁর কাছে। এখন ওর মায়ের পেটের সঙ্গে সেঁটে থাকার কথা। মা যা করবে তাই নকল করবে এখন থেকে। ওই বিশাল সমুদ্রে মা কোথায় আছে, আদৌ আছে কি কে জানে! তিনি ফিশফিশ করে ডাকলেন, 'ফিন, ফিন।' সঙ্গে-সঙ্গে শিশুটি পাক খেয়ে চলে গেল ওপাশে।

তথাগত লক্ষ করলেন গর্তের জল অনেকটা কমে গেছে। বালি শুষে নিচ্ছে। আগে জল ভরে দেওয়া দরকার। তিনি উঠতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। বড়-বড় ফোঁটা থেকে বাঁচতে দৌড়ে কাত হয়ে থাকা বারান্দার ছাদের নিচে চলে এলেন। বৃষ্টি আরম্ভ হল। সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্র চলে গেল সাদা পরদার আড়ালে। বারান্দায় ছাদের একপাশ দিয়ে জল ঢুকছে ভেতরে। তাঁর পক্ষে এখনই সারানো সম্ভব নয়। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা এল। বাংলোয় ছোট বড় যত পাত্র ছিল, এমনকী একটা বড় ড্রামও, বৃষ্টির জল ভরার কাজে লাগালেন। ড্রামের ভেতরটা পরিষ্কার করার মতো জল জমতে মিনিট পাঁচেক লাগল। খুশি হলেন তথাগত। ওপরের ট্যাঙ্কের জল শেষ হয়ে গেলেও এই জল কিছুদিন তাঁকে সাহায্য করবে। বৃষ্টির জল ফুটিয়ে নিলে খেতে তো অসুবিধে নেই।

এই তুমুল বৃষ্টি বেশিক্ষণ দেখতে ভালো লাগল না। ঘরে ঢুকে দেখলেন এখনও ছাদ থেকে জল পড়েনি। তাঁর লেখাগুলো নেতিয়ে পড়ে আছে খাটের ওপরে। শুতে গেলে ওগুলো সরাতে হবে। সেই পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করল না। বাইরের ঘরের ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিতে মনে হল এর চেয়ে আরাম আর কিছুতেই নেই। বড্ড বেশি পরিশ্রম করেছেন আজ, অনেকদিন বাদে। কিন্তু আজ এরকম হল কেন? সমুদ্র এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ধ্বংস করে গেছে সব এমন ঘটনার কথা কি আগে শুনেছেন? মনে পড়ছে না তার। এই তল্লাটে একমাত্র টিলার ওপর বাংলো এইটে। আর সবাই থাকেন সমুদ্রের লেভেলে। জোয়ারের সময় জল যত দূর ওঠে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু আজ যদি চল্লিশ ফুট উঁচুতে ঢেউ ডলফিনশিশুকে ছুঁড়ে দিতে পারে তাহলে মাইলের-পর-মাইল জনপদ এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই স্বাভাবিক। ওই যে জেলে বস্তি, বাসস্ট্যান্ডের পাশের দোকানপাট, মাছের আড়তগুলো, ও পাশের গ্রাম—ভাবতে পারছিলেন না তথাগত। ওই গ্রাম থেকে হেঁটে আসত বলরাম। তাঁর সংসারের প্রায় সব কাজ শেষ করে দুপুরের খাবার নিয়ে গ্রামে ফিরে যেত। লোকটার ব্যবহার দেখে খুশি হয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন তিনি, খুব খুশি হয়েছিল বলরাম। কিশোর বয়সে বিয়ে করেছিল সে বাড়ির চাপে। ভগবানের আশীর্বাদে বাচ্চা হয়নি। একথা ও নিজেই বলে। 'ভাগ্যিস হয়নি নইলে কী খাওয়াতাম তাকে!'

তথাগতর মনে হল তিনি আর বলরামকে দেখতে পাবেন না। ওর গ্রাম এখন নিশ্চিহ্ন। বলরাম বলেছিল, 'বাবু, আপনি যখন কলকাতায় ফিরে যাবেন আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'আমি তো আর কখনও কলকাতায় ফিরব না বলরাম।'

'সত্যি! তাহলে আর আমার কোনও চিন্তা নেই।'

'মানুষ কেন চিন্তা করে ভবিষ্যৎ ভেবে? কোনও মানে হয়? অনেকে কিছু ভেবে যদি কেউ সিদ্ধান্ত নেয় এইভাবে বাকি জীবন কাটাবে সেভাবে কি কাটাতে পারে? এক লহমায় মৃত্যু তাকে তুলে নিয়ে সেই চিন্তার আর কি মূল্য থাকছে!

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার আগেই একটা স্যাঁতসেঁতে সন্ধ্যা হুড়মুড়িয়ে এসে যেতেই ঘরদোর অন্ধকার হয়ে এল। আলো জ্বালতে গিয়েই হাত নামালেন তথাগত। সেই সাতসকালেই কারেন্ট গিয়েছে। খুঁজে-খুঁজে কয়েকটা মোমবাতি পেয়ে গেলেন। এগুলো বলরামই বাসস্ট্যান্ডের পাশের দোকান থেকে এনেছিল। মোমবাতি জ্বালালেন তিনি। আলো হল, সেইসঙ্গে

ছায়াও কাঁপতে লাগল।

রান্নাঘরে মোমবাতি নিয়ে গিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে প্যাকেট থেকে তৈরি রাখা নুডল বের করে জলে ফুটিয়ে নিতেই খাবার হয়ে গেল। মশলা ছড়িয়ে চামচ দিয়ে খেতে-খেতে মনে পড়ল ফিন-এর কথা। বেচারা সেই কখন এক কাপ দুধ খেয়েছে। খিদের জ্বালায় নিশ্চয়ই ছটফট করছে এখন। কয়েকটা নুডল প্লেট থেকে সরিয়ে জলে ধুয়ে নিলেন তিনি। তারপর ছাতি মাথায় এক প্লেট নুডল আর চামচ নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে নিচে পা রাখলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেলেও একটা আলোর মায়া বাইরের প্রকৃতিতেও তখন রয়েছে। গর্তের কাছে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বৃষ্টির জল গর্তে পড়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ফিন গর্তে নেই। আশেপাশে লক্ষ করতেই দেখতে পেলেন ওকে। ভেজা বালির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দ্রুত ওর পাশে গিয়ে বসতে-না-বসতেই ভিজে গেলেন তথাগত। হাত দিয়ে বুঝলেন ফিন এখনও মরেনি। ক্রমাগত জল গায়ে পড়ায় শুকিয়ে যায়নি শরীর। ওকে তুলে নিয়ে আবার গর্তে ছেড়ে দিলে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তথাগত ডাকলেন, 'ফিন, ফিন।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। আলোর মায়া চলে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। শেষপর্যন্ত মুখ তুলল ডলফিনশিশু। জলের ভেতর হাত দিয়ে ওকে আদর করলেন তথাগত। তারপর প্লেট থেকে এক চামচ নুডল নিয়ে ওর মুখের সামনে ধরলেন। হাঁ করল ফিন। নুডল মুখে দিতেই গিলে ফেলল অনায়াসে। একটু-একটু করে প্লেট খালি হয়ে গেল। তথাগত বুঝলেন ওর খেতে খারাপ লাগছে না এবং পরিমাণ আর একটু বেশি হলে ভালো হত। পেটে খাবার যাওয়ামাত্র চাঙ্গা হয়ে গেল ফিন। ঝট করে একটা পাক ঘুরে এল সে। মুখ তুলে হাঁ করল।

ছাতি ছাড়াই চলে এলেন তথাগত। ফ্রিজ থেকে দুধের বোতল বের করতেই নজরে পড়ল রবারের গ্লাভস দুটোর দিকে। ফ্রিজের ওপর পড়ে আছে। এখনও ব্যবহার করেনি। ওটার ভেতর জল ঢুকিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আঙুলগুলোয় দুধ ভরলেন। তারপর একটা আলপিন দিয়ে আঙুলের ডগা ফুটো করতেই এক ফোঁটা দুধ বেরিয়ে এল।

প্রায়ান্ধকারে গ্লাভসের পাঁচ আঙুলে দুধ চুষে খেয়ে ফেলল ডলফিনশিশু। এই সময় বৃষ্টি থামল। মুখ তুলে তথাগত দেখলেন কেউ যেন ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেঘগুলোকে। গর্ত থেকে খানিকটা জল বের করে টিন দিয়ে চাপা দিলেন তিনি। বাতাস ঢুকবে কিন্তু ফিন চেষ্টা করলেও বেরুতে পারবে না।

একটু হাওয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে উঠলেন তথাগত। বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস তাঁর নেই। নির্ঘাত সর্দিজ্বর আসবে। তাড়াতাড়ি মোমবাতি নিয়ে বাথরুমে চলে এসে ভালো করে স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন তিনি। গায়ে একটা চাদর জড়াতে আরাম হল। তারপর বোতল থেকে হুইস্কি বের করে গ্লাসে ঢাললেন। মনে-মনে বললেন, 'এই বস্তুটি পেটে গেলে সর্দিজ্বর পালাবেই।'

গোটা তিনেক হুইস্কি খাওয়ার পর অভ্যেসমতো বারান্দার দরজা বন্ধ করতে এসে থমকে গেলেন তিনি। সামনের আকাশে যেন ময়ূরের গলার রিং। কি দারুণ! দূরে সমুদ্রের বুকে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। আর নিচের সমুদ্র পোষা বেড়ালের মতো সেই আকাশে মুখ ঘষছে। সকালের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটির কথা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবে না এখন এই ছবির সামনে দাঁড়ালে। প্রকৃতির কি খেয়ালি খেলা। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলেন তিনি। কিছুক্ষণ দেখার পর বুকের ভেতরটা কীরকম মোলায়েম হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন ওটা আর আগের জায়গায় নেই। ছাদ নেমে আসায় বেঁকে গেছে দরজা। তারপর মনে হল, কেন বন্ধ করছেন? আজ এই রাত্রে এখানে আসার মতো কোনও প্রাণ এই চরাচরে নেই।

ফ্রিজে খাবার ছিল। সেগুলো এখন বিদ্যুতের অভাবে আহারযোগ্য কিনা তা যাচাই করতে ইচ্ছে হল না তথাগতর। কুড়িয়ে এনে রাখা মাছগুলো চটপট ভেজে নিলেন তিনি। তারপর হুইস্কি

গ্লাসে ঢেলে আরামচেয়ারে বসলেন। মোমবাতির শরীর ইতিমধ্যে খাটো হয়েছে কিছুটা।

তথাগত ভাবছিলেন। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিশ্চয়ই মাইলের-পর-মাইল সমুদ্র তীরে ঘটেছে। মাথার ওপরের ছাদ মোটামুটি ঠিক থাকলেও এখানে আর দু-একদিনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। জল এবং খাবার না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। অতএব কালই রওনা হওয়া দরকার। এখান থেকে প্রতিদিন তিনটি বাস শহর যায় আসে। ঘণ্টা আড়াই লাগে। সেই বাস চলছে কিনা তা স্ট্যান্ডে না গেলে জানা যাবে না। ট্রেন লাইন মাইল কুড়ি দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি ছিল। সেটা উড়ে গেলে সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যেতে হলে খালি হাতে যেতে হবে। এখানকার জিনিসগুলো নিয়ে তাঁর পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল পাণ্ডুলিপিগুলোর কথা। এতক্ষণে কাগজগুলোর শুকিয়ে যাওয়া উচিত। খুব ইচ্ছে করছিল পাশের ঘরে গিয়ে ওগুলো দেখতে। যতই ঝাপসা হোক, চেষ্টা করে পড়া গেলে পাবলিশার হাতে স্বর্গ পাবে। কিন্তু ইচ্ছেটাকে সংবরণ করলেন তিনি। ধরা যাক, শুকিয়ে যাওয়ার পর ওগুলো বেশ পড়া যাচ্ছে। এটুকু ভাবলেই আজ রাত্রে স্বস্তি পাচ্ছি। উলটোটা যদি ঘটে থাকে তাহলে খামোখা আজ রাত্রের স্বস্তি নষ্ট করে কি লাভ!

আজ দু-পেগ খেয়েই ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। সারাদিনের টেনশন, পরিশ্রমের ক্লান্তি এবং বৃষ্টিতে ভেজার অনভ্যাস তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। সেই ঘুমের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন, 'বাবু বাবু!'

বলরামের গলা। বেচারা বলরাম! মরে গিয়ে প্রেত হয়েও তাঁর কথা ভুলতে পারেনি। তিনি ঘুমের মধ্যেই বললেন, 'এই যে আমি। কিছু বলবে বলরাম?'

'বাবু! ও বাবু!' এবার গলায় কান্নার আওয়াজ।

প্রেতেরা কি কাঁদে? বলরামের জন্যে খুব কষ্ট নিয়ে নড়ে উঠলেন তথাগত। আরামচেয়ারের দুই হাতলে পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুতেই পায়ে কারও স্পর্শ পেলেন।

'বাবু, আমি বলরাম!'

চোখ খুললেন তিনি। ঘরে মোমবাতির আলো কাঁপছে। তাঁর পায়ের কাছে বলরাম দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে।

'তুমি?'

'হ্যাঁ বাবু!'

'বেঁচে আছ?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এখন তো অনেক রাত!'

'জল আসছে দেখে আমি বউকে নিয়ে কাঁঠাল গাছের মগডালে উঠে বসেছিলাম। ঢেউ গাছের নিচের ডালগুলো মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল। অত উঁচুতেও আমাদের গলা পর্যন্ত জল উঠেছিল। তারপর জল নেমে গেলে আর নামতে পারছিলাম না।'

'কেন?'

'নিচে কোনও ডাল ছিল না। কাঁঠাল গাছটা যেন নারকোল গাছ হয়ে গিয়েছিল। একটা লোক নেই চারপাশে যে সাহায্য করবে। গাঁকে গাঁ সমুদ্র গিলে ফেলেছে বাবু।' ডুকরে কেঁদে উঠল বলরাম।

'তা নামলে কী করে?'

'এই একটু আগে গাছটার মাজা ভেঙে পড়তে আমরা কোনওমতে পড়লাম। জলের সময় যদি গাছটা ভাঙত তাহলে—!'

'আমরা মানে?'

'আমি আর আমার বউ।'

'ও।'

'বাবু। আপনার কোনও বিপদ হয়নি তো?' বলরামের গলায় উদ্বেগ।

'হলে কি আমাকে দেখতে পেতে।' উঠে দাঁড়ালেন তথাগত। বলরামের পেছনে একটা লম্বা শরীর, মুখ ঘোমটায় ঢাকা। শাড়িটিতে কাদা শুকিয়ে আছে।

'নিশ্চয়ই না খেয়ে আছ?'

'খাবার কোথায় পাব বাবু! চারধার শ্মশান!'

'হুঁ। বাইরে বৃষ্টির জল ধরা আছে। গ্যাস জ্বেলে ভাত আলু ফুটিয়ে নাও। আজ রাত্রে বারান্দায় শোও তোমরা। আমার শোওয়ার ঘরে জায়গা নেই।'

'আয়।' বলে বউকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল বলরাম।

ঘণ্টা বারোর বেশি যারা গাছে ঝুলে ছিল প্রাণভয়ে তারা এত স্বচ্ছন্দে হাঁটে কী করে! তথাগত আবার হুইস্কি নিলেন। প্রত্যেক মাসে শহরে গিয়ে দশটা বোতল কিনে নিয়ে আসেন তিনি। এখনও যেমন খেয়েছেন তেমন খেলে দিন পনেরো চলবে। তারপর? হাসলেন তথাগত। আজকের রাতটায় তুমি বেঁচে অছে, তাই আজকের কথাই ভাব। সব ঠিকঠাক থাকলে খুশি হও। কালকের ভাবনা কালকে ভাবা যাবে।

ভোর হতে-না-হতে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন তথাগত। এরকম ভঙ্গিতে শোওয়ার অভ্যেস তাঁর নেই। ফলে পিঠে কোমরে একটু ব্যথা বোধ হল। এখনও আলো তার সঠিক চেহারা নেয়নি। আতপ চালের গুঁড়ো জলে গুলে যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর ওপর। তথাগত বেরুতে গিয়ে থমতে গেলেন। বারান্দার একপাশে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে বলরাম। মুখ হাঁ করা। পা ছড়ান। ওপাশে ওর বউ কাত হয়ে রয়েছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে গর্ত চাপা-দেওয়া টিনের কাছে এলেন। পায়ের নিচে তো বটেই, আশেপাশের বালি ভিজে রয়েছে।

টিনের আড়াল তুললেন তথাগত। গর্তের জল কমে গেলেও ফিনের শরীর ডুবিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। স্থির হয়ে ছিল সে। তথাগত যেই ডাকলেন, 'ফিন, ফিন,' অমনি নেচে উঠল যেন। কিনকিন আওয়াজ তুলে গর্তের ধারে এগিয়ে এসে হাঁ করল ফিন। ওর মাথায় হাত বোলালেন তথাগত, 'খিদে পেয়েছে? কিন্তু তোর দুধ তো আর একটুখানি ফ্রিজে পড়ে আছে! নুডল খাবি?'

'মাথা ঘষে তথাগতর হাতে আদর করল ফিন।

সমুদ্রের দিকে তাকালেন তথাগত। সমুদ্র এখন স্থির। মৃদু বাতাস আঁচড়ে যাচ্ছে তার জল। এই বিপুল জলরাশির কোথাও নিশ্চয়ই ফিন-এর মা খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্তানকে। কিন্তু ওকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেই যে মায়ের কাছে পৌঁছতে পারবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ওই শিশু অন্য কোনও প্রাণীর আক্রমণের লক্ষ্য হলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

'বাবু! এটা কী?' বলরামের গলা পেছন থেকে ভেসে এল।

'এটা একটা ডলফিনের বাচ্চা'। কাল সমুদ্র ওকে তুলে আমার এখানে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। আমি ওর নাম দিয়েছি ফিন।'

'এই এখানেও জল উঠেছিল?' হাঁ হয়ে গেল বলরাম।

'হ্যাঁ। জল না, ঢেউ উঠছিল ছোবল মেরে। ওই দ্যাখ, বারান্দার ছাত কাত হয়ে আছে। কাল তোমরা ভাত খেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ বাবু!'

'হাঁড়ি পরিষ্কার করে খেয়েছ না কিছু পড়ে আছে?'

'বেশি খেতে পারোনি বাবু, অনেকটা থেকে গেছে।'

'বাঃ। এক প্লেট ভাত জল দিয়ে ভিজিয়ে একটা চামচ সমেত নিয়ে এসো তো।' তথাগত উবু হয়ে বসলেন গর্তের পাশে, একটা পাক খেতে-খেতে ফিন শব্দ করল, 'কিন।' তথাগতর খেয়াল হল, কোথায় পড়েছিলেন, ডলফিন গান গাইতে পারে ওদের মতো করে। মানুষের ন্যাওটা হয়ে

যায় খুব তাড়াতাড়ি।

ভাত নিয়ে এল বলরাম। তথাগত ফিনের মুখে ধরতে গেলে সে হাঁ করল। অতএব এক চামক ভাত সেই হাঁ মুখে ঢেলে দিলেন, 'আস্তে খাবি।'

গপগপ করে গিলে ফেলল ফিন। আর একবার জলে পাক দিয়ে এসে হাঁ করল। বলরাম মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, 'এ ভাত খায়?'

'সমুদ্রের ভেতর ও ভাত পাবে কোথায়? মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স এখন। আমাদের বোতলের দুধ তো শেষ। কাল রাত্রে নুডল দিয়েছিলাম, খেয়েছিল। তাই এখন ভাত দিচ্ছি। নরম খাবার হলে গিলতে পারবে সহজে।'

প্লেটের ভাত শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে বলরামকে তথাগত বললেন, এক বালতি বৃষ্টির জল গর্তে ঢেলে দিতে। এই সময় খসখসে গলা ভেসে এল, 'হয়ে গেছে।'

'নিয়ে আয়। বাবুর কাছে লজ্জা কীসের। এক কাপ চা খেয়ে বাবু বাথরুমে যায়। নিয়ে আয় এখানে।' বলরাম হুকুম করল।

হেসে ফেললেন তথাগত। এক হাতে চায়ের কাপডিশ, অন্য হাতে ঘোমটার প্রান্ত গলার নিচে ধরে বলরামের বউ বারান্দা থেকে নামছে, হোঁচট খেয়ে পড়ল বলে।

'তুমি তো পড়ে যাবে। পথে দেখে হাঁটো।' বললেন তিনি।

'বললাম এত লজ্জার কিছু নেই। দিনভর যখন গাছে ঝুলছিলি তখন তোর মাথায় ঘোমটা ছিল? তখন তো মরতে বসেছিলি।' বলরাম খেঁকিয়ে উঠল।

ঘোমটা চিবুকের কাছে উঠল।

চায়ের কাপ নিয়ে তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বউ-এর নাম কী?'

বলরাম বলল, নাম বল।'

'লক্ষ্মী!' ঘোমটার আড়াল থেকে খসখসে গলা ভেসে এল।

চায়ে চুমুক দিলেন তথাগত। ভেবেছিলেন খাওয়া যাবে না কিন্তু ততটা খারাপ লাগল না। তথাগত বললেন, 'বলরাম, বাড়িতে যা আছে তাতে ক'টা দিন চলতে পারে। তারপর তো এখানে থাকা যাবে না। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমরা কী করবে ভেবে দ্যাখো। তোমাদের ঘর—!'

'কিছু নেই বাবু। একেবারে মাটি হয়ে গেছে।'

'তাহলে?'

'বাবু আপনি এখান থেকে যাবেন না। আমি যেখান থেকে পারি সব জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসব। দরকার হলে সাইকেলে শহরে চলে যাব। আমি একা থাকলে, দিকবিদিকে চলে যেতাম। কিন্তু গলায় তো কাঁটা বিঁধে আছে। ওকে নিয়ে কোথায় যাব বলুন!' কাতর গলায় বলল বলরাম।

পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটা পাতায় পাতলা কালির আড়ালে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট। অনেকক্ষণ ঠাওর করলে তবে বোঝা যায় কী লেখা হয়েছে। এখন এগুলো নিয়ে বসার কথা ভাবতেই পারছেন না তথাগত। বইটা যদি মেলায় না বের হয় তাহলে তাঁর কিছু করার নেই। কাগজগুলোকে গুছিয়ে রাখলেন তথাগত।

সাড়ে ন'টায় জলখাবার নিয়ে এল বলরাম। রুটি আর আলুর তরকারি। দেখা মাত্র টের পেলেন তাঁর খিদে পেয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে বলরাম বলল, 'কী পাওয়া যায় গিয়ে দেখি বাবু।'

'কিছুই পাবে না।'

'তবু—। সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি এখন শহরে যাবে নাকি?'

'মোমবাতি দরকার অনেকগুলো। চাল ডাল আছে। আলু পেঁয়াজ আদা লঙ্কা রসুন আর চিনি যদি পাই তাহলে কোনও চিন্তা নেই।' বলরাম বলল।

দু'শো টাকা দিলেন তথাগত। বড় নোট না দিয়ে দশ টাকার নোটে দিলেন। জলখাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে চলে গেল বলরাম হ্যান্ডেলে ব্যাগ ঝুলিয়ে। অনেকটা পথ তাকে সাইকেলকেই বহন করতে হবে।

বেলা এগারোটা নাগাদ ফিনকে দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফিন ওর মতো জলে পাক খাচ্ছে। কাছে যেতেই মুখ তুলে দেখল। তারপর প্রবল আনন্দে ঘুরপাক খেতে লাগল, মুখ হাঁ করল না। বালির প্রান্তে বাঁধানো দেওয়ালের কাছে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন তথাগত। বেশ বাতাস বইছে। দেখতে-দেখতে চল্লিশ ফুট নিচের বিচে নজর পড়ল তার। প্রায় কোমর জলে নেমে কিছু করছে একটি স্ত্রীলোক। এ কোত্থেকে এল? কী করছে ওখানে। ঢেউ এসে ওকে নাচিয়ে দিচ্ছে। তারপর চোখ পড়ল, দু-দিকে দুটো খুঁটি পুঁতে লম্বা কাপড় জলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথাগত পেছন দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'লক্ষ্মী!'

ভেতর থেকে সাড়া এল না।

স্ত্রীলোকটি লক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু বুঝতে সময় লাগল তাঁর। লক্ষ্মী মাছ ধরছে সমুদ্রের ছোট ঢেউ-এ কাপড় পেতে। কী মাছ পেতে পারে ও? তীরের এত কাছে কোনও মাছ সচরাচর আসে না। তা ছাড়া কালকের ঘটনার পর তীরের কাছাকাছি যত সামুদ্রিক ছোট প্রাণী ছিল সব মারা পড়েছে। মেয়েটা কি পাগল?

ঘণ্টাখানেক বাদে কাপড় তুলে পাড়ে উঠে এল লক্ষ্মী। এখন ওর পরনে কালো রঙের শায়া, যা বুকের ওপর গিঁট দিয়ে বাঁধা। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটি বেশ ফরসা এবং শরীর লম্বা ও আঁটোসাঁটো। উবু হয়ে বসে কাপড় থেকে কিছু তুলে-তুলে বালির ওপর রাখছিল লক্ষ্মী। সব তোলা হয়ে গেলে আবার নেমে গেল সমুদ্রে কাপড়টা নিয়ে। ভালো করে জলে ডুবিয়ে ধুয়ে জল নিংড়ে উঠে এল ওপরে। ওটা যে ওর পরনের কাপড় তা বুঝতে পারলেন তথাগত। সংগৃহীত বস্তু একটা থালায় তুলে লক্ষ্মী ওপাশ দিয়ে ওপরে আসার জন্যে পা বাড়াল।

ঘরে ঢুকে গেলেন তথাগত। ওর এই অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তাঁর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কী ধরেছে লক্ষ্মী? তারপর খেয়াল হল, ও তো একবস্ত্রে এসেছে। এখন ভেজা শাড়ি সায়া পরে থাকবে নাকি? তাঁর কাছে কোনও মেয়েদের পোশাক নেই। কী মনে হতে একজোড়া পুরোনো পাজামা পাঞ্জাবি বের করে বারান্দায় রাখলেন।

লক্ষ্মী এসেছে বুঝতে পেরে ঘর থেকেই গলা তুলে বললেন, 'সমুদ্রে গিয়ে ভিজে এলে কেন? কী ধরতে গিয়েছিলে?'

'চিংড়ির বাচ্চা।'

'চিংড়ির বাচ্চা? কেন?'

'ওর জন্যে।' লক্ষ্মীর গলায় খুশি।

তথাগত কী বলবেন ভেবে পেলেন না। কাল ওই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে আর আজ বউ নেমে গেছে সমুদ্রে স্বামীর জন্যে চিংড়ির বাচ্চা ধরতে। এদের প্রেমট্রেম বেশ জোরালো বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, 'তোমার তো আর জামাকাপড় নেই। বারান্দায় যেগুলো রেখেছি সেগুলো পরে শাড়ি শুকিয়ে নাও।'

মিনিট আটেক অপেক্ষা করল তথাগত। তারপর বাইরে এসে লক্ষ্মীকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। পাজামা এবং পাঞ্জাবি, দুটোই বড় হয়েছে। হাতা গুটিয়ে নিয়ে ম্যানেজ করেছে কিছুটা। লক্ষ্মী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁকে বালিতে নামতে দেখে লক্ষ্মী তাকাল। না, প্রথাগত সুন্দরী এই মেয়েটা না। ঠোঁট পুরু, চোখ চাপা। কিন্তু কীরকম একটা উগ্র ব্যাপার আছে। ঠিক এই রকম অনুভূতি

হয়েছিল তাঁর ফিল্মের এক মহিলাকে দেখে। কাকে? মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল, ভাত করব?'

ওর গলার স্বর ও বলার ভঙ্গিতে মনে পড়ে গেল, সোফিয়া লোরেন, হেসে ফেললেন তিনি। কার সঙ্গে কার মিল খুঁজছেন তিনি।

'তাহলে থাক।' লক্ষ্মী বলল।

'মানে?'

'আপনার খাওয়ার ইচ্ছা নাই যখন তখন থাক।'

'আমার যে ইচ্ছে নেই তুমি বুঝলে কী করে?'

'হাসলেন যে!'

'না, সত্যি খিদে নেই। তোমার খেতে ইচ্ছে করলে রাঁধতে পারো।'

মাথা নেড়ে না বলল লক্ষ্মী। তারপর এগিয়ে কানাতোলা থালা সামনে এনে ধরল, 'দ্যাখেন!'

'গুঁড়ি-গুঁড়ি, মাছের মতো দেখতে নয়, পোকাই বলা চলে, থালার জলে থিকথিক করছে। অবিশ্বাসী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলো চিংড়ির বাচ্চা?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লক্ষ্মী।

'বলরাম এগুলো খায়?'

'না-না। ওর জন্যে—।' আঙুল তুলে ফিনকে দেখিয়ে দিল লক্ষ্মী।

অবাক হয়ে গেলেন তথাগত। ডলফিনশিশুর খাবার আনতে ওইভাবে সমুদ্রে নেমেছিল লক্ষ্মী? আর তিনি ভেবেছিলেন স্বামীব জন্যে প্রেম উথলে পড়েছে! বেশ লজ্জিত হলেন তথাগত। বললেন, 'এক চামচ দাও তো, কেমন খায় দেখি!'

দূরে দাঁড়িয়ে তথাগত দেখলেন একটা চামচে করে চিংড়ির বাচ্চা তুলে গর্তের কাছে গেল লক্ষ্মী। ফিন সাঁতার কাটছিল। লক্ষ্মীকে দেখামাত্র ডুব দিয়ে নিচে গিয়ে বসে রইল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করল লক্ষ্মী কিন্তু ফিন-এর প্রতিক্রিয়া হল না।

লক্ষ্মী চামচ জলে ডুবিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ফিন নড়ল না। তথাগত ব্যাপারটা দেখে বললেন, 'ওগুলো বালির ওপর রেখে তুমি সরে যাও তো।'

লক্ষ্মী একটু দূরে চলে গেলে তথাগত গর্তের ধারে উবু হয়ে বসলেন। তৎক্ষণাৎ ফিন উঠে এল ওপরে। ঘুরে-ঘুরে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। মাথায় হাত বোলানোর পর ফিন শান্ত হল। তথাগত এক চামচ চিংড়ির বাচ্চা তুলে জলে ফেলতেই সে ঘাই মেরে গিলে ফেলল ওগুলোকে।

হাততালি দিয়ে হেসে লক্ষ্মী বলল, 'বদমাশ, আমাকে হিংসে করে।'

'তোমাকে হিংসে করবে কেন?'

'আপনার সঙ্গে ও ছিল, এখন আমি এসে গেছি। মেয়েছেলের মন তো!'

'মেয়েছেলে? এটা মেয়ে নাকি?'

'দ্যাখেননি? দ্যাখেন, আপনার হাত কী করে চাটে! আর একটু দিন না।'

ডলফিনের বাচ্চাটাকে দেখার পর থেকে একবারও তথাগতর মনে ওর লিঙ্গ নিয়ে কোনও চিন্তা আসেনি। শোনার পর তাকিয়েও পার্থক্য বুঝতে পারলেন না।

'ওকে ছেড়ে দেন।' লক্ষ্মী বলল।

'ছেড়ে দেব মানে? সমুদ্রে গেলে ও বাঁচতে পারবে?'

'নিজের জায়গায় পারবে না কেন? ঠিক পারবে!' লক্ষ্মী জোর দিয়ে বলল।

কথাটা পছন্দ হল না তথাগতর। এত তাড়াতাড়ি ফিনকে ছেড়ে দিতে তিনি মোটেই রাজি নন। মনে হল, লক্ষ্মী বোধহয় ঈর্ষা করছে ফিনকে। তাই বা কী করে হয়। তাহলে ফিন-এর জন্যে চিংড়ির বাচ্চা ধরতে যেত না!

এই সময় দূরের আকাশে শব্দ বাজল, গোঁ-গোঁ শব্দটা পাক খেতে-খেতে এদিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মী ভয়ে দৌড়ে ঢুকে গেল বারান্দায়। মুখ তুলে তথাগত দেখতে পেলেন একটা হেলিকপ্টার আকাশে পাক খাচ্ছে। এই বাংলোটাকে দেখে অনেকটা নিচে নেমে এল। পাইলট এবং তার পাশে বসা লোকদের দেখতে পেলেন তিনি। ওরা হাত নাড়ছে। হাত নাড়লেন তথাগত। সমুদ্রের ওপর চলে গেল হেলিকপ্টারটা। ওরা নিশ্চয়ই সমীক্ষা করতে এসেছে। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিলে ত্রাণ আসবে। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে এল। ঠিক মাথার ওপর এসে হাত নেড়ে সরে যেতে বলল তাঁকে। ওরা একটা বড় প্যাকেট ফেলে দিল নিচে। শোঁ করে নেমে আসছে সেটা, হঠাৎ খেয়াল হতে দৌড়ে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা টিনটাকে গর্তের ওপর চাপিয়ে দিতেই প্যাকেটটা পড়ল সেখানে সশব্দে। হেলিকপ্টার চলে গেল।

ছুটে বাইরে এল লক্ষ্মী। তথাগতর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। ওই প্যাকেট তাঁর মাথার ওপর পড়লে আর দেখতে হত না। খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মী প্যাকেটটা টেনে নামাল নিচে। পলিথিনের শক্ত প্যাকেটের মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা। গিঁট খুলতেই তা থেকে ছোট-ছোট প্যাকেট বেরুতে লাগল। চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, চালে ডাল মেশানো। খুব খুশি হল লক্ষ্মী। অন্তত ছ-সাত কেজির প্যাকেট ওটা। কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু টিনটা গর্তের ওপর থেকে তুলতে ভয় করছিল তথাগতর। প্যাকেট যখন টিনের ওপর পড়েছিল তখন খানিকটা জায়গা নিচু হয়ে গিয়েছিল চাপে। একে ওই ওজন, তার ওপর অত উঁচু থেকে পড়ার কারণে তা অনেক বেড়ে গেছে।

ধীরে-ধীরে টিনটাকে সরালেন তথাগত, জল ঘোলা। টিনের যাবতীয় জং প্যাকেটের আঘাতে জলে পড়ায় রং পালটেছে। একেবারে নিচে বালির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে পড়ে আছে ফিন।

'মরে গেছে।' ফিশফিশ করে বলল লক্ষ্মী কাঁধের ওপর থেকে। উবু হয়ে বসা তথাগত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। টিনটা যদি না চাপা দিতেন তাহলে গর্তের মধ্যেই প্যাকেটটা পড়ত। সেক্ষেত্রে—।

ঝুঁকে হাত বাড়ালেন তথাগত। ধীরে-ধীরে তুলে আনলেন ফিনকে। মনে হল, লক্ষ্মী ঠিকই বলেছিল, ওকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। বালির ওপর ফিনকে শুইয়ে দিয়ে ওর শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। লক্ষ করলেন যে জায়গায় ও ঢেউ-এ ধাক্কায় ওপরে উঠে এসে আঘাত পেয়েছিল সেই জায়গাটা রক্তে ভিজে গেছে। মিনিটখানেক বাদে হঠাৎ নড়ে উঠল ফিন। চমকে উঠে কোলে তুলে নিলেন তথাগত। লক্ষ্মী চিৎকার করল, 'বেঁচে আছে।'

এবার চোখ পিটপিট করতে লাগল ফিন, তথাগত বুঝলেন টিনের চাপে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বেচারা। অদ্ভুত শব্দ বের হল ওর গলা থেকে। তারপর ওকে গর্তের একপাশে শুইয়ে দিলেন যাতে ওর শরীরের নিচের দিকটা জলে ডুবে থাকে।

মন খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল হেলিকপ্টারটার প্যাকেট ফেলার! তাদের জন্যে পাঠানো খাবারের চাপে মারা যাবে ফিন?

'বাবু! ভাত করব? লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল।

'নাঃ। আমার খিদে নেই।' ঘরে চলে এলেন তথাগত। তারপর কখনই যা করেন না, দিনের বেলায় গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। বারংবার ফিন-এর কথা মনে আসছিল। একে কি মায়া বলে? সারাজীবন একা থেকেছেন। যত দিন মা ছিলেন সব কর্তব্য করেছেন। প্রেমেও পড়েছেন কয়েকবার। আশ্চর্য ব্যাপার, সবই বিবাহিত মহিলার সঙ্গে। আসলে লেখালেখির জগতে স্থিতু হয়ে বসতেই চল্লিশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার আগের সময়টা ছিল পায়ের তলায় মাটি আনার লড়াই। তখন প্রেম করার কথা ভাবতেই পারতেন না। একটি অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরি হলে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তার সেই সামর্থ না থাকায় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। তারপর যখন সক্ষম

হলেন তখন আশেপাশে কেউ আর অবিবাহিতা নেই। থাকলেও তাঁরা আকর্ষণীয়া না। অথচ বিবাহিতা মহিলারা, যাঁরা স্বামী থাকতেও নিজেকে একা ভাবেন তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারতেন না তথাগত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন এইরকম সম্পর্কের পরিণতি কখনই সুখের হতে পারে না। অন্যের সংসার ভেঙে নিজের সংসার তৈরি করলে সেটা সেই বাড়ির মতো দাঁড়াবে যার কোনও ভিত নেই। শেষপর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। এসে বেশ ছিলেন। কিন্তু ফিন তাঁকে দু-দিনেই বুঝিয়ে দিল, শুধু প্রেম নয়, মায়ার শক্তি কম জোরদার নয়।

'বাবা!'

চোখ ফেরালেন তথাগত। পাজামা পাঞ্জাবি ভাঁজ করে নিয়ে শাড়ি পড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকাতেই সে বলল, 'এগুলো কি ধুয়ে দেব?'

'না। রেখে দাও ওখানে।'

লক্ষ্মী একটা টেবিলের ওপর রেখে দিল পাজামা পাঞ্জাবি।'

'বলরামকে বললে পারতে তোমার জন্যে একটা শাড়ি পেলে নিয়ে আসতে।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল লক্ষ্মী।

'আজই বলরামকে পাঠানো ঠিক হয়নি। রাস্তা বলে তো কিছু নেই। কোথায় জিনিস পাবে কে জানে! যদি শহরে যাওয়ার চেষ্টা করে তো আজ ফিরতে পারবে না।' গ্লাস শেষ করলেন তথাগত। কী আশ্চর্য! আজ দুপুরেই বেশ মেজাজ হচ্ছে।

'ও বলেছে আজ নাও ফিরতে পারে।'

'আ! এটা ঠিক না। তোমাকে একা রেখে ও বাইরে থাকবে কেন?' দ্বিতীয় পেগ গ্লাসে ঢাললেন তথাগত, জল মেশালেন।

'আপনি আছেন। গেল বছর ও এক মাস আমাকে রেখে শহরে কাজের জন্যে গিয়েছিল। এখানে তো আপনার কাছে আছি।'

'যখন গিয়েছিল তখন তোমাদের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই পাশে ছিল।'

লক্ষ্মী শ্বাস ফেলল শব্দ করে, 'সবাই লোভ দেখাত। কেউ-কেউ পালাতে বলত। এখানে তো সেসব হবে না।'

'ঠিক আছে, মুড়কি চিড়ে যা ইচ্ছে খেয়ে বিশ্রাম করতে যাও।'

'ওটা কি বিলিতি মদ?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ হবে না?'

'না। বড়জোর ঘুম পাবে। ঘুমিয়ে পড়ব। যাও।'

লক্ষ্মী চলে গেল। তিনটে পেগ পেটে যাওয়ার পর হঠাৎই ঘুম এসে গেল। একে প্রায় খালি পেট, তার ওপর মনটাও বিগড়ে ছিল। খেতে-খেতেই ঘুমিয়ে পড়লেন চেয়ারে বসে। মাথাটা কাত হয়ে গেল একপাশে।

হঠাৎ তথাগতর মনে হল তিনি যেন শূন্যে ভাসছেন। কিন্তু সেই ঘোরটা কাটল দ্রুত। তাঁর শরীরটাকে দু-হাতে তুলে বিছানার কাছে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মী। ওর শরীর থেকে জলের গন্ধ বের হচ্ছে। শ্যাওলা জমা জল। টের পেলেন তিনি। ভাবলেন ঝটপটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তাঁর বেশ আরাম হচ্ছে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লক্ষ্মী মুখে হাত বুলিয়ে দিল। তথাগতর শরীর শিরশির করে উঠল। তিনি বাঁ-হাত দিয়ে লক্ষ্মীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। ধরতেই লক্ষ্মী নুইয়ে পড়ল তাঁর পাশে। তথাগত আবার ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে-যেতে পাশবালিশের মতো জড়িয়ে ধরলেন ওকে। কিন্তু কী করছেন তা তাঁর বোধে ছিল না।

ঘুম ভাঙতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তথাগত। কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না লক্ষ্মী তাঁর

পাশে কী করে এল। সন্তর্পণে নিজের হাত ওর শরীর থেকে তুলে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। একেবারে শিশুর ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ্মী! মদের ঘোরে তিনি কি ওকে কাছে ডেকেছিলেন! ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাহলে তো তাঁর নেশা করাই উচিত নয়। তিনি বসেছিলেন চেয়ারে, খাটে কী করে চলে এলেন? লক্ষ্মী কি তাঁকে নিয়ে এসেছে। চেয়ারে বসে তাঁকে দেখে ওর খারাপ লেগেছিল?'

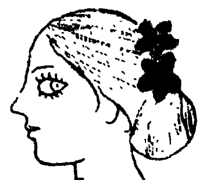
তথাগত বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এখন বিকেল। সমুদ্র শান্ত। আকাশ পরিষ্কার। মনে পড়তেই গর্তের দিকে তাকালেন। নড়ছে ফিন। সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে। তিনি পাশে যেতেই অদ্ভুত মুখ করে তাকাল। হাঁটু মুড়ে বসে তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?' মাথায় হাত বোলাতেই ফিন অনেকগুলো শব্দ করল। তথাগতর মনে হল বাচ্চাটা আবদার করছে। ওর প্রাণশক্তি এবং ভাগ্য খুব ভালো। নইলে দু-দুবার যে কাণ্ড ও সহ্য করেছে তা করার কথা নয়। লক্ষ্মীর কথা মনে এল। এভাবে যে বেঁচে থাকতে পেরেছে সে সমুদ্রে গেলে ঠিক নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

ফিনকে কোলে নিয়ে নামতে লাগলেন তথাগত। টিলার ওপর থেকে বালিতে পা রেখে নামতে গিয়ে হড়কে পড়তে-পড়তে সামলালেন কোনওক্রমে। তারপর সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। জোয়ার আসছে। ফিন-এর দিকে তাকালেন পরম মমতায়। তারপর জলে নেমে ফিনকে নিচু করে ধরলেন যাতে ও জলের স্পর্শ পায়। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে নড়াচড়া আরম্ভ করল ফিন। তারপর সাঁতার কেটে তথাগতর হাতের চৌহদ্দি থেকে বের হল। আবার ফিরে এল হাতের কাছে। মুখ তুলে দেখল তথাগতকে। তারপর পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল জলের গভীরে। কষ্ট হল, খুব কষ্ট হল তথাগতর।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি জলের ভেতর। সন্ধের অন্ধকার তির-তির করে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সমুদ্রের জলে উচ্ছ্বাস দেখতে পেলেন। তারপরেই এক ঝাঁক ডলফিন এসে তার চারপাশে পাক খেয়ে শব্দ করে কিছু বলে যেতে লাগল। ভয় পেয়েছিলেন প্রথমে, পরে বুঝলেন, আঘাত করতে নয়, খুশিতে ওরা এমন করছে। একবার মনে হল ফিনকে ওদের মধ্যে দেখলেন, বোঝার আগেই ওরা ফিরে গেল সমুদ্রে।

'বাবা, ও চলে গেল?'

চমকে পেছন ফিরলেন তথাগত। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে বালির ওপর। চুল উড়ছে। শব্দগুলো তথাগতর বুক থেকে বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ মা, মেয়েরা তো এভাবেই চলে যায়।'



বন্ধুর মতো

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রঞ্জন বলল, 'এই বাড়ি।' দিশা মুখ তুলে তাকাল। পাঁচতলা ঝকঝকে বাড়ি, সামনে গেট, নিচে কার-পার্কিং। বেশ সমৃদ্ধ চেহারা। আসার সময় দেখে বুঝেছে পাড়াটাও বেশ সমৃদ্ধ। অতএব ফ্ল্যাটের ভাড়া নিশ্চয়ই কম হবে না। রঞ্জন বলল, 'চলো।'

বাড়িটা পাঁচতলা হলেও লিফট আছে। দারোয়ান জানতে চাইল তারা কার কাছে যাবে। জেনে লিফট দেখিয়ে দিল। স্বয়ংচালিত লিফট বারো তলায় উঠে বাঁ-দিকের দরজার বেল টিপল রঞ্জন, যার পাশে লেখা রয়েছে আর সামন্ত। কয়েক মিনিট পরে কি-হোলে চোখের তারা, দরজা

ঈষৎ খুলে চেনে আটকে গেল, 'কি ব্যাপার?' এক মহিলার গলা।

'আমি রঞ্জন। আপনাকে ফোন করেছিলাম।'

চেন খুললেন যিনি তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে পরনে হাউসকোট, কাঁধ-ছোঁয়া চুলে রুপোলি ছোপ। হাত নেড়ে বললেন, 'আসুন।'

সোফায় মুখোমুখি বসার পর মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপু আপনার কথা আমাকে বলেছে। তবু, আপনার প্রফেশন কি?'

'আমার একটা অ্যাড এজেন্সি আছে।' রঞ্জন বলল।

'আপনি আর অপু একসঙ্গে পড়তেন?'

'হ্যাঁ। আমরা প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে পড়েছি।'

'এখন কোথায় আছেন?'

'আমার পৈতৃক বাড়ি গড়পারে। বেশ অসুবিধা হচ্ছে ওখানে।' রঞ্জন বলল।

'আপনি?'

'আমি দিশা। কলেজে পড়াই।'

'কি সাবজেক্ট?'

'ইকনমিক্স।'

'আমি আপনাদের চা অফার করতে পারছি না, কারণ কাজের মেয়েটি এখনও আসেনি। উনি চলে যাওয়ার পর অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম অপুকে, আর পারলাম না।। ওর কাছে যেতেই হচ্ছে। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অক্ষমতাও চেপে ধরছে। যাক গে। অপু যখন আপনাকে রেফার করছে তখন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে।' বৃদ্ধা তাকালেন।

'বলুন।'

'প্রতি বছর যে ক'বছর বাঁচব, আমার স্বামীর মৃত্যুদিনে আমি এই ফ্ল্যাটে থাকব। সেজন্যে বছরে দিন দশেকের জন্যে কলকাতায় আসব। মুশকিল হল, আমি কারও সঙ্গে শেয়ার করে থাকতে পারি না। অপু ওর লং আইল্যান্ডের বাড়ির আউট হাউস আমার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছে। তাই আমি এলে—।' বৃদ্ধা আচমকা চুপ করলেন।

'কোনও সমস্যা হবে না। এই ফ্ল্যাট যেমন আছে ঠিক তেমন রেখে আমরা দিন পনেরোর জন্যে বাইরে বেড়াতে যেতে পারি।' রঞ্জন হাসল।

'তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন, পুরো ফ্ল্যাটই সাজানো। বেডরুম চারটে। আপনারা তো দুজন, এত লাগার কথা নয়। একটি ঘর, যেখানে আমার স্বামী থাকতেন, আমি লক করে যাব। চলুন, ফ্ল্যাটটা দেখে নিন।' বৃদ্ধা উঠলেন। রঞ্জন বলল, 'আপনি আমাদের তুমি বলুন।'

'ওটা আমার জিভে চট করে আসে না।'

'বৃদ্ধার ফ্ল্যাট দেখে দিশা খুব খুশি। অন্তত আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট। সর্বত্র রুচির ছাপ। কিচেনটা বিশাল। তাতে সব আছে। বৃদ্ধা বললেন, 'এখানে থাকলে আপনাদের কিছুই আনতে হবে না। পছন্দ হয়েছে?'

'খুব।' দিশা হাসল।

'আমি একটা অনুমতিপত্র লিখে রাখব। ওটা থাকলে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু আঠারো তারিখে চলে যাচ্ছি।'

'দশদিন বাকি।' রঞ্জন হিসেব করল, 'কিন্তু—।'

বৃদ্ধা তাকালেন।

রঞ্জন ইতস্তত করল, 'আসলে অপুর সঙ্গে আমার টাকাপয়সা নিয়ে কথা হয়নি।'

'টাকা-পয়সা কেন? আমি তো আপনাকে ভাড়া দিচ্ছি না। আপনি আমার ছেলের বন্ধু, তাই আপনাকে কেয়ারটেকার হিসেবে থাকতে দিচ্ছি। এর-মধ্যে টাকাপয়সার কথা উঠছে কেন? উলটে আপনি টেক কেয়ার করবেন বলে আপনাকেই আমার কিছু দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এমন হতে পারে, আমি মন পালটালাম, ছয় মাস পরে ঠিক করলাম কলকাতায় চলে আসব, তাহলে অন্তত এক মাস আগে আপনাকে জানাব।' ভদ্রমহিলা জানিয়ে দিলেন।

রঞ্জন দিশার দিকে তাকাল। দিশা কি বলবে ভেবে পেল না। তাই দেখে বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না। এক বছরের মধ্যে সেরকম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। আপনি রবিবার বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করুন।'

বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'কীরকম লাগল?'

'খুব খারাপ।' দিশা হাঁটতে-হাঁটতে বলল।

'কেন?'

'উনি ভাড়া নেবেন না, মনে হবে কারও অনুকম্পায় আমরা থাকছি।' দিশা জানাল।

'অনুকম্পা বলছ কেন? ওঁর প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন মিলে যাচ্ছে বলেই থাকছি। অপু আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে ফানে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে আমার। ইলেকট্রিক, টেলিফোন তো ব্যবহার করব আমরা, তার বিল আমরাই দেব।' রঞ্জন বোঝাল।

রঞ্জনের বয়স এখন বিয়াল্লিশ। এতদিন ইচ্ছে হয়নি বলে বিয়ে করেনি। ওর দুই ভাই বিবাহিত, একজন মুম্বাইতে থাকে, দ্বিতীয়জন একই বাড়িতে। মা মারা গিয়েছেন গত বছর। এবং তারপরেই ওর আলাপ হয় দিশার সঙ্গে। মাথার ওপর কোনও অভিভাবক নেই, আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে বিয়ের প্রসঙ্গ আসবেই। এবং ওখানেই সমস্যার শুরু।

ইকনমিক্সে এম এসসি করার পর পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে দিশা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল দমদমের একটা কলেজে। ওর বাবা-মা থাকতেন সিউড়িতে। ছাত্রী জীবন কেটেছে হোস্টেলে। এখনও সে থাকে ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে। এক ঘরে একা। তার এই আটত্রিশ বছরের জীবনে বার তিনেক রোমান্সের ছোঁয়া লাগতে-লাগতে লাগেনি স্রেফ নিস্পৃহতার জন্যে। শুরুর দিকে যে ভালোলাগা তৈরি হত তা খানিকবাদে ভয়ে রূপান্তরিত হত। ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল কারণ ওই তিনজন পুরুষই ছিল উড়ে আসা নীড়ের পাখির মতো, নীড় বাঁধবার ইচ্ছে কারও ছিল না। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল দিশা। ছাত্রীদের পড়ানো, লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটায় সময়টা কাটিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই রঞ্জনের সঙ্গে আলাপ। একটি ভদ্র মানুষের সঙ্গে ক্রমশ মানসিকভাবে জড়িয়ে গিয়েছে সে। এই এক বছরে ওরা কোথাও এক রাতের জন্যে বেড়াতে যায়নি। কোনও রেস্তোরাঁর ঘেরাটোপে সময় কাটায়নি। পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ সামান্য ছোঁয়াছুয়ি আকস্মিকভাবে হওয়া ছাড়া কেউ কারও হাতে হাত রাখেনি। কিন্তু যেই বিয়ের কথা মনে এল অমনি সন্ত্রস্ত হল দিশা। প্রায় অচেনা একটি মানুষের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে, এই বয়সে মানুষটির প্রয়োজনে বিছানায় বিবস্ত্র হতে হবে ভাবতেই কীরকম শীতল হয়ে যাচ্ছিল শরীর। আর এই সময়, মাত্র মাস খানেক আগে বিয়ের কথা উঠল। দিশা মুখ নিচু করেছিল, 'এই তো ভালো, ভালো না?'

'তার মানে?' চোখ কপালে তুলেছিল রঞ্জন! তুমি কি আমার সঙ্গে বাকি জীবন থাকতে চাও না?'

মাথা নেড়েছিল সম্মতিতে, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি দিশা।

রঞ্জন গলা নামিয়েছিল, 'কি ব্যাপার বলো তো?'

'আমায় ভয় করে।'

'ভয়, কেন?'

'যদি বিয়েটা ভেঙে যায়। এই বয়সে বিয়ে করার পর সেটা হলে মুখ দেখাতে পারব না।'

মাথা নাড়ল দিশা, যেন ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে সেটা চোখের সামনে দেখতে পেল।

রঞ্জন অবাক। বলল, 'আমার মধ্যে কি এমন কিছু দেখেছ যে মনে হচ্ছে বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'দূর ! তা না। আসলে নিজেকে ভয় করে।'

কথাগুলো দিশা বললেও দেখাশোনা বন্ধ হল না। সপ্তাহে অন্তত চারদিন দেখা না করলে বুকে ভার জমে। যে দিন দেখা হওয়ার কথা সে দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অদ্ভুত ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়ে মনে।

শেষপর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তোমার এমন হয়?'

'হুঁ। হয়।' রঞ্জন মাথা নেড়েছিল।

শেষপর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্তে এল, একসঙ্গে থাকবে। দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে থাকতে গেলে বিয়ে করতে-ই হবে তার কোনও মানে নেই। বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীরা খেয়োখেয়ি করেও একসঙ্গে থাকছে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ নিয়েও বিয়ের বাঁধনটাকে ছিঁড়তে পারছে না, এরকম দৃষ্টান্ত চারপাশে ছড়িয়ে। সে দিন একটা কাগজে সমীক্ষা পড়েছিল, আশি শতাংশ দম্পতির সম্পর্ক সুখের নয়। বিয়ে না করে একসঙ্গে থেকে যদি সেই পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে বন্ধুত্ব রেখেই আলাদা হওয়া যেতে পারে। এখন তো বিবাহ বহির্ভূত একসঙ্গে থাকাকে আইন স্বীকৃত দিয়েছে। বিচ্ছেদের জন্য তো কোর্টে যেতে হচ্ছে না। সেখানে দাঁড়িয়ে দু-জনের কেচ্ছা শোনাতে হবে না।

'কিন্তু আত্মীয়স্বজন?' দিশার মনে তখনও অস্বস্তি।

'কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার কি?'

'প্রশ্নের মুখ কি দিয়ে চাপা দেব?'

'বলবে আমরা ভালোবেসে একসঙ্গে থাকছি।'

'যদি না থাকতে পারি, তাহলে তো হাসাহাসির পাত্র হব।'

'তা হব। হয়তো ওদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাব. না।'

'না পাই, ও নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই। আচ্ছা, যদি বলি বিয়ে করেছি, রেজিস্ট্রি করেছি। তাহলে সব মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'মিথ্যে কথা?'

'যুধিষ্ঠিরও বলেছিলেন।' দিশা বলল, 'লোকে জানুক কিন্তু ছাড়াছাড়ি যদি হয় তাহলে তো উকিলের কাছে ছুটতে হবে না। তাই না?'

'কিন্তু তুমি যদি প্রথম থেকেই কু গাও—।'

'কু গাই মানে?'

'ওই যে এখনও একসঙ্গে থাকলাম না, আর তুমি ছাড়াছাড়ির কথা ভাবছ! এত বেশি ভাবলে তো সত্যি হয়ে যেতে পারে।' রঞ্জন বলেছিল।

'না। উলটো। ভাবছি বলেই ওটা যাতে সত্যি না হয় তার জন্যে সতর্ক থাকব আমরা। বিয়ের মন্ত্রের চেয়ে বিয়ে না করে থাকার অঙ্গীকারে অনেক বেশি দায়িত্ব এসে যায়। তাই না?' দিশা সহজ হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত নেওয়ামাত্রই তো কার্যকর করা যায় না। রঞ্জনের পক্ষে ছোট ভাই এবং তার স্ত্রীকে জানাতে সময় লাগল। জানার পর স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এত দিন পরে দাদা বিয়ে করছে, পাত্রীটি তাদের অপরিচিতা, শাস্ত্র মেনে বিয়ে হবে না, এবং বিয়ের পর দাদা বউদি এ-বাড়িতে থাকবে না। তারা যে উপেক্ষিত এতে মনে ক্ষুণ্ণভাব এলেও ওরা যে এই বাড়িতে থাকছে না তাতে এক ধরনের স্বস্তি এল। একটু দূরের আত্মীয়রা আশা করল, একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে এবং সেখানেই তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন। রঞ্জন জানিয়ে দিল, কোনও উৎসব করা হচ্ছে না। সবাই ভাবল বেশি বয়সের বিয়ে বলে রঞ্জন লজ্জা পাচ্ছে।

দিশা অবশ্য তেমন কোনও প্রশ্নের সামনে পড়েনি। দীর্ঘকাল একা থাকার ফলে সিউড়ির বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো শিথিল হয়েই এসেছিল। ভাইরা রোজগার শুরু না করা পর্যন্ত সে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতি মাসে। তখন বাড়ি গেলে যে আদরযত্ন পেত, ওরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর টাকা পাঠানো বন্ধ করলে সেটা দ্রুত কমে গেল। সে বিয়ে করবে না, বাকি জীবন একা থাকবে, এরকমটাই ধরে নিয়েছিল সবাই। অতএব ওরা যখন দিশার চিঠিতে ব্যাপারটা জানতে পারল তখন চুপচাপ মেনে নিল। ছোট ভাই জানত দিশার প্রভিডেন্ড ফান্ডের নমিনি হিসেবে তার নাম আছে। দিদি কি সেটা বদলে দেবে? কৌতূহলটা সে প্রকাশ করতে পারল না।

রবিবারে গিয়েছিল রঞ্জন। বন্ধুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র নিয়েছিল। ওই ফ্ল্যাটের টেলিফোন এবং ইলেকট্রিকের টাকা ওঁর ব্যাঙ্ক থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে রঞ্জনকে সেই অ্যাকাউন্টে বিলের টাকা জামা দিতে হবে। কেয়ারটেকারকে ডেকে তিনি রঞ্জনের পরিচয় দিলেন আত্মীয় বলে। ওঁর অনুপস্থিতিতে রঞ্জন সস্ত্রীক এখানে থাকবে, ফ্ল্যাটে ঢোকার একটি চাবি তিনি রঞ্জনকে দিয়ে বললেন, 'অন্যটা আমার কাছে রইল।'

'আপনার ফ্লাইট কবে? কখন?'

'কেন? তুমি আমাকে দমদমে পৌঁছাতে যাবে নাকি?'

'আপনি যদি আপত্তি না করেন—।'

'না-না। ও ব্যাপারে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া তুমি তো তোমার বন্ধুর মায়ের খবর কোনওদিন নাওনি, এখন এসব করলে মনে হবে চক্ষুলজ্জায় করছ।' ভদ্রমহিলা বলেছিলেন।

দিন ঠিক হল। মাসের প্রথম তারিখেই ওরা নতুন জীবন শুরু করবে। তবে দু-জনে আলাদা ভাবে ওই বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। ওরা যে বিবাহিত নয় তা প্রচার করে লাভ কি! অতএব রঞ্জন ট্যাক্সি নিয়ে দুপুরের শেষে দিশার হোস্টেলে এল।

এ ক্ষেত্রে হোস্টেলের ঘর ছেড়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। দিশাও ভেবেছিল কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়ে দেবে। যে ঘরে দীর্ঘকাল একা কাটালো সেই ঘরে নিশ্চয়ই অন্য মেয়ে আসবে। শেষ মুহূর্তে মত বদলাল সে। এখনও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত না জানিয়ে কিছুদিন পরেও তো জানান যেতে পারে। বিশেষ কাজে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে বলে টাকা দিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই মেনে নেবেন। তার এতদিন এখানে থাকার কারণে কেউ প্রতিবাদ করবে না। শেষপর্যন্ত তাই করল সে।

দুটো সুটকেশ হোস্টেলের দারোয়ান তুলে দিয়ে গেল ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ছাড়তে রঞ্জন বলল, 'তোমার যাবতীয় সম্পদ ওই দুটোয় ভরে গেল?'

না বলতে গিয়ে সামলে নিল দিশা। উত্তরে শুধুই হাসল। ঘর ছেড়ে না দিয়ে আসার কথা শুনলে রঞ্জনের কি প্রতিক্রিয়া হবে তার জানা নেই। পরে ওকে বুঝিয়ে বলা যাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার?'

'সব তো আনা যায় না। যা প্রয়োজনীয় তা নিয়ে এসেছি। ওখানে তো কোনও কিছুর অভাব নেই। শুধু ব্যক্তিগত জিনিস থাকলেই দিব্যি চলে যাবে।' তারপর স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দিশা, এখন এই মুহূর্তে তোমার কেমন লাগছে?'

দিশা বলল, 'যেমন লাগা উচিত!'

রঞ্জন হাসল, আর কথা বাড়াল না।

একটি ঘর তালা বন্ধ কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। দুজনের জন্যে ফ্ল্যাটটা এত বড় যে প্রথমেই একটি কাজের লোকের কথা মনে এল দিশার। এতদিন সে হোস্টেলের একটি ছোট ঘরে থেকেছে। ঘরটাকে পরিষ্কার রাখতে তার মোটেই বেশি পরিশ্রম করতে হত না। কিন্তু এত বড় ফ্ল্যাট পরিষ্কার রাখা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে ওরা হলঘরের

সোফায় বসেছিল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বন্ধুর মায়ের নিশ্চয়ই মেইড সার্ভেন্ট ছিল, সে কোথায়?'

রঞ্জনের মনে পড়ে গেল, 'তোমাকে বলাই হয়নি। রবিবারে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছিলাম তখন প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। শুনলাম যে কাজ করত সে নাকি দীর্ঘকাল ওঁর সঙ্গে ছিল। তার বয়স হয়েছে এবং উনি আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন বলে সে তার দেশের বাড়িতে গিয়ে শেষ জীবন কাটাতে চায়। অতএব তাকে পাওয়া যাবে না।'

'বাঃ। তাহলে এখন কি হবে?'

'খুঁজে পেতে হবে। কেয়ারটেকারকে বললে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবে কাউকে।'

'তাহলে যাও, আজই বলে এসো। কাল সকাল থেকে চাই।'

রঞ্জন উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, 'লোকটাকে এখানে ডাকি।'

ইন্টারকমের বোতাম টিপে অনুরোধ জানিয়ে ফিরে এসে বলল, 'আজকের রাত্রে আর বাড়িতে রান্না করার দরকার নেই, বাইরে খাব!'

'রান্না করতে হলে কি ভাবে হত?'

'কেন? কিচেনে তো গ্যাস সিলিন্ডার আছে।'

'ব্যস? গ্যাস জ্বালালেই রান্না হয়ে যাবে? রান্নার আগে তো বাজার করতে হবে।'

'ওহো। তা বটে। আসলে কোনওদিন সংসারের এ-দিকটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি—।'

'আমিও তাই। সতেরো বছর হোস্টেলের রান্না খাচ্ছি। রান্নাঘরে ঢোকার দরকারই ছিল না।'

'তাহলে তো তোমার পক্ষে রান্না করা সমস্যা হয়ে যাবে।' চিন্তায় পড়ল রঞ্জন।

হাসল দিশা, 'এসব নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করিনি, করা উচিত ছিল।

'কেন?'

'তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবনা-চিন্তা করা যেত।' দিশা মুখ তুলল।

'দূর। সম্পর্ক ভালো হলে এটা কোনও পয়েন্টই না। আজকাল হোম ডেলিভারির মাধ্যমে দারুণ খাবার পাওয়া যায়। এ-বাড়িতে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, দেখছি। ওটা দিয়ে আমি রোজ ধুলো পরিষ্কার করে দেব। জামাকাপড় লন্ড্রিতে দেওয়া যাবে।' রঞ্জনের কথা শেষ হতে-না-হতেই বেল বাজল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই কেয়ারটেকারকে দেখতে পেল, 'ইয়েস স্যার।'

'আসুন।'

মাঝবয়সি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে দিশাকে নমস্কার করলেন।

রঞ্জন বলল, 'কয়েকটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

'বলুন।'

'কাজের লোক চাই। হোলটাইমার।' রঞ্জন বলল।

'না-না। হোলটাইমারের দরকার নেই। শুধু সকালটা হলেই চলবে।' দিশা প্রতিবাদ করল। রঞ্জন বলল, 'কেন? বিকেলে, মানে রাত্রের ব্যাপারটাই।'

কেয়ারটেকার বললেন, 'ম্যাডাম ঠিক বলেছেন স্যার। প্রথমত হোলটাইমার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজ না জেনেও প্রচুর টাকা চাইবে। তার ওপর বিশ্বাস করে বাড়ির দায়িত্ব দেওয়া নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। তুলনায় পার্টটাইমার চেষ্টা করলেই পাওয়া যেতে পারে।'

মেনে নিল রঞ্জন, 'ঠিক আছে, কাল সকাল থেকে কাউকে আসতে বলুন।'

'এত তাড়াতাড়ি হবে কি করে স্যার? এ-বাড়িতে যারা কাজে আসে তাদের বলতে হবে। সবাই তো প্রচুর কাজ করে, তার মধ্যে যাদের সময় আছে তাদের কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।' কেয়ারটেকার বললেন।

'দাঁড়ান। আমাদের এখানে যে কাজ করতে আসবে সে কি অন্য বাড়িতেও কাজ করবে?'

'পার্টটাইমাররা তো তাই করে। যে কাজের দায়িত্ব শুরুতে দেবেন তা আধঘণ্টার মধ্যে শেষ করে অন্য বাড়িতে চলে যাবে।' কেয়ারটেকার এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করলেন।

'কি আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম যে আসবে সে সমস্ত সকাল এখানে থাকবে।' রঞ্জন বলল।

'আপনাকে পাঁচ গুণ চার্জ দিতে হবে স্যার। আচ্ছা।' কেয়ারটেকার চলে গেলেন।

চিন্তিত রঞ্জন বলল, 'কি করা যায় বলো তো?'

দিশা হাসল, 'আপাতত ওসব ভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে আরাম করে বোসো।

রঞ্জন কিছু বলতে গিয়ে মন বদলাল, 'আমরা সংসার করব অথচ নির্ভর করতে হবে অজানা-অচেনা একজনের ওপর। অদ্ভুত!'

'বিদেশে কিন্তু এই তৃতীয়জন থাকে না।' দিশা বলল।

'রাইট। ওরা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারব না। এই ফ্ল্যাটে সব আধুনিক ব্যবস্থা আছে। একটা রান্নার বই কিনে নিলেই হবে—।'

রঞ্জনের গলায় উত্তেজনা।

'হোম ডেলিভারি।' নিচু গলায় বলল দিশা।

ফ্ল্যাটটা আর একবার জরিপ করে নিয়ে নিজের স্যুটকেশ যে বেডরুমে ঢোকাল দিশা সেখানে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে বার্মা টিকের কাঠের খাটে। টেবিল চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল আয়না, দেওয়াল আলমারি, '-যা দরকার সব চার পাশে। এমনকী একটা হেয়ার ড্রায়ারও চোখে পড়ল। খুশি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই দরজায় রঞ্জনকে দেখতে পেল দিশা।

'এই ঘরটাকে পছন্দ হল?' রঞ্জন হাসল।

'হ্যাঁ, বেশ ভালো।'

'তাহলে আমি পাশের ঘরটা নিই?' রঞ্জন দাঁড়াল না।

থমকে গেল দিশা। বিয়ে না করে বিবাহিত জীবনযাপন করতে গেলে কি আলাদা শুতে হয়? অথচ এখন ব্যাপারটা ভাবতেই এক ধরনের আড়ষ্টতা এসে যাচ্ছে। বিয়ের মন্ত্র বা সই কি সেই আড়ষ্টতা দূর করতে সাহায্য করে? আবার, একসঙ্গে এক ঘরে থাকলেই কি সে রঞ্জনকে দেওয়াল ড্রেসিং টেবিল ভাবতে পারবে? ওর সামনে পোশাক পালটাতে পারবে? অসম্ভব। তবু এই ভালো। না হয় রাত্রে দরজাটা ভেজিয়ে রাখবে কিন্তু আলাদা ঘরে একা শোওয়ার স্বস্তিটা তো থাকবে। কোথায় যেন পড়েছিল, বিদেশে স্বামী-স্ত্রীরাও আলাদা ঘরে শোয় তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখতে।

ঘরটা বড়। স্যুটকেশ খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি বের করল রঞ্জন। একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার মনে। দু-জনের ঘর আলাদা হয়ে কতটা ভালো বা মন্দ হল ঠিক বুঝতে পারছিল না রঞ্জন। জীবনে প্রথমবার সে একটি নারীর সঙ্গে একত্রে থাকছে, সেটা অবশ্যই আলাদা ঘরে থাকলে শিহরিত হওয়ার কথা নয়। কয়েকদিন ধরে সে আজকের রাতটার কথা ভাবছিল। এই রাতটাকে অবশ্যই ফুলশয্যার রাত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখানে আসার পর দিশার আচরণে কোনও আবেগ না দেখে সেও সৌজন্যের বাইরে যেতে পারেনি। এখন দিশা যখন তার শোওয়ার ঘর নির্বাচন করে ফেলেছে তখন জোর গলায় বলতে পারেনি, আমিও তোমার ঘরে থাকব। মনে একটু ভার জমলেও পাশাপাশি একটা তিরতিরে স্বস্তি টের পাচ্ছিল রঞ্জন। এতটা বয়স একা-একা থেকে এমন একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছে যে কারও সঙ্গে রাত্রিবাস করার কথা ভাবতে পারত না। অন্য কারও জন্যে নিজস্ব অভ্যেসগুলোর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলে মনে হত। আজ অন্য আবেগে আক্রান্ত হয়ে সেটাকে উপেক্ষা করতে যাচ্ছিল সে, না হওয়ায় যেন স্বস্তি এসে গেল চুপিচুপি।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসার ঘরে ঢুকে প্রথম জানলাগুলো খুলে দিল রঞ্জন। সামনের অনেকটা

খোলা। সূর্য ডুবছে। ছায়া-ছায়া বিকেল।

'কি দেখছ?'

দিশার গলার শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল রঞ্জন। সালোয়ার কামিজে এখন দিশাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। আকাশি নীল স্থির হয়ে আছে পোশাকে। এতদিন, যখনই দেখা হয়েছে ওকে শাড়িতে দেখেছে। সে দ্রুত এগিয়ে গেল। দুটো হাত দিশার কাঁধে রেখে বলল, 'তোমাকে কী সুন্দর লাগছে।'

দিশার গালে কি লালের ছোঁয়া লাগল, 'যাঃ।'

'আমায় দ্যাখো।'

'এই বয়সে কখনও সুন্দর লাগে?'

'কেন নয়? গায়ত্রী দেবী, ইন্দিরা গান্ধি, সুচিত্রা মিত্র সুন্দরী নন? অপর্ণা সেন, রেখা কি এখনও রূপসী নন? তা ছাড়া প্রতিমার বয়স হয় না।' রঞ্জন বলল।

'মানে?'

'দুর্গাঠাকুর দু'শো বছর আগে যেমন সুন্দরী ছিলেন এখনও তাই আছেন।'

'এইবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' দিশার চোখে কপট রাগ।

'দু-হাত কাঁধ থেকে সরিয়ে জড়িয়ে ধরল সে দিশাকে। নরম মেয়েলি গন্ধ, অনুভূতি, যেন ক্রমশ বাগিচা রঞ্জনের করায়ত্তে, সে দিশার গালে গাল রেখে বলল, 'তুমি আমার।' তারপরেই তার কপালে ভাঁজ পড়ল। মুখ সরিয়ে সে দিশার মুখ দেখল। থরথর করে কাঁপছে দিশা। সমস্ত শরীর যেন শক্ত হয়ে গেছে। হাত সরিয়ে নিলেই পড়ে যাবে। চোখ বন্ধ।

সে ফিশফিশিয়ে ডাকল, 'দিশা!'

দিশা সাড়া দিল না। যেন শুনতেই পায়নি তার ডাক। ধীরে-ধীরে ওকে একটা সোফায় বসিয়ে দিল রঞ্জন। বসার পরেই যেন চেতনা ফিরে এল, দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল দিশা। রঞ্জন হতভম্ব। সে এমন জোরে চেপে ধরেনি যে দিশা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আর অসুস্থ হওয়ার পর এই কান্নার মানে কি!

সে বলল, 'দিশা, আমি সরি। আমি নিজেই বুঝিনি কি করছি!'

কাঁদতে-কাঁদতে মাথা নাড়ল দিশা। যার মানে সরি বলার দরকার নেই। ঠিক তখনই বেল বাজল ঝমঝমিয়ে।

'তুমি ঘরে যেতে পারবে? কেউ এসেছে?'

'কান্না গিলল দিশা। তারপর ওড়নায় চোখ মুছল। দ্বিতীয়বার বেল বাজলে রঞ্জন বাধ্য হল দরজা খুলতে। বেশ স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী দাঁড়িয়ে।

'কেয়ারটেকার বাবু বলল আপনারা লোক খুঁজছেন।' মেয়েটি চোখ ফেরাল।

'ও হ্যাঁ। তুমি একটু পরে আসতে পারবে?' রঞ্জন বলল।

'পরে টাইম হবে না।' মেয়েটা সোজাসুজি রঞ্জনকে দেখল।

'ওকে ভেতরে আসতে বলো।' পেছন থেকে দিশার ধরা গলা ভেসে এল।

অগত্যা সরে দাঁড়াল রঞ্জন, মেয়েটি ভেতরে ঢুকল। দিশাকে দেখে বলল, 'আমার নাম মালা। মা মালা সিনহার ফ্যান ছিল তো। আপনি বউদি?'

দিশা চকিতে রঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কাজ করবে?'

'কেয়ারটেকারবাবু বললেন আপনার লোক দরকার। যদি তালাচাবি মিলে যায় করব।'

'বুঝতে পারলাম না।' দিশা বলল।

'আপনাদের যা প্রয়োজন তা যদি আমার অসুবিধে না হয় করব।'

'তোমার কি সুবিধে তা আগে বলো।' দিশা একটু-একটু করে সহজ হচ্ছিল।

'দেখুন বউদি, আমি সকালে চার বাড়িতে কাজ করি। তখন টাইম নেই। বিকেলে দু-বাড়িতে

কাজ করছি। একটা চারটে থেকে ছ'টা। আর একটা ছ'টা থেকে আটটা, ওই দ্বিতীয় কাজটা ছেড়ে দিতে চাই। ওই সময় আপনাদের দিতে পারি।' মেয়েটা একটা চেয়ারের দিকে তাকাল, 'ওখানে বসব?'

মাথা নাড়ল দিশা। সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ে পা নাচাতে লাগল মালা।

'কিন্তু আমাদের লোক দরকার সকালে। রান্নার জন্যে, ঘর পরিষ্কার করার জন্যে।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমি রাত্রে রান্না করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেব, আপনি সকালে গরম করে নেবেন। আর সকালে ঘর পরিষ্কার করলে রাত্রে যা হবে, রাত্রে করলে সকালে তাই তো হবে।' মালা বলল।

দিশা রঞ্জনের দিকে তাকাল।

রঞ্জন বলল, 'আমরা যদি রোজ ছ'টার মধ্যে না ফিরে আসি?'

'চাবি দিয়ে যাবেন। একটা চাবি।' সহজ গলায় বলল মালা, 'ভেবে বলুন, আপনারা হয়তো সকলে ন'টায় বের হবেন। আমি যদি আটটায় আসি তাহলে ক'টা পদ খেয়ে বেরুবেন? তার চেয়ে রাত্রে কান্না করা থাকলে অনেকে সুবিধে।'

'বাজার হাট?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা যদি দাদাবাবু করে দেন ভালো। আমি কাঁচা পয়সায় হাত দিতে চাই না।'

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাজটা ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'সত্যি কথা বলব বউদি?'

'আমি মিথ্যে কথা ভালোবাসি না।'

'দেখুন, আমি ওখান থেকে আড়াই হাজার পাই।'

'আড়াই হাজার!' রঞ্জনের গলা শুকিয়ে গেল।

'হ্যাঁ। সাড়ে বারোশো রান্নাবান্নার জন্যে। দুই বুড়ো বুড়ি। বুড়ি বাতের ব্যথায় অষ্টপ্রহর বিছানায় শুয়ে থাকে। বুড়োর খুব রস। রোজ তাকে ম্যাসাজ করে দিতে হয় আমাকে। তার জন্যে আরও সাড়ে বারোশো দেয়।'

'আমরা তো তোমাকে এত দিতে পারব না।' দিশা বলল।

'কে চাইছে?' চোখ ফেরাল মালা, 'ওই বারোশোর জন্যে রোজ রাত্রে আশি বছরের বুড়োর শরীর চটকাতে ভালো লাগে? এখন ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নারকেল গাছ। যে কোনওদিন ভেঙে পড়বে। তবু কোমরের ওপরে আমার হাত উঠতে দেবে না। ঘেন্না ধরে গেছে বউদি। আপনি আমাকে ওই সাড়ে বারোশো দেবেন। আপনাদের বাড়িতে তো কোনও বুড়োহাবড়া নেই।'

রঞ্জন চটজলদি বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথা শুনলাম। নিজেরা কথা বলে কেয়ারটেকারকে জানিয়ে দেব!'

'কিন্তু তার আগে যদি কাজ পেয়ে যাই তাহলে দোষ দেবেন না। আমরা গরিব মানুষ। হাতখালি করে বসে থাকতে পারি না তো!' উঠে পড়ল মালা।

'ঠিক আছে। তুমি কি আজ থেকে কাজে লাগবে?'

'তার মানে আপনি আমাকে রাখবেন?'

'হ্যাঁ', দিশা মাথা নাড়ল।

মাথা নাড়ল মালা, 'তাহলে কেয়ারটেকারকে ফোন করুন।'

'কেন?' দিশা বুঝতে পারল না।

'আমি কে, সত্যি-সত্যি উনি আমাকে পাঠিয়েছেন কিনা জেনে নিন। আজকাল তো আমাদের ছবি থানায় পাঠাতে হয়। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে কাজে লাগতে বলুন। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।' শেষ কথাগুলো মালা বলল রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে।

অগত্যা রঞ্জন রিসিভার তুলে যাচাই করে নিয়ে দিশার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

এবার খুশি হল মালা, 'আপনাদের রান্নাঘরটা বোধহয় ও দিকে। যাই আগে দেখে আসি।'

সে চোখের আড়ালে যেতেই রঞ্জন চাপা গলায় বলল, 'খুব টকেটিভ।'

দিশা হাসল, 'মনে হচ্ছে ভালো কাজ জানে।'

'একটু এক্সপেন্সিভও' আমাদের বাড়িতে যে রান্না করে সে বারশো পায়।'

'এ ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।' দিশা বলল।

'বউদি,' বলতে-বলতে ফিরে এল মালা। সবই আছে দেখলাম। কিন্তু সবজি, মাছ, মাংস নেই। আজ রাত্রের খাবারটাও কালকের সঙ্গে করে দিচ্ছি। কী খাবেন?'

'যা হোক কিছু করে দাও।' দিশা বলল।

'ভাত বা রুটি?'

'আমি রুটি।' দিশা বলল।

'আমি ভাত খাই।' রঞ্জন বলল।

'দু-রকমের ঝামেলা করবেন না বাবু।'

'ঠিক আছে, রুটি খাচ্ছি রাত্রে। সকালের জন্যে ভাত করো।'

'এবার আপনি যান। এক কেজি আলু, পাঁচশো পেঁয়াজ, আদা, লংকা, সবজি যা পাবেন আনবেন আর কাটাপোনা পাঁচশো। তাড়াতাড়ি ফিরবেন।' বলেই ভেতরে চলে গেল মালা।

'সর্বনাশ। আজই বাজারে যেতে হবে।' দিশার দিকে তাকাল রঞ্জন।

'খেতে হলে যেতে হবে।'

'আজকে আমরা কোনও রেস্টুরেন্টে খেতে পারতাম।'

'কাল সকালে কী করতে? আমার তো দশটায় ক্লাস।'

'বেস্ট ছিল কোনও হোমও ডেলিভারি সংস্থাকে বলে দেওয়া।'

'তাই দাও।'

'কিন্তু একে তো কাজ করতে বলে দিয়েছ।' রঞ্জন বিরক্ত হয়েছে বোঝাল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এল মালা, 'বউদি, দাদা তো এখানকার কিছু চেনে না, না? তাহলে তো এখন মুশকিলে পড়বে। ঠিক আছে, আমাকে টাকা দিন, প্রথম দিনটা আমিই বাজার করে দিচ্ছি। দাদা সঙ্গে যাক, আমি চিনিয়ে দিচ্ছি।'

'তাই ভালো।'

টাকা নিয়ে রঞ্জন প্রস্তাবটা শুনে বলল, 'কোনও অসুবিধে হবে না। খোঁজ করলেই লোকে বলে দেবে। আমি একাই যাচ্ছি।' রঞ্জন বেরিয়ে গেল।

'ওই যাঃ। দাদা বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেল না।'

'কিনে নেবে।'

'কিনবে কেন? রান্না ঘরে চারটে ব্যাগ রয়েছে।'

'থাক।'

'আগে যেখানে থাকতে সেখানে দাদা বাজার করত না?'

'না।'

'তাই মুখ অমন হয়েছে!' হাসল মালা, 'তোমরা রান্নায় ঝাল খাও না মিষ্টি?'

'মাঝামাঝি।'

'তোমাদের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে?'

'কেন?'

'না, দাদা ও-ঘর থেকে বের হল, তোমার জিনিস দেখলাম ওপাশের ঘরে। বেশিদিন বিয়ে

হয়ে গেলে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীরা দেখেছি আলাদা শোয়।' মালা বলল।

দিশা হাসার চেষ্টা করল।

'অবশ্যি একসঙ্গে শোওয়া পার্টি দেয় হয়তো দেখেছি। দিনভর ঝগড়া, সন্দেহ, গালমন্দ অথচ রাত্রে এক বিছানায় শোয়, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। খেয়োখেয়ি করেও একসঙ্গে থাকবে, ছাড়বে না। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল, সে খেয়োখেয়ি শুরু করতে, এক বছর মানিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। যখন দেখলাম শুধরাল না তখন লাথি মেরে বেরিয়ে এলাম। সবাই বলে, মালা আবার বিয়ে কর। পুরুষগুলো দিনরাত ছোঁক-ছোঁক করে। অথচ বলি ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়?' মালা কথা বলে চলেছিল।

'তাহলে এত রোজগার করছ কেন?'

'ভবিষ্যতের জন্যে বউদি। যখন শরীর ভাঙবে, পরিশ্রম করতে পারব না, কেউ ফিরেও তাকাবে না তখন বাঁচতে হবে না?' বলে হাসল, 'তোমাদের দেখে ভালো লাগল।'

'কেন?'

'এই এত বড় বাড়িতে যত ফ্ল্যাট আছে, তার দশটার মধ্যে ন'টায় স্বামী-স্ত্রী সুখে নেই গো। তিনটে বউদি যে দুপুরে ফুরতি করতে যায় তা আমি জানি। স্বামী সব জেনেও চুপ করে থাকে। একে কি বিয়ে বলে, বলো বউদি!' মালা বলল, 'যাই চা নিয়ে আসি।'

রাতের খাবার সাড়ে ন'টায় খেয়ে নিল ওরা। ঠিক সওয়া আটটায় মালা চলে গেছে। খেতে-খেতে রঞ্জন বলেছিল, 'নাঃ, মেয়েটা ভালো রাঁধে।'

'শুধু বেশি বকা ওর দোষ।' দিশা বলেছিল।

'তা করুক। জানো, জীবনে আজ প্রথমবার বাজার করলাম। বাজারে ঢোকার পর বুঝলাম ব্যাপারটায় বেশ থ্রিল আছে।'

'কোনও কিছু করার আগে বোঝা যায় না সেটা ভালো না খারাপ।'

তারপর বাইরের আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল রঞ্জন। দরজায় শব্দ হতে ফিরে তাকাল। দিশা দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো।'

'না, একটা কথা বলতে এলাম।' দিশার গলার স্বর প্রায় খাদে।

'হ্যাঁ, বসে বলো না।' রঞ্জন চেয়ার ছেড়ে খাটে গিয়ে বসল।

দিশা চেয়ারে বসল। বসে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?'

'না-না। দ্যাখো আজ আমাদের প্রথম দিন, প্রথম রাত। আমাদের আলাদা থাকা উচিত নয়। কিন্তু, ভেতরে-ভেতরে কীরকম একটা আড়ষ্টতা, তোমাকে বোঝাতে পারব না! এটা ভাঙা দরকার। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?' কাঙালের দৃষ্টি দিশার চোখে।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে চলো, তোমার বা আমার ঘরে নয়, ও-পাশের খালি ঘরটায় আমরা একসঙ্গে থাকি। আমাকে একটু সময় দাও—।'

নীল আলো জ্বলল। পাশাপাশি শুয়ে ওরা গল্প করছিল। রঞ্জন দিশার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছিল। একটা জোক শুনে দিশা ছেলেমানুষের মতো হাসল। তারপর রঞ্জন বলল, 'এই, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

দিশা বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ো।'

দুজনের মধ্যে তখন মাত্র এক ইঞ্চির ব্যবধান।

ইঁদুরের কল

নিরাপদ একজন বাঙালি প্রৌঢ়ের নাম, যার কোনও উজ্জ্বল অতীত নেই। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে সে মনে করে না। বর্তমানে সে সদাগরি অফিসে চাকরি করে, যা বেতন পায় তাতে তিন বেলা খাওয়া, ইলেকট্রিক বিল মেটানো, ঠিকে ঝি-এর মাইনে, কেবল এর পাওনা মিটিয়ে মন্দ থাকে না। তবে প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতেই অনেকটা বেরিয়ে যায়।

নিরাপদর অফিসে যাতায়াতের খরচ নেই। তিন কিলোমিটার পথ সে হেঁটেই যায় আসে। এতে শরীর চাঙ্গা থাকে, পয়সা বাঁচে এবং ধুতি ও শার্ট নষ্ট হয় না। বাসে উঠলে সোমবারে ভাঙা পোশাক মঙ্গলবারে পরা যায় না। নিরাপদ হেঁটে অফিসে গিয়ে টুলে বসে কাজ করে, চেয়ারে বসলেই হেলান দিতে হয় তাতে শার্ট ভাঁজ পড়তে বাধ্য। কোথাও গেলে কখনই বসে পড়ে না। সোমবারে ভাঙা ধুতি-শার্ট শনিবারে দেখলে যে কেউ ভাববে আজই নিরাপদ পরেছে ওগুলো। শুধু শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমাহলের সিটে আরাম করে হেলান দেয় সে। কারণ রবিবার ওগুলো কেচে ফেলবে।

বলা অনাবশ্যক, নিরাপদ অবিবাহিত। গত পঁয়ত্রিশ বছরে হিন্দি চলচ্চিত্রের নায়িকারা ছাড়া কোনও নারী তার জীবনে আসেনি। শনিবারে দেখা সিনেমার নায়িকার সঙ্গে সে দিব্যি সাতদিন থাকতে পারে। বাবা মারা গিয়েছেন ছেলেবেলায়, মা গত হয়েছেন বছর দশেক আগে, দাদার বাসায়। নিরাপদর মনে হয় সে দিব্যি আছে।

নিরাপদ কোনও রাজনীতি করে না, অফিস ইউনিয়নের ঝুট-ঝামেলায় সে নেই। এ কারণে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে পালটা অজুহাত দেখায় না, হাসিমুখে মেনে নেয়। নিরাপদ এতদিনে বুঝেছে, যে-কোনও উত্তেজনার আয়ু ক্ষণস্থায়ী। ঠিকে ঝি থাকা সত্ত্বেও সে নিজেই রান্না করে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর আজকাল মনে হয়, এত পরিশ্রম করে যা তৈরি হল তা খেয়ে ফেললেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকে প্রবল খিদে সামান্য খাবার পেলেই উধাও হয়ে যায়। এসব বিষয়ে ভাবতে তার ভালো লাগে।

ইদানিং নিরাপদ তার টিভির নব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যেসব চ্যানেলে ভূতের গল্প দেখায় তাদের খুঁজে বের করেছে। মানুষ মারা গেলে ভূত হয়। বেঁচে থাকার সময় যাকে কেউ পাত্তা দেয় না ভূত হলে তার ভয়ে কাঁপে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে নিরাপদর কাছে। মুশকিল হল এইসব অনুষ্ঠান হয় রাত দশটার পরে। ফলে এগারোটার সময় বিছানায় শুয়ে চট করে ঘুম আসে না। ড্রাকুলা, ঘোস্ট, ভূত, পেত্নি, শাকচুন্নিদের মিছিল শুরু হয়ে যায় চোখের সামনে। কয়েকদিন আগে একটু সর্দি হয়েছিল নিরাপদর। কড়া রোদে হেঁটে অফিসে গিয়েছিল, বোধহয় সেই কারণেই বিকেল থেকে শরীর ম্যাজম্যাজ করছিল। সন্ধেবেলায় শুয়ে পড়েছিল, খাওয়ার জন্যেও ওঠেনি। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোলে বেশ আরাম হয় নিরাপদর।

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। চাদর সরাল মুখ থেকে। ঘর অন্ধকার। শব্দটা মানুষের গলা থেকে বের হচ্ছে, গোঙানির। তাজ্জব হয়ে গেল নিরাপদ। এই ঘরে মানুষ কি করে গোঙাতে আসবে। ঘোস্ট নয় তো? ড্রাকুলা কখনও গোঙাবে না। এবার ভাবল চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকাই উচিত। টিভিতে যাদের দেখলে শিহরন জাগে, সামনাসামনি দেখা ঠিক নয়। কিন্তু সেই

সময় ঘরে নীল আলো জ্বলে উঠল। চোখ খুলতেই চমকে গেল নিরাপদ। একটা রোগা বেঁটে লোক চেয়ারের ওপর পা তুলে ঝুঁকে কিছু দেখছে। এই যদি ভূতের চেহারা হয় তাহলে উঠে বসাই যেতে পারে। চাদর সরিয়ে উঠে বসতেই লোকটা ফিনফিনে নীল আলোয় তাকে দেখতে পেয়েই নাকি খিঁচিয়ে উঠল, 'অদ্ভুত মানুষ তো! ঘর ভরতি ইঁদুর পুষে রেখেছেন। উঃ, বুড়ো আঙুলে এমন কামড়েছে যে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

'ইঁদুর!' নিরাপদর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'সেকি!'

'ন্যাকামি হচ্ছে? জানেন না? এ-ঘরে আপনি ইঁদুর পোষেন না? উঃ!'

'দিনের বেলায় ওরা থাকে না। তাহলে আজ রাত্রে কোনও গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছে।' নিরাপদ বিছানা থেকে নেমে বড় আলোটা জ্বালল।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বলে উঠল, 'এই সেরেছে, কড়া আলো জ্বালার কি দরকার? উঃ।'

নিরাপদ মেঝেতে তাকাল, কোনও ইঁদুরকে দৌড়তে দেখল না। তারপর লোকটিকে দেখল। এরকম নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। তার ওপর চ্যাপলিনের মতো গোঁফ রেখেছে। নিশ্চয়ই এটা আসল চেহারা নয়। ভূতেরা তো ইচ্ছেমতো চেহারা ধরতে পারে। কড়া আলো তারা সহ্য করতে পারে না।

সে ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?'

লোকটা গোল-গোল চোখে তাকাল। নিরাপদর মনে হল এখনই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সুযোগ এসেছে যখন তখন সেটা হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই চটপট বলল, 'আপনি অতিথি, অতিথিকে নারায়ণ বলা হয়।'

'নারায়ণ? না আমার নাম নারায়ণ নয়। উলটোপালটা বলবেন না।'

'আপনি এখানে কেন এসেছেন যদি দয়া করে জানান।'

'মাল হাতাতে। যাকে লোকে চুরি বলে। বুঝলেন? আমি একজন চোর। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢোকার পর অনেকক্ষণ বাইরের দরজাটা খুলে রেখেছিলেন। তখনই নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছি। তারপর দেখলাম চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ধীরে-সুস্থে খাওয়ার খেয়ে মাল যা নেওয়ার নিয়ে সটকে পড়তাম, টেরও পেতেন না। কিন্তু খাওয়ার পর মনে হল অনেক সময় আছে। একটু রেস্ট নিই। ওই চেয়ারে বসে রেস্ট নিতে গিয়ে একটু ইঁদুরের গায়ে পা দিয়ে ফেলতেই ব্যাটা অসভ্যের মতো কামড়ে দিল। উঃ।'

'তার মানে আপনি ভূতপ্রেত নন, একজন চোর।'

'আশ্চর্য। ভূতপ্রেতের কি শরীর থেকে রক্ত বের হয়?'

'তা ঠিক জানি না। তবে রক্ত চুষে খায়। ড্রাকুলা বলে তাদের।'

'দূর। ওরা তো সাহেব মেমসাহেব ভূত। বেঁচে থেকে মানুষের রক্ত চুষে বড়লোক হত, মরে গিয়ে খাঁটি রক্ত চোষে। ওষুধ আছে কিছু?'

'ওষুধ!' নিরাপদর খেয়াল হল। তুলো, ডেটল আর ব্যান্ডেজ বের করে বলল, 'পা চেয়ারে তুলুন ভাই।'

ভালো করে বেঁধে দিতেই চেয়ারে বসে পড়ল লোকটা, 'আমাকে নিতাই বলে ডাকবেন, রাতটা এখানেই থেকে যাই। আপনি মানুষটা খারাপ নন। তাই কথা দিচ্ছি কোনও কিছু চুরি করব না।'

'আপনি কোথায় থাকেন নিতাইবাবু?'

'চোরেরা ঠিকানা বলে না। জানেন না? আচ্ছা, একজন চোর দেখেও আপনি চ্যাঁচামেচি করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন না কেন?'

'আপনাকে প্রথমে চোর বলে ভাবিনি। রোজ ভূতের ছবি দেখি তো, তাই ভেবেছিলাম।'

লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল নিরাপদ।

'আপনি স্বচক্ষে তাদের দেখেছেন?' নিতাই জিজ্ঞাসা করল।

'মাথা নাড়ল নিরাপদ, 'না।'।

'আপনি কখনও কলকাতার বাইরে যাননি?'

আবার মাথা নেড়ে 'না' বলল নিরাপদ।

'তাহলে আর কি করে বলবেন। বাপের মুখে শুনেছি, এক কালে এই কলকাতায় চোরেরা বেশ ভালোভাবেই ছিলেন। ভারত স্বাধীন হতেই তেনারা কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।'

'তার মানে?' নিরাপদ অবাক।

'ওই যে স্বাধীনতার পর দেশ দু-টুকরো হল, তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষ চলে এল পাকিস্তান থেকে, আর এসে জমে গেল এই কলকাতাতেই, বাপের মুখে শুনেছি। তেনারা আর শান্তিতে থাকতে না পেরে চলে গেলেন গ্রামেগঞ্জে। থাকগে, আঙুলটা কনকন করছে।'

'একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন, ইনজেকশন, টিনজেকশন?'

বিরক্ত হল নিতাই, 'দেখছেন চুরি করে খাই। আজকের রাতটা বেকার গেল। আর খরচা বাড়াতে বলবেন না তো! তার চেয়ে রাত তো বেশি নেই, এখানেই ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়? অবশ্য আলো ফুটলে যদি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে জানিয়ে রাখি, সঙ্গে ছুরি আছে, ক্যাঁক করে পেটে চালিয়ে দেব।'

'না-না। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনাকে পুলিশে দিলে আমাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। অফিসে কামাই করে যেতে হবে সাক্ষী দিতে। তা ছাড়া আপনি কত জানেন। ভারত ভাগের জন্যে যেসব সমস্যা হয়েছে তার এই দিকটার কথা তো জানতামই না। আমি চাদর আর বালিশ দিচ্ছি, আপনি ঘুমোন।' নিরাপদ বলল।

কিছুক্ষণেই মধ্যেই নিতাই এতজোরে নাক ডাকাতে শুরু করল যে উঠে বসল নিরাপদ। কোনও চোরের এভাবে নাক ডাকা উচিত নয়। শেষপর্যন্ত বাধ্য হল সে নিতাইকে জাগাতে, এত জোরে নাক ডাকছে যে আমি ঘুমোতে পারছি না।

'ওই মুশকিল। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পর কিছুতেই আওয়াজটাকে কমাতে পারিনি। একবার এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই শালার নাক ডাকার জন্য ধরা পড়ে বামঠ্যাঙানি খেয়েছি। তবে কি জানেন, যে বাড়িতে কেউ এরকম নাক ডাকে সে বাড়িতে নিশির ডাক শোনা যায় না। নিরাপদে থাকে সবাই।' নিতাই উঠে বসল।

'নিশির ডাক?' নিরাপদ পুলকিত হল।

'জলার ভূত। পরিচিত লোকের গলা নকল করে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে জলে ডুবিয়ে মারে। শুনেছি সঙ্গীর অভাব হলেই এই রকম করে।'

'এসব সত্যি।'

'সত্যি মানে?' আপনি বিশ্বাস করবেন না? কাউকে না দেখালে যে মিথ্যে হয়ে যাবে? অদ্ভুত কথা!' খেঁকিয়ে উঠল নিতাই।

'বিজ্ঞান বলছে ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। ওগুলো নাকি কুসংস্কার। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন ওঁরা।'

'তাই? ওঁরা কি ভগবান দেখেছেন? কেউ দেখেছে। যে দেখেছে সে কি আর পাঁচজনকে ডেকে দেখাতে পেরেছে? পারেনি। তাহলে ভগবান বলে কিছু নেই। ওদের বলুন না এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। মেরে পাবলিক বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। ভূতেরা অনগ্রসর বলে তাদের নিয়ে যা খুশি করা যায়, না? বেশ খেপে গেল নিতাই। তারপর রায় দিল, 'শুনুন মশাই মরে গেলে ভূত হয়, মরে যাওয়ার পর কেউ ভগবান হয় না। আপনি দেখতে চান?' একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও

শেষপর্যন্ত মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল নিরাপদ।

নিরাপদর অফিসে পরপর দু-দিন ছুটি। নিতাই বলে গিয়েছিল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে শালিমার স্টেশনে চলে আসতে। স্টেশনটা ঠিক কোথায় জানা ছিল না। পৌঁছাতে দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। নিতাই পাজামা আর শার্ট পরে দাঁড়িয়েছিল, ঝটপট টিকিট কাটুন। দুটো দীঘা। ট্রেন ছাড়ল বলে।'

জনমানুষশূন্য বিশাল প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়ানো ট্রেনে পা দিতেই সেটা চলতে শুরু করল। নিতাই শুঁটকি মাছের চেহারা নিয়ে বসামাত্রই ঢুলতে শুরু করল। নিরাপদ বসল না। এই শার্ট ধুতি আরও দুদিন চালাতে হবে। সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেঁটে দরজার পাশে গেল। খবরের কাগজে পড়েছে এরকম একটা ট্রেনের কথা যা সাত তাড়াতাড়ি দীঘায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু তারা এই ট্রেনে ফিরতে পারবে না। নিতাই আশ্বাস দিয়েছে, রাতের বাস ধরে ভোরে ফিরে যাবে কলকাতায়। নাঃ, শার্টটা বাঁচানো গেল না। রাতের বাসে তো বসেই যেতে হবে। নষ্ট যখন হবেই তখন আর কষ্ট করে কি লাভ, নিরাপদ একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ল।

ট্রেন থেকে নেমেই নিতাই বলল— 'শরীর খাওয়ার চাইছে। কষ্ট না দেওয়াই ভালো, চলুন।' একটা পাইস হোটেলে ঢুকে সে-ই ভাত তরকারি মাছের অর্ডার দিল। ওই রকম একটা শুঁটকো লোক যে অত ভাত খেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করত না নিরাপদ। হাত ধোয়ার পর নিতাই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি দাম দেবেন?'

'মানে?'

'না দিতে চাইলে দৌড়তে হবে। দৌড়তে পারবেন তো?'

'ভ্যাট।' বলে নিরাপদ দাম মিটিয়ে দিতে দেখল পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে গেল।

একটা ভ্যানরিকশাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে নিরাপদকে নিয়ে উঠে বসল নিতাই। 'ইচ্ছে করলে আধশোয়া হতে পারেন। অনেকটা পথ।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তেনাদের দেখতে।'

নিরাপদ চারপাশে তাকাল। দূরে বালির ঝড় উঠেছে। ঘণ্টাখানেক বাদে ভ্যানওয়ালা বলল, 'আর যাবে না।'

নিতাই তর্ক করল কিন্তু লোকটা অনড়। অতএব তিরিশ টাকা লোকটার হাতে গুনে দিতেই নিরাপদ শুনল, 'আপসোস করবেন না। সুদে মূলে উশুল হয়ে যাবে।'

'মানে?' খিঁচিয়ে উঠল নিরাপদ।

'হাঁটুন।' নিতাই হাঁটতে শুরু করল।

বালি, কাঁটাঝোপ, চড়াই-উতরাই বিশাল ঝাউগাছের জঙ্গল। নিতাই বলল, 'এসে গেছি। ওই দেখুন, গাছের ডালে কত ন্যাকড়া বাঁধা রয়েছে, দেখছেন তো, ওগুলো শুধু ন্যাকড়া নয়, তেনাদের আস্তানা। দিনের বেলায় ওখানে থাকেন।'

'সেকি!' গা ছমছম করে উঠল নিরাপদর। কোনও লোক তো চোখে পড়ছে না। একটা ছাগলও নয়। সন্ধের পর জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জীবনে কখনও কোনও ব্যাপারে সে উৎসাহ দেখায়নি। কি দরকার ছিল এই নিতাইয়ের কথায় নাচার? টিভিতে ভূতের অনুষ্ঠান দেখেই তার কাল হল। পকেটে এখন শ'তিনেক আছে। নিতাই-এর লোকজন যদি সেটা ছিনতাই করে নেয় তাহলে তো কলকাতায় ফেরাই হবে না। এই সময় নিতাই বলল, 'চলুন, ক্ষেন্তির ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে।'

'ক্ষেন্তি? ক্ষেন্তি কে?' নিরাপদ শুনল ঝাউগাছে হাওয়ায় অদ্ভুত শব্দ তুলছে।

'আমার ওয়াইফ।' ঝাউগাছের জঙ্গলে ঢুকল নিরাপদ।

সামনে কয়েকটা ঝাউগাছের আড়াল, মাঝখানে অনেকটা খোলা বালিতে সে একটি সুন্দর বাঁশ-বাখারির ঘর দেখতে পাবে কল্পনা করেনি নিরাপদ। ঘরটির উলটো দিকে একটা চালার নিচে ভয়ঙ্কর নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে হাঁড়িকাঠ। নিতাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'ইনি মা নরকেশ্বরী। খুব জাগ্রত দেবী, প্রতি শনিবার এবং অমাবস্যায় এইখানে শয়ে-শয়ে ভক্ত আসেন। এসে তাঁরা সপ্তাহের ভোগ নিয়ে যান অন্যদিন তাঁদের আসা নিষেধ। কুকুরগুলো কোথায়?' চারপাশে তাকাল সে।

'কুকুর?'

'হ্যাঁ। ছয়টি কুকুর এই জায়গা পাহারা দেয়। আজ কোথায় গেল? নিতাই ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মারতেই নারীকণ্ঠের হুঙ্কার শোনা গেল। 'কে? কে ওখানে? এতবড় সাহস? এখানে আসার দিন যে আজ নয় তা ভুলে গেছিস?' তড়িঘড়ি নিতাই বলে উঠল, 'আমি, আমি গো, নিরাপদ বাবুকে নিয়ে আসতে হল।'

'আবার শঙ্করাকে সঙ্গে এনেছ। সে তোমাকে কোন বৈতরণী পার করাবে। অ্যাঁ?' ঘরের দরজায় যিনি আবির্ভূত হলেন তাঁকে দর্শন করে হাঁ হয়ে গেল নিরাপদ। নিতাই-এর থেকে অন্তত এক ফুট বেশি লম্বা, চূড়া করে বাঁধা চুল, স্থূলাঙ্গি হলেও শরীরে বাঁধুনি আছে, গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো, আর চোখ যে কারও অত বড় হয়, টানা হয় জানা ছিল না। সেই চোখ ঘুরিয়ে তিনি নিরাপদকে দেখলেন। তারপর অদ্ভুত হেসে বললেন, 'শেষপর্যন্ত আসা হল।'

নিরাপদ বলল, 'অ্যাঁ।'

'জন্মের মধ্যে কর্ম এই একবারই করলে। পুরুষমানুষ মানেই লোচ্চা, লম্পট, মনে শরীরে কীট কিলবিল করছে। কিন্তু এ তো দেখছি অনাঘ্রাত ফুল। আহা! প্রকৃত আধার।' একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'বসা হোক।'

'তবে? মাঝরাতে আলাপ হয়েছে, তবু ঠিক চিনেছি। কুকুরগুলো কোথায়?'

'ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। সন্ধের মুখে জাগবে। তা নামখানা কি?'

নিরাপদর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন, তাই সে মুখ খুলল, নিরাপদ মিত্র।'

'কুটিল কায়েত। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না। আগমনের কারণ?'

'তেনাদের দেখতে চায়।' নিতাই টুক করে বলল।

'চুপ! নিশ্চয়ই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে। ঠিক কিনা?'

মাথা নাড়ল নিতাই, 'তুমি মাইরি কি করে যে সব ঠিকঠাক বলে দাও। ওই আর কি!'

'এবার দূর হও।'

'তা কি করে সম্ভব? ওঁকে নিয়ে এসেছি, ফেরত নিয়ে যেতে হবে। আসলে ওঁর বাসনা তেনাদের দেখবেন। সন্ধের পর যদি দেখিয়ে দাও তাহলে রাতে বাস ধরব আমরা। কথা দিচ্ছি, একটাও কথা বলব না, মুখে কুলুপ মেরে পড়ে থাকব।'

'তুমি এই চৌহদ্দিতে থাকবে না। যাও, দিঘার বাস গুমটিতে গিয়ে বসে থাক। আপদ।' দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। বেরিয়ে গেলেন তখনই, 'এই নাও, পঞ্চাশ টাকা। যা গিলবার সেখানে গিয়ে গেল।'

খপ করে টাকাটা নিয়ে নিতাই নিরাপদ দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'তাহলে আমি চলি। সাধ মিটে গেলেই চলে আসবেন দিঘার বাসগুমটিতে।'

'কিন্তু—।'

'আচ্ছা, আমরা যেখানে ভ্যানরিকশা থেকে নেমেছিলাম সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব।' হনহনিয়ে চলে গেল নিতাই।

'এই যে গামছা আর ধুতি। পাশেই পুকুর আছে, ডুব দিয়ে আসা হোক। পথের ময়লা ধুয়ে

যাবে। আমি ততক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা করি।'

গামছা আর কাপড় হাতে নিয়ে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'এসব না করলেই নয়?'

'দুষ্টু। জলে নামতে এত ভয় কেন? এদিকে যে বেলা পড়ে যাচ্ছে।'

স্নান শেষে ধুতি পরে গা মুছে নিজের ধুতি গেঞ্জি শার্ট পরিপাটি ভাঁজ করে ফিরে আসতেই কোথাও শিয়াল ডেকে উঠল ভর বিকেলে।

'আয় আয় চলে আয়। খাবারের গন্ধ পেয়েছে। আয় রে।' আধ থালা ভাত নিয়ে ঘরের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো শিয়ালটা। মাটিতে ঢেলে দেওয়া ভাত গোগ্রাসে খেয়ে চুপচাপ বসে রইল।

এক থালা ছাড়ানো ফল ঘরের দাওয়ায় রেখে তিনি বললেন, 'খাওয়া হোক।'

নিরাপদর ফল খাওয়া অভ্যেস নেই। বারান্দার এক কোণে শার্ট ধুতি রেখে সে মাথা নাড়ল, 'আমার খিদে পায়নি।'

'অ। যখন পাবে খেয়ে নিলে খুশি হব। যাই পুজোয় গিয়ে বসি।'

মহিলা গিয়ে বাবু হয়ে বসলেন—মা নরকেশ্বরীর সামনে। প্রদীপ জ্বাললেন। তারপর হাতজোড় করে যা গাইতে লাগলেন তার মাথা বুঝল না নিরাপদ। অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আকাশে একটু মেঘ। হাওয়া নেই।

মহিলা মন্ত্রপাঠ করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোজা বসে থাকা নিরাপদর সামনে এসে তার বুকে হাত রাখলেন, 'তেনাদের দেখতে চেয়েছিলি?'

হকচকিয়ে গেল নিরাপদ, 'না, মানে—।'

'কাকে দেখবি? ব্রহ্মদত্যি? মামদো ভূত, মেছো ভূত, জলার ভূত, ঝাউ ভূত, না শাঁকচুন্নি কাকে দেখার ইচ্ছে তোর?' এতক্ষণ ভাববাচ্যে কথা হয়েছে, এবার সরাসরি তুই।

কেঁপে উঠল নিরাপদ, 'কাউকে না।'

'তাহলে এসেছিস কেন?'

'বিশ্বাস হয়নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তেনারা আছেন।'

'না দেখলে ফিরতে পারবি না। ঠিক করে বল, কাকে দেখবি?' ভয় নেই তোর, আমি তো আছি।' হাত সরাল না নারী।

'ড্রা-ড্রা-ড্রাকুলা।'

'সেটা আবার কে? কোনও হিন্দু ভূতের ওই নাম হয় না। ঠিক আছে, তুই বাড়ি যা, তবে তোর সঙ্গে একজন শাঁকচুন্নিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও এখানে থাকতে চাইছিল না। ও তোকে পাহারা দেবে বাকি জীবন, তোকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। অন্য ভূতেরা টের পাওয়ার আগেই ওকে নিয়ে চলে যা। যাঃ।'

সেই ফিনফিনে অন্ধকারে হাঁটা শুরু করে শেষপর্যন্ত দৌড়তে লাগল নিরাপদ। পেছনে যেন কীসের শব্দ হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখতে সাহস পাচ্ছিল না কোনও শাঁকচুন্নি পেছন-পেছন আসছে কিনা। বাসগুমটিতে যখন পৌঁছাল তখন নিরাপদর শরীরে শক্তি নেই। লোকজন ভিড় করল। নিতাই উদয় হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি! আপনি। ধুতি-শার্ট কোথায়? রেখে এসেছেন ওখানে? চলুন ফেরত নিয়ে আসি।'

নিরাপদ কোনওমতে না বলল। নিতাই একটা ট্রাক-ড্রাইভারকে ধরে নিরাপদকে নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। তারপর থেকে সে আর ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে তার ঘরে কেউ আছে। উঠতে বসতে পাশ ফিরতে মনে হচ্ছে সে এখন আর একা নেই। নিরাপদ এখন ধুতি জামা পরে খাটে চেয়ারে স্বচ্ছন্দে বসে। এখন আর নিজেকে একা মনে হয় না।

শুধু তার ঘরে ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে।

কুসুম আমি জানি তুমি ভালো নেই

এক চৈত্রের দুপুরে জনমানবহীন ছোটনাগপুরের মালভূমিতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। মাথার ওপর আগুন, পায়ের তলা পুড়ছে। যেদিকে তাকাই খাঁ-খাঁ শূন্যতা। সবুজের চিহ্ন নেই। প্রকৃতি যে কত রুক্ষ হতে পারে তার একটা ধারণা হয়েছিল তখন। তোমায় দেখে আজ সেই ছবিটাই মনে এল। কুসুম, তুমি এত নিরাসক্ত হয়ে গেলে কি করে? বর্ষার মেঘে তা থইথই আকাশে যৌবনের যে আনন্দ তা কি করে হারিয়ে যায় চৈত্রের শুষ্কতায়? আজ এতকাল পরে তোমাকে দেখেই বুঝলাম, কুসুম, তুমি ভালো নেই। পাহাড়ি স্টেশনে নেমে চারধারে তাকানোর পর নিজেকেই আগন্তুক বলে মনে হয়েছিল আমার! অথচ সেই বাল্যকালে, আমাদের চোখের সামনে রেললাইন পাতা হয়েছিল, ট্রেন এসেছিল মালা পরে। দিনে দুবার তার যাওয়া আসা। স্টেশনের বাইরে চালাঘরে হরিপদকাকা চায়ের দোকান খুলেছিল। দুবারের ট্রেনে কি আর বিক্রি হত তার। প্রথম স্টেশন মাস্টারের নাম ছিল ঘনশ্যাম ধাড়া। তাঁকে নিয়ে কত হাসাহাসি। চেহারার সঙ্গে নামের এমন রাজযোটক মিল বড় একটা চোখে পড়ে না। লাগোয়া রেল আবাসে ঘনশ্যাম ধাড়া একাই থাকতেন। টিকিট বিক্রি থেকে ট্রেনকে পতাকা দেখাতে কি আর সময় ব্যয় হত। সারাটা দুপুর আমগাছের নিচে বসে তিনি হরিপদকাকার সঙ্গে ফিস খেলতেন। তারপর আরও একজন বাড়লে, টোয়েন্টি নাইন।

আজ আমার মনে ছবিগুলো এল। কিন্তু হরিপদকাকার দোকানটা বেশ বড় হয়ে গেছে। তার জায়গায় আরও দশটা দোকান। রিকশার ভেঁপু, কুলিদের হইচই। শুনলাম দিনে দশবার ট্রেন দাঁড়ায় স্টেশনে। এখনকার স্টেশন মাস্টার ছিপছিপে সুদর্শন। কথা বলে শুনলাম, ইংরেজি শব্দ বেশি ব্যবহার করেন।

কুসুম, তুমি আর আমি প্রথম দিনের ট্রেন দেখতে এসেছিলাম এখানে। অবশ্য তখন স্টেশনটা তখনকার আমাদের মতো ছিল। এখনকার সব শহরের মতো, তখন আমাদের অনেকের বাড়িতে রেডিও ছিল না। টিভির কথা কেউ শোনেনি। কিন্তু তখন আমাদের আনন্দের অভাব ছিল না।

কুসুম, তখন তোমার বয়স আট, আমি এগারো। প্রথম যেদিন ট্রেন আসবে, আমাদের স্টেশনে সেদিন মফস্‌সল শহরটা প্রায় খাঁ-খাঁ করছিল। সবাই এসে ভিড় করেছে স্টেশনে দু-পাশে। দুটো লাইন সমান্তরাল ওই দিগন্ত থেকে ছুটে এসে অন্য দিগন্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। নতুন কোট প্যান্ট, মাথার টুপি, হাতে ফ্লাগ নিয়ে ঘনশ্যামবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করছেন। বড়রা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বলছেন, সময় নেই, মাঝে-মাঝে ধমকাচ্ছেন, ট্রেন লাইনে যেন কেউ এসে না দাঁড়ায়। হরিপদকাকা চা বিক্রি করে কূল পাচ্ছে না। এই সময় ঝমঝম করে ট্রেন এল। ইঞ্জিনের গায়ে আগের স্টেশনগুলোয় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। এখানকার বড়রাও পরালেন। ঘনশ্যামবাবু গার্ডের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ট্রেন ছাড়ল। ঠিক তখনই কুসুম, তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে?'

'কি জানি?'

'অনেক অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ। লন্ডন দিল্লি—।' আমার যা মনে পড়েছিল তাই বলেছিলাম।

'যাবে? যাবে একদিন?' তুমি বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

'ধেত। বাড়ি থেকে ছাড়বে না। টাকা লাগবে, কোথায় পাবি।'

তুমি আর কোনও কথা বলনি!

রিকশায় উঠলাম। বিহারি রিকশাওয়ালা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম লোকটা কাজের ধান্দায় এখানে এসেছিল দশ বছর আগে। এসেই রিকশা চালাচ্ছে। লোকটা জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাব? সেটা আমিও ভাবছিলাম। আমাদের বাল্যকালে এই মফস্‌সল শহরে কোনও হোটেল ছিল না। রামলাল আগরওয়ালা একটা ধর্মশালা বানিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে অবাঙালি ব্যবসায়ীরাই উঠত। ভেবেছিলাম সেখানেই যেতে হবে। কিন্তু স্টেশন চত্বরের এত পরিবর্তন দেখে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে ভালো হোটেল হয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবু। চারটে ভালো হোটেল, একটা খুব ভালো হোটেল।'

'খুব ভালোটায় নিয়ে চলো।'

একটু বাদেই যে শহরটাকে আমি দেখতে পেলাম তা আমার অচেনা, দারুণ-দারুণ দোকান, নতুন বাড়ি, বিউটি পার্লার থেকে এ টি এম, টিভির শোরুম থেকে পিজার দোকান, যা আছে সব আধুনিক শহরে এখানে তা পাশাপাশি সাজানো, রাস্তাগুলো অনেক চওড়া হয়েছে। যেন আলাদিনের দৈত্য এসে বদলে দিয়ে গেছে সব। আর তখনই আমার ভয় করতে লাগল, কুসুম, তুমি আছ তো, এই শহরে?

খুব ভালো হোটেলের সামনে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ইন এবং আউট লেখা দুটো গেট, মাঝখানে অনেকটা সুন্দর লন, ওপাশে ঝকঝকে পাঁচতলা বাড়িটার ওপর লেখা আছে ডে অ্যান্ড নাইট। এত বড় বাড়ি তখন কেউ এখানে চোখে দেখেনি। রিকশাওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে সুটকেশ নিয়ে কাচের দরজা ঠেলে পা বাড়াতেই ঠান্ডা লাগল বেশ। বুঝলাম ঠান্ডা মেশিন চলছে। রিসেপশনিস্ট মিষ্টি হেসে বলল, 'ইয়েস!'

প্রতিদিন থাকার জন্যে আড়াই হাজার দিতে হবে। সেসময় কোনও-কোনও বাড়ির কর্তা এই মাইনের চাকরি করতেন। লিফটে উঠলাম তিনতলায়। প্লাস্টিকের কার্ড ঢুকিয়ে দরজা খুললাম। যে কোনও ফোর স্টার হোটেলে এরকম ঘর দেখতে পেতাম। মনে পড়ল ছেলেবেলায় আমরা একটা হ্যারিকেনকে ঘিরে তিনভাই বোন পড়তে বসতাম। এই শহরেই। না। আমি ঠিক করলাম, আর অবাক হব না।

দারুণ বিছানায় জুতো সুদ্ধ শুয়ে পড়লাম। কতদিন? কতদিন পরে আমি এই শহরে এলাম? চল্লিশ। হ্যাঁ ঠিক চল্লিশ বছর পরে। এই বছরগুলোয় আমি অনেক লড়াই করেছি কলকাতায়, তারপর লন্ডন, নিউইয়র্কে ঘুরেছি নিয়মিত। এখন যাকে বলে সচ্ছল, আমি তাই। এখানে আমার কথা ছিল না আসার। মনেই ছিল না।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণে কানাডার টরেন্টো শহরে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে ভিড় হয়েছিল বেশ। বক্তৃতা ছাড়াও আমাকে অনুগল্প পড়তে হয়েছিল কয়েকটা। সবাই খুশি হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে অটোগ্রাফ দিতে-দিতে হাত ব্যথা। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম তুমি। সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলাম। চল্লিশ বছর আগের সব স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে। একটি বাইশ বছরের মেয়ের মধ্যে তুমি আসো কি করে? সেই নাক, চিবুক এবং চোখ। কিন্তু কোথায় শেষবার দেখেছিলাম যখন তুমি বারো। বারো বছরের মুখটাই যেন একটু পরিণত হয়েছে বাইশে।

আমাকে অবাক হতে দেখে সেই মেয়ে হাসল;

'কি হল?'

'তোমার নাম কী?'

'ফুল।'

'বাঃ। চমৎকার। কি করো এখানে?'

'মাস্টার্স করেছি। সামনের সপ্তাহে চাকরি শুরু করব। আপনার অনেক গল্প আমার পড়া। খুব ভালো লাগে।' ফুল হাসতেই আবার তোমাকে দেখলাম আমি,

'অনেক ধন্যবান।'

'আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? আমি কত ছোট। তা ছাড়া, আমি আপনি যে শহরে ছিলেন সেখানে জন্মেছি।' ফুল বলল।

'কোন শহরে?'

'বাঃ। আপনার মনে নেই? আপনার অনেক বইতে বারবার যে শহরটার কথা লিখেছেন, ভুলে গেছেন?'

'ও। তাই বুঝি? কোথায়, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ি।'

'আমার পিসির নাম কুসুম। কুসুমকুমারী।' আচমকা হৃৎপিন্ড উপড়ে এল গলায়, কথা আটকে গেল।

'জানেন, এই যে আমি এখানে পড়তে এসেছি তা শুধু পিসির জন্যে। আমরা তিন ভাইবোন। বাবার ক্ষমতা ছিল না এখানে এতদূরে পড়তে পাঠাবার। পিসি আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার দায়িত্ব ছেলেবেলা থেকে পিসি নিয়ে নিয়েছিল।'

'ও।'

'আপনার অনেক লেখায় পিসি আছে, না?'

'হয়তো।'

'আপনি কীরকম এড়িয়ে যাচ্ছেন। পিসিকে জিজ্ঞাসা করলেও এড়িয়ে যেত।'

'তোমার পিসি এখন কোথায়?'

'পিসি তো বাড়িতেই আছে। স্কুলে পড়ায়।'

'তোমাদের বাড়িতে? মানে আগের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। পিসি বিয়ে করেনি। দাদু মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তো। আমি ভাবছি, এবার পিসিকে আমার কাছে নিয়ে আসব।'

সেদিন ফুল আমাকে লাঞ্চ খাইয়ে দিল। তোমার কথা আর ও বলেনি, এমনকী এই শহরটা যে এখন বদলে গিয়েছে সেই কথাও না। ও শুধু বলেছে, এখানে ওর আজকাল খুব একা লাগে। জিজ্ঞাসা করাতে মাথা নেড়ে বলেছে, কোনও ছেলের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার হয়নি। অনেকেই অ্যাপ্রোচ করেছে কিন্তু ওর খুব ভয় করে। ছেলেদের ও বিশ্বাস করতে পারে না। শুনতে ভালো না লাগলেও আমি চুপচাপ ছিলাম।

তারপর থেকেই আমি কোনও কাজে মন দিতে পারছি না। বারংবার মনে পড়েছে কুসুম তোমার কথা। আচ্ছা, আমি যখন পনেরো বছর বয়সে ওই শহর ছেড়ে এসেছিলাম তখন তুমি বারো। আমি কি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলেছিলাম তখন? তুমি যখন কিছু বলতে আমি মানে বুঝতাম না। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট তুমি তবু কীরকম রহস্যময় ছিল তোমার কথা। আমাদের শহরের প্রান্তে রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে নিয়ে তুমি বলেছিলে, 'দ্যাখো, দিঘির জল দ্যাখো।' আমি দেখেছিলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'বলো তো দিঘি কার বন্ধু?'

'ধ্যাত।' আমি বলেছিলাম, 'দিঘি কি মানুষ যে কারও বন্ধু হবে।'

তুমি হেসেছিলে, 'না দিঘি আকাশের বন্ধু। তাকিয়ে দ্যাখো, দিঘিতে আকাশের ছায়া পড়েছে। আকাশের সব রং দিঘিতে।'

কুসুম, এগুলো কি ভালোবাসার কথা? তখন বুঝিনি। আজ আমি বুঝতে এলাম। কলকাতায় ফিরে এসেই স্থির করলাম, তোমার মুখোমুখি হব। এই দেখা না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার

শান্তি নেই।

বিকেল চারটে বাজল।

তৈরি হয়ে নিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই দিনের আলোয়। রাত নামলে নয়।

হোটেলের রিসেপশনে যারা সদাজাগ্রত তাদের কারও আমাকে চেনার কথা নয়। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যদি দূরে কোথাও যান তাহলে হোটেলের গাড়ি নিতে পারেন।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'দূরে যাব না।' তারপর কৌতূহল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি নিশ্চয়ই এই শহরের মানুষ নন? চাকরির সুবাদে এসেছেন?'

—না, আমার বাড়ি এখানেই।

'আচ্ছা! কোন পাড়ায়?' এরকম বলিয়ে কইয়ে এরকম নব্য চেহারার মহিলা আমাদের সময়ে এই শহরে ছিল না।

মহিলা বললেন, টেম্পল রোডে আমার বাবা থাকতেন। এখন আমরা থাকি নবাব পাড়ায়।

টেম্পল রোড! খালের পাশের সেই সরু পথটা। যেখানে কালীবাড়ি ছিল বলে ওই নামের রাস্তা হয়েছে। ওখানকার অনেককেই চিনতাম বলে ওঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, একটা টেলিফোন অ্যাটেন্ড করে আসার সময় দিলেন মহিলা 'নিখিলচন্দ্র মিত্র।'

'অ্যাঁ। নিখিলের মেয়ে?'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন?'

'চিনতাম। খুব ভালো লাগল। ওকে আমার কথা বললে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।' বাইরে বেরিয়ে এসেও ঘোর কাটল না। নিখিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে শান্ত এবং সুদর্শন ছিল। কিন্তু ওর সৌন্দর্যে মেয়েলি ভাবটার বাড়াবাড়ি ছিল। কথাও বলত একটু মেয়েলি ঢঙে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ যারা পেত না তারা ওর সঙ্গে ভাব করে বেশ মজা পেত। জনার্দন তো ঘোষণাই করেছিল সে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে না। নিখিলই ওর প্রেমিকা। ওর সঙ্গেই সারাজীবন থাকবে।

সেই নিখিলের এই স্মার্ট মেয়ে—ভাবতেই পারছি না। নিখিল কি তার স্বভাব এখন বদলে ফেলেছে? জনার্দনের সঙ্গে কি ওর সম্পর্ক এখনও আছে? এসব প্রশ্ন মাথায় পাক খাচ্ছে তখন একটা রিকশাওয়ালা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হর্ন বাজাল। রিকশায় উঠলাম। তোমার বাড়িতে যেতে হলে শহরের অনেকটা ডিঙিয়ে যেতে হবে।

তখন ছিল সরু রাস্তা, এখন সেটা বেশ চওড়া হয়েছে। বাঁ-দিকে গুপ্তদের পুকুরটা চোখে পড়তেই জায়গাটাকে চিনতে পারলাম। পুকুরটা এখনও আগের মতো রয়েছে। অল্প জল। হয়তো সরকারের আইন পুকুরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রোমোটারদের হাত থেকে। কিন্তু এই রাস্তার দুধারে অনেক ছোট-ছোট দোকান ছিল, তারা কোথায় গেল। এখন সাইবার কাফে, বিউটি পার্লার, আধুনিক ফাস্ট ফুডের দোকান পরপর দারুণভাবে সাজান, মোড়ের মাথায় এসে মনে পড়ল যতীনকাকার কথা। ওর ভাইপো বুলু আমাদের সঙ্গে পড়ত, তখন শহরের একমাত্র বই-পত্রিকার দোকানটা ছিল যতীনকাকার। দোকানটা ভেঙে রাস্তা হলেও পাশের দোতলা বাড়ির একতলায় সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম, 'বইটই।'

হ্যাঁ, ওই নামটাই ছিল তখন কিন্তু আমরা বলতাম যতীনকাকার দোকান। রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে নিচে নামলাম। বাইরে থেকে বুঝিনি, ভেতরে বেশ ভিড়। আর দোকানটাও ঢের বড়। আগে যা ছিল তাঁর তিনগুণ। চারটি যুবক খদ্দের সামলাচ্ছে। ভেতরের ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছেন যে বৃদ্ধ তার ভুরুর চুল সাদা, চুলের কোথাও কালো নেই। আমার মনে যতীনকাকার যে চেহারাটা ভাসছে তার সঙ্গে অনেক তফাত, মনের ছবির মুখে কিছু বলিরেখা, চুল ভুরু সাদা করে দিতেই এই মুখটি তৈরি হল।

'কি বই দেব?'

বই চাই না, ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' চোখের ইশারায় যতীনকাকাকে দেখলাম।

যুবক যতীনকাকাকে জানাতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করেও না পেরে উঠলেন। এখনও পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন দেখছি।

কাউন্টারের ধারে এসে বললেন, 'বলুন।'

'আপনি কী যতীনকাকা?'

সঙ্গে-সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল, 'এখন আমাকে সবাই দাদু বলে। আপনি কি আমার ভাইপোর বন্ধুদের কেউ? দাঁড়াও, চোখ বন্ধ করলেন যতীনকাকা, 'শম্ভু? শম্ভুনাথ?'

'না।' নিজের নাম বললাম।

'ওহে। হ্যাঁ, তাইতো, তোমার ছবি তো বই-এর পেছনে প্রায়ই দেখি। তা ছাড়া তোমার মুখাবয়বের তেমন পরিবর্তন হয়নি, এসো, ভেতরে এসো।' ভেতরে ঢুকলাম। আদর করে বসতে বললেন। বললাম, 'আপনার দোকানও বেশ বড় হয়েছে।'

'তা হয়েছে। তবে সেটা স্কুলবই-এর কল্যাণে। তুমি এখন বিখ্যাত লেখক হয়েছ, এই আমার দোকানেই তোমার প্রচুর বই। স্কুলের প্রাইজ হিসেবে তোমার বই-এর চাহিদা আছে। এই তো দ্যাখো, সামনের সপ্তাহে গার্লস' স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, লিস্টে তোমার অনেক বই আছে।' কথা শেষ করে একজনকে ড'কলেন, 'গার্লস স্কুলের কুসুমদিদিমণি যে লিস্টটা দিয়ে গেছেন ওটা আন তো।'

লিস্ট এল, এটা কি তোমার হাতের লেখা। তোমার হাতের লেখাতে কি তখন এমন মুক্তো ঝরত? যতীনকাকা দেখালেন, আমার আঠারোটা বই ওই তালিকায় রয়েছে।

কিছুক্ষণ কথা বলার মধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেল আমি কে! একজন ক্রেতা আমার বই কিনে এগিয়ে দিলেন অটোগ্রাফের জন্য।

অটোগ্রাফটা দেওয়ার পর যতীনকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদিন আছ?'

'ঠিক নেই কিছু।'

'তুমি এই শহরের ছেলে, এখানে ফিরে এসেছ এটা সবার জানা দরকার। একটু প্রচার করলেই দেখবে লোকজন চলে আসবে। তাহলে কাল বিকেলে আমার দোকানে তুমি থাকছ এটাই বলার ব্যবস্থা করি। কুলুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'না। ও কোথায়?'

'অস্ট্রেলিয়ায়। যোগাযোগ দূরের কথা, একটা চিঠিও লেখে না।'

আমি উঠলাম। যতীনকাকু বারংবার বললেন কাল ওখানে যাওয়ার জন্য, রিকশায় বসে ভাবলাম, হয়তো লোকজন আসবে, আমার বই কিনে অটোগ্রাফ নেবে। অর্থাৎ আমাকে দেখিয়ে কাল কিছু লাভ করতে চান যতীনকাকু। এখন তাঁর ব্যাবসা এমনিতেই ভালো। তবুও। আমি সেই ছোট্ট দোকানটায় বসে উনি যখন সারাদিনে তিন-চার জনের বেশি খদ্দের পেতেন না তখনও ওঁকে অন্যরকম লাগত আমাদের। দোকানে গেলেই বললেন, 'সুকুমার রায় আর অবনীন্দ্রনাথ পড়ো। না পড়লে জীবনটাকে দেখার চোখ তৈরি হবে না।'

কুসুম। ভাবতে পারো এই শহরের যে কেউ ছিল না, বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তুমি যা বলতে তা বুঝতে যার অনেক সময় লাগত তাকে অটোগ্রাফ দিতে হবে এখানেই। আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করেই রিকশাওয়ালাকে বললাম টেম্পল রোড হয়ে যেতে। দেখলাম, ক্যানাল বেশ চওড়া, নৌকো ভাসছে। দু-তিনটে ভাসমান রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল। টেম্পল রোড চওড়া হয়ে গেছে। নিখিলদের বাড়িটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। একদিকে ক্যানাল অন্যদিকে সারি-সারি নতুন দোতলা বাড়ি। একটু বেশি আস্থা রেখেছিলাম নিজের ওপর। নিখিলের মেয়ের কাছে

থেকে ঠিকানা নিয়ে আসা উচিত ছিল।

খোঁজাখুঁজি করলে হয়তো পাওয়া যেত নিখিলকে কিন্তু তাতে দিনের আলো নিভে যেত। রিকশাওয়ালাকে বললাম তোমার পাড়ায় নিয়ে যেতে।

নদীর ধারে তোমাদের বাড়ি। আমার ফুলমাসি থাকতেন ঠিক তোমাদের পাশের বাড়িতে। আমরা তখন খুব ছোট। ফুলমাসির বাড়িতে গেলেই তুমি চলে আসতে। তোমার যখন ছয় বছর বয়স তখন দারুণ ক্যারাম খেলতে। পরপর পাঁচটা গুটি গর্তে ফেলতে অনায়াসে।

দেখলাম অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে ওই পাড়ায়। তারপর বাঁধটার কাছে এলাম। বাঁধের গায়ে রাস্তা। রিকশাওয়ালা জানালো নদীকে বাঁধা হয়েছে যাতে পাড়া ভাসিয়ে দিতে না পারে। শেষপর্যন্ত তোমাদের বাড়ি। না টিনের চালটা নেই, একতলা সিমেন্টের সুন্দর ছিমছাম বাড়ি, বাইরে বারান্দা। পাশের ফুলমাসিদেরটা দোতলা হয়েছে। মেসো মারা যাওয়ার পর ফুলমাসি বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন কলকাতায়, ছেলেব কাছে।

ভাড়া না মিটিয়ে রিকশাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। একটি কিশোর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাইছেন?'

একটু অস্বস্তি হল। তোমার নাম বললে কি প্রতিক্রিয়া হবে? ছেলেবেলায় এই শহরে কোনও অবিবাহিতা মহিলার কাছে কোনও পুরুষ আসত না। নাম করা দূরের কথা।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কী?'

'অনুপম।'

'বা.। খুব সুন্দর নাম। কে দিয়েছে?'

'পিসিমণি।'

'তাই বলো, তিনি আছেন?'

'আছেন। আপনি কি পিসিমণিকে চাইছেন?'

থম ধরল বুকে। কুসুম; আমরা কি কেউ কাউকে কখনও দেখেছি?

'ওঁর সঙ্গে দে.া করতে এলাম।'

'এখন তো দেখা পাবেন না।'

'কেন?'

'বিকেল হলেই পিসিমণির মন খারাপ হয়ে যায়। কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিছানায় শুয়ে গীতবিতান পড়ে চুপচাপ।'

কিশোরের কথার মধ্যেই একজন মধ্যবয়সি মহিলা দরজায় এলেন, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমি নাম বললাম।

'আপনি কি লেখক?'

'হ্যাঁ। ওই আর কি!'

'ওহো। বসুন প্লিজ।' বারান্দায় সাজিয়ে রাখা চেয়ার দেখিয়ে এগিয়ে এলেন মহিলা, 'আমরা আপনার লেখার খুব ভক্ত। আমার মেয়ে—!'

'ফুল?'

'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমেরিকায়।'

'আচ্ছা! দেখুন তো গতকাল ফোন করেছিলাম অথচ একবারও বলেনি। ও আপনার প্রায় সব লেখাই পড়েছে। বসুন।' মহিলা আন্তরিক।

বসলাম।

'আপনার মতো একজন মানুষ আমাদের বাড়িতে এসেছেন ভাবতেই ভালো লাগছে। আপনার বাড়িও তো এই শহরে ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। এখানেই আমি জন্মেছি।'

'এই নিয়ে খুব গর্ব আমাদের। যখনই এই শহরের কথা লেখেন তখন সবাই খোঁজে, পরিচিত কে আপনার লেখায় এল। আপনি বসুন, দিদিকে ডেকে দিচ্ছি।'

'যদি ও ব্যস্ত থাকে তাহলে বিরক্ত করার দরকার নেই।'

মহিলা হাসলেন, 'দিদি স্কুল থেকে ফিরে একটু আরাম করে বলেই ওদের বোঝানো হয়েছে মন খারাপ তাই কথা বলবে না, নইলে এ তো বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়। আপনি চায়ে চিনি দুধ-খান?'

'ওই। হ্যাঁ আমি নর্মাল চা খাই।'

মহিলা ভেতরে চলে গেলে অনুপম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি দিদিকে কীরকম দেখলেন?' মোটা না রোগা?

'কোনওটাই নয়। খুব সুন্দর।'

এই সময় ভেতর থেকে তার মায়ের গলা ভেসে আসতেই সে বলল, 'চলি!'

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে দেখলাম বাঁধের ওপর ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামছে। এখানে বসলে আর নদী দেখা যায় না।

এই সময় তুমি এলে। এসে দরজায় দাঁড়ালে। পরনে অফ-হোয়াইট শাড়ি। চুল হাত খোঁপায় জড়ানো। চোখে চশমা। না। একটুও ভারি হয়নি শরীর, তেমন রোগাও নয়। ঈষৎ হাসলে, এগিয়ে এলে কাছে, 'হঠাৎ?'

এই ঠ-এর উচ্চারণ তুমি ঠিক ঠ-এর মতোই করতে। সুচিত্রা মিত্র যেমন গান গাইবার সময় করেন। কখনই ঠ ট হয় না।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, 'চলে এলাম।'

'বোসো।' এমন গলায় সে বলল যেন কাল বিকেলেও আমাদের দেখা হয়েছিল।

বসলাম। তুমি বললে, 'শুনলাম, আমেরিকায় গিয়ে ফুলের দেখা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ অনেক ফুল, তবে টিউলিপটা ওই সময় ফোটেনি।'

'তাই?' তুমি তাকালে,

'হ্যাঁ। ও নিজেই আলাপ করল। আমি ওকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। একেবারে পিসির মুখ বসানো। খুব সপ্রতিভ কথাবার্তা। বলল তুমিই ওর সবকিছু।'

'তাই এলে?'

'মানে?'

'ফুলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কথা মনে এল?'

'মনে এল নয়। মনে ছিল। ফুল সেটাকে নাড়িয়ে দিল বলতে পারো। ফুল বলল, 'আপনার সব লেখায় পিসি আছে, না?'

'বলল?'

'হ্যাঁ, তা থেকে প্রমাণিত হয় মনে ছিলই।'

'প্রমাণ তো কেউ চায়নি। তবে হ্যাঁ, তুমি এই কয় বছরে আমাকে কেবলই অস্বস্তিতে ফেলে গেছ। আমি কি তেমন অন্যায় করেছি?'

'অস্বস্তিতে ফেলেছি? কীরকম?'

'এই শহরের যে-কোনও নারী চরিত্র তোমার গল্প-উপন্যাসে এলেই সবাই মনে করে সেটা নাকি আমি? আমার কথা বলার ধরন নাকি তাদের মধ্যেও। স্কুলের অন্য শিক্ষিকারা রঙ্গ করে বলেন,

'তোমার উচিত ভদ্রলোকের কাছে লেখার অর্ধেক টাকা ডিমান্ড করা। মেয়ে চরিত্র হলেই তার মধ্যে তোমাকে মিশিয়ে দিচ্ছেন?' গম্ভীর হয়ে গেল কুসুম, 'আমি, যত সামান্যই হই, আমিই। আমি কারও মধ্যে যেতে চাই না। আমাকে কেন আমার মতো একা থাকতে দেওয়া হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না।'

আমি তোমার মুখের দিকে তাকাতেই তুমি মুখ ফেরালে। যেন যা বলার বলা হয়ে গেছে আর এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাও না।

এই সময় সেই মহিলা চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে কিছু খাবার।

কুসুম বলল, 'ওর নাম দীপা, দীপাবলী। আমার ভাই-এর বউ।'

মহিলা বললেন, 'আমি কিন্তু আপনার দীপাবলীর নামের যোগ্য নই।'

কুসুম বলল, 'ওই এক কথা! দীপাবলী একটা বানানো চরিত্র, তুমি বানান হবে কেন? তুমি তোমার মতো।'

'বানানো বললেই হল, তাহলে সবাই দীপাবলীর প্রশংসা করে কেন?' মহিলা বললেন—

'ওটাই লেখকের কৃতিত্ব। যারা প্রশংসা করে তাদের জীবনটা ওই রকম হলে বুঝতে পারত।' কাজের অছিলায় মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। এবং তখনই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুসুম, তুমি কেমন আছ?'

সে চোখ ঘোরাল। চশমা খুলে আঁচলে মুছল,

'কেমন দেখছ?'

বললাম, 'তুমি ভালো নেই।'

'এই ভঙ্গিতে তুমি কথা বলতে না।'

'তুমি যখন আমার কথা বলতে শুনেছ তারপর চল্লিশটা বছর চলে গিয়েছে। একমাত্র আকাশ ছাড়া এত বছরে সবকিছু বদলে যেতে পারে। আমি আকাশ নই। পরিবর্তন তাই স্বাভাবিক, পরিবর্তিত হওয়া মানে খারাপ থাকা নয়।' কুসুম বলল। কথাগুলো সে বলছিল বটে কিন্তু মনে-মনে জানলাম সে ভালো নেই।

কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করব না।'

'কেন?'

'ভালো না থাকলে কেউ এত লেখা লিখতে পারে না।'

'এটা তো একটা অভ্যেস। লোকে যে অভ্যেসে চাকরি করে।'

'হয়তো। কি জানি।' তারপর তাকাল সে আমার দিকে, 'কেন এলে?'

'কোথায়? এই শহরে?'

'হ্যাঁ। এখানে তো তোমার কোনও কাজ নেই।'

'আমি কোনও প্রয়োজনে আসিনি। এসেছি টানে। এসে দেখলাম শহরটা একদম বদলে গিয়েছে। যে হোটেলে উঠেছি সেসময় এমন হোটেল এখানে কল্পনাও করতে পারতাম না। যতীনকাকার বই-এর দোকানটাও বদলে গেছে। ফিরে গিয়ে যে লেখাই লিখব আমার ছেলেবেলার শহরটার ছবি আর আসবে না।'

'কোন হোটেলে উঠেছ?'

বললাম। সে বলল, 'বাব্বাঃ। খুব দামি হোটেল।'

এই শহরে এসে কোনও হোটেলে উঠব তাই ভাবতে পারিনি আগে। ওঠার পর মনে হয়েছে ঠিক করেছি। হাজার হোক, হোটেলের ঘরগুলো পৃথিবীর সবদেশেই মোটামুটি একই চেহারার। অনাত্মীয় বলে মনে হয় না।

চা শেষ করলাম। মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার ভাই?'

'ও বড় ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে।'

'তাহলে আজ উঠি?'

'ক'দিন থাকছ?'

'থাকার তো আর কারণ নেই। কালই ফিরে যাব।'

'ফিরে যাবে।' হাসল সে, 'যাও।'

উঠে দাঁড়াতেই মহিলা এবং কিশোর চলে এলেন। মহিলা বললেন, 'কাল ছুটির দিন। দুপুরে এখানেই খাবেন।'

কুসুম বলল, 'উনি কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন।'

'সেকি? কবে এসেছেন?'

'বোধহয় আজকেই। তাই তো?' কুসুম আমার দিকে তাকাল।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'আহা! আর একটা দিন থেকে যান না। পরিচিত সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

হেসে বললাম, 'শহরটা এমন বদলে গেছে যে পরিচিতরা কে কোথায় আছে খুঁজে পাব না। তা ছাড়া চল্লিশ বছর বাদে দেখা হলে এতকালের জমে থাকা স্মৃতি যে হোঁচট খাবেই তা আগে বুঝতে পারিনি। চলি!'

কুসুম বলল, 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।'

কিশোর জিজ্ঞাসা করল, 'পিসি, আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

তার মা ধমক দিল, 'তুমি যাও, পড়তে বোসো, সন্ধে হয়ে গিয়েছে।'

নিচে নেমে বললাম, 'এগিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। সামনেই রিকশা রয়েছে।'

'থাক না। ও নিচের রাস্তা দিয়ে বাঁধের শেষে যাক, আমরা বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে ওখানে পৌঁছে গেলে আপনি চলে যাবেন।'

রিকশাওয়ালাকে তাই বলা হল।

ধাপে-ধাপে পা ফেলে যখন বাঁধের ওপর উঠে এলাম তখন নদীর জল আরও কালো হয়েছে। বললাম 'বাঁধ দিয়ে বন্যা বন্ধ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। বাঁধটা সেইজন্যেই দেওয়া।' কুসুম বলল। চারপাশ এখন পাতলা অন্ধকার। একটু হালকা বাতাস বয়ে গেল।

আমরা নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলাম, বললাম। 'কুসুম তুমি সংসারী হলে না কেন?'

'সেকি! এতকাল তো সংসারই করছি।' হাসল সে, 'বলো বিয়ে করিনি কেন?'

'বেশ, তাই।'

'বিয়ের বয়স যখন হল তখনই বাবা চলে গেলেন। সবে স্কুলে পড়াতে ঢুকেছি, ভাই ছোট। দায়িত্ব নিতে হল। তারপর, একটা বর খুঁজে আনবে তেমন কেউ পাশে ছিল না।'

'কথাটা কি বিশ্বাস্য?'

'সেটা তুমি যেমন ভাবো। মিথ্যে নয়, স্কুলের সহকর্মীরা চেয়েছিলেন শহরের কাউকে বিয়ে করি যাতে স্কুলের চাকরিটা থাকে। উদ্যোগীও হয়েছিলেন কেউ-কেউ। আমি রাজি হইনি এই শহরের কাউকে বিয়ে করতে।'

'কেন?'

'তোমার প্রথম গল্প, যেটা দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল, সেটা পড়ার পর মনে হয়েছিল এই শহরের কাউকে বিয়ে করাটা ভুল হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

'কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি?'

'বন্ধুত্ব মানেই তাকে স্বামী হিসেবে ভেবে নেওয়া নয়। তুমি হয়তো জানো না, এখানকার সবাই জানে তোমার সঙ্গে আমার গভীর প্রেম আছে। ওরা ভুলে যায় তুমি পনেরো আর আমি বারো, সেই আমাদের শেষ দেখা। আসলে লিখে-লিখে তুমি এই ভাবনাটা ওদের মনে ঢুকিয়েছ। তাতে তুমি হয়তো বিখ্যাত হয়েছ কিন্তু আমার চারপাশে একটার-পর-একটা পাঁচিল উঠেছে।' বিষণ্ণ গলায় বলল সে।

'কিন্তু আমি তোমাকে আহত করতে কোনও লেখা লিখিনি। তোমার নাম বা তোমাকে চিনতে পারা যাবে এমন কোনও সূত্র আমার লেখায় ছিল না।'

'কি ছিল সেটা তুমি ভালো করে জানো।' হাঁটতে শুরু করল কুসুম। তারপরেই হেসে ফেলল আলতো শব্দ করে 'তুমি ভেবো না আমি কোনও অভিযোগ করছি। কেউ একজন বহুদূরে থেকে আমায় কীভাবে দেখছে, আমায় নিয়ে কী ভাবছে তা আবিষ্কারের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ তো আছে।'

'কি করব বলো। আমি তোমাকে ছাড়া ভাবতে গেলেই অসাড় হয়ে যাই।'

'তাই যে চরিত্র আমার নয় তার মধ্যেও আমাকে মিশিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' স্বীকার করলাম।

'এই ভাবনা, আমাকে নিয়ে ভাবনা, তোমার মনে কবে এসেছে?'

'সেই প্রথম লেখা থেকে। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার অন্তত আট বছর পরে।'

'ততদিনে তুমি বিবাহিত।'

'না। তারও তিন বছর পরে।'

'তিনি জানেন?'

'জানি না।'

'শুনেছি তুমি এখন একা থাকো!'

'হ্যাঁ!'

সে আর কথা বলল না। আমরা বাঁশের শেষে চলে এসেছিলাম। কুসুম বলল; এবার ফিরে গিয়ে যা লিখবে সেখানে নিশ্চয়ই আমি থাকব না।'

'কারণ?'

'যে-আমাকে এতকাল মনে রেখেছিল তার সঙ্গে এই আমার কোনও মিল দেখতে পেলে না। আর যাই হোক, এই-আমাকে নিয়ে তো লেখা যায় না।'

কথা না বলে হাসলাম আমি।

হঠাৎ সে নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো এত লেখ, বলো তো, নদী কার বন্ধু?'

'আকাশের।' জবাব দিলাম।

'ঠিক। কিন্তু আকাশ যখন অন্ধকারে তখন নদীও কালো। দুজনের কোনও যোগাযোগ থাকে না। যে যার নিজের মতো।' সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

তখন, আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুসুম তুমি কেমন আছ?'

সে তাকাল, 'কি মনে হয়?'

'কুসুম, আমি জানি তুমি ভালো নেই।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল সে, 'দূর! চমৎকার আছি, তোমার এত উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছি আমি, খারাপ থাকব কি করে!' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে এত লেখ, আজ যদি বলি, আমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলো যেখানে বাকি জীবনটা আমরা পাশাপাশি থাকতে পারব; পারবে নিয়ে যেতে?'

উত্তরটা নিজেই দিল সে, 'পারবে না। সম্ভব নয়। ঝরনা নদী হয়ে গেলে আর পাহাড়ে ফিরে যেতে পারে না। তার চেয়ে এই ভালো, এই যেমন আছি। এনাফ।'

কুসুম ফিরে গেল বাঁধের ওপর দিয়ে। ধীরে-ধীরে অন্ধকার তাকে আড়াল করল। নেমে এলাম রাস্তায়। রিকশায়। হোটেলে ফিরে আসতেই রিসেপশনের নতুন মেয়ে বলল, স্যার, আপনার একটা মেসেজ আছে। টেলিফোনে।' ঘরে এসে বোতাম টিপতেই কুসুমের গলা শুনতে পেলাম, 'শোনো, আমি জানি, তুমিও ভালো নেই।'



শিহরণ

শক্তিব্রতবাবু মুখ তুলে কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখলেন। এই ভয়ংকর গরমেও গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। তাঁর শ্বাস পড়ল। উদাস গলায় বললেন, 'আজকাল আর যুবতী বিধবা বড় একটা দেখা যায় না!'

সুধাকরবাবু অবাক হয়ে মুখ ফেরালেন, 'হঠাৎ এই ভাবনা?'

'কৃষ্ণচূড়া দেখে মনে এল।' শক্তিব্রতবাবু উত্তর দিলেন।

বিমলেন্দু একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ওপাশ থেকে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আশ্চর্য!'

শক্তিব্রতবাবু তাকালেন, 'অন্যায় কি করলাম?'

'কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে যুবতী বিধবার কি সম্পর্ক তাই বুঝতে পারছি না।' বিমলেন্দু বললেন।

'বঙ্কিম পড়েছেন?' শক্তিব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বিমলেন্দু সারা জীবন রেলে চাকরি করেছেন। প্রবাসে কাটিয়েছেন। গল্প উপন্যাস পড়ার বাতিক তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বই তিনি পড়েছিলেন কারণ সেটি তাঁর স্ত্রী বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলেন। কচি বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সব সংলাপ বসিয়েছেন যে লেখকের বাস্তব জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল। যদিও তাঁর স্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর মায়ের চৌদ্দো বছর বয়সের সন্তান। বিমলেন্দু উত্তর দিলেন না।

এই তিন ব্যক্তির বয়স সত্তর পেরিয়েছে। আলাপ বছর দেড়েকের। এখানকার নতুন হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দা এঁরা। রোজ বিকেলে এই পার্কের একটি বিশেষ বেঞ্চিতে তিনজন এসে বসেন। সুধাকরবাবু লোহালক্কড়ের ব্যাবসা, এখন ছেলে দেখছে। শক্তিব্রতবাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি হিসেবে অবসর নিয়েছেন।

সুধাকরবাবু বললেন, 'আগে বিজ্ঞান পিছিয়ে ছিল। অল্প বয়সে মানুষ মারা যেত ফলে তাদের যুবতী স্ত্রীরা বিধবা হয়ে যেতেন। কিন্তু সেইসব বিধবাদের তো বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে অনেক নিষেধ ছিল। তাদের দেখতেন কি করে?'

শক্তিব্রতবাবু বললেন, 'দূর মশায়। আমি বিয়ে করিনি, আজ অবধি কোনও মহিলার শরীর দেখা দূরের কথা আঙুলও ছুঁয়ে দেখিনি, আমি কি করে স্বচক্ষে ওঁদের দেখব। আমি তাঁদের দেখেছি বইয়ের পাতায়। ওই বঙ্কিম থেকে বটতলা, কত বইতে ওঁরা আছেন।'

শক্তিবাবু সংসার করেননি এটা ওঁরা জানতেন কিন্তু জীবনে কোনও মহিলার আঙুল স্পর্শ করেননি শুনে বেশ বিমর্ষ হলেন সঙ্গী দুই বৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিমলেন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বটতলা?'

শক্তিব্রতবাবু একটু লজ্জিত হলেন, 'ওই যে মলাট বিহীন চটি-চটি বইগুলো। বাঁকুড়ায় যখন পোস্টেড ছিলাম তখন এক সহকর্মী কলকাতায় গেলেই নিয়ে আসত। একটু, একটু কেন বেশ অশ্লীল। তবে কিনা ওই বয়সে মন্দ লাগত না।'

সেদিন সন্ধেবেলায় ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সুধাকরবাবু দেখলেন তাঁর স্ত্রী বউমার সঙ্গে হেসে হেসে খুব গল্প করছেন। তিনি কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। শক্তিব্রতবাবুর জন্য ওঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল। চায়ের কাপ নিয়ে বউমা ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোমার শাশুড়িকে একটু আসতে বলো।'

বউমা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। সবিতা এলেন, 'কি বলছ?'

'না কিছু না।' মাথা নাড়লেন সুধাকরবাবু।

'আরে। কি হয়েছে বলবে তো? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'তাহলে? কোনও খারাপ খবর পেয়েছ?'

'ওসব কিছু না।'

'এই শক্তিব্রতবাবুর কথা ভাবছিলাম। অবিবাহিত মানুষ একাই থাকেন।'

'সঙ্গে ভাইপো থাকে বলেছিল না?'

'হ্যাঁ ভাইপো মানে তো সংসার নয়!'

অনেক মানুষ অবিবাহিত থাকে। একমাত্র সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া বেশিরভাগই বদ হয়। ওদের সংসার করার প্রয়োজন হয় না।' সবিতা চলে গেলেন টিভি দেখতে।

আলো নিভিয়ে ছন্দা বিছানায় এসে চাপা গলায় বললেন, 'সরে শোও।' শরীরটাকে নাড়াচাড়া করলেন বিমলেন্দু। তারপর শ্বাস ফেললেন।

ধপ করে বিছানায় পড়ে বালিশটাকে স্বামীর বালিশ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে ছন্দা বললেন, 'আবার কি হল?'

'শক্তিব্রতবাবুর জন্যে মন খারাপ লাগছে।'

'কারণ?' অন্ধকারে প্রশ্নটা হল চটজলদি।

'ভদ্রলোকের বয়স এখন তেয়াত্তর। এখন পর্যন্ত কোনও নারীশরীর চোখে দ্যাখেননি। বিয়ে করেননি। কিন্তু অন্য অনেকভাবে তো দেখা যায়।' আবার শ্বাস ফেললেন বিমলেন্দু।

'ভালো মানুষ, সৎ চরিত্র। তোমার মতো ছোঁক-ছোঁক বাতিক নেই।'

'আঃ। তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা রোজ একসঙ্গে আড্ডা মারি, অলমোস্ট একই বয়সি, আমি আর সুধাকরবাবু দেখেছি আর উনি দ্যাখেননি, এক ধরনের কমপ্লেক্স তৈরি হয় না? তুমি পুরুষ হলে বুঝতে!'

'আমি পুরুষ হলে এখানে শুতাম না।' দূরত্ব বাড়ালেন ছন্দা, 'মেয়েমানুষের শরীর যেন বিড়লা প্লানেটেরিয়াম! না দেখলে জীবন বৃথা! কথা শুনলে গা জ্বলে যায়!'

বিমলেন্দু স্ত্রীর বাজুতে হাত ছোঁয়াতেই ছন্দা খেপে গেলেন, 'খবরদার আমাকে ছোঁবে না।'

'বয়ে গেছে ছুঁতে। এখন তোমার ছোঁয়া আর পাশ বালিশকে ছোঁয়ার মধ্যে তফাত নেই।'

'কি? আমি পাশবালিশ?'

'অলমোস্ট!'

ছন্দা বালিশ নিয়ে নিচে নেমে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। গরমকাল। ঠান্ডা লাগার কোনও ভয় নেই।

*

বিকেলবেলায় সবিতা যাচ্ছিলেন কোঅপারেটিভের দোকানে। সকাল থেকে তাঁর স্বামী মুখে কুলুপ দিয়ে বসে আছেন। দু-তিনটে কথা বলে উত্তর না পেয়ে আর কথা বাড়াননি, যা বলার বউমাই বলছে। পিঠে ঘামাচি হয়েছে। পাউডারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে বললে এনে দিতেন। কিন্তু জেদে বলেননি। নিজেই বেরিয়েছেন, একটু হাঁটা হবে।

সেলস কাউন্টারে গিয়ে দ্যাখেন ভিড় নেই। দাঁড়াতেই শুনলেন, 'ভালো?'

তাকিয়ে দেখলেন বিমলেন্দুবাবুর স্ত্রী ছন্দা। পুজোর সময় আলাপ। কিন্তু যাওয়া আসা নেই। মাথা নাড়লেন, 'ভালো। আপনি?'

'এই আর কি!' ছন্দা এগিয়ে এলেন, 'একা, না সঙ্গে কর্তা আছেন?'

'এই সময়? পাগল। এখন তিন বন্ধু পার্কে বসে গল্পে মশগুল। কেন? আপনার কর্তা যাননি? শরীর খারাপ নাকি?'

'না-না। গেছেন। না গেলে ভাত হজম হবে কেন?' ছন্দা হাসলেন।

কিন্তু-কিন্তু করেও জিজ্ঞাসা করে ফেললেন সবিতা, 'আচ্ছা, ওই শক্তিব্রতবাবু লোকটি কীরকম বলুন তো?' সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই দেখুন, আমার মনেও একই প্রশ্ন এসেছে। বিয়ে করেনি, ভাইপোকে নিয়ে থাকে। তার মানে সংসারী নয়। এঁদের সঙ্গে তাহলে কি নিয়ে কথা বলে?'

'ঠিক। কাল একটা কথা শুনে লজ্জায়—কি যে বলব!' সবিতা লজ্জা পেলেন।

ঘনিষ্ঠ হলেন ছন্দা, 'কি বলুন না, কি শুনেছেন?'

'আমার বলতে খারাপ লাগছে!'

'মেয়েমানুষের কথা?' ছন্দা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। এত বয়স বেঁচে আছেন, তিনি নাকি দ্যাখেননি তাই ওর জন্য সমবেদনায় মরে যাচ্ছেন আমার স্বামী। ভাবতে পারেন!' সবিতা চোখ বড় করলেন।

'শুধু আপনার? আমারটিও। বুড়ো বয়সে কি মতিভ্রমই না হয়?'

'লোকটা বদ। ওর সামনে গেলে মনে হবে এক্সরে-র চোখে আমাকে দেখছে।'

'যা বলেছেন। অথচ জানেন, কোনওদিন কেউ কারও বাড়িতে যায়নি।'

'অথচ এসব আলোচনা হয়! ভাবতে পারেন!'

'আর কি হয় কে জানে!'

'আমার মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিই।'

'কিন্তু, কি বলে যাবেন?' লোকটা কীরকম তাও তো জানি না।'

'না-না। লোকটা যখন থাকবে না তখন যাব। এই বিকেল সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'টার মধ্যে। ওর ভাইপো বাড়িতে থাকলে ঠিক কথা বের করতে পারব।'

'কিন্তু গেলে তো কিছু বলতে হবে!'

দুজনে মিনিট পাঁচেক আলোচনা করে শেষপর্যন্ত কথা পাকা করলেন।

পরের দিন স্বামীরা কথা বলতে চেয়েছিলেন, স্ত্রীরা রাজি হননি। বিকেল পৌনে পাঁচটায় ওঁরা পার্কের দিকে চলে গেলে সবিতা এবং ছন্দা দেখা করলেন।

সবিতা বললেন, 'যদি ওর ভাইপো ফ্ল্যাটে না থাকে?'

'ফিরে আসব। কেউ জানতেও পারবে না।'

বাড়ি বের করতে অসুবিধা হল না। বেল বাজাতে যে ছেলেটি দরজা খুলল তার বয়স কুড়ির আশেপাশে। সবিতা বললেন, 'আমরা মহিলা সমিতি থেকে এসেছি।'

'ও, আসুন। কিন্তু কেউ তো বাড়িতে নেই।'

ঘরে ঢুকে ছন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছেন?'

'পার্কে।'

'এ-বাড়িতে মহিলা আছেন?'

'সবিতার প্রশ্ন।

'না। আমি আর জেঠু।'

'কোনও মহিলা আছেন?' ছন্দা জিজ্ঞাসা করেন।

'না। জেঠু মহিলাদের পছন্দ করেন না।'

'কেন?'

'আমি জানি না। আমাকে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমরা ওঁর জন্যে অপেক্ষা করব।'

'দেরি হবে। পার্কে গেলে দেখা পাবেন।'

'না। উনি কোন ঘরে থাকেন?'

'ওই ঘরে।'

বলামাত্র ওঁরা চলে এলেন সেখানে। কোনও অবিবাহিত পুরুষদের ঘর এত সুন্দর সাজানো হতে পারে ওঁরা জানতেন না। তাদের স্বামীরা তো জল গড়িয়ে খান না।

'আমরা এখানেই বসছি।'

'আপনারা কি চা খাবেন?'

'তুমি তৈরি করতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।'

ছেলেটি চলে গেলে সবিতা বললেন, 'ভাইপোকে চাকরের মতো খাটায়।'

'মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেয় না। ওটা কি বই?' সবিতা এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে বইটা তুলল, 'বিদ্যাসুন্দর। এই বই পড়ছে, খুব রস!'

'রসালো বই?'

'হুঁ। বেশ অশ্লীল! পড়েননি?'

'না।'

'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলি আছে আমার কাছে, দেব, পড়বেন।'

বলতে-বলতে টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টানলেন ছন্দা। বাধা দিলেন, সবিতা, 'এই, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না।'

'একটা লোকের চরিত্র বোঝা যায় তার ড্রয়ার দেখে। এমা, এগুলো কি বই।'

তিনটে মলাটহীন চটি বই বের করলেন ছন্দা। পড়লেন, 'লাল শায়া,' 'যুবতী বিধবা', 'ভরদুপুরে শিহরন'। লাল শায়ায় প্রথম পাতায় চোখ রাখলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখে রক্ত জমল। কোনওক্রমে বইটা এগিয়ে দিলেন সবিতার দিকে। সবিতা পড়তে আরম্ভ করলে ওঁরও একই দশা হল। বললেন, 'একি!'

ছন্দা বললেন, 'আমার শরীর কীরকম করছে। মাথা ঝিমঝিম—।'

'আমারও।'

'এরকম বই কেউ লেখে? ছাপা হয়?'

'হয়েছে তো?'

'কেউ পড়ে?'

'পড়ে। পড়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নেয়। নচ্ছার লোক।'

'বলে নচ্ছার।'

'এসব ওদের পড়াচ্ছে কিনা কে জানে!'

'না। পড়ায়নি।' মাথা নাড়ল ছন্দা, 'পড়লে বাড়িতে এসে রসিয়ে বলত, চলো।'

'যাবে?'

'হ্যাঁ। যা জানার তা হয়ে গেছে।' বইগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও একটা বই বের করে নিল ছন্দা।

সবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা?'

'পড়ে দেখব। কেন পড়ে তা জানা দরকার।'

'ও তো টের পেয়ে যাবে। একটা বই নেই।'

'পাক। ভাইপোর মুখে শুনে বুঝতে পারবে না আমরা কারা।'

বাইরে বেরিয়ে টের পেলেন রান্নাঘরে চা বানানো চলছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন ওরা।

'তুমি আগে পড়ে নাও, তারপর আমি পড়ব।' হঠাৎই তুমি বেরিয়ে এল সবিতার মুখ থেকে। কয়েক লাইন পড়ে শরীর ঘিন-ঘিন করলেও রক্ত গরম।

'ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় পড়ি? বাড়ির সবাই তো তাকিয়ে দেখবে!'

'শোওয়ার ঘরে, দরজা বন্ধ করে?'

ছন্দা হাসলেন, 'দরজা বন্ধ করার চল উঠে গেছে দশ বছর আগে। এখন সব সাদা পাতা। কোনও আড়াল নেই। হঠাৎ তো দরজা বন্ধ করা যায় না।'

'আমারও তাই।'

'দেখি।'

আলমারিতে শাড়ির তলায় বইটা রেখে দিয়েছিলেন ছন্দা। ভেবেছিলেন ভোরবেলায় যখন বিমলেন্দু অঘোরে ঘুমিয়ে থাকেন তখন নিশ্চিন্তে পড়বেন। কিন্তু মাঝরাতে ঘটনা ঘটে গেল। বুকে ব্যথা, বমি, প্রবল ঘাম, ছন্দাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হল। যমে মানুষে টানাটানি। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে জানা যাবে না কিছু।

খবর পেয়ে নার্সিং হোমে এসেছিলেন শক্তিব্রতবাবু এবং সুধাকরবাবু। দুজনেই চিন্তিত। ভরসা দিলেন বিমলেন্দুকে। বিমলেন্দু ভেঙে পড়েছেন। সারা জীবন রেলে চাকরি করায় সময় দিতে পারেননি স্ত্রীকে। এরকম সতীসাধ্বী স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে পারেননি।

খবরটা পেয়ে ছটফট করেছেন সবিতা। তাঁর বদ্ধ ধারণা, ওই বই পড়েই ছন্দার শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু বইটা কোথায়? স্বামীকেও বলতে পারছিলেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে ডাক্তার কথা বলতে অনুমতি দিলেন। বিমলেন্দু ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'না, বইটা।'

'বই? কি বই বলো? এখন কি পড়তে পারবে?'

'আমি না। সবিতাকে—। আলমারিতে—। ওকে দিয়ে দিয়ো।'

সুধাকরবাবুর স্ত্রীর নাম সবিতা তা বিমলেন্দু জানতেন না। খোঁজ নিয়ে জানলেন। বাড়ি ফিরে আলমারি ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন, 'ভরদুপুরে শিহরন।' পাতা ওলটাতে তাঁর কান গরম হল। তবু পড়লেন। পড়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল। এই বই তাঁর স্ত্রী পড়তেন? তাঁর স্ত্রীকে তিনি সতীসাধ্বী বলে ভাবতেন? কিন্তু সুধাকরবাবুর স্ত্রীও কি তাই? তাঁকে এই বই দিতে বলেছেন ছন্দা।

সোজা সুধাকরবাবুর বাড়িতে চলে গেলেন বিমলেন্দুবাবু। সুধাকরবাবু তাঁকে দেখে অবাক। আপ্যায়ন করলেন। সবিতা ছন্দার খোঁজখবর নিলেন। চা খেতে হল। কিন্তু কিছুতেই বইটা পকেট

থেকে বের করতে পারলেন না তিনি।

সেদিন নার্সিংহোমে যাওয়ার পথে শক্তিব্রতবাবুর বাড়িতে এলেন তিনি। 'আপনার তো এসব পড়ার অভ্যেস আছে। রাখুন।'

'কি? একি? ভরদুপুরে শিহরন? এ বই আপনি কোথায় পেলেন?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন শক্তিব্রতবাবু।

'কেন? কি হল?'

'আরে মশাই দুজন মহিলা সমিতি থেকে এসে বইটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি মহিলা সমিতিতে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। ওঁরা কাউকে পাঠাননি।'

'মহিলা সমিতি?' ঘাবড়ে গেলেন বিমলেন্দু।

'ভাইপোকে তাই বলেছিল। দুজনেই বয়স্কা।'

'সেকি?'

'আরে মশাই আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার খুলে নিয়েছে। টাকাপয়সায় হাত দেয়নি। এইজন্যেই বলি বিয়ে না করে ভালো আছি।' শক্তিব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এটাকে কোথায় পেলেন?'

'রাস্তায়।'

'পড়ে-টড়ে বাড়িতে রাখতে না পেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। হয়ে গেল!'

'কি হয়ে গেল?' ঘাবড়ে গেলেন বিমলেন্দু।

'এবার ওই দুই মহিলার বৃদ্ধ স্বামীরা বিপদে পড়বেন। প্রৌঢ়ারা তরুণী হয়ে যাবেন আর বৃদ্ধরা সরষের ফুল দেখবেন।' হে হে হে, হাসলেন শক্তিব্রতবাবু।

নার্সিংহোমে গিয়ে দেখলেন সবিতা এসেছেন ছন্দাকে দেখতে। ছন্দা আজ ভালো। বেডে দিয়েছে ওরা। এক মুহূর্তেই বুঝে গেলেন শক্তিব্রতবাবুর বাড়িতে কারা হানা দিয়েছিল। সবিতা চলে গেলে স্ত্রীর পাশে টুল নিয়ে বসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'অবিবাহিত পুরুষের বাড়ি থেকে চুরি করে আনার মতো আর কিছু পেলে না?'

ছন্দা তাকালেন। চোখ বন্ধ করলেন লজ্জায়। তারপর একটা হাত স্বামীর হাঁটুর ওপর রেখে কাঁপা গলায় বললেন, 'অসভ্য।'



প্রেমে ওঠা

প্রেমে পড়লেন পতিতপাবন পাল। সহকর্মীরা ডাকত 'ট্রিপল পি' বলে। সেই ডাকগুলো বছর কয়েক আগে শেষ হয়েছে। এখন উনসত্তর। উনসত্তরে কোনও বঙ্গসন্তান প্রেমে পড়েন কি না তাঁর জানা নেই। অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক প্রেমে পড়া কি না তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। পার্কে ইদানীং এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয় বিকেলে গেলে। ওপাড়ার জটাবাবু। পুরো নাম জটিলেশ্বর কাঞ্জিলাল। একাশি বছর বয়স। জানেন না—এমন কোনও বিষয় পৃথিবীতে নেই। পতিতপাবনের মনে হল এ ব্যাপারে জটাবাবু তাঁকে জ্ঞানী করতে পারেন। বাস্তবে, বাংলা উপন্যাসে কেউ উনসত্তর বছরে প্রেমে পড়েছেন কি না জানা দরকার। তিনি আজ পর্যন্ত মেরে কেটে গোটা কুড়ি উপন্যাস

পাঠ করছেন। বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই কুড়ি হাজার উপন্যাস আছে। বাকিগুলো খুঁটিয়ে পড়া এ জীবনে সম্ভব নয়।

বিকেল পাঁচটায় জটাবাবু একাই পার্কের ঈশানকোণের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। সুযোগ পেয়ে প্রসঙ্গটা তুললেন পতিতপাবনবাবু। চোখ বন্ধ করলেন জটাবাবু,—প্রথমেই আপত্তি জানাচ্ছি। —জটাবাবু বললেন,—আপনি বলবেন প্রেমে পড়ার কথা। হোয়াই নট প্রেমে ওঠা? বাঙালির একটা টেন্ডেন্সি আছে পতনের দিকে। প্রেমে পড়া, সিনেমায় নামা, অলওয়েজ নিম্নমুখি। কথাটা হবে—প্রেমে ওঠা।

তা চিরকাল 'পড়া' শব্দটাই শুনেছেন, আজ 'ওঠা'-তে উঠতে একটু অস্বস্তি হল পতিতপাবনের।

জটাবাবু বললেন,—এই যে প্রেম, এ আপনাকে উজ্জীবিত করবে, রোমাঞ্চিত করবে, উদার করবে। এই ঘটনা আপনাকে জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করবে। এতকাল বদ্ধ জলে আটকে ছিলেন, এখন ঢেউ-এর দোলায় দুলবেন। এ পতন নয়, এ উত্থান। তাই 'প্রেমে ওঠা' বলবেন। কত বয়স?

—উনসত্তর।

—এঃ। একেবারে হাঁটুর বয়সি! কি জানতে চান, উনসত্তরে প্রেমে ওঠা যায় কিনা? রবিশংকর বিয়ে করেছিলেন উনসত্তর বছর বয়সে। বিয়ের আগে অনেক অসুখের খবর পেতাম, এখন দিব্যি আছেন বউ-এর সান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমে, মানে ভিক্টোরিয়ার প্রেমে উঠেছিলেন চৌষট্টিতে। তারপরের ওই নাবালিকার কেসটা ধরলে সত্তরে।—হাত নাড়ালেন জটাবাবু।

—বাংলা উপন্যাসে—

—দূর! বিভূতিভূষণ টু সমরেশ বসু, মারা গিয়েছেন উনসত্তরের অনেক আগে। কি করে নায়ককে ওই বয়সে নিয়ে যাবেন? তা ছাড়া তখনকার বাঙালি লেখকরা ছিলেন বিমল করের নায়কের মতো। কফ, কাশি, মাফলার, হাঁপানি, অজীর্ণরোগ আর বাঁদুরে টুপি। ওদের যৌবন তিরিশেই শেষ হয়ে যেত। এই যে রবীন্দ্রনাথ, 'নষ্টনীড়'-এর নায়ক কে? ভূপতি না অমল? ওঁর ইচ্ছে ছিল ভূপতিকে নায়ক বানানোর, কিন্তু যেহেতু তার বয়স তিরিশ পেরিয়েছে তাই অমল ক্রিম খেয়ে গেল। বিদেশে যান, আশি-পঁচাশিতেও লেখক-অভিনেতারা প্রেমে উঠছেন। বিয়ে করছেন। একই পৃথিবীর মানুষ তো আপনি। তাই না?—জটাবাবু পতিতপাবনকে উৎসাহিত করলেন।

পতিতপাবন পাল এখনও পর্যন্ত বিয়ে-থা করেননি। বাড়িতে একজনই আছেন যাঁর শাসন এখনও মান্য করতে হয় তাঁকে, তিনি তাঁর গর্ভধারিণী। ষোলোয় বিয়ে হয়েছিল, সতেরোতে তাঁকে জন্ম দিয়েছেন। ছত্রিশ বছরে বিধবা হন। এখন এই ছিয়াশিতেও কোনও হেলদোল নেই। বাড়ির বাইরে যান না বটে কিন্তু বাড়ির সব কাজ তাঁর নির্দেশেই কাজের লোক করে। মাঝে-মাঝে রান্নাঘরেও ঢোকেন। পঞ্চাশ বছরের বৈধব্যজীবন সত্ত্বেও দীক্ষা নেননি, বাড়িতে ঠাকুরঘর তৈরি করেননি। এককালের বড় চাকুরে পতিতপাবন নির্জীব হয়ে পড়েন জননীর সামনে গেলে। তা এই মহিলাকে প্রেমে ওঠার কথা না নিবেদন করলে তাঁর প্রেম পূর্ণতা পাবে না। কিন্তু এই কর্মটি করার হিম্মত পতিতপাবনের নেই।

বাড়ি ফিরে শুনলেন সন্ধ্যা মুখার্জির গান বাজছে মিউজিক সিস্টেমে। এই সাগরবেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক-একজন পুরোনো শিল্পীর গান এক ঘণ্টা শোনেন জননী। সাত দিনে সাতজন। আবার রিপিট হয়। এই সময় উনি কথা খরচ করেন না। ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকেন চোখ বন্ধ করে। পরদার ফাঁক দিয়ে আজও একই দৃশ্য দেখলেন পতিতপাবন। হচ্ছে তো প্রেমের গান অথচ প্রেমে ওঠার কথা ওঁকে বলতে পারছেন না।

এক ঘণ্টার গান শোনা শেষ হলে ডাক এল—পতিত, ফিরেছিস?

পতিতপাবন ঘরে ঢুকলেন,—হ্যাঁ মা।

—তুই নাকি সকালে হেঁটে এসে বাড়ির চা খাস না?

ধক্ করল বুকটা,—না, মানে, খেতে ভালো লাগে না।

—উঁহু, লক্ষণ ভালো নয়। খাবারে অরুচি হলেই বুঝবি শরীর খারাপ হতে যাচ্ছে। তার চেয়ে সকালে না হেঁটে বিকেলে আর একটু আগে বেরিয়ে হেঁটে নিস। —জননী রায় দিলেন।

—না-না। সকালে হাঁটলেই শরীরের উপকার হয়। এ নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না। —পতিতপাবন পালিয়ে বাঁচলেন।

ভোর পাঁচটায় তৈরি হয়ে নিলেন। বাইরের দরজা খুলে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে আপনা থেকেই সেটা এঁটে যায়। কিন্তু এই সময় জননী উঠবেনই।

—হাঁটতে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—তুই ফিরলে তবে চা খাব।

—আচ্ছা।

জননী দরজা বন্ধ করলেন। বাড়ি থেকে পার্ক মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ। সাদা কেডস, সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা জামা পরে উনসত্তরেও বেশ জোরেই হেঁটে এলেন পতিতপাবন। পার্কে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, প্রচুর লোক হাঁটা শুরু করেছে। মাঝখানের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। মাঠের ধার দিয়ে ডিমের মতো রাস্তা। হাঁটতে শুরু করলেন পতিতপাবন। আজ উলটোদিক দিয়ে।

আধাআধি যেতেই, যেখানে বড়-বড় দেবদারু গাছগুলো দাঁড়িয়ে, গলা কানে এল—এই যে, আমি এখানে।

তাকালেন। যাজ্ঞসেনী বসে আছেন বেঞ্চিতে। কিছুদূরে তাঁর পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। তার কাঁধে ফ্লাস্ক, হাতে বাস্কেট।

—গুডমর্নিং।—কাছে গিয়ে বললেন পতিতপাবন।

—মর্নিং। বেলা, সাহেবকে চা দে।

পতিতপাবন আপত্তি করলেন।

—সে কি? আমি মকাইবাড়ির চা নিয়ে এসেছি। লিকার, এক চামচ মধু দিয়ে তৈরি। না খেলে খুব দুঃখ পাব! ঠোঁট ফোলালেন যাজ্ঞসেনী।

—'মকাই বাড়ি'—বিড়বিড় করলেন পতিতপাবন।

—হ্যাঁ। দে বেলা।

বেলা নামের পরিচারিকা সঙ্গে-সঙ্গে কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিল।

—আপনি?

—এখন না, এর পরের বার। চিকেন স্যান্ডউইচ আছে আজ।

পতিতপাবন হাসলেন—বাব্বা! বেড়াতে এসে এত সময় পান?

—আগে তো করতাম না, এখন করি। যাজ্ঞসেনী বললেন,—আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না, কত জায়গা পড়ে আছে। বেলা, যা একটু ঘুরে আয়। আধঘণ্টার মধ্যে আসবি। যা।

যাজ্ঞসেনী হাত নাড়তেই বেলা উধাও হল।

আলাপ মাত্র দশদিনের। এই ভোরে হাঁটতে-হাঁটতে একটু জিরোচ্ছিলেন, পরিচারিকাকে নিয়ে যাজ্ঞসেনী এখানে এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি সঙ্গীতার স্বামী, না?

—না-না। আমি অবিবাহিত।

—ইয়ে, কিছু মনে করবেন না। কি ভুলটাই না করেছি।

—তাতে কি হয়েছে? আমি পতিতপাবন পাল।

—আমি যাজ্ঞসেনী দত্ত। উইডো। বিয়ের আগে বোস ছিলাম।

—ও। খুব স্যাড।—পতিতপাবন বললেন,

—স্যাড কেন?

—না, আপনার উনি চলে গেছেন।

—ভালোই হয়েছে। ক্যান্সারে ভুলছিল। যন্ত্রণা পাচ্ছিল খুব। আমার তখন অল্প বয়েস। এই ঊনচল্লিশ কি চল্লিশ। কুড়ি বছর হয়ে গেল।

—তাহলে অবশ্য ভালোই।

—চা খাবেন?

—চা?

—বেলা, সাহেবকে চা দে।

সেই আলাপ। তারপর প্রতিটি সকালে এক ঘণ্টার জন্যে দেখা, হাঁটা মাথায় উঠল। জানলেন যাজ্ঞদেবীর বয়স ঊনষাট। ছেলে-মেয়ে হয়নি। নিজের বাড়ি। অর্থাভাব নেই। গান শোনা আর বই পড়া ওঁর হবি। আর খাওয়াতে ভালোবাসেন। কিন্তু ভালোবাসলেই তো হল না, ভালো লোক চাই, যাকে খাওয়ানো যায়।

তাই ভোর না হতে-হতেই মন আনচান করে আজকাল। কখন যাজ্ঞসেনীর দেখা পাওয়া যাবে। এককালে যে সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়; স্লিভলেস পরেন। সেকালে হয়তো শাঁখের মতো ছিল হাত দুটো, এখন গজদাঁতের মতো। তাই বা কম কি!

—আমি আর পারছি না।—যাজ্ঞসেনী বললেন।

—কি ব্যাপার?—পতিতপাবন বুঝতে পারলেন না।

—দুষ্টু। কিছু বোঝেন না যেন!

—ও।

—আজই বাড়িতে আসতে হবে।

— বাড়িতে?

—হু। কোনও ভয় নেই। একতলায় বাবা থাকেন। বাতের ব্যথায় সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না, তাই দোতলায় আমি একা। কি একা!—যাজ্ঞসেনী বললেন।

—বাবা বেঁচে আছেন? কি ভালো?

—নাইন্টি! বাবা মানে আমার শ্বশুরমশাই। মাইডিয়ার মানুষ। ওঁকে বলেছি আপনার কথা। খুব খুশি হয়েছেন।

—খুশি হলেন কেন?

—বললেন, যাক, তবু তুমি সঙ্গী পেলে। শুনুন মশাই, আপনি আমার বাড়িতে না গেলে বাবা আপনার বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে প্রস্তাব দেবেন।

আঁতকে উঠলেন পতিতপাবন,—অসম্ভব!

—কেন? অসম্ভব কেন?

—আমার মা যে কি, মানে কত কড়া তা তো জানেন না!

—আশ্চর্য! ঊনসত্তর বছরেও আপনি শিশু হয়ে আছেন নাকি?

—না তা নয়—

—তার মানে মায়ের ভয়ে আপনি এগোবেন না?

—তা নয়—

—তা-নয় তা-নয় করছেন, ভয়টা কি? বলুন?

পতিতপাবন চুপ করে থাকলেন। সেটা দেখে যাজ্ঞসেনী সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,—সব

খুলে বলুন তো। আপনি আমার প্রেমে পড়েননি?

—না, প্রেমে উঠেছি।

—মানে?

জটাদার কথা বললেন পতিতপাবন। শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন যাজ্ঞসেনী, একবার পতিতপাবনের গায়েও ছোঁয়া লাগল। সেইসঙ্গে ভালো সেন্ট নাকে এল। পতিতপাবন বললেন,—ভাবছি আমি নিজেই মাকে বলব।

—গুড! এই তো চাই। আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসতে হবে, বাবা আলাপ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। যাজ্ঞসেনী ঘোষণা করলেন।

দরজা খুলল বেলা। দেখেই চ্যাঁচাল—এসে গেছেন! এসে গেছেন! মা এখন বাথরুমে। বসুন।

—কে রে বেলা? —বৃদ্ধের গলা কানে এল।

—ওই যে, সে!—বেলা কান পর্যন্ত হাসল। বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। পাকা আমের মতো দেখতে।

—পতিতপাবন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বউমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ?

—না, মানে—

—আবার 'না' কীসের? বসো। বে-থা করোনি শুনলাম।

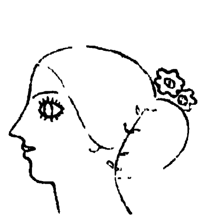
—হ্যাঁ। করা হয়ে ওঠেনি।

—এই কুড়ি বছরে অন্তত পনেরো জনকে দেখলাম। ম্যাক্সিমাম আয়ু যার ছিল, সে তিন সপ্তাহ এসেছিল। ব্যস।

—কেন?

—বউমা তো সতী-সাবিত্রী মহিলা। খাবার খাওয়াবে, গল্প করবে, যত্ন নেবে কিন্তু নিজের ঘরে একা শোবে আমার ছেলের ছবি নিয়ে। বিয়ের পর কোন পুরুষ সেটা সহ্য করবে বলো! আমার মতো বুড়োও করবে না। -ফিকফিক করে হাসলেন বৃদ্ধ।

পতিতপাবন আর দাঁড়ালেন না। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে পা বাড়ালেন। প্রেমে পড়লে গড়াগড়ি খেতে হয়, কিন্তু প্রেমে উঠলে তো উড়ে যাওয়া যায়। আর যাই হোক প্রেমে ওঠা তো ওলাওঠা নয়।



হঠাৎ হয়ে

দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে রবিবারের সকালটা কাটিয়ে দেওয়ার বিকল্প আর কিছু নেই ইন্দ্রজিতের কাছে। সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর এই সময়টা তার নিজস্ব, আরাম করার সময়। যোধপুর পার্কের এই বিরাট ফ্ল্যাটটার বাসিন্দা ছয়জন। ওরা তিনজন আর কার্মচারী তিনজন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে এটা মেনে নিতে পারত না ইন্দ্রজিৎ, এখন এটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এখন ইন্দ্রজিতের চোখ বন্ধ, পাশের টুলের ওপর তিন তিনটে খবরের কাগজ, পায়ের তলায় সুন্দর বেঁটে মোড়া।

একটা ঘর পেরিয়ে ছোট লাইব্রেরি রুমে তখন সুনেত্রা। ইন্দ্রজিতের পড়ার অভ্যেস এবং সময় না থাকলেও সুনেত্রার আছে। টিভি দেখতে ওর মোটেই ভালো লাগে না। কখনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান দেখালে সামনে গিয়ে বসে। সেই ছেলেবেলা থেকে যেসব বই পড়ে এসেছে তাদের একত্রিত করে রাখার ব্যাপারে সে সচেষ্ট। যে বইটি পনেরো বছর বয়সে পড়েছিল তার বিষয়বস্তুর আকর্ষণ তেমন না থাকলেও সেটি স্পর্শ করলে সেই দিনটিতে ফিরে যেতে পারে অনায়াসে। বাবার কিনে দেওয়া বইটিতে পনেরো বছরের হাতে লেখা নামটা এখন ওর কাছে বড় আদরের। বইগুলোতে ধুলো জমার কোনও সুযোগ নেই তবু ঝাড়ন বোলাচ্ছিল সুনেত্রা, এই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ছেলে, 'মাম।'

ছেলের বয়স উনিশ। ফরসা, সুন্দর চেহারা, ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। কথা বলতে গেলে মুখ তুলে তাকাতে হয়। যাদবপুরে পড়ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান। জয়েন্টে প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে ছিল।

'কিছু বলবি?' সুনেত্রা পথের পাঁচালিটা বের করল।

'আই অ্যাম ইন প্রব্লেম!' ছেলে বেঁকে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার?' মুখ তুলে তাকাল সুনেত্রা।

কাঁধ নাচাল ছেলে, ঠোঁট বেঁকাল, 'শি হ্যাজ মিস্‌ড হার মান্থ!'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠল সুনেত্রা।

'ইটস নট আওয়ার ফল্ট। হয়ে গেছে। টিলা খুব আপসেট। প্লিজ হেল্প হার। আমি সুইমিং-এ যাচ্ছি। বাই।' ছেলে বলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড শরীর অসাড়, শুধু বুকের ভেতরটা দুমড়ে উঠেছে। ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপর মাথা খারাপ হয়ে গেল সুনেত্রার। পথের পাঁচালিকে যথাস্থানে না রেখে সে দ্রুত বেরিয়ে এসে কমলাকে দেখতে পেল, 'বাবি কোথায়?'

'ছোটবাবু তো বেরিয়ে গেল!'

সুনেত্রা নিশ্বাস নিতে পারছিল না। এত বড় কাণ্ড করে কীরকম নির্লিপ্ত গলায় বলে গেল, সাহায্য করো। মাথা ঝিমঝিম করছিল সুনেত্রার। বেডরুমে গিয়ে সে শুয়ে পড়ল। মাস তিনেক আগে ডাক্তার বলেছিল, আপনার প্রেসারটা গোলমাল করছে ম্যাডাম, এখন থেকে রোজ অ্যামটাফ ফাইভ আর ইকোস্পিন সেভেন্টি ফাইভ খেয়ে যেতে হবে যতদিন বাঁচবেন। ওই ওষুধ দুটো ব্রেকফাস্টের পর খেয়ে সে বেশ ভালোই ছিল। এখন মনে হচ্ছে পায়ের তলা ঝিমঝিম করছে, মাথা ঘুরছে। মিনিট দশেক চুপচাপ শুয়ে থাকতে-থাকতে টিলার মুখ মনে পড়ল। মেয়েটাকে মাত্র একদিন দেখেছে সে। ছেলের সঙ্গে পড়ে। খুব ভালো মেয়ে। প্রায় পুতুলের মতো দেখতে। ছেলের থেকে তিন নম্বর বেশি পেয়েছিল জয়েন্টে। জনা চারেক ছেলেমেয়ে আধঘণ্টার জন্যে এসেছিল, তখন আলাপ হয়েছিল টিলার সঙ্গে। খুব মিষ্টি আর শান্ত বলে মনে হয়েছিল ওকে। ব্যস এটুকুই।

সুনেত্রা উঠল।

দক্ষিণের বারান্দায় যেতেই ইন্দ্রজিৎ ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ইটস টু মাচ। তোমার ছেলেকে আমি বারবার বলেছি গাড়িতে হাত না দিতে কিন্তু ওটা ওর কানে ঢুকছে না। একটু আগে কাউকে কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল!'

'চাবিটা তোমার কাছে রাখলে কী অসুবিধে হয়!'

'আশ্চর্য! আমার বাড়িতে আমি চোরের ভয়ে জিনিস লুকিয়ে রাখব? ও যে কথা শুনছে না সেটা তোমার নজরে পড়ছে না?' সোজা হল ইন্দ্রজিৎ, 'এইজন্যেই বলে বেশি আদর দিলে মাথায় চড়ে বসে। আমার বাবা কোনও নিষেধ করলে আমি সেটা অমান্য করার কথা ভাবতেই পারতাম না। গায়ে হাত তোলা যাবে না, বলে লাভ হচ্ছে না, এখন শুধু গিলে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, গেলা ছাড়া আর উপায় কি?' দ্বিতীয় চেয়ারটিতে বসল সুনেত্রা।

'গত রবিবার দু-দুটো অ্যাকসিডেন্ট করেছে। বললেই বলে অন্য গাড়ির দোষ। কিন্তু আমার পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে গ্যারাজের বিল মেটাতে। তাও যদি পুরোনো অ্যাম্বাসাডারটা নিত গায়ে লাগত না, ওর এস্টিম ছাড়া নবাবি দেখানো চলবে না। তা ছাড়া আজকাল ওর কথাবার্তা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

স্ত্রীর দিকে তাকানোয় গলার স্বর বদলে গেল ইন্দ্রজিতের, 'তোমার কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'চেপে যাচ্ছ কেন? প্রেসার বেড়েছে?'

'জানি না। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

'কি ব্যাপার বল তো?'

সুনেত্রা চুপচাপ সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। বুকের ভেতরটা কীরকম করছিল তার। তারপর বলল, 'একটা কথা রাখবে?'

'আশ্চর্য! কথাটা কী তা বলবে তো?'

'না। আগে তোমাকে কথা দিতে হবে।'

অস্বস্তিতে মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ। তারপর মেনে নিতে বাধ্য হল, 'ঠিক আছে।'

'আমি যা বলব তা শুনে তুমি উত্তেজিত হবে না।' সুনেত্রা নিশ্বাস ফেলল, 'এখন আমাদের যা করার মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে।'

ইন্দ্রজিৎ চোখ বড়-বড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। সুনেত্রার কথা বলার ধরন তার ভালো লাগছিল না। খুব বড় রকমের কাণ্ড না হলে সুনেত্রা এমনভাবে কথা বলবে না।

'তুমি তো টিলাকে চেনো না।' সুনেত্রা বলল।

'টিলা? কে টিলা?'

'বাবির সঙ্গে পড়ে।'

'অ। তো কি হয়েছে তার?'

'টিলা সম্ভবত কনসিভ করেছে।' নিচু গলায় বলল সুনেত্রা।

'সে কি! নিশ্চয়ই বিয়ে হয়নি?'

'আশ্চর্য! এই তো স্কুল থেকে বেরিয়ে জয়েন্ট দিয়ে বাবির সঙ্গে পড়ছে।'

'দ্যাখো, কী অবস্থা! এইটুকু মেয়ে কোথায় নেমে গেছে। ভাগ্যিস তোমার মেয়ে নেই, ছেলেকে নিয়ে একরকম সমস্যা, মেয়ে থাকলে তো—! ওর বাবা-মা জানেন?' ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করল।

'জানি না। বোধহয় জানে না।'

'কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

'বাবি বলল।'

'বন্ধুকে জানিয়েছে অথচ নিজের বাবা-মাকে জানায়নি! তা এ নিয়ে তোমার এত আপসেট হওয়ার কী কারণ আছে। এটা ওর মা-বাবার সমস্যা, তোমার নয়।'

'আমাদেরও।'

'তার মানে?' ইন্দ্রজিতের গলা আচমকা শুকিয়ে গেল।

'তোমার ছেলে বলল, ইটস নট আওয়ার ফল্ট, হয়ে গেছে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রজিৎ।

'চিৎকার কোরো না।'

'কী বলছ তুমি? ওইটুকুনি ছেলে, উনিশ বছর বয়স, জুতো মেরে ওর মুখ ভেঙে দেব

আমি। কোনওদিন গায়ে হাত দিইনি বলে—। ওঃ হারামজাদা আমাকে পাগল করে দেবে। কোথায় গিয়েছে সে, জানো?'

'কেন? সেখানে যাবে?'

'হ্যাঁ যাব। আমি ওকে এমন শাস্তি দেব যা জীবনে ভুলবে না। আমার ছেলে ব্রিলিয়ান্ট, হান্ডসাম, স্মার্ট শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ছেলে যে একটি অবাধ্য বাঁদর তাই এতদিন জানতাম। কিন্তু—, কোথায় গেছে সে?' উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। তার মুখের চেহারা বদলে গেছে।

'বোসো!'

'সুনেত্রা!'

'আমি তোমাকে অনুরোধ করেছি উত্তেজিত না হতে।'

'আরে, এই কথা শোনার পর আমাকে তুমি শান্ত হতে বলছ? ওইটুকুনি ছেলে, সবে স্কুল ছেড়েছে, কখন ক্রিমিনাল হয়ে গেল! আমার ছেলে রেপ করেছে আর আমি শান্ত হয়ে বসে থাকব?' ইন্দ্রজিৎ আবার বসে পড়ল।

'রেপ বলছ কেন?' নিচু গলায় বলল সুনেত্রা।

'ওই হল!' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'এই সেদিন জন্মাল, চোখের ওপর বড় হতে দেখলাম, সে কি না—! তোমার কাছে সোজাসুজি বলল?'

'হ্যাঁ। এটাই প্লাস পয়েন্ট, লুকোয়নি।'

'আশ্চর্য! আমি খুনটুন করে এসে লুকোলাম না, আমার সাত খুন মাপ হয়ে যাবে? আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল।'

'কখন?'

'একটা বাচ্চা, কোনও ভাইবোন নেই, এদের বেশিরভাগই শয়তান হয়। এই যে মুখার্জির ছেলেটা, ব্রিলিয়ান্ট বয়, কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারের জন্যে বাপমাকে ফেলে চলে গেল। এখন শুনেছি ফোন পর্যন্ত করে না।'

'অন্যের কথা না ভেবে কী করা যায় চিন্তা করো।'

'মেয়েটা কে?'

'ওর সঙ্গে পড়ে।'

'কীরকম ফ্যামিলির মেয়ে? তোমার ছেলেকে নিশ্চয়ই কলেজে ঢোকার পর চিনেছে, এর মধ্যেই এতটা এগিয়ে গেল? বাপ-মায়ের কোনও শিক্ষা নেই?'

'সেটা তোমার ছেলের ক্ষেত্রেও তো বলা যায়।'

'আমার ছেলে বলবে না।'

'ছেলে তো আমার একার হতে পারে না।'

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ কথা বলল না। সুনেত্রাও চুপ করে বসে রইল। ইন্দ্রজিতের মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরটা কীরকম হু-হু ফাঁকা হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত সে কথা বলল, 'ব্যাপারটা হয়েছে কোথায়?'

'আমি জানি না। বলেনি।'

'এই বয়সে হোটেলে ঢুকেছে। ভাবো। ভেতরে-ভেতরে কত বড় ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠেছে। উঃ। কখন আসবে কিছু বলে গেছে?'

'না।' সুনেত্রা বলল, 'শুধু বলেছে মেয়েটাকে সাহায্য করতে।'

'সাহায্য করতে? আমরা কী সাহায্য করব? যাদের মেয়ে তারা করবে। মেয়েটার বাবা-মা জানে?'

'আমি কিছু জানি না। বললাম তো কথাটা শুনে এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম যে—। তা ছাড়া বলেই ও সুইমিং-এ চলে গিয়েছিল।'

'সুইমিং? আমি ক্লাবে ফোন করছি।'

'দাঁড়াও। ও তো ব্যাপারটা নাও বলতে পারত।'

'না বলে উপায় নেই। বিয়ে করে খাওয়াতে হলে বাপের হোটেলে বউকে নিয়ে আসতে হবে। অতএব বলতে বাধ্য। অতএব ওই উনিশ বছরের ছেলের বিয়ে দাও। বাকি জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাক।'

'বিয়ে ছাড়া কি অন্য কোনও উপায় নেই?'

'অন্য উপায়? অ। সেটার জন্যে তোমাকে বলার কি দরকার? নিজেরা যখন অতটা এগিয়েছে তখন বাকিটাও পারবে। কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে এখন ওসবের ব্যবস্থা আছে।' বিরক্তিতে স্থির হতে পারছিল না ইন্দ্রজিৎ।

'নিশ্চয়ই সাহস পায়নি। পেলে বলত না, আমরা জানতেও পারতাম না। তুমি ওকে ক্রিমিন্যাল বলছ, পুরোপুরি তাই হলে আমাদের জানাত না।'

সুনেত্রার বক্তব্য অস্বীকার করতে পারল না ইন্দ্রজিৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মেয়েটা ওর সঙ্গে পড়ে। তার মানে সমান বয়স। বড়ও হতে পারে। না হলেও সমবয়সি ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি ম্যাচিয়োর্ড হয়। ওই মেয়েটা ইন্টেনশনালি করেনি তো?'

সুনেত্রা উঠে দাঁড়াল, 'তোমার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে!'

ছেলে ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পরে। স্নান সেরে ঝকঝকে হয়ে। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কপালে ভাঁজ পড়ল তার, 'কিছু বলবে?'

ইন্দ্রজিৎ হতভম্ব হয়ে গেল। এতবড় একটা কাণ্ড করার পর এই গলায় প্রশ্নটা করে কি করে? এই সময় সুনেত্রা ঘরে ঢুকল, 'বোস, কথা আছে।'

ছেলে বলল, 'তাড়াতাড়ি বলো, কুইজটা শুনতে হবে।'

সুনেত্রার গলার স্বর বদলাল, 'তোমাকে এখন এখানেই বসতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসল ছেলে, ইন্দ্রজিতের উলটো দিকে।

'তুমি যা বলে গেলে সেটা সত্যি?' সুনেত্রা জিগ্যেস করল।

'বাঃ, মিথ্যে বলব কেন?'

'তো-তোর লজ্জা করছে না এইভাবে কথা বলতে। ইউ-ইউ!' ইন্দ্রজিতের কথা জড়িয়ে গেল। সুনেত্রা বলল, 'প্লিজ, আমাকে কথা বলতে দাও।'

ছেলে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না। মিথ্যে কথা বলব কেন! বলে আমি কি খুব অন্যায় করেছি। বাবা এত এক্সাইটেড হয়ে পড়েছে কেন?'

সুনেত্রা হাত তুলল, 'তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না কাজটা অন্যায় হয়েছে?'

'ওয়েল, এখন মনে হচ্ছে।' ছেলে মাথা নাড়ল, 'বাট উই নেভার থট অফ ইট।' টিলা এখন এতটা আপসেট যে মনে হচ্ছে অন্যায় হয়েছে।'

'ওর বাবা-মা জানে?' সুনেত্রা প্রশ্ন করল।

'ওঃ, নো। জানলে ওর বাবা ওকে কেটে ফেলবে।'

'ফেলাই উচিত। শুধু ওকে নয়, তোমাকেও।' ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করল।

সুনেত্রা বলল, 'প্লিজ।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'টিলা ওর মাকে বলছে না কেন?'

'মায়ের কোনও ভয়েস নেই। শুনলেই বাবাকে বলে দেবেন।'

'কিন্তু এটা তো বেশিদিন গোপন করে রাখা যাবে না।'

'জানি! আমি অলরেডি স্টাডি করেছি। তাই তো তোমাকে সাহায্য করতে বললাম।'

'কিন্তু আমরা কীভাবে সাহায্য করব? যাদের মেয়ে তারা যদি না করে!'

সুনেত্রার কথার পরেই প্রশ্ন করল ইন্দ্রজিৎ, 'কোথায় গিয়েছিলি? কোন হোটেলে?'

'হোটেলে? হোটেলে যাব কেন?' অবাক হল ছেলে।

হতাশ চোখে ইন্দ্রজিৎ সুনেত্রার দিকে তাকাল।

'ব্যাপারটা কি করে হল তোর বাবা জানতে চাইছে।'

'তাই বলো। সুভদ্রদের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। জাস্ট আড্ডা মারতে। সুভদ্রর বাবা-মা বাড়িতে ছিল না। ওরও কোথাও যাওয়ার দরকার ছিল। আমাদের বলেছিল ঘণ্টাখানেক বাড়ি পাহারা দিতে। ওয়েল, হঠাৎই, বিশ্বাস করো, কোনও প্ল্যান ছিল না। জাস্ট হ্যাপেন্ড।'

'বাড়িতে চাকরবাকর ছিল না?' ইন্দ্রজিতের গলা ফ্যাসফেসে শোনাল।

'দোতলায় না ডাকলে ওরা ওঠে না।'

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল, 'শোনো, তোমার এখানে থেকে পড়ার দরকার নেই। ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, দিল্লি যেখানে হোক চলে যাও পড়তে। তোমার এখানে থাকা চলবে না।'

'বাঃ। আমি এখন ওসব জায়গায় অ্যাডমিশন পাব? কবে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তা-ছাড়া আমি চলে গেলেই টিলার প্রব্লেম সল্‌ভ হবে?'

'সেটা টিলার প্রবলেম।'

'না। আমাদেরও। আমারও।' ছেলে উঠে দাঁড়াল।

সুনেত্রা কথা বলল, 'ঠিক আছে, আমি টিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে এখানে আসতে বল।'

সোমবার বিকেলে যখন ছেলের সঙ্গে টিলা বাড়িতে এল তখন ইন্দ্রজিৎ অফিসে। এক নজরেই সুনেত্রা বুঝতে পারল মেয়েটার মুখ শুকনো। বসতে বলে কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এমন বোকামি করলে কেন?'

টিলা বাবির দিকে তাকাল, কাঁধ ঝাঁকাল।

'ক'টা মাস মিস করেছ?'

'একটা।'

'এটা অন্য কারণেও হতে পারে।'

মাথা নাড়ল টিলা, 'না। আমি ইউরিন পরীক্ষা করিয়েছি।'

'সে কি? তুমি নিজে প্যাথলজিতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। অন্য নাম বলেছিলাম।'

'তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে এতবড় ভুল করতে পারে ভাবা যায় না।'

'ওর একার দোষ নেই মা? ইনফ্যাক্ট ওর ইচ্ছে ছিল না। আমি ইনসিস্ট করলাম বলেই।' বাবি বলল।

ছেলের দিকে তাকাল সুনেত্রা। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলাতে পারল সে। এরা কি নির্লজ্জ না যা বলছে তার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না?'

টিলার দিকে তাকাল, সে, 'তোমার মাকে বলছ না কেন?'

'আমার মায়ের কোনও পার্সোনালিটি নেই। ওঁকে বললেই বাবা জানবে। বাবা এটাকে কিছুতেই মেনে নেবে না।' টিলা বলল।

'কী করবেন?'

'আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

'নিজের একমাত্র মেয়েকে কেউ বাড়ি থেকে বের করে দেয় না।'

'আপনি জানেন না আন্টি, বাবা পারেন।'

'তাহলে তো এই ব্যাপারটাকে আইনসঙ্গত করতে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়।' অন্যমনস্ক গলায় বলল সুনেত্রা।

'ইম্পসিবল।' মাথা ঝাঁকাল টিলা।

'মানে?'

'আপনি কি বিয়ের কথা ভাবছেন?' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল টিলা।

'এটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি না। কী আশ্চর্য! বিয়ে করব কেন?'

অবাক হয়ে গেল সুনেত্রা, 'মানে?' তোমরা, ভালোবাসো, অথচ—।'

'না তো। ভালোবাসি কে বলল?' উই আর নট ইন লাভ। কিরে, বল না আমি যা বলছি ঠিক কি না!' টিলা বাবির দিকে তাকাল।

'ঠিক।' বাবি মাথা নাড়ল।

হতভম্ব হয়ে গেল সুনেত্রা, 'সে কি?'

টিলা বলল, 'ওকে দেখে কখনই মনে হয়নি ভালোবাসব। এই রকম, কোনও চিন্তা মাথাতেই আসেনি।' টিলার গলায় জোরাল প্রতিবাদ।

অসহায় চোখে ওদের দেখল সুনেত্রা। তারপর বলল, 'তুমি তো যথেষ্ট বড় হয়ে গেছ। সমস্যার সমাধান নিজেই করে নাও।'

চোখ বন্ধ করল টিলা, 'আমার ভয় লাগছে আন্টি।'

'আশ্চর্য! অতটা এগোতে পেরেছ যখন তখন এটাও পারবে।' সুনেত্রা মাথা নাড়ল।

টিলা বাবির দিকে তাকাল। বাবি বলল, 'মা, প্লিজ! উই ডোন্ট নো এনি প্লেস। যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়—।'

'তুমি কি চাও তোমার মা-বাবাকে না জানিয়ে তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাব আমি? এটা কত বড় অন্যায় জানো?' সুনেত্রা রেগে গিয়ে প্রশ্ন করল টিলাকে।

'কেন? অন্যায় কেন? আমি এখন অ্যাডাল্ট। আমার সব কাজের জন্যে মা-বাবাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, না দিলে অন্যায় হবে কেন?' টিলা বলল।

'তোমাদের বোঝানো শিবের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আমি ভাবি। কিন্তু যদি তাই করি তাহলে একটা কন্ডিশনে করব!'

'বলুন!' টিলা তাকাল।

'তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

'সম্পর্ক মানে?' বাবি জিজ্ঞাসা করল।

'তোমরা আর কখনও পরস্পরকে মিট করবে না।'

'বাঃ, কলেজে গেলেই তো দেখা হবে।'

'সেটা হোক। কিন্তু ক্লাসের বাইরে কথা বলবে না।'

টিলা মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, নো প্রবলেম অ্যান্টি।'

কথাগুলো শোনার পর ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছ না যে?'

এখন সবে সন্ধে পেরিয়েছে। অফিস থেকে ফিরে সদ্য শেষ করা চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এদের কেউ বুঝতে পারবে না।'

বোঝাবুঝি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। মেয়েটার তো সর্বনাশ হবে।'

'আমাদের কি দায়িত্ব আছে?' ইন্দ্রজিৎ তাকাল।

'আছে। যদি উলটোপালটা জায়গায় গিয়ে অ্যাবরশন করিয়ে খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে তো পুলিশ তোমার ছেলেকে ধরবে।' সুনেত্রা বলল।

'আমাব ছেলে বোলো না।' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'আমি ওর ব্যবস্থা করেছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'ওকে এখানে রাখব না। চেন্নাইতে পাঠিয়ে দেব। ওখানে সেসন দেরিতে আরম্ভ হয়। কম্পিউটার ওখানেও শিখতে পারবে।' ইন্দ্রজিৎ বলল।

'তুমি পাগল হয়ে গেলে? যে ছেলে জয়েন্ট দিয়ে যাদবপুরে সুযোগ পেয়েছে তাকে পাঠাবে একটা কম্পিউটার স্কুলে পড়তে?' সুনেত্রা আঁতকে উঠল।

'ওর ওই ট্রিটমেন্ট দরকার।' মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ, 'ভালোবাসাবাসি নেই অথচ ওটা হয়ে গেল। এ তো পশুদের মধ্যে হয়।'

'আমার কিন্তু মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে।'

'মানে?'

'একটা মেয়ে এমন সমস্যায় পড়েও সত্যি কথাটা বলছে এটা ক'জন পারে? ও বাবিকে ভালোবাসে না, বাবিও না। কিন্তু এখন তো বলতেই পারত ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে হবে বাবিকে। সেটা তো বলেনি।' সুনেত্রা বলল।

'হুম!'

'শোনো, ডক্টর চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলব?'

'কী বলব?'

'একটা ব্যবস্থা করে দিতে—।'

'চমৎকার বুদ্ধি! ছেলে একটা কাণ্ড করে ফেলেছে অতএব আপনি মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। এই বলবে?'

'তুমি আমার সব কথার খুঁত ধরো অথচ নিজে কোনও রাস্তা বলবে না।

'দ্যাখো, মেয়েটা নাবালিকা নয়। তুমি ওকে নিয়ে সোজা কোনও নার্সিংহোমে যেতে পারো। তোমার মেয়ে পরিচয় দিয়ে মুক্ত করিয়ে আনতে পারো। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? ওর মা-বাবা যদি জানতে পারেন তাহলে কী কৈফিয়ত দেবে?'

'ঠিকই! তা ছাড়া যদি নার্সিংহোমে খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে তো হাতে হাতকড়া পড়বে।' শিউরে উঠল সুনেত্রা।

'আরও আছে। এই ঘটনাটা মেয়েটাকে ভবিষ্যতে বিপদে ফেললেও ফেলতে পারে। না-না, ওকে বলো নিজের বাপ-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

সুনেত্রার কথাটা বলতে খারাপ লাগছিল। কিন্তু চোখ-কান বুজে পরের সকালে ছেলেকে জানিয়ে দিল।

দিন চারেক বাদে বাবি কলেজে কীসব অনুষ্ঠান আছে বলে সকাল-সকাল বেরিয়ে যাওয়ার পরেই ফোনটা বাজল। সুনেত্রা ফোন ধরল।

'নমস্কার। আমি টিলার মা।'

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সুনেত্রার, 'ও হো। নমস্কার।'

'টিলা আপনাদের বাড়িতে পৌঁছেছে?'

'না, মানে—।'

'ওকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ও গেলে প্লিজ বলে দেবেন যাতে ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। নইলে ওর বাবা রাগারাগি করবেন।'

'আচ্ছা!'

'আপনাদের কথা শুনেছি, আলাপ হয়নি, একদিন আসুন না।'

'ঠিক আছে, বেশ তো—।'

রিসিভার নামিয়ে স্বস্তি পেল সুনেত্রা। ভদ্রমহিলা এখনও কিছু জানেন না। কিন্তু টিলার কি এ-বাড়িতে আসার কথা আছে? কই, বাবি কিছু বলে যায়নি তো! কেন আসবে! কেন আসবে? যা বলার বাবিকেই বলে দেওয়া হয়েছে, নতুন কিছু তো বলার নেই। তারপরেই খেয়াল হল, বাবি গিয়েছে কলেজের অনুষ্ঠানে। সারাদিন হবে। নিশ্চয়ই টিলা সেখানে যাবে। হয়তো যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা বলে যেতে চায়। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও অজুহাত দিয়েছে এখানে আসার ব্যাপারে।

বিকেল তিনটে নাগাদ ফোন এল, 'মা, কী করছ?'

'কী করছি মানে? তুই কোথায়?'

'নার্সিংহোমে। এক্ষুনি চলে এসো। এটা থার্টি থ্রি বাই সি পার্কসার্কাস স্ট্রিট। নার্সিংহোমের নাম সানফ্লাওয়ার—প্লিজ।'

'তুই নার্সিংহোমে কী করছিস? সুনেত্রা অবাক।

'টিলার জন্যে। এভরিথিং সেট্‌লড। কিন্তু তোমাকে আসতে হবে। মা, প্লিজ।'

এভরিথিং সেট্‌লড? তার মানে ওরা নিজেরা গিয়ে সবকিছু করিয়েছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল সুনেত্রা। কোনও মতে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন হল?'

'আজ সকালে। এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল, একটু ঘুমিয়েছে।'

'এখন?'

'কথা বলছে, তবে এখনও পুরো ফিট নয়।' হঠাৎ রাগ হয়ে গেল সুনেত্রার, 'আমি গিয়ে কী করব?'

'নার্সিংহোমে বলেছি রিলিজের সময় মা আসবে।'

'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।' টেলিফোন রেখে দিল সুনেত্রা। কয়েক মিনিট পর ভাবনাটা মাথায় এল। একবার ভাবল স্বামীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবে কী করা উচিত। এমন হতে পারে ওদের কাছে নার্সিংহোমের বিল মেটানোর মতো টাকা নেই। তাহলে তো বিরাট সমস্যায় পড়বে। মেয়েটার যে কিছু হয়নি সেটা জেনে অবশ্য ভালো লাগছে। কিন্তু বাড়িতে যখন ফিরবে তখন মায়ের চোখে ধরা পড়ে যাবে না? সুনেত্রারই কীরকম ভয়-ভয় করতে লাগল।

শেষপর্যন্ত আর পারল না সে। গাড়ি দুটো, কিন্তু ড্রাইভার একটা—যে ইন্দ্রজিতকে অফিসে নিয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে সুনেত্রা পৌঁছাল নার্সিংহোমে গেটেই ছেলে দাঁড়িয়ে? তাকে দেখতেই মুখ হাসিতে ভরে গেল। সুনেত্রা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'তিন নম্বর কেবিনে। চলো।' পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ছেলে।

টিলা শুয়েছিল, চোখ বন্ধ। সুনেত্রা ঢুকতেই চোখ খুলল। দেখে উঠে বসল চট করে। সুনেত্রা বাধা দিল, 'আরে, উঠছ কেন? শুয়ে থাকো।'

'না। না। আই অ্যাম ওকে, ফাইন।'

'কিন্তু তোমার চোখে ঘুম আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ।'

এই সময় একজন নার্স ঢুকল, কেবিনে, 'ও কিছু নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কেটে যাবে। তারপর দেখবেন ঘুমোবে। কাল সকালে ওকে দেখে বুঝতেই পারবেন না।'

'আজই ছেড়ে দেবেন?' সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ও এখনই চলে যেতে পারে। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে না হয় থাকুক।'

নার্স চলে গেলে সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল, 'বিল কত হয়েছে?'

'তোমার কাছে টাকা ছিল?'

বাবি বলল, 'ফিফটি-ফিফটি দিয়েছি। এখন আমি বেগার।'

'তাহলে আমাকে ডাকলি কেন?'

'আন্টি, প্লিজ একটা অনুরোধ করব?' টিলা অনুনয় করল।

সুনেত্রা তাকাল, কথা বলল না।

'আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?'

'তোমাকে? কেন?'

'আপনি জাস্ট বলবেন দুপুরে আজেবাজে খেয়ে আমার পেটে গোলমাল হয়েছে। আপনার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। আপনি ওষুধ দিয়েছেন। এখন ভালো আছি। ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাব। তাই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।'

'আমি এত মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'আমাকে বাঁচাতে। নইলে মা-বাবা ঠিক—।'

সুনেত্রা ভাবল। এমন তো হতেই পারে। টিলাকে তো সে নার্সিংহোমে নিয়ে আসেনি। ভেবে বলল, 'একটাই শর্ত, যা আগে বলেছি, তোমরা আর ক্লাসের বাইরে দেখা করবে না।'

'ডান।' বাবি বলে উঠল। টিলাও মাথা নাড়ল।

টিলার বাবা ছিলেন না। ওর মা ব্যস্ত হলেন মেয়েকে দেখে, 'কী হয়েছে?'

টিলা বলল, 'কিছু হয়নি। সুনেত্রা আন্টি!'

সুনেত্রা বলল, 'যাও রেস্ট নাও।' তারপর বলল, 'আজ সকালেই আপনার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হল, তখন ভাবিনি বিকেলে দেখা হবে। আসলে হয়েছে কি আপনার মেয়ে কলেজের অনুষ্ঠানে উলটোপালটা কিছু বোধহয় খেয়েছিল। আমার বাড়িতে এসে বমি করল। আমি ডাক্তারকে ফোন করে ওষুধ আনিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। এখন ভালো আছে। বললাম একা ছাড়ব না, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

'খুব ভালো করেছেন। এত করে বলেছি বাইরের খাওয়ার খাবি না, কথা শোনে না।'

'ওকে এখন ঘুমোতে দিন, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে।' সুনেত্রা হাসল, 'আচ্ছা, চলি।'

'সেকি! আপনি প্রথম এলেন, একটু বসুন, চা খান।'

'না-না। ওসব আর একদিন হবে। জরুরি কাজ আছে। আচ্ছা নমস্কার।' সুনেত্রা যেন পালিয়ে এল, এসে বাঁচল।

রাত্রে স্বামীকে ঘটনাটা বলতে গিয়েও পারল না সুনেত্রা। প্রতিক্রিয়া কি হবে কে জানে। কিন্তু ছেলের জন্যে এটুকু না করলে টিলার ক্ষতি হত, কথাটা ইন্দ্রজিৎ বুঝতে চাইবে না।

দিন সাতেক বাদে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'সামনের সোমবার তোমার ছেলেকে চেন্নাই পাঠাব। হ্যাঁ, মেয়েটার খবর কি?'

'ঠিক আছে।'

'তার মানে?'

'মুক্তি পেয়ে গেছে।'

'সেকি? ওর মা-বাবা হেল্প করলেন?'

'না, নিজেরাই।'

'মাই গড। তোমার ছেলে এতবড় তালেবর হয়ে গেছে যে মেয়েটাকে নার্সিংহোমে নিয়ে

গিয়ে—। ওই বয়সে আমি কল্পনাই করতে পারতাম না। ওকে ডাকো। এখনই। কথা বলব।' ইন্দ্রজিৎকে হিংস্র দেখাল।

'এসব ব্যাপারে কথা না বললে নয়?'

'এসব ব্যাপারে কথা বলতে আমার ঘেন্না করবে। ওকে চেন্নাই-এর কথা বলব। প্রসপেক্টাস আনিয়েছি, দেব।'

সুনেত্রা অবাক হল। বাবি চেন্নাই-এর প্রস্তাব শুধু মেনেই নিল না, যাওয়ার জন্যে বেশ উৎসাহী হল। চেন্নাই-এর কলেজে কম্পিউটার নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে নাকি অনেক বেশি এক্সপোজার পাওয়া যাবে। সুনেত্রারও মনে হল, এই ভালো। প্রথম বয়সের ভুলটাকে ভুলে যেতে পারবে ওরা। নিত্য ওদের সমস্যায় জড়াতে হবে না তাকে।

ক'দিন থেকেই টেলিফোন ঘন-ঘন বাজছে। চেন্নাই চলে যাবে বলে বন্ধুরা ফোন করে যাচ্ছে। ছেলে চেঁচিয়ে কথা বলছ। কেউ আপত্তি জানালে উড়িয়ে দিচ্ছে। একটু আগে যে টেলিফোনটা এল সেটা ধরে ছেলে কথা বলছিল হইহই করে, হঠাৎ গলা নেমে এল। তারপর ছেলে এল সুনেত্রার কাছে, 'মা তোমার ফোন!'

'কে?'

ছেলে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রিসিভার তুলল সুনেত্রা, 'হ্যালো।'

'আন্টি। আমি টিলা।'

'ও। কি খবর? কেমন আছ?'

'আন্টি, আজ আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বলল ও এখান থেকে চলে যাচ্ছে চেন্নাই-তে। কেন?'

'বেটার এক্সপোজার পাবে, তাই বোধহয়।'

'কথাটা ও তো আমাকে জানাতে পারত।'

'আমি তো তোমাদের নিষেধ করেছিলাম।'

'কেন?'

'আশ্চর্য? তোমরা দুজনে দুজনাকে ভালোবাসো না, মিছিমিছি কেন যোগাযোগ রাখবে? রাখলেই তো অতীতটা মনে পড়বে।'

'বাট আন্টি—!'

'তুমি কিছু বলবে?'

'আই হ্যাভ ডিসকভার্ড সামথিং।'

'কী সেটা?'

'আমি ওকে ভালোবাসি। রিয়েলি, বিশ্বাস করুন।'

'টিলা—।'

'হ্যাঁ আন্টি! ইটস লাইক এ আবিষ্কার!'

'তুমি কি বলছ?'

'আমি একদম ঠিক বলছি। কথাটা আমি ওকে বললাম। অদ্ভুত ব্যাপার, ও নাকি এটা ডিসকভার করেছে বলে চেন্নাই-এ যাওয়ার কথা আমাকে জানাতে পারেনি।'

'তুমি কি চাইছ ও চেন্নাই-তে না যাক?' সুনেত্রা জিজ্ঞাসা করল।

'নট দ্যাট। ভালো হলে ও যাক। কিন্তু অ্যান্টি, আমি যদি মাঝে-মাঝে আপনাকে ফোন করি, আপনার আপত্তি আছে?'

'না। নেই। তোমার ফোন পেলে খুশি হব।'

রিসিভার নামিয়ে ছেলের দিকে তাকাল সুনেত্রা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'টিলা কী বলল তুই বুঝতে পেরেছিস?'

মাথা নাড়ল ছেলে, 'ইটস নট আওয়ার ফল্ট, মা। হঠাৎ হয়ে গেল। আমি চেন্নাই চলে গেলে প্লিজ হেল্প হার। করবে তো?'

দায়মুক্ত

কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই হাঁপিয়ে উঠলেন রজতাভ। কাঁহাতক চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বসে থাকা যায়! সেই ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙার পর নিজে চা তৈরি করেন। কলকাতায় থাকলে শিখাকে ডেকে চায়ের কাপ ওর মাথার পাশে রাখতেন। শিখা উঠে পড়ত। এখানে শিখার ঘুম ভাঙে ঠিক সাতটায়। উঠেই ছেলের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ছোটে। রঙ্গন অফিসে বের হয় ঠিক আটটায়। দু-মাস আগে বউমাও যেতেন। মাস খানেক আগে বাচ্চা হওয়ার পর তিনি স্বাভাবিক কারণেই দেরিতে বিছানা ছাড়েন।

বউমার সন্তান হবে শুনে শিখা চলে এসেছিল মাস দুয়েক আগে। আসার সময় রজতাভকে সঙ্গে চেয়েছিল। রজতাভ আসেননি। একা-একা কী করে কলকাতা থেকে কলম্বাসে আসবেন এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিখার ঘুম হয়নি। কথাটা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছের মূল্য রজতাভ কোনওদিন দেননি। আমেরিকা থেকে রঙ্গন অভয় দিয়েছিল। সে এয়ারপোর্টে থাকবে। মায়ের কোনও চিন্তা নেই। নাতি হয়েছে খবর পেয়েও কিছুদিন টালবাহানা করে শেষপর্যন্ত চলে এসেছিলেন রজতাভ। আমেরিকা তাঁর একদম ভালো লাগে না, কীরকম বন্দি-বন্দি মনে হয় নিজেকে। তার ওপর মাসটা এখন জানুয়ারি। বাইরে মাইনাস আট।

সেই ভোর থেকেই জানলার পাশে গিয়ে মাঝে-মাঝে দাঁড়ান রজতাভ। বাইরে বরফ আর বরফ। মাঝে-মাঝে বরফ-সরানো গাড়ি রাস্তা ঠিক করে যাচ্ছে। আর ছুটছে শোঁ-শোঁ গাড়ি, ভাবখানা এখন যেন থামলেই জমে যাবে। অন্য সময় বাইরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন, চাই কি মলেও পৌঁছে যেতেন। ছুটির দিন বা অফিস ফেরত রঙ্গন তাঁকে নিয়ে ঘুরতে বের হত। এর বাড়ি ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে যেত। এখন তো বাইরে হাঁটার কোনেও সুযোগই নেই। একহাঁটু বরফে দু-মিনিট থাকলেই জমে যাবেন। অফিসের পর রঙ্গন বাড়ি ফিরে অবশ্য বলে, 'যাবে কি নাকি কোথাও।' কোথায় যাবেন? গেলে তো গাড়ির বাইরে পা দেওয়া যাবে না। ছেলের সঙ্গে কত আর বড়-বড় ডিপার্টমেন্টাল শপে ঘুরে বেড়াবেন। অতএব সময় কাটছে টিভি দেখে।

শিখার এসব সমস্যা নেই। বউমার শরীর দুর্বল বলে সে-ই সংসার সামলাচ্ছে। কত আধুনিক ব্যবস্থা এখানে, যা ইচ্ছে রান্না করা যায়। তারপর এক মাসের বাচ্চাটা তো আছেই। তাকে নিয়ে কাজের বাইরের সময়টায় পুতুলখেলা চলে তার। কলকাতায় থাকলে প্রায়ই তাঁদের বাক্‌যুদ্ধ হয়। এখানে সেটা হচ্ছে না।

রঙ্গন মদ্যপান করে না। কিন্তু বাবার জন্যে স্কচ এনে দেয়। নিয়ম করে প্রতি সন্ধ্যায় দুপেগ হুইস্কি খান তিনি। এই অভ্যেসটা হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের পর যখন তিনি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হয়েছিলেন।

ছেলের দিকে তাকালে তাঁর খুব ভালো লাগে। পড়াশুনায় তো ভালোই ছিল। তরতর করে প্রতিটি পরীক্ষায় আশির ওপর নম্বর পেয়ে আমেরিকায় চলে এসে দিব্যি চাকরি করছে। এরমধ্যে তিনবার বাড়ি বদলেছে। প্রতিবারই বাড়ির সাইজ বেড়েছে। দেশে থাকলে প্রতি সপ্তাহে দু-বার ফোন পান ছেলের। বউমাটিও মন্দ নয়।

কিন্তু তাই বলে কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বরফের মধ্যে গৃহবন্দি হয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

ছেলে বলল, 'তুমি লস এঞ্জেলেসে চলে যাও। ওখানে বরফ তো দূরের কথা ঠান্ডাও বেশি পড়ে না। আমার বন্ধু সুব্রতকে বলেছি। ও খুব আগ্রহী। অনেক জায়গা ওর বাড়িতে। কয়েকদিন ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে এসো।'

'না-না, একি হয়? চিনি না জানি না!' রজতাভ আপত্তি জানালেন।

'সুব্রতকে দেখলে একথা মনে হবে না। ও খুশি হবে তোমাকে পেলে!'

কিন্তু রজতাভ রাজি হলেন না।

শনিবার বিকেলে এই বাড়িটায় যেন উৎসব শুরু হয়। বউমা এখন শরীরের কারণে পারছেন না কিন্তু তাঁর ভূমিকা শিখা নিচ্ছে। আড়াইটে নাগাদ মা-ছেলে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ ঠেলে। ফিরে আসে পাঁচটায়। রিমোট টিপে গ্যারাজের দরজা খুলে রঙ্গন গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ির উত্তাপ গ্যারেজেও থাকে। তারপর গাড়ির ডিকি থেকে প্যাকেটের-পর-প্যাকেট নামায় ওরা। রজতাভ সোফায় বসে দেখেন।

প্যাকেট খুলে জিনিসগুলো বের করতে-করতে শিখার মুখে আলো ফোটে, 'কি দারুণ বেগুন, তোদের এখানে কত টাটকা আর বড় সবজি, আমাদের ওখানে চোখেই দেখিনি! কই মাছটা দ্যাখা তোর বাবাকে, দশ ইঞ্চি লম্বা। ইলিশের সময় বাজার থেকে এক কেজির বেশি নিয়ে আসতে পারে না। অথচ এখানকার বাংলাদেশিদের দোকানে আড়াইকেজি ইলিশের ছড়াছড়ি। তোর এখানে না এলে এসবেব দেখাই পেতাম না।'

শুনতে-শুনতে মুখ না খুলে পারেন না রজতাভ, 'বেশ তো, বাকি জীবনটা এখানেই থেকে যাও। নয়ন ভরে দেখে যেতে পারবে।'

ছেলে মাথা নাড়ল, 'নো মোর বাবা।'

শিখা বলল, 'দেখলি! সব সময় আমাকে না খোঁচালে ওঁর ভাত হজম হয় না।'

হ্যাঁ। খাওয়ার সুখ আছে এখানে। এত বড় লবস্টার কখনও চোখেই দ্যাখেনি রজতাভ। গাড়ি-বাড়ির আরাম আছে। কিন্তু জীবন? জীবন কোথায়? সেই সকালে বেরিয়ে যায় ছেলেটা. ফেরে সন্ধের মুখে। বউমাও তাই। তখন কোনওমতে রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে না দিলে ভোরে উঠবে কি করে?

আর একটা ব্যাপার ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে রজতাভের কাছে। আড্ডা নেই, হইচই নেই মাইনের চেক থেকে বাড়ি-গাড়ির ইনস্টলমেন্ট দিয়ে যাও। তাই প্রত্যেক শুক্র বা শনিবারে এর বাড়ি ওর বাড়িতে কথা বলার জন্যে জমায়েত। ক্যালেন্ডারে ছ'মাসের যত শুক্র এবং শনিবারে সব লেখা হয়ে আছে। কবে কার বাড়িতে যেতে হবে। যেহেতু বউমার বাচ্চা হয়েছে তাই আগামী পাঁচ মাস এ-বাড়িতে জমায়েত হতে পারে না।

রঙ্গন জোর করে তাঁকে নিয়ে যেত, শিখা খুশি হয়েই যেত। রজতাভ লক্ষ করেছেন এই পার্টিগুলোর চেহারা। যাঁর বাড়িতেই পার্টি হোক অতিথিদের সংখ্যা প্রায় এক আর একই মুখ সর্বত্র। কারণ একটাই, এই বাঙালিরাই শহরের বাসিন্দা। যদিও প্রচুর বাংলাদেশি এই শহরে থাকেন কিন্তু কলকাতার বাঙালিরা তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে পছন্দ করেন না। এরকম পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে সত্তর-আশি মাইল গাড়ি চালিয়েও লোকে আসে। সাতটার মধ্যে জমায়েত শুরু হয়ে যায়। গৃহকর্তা

পানীয় অফার করেন। অর্ধপেগ হুইস্কি অথবা কোমল পানীয়। সেটা শেষ হওয়ার আগেই গৃহকর্ত্রী সবিনয়ে জানান ডিনার পরিবেশিত হয়েছে। খেতে-খেতে গল্প চলে। একই গল্প। শিখা দুটো পার্টিতে এক পোশাক পরে যায় না। গহনাও আলাদা। না, এটা সম্রাট থেকে কেনা। না-না, নিউমার্কেট কেন, দক্ষিণাপণেই সব পাওয়া যায়। কথাবার্তা এই একই খাতে বয়ে যায়। বাড়ি ফেরা সাড়ে আটটায়। রজতাভ বিরক্ত হয়ে পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। শিখা এসে গাল ফুলিয়ে বলল, 'কি করছ, তুমি না গেলে সবাই প্রশ্ন করবে। কি জবাব দেবে খোকা?'

'যা হোক কিছু। বলবে বউমার শরীর খারাপ, তাই বাড়িতে আছি।'

'আশ্চর্য! বউমার শরীর খারাপ হলে আমার বাড়িতে থাকার কথা।'

'তাহলে বলে দিয়ো পেট খারাপ হয়েছে আমার।'

'তার মানে ছেলের সম্মান রাখতে তুমি যাবে না?'

'আমি না গেলে ওর সম্মান যদি চলে যায় তাহলে না যাওয়াই ভালো।'

রজতাভ ছেলেকে ডাকলেন। জানিয়ে দিলেন কেন তিনি যাচ্ছেন না। রঙ্গন হাসল, 'সত্যি, একদম রোবটের মতো ব্যাপার। আমারই যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু এখানে সম্পর্ক রাখা দরকার বলে যাই। তোমার ভালো না লাগলে যাবে না। আমি যা হোক বলে ম্যানেজ করে নেব।' রঙ্গন চলে গেল।

শিখা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখল, 'বউমার জন্যে খোকা একা যায়। কিন্তু আর সবাই জোড়ে আসে। তুমি এখানে থাকতে আমি একা যাচ্ছি, এতে যে সম্মান ধুলোয় লুটোবে তা ভেবেছ?'

'তাই বলো। খোকা নয়, তোমার কথা ভেবে আমাকে যেতে বলছ। তা তুমিও তো না যেতে পারো। সম্মান বজায় থাকবে।' রজতাভ হাসলেন।

শিখা কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রজতাভ জানেন শিখা যাবেই। এখানকার তরুণীমহলে শিখার খুব খাতির হয়েছে। ওর কাছ থেকে সবাই বিভিন্ন রান্নার রেসিপি জেনে নেয়।

পরদিন দুপুরে রোদ উঠল। বেশ কড়া রোদ। বরফও গলতে শুরু করল। ভরসা পেলেন রজতাভ। আপাদমস্তক গরম কাপড় মুড়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হলেন। রাস্তায় মোড় অবধি গিয়েছেন, মনে হল সারা শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে। হঠাৎ গাড়িটাকে দেখতে পেলেন। রঙ্গনের গাড়ি। চিৎকার করে বলছে, 'উঠে পড়, জলদি।'

উঠতে গিয়ে দেখলেন পা এগোচ্ছে না। কথা বলতে গেলে শব্দ হারিয়ে গেল। রঙ্গন দ্রুত নেমে এসে তাঁকে টেনে তুলল গাড়িতে। গাড়ির ভেতরটা মেশিন গরম রেখেছে। পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল রঙ্গন। ধরাধরি করে তাঁকে শোওয়ানো হল বিছানায়। টেলিফোন পেয়ে ছুটে এল রঙ্গনের বাঙালি ডাক্তার বন্ধু। ইনজেকশন দিল সে। বলল, 'ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে বোঝা যাবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিনা। মেসোমশাই-এর ইনশিয়োরেন্স করা আছে তো?'

শিখা জানে না। রঙ্গন দ্রুত রজতাভর পাসপোর্ট যে ব্যাগে থাকে সেটা খুঁটিয়ে দেখল। মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারের ইনশিয়োরেন্স করিয়ে এসেছেন রজতাভ কলকাতা থেকে আসার সময়। সম্ভবত প্রিমিয়ামের টাকাটা নষ্ট হয় বলে কম টাকায় করিয়েছিলেন। রঙ্গন জানে ওই পঞ্চাশ হাজার ডলার তেমন-তেমন ক্ষেত্রে কিছুই কাজ দেবে না। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হলে কি পরিণতি হবে ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

কপাল ভালো ছিল। ডাক্তার বন্ধু জানাল ইনজেকশনে কাজ হয়েছে। এখন রজতাভ ঘুমোবেন। কেউ যেন ওঁকে বিরক্ত না করে। পাক্কা তিরিশ ঘণ্টা ঘুমোবার পর চোখ খুললেন রজতাভ। শুনলেন তাঁর কোল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। ওই ঠান্ডায় যা পরে বের হওয়া উচিত তা তিনি পারেননি। মাথা থেকে পা ঢাকলেই মাইনাস পাঁচকে কবজা করা যায় না। তার জন্যে চাই আলাদা পোশাক। হিট স্ট্রোকের কথা তিনি জানেন, কোল্ড স্ট্রোক আজ প্রথম জানলেন। একা পেয়ে শিখা জানাল তাঁর

মুখ নাকি বেনারসের হনুমানের মতো হয়ে গেছে। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত চামড়া পুড়ে গিয়েছিল। ওইটুকুই খোলা ছিল তখন।

সাতদিনের মাথায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রজতাভ দেখলেন তাঁর মুখ থেকে শুকনো চামড়া উঠছে। সাপের খোলস যেমন ওঠে তেমনি মুখের চামড়া উঠে যাওয়ার পর তিনি রঙ্গনকে বললেন দেশে ফিরে যাবেন। শিখার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে নাতি আর বউমাকে নিয়ে ব্যস্ত। রঙ্গন আপত্তি করেছিল প্রথমে, শেষে প্লেনে সিট বুক করে দিল। ওদের শহর থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে কলকাতা। শিখার একটুও ইচ্ছে ছিল না স্বামীকে ছাড়ার। যাওয়ার আগের রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বলল, 'তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি।'

রজতাভ বললেন, 'কি চেয়েছ যা তোমাকে দিইনি?'

'জানি না। যাচ্ছ যাও। কিন্তু রোজ ফোন করতে হবে।'

'কত বিল দিতে হবে খেয়াল আছে?'

'তাহলে একদিন অন্তর একদিন?'

'আচ্ছা।'

'আর একটা কথা।' আমাদের বেডরুমে শোবে না।'

'তাহলে কোথায় শোব?'

'অন্য কোনও ঘরে। খোকার ঘরে।'

'বেশ। তাই হবে।' রজতাভ আর তর্ক করতে চাইলেন না।

রঙ্গন এল তাঁকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে। শেষ মুহূর্তে বলল, 'আমি জানি তোমার এখানে খুব অসুবিধে হয়, তবু তোমাকে দেখলে মন ভালো লাগে।'

রজতাভ ছেলের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমি মরে গেলে তুই তোর মাকে এখানে নিয়ে আসিস। কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিবি। তুই তো কখনও কলকাতায় ফিরে যেতে পারবি না।'

'অনেস্টলি বলছি বাবা, ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারব না। এই বাড়িটাকে কিনেছি পঁচিশ বছরের ইনস্টলমেন্টে। তা ছাড়া আমি চাকরি পেতে পারি কিন্তু তোমার বউমা ওখানে গেলে হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকবে। সেটা আর ও কিছুতেই পারবে না।'

'আমি জানি। তাই বলছি, বাড়িটাকে রেখে কোনও লাভ নেই।'

'এখনই এসব কথা বলবে না।'

ছেলের মুখটায় এখনও ওর ছেলেবেলার অভিমান। এখনও যে এটুকু বেঁচে আছে তা দেখে খুব খুশি হলেন রজতাভ।

লন্ডনে নামলেন সকাল আটটায়। এখানে ঘণ্টা পাঁচেক বসে থাকতে হবে। ট্রানজিট লাউঞ্জে পৌঁছে বোর্ড দেখলেন। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্লেন যাচ্ছে। তারা কখন কোন গেট থেকে ছাড়ছে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। তাঁর প্লেনের কোনও খবর নেই। মালপত্র যা ছিল তা আমেরিকায় বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় প্লেনকোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছেন। খালি হাতে ঘুরতে লাগলেন রজতাভ। দু-পাশে ডিউটি ফ্রি শপের আকর্ষণ। কয়েকটা দোকানে ঘুরতেই বুঝলেন, নামেই ডিউটি ফ্রি শপ। যে-কোনও জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। লন্ডন শহরে এর চেয়ে সস্তায় পাওয়া যায়।

হাঁটতে-হাঁটতে একটা লাউঞ্জে চলে এলেন রজতাভ। অনেক যাত্রী সেই লাউঞ্জের সোফায় বসে আছেন। এঁরা নিশ্চয়ই দূর থেকে আসছেন, অন্য ফ্লাইট ধরবেন। হঠাৎ নজর পড়ল এক মহিলার ওপর। দারুণ ফরসা, লম্বা, সুন্দর শরীর, তবে বয়স ষাটের কম নয়। পরনে অফহোয়াইট শাড়ি। মনে হল এই মহিলা যৌবনে ডানাকাটা সুন্দরী ছিলেন। এঁর বসে থাকার ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট।

ভদ্রমহিলা মুখ ফেরাতেই চোখ সরিয়ে নিলেন রজতাভ। এই সত্তরের কাছাকাছি এসে তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যা আঠারো-উনিশে মানায়।

রজতাভ কাচের দেওয়ালের কাছে গেলেন। ওপাশে হিথরো এয়ারপোর্টের রানওয়েতে কর্মব্যস্ততা চলছে। গোটা পৃথিবী থেকে উড়ে আসা প্লেনগুলো স্বচ্ছন্দে নামছে আবার উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নাকে মিষ্টি গন্ধ লাগল। ঘুরে তাকাতেই অবাক হলেন। সেই মহিলা উঠে এসেছেন তাঁর সামনে। চুল প্রায় সাদা, গলায় হাঁসের পায়ের দাগ। মহিলা হাসলেন, 'চিনতে পারছ না?'

এই একটি বাক্যে হুড়মুড় করে বিস্মৃতির সব দেওয়া খসে পড়ল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রজতাভ। কি করছেন না জেনেই এগিয়ে গিয়ে মহিলার হাত ধরলেন, 'তুমি!'

মাথা নাড়লেন মহিলা, 'তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু বুঝলাম তুমি পারনি। তাই উঠে এলাম।'

'আমি, আমি ভাবতেই পারছি না লালী, তোমাকে এখন এখানে দেখব ভাবতেই পারছি না। কিন্তু তুমি খুব বদলে গেছ।'

'কীরকম? মোটা হয়েছি? বুড়ি?'

'দূর! তুমি আরও সুন্দরী হয়েছ।'

'বাজে বোকো না। পঁয়ষট্টি বছরের বাঙালি মেয়েকে লোকে বুড়িই বলে।'

'পঁয়ষট্টি?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার থেকে তিন বছরের বড়।'

'তাইতো।' চোখ বন্ধ করলেন রজতাভ। লালী হাত ছাড়িয়ে নিলেন। রজতাভ চোখ খুললেন, 'হ্যাঁ। ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে তোমাকে দেখেছি।'

'ভাবা যায়?' লালী হাসলেন, 'তখন যদি আমরা ঠিক করতাম পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হবে তাহলে বিশ্বাস করতাম? চুলগুলো এত্ত উঠে গেল কেন?'

'বাপ-ঠাকুরদার দান।' রজতাভ হাসলেন, 'তুমি কি একাই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমিও। চলো, ওই সোফায় বসে কথা বলি।' রজতাভ লালীর কনুই ধরে নিয়ে এলেন। লালী বললেন, 'একটু আস্তে, এখন কি অত জোরে হাঁটতে পারি? তুমি দেখছি এখনও যুবক!'

'যুবক?' হো-হো করে হাসলেন রজতাভ, 'আমার নাতি হয়ে গেছে।'

'ছেলে তো আমেরিকায় থাকে।'

অবাক হয়ে তাকালেন রজতাভ, 'তুমি কি করে জানলে?'

হাসলেন লালী, 'চার বছর আগে পর্যন্ত জানতাম। মা বেঁচে ছিলেন ততদিন। মায়ের কাছে তোমাদের খবর পেতাম। তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'ভালো। ছেলের কাছে থেকে গেল কিছুদিনের জন্যে। নাতিকে সামলাচ্ছে।'

'বাঃ।'

'তোমার ছেলে মেয়ে?'

মাথা নাড়লেন লালী, 'একটি ছেলে।'

'তোমার স্বামী?'

'শরীর ভালো নয়। হাঁপানিতে ভুগছে।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ব্যাঙ্গালোরে। ছেলে ওখানে চাকরি করে। বছরে একবার যাই।'

'লন্ডনেই থাকো?'

'না। ম্যাঞ্চেস্টারে।'

'লালী, তুমি সুখে আছ তো?'

স্পষ্ট চোখে তাকালেন লালী, 'স্বার্থ আর অনুকম্পা দিয়ে যে সম্পর্কের শুরু তাতে কখনও সুখ জন্ম নেয়? ওঁর আত্মীয়স্বজন সবাই তো বিয়ের ব্যাপারটা জানে। পঞ্চাশ বছরেও সেই জানাজানি পুরোনো হয়নি।'

মাইকে ঘোষণা চলছিল সমানে। কখন কোন গেট দিয়ে যাত্রীদের প্লেনে উঠতে হবে। টিভি মনিটরে ফ্লাইটচার্ট দেখাচ্ছে। রজতাভর কলকাতা ফ্লাইটের ঘোষণা একবারও করেনি কর্তৃপক্ষ।

রজতাভ বললেন, 'আবার কি করে দেখা হবে লালী?'

'জানি না। হয় তো এভাবেই হয়ে যাবে।'

গম্ভীর হলেন রজতাভ, 'তোমার টেলিফোন নাম্বার পেতে পারি?'

একটু চুপ করে থাকলেন লালী। এই সময় মাইকে ঘোষণা করা হল, লালীর ফ্লাইট তৈরি। লালী চোখ তুললেন, 'তোমারটা?'

'নিশ্চয়ই।' পার্স বের করে নিজের কার্ড এগিয়ে দিলেন রজতাভ। সেটা নিয়ে লালী বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' অবাক হলেন রজতাভ।

'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন কেউ কাউকে ফোন করব না।'

'সেকি?' অবাক হয়ে গেলেন রজতাভ।

'আমরা জানব ইচ্ছে করলেই কথা বলে খবর নিতে পারি না একদিন পারতাম না। কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে লাগাব না।' লালী চোখ বন্ধ করলেন।

'তাহলে নাম্বার নিয়ে কি হবে?'

'হবে!' মাথা নাড়লেন লালী, 'তুমি এবং আমি এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে যেই আমাদের কেউ পৃথিবী থেকে চলে যাবে অমনি যে বেঁচে থাকবে সে যেন জানতে পারে। শুধু এইটুকু! বলো, রাজি আছ?'

একটা বড় শ্বাস বুক নিংড়ে বেরিয়ে এল, রজতাভ মাথা নাড়লেন। লালী তাঁর ফোন নাম্বার লিখে দিলেন, কার্ড ব্যাগে ঢোকালেন। এখন ঘনঘন আবেদন জানানো হচ্ছে প্লেনে ওঠার জন্যে। রজতাভ লালীকে ওঁর প্লেনে ওঠার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারলেন। বোর্ডিংকার্ড নিয়ে প্লেনের কর্মচারীরা লালীকে পরীক্ষা করে ভেতরে যেতে বলল। রজতাভ আশা করেছিলেন ভেতরে যাওয়ার আগে লালী মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাবে, কিন্তু তাকাল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন উড়ে গেল আকাশে।

হিথরো এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জ যাত্রীর ভিড়ে গমগম করছে। কিন্তু রজতাভর সবকিছু ফাঁকা বলে মনে হচ্ছিল। পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হল। অথচ শেষ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর লালীর কথা বেমালুম ভুলে ছিলেন তিনি। প্রথম পাঁচ বছরে রাগ ছিল, জ্বালা ছিল, না পাওয়ার যন্ত্রণা কুরে-কুরে খেত। নিজের যোগ্যতা এত কম ছিল যে ধিক্কার দিতেন নিজেকে। তারপর সামলে নিয়েছিলেন। মোটামুটি ভালো রেজাল্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় চাকরিটা তাঁকে ধীরে-ধীরে তুলে নিয়ে গিয়েছে ওপর মহলে। বিয়ে করেছেন, ছেলে হয়েছে। ভালোই ছিলেন এতকাল। লালীর স্মৃতি-বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে অথবা ওই বয়সের প্রেমকে 'কাফলাভ' বলা হয় কারণ তা কখনই স্থায়ী হয় না বুঝে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কখনও ভাবেননি পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হলে লালী বলবে সে সুখে নেই। কখনও কল্পনাও করেননি লালী তাঁর সব খবর রাখার চেষ্টা করে গেছে চার বছর আগে পর্যন্ত। তার মানে, জীবন সবসময় থিয়োরি মেনে চলে না।

আঠারো বছর বয়সে রজতাভ পাড়া-কাঁপানো ছেলে। ভালো ফুটবল খেলে, আশুতোষ কলেজে পড়ে কিন্তু সাত-আটজনের দল নিয়ে হকি স্টিক হাতে নিয়ে মারপিট করে নামও করে ফেলেছে।

বাবার প্রচণ্ড শাসন সত্ত্বেও মায়ের প্রশ্রয়ে রজতাভ যখন পাড়ার হিরো তখনই লালীর সঙ্গে দেখা। লালী তখন ক্লাশ টেনের ছাত্রী। বেলতলা স্কুলে পড়ে। ওর স্কুলে যাওয়া-আসার সময় কাজের মেয়ে সঙ্গী হয়। তাকে উপেক্ষা করে বেপাড়ার কিছু ছেলে লাইন মারছিল। খবর পেয়ে রজতাভ দল নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটাল তাদের। পিটিয়ে থানায় গিয়ে বলল, 'আমাদের পাড়ার মেয়েকে বেইজ্জত করছিল বলে ওদের মেরেছি।'

দারোগা বললেন, 'ঠিক করেছ। কিন্তু দ্বিতীয়বার করলে জেলে যেতে হবে।'

দ্বিতীয় দিন থেকে তিন মিনিটের রাস্তা গাড়িতে যাতায়াত শুরু করল লালী। চতুর্থ দিনে সেই গাড়ির জানলা থেকে কাগজ পড়ল রাস্তায়। গাড়ি চলে গেলে ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিল রজতাভ। সুন্দর হাতে লেখা, 'তুমি আমার উপকার করেছ বলে কৃতজ্ঞ। বাবা তোমাকে গুন্ডা বলে। তুমি একটু ভালো হতে পারো না?' কোনও নাম নেই ওপরে অথবা নিচে।

কিন্তু চিঠির আদান-প্রদান চলল। ওর ক্লাসে পড়ার একটি পরিচিত মেয়ের সাহায্য নিল রজতাভ। সাত নম্বর চিঠিতে নাম দেখা গেল। লালী। জানা গেল ওর বাবা এক নম্বরের স্বৈরাচারী। মেয়েকে কোথাও একা যেতে দেন না। সিনেমা দেখাও বারণ। বাইরে আলাদা দেখা করে কথা বলার কোনও সুযোগই নেই। লালী থাকে দোতলার রাস্তার দিকে ঘরে। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে এক মিনিটের জন্যে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে আসতে পারে।

লালীর বাবা যে বিরাট ব্যবসায়ী, বিশাল কারখানার মালিক তা জানা ছিল। বাড়ির গেটে দারোয়ান, চারটে গাড়ি। তারপর সেই বৃষ্টির রাত এল। রাস্তায় লোকজন নেই। দশটা নাগাদ অঝোরে ঝরা বৃষ্টির মধ্যে রেইন পাইপ বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে গিয়েছিল রজতাভ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দরজা বন্ধ। কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর ভীত গলা কানে এল, 'কে?'

'আমি রজতাভ।'

দরজা খুলে গেল। ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখল হালকা নীল আলো জ্বলছে। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া লালী মুখ হাত চাপা দিয়ে বলল, 'কীভাবে এলে? বাবা যদি জানতে পারে!'

'পারবে না। শুধু তুমি বলো, ডু ইউ লাভ মি?'

মুখে কিছু বলেনি লালী, শুধু দ্রুত ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

এত কাছে দাঁড়িয়ে, নীল আলোয় স্নান করল লালীর ফরসা মুখ, গলা হাত দেখে রজতাভর মুগ্ধতা বাড়ছিল, তখনই কুকুরের ডাক শোনা গেল। লালী ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'যাও, চলে যাও, প্লিজ। এখনই সবাই চলে আসবে।'

দাঁড়ায়নি রজতাভ। যে পথে এসেছিল সেই পথে নেমে গিয়েছিল রাস্তায়।

পরের দিন দেখা গেল রেইন পাইপে কাঁটাতার লাগানো হয়েছে।

সাত দিনের মধ্যে পাত্র পাওয়া গেল। ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট। বিলেতে রিসার্চ করতে যেতে চায়, পয়সার অভাবে পারছে না। তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হল লালীকে বিয়ে করার শর্তে। বিয়ের পর বরকনে চলে যাবে বিলেতে। একমাসের মধ্যেই সানাই বাজল। লালীর বাবা কোনও ঝুঁকি নেননি। পুলিশ পাহারা ছিল বাড়ির গেটে। সেইদিন রজতাভর মনে হচ্ছিল তার আত্মহত্যা করা উচিত। বন্ধুরা বুঝিয়েছিল, সামান্য একটা মেয়ের জন্যে সে প্রাণ দেবে! তার প্রাণ কি শস্তা!

পঞ্চাশ বছর পরে এইসব ঘটনা মনে পড়বে এমন কেউ বেঁচে আছে কি না জানা নেই। বন্ধুদের মধ্যে যারা এখনও আছে তারাও ভুলে গেছে। লালীর বাবার মৃত্যুর পর ব্যাবসা বন্ধ হয়েছে। সেই পাড়া ছেড়েছেন রজতাভ। আজ মনে এল। সেই বৃষ্টির রাত্রে রেইন পাইপ বেয়ে লালীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন? কীসের টানে? ওকেই ভালোবাসা বলে? তাহলে ভালোবাসার আয়ু কতদিন? দিব্যি তো সব ভুলে ছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর? নাকি অনাদরে ভালোবাসা ঘুমিয়ে থাকে, ঘুমোয় কিন্তু মরে না!

কলকাতায় এলেন। ফাঁকা বাড়ি। একটুও ভালো লাগছিল না তাঁর। অথচ কলকাতায় ফিরে আসার জন্যে ওখানে ছটফট করছিলেন। তাঁর টেলিফোনের নাম্বার লেখা বইয়ের 'এল' আদ্যক্ষরের শেষ নাম লিখলেন, লালী, জিরো, জিরো-ফোর ফোর...।

তারপর তিন-তিনটে বছর পার হয়ে গিয়েছে। পুজো আসছে। ষষ্ঠীর দিন ছেলে বউমা নাতিকে নিয়ে চলে এল বেড়াতে। বউমার বোন ও তাঁর স্বামী এলেন বোকারো থেকে, দিদির সঙ্গে পুজো কাটাতে। বাড়ি এখন জমজমাট। সন্ধের সময় বাঁ-হাতটা হঠাৎ কনকন করতে লাগল, বাঁ-বুকে ঈষৎ যন্ত্রণা। রজতাভ অ্যান্টাসিড খেলেন। মনে হচ্ছিল পেটে বাতাস জম্মেছে। কাউকে বলে বিরক্ত করতে চাইলেন না। কিন্তু রাত দশটা নাগাদ ব্যথা এত বাড়ল যে আর চেপে রাখতে পারলেন না। ডাক্তার পাশের বাড়িতেই। তিনি মুখে মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'ইনজেকশন দিচ্ছি। কাল সকালেই ইসিজি করাবেন।'

ছেলে উদ্বিগ্ন হল, 'রাত্রে কিছু হবে না তো?'

'বলতে পারছি না। হসপিটালে রিম্যুভ করলেই ভালো হয়।'

রজতাভ বললেন, 'আরে না, না। আমার কিছুই হয়নি। ঘুমিয়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা অযথা চিন্তা করছ।'

ইনজেকশনের কল্যাণেই ভালো ঘুম হল। সকালে অনেকটা চাঙ্গা। ইসিজির ইচ্ছে ছিল না, রঙ্গন জোর করে নিয়ে গেল। ইসিজি করার পর ডাক্তারের চোখ কপালে। রঙ্গনকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে হয়?'

'বাবা।'

'এখনই হাসপাতালে নিয়ে যান। খুব খারাপ অবস্থা।'

রঙ্গনের এক সহপাঠী অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তার। সে বলল, 'নিয়ে আয়।' হাসপাতালে আবার ইসিজি করা হল। করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অ্যাঞ্জিওগ্রাফ করা হবে। সেটা করা হল বিকেলবেলায়। দেখা গেল রজতাভর হৃৎপিণ্ডগামী রক্তবাহী শিরাগুলোর নব্বুইভাগ অকেজো হয়ে গেছে। আগামী কালই বাইপাস অপারেশন করা দরকার।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল রজতাভর। বুকটা খুব ভারি। শুনলেন আজ তাঁর অপারেশন হবে। কাল থেকে সমানে ওষুধ চলছে। আর তখনই মনে পড়ল। যদি অপারেশন টেবিলেই মরে যান তাহলে কি হবে? লালীকে তিনি জানাবেন কি করে? কথার খেলাপ হয়ে যাবে।

সকাল সাড়ে ন-টায় ওরা সবাই এল। ছেলে বলল, 'কোনও ভয় নেই বাবা। আজকাল বাইপাস জলভাত হয়ে গিয়েছে। নাভাস হয়ো না।'

বউমা বললেন, 'ওখানে তো বাইপাস হওয়ার পরের দিনই পেশেন্টকে হাঁটায়।'

বউমার বোনের স্বামী বলল, 'আমার বাবার হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। এখন নর্মাল লাইফ। কোনও চিন্তা করবেন না।'

চুপচাপ শুনলেন রজতাভ। তারপর বললেন, 'ভালো হলে ভালো। যদি তা না হয় তাহলে মাকে তোমার কাছে নিয়ে যেয়ো। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ো।'

শিখা কেঁদে উঠল। রঙ্গন চাপা গলায় বলল, 'মা!'

'রঙ্গন!' মৃদুস্বরে ডাকলেন রজতাভ।

'বলো।'

'একটা অনুরোধ রাখবে?'

'নিশ্চয়ই। বলো।'

'আমার যদি কিছু হয়—।' বলে মুখ তুলতেই বউমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। তারপর ওঁর

বোনের সঙ্গে। তখনই মনে হল, এরা কি ভাববে? বুড়ো বয়সে প্রেম করছেন? প্রেমিকাকে জানাতে চাইছেন তিনি নেই! ভাবতেই কীরকম কুঁকড়ে গেলেন তিনি।

'তোমার কিছু হবে না বাবা। তবু বলো, নিশ্চয়ই রাখব।'

'একটা ফোন—।' মন স্থির করতে পারছিলেন না তিনি।

'কাউকে ফোন করতে হবে?' রঙ্গন জানতে চাইল।

হঠাৎ শিখার যেন মনে পড়ে গেল, 'খোকা, ওই ফোনটা।'

বউমা বললেন, 'আঃ মা! আপনাকে নিষেধ করা হয়েছিল।'

রজতাভ তাকালেন শিখার দিকে, 'কি বলছ তুমি? বলো।'

হকচকিয়ে গেল শিখা, 'না, মানে আচ্ছা লালী বলে কাউকে চেনো?'

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বন্ধ করলেন রজতাভ। কেঁপে উঠলেন।

নার্স এল এই সময়। 'আপনারা এবার যান। পেশেন্টকে তৈরি করতে হবে।'

সবাই নড়ল। রঙ্গন ঝুঁকে বলল, কি করতে বলছিলে, বাবা!'

মাথা নাড়লেন রজতাভ, 'না, তার আর দরকার নেই।'



খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে

পরীক্ষাটা ছিল চাকরির। দেওয়ার সময়েই বুঝতে পেরেছিল ডাক আসবে না। এমন অনেক প্রশ্ন ছিল যা সে কখনও শোনেনি, উত্তর কি লিখবে। আধ ঘণ্টার পর মনে হয়েছিল উঠে পড়লেই হয়। কিন্তু ওঠেনি, সাঁতার না জানা মানুষ যদি পুকুরের ডুব দেয় তাহলে যে অবস্থা হবে সেই অবস্থায় বাকি সময়টা কাটিয়েছিল। প্রশান্ত জানে, এটাই তার জীবনের শেষ চাকরির পরীক্ষা। আর কয়েক মাস বাদেই বয়সটা সীমারেখা পেরিয়ে যাবে।

সেই সাত সকালে সে হাওড়ার কদমতলা থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরে খড়্গপুরে এসেছিল এই পরীক্ষাটা দিতে। বাড়ির সবাই খুব উৎসাহ দিয়েছিল। এর আগে যতবার সে দরখাস্ত করেছে কোনও বারই ডাক আসেনি। বাংলার অনার্সে পঞ্চাশ নম্বর পাওয়া ক্যান্ডিডেটকে যে ডাকা হয় না তা সে বুঝে গিয়েছিল। এবার ডাক পাওয়ায় সে যেমন অবাক হয়েছিল তেমনই আশা বেড়েছিল বাড়ির লোকদের। চাকরিটা হয়ে গেলে ছেলেটা চব্বিশ ঘণ্টা গুম মেরে বসে থাকবে না। পাড়ার দূরের কথা, বাড়ির লোকের সঙ্গেই ভালো করে কথা বলে না। মেয়েবন্ধু দূরের কথা, ওর কোনও ছেলে বন্ধু নেই। প্রশান্তর মায়ের ধারণা, ছেলে হয় সন্ন্যাসী নয় পাগল হয়ে যাবে। যে দেড় ঘণ্টা খাতা সামনে নিয়ে বসেছিল প্রশান্ত তা একদম না লিখে শেষ করেনি। দ্বিতীয় পাতায় সে তিনটে লাইন লিখেছিল,

'তাকে আমি খুঁজতে গেলাম পূর্বপাড়ার হাটে
তাকে আমি খুঁজে এলাম কৃষ্ণচূড়ার মাঠে
তাকে আমি খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে।'

কাকে যে খোঁজাখুঁজি করছে, এরকম লাইন কেন তার মাথায় এল, আর এল যখন তখন পরীক্ষার খাতায় লিখতে গেল কেন এসব প্রশ্নের কোনও জবাব সে নিজেই জানে না।

বাড়ি ফেরার জন্যে খড়গপুর স্টেশনের দুপুরের নির্জন প্ল্যাটফর্মে এসে মনে হল পরীক্ষার খাতায় ওসব লেখা ঠিক হয়নি। এখন মনে হচ্ছে কথাগুলো তার নিজের। নিজের কথা পাঁচ জনকে জানাবার কী দরকার? যিনি খাতা দেখবেন তিনি কি মানে বুঝবেন? অবশ্য সে নিজেই মানে জানে না। নিজের এরকম কিছু কথা থাকে যার মানে ঠিকঠাক জানা যায় না।

প্রশান্ত একটা বেঞ্চিতে বসল যার প্রান্তে দাড়িওয়ালা শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ় বসে আছে। লোকটির আর্থিক অবস্থা যে খারাপ তো দেখলেই বোঝা যায়। দুই আঙুলে দাড়ি চুলকে লোকটি বলল, 'আপনি যে উদ্‌ভ্রান্ত তা দেখেই বুঝতে পারছি।'

প্রশান্ত হাসল।

লোকটি পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে দু-হাতের আড়ালে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরাল। তারপর অনেকটা ধোঁয়া বের করে বলল, 'লোকে বলে অমুক ভালোবেসে পাগল হয়ে গিয়েছে। আরে ভালোবেসে কেন পাগল হবে? পাগলের কাছে কি ভালোবাসা থাকতে পারে? পাগলরা উদাসী হয়। ভালোবাসা থাকল কি গেল তাতে আর কী?'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল প্রশান্তর। হাসল।

'তা মশাই-এর সমস্যাটা কি?'

'কী বলব।' প্রশান্ত তাকাল।

'তা অবশ্য। অনেক সমস্যা থাকলে কোনটা বলবেন! আমার নাম শিবশম্ভু। ঠাকুমা রেখেছিলেন। থাকি কালিঘাটের কাঠিবাবার ডেরায়। জীবমুক্ত মহাপুরুষ। এক পলক দেখলেই বলে দেবেন কোন সমস্যা আপনার আসল।'

'আপনি ওখানে কি করেন?'

'বাবার ওখানে পড়ে থাকি। যা বলেন শুনি। মন ভরে যায়। আরে মশাই, মন ভরে গেলে আর কী চাই? এই শরীরটা? দুবেলা দুটো পেটে পড়লেই শরীর ঠান্ডা। যাবেন নাকি? একবার দর্শন করে ফিরে যান। কোথায় যাচ্ছেন?'

'কলকাতা।' হাওড়া না বলে কলকাতা বলল প্রশান্ত।

'অ। তা পথেই পড়বে। ট্রেন আসছে উঠুন।'

'কিন্তু আমার টিকিট তো হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কেটেছি।'

'রেখে দিন। ওটা পরে কাজে লাগবে। কোলাঘাট পর্যন্ত দরকার হবে না।'

দুপুরের লোকাল। ভিড় কম। বসার জায়গা পাওয়া গেল।

শিবশম্ভু জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন তো, কোলাঘাট কেন বিখ্যাত?'

প্রশান্তর মনে পড়ল ইলিশ মাছের কথা। কিন্তু এই সামান্য উত্তরের জন্যে নিশ্চয়ই শিবশম্ভু তাকে প্রশ্নটা করেনি। সে ভাবছে দেখে শিবশম্ভু হাসল, 'আরে ইলিশ মাছ। কোলাঘাটে থেকেও খেতে পাই না। অত দাম দিয়ে কিনব কী করে। তা ছাড়া কাঠিবাবার ডেরায় আমিষ বারণ। পেটে কিছু দিয়েছেন না হরিমটর?'

'খেতে ভালো লাগছে না।'

কোলাঘাটে নেমে স্বচ্ছন্দে শিবশম্ভু প্রশান্তকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গেটে দাঁড়ানো টিটি-কে বলল, 'আমার ভাই!' লোকটি একটিও কথা বলল না।

'পকেটে টাকা থাকলে এখানে খেয়ে নিতে পারেন।' স্টেশনের বাইরের ঝুপড়ি দোকান দেখাল শিবশম্ভু। মাথা নাড়ল প্রশান্ত, খিদে নেই। শিবশম্ভু একটু হতাশ হল, 'মুশকিল কি জানেন, খালি পেটে কাঠিবাবার সামনে যেতে নেই।'

'কেন?'

'পেটে কিছু না থাকলে হজম করবেন কী দিয়ে?'

অগত্যা ঝুপড়িতে ঢুকল ওরা। হাতে গড়া গরম রুটি আর ঘ্যাঁট। প্রশান্ত একটা খেলো তো শিবশম্ভু ছ'টা। তারপর চা। দশ টাকা লাগল। শিবশম্ভু বলল, 'কিছুই না। যে-কোনও দেবস্থানে যান, দেখবেন এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ হবে।'

হাঁটা শুরু হল। জনবসতি পেরিয়ে, মাঠ আর মাঠ। হাত তুলল শিবশম্ভু, 'ওই যে আকাশের গায়ে কালো বিন্দু, ওটা বিশাল বটগাছ। ওর নিচে কাঠিবাবার ডেরা। একটু আয়েশ করে হাঁটুন, কষ্ট হবে না।'

মাঠ শেষ হল। বটগাছ এখন বেশ বড়। তার নিচে খড়ের ছাউনি দেওয়া দুটো ঘর নিকোনো উঠোন। সেখানে বসে আছে জনা আটেক নারী-পুরুষ। শিবশম্ভু বলল, 'বসে পড়ুন। কাঠিবাবার এখন বিশ্রামের সময়।'

বটগাছের কিছুটা দূরে নদী। নদীতে জল সামান্য। না বসে সেদিকে এগিয়ে গেল প্রশান্ত। জলের কাছে যেতেই শুনতে পেল, 'ওমা এ আবার কে!'

পাশ ফিরে সে যে নারীকে দেখতে পেল তার চুল খোলা। রুক্ষ চুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। পরনে গেরুয়া শাড়ি। হাতে সদ্য ধোওয়া বাসনপত্র। নারীর বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী। ঠোঁট মুচড়ে, চোখ ঘুরিয়ে নারী বলল, 'প্যাট-প্যাট করে দেখা হচ্ছে। ভালো চাও তো পালাও, নইলে মরণফাঁদে পড়বে।' তারপর উঠে চলে গেল কাঠিবাবার ডেরার দিকে।

মরণফাঁদ! সেটা কী জিনিস? মাথা নাড়ল প্রশান্ত। তারপর উবু হয়ে বসে নদীর জলে মুখ ধুলো। বাঃ, বেশ ঠান্ডা, শরীর জুড়িয়ে গেল।

শিবশম্ভু বলল, 'বাবা, বিশ্রামভঙ্গ করেছেন, তোমার কথা জানিয়ে দিয়েছি, অনেকদূরে যাবে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।'

এই সময় সেই নারী ঘরের বারান্দায় একটা চাটাই পেতে দিল। এখন তার চুল বিশাল খোপা হয়ে গেছে। সাধিকা-সাধিকা লাগছে। শিবশম্ভু নিচু স্বরে বলল, 'কাঠিবাবার সেবিকা।'

এর পরে কাঠিবাবা বেরিয়ে এলেন। চাটাই-এর ওপর বসলেন ধীরে-ধীরে। অতি শীর্ণ শরীর। বুকের সব হাড় বোধহয় গোনা যায়। পাকা দাড়ি গলার নিচে এসে থেমেছে। মাথায় চুল নেই। চকচকে টাক। বয়স আশির আশেপাশে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। শিবশম্ভু উঠে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল কাঠিবাবাকে। তিনি হাত ওপরে তুলে নামিয়ে নিলেন। প্রণাম শেষ করে কিছু বলল শিবশম্ভু। কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন।

শিবশম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের মধ্যে কে-কে খুব দূরের জায়গা থেকে এসেছেন? হাত তুলুন।'

এক দম্পতি বসেছিল সামনে। লোকটি হাত তুলল।

'আসুন আপনারা।'

ওরা এসে দূর থেকে প্রণাম করল। কাঠিবাবা বললেন, 'আমি ভগবান নই যে যা চাইবে তাই পাইয়ে দেব, ডাক্তার নই যে রোগ সারিয়ে যাব। তোমাদের মনে অশান্তি আছে নইলে এখানে আসবে না। তাই তো—!'

পুরুষটি বলল, 'হ্যাঁ বাবা, দশ বছর বিয়ে করেছি, এখনও সন্তান হল না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। আমার এই স্ত্রী বলেছিল আবার বিয়ে করতে। কিন্তু কলকাতার ডাক্তার বলেছে না হওয়ার জন্যে আমিই দায়ী। আমি কখনও বাবা হতে পারব না। তবে আমার স্ত্রী মা হতে পারে। ডাক্তাররা নলজাত শিশুর কথা বলেছে। ওর শরীরেই বড় হবে। ওর শরীর থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। এই নিয়ে খুব অশান্তি। কী করব বলে দিন।'

কাঠিবাবা রমণীটির দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাভারতের গল্প জানো?'

'জানি। টি ভি-তেও দেখেছি।' স্ত্রী বলল।

'এই মহাভারত, গীতা কিছুই হত না যদি ব্যাসদেব না থাকতেন। রাজার সন্তান নেই। সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু তখন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল নিয়োগ প্রথা। তিনি মহামতি ব্যাসদেবের কাছে রানিদের পাঠালেন। তার ফলেই যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের পিতারা জন্ম নিয়েছিল। আজ নিয়োগপ্রথা নেই। কিন্তু নলপ্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে তোমার সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকবে আপত্তি করার তো কিছু নেই। এসো তোমরা।' কাঠিবাবা চোখ বন্ধ করলেন।

পুরুষটি একটি পুঁটলি সামনে রেখে প্রণাম করল। স্ত্রীও। তারপর তারা উঠে চলে যেতে শিবশম্ভু ডাকল, প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল। শিবশম্ভু বলল, বসুন।'

কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে কাঠিবাবা প্রশ্ন করলেন, 'সমস্যাটা কি? মন এত উতলা কেন? তুমি তো কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। পৃথিবী ঘুরলেও না।'

'হ্যাঁ। আমার কিছু ভালো লাগে না। দিন-দিন নিজের ওপর আস্থা চলে যাচ্ছে। চাকরি পাইনি। বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে করে না।'

'তোমাকে যদি আজই অনেক টাকার চাকরি দেওয়া হয় তাহলে? মন শান্ত হবে?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আজকাল আমার কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয় কোথাও চলে যাই।' প্রশান্ত সত্যি কথা বলল।

কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন, 'হু। আমার চোখের দিকে তাকাও।'

তাকাল প্রশান্ত। কিন্তু কাঠিবাবার শুকনো মুখ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। কাঠিবাবা বললেন, 'তোমাকে আমি এমন একটা জিনিস দিতে পারি যাতে বাইরে যেতে হবে না। তুমি যেখানে আছ সেখানেই চিন্তামুক্ত হয়ে থাকতে পারবে। তুমি সামনের শনিবার এসো। বাড়িতে বোলো যে রাতে বাড়িই ফিরবে না। এসো।'

হাওড়ায় ফিরে এসেছিল প্রশান্ত। এরকম অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। চাকরির পরীক্ষায় ওই কাণ্ড হওয়ায় মনে যে হতাশা এসেছিল সেটা যে কখন চলে গিয়েছে সে টের পায়নি। ব্যাপারটা শুনে বাড়ির সবাই যে গম্ভীর হয়ে গেল তাতেও সে বিচলিত হল না। তার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কাঠিবাবা তাকে কী দেবেন?'

কাঠিবাবা বলেছেন শনিবারে যেতে। কখন যেতে হবে বলেননি। শিবশম্ভুকে জিজ্ঞাসা করে এলে হত। শনিবার দুপুরে সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে গেল, ফিরতে দেরি হয়ে গেলে রাত্রে থেকে যাবে, কাল ফিরবে। এই কথায় বাড়ির কারও কোনও প্রতিক্রিয়া যে হল না এটাও লক্ষ করল না সে।

কোলাঘাট স্টেশনে নেমে সে অবাক হয়ে গেল। পুলিশে-পুলিশে প্ল্যাটফর্ম তটস্থ! বেশি যাত্রীও নেই.। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল আজ ভোরের বেলায় সন্ত্রাসবাদী অথবা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়েছে। দুজন পুলিশ আর একজন উগ্রপন্থী মারা গিয়েছে। উগ্রপন্থীরা কোলাঘাট বন্ধের ডাক দিয়েছে। পুলিশ রেললাইন পাহারা দিচ্ছে বলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি। সে প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই দুজন পুলিশ অফিসার তাকে কাছে ডাকল, 'কোথায় থাকা হয়?'

'হাওড়ায়।'

দ্বিতীয়জন কপালে ভাঁজ ফেলল, 'এখানে কোথায় যাবে?'

'কাঠিবাবার কাছে।'

'কী বাবা?' দ্বিতীয়জন চোখ ছোট করল।

প্রথমজন বলল, 'একজন সাধু। নদীর ধারে থাকে।'

'কী জন্যে যাবে ওর কাছে?' দ্বিতীয় জনের প্রশ্ন।

'দেখা করতে।'

'আজ ভোরে যারা পুলিশ মেরেছে তাদের চেনো?'

'না।'

আইডেন্টিটি কার্ড আছে?'

'না।'

'কী নাম?'

'প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কি করো।'

'কিছু না।'

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বলল, 'শুনলে তো। এরাই ওই দলের মেম্বার। একে ছাড়া ঠিক হবে না। রগড়ালে খবর বের হতে পারে।'

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'কাঠিবাবার সঙ্গে কেন দেখা করবে?'

'উনি আসতে বলেছিলেন। আমাকে কিছু দেবেন যাতে মন শান্ত হবে।'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'এই কাঠিবাবা ওদের এজেন্ট নয় তো?'

প্রথমজন এবার হাসল, 'দূর। উনি সত্যিকারের একজন সাধক। প্রশান্ত, তোমার মনকে শান্ত করতে হচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না। আমার কিছু ভালো লাগে না।'

'গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রাগ হয়? সমাজব্যবস্থা বদলাতে ইচ্ছে করে?'

'না। আমি ওসব নিয়ে ভাবি না।'

প্রথমজন বলল, 'যেতে দাও। ন্যাতানো মাল।'

অতএব হাঁটতে শুরু করল প্রশান্ত। ঝুপড়ির দোকানগুলো বন্ধ। আচ্ছা, ন্যাতানো মাল বলল কেন? ওরা যাদের খুঁজতে তারা কি খুব শক্ত লোক, তাজা? মন খারাপ হয়ে গেল খুব।

কাঠিবাবার ডেরার সামনে আজ কোনও ভক্ত বসে নাই। সম্ভবত ধর্মঘটের জন্যেই আসতে পারেনি কেউ। চারপাশে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেল না প্রশান্ত। শিবশম্ভুকেও না। কুটিরের ভেতর নিশ্চয়ই কাঠিবাবা আছেন। কিন্তু কী বলে তাঁকে ডাকা যায়। শেষপর্যন্ত না বলে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল সে। কুটিরের সামনে গাছের ছায়ায় বসল আরাম করে।

অবশ্য এখন এখানে আসা ঠিক হয়নি। ভরদুপুরে নিশ্চয়ই কাঠিবাবা বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ কানে এল, 'ওমা! একে দেখছি হরতালও আটকাতে পারেনি?'

প্রশান্ত নারীকে দেখল। পেছনের নদী থেকে স্নান সেরে আসছে। পরনের সিক্তবসনে শরীরকে আড়াল করেছে। কিন্তু কাপড় ভিজে গেলে যে আকর্ষণীয় হয় তা এই প্রথম জানতে পারল প্রশান্ত।

'না, মানে, ট্রেন চলছিল, এদিকের অবস্থা হাওড়াতে টের পাইনি।'

'পুলিশ ধরেনি?'

'ধরেছিল। ছেড়ে দিয়েছে।'

'পুলিশ যখন ছোঁয়নি তখন বাঘেও কিছু করতে পারবে না। তা পেটে কিছু দিয়ে এসেছ না—।'

'না-না। আমি খেয়ে এসেছি।'

'বাঁচালে।' নারী ভেতরে চলে গেল।

কাঠিবাবা বেরিয়ে এলেন দু-ঘণ্টা বাদে। তখন রোদ রয়েছে গাছের শরীরে। প্রশান্ত আজ সামনে গিয়ে নমস্কার করে বসে পড়ল।

'সংসারে কে আছেন?'

'বাবা, মা, ভাই?'

'বিয়ে করনি?'

'না। আমি রোজগার করি না।'

'মনের ভাবটা খুলে বলো। কী চাও?'

'আমার সবসময় অশান্তি লাগে। বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। আবার বাইরে গিয়ে কী করব তা বুঝতে পারি না। বাড়িতে থাকলে চাকরি করতে হবে, সংসার করতে হবে। চাকরি পাইনি। চাকরির পরীক্ষায় খাতায় উলটো-পালটা লিখে এলাম।'

'কী লিখলে?'

মাথা নাড়ল প্রশান্ত, 'ছেলেমানুষের মতো কথা। আপনি হাসবেন।'

'না হয় হাসির কথাই শোনাও।'

প্রশান্ত মনে করে-করে বলল,

'তাকে আমি খুঁজতে গেলাম পূর্বপাড়ার মাঠে
তাকে আমি খুঁজতে এলাম কৃষ্ণচূড়ার হাটে
তাকে আমি খুঁজতে যাব প্রাণগঙ্গার ঘাটে।'

কাঠিবাবা বললেন, 'অপূর্ব! আসল কথাই তো বলে ফেলেছ। তোমার মন খোঁজাখুঁজি করছে। কাকে খুঁজছে? ইষ্টকে। কিন্তু তাকে পেতে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তো পেতে পারো। তোমার মন ঘরে বসে যদি শান্ত হয়ে যায় তাহলে বাইরে যাওয়ার তো কারণ নেই।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন কাঠিবাবা। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমি তোমাকে দেব। কিন্তু তার আগে বলো মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার পর তোমার শরীরের অভ্যন্তরে কোনও আন্দোলন হয়েছে কিনা?'

প্রশান্ত বুঝতে না পেরে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

কাঠিবাবা মাথা নাড়লেন, 'তুমি কি কোনও নারী শরীরে উপগত হয়েছ?'

'না-না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রশান্ত।

'খুব ভালো। যাও, পেছনে নদী আছে। সেখানে পোশাক খুলে তিনবার ডুব দিয়ে এসো। দিগম্বর হয়ে ডুব দেবে। ওদিকে কোনও মানুষ থাকে না, লজ্জার কোনও কারণ নেই।'

প্রশান্ত উঠল। নদীর ধারে গিয়ে সে কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঠিবাবার নির্দেশ মান্য করল। তারপর ভেজা শরীরেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ফিরে এল কুটিরের সামনে। কাঠিবাবা তাকে তাঁর সামনে সোজা হয়ে বসতে বললেন।

প্রশান্ত বসল,

'গায়ের জামা খুলে ফ্যালো।' কাঠিবাবা আদেশ করলেন।

খুলল সে। শরীরের জলে ভিজেছে কিছুটা।

'কোমরের দড়ি একেবারেই আলগা করে দাও।'

পাজামার গিঁট খুলে দিল প্রশান্ত। বসে থাকার জন্যে সেটি নিচে নেমে যেতে পারল না।

'আমি তোমাকে ইষ্টলাভের পথ চিনিয়ে দেব। সেই পথে হাঁটতে হবে তোমাকেই। তোমার মন যদি একাগ্র হয় তাহলেই তুমি পূর্ণতা পাবে। যখন সেটা পাবে তখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তারপর তোমার পাওয়ার অহঙ্কার যদি জটাধারী সন্ন্যাসী করে শিষ্য জুটিয়ে আশ্রম তৈরি করে তার মধ্যে শিবলিঙ্গ রেখে ভোগের মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারো।' কাঠিবাবা চোখ বন্ধ করলেন। তারপর প্রাণের ক্রিয়া দেখালেন। কীভাবে জপ করতে হবে দেখিয়ে বীজমন্ত্র দিলেন। জিভের সঙ্গে জপের মাত্রানুযায়ী একটি ক্রিয়া দেখালেন আর বললেন, 'ওইখানেই নিরবচ্ছিন্ন জপ চলবে সারাক্ষণ। বাইরে কাজকর্ম চলবে আবার জপ চলবে। এই নিরবচ্ছিন্ন জপের ফলই হবে জপসিদ্ধির অবস্থা, তারপর ধ্যানের ধারা আসবে। পবিত্র স্থানে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে এই জপ চলতে থাকলে যে অবস্থা

হবে তখনই বুঝবে সৃষ্টির রহস্য, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক।'

প্রশান্ত শরীরে মনে অন্যরকম অনুভূতি আবিষ্কার করল। কাঠিবাবা বললেন, 'তোমার ক্ষেত্র অনেকটাই তৈরি। তুমি ঘন-ঘন আসবে আমার কাছে। না হলে সামলাতে পারবে না। তোমার শক্তিলাভ হবেই। যদি মোহমুক্ত হতে পারো তাহলেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা! তবে গৃহত্যাগ কোরো না। করার দরকার নেই। তুমি ফিরে যাওয়ার আগে অন্তত একঘণ্টা এই জায়গায় বসে আমার দেখানো ক্রিয়া অনুসরণ করো। যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সংশোধন করে দিতে পারব।'

কাঠিবাবা কুটিরের ভেতর চলে গেলেন।

প্রশান্ত কাঠিবাবার নির্দেশ মনে করে-করে প্রাণায়ামের ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করল। বিচিত্র অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই সে অনুভব করছিল না। মন স্থির রাখাই মুশকিল হচ্ছিল।

'ফেরার ইচ্ছে নেই বুঝি!'

গলা কানে যেতে তাকাল প্রশান্ত। সেই নারী দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরের পৃথিবীতে ছায়া নেমে গেছে। শরীর বেশবাস এখন কিছুটা পরিপাটি; ঠোঁট পানের রসে লাল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই খেয়াল হল। দ্রুত পাজামা ধরে ফেলে নারীর দিকে পেছন ফিরে গিট বাঁধল সে।

নারী হাসল, 'ওই গিঁটই হল আসল, গিঁট খুললেই সর্বনাশ।'

পাঞ্জাবিটা পরে নিতেই নারী বলল, 'উঠল বাই তো কটক যাই। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। একটু বসে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

অগত্যা বসল প্রশান্ত। মিনিটখানেকের মধ্যে নারী এক বাটি মুড়ি আর একটা কাঁচা লংকা নিয়ে এল, 'এগুলোর গতি হোক।'

খিদে ছিল না। মন এখন অন্য কিছুর আশায় উন্মুখ। তবু হাত বাড়াতে হল। খাওয়া দেখতে-দেখতে নারী জিজ্ঞাসা করল, 'পিছুটান নেই, না?'

মুখ তুলল প্রশান্ত, 'বাড়িতেই সবাই আছেন।'

'বউ আছে? বউ।'

মাথা নেড়ে না বলল প্রশান্ত।

শব্দ করে হাসল নারী, 'তাহলে আর পিছুটান কোথায়?' তারপরই গলা নামাল, 'তা এসব করার ইচ্ছে হল কেন? সারা জীবন শুকিয়ে মরবে বলে?' বলেই কুটির থেকে নেমে চলে গেল গাছপালার আড়ালে।

হতভম্ব হয়ে গেল প্রশান্ত। কী বলল নারী? কাঠিবাবার সঙ্গে থেকে এসব কী কথা? কিন্তু এই নারী কে? তান্ত্রিকদের সঙ্গে ভৈরবী থাকে বলে শুনেছি। কিন্তু কাঠিবাবা কি তান্ত্রিক? দেখে মনে হয় না। আর এই নারীর বিপুল শরীর আর গেরুয়া শাড়ি ছাড়া আর কিছুই সাধিকার ভাবমূর্তি তৈরি করে না।

মুড়ি শেষ করে তেষ্টা পেল। কিন্তু জল দেওয়ার কেউ নেই। ওপাশে নদী আছে অবশ্য। কিন্তু সে জল পান করা ঠিক কি? প্রশান্ত স্থির করল, স্টেশনে পৌঁছে জলপান করবে। সন্ধের অন্ধকার মাটি থেকে উঠে আসছে যদিও আকাশে এখনও আলোর রেশ।

হাঁটতে শুরু করল সে। মিনিট কয়েক যেতেই দেখল নারী ফিরছে, ঠোঁট টিপে হাসল নারী, 'চললে?'

'হুঁ।'

'কথাটা মনে রেখো।'

'ইষ্টলাভের চেষ্টা করা কি অন্যায়?' জিজ্ঞাসা না করে পারল না প্রশান্ত।

'ইষ্ট? ইষ্ট মানে কি? ভগবান? তোমাদের ওই বাবা ভগবানকে পেয়েছে? জপ করে-করে

প্রাণায়াম করে শরীরের ভেতর ঢেউ তুলে ভাবছে ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছে। তার ফলে লোক এসে দুমুঠো মুড়ি, চারটে কলা দিয়ে যাচ্ছে। যা দেবে তাই খাও, তোমার ইচ্ছে মতো খাওয়ার পাবে না। একটাই তো জীবন। মরতে হবে। মরার পর ভগবান কোলে বসিয়ে দুধু খাওয়াবে এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। তাহলে? নিজের জন্যে জপতপ করে শুকিয়ে না মরে পাঁচ জনকে নিয়ে বাঁচো। কেউ না খেতে পেয়ে মরছে, জপ করে তাকে খাওয়ার দিতে পারবে?' হাসল নারী, 'শক্ত লাগছে। বিয়ে করোনি, মেয়েমানুষ ছোঁওনি। তোমার মতো হাঁদা আছে বলেই তো গোলমাল।'

'আপনি কে?'

'আমি? আমার নাম নয়নতারা। তোমাদের কাঠিবাবার মেয়ে। হ্যাঁ গো। দু-দুবার বিয়ে করেছিলাম। টেঁকেনি। আবার কবে আসছ?'

'দেখি।'

'আসতে তোমাকে হবেই। কাঠিবাবা ঠিক টেনে আনবে। তা আনুক। আমাকে একটু ছুঁয়ে দাও তো। এই কনুই-এর ওপরটা ছোঁও।'

'কেন?'

'আঃ। যা বলছি তাই করো।'

কাঁপা আঙুলে নয়নতারার কনুই স্পর্শ করেই হাত নামাল প্রশান্ত।

হাসল নয়নতারা, 'যাও। দুগ্গা দুগ্গা।' বলে আর দাঁড়াল না।

নবম তুলতুলে স্পর্শ আঙুলের ডগায়। কেন তাকে স্পর্শ করতে বলল নয়নতারা? আলাদা রকমের অনুভূতি নিয়ে হাঁটছিল সে। পাতলা অন্ধকার চারপাশে স্থির হয়ে আছে। কাঠিবাবা যা দিয়েছেন আর নয়নতারা যা বলল তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল।

স্টেশনের কাছে আসতেই তার খেয়াল হল চারদিক স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। একটি মানুষের শরীরও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ চিৎকার কানে এল, 'ওই যে, আর একটা!'

সে কিছু বোঝার আগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যারা, তারা যে পুলিশ তা বোঝার আগেই সে মাটিতে শুতে বাধ্য হল। এলোপাথাড়ি ভারি বুটের লাথি পড়ছে শরীরে। পাঁজর, কোমরের হাড় যেন ভেঙে যাচ্ছে একটার-পর-একটা।

'থাম। মুখটা দেখি।' ধমক ভেসে এল। তারপর টর্চের আলো পড়ল প্রশান্তর মুখে। যন্ত্রণার তার মুখ বিকৃত।

'দূর। এ নয়।' অফিসারের গলায় হতাশা।

'স্যার এরকমই বয়স।'

'বয়স তো এক হতেই পারে। যাক গে ভ্যানে তুলে রাখ।'

সঙ্গে-সঙ্গে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ভ্যানের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল, ঘড়াং করে বন্ধ হল ভ্যানের দরজা। ভেতরটা নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে খুব নিচু গলায় প্রশ্ন কানে এল, 'কে?'

প্রশান্ত উঠে বসার চেষ্টা করল। টনটন করছে পাঁজর কিন্তু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে অনুভব করল পাশেই কেউ শুয়ে আছে। জবাব না দিয়ে সে পালটা প্রশ্ন করল শুয়ে থাকা মানুষটাকে, 'আপনি কে?'

লোকটা জবাব দিল না। ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠ ভেসে এল, 'ও কোনওদিন কথা বলবে না। ও এখন লাশ হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি কে?'

'আমি? আমি রতন। তুমি কি অসিত?'

'না। আমি প্রশান্ত।'

'তুমি এখানে এলে কেন? তোমার নাম তো আজকের এনকাউন্টারে ছিল না।'

প্রশান্ত ঢোঁক গিলল। সে বুঝতে পারল এতক্ষণে। এদের কথাই কাগজে পড়েছে সে। আজ সকালে এদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল পুলিশের। তারপর বোধহয় বিকেলেও হয়েছে। কাগজে পড়েছে, জেনেছে এরা ভারতবর্ষের আমূল পরিবর্তন চায়। এরা সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। এরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে চায়। এই রতন ছেলেটি তাকেও কি সেই স্বাধীনতাযোদ্ধা বলে ভাবছে?

'শোনো প্রশান্ত, একটু পরেই ওরা একটা মাঠের মধ্যে ভ্যানটাকে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়ে পালাতে বলবে। আমরা পালবার চেষ্টা করলেই পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলবে। এরজন্যে ওদের কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। বুঝলে?'

'তাহলে?'

'আমাদের এখনই পালাতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে।'

'কী করে পালাব। দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ।' প্রশান্ত বলল।

'অপেক্ষা করো। ওরা তো দরজা খুলবেই। মাঠেও গুলি করে মারবে, এখানেও মারতে পারে। এখানে তবু বাঁচাব একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারি।'

ঘটাং করে ভ্যানের দরজা খুলে গেল।

'যারা জিন্দা আছিস তারা নেমে আয়।' হুকুম হল।

ধীরে-ধীরে নিচে নামল প্রশান্ত।

ওপাশ থেকে দুপুরের একজন অঁফিসার এগিয়ে এলেন, 'আরে তুমি দুপুরে হাওড়া থেকে এসেছিলে না?'

'কোথায় গিয়েছিলে যেন?'

'কাঠিবাবার আশ্রমে।'

'ভ্যানে চড়লে কেন?'

'আমাকে মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

'হুঁ। এখানে ঘুর-ঘুর করছিলে কেন?'

'স্টেশনে এসেছিলাম, ট্রেন ধরে বাড়িতে যাব বলে।'

'অ। কাঠিবাবা কী বলল?'

'আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন। জপ করতে বলেছেন।'

অফিসার আর একজনের দিকে তাকালেন, 'দ্যাটস গুড। জপটপ নিয়ে থাকলে মাথায় দেশউদ্ধারের চিন্তা ঢুকবে না।'

'স্যার, এ গুল মারছে কিনা কে জানে। আচ্ছা ভাই, কীভাবে জপ করতে শিখিয়েছে কাঠিবাবা তা করে দেখাও তো।'

প্রশান্ত নার্ভাস হল। কাঠিবাবা যা শিখিয়েছেন তা কাউকে দেখাবার জন্যে নয় এটা সে বুঝেছে। কিন্তু এরা তাকে ছাড়বে না। রেগে গেলেই লাশ বানিয়ে ফেলবে। অতএব বাবু হয়ে মাটিতে বসল সে। সোজা হতে গিয়ে পাঁজরে খচ করে-করে লাগল। মুখ বিকৃত করল। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'না। কিছু না।' তারপর জপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল সে কিছুই মনে করতে পারছে না।

'থাক, থাক। রিলিজিয়ন নিয়ে রসিকতা করার কোনও মানে হয় না। ওঠো।' অফিসার আদেশ করলেন, 'লোকাল ধরে সোজা হাওড়ায় চলে যাও।'

'স্যার, ওকে ছেড়ে দেবেন?'

'যাক। নির্দোষ। ওই যে বলেছে না একশোটা দোষী যদি ছাড়া পায় তো পাক, কিন্তু একজন নির্দোষ যেন সাজা না পায়।' অফিসার হাসলেন।

'কিন্তু স্যার ও ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবে।'

'নাম ঠিকানা ভেরিফাই করে ছাড়ো। মুখ খুললেই তুলে আনব। তবে কাঠিবাবার কাছে নিশ্চয়ই ও আসবে। সেক্ষেত্রে মুখ বন্ধ রাখবে।'

একটা অফিসার ওকে নিয়ে গেল স্টেশনের একটি ঘরে। নাম ঠিকানা লেখাল। পরিচিত লোকের ফোন নাম্বার দিতে হল। সেখানে ফোন করে সত্যতা যাচাই করা হল। লোকটা বলল, 'যা, পালা।'

প্রশান্ত বলল, 'রতনকে ছাড়বেন না?'

'রতন? কে রতন?'

'ভ্যানের ভেতর আছে।'

'এরমধ্যে দোস্তি হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, ওকে ছাড়ব। মাঠের ভেতর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। রতন বাড়িতে চলে যাবে।' অফিসারের কথা শেষ হওয়া মাত্র বাইরে চিৎকার শুরু হল। সঙ্গে গুলির আওয়াজ। প্রশান্তকে ছেড়ে অফিসার ছুটল ওদিকে। ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ভাগ গিয়া, ভাগ গিয়া।'

শুনে খুব আনন্দ হল। রতন পালাতে পেরেছে। একটা প্রাণ বেঁচে গেল বলে তার আনন্দ হচ্ছিল। হঠাৎ ভয় হল। রতন পালিয়ে গেছে বলে ওরা যদি তাকে আবার ধরে? সে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার খুঁজল।

ট্রেন এসে দাঁড়াল চোরের মতো। টুপ করে উঠে বসল প্রশান্ত। যত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা হাওড়ায় পৌঁছয় তত ভালো।

স্টেশনে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। আশপাশের লোকজন তার দিকে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ভাই?'

'কী হবে?'

'আপনারা সারা গায়ে কাদা মাটি, মুখ ফুলে গেছে।'

প্রশান্ত উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল।

লোকটা তার পাশের লোককে চাপা গলায় বলল, 'কোলাঘাট থেকে উঠেছে। নিজের চোখে দেখেছি। নিশ্চয়ই উগ্রপন্থী।'

বাড়িতে ঢোকার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'এইসব করছ? ভারতবর্ষের মুক্তি আনবে? বারংবার পুলিশ এসে তোমার গতিবিধি জানতে চাইছে? পরীক্ষা দেওয়ার নাম করে পুলিশ মারতে যাওয়া হচ্ছে? শোনো, তোমাকে এ-বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না।'

'আপনি ভুল করছেন বাবা।'

'ঠিক আছে। পুলিশ এসে বলুক আমি ভুল বলছি, তাহলে স্বীকার করে নেব। তোমার মুখ, পোশাক বলে দিচ্ছে তুমি কোথায় ছিলে!'

মধ্যরাতেও ঘুম আসছিল না। সর্বাঙ্গে মারাত্মক ব্যথা। সে এখন কী করবে? কাঠিবাবা যা শিখিয়েছিল সব মাথা থেকে সরে গেছে। রতন বলেছিল, অনেক কাজ বাকি আছে। কী সেই কাজ? কার জন্যে কাজ?

রতনকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? রতনকে খোঁজা দরকার। কাঠিবাবা নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু নয়নতারা কি জানে না? চোখ বন্ধ করল প্রশান্ত।



হিম আগুন

গত কয়েকদিনের মধ্যে গত রাতেই বোধহয় ঠান্ডাটা কট্টর ছিল। আজ বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। জানালার কাচ খোলা, বাইরের পৃথিবীটা আড়ালে। কিন্তু যেহেতু ঘড়ি বলছে এখন সকাল দশটা তাই অস্বস্তি শুরু হল। ঠিক এই মুহূর্তে যদি ঘড়িতে সময় সাড়ে ছয় বা সাত থাকত তাহলে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম। যেই জানলাম বেলা বেশ হয়ে গেছে অমনি শরীরের অন্য প্রয়োজনগুলো প্রকট হল, টয়লেটে ছুটতেই হবে যখন তখন বিছানা না ছেড়ে উপায় কী।

মিনিট পনেরো বাদে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা নিয়ে দরজা খুলে আবার কাঠের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পাহাড় তো বটেই, সামনের রাস্তাটাও কুয়াশায় ঢেকে গেছে। কাঠের বারান্দায় কুয়াশারা দাগ রেখে গেছে। ওখানে পড়ে থাকা বেতের চেয়ার এখন বেশ স্যাঁতসেঁতে। সেটায় বসে যে মগে আরাম করে চুমুক দেব তার উপায় নেই।

এখন আমার শরীরে যাবতীয় শীতবস্ত্র। এই এলাকাটা একেই বেশ নির্জন, তার ওপর শীত এবং কুয়াশা বাড়লে অথবা বৃষ্টি বাড়লে মনে হয় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। অনেক তল্লাশির পর এরকম জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমি।

চারপাশে তাকালাম। তাকাতেই মনে হয় এই মেঘ, কুয়াশা, ছায়ায় সময় যেন বেড়ে ওঠার আগেই ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ আলো নিভল অন্ধকার জানান দিল আর বোঝা গেল এখন রাত। তার আগে কখন যে দুপুর-বিকেল গলে গেল তা টেরই পাওয়া যায় না।

খুব কাছের বাড়িটা মিনিট আটেক দূরে। এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে। একজন প্রাক্তন নাবিক থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক অবসর নিয়েছেন বছর দুয়েক হল। তার ছয়মাস আগে বিয়ে করেছিলেন একজন গোয়ানিজ মহিলাকে। এটি ওঁর তৃতীয় বিয়ে। এই বিয়ের পর তাঁর প্রথম দু-পক্ষের সন্তানরা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। ওই গোয়ানিজ মহিলাও এতদিন স্বামীর কাছে আসেননি। শেষপর্যন্ত পদার্পণ করেছেন মাস দুয়েক হল। প্রায় তিরিশ বছর পরে জন্মানো স্ত্রী বাড়িতে আসার পর নাবিক ভদ্রলোককে খুব কমই বাড়ির বাইরে দেখা যায়। ভদ্রমহিলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নইলে রোজ দু-বেলা সমুদ্রের গর্জন শুনতে হত পাহাড়ে বসে।

আমার এই বাড়ি থেকে বাজার পাক্কা এক মাইলের পাহাড়ি পথ। ওখানটা বেশ জমজমাট। বাস টার্মিনাল, সিনেমা হল, দোকানপাট—বাজারগুলো যেমন হয় আর কী। সপ্তাহে একদিন যেতে হয় আমাকে। সাতদিনের খাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সিগারেট, ওষুধ—দিনে এক মাইল পাহাড়ি পথ ভাঙতে ইচ্ছে হয় না বলেই ট্যাক্সি নিই। এক মাইলের জন্যে তিরিশ টাকা চাইলে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করার কোনও মানে হয় না। এরকম নির্জনে জোরে কথা বলাও ঠিক নয়। এই বেশ আছি। চা শেষ করলাম আমি। বারান্দার আর এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন থেকে সূর্য ঠিকঠাক আলো ফেললে, বরফের চূড়াগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আজ তার সুযোগ নেই। বাজারের হোটেল থেকে বাড়ির খোঁজ করতেই একজন সন্ধান দিয়েছিল। যাঁর বাড়ি তিনি থাকেন সমতলের শহরে। বছরে দিন-সাতেকের জন্যে এখানে আসেন ছুটি কাটাতে। শর্ত হল, তিনি যখন আসবেন তখন তাঁকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। দিন-সাতেকের জন্যে এই শর্ত মেনে নিয়েছি। ইতিমধ্যে একটি বছর কেটেছে

আর ভদ্রলোক সস্ত্রীক ঠিক সাতটা দিন এখানে থেকেছিলেন। ওই সময় আমি চলে গিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপরের ফরেস্ট বাংলোয়। পরিবর্তনটা মন্দ লাগেনি। ফিরে এসে দেখলাম আমার যাবতীয় জিনিস ঠিকঠাক রয়েছে, ওঁরা সেগুলো স্পর্শ করেননি। উলটে বাড়িটাকে আরও একটু পরিচ্ছন্ন করে গেছেন।

অথচ টিঙ্কু যখন পাশে ছিল তখন এরকম জীবনের কথা ভাবতেই পারতাম না। সকালে ঘুম ভাঙার পর যে হইচই শুরু হত তার শেষ মাঝরাতে ঘুম এল। অবশ্য সন্ধেটা ছিল ওর, আমার নয়।

ওসব কথা আজকাল মনে করতে চাই না। কিন্তু এই না চাওয়ার সঙ্গে মনের কিছুতেই বনিবনা হয় না। যেমন এখন চারপাশে কুয়াশার দেওয়াল আর হাতে শূন্য চায়ের মগ নিয়ে টিঙ্কুর মুখ ভেসে উঠল। টিঙ্কু গাইত প্রচুর হিন্দি আর কিছু হিট বাংলা গান। শুধু একটা রবীন্দ্রনাথের গান ওর মুখে শুনতে পেতাম। তাও যখন অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই সন্ধে নামত তখনই। টিঙ্কু গাইত, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে—।' কুয়াশারা মেঘ নয়, তবুও এখন ওদের মেঘ বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে।

ঘরে ফিরে গিয়ে বেসিনে মগ রাখলাম। এখন কল খুলে ওটাকে ধোওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। দুপুরে নিশ্চয়ই ঠান্ডাটা কমবে।

গত সপ্তাহে বাজারে মাছ আসেনি। এখানে খাসির মাংস পাওয়া যায় মাঝে-মাঝে, চিকেন প্রচুর আর বিফ বেশ সস্তা।

চিকেন বা বিফের থেকে পাঁঠা বা খাসির মাংসের ওপর আমার একটু টান আছে। সেদিন শুনেছিলাম আজ খাবার দোকানে খাসি কাটা হবে। একবার ঘুরে আসা যাক। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে অন্যরকমের আরাম হয়।

জিনস্, জ্যাকেট, মাফলার, জর্থাস্টার আর মাথায় পাগড়ি টুপি, কাঁধে লম্বা স্ট্রাইপের ব্যাগ, হাঁটতে-হাঁটতে হেসে ফেললাম। এখন তাকে মাছ বা খাসির মাংস নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। টিঙ্কু শুনলে হেসে গাড়িয়ে পড়ত। যে লোকটাকে কাজে লাগাতে তাবড়-তাবড় রুই কাতলারা দিনরাত পেছনে লেগে থাকত, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যে প্রবলভাবে বেঁচে থাকত, সেই মানুষ কী করে কষা মাংস রাঁধবে তা নিয়ে ভেবে কূল পায় না, তখন তো হাসি পাবেই। কিন্তু সত্যি বলতে কি এসব নিয়ে থাকতে আবার মন্দ লাগছে না। এর ভেতরেও একটা অন্যরকমের আনন্দ আছে যা আমি আগে জানতাম না।

মোড় ঘুরতেই বাড়িটার দিকে তাকাতে প্রাক্তন নাবিককে দেখতে পেলাম। এই ঠান্ডায় একটা লম্বা ঝাঁটা দিয়ে বারান্দা পরিষ্কার করছে। দেখাদেখি হতেই বলল, 'হা-ই।'

আমি দাঁড়ালাম, 'আপনার কী হয়েছে?'

নাবিক বলল, 'কেন? আই অ্যাম ফাইন।'

'তাহলে অনেকদিন আপনার দেখা পাইনি কেন?' চিৎকার করে বলতে হল।

'আমার স্ত্রী এসেছেন, বুঝতেই পারছেন, সময় দিতে হচ্ছে। এসব বুঝবেন না।'

এই সময় একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'কেন? বুঝবেন না কেন? নির্বোধ নাকি?'.

মহিলার শরীরে ওভার কোট। মুখচোখ ভালোই ফরসা।

নাবিক নিচু গলায় কিছু বললেন। সম্ভবত আবার একা থাকার কথাই জানালেন। ভদ্রমহিলা কাঁধ নাচালেন এবং আমাকে শুনিয়ে বললেন, 'এরকম স্থূল রসিকতা আমি একদম পছন্দ করি না।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে, আর বলব না।' চটপট মেনে নিলেন নাবিক। আমার বেশ মজা লাগছিল। আচ্ছা, একেই কি স্ত্রৈণ বলে? ওঁকে আর বিরক্ত না করার জন্যে বললাম, 'আচ্ছা, চলি। পরে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কবে দেখা হবে তা আপনাকে বলতে পারছি না।'

'কেন?' অবাক হলাম।

'অসুবিধে আছে।'

'মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক আগের মতো কথা বলতে পারছেন না।' আমি হাত নাড়লাম।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা গলা তুললেন, 'এক্সকিউজ মি, দয়া করে একটু কাছাকাছি আসবেন? বেশ মজা লাগছিল।' বাড়ির সামনে পৌঁছলে মহিলা বললেন, 'আপনি যখন আমাদের প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই আমার পরিচয় জানেন! যদি না জানেন তাহলে জানিয়ে দিচ্ছি, এই ভদ্রলোক আমার স্বামী।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ। আপনি বললেন এই ভদ্রলোক ঠিক আগের মতো কথা বলছেন না। তার মানে হল, আমি এখানে আসার পর ওঁর কথা বলার ধরন বদলে গেছে। রাইট?'

'হ্যাঁ, আপনি এখানে আসার আগে উনি দু-বেলা আমার ওখানে যেতেন—গল্প...।

বাধা দিলেন মহিলা, 'বিশ্বাস করছি না। উনি গল্প করতে জানেন না। তার থেকে বলুন, উনি একাই কথা বলে যেতেন, আপনার কথা শুনতে চাইতেন না। কারেক্ট? আমি এসে কিছু ডিসিপ্লিন এনেছি। উনি দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা যা ইচ্ছে বলে যেতে পারেন কিন্তু বাকি তেইশ ঘণ্টা মুখ বন্ধ রাখতে হবে। আজ যে কথাগুলো বলেছেন তা ওই সময়ের মধ্যে। অর্থাৎ আর পঞ্চাশ মিনিট পরে উনি মুখ বন্ধ করে রাখতে বাধ্য।

মাথা নাড়লাম। 'অভিনব ব্যাপার। এবার আমি চলি। দেরি হয়ে গেলে বাজারে কিছুই পাব না।'

'আই সি। আপনি বাজারে যাচ্ছেন! আমাকে দু-মিনিট সময় দেবেন?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আপনাকে তো গবেট বলে মনে হয় না।' শরীর বেঁকিয়ে মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। প্রাক্তন নাবিক খুকখুক করে হাসল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি আমার সঙ্গে যাবেন?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে জানালো কিস্যু জানে না।

বললাম, 'আপনার তো এখন কথা বলার সময়, বলছেন না কেন?'

মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'অত্যন্ত হিসেবি। দশ মিনিট বলেছে, বাকি পঞ্চাশ মিনিট হাতে রেখে দিচ্ছে। চলুন।'

পরনে জিনস, পুলওভার, মাথায় রুমাল বাঁধা, হাতে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'যেখানে যা-যা করতে বলেছি করে রাখবে। কোনও অজুহাত শুনতে চাই না।'

প্রাক্তন নাবিক ঘাড় নাড়লেন।

মিনিট দুয়েক চুপচাপ হাঁটলাম আমরা। চারপাশে কুয়াশা পাক খাচ্ছে। কিছু বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুয়াশা আপনার কেমন লাগে?'

'নো, নট অ্যাট অল। আপনার?'

'আমার বেশ রহস্যময় মনে হয়।'

'থ্রিলার-ট্রিলার পড়ার অভ্যেস আছে?'

'না। ওটা এমনি-এমনি মনে আসে।'

'ব্যক্তিগত কথা বলা আমি পছন্দ করি না। এখন যেহেতু একসঙ্গে হাঁটছি তখন আপনার শখ আমার জানা দরকার। আমি জুলি।'

নাম বললাম, 'শান্ত।'

'ওয়েল শান্ত, আমি শুনেছিলাম আপনি এখানে একা থাকেন।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'স্ত্রী কোথায়?'

'আসেননি। আমার জীবনে কেউ স্ত্রী হয়ে আসেননি।'

'কেন? আপনার কি কোনও গোলমাল আছে?'

'যাচাই করার সুযোগ হয়নি ম্যাডাম।'

'ও, ম্যাডাম বলার কী দরকার? জুলি বলবেন, বুঝলেন?'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে।'

'তাহলে আপনি একা থাকেন। নিজেই নিজের সংসার চালান। কিন্তু আপনার বয়স তো চল্লিশের নিচে। এই বয়সেই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একলা থাকছেন, এর মধ্যেই প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন, তাই না?' জুলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'তেমন কিছু নয়। তবে যা পেয়েছি তার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে।' বললাম। 'সেই টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার পরিশ্রম করতে বেরুব।'

'হুম্।' খানিকটা হাঁটার পর জুলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একা থাকতে আপনার ভালো লাগে?'

'মন্দ লাগে না, শুধু এটুকু বলতে পারি।'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি নিশ্চয় তার থার্ড ওয়াইফ?'

মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'এ ব্যাপারে উনি আপনার থেকে তিনগুণ সক্রিয় পুরুষ। আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন আমার থেকে এত বেশি বড় একটা লোককে কেন বিয়ে করলাম।' জুলি তাকাল।

'কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে একথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

'রাইট!' মাথা দোলালেন জুলি।

এখন এই রাস্তার দু-ধারে যেসব বাড়ি তার সবগুলো কাঠের। রাস্তার ওপর এখনও ফিনফিনে কুয়াশা। সামনেই বনবিভাগের দপ্তর, পূর্তদপ্তরের কার্যালয়। এর পরেই ডানদিকে ঘুরলেই বাজার। বললাম, 'আমরা বাজারে পৌঁছে গিয়েছি।'

'আপনি কী কিনবেন? খুব দেরি হবে?' জুলি দাঁড়ালেন।

'মাংস।' খুব নির্লিপ্ত গলায় বললাম।

'অ। আমি ভেজিটেরিয়ান। এতটা পথ একা ফিরে যাওয়া বিরক্তিকর। আমরা কি ফেরার সময়টা ঠিক করে নিতে পারি?' ঘড়ি দেখে বললাম, 'ঠিক আধঘণ্টা বাদে এখানে দেখা হতে পারে?'

'ওটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট করুন।'

'ঠিক আছে।'

ভদ্রমহিলাকে সবজির বাজারের মুখে ছেড়ে দিয়ে মাংসের দোকানের সামনে পৌঁছে দেখলাম ওটা বন্ধ। ওপাশে কয়েকজন দিশি মুরগি নিয়ে বসে আছে কিন্তু তাদের চেহারা দেখে ইচ্ছে হল না নেওয়ার। ভিড় হয়েছে যে মাছওয়ালার সামনে সে একটা বিশাল বোয়াল কেটেছে। দেখলেই বোঝা যায় মাছটা তাজা। মাছওয়ালা অন্যদিনের থেকে বেশি দাম চাইছে বলে খদ্দেরদের সাথে ঝগড়া হচ্ছে।

ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে বললাম, 'দু-কিলো।'

মাছওয়ালা বলল, 'দাম কম হবে না কিন্তু।'

হাসলাম, 'ভালো জিনিসের দাম সবসময় বেশি হয়।'

'বলুন বলুন। আপনি যে হক কথাটা বললেন তা কেন এরা বুঝতে পারে না? চটপট দু-কেজি মাছ কেটে টুকরো করে পলিথিনের প্যাকেটে ভরে দিল মাছওয়ালা। দাম মিটিয়ে মশলার দোকান থেকে কিছু মশলা কিনে নিলাম। দু-কেজি সলিড বোয়াল মাছ মাংসের চেয়ে কোনও অংশে

খারাপ নয়। ছেলেবেলায় বাড়িতে বোয়াল মাছ ঢুকত না। কেউ খেত না। এখন ব্যাপারটাকে নেহাতই বোকামি বলে মনে হয়। এই শহরের একমাত্র বিলিতি মদের দোকানের সামনে চলে এসেছি। একটা বড় বোতল রাম কিনলাম। এখানে আসার পরে হুইস্কি থেকে রামে এসে দেখলাম বেশ ভালো লাগছে। নিচে নেমে চায়ের দোকানে ঢুকে ডিমের পোচ আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম। দোকানে ভিড় নেই। নিচের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কুয়াশারা এখন পাহাড়ের মাথায় চলে গেছে। হালকা রোদ উঠেছে।

মহিলার নাম জুলি। প্রথম দর্শনে বুঝতে পারিনি কিন্তু রাস্তায় নামার পর বোঝা যাচ্ছিল ওর ফিগার অসম্ভব রকমের ভালো। কোনও-কোনও মহিলাকে ঈশ্বর তেমন মুখ-চোখ না দিয়ে শরীরটাকে নিখুঁত করে দেন। ইনি তাদের একজন। ডাবল বয়সের প্রাক্তন নাবিককে মহিলা বোকার মতো করে রেখেছেন। আচ্ছা এই নাবিক ভদ্রলোকের প্রথম স্ত্রী-র গল্প যা শুনেছি তাতে বোঝা যায় ওর মেজাজ খুব শান্ত ছিল। সমুদ্র থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ি ফিরত তখন খুব সেবাযত্ন করত। দ্বিতীয় পক্ষের বউটা নাকি একটু বোকাসোকা ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ছিল না। ভাবতেই হাসি পেল আমার। অজান্তেই শব্দ করে হাসলাম।

'আপনাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম।'

অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে ওপাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই ভুলটা বুঝতে পারলাম। কথাটা তার উদ্দেশে নয়, ওখানে যারা বসে আছে তাদের একজন আর একজনকে বলছে। সঙ্গে-সঙ্গে টিঙ্কুর মুখ মনে এল, 'সারাক্ষণ এত গম্ভীর থাকা কেন? হাসতে পারো না?'

'কী করব বলো? আমার মুখটাই এইরকম।' বলেছিলাম। 'তোমার সঙ্গে কথা বলে পারি না।' টিঙ্কু সরে গিয়েছিল।

ওটা ওর স্বভাব ছিল। তোমার সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারি না, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে পারি না। অথচ অত না পেরেও এখন কেমন করে আমাকে অধিকার করে রয়ে গেছে।

খাবার এল। মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। এই সময় রেস্টুরেন্টের মালিক এসে সামনে বসল, 'গুড মর্নিং স্যার।'

'গুড মর্নিং।'

'আপনাকে অনেকদিন ধরে দেখছি, মাঝে-মাঝেই দোকানে আসেন কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকেন বলে বিরক্ত করিনি। আপনার নাম জানতে পারি?'

'শান্ত।'

'তাহলে ভুল হয়েছে।'

'মানে?'

'কাল বিকেলে দুজন লোক একজনের খোঁজ করছিল। তার চেহারার বর্ণনা আপনার সঙ্গে মেলে।'

'আচ্ছা!'

'ওরা কারা?'

'কখনও দেখিনি। মনে হয় এখানে প্রথম এসেছে।' একটা নাম আর চেহারার বর্ণনা দিন। বলল লোকটা এখানেই থাকে। 'আমি আন্দাজের ওপর কথা বলি না। তা ছাড়া।' দোকানদার কথা শেষ করবে কি না ভাবল।

একটু অপেক্ষা করে বললাম, 'বলুন।'

'মানে, লোকদুটোর চেহারা, কথা বলার ধরন ভালো নয়।'

'তাই?' পার্স খুলে বেয়ারাকে ইশারায় ডাকলাম।

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওদের একজনের কোমরে রিভলভার গোঁজা ছিল।'

কত হয়েছে জেনে নিয়ে দাম মিটিয়ে দোকানদারকে বললাম, 'খবরটা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'এখানে আপনি কোথায় বাড়ি নিয়েছেন স্যার?'

'মাইল খানেক দূরে। চলি। দেখা হবে।' মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

জুলির জন্য অপেক্ষা করছিলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু দুশ্চিন্তাকে এড়াতে পারলাম না। এখানে কারা আবার আমার খোঁজে এসেছে যাদের কোমরে রিভলভার গোঁজা আছে? লোকগুলোর চেহারা, কথা বলার ধরন দোকানদারের ভালো লাগেনি। কোনও ডিটেকটিভ এজেন্সির লোকজন সাধারণত এরকম ধারণা মানুষের মনে তৈরি করবে না। তাহলে কি এরা স্রেফ ভাড়াটে গুন্ডা? কে পাঠাল ওদের আমায় খুঁজে বের করতে?

বেশ ছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেউ যেন ঘরের পেছনে নিশ্বাস ফেলছে। তাহলে কি আমাকে গোপনে এখান থেকে চলে যেতে হবে? আচ্ছা লোকদুটো নিশ্চিত হয়ে কী করে বলল, আমি এখানেই থাকি? কে খবর দিল ওদের? আবার এমনও হতে পারে ওরা অন্য কারো খোঁজ নিতে এসেছে। চেহারায় মিলে যাওয়ায় দোকানদার ভুল করেছে। ওরা তো শান্ত নামটা ব্যবহার করেনি। যারা আমাকে খুঁজতে আসবে তারা নাম জিজ্ঞাসা করবে না? অবশ্য আসল নামটাকে আমি একটু ছোট করে নিয়েছি এখানে। তবে প্রশান্ত আর শান্তের মধ্যে তেমন কি ফারাক।

একটা গাড়ির আওয়াজ। কারা এল এবং সেইসঙ্গে মহিলা কণ্ঠে, 'উঠে পড়ুন' চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম এখানকার বাজারে, যে গুটিকয়েক ট্যাক্সি রয়েছে তার একটাকে নিয়ে এসেছেন জুলি। আমাকে অবাক হতে দেখে পাশে পৌঁছে বললেন, 'আর হাঁটতে পারছি না। ওপর-নিচ করতে-করতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। চলে আসুন।'

দরজা খুলে মালপত্র নিয়ে মহিলার পাশে বসতেই ট্যাক্সি ছাড়ল। এত আওয়াজ হয় যে হর্ন বাজানোর দরকার পড়ে না।

'কী-কী কিনলেন?'

'ওই যে বলেছিলাম। মাংস পেলাম না, মাংসের চেয়ে ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম। বোয়াল মাছ। সেই সঙ্গে মশলা আর মদ।' বললাম আমি।

'আপনি রোজ মদ খান?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো লাগে?'

'খারাপ লাগলে খেতাম না।'

'হুম্। আমি এখানে আসার আগে এই নাবিক ভদ্রলোক আপনার বাড়িতে যেতেন?'

'হ্যাঁ। তাঁর মনের সব কথা উগরে দিতে আমাকে প্রয়োজন হত।'

'মদ খেত না?'

'না। কোন দ্বীপে কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মদ ছোঁবেন না।'

'সাত বছর সময়টা এখনও শেষ হয়নি।'

'কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জানেন। আমার বাবার কাছে। আমার দিকে ছোঁক-ছোঁক করেছিল বলে বাবা শর্তটা দিয়েছিল। এমনিতেই এত বড়, তার ওপর মাতাল। কোনও বাবা রাজি হয়? বাবা আমাকে বলেছিল সারাজীবন মদ খাওয়ার পর সাত বছর না খেলে শরীর ভেঙে পড়তে বাধ্য। বার্ধক্য এসে যাবে চটপট। তখন আর আমাকে বিয়ের কথা ওর মাথায় থাকবে না। বলুন। তা বাবা মারা গেল দু-বছরের মধ্যে। ওর প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভাঙল না। এই আত্মত্যাগ দেখে আমি মরলাম, বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম।'

'তারও পরে সাত বছরের প্রতিজ্ঞা কী দরকার?'

'বলেছিলাম। কিন্তু লোকটা এমন গোঁয়ার যে বলল প্রতিজ্ঞা ভাঙলে নাকি বাবার আত্মাকে অসম্মান করা হবে। মর তুই।' জুলি জানালার বাইরে তাকালেন। ওদের বাড়ি এসে গেল। জুলি বললেন, 'আলাপ হল। এভাবেই যাতায়াতের পথে দেখা হলে কথা হবে। ঠিক আছে?'

মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। ড্রাইভারকে যে ভাড়া দেওয়া হবে তাতে সে আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু জুলি কিছু না বলায় আমি অপেক্ষা করলাম না। ততক্ষণে দরজা খুলে প্রাক্তন নাবিক বেরিয়ে এসেছেন তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে সাহায্য করতে।

এই সময়ে ঠান্ডাটা সামান্য কম বলে চটপট কয়েক পিস মাছ রান্না করে ফেললাম। একা থাকার আগে আমি কখনও কিচেনে ঢুকিনি। ঢুকতে হবে যখন, তখন রান্না করার নিজস্ব পদ্ধতি নিজেই আবিষ্কার করে নিলাম। ভাত এখন করলে খাওয়ার সময় সেটা এমন ঠান্ডা হয়ে যাবে যে, গেলা যাবে না। কাজকর্ম শেষ করে রামের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে জানালার পাশের টেবিলে গিয়ে বসলাম। এখান থেকে রাস্তার অনেকটাই দেখা যায়। কেউ এলে আমার চোখ এড়াতে পারবে না। একটা বাদামের সঙ্গে এক চুমুক রাম অতি উপাদেয়। গলা দিয়ে চালান করে আমি চোখ বন্ধ করলাম। কে হতে পারে? ভাড়াটে গুন্ডা নিশ্চয়ই নিজেরাই আসবে না, কেউ ওদের পাঠিয়েছে টাকা খরচ করে। এই কেউটা কে? আট বছর আগে আমি স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে একটা বড় ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরি পেয়েছিলাম। প্রথমদিকে ওরা আমাকে সেইসব নারী-পুরুষের পেছনে খবর জোগাড় করতে পাঠাত, যাদের একজন আমাদের কাছে এসে ডিভোর্সের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য চাইত। খুব বিশ্রী কাজ। নারী যদি ক্লায়েন্ট হত তাহলে সারাদিন পুরুষটি কোথায়-কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে তা জানতে হত। আর পুরুষ হলে নারীটি কারও সঙ্গে প্রেম করছে কিনা সেটা জেনে প্রমাণ জোগাড় করতে হত। কোনও থ্রিল নেই এই কাজে। বছরখানেক বাদে আমার প্রমোশন হল। দুই বড় শিল্পপতি, যাদের সামনাসামনি সদ্ভাব থাকলেও অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর, তাদের কেউ ক্লায়েন্ট হয়ে আসায় আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন মালিক। সেই কাজে চমৎকার সাফল্য পাওয়ার পরই কাল হল। কলকাতায় একজন বড় ব্যাবসায়ী আমাদের কোম্পানিকে প্রস্তাব দিলেন আমি যেন তার দেহরক্ষী হিসেবে সিমলায় যাই। সেখানে তিনি একটা ব্যাবসায়িক মিটিং করতে যাচ্ছেন। টাকার অঙ্ক ভালো বলে মালিক রাজি হয়ে গেলেন। সেই প্রথম প্লেনে উঠলাম আমি। দিল্লি হয়ে চণ্ডীগড়। সেখান থেকে গাড়িতে কালকা হয়ে সিমলার পথে। সিমলায় বড় হোটেলে ওঠা হল। কোনও কাজকর্ম নেই, বেশ আরামে দিন কাটছিল। ভদ্রলোকের কাছে মাঝে-মাঝে দু-একজন লোক আসে। তখন আমাকে বাইরে থাকতে হয়। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন আমাকে আর তাঁর দরকার নেই। তিনি ওখান থেকে বোম্বে চলে যাচ্ছেন। তবে আমি যেন একটা ছোট ব্যাগ তাঁর কলকাতার অফিসে পৌঁছে দিই। ব্যাগটিতে জরুরি কাগজপত্র আছে, ওটা যেন কখনই কাছছাড়া না করি। উনি একদিন পরে আসবেন বলে আমি সিমলা থেকে রওনা হলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার ড্রাইভার জানাল, একটা গাড়ি নাকি আমাদের অনুসরণ করছে। তবে সে কিছুতেই ওদের কাছে আসতে দেবে না। চণ্ডীগড় পর্যন্ত যে গতিতে গাড়ি ছুটল তাতে আমার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলাম রানওয়েতে কী গোলমাল হওয়ায় সেদিনের সব ফ্লাইট ক্যানসেল করা হয়েছে। অতএব হোটেলে উঠতে হল এবং সেই রাতে আমার ঘরে হামলা হয়েছিল। দুজন বন্দুক দেখিয়ে ঢুকে ব্যাগটা চেয়েছিল। আমি অস্বীকার করি। বলি, নিজের ব্যাগ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাগ আমার কাছে নেই। ওদের একজন তল্লাশি চালায়। ব্যাগটাকে আমি রেখেছিলাম বাথরুমের গিজারের ওপর। সেটা ওদের মাথায় আসেনি। না পেয়ে ওরা তখনকার মতো চলে যায়। এবার সন্দেহ হওয়ায় আমি ব্যাগ খুলি। ব্রাউন সুগারের প্যাকেটগুলো

নজরে পড়ায় পাথর হয়ে যাই। ওইরকম একজন মানী ধনী ব্যাবসায়ী আমাকে মিথ্যে কথা বলে কলকাতায় ব্রাউন সুগার পাঠাচ্ছেন কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

আমি আর দেরি না করে হোটেল ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সিমলায় ফিরে গেলাম। হোটেলে রিসেপশনে বলল, ভদ্রলোক ঘরে আছে। ওপরে উঠে বেল বাজালাম। কেউ খুলল না। শেষপর্যন্ত দরজায় চাপ দিতে সেটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে আমি হতভম্ব। ভদ্রলোক পড়ে আছেন মেঝের ওপর উপুড় হয়ে। শরীরে প্রাণ নেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম হোটেল থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে-যেতে একটা বিশাল ঝোরা যা আগেই চোখে পড়েছিল। তার পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েছিলাম ব্যাগ নিয়ে। ব্রাউন সুগারের প্যাকেটগুলো খুলে সমস্ত বিষ ঝোরার জলে ফেলে দিয়েছিলাম। প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি জলের সঙ্গে মিশে তীব্র বেগে নিচে চলে গিয়েছিল। তারপর শূন্য ব্যাগটাকে নিচের খাদে ছুড়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম।

চণ্ডীগড়ের হোটেলে পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম একটা বড় ভুল করেছি। ব্যাগের মধ্যে ব্রাউন সুগার রয়েছে জানামাত্র আমার উচিত ছিল অফিসে ফোন করে কী করণীয় তা জানতে চাওয়া।

মালিকের নির্দেশমতো কাজ করা। বেটার লেট দ্যান নেভার। আমি উঠলাম। হোটেল থেকে ফোন না করে কোনও এস.টি.ডি বুথে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দরজায় শব্দ হল। খুলতেই দেখলাম চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাকে অ্যারেস্ট করল। সিমলার হোটেলে কলকাতার বিখ্যাত ব্যাবসায়ীকে খুনের অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে গেল ওরা। তার আগে হোটেলের ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওরা আপত্তি করার মতো কিছু পেল না।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই ব্যাবসায়ীর সঙ্গে আমি দেহরক্ষী হিসেবে সিমলায় গিয়েছি। সম্ভবত তার কোনও গোপন ব্যাপার জানতে পেরে আমি ব্ল্যাকমেল করি।

উনি টাকা দিতে রাজি হননি। উলটে হোটেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যেহেতু ওর আর প্রয়োজন হচ্ছে না, তাই আমাকে উনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অতএব, হোটেল যেন আমার বিলটা ওঁর কাছে পৌঁছে দেয়। আমি হোটেল ছেড়ে চলে গেলেও আবার ফিরে আসি। রিসেপশনে জানতে চাই উনি ঘরে আছেন কিনা। ওঁর ঘরে গিয়েই আবার নিচে নেমে আসি এবং কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে বেরিয়ে যাই। পুলিশের ধারণা, ওই সময়েই আমি ভদ্রলোককে খুন করেছি। পরদিন কোর্টে তোলা হলে বিচারক আমাকে জামিন দিলেন না, আরও তদন্তের জন্যে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার কোম্পানির লোক খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর আমাকে লোকটি জানিয়ে গেল ফিরে গিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলবে। লোকটি যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল তখন একজন পুলিশ অফিসার পাশে থাকায় আমি ব্রাউন সুগারের ব্যাপারটার কথা না বলে যা ঘটেছিল সব বলেছিলাম। ততক্ষণে আমার মনে আত্মরক্ষার জন্য নানান যুক্তি তৈরি হয়ে ওঠায় আবার সিমলায় ফিরে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে যাওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম এক্ষেত্রে একমাত্র সাক্ষী রিসেপশনের সেই প্রৌঢ় লোকটি যাকে দেখলেই মনে হয় নেশা করে আছে। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম ওর দেখায় ভুল হয়েছে।

দিল্লির ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় আমি এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনায় এই হোটেলে উঠেছি এবং চণ্ডীগরের বাইরে যাইনি।

প্রায় তিনমাস পরে আমি জামিন পেলাম। আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছিল টিঙ্কু। ওর বাবা চণ্ডীগড়ের নামকরা উকিল। ওকালতি পাস করে ও বাবার জুনিয়ার। আমার কথা কাগজে পড়ার

পর ও একদিন জেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিল উকিলের প্রয়োজন আছে কি না? ততদিনে আমার মন এমন বিষিয়ে গিয়েছিল যে বলেছিলাম আর আমার কাউকে দরকার নেই, সুযোগ পেলে আমি নিজেই বিচারককে সব বলব।

টিঙ্কু হেসে বলেছিল, 'ঠিক কথা, কিন্তু আপনি যা বলতে পারবেন না তা আমি বিচারককে বলব। জানেন তো উকিলরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা বললে কোনও দোষ হয় না।' শেষপর্যন্ত আমি রাজি হলাম। আমার জামিন পাওয়া গেল। গ্রেফতার হওয়াব সময় অল্প কিছু টাকা পকেটে ছিল। সেগুলো ফেরত পাওয়া গেল। আমার ওপর আদালতের আদেশ ছিল যেন চণ্ডীগড়ের বাইরে না যাই। কলকাতার ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা আছে। ওদের চণ্ডীগড়ের ব্রাঞ্চে সেটা ট্রান্সফার করিয়ে নিলাম। টিঙ্কু আমার জন্য সস্তায় একটা ভালো গেস্টহাউসের ব্যবস্থা করে দিল।

জানালার পাশ থেকে উঠে এলাম। ইতিমধ্যে ছ-পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন দুপুর দেড়টা। অথচ বাইরের আলো ভোরের মতো। টিঙ্কু বলেছিল মদ খেতে দেখলে আমার খারাপ লাগে না কিন্তু মাতাল দেখলে গা ঘিনঘিন করে। এক সিটিং-এ ছ'পেগের বেশি এখন খাই না।

ভাতটা গ্যাসে চাপিয়ে দিলাম। গত রাত্রের কিছু কাজ বাকি ছিল, সেগুলো শেষ করলাম চটপট। তারপর লাঞ্চ করলাম। একবার পেটে ভাত পড়লে অদ্ভুত, ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আর মদ খেতে ইচ্ছে করে না। উলটো এখন শরীর আরাম চাইছে। হঠাৎই জায়গাটির কথা মনে পড়ল। আজ দুপুরে প্রতিদিনের মতো বিছানায় শুতে ঠিক স্বস্তি হচ্ছিল না। দোকানদারের কথা মনে আসতেই ঠিক করলাম ঝুঁকি নেওয়া অন্যায় হবে। দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় নামলাম। বাজারের রাস্তাব উলটোদিক ধবে একটু হাঁটলেই পথ শেষ। কিন্তু ওপরে ওঠা যায়। পাথরে পা ফেলে অনেকটা ওপরে ওঠার পর একটা আড়াল পার হতেই পাথরের চাতাল। বেশ বড়। ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতো। তখন এখানে কুয়াশা নেই, আধমরা রোদ নেতিয়ে রয়েছে। নিচের দিকে তাকালেই আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একদম ছবির মতো। চাতালে শুয়ে পড়লাম। পেটে মদ ছিল, তার ওপর ভাত পড়ায় ঘুম আসতে দেরি হল না। কিন্তু আমি জেগে থাকতে চাইলাম। মনে হচ্ছিল, দোকানদারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে যারা খোঁজ করছে তারা আজ সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে। পাহাড়ের অচেনা জায়গায় কেউ রাত্রে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না। আমি উপুড় হয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

টিঙ্কুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সে আমার কেসটায় আগ্রহী হল। টিঙ্কু হেসে বলেছিল, 'খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে। মনে হয়েছিল এই লোকটা খুন করতে পারে না' তারপর সিরিয়াস হয়ে বলেছিল, 'কোনও খুনি চাইবে না প্রমাণ রেখে খুন করতে। তুমি রিসেপশনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে খুন করে আবার ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা হতেই পারে না।'

টিঙ্কু আদালতে প্রমাণ করেছিল যে আমি সিমলা থেকে চণ্ডীগর যখন যাই তখন একটা গাড়ি আমাদের ফলো কবেছিল। সম্ভবত আততায়ী জানতে চাইছিল আমি সত্যি রিপোর্ট করেছিলাম কি না। এবং ওরা আমাকে এক রাত্রের জন্য হোটেল দিয়েছিল। হোটেল বলেছে আমি চেক ইন করেছিলাম। তবে দুপুরের পর আমি কখন বেরিয়েছিলাম তা ওরা লক্ষ করেনি, তবে ফিরেছিলাম রাত দশটার সময়। ফ্লাইট চালু থাকলে যার দিল্লি হয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার কথা তার নিশ্চয়ই সিমলার কাউকে খুন করার পরিকল্পনা থাকতে পারে না। দুটো সিনেমা হলের ম্যাটিনি এবং ইভিনিং শো-এর টিকিট কোর্টে দাখিল করে টিঙ্কু বলেছিল আমি সেদিন ওই চণ্ডীগড়ে সিনেমা হলে বসেছিলাম। পুলিশের উকিল রিসেপশনিস্টকে হাজির করেছিল আদালতে সাক্ষী হিসেবে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক কথা বলছিলেন মাটির দিকে তাকিয়ে। তার মনে হচ্ছে তিনি আমার স্বার্থে কথা বলেছেন। টিঙ্কু কিছুক্ষণ কথা বলার পর বিচারককে অনুরোধ করল সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে এই বলে যে, টিঙ্কুর চেহারা কীরকম। টিঙ্কু সাক্ষীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক থতমত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন,

'অল্প বয়স।' বিচারক আদেশ দিলেন, 'চেহারা বর্ণনা করুন।' ভদ্রলোক সংকোচে বললেন, 'মহিলার মুখ বলে তিনি ভালো করে লক্ষ করেননি।' দর্শকরা হেসে উঠলে টিঙ্কু বলল, 'আর আমার কিছু বলার নেই। যে সাক্ষীর সঙ্গে এ মুহূর্তে কথা বলছি, তিনি যখন আমার মুখের দিকে তাকাননি তাঁর পক্ষে কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি মনে রেখে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব কি না আদালত বিচার করবেন।' সরকারের উকিল তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। নারীর মুখের দিকে তাকান না যিনি, তিনি পুরুষের মুখ দেখবেন না—এমন ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু সেটা বিচারকের মনে রেখাপাত করল না। প্রায় এক বছর পরে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

ততদিনে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি। টিঙ্কুর বাবার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সে আমাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু আমার তখন রোজগার নেই। টিঙ্কুর উদ্যোগে আমরা একটা ফার্ম খুললাম। আইন সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য দেওয়া হবে। টিঙ্কু আইনের দিকটা দেখবে আর আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমার কেসটা জেতায় টিঙ্কুর খুব নাম হয়েছিল। ফলে প্রচুর ক্লায়েন্ট আসতে লাগল। সবাই যে কোর্টে যেতে চায়, তা নয়। ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি কোর্টের বাইরে সমস্যার সমাধান করতে লাগলাম। দু-বছরের মধ্যেই ভালো রোজগার হল।

এই সময়ে আমরা রেজিস্ট্রি করলাম। যেদিন ছুটি থাকত, সেদিন মনে হত পৃথিবীটা আমাদের। সন্ধ্যা হলেও আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে লং ড্রাইভে যাওয়া ছিল ওর নেশা।

মাস ছয়েক পরে টিঙ্কুকে সিমলায় যেতে হয়েছিল কাজে। বলেছিলাম, গাড়ি না নিয়ে ট্যাক্সিতে যেতে। গাড়ি চালাতে যে ভালোবাসে তাকে এই প্রস্তাব দিলে কাজ হয় না। ভোরবেলায় বেরিয়ে গেল। বলল, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। সেই শেষ দেখা। পুলিশ খবর দিল, ওর গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। সম্ভবত ব্রেক ফেল করায় রাস্তা ছেড়ে খাদের গভীরে আছড়ে পড়েছে। অন্ধকারের জন্য আজ উদ্ধারের কাজ করা সম্ভব হয়নি। আগামীকাল সকালে সেটা হবে। পাগল হয়ে গেলাম যেন। তখনই দুর্ঘটনাস্থলে যেতে চাইলাম। মনে হচ্ছিল, খাদে পড়া সত্ত্বেও টিঙ্কু তো বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশ আমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। ভোরবেলায় রওনা হলাম। স্থানীয় পুলিশ তখন উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। ওপর থেকে দেখেই বুঝলাম, কোনও আশা নেই। টিঙ্কুর গাড়িটা টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে। সারাদিন পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়েছিল। রক্তমাখা জামাকাপড় ছাড়া টিঙ্কুর আর কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। জলজ্যান্ত মেয়েটার শরীর উধাও হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের ধারণা শরীর টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং সারারাত ধরে বন্যজন্তুরা সেগুলো ভোজন করেছে।

এই মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারিনি। চণ্ডীগড়ে থাকতে পারিনি আর। সবকিছু বন্ধ করে এলোমেলো ঘুরেছিলাম নানান শহরে। শেষপর্যন্ত এখানে এসে মনে হয়েছিল নিজের মতো থাকতে পারব। না। আমি টিঙ্কুকে এখন স্বপ্নেও দেখি না। তবে ওর কথা, ওর হাসি, ওর তাকানোর ভঙ্গি মাঝে-মাঝেই জেগে থাকা অবস্থায় মনে পড়ে যায়। তবে এই মাঝে-মাঝের মধ্যে সময়ের ফারাক বাড়ছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই বাজপাখিটাকে দেখতে পেলাম। খানিকটা ওপরে পাথরের ওপর বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দূরদৃষ্টি নিয়ে। ঝটপট উঠে বসতেই পাখিটা উড়ে গেল।

চারপাশে তাকালাম। আলো যেটুকু ছিল এখন তার অল্পই অবশিষ্ট আছে। বোধহয় সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। নিচের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। কেউ একজন আমার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন নয়, একজন। তারপরেই চিনতে পারলাম। জুলি। জুলি আমার কাছে এসেছে কোনও প্রয়োজনে? প্রয়োজন থাকলে তো প্রাক্তন নাবিককেই পাঠানো উচিত। আমি জানান দিলাম, না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জুলি ফিরে গেল।

আমি উঠলাম। এখনও অন্ধকার নামেনি। কিন্তু তার আগে আমার উচিত কিছুটা নিচে চলে যাওয়া, অন্ধকারে এত উঁচু করে নামা সহজ কাজ নয়।

সন্ধ্যা নামলে নেমে এলাম বাকিটা। এদিকে রাস্তায় আলো নেই। আকাশে মেঘ থাকায় রাতের আগেই অন্ধকার ঘন হয়ে যায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ওটাকে ভালো করে বন্ধ করে চা বানালাম। তারপর মগটা নিয়ে ওপাশের জানালার পাশে গিয়ে বসলাম। জানালার নিচে অনেকটা খাদ। খাদের ওপাশে রাস্তা। সেখান দিয়ে ছাড়া আমার এখানে পৌঁছনোর কোনও উপায় নেই। যেই আসুক, আমার চোখ এই অন্ধকারেও তাকে বুঝতে পারবে। যে ভদ্রলোক সিমলার হোটেলে খুন হয়েছিলেন তার হত্যাকারী আমি চণ্ডীগড়ে থাকাকালীন সময়েও ধরা পড়েনি। আমি জামিন পাওয়া শেষে মুক্ত হওয়ার পর দু-বছরের ওপর টিঙ্কুর সঙ্গে ছিলাম কিন্তু কেউ আমায় বিরক্ত করেনি। কোনও দাবি নিয়ে কেউ সামনে দাঁড়ায়নি। চণ্ডীগড় থেকে বেরিয়ে আমি যেখানে গিয়েছি কখনও বুঝতে পারিনি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কিনা। না সম্ভব নয়, অনেক জায়গায় আমি হঠাৎই মাঝরাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরেছি। যত ধুরন্ধর অনুসরণকারী হোক, আমি হোটেলের ঘরে শুয়ে আছি জানার পর মাঝরাতে হোটেলের বাইরে জেগে থাকবে না। তা হলে আমার খোঁজে এই পাহাড়ি শহরে কেউ আসবে কী করে? কীভাবে বলবে আমি এখানে থাকি! হ্যাঁ, যারা আমার কাছে ব্রাউন সুগারের ব্যাগ খুঁজতে এসেছিল তারা এতদিন চুপচাপ থেকে হঠাৎ জেগে উঠবে এটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এত বছর ব্যাগটাকে নিশ্চয়ই আমি সঙ্গে রাখব না।

হঠাৎ দূরে আলো দেখতে পেলাম। জ্বলছে নিভছে এবং জ্বলছে। আলোটা এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি সতর্ক হলাম। পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট না হলে দরজা খুলব না। যদি দরজা ভাঙার চেষ্টা করে তাহলে বাড়ির পেছনের দরজা যার সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে, ব্যবহার করব। ক্রমশ আলোটা আমার বাড়ির সামনে এল। টর্চের আলো এসে পড়ল বাড়ির ওপরে। তারপরেই আমি জুলির গলা শুনতে পেলাম, 'মিস্টার শান্ত, মিস্টার শান্ত।'

সবিস্ময়ে দরজা খুললাম। আলোটা জ্বালার কথাও মনে পড়ল না। টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে, 'ওঃ ইউ আর হিয়ার! কোথায় গিয়েছিলেন? আমি কয়েকবার আপনাকে খুঁজে গিয়েছি। ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' আমি, আলো জ্বালালাম।

জুলি ভেতরে এলেন, 'আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।' ওর হাতে একটা ব্যাগ।

'বসুন।' আমি দরজা বন্ধ করলাম।

জুলি চেয়ারে বসলেন, 'ও নেই।'

'মানে?'

আজ বিকেলে দুজন লোক আমাদের বাড়িতে এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। লোক দুটোর চেহারা দেখে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আমি যাতে শুনতে না পাই, তাই বাড়ির বাইরে গিয়ে কথা বলল। অনেকক্ষণ ধরে ওদের সঙ্গে তর্ক করে আপনার বন্ধু বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ফিরে এসে বলল, একটা জরুরি কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল বিকালের আগে ফিরতে পারবে না। কী জরুরি কাজ জানতে চাইলে বলল, ফিরে এসে বলব। একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস আর শার্ট নিয়ে ও চলে গেল স্কুটারে।

এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমাকে কোনও কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করল না? শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল, আবার মাথার ওপর থেকে বিশাল ওজন নেমে গেল। প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?'

'তবে হ্যাঁ, ও যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেল সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'না। আমি কিছুই জানি না।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী কোনও ক্রিমিনালদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

'আমার তো মনে হয় না।'

'তাহলে ও যাবে কেন? আর আমাকে ও বলতে পারল না কেন?'

'হ্যাঁ, এইটা অস্বাভাবিক। চা খাবেন?'

'না, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি মায়ের কাছে চলে যেতে।'

'আহা, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উনি ফিরে এলে।'

'কোথায় অপেক্ষা করব? এই বাড়িতে? একা?' মাথা নাড়লেন জুলি।

'ভয়ে আমি মরে যাব। আর কে বলতে পারে আমি একা আছি জেনে লোকদুটো আবার ফিরে আসবে কিনা। উঃ। কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি।'

'হ্যাঁ একা থাকা, বিশেষ করে আপনার মতো মহিলার পক্ষে খুব মুশকিল।'

'আমি যদি বুড়ি হতাম, অথর্ব হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই পারতাম।' জুলি মাথা নাড়ল, 'এখানে তো ভালো হোটেলও নেই।'

'হোটেলে থাকার চেয়ে আমি এখানে থাকলে ভালো থাকব।' জুলি বললেন।

'এখানে?' আমি হতভম্ব।

'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

জুলি উঠে দাঁড়ালেন, 'বেডরুম তো দুটো দেখছি।'

'না-না, আপত্তি কীসের আপনি স্বচ্ছন্দে থাকুন। তবে...।'

'তবে'

'আমি মদ্যপান করি, গন্ধটা সহ্য করতে হবে।'

'অপমানের জ্বালার থেকে মদের গন্ধ কি বেশি তীব্র? কোন ঘরে যাব?'

'যে-কোনও ঘর।'

ব্যাগ নিয়ে জুলি আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল, দরজা ভেজিয়ে দিলেন না। আমি মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলাম। তাহলে প্রাক্তন নাবিকের সন্ধানে এসেছিল লোকদুটো। কী জন্য এসেছিল তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমার কোনও সমস্যা নেই জানার পর বেশ হালকা লাগছে। কিন্তু জুলিকে রাতে কী খাওয়ানো যায়? মাছ ভাত কি খাবে? মিনিট দশেক পরে জুলি বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর পরনে ম্যাক্সি আর শাল। সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'দিন আমাকে, মদ খেলেই ভীষণ ঘুম পায়। ঘুমালে মাথায় চিন্তা থাকবে না। রাতটা দিব্যি কেটে যাবে।'

গ্লাসে বরফ ঢেলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলবেন, কতটা জল দেব।'

'অল্প।'

'সেইমতো গ্লাস এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে কী খাবেন?'

'কিছু না।'

এলোমেলো কথা, বেশিরভাগই প্রাক্তন নাবিককে গালাগালি, শেষ করে, তিন গ্লাস পেটে চালান করে উঠে পড়লেন, 'ঘুম পাচ্ছে। শুতে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই রাতে আমার ঘরে ঢুকবেন না। না, না বলবেন না। আপনি যদি পুরুষ হন, তাহলে আপনার ইচ্ছে করবে। কিন্তু অতিথির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা অভদ্রতা, তাই না?' জুলি চলে গেলেন।

কথাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে গেলেন জুলি। আমি আর মদ খেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কোনও অবস্থায় মাতাল হব না। হঠাৎ আমার মনে হল, জুলি আমার ঘরে আসতে পারেন। আমি তো ওঁর অতিথি নই। তাই অভদ্রতা হবে না। দিনেরবেলায় পাহাড়ের ওপরে পালিয়েছিলাম। রাতে কোথায় যাব? তা ছাড়া আমার মনে অন্য ভাবনা যদি আসে? আলো নিভিয়ে দ্বিতীয় ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। নিজেকে চোর বলে মনে হচ্ছিল, আর পুলিশ যেন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাল রাতে বেশি মদ্যপান করে ফেলেছিলাম। বেশি মদ খেলে আমার শরীর অচল হয়ে যায়। তখন সবকিছুতেই আলস্য লাগে। এমনকী খাবার খেতেও ইচ্ছে হয় না। আমি সেটাই চেয়েছিলাম। দরজা বন্ধ করে কোনওমতেই শরীরটাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। অর্থাৎ খালি পেটে অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য আমার হ্যাঙওভার হয়েছে। চোখ মেলতেও কষ্ট হচ্ছিল। বাইরে রোদ নেই কিন্তু ঘড়ি বলছে ন'টা বেজে গেছে। জুলির কথা মনে পড়ল। পাশের ঘরে সে আছে। হাজার হোক এই বাড়িতে ও এখন অতিথি। ভোরবেলায় ওকে চা দেওয়া আমার কর্তব্য। অবশ্য এখন ভোর চলে গিয়ে ভরা সকাল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠতেই দরজায় শব্দ হল।

আমি জানান দিতেই জুলি বলল, 'ব্রেকফাস্ট রেডি।'

আমি বন্ধ দরজার দিকে তাকালাম। মেয়েরা কি যেখানেই যায় সেখানেই নিজের মতো করে সব গুছিয়ে নেয়? এমনভাবে ব্রেকফাস্ট রেডি বলল যে, শুনলে যে কেউ ভাববে ও এই বাড়িরই কেউ। পরিষ্কার হয়ে এক গ্লাস জলে দুটো ডিসপিরিন ফেলে দিয়ে খেয়ে নিয়ে বাইরে বের হলাম। জুলি চলছিল স্কার্ট আর হাতকাটা শার্ট পরে। মেয়েদের এমনিতেই ঠান্ডা কম লাগে। এর বোধহয় আরও কম। বললাম, 'গুড মর্নিং!'

আমার দিকে তাকিয়ে জুলি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'কী ব্যাপার?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনার মুখটা আয়নায় দেখুন, চিনতে পারবেন না।' জুলি আবার হাসছেন—'কী বিশাল হয়ে গিয়েছে ফুলে। দরজা বন্ধ করে প্রচুর ড্রিংক করেছেন, না?'

'ওই আর কী!' দরজা বন্ধ করে শব্দতিনটে কানে ঢুকল। তার মানে জুলি রাতে আমার ঘরের দরজা পরখ করে গেছে।

চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। সামনের রাস্তা নিঝুম। ছায়া জড়ানো। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'এবার আপনার থানায় যাওয়া উচিত।'

'থানায়?'

'হ্যাঁ। আপনার স্বামীকে দুজন লোক কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে তা থানাকে জানানো দরকার। ওঁকে উদ্ধার করতে তো হবে।' আমি বললাম।

'আমিও মনে করেছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে আসে।'

'তার মানে?'

'আপনার প্রতিবেশীর যদি কোনও গলতি থাকে?'

'থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সেটা জানি না। যদি খারাপ কিছু হয় তাহলে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করবে, কেন কিডন্যাপ হওয়ার পরও আপনি জানাননি।'

জুলির মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল, 'কিন্তু থানা কোথায় আমি জানি না। তা ছাড়া শুনেছি, পুলিশ নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করে! আপনি সঙ্গে যাবেন?'

'যেতে পারি।' কিছু না ভেবেই বললাম।

সঙ্গে-সঙ্গে দুশ্চিন্তা চলে গেল জুলির মুখ থেকে। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিই।'

এত অল্প সময়ের মধ্যে তিন-তিনটি আইটেম করে ফেলেছেন উনি। খেতে বেশ ভালো লাগছে। বললাম, 'আপনার রান্নার হাত বেশ ভালো।'

'তাই।'

'নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধতাম, এখন মনে হচ্ছে আমার কপাল বেশ ভালো।'

'দুপুরে কী খাবেন বলুন? আপনার ফ্রিজে দেখলাম বোয়াল মাছ আছে।'

'আমার এখানে এসে আপনি রাঁধবেন কেন?'

'কারণ আমার রাঁধতে ভালো লাগে।' জুলি হাসলেন।

প্রশ্নটা না করে পারলাম না, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে গতকাল যেরকম দেখেছি আজ তার ঠিক উলটোটা, কী করে হল?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আপনাকে গতকাল সকালে বেশ বয়সি, গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। আজ আপনি খুব সহজ, ঘরোয়া।' বললাম।

'তাহলে সঙ্গগুণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।' জুলি খাওয়া শেষ করল।

'কেন? নাবিক কি অন্যরকম মানুষ?'

'আমি জানি না। তবে ওই বাড়িতে ঢুকলেই মনে হয় পৃথিবীতে আমার কোনও বন্ধু নেই।'

'আপনাদের তো প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল?'

'আর প্রেম। তিরিশ বছরের গ্যাপটা এখন সব প্রেম উড়িয়ে দিয়েছে। আমার কথা থাক। আমরা কি এখন থানায় যাব, না লাঞ্চের পরে?' জুলি উঠে দাঁড়ালেন।

'এখনই যাওয়া ভালো।'

বেরুবার আগে পাশের ঘরে গিয়ে খুশি হলাম। এর মধ্যেই চমৎকার গুছিয়ে ফেলেছেন জুলি ঘরটাকে। বেশ দেখাচ্ছে।

জিনস্ আর জ্যাকেট, হাতে ছাতি নিয়ে জুলি আমার সঙ্গে রওনা হলেন। নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'একটা লোক রেখে গেলে হত। যদি ও এর মধ্যে ফিরে আসে। যাক, আসবে বলে মনে হয় না।'

একটা ব্যাপার আমাকে হঠাৎ ভাবাল। কাল থেকে স্বামী নেই, ওঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিন্তু জুলিকে তো তেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে না। অন্য বউ হলে কান্নাকাটি করত। তৃতীয় পক্ষ বলেই বোধহয় এতটা আবেগ আসে না।

গল্প করতে-করতে আমরা থানায় পৌঁছে গেলাম। থানার অফিসার জুলির মুখে ঘটনাটা শুনলেন। তারপর আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি আপনার কে হন?'

জুলি বললেন, 'প্রতিবেশী।'

অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একেবারে পাশেই থাকেন?'

'একটু দূরে, তবে মাঝখানে কোনও বাড়ি নেই।'

'ওহো, বুঝতে পেরেছি।

'আপনি তো একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'এর সঙ্গে কতদিনের আলাপ?'

'গতকালই পরিচয় হয়েছে।'

'সে কী? ম্যাডাম কতদিন আপনি স্বামীর সঙ্গে ওই বাড়িতে বাস করেছেন?'

'দু-মাস।'

'এই দু-মাসে আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়নি?'

'আমি আগ্রহী ছিলাম না তাই। আমার স্বামী যেতেন ওর কাছে।'

'আপনাব স্বামীকে কে কিডন্যাপ করতে পারে?'

'আমার কোনও ধারণা নেই।'

'আপনার কি ধারণা আছে মিস্টার...?'

'না।' মাথা নাড়লাম আমি।

'কাল থেকে আপনি ওই বাড়িতে একাই আছেন?'

'আপনার স্বামীর একটা ছবি চাই।'

জুলি ব্যাগ খুলে একটা ছবি বের করে দিলেন, 'আমরা দুজন এতে আছি।'

অফিসার দেখলেন ছবিটাকে, 'আপনার স্বামী? আশ্চর্য তো! দেখে মনে হচ্ছে আপনি ওঁর মেয়ে। ঠিক আছে, এই ছবি আমি রেখে দিচ্ছি। কেউ যদি আপনার কাছে টাকাপয়সা চায় তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের জানাবেন।'

অফিসার এমন ভাব করলেন যে মনে হল কথা শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম, 'কিছু মনে করবে না, ফর দ্য রেকর্ড, ডায়েরি নাম্বার দেবেন?

'ডায়েরি? কী দরকার?'

'উনি যে আপনার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তার প্রমাণ।'

'কী দরকার সেটার?'

'এমনি তো কোনও দরকার নেই। কিন্তু যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়।'

'খারাপ কিছু বলতে?'

'ধরুন, তিনি খুন হলেন। তখন ওঁর স্বামীর সম্পত্তি পেতে এই ডায়েরি ওঁকে সাহায্য করবে। তাই না?' বললাম আমি।

'আই সি। বৃদ্ধ স্বামী খুন হয়ে গেলে যুবতী স্ত্রী-র উপকারই হয়। এই পরামর্শ আপনি ওকে দিয়েছেন নিশ্চয়ই।' অফিসার বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে বলল।

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' আমি রেগে গেলাম।

'কিছু না, একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে ডায়েরি নাম্বার নিয়ে আমরা বাইরে বের হলাম।

জুলি খুব বিমর্ষ গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে থানায় আপনাকে কথা শুনতে হল।'

'দূর। আমার গায়ে লাগেনি।'

'লোকটা আপনার আর আমার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করছিল।'

'পুলিশের যা স্বভাব।' বললাম। 'যদি শুনত কাল রাতে আমি আপনার বাড়িতে ছিলাম তাহলে...।' হাসলেন জুলি, 'লোকটা তো জানে না আপনি কী ভীতু। সারারাত দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।'

'ঠিক। আমি নিজেকে ভয় করেছিলাম। যদি আপনার অসম্মান করে ফেলি।'

'তাই?' জুলি চোখ ঘুরিয়ে আমায় দেখে হাসলেন।

আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। জুলি প্রায়ই এত কাছে চলে আসছিলেন যে আমার কাঁধে তাঁর কাঁধ ঘষে যাচ্ছিল। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'আজ বোয়াল মাছের এমন একটা প্রিপারেশন আপনাকে খাওয়াব যা বাজি রেখে বলতে পারি কখনও খাননি।'

'অপেক্ষায় থাকছি।' আমি বললাম।

ওঁদের বাড়ির সামনে আসতেই দেখতে পেলাম নাবিককে। বারান্দায় বসে আছে। বিধ্বস্ত চেহারায়। আমরা দৌড়ে কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছিল?'

'ওরা ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর পারছি না। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?'

'থানায়।' জুলি বললেন।

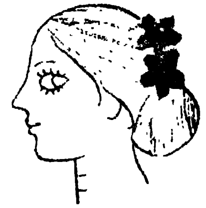
'আঃ। থানায় কেন গেলে? ওরা বলেছে পুলিশ যেন কিছু না জানে।'

'ওরা কারা?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'জানি না। নাবিক চোখ তুললেন, ওরা বোধহয় তোমার বদলে ভুল করে আমাকে তুলে

নিয়ে গিয়েছিল। সাবধানে থেকো।'

চলে আসতে-আসতে পেছন ফিরে তাকালাম। জুলি একা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলা। জুলি হাসলেন। হঠাৎ আমার মনে হল, কথাটা নাবিক বানিয়ে বলেনি তো? আমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য। বার্ধক্য তো চিরকাল যৌবনকে ভয় করে। জুলির হাসি তো সে কথাই বলছে। বাড়ি ফিরেও আমি আশা করছি, জুলি আসবেন এবং ফ্রিজে ঠান্ডা হয়ে পড়ে থাকা মাছটাকে দারুণভাবে রাঁধবেন। আশা করতে আমার ভালো লাগছে। কী করব!



সাংসারিক

পনেরো দিন বাড়িটা মিস্ত্রিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেস্টহাউসে থাকতে হয়েছিল কমলেন্দুকে, সস্ত্রীক। স্ত্রী-র ইচ্ছা ছিল তার বোনের বাড়িতে গিয়ে থাকার। অনেক জায়গা, ওরাও চেয়েছিল কিন্তু কমলেন্দু রাজি হননি। স্ত্রী-র বাপের বাড়ি বলে নয়, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে থাকাটা তাঁর পছন্দ নয়।

পনেরোদিন পরে একতলা বাড়িটার সবক'টা ঘরের চেহারা পালটে নতুন করে মিস্ত্রিরা যখন বিদায় হল তখন ফিরে এলেন ওঁরা। বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র ছাদের বিশাল ঘরে তুলে রাখা হয়েছিল। মিস্ত্রিরাই সেগুলো নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেগুলো যথাস্থানে সাজাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন বনানী। কমলেন্দু যখন বাঁধানো ছবির প্যাকেট খুলছেন তখন বনানী বললেন, 'না। ওগুলো নিচে নামাবে না।'

'মানে?'

'এখন নিচের দেওয়ালগুলো কী দারুণ দেখতে লাগছে। সেখানে পেরেক পুঁতে ওই বিবর্ণ ছবিগুলোকে টাঙাতে হবে না। ওগুলো এখানেই থাক।'

'কী বলছ তুমি? এই বাড়ি বানিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদা। বাবা এখানেই জন্মেছিলেন। তাঁদের ছবি দেওয়ালে টাঙাব না?' কমলেন্দু প্রতিবাদ করেছিলেন।

'ওগুলো আগের দেওয়ালের সঙ্গে মানাত। তা ছাড়া, সত্যি বলতে গেলে বলতে হয়, তুমি চলে গেলে ওগুলোর কোনও দাম থাকবে না।' বনানী নিচে নেমে গেলেন।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন কমলেন্দু। তুমি চলে গেলে—! আজ কথাটা স্বচ্ছন্দে বলতে পারল বনানী! কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত বলত, 'আমি যেন তোমার আগে যাই! তুমি নেই অথচ আমি আছি এরকম শাস্তি ভগবান যেন না দেন।'

ছবিগুলো কাগজের মোড়ক থেকে বের করলেন কমলেন্দু। ঠাকুরদার ছবি। লাঠি হাতে চেয়ারে বসে আছেন। গলাবন্ধ কোট। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, স্কুলজীবন পর্যন্ত ওঁকে দেখেছেন কমলেন্দু। খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। পরের ছবিটা বাবার। কোট পরা। ভালোমানুষ-ভালোমানুষ চেহারা। ঠাকুরদা যতদিন ছিলেন ততদিন বাবা তাঁর ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়েছিলেন। তৃতীয় ছবিটা মায়ের। ঢলঢল মুখ। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। যে শাড়ি পরে এই ছবিটা তুলিয়েছিলেন সেটা এখনও আলমারিতে তোলা আছে। চতুর্থ ছবি পিসিমার। বাল্যবিধবা! অন্ধের মতো ভালোবাসতেন কমলেন্দুকে।

হাতুড়ি আর পেরেক জোগাড় করে ছবি চারটেকে দেওয়ালে তুললেন কমলেন্দু। ঠাকুরদা, বাবা, পিসিমা আর মা। কমলেন্দুর জন্ম হওয়ার পর যে চারজনকে দেখে এসেছে তাঁরা এখন ছাদের ঘরের চার দেওয়ালে। এই ঘরটির সংস্কার হয়নি। বনানী বলেছিলেন, দেওয়ালে যখন ক্র্যাক হয়নি আর বাইরের লোক তো ওই ঘরে যাবে না তখন মিছিমিছি পয়সা খরচ করার কী দরকার। ঠাকুরদার ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা নামালেন কমলেন্দু। একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কী করে এমন মাতৃতান্ত্রিক হয়ে গেল!

নিচে নামবার সময় বনানীর চিৎকার শুনতে পেলেন তিনি, 'কী বললি? তিনকেজি ওজন এক-একটার? তোর বাবা বাজারে গেলে এককেজির বেশি নিয়ে আসে না। কিন্তু শোন, তিন পিসের বেশি খাবি না। আর খাওয়ার আগে অ্যান্টাসিড খেয়ে নিবি তোরা। ইলিশমাছকে বিশ্বাস করবি না। টুকান কোথায়? হ্যাঁ দে।' এইসময় স্বামীকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন বনানী, 'টুকান, শোনো, অত বড় ইলিশ একসঙ্গে রান্না কোরো না। কী বলছ? হ্যালো! বাড়িতে পার্টি আছে। আটজন আসবে? স্বামী-স্ত্রী। তাহলে তো তোমার খুব পরিশ্রম হবে। বাবান কোথায়? ও যখন ঘুমায় তখন তোমরা কেন টেলিফোন করো? বাবা? হ্যাঁ, তিনি আছেন। ও। আবার পেছনে ফিরে ইশারায় ঘুরলেন বনানী, 'এক মিনিটের বেশি কথা বলবে না। আমার অনেক কথা আছে।'

দ্রুত চলে এসে রিসিভার ধরলেন কমলেন্দু, 'হ্যালো!'

ছেলের গলা, 'কেমন আছ বাপি?'

'ভালো। তোরা কেমন আছিস?'

'ভালো। শোনো, তুমি একটা গাড়ি কেনো। মারুতি জেন। আমি টাকা পাঠাচ্ছি।'

'গাড়ি। গাড়িতে কী হবে?' হকচকিয়ে গেলেন কমলেন্দু।

'সারাজীবন বাসে মিনিবাসে ঘুরেছ, এবার একটু আরাম করো। শুনেছি সাড়ে চারের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। কালই টাকা পাঠাচ্ছি।'

'দূর। পাগলামি করিস না। গাড়ির পেছনে কত খরচ জানিস?'

'জানি। ড্রাইভার, তেল, মবিল নিয়ে আট হাজারের বেশি হবে না। প্রত্যেক মাসে মায়ের টাকার সঙ্গে ওটা যোগ করে দেবে। বাবা, প্লিজ না বোলো না।'

ছেলের কথার মধ্যেই বনানী বললেন, 'দাও।'

রিসিভার দিয়ে দিলেন তিনি। তারপর স্ত্রীর গলা শুনলেন, 'তুই যখন দিতে পারছিস তখন নেবে না কেন? তোর বাবা সারাজীবন পুতুপুতু করে বেঁচে থাকল। দিতে যেমন জানতে হয় তেমনি নিতেও শিখতে হয়। গাড়ি থাকলে ভালোই হবে। একটু দূরের কারও বাড়িতে যেতে পারি না একা. এখন যাব। আমার কোনও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে তোর বাবার মুখ তো হাঁড়ি হয়ে যায়। তুই গাড়ি দিলে—।'

শ্রবণসীমার বাইরে চলে এলেন কমলেন্দু।

ব্যাপারটা তিনি মানতে পারছেন না। ওই পুতুপুতু করে বেঁচে না থাকলে, অবসর জীবনে দু-বেলা মাছ-মাংস খেয়ে থাকা সম্ভব হত না। তার মধ্যে একমাত্র ছেলেকে ইলেকট্রনিক্স পড়িয়েছেন, বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার সময় প্লেনের ভাড়া দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত নিজের পয়সায় সংসার চালাচ্ছেন। ছেলের সাহায্য নেননি। যে টাকা পাঠায় তার মায়ের শখ, মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ কত হয়েছে তা জানতেও চান না তিনি। ছেলেকে বলেছেন, 'যেদিন আমি চালাতে পারব না সেদিন তোমাকে বলব, ততদিন আমার স্বাধীনতায় হাত দিও না।' ছেলে প্রতি সপ্তাহে ফোন করে আর তার মা একঘণ্টা ধরে অবান্তর কথা বলে যান, একবারও ভাবেন না কত খরচ হচ্ছে। প্রথম দিন কথাটা বলে শুনেছিলেন, 'খরচটা আমার ছেলের হচ্ছে, তোমার গায়ে লাগছে কেন? ও আয় করছে ভালো খরচও করছে। তোমার মতো লোকাল কল দু-মিনিটে শেষ করার

জন্যে বিদেশে যায়নি!'

এখন এই গাড়ি কেনার প্রস্তাবটা তিনি গ্রহণ না করলেও বনানী করবেন। ছেলেকে যদি বলেন তিনি গাড়ি কিনবেন না তাহলে সে তার মাকে কিনতে বলবে। সেই গাড়ি কেনা থেকে ড্রাইভার খোঁজার তদারকি তো তাঁকেই করতে হবে। কিছুতেই অস্বস্তি সরাতে পারছিলেন না কমলেন্দু।

বিকেলবেলার মধ্যে নৈহাটি থেকে বজবজের যাবতীয় আত্মীয়স্বজন জেনে গেল কিছুদিনের মধ্যেই বনানী গাড়ি নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন।

কমলেন্দু বললেন, 'ছেলে ফোন করলে বলে দিও তোমার নামে যেন টাকা পাঠায়, গাড়ি তোমার নামেই কেনা হবে।'

'বলে দিয়েছি।'

'ও।'

'একবার যখন গোঁ ধরেছে তখন গাড়ি নেবে না বুঝে গিয়েছি। ওকে দুঃখ দিয়ে লাভ নেই। তাই বলে দিয়েছি আমার নামে টাকা পাঠাতে।' বনানী জানিয়ে দিলেন। কথাটা শুনলেন কিন্তু অস্বস্তিটা তবু থেকেই গেল।

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হয়। ন'টা পর্যন্ত বাংলা সিরিয়াল, সাড়ে ন'টা থেকে হিন্দি। বিশেষ করে শাঁস ভি না দেখলে বনানীর ঘুম আসবে না। ওইসময় কথা বলা দূরে থাক শব্দ করতেই বিরক্ত হন। পাশের ঘরে বই নিয়ে শুয়ে থাকেন কমলেন্দু। আজ হঠাৎ কী মনে হল চুপচাপ ছাদের ঘরে চলে গেলেন। ভেবেছিলেন ছাদে যাবেন কিন্তু বৃষ্টি নেমে গেল। ছাদের ঘরের আলো জেলে একটা চেয়ার টেনে বসতেই ঠাকুরদার মুখোমুখি। এই মানুষটি তাঁকে সেই বাল্যকালে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে ওঠার রেজাল্ট বেরুলে আনন্দে নাচতে-নাচতে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির বারান্দায় অবিবাহিত জ্যাঠামশাই বসেছিলেন। বললেন, 'এদিকে এসো। এবার অঙ্কে কত পেয়েছ? গর্বিত ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিলেন, একশোতে একশো।'

ঠাস করে একটা চড় এসে পড়েছিল তাঁর গালে।

তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। জ্যাঠামশাই বললেন, 'একশো'র কম পেলে যে মার খেতে তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে তার টেন পার্সেন্ট নমুনা দিলাম। যাও।'

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'খারাপটা কী জানলে ভালো করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।'

হঠাৎ মনে হল তিনি এখন বসে আছেন তাঁর প্রিয়জনের মধ্যে। ছেলেবেলায় ঠাকুরদা এবং বাবা যখন কথা বলতেন তখন তিনি তাঁদের মাঝখানে এসে বসতেন। পিসিমা এসে দাঁড়াতেন ঠাকুরদার পাশে, মা ভেতরের দরজায়। ঘোমটা দিয়ে। এখন যেন তেমনই হচ্ছে। পিসিমার ছবির দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোর বড্ড বেশি জেদ পুনা। ছেলেটা বিদেশে থাকে, বাপমায়ের জন্যে কিছু করতে ওর ভালো লাগে এটা বুঝিস না কেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরদা ধমক দিলেন, 'চুপ করো। ও আমার নাতির মতোই কাজ করেছে। কেন ছেলের কাছে হাত পাতবে? আমি কখনও পেতেছি ওর বাপের কাছে। কি পেতেছি?'

শেষ প্রশ্ন বাবাকে করায় তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন।

মা বললেন, 'তবে বউমাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বেচারার এক ছেলে। বিদেশে থাকে, মন তো কেমন করবেই।'

ঠাকুরদা বললেন, 'বউমা, তোমার বিবেচনা বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। পুনার বউকে যখন তোমরা এনেছিলে তখন আমি পৃথিবীতে নেই। কিন্তু ইদানিং সে অকারণে পুনাকে অবজ্ঞা করে। ছেলের গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ে না।'

বাবা বললেন এবার, 'এ জন্যে এই হতভাগাই দায়ী। আমি যখন সম্বন্ধ করে বউমাকে

এনেছিলাম তখন সে ছিল বড় কোমল। আমরা চলে আসার পর বউমাকে আঘাত দিয়ে-দিয়ে ওরকম করেছে, বেশিদিন অত্যাচারিত হলে বোবাও কথা বলতে শেখে।'

'চুপ কর।' পিসিমা ধমকালেন, 'ছেলের নিন্দে করার সুযোগ পেলে তোর জিভ চুলবুল করে। চিরটাকাল দেখে এসেছি।'

ঠাকুরদা বললেন, 'যাক গে, আমাদের তো ছাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছ? নিচে কী হচ্ছে দেখতে যাব না। গাড়ি এলে তুমি আবার গদগদ হয়ে তাতে বেরিও না পুনা।'

বাবা বললেন, 'এ হয় না বাবা! বাড়ির বউ সর্বত্র একা হইহই করে ঘুরবে না। ও যাবে তবে ড্রাইভারের পাশে বসবে। বউমা একা পেছনে বসবেন।'

'কেন? তোর ছেলে কি বাড়ির কাজের লোক যে সামনে বসবে।' পিসিমার কথা শেষ হওয়ামাত্র নীচ থেকে গলা ভেসে এল, 'তুমি ওপরে একা-একা কী করছ। নিচে এসো।'

মা বললেন, 'যা পুনা। তাড়াতাড়ি যা নইলে বউমা আবার বিরক্ত হবে।'

ঠাকুরদা বললেন, 'তুমি স্ত্রৈণ হয়ে গেলে পুনা!'

কমলেন্দু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্র উঠে পড়ল, দরজা খুলে নামতে লাগল। বনানী অনেকটা উঠে এসেছিলেন, বলল, 'কী করছিলে ওপরে? সতুদা এসে বসে আছে।'

'কে সতুদা?' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল কমলেন্দু।

'ওমা! তুমি কী গো? বিনতার ভাসুরের পো, ভুলে গেলে কী করে?'

মনে পড়ল। বিনতা বনানীর মাসতুতো বোন। থাকে চেতলায়। তার ভাসুরকে কয়েকবার দেখেছেন বটে কিন্তু মনে রাখার মতো মানুষ বলে মনে হয়নি।

'তিনি হঠাৎ এ বাড়িতে?'

'আমি আসতে বলেছিলাম। তোমার দ্বারা কতদূর কী হবে তাতে সন্দেহ আছে।'

বাইরের ঘরে বসেছিলেন সতুদা। কোনও-কোনও মানুষকে বৃদ্ধ হলেও ঠিক বোঝা যায় না আজকাল। চুলে কলপ এবং দাঁত বাঁধানো বলেই মনে হল। কমলেন্দু নমস্কার করলেন।

বনানী বললেন, 'সতুদা গাড়ির সব খবর রাখেন।'

খুব রোগা, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, সতুদা বললেন, 'বাড়িটা বেশ সুন্দর হয়েছে এখন।'

বনানী বললেন, 'নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করালাম।'

'এখন এই বাড়ির সঙ্গে মানানসই গাড়ি চাই। তাই তো?' সতুদা বললেন।

'হ্যাঁ। ওর নামে।' কমলেন্দু না বলে পারল না।

'আরে ভাই, যে-কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের নামে কিছু জমায় না। সব স্ত্রী-র নামে, হ্যাঁ, গাড়ি তো এখন অনেক, বাজেট কত?' সতুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

কমলেন্দু স্ত্রী-র দিকে তাকালেন। বনানী বললেন, 'বেশি দামি নয়। মাঝামাঝি!'

'অ। তাহলে স্যান্টোস, ওয়াগনার, জেন।' সতুদা মনে করার চেষ্টা করলেন।

'জেন, জেন।' বনানীর মনে পড়ল।

'হয়ে যাবে। তবে দিন কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে। লাইন আছে।' সতুদা বললেন।

'কীসের লাইন?' বনানী বুঝতে পারলেন না।

'গাড়ি যা আসছে তার থেকে চাহিদা বেশি। তোমাদের টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আমার যা সোর্স আছে তাতে কুড়ির বদলে দশদিন করতে পারব। তাহলে কালই চলে এসো। হ্যাঁ, ইনস্টলমেন্টে না ক্যাশ ডাউনে নেবে?' সতুদা হাই তুললেন।

'না, একসঙ্গেই টাকা দেব। চেকে দিলে হবে না?' বনানী জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই হবে। এবার কফি খাওয়াও।'

'এক্ষুনি খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দাদা আপনাকে আর একটা উপকার করতে হবে।'

'শোনা যাক।'

'একজন ড্রাইভার দিতে হবে।' বনানী বললেন।

'কীরকম ড্রাইভার চাই? বেশ স্মার্ট, ভালো চালায়, গাড়ির ছোটখাটো সমস্যার সমাধান নিজেই করে, তিন হাজার টাকা মাইনে, আটঘণ্টা হয়ে গেলে ওভারটাইম। অথবা খুব অলস, গাড়ির কোনও কাজ জানে না, কিন্তু গাড়িটা ভালো চালায়, তেইশ-শো, তে পাবেন।

'না, না, অলস চাই না। আর আমরা তো বেশি গাড়িতে উঠব না যে ওভারটাইম দিতে হবে। স্মার্টই ভালো।' বনানী বললেন।

'একটা কথা বলে রাখি, স্মার্ট যে সে কিন্তু স্মার্টলি চুরি করবে। খালি গাড়ি পেলেই শেয়ারে প্যাসেঞ্জার তুলবে। দশ লিটার তেল কিনতে টাকা নিয়ে আট লিটার কিনবে। কিন্তু গাড়িটাকে খুব যত্নে রাখবে। আর অলস যে তার চুরি করারও সাহস নেই, কোনও গাড়ি যদি তার গাড়িতে টোকা মারে তাহলে সিট থেকে নামবে না। বলবে নেমে কী হবে, শুধু ঝগড়াই হবে। এখন বলো কীরকম ড্রাইভার চাই তোমাদের।' সতুদা পা দোলালেন।

বনানী সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে বললেন, 'তুমি কিছু বলো, তখন থেকে মুখে সেলাই করে বসে আছ। আচ্ছা পুরুষ মানুষ।'

সতুদা ঘড়ি দেখলেন। 'ওরে বাবা। এত রাত হয়ে গিয়েছে খেয়ালই করেনি। আমি এখন উঠছি। আর বাস পাব না মনে হচ্ছে। তোমরা ভেবেচিন্তে কাল জানিও।'

সতুদা চলে গেলে কমলেন্দু বললেন, 'তোমার আজ শাঁস ভি দেখা হল না।'

'কাল দেখব, আজকের এপিসোড কাল দুপুরে দেখাবে। কিন্তু সতুদা কফি খেতে চেয়েছিল খাওয়ানো হল না। আমাকেই কথা বলতে হবে আবার কফি বানাতেও হবে। খোকা তো চমৎকার রান্না করতে পারে অথচ তুমি যে অলস সেই অলসই থেকে গেলে।' উঠলেন বনানী, ঘড়ি দেখলেন। কলকাতা আর মেরিল্যান্ডের সময় তাঁর মুখস্থ! ছেলের অফিসে ফোন করলেন তিনি। এই ফোন একবারেই বাজে, শুনলে মনে হয় পাশের ঘর থেকে কথা বলছে। খুব সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করেও মিনিট পাঁচ সময় নিলেন সতুদার বক্তব্য ছেলেকে বোঝাতে। ছেলে হাসল, 'এ তো তোমরাই ঠিক করে নিতে পারতে। ওই স্মার্ট ড্রাইভারকে রাখো।'

'সে কী? সে চুরি করবে।' বনানী চেঁচালেন।

'মা ইনএফিসিয়েন্ট অনেস্টের থেকে এফিসিয়েন্ট ডিস-অনেস্ট অনেক বেশি উপকারে আসে। যে গোরু দুধ দেয় তার চাঁট তো সহ্য করতে হয়ই।' ছেলে বলল, 'ওর মাইনেটা আমি পাঠিয়ে দেব। রাখছি।'

বনানী রিসিভার রেখে স্বামীর দিকে তাকালেন, ছেলের বক্তব্য জানালেন না।

দশদিনের মাথায় গাড়ি এসে গেল। দেখে মনে হল বেগুনি রঙের চকোলেটের বাক্স। সতুদা ড্রাইভারকে নিয়োগ করে বনানীকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডিলারের শোরুমে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন কমলেন্দু। বনানী গাড়ি থেকে নামার আগেই একটি সুদর্শন স্মার্ট ছেলে তাঁর দরজা খুলে দিল। সগর্বে গাড়ি থেকে নামলেন বনানী। নেমে বললেন, 'বাবুকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম।'

কমলেন্দু মাথা নাড়লেন, 'না-না। ঘোরার কী আছে! বেশ ভালো হয়েছে। বেশ।'

বনানী বললেন, 'ওর নাম লিটন। খুব ভালো চালায়।'

লিটন হাসল।

এ বাড়িতে দীর্ঘকাল যে প্যাসেজটা খালি পড়ে থাকত তার ওপর ছাদ তুলে গ্যারাজের ব্যবস্থা করেছেন বনানী। গাড়ি সেখানেই রাখা হল।

'ম্যাডাম, আজ কি গাড়ি বের হবে?' লিটন জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আজ চেতলায় যাব। এই বিকেল সাড়ে চারটের সময়।'

'ওকে ম্যাডাম।'

'তুমি অনেকক্ষণ থাকবে কোথায়? কিছু খেয়েছ?'

'এমন কিছু নয়।'

'এক কাজ করো, আজ প্রথম দিন, ওই গলির মোড়ে একটা খাবারের দোকান আছে। গিয়ে খেয়ে এসো।' ব্যাগ খুলে কুড়িটা টাকা দিলেন বনানী।

'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।' টাকা নিয়ে লিটন চলে গেল।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় বনানীর গাড়ি বেরিয়ে যেতেই ফোন বাজল। রিসিভার তুললেন কমলেন্দু। 'হ্যালো।'

'গাড়ি পেয়ে গেছ?' ছেলের গলা।

'হ্যাঁ। তোর মা এনেছে। এখন চেতলায় গিয়েছে দেখাতে।'

'তুমি তো জানো বাবা মা একটু এইরকম। ওঁকে ওঁর মতো থাকতে দাও, তুমি কিছু বোলো না। তবে তুমি গাড়ি ব্যবহার না করলে খুব দুঃখ পাব।' ছেলে বলল।

কমলেন্দু বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না।'

'আর একটা কথা—।' ছেলে বলল, 'আমার কাছে এসে কিছুদিন থাকো।'

'আমি? আমাকে বলছ?'

'হ্যাঁ। এর আগে মাকে যতবার বলা হয়েছে শুনেছি বাড়ি তালাবন্ধ করে যাওয়া যাবে না। আসলে মা এখানে আসতে চাইছে না। এখন এখানে চমৎকার আবহাওয়া, একটুও ঠান্ডা নেই, তুমি এসে ঘুরে যাও।'

'দেখি।'

'দু-দিন পরে ফোন করব।' ছেলের লাইন কেটে গেল।

সারাজীবন যে চাকরি করেছেন তাতে বিদেশে যাওয়ার সুযোগই হয়নি। পকেটের টাকা খরচ করে যাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর কোনওদিনই ছিল না। ছেলে ও-দেশে যাওয়ার পর পাশের বাড়ির দত্তবাবু বলেছিলেন, 'এবার তো ঘনঘন আমেরিকায় যাবেন। কিন্তু গত তিন বছরেও যাওয়ার কথা ওঠেনি। আজ সন্ধেবেলায় কমলেন্দু খালি বাড়িতে বসে আমেরিকার ম্যাপ দেখছিলেন। কত কী দেখার আছে! নায়গ্রা, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, হোয়াইট হাউস—। টেলিফোন বাজল।

রিসিভার তুলে কমলেন্দু বললেন, 'হ্যালো।'

'কী মশাই, গাড়ি এল?' খোকার শ্বশুরের গলা।

কমলেন্দু অস্বস্তিতে পড়লেন। এই লোকটিকে পছন্দ করেন না। টাকা ছাড়া জীবনে আর কিছু চেনেননি। অথচ বউমা ঠিক বাবার উলটো।

'হ্যাঁ। খোকা বলেছে বুঝি!'

'না-না। আপনার ছেলে কি মুখ খুলবে? মেয়েকে জেরা করে জানলাম। তা কী গাড়ি কেনা হল?' বেয়াই জিজ্ঞাসা করলেন।

'জেন।'

'সে কী! অন্যের পয়সায় গাড়ি কিনলেন যখন তখন আরও দামি কিনলেন না কেন? আরে মশাই চিরকাল পাইস হোটেলে খেয়ে এলেন তাই তাজ বেঙ্গলে খাওয়ার কথা ভাবতে পারলেন না, হে-হে। তা কত পড়ল?'

'আমি জানি না। আমার স্ত্রী জানেন।'

'অ। তার মানে বেয়ানের নামে গাড়ি? ভালো।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' কমলেন্দুর গলা গম্ভীর।

'না-না। কিছু না। এ ব্যাপারে কিছু বলা আমার পক্ষে অনুচিত। হ্যাঁ, মেয়ে বলছিল আপনারা আগে ওখানে যাবেন তারপর আমরা। অর্থাৎ আপনারা না ঘুরে এলে আমাদের যাওয়া হবে না। তা যাচ্ছেন কবে?'

'কোনও ঠিক নেই।' ছেলের শ্বশুরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না কমলেন্দু। শ্বশুরের মেয়েটা তো ভালো।

'তাড়াতাড়ি ঠিক করুন দাদা। আমি তো দু-মাসের বেশি ছুটি পাব না কিন্তু হিসেব করে দেখেছি চারমাস থাকলে আর্থিক লাভ হবে।'

'মানে?'

'দু-মাস উইদআউট পে হব বটে কিন্তু চারমাসের সংসার খরচ বেঁচে গেলে লাভই হবে। তার ওপর ছোট মেয়েটাকে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের সম্বন্ধ ওখানে গিয়ে করলে হাতে-হাতে ফল পাব।'

'তিনজনে যাবেন? অনেক ভাড়া।' কমলেন্দু বলে ফেললেন।

'ওসব মেয়ের দায়িত্ব। যত ভাড়া হোক জেন গাড়ির দামের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি হবে না। এখন আপনি ঠিক করুন কবে যাবেন। আচ্ছা!'

রিসিভার রেখে গুম মেরে রইলেন কমলেন্দু।

বনানী ফিরলেন উচ্ছ্বসিত হয়ে। গাড়িটা নাকি দারুণ। ড্রাইভারের হাতও চমৎকার।

তারপর স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থমকালেন, 'কী হয়েছে?'

বেয়াই-এর কথাগুলো স্ত্রীকে বললেন কমলেন্দু।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ি দেখলেন বনানী। তারপর উঠে ফোনের নম্বর টিপতে লাগলেন।

কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন 'কী করছ?'

'থামো তো!' চাপা গলায় বললেন বনানী। কান পাতলেন রিসিভারে, 'হ্যাঁ, খোকা, আমরা যদি চিরকাল পাইস হোটেলে খেয়ে আসি তাহলে সেই খাবারে নিশ্চয়ই তৃপ্তি পেয়েছি। কিন্তু সে-ব্যাপারে অন্য কারও কথা শুনতে রাজি নই। আমি সতুদাকে বলেছি গাড়িটাকে বিক্রি করে দিতে। তোর গাড়ির আর দরকার নেই আমাদের।'

'কী হল বলবে তো?'

'টুকান তার বাবাকে বলেছে তুই আমাদের গাড়ি কেনার টাকা দিয়েছিস। তিনি তোর বাবাকে ফোন করেছেন ছেলের পয়সায় যখন গাড়ি কিনেছি তখন বেশি দামের গাড়ি কিনলাম না কেন? আমরা কি ভিখিরি?'

'তুমি ফোনটা রাখো, আমি দশ মিনিট পরে ফোন করছি।'

রিসিভার রেখে বনানী স্বামীর দিকে তাকালেন, 'তুমি লোকটাকে কথা শোনাতে পারলে না? আর কতদিন চুপ করে থাকবে?'

'দ্যাখো, খোকার শ্বশুর বলে কথা—!'

'চুপ করো!' বনানী শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন।

ঠিক দশ মিনিট পরে ফোন এল খোকার, 'মা, এ নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। যা বলার আমি বলে দিয়েছি, রাখলাম।'

কমলেন্দু আশঙ্কা করছিলেন এখনই ভদ্রলোকের ফোন আসবে। কিন্তু এল না।

রাত্রে শোওয়ার পরে বনানী বললেন, 'শোনো, তুমি খোকার ওখান থেকে ঘুরে এসো। তোমার ভালো লাগবে।'

কমলেন্দু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এই স্বরে অনেকদিন কথা বলেননি বনানী। তিনি কিছু বললেন না। বনানী বললেন, 'টুকান আমাকে যেতে বলেছিল। ওর বাচ্চা হবে। সে সময় আমাকে

থাকতে বলেছিল।'

'সে কী? আমাকে বলোনি কেন?' কমলেন্দু উঠে বসলেন।

'তোমাকে এখনই বলতে নিষেধ করেছিল, সারপ্রাইজ দেবে বলে।'

'তাহলে তো তোমার যাওয়া উচিত।'

'একসঙ্গে দুজন তো যেতে পারব না। ভেবেছিলাম তুমি ঘুরে এলে ঠিক সময়ে আমি যাব। কিন্তু টুকানের মা-বাবা-বোন যাচ্ছে তখন আমার যাওয়ার দরকার নেই। দ্যাখো, ছেলেটা ফোন করল কিন্তু কী বলেছে সে তা জানাল না। বনানী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কমলেন্দু শুয়ে পড়লেন কিন্তু ঘুম আসছিল না।

ভোর চারটের সময় ফোন বাজল। ধড়মড়িয়ে উঠে রিসিভার তুললেন কমলেন্দু। 'হ্যালো।' সঙ্গে-সঙ্গে টুকানের গলা শুনতে পেলেন, 'বাবা, আমি কী করব?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ও আমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বলেছে টিকিট কেটে দেশে ফিরে যেতে টাকাও দিয়ে দিয়েছে।' টুকান কাঁদছিল।

'সে কী! কেন?' বিচলিত হলেন কমলেন্দু।

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানি না।'

'তোমার বাবাকে জানিয়েছ?'

'না। আমাদের ব্যাপার বাবাকে কেন জানাব?'

'তুমি আমাকে মিনিট পনেরো বাদে ফোন করতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব।'

লাইন বিচ্ছিন্ন হতেই ছেলেকে ফোন করলেন কমলেন্দু, 'তুই কী ভেবেছিস? আমরা মরে গেছি, তোর যা ইচ্ছে তাই করবি?'

'কী বলছ?' ছেলের গলায় বিস্ময়।

'আমাদের বাড়ির বউকে এয়ারপোর্টে ফেলে দিয়ে এসেছিস একা? সে টিকিট কেটে দেশে ফিরবে? তার বাবা যদি কোনও অন্যায় করে থাকে তাহলে সে শাস্তি পাবে?'

'আমি তো তাকে বলিনি কে কী অন্যায় করেছে! আমি ভদ্রলোককে বলেছি এখন থেকে আপনি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাবেন না। তিনি বললেন, তাঁর মেয়ে যতদিন আমার স্ত্রী হয়ে থাকবেন ততদিন তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।'

'ব্যস সঙ্গে-সঙ্গে তুই ঘরের বউকে বের করে দিলি। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। এখনই এয়ারপোর্টে গিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যা। নইলে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না তোর।' রিসিভার রাখতেই কমলেন্দু দেখলেন বনানী উঠে এসে তাঁর কথা শুনছে।

কমলেন্দুর মাথা ঝিমঝিম করছিল। বনানী কাছে এসে ওঁর হাত ধরে বলল, 'বিছানায় এসে বসো। উত্তেজিত হয়ো না।'

কমলেন্দু বললেন, 'গর্দভটার এত সাহস!'

বনানী হাসলেন, 'দু-হাতে কমলেন্দুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কমলেন্দু বললেন, 'এ কী!'

বনানী বলেন, 'চুপ করো।'

কিছুক্ষণ বাদে ফোন বাজতেই কমলেন্দু ধরলেন, হ্যাঁ, শোনো, তুমি এয়ারপোর্টের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। সে আসছে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাড়িতে পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। বুঝেছ। আচ্ছা।'

রিসিভার রাখার পর আর ঘুম এল না। ফরসা হয়ে গেল খানিক পরেই। বনানী চা করে

নিয়ে এলেন। চুপচাপ চা খেয়ে গেলেন ওরা। ঘণ্টাতিনেক পরে ফোন এল, 'বাবা!'

'হ্যাঁ। বল।'

'ও আমাকে বাড়িতে নামিয়ে চলে গেছে কাজে। রাস্তায় একটা কথাও বলেনি। বাড়িতে পৌঁছে বলেছে, এখন থেকে তুমি তোমার মতো এখানে থাকবে। ব্যস।'

'বাঃ ভালোই তো। নিজের খুশিমতো খাওদাও চাকরি করো। ওকে কেয়ার কোরো না।'

'না-না, বাবা।'

'ও, তাহলে?'

'তোমরা এসো। তোমরা এলে ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'তোমার বাবা মা বোন তো যাচ্ছে!'

'ওরা পরে আসুক। ওরা এখন এলে ও আরও দূরে সরে যাবে!'

'ঠিক আছে, দেখছি।'

রিসিভার নামিয়ে কথাগুলো স্ত্রীকে বললেন কমলেন্দু। বনানী চুপ করে ছিল। কমলেন্দু বলেন, 'ওর গলা শুনে বউমা বলে মনে হচ্ছিল না। যেন নিজের মেয়ে কথা বলছিল।'

বনানী আচমকা বললেন, 'আচ্ছা আমরা দুজনে একসঙ্গে গেলে কী হবে?'

'চুরি হবে। তালা ভাঙবে চোর।' কমলেন্দু জবাব দিলেন।

'চুরি করে কী পাবে? কী নিতে পারে চোর। ফ্রিজ, টিভি, জামাকাপড়। টাকাপয়সা গয়নাগাটি তো ব্যাঙ্কে থাকবে। তাই না!'

'হ্যাঁ, কিন্তু জেনেশুনে চোরের জন্যে সব ফেলে যাবে?'

'সব আর কোথায়? আমরা ওখানে গেলে যে স্বামীকে নিজের করে পাবে বলে ভাবছে তার পাওয়ার চেয়ে এই ফ্রিজ টিভি কি খুব মূল্যবান?'

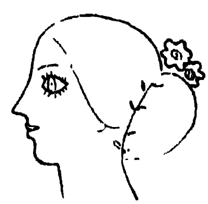
'না। একদম নয়। একসঙ্গে যাবে? আনন্দিত হলেন কমলেন্দু! পাশের বাড়ির দত্তবাবুকে বলে যাব চোখ রাখতে। আর ওখানে গেলে শুধু ওরাই পাবে না, আমিও পাব।'

'কী পাবে তুমি?'

'আনন্দ। এই বয়সে একা-একা কিছু ভালো লাগে না।' কমলেন্দু বললেন।

স্বামীর হাতে হাত রাখলেন বনানী।

কীরকম শিরশির করে উঠল তাঁর শরীর।



ম্লান-অম্লান

নিরাপদ বসুকে এই কাহিনির নায়ক বলা যাবে না। অথচ যা কিছু ঝামেলা ওকে নিয়েই। নিরাপদ অবশ্য ঝামেলা বলে স্বীকার করে না। সে যথেষ্ট ঝামেলা এড়ানো ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী হৈমন্তী যদিও এই স্বভাবটার জন্যে ওকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে মনে করে। নিরাপদ এসব শুনলে দুঃখ পায়। কিন্তু ইদানীং স্ত্রী-র কথাবার্তা সে উপেক্ষা করতে শিখে গিয়েছে। নিরাপদ একজন সরকারি চাকুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিসেবে ফল ভালো করেছিল। চাকরিতে ফাঁকি দেয়নি। তাই পঞ্চাশ বছরেই যতটা ওপরতলায় ওঠা সম্ভব উঠেছে।

হৈমন্তী খুব গোছানো মেয়ে। স্বামীর যা আয় তাতেই সে সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চাহিদা তো অনেক থাকে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দিনরাত অশান্তি করে না। চল্লিশের এপাশে এসেও হৈমন্তী এখনও আকর্ষণীয়, যাকে বলে সুন্দরী, ঠিক তাই। আর এখানেই তার যা কিছু কষ্ট। নিরাপদ পঞ্চাশেই কেমন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া কিছুতেই উৎসাহ নেই। সুন্দরী স্ত্রী যে তাকে তেমন আকর্ষণ করে তা আর আজকাল বোঝা যায় না। হৈমন্তী নিরাপদের মেয়ের নাম অদিতি। বয়স আঠারো-উনিশের মাঝামাঝি। লম্বা, দারুণ দেখতে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় হৈমন্তীর রাত্রের ঘুম নেই। টেলিফোন বাজলেই অদিতিকে কেউ-না-কেউ ডাকবে। লেটার-বক্সে প্রেমপত্রের বন্যা বয়ে যায়। ভরসা এই মেয়েটা এসব পাত্তা দেয় না। হৈমন্তীর রাগ, নিরাপদ একটুও চিন্তিত নয় মেয়ের ব্যাপারে। কখন কোন উটকো ছেলের সঙ্গে মজে গেলে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে। সারা সময় মেয়েকে সেকথা শোনায় হৈমন্তী।

এই নিরাপদকে অফিসের কাজে একবার দিল্লিতে যেতে হয়েছিল। দিল্লিতে হৈমন্তীর দিদি থাকেন। কোনও অসুবিধে হয়নি। ফেরার সময় কালকার টিকিট পাওয়া গেল না। সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারে সে বেশি স্বচ্ছন্দ। ভায়রাভাই রাজধানীর চেয়ারকারের টিকিট ম্যানেজ করে দিল। বড়লোকি পরিবেশ একদম সহ্য হয় না নিরাপদর। এয়ার কন্ডিশন্ড মানে সেইরকম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সিটে বসে দেখল তার মতো পোশাক ও চেহারার অনেক যাত্রী যাচ্ছে। সে সাইড ব্যাগ থেকে আগাথা ক্রিস্টির একটা বই বের করে চোখ রাখল হেলানো চেয়ারে মাথা রেখে। আগাথা ক্রিস্টি ওর খুব প্রিয় লেখিকা। গাড়ি চলল। ভেতর থেকে গতি বোঝার উপায় নেই, ধুলো নেই। নিরাপদর ভালো লাগল। এই সময় বেয়ারা গোছের একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। চমকে উঠে বসল নিরাপদ। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বুঝল সেলামটা তার পাশে বসা যাত্রীর জন্যে। বেয়ারা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, কফি চাহিয়ে?'

'কফি? হলে মন্দ হয় না।'

'ঠিক হ্যায় সাব।' বেয়ারা চলে গেল।

নিরাপদ অবাক। কম্পার্টমেন্টের কাউকে এই প্রশ্ন করেনি বেয়ারা। এই লোকটি কী এমন তালেবর যে তাকেই খাতির করতে হবে! কিন্তু এই প্রশ্ন মনে এলেও মুখে কিছু বলল না নিরাপদ। সেটা তার স্বভাবে নেই। নিজেকেই বোঝাল, নিশ্চয়ই রেলের কোনও বড় কর্মচারী। সে আড়চোখে তাকাল। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। রোগা, ফরসা, চশমা পরা। এ ধরনের চেহারার বয়স চট করে অবশ্য আন্দাজ করা যায় না।

কফি এল। আরাম করে খেল লোকটা পাশে বসে। কম্পার্টমেন্টের অনেকেই এই খাওয়াটা দেখছে। সবার চোখেই বিস্ময়।

পাশাপাশি বসেও কথা হচ্ছিল না। আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব নেই নিরাপদর। সে বই-এ দৃষ্টি রেখেছিল। বেয়ারাটা আবার এল কাপ প্লেট নিতে। জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনি কি আলাদা কোনও মেনু ডিনারে নেবেন?'

লোকটি বলল, 'না, না। যা সবাইকে দিচ্ছ তাই আমাকে দিও।'

নিরাপদ নিশ্চিত হল লোকটি রেলের অফিসার। তার অবশ্য রেলের অফিসারের সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে কলকাতা থেকে সে বের হয়।

'ওটা কি আগাথা ক্রিস্টি?'

চমকে উঠল নিরাপদ। দ্রুত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার খুব প্রিয় লেখক। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি থেকে আমাদের ফেলুদা, হাতে পেলে পৃথিবী ভুলে যাই আমি।'

নিরাপদ হাসল। অথবা বলা যেতে পারে, হাসবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিল্লির লোক নন নিশ্চয়ই?'

'না, না, আমি কলকাতায় থাকি। কাজে এসেছিলাম। সরকারি কাজে।'

'প্রায়ই আসেন?'

'না। হঠাৎই আমাকে আসতে হল।'

'কোন ডিপার্টমেন্ট আপনার?'

নিরাপদ সেটা জানাল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'যাক খুব দুশ্চিন্তা ছিল, আমার পাশে যদি কোনও উটকো লোক বসত তাহলে সারাটা পথ মুখ বন্ধ করে থাকতে হত। আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না!'

'আমি নিরাপদ বসু। আপনি?'

'অম্লান মিত্র।'

ভদ্রলোক কি করেন, রেলের অফিসার কিনা তা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল নিরাপদর। নিজের ওপর এই কারণেই তার ক্ষোভ হয়। হৈমন্তী রেগে যায় এই কারণে। ডিনার এল। ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন খাবার দেওয়ার আধঘণ্টা বাদে আবার যেন কফি দিয়ে যায়। এবার দু-কাপ।

না, লোকটা খারাপ নয়। রাত্রে ঘুমাবার আগে অনেক কথা হল। সকালেও। নিরাপদর অফিস এবং বাড়ির ফোন নম্বর নিলেন ভদ্রলোক। নিজের ফোন নম্বর দিলেন না। বললেন, 'টালিগঞ্জের নম্বর শুনছি পালটে যাবে। গিয়ে দেখব হয়তো এরই মধ্যে পালটে গিয়েছে। আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।'

এই লোকটির কথা বাড়িতে ফিরে হৈমন্তীকে বলেনি নিরাপদ। বললেই হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করত, 'একটা লোককে সব জানিয়ে দিলে অথচ সে কী করে কোথায় থাকে তা জানলে না?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপদ বোঝাতে পারবে না যে তার মনে হয়েছিল লোকটি নিজের সম্পর্কে বেশি কথা বলতে চায় না। তাই জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায় লেগেছিল। তা ছাড়া একজনের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে এবং সেখানেই শেষ, তাই নিয়ে স্ত্রী-র সঙ্গে ঝামেলা করে কী হবে। হৈমন্তীকে একথা বলা মানে ঝামেলা পাকানো। হৈমন্তীকে খুশি করার জন্যে ও রোজ সকালে বাজারে যায়, গ্যাস বুক করে, তাগাদা দেয়, রেশনের দোকানে যায়, শুধু কেরোসিনের লাইন দেয় না। সেটা হৈমন্তীই নিষেধ করেছে। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বস্তির লোকেদের সঙ্গে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চায় না সে। কিন্তু ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিলটা ওর পকেটে গুঁজে দেয়। ডাবল সিলিন্ডার থাকায় গ্যাস ফুরোবার আগেই দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়া যায়। হৈমন্তীর সমস্যা থাকে না। এবার দিল্লি থেকে এসে শুনল যে-কোনও মুহূর্তে আগের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু দোকানে বলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। বলেছে সাপ্লাই নেই। পাড়ার দোকানে গ্যাস সাপ্লাই না থাকলে নিরাপদ কী করতে পারে? হৈমন্তী অবশ্য কাজের মেয়েকে দিয়ে অনেকটা কেরোসিন তুলিয়ে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে নিরাপদ দেখল লোডশেডিং। মেজাজ খারাপ হয় না আজকাল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম প্রথম ফোন করত অদিতির তাড়নায়। শুনত কেব্‌ল ফল্ট আজকাল করে না। মোমবাতি জ্বলে, গরমে পচতে হয়। আজ টেলিফোন বাজল। হৈমন্তী কথা বলে জানল অম্লান মিত্র নামে একজন তাকে ডাকছে।

নিরাপদ ফোন ধরল। অম্লানের গলা পাওয়া গেল, 'কি মশাই, চিনতে পারছেন? আমি অম্লান। রাজধানীতে আলাপ হয়েছিল।'

নিরাপদ শুকনো হাসল, 'হেঁ-হেঁ। কেমন আছেন।'

'ফার্স্ট ক্লাস। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম যোগাযোগ করি। কি করছেন?'

'কিছু না।'

'তাহলে একবার আপনাদের ওখানে টুঁ মেরে আসি। ঠিক কোথায় যেন বাড়িটা?'

নিরাপদ মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে সে কিন্তু-কিন্তু হৈমন্তীকে বলল, 'অম্লানবাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। খুব বড় অফিসার।'

'কোথাকার?'

'রেলের বোধ-হয়।'

'বোধ-হয় মানে? উনি বলেননি?'

নিরাপদ অস্বস্তিতে পড়ল, 'সেইরকম মনে হল।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, টেলিফোন নম্বর দিলে অথচ সে কোথায় কাজ করে জানলে না! কি করে সরকারি চাকরি করো? কী বললেন?'

'এ পাড়ায় এসেছিলেন। তাই ঘুরে যেতে পারেন।'

'এই অন্ধকারে? নিষেধ করলে না?'

'কেউ যদি আসতে চায় নিজে থেকে তা মানা করব কি করে?'

'আমি লোডশেডিং-এর মধ্যে চা-ফা খাওয়াতে পারব না।'

মিনিট দশেক বাদে অম্লান এল। এসেই বলল, 'একি দাদা, অন্ধকারে বসে আছেন?'

নিরাপদ বলল, 'কি করব, উপায় তো নেই।'

'উপায় নেই হয় নাকি? আপনার টেলিফোন কোথায়?'

নিরাপদ অবাক হলেও টেলিফোন দেখিয়ে দিল। মোমবাতির আলোয় ডায়াল ঘোরাল অম্লান। নিরাপদ শুনল অম্লান বলছে, হ্যালো, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন?' ও, অম্লান বলছি। আমি এখন তিনশো বাইশ সার্কুলার রোডে আছি। এখানকার ফেজটা অন করে দিতে বলুন। ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিয়ে অম্লান বলল, 'এই গরমে কোনও ভদ্রলোক থাকতে পারে?'

নিরাপদ অবাক। সে একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল যখন এর মিনিটখানেক বাদেই আলো এসে গেল। চারপাশে উল্লাস শোনা গেল। ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী সমস্ত ব্যাপারটা শুনল। আলো জ্বলতে সেও অবাক। নিরাপদ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে আপনার চেনাজানা আছে বুঝি?'

'ওই একটু-আধটু।' অম্লান বসল। এই সময় অদিতি ছুটে এসে জানাল একমাত্র তাদের বাড়ি এবং রাস্তার এপাশের কয়েকটিতে আলো এসেছে। উলটোদিকটায় এখনও লোডশেডিং। অম্লান অদিতিকে দেখছিল। হেসে বলল, 'যাতে তোমাদের এই বাড়িতে কখনও লোডশেডিং না হয় সেই ব্যবস্থা করব?'

'আপনি পারবেন? অসম্ভব।'

'দেখি।' রহস্যের হাসি হাসে অম্লান।

নিরাপদ স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে অম্লানের আলাপ করিয়ে দিল। অম্লান খুবই ভদ্রভাবে কথা বলল। আদিতি টিভি খুলেছিল। ছবি এখনও কাঁপছে। দু-বছরের টিভি, মিস্ত্রি দেখিয়েও ঠিক হচ্ছে না। অম্লান বলল, 'এই টিভি দেখবেন না দাদা, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। গ্যারান্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকবার মিস্ত্রি দেখালাম, যখন করে দিয়ে যায় তখন ঠিক থাকে তারপর যে-কে সেই। আর একটা যে কালার টিভি কিনব তার তো উপায় নেই। যা দাম।

'আহা কিনবেন কেন বউদি। দু-বছর তো বেশিদিন নয়। কোম্পানিকে লিখছেন না কেন? ঠিক আছে, টিভি কেনার রসিদটা আছে?' অম্লান জিজ্ঞাসা করল।

রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখি কী করা যায়।'

অনেকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে গেল সে। এর মধ্যে হৈমন্তী জানতে পেরেছে বিয়ে থা করার সুযোগ হয়নি এখনও ওর। টালিগঞ্জে বাড়ি। বাড়িতে মা আছে। সরকারি চাকরি করে। কিন্তু কোন ডিপার্টমেন্ট তা বের করতে পারেনি হৈমন্তী। অম্লান বলেছে, 'বউদি মাপ করবেন, এটা বলতে অসুবিধে আছে।'

তাজ্জব ব্যাপার। সেদিনের পর আর লোডশেডিং হচ্ছে না এ বাড়িতে। প্রতিবেশীরা এতে অবাক। ঈর্ষান্বিত অনেকেই। হৈমন্তী বলল, 'সত্যি ভদ্রলোক খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।'

হৈমন্তীর ভাই এসেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন করে। বলল, 'সত্যি দিদি, এই কারণে তোমরা এত সহজে টুপি পরো।'

হৈমন্তী চটে গেল, 'আজেবাজে কথা বলিস না।'

ভাই বোঝাল, 'ধরো, আমার সঙ্গে খুব জানপয়চান আছে ইলেকট্রিসিটির ইঞ্জিনিয়ারের। এপাড়া এসে জানলাম তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। সঙ্গে-সঙ্গে ফোনে তাকে অনুরোধটা করলাম। তারপর তোমার বাড়িতে এসে যেন প্রথম লোডশেডিং দেখছি এমন অভিনয় করে লোকটাকে দ্বিতীয়বার ফোন করলাম। ব্যাস, আলো এসে গেল। আর তুমি ভাবলে, ব্যাপস, লোকটার কি ক্ষমতা।'

হৈমন্তী এতটা বোঝেনি। এবার বুঝে বলল, 'যাক বাবা, আমাদের তো আর লোডশেডিং হচ্ছে না, সেইটেই উপকার।'

কিন্তু দিন-তিনেক বাদে টিভি কোম্পানি থেকে টেলিফোন এল। তাঁরা পুরোনো টিভি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন সেট দিয়ে দিতে চান। আজ বিকেলে তাঁদের লোক সেটা পৌঁছে দেবে। হৈমন্তী হতভম্ব। গ্যারান্টি কার্ডে এক বছর সময়সীমা ছিল তবু এটা সম্ভব হল কি করে? সে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন করল নিরাপদকে। নিরাপদ ছুটে এল বাড়িতে। কোম্পানির লোক বিকেলবেলায় এসে পুরোনো সেট নিয়ে গেল নতুন সেট বসিয়ে। তারা জানাল ওপরতলার হুকুমে কাজটা করা হচ্ছে। নতুন সেট অনেক বেশি আধুনিক এবং দামের তফাত তিন হাজার টাকা।

হৈমন্তী বলল, 'নাঃ, ক্ষমতা আছে বটে অম্লানের। তবে গায়ে পড়ে এত উপকার করছে, এটা আমার ভালো লাগছে না।'

নিরাপদ বলল, 'তুমি বড্ড সন্দেহবাতিক।'

'হয়তো। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

তাহলেও আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা জানল। অনেকেই অম্লানের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। হৈমন্তী ঠেকিয়ে রাখে। দিন-দশেক বাদে ছুটির দশ মিনিট আগে নিরাপদ দেখল তার সামনে অম্লান, 'এদিকে এসেছিলাম ভাবলাম দাদাকে নিশ্চয়ই অফিসে পেয়ে যাব।' নিরাপদ টিভিটার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিল।

অম্লান বলল, 'এ কিছু নয়। আসলে আমরা অনেকেই নিয়ম জানি না। কোনও কোম্পানি চাইবে না বিক্রির দুই বছরের মধ্যে তাদের জিনিস খারাপ এটা বাজারে চালু হোক। নিজেদের মান বাঁচাতে ওরা পালটে দেবে।'

নিরাপদ অম্লানের সঙ্গে বের হল। সামনের গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠল অম্লান। গাড়ির ওপর লাল আলো। ড্রাইভার নেই। অম্লানই চালান। ডালহৌসি এলাকায় অত স্পিডে গাড়ি চালাতে কাউকে দ্যাখেনি নিরাপদ। মাথার ওপর লাল আলো থাকায় মোড় পার হবার সময় সেপাইরা সেলাম ঠুকছে।

নিরাপদ বাকশক্তি রহিত। নিরাপদ কোনওমতে অনুরোধ করল আস্তে চালাতে। অম্লান হাসল, 'আস্তে চালাতে কোনও মজা নেই দাদা।'

'কিন্তু আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' আর্তনাদ করল নিরাপদ।

গাড়ির গতি কমাল অম্লান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িতে লাল আলো কেন হে? শুনেছি মন্ত্রীমশাই, জাজ ছাড়া লাল আলো কোনও সাধারণ নাগরিক জ্বালাতে পারে না।'

অম্লান গম্ভীর হল, 'তাহলে আমাকে অসাধারণ নাগরিক মনে করুন।'

বাড়িতে পৌঁছে দিল অম্লান। নিরাপদ তাকে নিমন্ত্রন করল চা খেয়ে যেতে। ওপরে এল ওরা। অদিতি দরজা খুলল। অম্লান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? লোডশেডিং-এর কষ্টটা নেই তো?'

অদিতি হাসল, 'না নেই। থ্যাঙ্কস। সে ভেতরে চলে গেল।'

নিরাপদ দেখল ওর চলে যাওয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে অম্লান। সেই সময় হৈমন্তী ভেতর থেকে আসছিল। অম্লানের বিহুল দৃষ্টি দেখে সেও লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সম্বিৎ এল যেন, অম্লান বলল, 'কিছু না। কেমন আছেন?'

'ভালো। হৈমন্তী স্বামীর দিকে তাকাল, সর্বনাশটা হল।'

'কি ব্যাপার?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম। বলল, দিন-দশেক লাগবে।'

হৈমন্তী চিন্তিত, আগামী পরশু মেয়ের জন্মদিন। সবাইকে আসতে বলেছি। 'কী হবে?'

অম্লান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডাবল সিলিন্ডার নেই?'

নিরাপদ জবাব দিল, 'ডাবল সিলিন্ডারেই এই দশা।'

অম্লান মাথা নাড়ল, 'এটা কোনও প্রবলেমই নয়।'

হৈমন্তী রেগে গেল, 'প্রবলেম নয় মানে? কেরাসিন পাওয়া যায় বাজারে?'

'যায়। দাম বেশি দিতে হয়। কিন্তু বউদি, চিন্তা করবেন না, আপনি গ্যাসই পাবেন। কাল সকালে আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

অম্লানের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল নিরাপদর। যে ইলেকট্রিক এনে দিতে পারে, টিভি সেট পালটাতে পারে সে হয়তো গ্যাসও পারবে। একটু বাদে নিরাপদর শ্যালক অবিনাশ এল। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অম্লানের। অবিনাশ ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষ। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী চাকরি করেন মশাই।'

অম্লান হাসল, 'আমি যে চাকরি করি সেটা সাধারণকে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা?'

'টালিগঞ্জে থাকি, এটুকু জানলেই চলে না?'

'না, চলে না, আপনি কেমন লোক মশাই? হুট করে ট্রেনের আলাপ সম্বল করে ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন অথচ নিজের পরিচয় কাউকে জানাচ্ছেন না? এটা কোন ভদ্রতা?'

নিরাপদ শালাকে সামলালো, 'আহা নিশ্চয়ই ওঁর অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধে না ধান্দাবাজি। আপনাকে ফাঁসাবে এই লোকটা।'

অম্লান হাসল, 'আপনি আমাকে অপমান করছেন।' এখানে এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন, গায়ের জোরে আমি পারব না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে কোনও কারণ না দেখিয়ে কয়েকমাস জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো, আমি কি আপনার কোনও ক্ষতি করেছি?'

'তা নয়।' আমতা-আমতা করল হৈমন্তী।

'আপনার খুব ক্ষমতা, না?' অবিনাশ তেজি গলায় বলল।

'খুব না, সামান্য।'

'আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম গড়িয়ায়। নাইনটি পারসেন্ট টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রোমোটার এখন এক্সট্রা এক লাখ চাইছে। এটা সমস্ত রীতিনীতি ভদ্রতার বাইরে। প্রোমোটার এখন বেশি দাম পাচ্ছেন বাইরে থেকে। বলছেন হয় আমাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে হবে নয় উনি আমার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। কেস করে কোনও লাভ হবে না। কারণ সবাই জানে প্রোমোটার ফ্ল্যাট একেবারে সাদা টাকায় বিক্রি করে না। কিছু উপায় হতে পারে?'

অম্লান নিরাপদর দিকে তাকাল, 'দাদা, আপনি কি চান কিছু হোক?'

নিরাপদ নিজের মাথায় হাত বোলালে, 'হওয়া খুব শক্ত। এক, পাড়ার ছেলেরা যদি লোকটাকে চাপ দেয় তাহলে—।'

অবিনাশ মাথা নাড়ল, 'সেটা আর সম্ভব নয়। লোকটা ওদের হাত করে ফেলেছে।'

অম্লান এবার হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বউদি আপনি কি চান?'

হৈমন্তী একটু গদগদ গলায় বলল, 'দেখুন না, চেষ্টা করে।'

অম্লান অবিনাশের কাছে ঠিকানা, প্রোমোটারের নাম-ধাম চাইল। তারপর আগামীকাল কিছু করা যাবে বলে চলে গেল। অদিতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল, দেখল লাল আলো লাগানো গাড়িতে ওঠার আগে অম্লান ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

পরদিন দুপুরে অফিসে অবিনাশের ফোন পেল নিরাপদ। সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল তাকে থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলার জন্যে। প্রোমোটার বোধহয় থানাকেও ম্যানেজ করেছে। জামাইবাবু যদি সঙ্গে আসেন তাহলে সে সাহস পায়। নিরাপদ স্ত্রী-র ভাই-এর দুর্দিনে সঙ্গী হল।

দারোগার সামনে বসেছিলেন প্রোমোটার এবং এক ভদ্রলোক। অবিনাশ নিজের পরিচয় দেওয়ামাত্র দারোগা তাকে বসতে বললেন। প্রাথমিক আলোচনার পর প্রোমোটার যখন জিনিসপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন তখন দারোগা স্পষ্ট বলে দিলেন, 'মাসখানেকের মধ্যে যদি আপনি অবিনাশবাবুর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি না তুলে দেন তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

প্রোমোটার ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে চাইলেন কিন্তু দারোগা কোনও কথা শুনতে চাইলেন না। এবার প্রোমোটার প্রস্তাব দিলেন একটু আলাদা করে তার সঙ্গে বসে কথা শুনতে। দারোগা সেটাকেও নাকচ করলেন। এবার প্রোমোটারের সঙ্গী ভদ্রলোক কথা বললেন বেশ গম্ভীর গলায়। দারোগা শুনলেন। হেসে বললেন, 'অজিতবাবু, পলিটিক্যাল প্রেশার দিয়ে কোনও লাভ হবে না। অর্ডারটা এসেছে এত ওপরতলা থেকে যেখানে আপনারাও পৌঁছতে পারবেন না। এর পরে প্রোমোটার দারোগাকে লিখিতভাবে জানাল যে তিনি এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবি অবিনাশকে দিয়ে দেবেন।

নিরাপদ তো বটেই অবিনাশেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ সবই অম্লানের জন্যে হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না। লোডশেডিং দূর করা বা টিভি-সেট পালটানো খুব দারুণ ব্যাপার নয় কিন্তু ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়া?

নিরাপদ বাড়িতে ফিরে শুনল হৈমন্তী বেরিয়ে গিয়েছে। অদিতি বলল, দুপুরে অম্লানকাকু ফোন করেছিল। ভবানীপুরের এক গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে নিরাপদর নাম বললেই নাকি সিলিন্ডার পাওয়া যাবে। নিরাপদ হতভম্ব। সেই দোকানে তাদের নাম লিস্টে নেই।

বললেই দেওয়া যায় নাকি? কিন্তু হৈমন্তী ফিরে এল একটি কুলিগোছের লোকের সঙ্গে যার হাতে সিলিন্ডার। পুরোনোটা নিয়ে নতুনটা দিয়ে সে চলে যাওয়া মাত্র হৈমন্তী যেন সাতমুখে কথা বলে উঠল, 'তুমি জানো অম্লান কে?'

'কে?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ।

'ডেপুটি গভর্নর অফ ওয়েস্টবেঙ্গল। ভাবতে পারো?'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ গো। আমি সেই ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে উনি একটি চিরকুট বের করলেন। ওদের ওপরতলার এক সাহেব লিখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি গভর্নরের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে যেন একটা গ্যাসের সিলিন্ডার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।' হৈমন্তী বসে পড়ল।

'ডেপুটি গভর্নর? এরকম পোস্ট তো পশ্চিমবাংলায় আছে বলে শুনিনি।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

নিরাপদ বিড়বিড় করল, 'একবার অজয়বাবুর আমলে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পোস্ট তৈরি হয়েছিল, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার পোস্ট মাঝে-মাঝে হয় কিন্তু ডেপুটি গভর্নর?' সে উঠে টেলিফোন গাইড দেখে রাজভবনে ফোন করল। রাজভবন জানাল অম্লান মিত্র নামে কাউকে তারা চেনে না। নিরাপদ পরিচিতজনদের ফোন করল। সবাই হাসাহাসি করল ডেপুটি গভর্নর নামে কোনও পোস্ট আছে শুনে। অথচ হৈমন্তী জোর দিয়ে বলছে সে ওই শব্দদুটো কাগজে দেখেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আত্মীয়স্বজন এল এ বাড়িতে আদিতির জন্মদিন উপলক্ষ্যে। হইচই হচ্ছে। অবিনাশের ছোটভাই বিকাশ থাকে বিরাটিতে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রাত করতে চাইল না। সে যখন আটটা নাগাদ বের হচ্ছে তখন অম্লান এল লাল আলো জ্বালানো গাড়ি চালিয়ে। এসে বলল, 'দাদা, অদিতির জন্মদিনে আমাকেই বাদ দিলেন? তবু অযাচিতের মতো এসে পড়লাম।'

অবিনাশ তাকে দেখে খুব খুশি। হৈমন্তীও। সে বলল, 'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না বলে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। খুব খুশি হয়েছি এসেছেন বলে।' তার সঙ্গে বিকাশেরও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। বিকাশ চলে যাচ্ছে শুনে ব্যস্ত হল অম্লান, 'সেকি, এখন তো সবে সন্ধে, এখনই চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিকাশ বলল, 'ফ্ল্যাটে তালাচাবি দিয়ে এসেছি। খুব চুরি হচ্ছে এখন ও-পাড়ায়। তাই বেশি রাত করতে চাই না।'

'এটা কোনও প্রবলেম নয়। ঠিকানাটা বলুন।'

ঠিকানা শুনে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচুগলায় কিছু বলে এসে অম্লান হাসল, 'নিন, আড্ডা মারুন। দশটা নাগাদ উঠব।'

'কিন্তু—।' বিকাশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ বলল, 'আর কিন্তু করিস না। অম্লানবাবু যখন বলছেন তখন মন ঠিক করে আড্ডা মার! কোনও ভয় নেই।'

হঠাৎ অম্লান নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনার জমি কেনা আছে?'

'জমি? না। ওসব আর হয়ে উঠল না।'

হৈমন্তী বলে উঠল, 'একদম বিষয়ী মানুষ নয়। এই ভাড়ার ফ্ল্যাটেই সারাজীবন পচতে হবে।'

অম্লান হাসল, 'তা কেন? আপনি সল্টলেকে পাঁচকাঠা জমি নিন। স্টেডিয়ামের ঠিক পেছনে। খুব ভালো জায়গা। নেবেন?'

নিরাপদ কিছু বলার আগে অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'সল্টলেকে? ওরেব্বাস। ওখানে এখন তিন লাখ করে কাঠা।'

নিরাপদ বলল, 'আমাকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না।' অম্লান হাসল, 'তিন লাখ তো ব্ল্যাক। বারো হাজার করে কাঠা পাবেন। নিয়ে নিন দাদা। ষাট হাজার দিয়ে জমিটা কিনে ফেলুন। ওটাই আইনসম্মত দাম। পরে বাড়ি করতে ইচ্ছে না হলে না হয় বিক্রি করে দেবেন।'

অবিনাশ উল্লাসিত, 'নিয়ে নিন জামাইবাবু। বাড়ি না করলে চৌদ্দ লাখ চল্লিশ হাজার এখনই প্রফিট। এত লাভ ভাবা যায় না। জমি এখন সোনা।'

অম্লান বলল, 'ভেবে দেখুন। যদি চান তাহলে একটা চেষ্টা হতে পারে।'

নিরাপদ বলল, 'ভেবে দেখি।'

হঠাৎ অম্লানের যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে সে উঠে অদিতির সামনে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছোট্ট প্যাকেট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।' অদিতি বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

বিকাশরা চলে গেল ন'টা নাগাদ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বস্তিতে নেই। নিরাপদই যেতে বলল তাকে। খাওয়া-দাওয়া হইচই করতে-করতে এদের দশটা বেজে গেল। এক ফাঁকে অম্লান নিরাপদকে বলল, 'দাদা আপনারা সবাই ভাবছেন আমি কে অথচ আমি সেটা জানাতে পারছি না। খুব খারাপ লাগে। এবার আমার সঙ্গে আপনাদের দেখা আর ঘনঘন হবে না।'

'সেকি, কেন?' নিরাপদ অবাক।

'আমাকে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। এখনও কিছু দেরি আছে যাওয়ার।'

মন খারাপ হয়ে গেল নিরাপদর। লোকটার পরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্যবহার তার খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া অযাচিত উপকারগুলোর কথা ধরলে—! সে বলল, 'আমরা আপনার কাছে শুধু উপকার নিয়ে গেলাম, বদলে কিছুই করলাম না।'

'ছি-ছি। আপনি একথা বলছেন কেন? আমি যা-যা করেছি ভালোবেসে করেছি। সবাইকে কি খুশি করা যায়? আমার মাকেই খুশি করতে পারলাম না।'

'কেন?'

'মা চান আমি বিয়ে করি, সংসারী হই।'

'এতে অসুবিধে কোথায়?'

'মেয়ে কোথায়? তেমন মেয়ে না পেলে বিয়ে করে কি লাভ?'

'কীরকম মেয়ে আপনার পছন্দ?' সরল গলায় জানতে চাইল নিরাপদ।

এই সময় হৈমন্তী পাশে এসে দাঁড়াল। তার কানেও গেছে শেষ প্রশ্নটা। অম্লান হাসল, 'বউদি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

হৈমন্তী হাসল, 'বাঃ রাগ করব কেন?'

'তাহলে বলি। ঠিক আপনার মতো মেয়ে পেলে বিয়ে করতে পারি।'

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। নিরাপদ হেসে উঠল। আর তখনই টেলিফোন বাজল। নিরাপদ এগিয়ে গেল সেটা ধরতে। হৈমন্তী বলল, 'আপনি খুব ফাজিল।'

'সত্যি কথা বলেছি বউদি।'

'আমার মতো মেয়ের কি অভাব বাংলাদেশে?'

'খুঁজে দিন। আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম।'

এই সময় অদিতি এসে দাঁড়াল পাশে, 'মা দ্যাখো!'

হৈমন্তী দেখল। একটি দামি হাতঘড়ি। সে বলল, 'একি, এত দামি জিনিস কেন আনলেন?'

'অপরাধ হয়ে গেছে?'

হৈমন্তী জবাব দিতে পারল না। হঠাৎ তার মনে সন্দেহটা এল। অম্লান কী অদিতির জন্যে এসব করছে? তার মতোই তো দেখতে অদিতি। প্রথমদিন যেভাবে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে, গাড়িতে ওঠার আগে হাত নাড়া, দামি ঘড়ি উপযাজক হয়ে এসে উপহার দেওয়া—এসব কি তারই ইঙ্গিত? অসম্ভব। এই দুজনের বয়সের পার্থক্য অন্তত আঠারো বছরের। ভাবল বয়সি লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারে না হৈমন্তী। আর অদিতি কিছুতেই রাজি হবে না জানত। ওর বন্ধুর দাদারাই পাত্তা পাচ্ছে না।

নিরাপদ ফিরে এল টেলিফোন রেখে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' হাসল অম্লান।

বিকাশ ফোন করেছিল। ও ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্যাখে একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওর পরিচয় পেয়ে তারা জানায় যে অর্ডার পেয়ে এসেছিল ফ্ল্যাট পাহারা দিতে। কোনও বিপদ হয়নি। বিকাশ এসে যাওয়ায় ওরা চলে গেছে। বিকাশ আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছে।'

অবিনাশ ছিল। সে বলল, 'অম্লানবাবু, আপনি কে মশাই? আরব্যরজনীর আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের গল্প শুনেছি, এ যে তার মতো ব্যাপার।'

অম্লান হাসল, 'প্রদীপের দৈত্য কিনা জানি না তবে এসব করলে দেখেছি একসময় যাদের জন্য করেছি তাদের কাছে ভীতিকর দৈত্য হয়ে যাই।' তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বউদি? আমার কথা কিছু ভাবলেন?'

হৈমন্তী বাঁকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত পারেন আর এটুকু পারেন না?'

অম্লান হাসল, 'এখানে আমার সঙ্গে প্রদীপের দৈত্যের মিল আছে। পার্থিব জিনিস আমরা এনে দিতে পারি। কিন্তু দয়ামায়া ভালোবাসা পারি না। আপনি তা পারেন।'

'অসম্ভব। আপনার কথা আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছি না।'

'জানতাম।' অম্লান মাথা নাড়ল। তারপর নিরাপদকে বলল, 'চলি দাদা।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে হৈমন্তী তার সন্দেহের কথাটা নিরাপদকে জানাল। নিরাপদ চমকে উঠল। অসম্ভব। অদিতি ওর হাঁটুর বয়সি। হৈমন্তী বলল, 'লোকটা এই মতলবে এসেছিল।'

নিরাপদ অবশ্য একমত হল না। ট্রেনে অদিতির কথা ও জানত না।

দু-দিন পরে লোডশেডিং হলে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, জমি কেনার কথা মনে হলে হৈমন্তী নিরাপদর খুব কষ্ট হত। তাদের মনে হত অদিতিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এখন সেটা করে কোনও লাভ নেই। অম্লান সম্ভবত মাদ্রাজে চলে গিয়েছে। হয়তো সেখানে কোনও দাদা-বউদি পেয়ে তাদের উপকার করছে। হৈমন্তী সেটা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়।



হনিমুনে যেমন হয়

বিয়ে হয়েছিল শেষ রাতে। বাসরঘরে যেতে-যেতেই আকাশ ফরসা। মেয়েরা আক্ষেপ করেছিল এইরকম বিয়ের কোনও মানে হয় না। বাসর জেগে বরবউ-এর সঙ্গে রসিকতা করা গেল না, গানবাজনা হল না, এ কেমন বিয়ে! অবশ্য সবাই জানত ওই রাত ছিল মরশুমের শেষ বিয়ের রাত আর তার লগ্ন যদি শেষ রাত্রে পড়ে তাহলে কারও কিছু করার নেই।

রাত জাগতে হয়েছিল, সকালে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেই বিছানায় গিয়েছিল প্রতীক। দুপুর অবধি ঘুমাতে পেরেছিল। আজ কালরাত্রি, বউ-এর পাশে যাওয়া দূরের কথা, মুখ দেখতে নেই বলে পিসিমারা ফতোয়া দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় তালিবান হলেন বড় মাসিমা। বলেছিলেন, 'খবরদার ছায়াও মারাবি না।'

বন্ধুরা আড্ডা মারতে এসেছিল। বলেছিল, আজ তোর লাস্ট নাইট অফ ব্যাচেলার্স লাইফ। কাল থেকে তো সারাজীবনের ফুলশয্যা। মনে-মনে রোমাঞ্চিত হলেও মুখের চেহারা পালটায়নি প্রতীক। যে বন্ধুরা বিবাহিত এবং অভিজ্ঞ পরামর্শ দেওয়ার সময় তারা দু-দলে ভাগ হল। একদল বলল, 'প্রথম রাত্রে বড়জোর হাত ধরবি, তার বেশি এগোবি না। নইলে সারাজীবন তোকে একটা

অভদ্র, সৌজন্যবিহীন রাক্ষস ভাববে।' আর একদল বলেছিল, 'দূর! প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়।' অবিবাহিত ডাক্তার বন্ধু অমলকান্তি বলে গিয়েছিল, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ করবি। কিন্তু যা করবি উইথ ডিগনিটি। বর্বর হোস না।'

ক'দিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল প্রতীক। তার জীবনে কোনও মেয়ে আসেনি। প্রেম করার সুযোগ সে পায়নি। পড়াশুনা এবং গবেষণা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল এতদিন যে মেয়েদের সম্পর্কে কোনও আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়নি কখনও। আজ বাড়িতে যে এত মহিলা এবং মেয়েদের ভিড়, তা হয়েছে তার বিয়েকে উপলক্ষ করে। বউভাতের পরই সবাই চলে যাবে। সে, মা আর বাবা এই বড় বাড়িতে এতকাল বাস করে এসেছে। এখন থেকে আর একজন বাসিন্দা বাড়ল।

খবরটা এনেছিলেন বড় মাসিমা। কথাবার্তা যাতায়াত করেছিল মা-বাবা। তবে বলা হয়েছিল দেখে আসতে। প্রতীক আপত্তি করেছিল। ছবিতেই তো ভালো লাগছে। যাকে চিনি না, জানি না, তাকে বউ হিসেবে পেতে সামনে যাওয়া কীরকম বোকা-বোকা ব্যাপার। অবশ্য মেয়ের যদি তাকে দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে যেতে হবে। জেনেছিল, মেয়েরও সেই বাসনা নেই। অতএব ছাদনাতলায় দেখা হল। দেখে ভালো লাগল।

বন্ধুরা যাই বলে যাক, প্রতীক ভেবে রেখেছিল, প্রথম রাত কেন, যতদিন পরস্পরের জানাজানি সম্পূর্ণ না হয় ততদিন পদ্মকলির শরীরের ওপর স্বামীর অধিকার ফলাতে যাবে না।

বউভাতের পালা তখনও চোকেনি অথচ রাত গড়িয়েছে এগারোটায়। মামাতো পিসতুতো বোনেরা তাদের দুজনকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া সেরেছে। বন্ধুরাও ছিল। খাওয়ার পর যখন তাদের সঙ্গে গল্প করছে মেয়েরা এসে বলল, 'একি! আজ তোমার ফুলশয্যা আর তুমি এখনও গল্প করছ? বউদিমণি কতক্ষণ জেগে থাকবে। চলো।'

বন্ধুরা হাত নেড়ে বলল, 'বিদায় উইশ ইউ গুড লাক।'

বড়পিসির ধমকানিতে মেয়েরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। ফুল দিয়ে চমৎকার সাজানো খাটের ঠিক মাঝখানে মুখ নিচু করে যে সুন্দরী বসে আছে তার নজর কোথাও নেই। স্বাভাবিক। প্রতীক ভাবল, একদম অচেনা একটি পুরুষের সঙ্গে ওকে আজ রাত কাটাতে হবে। সঙ্কোচ, ভয় তো হওয়ারই কথা। সে দরজা বন্ধ করল। তারপর চেয়ার টেনে খাটের পাশে নিয়ে গিয়ে বসল, 'আমি প্রতীক, তুমি তো পদ্মকলি।'

পদ্মকলি মুখ তুলল না।

'আজ নিশ্চয়ই তুমি খুব টায়ার্ড। অন্যদিন না হয় গল্প করা যাবে। তুমি বরং একটু সহজ হয়ে শুয়ে পড়ো। খাটটা তো বেশ বড়, আমি ওপাশে শুতে পারি। আর তাতে যদি অস্বস্তি হয় মেঝেতে বিছানা পেতে নিতে পারি।' প্রতীক বলল।

পদ্মকলি কোনও সাড়া দিল না।

প্রতীকের খেয়াল হল, 'সরি। আমার বোধহয় আপনি দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল। এই প্রথম কথা বলছি। আমরা তো কেউ কাউকে চিনি না।'

পদ্মকলি এবার মুখ তুলল। নিজের ঠোঁটের এক প্রান্ত ওপরের দাঁতে চাপল। তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'খুব জরুরি না হলে, মানে আজ তো অনেক ধকল গেল, বিশ্রাম নিলেই ভালো হয়।'

'না। জরুরি, খুব।' পদ্মকলি মুখ ফেরাচ্ছিল না। কিন্তু তার গলার স্বরে উত্তেজনা ছিল। প্রতীক অবাক হল। বাইরে এখনও লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। বাসরঘরে মেয়েরা জমিয়ে থাকে, ফুলশয্যায় কি আড়ি পাতে? অবশ্য পরদা ঢাকা বন্ধ কাচের জানলায় ওরা শুধু আলো দেখতে পাবে। ঘরের কিছু চোখে পড়বে না। সে বলল, 'বেশ, শোনা যাক।'

'আপনি হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ ভাববেন।' পদ্মকলি থেমে গেল।

'না-না, অকারণে খারাপ ভাবতে যাব কেন?'

'অকারণে নয়। মানে, আমার খুব খারাপ লাগছে আপনাকে কষ্ট দিতে, আপনি তো সত্যিকারের ভদ্রলোক, তাই না?' এই প্রথম তাকাল পদ্মকলি।

সোজা হয়ে বসল প্রতীক, 'বুঝতে পারছি না, মানে না শুনলে বুঝব কী করে!'

'হ্যাঁ। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি আগে বলিনি কেন? একটা ফোন করে সব বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। সেটা আমি পারিনি। না পারার কারণ ছিল। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আমি কী বলতে চাইছি?' পদ্মকলি করুণ চোখে তাকাল।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল প্রতীক।

'আমার বিবেক আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না।'

'আহা! আমি কেন ঠকব?' প্রতীক অবাক।

'ঠকবেন না? যাকে বিয়ে করেছেন সে যদি অন্য পুরুষকে মন দিয়ে বসে থাকে তাহলে আপনি ঠকবেন না? একি কথা বলছেন?' চাপাস্বরে জিজ্ঞাসা করল পদ্মকলি।

'তাই নাকি?' শব্দদুটো অসাড়ে বেরিয়ে এল প্রতীকের মুখ থেকে।

'হ্যাঁ, আড়াই বছর ধরে টানা প্রেম করেছি ওর সঙ্গে। পার্কে ঘুরেছি, গঙ্গার ধারে গিয়ে ভেলপুরি খেয়েছি, মাসে একদিন সিনেমায় যেতাম। তার বেশি কিছু নয়।'

'তাহলে তো তাকেই বিয়ে করা উচিত ছিল।'

'ছিলই তো। কিন্তু আপনি যেটা সহজে বললেন তা আমার বাবা-মা ভাবতেই পারল না। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল, ফোন ধরতে দিত না। আমি সেসব না শুনতে মা একদিন ঘুমের ওষুধ খেল দশটা। যমে মানুষে টানাটানি। সবাই বলতে লাগল মায়ের মৃত্যু হলে আমি দায়ী হব। কিন্তু ডাক্তার বাঁচিয়ে দিল। বাড়িতেই। বাইরের কেউ জানতে পারেনি। ভালো হতেই মা আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন বাড়ির পছন্দ করা পাত্রকে যদি বিয়ে না করি তাহলে গলায় দড়ি দেবেন, বুঝুন ব্যাপারটা।' করুণ দেখাল পদ্মকলির মুখ।

'সর্বনাশ!' প্রতীক বলল।

'ঠিক এই কথাটাই বলেছিল ও, সর্বনাশ। আমার অবস্থা ভাবুন। যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করলে মা গলায় দড়ি দেবে। মানে আমি মাকে হত্যা করব! কোনও সন্তান তা পারে? তাই মাকে বাঁচাতে আপনার সঙ্গে বিয়েতে রাজি হতে হল আমাকে।' পদ্মকলি বলল।

'ও।' প্রতীক ভেবে পাচ্ছিল না কী বলবে!

'হ্যাঁ, প্রথম কথা উঠতে পারে, ব্যাপারটা বিয়ের আগে আপনাকে কেন জানালাম না। এ বাড়ির ফোন নাম্বার তো বাইরেই পেতে পারতাম। ফোনেই বলা যেত।'

'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক কথা।' মাথা নাড়ল প্রতীক।

'ঠিক কথা?' পদ্মকলি এমনভাবে তাকাল যেন অদ্ভুত কথা শুনছে, 'না ভেবে বললেন তো? আপনি আমার ফোন পেয়ে বাড়িতে বলতেন, তাঁরা আমার বাড়িতে জানাত। বিয়ে ভেঙে যেত। তখন মা কী করত? শুধু গলায় দড়ি নয়, গায়ে আগুনও লাগাত। বুঝতে পারছেন?'

'তা অবশ্য! কিন্তু ওই ছেলেটির ব্যাপারে আপনার বাবা-মায়ের আপত্তি কেন ছিল?'

'ও কবিতা লেখে। কবিদের ওপর ভরসা করা যায় না বলে মায়ের ধারণা। তা ছাড়া ওর টাইটল হল কর্মকার, আমরা মুখার্জি। মা মানতেই পারছিল না। তার ওপর বাংলায় এম. এ., স্কুলে পড়ায়। বাবার ধারণা বিয়ে হলে ঘরজামাই হতে চাইবে।' পদ্মকলি বলল, 'কিন্তু হৃদয়? ওর মতো হৃদয় আমি কারও দেখিনি। এই যে এতদিন ধরে প্রেম করেছি, একবারের জন্যেও আমার শরীর স্পর্শ করেনি, জানেন?' পদ্মকলির চোখ বন্ধ হল, 'যখন বললাম হে বন্ধু বিদায়, তখন যেন ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।'

মাথা নাড়ল প্রতীক, 'স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক।'

'ও দেবদাস হতে পারত, আমাকে খুন করতে পার[redacted]ছুড়ে মুখ পুড়িয়ে দিতে পারত, এমনকী বিয়ের সময় এসে হাঙ্গামা করতে পার[redacted]এত নরম মন ওর।'

'উনি কোথায়?'

'নেই।' দ্রুত মাথা নাড়ল পদ্মকলি।

'সেকি?'

'চুপচাপ হারিয়ে গেল। শিলং-এর পাহাড়ে।'

'ও! কিন্তু শিলং কেন?'

'শিলং তো প্রেমিক-প্রেমিকার জেরুজালেম। অমিত লাবণ্যের লীলাক্ষেত্র। ও নাকি শিলং থেকে একটু দূরে চেরাপুঞ্জিতে এক মিশনে গিয়ে জনসেবা করছে।'

'সেখানে তো খুব বৃষ্টি হয়।'

'হত। এখন হয় না। আকাশে যখনই মেঘ দেখি তখনই ওর কথা মনে পড়ে। আচ্ছা, বঙ্গোপসাগর থেকে যে সব মেঘ কলকাতার আকাশে আসে তারা তো চেরাপুঞ্জিতে যায়, না?'

'বোধহয়।'

'যাকগে, আমার যা কথা ছিল সব বলে দিলাম।'

'হুঁ। আচ্ছা উনি যদি হারিয়ে না গিয়ে আপনার ওপর জোর করতেন?'

'খুশি হতাম। কিন্তু ও তো খুব নরম।' পদ্মকলি বলল, 'এসব শুনে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন?'

'না-না। খারাপ ভাবব কেন? আমি প্রেম করতে পারিনি আপনি করেছেন। আমার বন্ধুরা বলে আমি অস্বাভাবিক বলে প্রেম করতে পারিনি। আপনি স্বাভাবিক।' প্রতীক বলল।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' পদ্মকলি হাসল, 'এখন কী করবেন?'

'ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে।'

'আমি যখন একবার এ বাড়িতে চলে এসেছি তখন এখনই চলে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? শুনলে আত্মীয়স্বজনরা ছি-ছি করবে।' পদ্মকলি বলল।

'তা তো বটেই। আর চলে যাওয়ার কথা উঠছে কেন? আগে সব ভাবি তারপর ঠিক করব কী করা উচিত। নিন, এবার আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

'আপনি? না-না, আপনি মেঝেতে শোবেন আর আমি খাটে, এ ভারি খারাপ দেখাবে। বরং উলটো হোক।' পদ্মকলি খাট থেকে নেমে এল।

'বেশ। আপনার যা ইচ্ছে।' প্রতীক উঠে দাঁড়াল।

পদ্মকলি বলল, 'এই যে আমাকে দেখছেন, আমার মধ্যে কোনও মন নেই।'

'জানি! সেই মন এখন চেরাপুঞ্জিতে।' প্রতীক বলল।

'হ্যাঁ। তাই আলো নেভাবেন না। অন্ধকারে যদি আপনি ভুল করে ফেলেন।'

অন্ধকারে ভুল? প্রতীক লজ্জা পেল, 'না-না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান।'

মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল পদ্মকলি, 'আপনার বাড়ির লোক শুনলে কি কাণ্ড হবে! আমার মা-বাবা শুনবেন।'

'কেউ শুনবে না।' প্রতীক আশ্বাস দিল।

'ক'দিন বাদে তো দ্বিরাগমনে যেতে হবে।' পদ্মকলি মনে করিয়ে দিল।

'জানি। মা বলেছে।' প্রতীক বলল, 'আমি ভাবছি ওরা আমাদের আপনি-আপনি শুনলে কীরকম করবে? বিয়ের আগে যারা তুই-তোকারি করে তারাও তো বিয়ের পরে তুমি বলে। আচ্ছা, আমরা এইটুকু অ্যাডজাস্ট করতে পারি না?'

'ছি-ছি। এভাবে [illegible]য়। নিশ্চয়ই পারি।' লজ্জিত হল পদ্মকলি।

'তাহলে গুড [illegible]

'হ্যাঁ, গুড নাইট [illegible]া জ্বলতে লাগল।

সকালবেলায় চা খে[illegible] বড়পিসি বললেন, 'সেসব দিন চলে গেছে। এখন সংসার আর রমণীয় হয় না রমণীর গুণে, পুরুষেরও দায়িত্ব বেড়েছে।'

প্রতীকের বাবা বললেন, 'হুম্।'

এই সময় মাথায় আধঘোমটা টেনে পদ্মকলি ঘরে ঢুকতেই প্রতীকের মা বললেন, 'এসো এসো। খোকা উঠেছে?'

পদ্মকলি নীরবে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

বড়পিসির কপালে ভাঁজ পড়ল, 'সারারাত ঘরে আলো জ্বালিয়ে তুমি ঘুমোতে পারো? খোকা তো জ্বালত না।'

বাবা বলতেন, 'নতুন জায়গা, বোধহয় ভয় করছিল।'

'কেন? খোকা তো পাশে ছিল।' বড়পিসি বললেন, 'যাক গে, দ্বিরাগমন থেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে যাবে। এখান থেকে পাটনা এমন কিছু দূর নয়। আমার বাড়ি দিয়ে শুরু করবে তারপর অন্তত বারোটা বাড়িতে যেতে হবে তোমাদের। আমরা একসঙ্গে থাকি না বটে, কিন্তু লতায়পাতায় জড়িয়ে আছি। বুঝেছ?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল পদ্মকলি।

মা বললেন, 'চেয়ারে বসো না। চা খাও।'

পদ্মকলি বলল, 'এখন থাক।'

বড়পিসি কপালে চোখ তুললেন, 'ওরে বাবা, তুমি কোন যুগের মেয়ে? স্বামী খায়নি বলে আগে খাবে না? এখন এসব কেউ মানে? এসো, বসো বলছি।'

বাধ্য হল পদ্মকলি। এই সময় প্রতীক এল ঘরে। তাকে দেখে ঘোমটা টানছিল পদ্মকলি।

মা বলল, 'না, তোমাকে ঘোমটা দিতে হবে না। তুমি এখন আমার মেয়ে। মা-বাবার সামনে কি মেয়ে ঘোমটা দেয়?'

বাবার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অতিথিদের তদারকি করতে তিনি উঠে গেলে বড়পিসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে খোকা, হনিমুনে কোথায় যাচ্ছিস?'

'হনিমুন!' প্রতীক ঢোক গিলল।

'একি রে! তুই প্ল্যান করিসনি?'

'না।'

'কি আশ্চর্য! তোর পিসে আমাকে নিয়ে হনিমুনে গিয়েছিল কাশীতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বিধবা মা, অবিবাহিত খুড়ো কাকাকে। তাদের সেবা করতে-করতে আমার আর গঙ্গায় নৌকো চড়া হয়নি।' পিসি বলল।

'এখন ছুটি নেই। দ্বিরাগমনের পরেই জয়েন করতে হবে।'

'তা দ্বিরাগমনের তো দেরি আছে। দু-তিনদিনের জন্যে ওকে নিয়ে কোথাও যা। প্লেনে চেপে যাবি, সমুদ্রে কিংবা পাহাড়ে।'

'দেখি।' প্রতীক জবাব দিল।

রাত্রে প্রতীক ঘরের দরজা বন্ধ করতে পদ্মকলি বলল, 'বাব্বা, সারাদিন এত ব্যস্ত যে কথা বলার সময় পাওয়া গেল না।'

প্রতীক দেখল পদ্মকলি খাটে বসে আছে। সে চেয়ারে বসল, 'না, সবার সামনে কী কথা বলব।

'কী ভাবা হল?'

'কী ব্যাপারে?'

'বাঃ। কাল বলা হল ভাবতে হবে, অনেক ভাবতে হবে।'

'ভাবলাম, যা চলছে তা চলুক। ও হ্যাঁ, বড়পিসি চাপ দিল, মা-ও পরে বলল, বন্ধুদের বলতে ওরা তিনদিনের হনিমুন করার জায়গা বলে দিল। এতদিন প্লেন চলত না, এখন আবার চালু হয়েছে।' প্রতীক বলল।

'আমার কিন্তু সমুদ্র তেমন ভালো লাগে না।' পদ্মকলি বলল।

'না-না। সমুদ্র নয়। পাহাড় শিলং-এ।' প্রতীক হাসল।

'শিলং!' সোজা হয়ে বসল পদ্মকলি।

'পাইনউড হোটেল বুক করে দিয়েছি।'

'ওঃ। কি ভালো! আমি ভাবতেই পারছি না।' চোখ বন্ধ করল পদ্মকলি, 'শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি কত দূরে?'

'বেশি দূর তো নয়। গিয়ে দেখা যাবে।'

'কবে যাওয়া হবে?' মুখে খুশি উথলে উঠল পদ্মকলির।

'কাল। কালই ফ্লাইট। রোজ তো যাওয়া যায় না।'

হঠাৎ পদ্মকলির খেয়াল হল, 'আমরা কিন্তু কেউ কাউকে তুমি বলছি না। অবশ্য বন্ধ ঘরে কেউ শুনছে না।'

'বেশ। আমি বলছি। তুমি খুশি?' প্রতীক স্মার্ট হল।

'তুমি?' পদ্মকলি তাকাল।

'তুমি খুশি হলেই আমি খুশি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপরেই উদাস হল পদ্মকলি, 'আমি ওকে বলেছিলাম, জানো।'

'কী বলেছিলে?'

'বলেছিলাম, দ্যাখো, বাবার জন্যে রামচন্দ্রকে বনবাস যেতে হয়েছিল। আমি বিয়ে করছি মায়ের জন্যে। কিন্তু আমার শরীর আর মন তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমার মনে হয় ও তিন বছরের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে।' ফোঁস করে একটা শব্দ বের হল পদ্মকলির নাক থেকে।

'তুমি যে কাল বললে উনি চেরাপুঞ্জির আশ্রমে...।'

'ওর মাসতুতো বোনের মুখে শুনেছিলাম। তা অতদূরে যাওয়া মানে উধাও হয়েই যাওয়া। আজ খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'শুয়ে পড়ো।'

'কাল মেঝেতে শুয়ে গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। আমি আজ খাটে শুই? মেঝেতে শোওয়ার কি অভ্যেস আছে?'

'নো প্রবলেম।' প্রতীক ঝটপট মেঝেতে বিছানা করে নিল।

'তুমি কী ভালো। জানো, আমি না বিয়ের আগে শাড়ি পরে শুতে পারতাম না। কাল রাত্রে বারংবার ঘুম ভেঙে গেছে। নাইটিতে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে না!'

'যাতে সুবিধে তাই পরো।'

'তখন একা শুতাম, শোওয়া খুব খারাপ। নাইটি হাঁটুর ওপর উঠে যেত। মা বকত খুব। কিন্তু ঘুমের মধ্যে উঠলে আমি কি করব বলো। ভয় হচ্ছে, যদি আজও উঠে যায়?'

'ঘুম ভাঙলে নামিয়ে নিও।' প্রতীক উপদেশ দিল।

'তুমি অবশ্য মাটিতে শুয়ে দেখতে পাবে না। কিন্তু রাত্রে টয়লেটে যাওয়ার সময় আমার দিকে একবারও তাকাবে না।'

'বেশ তাকাব না।'

'তুমি কি ভালো। তাহলে গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

এয়ারপোর্ট ছোট। সেখানে নেমে পদ্মকলি মুগ্ধ। 'দ্যাখো দ্যাখো কী সুন্দর। দ্যাখো রে, জগতের কী বাহার।'

'সত্যি সুন্দর। কিন্তু ঠান্ডা আছে।'

'তুমি দেখছি খুব শীতকাতুরে। ওর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। শুনে তোমার বোধহয় ভালো লাগবে না।' পদ্মকলি বলল।

'শোনাও না।' প্রতীক বলল।

'যে পাহাড়ে কখনও শীত নামে না সেখানে জড়ো হয়েছে কিছু নারী যারা কখনও পুরুষ দেখেনি।' হাসল পদ্মকলি, 'দারুণ, না?'

না বুঝে মাথা নাড়ল প্রতীক।

হোটেলটি চমৎকার। কার্পেটে মোড়া বড় ঘর, বিশাল বাথরুম, ফায়ার প্লেসে রুম হিটার আছে। পদ্মকলি পুলকিত, 'এরকম হোটেলে আমি কখনও থাকিনি। হনিমুন করতে হলে এরকম ঘরে এসে থাকা উচিত। না?'

'হুঁ। কিন্তু আমি ভাবছি স্লিপিং ব্যাগ ভাড়া করতে হবে।' প্রতীক বলল।

'ওমা! কেন?'

'এই মেঝেতে শুলে নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'

তখন দুপুর। একা বেরিয়ে প্রতীক স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে এল। তখন স্নান শেষ করে পদ্মকলি তাজা। প্রতীক বলল, 'এটাকে একটু আড়ালে রাখতে হবে। হনিমুন করতে এসে স্লিপিং ব্যাগ ব্যবহার করছি জানলে হোটেলের কর্মচারীরা যা-তা ভাববে।' পদ্মকলি ব্যাগটাকে ওয়ার্ডরোবের ভেতর ঢুকিয়ে কম্বলে চাপা দিয়ে দিল।

প্রতীক বলল, 'আমি বাথরুমে যাচ্ছি, বেরিয়েই খেয়ে নেব। খোঁজ নিয়েছি মারুতি ভাড়া করে চেরাপুঞ্জিতে যেতে বেশি সময় লাগে না।'

'আজই যাবে?' পদ্মকলি অবাক।

'পরশু তো ফিরতে হবে। সময় কোথায়?' বাথরুমে ঢুকে পড়ল প্রতীক। ঢুকে দেখল তোয়ালে রাখার জায়গায় পদ্মকলির কাচা শায়া এবং অন্তর্বাস ঝুলছে। এই প্রথম কোনও নারীর অন্তর্বাস দেখল প্রতীক। দেখেই চোখ সরিয়ে নিল।

ফ্রেস হয়ে বাথরুমের দরজা খুলতেই দেখল পদ্মকলি পোশাক বদলে দাঁড়িয়ে। এখন তার পরনে জিনস আর পুলওভার। দুটোই নীল। দারুণ দেখাচ্ছে। পদ্মকলি বলল, 'সরি, তুমি দ্যাখোনি তো?'

'কী?' অবাক হল প্রতীক।

'ঠিক ভেবেছি। তোমার ওসব নজরে পড়বেই না।' পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে শায়াটাকে অন্তর্বাসের ওপর চাপিয়ে দিল পদ্মকলি।

লাঞ্চের পর মারুতিতে উঠে বসল ওরা। মারুতি চলতে শুরু করলে পদ্মকলি তাকাল, 'তুমি এখন এত গম্ভীর কেন গো?'

'কোথায় গম্ভীর?' প্রতীক প্রকৃতি দেখল।

'নিশ্চয়ই তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কী করব বলো। মানুষটাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে বসে আছি। ও যদি তিন বছর আমার জন্যে অপেক্ষা করে তাহলে আমারও তো একটা কর্তব্য আছে কী বলো?'

'নিশ্চয়ই।' মাথা নাড়ল প্রতীক।

'আমাকে দেখে খুব কান্নাকাটি করতে পারে। মনটা নরম তো। আমি ওকে তোমার কথা বলব। তুমি কি ভালো, সব বলব।' পদ্মকলি বলল।

'না-না। তার কী দরকার।'

'দরকার আছে। তুমি কিছু বোঝো না। ও যদি আমাকে আটকে রাখতে চায়, অবুঝ হয়? আমি বিবাহিতা, আটকে থাকতে পারি? আগে ডিভোর্স হোক, তারপর ওর ইচ্ছে পূর্ণ হবে। কিন্তু ও যদি শোনে তুমি খুব ভালো তাহলে বিশ্বাস করবে আমি ফিরে যাব। আর আটকাতে চাইবে না।'

প্রতীক বলল, 'কিন্তু ও যদি জেদি হয় আর তুমি না আসতে পারো তাহলে আমার আর কলকাতায় ফেরা হবে না।'

'কেন?'

'ঝগড়া হত, আলাদা হতাম। ডিভোর্স হল, এর একটা মানে আছে। কিন্তু হনিমুন করতে এসে বউকে রেখে ফিরলে মুখ দেখাতে পারব না।'

'তা ঠিক। তাহলে কি ফিরে যাব? আমার যে খুব ইচ্ছে করছে যেতে!' পদ্মকলি আনমনা হল।

'চলো। দেখা যাক, কপালে কী আছে।' প্রতীক বলল।

চেরাপুঞ্জিতে একটুও মেঘ নেই। চারিদিক খটখট। খোঁজখবর করে আশ্রমের সন্ধান মিলল। দারোয়ান আটকে দিল, 'এই আশ্রমে নারীর প্রবেশের অধিকার নেই।'

পদ্মকলি বলল, 'তাই নাকি? ডাকো ওকে। বলো কলকাতা থেকে পদ্মকলি এসেছে।' নাম বলল সে।

দূরে দাঁড়িয়েছিল প্রতীক। নামটা শুনল।

দারোয়ান ফিরে এসে বলল, 'উনি আসছেন।'

তারপরেই একজন ব্রহ্মচারীকে দেখা গেল। পরনে সাদা লুঙ্গি, সাদা ফতুয়া। মাথা কামানো। পদ্মকলি চেঁচালো, 'এ কী! কে মরেছে?'

'আমার গৃহী জীবন। সে জীবনে কত দ্বন্দ্ব, কত কষ্ট। এই জীবনে পরম শান্তি। তুমি একা কেন? তিনি কোথায়?'

'ওই তো ওখানে।' হাত তুলে দেখাল পদ্মকলি।

'তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ নাকি?'

'বড় কঠিন পথ। আমি এখন ব্রহ্মচারী। পরীক্ষায় পাশ করলে ওই পথে হাঁটতে পারব।'

'তুমি আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?'

'নারীমুখ দর্শনে চিত্তে স্থিরতা থাকে না।'

'ন্যাকা।'

'আচ্ছা। চলি। স্বামী, সন্তান নিয়ে সুখী হও।'

'আশ্চর্য। তিন বছর অপেক্ষা করবে না?'

'প্রতিদিন পৃথিবী বদলায়। কথা তো বদলাবে। তখন অন্ধ ছিলাম। এখন আলোর ইশারা পাচ্ছি। যাই।'

'বেশ। যাও। ভালোই হল, এখানে না এলে শ্রাদ্ধ হত না।'

'শ্রাদ্ধ?'

'হ্যাঁ। আমার মনের।' হনহন করে ফিরে এল পদ্মকলি প্রতীকের কাছে। বলল, 'চলো।'

সেদিন সন্ধে থেকে শিলং-এ বৃষ্টি নামল। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ল ঠান্ডা। সেই দুপুরের পর পদ্মকলি আর কথা বলেনি। বিছানায় লেপচাপা দিয়ে পড়েছিল সন্ধে পর্যন্ত। তারপর প্রতীকের অনুরোধে রাতের খাওয়া শেষ করে আবার লেপের তলায় ঢুকেছিল।

স্লিপিং ব্যাগটা বের করে কার্পেটের ওপর বিছিয়ে প্রতীক দেখল সেটা বেশ বড়সড়। সোয়েটার পরেই ভিতরে ঢুকে চেন টেনে দিল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার এমন গরম লাগল যে আবার চেন খুলে উঠে বসে সোয়েটার ছেড়ে ফেলল।

এই সময় পদ্মকলির গলা ভেসে এল, 'আমার খুব ঠান্ডা লাগছে।'

'আমার লেপটা নিয়ে যাও।'

'না। লেপে ঠান্ডা যাচ্ছে না।'

'তাহলে স্লিপিং ব্যাগটা খাটে তুলে দিচ্ছি। এর ভেতরটা বেশ গরম।' প্রতীক বলল।

'না। খাটে তুলতে হবে না।'

নিচে নেমে এল পদ্মকলি, 'এটা কি সিঙ্গল স্লিপিং ব্যাগ?'

'না বোধহয়। বেশ তো বড়।'

'তাহলে একটু সরে শোও।'

স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে পড়ল পদ্মকলি। প্রতীক শুয়ে পড়তেই সে চেন টেনে দিল।

ব্যাগের খোলের মধ্যে দুটো শরীর উত্তপ্ত হচ্ছিল কারণ দুজনের মাঝখানে একটুও ব্যবধান নেই।

হনিমুন যেমন হয়ে থাকে।



আপনা মাংসে হরিণা বৈরী

আজ সকালে যখন বেলটা বেজেছিল তখন সুচরিতার ঘুম সদ্য ভেঙেছে। এসময় অনেকেই আসে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা। কিন্তু এত জোরে ওরা বেল বাজায় না। আজকাল শব্দের বাড়াবাড়ি খুব খারাপ লাগে তাঁর। বিছানা থেকে নামার আগেই দরজায় যমুনা। সুচরিতাকে বসে থাকতে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সেই চিৎকার জড়ানো কান্না থেকে আবিষ্কার করা গেল ওর ভাই এসেছে মায়ের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। ওকে এখনই চলে যেতে হবে।

কিছু টাকা আর জামাকাপড় ব্যাগে পুরে যখন যমুনা ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তখনও পাশের বেডরুমের দরজা ভেজানো। এই যে একটা মেয়ে মায়ের শোকে চেঁচিয়ে কাঁদল তাতেও মানুষটার ঘুম ভাঙেনি একথা বিশ্বাস করেন না সুচরিতা। ভেঙেছে কিন্তু ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। বেরিয়ে এলে যদি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে দেখা দিচ্ছে না। বিয়াল্লিশ বছর ধরে লোকটাকে দেখে আসছেন। যত দিন যাচ্ছে তত নিজের চারপাশে খোলস বানাচ্ছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকলেন সুচরিতা। এই কাজটা যমুনা করত। চায়ের জল গরম করতে-করতে মাথাটাই গরম হয়ে গেল তাঁর। সারাদিন ধরে এ বাড়িতে কত কাজ। ঘর পরিষ্কার,

ব্রেকফাস্ট বানানো, দুপুরের খাবার, বিকেলের চা, রাতের খাবার, বাজার করা, বাসন ধোয়া, থাকতে হলে এইসব কাজ ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে। যমুনা আছে বছর দশেক। সাতদিনের ছুটি নেয় পুজোর ঠিক আগে। প্ল্যান করে যায় বলে বদলি একজনকে দিতে পারে। সে যে-বাড়িতে কাজ করে সেখান থেকে বাৎসরিক ছুটি নিয়ে এসে উপরি রোজগার করে। এখন তাকে মরে গেলেও পাওয়া যাবে না।

চা বানালেন সুচরিতা। কিছুটা লিকার পটে রেখে নিজেরটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন। কী করা যায়! মনে পড়ল, কেব্‌লে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন নাম্বারটা টুকে রেখেছিলেন। ফোন করলেই বাড়িতে খাবার দিয়ে যায়। একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যমুনাকে ওই সময়েও তিনি বলেছেন যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসতে। এই তাড়াতাড়িটা যে কতদিনে হবে তা ঈশ্বর জানে। হঠাৎ কীরকম অসহায় মনে হল নিজেকে। ঘড়ি দেখলেন, এখন সন্তুদের শুয়ে পড়ার সময় হয়নি। রিসিভারটা তুলে বোতাম টিপলেন তিনি। রিং হচ্ছে। সুতপার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো!'

'কেমন আছ তোমরা?' সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ও, মামাই, ভালো আছি, তোমার কি খবর? কালই তো ও ফোন করেছিল, না?' সুতপার গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ। সন্তু নেই?' সুচরিতা বিরক্ত হল।

ছেলের গলা পেলেন তিনি, 'বলো মা, কী ব্যাপার?'

'এমনি। এমন কিছু নয়। যমুনার মা মরে গেছে, ও দেশে চলে গেল।'

'তাই? কাউকে বদলি দিয়ে গেছে?'

'কী করে দেবে? খবর পাওয়ামাত্র চলে গেল।'

'আশ্চর্য! তুমি ছাড়লে কেন? কোনও দায়িত্ববোধ নেই?'

ওপাশ থেকে সুতপা বোধহয় জিজ্ঞাসা করল। সন্তু তাকে জানাল। সুতপা আবার কিছু বলতে সন্তু হাসল, 'সুতপা বলছে আমাদের তো এতবড় বাংলো, কোনও ঝি-চাকর নেই, এটা আমাদের কাছে কোনও প্রবলেম নয়। যাক গে, ক'দিন ম্যানেজ করে নাও। আর কিছু?'

'না। রাখছি।' রিসিভারটা রেখে দেওয়ার পর মনে হল খুব বোকামি করা হল। অতদূর থেকে এ ছাড়া আর কী বলতে পারে ওরা। হুঁঃ, একবার ওদেশে গিয়ে দেখে এসেছিলেন কাজের লোক ছাড়া কীভাবে ওরা সংসার করে। সব তো হাতের সামনে। তা ছাড়া সুতপা একা তো কিছু করে না, সন্তুও সমানে খাটে। সন্তুকে রাঁধতে দেখেছেন তিনি। লনের ঘাস ছাঁটা থেকে কার্পেট ক্লিনিং ওই করে। বড়-বড় কথা। বিয়ের পর সুচরিতাকেও তো সব করতে হয়েছিল। এখানে নয়, বহরমপুরে। একান্নবর্তী পরিবার, চার ভাইয়ের বউ, কাকার ফ্যামিলি সব এক বাড়িতে। সেখানে বউদের রান্না করতে হত, ঘর মুছতে হত, বাসন ধোয়ার জন্যে অবশ্য লোক ছিল। কিন্তু এত লোকের রান্না কাঠের আগুনে করা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা সুতপারা কোনওদিন বুঝতে পারবে না। তিনমাসেই সুচরিতার চেহারায় কালি পড়ে গিয়েছিল। সুস্নাতর বাবা কাজের লোকের হাতের রান্না খাবেন না। ওইরকম বুর্জোয়া শখ মেটাতে চার বউকে পালা করে রাঁধতে হত। ভাবা যায়?

চা শেষ করলেন যখন সুচরিতা তখন পাশের বেডরুমের দরজা খুলল।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সুস্নাত টেবিলের উলটোদিকে এসে বসলেন, 'কাগজ দেয়নি? যমুনা—!'

'তোমাকে খবরটা জানানো দরকার। যমুনা দেশে গিয়েছে। ওর মা মারা গেছে।'

'যাচ্চলে!'

'কবে আসবে জানি না। ওর কান্না নিশ্চয়ই তোমার কানে গিয়েছিল!'

'ওর কান্না বলে বুঝিনি, ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলাম বাংলা সিরিয়াল হচ্ছে।'

'আপাতত আমি চা করেছি। পটে আছে, কিচেন থেকে নিয়ে নাও।' ইচ্ছে করেই বললেন সুচরিতা। সাতসকালে বাংলা সিরিয়ালের কান্না শুনছে। কোনওদিন ওই সময় সিরিয়াল হয়? সুচরিতার মনে পড়ল না ও কখনও নিজে চা বানিয়ে খেয়েছে কিনা। কিন্তু এখন বেশ চলে গেল কিচেনে। খানিক বাদে চা আর বিস্কুট নিয়ে ফিরতেই বেল বাজল। সুচরিতা দরজা খুললেন। একসঙ্গে কাগজওয়ালা এবং দুধওয়ালা। এ বাড়িতে দুটো কাগজ রাখা হয়। একটা টেবিলে রেখে সুচরিতা ইচ্ছে করেই আর একটা নিয়ে বসলেন। অন্যদিন সুস্নাত এখানে একা বসে দু-কাপ চা নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে।

অন্যদিনের থেকে আজকের পার্থক্যটা ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

সুস্নাতর এখন সত্তর। চুল পেকেছে, দাঁতও পড়েছে কয়েকটা কিন্তু বার্ধক্য ওকে তেমনভাবে দখল করতে পারেনি। কাজকর্ম শেষ করেছে অনেকদিন। এখন বই নিয়ে পড়ে থাকে। বিকেল হলে সেজেগুজে বের হয়। ক্লাবে যায়। সেখানে নিয়ম করে মদ্যপান করে ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। সারাদিন মুখ বন্ধ করে থেকে ওখানে গিয়ে বোধহয় রাজাউজির মারে। বছর পাঁচেক আগেও সুচরিতার ফিগার প্রায় ঠিকঠাক ছিল। ষাট বছর বয়সে যতটা ঠিক থাকা সম্ভব।

খবরের কাগজে মন দেওয়া সম্ভব হয় না সুচরিতার। তিনি কাগজ নিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ তুললেন সুস্নাত। হয়ে গেল, আজ থেকে যমুনা না ফেরা পর্যন্ত এ বাড়ি আর শ্মশানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। খবরের কাগজে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। সেই যৌবনের মাঝামাঝি থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, সমস্যা এলে বুক চিতিয়ে মোকাবিলা করা নেহাতই বোকামি। এ অনেকটা সমুদ্রে নেমে স্নান করার মতো। বিশাল ঢেউ গড়িয়ে-গড়িয়ে আসছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলে ঢেউ শরীরটাকে তুলে নিয়ে বালিতে এমন আছাড় মারবে যে হাড় না ভাঙলেও ছড়ে যাবে শরীরের নানান অংশ। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানরা হয় লাফিয়ে ঢেউয়ের ওপর উঠে যায় নয় ডুবে গিয়ে ওটাকে মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। এইসব তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলো ঢেউয়ের মতো চলে গেলে নির্বিষ জলের মতো ফিরে যায়। সুস্নাত নিজের ঘরে চলে এলেন। আর তখনই টেলিফোনটা বাজল। মূল রিসিভারটা ডাইনিং টেবিলের পাশে থাকলেও দুটো বেডরুমে তার এক্সটেনশন রয়েছে। সুস্নাত রিসিভার তুললেন।

'হ্যালো, সুস্নাত বলছি।'

'বাবা, কী হয়েছে? যমুনা কেন চলে গিয়েছে?'

নীপার গলা।

হকচকিয়ে গেলেন সুস্নাত, 'তুই কী করে খবর পেলি?'

'এইমাত্র দাদা ফোন করেছিল।'

'তোর দাদা লং আইল্যান্ডে বসে কী করে জানতে পারল?'

'ও, তুমি বড্ড প্রশ্ন করো। মা ফোন করেছিল দাদাকে, তুমি জানো না?'

'ও! আমাকে না জানালে জানব কী করে!'

'তোমরা এই ক'দিন কোনও হোটেলে গিয়ে থাকো না। কলকাতায় না থাকতে চাও, দীঘা বা দার্জিলিং-এ চলে যাও। দয়া করে বোলো না তোমার টাকা নেই। মা এমনভাবে ফোন করেছে যে দাদা চিন্তায় পড়ে গেছে!'

'তোরা যে এত চিন্তা করছিস তা জেনে খুব ভালো লাগছে রে!'

'ওয়েল, তুমি ঠাট্টা করছ। আমি তোমাকে কতবার বলেছি ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে সোজা চলে এসো মাকে নিয়ে। কিন্তু তুমি আসবে না! মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকা যায় না, এই প্রিমিটিভ আইডিয়া থেকে তোমরা মুক্ত নয়।' মেয়ের গলায় অভিমান।

'তোর দাদার ওখানে তো আমরা যাচ্ছি না।'

'আমি জানি কেন যাচ্ছ না। কিন্তু—। যাক গে, হোটেলে যদি যেতে না চাও তো মাকে বলো সাদামাটা কিছু রাঁধতে এবং তুমি মাকে হেল্প করো। বুঝলে! বাবা, ট্রাই টু রিয়েলাইজ, মা ছাড়া তোমার পাশে এখন কেউ নেই। আমি এত দূর চলে এসেছি যে চেষ্টা করলেই তোমার সাহায্যে লাগতে পারব না।'

নীপার টেলিফোন রেখে দেওয়ার পর সুস্নাতর মনে হল মেয়েটা খুব সত্যি কথা বলল, ও অনেক দূরে চলে গিয়েছে? কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া তো অনেক দূরে। যমুনা এই ফ্ল্যাট থেকে চলে গিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে, নাকি আর একটু বেশি? কিন্তু তার মধ্যেই নিউইয়র্কে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে। নিউইয়র্ক জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। কলকাতার কোনও খবরে সমস্যার গন্ধ পেলে ভাইও বোনকে সেটা জানিয়ে দেয়। সুস্নাত মেয়েকে কোনও কড়া কথা বলতে চাইলেও পারেন না। এই মেয়েটার ওপর তাঁর দুর্বলতার কথা সবাই জানে। ভালো ছাত্রী ছিল। ওর দাদা পরিশ্রমী বলে ভালো ফল করেছিল কিন্তু ওর মতো মেধাবী ছিল না। অনেকগুলো ডিগ্রি পেয়ে সহপাঠীকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল। সিডনিতে ভালোই আছে ওরা। আর কিছু নয়, একেবারে সমবয়সিকে বিয়ে করার ব্যাপারে অস্বস্তি ছিল সুস্নাতর। মেয়ে জানতে পেরে অভয় দিয়েছিল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। বেশি বড় হলে ও আমার কথা শুনত না। এখন শুনবে। আমাদের সম্পর্কটা দেখো ভালো থাকবে।'

মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ছেলে আমেরিকায়। অনেক কাল ছেলে 'মায়ের ছেলে' হয়ে ছিল। এখন বউয়ের স্বামী। তবু ভদ্রমহিলার হুঁশ হয় না। যে-কোনও সমস্যায় পড়তেই তড়িঘড়ি ছেলেকে ফোন করেন। যেন সঙ্গে-সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রাবিশ!

মেয়ের কথাটা কানে বাজছে। 'ট্রাই টু রিয়েলাইজ, মা ছাড়া তোমার পাশে এখন কেউ নেই।' এই পৃথিবীতে চোখের সামনে যে এল সে-ই এখন উপদেশ দিচ্ছে। কেন নেই? তুই নেই কেন? তোর দাদা নেই কেন? তোর কাকা পিসিরা নেই কেন? কথাটা মনে আসতেই খেয়াল হল নীপা ওর পিসিদের দুজনকেই কখনও দেখেনি। ও জন্মাবার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে ডিগ্রি এবং প্রেম নিয়ে বহরমপুরে ফিরে গিয়েছিলেন যুবক সুস্নাত চাকরি করতে। ওঁদের পিতৃদেব চেয়েছিলেন চার ছেলে বাড়িতে থেকেই কাজকর্ম করুক। সবাই একত্রিত থাক। সুস্নাতর প্রেমের প্রসঙ্গ জানাজানি হওয়ার পর মায়ের উদ্যোগে বিয়েটা হয়েছিল। কলকাতার মেয়ে সুচরিতা বউ হয়ে গিয়েছিল বহরমপুরে।

তারপরে কী যন্ত্রণা। যে মেয়ে চিরকাল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকেনি, চাইলেই যে সব পেয়েছে তার পক্ষে একান্নবর্তী পরিবারে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা একসময় করুণ চেহারা নিল। রাত্রে বিছানায় এসে কান্নাকাটি প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে গেল। ননদরা কে কীরকম খোঁটা দিয়েছে, সিনেমায় যেতে চাইলে কেন দুজনে আলাদা যেতে পারবে না, কাঠের আগুনে রান্না করা যার অভ্যেস নেই তাকে কেন সপ্তাহে চাররাত রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, এই ধরনের নানান অনুযোগে সুস্নাত ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় হঠাৎ শ্বশুরমশাইয়ের আগমন। মেয়েকে দেখে যেন তাঁর খুব কষ্ট হল, মেয়েরও শোক উথলে উঠল। ক'দিনের জন্যে মেয়েকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে জানালেন মেয়ের ইচ্ছে এম. এ. পড়ার। সুস্নাতর পিতৃদেব বললেন, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে বউমার পড়াশুনার ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাব কেন!'

সুস্নাত এলেন কলকাতায়। বুঝলেন, পড়াশুনাটা নেহাতই বাহানা। বহরমপুরের জীবনে ফিরে যেতে প্রবল আপত্তি সুচরিতার। এদেশে প্রেমের সময় ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে বড়জোর দশ শতাংশ জানতে পারে। বিয়ের পর বাকি নব্বই শতাংশ স্রেফ জুয়োখেলার চেহারা নেয়। সুস্নাত ফিরে গেলেন বহরমপুরে। এবং তারপরেই পিতৃদেবের মৃত্যু। খুঁটিটা নড়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যাগুলো দাঁত বের করল। মায়ের পক্ষে সেটা সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ল। কোনও ভাইয়ের ভাগে ঘর

কম হচ্ছে, কোনও ভাইয়ের অনুযোগ তার তুলনায় অন্য ভাই সংসারে কম টাকা দিয়েও সমান সুখ ভোগ করছে, ব্যাঙ্কে পিতৃদেবের যা রয়েছে তার বিলিব্যবস্থা কীভাবে হবে ইত্যাদি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সুস্নাত লক্ষ করত ওরা যখন কথা বলেছে তখন সুচরিতাকে বাদ দিয়েই বলেছে। যেন সুচরিতা এই বাড়ির কেউ নয়। একদিন কথাটা তুলতেই বড়বোন, যে তখন সদ্য বিবাহিতা, বলে ফেলল, 'কিছু মনে কোরো না দাদা, এ বাড়ি থেকে বউদির বেরিয়ে যাওয়াটা বাবা মেনে নিতে পারেনি বলে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখানে কেউ জানল না, তুমিও কিছু জানো না, হঠাৎ এম. এ. পড়ার ইচ্ছে হয়ে গেল? আর এম. এ. তো যখন-তখন পড়া যায় না, তারও তো সময় আছে। আমরা নিশ্চয়ই ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। যাই বলো, শুরুটা কিন্তু তোমার বউই করল।'

বাড়ির মধ্যে বাড়ি, ঘরের মধ্যে ঘর, মায়ের অবস্থা অসহায়। আর সেই সময় কলকাতার চাকরিটা চলে এল হাতের মধ্যে। মায়ের আপত্তি ছিল খুব। যেন সুস্নাতই তার ভরসা। তিনি পাশে থাকলে ভাঙনটাকে মা রুখতে পারবেন। কিন্তু সুচরিতা নিজের ভবিষ্যৎ, আকাশে ওড়ার স্বপ্ন টেনে নিয়ে এল সুস্নাত কলকাতায়। দমদমের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে তখন অপার আনন্দ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সকাল আসে। রবীন্দ্রনাথের গান বাজে সুচরিতার গলায়, রেকর্ডে। সুচরিতার পড়াশুনা, সুস্নাতর চাকরির বাইরের সময়টা যেন থমকে থাকে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে। পড়া শেষ হলে সুচরিতা চাকরি পেল, সুস্নাতর উন্নতি। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়ে চলে এল কয়েক বছরের ব্যবধানে।

ছেলে আসার পর যা হয়নি মেয়ে এলে তা হল। মেয়ের ওপর সুস্নাতর আগ্রহ নিয়ে রসিকতা করত সুচরিতা। যা ছিল এতকাল উদারতায় চাপা দেওয়া তা যে কখন উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তা ওরা নিজেরাই জানে না। এ বাড়িতে সুচরিতার দিদির অবারিত যাতায়াত। তাঁর সন্তানদের আঁকড়ে ধরেছে সুচরিতার ছেলে-মেয়ে। দিদি কেবলই বোঝাচ্ছেন, আর কতদিন ওরা ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকবে! ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের ফ্ল্যাট হওয়া উচিত। সুচরিতাই উদ্যোগী হলেন। ওঁর জামাইবাবু এই ফ্ল্যাট বুক করিয়ে দিলেন। সেসময় দুজনের রোজগার থেকে যা বাঁচত তার সবটাই চলে যেত ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেন্ট মেটাতে। সেই সময় বহরমপুরে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। মা যে ভাইয়ের সঙ্গে আছেন তার রোজগার কম। মায়ের জন্যে টাকা পাঠানোর অনুভব করেন সুস্নাত। সুচরিতা বলেন, 'তোমার মাকে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। কীভাবে করবে তা তুমিই ঠিক করো। তবে তোমার ভাইয়ের সংসার চালানোর দায়িত্ব নিশ্চয়ই তোমার নয়। আর সেটা তুমি নিজের ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে করতে পারো না।'

'তার মানে?'

'তুমি তোমার মায়ের জন্যে কত পাঠাবে? খাওয়াদাওয়া, ওষুধ ইত্যাদির জন্যে কত টাকা? ধরো পাঁচশো। তা তোমার মা নিশ্চয়ই সেই টাকায় বাজার করে নিজের জন্যে রাঁধবেন না। তাঁকে টাকাটা দিতে হবে ছেলের হাতে।'

'মা কীভাবে খরচ করবেন সেটা তাঁর ওপর নির্ভর করছে।' সুস্নাত বলেছিলেন।

মাকে পাঁচশো টাকা পাঠাতে বাড়তি খাটতে হচ্ছিল। কিন্তু সব মাসে ঠিকঠাক সময়ে পাঠাতে পারছিল না সে। আর তখনই হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ এল চাকরির সূত্রে। এক বছরের জন্যে। ফিরে এল অনেকটা ধাপ ওপরে ওঠার আনন্দ নিয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে মা মারা গিয়েছেন। ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

সুস্নাত জানেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা সত্ত্বেও ভাইদের ধারণা তিনিই সবচেয়ে সুবিধেবাদী। সবচেয়ে বেশি রোজগার করা সত্ত্বেও এক-এক ভাই যখন বিপদে পড়ে টাকা চেয়েছে তখন তিনি দিতে পারেননি। সুচরিতা ঠিকই বলতেন, 'দিলে ফেরত পাবে? বাড়ি বানাবার জন্যে দু-লাখ চেয়েছে, শোধ করবে? একজনকেই দুই দিলে আর একজন হাত বাড়াবে। তখন তাকেও দেবে?'

যুক্তিযুক্ত কথা। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে একটা তিরতিরে যন্ত্রণা রয়েই গেল। একসময় তিনি খবর পেতেন কাজেকর্মে ভাইরা কলকাতায় আসে অথচ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে না। বহরমপুরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনলেন, সেজো ভাইয়ের ছেলে যাদবপুরে পড়ছে অথচ তিনি জানেন না। ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেটাকে দেখে আসার কিন্তু ওরা যখন নিজেরাই দূরত্ব রাখছে তখন তিনি কেন উদ্যোগী হবেন? আর এইসব করতে-করতে আবিষ্কার করলেন ছেলে এবং মেয়ে মাসতুতো ভাইবোনকে চেনে, জানে, নিজের মনে করে কিন্তু বাবার তরফের কাউকে জানে না। এবং জানবার আগ্রহও নেই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোনওদিন সুস্নাতর ছিল না। এ নিয়ে সুচরিতার অনুযোগ খুব। শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

এইসময় শ্বশুর মারা গেলেন। শাশুড়ি একা। সুচরিতার দিদির ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। প্রায় ঝাড়া হাত-পা। অতএব তিনি গেলেন মায়ের সঙ্গে থাকতে। ভাইরাভাইয়ের পৈতৃক বাড়ি। দুই ভাইয়ের ব্যবস্থা আলাদা। কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দুজন মহিলা একা থাকবেন কী করে তাই ছেলে গেল দিদিমার বাড়িতে। সুস্নাত টের পেলেন তখন থেকেই দুই বোনের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। অথচ প্রকাশ্যে কেউ কাউকে সেটা জানাচ্ছে না। সুচরিতা ছেলেমেয়েকে মাসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার ব্যাপারে ঘুরিয়ে সতর্ক করছেন। একবার নিজেই চলে গেলেন ছেলেকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকবেন বলে। মেয়ে গেল না। ফিরে এলেন দিন-তিনেক বাদে। কারণটা জানালেন না। মেয়ে জানাল, মা খুব রেগে গেছে। যেহেতু সুচরিতা জানাননি তাই সুস্নাত জানতে চাইলেন না। কখন কেমন করে দুটো কম্পার্টমেন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলান না।

প্রথমে ছেলে পড়তে গেল আমেরিকায়। ফুল স্কলারশিপ পেয়ে। কথা হল, পড়াশুনো শেষ করেই ফিরে আসবে। কথা হয়েছিল মায়ের সঙ্গে, সুস্নাত জানতেন ছেলে ফিরবে না। সেটা জানাতে সুচরিতা রেগে গেলেন। জানালেন, সুস্নাত কখনই ছেলেকে পছন্দ করে না। ছেলে পড়া শেষ করে চাকরি নিল সেখানে। বছরে একবার আসতে লাগল। সুচরিতা তাকে বিয়ের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল। সুতপাকে পছন্দ করল সুচরিতা। সুস্নাত কোনও মন্তব্য করেননি। বিয়ের পর ওর মাকে নিয়ে ওরা চলে গেল। চাকরির দোহাই দিয়ে ফিরে এলেন সুচরিতা। সেই শেষ। আর যাওয়া হয়নি। মেয়ের বিয়ের সময় সুচরিতা যেন সবকিছু মেনে নিচ্ছিলেন। যেন সুস্নাতকে জব্দ করার জন্যেই ওই মেনে নেওয়া। বিয়ের পর যখন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল ওরা, আর তার কিছু পরেই শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে গেল তখন থেকে সুচরিতার কাছে মেয়ে বাতিল হয়ে গেল যেন। নীপা তার দেওরকে ওখানে নিয়ে গিয়েছে শুনে বলেছিলেন, 'বাপের মতোই কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

সুস্নাত লক্ষ করেন, মানুষ সারাজীবন ধরে একটার-পর-একটা সম্পর্ক স্বার্থের কারণে ছিঁড়ে ফেলে। প্রথমে স্বামী-স্ত্রী-র স্বার্থ, বাকি পৃথিবীটা আলাদা। তারপর স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের স্বার্থ, তারপর নিজের এবং সন্তানের স্বার্থ, তারপর সন্তান আলাদা, স্বামী আলাদা, শুধু নিজের স্বার্থ। পিতৃদেব বেঁচে থাকতে সুস্নাত যা ভাবতে পারতেন না তিনি মরে যাওয়ার পর তা পেরেছেন। অনায়াসে। মা চলে যাওয়ার পর আরও সহজ হল। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যে-যার নিজের জগৎ তৈরি করে নেওয়ার পর তাদের জন্যে চিন্তা করার দায় ঘুচল।

আর সুচরিতা? বিয়ের বছর দশেকের মধ্যেই মনে হয়েছিল যে, নারীকে তিনি আবাল্য কল্পনা করে এসেছিলেন সেই নারী সুচরিতা নয়। ঝগড়াঝাঁটি করার মতো নিম্ন রুচি তার নেই, আলাদা হয়ে যাওয়ার মতো মনের জোরও নেই। সেই জোর তৈরি হয়নি সন্তানদের জন্যেও।

এখন দশটা বাজে। সুস্নাত ঘর থেকে বের হলেন। পাশের বেডরুমের দরজায় গিয়ে নিচুগলায় বললেন, 'শুনছ!'

সুচরিতা, গলা পাওয়া গেল, 'কী ব্যাপার?'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসছি।'

সুচরিতা নিজেই বাইরে এলেন। সুস্নাত বললেন, 'নীপা ফোন করেছিল। ওকে ওর দাদা জানিয়েছে যে যমুনা চলে গেছে।'

'জেনে সে কী উপদেশ দিল?'

'উপদেশ বলছ কেন?'

'নয়তো কি! তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বসে শাশুড়ি, দেওরকে নিয়ে সংসার করতে-করতে আর কী করতে পারেন।' সুচরিতার কথায় ছুরির ধার।

'সেটা তো সন্তুও করতে পারে না।'

'কেন? পারে না কেন? সুতপা উপদেশ দিয়েছে তাকে অনুসরণ করতে। আমেরিকায় ওরা নিজেরাই সব করে। কে কেমন আমার সব জানা হয়ে গেছে।'

সুচরিতার কথা শুনে অনেকদিন বাদে সুস্নাতর খুব ভালো লাগল। সে বলল, 'নীপা বলছিল, যমুনা যতদিন না ফিরছে ততদিন কোথাও গিয়ে হোটেলে থাকতে। ইনফ্যাক্ট অনেকদিন বাইরে যাওয়াও হয়নি।'

'বেশ তো। যাও। তুমি এখানে না থাকলে আমার কোনও প্রবলেম হবে না, তা জানি।'

'ধন্যবাদ। নীপা বলছিল আমি যদি তোমাকে হেল্প করি—।'

'তুমি? হেল্প করবে? কোনওদিনও খাওয়ার পর প্লেট ধুয়েছ? হেল্প করতে গেলে তিনগুণ সমস্যা তৈরি করবে। তার চেয়ে কোথাও ঘুরে এসো।'

'তুমিও যেতে পারো। হোটেলে থাকলে কোনও পরিশ্রম হবে না।'

'অসম্ভব। এ বাড়িতে আছি, ঠিক আছি, অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হোটেলে গিয়ে একঘরে থেকে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারব না। তুমি তো জানোই, কথা বললেই আজকাল ঝামেলা হয়। কী দরকার প্রেশার বাড়াবার।'

'বেশ, তাহলে তুমিই কোথাও ঘুরে এসো। আমি এখানে হোটেলে খেয়ে নেব। আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

'সেটা মন্দ নয়। যাওয়া যেতে পারে। দীঘায় যেতে কতক্ষণ লাগে?'

'ঘণ্টা পাঁচেক বড়জোর। দুপুরে বাস আছে।'

সুচরিতা খুশি হলেন। বললেন, 'অনেকদিন সমুদ্র দেখা হয়নি।'

সুস্নাত নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, সুচরিতা নয়, তাঁরই উচিত ছিল দীঘায় যাওয়া। এতগুলো বছরে সুচরিতা কখনও একা কোথাও যায়নি। দীঘাতে তাঁরা গিয়েছিলেন ছেলে হওয়ার পরের বছরে। এখন নিশ্চয়ই কোনও মিল পাওয়া যাবে না। সেখানে গিয়ে হোটেল খুঁজে বের করে থাকার মধ্যে একটু অনিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া অনেক হোটেলে মেয়েদের একলা জায়গা দেওয়া হয় না। অবশ্য সুচরিতাকে এখন ঠিক মেয়ে বলা যায় না। আবার নিজে যে যাবেন সে ব্যাপারেও অস্বস্তি আছে সুস্নাতর। ধর্মতলায় গিয়ে বাস ধরতে হবে, অতদূর যাওয়া, হোটেলে থাকা, কীরকম পরিশ্রমের ব্যাপার বলে মনে হল।

'এদিকে আসবে?'

সুচরিতার গলা শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন সুস্নাত।

'শোনো, আমি একটা লাঞ্চমতো বানাচ্ছি। তোমাকে আর দুপুরে খেতে বেরুতে হবে না। স্টকে ডিম নেই। গোটা চারেক ডিম এনে দাও।'

'ডিম!'

'কেন? মেয়ে তো উপদেশ দিয়েছে, শোনোনি!'

অতএব সুস্নাত বেরুলেন। শেষ কবে বাজারে গিয়েছিলেন মনে পড়ে না। অবশ্য ডিম কিনতে বাজারে যেতে হবে না। রাস্তার উলটোদিকেই মুদির দোকান রয়েছে।

'চারটে ডিমের দাম কত?'

'হাঁস না মুরগি?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'সর্বনাশ।' ফাঁপড়ে পড়লেন সুস্নাত।

এই সময় হাসির আওয়াজ কানে এল। সুস্নাত দেখল মিসেস পাকড়াশি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'আজ কি দেখছি, আপনি ডিম কিনছেন?'

'আর বলবেন না, কাজের লোক দেশে গিয়েছে—!'

'তাহলে রান্নাবান্না—। আপনার মিসেসের শুনেছি গ্যাসের কাছে যাওয়া বারণ। আপনি রান্না করছেন নাকি ?'

হেসে মাথা নেড়ে চারটে হাঁসের ডিম কিনে বাড়ি ফিরল সুস্নাত। হ্যাঁ, সুচরিতার নিশ্বাসের একটা কষ্ট আছে। কথাটা খেয়াল ছিল না।

'শোনো, ওগুলো থাক। আমি দোকান থেকে কিছু কিনে আনছি।'

'ডিম আনোনি?'

'এনেছি।'

'দয়া করে পেঁয়াজগুলো একটু কুচিয়ে দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

ব্যাপারটা কিছুই নয় কিন্তু বেশ হিমসিম খেল সুস্নাত। হঠাৎ নিজেকে অপদার্থ বলে মনে হল তাঁর। কত মানুষ আছে যারা সব কাজকর্ম করেও চমৎকার রাঁধতে পারে। এই সন্তুটাও। শুনেছেন, নীপার বর নাকি দশ-বারোজনের ডিনার একাই বানিয়ে ফেলে। আর তিনি পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে চোখের জল ফেলছেন।

'ছাড়ো। ওইভাবে কাটলে আমার খাওয়া হবে না। তুমি দয়া করে একটা কাজ করো। ফোন করে জেনে নাও সিট রিজার্ভ করা যাবে কিনা, কখন বাস কোত্থেকে ছাড়বে আর দীঘার হোটেল বুক করা যাবে কিনা!' তৎক্ষণাৎ সরে আসছিল সুস্নাত, সুচরিতা বলল, 'ভেবো না তোমার ফেবার নিচ্ছি। পেঁয়াজ না কেটে ওই কাজটা তুমি করছ।'

আধঘণ্টা বাদে সুস্নাত জানল, টেলিফোনে টিকিট বুক করা যায় না। বাস ছাড়বে বারো, সাড়ে বারো এবং একটায় মনুমেন্টের কাছ থেকে। দীঘায় এখন ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই, সব হোটেল খালি যাচ্ছে।

শুনে খুশি হল সুচরিতা, 'বারোটা? এখনও দেরি আছে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। একটাই ব্যাগ নিচ্ছি। সুতপা সেবার একটা সুইমিং কস্ট্যুম নিতে চেয়েছিল, নিয়ে নিলে আচ্ছা করে সমুদ্রস্নান করা যেত। গিয়ে ফোন করে হোটেলের নাম্বার দিয়ে দেব। যমুনা এলে জানিয়ে দিও।'

'সমুদ্রের জলে শুনেছি স্কিন অ্যালার্জি হয়।'

'তোমার তো সবকিছুতেই অ্যালার্জি। আমাতেও।'

এই সময় টেলিফোন বাজল। সুচরিতা গিয়ে ফোনটা ধরল, 'হ্যালো! কে? ও! কি খবর? অ্যাঁ? তাই নাকি? খুব ভালো কথা। কোত্থেকে বলছ? শেয়ালদা স্টেশন? হ্যাঁ, তোমার দাদা আছে। ফোনে কী কথা বলবে, চলে এসো সোজা। আরে এসো। ঠিকানাটা জানো? বেশ তো। আমি অবশ্য বাইরে যাচ্ছি, তোমার দাদা তো রইল।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সুস্নাত। সুচরিতা বলল, 'তোমার আর কোনও চিন্তা নেই, হোটেলে খেতে হবে না। এই ফ্ল্যাটে বসে মায়ের রান্না খেতে পারবে।'

'মায়ের রান্না?'

'কেন? তোমার ছোটবোন মায়ের কাছে রান্না শেখেনি?'

'সে কি? ইতি ফোন করেছিল? হঠাৎ?'

'মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। হোটেলে উঠবে।'দাদা শহরে থাকতে হোটেলে কেন? পাত্রপক্ষ কি ভাববে? তাই বলে দিলাম চলে আসতে।'

'তুমি বলে দিলে?' সুস্নাত তখনও অবাক।

'হ্যাঁ। খালি ফ্ল্যাট। তবে আমার বেডরুমটা যেন ওরা ব্যবহার না করে। তিনজন আছে। তোমার ভালোই লাগবে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ—।'

'তো কি? নিশ্চিন্তে যাচ্ছি। দরজা ভালো করে বন্ধ না করে তুমি বেরিয়ে গেলে চোর ঢুকত, এখন সেটা হবে না। বউদি তো ওদের চোখে খুব খারাপ, আমি না থাকলে তাই ভাববে। বেশি আর কী!'

স্নান সেরে এসে সুচরিতা টেবিলে খাবার সাজাল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ওরা এসে পড়লে অসুবিধে হবে। দুজনের জন্যে বানিয়েছিলাম।'

অতএব খেতে বসতে হল। মন্দ হয়নি। কিন্তু ইতির মুখটা মনে করার চেষ্টা করল সুস্নাত। কত বছর ছোটবোনকে দেখেনি। ভাইদের মুখ কেমন ছিল? বড়বোনের? ইতির মেয়ে তাহলে বিয়ের বয়সি? তাকে তো দেখেইনি। হঠাৎ একটু কৃতজ্ঞবোধ করল সে সুচরিতার কাছে।

খাওয়া যখন শেষ তখন প্রথম বেলটা বাজল। সুচরিতাই দরজা খুলল। স্মার্ট চেহারার একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে, 'আমি তাজ ইন্ডিয়া থেকে আসছি। আপনাদের জন্যে একটা লাঞ্চ প্যাকেট আছে।'

'লাঞ্চ প্যাকেট? কে অর্ডার দিল?'

'ই-মেলে অর্ডার এসেছে নিউইয়র্ক থেকে, ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করেছেন। এটা নিন আর দয়া করে এখানে সই করে দিন।'

লোকটিকে বিদায় করে বড় প্যাকেটটা নিয়ে অপূর্ব হাসলেন সুচরিতা, 'দ্যাখো সন্তুর কাণ্ড। যমুনা নেই বলে ফাইভস্টার হোটেলকে বলেছে বাড়িতে লাঞ্চ পাঠিয়ে দিতে। নিশ্চয়ই সুতপা জানে না।'

'এরকম করা যায় তাই আমি জানতাম না।' বিড়বিড় করল সুস্নাত।

'তুমি তো কিছুই জানো না।' প্যাকেট খুললেন তিনি। তারপর উচ্ছ্বসিত হলেন, 'কী কাণ্ড! ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিকেন কাবাব, এটা কি? এ তো দুজনেও শেষ করা যাবে না। হয়তো ভেবেছে রাত্রেও খাব। জানে না তো, আমি দীঘায় চলে যাচ্ছি।' সুচরিতা বললেন।

'তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'নষ্ট করতে! এত একা খাওয়া যায়? নাকি, সন্তু পাঠিয়েছে বলে তোমার খেতে অরুচি হচ্ছে।' সুচরিতার কথা শেষ হতেই বেল বাজল।

'দ্যাখো, তোমার বোন এল!'

অতএব সুস্নাত দরজা খুললেন। আর একটি তরুণ দাঁড়িয়ে, হাতে বাক্স, 'মিস্টার সুস্নাত—।'

'হ্যাঁ, আমি।'

'এই নিন। আপনাদের লাঞ্চ প্যাকেট। হোটেল গ্র্যান্ড থেকে আসছি, অস্ট্রেলিয়া থেকে ই-

মেলে অর্ডার এসেছিল। ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট হয়ে গেছে। সই করুন।'

ছেলেটিকে বিদায় করে হাসিমুখে বাক্সটাকে টেবিলে রাখলেন সুস্নাত, 'দ্যাখো মেয়ের কাণ্ড। উপদেশ দেওয়ার পরেও খাবার পাঠিয়েছে। ই-মেলে আজকাল কত কী করা যায়। খুলে দ্যাখো তো, কী আছে!'

'তোমার মেয়ে পাঠিয়েছে, তুমিই খোলো।'

সুচরিতা মুখ ফেরালেন।

সুস্নাত খুলল। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিকেন কাবাব, আর একটা যেন কী! চারজন খেতে পারবে। বললেন, 'যাই বলো, মেয়ে আমাদের কথা ভাবে।'

'আমাদের বোলো না, আমার বলো।'

ঠিক সেই সময় আবার ফোন বাজল। সুচরিতাই ফোন ধরল, 'হ্যাঁ, কি হল ইতি? তোমরা হোটেলে যাচ্ছ, কেন? আরে এতদিন যোগাযোগ রাখোনি তো কী হয়েছে? তুমি যেমন রাখোনি তেমন আমরাও তো রাখিনি। না না, তোমার ফোন আসার আগেই আমি ভাবছিলাম বাইরে যাব। তুমি আসছ বলে চলে যাচ্ছি তা ভাবছ কেন? শোনো, তোমরা যদি না আসো তাহলে খুব দুঃখ পাব। তোমরা আসবে বলেই বোধ হয় বড় হোটেলের খাবার এসেছে। গুড। এসো।'

সুচরিতা উঠলেন। খাবারগুলোকে হটবক্সে রাখতে হবে।

সুস্নাত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলল?'

'আমি থাকব না বলে আসতে চাইছিল না। এখন আসছে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ জেনেও আসছে?'

'আমি চলে যাচ্ছি কে বলল? যাচ্ছি না।'

'ও!'

'ছেলেমেয়ে কষ্ট করে বিদেশে রোজগার করে, সেই টাকায় কেনা খাবার ফেলে দিতে তো পারি না। তা ছাড়া ননদের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, বাড়ির বউ হিসেবে না হয় একটা কর্তব্য করা যাক।'

'কিন্তু রান্নাবান্না—এত লোকের।'

'সবাই তো তোমার মতো অকর্মার ঢেঁকি নয়। এই খাবারে আজ চলে যাবে, কাল থেকে ইতি নিজেই রান্নাঘরে ঢুকবে। সমস্যার যখন সমাধান হয়ে যাচ্ছে তখন বাইরে যাওয়ার দরকার কি!' খাবারগুলো হটবক্সে ফেলতে-ফেলতে বললেন সুচরিতা।

নিজের ঘরে চলে এলেন সুস্নাত। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, যমুনা না ফেরা পর্যন্ত যে করেই হোক ইতিকে এখানে আটকে রাখতে হবে। যৌবনে একান্নবর্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, একের-পর-এক জায়গা বদল করেছেন, কিন্তু এখন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এখন শুধু অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়া, যে ক'টা দিন পারা যায়।



শান্তিজল

তার সুটকেসটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে অনুপ বলল, 'দে।'

'না-না ঠিক আছে।' কুড়ি বছরের ছোটভাই দাদার সুটকেস বইতে চাইবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু পিতৃবিয়োগের বিজ্ঞাপন শরীরে ধারণ করে থাকলে তাকে কাজটা করতে দেওয়া যায় না।

'মা কেমন আছে?' অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল।

'এই সময় যেরকম থাকা উচিত।' অনুপ নিচুগলায় বলল।

রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার সময় অমিতাভ লক্ষ করল সবাই অনুপের দিকে তাকাচ্ছে। একজন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

অনুপ চলতে-চলতে জবাব দিল, 'বাবা।'

যেহেতু অমিতাভর পরনে শার্ট-প্যান্ট, পায়ে জুতো তাই তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। শোকগ্রস্ত মানুষকে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে কৌতূহলের কারণেই সবাই অনুপকে দেখছে বলে মনে হল অমিতাভর। সে এই শহর ছেড়েছে বহু বছর। বছরে এক-আধবার আসে বাবা-মায়ের কাছে। বন্ধুবান্ধবরা এখন আর এখানে নেই। তাই যে ক'দিন থাকে বাড়িতেই থাকে। নতুন মানুষের পক্ষে তাকে চেনার কথা নয়। কিন্তু এখন মনে হল যিনি মারা গিয়েছেন তিনি কেবলই অনুপের বাবা ছিলেন।

রিকশায় বসল ওরা। অনেক বছর পরে, শেষ কবে মনে নেই, এইভাবে পাশাপাশি রিকশায় বসা। রিকশা চলতে শুরু করলে অমিতাভ চারপাশে তাকাল। অনেক নতুন বাড়ি উঠছে, দু-পাশে আধুনিক দোকান হয়েছে।

অনুপ বলল, 'আমরা রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।'

'হুঁ। কিন্তু খবর যখন পেয়েছিলাম তখন কোনও ফ্লাইট নেই। সন্ধের ট্রেন ধরলেও পরের দিন এই সময় পৌঁছতাম।' অমিতাভ বলল।

'সেটা ভেবেই বডি রাখা হল না।' অনুপ বলল।

'বডি?' অবাক হল অমিতাভ।

'বাবার শরীর। শেষ সময়ে তোর খোঁজ করেছিল খুব।'

অমিতাভ মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাবার মৃত্যুসংবাদ টেলিফোনে পেয়ে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসেছিল। আজ বিকেল তিনটে। ছ'শো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মৃত বাবার কাছে পৌঁছতে গেলে বারো ঘণ্টা সময় লাগবে। এই মফস্‌সল শহরে ততটা সময় মৃতশরীর ঠিকঠাক রাখা সম্ভব নয়। তাই দিন-চারেক পর সে এল। দাহের পরের দিন এলে যা হত আজ আসায় তা থেকে অনেক ভালো হয়েছে। কাজকর্ম গুছিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তার একটুও কান্না পায়নি। একফোঁটা জল চোখ থেকে বেরিয়ে আসেনি। শুধু চারপাশ ফাঁকা লাগছিল, খুব ফাঁকা। অথচ এই মানুষটার সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। উনি তাকে যতটা অপছন্দ করতেন ঠিক ততটাই পছন্দ করতেন। নিজের বন্ধুদের কাছে ছেলের প্রশংসা করতেন আবার সামনাসামনি হলে ওঁর গাম্ভীর্য ছিল দেখার মতো। ইংরেজি অনার্স ছেড়ে আর্ট কলেজে ভরতি হওয়ার খবর পেয়ে এমন খেপে গিয়েছিলেন

যে একমাস টাকা পাঠাননি। শেষে মায়ের চেষ্টায় একটু নরম হন। সেসময় ছুটিতে বাড়ি এলে কথা বলতেন না। তারপর যখন নামী কাগজে চাকরি পেল সে, শেষপর্যন্ত আর্ট ডিরেক্টর হয়ে গেল, তখন টেলিফোনে বলেছিলেন, 'জীবন নিয়ে যারা জুয়ো খেলে তাদের অধিকাংশই ফতুর হয়ে যায়। তুমি জিতেছ যখন জয়টাকে ধরে রেখো।' এই বাবা মারা যাওয়ার আগে তার খোঁজ করছিলেন কেন? কিছু কি বলার ছিল তাঁর? ভদ্রলোক সারাজীবন তার সঙ্গে এত দূরত্ব রেখে গেলেন কেন? আগেকার বাবারা কেন এমন হতেন?

গেটের সামনে রিকশা থামতেই বারান্দায় অতনুকে দেখতে পেল অমিতাভ। টুকুনের স্বামী। তাকে দেখে ঘোষণা করল, 'দাদা এসে গিয়েছে।'

ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস নিয়ে বাগানে পা রাখল অমিতাভ। অনুপ গেট বন্ধ করছে। এই সময় টুকুন ছুটে এল। পরনে সাদা শাড়ি। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। সুটকেস বারান্দায় রেখে বোনের কাঁধে হাত রাখতেই টুকুন তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। খুব ছেলেবেলায় সে যখন কলেজের ছুটিতে বাড়ি আসত তখন তাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরত টুকুন। সে কত বছর আগে। শোক মানুষদের আচমকা কাছে এনে দেয়।

অমিতাভ বলল, 'কাঁদিস না।'

'আমি বাবার শেষ সময়ে থাকতে পারিনি। টুকুন কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'খবর পেয়ে এসে দেখলাম বাবা ঘুমিয়ে আছে।'

অতনু বলল, 'সকালেও ফোনে কথা হয়েছিল। তখন বুঝতে পারিনি। আপনি বসুন, অতদূর থেকে এসেছেন।'

'মা কোথায়?'

ততক্ষণে কান্না সামলে নিয়েছে টুকুন। বলল, 'ঠাকুরঘরে।'

এক মুহূর্ত ভাবল অমিতাভ। এ বাড়িতে কেউ বাইরের পোশাক পরে ঠাকুরঘরে ঢোকে না। শৈশব থেকে এই ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত। তার ওপরে সে সারারাত এই পোশাকে ট্রেনে চেপে এসেছে।

এই বাড়িতে এলে বরাবরই একটি বিশেষ ঘরে অমিতাভ থাকে। ঘরটাকে এখন দাদার ঘর বলে সবাই। সেখানেই গেল সে। শার্ট-প্যান্ট খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরল। তারপর ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়াল। দরজা ভেজানো। সেটা খুলতেই মাকে দেখতে পেল সে। ঘরের মাঝখানে ঠাকুরের আসনের দিকে মাথা করে কম্বলের ওপর শুয়ে আছে মা। চোখ বন্ধ।

শোওয়ার ভঙ্গিতে এমন একটা অসহায়তা ফুটে উঠেছিল যা দেখে অমিতাভ কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মাকে সে কখনই এইরকম ভঙ্গিতে পড়ে থাকতে দ্যাখেনি। সে মায়ের পাশে এসে বসল। গায়ে হাত রাখল। মায়ের চোখ বন্ধ। সেই অবস্থায় ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এলি?'

'হুঁ' শব্দ করা ছাড়া কোনও জবাব খুঁজে পেল না অমিতাভ।

মা নিশ্চয়ই টুকুনের গলা শুনতে পেয়েছেন। অথবা টুকুনের স্বামীর চিৎকার ওঁর কানে গিয়েছে। তাই জেনেছেন যে সে বাড়িতে এসেছে। এতদিন পরে শুধু স্পর্শে মানুষ চেনা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

হঠাৎ মায়ের শরীর কাঁপতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা থরথরানি। আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরেছেন যাতে শব্দ না বের হয়। অমিতাভ বৃদ্ধার শরীর দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। এবং তখনই মনে পড়ল, মা তার থেকে যোলো বছরের বড়। মায়ের বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সে,

এক বছর পরে প্রথম ছেলের মা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রসবের পরে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তিনমাস সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেননি।

ধীরে-ধীরে কাঁপুনি কমল। শান্ত হতে আরও কয়েক মিনিট। এতটা সময় ধরে মাকে জড়িয়ে সে কি কোনওদিন বসেছিল? অমিতাভর মনে পড়ে না।

মা উঠে বসলেন। আঁচলে চোখ মুছলেন। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতমুখ ধো, চা খা।'

এই সময় মেজভাই অনলের গলা পাওয়া গেল, 'দাদা কোথায়?'

অতনুর গলা শোনা গেল, 'মায়ের ঘরে।'

মা বললেন, 'অনল ঠাকুরমশাইয়ের কাছে গিয়েছিল।'

তখনই অনলকে দরজায় দেখা গেল, 'যাক, তুই এসে গিয়েছিস।'

অমিতাভ দেখল অনলও অনুপের মতো কাছা ধারণ করেছে। মায়ের শরীর থেকে হাত সরাল অমিতাভ।

অনল বলল, 'তুই পাঞ্জাবি ছেড়ে ফেল। আমি এইসব তোর ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কেন?' অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল।

'কেন মানে? বাবা মারা গিয়েছেন, এখন অশৌচ, এসব পরতে হয়। তুই জেনেশুনে প্রশ্ন করছিস?' অনল বিস্মিত।

'ওগুলো না পরলে কি শোক দেখানো যাবে না?'

'লোকে কি শোক দেখানোর জন্যে পরে?'

'কেন পরে আমি জানি না। তবে তোর বা অনুপের চেয়ে আমার মনে বাবার মৃত্যু কম কষ্ট এনে দেয়নি।' অমিতাভ বলল।

মা হাত তুললেন, 'থাক। ও তো মুখাগ্নির সময় এখানে ছিল না। ওর যদি ওসব পরতে ইচ্ছে না করে পরার দরকার নেই।'

অনল কাঁধ নাচাল। এই শহরের বিখ্যাত উকিল সে। মায়ের কথার ওপর আর কথা বাড়াতে চাইল না। বলল, 'ঠাকুরমশাই লিস্ট দিয়ে দিয়েছেন। শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপা হয়ে গিয়েছে। তুমি একটু সময় দিলে ভালো হয় মা।'

মা মাথা নাড়তেই অনল চলে গেল।

অমিতাভ বলল, 'ও আমাকে ভুল বুঝল মা। শুধু পরতে হয় বলে ওসব পরব কেন? আগে তো এক মাসের পর শ্রাদ্ধ হত, এখন হয়? বিয়ের দিন বর-কনেকে নির্জলা উপোস করতে হত, এখন কেউ করে?'

মা চুপ করে থাকলেন।

অমিতাভ বলল, 'আমি মেনে নিতে পারি না। তবে তুমি যদি বলো তাহলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি মেনে নেব। তোমার জন্যে মানতে হবে।'

মা মাথা নাড়লেন। ছেলের হাতে হাত রেখে বললেন, 'তোর যেটা ভালো লাগে তাই তুই কর। যা, হাত-পা ধুয়ে নে।'

দুই ভাই হবিষ্যি করেছে। গোত্রান্তরিত হওয়ার সুবাদে টুকুন তিনদিনে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিয়েছে। একই বাবা-মায়ের পুরুষ-সন্তান আর নারী-সন্তানের মধ্যে শোকের বা শ্রদ্ধার এই

হেরফের হবে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত। তুলে লাভ হবে না বলে মুখ খুলল না অমিতাভ। অমিতাভ সাদামাটা নিরামিষ খেল অতনুর সঙ্গে।

দুপুরে মায়ের ঘরে বসে অনল লিস্ট তৈরি করেছিল। শ্রাদ্ধের কার্ড যাদের পাঠাতে হবে তাদের নামের লিস্ট। মায়ের জানা নাম লিখে নিয়ে সে অমিতাভর দিকে তাকাল, 'দাদা, তুই কাকে কাকে বলবি, বল।'

'আমার কাউকে বলার নেই।' অমিতাভ বলল।

'তো, শ্বশুরবাড়িতে তো পাঠাতে হবে।'

'ওঁরা জানেন। পাঠাবার দরকার নেই।'

'বন্ধুবান্ধব?'

'আশ্চর্য। বন্ধুরা কলকাতায় থাকে, খামোকা, পাঠাতে যাব কেন?'

অনল বলল, 'আসলে এটা একটা নোটিফিকেশন। সবাই জানতে পারবে বাবা আর ইহজগতে নেই। সেই জন্যেই—।'

'এটা আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে নাকি?'

'না। তবে এটা একটা রীতি, প্রথা।'

'আমার দরকার নেই। বিয়ের আগে নেমতন্ন করার সময় বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ক'টা কার্ড আমার দরকার। একই ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না?' হাসল অমিতাভ।

এই সময় টুকুন দৌড়ে এল বারান্দা থেকে, 'কমলকাকু আসছে।'

অনল বলল, 'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন?' অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল।

'ছিদ্রসন্ধানী মানুষ। তোকে এই অবস্থায় দেখলে শহরময় কেচ্ছা করে বেড়াবে। দাদা, প্লিজ, তুই ঘরে চলে যা।' অনল বলল।

অনুপ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। বলল, 'দাদা মিছিমিছি সমস্যা তৈরি করে কী লাভ? আমরা মেনে নিয়েছি বলে তো বাইরের লোক মানবে না।'

অতনু বলল, 'কথাটা ঠিক।'

বাইরে থেকে ভদ্রলোকের গলা ভেসে এল, 'কই হে তোমরা? অনল।'

অমিতাভ মায়ের দিকে তাকাল। মায়ের মুখে অস্বস্তি। তর্ক করা যেত। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারত কিন্তু তা না করে অমিতাভ উঠল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

ভেজানো দরজা সত্ত্বেও কমলকাকুর গলা শোনা যাচ্ছিল, 'ও, তোমরা সব এক জায়গায়? কার্ড লেখা হচ্ছে বুঝি। ভালো। আমি কয়েকটা নাম দিয়ে দেব। কিন্তু বউদি, বড়ছেলে কোথায়? বাবা মারা গেল আর সে এখনও কলকাতায় বসে আছে? এ তো ভালো কথা নয়।'

'কলকাতায় থাকবে কেন? ও এসেছে।' মায়ের গলা।

'এসেছে। বাঃ। কোথায় সে? একবার ডাক।'

অনল বলল, 'দাদা বেরিয়েছে।'

'অ। হ্যাঁ, নামগুলো লেখ। এদের দাদা খুব পছন্দ করতেন। আর হ্যাঁ, শ্মশানযাত্রীদের তো বলবেই, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও নেমন্তন্ন করে এসো। লেখো—'।

অমিতাভ খাটে শুয়ে পড়ল। কলকাতায় তার পরিচিত মানুষগুলো যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়, তাদের কাউকেই রোজ পুজো করতে অথবা ধর্মাচরণ করতে দেখা যায় না। তাদের অনেকেই দুর্গাপুজোর সময় বাইরে বেড়াতে যায়। কলকাতায় থাকলে মণ্ডপে না গিয়ে বাড়িতে ফুর্তি করে। ধর্মের সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। বেশিরভাগ মানুষের বাড়িতে ঠাকুরদেবতার ছবি নেই। অথচ বাবা-মা মারা গেলেই গালে দাড়ি রেখে পায়ে হাওয়াই পরে কাছা নেয়। শ্রাদ্ধ চুকতে-

না-চুকতে ভাইভাই-এর বিরুদ্ধে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে মামলা ঠুকতে উকিলের কাছে দৌড়য়। অথচ এরা হিন্দু। বারোশো বছর আগে যখন বাঙালি বলে কোনও জাত ছিল না তখন আমাদের পূর্বপুরুষের কি ধর্ম ছিল? আর্যরা তো বঙ্গভূমিতে আসেনি। অদ্ভুত ব্যাপার!

বাড়িতে এখন উৎসবের আবহাওয়া। আত্মীয়স্বজনরা এসে গেছে। এসে প্রথম কয়েক মিনিট শোক-শোক মুখ করে থেকেছে। তারপর এ-ওর খবর নেওয়া, মাকে জ্ঞান দেওয়া—মাসিমা, আপনি কিন্তু মাছ-মাংস ছাড়বেন না। ওসব ছাড়ার কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। মাসিমা, মেসোমশাই কী-কী খেতে ভালোবাসতেন বলুন, শ্রাদ্ধের মেনুতে রাখতে হবে। ও টুকুন, তুই কী সুন্দর হয়েছিস রে। বাচ্চা না হওয়ায় ফিগার রাখতে পারছিস। আমি তো—।

ছোটপিসি এসে বললেন, 'একি তুই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছিস? বাপের শ্রাদ্ধ করবি না।'

অমিতাভ বলল, 'শ্রদ্ধা করব।'

'ইয়ার্কি নাকি। ও বউদি তোমার বড়ছেলের হাতের জল না পেলে দাদা শান্তি পাবে? ও কি সিনেমাস্টার, যে ম্লেচ্ছ হয়ে আছে?

মা বললেন, 'বোধহয় ওর শরীর খারাপ। প্রেশার তো আছেই।'

ঘর থেকে বের হতে না চাইলেও সবাই তার ঘরে আসতে লাগল। ছোটমামা এসে বলল, 'আরে ছাড়, আজকাল পুরুতকে মূল্য ধরে দিলে সবকিছু করা যায়। তবে দাড়িটা কাটিস না। ও হ্যাঁ, আমার বড় শালার ছেলে জার্নালিজম পড়ছে। তোদের কাগজে একটু দেখিস।'

বাড়িটা ক্রমশ উৎসবের বাড়ি হয়ে গেল। সবসময় হইহই। এক রাত্রে মাকে একটু একা পেয়ে গেল অমিতাভ। বাবার ছবি বড় করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছে অনুপ। অল্প বয়সের ছবি। মা একা দেখছিল। অমিতাভ সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা কেন যে আমার সঙ্গে দূরত্ব রাখত।'

মা বললেন, 'শুধু তোর সঙ্গে কেন, আমার সঙ্গেও।'

'তাই?'

'কখনও মনের কথা খুলে বলত না।'

'তুমি বলতে?'

'প্রথম-প্রথম বলতাম। তারপর চুপ করে থাকতাম।'

'কিন্তু তুমি তো বাবাকে ভালোবাসতে।'

মাকে এই প্রথম হাসতে দেখল অমিতাভ, 'দূর! ভালোবাসা কী তা বোঝার আগেই তুই এসে গিয়েছিলি। তারপর সংসারের ঘানি টেনে চলেছি।'

'বাবা?'

মা এবার গম্ভীর হলেন, 'কী জানি! এসব কথা থাক। দেখ, সবাই যা বলছে তাই দু-কান দিয়ে শুনে চলেছি। শ্রাদ্ধ যে কত রকমের হয় আগে জানতাম না। কিন্তু এত চেঁচামেচি, হুল্লোড় আমার ভালো লাগছে না। টুকুনটাকে দেখ, সারাদুপুর ওদের সঙ্গে ক্যারাম খেলে কাটাল। হয়তো এটাই ঠিক; আমি ভুল বুঝছি। জানিস খোকা, সারাজীবন আমি বোধহয় কোনও কিছুই ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না।'

ঠাকুরমশাই এসে গিয়েছেন। অনলের গাড়ি গেটের বাইরে। অনল এবং অনুপকে নিয়ে ঠাকুরমশাই যাবেন শহরের পশ্চিমপ্রান্তে যেখানে বিশাল জলাশয় রয়েছে। আজ ওদের মাথার চুল বিসর্জন দিতে হবে। বারান্দায় সবাই ভিড় জমিয়েছে। বাগানেও কিছু লোক। ছোটমামা পুরো ব্যাপার

পরিচালনা করছেন। ওদের গাড়িতে তুলে হাঁক দিলেন তিনি, 'বড়খোকা কোথায়? অমিতাভ। ডাক ওকে।'

ভিড় সরিয়ে অমিতাভ সিঁড়িতে পা রাখল, 'কি ব্যাপার?'

'আগে ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা কর, তোর চুল না কাটলে কত মূল্য দিতে হবে? ও ঠাকুরমশাই, বড়খোকা ন্যাড়া না হলে কত নেবেন?' নিজেই প্রশ্নটা করলেন ছোটমামা।

প্রৌঢ় ঠাকুরমশাই বললেন, 'এসব তো এখন চালু হয়েছে শুনতে পাই। তা আমি কী বলব, যা মনে ধরে তাই দেবেন।'

ঠিক তখনই কান্নাকাটি সোচ্চার হল। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে মা মুখে হাত চেপে কান্না সামলাচ্ছেন। অমিতাভ ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। ছেলেরা ন্যাড়া হতে যাচ্ছে বলেই বোধহয় মায়ের শোক ফিরে এল। সে চাপা গলায় বলল, 'কেঁদো না মা।'

'খোকা!' মা জলভরা চোখে তাকাল।

'হ্যাঁ, বলো।' দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ছিল অমিতাভ।

'তোর কি খুব অসুবিধে হবে? ওদের সঙ্গে তুই যেতে পারবি না?'

চমকে গেল অমিতাভ। এই ক'দিন যে ভদ্রমহিলা তার ইচ্ছেগুলোকে আগলে রেখেছেন, কারও সমালোচনায় কান দেননি, তিনি এ কী প্রস্তাব করছেন? কিন্তু সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছিল অমিতাভ। তারপর বলল, 'বেশ। যাচ্ছি। শুধু তোমার জন্যে যাচ্ছি।'

গাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে অমিতাভ দেখল ছোটমামা হাততালি দিচ্ছে। দর্শকদের উল্লাস চাপা নেই।

অনলের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। অনুপ তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

ছেলেরা ফিরে আসতেই আবার মায়ের কান্না। কিন্তু এবার একটি কথাও না বলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল অমিতাভ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রায়-অচেনা একটা মানুষকে দেখতে পেল। সামান্য চুল এবং দাড়ি বিসর্জন দিতেই মানুষের এত পরিবর্তন হয়?

এই সময় টুকুন চা নিয়ে এল 'জানিস দাদা, তোদের তিনজনকে এখন একরকম দেখাচ্ছে।'

'একরকম?'

'হ্যাঁ রে। সবাই বলছে।' টুকুন চায়ের কাপ রেখে চলে গেল।

আজ শ্রাদ্ধ। ভোর থেকেই ঠাকুরমশাই তাঁর মণ্ডপ সাজিয়ে বসেছেন। যারা বাড়িতে ছিল তারা তো বটেই, বাইরের অতিথিরা জমতে শুরু করেছেন। 'অ্যাই, ওকে চা দে।' 'না, না, একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে।' 'আরে একা কেন, গিন্নিকে নিয়ে এলেন না কেন?' 'ও অতুলদা আপনার বড় মেয়ে? বাঃ কী সুন্দর দেখতে হয়েছে? কী পড়ো গো তুমি?' এইরকম সংলাপ এ বাড়ির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাবার ছবি ঘিরে ফুলের মালা। সামনে ফুলের স্তূপ। বাবা সব দেখছেন।

মা বসে আছেন খানিকটা তফাতে। মোড়ায়। ঠাকুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোত্রটা কী যেন? কাশ্যপ? তাই তো?'

মা মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন। মায়ের পরনে শুধু সাদা আর সাদা।

অমিতাভও আসনে বসে হেসে ফেলল।

ঠাকুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসি কেন?'

'মায়ের গোত্র বিয়ের পর বদলে গেল।'

'স্বামীর গোত্রই তো স্ত্রী-র গোত্র হবে।'

'আজকাল তো অনেক মেয়েই দু-তিনবার বিয়ে করে। তাহলে তাকে বারংবার গোত্র বদলাতে

হবে। তাই তো?'

ঠাকুরমশাই চুপ করে গেলেন। মা চোখের ইশারায় জানালেন থামতে। প্রথমে যে মুখাগ্নি করেছিল সে বসবে। অতএব অমিতাভর পালা পরে। সে একটু দূরে চলে আসতে চাইলে কমলকাকা পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'বড় ভালো মানুষ ছিলেন।'

'কে?' মুখ ফেরাল অমিতাভ।

'তোমার বাবার কথা বলছি। তাস খেলতে বসে সবাই একটু-আধটু চুরি করে কিন্তু দাদা কখনই করেনি।'

'আপনারা কী তাস খেলতেন?'

'বেশিরভাগ সময় রামি। রামির নেশা ছিল ওঁর।'

বাবা যে রামি খেলতেন এবং চুরি করতেন না জেনে তার কোনও লাভ নেই। তবে এখন মনে হচ্ছে বাড়ির বাইরের মানুষটা বেশ স্বাভাবিক ছিলেন।

'কোনও উইল করে গিয়েছেন?'

'কীসের উইল?'

'এই বাড়ি, সম্পত্তির?'

'আমি জানি না।'

'খোঁজ নাও। এই নিয়েই তো ভাই-এ ভাই-এ বিরোধ হয়।'

'এ ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আপনিই বা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ইচ্ছে করে বের করতেই কমলকাকা দ্রুত সরে গেলেন।

ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়ছেন। সুরে এবং দ্রুত উচ্চারণ করা শব্দাবলি কেউ বুঝতে পারছে বলে মনে হল না। আসনে বসে ঠাকুরমশাই যা-যা করতে বলছেন তাই সে করে যাচ্ছিল। অমিতাভর মনে হচ্ছিল, এই অর্থহীন ব্যাপারগুলো শেষ হলে সে বেঁচে যাবে। হঠাৎ কানে এল ঠাকুরমশাই একটা কলাপাতায় চাল, কলা ইত্যাদি মেখে বলছেন, 'এই পিণ্ড ওই ফাঁকা জায়গায় রেখে এসো।'

'কেন?'

'একটা কাক এসে খাবে। একটা খেলেই হল।'

আদেশ পালন করল অমিতাভ। ঠাকুরমশাই বললেন, 'এবার বলো।'

সংস্কৃত শব্দগুলো বুঝতে দু-বার বলাল সে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'সরি। আমার পক্ষে এই কথাগুলো বলা সম্ভব নয়।'

'কেন?' ঠাকুরমশাই অবাক, 'সংস্কৃতে কী বলেছি বুঝেছ?'

'হ্যাঁ। আমি উঠলাম।' অমিতাভ উঠে দাঁড়াল।

মা হতভম্ব।

ছোটমামা ছুটে এল, 'কী হয়েছে? উঠছিস কেন? কমপ্লিট হয়নি এখনও।'

'উনি আমাকে বলতে বলছেন, আমার বাবা এখানে প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর আত্মার শান্তির জন্যে আমি ওই পিণ্ড দান করেছি। তিনি যেন কাক হয়ে এসে তা খেয়ে নেন। আমার বাবাকে আমি প্রেত বলে ভাবতেই পারি না। ওই পিণ্ড না খেলে যদি তাঁর মুক্তি না হয় তাহলে তিনি এই বাড়িতে থেকে কারও অমঙ্গল করবেন। প্রেত তো অমঙ্গল করে। সরি।'

সে আসন ছেড়ে ভেতরে পা বাড়াতে অনল এগিয়ে গেল, 'ঠিক আছে। বলুন কী করতে হবে। আমি বসছি।'

শ্রাদ্ধবাড়িতে হইচই পড়ে গেল। পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহরা এতদিন যা করে এসেছেন, তাকে ভুল বলার জন্যে একদল সমালোচনা শুরু করে দিল। আর একদল, যাদের সংখ্যা কম, তারা বলল, 'ওই প্রেত-ফ্রেত বলতে গেলেন কেন ঠাকুরমশাই। না বললেই তো হত।'

এখন ভরদুপুর। অমিতাভ চুপচাপ শুয়েছিল নিজের ঘরে, দরজা ভেজিয়ে। নিজেকে দলছুট বলে মনে হচ্ছিল অমিতাভর। শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পর ওদিকে খাওয়া-দাওয়ার উৎসব চলছে। ওই সময় মা এলেন ঘরে। এসে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। উঠে বসল অমিতাভ।

মায়ের মুখ শক্ত। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে।

অমিতাভ উঠে দাঁড়াল, হাত বাড়াল, 'মা।'

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলেন মা।

'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা।'

'আজ তুই প্রতিবাদ করলি? এতদিন যখন করিসনি তখন আজ কেন করলি? আজ তোর ওকে প্রেত বলে স্বীকার করতে বাধল? 'হু-হু করে কেঁদে ফেললেন মা।

'মা!'

'মানুষ কি শুধু মরে যাওয়ার পরে প্রেত হয়? বেঁচে থাকতে হয় না, আমার মতো অনেক মেয়েই তো সারাজীবন প্রেতযন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে থাকে। তখন অন্ধ হয়ে থাকিস।'

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল অমিতাভ।

ধীরে-ধীরে নিজেকে সামলালেন মা, 'আমি মরে গেলে এসব তুই করবি না।'

'মা!'

'আমি মরে গিয়ে তোর চারপাশে প্রেত হয়ে ঘুরতে পারব না রে।' দু-হাতে ছেলেকে আঁকড়ে ধরলেন মা।

আর এই প্রথম সমস্ত শরীর নিংড়ে কান্না বেরিয়ে এল, প্রচণ্ড জোরে কেঁদে উঠল



স্বপ্নের রথে রপ্তানি

ব্যাপারটা কীরকম? যে সন্ধেয় একটু পানভোজন হয় সেই রাত্রেই সুশোভন স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কোথায় যেন পড়েছিলেন, যে মানুষ স্বপ্ন দেখে না তার বেঁচে থাকাই অর্থহীন। প্রথম যৌবনে এক-আধবার একে ওকে স্বপ্নে দেখেছেন। পরিচিতা বা অপরিচিতা সেইসব সুন্দরীরা খুব দ্রুত স্বপ্ন থেকে সরে গিয়েছিল। তারপর আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। বোধহয় বিয়ের পর থেকেই স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাশে কেউ শুয়ে থাকলে, বিশেষ করে তার হাত বা ঠ্যাং গায়ের ওপর পড়লে স্বপ্নেরা আসতে চায় না। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে সুশোভন তার স্ত্রী শ্রীজাতাকে বলেছিলেন। শ্রীজাতা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'ভালোই হয়েছে। পেট গরম হলে লোকে স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্ন দেখলে নিশ্চয়ই ঘুম ভালো হয় না। ফলে সকালে শরীর ম্যাজম্যাজ করবে। তুমি বেঁচে গেছ।'

হয়তো। তবে তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাননি সুশোভন। তারপর ছেলেমেয়ে বড় হল। সুশোভনের শোওয়ার ঘর আলাদা হল, কারণ শ্রীজাতা মেয়ের সঙ্গে শোবেন। ছেলেও দশ বছরের পর অন্য ঘরে চলে গেল। এখন তার পাশে কেউ শোয় না কিন্তু সেই চলে যাওয়া স্বপ্নরা আর ফিরে এল না। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সুশোভন প্রথম মদ্যপান করেন, সেটা একটা পিকনিকে। বন্ধুবান্ধবরা সস্ত্রীক গিয়েছিলেন সেই পিকনিকে। শ্রীজাতাও সঙ্গে ছিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া

হয়নি বলে শ্রীজাতাকে সেদিন বেশ ফুর্তিতে আছেন বলে মনে হচ্ছিল। এক বন্ধু ডাবের জলে ভদকা মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন গ্লাস, 'নিন, দু-পাত্র খেলে খিদে বাড়বে।'

সুশোভন মদ খান না বলে মৃদু আপত্তি জানাতে সবাই হইহই করে উঠেছিল। এমনকী শ্রীজাতাও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'একদিন খেলে কী হয়।' সেই শুরু। ভদকার স্বাদ বেশ ভালো লেগেছিল। তারপর সেটা গিয়ে দাঁড়াল সাপ্তাহিক ব্যাপারে। প্রতি শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে এই ক্লাবে বা ওই ক্লাবে। বেশি নয়, তিনটে পেগ। তারপর স্বচ্ছন্দে বাড়ি ফিরে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়া। শ্রীজাতা অবশ্য নির্দেশ দিয়েছেন, 'শুক্রবারে বাড়ি ফিরে তুমি কারও সঙ্গে কথা বলবে না। সোজা খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

সুশোভন জানতে চেয়েছিলেন, 'কেন?'

'তখন তোমাকে অন্যরকম দেখায়।'

তৃতীয় শুক্রবারের রাত্রে সুশোভনের স্বপ্ন দেখা শুরু হল। গভীর জঙ্গলে একটি তপোবন। তিনি এক বালতি জল দিঘি থেকে তুলে নিয়ে আসছেন। এমন সময় গুরুদেব বজ্রকণ্ঠে ডাকলেন, 'সু, এদিকে এসো।'

গুরুদেবের শরীর শীর্ণ, দাড়ি পাকা, কৃচ্ছ্রসাধনা করে তিনি শরীরে এক গ্রাম মেদ জমাতে দেননি, জলের বালতি সরিয়ে রেখে সুশোভন নতজানু হয়ে বললেন, 'আদেশ করুন গুরুদেব।' গুরুদেব বললেন, 'এই যে জল তুমি আনছ এ কার সৃষ্টি?'

'ঈশ্বরের।'

'ঈশ্বরের ঠিকানা কি?'

'স্বর্গে।'

'স্বর্গ কোথায়?'

'এই এ ব্যাপারে আমি অন্ধ, গুরুদেব। আপনি আলোকপাত করুন।'

'স্বর্গ মানুষের মনে। অথচ মানুষ তাব খবর জানে না। তাই তারা ঈশ্বরের সন্ধান পায় না। তুমি তার সন্ধান শুরু করো বৎস।'

ব্যস। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল কিন্তু ঘুম ভাঙল না। পরদিন সকালে ঠিকঠাক মনে পড়ে গেল স্বপ্নটা। সুশোভন একটু বিহ্বল হলেন। এসব চিন্তা তাঁর মাথায় কখনও আসেনি, তাহলে এমন স্বপ্ন দেখলেন কেন?

বন্ধুদের মধ্যে একজনের এ বিষয়ে পড়াশুনো আছে। সব শুনে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ঈশ্বরচিন্তা করে থাকেন? করেন না। বেশ, দেবস্থানে যান? যেমন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, কালীঘাট অথবা বেলুড়ে? তাও না। আপনার পিতা পিতামহ কি ধার্মিক ছিলেন?'

এবার মাথা নাড়লেন সুশোভন। 'আমি তাঁদের দেখিনি। আমার জন্মের আগেই বাবা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। আমি মামার বাড়িতে মানুষ। তাঁরা কেউ তেমন ধার্মিক ছিলেন না।'

'বই পড়েন?'

'হ্যাঁ।'

'কী ধরনের বই?'

'বাছবিচার নেই। যা পাই তাই পড়ি।'

'কথামৃত?'

'পড়েছি। পড়ে ভালো লেগেছে কিন্তু ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইনি।'

'আপনি তপোবনের স্বপ্ন দেখেছেন। মহাভারত পড়েছেন?'

'হ্যাঁ কিন্তু—।'

'বলুন, সঙ্কোচ করবেন না।'

'মহাভারত পড়েছি রোমান্সের মজা পেতে। মুনি বা দেবতারা কীরকম চটপট অপ্সরা বা মানবীদের প্রেমে পড়তেন এবং শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু পড়ার সময় অশ্লীল বলে মনে হত না আমার, তাই পড়তাম।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম। আপনি স্বপ্নে যে তপোবন দেখেছেন সেখানে আপনি আর গুরুদেব ছিলেন। তাঁর নাম?'

'নাম জানার সুযোগ হয়নি।'

'কোনও মহিলা কি ছিলেন সেখানে? কোনও গুরুপত্নী বা গুরুদেবের শিষ্যা? বৃহস্পতির তপোবনে যেমন দেবযানী ছিলেন কচের সহপাঠী হিসেবে তেমন কেউ।'

'না। কাউকে দেখিনি।'

'কোনও অপ্সরা কি আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল?'

'না তো।'

'আমার বিশ্বাস এই স্বপ্ন অনেক-অনেক স্বপ্নের ভূমিকা। মহাভারত পড়ার রোমান্স আপনার মনে সুপ্ত ছিল এবং আছে। আপনি নিশ্চয়ই তপোবনে অপ্সরাদের দেখতে ইচ্ছুক। হয়তো দেখা পেয়েও যাবেন।' ভদ্রলোক বললেন।

কিন্তু পরের রাত্রে গভীর ঘুমেও স্বপ্ন দেখা হল না। সকালে সেটা আবিষ্কার করে মন খারাপ হয়ে গেল। আহা, মানুষ যদি ইচ্ছে করলেই স্বপ্ন দেখতে পেত। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থ। কিন্তু স্বপ্ন দেখলেন পরের শুক্রবারের রাত্রে। সেদিনও তিন পেগ খেয়ে এসেছিলেন।

স্বপ্নে সেই তপোবন। গুরুদেব শুয়ে আছেন তৃণশয্যায়। বললেন, 'হে সু, সংসারে তুমি কীরকমভাবে থাকবে?'

'মাছের মতো। জলে থেকেও সিক্ত হব না।'

'চমৎকার। বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানুষের একমাত্র কামা হয় তাহলে জন্মাবার পর কেন তাকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়?'

'বন্ধন কী তা না জানলে তার থেকে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় না।'

গুরুদেব উঠে বসলেন, 'বাঃ। এই তো চাই। এখন তোমার ওপর আশ্রমের দায়িত্ব অর্পণ করে কিছুদিনের জন্যে আমি অন্যলোকে যেতে পারি। তুমি যোগ্যতা অর্জন করেছ। তবে মনে রেখো, একমাত্র দুর্বাসা ছাড়া অন্য কাউকে তুমি আমার অবর্তমানে এখানে থাকতে দেবে না।' কথাগুলো বলে গুরুদেব ধীরে-ধীরে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলেন।

স্বপ্নটা যে সেখানেই থেমে গিয়েছিল তা পরের সকালে ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলেন সুশোভন। নিজেকে কীরকম পবিত্র-পবিত্র বলে মনে হচ্ছিল। হোক স্বপ্ন তবু তো একজন মুনি তাঁকে যোগ্য বলে মনে করেছেন।

চায়ের কাপ নিয়ে এলেন শ্রীজাতা। বললেন, 'আজ যদি গ্যাস না দিয়ে যায় তাহলে খুব প্রবলেম হবে। কেরোসিন বেশি নেই যে স্টোভ জ্বালাব।'

অন্যমনস্ক ছিলেন সুশোভন, বললেন, 'হুঁ।'

'তোমার কী হয়েছে?'

'কেন? কিছু হয়েছে ভাবছ কেন?'

'অন্যরকম লাগছে। কালোর মাকে পাঠাচ্ছি কেরোসিনের জন্যে। ব্ল্যাকে এনে দেবে।'

'ব্ল্যাকে? না-না। ছিঃ। তুমি ব্ল্যাকে কেরোসিন কিনবে কেন? এ তো অন্যায়। চরিত্রের পতন। গ্যাস না পেলে হোম সার্ভিসে ফোন করে খাবার আনিয়ে নাও।'

'ওমা। এই যে প্রতিবার এক সিলিন্ডার গ্যাসের জন্যে একস্ট্রা পনেরো টাকা দিচ্ছি সেটাও তাহলে অন্যায়? চরিত্রের পতন? এই যে প্রতি শুক্রবার তুমি মদ গিলে আসো সেটা কি চরিত্রের

উত্থান? কথা শুনলে শরীর জ্বলে যায়।'

'পরিমিত মদ্যপান ডাক্তাররাই করতে বলেন। তা ছাড়া মুনিঋষিরা নিয়মিত সোমরস পান করতেন কিন্তু ব্ল্যাকে কোনও জিনিস কিনতেন না।' সুশোভনের কথা শোনার পর শ্রীজাতা সেখানে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

অনেক ভাবলেন সুশোভন। সংসারে শান্তি নেই। অথচ স্বপ্নে ওই তপোবনে গেলেই মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। সমস্যা হল মদ্যপান না করলে তিনি স্বপ্ন দেখতে পান না। মদের সঙ্গে ওইরকম পবিত্র স্বপ্নের কী সম্পর্ক আছে তা তিনি বুঝতে পারেন না।

অতএব স্বপ্ন দেখার জন্যে তাঁকে সাপ্তাহিক মদ্যপানের রাতটির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। পরের শুক্রবার একটু বেশি পান করা হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে ফিরে খাব না বলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। জামা-প্যান্ট বদলে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে বালিশে মাথা রাখতেই ঘুম চলে এল। শ্রীজাতা বলেন, 'সুইচ অনের মতো ঘুম আসে। অথচ আমরা হাপিত্যেশ করে থাকি কখন ঘুম আসবে।'

তপোবন। কোকিল ডাকছে। মধুর মলয় বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ময়ূর পেখম মেলে ধরেছে যদিও আকাশে মেঘ নেই। এই সময় মেঘ ডাকার মতো গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল, 'কী আশ্চর্য! আমি এসেছি অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না?'

সুশোভন চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন ক্ষয়াটে চেহারার এক মুনি, মাথায় জটা, হাতে কমণ্ডলু, খড়ম পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে সঙ্গে-সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, 'গুরুদেব এখন তপোবনে নেই, আপনি আমাকে আদেশ করুন।'

'কে তুমি?'

'আমি সুশোভন, গুরুদেবের শিষ্য।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও, ভক্ত বড় না ভগবান বড়?'

ইনি কে বুঝতে পারছিলেন না সুশোভন। তবে কথা বলার ভঙ্গিতে সামান্য মিষ্টভাব নেই। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা লেখেননি। তিনি বললেন, 'ভক্ত না থাকলে ভগবানকে কে পুজো করবে।' তাই তো কবি গেয়েছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেমে হত যে মিছে।'

'দশে দশ।' মুনি মাথা নাড়লেন। 'যাকগে। তোমার শিক্ষায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তপোবনে ভালো ঘি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু অপরাধ নেবেন না, আপনার পরিচয় আমার জানা নেই।'

'কি? এতবড় স্পর্ধা। ত্রিভুবন যাঁর জন্যে উদগ্রীব থাকে তুমি তার কাছে পরিচয় জানতে চাইছ? আমি তোমাকে ভস্ম করতে পারি তা জানো?'

হাতজোড় করলেন সুশোভন, 'আমার গুরুদেবের আদেশ, একমাত্র মহারাজ দুর্বাসা ছাড়া আর কাউকে যেন তপোবনে না থাকতে দিই।'

'ও। একথা বলে গেছে ছোকরা? ভালো। হ্যাঁ, আমিই সে।'

শোনামাত্র দুর্বাসার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন সুশোভন। দুর্বাসা বললেন, 'এসব খুব বিরক্তিকর, তার বদলে আমি এখানে শুয়ে পড়ছি, তুমি আমার সারা শরীরে ঘি লেপন করো। কোনও সঙ্কোচ না করে কর্মটি শেষ করবে।'

স্বর্গে বিউটি পার্লার থাকতে পারে দেবী বা অপ্সরাদের জন্যে, সেলুন যে নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন সুশোভন। এত লোমশ শরীর এবং তার গোড়ায় এত ময়লা লেগে আছে যে ভক্তি মাথায় ওঠে। তবু ঠোঁট টিপে ঘি লেপন করলেন তিনি। করতে-করতে দেখলেন দুর্বাসা আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পায়ের গোড়ালির কাছে এসে তিনি থমকে গেলেন। পায়ের তলা ফাটা। ময়লা জমে আছে। সুশোভন পায়ের তলায় আর ঘি লাগালেন না। সেটা অনর্থক বলে মনে হল তাঁর।

ঘণ্টা তিনেক বাদে ঘুম থেকে উঠে ঘি-এর গন্ধ পাওয়ায় প্রসন্ন হলেন দুর্বাসা। কিন্তু কয়েক পা হাঁটতেই তিনি টের পেলেন তাঁর পায়ের তলায় ঘি নেই। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে কৈফিয়ত তলব করলেন।

সুশোভন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দিলেন, 'তোর এতবড় আস্পর্ধা, আমার আদেশ মান্য করিসনি বলে যা—ওই দিঘিতে মাছ হয়ে বাস কর।'

সঙ্গে-সঙ্গে মুনির পায়ে পড়ে গেলেন সুশোভন। অনেক কাকুতিমিনতি করার পর মুনির মনে একটু দয়া এল, 'ঠিক আছে, যদি কোনও সুন্দরী নারী তোর শরীর তার পায়ের তলা দিয়ে স্পর্শ করে তাহলে আবার মানুষ হয়ে যাবি।'

যেন টিভি সিরিয়ালের একটি পর্ব দেখছেন এমনভাবে স্বপ্নের শেষ হয়, ঘুম ভাঙে না। কিন্তু পরদিন সকালে সুশোভন ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। না তিনি জলে মাছ হয়ে সাঁতার কাটছেন না, নিজের বিছানায় বসে আছেন।

শ্রীজাতা ঘরে এলেন, 'তুমি আজকাল মাতাল হয়ে যাচ্ছ, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তারা তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে?'

স্বপ্নে শোনা গুরুদেবের কথা মনে এল। সুশোভন চমৎকার আবৃত্তি করলেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু/ লোকেষু কিঞ্চন।/নানা বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।/'

হতভম্ব শ্রীজাতা বললেন 'মানে?'

সুশোভন হাসলেন, 'হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত আছি।'

শ্রীজাতা চমকে উঠলেন, 'এ কি বলছ তুমি? এসব কথা তো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। তোমার কি হল গো?'

'মাছ, মাছ হয়ে গেছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তুমি ঠাকুরের কথায় আশ্রয় নিতে চাইছ। সংসারে থাকবে মাছের মতো, জলে থেকেও শরীর ভেজাবে না। শোনো, তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।'

সুশোভন বললেন, 'অসম্ভব। স্বধর্মে নিধনও ভালো, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।'

'এসব সুযোগসন্ধানী কথাবার্তা, ঠাকুর বলেছেন পবিত্র মন নিয়ে, ধার্মিক ভক্তদের সদুপদেশ দিয়েছেন। তোমার মতো চালাক লোক সেই উপদেশকে অন্য অর্থে ব্যবহার করছ।'

স্ত্রী-র দিকে তাকালেন সুশোভন, 'বিশ্বাস করো, স্বপ্ন দেখলেই আমার মনে পবিত্রভাব আসে। নিজেকে খুব ধার্মিক বলে মনে হয়।'

'বাপের জন্মে এমন কথা শুনিনি।' শ্রীজাতা বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

এখন প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে সুশোভনের। তাঁর আত্মা মাছ হয়ে দিঘিতে সাঁতার কাটছে। কোনও জেলে এসে ধরে নিয়ে যেতেই পারে। যদিও তাঁর স্মরণে আসছিল না তপোবনের আশপাশে কোনও জেলেকে দেখেছেন কিনা। এদিকে মুশকিলের ব্যাপার হল, পান না করলে স্বপ্ন দেখতে পারছেন না। তাঁর বন্ধুরা সারা সপ্তাহের কাজের শেষে শুক্রবার রাত্রে পানাহার করেন। স্বপ্ন দেখতে হলে সাত-সাতটা দিন অপেক্ষা করতে হয়। তর সইল না সুশোভনের। পরের দিন অফিস ছুটির পর বন্ধুদের বললেন ক্লাবে যাওয়ার জন্যে। তাঁরা অবাক। যে সুশোভন এতদিন মদ ছোঁয়নি তার হঠাৎ এমন পরিবর্তন কি করে হল? অন্যেরা কাজের অছিলায় সরে গেলেও একজন সঙ্গী হলেন। একা-একা মদ খাওয়াতে অস্বস্তি আছে। ক্লাবে সবাই ছোট-ছোট দলে ভাগ করে মদ খায়। কেউ একা খাওয়া মানে কৌতূহল তৈরি হবে।

রাত্রে বেশ টলমল অবস্থায় বাড়ি ফিরেই শুয়ে পড়লেন সুশোভন। তাঁর পক্ষে ধৈর্য রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। শ্রীজাতার গম্ভীর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।

আহা। কী মোলায়েম এই দিঘির জল। তিনি সাঁতার কাটছেন মাছ হয়ে। বেশ বড় মাছ। হয়তো রুই নয়তো কাতলা। আশপাশে অনেক মাছ রয়েছে। তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেই তারা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁকে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। তিনি যেন মাছ হয়েও মাছ নন।

এইভাবে স্বপ্নেই ক'টা দিন কেটে যেতে সুশোভন চমকে উঠলেন। জলে কার যেন ছায়া পড়েছে। অপরূপা সুন্দরী এক রমণীর ছায়া। সেই রমণী এসেছেন দিঘিতে স্নান করতে। ক্রমশ জলে নেমে ঢেউ তুলতে লাগলেন তিনি। তারপর সাঁতার কেটে চললেন খানিকটা। সময় নষ্ট করলেন না সুশোভন। দ্রুত পেছন থেকে ছুটে গিয়ে সুন্দরীর পায়ের তলায় চলে এলেন। সাঁতারের সময় পা ছুড়তেই সুন্দরীর পায়ের তলা স্পর্শ করল তাঁর শরীর। সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে গেল, তিনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন কোমর-জলে দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক গজ দূরে একজন পুরুষকে দেখে চিৎকার করতে গিয়েও সেটা গিলে ফেললেন সুন্দরী।

সুশোভন দ্রুত নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্যে দুর্বাসার অভিশাপ বর্ণনা করলে সুন্দরী শান্ত হলেন। তিনি বললেন, 'আমার স্বামী সন্দিগ্ধমনা। আপনার সঙ্গে আমাকে এভাবে দেখলে ভাববেন আমরা জলবিহার করছি। আপনি দ্রুত ওপরে উঠে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়ান।'

সুশোভন করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পরিচয়?'

'আমার নাম শাখা। চুম্বাসা শহরের রাজা আমার পিতা। এই তপোবনের মুনিকে আমি বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আমার পিতার উপকার করায় পিতা তাঁর হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন। আপনি যখন তাঁর শিষ্য তখন আমাদের তো দেখা হবেই।' শাখা বললেন।

দ্রুত দিঘি থেকে উঠে জঙ্গলের মধ্যে রোদে দাঁড়িয়ে পোশাক লুকিয়ে নিলেন সুশোভন। তারপর তপোবনের ভেতর প্রবেশ করে গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ক্রুদ্ধ মুনি তাঁকে অনেক কুকথা বলার পর দুর্বাসার অভিশাপের কথা জানতে পেরে শান্ত হলেন। কী করে শাপমুক্ত হলেন, জিজ্ঞাসা করতে সুশোভন বললেন যে, স্নানের সময় গুরুপত্নী অজান্তে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করায় তিনি মানুষের চেহারা ফিরে পেয়েছেন।

মুনি বললেন, 'বেশ, এখন থেকে তুমি কেবল তার পায়ের পাতায় নজর রাখবে, কখনই পাতার ওপর দৃষ্টি তুলবে না। যাও, সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করে নিয়ে এসো।'

একঝুড়ি ফল সংগ্রহ করে আনার পর গুরুদেব খুশি হলেন। 'বৎস, তুমি স্থাণু হওয়ার চেষ্টা করো। নইলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'স্থাণু মানে কী গুরুদেব?'

'দৈত্যরাজ নিকুম্ভের পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দকে নিধনের জন্যে বিশ্বকর্মা ত্রিভুবনের সব উত্তম জিনিস তিলতিল করে সংগ্রহ করে যে নারী সৃষ্টি করেন তার নাম তিলোত্তমা। সে যেদিকে যায় তাকে দেখবার জন্যে ব্রহ্মার একটা করে মুখ বেরিয়ে আসায় তিনি চতুর্মুখ হতেন। তাকে দেখার জন্যে ইন্দ্রের সহস্রলোচন হল। কিন্তু শিব থেকে গেলেন স্থির হয়ে। তাই তাঁর নাম স্থাণু। তুমি শিবের মতো স্থির হও।' গুরুদেব বললেন।

গুরুদেব কেন তাকে শিবের মতো স্থির হতে বললেন তা সুশোভন অনুমান করলেন। তপোবনের সব কাজ তিনি নির্বিকার মুখে করে যেতে লাগলেন কিন্তু ভুলেও গুরুপত্নী শাখার দিকে তাকালেন না। কিন্তু দিঘিতে জল আনতে গিয়ে জলে গুরুপত্নীর প্রতিবিম্ব পড়লে না দেখে

উপায় কি।

শাখা হাসলেন, 'আমার মুখের দিকে তাকানো কি পাপ?'

'কি করব। গুরুদেবের আদেশ।' জলের দিকে তাকিয়ে বললেন সুশোভন।

'আঃ, ওই তো তোমার গুরুদেব! শ্মশানের পোড়া কাঠের মতো চেহারা। অতি বৃদ্ধ। ওঁর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা না বলো তাহলে আমি এই দিঘিতে ডুব দিয়ে মরব, বলে দিলাম।' প্রতিবিম্ব সরে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল সুশোভনের। ফিরে গিয়ে দেখলেন গুরুদেব অন্যমনস্ক। কারণ জিজ্ঞাসা করতে জানালেন, 'বৎস, আমার সাধনার বিঘ্ন ঘটছে। কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছি না। ভাবছি তোমার গুরুপত্নীকে তার পিত্রালয়ে রেখে হিমালয়ে যাব সাধনা করতে। ততদিন তুমি আমার এই তপোবনের দায়িত্বে থাকবে।'

সুশোভন বিচলিত হলেন, 'অপরাধ যদি না নেন তাহলে একটা কথা বলতে পারি।'

'কি কথা?'

'মনস্থির করা বা মনঃসংযোগ বাড়াবার একটা পথ হল সোমরস পান করা। সোমরস মনে ভক্তিভাব বাড়িয়ে দেয়।' সুশোভন নিবেদন করে।

'সেকি।'

'হ্যাঁ। শরীরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।'

'অ। তা এখানে সোমরস কোথায় পাব? এই জঙ্গলে?'

'আপনি আদেশ দিলে আমি সংগ্রহ করতে পারি।'

'বেশ, আনো দেখি।'

সকালে স্বপ্নটাকে হুবহু মনে করে সুশোভন সোজা হয়ে বিছানায় বসলেন। কলকাতায় লক্ষ টন সোমরস বোতলবন্দি হয়ে আছে। রোজ একটা বোতল তিনি যদি স্বপ্নে নিয়ে গিয়ে গুরুদেবকে দিতে পারেন তাহলে নির্ঘাত প্রতিরাত্রে গুরুদেব চৈতন্য হারিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন। সেই স্বপ্ন নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ঘিরে হবে। আর গুরুদেবের স্বপ্ন দেখার সময়ে শাখার সঙ্গে একটু রসালাপ করতে কী এমন ক্ষতি। সেটাও তো আর এক ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আত্মিকও বলা যেতে পারে।



তবু জীবন অগাধ

'তুমি ভুল বুঝলেই নিশ্বাস ভারী হয়।'

বারোতলা বাড়ির এগারোতলার ফ্ল্যাটে বসে ঠিক দুপুরবেলায় এই লাইনটা লিখে ফেলল কল্লন। তার টেবিলের সামনে একটা বড় জানলা। চিলগুলো পাক খাচ্ছে জানলার বাইরে। মেঘগুলো বড় কাছে কিন্তু কাছাকাছি নয়। হলে ভালো লাগত না, যে মেঘের শরীর জলে ভেজা নয় তাদের সাহারায় চলে যাওয়া উচিত।

এখন দুপুর। ফ্ল্যাটে কেউ নেই। কল্লন অবাক হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কবিতা লেখে না। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ে না। বাবা বলেন, ওগুলো ট্র্যাশ। ইংরেজিতে প্রকাশিত

পৃথিবীর যাবতীয় সিরিয়াস লেখা নিয়মিত পড়ে বাবা। এ বাড়িতে কোনও বাংলা বই নেই।

মায়ের পড়ার অভ্যেস নেই। কাজ না থাকলে মা টিভি-র সামনে বসে থাকে। মায়ের প্রিয় চ্যানেল এম। মা কখনও নাচত কিনা কল্লন জানে না, কিন্তু অনবরত শরীর বেঁকিয়ে এবং দেখিয়ে মেয়েগুলো লাফিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে, মায়ের দেখতে ভালো লাগে। যেদিন টি-এন-টি-তে ছবির বদলে বিকট চেহারার কুস্তিগিররা কুস্তির অভিনয় করে সেদিন মায়ের খুব ভালো কাটে।

কল্লন পড়াশুনা করেছে সেন্ট জেভিয়ার্সে, স্কুল এবং কলেজে। সে ইংরেজিটা ভালো বলে। ওইটেই তার অনার্সের বিষয়। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাস ছিল বলে সবাই জেনে নিয়েছে ফাইনালেও থাকবে। এরপর কল্লন কী করবে তাই নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে প্রায়ই তর্ক চলে। বাবা তাকে লন্ডনে পাঠাতে চায় মা আমেরিকায়। ওর কোনও ভাইবোন নেই।

'তুমি ভুল বুঝলেই নিশ্বাস ভারী হয়।'

আচ্ছা, এটা কি বাংলা কবিতার লাইন হয়েছে? কল্লন তাকিয়ে দেখল চিলগুলো সামনের আকাশে নেই। সে অপেক্ষা করল। এখনই টানটান ডানায় ভেসে ফিরে আসবে ওরা। এক, দুই অনেক মুহূর্ত গেল, ওরা ফিরল না। অস্বস্তি হল। কল্লন চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলায় গেল। সারা আকাশে একটাও চিল নেই। এই নগ্ন আকাশ দেখতে কুৎসিত লাগল। নিশ্বাস ভারী হল। সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটে এল টেবিলে। লাইনটা পড়ল।

কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? ওর কলেজের বন্ধুদের মধ্যে খুব কাছাকাছি সন্দীপ। টেলিফোন পেয়েই সন্দীপ বলল, 'কী ব্যাপার?'

'শোনো। তুমি ভুল বুঝলেই নিশ্বাস ভারী হয়, এটাকে বাংলা কবিতার লাইন বলা যেতে পারে?'

'হয়তো।' সন্দীপ একটু অবাক হল যেন।

'তার মানে তুই জানিস না?'

'ইন ফ্যাক্ট ব্যাপারটা খুব সিলি লাগছে।'

'সিলি?'

'এখন ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'কেন?'

'প্রেম এখন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার দিন শেষ। ওর পেছনে কেউ সময় নষ্ট করে না।'

'সে কি রে? কয়েকদিন আগে টেলিগ্রাফে পড়লাম একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছে কারণ তার প্রেমিকা তাকে রিফিউজ করেছিল।'

'দ্যাখ, উজবুকটা নিশ্চয়ই বাংলা উপন্যাস পড়ত। বাই!'

মাথা নাড়ল কল্লন। সন্দীপকে ফোন করা ভুল হয়েছে। বাবার সঙ্গে ওর কোনও ফারাক নেই। সল বেলো পড়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

খুব অস্বস্তি হচ্ছিল কল্লনের। একজন কবিকে যদি পাওয়া যেত তা হলে সে জিজ্ঞাসা করত লাইনটায় কবিতা আছে কিনা। কিন্তু বাংলা ভাষায় যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের নাম বা টেলি-নম্বর তার জানা নেই।

জিনসের ওপর ফতুয়াটা চাপিয়ে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হল কল্লন। যে-কোনও বাংলা বই-এর দোকানে যেতে হবে তাকে।

এগারোতলা থেকে নামতেই সে মহিলাকে দেখতে পেল। এই বাড়িতেই থাকেন। বেশ মিষ্টি দেখতে। ছেলেবেলা থেকে এঁকে দেখছে সে। কিন্তু তার বেশি সম্পর্ক হয়নি। মা পছন্দ করে না ঘনিষ্ঠতায়।

মহিলা হাসলেন, 'ভালো?'

কল্পন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি যেন কী পড়ছ?'

'পার্ট টু দিয়েছি।'

'আ-চ্-ছা!' মহিলার চোখ বড় হল।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্নটা করে ফেলল কল্পন, 'আচ্ছা, আপনি বাংলা কবিতা, গল্প পড়েন?'

'নিশ্চয়ই। রোজ বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না।'

'বাংলা বই?'

'হ্যাঁ, কেন বলো তো?'

'আপনি আমাকে একটু হেল্প করবেন? বাংলা ভাষায় এখনকার দুজন বড় কবির নাম এবং ফোন নাম্বার দিতে পারবেন?'

'ফোন নাম্বার তো জানি না, ওঁদের বই দিতে পারি। তুমি আসবে?'

খুশি হয়ে মাথা নাড়ল কল্পন।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এ ঘরে এসো।'

পাশের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কল্পন, দেওয়াল জুড়ে স্টিলের ফ্রেমে বাংলা বই সাজানো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওগুলো মেজর উপন্যাস, মাঝখানে গল্প, এপাশে কিছু প্রবন্ধ আর ক্লাসিক বই আর এদিকে কবিতা।'

'ক্লাসিক বই?'

'হ্যাঁ। রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—তুমি পড়োনি?'

মাথা নাড়ল কল্পন, 'না। বাংলা বই আমাদের বাড়িতে নেই।'

'তুমি কী পড়ো? ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বাংলা কবিতার খোঁজ করছ কেন?'

'কবিতার খোঁজ করছি না। কবির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কল্পন এখন যুবক কিন্তু তার মুখে কিশোরের সারল্য থেকে গেছে। তিনি একটা বই বের করলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয় তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। এঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়লেই তুমি কিছুটা আন্দাজ পাবে।'

'এঁর টেলিফোন নাম্বার পাওয়া যাবে না?'

'ইনি অনেককাল আগে মারা গিয়েছেন।'

'ও। যাঁরা বেঁচে আছেন—।' শেষ করল না কল্পন।

'সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীরা আছেন। এঁদের বই-এর প্রকাশকরা নিশ্চয়ই টেলিফোন নাম্বার দিতে পারবেন। কিন্তু বাংলা না পড়ে বাঙালি কবির সঙ্গে কথা বলতে চাইছ কেন? কিছু দরকার?' ভদ্রমহিলার গলায় বিস্ময় স্পষ্ট।

'আসলে, মানে, আমি কখনও লেখার কথা ভাবিনি। এখন ছুটি। ফ্ল্যাটে একা ছিলাম। হঠাৎ একটা লাইন লিখে ফেললাম। মনে হল, কেউ যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল। তারপর থেকেই ভাবতে লাগলাম বাংলায় ওই লাইনটাকে কবিতা বলা যায় কি না?' কল্পন খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল।

'কী লাইন লিখেছ?'

'আপনি হাসবেন। ব্যাপারটা হয়তো ছেলেমানুষি, পরিচিত কাউকে বলতে চাইনি। যে কখনও সাঁতার শেখেনি সে কী করে সাঁতার কাটবে?'

'তা তো ঠিকই। সব কিছুই শিখতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। তোমার কাছে ইংরেজি থেকে বাংলা শব্দের অভিধান আছে? অথবা বাংলা থেকে ইংরেজির?'

'অভিধান?'

'ডিকশনারি।'

'ওঃ। না, নেই। স্কুলে আমার বাংলা বই ছিল না, হিন্দি পড়েছি।'

'তাহলে তোমার পক্ষে বাংলা লেখা সম্ভব নয়। তবু কথা দিচ্ছি হাসব না। কী লিখেছ শুনি।' মহিলা সিরিয়াস ভঙ্গি করলেন।

কল্পন লাইনটা ভাবতে-ভাবতে দেখল মহিলা চোখ বন্ধ করলেন। সে আবৃত্তির মতো উচ্চারণ করল, 'তুমি ভুল বুঝলেই নিশ্বাস ভারী হয়।'

কল্পন দেখল লাইনটা শোনামাত্রই মহিলার মুখের রং পলকের জন্যে বদলে গেল। অপূর্ব এক আলো খেলা করে গেল ওঁর গালে, ঠোঁটে, চিবুকে। চোখ খুললেন তিনি, 'এই লাইন তুমি লিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এর পরের লাইন কী?'

'তারপর কিছু ভাবিনি।'

'খুব ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, এইরকম ইংরেজি কবিতা কিছু পড়েছ?'

'না তো!'

'এই তুমিটা কে? কার কথা ভাবলে তোমার নিশ্বাস ভারী হয়?'

'কাউকে ভেবে লিখিনি তো!'

'তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই?'

'না।'

ভদ্রমহিলা জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা আর দুটো অভিধান কল্পনকে দিয়ে বললেন, 'খুব ভালো লাগল। কিন্তু কবিতাটা শেষ করতে হবে তোমাকে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।'

নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এল কল্পন। টেবিলে বসতেই সে চিলটাকে দেখতে পেল। একলা একটা চিল টানটান ডানা মেলে মেঘেদের শরীর ছুঁয়ে যেন সাঁতার কেটে চলেছে। ওর সঙ্গীরা কোথায়?

'কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনও আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেকরকম।'

বই-এর শুরুতেই লাইনটা পড়ে কল্পনের মনে হল এমন সরল কবিতার ব্যাখ্যা কোনও ইংরেজি প্রবন্ধে পড়েনি সে। কিন্তু প্রথম কবিতা, যার শিরোনাম নীলিমা, পড়তে গিয়ে হোঁচট খেল সে। 'আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা' লাইনটার অর্থ বোধগম্য হল না তার। এমন কঠিন বাংলা শব্দ সে কখনও শোনেনি। কষ্ট হল। যাঁরা কবিতা লেখনে এবং পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই খুব পণ্ডিত মানুষ। পাতা ওলটাল সে। হঠাৎই শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল। 'যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনও সাধ নাই তার ফসলের তরে।' উত্তেজিত অবস্থায় অভিধান খুলল সে। অনুমানে যেটা ধরেছে সেটা যাচাই করতে গিয়ে খুশি হল। শিয়রে শব্দটা বড় কাছের হয়ে গেল। 'নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার।' চোখের সামনে যেন ছবিটা আঁকা হয়ে গেল।

ঠিক-ঠিক। প্রথমটা যদি পণ্ডিতের, দ্বিতীয়টা তাহলে যার অনুভব করার ক্ষমতা আছে তার। 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির, রস নয়।' অভিধান খুলে উৎকৃষ্ট শব্দের মানে দেখল কল্পন।

চোখ তুলতেই কল্পন দেখতে পেল উড়তে-উড়তে চিলটা জানালার বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। কখনও-সখনও ওদের বারোতলার কার্নিশে বসে থাকতে দেখা যায়। ওর সঙ্গীরা কী ক্লান্ত হয়ে কোনও কার্নিশে বিশ্রাম নিচ্ছে! হঠাৎই ডেকে উঠল পাখিটা, উড়তে-উড়তে ডাকল। চিলের ডাক বড় কর্কশ শোনায়।

পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কবিতাটা চোখ কেড়ে নিল। 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে/তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।' বাঃ, সমস্ত পৃথিবীটা যেন আলোকিত হল। একেবারে ওই চিলটাকে নিয়ে লিখেছেন কবি। তাহলে একটু আগে যে ডাকটা সে শুনতে পেয়েছিল সেটা ডাক নয়, কান্না? 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।'

বেতের ফল কীরকম দেখতে? কল্পন পাশের ঘরে গিয়ে কর্ডলেসের বোতাম টিপল, 'সন্দীপ, তুই বেতের ফল দেখেছিস?'

'না। কেন?'

'ঠিক আছে।' লাইনটা কেটে দিয়ে দ্বিতীয় নাম্বার টিপল সে। বাবার টেলিফোন বেজে চলেছে। অর্থাৎ ভদ্রলোক এখন তাঁর ঘরে নেই। তৃতীয় নাম্বার টিপে নাম বলতেই মাকে পেল কল্পন, 'মা, বাই এনি চান্স তুমি বেতের ফল দেখেছ?'

'হোয়াট? কী ফল?'

'বেত। কেন?'

'কোনও ইংরেজি উপন্যাসে পেয়েছ বোধ হয়। ওসব আফ্রিকানরা খায়। বাই!'

ঠোঁট কামড়াল কল্পন। তারপর বই-এর পাতা উলটে প্রকাশকের নাম ঠিকানা দেখল। নাভানা, সাতচল্লিশ গণেশ অ্যাভিনিউ। টেলিফোন গাইড খুঁজে কোনও হদিশ পেল না সে। তারপরেই খেয়াল হল। নিউ মার্কেটের যে দোকান থেকে মা ফলটল কেনে তারা বলতে পারে। বাবা একবার বলেছিল নিউ মার্কেট এমন একটা জায়গা যেখানে চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

লিন্ডসে স্ট্রিট দিয়ে ঢুকে সেই দোকানে পৌঁছাতে সময় লাগল না। এখন পড়ন্ত দুপুর বলে ভিড় শুরু হয়নি। দোকানদার তাকে বেশ কয়েকবার দেখেছে মায়ের সঙ্গে আসতে। জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই বাবু?'

'বেতের ফল।'

'বেতের ফল? আমার কাছে নেই।'

'কোথায় পাব?'

'কেউ রাখে বলে শুনিনি।'

'কীরকম দেখতে হয় জানেন?'

'আমি তো কখনও দেখিনি।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কল্পন।

'আচ্ছা, আপনি বেতের ফল খুঁজছেন কেন?'

প্রশ্নটা পাশ থেকে আসতেই সে মাথা ঘুরিয়ে দেখল একজন তরুণী কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে।

'আমার দরকার ছিল।' গম্ভীর হল কল্পন।

'আমি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে বেতের গাছ ছিল।'

'তাই?' মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল কল্পন, 'কীরকম দেখতে। খুব ডিপ্রেসড্ দেখতে?'

'ডিপ্রেসড্?'

'হ্যাঁ। মানে দেখলেই ম্লান চোখ মনে আসে?'

মেয়েটি একেবারে সকালের প্রথম রোদ হয়ে গেল, 'আপনি বুঝি জীবনানন্দ দাশের খুব ভক্ত?'

'কী করে বুঝলেন?'

'আপনি 'হায় চিল' কবিতার লাইন বললেন।'

'আপনার মুখস্থ? কিন্তু জানেন, আজ দুপুরের আগে আমি ওঁর নাম শুনিনি, লেখাপড়া দূরের কথা।'

'সেকি?'

'কিন্তু ফলটা কীরকম দেখতে বললেন না।'

'মনে পড়ছে না। আপনি কবিতা লেখেন?'

'না। আচ্ছা বলুন তো, এই লাইনটায় কবিতা আছে কি না?' কল্পন সরাসরি লাইনটা বলল, 'তুমি ভুল বুঝলেই নিশ্বাস ভারী হয়।'

'কবিতার আভাস আছে লাইনটায়। জয় গোস্বামীর লাইন?'

'উনি বুঝি খুব নামকরা কবি!'

মেয়েটি এমন চোখে তাকাল যে সঙ্গে-সঙ্গে বেতের ফলের কথা মনে পড়ল কল্পনের। প্রবল বিস্ময় নয়, কীরকম ম্লান হয়ে গেল ওর চোখ। তারপর ফলের প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেল।

বাবা অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাবে যায়। ক্লাব থেকে ফিরে আসে ঠিক ন'টায়। এসে স্নান করে। তারপর বিদেশি বোতল নিয়ে বসে। কয়েকটা বরফের টুকরো, শসার টুকরো দিয়ে তিন পেগ মদ খায়। ক্লাবে বাবা বিয়ার খায়। দিশি হুইস্কি বাবার চলে না। এসময় কথা বলতে চাইলে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। বাবা স্কচের সঙ্গে বাংলা বলে না। এটাই নিয়ম।

কল্পন চেয়ার টেনে বলল, 'তুমি যখন ড্রিংক করো তখন কোনও ঘ্রাণ পাও?'

'ঘ্রাণ?' শব্দটা বলেই বাবা কাঁধ নাচাল। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ওয়েল, স্কচের একটা নিজস্ব ফ্লেবার আছে। পৃথিবীর কোনও হুইস্কিতে সেটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেন?'

'ঘাসের ঘ্রাণ তোমার মদে নেই?' কল্পন জিজ্ঞাসা করল।

'ঘাসের ঘ্রাণ! ওটা একটা গন্ধ হল! গরুর খাদ্য যা তার কখনওই মানুষের ভালো লাগতে পারে না। আজ তোমার কী হল?' প্রশ্ন ইংরেজিতে।

মা বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। টেবিলের ধারে শরীর রেখে বলল, 'তোমার ছেলের কিছু একটা হয়েছে। আজ অফিসে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল আমি বেতের ফল দেখেছি কি না?'

বাবা বলল, 'এখন জিজ্ঞাসা করছে স্কচে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি কিনা।'

কল্পন বলল, 'গন্ধ নয় ঘ্রাণ।'

বাবা হাত নাড়ল, 'ওঃ, একই হল।'

'আমারও ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে-গেলাসে পান করি।' কল্পন হাসল।

'মাই গড! তুমি কবিতা পড়ছ নাকি? বাংলা কবিতা?'

'হ্যাঁ।'

'হোয়াট?'

'পড়ার পর মনে হচ্ছে এতদিন অশিক্ষিত ছিলাম।'

কল্পন চেয়ার থেকে উঠে গেল চোয়াল ঝুলে যাওয়া মুখের সামনে থেকে। ঘরে ঢোকার আগে শুনল, 'কি হল ওর? পাগল হয়ে গেল নাকি?'

বাবা বলল, 'মনে হচ্ছে। কোনও পাতি বাঙালি মেয়ে ওকে ফাঁসিয়েছে। তোমার ছেলের মুন্ডু চিবিয়েছে সে।'

'মেয়ে? ওর কলেজের কোনও মেয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়নি।'

'তখন হয়নি, এখন হয়েছে। সে-ই ওকে বাংলা কবিতা পড়াচ্ছে দ্যাখো, এবার হয়তো বলবে বাংলা নিয়ে এম. এ. করবে। উঃ! আঃ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি?' নিজের অজান্তেই বাংলায় চলে এল বাবা।

'এই জন্যেই আমি ওকে আমেরিকায় পাঠাতে বলেছিলাম।'

'এমনভাবে কথা বলছ যেন বম্বে দিল্লিতে পাঠাতে চাও। আমেরিকায় যাওয়া খুব সোজা ব্যাপার? ভিসা পাবে ও? কখনও না। তার চেয়ে লন্ডনের ভিসা পাওয়া অনেক সহজ। ওকে জিগ্যেস করো ব্যাপারটা কী?'

বাবা খেঁকিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মা বলল, 'তুমি ওইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'আই অ্যাম সরি। ওকে?'

মা এল কল্পনের ঘরে।

কল্পন হাসল, 'কোনও মেয়ে আমাকে ফাঁসায়নি। তুমি যাও।'

'তাহলে এ সব কী বলোছিস তুই?' মা মমির মতো মুখ করে বলল।

'কিছুই না। তুমি টিভি দ্যাখো।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মা ফিরে গেল। কল্পন তাকাল জানলার বাইরে। পরিষ্কার আকাশে অজস্র তারার ভিড়। কোনও রাতে সে কী এত তারা আকাশে দেখেছে? সমস্ত সন্ধে নিংড়ে যে লাইনগুলো বই-এর পাতা থেকে বুকে তুলে নিয়েছিল তার কোনও-কোনওটার সঙ্গে কি এই আকাশের মিল আছে? দ্রুত বই খুলল কল্পন। পাতার-পর-পাতা সরিয়ে-সরিয়ে শেষ পর্যন্ত থামল—'আকাশে এক তিলও ফাঁক ছিল না।' আশ্চর্য, যে বই ছাপা হয়েছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে অর্থাৎ চুয়াল্লিশ বছর আগে তার কবি আজকের আকাশটাকে কি করে দেখলেন! নাকি সে-রাতেও এমনই আকাশ ছিল! নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করল কল্পন। না, তার কোনও প্রিয় মানুষ এখনও মারা যায়নি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে দেখছে বাবা আর মাকে। মাঝে-মাঝে মাসিমণি। ব্যস। এরা কেউ মারা যায়নি। অতএব মৃতদের মুখ নক্ষত্রের ভেতর দেখার কোনও অবকাশ নেই। এই নক্ষত্রেরা কীরকম ঝলমল? অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো। অভিধান বলছে অশ্বত্থ একটি বৃক্ষ অর্থাৎ বড় গাছ। তার চূড়ায় বসলে নক্ষত্রের একটু কাছাকাছি হওয়া হয়তো সম্ভব কিন্তু প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখ কীরকম দেখতে? প্রেমিক চিলপুরুষ কেন? কেন প্রেমিকা চিলনারী নয়? আজ দুপুরে যে চিলটা উড়ে-উড়ে কেঁদে যাচ্ছিল সে কী পুরুষ না নারী?

কল্পন কিছুটা অনুমান করছিল অনেকটাই বোধের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

এ বাড়িতে ডিনার শুরু হয় বাবার স্কচ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে। আজ রাতে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সেটা জানালে সমস্যা বাড়বে বলে তাকে টেবিলে বসতে হল।

খাওয়া শুরু করে বাবা বলল, 'তুমি কী টেগোর পড়ছ?'

'না তো! কেন?'

'হঠাৎ তোমার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ওয়েল, লোকে বলবে বাঙালি হয়ে বাংলা পড়ো না, এটা লজ্জার কথা। আরে, কীসের লজ্জা? ইংরেজি পড়লে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার খবর পাওয়া যাবে। বাংলায় যারা লেখে তারা ইংরেজি থেকেই কীভাবে লিখতে হয় শিখেছে। নকল পড়ে কি

হবে, পড়তে হলে আসল পড়াই ভালো।' স্কচ খাওয়ার পর বাবা যখন কথা বলে তখন গলার স্বরের পরিবর্তন হয়। ক্রিকেট খেলার ঘুমন্ত রিলের মতো মনে হয়।

কল্পন মায়ের দিকে তাকাল, 'ব্যাবিলনের রানি খুব সুন্দরী ছিলেন?'

মা জবাব দেওয়ার আগেই বাবা প্রশ্নটা লুফে নিল, 'ওঃ, ফ্যান্টাস্টিক। কোন বইটা পড়ছিস?'

'কেন?'

'ব্যাবিলনের রানির কথা জানতে চাইছিস!'

'যে সব রূপসিরা এশিরিয়া, মিশর, বিদিশায় মারা গিয়েছিল মাঝে-মাঝে তারা কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় রাতের আকাশে মৃত্যুকে পরাজিত করতে। এদের মধ্যে ব্যাবিলনের রানিও আছেন।' কল্পন আবৃত্তি না করে বলল।

'দ্যাটস্ ইট।' বাবা ঘাড় নাড়ল, 'এইটে হল সময়কে অতিক্রম করা অথবা কী বলা যায়?'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না।' মা বাধা দিল, 'তাহলে তুই তখন ঘাসের ঘ্রাণটান কী বলছিলি? মাথা খারাপ করে দিস!'

'বাড়িতে একটা মশারি ছিল না?'

'মশারি? মশারি কী হবে এই এগারোতলায়!' মা অবাক।

'কলকাতায় খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল।

মা মাথা নাড়ল, 'পাগলের কাণ্ড। কখন কী বলো বুঝতে পারি না।'

মশারিটাকে টাঙাল খুব কসরত করে। এ বাড়ির দেওয়ালে পেরেক পোঁতা নেই, দেওয়াল নষ্ট হয়। অতএব মশারি টাঙাতে বুদ্ধি খরচ করতে হল। আলো নিবিয়ে সবক'টা জানালা খুলে দিল কল্পন। এগারোতলার এই ঘরটাকে হাওয়া-ঘর বলা যায়। ফ্যান খুলতে হয় না। দুটো জানালা বন্ধ না করলে ঝড় বয়ে যাবে। আজ সব উন্মুক্ত।

মশারির ভেতর শুয়ে নাইলনের মশারির ফাঁক দিয়ে আকাশের নক্ষত্রদের দিকে তাকাতেই মনে হল ওরা যেন অনেকটা নেমে এসেছে। ওদের কারও নাম ক্লিওপেট্রা কারও নাম শিবা। অসংখ্য মৃত রাজকন্যারা তাকিয়ে আছে প্রেমিক চিলের কুয়াশা-ভেজা চোখের দিকে। ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল কল্পন। এবং তখনই বঙ্গোপসাগর ছেড়ে উড়ে এল হাওয়ারা। কল্পনের মনে হল সেইসব বিস্তীর্ণ হাওয়া তার মশারির সঙ্গে খেলা করে চলেছে। মশারিটা ফুলে উঠেছে মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতো। যে-কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে ছড়িগুলো, মশারিটা উড়ে যাবে নক্ষত্রের দিকে। এই দেখতে-দেখতে চোখ বন্ধ করল কল্পন। তার মনে হল, মাথার ওপর মশারিটা আর নেই। স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ে যাচ্ছে। আহা, আজ কী চমৎকার রাত! সেই মশারির ঝুলে থাকা সাদা দড়ি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে নেমে এল জানলা গলে। এ যেন কোনও ঈশ্বরীর পাঠানো প্যারাসুট যা বহন করতে চাইল কল্পনকে। সেই প্রবল টানে বারোতলা বাড়ির এগারোতলার ফ্ল্যাটের জানালা গলে কল্পনের শরীরটা উঠে গেল নক্ষত্রের নিচে।

কল্পন আড়ষ্ট। তার চারপাশে কী নীল! নীলগুলো গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে এখন। যেন অজস্র নীলগাই তেড়ে এসে ঢুঁস দিয়ে বলের মতো গড়িয়ে দিল তাকে। মশারির খুঁট আঁকড়ে ধরে বাঁচার উপায় নেই। এই নীলের অত্যাচার প্রবল হওয়ায় নিশ্বাস নিতে মশারির খুঁট ছেড়ে দিল। মৃত প্রজাপতির 'পর তার শরীর নীল ছেড়ে নেমে এল সাঁই-সাঁই করে।

'ঘাসের ওপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস। অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।' সেই সবুজে পতিত হয়ে কল্পন নিশ্বাস নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। মাথার ওপর রাতের নক্ষত্ররা উধাও। মেঘ নেই, এমনকী সেই মহানীল চোখে পড়ছে না। উলটে থাকা চড়াই-এর চুড়োয় অজস্র সবুজে সে

দাঁড়িয়ে আছে একা। কয়েক পা হাঁটতেই অতল খাদ। খাদের নিচে অজস্র মানুষ, মানুষের দুঃখ, মানুষের ক্লান্তি ও অধঃপতনের সীমা। তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া যার মধ্যে পুঁটি মাছের মতো ছটফট করছে ঈর্ষা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা। এইসব মানুষের ভিড়ে খুঁজতে-খুঁজতে সে প্রথমেই বাবাকে দেখতে পেল। মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে মাকে লুকিয়ে বাবা তার নখগুলো দস্তানায় ঢেকে রাখছে। সামনে দাঁড়িয়ে মা মিউজিক চ্যানেলের শাকচুন্নির পোজ দিচ্ছে পৃথুলা শরীরে। সে চিৎকার করল, 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ?' ওদের ভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হল না। শুধু ধোঁয়াগুলো পাক খাচ্ছিল।

কল্পন সরে এল। এই সবুজ, নিথর সবুজের দিকে পৃথিবীর শেষ রাজকুমারের মতো হেঁটে এল অনেকটা। এই সময় কেউ কথা বলল। কী কথা? কল্পনের মনে হল কেউ বলল, তোমাকে চাই। সে চারপাশে তাকাল। তৎক্ষণাৎ ওই সবুজের একপ্রান্তে সন্ধ্যা, আর সেই সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে একটি অবয়ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ঠিক শিরীষের ডালের নিচে। হলুদ ফালি চাঁদ এসে আটকে গেল শিরীষের ডালে। অথচ যেখানে কল্পন দাঁড়িয়ে সেই সবুজ আলোর প্রসন্নতা ছড়িয়ে সে এগিয়ে গেল। অবয়ব স্পষ্ট হচ্ছিল। কল্পন দেখল, 'দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা।' যে পাখির ডানায় বল নেই, জরা তাকে শেষ ঘণ্টা শোনাবে বলে তৈরি, ঘাসের ওপর বসা সেই পাখির রং ছড়িয়েছে কী ওই শরীরে? চোখ তুলল কল্পন। এ কী! 'কড়ির মতো সাদা মুখ তার, দুইখানা হাত তার হিম। চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে।' এ কেমন নারী? পৃথিবীর উপোসি রাজকন্যাদের মৃত ইচ্ছাগুলো একত্রিত হয়েছে ওই শরীরে। কল্পন ছিটকে সরে এল আলোয়। দ্রুত ছুটে গেল অন্য প্রান্তে যেখানে শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে নেবে। চারপাশের সবুজে সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিল বাতাস। ঘুঘুদের শেষ ডাক, ঝাউফুল ছড়ানো ঘাসে শালিকের শেষ লীলা, লাল বটফল নেমে যায় জলে, চরাচর জুড়ে নিস্তব্ধ শান্তি। এই সময় তাকে দেখতে পেল কল্পন। সূর্য তার শেষ রশ্মি জড়িয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল পৃথিবীর পথে। উশখুশ খোঁপা থেকে পায়ের নখটি এই শেষ বিকেলের বাতাসে যেন বড় সচেতন। এই পৃথিবীর রোদ, রাত্রির ঘ্রাণ, নক্ষত্রের শিশির তার শরীরে মুখ ডুবিয়েছে। সে যখন কাছে এল তখন জলের, সহজ জলের আভা স্পর্শ করল কল্পনকে। সে চোখ তুলে কল্পনকে দেখল। কল্পনের মনে হল, 'কতদিন অপেক্ষার পরে/আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে—অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।' নারী কল্পনের এক হাত তুলে নিয়ে নিজের গালে রাখল, বলল, 'রোগা হয়ে গেছ এত চাপা পড়ে গেছে যে হারিয়ে পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—! এতদিন কোথায় ছিলে? কেন চাওনি, ভাবোনি, দ্যাখোনি আমাকে?'

কল্পনের ঠোঁট কাঁপল। যেভাবে নীড়ের কোণে ছানা-পাখি মাতৃমুখ থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহ করে সেইভাবে বলল সে, 'তোমাকে দেখার মতো মন ছিল না।'

সে হাসল। তারপর বলল, 'এখন আছে?'

কল্পন বলল, 'তোমার আলোয় আলো হলাম, তোমার জলে জল।'

সে বলল, 'তোমার হৃদয় জেগেছে। এ-জীবন পদ্মপাতায় জল। পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল। জল ঝরে যায় যাক। অনন্তকাল থাকবে যে আশ্বাস তাই আমাদের প্রেম। এসো হাঁটি, পাশাপাশি, ছায়াদের এক করে।'

ওরা হাঁটছিল। কল্পনের মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবিতা কী?'

'কী জানি!' নারী মাথা নাড়ল।

'তুমি ভুল বুঝলে নিশ্বাস ভারী হয়। এ কী কবিতা?'

'পুবে সূর্য ওঠে, পশ্চিমে যেতে সে বাধ্য। যে মুকুল কাল ফুল হবে সে আজ ফুল নয়। শৈশব না থাকলে যৌবন আসে না কিন্তু শৈশবই যৌবন নয়। এই লাইন সেই পুর্ব সূর্যের মতো, মুকুলের মতো শৈশবের মতো। নিশ্বাস ভারী হয় মাত্র, ভারী হতে-হতে নিশ্বাসে যে কাতরতা তা

এখনও বহুদূর।' নিম-আমলকী পাতার ঘ্রাণমাখা বাতাসে চুল উড়ে-উড়ে খেলছিল কপালে, দ্রোণ ফুল লেগে আছে তার মেরুন-শাড়িতে। চারপাশের সবুজ গাছগাছালি, পাখি, ফুল যদি প্রকৃতি তাহলে এই নারী দ্বিতীয় প্রকৃতি।

কল্পন কথা বলল না আর, নারীও। তারপর তার সন্ধের কিনারায় এসে দাঁড়াল। নারী জিজ্ঞাসা করল, 'সরল সত্যি জানে?'

'না।'

'একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিল তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে। কেন?'

'জানি না।'

'সন্ধান করো। দ্যাখো না, এ-জীবনে জানতে পারো কিনা।' এই বলে সেই নারী চলে গেল। সাদা ছিট কালো পায়রার ওড়াওড়ি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে মায়াবী আলোয় অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙল কল্পনের। পৃথিবীর সবকিছু ঠিকঠাক। এই এগারোতলার ফ্ল্যাট, এই মশারি এবং রাতের আকাশ। কিন্তু এক মহাশূন্যতা বুকের ভেতরে। বৈশাখের মধ্য সাহারার বালিকণা পাক খেয়ে মরে সেখানে। এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালোবেসেছিল তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে? কেন? করুণ শঙ্খের মতো এই প্রশ্ন বেজে যাবে অনন্তকাল। এই রাত, জীবনের প্রথম এমন রাত, যা প্রশ্নের জন্ম দিয়ে সারাজীবনের অনেক অজস্র রাতকে নিঃস্ব করে দিল। কল্পন অলোস আঙুলে বইটি খুলল, 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।'



হয়তো পরের পূর্ণিমায়

আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিল সে। রাগি মোষের মতো তেড়ে আসছে মেঘগুলো। অতবড় আকাশটার দখল নিতে তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে চারপাশে। বড় মেঘের সঙ্গে ছোট মেঘগুলো জুড়ে যাচ্ছে চটপট। মোষের কথা মনে হলেও মেঘগুলো যেন মোষের চেয়েও কালো এবং ভয়ঙ্কর। অথচ দেখতে-দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে যদি ওই মেঘেদের শক্তি পেত! পৃথিবীর কোনও মানুষের ওই শক্তি নেই।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা করতে-করতে সে এমনই বিহ্বল যে, কেউ যে তাকে ডাকছে তা টের পায়নি। মেঘেদের শরীরে শক্তি আছে, মেঘ দেখলে কে না ভয় পায়! উন্মুখ হয়ে সে ভাবছিল, আহা মেঘেদের শক্তি যদি তার মধ্যে চলে আসত! এই সময় পৃথিবী প্রায় অন্ধকার। সংঘর্ষে মেঘেদের বুক থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে নেমে আসছে পৃথিবীতে। এইসব মিলেমিশে যে ভুবনমোহিনী রূপে আকাশ সেজেছে, তা তার চোখে পড়ছিল না। সে শুধু ঈর্ষাকাতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'অ্যাই সুন্দর, এত ডাকছি, কথা কানে যায় না?'

সে মুখ নামাল। জগদীশদা দাঁড়িয়ে আছে।

'তোকে ডাক্তারবাবু তখন থেকে ডাকছে চল।' জগদীশদা হাঁটতে লাগল। ওর একটি পা বেঁকে ছোট হয়ে যাওয়ায় হাঁটতে অসুবিধে হয়। হাঁটার সময় মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল। সুন্দর জগদীশের পাশে চলে এল, 'আচ্ছা জগদীশদা, তোমার পা ঠিক হয়ে গেলে কীরকম হয়?'

'হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কখনও হবে না। দুটো পা সমান-সমান করতে যে টাকা লাগবে তা এ-জীবনে পাব না আমি।' জগদীশ দাঁড়িয়ে গেল।

'যদি হয়?'

'বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন! চল।'

'যদি আমি তোমার পা ঠিক করে দিই?' সুন্দরের বলার ভঙ্গি জগদীশকে অবাক করল। তারপরই সে হো-হো করে হেসে উঠল। তার শরীর কাঁপতে লাগল। পেটে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল হাসতে-হাসতে। সুন্দর হতভম্ব হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল, সে কিছু না, কোনও অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার শক্তি ভগবান তাকে দেননি। সে দৌড়াতে লাগল। এই সময় ঝোড়ো বাতাস শুরু হল, শীতল ঝোড়ো বাতাস।

'কোথায় গিয়েছিলি?' বিশাল চেহারা থেকে বাজখাঁই গলা ভেসে এল।

'মাঠে।' সুন্দর মাথা নামাল।

'মাঠে? এই বাদলবেলায় মাঠে কার গরু খুঁজতে গিয়েছিলি?'

'আজ্ঞে—।'

'এসব বাঁদরামো আমার এখানে চলবে না। তোকে আমি কী বলেছিলাম?'

এতক্ষণে মনে পড়ল। ডাক্তারবাবু তাকে ইসমাইলের মাংসের দোকানে যেতে বলেছিলেন। আজ রাত্রে মাংস হবে। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে।

কোনও কথা না বলে দ্রুত ছুটতে লাগল সে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা শরীরে তিরের মতো বিঁধতে লাগল। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে দৌড়োতে লাগল। যেন বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ার আগে হাটের মুখে ইসমাইলের দোকানে পৌঁছে যাবে।

এই মফস্বল শহরে মানুষ একেই কম, তারপর বৃষ্টি-টিষ্টি হলে রাস্তা একদম ফাঁকা। অসময়ে একটা পাতলা অন্ধকার পৃথিবীর ওপর ঝুলছিল। একেবারে ভিজে চুপসে সুন্দর ইসমাইলের দোকানে পৌঁছে দেখল কোনও পাঁঠার ঠ্যাং শিকে ঝুলছে না। লম্বা বিড়ি টানতে-টানতে ইসমাইল বৃষ্টি দেখছিল, বলল, 'কী চাই?'

'মাংস।'

'দোকান পরিষ্কার। কাল সকালে এসো।'

বলেই চোখ ছোট করল, 'তুমি ডাক্তারবাবুর কাছে আছ না? হ্যাঁ মনে পড়েছে। মুশকিল হয়ে গেল।'

'কেন?'

'ডাক্তারবাবুর পাঁঠা আজ আমার কাছে নেই। বলবে ইসমাইল ক্ষমা চেয়েছে। থাকলে এই বিকেলবেলাতেও নতুন মাল কাটতাম। ডাক্তারবাবু আমাদের ভগবান।'

তার মনে পড়ল। ডাক্তারবাবু যে-সে পাঁঠার মাংস খান না। শুধু ছোলা খেয়ে বড় হতে হবে ওটাকে। গায়ের রং হবে মিশমিশে কালো। ধরতে গেলেই ঘাড় বেঁকিয়ে ঢুঁস দিতে আসবে, এমন রাগি। সেই পাঁঠার মাংস নাকি যেমন নরম তেমন সুস্বাদু। মাংস কেনার কথা হলেই ডাক্তারবাবু এইরকম বর্ণনা দেন।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফিরছিল সুন্দর। কোথায় বর্ধমানে মামাদের বাড়ি আর কোথায় বিহারের এই আধাপাহাড়ি মফস্বল শহর। আঠারো বছর বয়সেও পড়াশুনা না হওয়ার জন্যেই কাজকর্ম তেমন জুটল না তখন ঘর ছেড়েছে সে। ঘর বলতে মামার বাড়ি। বাপ জন্ম দিয়েই মরে গিয়েছিল। বিধবা মায়ের সঙ্গে আশ্রয় পেতেছিল মামার বাড়িতে। তারা যে আশ্রিত, মামার দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে একথা প্রতি পদে মনে রাখতে হত। ভুলে গেলেই প্রহার। মামার শরীরের শক্তি ফুরিয়ে এলেও আঠারো বছরের শক্তিশালী ভাগ্নের গায়ে জুতো ছুড়ে মারতে দ্বিধা করতেন না। কারণ তিনি জানতেন জাদুকাঠি

তাঁর হাতে। তখন মামাকে কংসের মতো মনে হত। আর মনে হতেই শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চাইত সে। শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন অবহেলায় তখন সে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোথাও এমন কোনও মন্ত্র অথবা অমৃত লুকোনো আছে যা পান করলেই অমিতশক্তির অধিকারী হওয়া যায়। মা বলেছিলেন তাকে পালিয়ে যেতে, 'এখানে পড়ে-পড়ে অন্ন ধ্বংস করছিস আর মার খাচ্ছিস। তোর লজ্জাও হয় না! এত বড় শরীরটা দিয়ে কিছু কর। নিজের ভাত নিজে জুটিয়ে নে। পালা এখান থেকে। আমার জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না।'

দু-চারটে জামাপ্যান্ট ঝোলায় ভরে বেরিয়ে পড়েছিল সে। বর্ধমান স্টেশন থেকে ট্রেনটা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে না জেনেই উঠে বসেছিল। ট্রেনটা ছিল রাতের। দেহাতি কিছু মানুষ আর কয়েকজন শহরের লোক বসেছিলেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একপাশে চুপচাপ বসেছিল সে। আর তখনই মনে হয়েছিল সে যদি ট্রেনের ড্রাইভার হত! তাহলে এই ট্রেনটা নিয়ে সে পৃথিবীর কোনও অজানা প্রান্তে চলে যেত। হু-হু করে ছুটে চলা ট্রেন, চাকার শব্দ, হুইসেলের আওয়াজ একসঙ্গে মিলেমিশে তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল বেশ। আলোগুলো যেন অসহায় হয়ে পেছনে ছিটকে চলে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীটা হেরে যাচ্ছে এই ট্রেনের বিক্রমের কাছে। আহা, সে যদি ট্রেনটাকে নিয়ন্ত্রন করার কায়দা জানতে পারত।

টিমটিমে আলোর একটা স্টেশনে ট্রেনটার থামার কোনও দরকার ছিল না। তবু থামল। এবং তখনই একজন চেকার উঠে এল। লোকটা চারপাশে তাকিয়ে তার মুখে কি দেখতে পেল কে জানে, সোজা সামনে এসে হাত পাতল, 'টিকিট।'

কামরার অল্প আলোতেও সে দেখতে পেল লোকটার হাতে কোনও রেখা নেই। এটা কী করে সম্ভব? হাতের রেখা তো ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। দু-বছর আগে একজন জ্যোতিষী তাকে বুঝিয়েছিল সুদিন আসতে তার দেরি নেই।

'টিকিট?'

'আমি টিকিট কাটিনি।'

'টিকিট কাটোনি অথচ ট্রেনে চড়েছ? কী আস্পর্ধা। টিকিট কাটোনি কেন?'

'টাকাপয়সা নেই।'

'ক্রিমিন্যাল। ঠান্ডা মাথার ক্রিমিন্যাল। সামনের স্টেশনে তোমাকে নামতে হবে।'

এই সময় মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ওপাশ থেকে বলে উঠলেন, 'এই যে, শ্রীমান, এদিকে এসো। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। এসো।'

বাধ্য হয়ে সুন্দর তার ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাওয়া হবে?'

মাথা নিচু করল সে, 'জানি না।'

'জানো না! বাড়ি থেকে পালিয়েছ নাকি?'

'না থাকতে পেরে চলে এসেছি। মামা—।'

'মা আছেন?'

'হ্যাঁ। মা-ই বলল আসতে।'

'হুঁ। পড়াশুনা কদ্দুর?'

'এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম।'

'বাঃ। একেবারে বিদ্যের হিমালয়। চাকরি করবে?'

সুন্দর ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল। লোকটাকে যেন সে দেখতে পাচ্ছে না।

'আমার কাছে যে ছিল তার ওপর ভরসা করতে পারতাম। একদিনে হবে না, তবে আগ্রহ যদি থাকে তাহলে আমি শিখিয়ে নেব। এই ধরো ব্যান্ডেজ বাঁধা, ওষুধগুলো এগিয়ে দেওয়া,

ডিসপেনসারির দরজা খোলা-বন্ধ, ঝাঁট দেওয়া। এগুলো প্রথমদিকে। এর সঙ্গে আমি ইনজেকশন দেওয়াও শিখিয়ে দেব পরে। রাজি?'

সে মোলায়েম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'নিন চেকারমশাই, ওর টিকিটের দাম আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

চেকার এবং আরও কয়েকজন এইসব সংলাপ অবাক হয়ে শুনছিল। চেকার বলল, 'কিন্তু এটা কি ঠিক করছেন? চেনাজানা নেই একটা উটকো লোককে হুট করে চাকরি দিয়ে দিলেন। ও তো চোর ছ্যাঁচোড় হতে পারে!'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'হতে পারে। তবে উটকো লোকের সুবিধে হল দু-বার ভাবতে হয় না। একবারই দূর করে দেওয়া যায়।'

বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে শীত করছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্দর বলল, 'নেই।'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে তাকে দেখলেন, 'বৃষ্টিতে ভিজতে কে বলেছে?'

'খেয়াল ছিল না।'

'এবার সর্দি হবে, জ্বর আসবে। আমাকে জ্বালানোর মতলব? এসব ছ্যাঁচড়ামি আমার এখানে চলবে না। মাংস নেই মানে?'

'আপনার মাংস নেই।'

হঠাৎ হো-হো করে হাসতে লাগলেন ডাক্তার, 'সত্যি কথা, চর্বিগুলো বেড়ে গিয়ে মাংস বোধহয় কমে যাচ্ছে। ঝটপট শুকনো জামাপ্যান্ট পরে আয়।'

তা এখানে মাস তিনেক হয়ে গেল। এখন সে ওষুধগুলো চিনে গিয়েছে বললে একটু মিথ্যে বলা হবে। তবে বেশিরভাগ ওষুধ সে চেনে। ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে। ডাক্তারবাবু সেটা নিজের হাতে শিখিয়েছেন। এক-এক প্রয়োজনে আলাদা-আলাদা ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজ বাঁধতে সুন্দরের খুব ভালো লাগে। পরতে-পরতে জড়িয়ে যায়; কোথাও বেঢপ উঁচু হয়ে থাকে না। ডিসপেনসারির দায়িত্ব তার। রাত্রে এখানেই শোওয়া। সেটা অবশ্য আর-এক জ্বালা। মাঝরাত্রে কেউ দরজায় এল, 'খুলুন, খুলুন, ছেলের এই হয়েছে, মেয়ের তাই হয়েছে।' খুলতে হয়। তারপর ভেতরের দরজায় আওয়াজ করে ডাক্তারবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে সমস্যার সমাধান। কয়েকদিন আগে রাত-গভীরে ঠিক ওইরকম ধাক্কা। যেন পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? না, পরিবারের সকাল থেকে পাতলা পায়খানা হচ্ছিল, এখন একেবারে জল ছিটকাচ্ছে। শোনার পর ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর লোকটা অনেকক্ষণ ধরে বই পড়েন। একবারে ঘুম আসতে চায় না। লোকটাকে ডাকতে মায়া হল। তার মনে পড়ল শরীরের ওই অবস্থায় ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়ে থাকে তা সে জানে। বাঁদিকের তাক থেকে দুটো বড়ি বের করে নিয়ে এসে দরজা খুলে সে আগন্তুককে দিল, 'এখনই একটা খাইয়ে দাও, পরেরটা চারঘণ্টা পর। নুন-চিনির জল ছাড়া কিছু খাবে না। বুঝেছ?'

পরের দিন দুপুরে সেই লোকটি হাজির। ডাক্তারবাবু তখন রুগি দেখছিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি ভগবান। দুটো বড়ি দিলেন তাতেই আমার পরিবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জলের মতো পায়খানা হচ্ছিল, 'কী বিশ্রী গন্ধ! আর হচ্ছে না। তা জিজ্ঞাসা করছি, শেষ বড়ি তো ভোরবেলায় পড়েছিল, আর কী দিতে হবে?'

'যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।'

'ওষুধ তো আপনিই দিয়েছেন। কাল অনেক রাত্রে এসে ডাকলাম, আপনার নতুন লোক ভেতর থেকে ওষুধ এনেছিল, 'এঃ, সব ভুলে গেছেন।'

ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'সুন্দর।'

কাজটা ঠিক হয়নি কিনা বুঝতে পারছিল না সুন্দর। একটু অস্বস্তি নিয়ে সে সামনে গেল। ডাক্তারবাবুর গলা শান্ত কিন্তু কীরকম অচেনা, 'কী ওষুধ দিয়েছিস?'

সুন্দর বাঁদিকের তাক থেকে ওই ধরনের বড়ি এনে দেখাল। মাথা নাড়লেন ডাক্তারবাবু, 'ঠিক আছে। আর যখন হয়নি তখন খাওয়ানোর দরকার নেই। তবে একটা কাছে রাখ। যদি দ্যাখো আবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তখন খাইয়ে দিয়ো। আর হ্যাঁ, আজ কোনও সলিড খাবার নয়।'

'সে তো ঠিকই। কাল আপনি যেমন বলেছিলেন তাই দিচ্ছি।'

'কী বলেছিলাম?'

'নুন-চিনি জল।'

'ও। না, আজ একটু চিঁড়ে ভিজিয়ে একেবারে কাদা করে দিয়ো।'

শেষ রুগিকে দেখে ডাক্তারবাবু আবার ডাকলেন। কাছে যেতেই প্রচণ্ড একটা চড় এসে পড়ল গালে। সুন্দরের স্বাস্থ্য ভালো। গত তিনমাসে সেটির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবু ওই চড়ের আঘাত সামলাতে না পেরে অনেকটা টলে গেল। ডাক্তারবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'হতচ্ছাড়া বদমাশ, ডাক্তার হয়েছ? ডাক্তার হওয়ার শখ? আমাকে না জানিয়ে ওষুধ দেওয়া? ওষুধের একটু হেরফেরে মানুষের প্রাণ চলে যায় তা জানিস! অনেক কষ্ট, ধারধোর করে ডাক্তারি পড়েছি আমি। আর তুই দু-দিনের জন্যে এখানে এসে আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিস!'

'আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।'

'তাতে তোর কী! নরনারায়ণের সেবা করতে এটা খুলেছি? ঘুমাচ্ছি বলে সেটা বন্ধ থাকবে নাকি? আর কক্ষনও যদি কোনও ওষুধ আমার অজান্তে কাউকে দাও তাহলে আমি জেলে ঢুকিয়ে দেব। দূর হ।'

মানুষের উপকার করলে ওইরকম ব্যবহার পাবে? সুন্দরের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানা বন্ধ হওয়ার পর সে স্নান-খাওয়া করতে গেল না। এখন প্রায় পড়ন্ত দুপুর। চারধার খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তারখানার সামনে একটা বড় বটগাছের নিচে বসেছিল সে। ডাক্তারবাবু যখন তাকে মারল তখন সে পালটা আঘাত করতে পারত। তার শরীরেও যে শক্তি আছে তা বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কথাটা সে সময় মাথায় আসেনি। এখন আসতে লাগল। ডাক্তারবাবু আর যাই হোক মামার মতো নয়। লোকটার মধ্যে ভালোবাসা আছে এটা সে টের পায়। ডাক্তারবাবুকে পালটা মারার কথা মনে এসেছে বলে এখন খারাপ লাগল। কিন্তু কথাটা ঠিক, ডাক্তারবাবু অন্যায় করেছে। ওইভাবে মারা ঠিক হয়নি। সে তো ভালো কাজই করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা তো হল, সে যদি খুব কষ্ট করে ডাক্তার হতে পারত! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। যার ওষুধে যে-কোনও অসুখ সেরে যাবে। ডাক্তারবাবু ভালো কিন্তু অনেকের অসুখ সারাতে পারেনি। চারজন মানুষকে সে জানে যারা এই তিনমাসে শুধু ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, কোনও উপকার হয়নি। ডাক্তারবাবুকে লোকে ভগবান বলে কিন্তু ওঁর ওষুধ খেয়েও তো বাজারের এক দোকানদার মরে গেল। তবে? সে যদি ডাক্তার হত তাহলে পৃথিবীর কেউ মারা যেত না, এমনকী মামার যে অসুখটা এখন বাড়ছে সেটাও সারিয়ে দিত। কিন্তু কী করলে সেরকম ডাক্তার হওয়া যায়?

গত দু-তিন বছরে সে কম চেষ্টা করেনি। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে কোনওমতে দশ টাকা জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এক্সট্রা স্ট্রং মাদুলি এসেছিল। সেটা পরে মনে হয়েছিল পৃথিবীতে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। মামাতো ভাই খবরটা ফাঁস করে দিতে মামা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে ছিল টাকা নষ্ট করার জন্যে। মাদুলিটা কোনও কাজেই লাগেনি। বর্ধমান শ্মশানের কাছে একজন সাধুগোছের লোক এসেছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে সে গিয়েছিল লোকটার কাছে। তার প্রার্থনা শুনে লোকটা দু-লাইন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। দিনে এক হাজার বার ওই মন্ত্র জপ করলে কাজ হবে। তারপর যার দিকে তাকাবে সে-ই বশীভূত হবে। ঠিক এক হাজার বার জপ করার পর সে

একটা ষাঁড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। ষাঁড়টা হঠাৎ তেড়ে এল তার দিকে। সে বড় চোখে তাকিয়েও যখন ওটাকে বশীভূত করতে পারল না তখন প্রাণ বাঁচাতে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। আগেকার কাল হলে সে সাধনায় বসত। গায়ে উইপোকার ঢিবি গজিয়ে গেলেও আসন ছেড়ে নড়ত না। যখন তার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বর দিতে আসতেন তখন টুক করে সেটা চেয়ে নিত। কিন্তু এখনকার কালে কেউ সাধনা করে না। মহা মুশকিল।

জগদীশ এল, 'ডাক্তারবাবু ডাকছেন।'

'কেন?'

'তোর জন্যে সবাই বসে থাকবে নাকি? নাওয়া-খাওয়া করবি না?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'সেটা তুই নিজের মুখে বলে আয়।' জগদীশ ফিরে গেল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে।

রান্নাঘরের বারান্দায় আসন পেতে ডাক্তারবাবু খেতে বসেছিলেন। এইভাবেই খাওয়া ওঁর অভ্যেস। এই মফস্বল শহরে ওঁর খাওয়া নিয়ে লোকে গল্প করে। আমের সময় সব খাওয়ার পর কুড়িখানা আম খেয়ে নেন। এককেজি মাংস একাই শেষ করে ফেলতে পারেন। অথচ এসবের জন্যে ওঁর শরীর কখনও খারাপ হয় না।

উঠোনে দাঁড়িয়ে সুন্দর দেখল ডাক্তারবাবু মাছের মুড়ো খাচ্ছেন। এতবড় মুড়ো এর আগে কারও পাতে দেখেনি সে। তাকে দেখলেন ডাক্তারবাবু। সমুদ্র শুষে নেওয়ার মতো মুড়োর ঘিলু শুষে বললেন, 'ইডিয়ট। আমার ওপর রাগ করে তুই নিজের পেটকে কষ্ট দিচ্ছিস? তোকে চড় মেরেছি কারণ শাস্তিটা তোর প্রাপ্য ছিল। তাই বলে না খেয়ে কাকে কষ্ট দিচ্ছিস? যা স্নান করে নে, আজ রান্নাটা জব্বর হয়েছে। পেট পুরে খেয়ে ফ্যাল।'

অনেক কথা মাথায় এসেছিল কিন্তু বলতে পারা গেল না।

সেই বিকেলে ডিসপেনসারি খোলার আগে ডাক্তারবাবু তাকে ডাকলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার মনে হচ্ছে তোর আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তাই তো?'

সুন্দর জবাব দিল না। চট করে কিছু বলা ঠিক নয়।

'তোর মুখ-চোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। তা বাবা, মতলবটা খুলে বলো।'

'আমার এইভাবে থাকতে ভালো লাগে না।'

'কীভাবে?'

'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই।' বলার সময় আচমকা মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

'শ্রেষ্ঠ মানুষ? বাঃ। খুব ভালো। স্বপ্ন দেখতে হলে বড়সড় দেখাই ভালো। তা কীরকম শ্রেষ্ঠ মানুষ? মিস্টার ইউনিভার্স? পৃথিবীর সেরা শরীর?'

সুন্দর একঝলক ভেবে নিয়ে মাথা নাড়ল, 'অনেকটা।'

'অনেকটা আবার কি রে? বলো, পুরোটা। শোন, সবার সেরা তো এমনি-এমনি হওয়া যায় না। তোকে তার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। সকাল বিকেল কারও কোচিং-এ কঠোর অনুশীলন করতে হবে। তা মিস্টার ইউনিভার্স হওয়ার জন্যে যে বয়স থেকে ওটা করতে হয়, সেটা প্রায় পেরিয়ে এসেছিস। তবু চেষ্টা কর। কলকাতায় গিয়ে মনোতোষ রায় মশাই-এর কাছে ভরতি হ। আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখিস এটা খেলা নয়, কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা। আর এসব করেও শেষপর্যন্ত যে তুই মিস্টার ইউনিভার্স হবি এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। নইলে রানার্স আপ পদটা থাকবে কেন? তাকেও তো একই সাধনা করতে হয়।'

'তারপর?'

'তারপর? পুলিশে চাকরি করবি। না হলে অন্যদের ব্যায়াম শেখাবি। তারপর শরীর বুড়িয়ে গেলে বলবি আমি একসময় মিস্টার ইউনিভার্স হয়েছিলাম। ব্যস!'

'না। আমি ওরকম হতে চাই না।'

'অ। কীরকম চাও?'

'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হব। যা চাইব তাই করতে পারব।'

'তাহলে তোমাকে নীলগাইয়ের দুধ খেতে হবে।' ডাক্তারবাবু খুক-খুক করে হাসলেন।

'নীলগাইয়ের দুধ?'

'হুঁ। সেটা এমনি খেলে চলবে না। বাঁটে মুখ লাগিয়ে খেতে হবে। আর খাওয়ার সময়টা ঠিক রাতদুপুরে জ্যোৎস্না ফুটলে। পারবি?'

'পারব। কিন্তু নীলগাই কী জিনিস?'

'গরু। তবে আমাদের চারপাশের পোষা গরুদের মতো নয়। তারা জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় দলবেঁধে। জ্যোৎস্না রাতে তাদের শরীর থেকে অদ্ভুত নীলচে আভা বের হয়। স্বপ্ন আর জাগরণ একাকার হয়ে যায়। মাকে টাকা পাঠিয়েছিস?'

'অ্যাঁ?'

'এ মাসে মাইনে পেয়ে মাকে টাকা পাঠিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ। আমি বলি কী, প্রতি রাত্রে স্বপ্নে নীলগাই দেখার চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত সেটা না দেখবে ততদিন এখানেই কাজ কর। সামনের সপ্তাহে আমি ইনজেকশন দেওয়া শিখিয়ে দেব। যাঃ।'

রাত্রে ঘুম আসছিল না। চোখের সামনে শুধু নীলগাই তার বাঁটভরতি দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারবাবুর গোয়ালে যে সাদা গোরুটা দুধ দেয় তাকে দেখে এসেছে। বাঁটে মুখ দিতে গেলে ও লাথি মারতে চাইবে বটে তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হওয়ার জন্যে ওরকম লাথি খাওয়া যায়।

পর-পর তিনটে রাত সে ঘুমাল অথচ স্বপ্ন দেখল না। স্বপ্নই যখন দেখা হল না তখন নীলগাই অনেক দূরে থেকে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, যদি সে কোনওদিন স্বপ্ন না দেখে তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যাবে। সে জগদীশকে একা পেয়ে প্রশ্ন করল। জগদীশ মাথা নাড়ল, 'নীলগাই? তারা তো এখানে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'তুই বরং হারান মাস্টারকে জিজ্ঞাসা কর। ও ঠিক ঠিকানা বলে দেবে।'

অগত্যা হারান মাস্টারের শরণাপন্ন হল সুন্দর। হারান মাস্টার মাথা নাড়ল, 'তারা থাকে পাহাড় আর সমতলের মাঝখানে। বেশি উঁচুতে নয় আবার নিচুতেও নামে না। তবে সেই পাহাড়ের বুকে যদি নদী থাকে আর শীতকালে তার জল শুকিয়ে যায় তাহলে নীলগাইয়ের দল সেই নদীর চরে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসে।'

'কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

'ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকার উত্তর ভাগে, ব্রাজিলে এবং কিছু-কিছু দেখা যায় অস্ট্রেলিয়াতেও। ম্যাপ দেখবে?'

'আমাদের এখানে পাওয়া যায় না?'

'নিশ্চয়ই যাবে। যাবে না কেন?'

পাহাড়। কোনখানে? কোন ট্রেন সেখানে যায়? স্টেশনে গিয়ে খবরটা পেতেই আর কিছু মনে রইল না। পকেটে কিছু নেই, পুঁটলিটা ডিসপেনসারির কোনায়, কী-এক ঘোরের মধ্যে সে ট্রেনে উঠে বসল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ যখন টনটন করছে তখনই দিগন্তে পাহাড়ের রেখা দেখা গেল। ধীরে-ধীরে আরও স্পষ্ট হচ্ছিল পাহাড়। ছোট স্টেশনে ট্রেন থামছে, হাঁপাচ্ছে, আর সুন্দরের মনে হচ্ছিল কতক্ষণে ছাড়বে। পাশের লোকটাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই পাহাড়ে

ট্রেনটা কতক্ষণে পৌঁছবে?'

'পাহাড়ে তো ট্রেন যায় না। পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'সে কী!' সুন্দর হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল।

আজ তার দিকে কোনও কালো কোট পরা মানুষ হাত বাড়াল না। ট্রেন চলে গেলে সে হাঁটা শুরু করল। আধ ঘণ্টা হাঁটতেই সে পাহাড়ের নিচে। পাথুরে হলেও পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আছে। শেষ দেহাতি লোকটাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই পাহাড়ে কী নীলগাই আছে?'

'জানি না বাবু। তবে অনেককিছু আছে।'

'নদী আছে? নদীর চর?'

'নাঃ। তবে খুব বড় দিঘি আছে একটা।'

পাহাড়ের বুকে দিঘি? সুন্দরের মনে হল নদীর চরে যদি নীলগাই বেড়াতে আসতে পারে তাহলে দিঘির ধারে আসবে না কেন? সে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস না থাকলেও সে দ্রুত উঠছিল। ক্রমশ লোকালয় হারিয়ে গেল। পাখির ডাক আর বাঁদরের চিৎকার ছাড়া কোনও শব্দ নেই। দুপুর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খিদে-তেষ্টায় শরীরের শক্তি ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল, এসবই তার পরীক্ষা। সাধনার পথে এভাবেই পরীক্ষা দিতে হয়।

হঠাৎ তার খেয়াল হল। এখন কি চাঁদ ওঠার রাত? গতরাতেও বৃষ্টি হয়েছিল। তার আগে? জ্যোৎস্না দেখেছে বলে মনে হয় না। অথচ চাঁদের রাত হওয়া দরকার। এই বনপাহাড়ে নীলগাই যদি থাকে তাহলে সে অপেক্ষা করবে চাঁদের জন্যে। কথাটা যদি আগে মাথায় আসত তাহলে সময় বুঝে আসা যেত।

এতটা পথ পাহাড়ে-জঙ্গলে হেঁটে এল কিন্তু কোনও প্রাণীর দেখা সে পায়নি। এই জঙ্গল কী প্রাণীশূন্য? বাঁদর আছে, মানে গাছে ফল আছে। কিন্তু বড়সড় জন্তুরা থাকবে এমন কথা নেই। সে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিলের ধারে একটা পাথরে ঠেস দিতেই প্রশ্নটা ভেসে এল, 'অ্যাই? কে তুই?'

চমকে পেছনে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুলে জটা পাকিয়ে চুড়ো হয়ে আছে। পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা ত্রিশূল। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। মহিলার চোখদুটো খুব বড় এবং জ্বলছে। সে ভয় পেয়ে গেল। বর্ধমানের শ্মশানে একজন ভৈরব তাঁর ভৈরবীকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে এসেছিল। সেই ভৈরবী এমন ভয়ঙ্কর সুন্দরী ছিল না। হ্যাঁ, সুন্দরী তো বটেই। গায়ের রং ফরসার দিকে, শরীর টানটান এবং লম্বা। ডানহাতে একটা পুঁটুলি।

'কে তুই?' আবার গর্জন ভেসে এল।

'আমি সুন্দর।' সে মিনমিনে গলায় বলল।

'সু-ন্দ-র!' বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন ভৈরবী। তারপরই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মতলব কি? এখানে এসেছিস কেন?'

'কেন? এখানে আসা কি বারণ?'

'হ্যাঁ বারণ। এ তল্লাটের সব্বাই জানে। মড়া পোড়ানো ছাড়া কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। মতলববাজদের পেট ফুঁড়ে দিই আমি। আমাকে চিনিস?'

'আজ্ঞে না। আমি বর্ধমানে থাকি।'

'বর্ধমান! সে তো অনেক দূর। এখানে কেন?'

সুন্দর বুঝল তার পরিত্রাণ নেই। তাঁরপরই খেয়াল হল। এই ভৈরবী যদি এখানে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জানেন নীলগাই এই পাহাড়ে আছে কিনা, সে হাতজোড় করল, 'আমি কোনও অন্যায় করতে আসিনি। আপনি বলোতে পারেন, এই পাহাড়ে নীলগাই আছে কিনা! আমার খুব দরকার!'

'নীলগাই? কীসের দরকার?'

'একটা সাধনা আছে।'

'সাধনা? ফক্কিবাজি! মিথ্যে বললে দেব তোর জিভ খসিয়ে।'

'আমি নীলগাইয়ের বাঁট থেকে দুধ খেতে চাই।'

'অ্যাঁ? কেন?'

'সেটা বলা নিষেধ।'

'তিনকুলে কেউ আছে?'

'না। কেউ নেই।'

'এখানে থাকা হয় কোথায়?'

'এখনও থাকিনি। ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে এসে পড়েছি।'

'ট্রেন। সে তো অনেক দূর।'

'আজ্ঞে নীলগাই কি আছে?'

ভৈরবী তার ত্রিশূল আর পুঁটুলি পাথরের উপর রাখলেন। চোখ বন্ধ করে কিছু বিড়-বিড় করে হাঁকলেন, 'অ্যাই লব, অ্যাই কুশ।' সঙ্গে-সঙ্গে দুটো প্রমাণ সাইজের হনুমান ঝুপ-ঝুপ করে কোথা থেকে পাথরের ওপর এসে পড়ল। ভৈরবী বললেন, 'এরা খুব রাগি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেখানেই থাকবি। নড়বি না। আমি স্নান করে আসি।' বলেই আলখাল্লা-সমেত জলে নেমে গেলেন। গুনে-গুনে আটবার ডুব দিলেন ভৈরবী। তাঁর জটাপাকানো চুলে জল ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। তারপর কোমরজলে উঠে এসে পট করে আলখাল্লাখানা খুলে ফেললেন এদিকে পেছন ফিরে। তাঁর নগ্নপিঠ কোমর হাত-মুখের চেয়ে ঢের ফরসা। জলের ওপর আছাড় মেরে আলখাল্লা কাচলেন তিনি। তারপর সোজা উঠে এলেন ওপরে। মুখে মন্ত্র। চিৎকার করে বলা শব্দগুলো যেন তাঁকে আড়াল করে রাখছিল। এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সুন্দর। জীবনে প্রথমবার সে একজন নগ্নিকাকে দেখল। কিন্তু নারীদেহের সম্পদ তাকে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করল না।

'সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দাও।'

মুখ ফেরাল সুন্দর। শুকনো আলখাল্লাটা নিশ্চয়ই পুঁটলিতে ছিল। সেটি এখন অঙ্গ ঢেকেছে। ভেজাটা পুঁটলিতে নিয়ে ত্রিশূল হাতে ভৈরবী এখন দাঁড়িয়ে।

'কেন এসেছিস?'

'নীলগাইয়ের দুধ খাব বলে এসেছি।'

'নীলগাইয়ের দুধ?'

'হ্যাঁ। জ্যোৎস্নারাতে নীলগাইয়ের দুধ খেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া যায়।'

'নীলগাইয়ের দুধ কে এনে দেবে তোকে?'

'আনা দুধ খেলে হবে না। বাঁটে মুখ লাগিয়ে খেতে হবে।'

ভৈরবী তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন, 'পেটে কিছু পড়েছে?'

'না।'

'আয় আমার সঙ্গে। পেছন-পেছন আসবি। বেশি কাছাকাছি এলে লব-কুশ তোকে ছিঁড়ে ফেলবে। ভীষণ শয়তান এ দুটো।' ভৈরবী হাঁটতে শুরু করলেন।

পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল সে ভৈরবীকে অনুসরণ করে। ওদের মাঝখানে হনুমানদুটো রাশভারী মেজাজে হাঁটছে। একটা মাঝে-মাঝেই পেছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে দাঁত দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা চাতাল গোছের জায়গায় উঠে এল ওরা। চাতালের একপাশে ছোট্ট বাখারির ঘর যার মাথায় টিন দিয়ে ছাদ তৈরি। ভৈরবী সেখানে গিয়ে প্রণাম করল। সুন্দর দেখল ঘরের মধ্যে কালীমূর্তি রয়েছে। ছোট্ট কিন্তু ভয়ঙ্করী। এই মায়ের পায়ের তলায় শিব

নেই, হাতে খড়্গ। যেন যুদ্ধে মত্ত তিনি। ভৈরবী বললেন, 'মাকে প্রণাম কর।'

সে আদেশ মান্য করল। তারপর চারপাশে নজর ফেলতেই বেশ কয়েকটা জায়গায় পোড়া ছাই দেখতে পেল। কাঠে আগুন দিলে এমন ছাই হয়।

ভৈরবী হাসলেন, 'কী দেখছিস? ওগুলো চিতা। গ্রামের লোক মড়া নিয়ে এসে এখানে পোড়ায়। মায়ের সামনে। সব শালা স্বর্গে যাবে। হুঁ! আমাকে যে ভৈরব এখানে এনেছিল, সে-ই নিয়মটা চালু করেছিল। চিতায় আগুন দেওয়ার পর সবাইকে নেমে যেতে হত এখান থেকে। সেই সময় ভৈরব মড়ার মাথা চিতা থেকে বের করে ঘিলু খেত। তারপর পুরো ছাই হয়ে গেলে লোকজনদের ডেকে অস্থি দিয়ে দিত। ভৈরব মরে যাওয়ার পর আমি আত্মীয়স্বজনদের চিতার কাছে থাকার অনুমতি দিয়েছি। ওসব ঘিলু-ফিলু খাওয়ার কথা ভাবলেই গা গোলায় আমার। আয়।'

চাতালের একপাশে পাথরের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে ওপরে উঠতেই গুহা দেখতে পেল সুন্দর। ভৈরবী বললেন, 'এখানে কোনও পুরুষের ওঠা নিষেধ। ভৈরব মারা যাওয়ার পর শুধু তোকেই নিয়ে এলাম। ওখানে জল ধরা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নে, আমি দেখি তোকে কি দিতে পারি।' ভৈরবী গুহার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

একটা বড় ড্রামে জল রয়েছে। তাই দিয়ে মুখ হাত-পা ধুতে শরীর একটু জুড়াল সুন্দর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। অনেকটা ওপরে বলে বিল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমনকী বিলের ধারের গাছগাছালিও! চোখ জুড়িয়ে যায়। তারপরই খেয়াল হল, ভৈরবীর সঙ্গে এখানে চলে আসাটা কী ভালো হল? ওরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে। তাকে যদি বশ করে ফেলে! কামাখ্যা বলে একটা জায়গায় নাকি মানুষকে ছাগল বানিয়ে দেয় মন্ত্র পড়ে। সে হনুমানদুটোকে খুঁজল। নিচের চাতালে বসে একজন আর একজনের শরীর থেকে পোকা বাছছে। ওরা মানুষ নয়, মন্ত্র পড়ায় হনুমান হয়ে গেছে। কীরকম ছমছম করতে লাগল শরীর।

'আয়। এদিকে আয়।' ভৈরবীর গলা ভেসে এল।

একটা কলাইয়ের থালাভরতি ভাত আর কিছু সেদ্ধ। একপাশে নুন। ভৈরবী নিজেও তাই নিয়েছে। ভৈরবী বললেন, 'আমি এই খাই, খেতে হয় খা, নইলে রেখে দে।'

'মাছ-মাংস খাওয়া হয় না?'

'ও আবার কী ধরনের কথা! হয় না। হয় তুমি বলবি, নয় আপনি। আমি তোর চেয়ে বয়সে ঢের বড়। তিরিশ হয়ে গেল, এর মধ্যে তিন-তিনটে ভৈরব পার করেছি।' খেতে-খেতে ভৈরবী বলছিলেন, 'তা অস্বীকার করব না, তিনজনের কাছে অনেককিছু শিখেছি। মাছ-মাংস! মড়ার মাংস খেতে হয়েছে আমাকে, শুধু ঘিলুটা পারিনি। তুই যদি খেতে চাস তাহলে বিল থেকে মাছ ধরে আন, জঙ্গলে খরগোশ, বনমুরগি আছে, ধরে নিয়ে এলে নুন-হলুদ দিয়ে ফুটিয়ে দেব। কিন্তু আমি নিরামিষ খাই।'

'আমি ধরে আনব?'

'তোকে তো দিন-দশেক এখানে থাকতেই হবে। তারপর চাঁদ উঠবে। হ্যাঁ, নীলগাই এখানে আছে। দলবেঁধে বের হয়। তদ্দিন তো পেটে দিতে হবে।'

এতক্ষণে স্বস্তি হল। এই বিস্বাদ খাবারও ভালো লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে একা থাকতে তোমার ভয় লাগে না?'

'দূর! ভয় করব কাকে? উলটে লোকেরাই আমাকে ভয় পায়। এর পর রাত্রে খেতে হবে নাকি? আমি বাপু রাঁধতে পারব না। আমার রাতের ভাত তোকে দিয়ে দিলাম। দুটো পেয়ারা আছে, খিদে পেলে খেয়ে নিস।'

খাওয়ার পর ভৈরবী ভেতরে চলে গেলেন। শরীরটা এখন শান্ত। সে বিলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। ছায়া ঘন হয়েছে। একটু পরেই আঁধার নামবে। হঠাৎ নাকে কটু গন্ধ লাগল। বাতাসে

ভেসে আসছে। গন্ধটা কীসের? সে উঠল। চারপাশে নাক টেনে বুঝল ওটা আসছে গুহার ভেতর থেকেই। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে দেখল ভৈরবী বাবু হয়ে বসে দু-হাতে কলকে ধরে টান দিচ্ছেন। গাঁজা খাচ্ছেন ভৈরবী। তাকে দেখামাত্র হেসে ইশারা করলেন কলকে দেখিয়ে। সে দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বড় হয়ে গেল আরও। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভৈরবী কড়া গলায় বললেন, 'তিনটে টান দে। এখানে থাকতে হলে আমি যা-যা খাব তাই তোকে খেতে হবে।' তারপর হালকা হাসলেন, 'কোনও ক্ষতি হবে না। বরং মন হালকা হবে। শরীরে বল পাবি। খা।'

কাঁপা হাতে কলকে নিল সুন্দর। ভয়ে-ভয়ে একটা টান দিতেই কাশি এল। ভৈরবী বললেন, 'গলার কাঁটা সরছে। দে টান, জোরে-জোরে।'

তিনটে টানেই অবস্থা কাহিল। কোনওমতে কলকে ফিরিয়ে দিয়ে সে একপাশে বসে পড়ল। মাথা ঘুরছে, নাকী পৃথিবীটা! চোখ খুলে রাখতে পারছিল না সে।

'তোকে নীলগাই এমনি-এমনি বাঁটে মুখ রাখতে দেবে? তার জন্যে অনেককিছু শিখতে হবে। আমার কথা শুনে চললে সেসব আমি শিখিয়ে দেব। এখন শুয়ে পড়।'

এত ঘুম সে কোনওদিন ঘুমায়নি। চোখ মেলতেই কানে শব্দ আসতে লাগল। মন্ত্র পড়ার শব্দ। এখনও আকাশে পাতলা অন্ধকার। ভোর হব-হব। সে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল। তারপর উঠে এগোতেই নিচের চাতালে নজর গেল। মায়ের মন্দিরের সামনে কাঠের আগুন জ্বেলে বসে আছেন ভৈরবী। বসার ভঙ্গিটায় শরীর আরও টানটান দেখাচ্ছে।

ওপাশে কিছু লোক নিভে আসা চিতাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ভৈরবী মন্ত্র পড়ে চলেছেন। শ্মশানযাত্রীদের কেউ চিতায় জল ঢাললে শব্দ হল আগুন নেবার। এবং তখনই মন্ত্রপাঠ শেষ হল।

ভৈরবী বললেন, 'যাঃ। ওর আত্মা আর এখানে থাকবে না। অস্থি নিয়ে তোরা বিদায় হ এবার।'

আগুন নিবিয়ে অস্থি সংগ্রহ করে লোকজন নেমে গেল। রাতেও কখন কোনওসময় মড়া নিয়ে লোকজন এসেছিল, ভৈরবী নেমে গিয়েছিল, তা সে টের পায়নি। অদ্ভুত ঘুম হল তার।

সুন্দর নিচে নেমে আসতেই ভৈরবী বললেন, 'কী খবর? মশাইয়ের ঘুম ভাঙল। এখন এই বস্তাটা ওপরে নিয়ে যাও। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, নুন যা আছে তাতে আমার এক-দেড় মাস সচ্ছন্দে চলে যেত। এখন তো মুখ বেড়েছে তাই মা আগেভাগে পাইয়ে দিল।'

সুন্দর বস্তাটা তুলল। বেশ ভারী।

সারাটা সকাল ভৈরবী পড়ে-পড়ে ঘুমাল। এর মধ্যে সুন্দর জঙ্গলের অনেকটা ঘুরে এসেছে। বনমুরগি আর খরগোশ চোখে পড়লেও ধরার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আচমকা তার চোখ পড়ল জঙ্গলে কলাগাছের দিকে। বাঁদরদের নজর এড়িয়ে কী করে কলাগুলো অত পুরুষ্ট হয়ে রয়েছে, ভগবান জানে! সে টেনে হিঁচড়েও কলার কাঁদি ছিঁড়তে পারছিল না। এইসময় হুপ-হুপ শব্দ হল। সুন্দর দেখল কয়েকটা হনুমান গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে আসছে। সে দৌড়োল। এদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও অস্ত্র তার কাছে নেই।

কিছুদূর আসার পর খুব আপশোস হল। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চায় অথচ কয়েকটা হনুমানকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা নেই। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল সে। গুহায় ফেরার অনেকক্ষণ বাদে ভৈরবীর ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরে হাত তুলে যখন আলস্য ভাঙছেন ভৈরবী, তখন হঠাৎ বুকের মধ্যে কী যেন নড়ে উঠল সুন্দরের। ভৈরবীর ঊর্ধ্বাঙ্গে এখন অনেক স্থির-ঢেউ।

'কী রে? মন খারাপ করে আছিস কেন?'

সে শুকনো গলায় বলল, 'আমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?'

'মন্ত্র? কীসের মন্ত্র?'

'মানুষ, প্রাণীকে বশ করার মন্ত্র?'

'দূর শালা! তোর আর এখানে থাকার দরকার নেই। যা, বিদায় হ।'

'কেন? আমি কী অন্যায় বললাম?'

'তোর কোনও যোগ্যতা আছে মন্ত্র নেওয়ার?' ভৈরবী চিৎকার করলেন।

'তুমি যদি শিখিয়ে দাও!'

ভৈরবী এবার অদ্ভুত চোখে তাকাল। চোখ সরিয়ে নিল সুন্দর। ওরকম অদ্ভুত চাহনির সামনে সে কখনও দাঁড়ায়নি। প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে ভৈরবী বললেন, 'প্রমাণ দে যে তোর যোগ্যতা আছে।'

'কীভাবে দিতে হবে?'

'নিজের প্রস্রাব খেতে পারবি?'

সুন্দরের মনে পড়ল। কোনও এক নেতা নাকি তাই খেতেন। লোকে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। সেই লোকটা সংসারে থেকে যদি কাজটা করতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন? সুন্দর মাথা নাড়ল, 'পারব।'

'বাঃ। আমারটাও? অন্য লোকেরটা? পারবি?'

উত্তরটা জিভে আসছিল না। ভৈরবী বললেন, 'নিজেরটা করা ঢের সহজ। স্বার্থপর হলে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দে।'

এখন এখানে মেঘ নেই তাই বাইরে শুতে অসুবিধে নেই। বিলের জলে স্নান আর নিরামিষ খাওয়া। ভৈরবী তার সঙ্গে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলেন না। তিনি যে সারারাত জেগে থাকেন মন্দিরের সামনে, তা সে দ্বিতীয় রাতেই টের পেয়েছিল। এখন রাতেরবেলায়, একরকম কিন্তু দিন কাটতেই চায় না সুন্দরের।

কিন্তু কাটল। দেখতে-দেখতে চাঁদের রাত চলে এল। প্রথমে ফিনফিনে জ্যোৎস্না। বিলের ধারে সারারাত জেগে দাঁড়িয়েও নীলগাইয়ের দর্শন পেল না সে। কিন্তু যেদিন পূর্ণচন্দ্র সেদিন বিকেলে ভৈরবী বেশ বদল করলেন। আজ তাঁর পরনে টকটকে লাল শাড়ি। গায়ে জামা নেই। সুডৌল কাঁধে অদ্ভুত মায়া। ভৈরবী বললেন, 'আজ পূর্ণিমা।'

সুন্দর বলল, 'কিন্তু নীলগাইয়ের যে দেখাই পাচ্ছি না।'

'ওরা ওদের মতো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ধৈর্য না রাখতে পারলে কিছুই পাওয়া যায় না। তোমার কপাল ভালো থাকলে আজ রাত্রেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে।'

সন্ধ্যার আগেই জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে গেল। রুপোর টাকার মতো চাঁদ লাফিয়ে উঠল আকাশে। ঘর-খোঁজা পাখিরা হা-হা রবে উড়ে গেল ডানায় হাততালির শব্দ তুলে। সুন্দর এই মায়াময় বনানীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়।

গাছে-গাছে পাখিদের নীরবতা নেমে এল। জ্যোৎস্নায় পাহাড়-জঙ্গল এখন সিনেমার মতো সুন্দর। সুন্দর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সন্ধে পেরিয়ে রাত ঘন হল। মশার কামড় উপেক্ষা করতে আর পারছিল না সে। হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দ হল। বিলের ওপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে নীলগাইয়েরা নেমে আসছে বিলের দিকে। সেখানে পৌঁছাতে হলে এই বিল সাঁতরে পার হতে হয়। বর্ধমানের পুকুরের সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা নিয়ে জলে নামল সে। প্রথম-প্রথম তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত হাতে-পায়ে টান ধরল। কোনওরকমে বিল পার হয়ে মুখ তুলতেই সে নীলগাইয়ের দেখতে পেল। অদ্ভুত গোটা কুড়ি বলশালী প্রাণীর সঙ্গে তিনটে শিশু ঘুরছে। জলে দাঁড়িয়েই সে শিশুদের লক্ষ করতেই তাদের মায়েদের দর্শন পেয়ে গেল। একটা বাচ্চা মাঝে-মাঝেই ছুটে গিয়ে বাঁটে মুখ রাখছে। এই স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় যেন আকাশ থেকে নেমে আসা পরীরা তার সামনে। কোনওমতে কাছে পৌঁছে বাঁটে মুখ রাখলেই স্বর্গলাভ। জল ছেড়ে উঠল সুন্দর। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল নীলগাইরা। সতর্ক চোখে তারা দেখল সুন্দরকে। কয়েক মুহূর্ত। তারপর দৌড় শুরু হল। ঝড়ের গতিতে ফিরে যাচ্ছে

তারা। সুন্দর দৌড়োতে লাগল। একটা বাচ্চা তাল রাখতে পারছে না। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সেটা। দৌড়ে কাছে গিয়ে তাকে তুলতেই সুন্দর দেখতে পেল মা নীলগাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর উলটো দিকে ছুটে আসতে লাগল সেটা। এই জ্যোৎস্নায় তার ভরা বাঁট চোখে পড়ল সুন্দরের। কিন্তু একই সঙ্গে আত্মরক্ষার তাগিদে সে বাচ্চাটাকে ঠেলে দূরে সরে এল। বাচ্চাটা এবার মায়ের দুধ খাচ্ছে। মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিন্তু দৃষ্টি সুন্দরের দিকে।

ওই দুধ খেতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। সুন্দর পায়ে-পায়ে এগোল। সঙ্গে-সঙ্গে মা নীলগাই হাঁটা শুরু করল বাচ্চাটাকে নিয়ে। মরিয়া হয়ে ছুটে গেল সুন্দর আর তখনই প্রচণ্ড একটা লাথি তার শরীরটাকে ছিটকে দিল।

তখনও জ্যোৎস্না রয়েছে কিন্তু নীলগাইয়েরা নেই। ডানপায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। উঠে দাঁড়াতে সময় লাগল। রক্ত ঝরছে পা থেকে। ওই অবস্থায় জলে নামল সে। এই বিল পেরিয়ে তাকে ফিরতে হবে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে গুহার অন্ধকারে। সমস্ত শরীরে চাপ। সে নড়ে উঠতেই ভৈরবী বললেন, 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। তোমার শরীরের সব যন্ত্রণা আমি নিচ্ছি।'

'কী করে?'

'এমনি করে।'

সে টের পেল। ভৈরবী তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছেন। এবং ভৈরবীর শরীরে কোনও কাপড় নেই। তার ডানপায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। কী করে সে বিল পার হল, এখানে এসে তার কিছুই এখন মনে পড়ছে না। সে শুধু বলল, 'পারলাম না।'

'পারবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

'দেবে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ তুমি সুপ্ত ছিলে। এখন জেগেছ। কেমন লাগছে?'

'ভালো।' যন্ত্রণা উপেক্ষা করল সে।

'আমার শরীর টের পাচ্ছ?'

'হুঁ।' বলামাত্র ভৈরবীর শারীরিক সম্পদ তাকে বিদ্ধ করল। সমস্ত শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

ভৈরবী বলল, 'নিজেকে সংযত করো। শরীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চোখ বন্ধ করে মায়ের মুখ স্মরণ করো। তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন।'

অথচ সমস্ত শরীরে প্রতিবাদের ঢেউ। সুন্দর নিজেকে সংযত রাখার জন্যে মা কালীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। এ কি! মায়ের জিভ বাইরে বের করা নেই। সেটা ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় মাকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। ভিন্নতর আবেগ আরও উসকে দিচ্ছে তপ্ত রক্তধারাকে।

আগামী পূর্ণিমায় আবার নীলগাইয়েরা পাহাড় বেয়ে নেমে আসবে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন স্বপ্নের নীলগাই জ্যোৎস্নায় জল খেয়ে যাবে। কিন্তু সুন্দরের সামনে এখন আগুনের রথ। ভৈরবী তার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিয়েছে। জীবনে কখনও যে নীলগাইয়ের দুধ খায়নি তার তো আগুনের রথেও চড়া হয়নি।

এই সময় ভৈরবী ফিসফিসিয়ে বলল, 'কাকে চাই? নীলগাই না আমাকে?'

ভৈরবী ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। হেসে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। এর নাম সাধনা। আমার ভৈরবরা এই সাধনাই আমাকে শিখিয়ে গেছেন। আবার সামনের পূর্ণিমায় আমরা এই সাধনায় বসব। কেমন।'

ভৈরবী নেমে গেছেন নিচে। তাঁর পুজো শুরু হয়ে গেল।

শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। মৃতদেহের মতো পড়েছিল সুন্দর। আশ্চর্য, আচমকা তার রক্ত

একেবারে শান্ত হয়ে গেল। বদলে এক অবসাদ।

নীলগাইয়ের লাথি আর ভৈরবীর হঠাৎ উঠে যাওয়া যেন একই যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিয়ে গেল তার শরীরে। পূর্ণিমা আসবে এক মাস পরে। তদ্দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে তাকে।

দুটো পথই একই লক্ষ্যে গিয়েছে।

কিন্তু ভৈরবী তাকে অগ্নিরথের সন্ধান দিতে পারে।

নীলগাইরা সেটা কখনও পারবে না।



আকাশের আড়ালে আকাশ

মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটতে-ছুটতে ট্রেনটা বিকেল শেষ করে দিল। জানালায় বসে রোদ মরে যেতে দেখেছিল সে, ছায়া গাঢ় হতে-হতে ঘোলা পৃথিবী। ছুটন্ত ট্রেন থেকে অনীক সূর্য-হারানো পৃথিবীর শরীর চুঁইয়ে বেরনো অন্ধকারকে অনুভব করতে পারল এক সময়। পর-পর এইসব পরিবর্তন দেখতে-দেখতে অদ্ভুত বিষণ্ণ আরামে আক্রান্ত হয়ে গেল সে। অনীক জানালায় মাথা রেখে চাঁদ উঠতে দেখল।

আর তখনই পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল। গাছগাছালি, মাঠ আর অপূর্ব নীল আকাশকে স্নান করাতে সোনার থালার মতো চাঁদ পৃথিবীর সামান্য ওপরে গুঁড়ি মেরে উঠে এসেছে। একদম নিটোল নারীর মতো চাঁদ। এই মুহূর্তে নিজের শরীরের আলোয় সে আলোকিত। এমন উদাসীনা নারীর খবর একমাত্র শুক্লপক্ষই দিতে পারে। ক্রমশ সেই তিরতিরে জ্যোৎস্নায়ভেজা অলৌকিক প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একটা তীব্র আকর্ষণ অনীকের বুকে পৌঁছে গেল। এমন এক মায়াময় ভুবন পৃথিবীতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে অথচ সে ট্রেনের কামরায় নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদে বসে—এ হতে পারে না। মানুষ শত চেষ্টা করলেও এক জীবনের বেশি বাঁচতে পারে না। যা কিছু প্রয়োজন তা যত জরুরিই হোক, সেই জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়। অতএব নিয়ম ভাঙতে যে ক্ষতি তার জন্যে তোয়াক্কা করে কী লাভ। ট্রেনের গতি কমতে-কমতে এক নাম-না-জানা স্টেশনে ক্ষণিকের জন্যে জিরোতেই অনীক নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্ম না বলে ইটবাঁধানো চত্বর বলাই সঙ্গত।

নামামাত্রই ট্রেনটা নড়ে উঠল। তারপর যেতে হয় তাই যাচ্ছি এমন ভঙ্গিতে আলোকিত কামরাগুলো একে-একে চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আর কেউ কি নেমেছেন এই স্টেশনে অথবা এখান থেকে ওই ট্রেনে কেউ কি চলে গেল? বোঝা গেল না এই মুহূর্তে, কারণ শূন্য রেললাইনের পাশে বাঁধানো চত্বর ফাঁকা। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিশেল এখানে তেমন জমেনি স্টেশনবাড়ির পিছনে গাছগাছালি থাকায়। অনীক এগিয়ে গেল। স্টেশন বলতে দু-খানা ঘর। তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকে দেখছিল এক প্রৌঢ়। বললেন, তিনিই স্টেশনমাস্টার। দ্বিতীয় কর্মচারীটির শরীর খারাপ বলে আসেনি। এরপর আর কোনও ট্রেন এই স্টেশনে থামবে না। অতএব ঝাঁপি বন্ধ করে চলে যাবেন তিনি রেলের দেওয়া বাসায়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের গন্তব্য কোথায়?'

অনীক মাথা নাড়ল। তার কী অর্থ তা সে নিজেই জানে না। স্টেশনমাস্টার যেন অদ্ভুত

কিছু দেখলেন। অনীক উলটে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চায়ের দোকান আছে?'

'দোকান? খেপেছেন? কিনবে কে? আমার সংসারের যা কিছু দরকার তা সুরজগঞ্জ থেকে নিয়ে আসি। পাক্কা দশ মাইল। কিন্তু এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা বুঝলাম না।'

'উদ্দেশ্যবিহীন। যেতে-যেতে ভালো লেগে গেল তাই নেমে পড়লাম। আপনি আপনার কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে যান, আমি একটু চারপাশ ঘুরেফিরে দেখি।' অনীক এগোতে চাইল।

স্টেশনমাস্টার পাশে এলেন, 'চারপাশে ঘুরবেন মানে? কিস্যু দেখার নেই এখানে। আমরা কি নিঃসঙ্গ, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। স্টেশনের পাশে বাসা বলতে আমার দুটো ঘর, রামবিলাস থাকে এখানেই, এই অফিসঘরে। তারপর আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবেন না আপনি। এই রাতেরবেলায় মানুষজনের মুখ দেখতে পাবেন না!'

'আমি তো সেইরকম আশা করেই ট্রেন থেকে নেমেছি।'

উন্মাদ-দর্শনের সুখ থেকে ভদ্রলোককে বঞ্চিত করে অনীক অফিসঘরের পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ডান হাতেই স্টেশনমাস্টারের দু-ঘরের বাসা। চারপাশে লম্বা-লম্বা গাছ থাকায় ফালি-ফালি জ্যোৎস্না তার গায়ে নকশা এঁকেছে। এত চুপচাপ চারধার যে দু-কান পরিষ্কার হয়ে যায়। অনীক দেখল একটা না বাঁধানো পথ চলে গেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। ওই পথেই তাকে যেতে হবে। স্টেশনমাস্টারের বাসায় হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। এই সময় হলুদ শাড়িপরা একজনকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে দেখল সে। মুখচোখ দেখা যাচ্ছে না দূরত্বের কারণে যতটা তার চেয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে।

'চায়ের দোকানের খবর নিচ্ছিলেন, এক কাপ চা না হয় আমার এখানেই খেয়ে যান। কথা বলার লোক তো এসময় পাই না, একটু গপ্পো করা যাবে।' কথা শেষ করেই সম্মতির অপেক্ষা না করে হাঁকলেন, 'ওগো, এই ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হবে।'

বারান্দা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কেন?'

একটাই শব্দ কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণে কীরকম অর্থবহ হয়ে উঠল। অনীক কৌতূহলে মহিলাকে দেখতে চাইল। এইরকম একটা প্রশ্ন শুনতে পাবে তা কল্পনায় ছিল না। স্টেশনমাস্টার যে বেশ বিব্রত তা তাঁর গলার স্বরে স্পষ্ট, 'না, মানে এখানে তো কোনও চায়ের দোকান নেই।'

'এখানে তো কোনওকিছুই নেই।' চটজলদি কথাগুলো ভেসে এল।

'তুমি অমন করে বলছ কেন? ভদ্রলোক আমাদের এই জায়গা দেখতে ট্রেন থেকে নেমে এসেছেন। এখানে থাকার জায়গা নেই। চায়ের কথা বলছিলেন—তাই—'

'আমাদের জায়গা মানে? তুমি এখানে থাকতে চাও না, আমি চাই, আমার জায়গা।'

'বেশ, তাই হল। আসুন ভাই।' স্টেশনমাস্টার এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ অনীক ঠিক করেছিল সে এখানে চা খাবে না। হয়তো স্টেশনমাস্টার প্রায়ই লোক ধরে আনেন চা খাওয়াবার জন্যে আর সেই কারণে ভদ্রমহিলা বিরক্ত। অতএব একজন উটকো মানুষকে তিনি চা না খাওয়াতেই পারেন। কিন্তু ওই যে কথাটা, আমার জায়গা, অনীককে আকর্ষণ করল। একজন প্রৌঢ় স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী ওই জ্যোৎস্নাক্রান্ত চরাচরকে নিজের জায়গা বলে মনে করছে শোনার পর তাকে কাছে গিয়ে দেখার লোভ হল ওর।

মহিলা একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন। অনীক কাছাকাছি হতেই বুঝল তিনি সুশ্রী আর বয়স কখনওই পঁচিশের বেশি নয়। অসমসাহসী স্বামী-স্ত্রী সে অনেক দেখেছে কিন্তু এঁদের স্বামী-স্ত্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না এই মুহূর্তে। মহিলার গৌরবর্ণের সঙ্গে হলুদ শাড়ি চমৎকার সঙ্গত করছে। প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখানে চায়ের দোকান নেই বলে উনি আপনাকে চা খেতে ডেকেছেন। আপনার আর যা-যা প্রয়োজন তা এখানে মেটানোর ব্যবস্থা নেই বলে উনি কী আমাকে তার আয়োজন করতে বলবেন?'

স্টেশনমাস্টার চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'ছিঃ রাণু, এসব কী বলছ?'

অনীক মাথা নাড়ল, 'আপনাকে চা করতে হবে না।'

'কেন হবে না?'

'আপনার ইচ্ছে নেই বলে।'

'বাঃ, আপনি খুব ভালো। ভালো লোককে চা খাওয়াতে আমার আপত্তি নেই। বসুন।'

রাণু নামের মহিলা পাখির মতো পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার হাসলেন, 'যাক, নরম হয়েছে। এমন সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করে যে—।'

ওঁর কথা শেষ হল না, রাণু ফিরে এলেন, 'আপনি মতলববাজও হতে পারেন।'

'কি বলছ তুমি?' স্টেশনমাস্টার প্রতিবাদ করলেন।

'থামো! কতক্ষণ চেনো তুমি ওঁকে? এই যে আমার ইচ্ছে নেই বলে চা করতে নিষেধ করলেন, এটাও তো প্ল্যান করে বলতে পারেন। ওটা বললে আমি গলে গিয়ে চা বানিয়ে আনব।' রাণু যেন শিউরে উঠলেন, 'ঠিক ওই ভুলটাই করতে যাচ্ছিলাম।'

'আপনাকে একটুও বিব্রত হতে হবে না। আমার চায়ের দরকার নেই। আচ্ছা, আসি।'

অনীক চলে যাওয়ার জন্যে ফিরতেই রাণু এগিয়ে এলেন, 'দাঁড়ান। আমি বিব্রত হচ্ছি কে আপনাকে বলল? আমি বলেছি আপনাকে?'

'না, আপনার কথা শুনে মনে হল।'

'বাঃ। আপনার দেখছি অন্য কোনও বোধ বেশ কাজ করে। চমৎকার।'

অনীক চমকে উঠল। এই লাইনটি যে মেয়ে ওইভাবে উচ্চারণ করতে পারে সে নিপাট সাধারণ নয়। এখন চাঁদের তেজ বাড়ছে। রাণুর মুখচোখ অনেকটা স্পষ্ট।

ওঁর গলা বেশ লম্বা, কাঁধ চওড়া। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ। প্রচলিত সুন্দরী নয় কিন্তু ভালো লাগা তৈরি হয় কিছুক্ষণ থাকলেই।

'যাকগে! আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

'প্ল্যান করে আসিনি। ট্রেনের জানালা থেকে জায়গাটা দেখে ভালো লেগে গেল।'

'লাগবেই। এটা আমার জায়গা। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ওই ভৈরবীর কথা শুনেছেন?'

'ভৈরবী। কে?'

'অভিনয় করছেন না তো?'

'বিশ্বাস করুন। আমি জ্যোৎস্নায় ডোবা গাছগাছালি আর নির্জনতা দেখে নেমে পড়েছি।'

'তাহলে ভালো। আপনি গাছ চেনেন?'

'কিছু-কিছু?'

'আপনার সঙ্গে আমার এর আগে দেখা হয়েছিল।' রাণু এক পা এগিয়ে এলেন।

'আমার সঙ্গে?' অনীক এবার বিব্রত। এমন কথা-বলা-মহিলাকে সে কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না। অথচ ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সামনেই স্বাভাবিক গলায় ঘোষণা করলেন, দেখা হয়েছিল। স্টেশনমাস্টার সমাধানের চেষ্টায় বললেন, 'উনি কোথায় থাকেন জানলে তুমি বুঝতে পারবে সেখানে কখনও গিয়েছিলে কিনা।'

'আমি আগে গিয়েছিলাম কিনা, তা উনি কী করে জানবেন? সেটা আমি বলতে পারি। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি এর আগে দেখেছি। বসুন।' রাণু চলে গেলেন ভেতরে। স্টেশনমাস্টার বারান্দাতেই বসার ব্যবস্থা করলেন।

অনীক খুব ফাঁপরে পড়েছিল। ভদ্রমহিলাকে সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। মানুষের শরীর সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বদলায়। কিন্তু কতটা পরিবর্তন হলে এত অচেনা মনে হবে?

'বেশ চকমকে জ্যোৎস্না, কি বলেন?' কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখল অনীক।

'আমি জানি।' ভদ্রলোক নিচুগলায় বললেন।

'জানেন?'

'বুঝতেই পারছেন, কথাবার্তায় একটু—, আসলে নির্জনে একা থাকতে-থাকতে—।'

স্টেশনমাস্টার কোনও কথাই পুরোটা বলেন না।

'আপনি কী অ্যাবনর্ম্যালিটির কথা বলছেন?'

'ঠিক তা নয়, আবার অনেকটাই।'

'তাহলে তো ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'কোথায় যাব? ছুটি চাইলে পাওয়া যায় না যে, শহরে গিয়ে দেখাব। আবার দিনেরবেলায় ও খুব নর্ম্যাল। কথাবার্তা কম বলে কিন্তু কোনও ত্রুটি পাবেন না।'

'বিয়ের পর থেকেই এইরকম?'

'এইরকম মানে এমন সব প্রশ্ন করে যা সাধারণ মানুষ করে না। এই তো, গতকাল আমাকে বলল ওর সঙ্গে যেন রাত্রে কথা না বলি কারণ গাছেরা ওর সঙ্গে আলাপ করবে সারারাত ধরে, আর আমাকে নাকি ঠাকুরদা বলে মনে হচ্ছে ওর।' বলেই সামান্য হাসলেন ভদ্রলোক, 'বয়সের ব্যবধান তো আছেই। লেট ম্যারেজ। গরিবঘরের মেয়ে বলে ওকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। নইলে কত ভালো বিয়ে হত ওর।'

'বিয়ে কতদিন হয়েছে?'

'বছর সাতেক। একেবারেই বালিকা ছিল। মামারা রাজি হয়ে গেল। বাপ-মা নেই।'

'সন্তান?'

'নো। আর এখন তো নো চান্স!' অদ্ভুত উদাস গলায় বললেন স্টেশনমাস্টার।

'নিন। খেয়ে দেখুন। একেবারে গ্রাম্য চা।' এক কাপ চা হাতে রাণু ফিরে এলেন। কাপটা এগিয়ে ধরলেন অনীকের সামনে।

'এর দরকার ছিল না।'

'সেটা আমি বুঝব। নেবেন না ফেলে দেব?'

অগত্যা নিতে হল অনীককে। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি?'

স্টেশনমাস্টার হাতজোড় করলেন, 'না-না। আমি চা পান করি না।'

অনীক তাকাল। পৃথিবীতে এখনও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চা, কফি, পান, ধূমপান, অথবা মদ্যপান করেন না। ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে বেশ বেঁচে যান যে ক'দিন পারেন। কোনওকিছু হারাচ্ছেন বলে তাঁদের ধারণাও নেই। স্টেশনমাস্টারের মুখে তেমন সারল্য আছে।

চা শেষ করতে হল তাড়াতাড়ি। ওঁরা চুপচাপ দেখছিলেন যেন পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। কাপ ফিরিয়ে দিয়ে অনীক বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন রাণু, 'কোথায়?'

'একটু ঘুরে বেড়াই।'

'দাঁড়ান, আমরাও যাব। আপনি তো এখানকার কিছুই চেনেন না। নতুন জায়গায় কেউ চিনিয়ে না দিলে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। এক মিনিট।' কাপ হাতে রাণু দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন।

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'দুর! রাত-বিরেতে জঙ্গলে-মাঠে ঘুরতে আমার একদম ভালো লাগে না।'

'বেশ তো, আপনারা থাকুন, আমি চলি।'

'আপনি আচ্ছা লোক। আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে আপনি বাইরে ঘুরে বেড়াবেন। এখন

যদি বলি যাব না তাহলে সাতদিন অশান্তি চলবে। বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা বুঝবেন না।'

স্টেশনমাস্টারের কথা শেষ হওয়ামাত্র রাণু বেরিয়ে এলেন। স্টেশনমাস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবে তো?'

'চলো।'

অনীক দেখল এরা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ এটা এমন জায়গা যে চুরি করতেও কেউ আসবে না। সে দেখল যে রাস্তাটা মাঠঘাট পেরিয়ে স্টেশনের গায়ে পৌঁছেছে সেটা না ধরে সরু পায়ে-চলা পথ বেছে নিলেন রাণু। তিনিই আগে হাঁটছেন। চাঁদ এখন বেশ ওপরে উঠে এসেছে। অল্প-স্বল্প বাতাস বইছে। ছোটবড় গাছগুলোর ফাঁক গলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রয়েছে ঘাসে।। এইরকম সময়ে সঙ্গে দুজন মানুষ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কীভাবে এদের সঙ্গ এড়ানো যায়? এই সময় স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কতদূরে যাব?'

রাণু বললেন, 'আমরা তো যাচ্ছি না। আমরা ঘুরছি।'

অনীক মুখ খুলল, 'আমার জন্যে আপনারা মিছিমিছি পরিশ্রম করছেন।'

রাণু বললেন, 'দূর! আপনার জন্যে কেন, আমি শুক্লপক্ষের রাত্রে ঘুমাই না। সারারাত জ্যোৎস্না দেখি, ভোরবেলায় খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিনভোর ঘুমাই।'

অনীক অবাক হয়ে তাকাল। আজ পর্যন্ত কোনও নারী এমন কথা বলেছে বলে সে শোনেনি। স্টেশনমাস্টার বললেন, 'একটু বসলে হয় না। ওখানে সুন্দর একটা কালভার্ট আছে।'

'তোমরা বসতে পারো। আপনি বসবেন?'

অনীক মাথা নেড়ে না বলতেই রাণু খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভালো। এতদিনে একজন ভালো সঙ্গী পাওয়া গেল। চলুন।'

অনীক দেখল স্টেশনমাস্টার সোৎসাহে তাঁর কালভার্টের দিকে এগোলেন। এমন নির্জন রাত্রে কোনও পুরুষ নিজের স্ত্রী-কে একদম অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারে? কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে? সিনেমায় হয়।

'আপনি হিজল গাছ দেখেছেন?'

'দেখেছি।' পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে অনীক বলল, 'জলের ধারে হয়।'

'তাই বলুন। এখানে কোথাও জলাভূমি নেই, এমনকী পুকুরও। অথচ আমার হিজল দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আপনার এখন কি ইচ্ছে করছে?'

অনীক তাকাল। জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত শরীর নিয়ে রাণু হেঁটে যাচ্ছেন। সে বলল, 'যতটা পারি এমন একটা রাতকে বুকে ভরে নিতে।'

'আপনি ভেবেছিলেন যে এই নির্জন জ্যোৎস্নায় আমার মতো একজনকে একা পাবেন?'

'না, ভাবিনি।'

'পেয়ে কেমন লাগছে।'

'আর-এক ধরনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।'

'কীরকম?'

'এক উপভোগ করার আনন্দ।' হঠাৎ খেয়াল হল অনীকের ঝোলাটার কথা। চেয়ারে ফেলে এসেছে।

'আপনি দেখছি স্বার্থপর।' রাণু মাথা নাড়লেন, 'আমার ইচ্ছে, কবি লিখেছেন, শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে আমরা চলিতে চাই—।'

হাত তুলে থামিয়ে দিল অনীক, 'এখানেই থামুন। ভাবতে ভালো লাগবে। তার পরের লাইনটা

আমার মোটেই পছন্দ নয়। মরবার কোনও বাসনা আমার নেই।'

'বাঃ। আপনি দেখছি বেশ শিক্ষিত।'

'কবিতা পড়া শিক্ষিতের লক্ষণ কিনা জানি না।'

'কিন্তু ওটা কোন মরণের কথা কবি লিখেছেন? তারপরে যেতে চাই মরে। মরতে চাই না, যেতে চাই মরে। বুঝলেন মশাই! আপনি মরণ বুঝবেন না। কখনও-কখনও প্রবলভাবে জীবন পাওয়ার উপলব্ধিতে মরণ বলতে সুখ হয়।'

বিস্ময় বাড়ছিল অনীকের। অভাবগ্রস্ত এক পরিবারের বাপ-মা-হারা কোনও অনাথ কিশোরীকে আত্মীয়স্বজন যখন বয়স্ক কোনও পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় তখন ধরেই নেওয়া যায় একমাত্র শরীর ছাড়া তার বিকাশ অন্যত্র হয় না। অথচ রাণু যে কথা বলছেন তা অশিক্ষিতের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম আলাপে যে বিভ্রম জাগছিল এখন তা মোটেই নেই।

'আপনি এখানে কবিতার বই পান?'

'মানে?'

'আপনার কথার সূত্রে জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি খুব অশিক্ষিত। ছেলেবেলায় পড়ার বইতে যেসব কবিতা থাকে তার বাইরে কিছু পড়িনি। অনেকদিন আগে, তখন আমরা অন্য স্টেশনে থাকতাম, এক ভদ্রলোক ওয়েটিং রুমে একটা বই-এর প্যাকেট ফেলে গিয়েছিলেন। উনি সেই প্যাকেট আমাকে এনে দেন। তাতে জীবনানন্দ দাশের তিনটে কবিতার বই ছিল। এত বছর ধরে ওগুলোই পড়ি।'

'পড়ে বুঝেছিলেন?'

'ঠিক বুঝিনি। একটু-একটু ভালো লাগছিল। বারংবার পড়তে-পড়তে অন্যরকম মানে মনে এল। তারপর এখানে আসার পর মনে হল ও-সবই আমার কথা। পৃথিবীতে আরও অনেক কবি অনেক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো বিশ্বকবি। কিন্তু আমার কাছে ওই তিনটে বই এত বড় যে বোধহয় এক জীবনে বুঝে উঠতে পারব না। চাঁদটাকে দেখুন।'

অনীক তাকাল। একচিলতে কালচে মেঘ গোল চাঁদের মাথায় জড়িয়ে আছে। মানুষ যতই চাঁদে হেঁটে বেড়াক, পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। রাণু হাসলেন, 'কলঙ্ক আপনার কেমন লাগে?'

'একটু-আধটু থাকলে মন্দ হয় না। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, জীবনানন্দের তিনটি বই ছাড়া আপনি এখন পর্যন্ত আর কারও কোনও লেখা পড়েননি?' অনীকের বিস্ময় যাচ্ছিল না।

'না। পড়ার সুযোগ তো কখনও হয়নি। তা ছাড়া এই তিনটে শেষ না করে অন্যের বই পড়ি কি করে?' রাণু চাঁদের দিকে মুখ তুললেন।

'আপনার এখনও শেষ হয়নি?'

'না। আসলে আমি তো একটা গর্দভ, আজ যে মানে ঠিক করি কাল সেটা বদলে যায়। যেমন ধরুন একটা লাইনের কথা, 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার সাদা মরা শেফালির বিছানার পর।' প্রথম পড়ার সময় মনে হয়েছিল শেফালিকে হেমন্তের মেয়ে হিসেবে কবি ভেবেছেন। গাছেরতলায় শেফালি ঝরে পড়ে আছে, হেমন্ত বিদায় নিচ্ছে। স্টেশনের কাছে কিছু শেফালির গাছ আছে। পুজোর পর এক ভোরে সেখানে গিয়ে বর্ণনা মিলিয়ে নিতে চমকে উঠলাম। কবি লিখেছেন সাদা মরা শেফালির বিছানার ওপরে হেমন্তের শেষ সন্তান রয়ে গেছে। অথচ শেফালির গালচের ওপর আমি কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। পরের দিন গিয়ে চেয়ে থাকতে ফুলগুলো যেন চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি যেন স্পষ্ট ফুলের বিছানার ওপর হিমশীতকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। বাড়িতে এসে ওঁকে বললাম। উনি ভাবলেন আমার মাথা আরও খারাপ হয়েছে। আসলে এসব কাউকে বোঝানো যায় না।' কথা বলতে-বলতে রাণু হঠাৎই উদাস হয়ে গেলেন। আর এই সময়

ওঁকে খুব একলা বলে মনে হচ্ছিল অনীকের। সে মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই একটা অদ্ভুত গাছ দেখতে পেল। গাছটার শরীর বিশাল কিন্তু কোনও পাতা নেই, ফুল-ফল তো দূরের কথা। যেন আকাশটাকে জালের মতো শুকনো ডাল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে।

রাণু বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, মরা গাছ? মোটেই না। আমি এখানে আসার পর থেকেই গাছটাকে ওই অবস্থায় দেখছি। কোনও পাতা দেখিনি কখনও অথচ ডাল মরেনি।'

জ্যোৎস্না ওর সর্বাঙ্গে কিন্তু তবু গাছটাকে অসুন্দর দেখাচ্ছে। রাণু বললেন, 'দেখেছেন?'

অনীক দেখেছিল। একেবারে উঁচু ডালে একটা পাখি বসে আছে। তার গায়ের রং বেশ ধূসর। গোল মুখ ঘুরিয়ে তাকানোর ভঙ্গিতে পরিচয় বোঝা গেল। এত কাছ থেকে গাছে প্যাঁচা বসে থাকতে অনীক কোনওদিন দেখেনি। আরও একটু হাঁটতে কিছু লম্বা ঘাসের জঙ্গল দেখা গেল। কোমর পর্যন্ত বড়জোর। রাণু বললেন, 'ওখানে কয়েকটা খরগোশ আছে। দেখবেন?'

'কীভাবে দেখা যায়?'

'বসে থাকতে হবে চুপচাপ। রাত ফুরিয়ে যাওয়ার আগে দেখা পেলেও পাবেন।'

'আপনি বসে থাকেন নাকি?'

'মাঝে-মাঝে। গত সপ্তাহে দেখে গেছি একটা খরগোশের বাচ্চা হবে।'

অনীক রাণুর দিকে তাকাল।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর, জ্যোৎস্নায় চুপচাপ মাখামাখি হওয়ার পর রাণু বললেন, 'দাঁড়ান।'

অনীক দেখল গাছটা অতি সাধারণ। কিন্তু তার তলায় একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে, রাণু উবু হয়ে দেখলেন। বাসায় ডিম ছিল, ভেঙে গেছে। রাণু উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন, 'আমাদের আগে জীবনানন্দ এসব দেখে গেছেন, 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা শিশিরে গিয়েছে ভিজে, পথের উপর পাখির ডিমের খোলা, ঠান্ডা—কড়কড়।' উঃ, এই কড়কড় শব্দটা যে কি মারাত্মক শূন্যতা তৈরি করে। হাত দিয়ে দেখুন ডিমে, টের পাবেন।'

'হাত না দিয়েই টের পাচ্ছি।'

'তাই? আপনারা পণ্ডিত লোক তো, সব অনুভবে বুঝতে পারেন। আমি এত কম বুঝি যে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে হয়।' রাণু হাঁটতে শুরু করলেন আকাশের দিকে মুখ তুলে।

তারপর হঠাৎ আঙুল তুলে বালিকার মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন দেখুন।'

অনীক দেখল অনেকদূরে প্রায় অস্পষ্ট একটা কিছু উড়ে যাচ্ছে।

'কি দেখলেন?'

'পাখিটা।'

'উঃ, আজ আকাশে একতিল ফাঁকাও নেই নক্ষত্রদের জন্যে আর আপনার পাখিটার দিকে নজর গেল? আজ নিশ্চয়ই সব মৃত, নক্ষত্র জেগে উঠেছে। আচ্ছা, প্রেমিক চিল-পুরুষ দেখেছেন আপনি?' গলায় অদ্ভুত আবেগ এল রাণুর।

'না। চিলদের কে নারী কে পুরুষ আমি আলাদা করতে পারি না।'

'জীবনানন্দ করেছিলেন। প্রেমিক চিল-পুরুষের চোখ শিশিরভেজা হয়। শিশির-ভেজা কিন্তু ঝলমলে। ওই সমস্ত নক্ষত্রের মতো।' একটু চুপ করে রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কখনও প্রেম করেছেন?'

'প্রেম?'

'না, না। এই গাছপালা বা পাখির সঙ্গে নয়, মানুষের সঙ্গে?'

হেসে ফেলল অনীক, 'না!'

'আপনি বিয়ে করেননি?'

'এখনও সুযোগ হয়নি।'

'ও। ধরুন, যদি আপনি কখনও প্রেম করেন তাহলে কেন তা করবেন?'

'প্রেম কেউ কী করে? শুনেছি ওটা আপনা-আপনি এসে যায়।'

'আশ্চর্য! একটা মানুষকে দেখে আপনার মনে আপনা-আপনি প্রেম এল আর হাজার মানুষকে দেখে তা এল না, তাই তো? তাহলে ওই একজনের কী বিশেষত্ব?'

'বলতে পারব না।'

'আমিও বুঝতে পারি। এই যে প্রতিদিন যে ট্রেনগুলো স্টেশনে এসে দু-মিনিটের জন্য দাঁড়ায়, তার জানালায় কত মানুষের মুখ। আমি রোজ তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখি কিন্তু একবারও কাউকে দেখে মনে প্রেম আসেনি।'

'আপনি তো বিবাহিতা?'

'তাতে কী হল?'

'আপনার স্বামীর জন্যে নিশ্চয়ই—'

'একটুও না। ওকে বিয়ের সময় যখন দেখি তখন আমি কিছুই ভাবিনি। পরে একসঙ্গে থাকতে-থাকতেও মনে প্রেম এল না। আমার কাছে ও কখনও বাবা, কখনও ভাই, কখনও বন্ধু। ওর জন্যে আমার মনে প্রেম নেই এটা ও জানে কিন্তু তার জন্যে একটুও দুঃখ পায় না। কারণ, আমি যে ওর স্ত্রী এটাই শেষ কথা বলে ভাবে।'

'আপনাকে কেউ প্রেম নিবেদন করেনি?'

'হুঁ, করেছে। আমি বাবা মিথ্যে বলতে পারি না। বিয়ের আগে করেছে, বিয়ের পর দুজন। আর তার জন্যে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেছে।'

'কীরকম?'

'বিয়ের আগে আমাকে যারা প্রেম-নিবেদন করেছে, তাদের বয়েস কারও চল্লিশ কারও পনেরো। একটু একা পেলেই মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলত ওরা। সেটা যে প্রেম-নিবেদন করা তা তখন না বুঝলেও ওরা যে কথাগুলো বলে অন্যকিছু চাইছে, তা টের পেতাম।' রাণু হেসে ফেললেন, 'মেয়েরা অবশ্য অনেক কিছু আগাম টের পায় বলে গর্ব করে কিন্তু এ ব্যাপারটায় আমার ভুল হয়নি। বাপ-মা ছিল না, গরিব মামার কাছে মানুষ, তাই একটু ভয়ে-ভয়ে থাকতে হত।'

'ওরা নিশ্চয়ই কবিতার লাইন বলত না!'

'মাথা খারাপ। একজন ছিল মুদিওয়ালা। আমরা কাকা বলতাম। সে বলত, এই তোর আঙুল কী সুন্দর, চাঁপার মতো। কেউ আমার হাতের প্রশংসা করত, কেউ বলত আমার নাকি হাঁসের মতো গলা। আমার বন্ধুর দাদা বলেছিল, তোর পা-দুখানার যা শেপ, খুব প্রভোকেটিভ। মানে বুঝিনি কিন্তু শব্দটা মনে আছে। আর একজন বলেছিল, তোমার কোমরটা এত সরু যে মুঠোয় ধরা যায়। এরা সবাই আমার চেয়ে বড় কিন্তু কেউ আমার মুখের প্রশংসা করেনি। তাই ওসব শুনলেই বাড়ি ফিরে এসে এক ফাঁকে আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম। মনে হত নিশ্চয়ই আমার মুখ দেখতে খারাপ, না হলে লোকে তো প্রথমে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সেই প্রশংসাও জুটল। পাশের বাড়িতে আমার সমবয়সি কলকাতার একটি ছেলে এসেছিল। সে আড়ালে পেয়ে বলল, তোমার চোখদুটো কী গভীর, দীঘির মতো। আমার খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমি সমস্যায় পড়লাম। এতগুলো মানুষ আলাদা-আলাদা করে হয় আমার আঙুল, নয় হাত-পা, নয় গলা অথবা চোখকে সুন্দর বলছে। এই পুরো আমাকে কেউ সুন্দর বলছে না। একদিন আমার চেয়ে একটু ছোট একজন নিরালায় পেয়ে ফস করে বলল, 'এই তোর বুকে হাত দিতে দিবি? কী সুন্দর বুক তোর! আমার রাগ হয়ে গেল। ছেলেটা বুকের কথা বলেছে বলে যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি ও মিথ্যে বলছে। খেপে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, তুই বুঝলি কী করে আমার গায়ে জামা নেই? ছেলেটা এমন ঘাবড়ে গেল আর কোনওদিন বিরক্ত করেনি। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম, আমার চেয়ে যারা বয়স্ক তারা শরীরের সেইসব

অঙ্গের প্রশংসা করে, যা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু যে আঙুলের প্রশংসা করছে, তাকে আঙুল ধরতে দিলে তাই নিয়ে সারাজীবন বসে থাকবে না। সে সুযোগ পেলেই ঢাকা-শরীরের দিকে এগোবে। এটা বোঝবার পর মনে হল সবাই আমার সঙ্গে ভান করছে। আর তাই কাউকেই আমার ভালো লাগল না।'

চুপচাপ কথাগুলো শুনতে-শুনতে হাঁটছিল অনীক। এত স্পষ্ট গলায় কোনও মেয়ে যে তার উপলব্ধির কথা বলতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি। এখন চাঁদ মাথার ওপর চলে এসেছে। চমৎকার সাদা এক নাম-না-জানা পাখি উড়ে গেল জ্যোৎস্না মেখে। অনীক গল্পের রেশ ধরে রাখতে চাইল, 'বিয়ের পরে?'

'আপনার এসব শুনে কী লাভ?' আচমকা প্রশ্ন করলেন রাণু।

'আপনাকে জানতে ইচ্ছে করছে, তাই।'

'কখন থেকে?'

'মানে?'

'এই জানার ইচ্ছেটা কখন থেকে হয়েছে? আপনি তো আমাদের কোয়ার্টার্সে বসতেই চাইছিলেন না। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর—। ঠিক আছে।'

'না, ঠিক নেই। বিয়ের পর যারা প্রেম-নিবেদন করেছে তাদের বক্তব্য একইরকম। আমার সঙ্গে আমার স্বামীকে মানায় না, আমাকে অনেক-অনেক সুখী করতে পারে তারা যদি স্বামীকে ছেড়ে চলে যাই তাদের সঙ্গে। অথবা স্বামীর কাছেই থাকি আর তারা লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাকে সঙ্গ দেবে।' হাসলেন রাণু। 'আসলে আমরা খুব বোকা। আমরা কেউ বুঝি না সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয় কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি। আমরা কেউ ভাবতে চাই না আমার বুকে প্রেম এল যার জন্যে, তার অনুভূতি কীরকম? সে কি আমাকে চাইছে? শুধু মানুষের বেলায় নয়, এই যাকে আমরা প্রকৃতি বলি, এই জ্যোৎস্না, গাছপালা, ফুল অথবা আকাশ—এরাও কি আমাকে চায়? আমি চাইলেই কী ওদের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল? ওদেরও তো চাওয়া দরকার। আমার স্বামী বলেন, ওদের প্রাণ নেই, থাকলেও বোঝার এবং বোঝানোর ক্ষমতা নেই। কি বোকা-বোকা কথা বলুন তো! আপনি একটা গাছের কাছে রোজ আসুন, তাকে ভালোবাসুন, তার শরীর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দিন, দেখবেন যেই তার আপনাকে ভালো লাগবে, অমনি সে কেমন চনমনিয়ে উঠবে, যা অন্য কেউ এলে হবে না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন রানু। তাঁর চোখ সামনের দিকে। অনীক দেখল মাঠের গায়ে গাছপালার মধ্যে মন্দিরের আদল দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'ওপাশে যাব না।'

'কেন?'

'ওখানে একজন মহিলা থাকেন। লোকে বলে ভৈরবী।'

'ও, ওঁর কথাই তখন বলছিলেন?'

'ভদ্রমহিলা দিনেরবেলায় বের হন না। জ্যোৎস্নারাত্রেও নয়। কৃষ্ণপক্ষের রাতে ঘুরে বেড়ান মাঠে-মাঠে। শুনেছি রাত্রে দেখতে পান।'

'আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারি না। উনি সেই থুরথুরে অন্ধপেঁচার মতো যে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধঝাঁকে জোনাকির মাখামাখি কোনওদিন দেখতে পাবে না. উলটে বলবে, 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে। চমৎকার! ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'

অনীক হেসে ফেলল শব্দ করে। রাণু মুখ ফেরালেন, 'হাসলেন কেন?'

'আমি লাইনটার অন্য অর্থ জানি।'

'যেমন?'

'পরের লাইনে তিনটে শব্দ আছে, তুমুল গাঢ় সমাচার। একটা অন্ধ জরাগ্রস্ত পেঁচার কাছে দু-একটা ইঁদুর ধরতে পারা মানে বেঁচে থাকা। বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করা। পৃথিবীর সমস্ত অশক্ত মানুষ যে সংগ্রাম করছে, এ তারই প্রতিচ্ছবি। জীবনের এই স্বাদ আপনার অসহ্য বোধ হল?'

'এ আপনার ব্যাখ্যা। আপনাদের। আমি এ মানি না।'

'কিন্তু কবিতা শুধু ব্যবহারে নয়, শব্দ থেকে উঠে আসা দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয় মানেতে তার বিচরণ।'

'হয়তো। কিন্তু যে পেঁচা সারারাত জ্যোৎস্নার ফিনিক দেখে মুখ গুঁজে রইল সে চাঁদ ডুবে গেলে ছটফটিয়ে ইঁদুর ধরতে বেরিয়ে আসবে কীসের ইশারায়? তা ছাড়া, মশাই, মনে রাখবেন, ওই পেঁচাটি অন্ধ ছিল। অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত। সে কি করে বুঝবে কখন আলো জ্বলছে অথবা নিবে গেছে?'

অনীক হোঁচট খেল। সত্যি তো। অন্ধ শব্দটি নিয়ে সে কখনও ভাবেনি।

রাণু হাসলেন, 'অন্ধত্ব তাহলে অভ্যেসের কাছে হার মানে, তাই না?'

অনীক আপত্তি জানাল, 'সব পেঁচাই অন্ধ হয়ে যায় আলো জ্বললে। জ্যোৎস্নাও তো আলো, এই যেমন চারপাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পেঁচার কথা থাক, ওই ভৈরবী নিশ্চয়ই অন্ধ এবং থুরথুরে নন?'

'চেহারায় নয়, মনে। নইলে দিনেরবেলায় দেখা যায় না কেন? কোনও জ্যোৎস্নারাত্রে ওকে দেখতে পাই না কেন?'

'হয়তো নিজেকে আড়ালে রাখতে চান।'

'আপনি ওর কাছে যেতে চান?'

'আগ্রহ যে হচ্ছে না তাই বা বলি কী করে?'

'তাহলে এখন ফিরে যান স্টেশনে। অমাবস্যায় আসুন। যখন এইসব চরাচর অন্ধকারে ডুবে যাবে, ডুবে গিয়ে চরিত্র হারাবে, তখন নিজেকে হারান।'

'আপনি অন্ধকারকে খুব ভয় পান, না?'

'আপনি পান না?'

'হ্যাঁ, পাই।'

দু-চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ তুললেন রাণু, 'আচ্ছা, আপনি কীরকম লোক? আমার কি কিছুই আপনার ভালো লাগছে না?'

'নিশ্চয়ই লাগছে।'

'সেটা আমার আঙুল, হাত-পা, গলা, মুখ অথবা বুক নয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সব মিলিয়ে এই আমি, আমাকেই, কিনা? আমাকে নিয়ে কোথাও হারিয়ে যেতে, অথবা আমার সঙ্গে গোপনে আনন্দ করতে নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছে করছে না?' রাণু চোখ খুলছিলেন না।

অনীক একটু ভাবল, তারপর মাথা নাড়ল, 'না।'

'তাহলে?'

'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো লাইনগুলো আবৃত্তি করল অনীক। এ যেন তার কথা, তারই কথা।

চোখ খুললেন রাণু। যেন নক্ষত্রের উজ্জ্বল জলে তার চোখ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। খানিক

আগে যে ধবল পাখি জ্যোৎস্নায় মিশে গিয়েছিল সে যেন কোনও নাম-না-জানা ফুলের ফুটে ওঠার খবর নিয়ে এল। এই তিরতিরে রাত্তিরে, নির্জনতা যখন বড় ভয়াবহ, হাওয়ায় এক অতীন্দ্রিয় কাঁপন টের পেয়ে গাছেরা পুলকিত, এই তারা-জ্বলা-রাতে রাণু এগিয়ে এলেন অনীকের সামনে। বললেন, 'আমি এক সামান্য নারী, তুমি আমাকে অসামান্যা করো।'

মুগ্ধ তো ছিলই, লুব্ধ হল অনীক। রক্তে সর্বনাশের ঝড় উঠল, বুকে গোখরোর ফণা। এখনও সে সেই পুরুষ যার কোনও যোনিচক্র স্মৃতি নেই। প্রতিটি রোমকূপে এখন দাউদাউ চিতা। তবু সে কথা বলল, 'রাত ফুরুলে কী হবে?'

'আপনি চলে যাবেন।'

'আর তুমি?'

হেসে উঠলেন রাণু, 'আমি এইসব গাছপালা, জ্যোৎস্না আর আকাশের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে দারুণভাবে বেঁচে থাকব।'

'আমি যদি না যাই।'

'আপনি রসিকতা করছেন।'

'রসিকতা?'

'একতিল বেশি রাত্রির মতো আপনার জীবন। সেই একতিল কম আর্ত রাত্রি আমি। অতএব আপনার জীবনের কাছে আমি মূল্যহীনা।'

'আমি মানি না। যখনই জ্যোৎস্না ফুটবে, চরাচর এমন স্বপ্নিল হয়ে উঠবে তখনই আমি দু-হাত বাড়িয়ে তোমাকে চাইব।'

'কিন্তু যেই চাঁদ ডুবে যাবে, যখনই অন্ধকার নামবে অথবা ভোরের শিশির শুকিয়ে সূর্য উঠবে তখন আমি ছায়ার মতনও থাকব না আপনার মনে। আর তার জন্যে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। এই এক রাত্রি যত দিতে পারে তাই জীবনভরে নিতে চাই।' স্পষ্ট আহ্বান খোদিত হল রাণুর চোখে-মুখে-শরীরে।

কালো মেঘ যা এতক্ষণ ইতিউতি ছড়িয়ে ছিল, যেন এই কথা শুনে গড়িয়ে এল চাঁদের বুকে, চটজলদি জ্যোৎস্না উধাও। স্লেট রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। চক্ষুষ্মান হয়ে পেঁচা খুঁজে ফিরতে শুরু করল তার রাতের আহার। রাণুর আক্ষেপ শোনা গেল, 'আহ্, এ কেন হল?'

আর তখনই অনীক দেখল। দেখল না বলে দর্শন করল বলা ঢের ভালো। জঙ্গল-ঘেরা মন্দির থেকে একটি মূর্তি চকিতে বেরিয়ে এল মাঠের মধ্যে। দু-হাত আকাশে তুলে যেন সে মেঘগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে চাঁদের বুকে অথবা তাদের আটকে রাখতে চাইল যেমন করে বেয়াড়া সূর্যকে বগলে দাবিয়ে রেখেছিল পবনপুত্র।

অথবা এসবই অনীকের মনে হওয়া। মহিলা মাথার ওপর হাত তুলে আরাম করলেন। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেলেন ঝোপের আড়ালে। মিলিয়ে যাওয়ার আগে মনে হল তিনি বসে পড়লেন। ওই কালচে আলোয় চারপাশ বেশ অস্পষ্ট। অনীক রাণুর দিকে তাকাল। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ভৈরবীর উপস্থিতি তিনি জানেন বুঝতে অসুবিধে হল না। সেই মুহূর্তেই দূরের ঝোপের আড়ালে মূর্তিটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। মাথা এবং কাঁধ প্রথমে দৃশ্যমান হওয়ার পর শরীরটা বেরিয়ে এল। অনীকের মনে হল ভৈরবীর কোনও রহস্য নেই। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাকেও ঝোপের আড়ালে আসতে হয়। হয়তো মন্দিরে কোনও টয়লেট নেই। এসব অঞ্চলে সেটা স্বাভাবিক।

'চলুন, মহিলার সঙ্গে আলাপ করি।'

'না।'

'কেন?'

'ও আপনাকে একটা ছাগল কিংবা ভেড়া করে দেবে।'

'দূর! এসব কখনও হয় নাকি?'

'আপনি বুঝতে পারবেন না। ছাগল ভেড়ারা বুঝতে পারে না তারা কি।'

অনীক হাসল, 'হ্যাঁ। মানুষের মধ্যেও অনেক ছাগল ভেড়া আছে, অন্তত বিশেষ-বিশেষ মহিলাদের সঙ্গে তাঁরা সেইরকম আচরণ করে।'

'তবে?'

'আমার তো সেই ভয় নেই। রক্ষাকবচ আছে, আপনি।'

রাণু কেঁপে উঠলেন, 'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি।'

ওরা এবার এগোল। রাণুর পায়ে এখনও জড়তা। মাঠের মাঝখানে সেই নারী যাকে ভৈরবী বলা হয়, একা। দুটি মানুষের পায়ের চাপে ঘাসেরাও শব্দহীন। অনীক দেখল একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেও মহিলা তাদের যেন ঠিকঠাক লক্ষ করছেন না। গেরুয়া শাড়ি-জড়ানো শীর্ণ শরীরটি কি কখনও সুন্দরী ছিল?

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ এবং মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না এই রমণী প্রায় অন্ধ। আপ্রাণ চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কেউ কি ওখানে?'

অনীক কথা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা।'

'এত রাত্রে এখানে কেন?'

'এমনি। চাঁদের আলোয় পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

'বাঃ। দেখা হল?'

'না, মানে এখনও মন ভরেনি।'

'ওইটাই মুশকিল। কোনওদিন মন ভরে না। তোমাদের সন্তান নেই?'

হকচকিয়ে গেল অনীক। রাণু ঠোঁট কামড়ালেন।

'ও, হয়নি বুঝি? মাকে ডাকো, হবে। সন্তানই তো সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে।' আচমকা পায়ে মেপে-মেপে রাস্তা করে ভৈরবী চলে গেলেন মন্দিরের দিকে। একটা পোড়ো ছোট মন্দির যার চারপাশে জঙ্গল। সাধারণত গ্রামের মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে এইসব মন্দিরে আসে আর তাই বেঁচে আছেন ভৈরবী।

এখন এই মাঠে ওরা দুজন। অনীক হাসল, 'দেখলেন তো, আপনার কল্পনার সঙ্গে ওর কোনও মিল নেই। একজন স্বাভাবিক বয়স্কা মানুষ, চোখে হয়তো ছানি পড়েছে। কোনওকিছু বানাতে উনি পারেন না।'

'কে বলল?'

'মানে?'

'ওই যে কথাটা বলে গেল, সন্তান, সন্তান হয়নি তাহলে আমার সঙ্গে কারও তো সম্পর্ক হবে না। আমি যাকে ভালোবাসব, সে আমাকে ভালোবাসবে, আমাদের কোনও সম্পর্ক তৈরি হবে না যতদিন না সন্তান আসবে। মনের মধ্যে এই যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল ও, এও তো বশীকরণ।' গোঙানি ফুটল রাণুর গলায়।

'এ বশীকরণ নয়, এ আনন্দের উৎসাহ। আপনি উৎসাহিত হচ্ছেন না কেন?'

'কি করে হব? আমি যাদের ভালোবাসি, এই মাটি, গাছ, চাঁদ, আকাশ—এরা আমার বৃদ্ধ, স্থবির প্রেমিক। আমি যাকে ভালোবাসি না, যিনি আমার স্বামী, তিনি অক্ষম। আমার সন্তানের জন্য আঁতুড়ঘর, আর শ্মশানের চিতা একাকার।' রাণুর আক্ষেপ শেষ হওয়ামাত্র মেঘ সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। চাঁদ হেলে গেছে অনেকটা। দু-হাত বাড়িয়ে রাণু বললেন, 'আপনি কীরকম পুরুষ?'

এখন চারপাশ দিনের আলোর মতো আলোকিত। অনীক বলল, 'আপনাকে জননীর সম্মান দিতে গিয়ে আমি পিতৃত্বের অধিকার হারাব। আমি যে পিতা হতে চাই।'

অদ্ভুত চোখে তাকালেন রাণু, 'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'আমি জানি না।'

'যদি ও রাজি হয় আমাকে মুক্ত করে দিতে—।'

'আমি প্রস্তুত।'

'তাহলে চলুন, এখনই, এই রাত্রে ওর কাছে ফিরে যাই, গিয়ে কথা বলি।'

ওরা দুজনে দ্রুত জ্যোৎস্না মাড়িয়ে ফিরে এল সেইখানে যেখানে স্টেশনমাস্টারকে রেখে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল মানুষটা নেই। অনেক ডাকাডাকিতেও তার সাড়া পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন রাণু বললেন, 'বড্ড ঘুমকাতুরে। নিশ্চয়ই ফিরে গেছে বাসায়। চলুন।'

যেতে-যেতে চাঁদ দিগন্তে চলে যাচ্ছিল। অদ্ভুত প্রাচীন এক ছায়া নেমে আসছিল পৃথিবীতে। স্টেশনের কাছে পৌঁছে ওরা থমকে দাঁড়াল। স্টেশনমাস্টার তাঁর পোশাক পরে তৈরি, এমনকী পোর্টারও উর্দি এঁটে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র ভদ্রলোক বললেন, 'আজ ভোরে এখান দিয়ে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল। কী মনে হতে মাঝরাতে ফিরে এলাম। এসে বেঁচে গেলাম।'

রাণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীরকম?'

'তার এসেছে। ট্রেনটা এখানে, আমার এই স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে থামবে। খুব বড়-বড় ভি.আই.পি. থাকবে গাড়িতে। তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে চাকরি চলে যেত।'

ব্যস্ততা বাড়ল: দূরে ইঞ্জিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

রাণু বললেন, 'এই সময় ওঁকে অন্যরকম দেখায়।'

'হ্যাঁ। বেশ দায়িত্বশীল মানুষ।'

'ইস্, চাঁদ ডুবে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ঘুম পাচ্ছে না?'

'তেমন নয়।'

'চা খাবেন? আমি খুব ভালো চা করতে পারি।'

'তা তো জানি।'

'না, সন্ধেবেলার মতো নয়, ভোরের চা অনেক ভালো হবে।'

'থাক। ভাবছি ট্রেনে যদি চলে যাই কীরকম হবে?'

'ভি. আই. পি.-দের সঙ্গে?'

'তা কেন? একটু জায়গা পেলেই হবে। ওঁকে বলব?'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। উনি বললে কেউ না বলতে পারবে না।'

ট্রেনটা এল। ঝাঁকে-ঝাঁকে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। বড়-বড় ভি.আই.পি.-রা ঘুমোতে ব্যস্ত। গার্ড এলেন হনহনিয়ে। স্টেশনমাস্টার তাঁর সঙ্গে ব্যস্ত। অনীক তাকাল রাণুর দিকে। কী দারুণ গর্বিতা রমণীর মতো চেয়ে আছে ট্রেনটার দিকে। যে কারণে ফিরে আসা, তা এখন এই মুহূর্তে মনে করিয়ে দেওয়ায় মন সায় দিল না।

ফাঁক পেয়ে স্টেশনমাস্টার এগিয়ে আসতেই অনীক তাঁকে ইচ্ছে জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'চলে যাবেন? ও। আচ্ছা আসুন। একেবারে প্রথম কামরা খালি আছে।'

অনীক বলল, 'এলাম।'

'ভালো থাকবেন।' রাণু বললেন।

'আর কিছু বলবেন না?'

'না।' মাথা নাড়লেন রাণু।

জীবনে অনেকবারই এমন হয়েছে। ঠিক সময়ে নিজেকে মেলতে পারেনি বলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজ ওই জ্যোৎস্নায় মাঠে কেন সক্রিয় হয়নি বলে আজ যে আপশোস এই বুকে, তা আজীবন বহন করতে হবে। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। অনেক পেছনের প্ল্যাটফর্মে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়তেই খেয়াল হল। ঝোলাটা পড়ে আছে স্টেশনমাস্টারের বারান্দায় পাতা চেয়ারে। সেই ঝোলায় ডায়েরি, টাকাপয়সা। ডায়েরিটা বড় জরুরি। চটজলদি নেমে পড়ল অনীক। নামতে-নামতে অনেকটা দূরে। শব্দ তুলে ট্রেনটা চলে গেল ভোর-ভোর পৃথিবীতে।

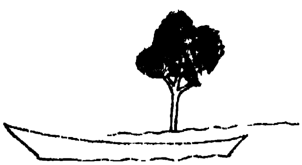
একটু দাঁড়াল সে। এই যে ফিরে যাওয়া এ বড় অস্বস্তির। রাণু কী একে বাহানা ভাববে? ভাবলেও উপায় নেই। ডায়েরিটা তার দরকার। শ্লথ পায়ে সে যখন স্টেশনের সামনে ফিরে এল তখন জায়গাটা ফাঁকা। রামবিলাস না কি যেন নাম পোর্টারের, দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ওর পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। কোয়ার্টার্সে কোনও আলো জ্বলছে না। ওরা কি এরমধ্যে ঘরে ফিরে গেছে? সে ধীরে-ধীরে বারান্দায় এল। ঝোলাটা পড়ে রয়েছে চেয়ারে। সেটা তুলে নিতেই কান্নার আওয়াজ কানে এল। ডুকরে-ডুকরে কান্না। তারপর স্টেশনমাস্টারের গলা বাজল, 'শান্ত হও। শক্ত হও রাণু।'

'আমি আর পারছি না।' কান্না ছিটকে উঠল।

'কিছুই হল না?' অদ্ভুত অসহায় গলা স্টেশনমাস্টারের।

'কিচ্ছু না। এত কথা বলেছি এত কথা—!' রাণু ককিয়ে উঠলেন, 'আমাদের কি হবে?'

'আমরা অপেক্ষা করব।' শান্ত গলায় জবাব দিলেন স্টেশনমাস্টার। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অনীক। এই ভোর-ভোর অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে যেন সেই অন্ধ থুরথুরে পেঁচা বলে উঠেছে, 'ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'



ইচ্ছে বাড়ি

পঞ্চাশে পা দেওয়ার আগে অন্তত পঁচিশবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছে অরবিন্দ কিন্তু কখনও দু-রাতের বেশি থাকেনি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছড়িয়ে আছে পূর্বপল্লি এবং রতনপল্লিতে। ষাট-সত্তর বছরের বাড়ি সব। বিরাট বাগান, অনেক ঘর। সঞ্চয়িতা এবং গীতবিতান ছেঁকে নামকরণ করা হয়েছিল তাদের। সেইসব বাড়ির মালিকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বিখ্যাত হয়েছেন এমন কয়েকজন বন্ধুর পিতাকে সে যৌবনে দেখেছে। অরবিন্দ লক্ষ করত ওসব বাড়িতে একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব ছিল, এমনকী সন্ধের পর মদ খাওয়ার সময়ও কেউ চপল রসিকতা করত না। এঁরা যে ব্রাহ্ম তা নয়, কিন্তু কেউ বাড়িতে সন্ধ্যা মুখার্জির গান গাইত না। কলকাতার এত কাছে জায়গাটা চুপচাপ পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে। বর্ষায় বৃষ্টি দেখতে অথবা দোল কিংবা পৌষ উৎসবে মানুষ ছুটে যেত ক'দিনের জন্যে। হঠাৎ আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতার বাবুদের মনে হল শান্তিনিকেতনে বাড়ি বানালে চমৎকার হয়। যে জমির দাম ছিল এক হাজার, তা হয়ে গেল ছাব্বিশ। খাল পেরিয়ে যে ধু-ধু প্রান্তর সামনে

পড়ে থাকত, তাতে গজিয়ে উঠল সুন্দর-সুন্দর বাড়ি। এমনকী প্রান্তিকের মাঠের জমিও বারো হাজার কাঠায় উঠে এল, যেখানে সন্ধের পর প্রদীপ জ্বলত না বারো বছর আগে। বন্ধুরা বলল, 'অরবিন্দ, চটপট একটা জায়গা কিনে ফ্যালো, বাড়ি না বানাও এর চেয়ে ভালো ইনভেস্টমেন্ট আর হয় না।'

অরবিন্দকে সবাই সফল মানুষ বলে। কলকাতা শহরে তার একটি চালু ব্যাবসা আছে। বছর পনেরো আগে মাত্র দেড় লাখ টাকায় যে ফ্ল্যাট কিনেছিল তার দাম এখন ষোলো লাখ। কলকাতার কয়েকটা বড় ক্লাবের মেম্বার সে। নিজে কিছু করে না বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে কোনও অসুবিধে হয় না।

ওর একমাত্র ছেলে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাশ করে যাদবপুর থেকে বি. ই. ডিগ্রি নিয়ে এখন আমেরিকায় পড়ছে। অরবিন্দর স্ত্রী ইতি বড় ভালোমানুষ। খুব হাসেন। দেখলেই বোঝা যায় স্বামী সম্পর্কে কোনও বড় অভিযোগ নেই। ইতি নিজের চেহারাটাকে বুড়িয়ে যেতে দেননি, অত বড় ছেলের মা বলে মনে হয় না। তুলনায় অরবিন্দর মনে একটু দুঃখ থাকা স্বাভাবিক। ইদানীং ঝুপ্পঝুপ করে টাক পড়ছে তার। তা টাক তো সব মানুষকেই মেনে নিতে হয়েছে। ইতি প্রায়ই অনুপম খেরের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এমন একজন পঞ্চাশে পা দেওয়া মানুষকে সফল না বলে উপায় কি! ওকে ধার করতে হয় না, গাড়ি আছে, ব্যাবসাটা দু-দিন না দেখলে অচল হয় না।

মাস তিনেক আগে ওরা চার বন্ধু শনিবারের শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চেপেছিল। বিকেল-রাত-সকাল কাটিয়ে দুপুরে ফিরে আসবে। রতনপল্লির ববি গুহর বাড়িতে ওরা উঠেছিল। ববিও ওদের সঙ্গে এসেছে। আসা মাত্র দারোয়ান চাকররা চরকির মতো ছুটছে। সন্ধে হল। চাঁদ উঠল। ববি গুহর বাগানঘেরা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসা হয়েছে। কলকাতা থেকে আনা হুইস্কির সঙ্গে মাছভাজা চলছে। ঢাউস চাঁদের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দর হঠাৎ মনে হল, পঞ্চাশ বছর পরে সে আর ওই চাঁদটাকে দেখতে পাবে না। পঞ্চাশ বছর পরে তার বয়স একশো হবে। দূর, অতদিন কি, চল্লিশ বা তিরিশ বছর পরেও যে দেখতে পাবে, তার নিশ্চয়তা কী! সে চুপচাপ বন্ধুদের দিকে তাকাল। ওরা কথা বলছে। পঞ্চাশের গায়ে বয়স সবার। তিরিশ বছর পর এদের অনেকেই থাকবে না। চল্লিশের পর তো নয়-ই। কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে দুশো বছর বাদেও এখানে বসে মাল খাবে। রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বয়সে মারা গিয়েছেন এবং তারপর বাঁচা বাঙালির আশা করাই উচিত নয়। অর্থাৎ তিরিশ বছরটাই তাহলে ম্যাক্সিমাম আয়ু। অরবিন্দর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তখনই গেট খুলে সে লোকটাকে ঢুকতে দেখল। জ্যোৎস্না মাখতে-মাখতে একটা সাদা জামা এবং ধুতি এগিয়ে আসছে। ববি গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাপাগলায় বলল, 'হু ইজ হি?'

ততক্ষণে লোকটা সামনে এসে গিয়েছে। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি বোধহয় এসময় এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম?'

ববি গুহ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

'আজ্ঞে, আমি মদ বিক্রি করি।'

'মাই গড। তা এখানে কী দরকার?'

'আজ্ঞে, আপনারা আমার ওপর অবিচার করছেন। আপনারা প্রায়ই আসেন, 'ক-দিন থাকেন কিন্তু কলকাতা থেকে মদ কিনে এনে খান। আমি স্থানীয় মানুষ, যদি আমাকে সুযোগ দেন, তাহলে কলকাতা থেকে বয়ে আনার কাজটা করতে হয় না।'

'বোলপুরে আপনার মদের দোকান আছে?'

'আজ্ঞে না। তবে যে-কোনও মদ আমি এনে দিতে পারি। স্কচ খেতে চাইলে চব্বিশঘণ্টার নোটিশ দিতে হবে। আমি একেবারে কলকাতার দামেই দেব।'

'কোত্থেকে দেবেন?'

লোকটি বিনীতগলায় বলল, 'ব্যাবসার গোপনীয়তা জানতে চাইবেন না স্যার।'

'আমরা যে মদ খাই, তা আপনি জানলেন কী করে?'

'চেহারা দেখে।'

সৌমেন চুপচাপ শুনছিল। চাপাগলায় বলল, 'আমার বউ সেদিন বলছিল রোজ মদ খেয়ো না। এরপর লোকে চেহারা দেখে বুঝতে পারবে।'

ববি গুহ ধমকাল, 'রসিকতা করছেন? চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছেন?'

'আজ্ঞে, আপনারা চারজন শিক্ষিত, সম্পন্ন মানুষ ছেলেমেয়েদের না নিয়ে এখানে এসেছেন। আপনারা শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতে যান না, প্রান্তিকের মাঠে হাঁটতেও দেখি না। অবশ্য এখন আর মাঠ কোথায়? মেয়েমানুষের দোষও আপনাদের নেই। চারজন ব্যাটাছেলে সন্ধেবেলায় একসঙ্গে থাকলে যদি একটু মদ খায় তাতে তো কোনও ক্ষতি নেই। এই দেখুন, আজ শনিবার, রতনপল্লির পাঁচটা বাড়ি আর পূর্বর ছ'টা, মোট এগারোটা বাড়িতে পঞ্চাশজন মানুষ অন্তত ষোলো-সতেরোটা বোতল আজ শেষ করবে। পরিমাণটা আপনি ভাবুন!'

লোকটি কথা বলছিল খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে। ববি গুহ বন্ধুদের দিকে তাকাল। এবার অরবিন্দ কথা বলল, 'আমরা তো কালই চলে যাচ্ছি। এ যাত্রায়—।'

'আবার তো আসবেন। তাহলে কথা হয়ে গেল—।' লোকটা হাসল, 'আমি প্রতিদিন শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস অ্যাটেন্ড করি। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় ডানদিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পাবেন। তখন অর্ডারটা দিয়ে দিলেই ঠিক পৌঁছে যাবে।'

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'মধুসূদন দত্ত।' লোকটি নমস্কার করে গেটের দিকে চলে গেল।

ববি বলল, 'অদ্ভুত! মধুসূদন দত্ত শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করে বেড়াচ্ছে?'

অরবিন্দ বলল, 'লোকটা খুব সরাসরি কথা বলে। একসময় এরকম সেলসম্যানের কথা শান্তিনিকেতনে কেউ চিন্তাও করতে পারত না।'

সৌমেন বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে ওকে দূর করে দিতেন।'

ববি গুহ বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এইভাবে বারান্দায় বসে আমরা মাল খেতাম কিনা সন্দেহ আছে।'

দেবব্রত চুপচাপ মানুষ। তবু বলল, 'আচ্ছা, সেসময় অত বিখ্যাত মানুষ এখানে আসতেন, থাকতেন, তাঁরা পান করতেন না, এটা বিশ্বাস করতে পারি না।'

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে গেলে অরবিন্দর মনে হল ওই মধুসুদন দত্তর সঙ্গে আর একটু কথা বললে ভালো হত। লোকটা এতদিন কি করত, মদ বিক্রি করা ছাড়া আর কিছু করে কি না, পরিবার আছে কি না অথবা কখনও কবিতা লিখত কি না, এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারত।

পরদিন ফেরার সময় দেখা গেল হাওড়া থেকে ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। রবিবার বলে প্ল্যাটফর্মে ভিড় খুব। অরবিন্দ গেটের কাছে পৌঁছে ডানদিকে তাকাতেই মধুসূদন দত্তকে দেখতে পেল। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে একাই এগিয়ে গেল, 'চিনতে পারছেন? কাল রাত্রে—।'

'বিলোক্ষণ। কলকাতার এক পার্টি আসছে প্রান্তিকে উঠবে। ওদের জন্যে ভদকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগেরবার অর্ডার করে গিয়েছিল। এখন ট্রেন বেশি লেট করলে দুপুর পেরিয়ে যাবে, সন্ধে নামলে কেউ ভদকা খায় না, চিন্তা হচ্ছে।' কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো মুখ করে বলল মধুসূদন দত্ত।

'আপনি এখানে অনেক বছর আছেন?'

'তা আছি। আপনি এখানে স্থিতু হবেন না?'

'বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি আছে, দিব্যি আসছি, যাচ্ছি—।'

'দূর! প্রত্যেক মানুষের তো একটাই জীবন। কিছু-না-কিছু রেখে যেতে হয় পরের প্রজন্মের জন্যে। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান, যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি

রেখে যেতে পারেন।'

'কে করবে? আমার পক্ষে তো আর দাঁড়িয়ে থেকে করানো সম্ভব নয়।'

'কোনও দরকার নেই। আমি আছি। ইচ্ছে হলে খবর দেবেন।'

ওই যে কথাটা, কিছু রেখে যাওয়া—তা ঢুকে গেল বুকে। লোকে বলবে, এই বাড়িতে অরবিন্দবাবু থাকতেন। বন্ধুরা বলল, 'লাখ চারেক খরচ করলে মোটামুটি মাথা গোঁজার জায়গা হয়ে যাবে। শুনে ইতি বলল, 'মাঝেমধ্যে বেড়াতে যেতে পারি কিন্তু পাকাপাকি থাকতে পারব না।'

'এখন কে থাকতে বলছে? বুড়ো বয়সে—।' অরবিন্দ বলতে গেল।

'সেই বয়স এলে দেখা যাবে।'

অরবিন্দ চলে যাওয়া ইতিকে দেখল। সাতচল্লিশ প্লাস। আর ম্যাক্সিমাম এগারো বছর। মানে এগারোটা পুজো, এগারোটা পূজাসংখ্যা। অথচ এমন ভাব, বুড়ো হতে প্রচুর দেরি। একটা মানুষ জন্মাল, বড় হল, ছেলেমেয়ে আনল, বুড়ো হল এবং মরে গেল, তা নিয়ে একবারও ভাবল না।

আর এই ভাবনাটাই অরবিন্দকে ক-দিন বাদে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেল। গেটের ডানদিকেই পাওয়া গেল মধুসূদন দত্তকে। মধুসূদন হাসল, 'এবার একা? কি দেব?'

'আমি ট্যুরিস্ট লজে উঠছি। বিকেলে দেখা করবেন। আমার নাম অরবিন্দ মিত্র।'

বিকেলে মধুসূদন দত্ত এল। সঙ্গে সেই ব্যাগ। তাকে বলল, 'আমি এখানে একটা ছোটখাটো বাড়ি করতে চাই। আপনি বলেছিলেন—।'

'জমি কিনে বাড়ি বানাবেন, না পুরোনো কিনে ঠিকঠাক করে নেবেন?'

'পুরোনো বাড়ি কেনা ঠিক হবে? নিজের মনের মতো তো হবে না।'

'তা ঠিক। পূর্বপল্লির শেষ প্রান্তে জমির দাম এখন চব্বিশ। প্রান্তিকে যেতে যেখানে সুনীলবাবু অর্ঘ্যবাবুদের বাড়ি সেখানে পনেরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিকের কাছে বারোতে পাবেন। তবে আমি সাজেস্ট করব পূর্বপল্লিতেই বাড়ি বানান। একটু কমে পেয়ে যেতে পারি।'

খানিকটা আলোচনার পর ঠিক হল কাল সকালে মধুসূদন দত্ত অরবিন্দকে জমি দেখাতে নিয়ে যাবে। কথা শেষ হয়ে গেলে সে ব্যাগে হাত দিল, 'কী দেব?'

মনে পড়ল। মাথা নাড়ল সে, 'না-না, আমি একা-একা মদ খাই না।'

'ও!' লোকটাকে খুব হতাশ দেখাল। ধীরে-ধীরে চলে গেল।

পূর্বপল্লির জমি দেখা থেকে শুরু করে তার অধিকার আইনসম্মত করে নেওয়ার যে ঝামেলা, মধুসূদন দত্তই সামাল দিল। হ্যাঁ, অরবিন্দকে কয়েকবার আসতে হয়েছে। সঙ্গে কোনও বন্ধু থাকলেও লোকটাকে নিরাশ করেনি। কলকাতার দামেই মদ বিক্রি করে এটা প্রমাণিত। কথাটা পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়ায় লোকটার চাহিদা বেড়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা বোলপুর স্টেশনের গেট পার হওয়ার সময় ডানদিকে তাকিয়ে বলছেন, 'মধুবাবু, অমুক বাড়িতে উঠছি। আসছেন তো?'

মধুসূদন দত্ত হাতজোড় করে জবাব দেন, 'সেবার সুযোগ দিচ্ছেন, আমি ধন্য।'

এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বাড়ির নকশা করে দেওয়ার আগে প্রশ্ন করেছিল, 'কীরকম খরচ করতে চাও? ছেলে তো আর শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করবে না।'

মাথা নেড়েছিল। আসলে ভেতরে ঢুকে পড়ার পর অরবিন্দর যেন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বাড়ি ইজ বাড়ি। কে থাকছে, ক'দিন থাকছে, তা ভাবার দরকার নেই।'

অতএব যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হল। ইতি মাঝে একবার দেখতে গিয়েছে। সেটা ভিতপুজোর সময়। দেখে বলেছিল, 'এখানে বাড়ি হলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। কেউ দেখতে আসবে না।'

ভিত তৈরি হয়ে গেলে মধুসূদন দত্ত বলল, 'প্রথমে দুটো কাজ করতে হবে। এক, পাঁচিল দেওয়া—দুই, গাছ লাগানো।

'গাছ লাগানো মানে?' অরবিন্দ বুঝতে পারল না।

'বাড়িটাকে ঘিরে এখন গাছ লাগিয়ে দিলে গৃহপ্রবেশের সময় দেখবেন ওগুলো বেশ ডাগর হয়ে গিয়েছে। এখানকার মাটিতে তরিতরিয়ে বাড়ে। তবে কী গাছ লাগাবেন, সেটা ভাবুন। ফুলের গাছ, যেমন, টগর লাগাতে পারেন। আবার শিরীষ, দেবদারু, কদমজাতীয় গাছও লাগানো যায়। শেষের গাছগুলো বহু-বহু বছর বেঁচে থাকবে। আর যদি সরকারি গাছ কিনে এনে লাগান তাহলে কয়েক বছর বাদে প্রচুর টাকা পাবেন বিক্রি করে। ব্যাবসাও হয়ে যাবে।' মধুসূদন দত্ত মতলব দিল।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে কিন্তু জমি থেকে গাছ কাটার কথা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগল। মধুসূদনবাবুকে বলল, 'ইউক্যালিপটাস, শিরীষ, দেবদারু গাছ লাগান চারপাশে। দুটো কদমগাছ থাকবে দু-পাশে। কাটাকাটির মধ্যে আমি নেই।'

বাড়ি তৈরি হতে লাগল। গাছ পোঁতাও শেষ। প্রতি শনিবার অরবিন্দ চলে আসে শান্তিনিকেতনে। প্রতিটি ইট বসছে আর অরবিন্দর মনে হচ্ছে পাঁজরগুলো তার চেনা হয়ে যাচ্ছে। সিমেন্ট পড়ার আগে বাড়িটার যে আসল খাঁচা, যা বহু বছর খাড়া হয়ে থাকবে তার সঙ্গে পরিচিত হতে যে কী আরাম, তা কাউকে বোঝানো যাবে না। ইটের ওপর সিমেন্ট মেশানো বালি ফেলে আর ইট চাপিয়ে যখন উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে তখন যেন সিমেন্ট মেশানো বালি কীরকম মায়া-মায়া হয়ে যাচ্ছে। অরবিন্দর মনে হল, সে যখন থাকবে না তখন এই বাড়িটা থাকবে। এত টান সে কখনও অনুভব করেনি।

যেসব বন্ধুরা ইতিমধ্যেই ওখানে বাড়ি বানিয়েছে তারা অরবিন্দকে বোঝাল, 'লোকটার হাতে সব ছেড়ে বসে থেকো না। নিজে সিমেন্ট ইটের দরাদরি কর। নইলে মেরে ফাঁক করে দেবে। কন্ট্রাক্টর টেন পার্সেন্ট নিয়ে থাকে, তোমার মধুবাবু কত নিচ্ছে কে জানে!'

অরবিন্দ অসহায় বোধ করল। মধুসূদন দত্তের কথা এবং কাজে কোনও অসঙ্গতি পায়নি সে। লোকটা তাকে ঠকাচ্ছে কিনা খোঁজ করতে গেলে ওকে অপমান করা হয়। তবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকটার টিকি দেখা যায় না। অরবিন্দ অনুমান করে, তখন মধুসূদন দত্ত মদের ব্যাবসা করে বেড়ায়। এ নিয়ে কোনও আপত্তি করার মানে হয় না। কারণ, তার বাড়ি তৈরির কাজে কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না। তবে একটা অস্বস্তি কাটাতে পারছে না, তাকে কী দিতে হবে? সেই জমি কেনা, প্ল্যান স্যাংশান করানো থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের মিটার আনবার দরখাস্ত করা পর্যন্ত যে লোকটা একটুও গাফিলতি করেনি, তার দক্ষিণা কত এটা জানা দরকার। ট্যুরিস্ট লজের ঘরে বসে একবার প্রশ্নটা করেছিল সে। মধুসূদন দত্ত জিভ বের করে শব্দ করল, 'থাক না ওসব। আমিও মরে যাচ্ছি না, আপনিও থাকছেন। অন্তত দু-এক বছর তো আছি। পরে হবে ওসব কথা। আগে মনের মতো বাড়িটা হোক, দেখে প্রাণ জুড়োক, তারপর কথা বলা যাবে।'

অরবিন্দ বলেছিল, 'কিন্তু আগে থেকে জানলে আমি বাজেট করতে পারব।'

'এই দেখুন, বেফাঁস কথাটা বলে ফেললেন। বাজেট! পৃথিবীতে কেউ কখনও তার বাজেট ঠিক রাখতে পেরেছে। অর্থমন্ত্রীরাই পারে না তো সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া শখের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস অত বাজেট মাথায় রেখে হয় না। শাজাহান কখনওই তাজমহলের জন্য বাজেট করেননি। ঠিক কিনা বলুন।' মধুসূদন দত্ত হাসল।

অরবিন্দ শেষপর্যন্ত প্রশ্ন করে ফেলল, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা কিন্তু আমি জানি না।'

'আপনি স্যার জিজ্ঞাসা করেননি কখনও, তাই বলিনি। আসলে আমার কোনও ঠিকানা নেই। এর কাছে ক'দিন, ওর কাছে কিছুদিন, এভাবেই চলে যায়। এই যে আপনি বাড়ি বানাচ্ছেন, আপনি তো পাকাপাকি থাকবেন না, হয়তো শনি রবিবারে আসবেন প্রথম-প্রথম, তা বাকি পাঁচদিন তালাবন্ধ থাকবে, থাকবে তো? তখন যদি বলেন আমাকে পাহারা দিতে, তাহলে একটা মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে, এইরকম?'

'আপনার পরিবার?'

'ছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। সন্তান হয়নি। তখন দুবরাজপুরে থাকতাম। চাকরি করতাম। সে ভাবল, আমি অপদার্থ তাই পছন্দসই পুরুষ পেয়ে ছেড়ে গেল আমাকে। লোকে বলেছিল থানায় যেতে, আমি যাইনি। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে চাবুক মেরে কোনও কাজ হয় না।'

'আপনার নামটা নিয়ে কখনও ভেবেছেন?'

একগাল হাসল লোকটা, 'কবিতা লিখতাম। বাল্যকালে। চতুর্দশপদী। একেবারে তাঁর নকল করে। বন্ধুবান্ধবরা বলত, ভালো হয়েছে। বড় হয়ে বুঝলাম, কিস্যু হয়নি। লেখার চেষ্টা আর করি না। সবার তো সব হয় না।'

'আর একটা কথা,' অরবিন্দ বলল, 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আপনি ঘুরে-ঘুরে মদ বিক্রি করেন, কখনও কোনও বাধা আসেনি?'

'আজ্ঞে না! মানুষের প্রয়োজন আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। তিন পেগ মদ খাওয়ার পর টেপে 'এ পরবাসে' অথবা 'সখী আঁধারে' শুনতে যাদের ভালো লাগে তাদের বঞ্চিত করি না আমি। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করত, সেইভাবে চিরকাল কেন করবে? সময়ের সঙ্গে গ্রহণ করার ধরনটা বদলাবে না? তিন পেগ পেটে পড়ার পর 'সহে না যাতনা' কেউ যদি সত্যিকারের দরদ দিয়ে গায় তাহলে তাকে কি আপনি রবীন্দ্রবিরোধী বলবেন? তা ছাড়া সে তো পাবলিক ফাংশান গাইতে যাচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নির্জনে বাস করছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে অরবিন্দর মনে হল কথাগুলোর যুক্তি আছে। কলকাতায় তো বটেই, এখানে যে-সমস্ত মানুষ সাপ্তাহিক মাসিক অথবা বাৎসরিক ভ্রমণে নিজের বাড়িতে আসে তাদের বয়স এখন পঞ্চাশের সামান্য ওপরে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চলে গেছেন। সন্ধেবেলায় তাঁরা মদ্যপান, কিঞ্চিৎ খিস্তিযোগে রসালাপ যেমন করেন, তেমন কোনও গাইয়ে সঙ্গে থাকলে রবীন্দ্রনাথের গানও শোনেন। এই মিশ্রিত মানুষেরা কেউ রবীন্দ্রবিরোধী নয়। তফাত এই, এঁরা কেউ তাকে গুরুদেব গুরুদেব করেন না।

শেষপর্যন্ত বাড়ি তৈরি হল। গাছগুলো বড় হয়ে গেছে। এক বছরে সবক'টা ঋতুর স্পর্শ পেয়ে অনেক-অনেক বছরের জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ কলকাতা থেকে চমৎকার আসবাব আনিয়ে নিল। রান্নাঘরে গ্যাস চলে এল। পাখাগুলো ঘুরতে লাগল বনবন করে। তিনটে শোওয়ার ঘর, তিনটে টয়লেট, ডাইনিং কাম বসার ঘর আর বাগানঘেরা একটা বারান্দা। মধুসূদন দত্তর অনুরোধে একটা ছোট জেনারেটারের ব্যবস্থা করেছে সে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকালে মনে হয় স্বপ্নের বাড়ি। কলকাতার ফ্ল্যাট এর কাছে কিছু নয়।

বন্ধুরা বলল, 'গৃহপ্রবেশ করো অরবিন্দ, দলবেঁধে কলকাতা থেকে যাব সবাই।'

ইতি বলল, 'তোমার বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে গেলে থাকতে দেবে কোথায়? ওই তো ক'টা ঘর। সবাইকে বলো বিশ্বভারতীতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরে ফিরে আসতে।'

এ কথা বলা যায় না। থাকতে দিতেই হবে এমন তো কথা নেই। ববি গুহর বাড়ি আছে, সন্ধি গুহঠাকুরতার বাড়ি আছে, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির তো অভাব নেই। কিন্তু যে দিনটি গৃহপ্রবেশের জন্যে ঠিক করা হল সেদিন দেখা গেল প্রত্যেকের অসুবিধে। কেউ-না-কেউ কলকাতায় কাজেকর্মে জড়িয়ে থাকবে। ইতি বলল, 'বাড়িটা আমাদের, আমাদের সুবিধেমতো গৃহপ্রবেশ করব, যার সুবিধে যাবে, আমরা দিন পালটাব কেন?'

অরবিন্দর সেটা মত ছিল না, তবু মানতে হল। বন্ধুরা জানাল, সপ্তাহের মাঝখানে না গিয়ে সামনের শনিবার হাজির হবে। সেটে গৃহপ্রবেশ সেলিব্রেট করবে সবাই। ইতি বলল, 'বাঁচা গেল।'

দুই অরবিন্দ

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝকঝকে নতুন সাদা নতুন ডিজাইনের একতলা বাড়ি। পূর্বপল্লিতে এর কোনও জুড়ি নেই। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছগুলো এক বর্ষাতেই তরতরিয়ে উঠেছে। কী সবুজ ছেয়ে গেছে বাড়িটার চারধারে! প্রাসাদ নয় কিন্তু ছোট্ট অথচ মজবুত বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে অনেক-অনেক বছর। একটু যত্ন করলে তিন-চারশো বছরও থেকে যেতে পারে। যখন অরবিন্দ থাকবে না, তার ছেলে অথবা বংশধর বলবে বাড়িটা যে বানিয়েছিল তার কথা। এটাকেই কী রেখে যাওয়া বলে?

'কেমন দেখছেন স্যার?'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম মধুসূদন দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন খানিক দূরে।

জবাব দিলাম, 'ভালোই। শুধু সাদা রংটা যেন বড্ড চোখে লাগছে।'

'ধুয়ে যাবে। বর্ষাটা যেতে দিন। শীত পড়লে আর একপ্রস্থ মোলায়েম রং মাখিয়ে দেব। হ্যাঁ, শনিবার অতিথিরা আসছেন, কী-কী ব্যবস্থা করতে হবে বলে দিন।'

'চারজন এখানে থাকবে বাকিরা বন্ধুদের বাড়িতে। দুপুর আর রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার স্ত্রী অবশ্য তখন থাকতে পারছেন না।'

'দেখুন, বাড়ি যদি নিজের হয় তাহলে তার কোণে-কোণে মায়া জড়ানো থাকে। আর এই মায়া স্থায়ী হয় প্রিয় মানুষীর স্পর্শ পেলে। ঘরের সঙ্গে তাই ঘরণির সম্পর্ক এত নিবিড়। তিনি থাকলে বাড়ি কখনওই অশুচি হয় না। যাকগে, কত বোতল দেব? দুপুরে এসেই তো খেতে বসবেন না, ভদকা বা বিয়ারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবার সন্ধের পর হুইস্কি। পরিমাণটা যদি বলেন।'

হঠাৎ আমার খারাপ লাগা শুরু হল। এত জ্ঞানগর্ভ কথা বলার পরই লোকটা চট করে ওর মদ বিক্রির ব্যবসায় চলে এল। আমি দেখতে পেলাম আমার বাড়ির লম্বা বারান্দায় বসার ঘরে বন্ধুরা মদ আর চাট নিয়ে বসে আছে। যদি মধুসূদনকে না বলতে পারতাম, তাহলে এই মুহূর্তে আমার ভালো লাগত। কিন্তু ওসবের ব্যবস্থা না থাকলে আমার শিক্ষিত ভদ্র রুচিবান বন্ধুরা কী পরিমাণ বিরক্ত হবে, তা আমি জানি। হয়তো বিকেলেই ওরা আসর বসাবে ববি গুহ-র বাড়িতে। আমার গোঁড়ামি নিয়ে কটূক্তির বন্যা বইয়ে দেবে। মধুসূদনবাবুকে বললাম, 'আপনার তো স্টকের অভাব নেই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন, আমি দাম দিয়ে দেব।' বলেই খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, এই যে আপনি বাড়ি-বাড়ি মদ বিক্রি করেন এটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি, না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ-ও বলা যায় আবার না-ও।'

'না কেন?'

'আমি দোকান থেকে এনে আপনাদের দিচ্ছি। এক্সাইজ ডিউটি তো দোকানদার দিচ্ছে, আমি বাহকমাত্র। হরিদ্বারে মাছমাংস খাওয়া যেমন বেআইনি, শান্তিনিকেতনে মদ বিক্রি করা তো তেমন অর্থে বেআইনি নয়। খোদ কবিগুরু তাঁর কবিতায় হুইস্কির কথা লিখে গিয়েছেন। আর এখন লোকে মদ খায় কিন্তু মাতলামি করে না। যে করে তাকে অসভ্য বলা হয়, পরেরবার আর ডাকা হয় না। তার মানে মদ খাওয়াটাও আর বেআইনি নয়। যাক সে কথা, বাড়িটার একটা নাম দেবেন না?'

মাথা নাড়লাম। এই নিয়ে ইতির সঙ্গে ক'দিন কথা হয়েছে। বাড়ির একটা নামকরণ করা দরকার। শ্বেতপাথরের ফলকে সেটা লিখে গেটের মাঝখানে বসিয়ে দিতে চেয়েছে সে। আমি বলেছি গেটে নয়, ঢুকতেই যে দেওয়াল চোখে পড়ে তার মাঝখানে ওটা বসাব। বাড়ি রইল ঠিকঠাক অথচ গেট ভেঙে গেল এমন তো হতেই পারে। ইতি রবীন্দ্রনাথ হাতড়ে ছিল। পূর্বপল্লি রতনপল্লির বেশিরভাগ বাড়ির নামকরণের পেছনে তিনি রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বাড়ি হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথকে

বাদ দিয়ে নামকরণ হবে এ কী সম্ভব? ইতি গোটা দশেক নাম ঠিক করেছিল আমার পছন্দ হয়নি। রেগেমেগে সে বলেছিল, 'তাহলে তোমার বাবা-মায়ের নামে নামকরণ করো। মাতৃস্মৃতি-পিতৃস্মৃতি গোছের।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ভাগ্যিস বলনি বাড়ির নাম দাও, ইতি।'

ও গম্ভীর মুখে সরে গিয়েছিল। আর এ নিয়ে কথা বলেনি। ভাবনাটা তখনই মাথায় এল। বাড়িটার নাম যদি দিই 'অরবিন্দ' তাহলে কেমন হয়? যুগ-যুগ ধরে অরবিন্দ বেঁচে থাকল। তারপরেই খেয়াল হল আশি বছর বাদে লোকে দেখে ভাববে ঋষি অরবিন্দের নামে নামকরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো ভদ্রলোককে নমস্কার-টমস্কার জানিয়েছেন; তখন কেউ আমার কথা ভাববে না। একই নামে বিখ্যাত কেউ থাকলে এই হয় মুশকিল। এক্ষেত্রে নাম এবং পদবি দুই-ই লিখতে হয়। কিন্তু সেটা কল্পনা করতেই অস্বস্তি হল। লোকে ভাববে, আমি আমার ঢাক নিজেই পেটাচ্ছি। নির্লজ্জ বলতে পারে। বাইরের কেউ মুখের ওপর কিছু না বললেও ইতি ভাবতে পারে সে কথা। কলকাতায় ফ্ল্যাটের দরজার পাশে লেটার-বক্সে ওর নাম ওপরে, আমার নাম নিচে লেখা আছে। এখানে একা আমার নাম দেওয়ালে থাকলে দৃষ্টিকটু হবে। অথচ আমি নিজের টাকায় বাড়িটা বানিয়েছি, প্রতিটি স্তর নিজের চোখে দেখেছি, এই বাড়ির সঙ্গে বহু বছর নিজের নামটাকে জড়িয়ে রাখার দাবি আমারই আগে। শালা, চক্ষুলজ্জা করেই বাঙালি শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হল। মধুসূদন দত্তকে বললাম, 'একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন।'

'ওই যে বাগানের মাঝখানে খোলা জায়গাটা রয়েছে, ওখানে অন্তত তিরিশ ফুট গভীর একটা ভিত করতে হবে। ছয় বাই চার ফুট। মাটির তলায় গাঁথুনি থাকবে তিরিশ ফুট। মাটির ওপরে ফুট-পাঁচেক। খুব মজবুত। ক'দিন লাগবে?'

'ঘর হবে?'

'না-না। একদম সলিড। ভেতরে কোনও গর্ত থাকবে না।'

'এরকম একটা থাম্বা করবেন কেন?'

'দরকার আছে। আজই শুরু করে দিন কাজ।'

স্টেশনে যাওয়ার সময় ইতি দাঁড়িয়ে গেল, 'ওরা গর্ত খুঁড়ছে কেন?'

'পিলার হবে।'

'কেন?'

'এমনি। দেখতে ভালো লাগবে।'

'এত বাজে খরচ করো!' সে গেট পেরিয়ে রিকশায় উঠল। তাকে তুলে দিলাম শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার আগে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি। পাশের বাড়ির মুকুদি, ডক্টর মুখার্জির স্ত্রী, মদ খাওয়া একদম পছন্দ করেন না। ওপাশে মিস্টার হাজরা আছেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন, শুদ্ধ মানুষ। বাড়িতে এমন কাণ্ড বন্ধুদের নিয়ে কোরো না যাতে ওঁরা আঘাত পান। আমাকে এখানে আসতে তাহলে আর বলবে না। মনে রেখো।'

ট্রেন চলে যেতেই দেখলাম মধুসূদন দত্ত আজও দুজন খদ্দের পেয়ে গেছেন। তাদের ঠিকানা টুকে নিচ্ছেন। একটুও ভয়ডর নেই লোকটার। অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। আই. জি., ডি. আই. জি. থেকে আবগারি বিভাগের বড়কর্তারা ট্রেন থেকে নেমে হাত তুলে ওকে বলে যান, 'দত্ত, আমি এসেছি।'

আজ দুপুরের ট্রেনে বন্ধুরা আসবে। মধুসূদন দত্ত ঠাকুর-চাকর আনিয়ে রান্নার তদারকি

করছিল। বাগানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম গর্ত খোঁড়ার পর নিচে ইট-সিমেন্ট-বালির গাঁথুনি চলছে। চারপাশে লোহার রডকে বেঁধে তাকে ঘিরে মোটা পিলার ওপরে উঠে আসবে। মধুসূদন দত্ত চেয়েছিল পুরোটা ইট না দিয়ে বালি-সিমেন্ট মিশিয়ে ভরাট করতে। আমি রাজি হইনি। খরচ হোক কিন্তু মজবুত করা দরকার। মিস্ত্রিদের তাগাদা দিচ্ছিলাম। ওরা বলল বিকেলের মধ্যেই ভরাট করে ফেলতে পারবে।

দুটো মারুতি ভাড়া করে মধুসূদন দত্ত ওদের নিয়ে এল স্টেশন থেকে। আমি গেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে দেখে সবাই হইহই করে উঠল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওরা বাড়িটার প্রশংসা করতে লাগল, 'দারুণ, গ্র্যান্ড, সুপার্ব, বিউটিফুল, মিসেস কোথায়?'

কলকাতায় কাজ ছিল বলে চলে গেছে শুনে ববি গুহ বলল, 'বুদ্ধিমতী মহিলা। এতগুলো দামড়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ভেবেছেন। ওখানে কি হচ্ছে?'

সবাই গর্তটাকে দেখল। তখনও মিস্ত্রিরা নিচে। ওপর থেকে জোগানদার জোগান দিচ্ছে। পাশ থেকে মধুসূদন দত্ত বলল, 'বসার জায়গা হচ্ছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে কারও আর আগ্রহ থাকল না। মোট সাতজন এসেছে। এদের একজন এই প্রথম শান্তিনিকেতনে। বাগানে দাঁড়িয়েই জিগ্যেস করল, 'কত খরচ হল অরবিন্দ? টোটাল কত হবে?'

'হিসেব করিনি।'

'কম হবে না। কিন্তু ভাই যাই বলো ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। এতদূরে এসে তুমি নিশ্চয়ই পারমানেন্টলি থাকবে না।' তপন যেন আমার জন্যে আপশোস করল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধি প্রতিবাদ করল, 'তোর শালা কোনওকালে কিছু হবে না। সারাজীবন কিপটের মতো কাটিয়ে দিলি। আরে, টাকা জমিয়ে কি হবে যদি নিজে ভোগ করে না যেতে পারিস! এই বাড়ি, গাছপালা, আকাশ-এসবের মর্ম তুই জীবনে বুঝলি না।'

বললাম, 'তোরা হাতমুখ ধুয়ে নে। খাবার রেডি আছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে হইহই করে উঠল সবাই, 'আরে এখন সবে একটা বাজে, এখনই লাঞ্চ! মধুবাবু, ভদকা বিয়ার বের করুন।'

যেযার মতো জামাকাপড় পালটে বসে গেল বারান্দায়। মধুসূদন দত্ত সযত্নে মাছভাজার সঙ্গে পানীয় পরিবেশন করছেন। তপন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি? গ্লাস কোথায়?'

মধুসূদন দত্ত মাথা নাড়লেন, 'আমার নামের এক মহাত্মা যা খেয়ে গেছেন তারপর আর কোন মুখে খাই। আপনাদের সেবা করতেই আমার আনন্দ।'

ববি গুহ গেয়ে উঠল, 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর।'

সৌমেন ধমক দিল, 'হেঁড়ে গলায় গাইবি না।'

ববি বলল, 'যা ইচ্ছে তাই করব। আজ আমরা বাঁধনহারা।'

তপন বলল, 'সেই রবীন্দ্রনাথ।'

ববি গুহ বলল, 'যাচ্চলে! বাংলাভাষা কী রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক সম্পত্তি?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। ওই ভদ্রলোক না জন্মালে আমরা এখনও বঙ্কিমী ভাষায় কথা বলোতাম।'

ববি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'রবীন্দ্রনাথ বাঁকা ভাষায় লেখেননি?'

'বাঁকা ভাষায়?'

'ধরো, দুটি কিশোরীর বিয়ে হল। খুব বন্ধু। ভোরবেলায় স্বামী একজনকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ? তোমার চোখে জল কেন? সে জবাব দিল, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।' ববি গুহ চুমুক দিল।

সবাই হইহই করে উঠল। সন্ধি জিজ্ঞাসা করল, 'দ্বিতীয়জনের কেসটা কী?'

ববি বলল, 'দ্বিতীয়জনকে সকালবেলায় বান্ধবী জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, কেমন আছিস?' সে

বলল, 'কাল রজনীতে ঝড় বয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।' আর স্বামী চলে গেল তার কাজের জায়গায়। কয়েকমাস বাদে স্ত্রী-র চিঠি গেল প্রবাসে স্বামীর কাছে, 'এক রজনীর বরিষণে মোর সরোবর গেছে ভরিয়া'।' আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল। ববি এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো বাঁকা ভাষায় লেখা নয়?'

তপন বলল, 'তোদের মন বিষাক্ত তাই সর্বত্র বিষ খুঁজে বেড়াস।'

সন্ধি বলল. 'মানুষটাকে গুরুদেব বানিয়ে লোকে কী বিপদে ফেলেছিল ওঁকে। একটু যে প্রাণ খুলে তরল রসিকতা করবেন, তারও উপায় ছিল না। ফলে এইরকম আড়াল-আবডাল বেছে নিতে হয়েছে, কী বলেন মধুসূদন দত্ত মশাই!'

মধুসূদন দত্ত চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও দোষ নেই।'

'তার মানে?' ববি গুহ জিজ্ঞাসা করল।

'দেখুন, অচিন্ত্যকুমার অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র যদি অশ্লীল শব্দ লেখেন আপনাদের আপত্তি নেই। বুদ্ধদেব বসু বা সমরেশ বসু লিখলে সাহিত্যের সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন না। আমি অবশ্য তেমন বুঝি না, বিদেশি ক্লাসিক এবং মহাভারতে তো ওসবের ছড়াছড়ি। এতে কোনও অন্যায় হত না। যত দোষ রবীন্দ্রনাথের বেলায়? তাঁর প্রেমের কবিতা কামহীন হবে? নীরক্ত মানুষ নিয়ে কবিতা লিখবেন এমন ধারণা নিয়ে এখনও বসে আছেন আপনারা? তিনি অশোভন ভাষায় লিখতে পারেননি কিন্তু চমৎকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সেটা উপভোগ না করে বক্র কথা বললে কী আনন্দ পাওয়া যায় তা বুঝি না।' কথা বলতে-বলতে মানুষটার গলা চড়ছিল। শেষ হওয়ামাত্র যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ভেবে মাথা নিচু করলেন।

আমার বন্ধুরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সন্ধি বলল, 'আপনার দেখছি বেশ পড়াশুনা রয়েছে, তাহলে মদ বিক্রি করেন কেন?'

মধুসূদন দত্ত জিভ বের করলেন, 'ছি-ছি! আমি নিতান্তই মূর্খ। অবসর সময়ে ভালো লাগে বলে ওঁর বই-এর পাতা ওলটাই। আর একপ্লেট মাছভাজা দেব?'

আমি বুঝতে পারছিলাম, তাল ভঙ্গ হয়ে গেছে। বন্ধুদের মেজাজ চলে গেছে তাই বললাম, 'আপনি লাঞ্চের ব্যবস্থা করুন। বেলা তো বেশ হয়ে গেছে।'

মধুসূদন দত্ত চলে গেলে ববি গুহ বলল, 'লোকটা তো বহুত খচ্চর। দিল মেজাজের বারোটা বাজিয়ে। একে টাইট দিতে হবে।'

বললাম, 'গরিব মানুষ, ওকে টাইট দিয়ে কি হবে?'

'অনধিকার চর্চা করল। ওর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে করল। মানছ?'

'মানছি। তবে ভুলে যাও এটা।'

খাওয়া শেষ হলে সবাই গা এলাল। খাটে না কুলোতে মেঝেতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল কেউ-কেউ। আমি বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিস্ত্রিরা এখন ওপরে উঠে এসেছে। দ্রুত কাজ করছে ওরা। এবার সোজা মাথা তুলে দাঁড়াবে পিলার। মধুসূদন দত্ত মাথা নিচু করে কাছে এলেন, 'আমাকে মাপ করবেন স্যার।'

'কেন?'

'ছোট মুখে বড় কথা বলা ঠিক হয়নি।'

'কখনও-কখনও অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। আপনি কোনও অন্যায় করেননি।'

'কিন্তু ওঁরা অতিথি। একটু প্রমোদ করতে এখানে এসেছেন। আসলে আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারি না। যাকগে।' নিশ্বাস ফেললেন মধুসূদন দত্ত, 'আচ্ছা, এটা ঠিক কি বানাতে চাইছেন বলুন তো! পাঁচ ফুট লম্বা হবে অথচ সিঁড়ি থাকবে না ওপরে ওঠার। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'শেষ হোক, তারপর বলব। আপনি শুধু একটা কাজ করুন। বোলপুরের খোয়াই স্টোর্সে কাউকে পাঠান। ওরা একটা শ্বেতপাথরের ফলক দেবে, বিকেলে মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। টাকাপয়সা দেওয়া আছে।'

'শ্বেতপাথরের ফলক! তার মানে স্মৃতিসৌধ?'

'এখন নয়। কুড়ি-পঁচিশ বছর বাদে হলেও হতে পারে।' আমি হাসলাম, 'দাঁড়াও পথিকবর দেখে তো লোকে এখনও পার্কসার্কাসে দাঁড়িয়ে পড়ে।'

মধুসূদন দত্তের মুখ গম্ভীর হল, 'স্যার, আমি একবার গিয়েছিলাম ওখানে। মন টানছিল বলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে মনে হয়েছিল, না এলেই হত।'

'কেন?'

'মনে হল, কবি যেন পথিকের অনুকম্পা ভিক্ষে করছেন। তোমরা যদি বঙ্গদেশে জন্মাও তাহলে দয়া করে একটু দাঁড়াও। বাঙালির মতো স্মৃতিমোছা জাত আর কোথায় আছে, তা তো জানা নেই। ছেলেপিলে না থাকলে অথবা ব্যাবসা না হলে এদেশে কোনও মহৎ স্রষ্টার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয় না। জন্মদিন পালন তো দূরের কথা। মধুসূদন দত্ত সেটা জানতেন না। তাই এখন ওই লেখার দিকে কেউ অবহেলায় তাকায় না। আচ্ছা চলি, আবার সন্ধেবেলার স্টক আনতে হবে।'

বিকেলে খোয়াই স্টোর্স থেকে প্যাকেট এল। বন্ধুরা তখন চা পান করছে। আমি মোড়ক খুললাম না। মিস্ত্রিদের কাজ শেষ হয়নি। ওরা কথা দিল কাল সকালের মধ্যেই কাজ শেষ করবে।

আজ খুব হাওয়া দিচ্ছে। গাছেরা বেশ দুলছে, যদিও আকাশে মেঘ নেই। স্নানটান সেরে সবাই গুছিয়ে বসেছে বারান্দায়। সন্ধি বলল, 'আজ চাঁদ উঠলে ভালো লাগত।'

তপন বলল, 'আমার একসময় ধারণা ছিল, শান্তিনিকেতনে এলে দারুণ-দারুণ রমণীর দেখা পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে মহুয়া আর সারারাত নাচ।'

'ননসেন্স! পঞ্চাশে পৌঁছেও প্রিমিটিভ ভাবনা নিয়ে বসে আছিস। এখন আমাদের হিম্মত বলে কিছু নেই। ইচ্ছে হলেও কেউ একা সোনাগাছিতে যেতে পারব না। এখন এইসব উলটোপালটা কথা বলে লাভ কী! মহাকবি মধুসূদন কোথায়?' সন্ধি বলল।

ববি গুহ চ্যাঁচাল, 'মধুবাবু! মাল নিয়ে আসুন। সন্ধে যে যায়।'

কোনও সাড়া দিল না। আমি উঠলাম। হোস্ট হিসেবে এখনই মদ পরিবেশনের দায়িত্ব আমার। কিন্তু মধুসূদন দত্ত তো এখনও ফিরে আসেনি। তবে কী স্টক জোগাড় করতে পারেনি অথবা সেটা করতে বাইরে গেছে। আমরা আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম।

ববি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না।' মাথা নাড়ালাম আমি।

'লোকটা থাকে কোথায়?'

'ঠিকানা জানি না। কখনও কামাই করেনি।'

'এ বাড়ি তৈরির জন্য তোমার কাছে দক্ষিণা নেয়নি?'

'এখনও না।'

'মুশকিল হয়ে গেল। এরকম সম্পূর্ণ অজানা লোককে দায়িত্ব দেওয়া কি ঠিক?'

'ভদ্রলোক আমার কোনও ক্ষতি করেননি আজ পর্যন্ত।'

'এখন মদ না পেলে—। কেউ আমার সঙ্গে চলো, বোলপুর থেকে কিনে আনি।'

আমার বাড়িতে এসে ওরা পয়সা দিয়ে মদ কিনে খাবে সেটা হয় না। অতএব আমিই ববি গুহ-র সঙ্গে চললাম। গাড়ি চালাতে-চালাতে ববি যখন মধুসূদনকে গালাগাল দিচ্ছিল তখন তাতে কান দিচ্ছিলাম না। মধুসূদনের ওপর দুপুর থেকেই খেপে আছে সে। কিন্তু লোকটার কি হল? কখনও খেলাপ করেনি আজ পর্যন্ত।

আইনসম্মত মদের দোকানে পৌঁছে দেখলাম সন্ধের পরেও কাউন্টার ফাঁকা। ববি গুহ যে ব্র্যান্ড চাইল পাওয়া গেল না। রুচি নিয়ে নামাতে হল, দামও বেশি। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার বলল, 'আনার খরচ আছে। তা ছাড়া এখানে বিক্রিও কম হয়।'

'মধুসূদন দত্তকে চেনেন?' ববি গুহ আচমকা প্রশ্ন করল।

'কোন মধুসূদন?'

'বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মদ বিক্রি করে।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদের বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'ধরেননি কেন?'

'কে ঝামেলা করে বলুন।'

'কোথায় থাকে লোকটা জানেন?'

'না। তবে ও বোলপুরে বিক্রি করে না। শান্তিনিকেতনেই ঘুরে বেড়ায়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে রাগতস্বরে ববি বলল, 'একদম জালি লোক। কার পাল্লায় পড়েছিলে ভেবে দ্যাখ। আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাকে জ্ঞান দেয়!'

সেদিন জমবে না-জমবে না করে শেষপর্যন্ত জমে গেল। আমার নতুন বাড়ির বারান্দায় প্রায় গোটা তিন বোতল মদ শেষ হয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ প্রত্যেকেরই নেশা জমজমাট। সন্ধি গান গাইছিল। আমাদের যে-কোনও পার্টিতে ও মেজাজ হলে গায়। ওর ভরাট গলায় আমার সর্বস্ব যেন কেঁপে উঠছিল, 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।' হয়তো সুরা কাজ করছিল কিন্তু আমি এই বন্ধুদের একপাশে বসে কী একা হয়ে যাচ্ছিলাম! আমার বুকের ভেতরে রক্ত ঝরে যাচ্ছিল অসাড়ে। যখন সন্ধি গাইল, 'অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা হলে আমারে তার অর্থ শেখা' তখন হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল। যতবারই সে আমার হয়ে 'বুঝিয়ে দে' গাইছিল ততবারই মনে হচ্ছিল এক জীবনে বোঝা যাবে না। আমি কাঁদছিলাম কিন্তু আমার চোখে জল ছিল না। আমার সর্বশরীরের সঙ্গে মিশে থাকা একাকীত্ব কেঁদে মরছিল। সন্ধি গান থামাল। তারপর ববি গুহ-র দিকে মুখ ফিরিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'কিছু ঢুকল মাথায়?'

'ঠিক হ্যায়।' ববি চোখ বন্ধ করে জবাব দিল।

'ঠিক নেই। দুপুরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাজে বকছিলি না? আজকের এই অন্ধকারে একচল্লিশ সালে অস্ত-যাওয়া রবীন্দ্রনাথের লিপি লেখা আছে, তার অর্থ শেখা তোর কোনওকালে হয়ে উঠবে না।'

'অ্যাই তুই আমাকে ইনসাল্ট করছিস!' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ববি গুহ।

'সত্যি কথা হজম করার চেষ্টা কর।'

'নো, নেভার। আমি এখানে অপমানিত হতে আসিনি। আমি চলে যাচ্ছি আমার বাড়িতে। এই, কেউ যাবে আমার সঙ্গে?'

আমি ববি গুহকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও সুস্থ ছিল না। তপন এবং সৌমেন ওর সঙ্গে চলল। ওরা যখন গেটের কাছে এবং আমি সঙ্গে থেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি ঠিক তখন একটা গাড়ি এগিয়ে এল। তার হেডলাইটে চারপাশ উদ্ভাসিত। একজন পুলিশ অফিসার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে আমি মাথা নাড়লাম। উনি বললেন, 'আপনি মধুসূদন দত্তকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কী তাকে কিছু কিনতে পাঠিয়েছিলেন?'

'আমি ঠিক পাঠাইনি, উনি নিজেই আনতে চেয়েছিলেন। কেন? কী হয়েছে?'

'আমি একটা খারাপ খবর দিচ্ছি। উনি একটু আগে মারা গিয়েছেন।'

'মারা গিয়েছেন।' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যাঁ। ব্যাগ হাতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসে ধাক্কা খান। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষপর্যন্ত সেন্স ছিল। মারা যাওয়ার আগে আপনার নাম-ঠিকানা বলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েও ব্যাগের হাতল ছাড়েননি। ওতে মদের বোতল ছিল কিন্তু ভদ্রলোক নেশা করেননি।'

পুলিশ অফিসার একজন সেপাইকে বলতে সে মধুসূদন দত্তের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করব না। কাল সকাল দশটা নাগাদ একবার আপনি যাবেন। ওঁর আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া দরকার।'

'যতদূর জানি কেউ ছিল না ওঁর।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। ওর ডায়েরির নাম মধুসূদন দত্ত কিন্তু সেটা যে সত্যি তা আপনাকে অনুগ্রহ করে বলতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।' অফিসার গাড়িতে উঠতেই হেডলাইটের আলো ঘুরে ফিরে গেল। ওই গভীর গহন অন্ধকারে এখন আমরা একা।

বারান্দায় যারা বসেছিল তারাও পুলিশের গাড়ি দেখে বেরিয়ে এসেছিল। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। মধুসূদন দত্ত নেই। বকরূপী ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উত্তর মানুষ কখনও মনে রাখে না।

হঠাৎ ববি গুহ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে, 'শালা, নিজেকে খুব ছোট লাগছে রে এখন। লোকটাকে আমি মিছিমিছি সন্দেহ করেছিলাম।'

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'কী অবিশ্বাস্য!'

ববি গুহ ফিরে এল। আমরা আবার বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। মধুসূদন দত্তের ব্যাগটাকে তুলে আনতে হয়েছে। অন্ধকারে ব্যাগের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধি বলল, 'লোকটা আমাদের জন্যে মদ কিনতে গিয়ে মরে গেল! অবিশ্বাস্য!'

অবিশ্বাস্য শব্দটা যেন ওর জিভে আটকে আছে।

তপন বলল, 'আমি আমার ঠাকুরদা, বাবার মৃত্যু দেখেছি। ওঁদের বয়স হয়েছিল।'

'দূর! বাবর, আকবর, সিরাজ, রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ একসময় বেঁচেছিলেন, এখন নেই। তার মানে তাঁদেরও মরতে হয়েছে। সবাইকে মরতে হবে। তুই আমি কেউ শালা বাঁচব না। এই মধুসূদন দত্ত সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল। এই জন্যে আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না। যা ইচ্ছে তাই করি। ওর ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের কর।' ববি গুহ বলল।

সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য।'

'হোয়াই?' ববি খেপে গেল।

'লোকটা মদ পাঠিয়ে দিল অথচ দাম নিতে আসবে না। এখন সে শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে। আর তুই তার পাঠানো মদ খাবি?' সন্ধি বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'লোকটার আত্মা এতে শান্তি পাবে।' ববি গুহ বোতল বের করল, 'বাঃ, এই তো আমাদের ব্র্যান্ড। ওর কাউকে তুমি চেনো যাকে দামটা দিয়ে দিতে পারি?'

'না, কাউকে চিনি না।' অন্ধকারেই মাথা নাড়লাম আমি।

'তোমার কাছেও এই বাড়ি বানাবার জন্যে টাকা পেত তো?'

'পেত।'

'কী করবে?'

'জানি না।'

*

গতরাত্রে কেউ ডিনার খায়নি। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলো দুঃখী-দুঃখী হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ক্রমশ খারাপ লাগা অথবা লোকটির জন্যে যে কষ্টবোধ তা অসাড় হয়ে গেল। একসময় কিছুই ভাবছিলাম না আমি। মাথার ওপর অনেক তারা। এরা সব পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। গতকাল মধুসূদন দত্ত ছিলেন, আজ নেই। নিজের জন্যে যে ভাবনা তার কি কোনও সুস্থ মীমাংসা নেই?

ঘুম ভেঙেছিল সকাল-সকাল। বন্ধুরা সবাই মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। খাটে কুলায়নি কিন্তু কেউ তার তোয়াক্কা করেনি। বাগানে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিস্ত্রিরা এসে গেল। কাজে লেগে গেল তারা। মনে হয়, ওদের নিষেধ করি। কোনও দরকার নেই। ওইভাবে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও দরকার নেই। কিন্তু পিলারটিকে অসম্পূর্ণ রাখার তো কোনও মানে হয় না। শেষ করুক ওরা।

বন্ধুরা উঠল। কয়েকজনের ইতিমধ্যে হ্যাঙওভার হয়ে গেছে। কালো কফি খেল তারা। খাওয়াদাওয়া করে দুপুরের ট্রেনে সবাই ফিরে যাবে কলকাতায়। হঠাৎ ববি গুহ বলল, 'তোমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ। তোমরা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাও, আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরব।'

'না, চলো সবাই মিলে যাই। বডি যদি পাওয়া যায় লোকটার শেষ কাজ করে যাই আমরা। আফটার অল শেষসময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই তো ছিল।' ববি গুহ বলল। দেখলাম অন্যরাও একমত।

তখনও সদরে শরীর চালান দেয়নি পুলিশ। ববি গুহর তৎপরতায় সেটা বন্ধ করা হল। আমি মধুসূদন দত্তকে আইডেন্টিফাই করলাম। পোস্টমর্টেম ছাড়াই ববি দুপুর নাগাদ দাহ করার অনুমতি জোগাড় করল।

মধুসূদন দত্তকে শ্মশানে নিয়ে আসতে আমাদের কাঁধ দিতে হয়েছিল। আমরা কলকাতাবাসী সুখী মধ্যবয়সি সম্পন্ন মানুষ, এতে অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও গম্ভীরভাবে কাজটি সম্পন্ন করলাম। সৎকারের ব্যবস্থা হল। হঠাৎ বাধ কোত্থেকে এক বালককে ধরে নিয়ে এল। বলল, 'এ মুখাগ্নি করবে—'

'সে কী?' সন্ধি অবাক।

'আমরা শালা হিন্দু, পোড়াচ্ছি যখন তখন মুখাগ্নি করাতে তো হবেই। এই বাচ্চাটার বয়স আট। আরও সত্তর বছর বাঁচবে ধরে নিতে পারি। ওর বাপ-মা নেই, চায়ের দোকানটায় কাজ করে। ওই করুক মুখাগ্নি। যতদিন বাঁচবে ততদিন মনে রাখবে লোকটাকে।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে দশ টাকা। শোন, যাঁর মুখে আগুন ছোঁয়াবি, তাঁর নাম মধুসূদন দত্ত। বলো তো নামটা?'

কচি গলায় উচ্চারিত হল, 'মধুসূদন দত্ত।'

'আবার বলো।'

'মধুসূদন দত্ত।'

'ভুলবি না?'

বালক মাথা নেড়ে 'না' বলল।

পাটকাঠির আগুন বালক ছোঁয়াল মধুসূদন দত্তের মুখে। আগুন জ্বলল চারপাশে, ববি চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।'

সন্ধি ধমকে উঠল, 'অ্যাই চুপ কর। আমি মন্ত্র পড়ছি। শেষ মন্তর!' বলেই সে গান ধরল, 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।'

পূর্বপল্লিতে ফিরে এলাম শেষ দুপুরে। সারাদিন কারও খাওয়া হয়নি। স্নান হয়নি। সবাই খুব ক্লান্ত। আমার কেবলই মনে পড়ছিল সেই মহিলার কথা, যিনি ত্যাগ করেছিলেন মধুসূদন দত্তকে,

যিনি এখনও জানেন না প্রচলিত অর্থে তিনি বিধবা। একটা মানুষ ছিল, একটা মানুষ নেই, কি সামান্য তফাত।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি মিস্ত্রিরা অপেক্ষা করছে। তাদের কাজ শেষ। তিরিশ ফুট মাটির তলায় ডুবে থাকা পিলার পাঁচ ফুট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণভাবে। হেডমিস্ত্রি এগিয়ে এল, 'এখন কী করতে হবে বাবু?'

বোলপুর থেকে মধুসূদন দত্ত যে প্যাকেটটা আনিয়ে দিয়েছিলেন সেটা ঘরেই পড়ে আছে। ওই প্যাকেট থেকে ফলকটা বের করে পিলারের ওপর লাগিয়ে দিতে হবে সিমেন্ট কাঁচা থাকতেই। যতদিন পিলারটা থাকবে ততদিন লোকে ফলক দেখে জানতে পারবে অরবিন্দ মিত্র নামে একজন মানুষ এখানে বাস করতেন। ইতি কী ভাবল, বন্ধুরা কী মনে করল তাতে কি এসে যায়। এদেশে লোকে যখন নিজের নামে একটা স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারে, তখন আমি একটা বাড়ি বানাতে পারি না?

কিন্তু এখন অস্নাত, অভুক্ত এই আমি একদম সময় পাচ্ছিলাম না ভেতর থেকে ওই ফলক বের করতে। আজকের দিনটা যাক, এর পরেরবার যখন আসব তখন হয়তো মন এবং শরীর অনেক চাঙ্গা থাকবে, সায়ও পেয়ে যেতে পারি।

'যাদের হ্যাঙওভার হয়েছে তারা একটু পান করে নাও, ফিট হয়ে যাবে।' ববি গুহ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করল গ্লাস হাতে।

সন্ধি কিন্তু-কিন্তু করল, 'খালি পেটে খাব?'

'নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্নান সেরে ভাত-ঘুম। সন্ধের ট্রেনে কলকাতা। আরে, এই বাড়িতে এসেছি যা ইচ্ছে তাই করব বলে। নিয়ম মানতে তো কলকাতাই রয়েছে।' ববি চিৎকার করল।

সন্ধি যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল, 'অরু, তোর বাড়ির নাম দে ইচ্ছেবাড়ি।'

ওরা সব ভেতরে চলে গেল। ইচ্ছেবাড়ি। বুকের মধ্যে খলখলিয়ে উঠল শব্দদুটো। যা ইচ্ছে তাই নয়, আমার ইচ্ছে এইখানে থেকে যাক অনন্ত বছর। আমি মনে-মনে একটা ফলক বসিয়ে দিলাম। ওই কাঁচা পিলারের গায়ে, 'ইচ্ছেবাড়ি'। মধুসূদন দত্ত আমাকে বলেছিলেন, 'যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সৃষ্টি রেখে যান। যাঁরা সাধারণ এবং সক্ষম, তাঁরা অন্তত একটা বাড়ি রেখে যেতে পারেন।' আর সেই বাড়িটার নাম ইচ্ছেবাড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে! মিস্ত্রিদের আমি ছুটি দিয়ে দিলাম। সামনের রবিবার সকালে ওদের আবার আসতে হবে নতুন ফলক লাগাবার জন্যে।

আমি বন্ধুদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে পা বাড়ালাম।



পুলিশের নাম বসন্ত

ট্রামবাস চলতে শুরু করে দেয় দুটো নাগাদ, ওই সময় আর কেউই রং ছোড়ে না। তবু অহনা ইতস্তত করেছিল, 'কালকের দিনটা ছেড়ে দাও।'

স্বপ্নময় বলেছিল, 'ইমপসিবল। আগামীকাল বছরের সবচেয়ে বড় চাঁদ উঠবে আর একসঙ্গে দেখব না? তুমি এরকম ভাবতে পারছ?'

অহনা স্বপ্নময়ের মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল এত আর্তি সে আর কারও মুখে দেখেনি। তবু তার গলায় নরম সুর বাজল, 'আমার না ভীষণ ভয় করে। রং দেওয়া-নেওয়া আমি কোনওদিন করিনি। সারা সকাল-দুপুর দরজা বন্ধ করে গান শুনি।'

'সেটা দুপুর পর্যন্ত শুনে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে এসো।'

'কিন্তু মা-বাবা কী ভাববে?'

'তার মানে? তুমি কচি খুকি নাকি? তা ছাড়া ন'টার মধ্যেই তো ফিরে যাচ্ছ!'

'তুমি বুঝতে পারছ না যে, আমি রঙের দিন ঘরের বাইরে বের হই না। সেই আমি বিকেলবেলায় বেরুচ্ছি, ওরা বিশ্বাসই করতে পারবে না।'

'বিশ্বাস করাও। মোটের ওপর কালকের চাঁদ আমরা একসঙ্গে দেখব।'

অহনা ফিরে গিয়েছিল কিন্তু-কিন্তু মুখ নিয়ে। স্বপ্নময়ের বাড়িতেও দোল খেলার তেমন চল নেই। বাবা-মায়ের বন্ধুরা অবশ্য গাড়ি চালিয়ে আসে। একটু-আধটু আবির ছুড়ে তাস খেলতে বসে যায়। সঙ্গে থাকে বিয়ার আর ভদকা। সুভদ্রার মা মাছভাজা সাপ্লাই দেয়। বাবার বন্ধুদের স্ত্রী-রা তো বটেই, এইদিন মায়ের হাতেও গ্লাস দেখেছে সে। এবছর বাবাই তাকে ডাকল, 'স্বপ্ন, এদিকে এসো।'

বিছানায় শুয়ে বব ডিলানের ক্যাসেট শুনছিল সে। অহনা তাকে দিয়েছে। সুমনের গানের ধরনও কিছু কথাবার্তা যে বব ডিলান থেকে নেওয়া সেটা বুঝে উত্তেজিত হচ্ছিল সে। সুমন তার প্রিয় গায়ক। হোক না নেওয়া, রবীন্দ্রনাথও তো নিয়েছেন। আসলে অন্যের জিনিস নিয়ে নিজের মতো পরিবেশন করতে হিম্মত লাগে।

বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। এখন সকাল সাড়ে দশটা। কার্পেটে বাবু হয়ে বসে চেপে খেলা হচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মা গ্লাস নামিয়ে রাখল। এদের প্রায় সবাইকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। যে দুজনকে দেখেনি তাদের একজন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ভাই? দেওর না ভাই?'

মায়ের মুখ লাল হয়েই ছিল। বলল, 'ধ্যাৎ। আমার ছেলে। স্বপ্নময়।'

বাবা ডাকলেন, 'স্বপ্নময় এসো। সবাইকে হ্যালো বলো।' এই ব্যাপারটা সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বাবা চালিয়ে আসছে। বাড়িতে কেউ এলেই তার ডাক পড়ে 'হ্যালো' বলার জন্যে। আজ সে বলল, 'আপনারা ভালো আছেন?'

ডার্বিকাকা, ভদ্রলোকের নাম ডার্বি দাশগুপ্ত, বললেন, 'আছি হে। তা তুমি যে ঘরবন্দি হয়ে আছ। যাও, রং-টং খেলো। কলেজে পড়ছ তো?'

'পার্ট টু দেব।'

'তবে? এখনও দু-এক পিস গার্লফ্রেন্ড হয়নি?'

সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্বিদা, আমার ছেলের মাথাটা খাবেন না।'

সবার হাসি থামলে বাবা একটা গ্লাসে ভদকার সঙ্গে লিমকা মিশিয়ে এগিয়ে ধরলেন, 'নাও। খাও। এককালে বাঙালি আজকের দিনে ভাঙ-এর শরবত খেত। টেস্ট করো।'

'আমার ঠিক ভালো লাগে না।'

ডার্বিকাকা বললেন, 'আরে না খেলে বুঝবে কী করে ওটা ভালো না মন্দ? তোমরা কীরকম লাকি বলো তো? বাবা নিজের হাতে ভদকার গ্লাস তুলে দিচ্ছে! আমাদের বাবারা দৃশ্যটা ভাবতেও পারতেন না।'

বাবা বললেন, 'এটা তো খারাপ কিছু নয়। সিগারেট, মদ আজ বাদে কাল ও নিজেই খাবে। আমি শুধু বলব নেশার গলায় লাগাম না পরাতে পারলে কখনও নেশা কোরো না।'

স্বপ্নময় বলল, 'আমি আসছি।'

বাবা মাথা নাড়তেই সে বেরিয়ে গেল। ফ্ল্যাটটা বড়। কোণের ঘর স্বপ্নময়ের। একটা ছোট্ট ব্যালকনিও রয়েছে। সে ব্যালকনিতে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল।

রাস্তায় জোর হোলি খেলা চলছে। এরইমধ্যে কিছু মানুষ প্রায় ভূত সেজে হল্লা করছে। তাদের মুখে চকচকে রং, ভঙ্গি-সিনেমায় দেখা আফ্রিকার ক্যানিবালদেরও হার মানায়। কয়েকটি মেয়েকেও মাথায় পট্টি বেঁধে রঙিন হয়ে যেতে দেখল সে। এই যে রঙের জন্যে একবেলার উল্লাস, দূর থেকে দেখতেও ভালো লাগে না স্বপ্নময়ের। সে মুখ তুলল। পাশের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে মুন্নি দাঁড়িয়েছিল। চোখাচোখি হতে করুণ হাসল, 'ওদের কী মজা, না স্বপ্নদা?'

'তোমার রং খেলতে ইচ্ছে করছে?'

'খু-উ-ব। কিন্তু কার সঙ্গে খেলব? মা বলেছে নিচে নামা চলবে না?'

মুন্নির বয়স বড়জোর আট। স্বপ্নময় হেসে বলল, 'বাবা-মায়ের সঙ্গে খ্যালো।'

'বাবা তো নেই। আজ হোলি বলে বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় চলে গিয়েছেন গতকাল। এই, তুমি আমার সঙ্গে রং খেলবে?' মুন্নির মুখের চেহারা বদলে গেল।

'আমার যে রং খেলতে ভালো লাগে না।'

'খ্যালো না। প্লিজ, আমার জন্যে খ্যালো। শুধু আবির। আর কিছু না।'

'আবির কোথায় পাব?'

'আছে। বাবা কিনেছিল দীঘায় নিয়ে যাবে বলে। আমি তা থেকে খানিকটা রেখে দিয়েছি। ও স্বপ্নদা, এসো না, প্লিজ।'

'শুধু কপালে কিন্তু—।'

'ঠিক আছে বাবা। মা-মা, স্বপ্নদা আসছে রং খেলতে।' মুন্নি ছুটে গেল ভেতরে। স্বপ্নময় আড়ষ্ট হল। তার যেটা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সেটাই করতে হবে? বাচ্চা মেয়েটা ওইভাবে বলতে তার মুখ ফসকে—! যাকগে, একটা শিশু যদি আনন্দ পায়, পাক। সে বাইরের ঘরে আসতেই মা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে?'

'পাশের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।' গম্ভীর গলায় বলল স্বপ্নময়।

'কেন?'

'মুন্নি ডাকছে।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। দরজা বন্ধ করতেই ওপাশের দরজা খুলে গেল। মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে, 'কী মজা! এসো।'

সিঁড়িতে কেউ নেই। ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে স্বপ্নময় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়, আবির দাও।'

এই সময় মুন্নির মা বেরিয়ে এলেন, 'কী ব্যাপার স্বপ্নময়? তুমি!' ভদ্রমহিলার মুখে মিষ্টি হাসি। মহিলা সুন্দরী। এ পাড়ায় এত সুন্দর ফিগার কারও নেই। স্বপ্নময়ের না জানা কোনও কারণে মা ওঁকে পছন্দ করেন না। মুন্নির মাও অন্য কোনও ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করেন না।

'মুন্নি বলল, রং খেলার সঙ্গী পাচ্ছে না—।'

'ও তাই বলো, ব্যালকনি থেকে বলেছে। আমাকে তো সকাল থেকে পঁচিশবার বলল। আচ্ছা, তুমিই বলো, আমি ওর সঙ্গে কি রং খেলব?' প্রশ্ন শেষ হওয়ামাত্র হাসি বাজল।

ইতিমধ্যে মুন্নি আবিরের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তার মা চোখ পাকাল, 'নো। এখানে নয়। ঘর নোংরা হবে। ব্যালকনিতে যাও মুন্নি।'

মুন্নি স্বপ্নময়কে ডাকল, 'এসো।'

ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই নিচ থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'হোলি হ্যায়।'

এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। বাঙালি নিজের অজান্তেই হিন্দি বলে। 'হোলি হ্যায়', 'দুর্গা মাঈকি জয়'। হিন্দি না বললে আবেগ জোরদার হয় না।

হঠাৎ মুন্নির গলায় 'হোলি হ্যায়' চিৎকার বাজল, এবং স্বপ্নময় মুখচোখে আবিরের আঘাত পেল। যথাসময়ে চোখের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিল বলে রক্ষে। আর সেই সুযোগ নিয়ে মুন্নি মুঠো-মুঠো আবির তার গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময় অন্ধের মতো হাত বাড়াল, 'মুন্নি, আমার হাতে কোনও আবির নেই, আমায় দাও, নইলে তোমাকে মাখাব কী করে?'

'মুন্নি, এক চিমটি আবির স্বপ্নময়ের বাড়ানো হাতে দিতেই তার মা হেসে উঠলেন, 'ইস, কি কিপটে! আরও খানিকটা দে।'

'বেশি দিলে যে শেষ হয়ে যাবে।'

'হোক।'

মুন্নি আর একটু পরিমাণ বাড়াতে স্বপ্নময় তাকে টেনে নিয়ে আলতো করে মুখে কপালে মাখিয়ে দিল। যখন সে রং মাখাচ্ছে তখন মুন্নি স্থির। চোখ বন্ধ, মুখে তৃপ্তির ছাপ, ঠোঁটে হাসি। তারপরই সে ঘুরে দাঁড়াল, 'মা, তুমি নিচু হও।'

সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা হরিণের মতো ছুটে গেলেন, 'না বাবা, আমি না।' মুন্নি তাকে অনুসরণ করল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্নময়। পাশের ঘরে হুটোপুটি চলছে। তারপর মুন্নি বেরিয়ে এল, 'নেই, সব শেষ। কী হবে?'

'বেশ তো, খেলা হল।' স্বপ্নময় ওর মাথায় হাত রাখল।

'এইটুকুনি? জানো, বাবা না এত্তো-এত্তো রং নিয়ে গিয়েছে। কত খেলবে, তোমাদের বাড়িতে আবির নেই?'

'না। আচ্ছা, এখন আমি চলি।'

বাইরের ঘরে পা বাড়াতেই মুন্নির মা এলেন, 'দ্যাখো তো কী কাণ্ড!'

ভদ্রমহিলাকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ওঁর গায়ের চামড়ার সঙ্গে ছোপ-ছোপ আবির আলাদা ছবি তৈরি করেছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আর তো আবির নেই।'

'আর নেই না! ওহো কিছু খাবে না? এইদিন রং খেললে কিছু খেতে হয়।'

'না, না। এখন কিছু খাব না।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। এবং তখনই একটা হইচই আওয়াজ কানে এল। সে কিছু বোঝার আগেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে। দুজন তাকে জাপটে ধরেছে, দুজন মুখে-কপালে-গলায় রং বোলাচ্ছে। সে প্রতিবাদ করার সময় পেল না। ছেলেদের একজন খোলা দরজায় দাঁড়াল, 'বউদি, একটু রং?'

মুন্নির মায়ের আপত্তি কানে এল, 'না ভাই। আমার ওসব...।'

'ওই তো মেখেছেন। স্বপ্নময় মাখাতে পারে আমরা না কেন? শুধু আবির।'

'ওহো! ঠিক আছে, শুধু কপালে কিন্তু—।'

সঙ্গে-সঙ্গে উল্লাস বাজল। স্বপ্নময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ খুলল। মুন্নির মাকে জড়িয়ে ধরে রং মাখাচ্ছে ছেলেটি। কপালে, গলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল হাত। ভদ্রমহিলা দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। ছেলের দল নেমে গেল হইচই করতে-করতে। স্বপ্নময় হাত বাড়িয়ে দরজা টেনে দিয়ে আড়াল আনল। কোনও মহিলার বুকে রং মাখাবার নাম করে হাত দিলে তিনি চুপ করে থাকবেন কেন? সে নিজের ফ্ল্যাটের বেল টিপল।

মা দরজা খুলল, 'কে, কাকে চাই?'

'আমি। সরো।' ভেতরে পা বাড়াল স্বপ্নময়।

'এম্মা! তোর কী চেহারা হয়েছে। দ্যাখো-দ্যাখো তোমার পুত্রের কাণ্ড দ্যাখো। কোনওদিন যে রং খেলেনি সে এবার ভূত সেজে এল, আমি চিনতেই পারিনি।'

ডার্বিকাকুর জড়ানো গলা বলল, 'মা জিজ্ঞাসা করছে ছেলেকে, কে? ভাবা যায়!'

স্বপ্নময় ভেতরে চলে এল। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বললে সেটা মা-বাবার গায়ে লাগত। এরা দিনদুপুরে জুয়ো খেলতে-খেলতে মদ খেয়ে যা ইচ্ছে তাই বলার অধিকার পাবে বলে ধরে নিয়েছে।

বাবার সঙ্গে মায়ের চমৎকার বন্ধুত্ব। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখেনি স্বপ্নময়। বাবার বন্ধুরা বলে, এমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং তারা কল্পনাও করে না। এরা যেন ঠিকঠাক, 'মেড ফর ইচ আদার' পেয়ার। অথচ ছুটির দিনে বা কোনও পার্টি হলে যাঁরা এ বাড়িতে আসেন, তাঁদের নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে যে গোলমাল তা মিটিয়ে দিতে মাকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। বাবার চেয়ে বয়সে একটু ছোট, বড় কোম্পানির বড় অফিসার হিল্লোল ঘোস অনেকটা মদ্যপানের পর গত মাসে চিৎকার করেছিল, 'ওকে বলে দিন, রুমাল পালটাবার মতো বয়ফ্রেন্ড যেন না পালটায়। এতে আমার খুব অসুবিধে হয়। আমি যেমন একজনের সঙ্গে স্টেডি আছি ও তাই করুক, নো প্রবলেম। ডিভোর্স সেপারেশন চলবে না, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেব। প্রমিস!'

পাশের ঘরে বসেও কথাগুলো কানে এসেছিল স্বপ্নময়ের। সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের গলা বেজেছিল, 'প্লিজ হিল্লোল। তুমি নিয়ম ভাঙছ। মদ খাবে কিন্তু মাতলামি করবে না, তোমরা সবাই স্থির করেছিলে। তাই না?'

'ইয়েস ম্যাডাম। আমি মাতাল নই।'

'তোমার গলা পাশের ঘরে আমার ছেলের কানেও পৌঁছে যাচ্ছে!'

'দেন, আই অ্যাম সরি। আমি চুপ করলাম।'

আবার সব শান্ত হয়ে গেল।

বাবা-মা এবং তাদের বন্ধুদের জীবনযাপন এখন বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নময়ের অনেক বন্ধুদের বাবা-মা এবং তাদের বন্ধুরা এই একই জীবনযাপন করে। সোম থেকে বৃহস্পতিবার অফিস অথবা ব্যাবসা। প্রচণ্ড সিরিয়াস লোক তখন সবাই। কিন্তু শুক্রবার এবং শনিবার সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একসঙ্গে জড়ো হয়ে মদ্যপান এবং খাবার খাওয়া প্রায় নিয়মের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়দের সমালোচনা করা তার কাজ নয়। তা ছাড়া মা-বাবা তার সঙ্গে কখনওই অন্যায় ব্যবহার করে না। বাবা তো বলেই দিয়েছে, 'তুমি এখন বড় হয়েছ। ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে। নিজে যা ভালো মনে করবে করো, আমার আপত্তি নেই।'

বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে হেসে ফেলল স্বপ্নময়। এই মুখ যে তার তা ভাবাই যাচ্ছে না। মা যে প্রথমে চিনতে পারেনি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অহনা যদি এই মুখ দেখতে পেত! মুখে রং লাগালে চরিত্র বদলে যায়। অদ্ভুত! কিন্তু সেই রং তুলতে গিয়ে যখন মুখের চামড়া জ্বলতে লাগল, লাল হয়ে গেল তখন স্বপ্নময়ের মনে হল ওই ছেলেগুলো প্রতিবছর এত কষ্ট হবে জেনেও মুখে বাঁদর-রং মাখে কেন?

একসময় সবাই একান্নবর্তী ছিল। এখন যা হয়, তাই হলেও সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। পালাপার্বণে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে সবাই জড়ো হয়। আজ যেমন সকাল হতে-না-হতেই এসে হাজির। ছেলেরা ধুতি-পাঞ্জাবি, মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি। এ-পাড়ায় আটটার আগে রাস্তায় রং খেলা হয় না। অহনার বাবার উৎসাহে যারা পেরেছে তার আগেই পৌঁছে গিয়েছে। গাড়িওয়ালা এসেছে একটু দেরি করে। অহনাদের বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের। মাঝখানে অনেকটা বড় বাঁধানো চাতাল, চারপাশে উঁচু বারান্দা। ওই চাতালে শতরঞ্চি পেতে বসেছে সবাই। সঙ্গে হারমোনিয়াম, তবলা। বেগুনি আবির প্রত্যেকের কপালে। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান গলায়-গলায়। দশটা নাগাদ যখন আসর জমজমাট তখন কারও খেয়াল হল, অহনা সেখানে নেই।

'ও জেঠিমা, অহনা কোথায়? সে এল না কেন?'

অহনার মা খোঁপায় ঘোমটা ঠিক রেখে বললেন, 'ভীতুর ডিম। ঘরের দরজা বন্ধ করে টেপ চালিয়ে গান শুনছে। রঙে তার ভীষণ ভয়।'

দু-চারজন হইহই করে উঠল। এ কেমন কথা? আমরা সব ঝুঁকি নিয়ে এতদূরে এলাম আর বাড়ির মেয়ে ঘরের দরজা আটকে বসে থাকবে? ছুটল তারা। মেয়েরাই সংখ্যায় ভারী। মিনিট চারেকের মধ্যে টানতে-টানতে নিয়ে এল বিধ্বস্ত অহনাকে। তখন তার পরনে অবশ্য বাসন্তী রঙেরই শাড়ি। আসরের মধ্যিখানে বসিয়ে দেওয়া হল তাকে। কেউ একজন আবিরের টিপ পরিয়ে দিতে গেলে সে মুখ ঢাকল দু-হাতে।

অহনার বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই বরং একটা গান গা মা।'

অহনা আঙুলের আড়াল কিছুতেই সরায় না, গান গাইবে কী? তখন আশ্বাস দেওয়া হল, গান শোনালে মুক্তি পাবে। তবে যে-সে গান নয়, 'আজ সবার রঙে রং মিশাতে হবে।'

শেষপর্যন্ত মুখ নিচু করে হারমোনিয়ামে হাত রাখল অহনা। প্রথম দিকে গলায় ঈষৎ কাঁপন, ক্রমশ সেটা স্থির। সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনল। গান থামতেই এক আত্মীয় ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কী গুণী মেয়ে রে তুই। যা গাইলি তা যদি বিশ্বাস নাই করিস তাহলে গানটা এমন সুন্দর হল কী করে?' বলামাত্র আবির ঝরাল অহনার চুলে-মুখে-গলায়।

প্রায় কেঁদে ফেলেছিল অহনা। কিন্তু সামলে নিতে পারল। শুধু মুখে বলল, 'তোমরা কথা রাখোনি।'

ওপাশ থেকে এক মামাতো দাদা বলে উঠল, 'কেউ কথা রাখে না।'

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতাটা হয়ে যাক।' আর একজন মন্তব্য করল।

দাদাটি উঁচিয়ে ছিল। তার আবৃত্তির গলা বেশ ভালো, ফাংশানে ডাক পড়ে। কিন্তু সে মাথা নাড়ল, 'উঁহু। অহনা আর একটা গান না শোনালে আমি কিছুই করব না।'

'গা, গা অহনা, প্লিজ।'

মাথা ঝাঁকাল অহনা, 'আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

দাদাটি বলল, 'বেশি গাইতে হবে না। 'দুজনের কানাকানি কথা—।'

'এম্মা। ওইভাবে মাঝখান থেকে গাওয়া যায় নাকি?' অহনা অবাক।

অহনার মা বললেন, 'এ আবার কীরকম গান?'

'যে গাইবে সে বুঝেছে।'

অহনা মাথা নাড়ল, 'তা ছাড়া ওটা তো রাতেরবেলার গান।'

'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত। আজ রঙের নেশায় আমরা অন্ধ।' দাদাটি বলল।

বাবা বললেন, 'এ তো ছোঁড়া দেখছি বেশ পক্ক হয়েছে। তাই গা—।'

'দুজনের কানাকানি কথা দুজনের মিলনবিহ্বলতা, জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।' অহনার চোখ বন্ধ। হঠাৎ সে চোখের সামনে স্বপ্নময়কে দেখতে পেল। স্বপ্নময় বলেছিল, আজ রাত্রে আমরা একসঙ্গে চাঁদ দেখব। সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের কাছেই নিজের গলা অচেনা মনে হল।' 'তোমার অলস দ্বিপ্রহরে' বলার সময় সে যেন স্বপ্নময়কে ছুঁতে পারল। অথচ এ গান ছোঁয়ার নয়। এ গান ছোঁয়ার বাসনা রেখে যাওয়ার। গান শেষ হতেই লক্ষ পায়রা ডানা মেলল। সবাই হাততালি দিচ্ছে। এমনকী বাবাও। হাত বাড়িয়ে তিনি অহনার চিবুক ধরলেন, 'তুই কী ভালো গাইলি। রাজেশ্বরী দত্তের কথা মনে পড়ে গেল। বাঃ। খুব ভালো।'

মুখে রক্ত জমে গেল অহনার। ভাগ্যিস ছড়ানো ছিল আগেভাগে, নইলে ঠিক ধরা পড়ে যেত এদের কাছে।

কবিতা আর গানে দুপুর গড়াল। আজ খিচুড়ি আর চাররকমের ভাজা। সঙ্গে চাটনি। চেটেপুটে

খেল সবাই। বাবা বলোলেন, 'যদ্দিন বাঁচি তদ্দিন এই আনন্দটুকু করে যাব। যারা সারা বছর ব্যস্ত থাকে, তারা যেন সময় করে সামনের বারও এসো।'

তিনটেয় বাড়ি ফাঁকা। তখন রাস্তায় রঙিন বীরদের দৌরাত্ম্য শেষ। এখন সর্বত্র রঙের দাগ অথচ সেগুলোর কোনও মূল্য নেই।

অহনা নিজের ঘরে জানলার পাশে বসেছিল। এখনও বাইরে ভালো রোদ, আর কিছুক্ষণ বাদে তাকে বেরুতে হবে। কোনওদিন যা করেনি আজ করলে বাড়িতে কী প্রতিক্রিয়া হবে? স্বপ্নময়টা তাকে এমন বিপদে ফেলে দিল। নামটা মনে আসতেই কীরকম একটা ভালোলাগা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, ওর কথা ভাবতেই তার গানের গলা এমন হয়ে গেল যে বাবার রাজেশ্বরী দত্তের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল?

গতকালই অহনা ভেবেছিল মাকে বলে রাখবে বেরুবার কথা। কিন্তু বলব-বলব করেও ঠিক সাহস হয়নি। সে আকাশের দিকে তাকাল। যেহেতু এ আকাশ বসন্তের তাই কীরকম মায়া মাখানো। সে উঠল। করিডোর পেরিয়ে বাবা-মায়ের ঘরে পৌঁছাল। মা বাঁধানো মাসিক বসুমতী নিয়ে শুয়ে আছেন। এটা মায়ের হবি। কবে মাসিক বসুমতী বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু মায়ের তাতে কোনও আপত্তি নেই। এ বাড়িতে যত মাসিক আসত সবই বাঁধানো অবস্থায় এর ওর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। এমনকী প্রথম সংখ্যা দেশ পত্রিকা থেকেও একটিও বাদ নেই। মা দুপুরে বসুমতীর গল্পগুলো পড়ে। বাবা শুয়ে আছে ওপাশে, মায়ের দিকে পেছন ফিরে। মাঝখানে একটা মোটা পাশবালিশ। ওকে ঢুকতে দেখে মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, 'কি রে?'

'আজ বিকেলবেলায় আমি একটু বেরুব?'

'কোথায়?'

'আমাদের এক অধ্যাপকের বাড়িতে, গানটান হবে—।'

'এই রঙের দিনে বেরুবি? কতদূরে?'

'বেশি দূরে নয়।'

পাশ-ফেরা বাবা ওই অবস্থায় বলল, 'অধ্যাপকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে দিয়ে যাও। আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা খুউব হারিয়ে যায়। তেমন হলে পুলিশকে তো বলতে পারব এই ঠিকানায় গিয়েছিল।'

অহনা তীব্র আপত্তি করে উঠেছিল, 'বাবা, তুমি না? ঠিক আছে, আমি কোথাও যাব না।'

মা বলল, 'দামি কিছু পরে যাস না! কে কোত্থেকে রং ছুড়বে। অধ্যাপকের বাড়ি যখন তখন যা। তবে খবর শুরু হওয়ার আগে ফিরে আসিস।'

অহনা বাধ্য বালিকার মতো ঘাড় নেড়েছিল।

হলুদ শাড়ি, হলুদ জামা, চুড়ি, হলদে বাঁধন, কপালে হলুদ টিপ, অহনা যখন পথে নামল তখন কলকাতার রোদ্দুর পূর্ব দিগন্তে। একটা গম্ভীর ছায়া ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। পাড়া থেকে বেরুবার আগে কেউ একজন মন্তব্য করল, 'কেস জন্ডিস!'

গালে রক্ত জমল অহনার, হাঁটার গতি বেড়ে গেল। সে যে আজ হলুদে আছে দেখেই ওই মন্তব্য—ছেলেগুলো দিনরাত রকে বসে থাকে কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো। বড় রাস্তার বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল সবাই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েছে। দোলের বিকেল বলে কেউ ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু সবাই তাকে ঘুরে-ঘুরে দেখছে। এই দেখাটা বড় অস্বস্তিকর। না হয় সব হলুদ পড়েছে তাই বলে মাথা ঘুরিয়ে দেখার কী আছে!

ধর্মতলার মোড় ছাড়িয়ে, রাজভবনের পাশ দিয়ে প্রাইভেট বাসটা যখন আউটরাম ঘাটের

দিকে এগোচ্ছে তখনও আলো ছিল। এসব জায়গায় যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই মরে যাওয়া আলো জানান দিচ্ছে অন্ধকারের। বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল অহনার। টার্মিনাসে বাস থামতেই সে শিরশিরে পায়ে নিচে নামতেই কোথাও স্বপ্নময়কে দেখতে পেল না। অথচ কথা ছিল স্বপ্নময় এইখানে এই সময়ে তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলে? অহনা ঠিক করল এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সময় সে নিজের নামটা শুনতে পেল। চমকে মুখ ফেরাতেই রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো স্বপ্নময়কে দেখতে পেল। পরপর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে বলে এদিকে আসতে পারছে না। চিৎকার করে হাত নেড়ে ডাকছে। চিৎকারটা এমন যে সারা পৃথিবী অহনার নাম জেনে গেল।

অহনাকে এগোতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্নময়। অহনাই রাস্তা পার হল। আর স্বপ্নময় বলল, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'দেরি করলে কেন?'

'কোথায় দেরি? আমি দেখলাম তুমি বাস থেকে নামছ। আমাকে খুঁজছ। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লে। রুমালে আঙুল জড়ালে, 'কী ঠিক কি না?'

'বাঃ, তুমি দূর থেকে দেখছিলে?'

'দেখেই তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। অহনা সত্যি, তোমাকে খুউব...।'

'থাক। চলো, আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

তিন পা হেঁটেই স্বপ্নময় বলল, 'অ্যাই, কী ব্যাপার বলো তো?'

'কী?'

'তোমাকে খুব ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা বলে মনে হচ্ছে আজ।'

'সেটা খারাপ?'

'খারাপ নয়। তবে আজ দোলের দিনে একটু অসুবিধে হয়।'

'তুমি কী করলে সারা সকাল?'

'একটা বাচ্চা মেয়ে আবিরের বায়না ধরেছিল, তাকে শান্ত করতে গিয়ে অন্যেরা এসে বাঁদুরে-রং মাখিয়ে দিল। তা মুখ থেকে তুলতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে।'

'কই দেখি?'

চিবুক তুলল স্বপ্নময়। অহনা বলল, 'দূর, কিছু লেগে নেই।'

'তুমি বই পড়ে গান শুনে কাটালে?'

'নাঃ। সব্বাই এমন ধরল যে একটু আবির মাখতে হল।'

ওরা গঙ্গার ধারে চলে এল। সন্ধে নামছে কিন্তু সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা বসার জায়গা খুঁজল। আশ্চর্য, সব জায়গা আগেভাগে দখল করে নিয়েছে পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকা। এমনকী তিনজোড়া অপরিচিত প্রেমিক-প্রেমিকা গাদাগাদি করে গাছের নিচে বসে কী করে নিজেদের কথা বলছে কে জানে!

অনেক হাঁটাহাঁটির পরও যখন জায়গা পাওয়া গেল না তখন একটি বৃদ্ধ মাঝি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'আসুন, একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা, তিনঘণ্টা-আমার নৌকায় বসে চাঁদ দেখবেন। দোলপূর্ণিমার চাঁদ বলে কথা। এই চাঁদ জলের সঙ্গে সম্পর্ক করে। তাই জলে না বসলে বুঝতে পারবেন না। এখন ঘণ্টা পঞ্চাশ টাকা।'

'পঞ্চাশ টাকা। সর্বনাশ! অত টাকা আমার কাছে নেই।'

'দুজনের যা আছে মিলিয়ে দেখুন না। ছই আছে।'

'ছই-এর মধ্যে বসলে চাঁদ দেখব কী করে?'

বৃদ্ধ হাসল, 'সে আপনাদের যা ইচ্ছে। দেখতে-দেখতেও তো বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়।'

অহনা এতক্ষণ শুনছিল। এবার মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। আমি জলে নামব না।'

বৃদ্ধ বলল, 'আপনি জলে নামবেন কেন দিদি, আপনি নৌকায় থাকবেন।'

'নৌকোটা তো জলে ভাসবে।' অহনা আপত্তি করল।

স্বপ্নময় বলল, 'খুব থ্রিল হত কিন্তু। দেখুন, পঞ্চাশ দিতে পারব না—।'

'ঠিক আছে, পরে বিচার-বিবেচনা করে যা হয় দেবেন।' বৃদ্ধ হাসল।

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটা আরম্ভ করল অহনা। স্বপ্নময় তার পেছনে ছুটে এল, 'কী হল?'

'লোকটির হাসি খুব খারাপ। এখান থেকে চলো।'

অনেকটা দূরে চলে আসার পর সিনেমার মতো চাঁদ উঠল। যদিও রাস্তার কিছু আলো তখনও জ্বলছে কিন্তু পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল।

স্বপ্নময় বলল, 'আচ্ছা কীরকম হাসি খারাপ হয়?'

'জানি না। তবে ওই লোকটার হাসি খারাপ।'

'তাহলে আমরা এখন কি করব? কিছু খাবে?'

'কী খাব?'

'এই ধরো ফুচকা, চা, বাদাম—।'

'তোমার খিদে পেয়েছে?'

'না। কিছু করতে হবে তো।'

'চলো, কোথাও গিয়ে বসি।'

'বসার জায়গা—।' বলোতে গিয়ে মনে পড়ে গেল। উদ্ভাসিত হল স্বপ্নময়, 'চলো, ওই মাঠটায় বসি। দারুণ ব্যাপার হবে।'

ওরা রাস্তা পার হয়ে আইসক্রিমের গাড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় শুনতে পেল, 'সাব, প্লাস্টিক লাগে গা?'

স্বপ্নময় জিজ্ঞাসা করল, 'প্লাস্টিক?'

লোকটা তার স্টক থেকে একটা বড় প্লাস্টিক শিট বের করে দেখাল। স্বপ্নময় ঘাড় নাড়ল, না। লোকটা বলল, 'হ্যাঁ বললে সুবিধে হবে। কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না।'

ওরা লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে মাঠের মাঝখানে চলে এল। দূরে গঙ্গার ধারের দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে। বিশাল মাঠের ওপর আকাশ উপচানো যে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে তার কাছে সেই আলো একেবারেই ম্লান। গোল চাঁদ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। স্বপ্নময় অহনার পাশে বসে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

অহনাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল এতদিন কত চাঁদ কত পূর্ণিমায় আকাশে আলোর ঝড় তুলেছে কিন্তু আগকের মতো কখনও হয়নি। গত পূর্ণিমাতেও নিশ্চয়ই চাঁদ উঠেছিল কিন্তু তার মনেই নেই। আজকের রাতটা মনে থাকবে কারণ স্বপ্নময় পাশে রয়েছে। সে স্বপ্নময়ের দিকে তাকাল। কীরকম মুগ্ধ চোখে চাঁদ দেখছে, 'অ্যাই!'

স্বপ্নময় মুখ ফেরাল না, 'বলো!'

'শুধু চাঁদ দেখতেই এসেছ? কথা বলবে না?'

'ধরো আজ যদি আমরা কথা না বলি, শুধু চাঁদ দেখে যাই।'

'আমার ভালো লাগবে না।'

স্বপ্নময় হঠাৎ ফিরে তাকাল, 'তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসো অহনা?'

অহনা মুখ সরাল, 'জানি না।'

'আমরা একসঙ্গে পড়ি। একসঙ্গে সারাজীবন থাকব?'

'নইলে আজ এখানে আসব কেন?'

'কোনও চাপে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?'

'কখনও না।'

'যদি কখনও আমার ওপর বিরক্ত হও, যদি আমাকে অসহ্য লাগে?'

'আমি জানি না।'

'কেন?'

'ওই যে, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।' স্বপ্নময় বলল।

'তুমি বালক?' হেসে উঠল অহনা।

'আহা তুমি আমার প্রথম প্রেম তো! তা ছাড়া পৃথিবীর সব প্রেম নাকি বিচ্ছেদেই মর্যাদা পেয়েছে। আই কান্ট ড্রিম দ্যাট। এই তোমার হাত দেখি।'

'কেন?'

'একটু ধরব।' স্বপ্নময় হাত বাড়িয়ে অহনার আঙুল স্পর্শ করল। কী ঠান্ডা, ঠান্ডা এবং ভিজে-ভিজে। সে গাঢ় গলায় বলল, 'এই একটা গান গাইবে?'

'ধ্যাৎ, লোকে শুনলে কি বলবে?'

'কেউ কিছু বলবে না। গাও।'

অহনা চোখ বন্ধ করল, 'নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে/শুক্লারাতে চাঁদের তরুণী।' লাইনটা দ্বিতীয়বার গাইতেই কয়েকজন পেছনে এসে দাঁড়াল।

'উঠুন।'

অহনা গান থামাল। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল স্বপ্নময়, 'মানে? কে আপনারা।'

'পুলিশ। উঠে পড়ুন। এখানে ভ্যান আছে।'

'আশ্চর্য! এখানে বসা কি অপরাধ?'

'সেটা থানায় গিয়ে জানতে পারবেন।'

'দেখুন, আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। শুধু এখানে বসেছিলাম।'

'আপনাদের সম্পর্ক?'

'আমরা, আমরা বন্ধু।'

'তাই আপনারা দুজনে আঙুলে-আঙুল জড়িয়ে ছিলেন। এই যে ম্যাডাম, উঠে পড়ুন।'

স্বপ্নময়ের আপত্তি, অনুরোধে কান না দিয়ে একজন ওর হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছিল ভ্যানের দিকে। বাকি দুজন গোরু তাড়ানোর ভঙ্গিতে অহনাকে হাঁটাচ্ছিল। অহনার আশা হচ্ছিল শেষ মুহূর্তে স্বপ্নময় একটা পথ বের করবে! কিন্তু লোকটার পাশে ওকে কী অসহায়, রুগ্ন দেখাচ্ছে। স্বপ্নময়কে ভ্যানে তোলা হলে ইউনিফর্ম পরা এক যুবক অফিসার এগিয়ে এল, 'সবক'টাকে তুলেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।' যে লোকটা অহনার পেছনে ছিল সে তাড়া দিল, 'উঠুন, উঠুন।'

অফিসার অহনার দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখের চেহারা পালটে গেল তার, 'আরে! তুমি? তুমি এখানে কী করছ?'

চিবুক বুকের ওপর নেমে যাচ্ছিল। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো অহনা?'

অহনা মুখ তুলল, 'আমি কিছুই করিনি।'

'আঃ। এখানে সন্ধের পর মাঠে কেউ বসে। কত খারাপ কাজকর্ম হয় এখানে! কলগার্ল আর ভদ্রলোকের মেয়েদের আলাদা করা যায় না। তোমরা প্লাস্টিক শিট নিয়েছিলে?'

সেপাইটি বলল, 'না স্যার।'

'ঠিক আছে। আপাতত ভ্যানে ওঠো।'

উঠতে হল। অহনা দেখল ভ্যানে আরও কয়েকজন ছেলে-মেয়ে নারীপুরুষ রয়েছে। একটি মেয়ে বিড়ি খাচ্ছে। ভ্যান চলল, স্বপ্নময় চুপচাপ মুখে হাত দিয়ে বসে আছে।

কিছুটা যাওয়ার পর ভ্যান থামল। পেছনের দরজা খুলে অফিসার ডাকল, 'অহনা, নেমে

এসো। তাড়াতাড়ি।'

অহনা নামল। অফিসার বলল, 'এটা বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যাও। আমাকে তুমি চিনতে পারছ?'

অহনা কথা বলল না। অফিসার বলল, 'আমার নাম বসন্ত। তোমাদের গলির মোড়েই থাকি। কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারটা পাড়ার কেউ জানতে পারবে না। যাও।'

'ও!' অহনার মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল।

'কী নাম?'

'স্বপ্নময়।'

'বন্ধু, মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

অহনা জবাব দিল না।

'তুমি বড় হয়েছ। এমন ইম্ম্যাচিওর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি মানায়, যে তোমাকে খোলা মাঠে নিয়ে এসে বিপদে ফেলে দেবে? ভেবে দেখো।' অফিসার ভ্যানের দিকে মুখ ফেরাল, 'স্বপ্নময় কে? নেমে এসো। কুইক।'

স্বপ্নময় নামল। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে, চলে গেল দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে। ভ্যানটা বেরিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অহনা। খানিকটা দূরে স্বপ্নময়। ইতস্তত করে সে কাছে এল, 'আই অ্যাম সরি। আসলে আমি জানতাম না এসব হবে।'

অহনা নিরুত্তর।

'লোকটা তোমার পরিচিত বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। উঃ, থানায় নিয়ে গিয়ে বাড়িতে খবর দিলে কী হত ভাবলেই—। তোমার সঙ্গে ভালো চেনা?'

'না। চিনি না। কোনওদিন দেখিনি।'

'তোমাকে হয়তো চেনে।' স্বপ্নময় বলল, 'দেখো, এরপর তোমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'তো?'

'তুমি দেখা কোরো না, প্লিজ।'

'লোকটা তো আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আর ওকে সে সুযোগ দেব না। আমরা কোনও নিরিবিলি জায়গায় কখনও যাব না। কফি হাউসের ভিড়ে বসব।'

এই সময় বাস এসে গেল। এই বাস অহনার পাড়ায় যাবে। অহনা বলল, 'এলাম।'

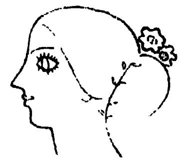
'এখনই। রাত ন'টা বাজতে অনেক দেরি। এখনই যাবে?'

'ওই লোকটা তাই বলে গেল।'

'বাঃ, ওই লোকটার কথা তোমার কাছে বড় হল?'

'অন্তত আজকে তো নিশ্চয়ই—।' বাসে উঠে পড়ল অহনা।

খালি বাস। জানলার পাশে বসতেই তার চোখে পূর্ণিমার চাঁদ আটকে গেল। বাসটা ছুটছে, সঙ্গে চাঁদও। হঠাৎ খুব কান্না পেল অহনার। বুকের ভেতর থেকে কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে আসছে। প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। এবং সেটা করতে-করতে ও আবিষ্কার করল এইভাবে নিজেকে সামলে নেওয়ার নামই জীবনযাপন। এই রাতের কথা কখনও বলতে পারবে না। নিজেকেও নয়। একজন পুলিশের নাম বসন্ত, ভাবা যায়?



বঙ্গ আমার জননী আমার

দোয়েল পাখিদুটোর দিকে তাকিয়ে ইমনের হঠাৎ মনে হল ওরা যে-কোনও মুহূর্তে ডানা নেড়ে আকাশে উড়ে যাবে। তারপর শূন্যে ভাসতে-ভাসতে বাংলা অ্যাকাডেমির চত্বরে গিয়ে বইমেলা দেখে নিতে পারে। মনে হওয়ামাত্র তার বেশ মজা লাগল। মাটিতে দাঁড়ানো মানুষেরা এই বিশাল পাখিদুটোকে জীবন্ত দেখলে দোয়েল বলে ভাবতেই পারবে না, আতঙ্কে ছুটোছুটি করবে।

দিনের-পর-দিন, রাতের-পর-রাত নিষ্প্রাণ পাখিদুটো এ ওর ডানার ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকে। যদি কথা বলতে পারত, কী কথা বলত ওরা?

আজকাল ইমনের মাথায় প্রায়ই এইসব উদ্ভট ভাবনা ঢুকে পড়ছে। কোনওকিছু দেখলে হঠাৎই তার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যায়। সেদিন একটি ছবি দেখছিল ম্যাগাজিনে। পাহাড়ি উপত্যকায় মেষ-পালকেরা মেষ চরাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে নিজের অজান্তে একটা অন্য ছবি তৈরি করে নিল। পাঁচিলঘেরা চত্বরে একটার-পর-একটা মেষকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেষগুলো আনন্দে ঢুকছে। কিন্তু ক্রমশ জায়গাটা ভরাট হয়ে গেল। এ ওর শরীরের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে। বেরুবার অন্য দরজাগুলো একদম বন্ধ। তাদের ওপর লেখা আছে, সেসন জট।

ইমনের বয়স তেইশ। রোগা এবং লম্বা। চোখদুটো খুব উজ্জ্বল, সহজেই চোখে পড়ে। গায়ের রং শ্যামলা। ইমনের বাবা সাধারণ চাকরি করেন, ঘুষ নেন না। এখনও ওদের বাসায় টিনের ছাদ, উঠোনে কাঁঠাল গাছ। যদিও একটা টিভি কোনওমতে কেনা হয়েছে। গাড়ি কেনার স্বপ্ন ওর বাবার নেই। সামর্থও। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ইমন শুনে এসেছে, ওর বাবা উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে সব মানুষ শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে তাঁকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেইসময়ের একটা খবরের কাগজ বাসায় এখনও সযত্নে মা রেখে দিয়েছেন যাতে বাবার নাম ছাপা হয়েছিল। তখন বাবা ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি সাধারণ কর্মচারী। অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। রাজনীতি করেননি কখনও। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মাস ঘরছাড়া ছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ঘোষণা করেননি। নিজের কথা বাবা কখনও বলেন না। ইমন এসব শুনেছে মায়ের কাছে।

ইমন জানে তার ওপর সবাই অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাবা অবসর নেওয়ার পরই সংসারে ঝড় উঠবে। সেইসময় তার আয় খুবই জরুরি। সে যদি পাশ করতে পারত, একটা চাকরি পেত—! কিন্তু পাশ করলেই তো চাকরি পাওয়া যায় না। মাস্টার্স করে কত ছেলে বেকার। পিওনের চাকরির জন্যে এখন গ্র্যাজুয়েটরাও লোভীর মতো অপেক্ষা করে। তাহলে? দিলারা বলেছিল, 'আপনি কানাডায় চলে যাচ্ছেন না কেন? যদি সেখানে যেতে চান তাহলে আমি আমার আব্বুকে বলতে পারি।'

দিলারা আজিজের বান্ধবী। বইমেলায় রোজ বেড়াতে আসে অথচ বই কেনে না। ওর ব্যাগে অনেকগুলো পাঁচশো টাকার নোট থাকে। দিলারা সুন্দরী, মোমের মতো গায়ের রং। আজিজের বেশ কয়েকজন বান্ধবী আছে, দিলারা তাদের একজন। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনও অনুষ্ঠানে আজকাল এইসব মোমরঙা সুন্দরীদের খুব দেখা যায়। তাদের মুখ, চোখ, গড়ন এবং রং যেন কোনও স্বপ্নের

জাদুকরের তুলির ছোঁয়ায় তৈরি। ইমনের মা অথবা আপা, তার পাড়ার বেশিরভাগ মেয়েদের সঙ্গে এদের একটুও মিল নেই। সেইসব মেয়েরা হয় শ্যামলা, নয় সাধারণ গৌরবর্ণ। দিলারাদের মতো টকটকে গায়ের রং তাদের নয়। মাঝেমাঝেই মনে হয় এরা স্বপ্নসুন্দরী। একটু বেশি ভাবলেই তার চোখের সামনে আর একটা ছবি তৈরি হয়ে যায়। একজন মানুষের অনেকগুলো আমের বাগান ছিল। এক-একটা জায়গায় এক-এক জাতের আম। ল্যাংড়া, হিমসাগর থেকে ফজলি। গাছগুলো ঝড় সহ্য করে, বৃষ্টিতে ভেজে, কিন্তু ফাল্গুনেই যে মুকুল ধরে, তা বৈশাখের শেষে থোকা-থোকা আম হয়ে ঝোলে। বাগানের মালিকের কিন্তু তাদের দিকে লক্ষ নেই। সে জানে ওইসব আম পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। সে সচেতন থাকে একটি ছোট্ট বাগানের জন্যে। সেখানে গাছ অল্প কিন্তু প্রতি পদে তাদের যত্ন করতে হয়। আম পাকার সময় থেকে সতর্ক হতে হয়। পাকলে তুলোর বাক্সে ভরতে হয়। বড় দামি আর দামি বলেই তাদের জন্যে যত্নটাও বেশি। অন্য বাগানের আমেরা কাঠের বাক্সে ঢোকার সময় দূর থেকে এই দামি আমদের দেখে আর ঈর্ষান্বিত হয়। ছবিটা এইরকম।

'কী ভাবছেন, 'একা-একা?'

চমকে ফিরে তাকাল ইমন, দিলারা তার পাশে দাঁড়িয়ে।

'কিছু না।' লজ্জা পেল ইমন।

'কিছু একটা ভাবছিলেন। মেলায় যাবেন না?'

'নাঃ। মেলায় গেলে কষ্ট হয়। বই কিনতে পারি না।'

দিলারা তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমার জন্যে না হয় আজ কষ্ট করলেন।'

অতএব হাঁটতে হল। দোয়েল চত্বর থেকে মেলার গেটের মুখে পৌঁছবার রাস্তার দু-পাশে আধুনিক গান আর আবৃত্তির মিলিত শব্দের ঝড় ওদের ওপর আছড়ে পড়ছিল। কয়েক পা হাঁটবার পর আর সহজে এগোনো যাচ্ছিল না। মানুষ আর মানুষ। প্রত্যেকেই নবীন যুবক। হয় তারা মেলায় যাচ্ছে নয় মেলা থেকে ফিরছে। এই ভিড়ের স্রোতে মিশে এক-পা, এক-পা করে তাদের এগোতে হবে। দিলারা ইমনের একেবারে কাছে চলে এল, 'কত মানুষ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ।'

ওরা এগোচ্ছিল। দু-কানে শব্দের ঝড়। হঠাৎ সামনে কয়েকজন যুবক নিজেদের মধ্যে কপট মারামারি শুরু করতেই জমাট ভিড়টা ছিটকে উঠল। দিলারাকে নিয়ে ইমন একপাশে সরে আসার চেষ্টা করছিল। সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো সেই ধাক্কা সামলানো মুশকিল। হঠাৎ দিলারা চিৎকার করতেই ইমন ফিরে তাকাল। একটি তরুণ সেই সময় দিলারার শরীর থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছে। নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ দুই হাতে আড়াল করতে-করতে আর্তনাদ করে উঠেছে দিলারা। তার চারপাশে মেলা দেখতে যাওয়া মানুষ কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। সেই যুবক নির্লিপ্তের মতো দিলারার কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইমন। যুবকের শার্ট টেনে ধরে চিৎকার করল, 'একী করলি তুই? তোর বাসায় মা-বোন নাই? বদমাশ, ইতর!' উত্তেজনায় তার গলা চিরে গিয়েছিল।

যুবকটি ফিরে তাকাল। তার চোখে নাৎসিদের চাহনি। আচমকা ঘুষি মারল সে ইমনের মুখে। ইমন পড়ে গেল ভিড়ের নিচে। এবং তারপরেই পেছনের মানুষের ঠেলায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হল তার পাশের মানুষেরা। চেষ্টা করেও অনেকে পা সরাতে পারল না।

ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত ইমনকে যখন দিলারা তুলতে পারল তখন সেই যুবক ধারে-কাছে নেই। কিছু ছেলে এগিয়ে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। 'সামান্য ক্ষতি' নামের একটি চায়ের স্টলে ইমনকে বয়ে লম্বামতো একটি কালো ছেলে পানি এনে দিল দিলারাকে, 'ভাইকে পরিষ্কার করে দেন আপা। আমার নাম রঞ্জু। গত বছর মাস্টার্স করেছি। বেকার। এই স্টল আমার। আর কোনও ভয় নেই আপনাদের।'

তার পরের সময়টা খুব স্বাভাবিকভাবে কাটল। রক্ত পরিষ্কার করা, ফার্স্ট এইড দেওয়া

ইত্যাদি কাজ যখন শেষ হল তখন ইমন ঝুম মেরে বসে। তার চোখের সামনে তখন আলাদা ছবি। ছবিটাকে দেখতে-দেখতে শিউরে উঠল সে। দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? কী হয়েছে?'

সম্বিৎ ফিরে পেল ইমন। বলল, 'কিছু না, কিছু না।'

দিলারা বলল, 'চলেন, আপনাকে বাসায় পৌঁছায় দিই।'

ইমন তাকাল। তার মুখের এখানে-ওখানে প্লাস্টার। মুখ ফোলা। সে মাথা নাড়ল, 'মেলায় যাব।'

'মেলা?' দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'পারবেন?'

ইমন উঠে দাঁড়াল, 'অবশ্যই।'

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ইমনের মনে হল তার সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। চারপাশে বই আর বই। বাংলা শব্দের বাগান। তার মা তাকে শৈশবে অ আ ই ঈ উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলেন। বাবা তখন মুক্তিযুদ্ধে নিরুদ্দেশ। সেই বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দের মিছিল বই-এর পাতায়-পাতায়। দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'কী বই কিনবেন?'

ইমন হাসল, 'কিনব না, দেখব!'

ওরা স্টলগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছিল। অনেকেই ইমনের বদলে যাওয়া চেহারাটা অবাক হয়ে দেখছিল। হঠাৎ দিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন কেন?'

ইমন বলল, 'কী জানি!'

দিলারা বলল, 'আপনার বন্ধু আজিজ থাকলে চুপচাপ থাকত। আমাকে বাঁচাতে সে আপনার মতো আহত হতে চাইত না, তাতে অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হত।'

'আপনি সব জানেন?'

'জানি। ওর মধ্যে অন্য গুণ আছে। ও ভালো কথা বলতে পারে। তা ছাড়া—।' দিলারা চুপ করে গেল।

'তা ছাড়া—?'

'আমার কোনও বন্ধু নেই। স্কুলে পড়ার সময় আব্বা আমাকে প্রায় বন্দি করে রাখত। আম্মা বলত শরীরে রোদ লাগালে আমি নষ্ট হয়ে যাব। তাই কারও সঙ্গে মিশতাম না। একাত্তর সালের পর যারা বড়লোক হয়েছে আব্বা তাদের সহ্য করতে পারে না। বলে তাদের আভিজাত্য নেই। কলেজে ওঠার পর আবিষ্কার করলাম, আমি বাংলাদেশের মেয়ে অথচ আর পাঁচটা মেয়ের মতো নই। এইসময় আজিজ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। সে সৎ নয় তবু তো বন্ধু।' দিলারা বলল।

হঠাৎ চিৎকার উঠল। দূরের একটি স্টলের সামনে উন্মত্ত যুবকদের ভিড়। প্রতিরোধের চেষ্টা হতেই স্টলটা লুট হয়ে গেল। ইমনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'হায় আল্লা!' তারপরেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল স্টলটির দিকে। দিলারা তাকে আটকাল, 'না, প্লিজ যাবেন না। ওরা অতজন, আপনি একা। কিছুই করতে পারবেন না।'

'কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব? ওরা বাংলাভাষায় লেখা বই লুট করছে!' ইমন পাগল হয়ে গেল।

'একটু শান্ত হন। পুলিশ আছে, আশেপাশে অনেক মানুষ আছে—।'

'কিন্তু কেউ আসছে না। দেখুন, স্টলটার বাতি নিভে গেল, সাইনবোর্ড ভেঙে পড়ল—।'

ততক্ষণে বই নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে হানাদাররা। একটু পরেই সব শান্ত, যেমনটি আগে ছিল।

ইমন বলল, 'আমার এখানে দাঁড়াতে ভালো লাগছে না। আমি বাইরে যাব।'

বাইরে তখন সন্ধ্যা নামছে। বাতাসে হিমের ছোঁয়া। ক'দিন আগের বৃষ্টি শীতকে আবার টেনে

এনেছে। সেই সময় তারা শুনতে পেল কেউ অথবা কারা যেন শহীদ বেদির লাল সূর্যটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

ইমন বলল, 'অসম্ভব। হতে পারে না। মায়ের মুখে শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাষা আন্দোলন না করলে আজ আমরা স্বাধীন হতাম না। তাকে অপমান কেউ করতে পারে না।'

দিলারা বলল, 'আজ রাত বারোটায় একুশে ফেব্রুয়ারি। আমি কখনও সেইসময় যাইনি। এখন যাবেন?'

ইমন বিস্মিত, 'সেকি? আপনি কখনও যাননি?'

'না!' মাথা নাড়ল দিলারা, 'আব্বা বলে মেয়েরা নাকি ওই সময় নিরাপদ নয়। তাই আমার যাওয়া নিষেধ।'

'আপনার বাবা ভাষা আন্দোলন করেননি?'

'না। তিনি তখন মুসলিম লিগ করতেন। গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন পঞ্চাশ সালে।'

'একাত্তরে, স্বাধীনতা আন্দোলনে—?'

'আমি জানি না। তখন আমি জন্মাইনি।'

ওরা হাঁটছিল। চারধার থমথমে। তবু কিন্তু মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে শহীদ বেদির দিকে।

ইমন বলল, 'আজিজ থাকলে আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো গানটা গাইত। চমৎকার গায় ও।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে আজ পর্যন্ত শহীদ মিনারে ফুল দেয়নি। হাততালি পাওয়ার জন্যে গায়।'

'আপনি ওর ওপর রেগে আছেন।'

দিলারা কিছু বলল না।

অনেক মানুষের ভিড় দূর থেকে নজরে এল। সবাই চুপচাপ, যেন মৃত মানুষের সমাধির সামনে সমবেত হয়েছেন সবাই। এইসময় দিলারা চিৎকার করে উঠল। অবিকল সেই চিৎকার যা সে ভিড়ের মধ্যে করছিল। কিন্তু এখন তো তারা হাঁটছে একদম ফাঁকায়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দেওয়ালটার দিকে নজর গেল ইমনের। দেওয়ালে বাঙালির বুকের রক্ত দিয়ে লেখা যে সব লাইন ছড়ানো ছিল, তার ওপর কেউ বা কারা রঙের প্রলেপ দিয়ে মোছার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল থেকে শুরু করে আজকের কবির কলম থেকে উঠে আসা শ্রদ্ধাঞ্জলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে ঘাতকেরা।

দিলারা ডুকরে উঠল, 'দেখেছেন, দেখেছেন—আঃ!'

ইমন কথা বলতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন লহমায় জমে গেছে। তার চোখের সামনে দেওয়াল নেই, কোনও লেখা নেই। ধীরে-ধীরে অন্য একটা ছবি তৈরি হয়ে উঠছে। শত-শত মুখোশ-পরা মানুষ একটা রমণীকে ঘিরে ধরে বলাৎকার করছে। রমণীটি নির্বাক ছিল এতক্ষণ। চূড়ান্ত অত্যাচারের সময় সেই নারকীয় উল্লাসকে ছাপিয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে উঠলেন, 'ওরে, আমি তোদের মা, তোদের মা।' তাঁর মুখ দেখা গেল। সেই মুখ ইমনের নিজের মায়ের অথবা দিলারার এবং শেষপর্যন্ত মিলেমিশে একুশে ফেব্রুয়ারির।

সেই কল্পিত ছবির দিকে তিরের মতো ছুটে গেল বরকত-সালাম-রফিকের সন্তান ইমন, দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে। নিজের জন্যে, নিজেদের জন্যে।



গ্রীষ্মকাল এসে গেছে

বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করলেন রবার্ট স্টিভেনসন, 'দেশটা উচ্ছন্নে গেল।' বাইরে তখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। ওটা শুরু হয়েছে তিনদিন আগে। আকাশ-ভরতি ভারী মেঘের গম্ভীর চলাফেরা। তাপাঙ্ক নেমে গিয়েছে স্বাভাবিকের খানিকটা নিচে। অথচ এখন এরকমটা হওয়ার কথা নয়। ক্যালেন্ডারে সামার এসে গিয়েছে। এমন নরম-নরম রোদের সামার আর আকাশে অনেকক্ষণ নীল দেখা যায়। রবার্ট কাচের আড়ালে রাস্তায় যেটুকু দেখতে পেলেন তাতে বিন্দুমাত্র ভরসা পেলেন না। কোনও মানুষ নেই, বোস্টন শহরটা যেন আঁধা অন্ধকারে জবুথবু হয়ে আছে।

জানালা থেকে সরে এলেন রবার্ট। চমৎকার প্রকৃতি তো আর একা সৎ থাকতে পারে না। নব্বইটা বছর বেঁচে থাকতে হচ্ছে এসব দেখার জন্যে। নিজের শরীরের দিকে তাকালেন। হাত গোটালে বাইসেপটা ভাঙা ডিঙার মতো দেখায় এখনও। মেদটেদ শুকিয়ে গেছে, গাল বসে গিয়েছে অনেকটা, কিন্তু এখনও তিনি সবল আছেন। মাথাটা যদি সাততাড়াতাড়ি মরে না যেত জীবনটাকে আরও একটু নেড়েচেড়ে দেখতেন তিনি।

টিভি খুললেন রবার্ট। বি.বি.সি-র নিউজ বুলেটিনে ওই এক কথা। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া আর মেঘলা আকাশ। এগুলো বলার জন্যে বিদ্যের দরকার হয় না, জানালার বাইরে চোখ মেললেই বোঝা যায়। আগে বি.বি.সি. কি নিখুঁত আবহাওয়ার ভবিষ্যদবাণী করত। আর এখন? সোফায় বসলেন তিনি। আর তখনই নিচে শব্দ হল। কেউ হাতুড়ি ঠুকছে দেওয়ালে। রবার্টের মনে হল তাঁর বুকেই যেন আওয়াজটা হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন তুলে বোতাম টিপলেন। তিনবারের বার গলা পেলেন। কাউড্রেদের মেয়ের গলা। রবার্ট নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বললেন, 'শোনো, যখন তোমার বাবাকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়েছিলাম তখন কথা হয়েছিল দেওয়াল অক্ষত থাকবে। দেওয়ালে পেরেক ঠোকার মতো ভারতীয় অভ্যেস দয়া করে ত্যাগ করো।'

মেয়েটা হি-হি করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আমি কি একবার ওপরে আসতে পারি?'

'তোমার বাপ-মা কেউ এখন নেই বুঝি?'

'না। খুব একা লাগছিল বলে পেরেক ঠুকছিলাম।'

'ঠিক আছে, মিনিট পাঁচেকের জন্যে আসতে পারো।'

রিসিভার নামিয়ে মনে হল কাজটা ভালো না। ভাড়াটের সঙ্গে দহরম করা ঠিক নয়। ইন্ডিয়া থেকে ফিরে ঘুরতে-ঘুরতে এই বোস্টনে এসে মার্থার জন্যেই বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। মার্থা চলে যাওয়ার পর নিচটা ভাড়া দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একা-একাই বেশ আরামে থাকেন। বেল বাজল।

প্যান্টের ওপর হাফস্লিভ শার্টে তাঁকে নেহাত খারাপ দেখাচ্ছে না। রবার্ট দরজা খুললেন, 'হ্যালো।'

'হাই।' পনেরো বছরের মেয়েটা খিলখিলিয়ে হাসল। তিনি কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল সে। রবার্ট প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মেয়েটার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! অত ছোট প্যান্ট পরে চলে এসেছে? অথচ ওপরে গলাবন্ধ পুরোহাত সোয়েটার! রবার্ট দরজা বন্ধ করলেন, 'লুক, আমি চাই না, তোমরা দেয়ালে পেরেক ঠোকো।'

মেয়েটা ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। তারপর শুরু করল সুর আর গান, 'উই উইল

ফলো নান বাট ভার্জিনিয়া বটমানি।'

রবার্ট খেঁকিয়ে উঠলেন, 'স্টপ ইট।'

মেয়েটা হাসল, 'কেন? আমাদের প্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপদেশ দিয়েছেন এখনই যেন যৌন-জীবন নিয়ে চিন্তা না করি। কিন্তু 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' কী লিখেছে জানো?'

'কী লিখেছে?'

'আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভার্জিনিয়া বটমানি নিজেই কুমারীমাতা ছিলেন।'

'উঃ, দেশটার কী হল! মেজর কিছু বলছে না?'

'ছাই। মেজর শেলটার দিচ্ছে। বলছে, ওটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' মেয়েটা রিমোট টিপে টিভি চালাল। দু-তিনটে চ্যানেল পালটেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই বব্, কাম হিয়ার, আহা দেশটার কী হল! কী মজা!'

রবার্ট ভ্রূ কুঁচকে টিভির দিকে তাকালেন। পরদায় ফুটে উঠছে, জাতীয় ঐতিহ্যবাহী ডেভিড মিলার পদত্যাগ করেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেটা এখনও গ্রহণ করেননি।

'এটা একটা মজার খবর নাকি?' বিরক্ত হলেন রবার্ট।

'বব্। তুমি কোথায় বাস করছ? টিভি দ্যাখোনি, কাগজ পড়োনি?'

'কাগজ আমি পড়ি না, আর ওয়েদার ছাড়া টিভি দেখছি না।'

'মাই গড! তুমি আন্তোনিও দে সান্টারের নাম শুনেছ?'

'সে কে?'

'ওঃ, একজন অভিনেত্রী। আমাদের ঐতিহ্যমন্ত্রী, ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী মিস্টার মিলার অভিনেত্রী সান্টারের সঙ্গে যৌনকাজে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে সরকারি কাজে সময় দিতে পারতেন না। এবং তিনি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে।'

'মাই গড! টিভিতে কী বলছে দেখেছ?' বিশ্বাস করতে পারছিলেন না রবার্ট।

ভাষ্যকার তখন জানাচ্ছেন, 'প্রধানমন্ত্রী জন মেজর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে বলেছেন, এটা মিলারের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন, তা নিয়ে প্রেস যাতে নাক গলাতে না পারে তার জন্য মেজর একটি নতুন আইনকে সমর্থন করেছেন। এই আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যার ডেভিড ক্যালকটকে। এদিকে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে।'

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করে মেয়েটা বলল, 'তোমার বয়স কত বব্?'

আচমকা এইরকম প্রশ্ন কেন বুঝতে না পেরেও তিনি জবাব দিলেন, 'নব্বুই।'

'মাই গড! আর ওই লোকটা মাত্র তেতাল্লিশ। তোমার চেয়ে সাতচল্লিশ বছরের ছোট। অথচ সান্টারের সঙ্গে সেক্স করে এমন ক্লান্ত হয়ে যায় যে সরকারি কাজ করতে পারে না। আমি এই কথাটাই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো বব্। কত বছর বয়স থেকে পুরুষরা ওসব করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে?'

'লুক বেবি, এসব আলোচনা আমার সঙ্গে করা তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'মাই গড। 'দ্য পিপল' প্রকাশ্যে লিখছে ওই জন্যে মিলার কাজ করতে পারছে না আর আমি আলোচনা করলেই দোষ। আমার এক বান্ধবী বলছিল চার্লি চ্যাপলিন নাকি—'

হাত তুলে মেয়েটাকে থামালেন রবার্ট। একটু ভাবলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'সাধারণত শীতপ্রধান দেশে বেশি বয়স পর্যন্ত ছেলেরা সক্ষম থাকে। মিলার স্বাভাবিক নয়। আমি যখন ইন্ডিয়ায় ছিলাম তখন দেখেছি চল্লিশের পুরুষরাও যৌনজীবন ত্যাগ করেছে।'

'সেইজন্যে তুমি ইন্ডিয়া থেকে চলে এসেছ?' হাসল মেয়েটা।

রবার্ট ক্ষমা করলেন ব্যাপারটা, 'ইন্ডিয়া যখন স্বাধীন হল তখন আমার বয়স ছত্রিশ। মার্থা

আর থাকতে চাইল না। এখন মনে হয় থেকে গেলে ভালো করতাম।'

'কেন?'

'এইসব শুনতে হয় না। ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে আর তার প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সমর্থন করছে। ব্রিটিশ হিসেবে কি লজ্জার কথা! এখন কেটে পড়ো, আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

মেয়েটা বলে উঠল, 'তোমার একা থাকতে কষ্ট হয় না?'

'হয়। সেটা আমার সমস্যা।'

'তুমি আর একটা বিয়ে করছ না কেন!'

এবার হেসে ফেললেন রবার্ট, 'এই নব্বুই বছর বয়সে কে আমাকে বিয়ে করবে?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আই ডোন্ট নো! মে বি সামওয়ান, একটা অ্যাড দেওয়া যেতে পারে।' সে হাসল। তারপর ছটফটিয়ে চলে গেল।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল রবার্টের। ওর নামটা যেন কী? তিন-চারটে নাম ঐকসঙ্গে মারপিট করতে লাগল মাথায়। আজকাল সবকিছু ঠিকঠাক ঠিক সময়ে মাথায় আসে না। দরজা বন্ধ করে তিনি কিচেনে গেলেন। যত্ন করে এককাপ কফি বানালেন। দেশটার কী হল। ঠিক সময়ে সামার আসে না, কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েও মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব যায় না। চার্লস আর ডায়না তো এখনও যুবরাজ আর যুবরানি অথচ প্রোফুমোকে পত্রপাঠ চলে যেতে হয়েছিল একরকম। একজন ব্রিটিশের যদি ঐতিহ্য না থাকে তাহলে আর কি থাকল! এই যে ইয়ং জেনারেশন তৈরি হচ্ছে, এদের যৌবনে দেশটা তো আরও উচ্ছন্নে যাবে। এত ছোট প্যান্ট পরে কেউ ঘরের বাইরে যায়?

কফিতে চুমুক দিয়ে জানালায় ঝুঁকে দাঁড়ালেন রবার্ট। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। ছাতা ছাড়াই একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। লোকটা ইন্ডিয়ান অথবা পাকিস্তানি। মেজাজ নষ্ট হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। মার্থা তাঁর সর্বনাশ করে গিয়েছে। লন্ডনের অনেক দূরে বোল্টন নামের এই ছোট্ট শহরের রাস্তায় যদি প্রতি পাঁচজনে একটা ভারতীয় বা পাকিস্তানিকে দেখতে হয়, তাহলে এদেশে ফিরে আসার দরকার কি ছিল? কিছু ব্রিটিশ এখনও রয়ে গেছে ইন্ডিয়ায়। আর তারা আছে রাজার মতো। বাংলো, লন, গল্ফ খেলা, একগাদা ঝি-চাকর, কী আরাম! তখন মার্থা ভয় পেল। যদি ইন্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেয়। তার ওপর মাতৃভূমি টানতে লাগল। বোঝো এখন! এই তো মাতৃভূমি! হয়তো দেখা যাবে গোটা ব্রিটেনের ওয়ানফিফ্‌থ মানুষই হল এশিয়ার। লন্ডনের মেয়র একজন ইন্ডিয়ান, এমনটা হতে আর বেশি দেরি নেই। মাঝে-মাঝে মনে হয় মার্থার ভয়টাই ঠিক। ইন্ডিয়ানরা প্রতিশোধ নেবে। ওরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে যাবে। একটাই ভরসা, তাঁকে ততদিন বেঁচে থাকতে হবে না।

রবার্ট আবার বি.বি.সি. ধরলেন। তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল। জেসাস! কী দেখছেন তিনি! রোদ উঠবে! আজই। বিকেল আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। থাকবে এক ঘণ্টা। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগামীকাল আরও একটু বেশি সময় ধরে রোদ থাকবে। আঃ! রবার্ট ছুটে গেলেন জানালায়। কাচের আড়াল থেকে রাস্তার যেটুকু দেখা যাচ্ছে, মনটা আনন্দে ভরে গেল। টেলিফোনের কাছে ছুটলেন তিনি। মার্থার বান্ধবী এমিকে খবরটা দেওয়া দরকার। বড় বাতের ব্যথায় ভুগছে বেচারা! 'হ্যালো এমি? শুনেছ? ওহো, বি.বি সি দ্যাখোনি? আজ রোদ উঠবে। পরিষ্কার ঝকঝকে রোদ। আরে, সকাল থেকে দিনটা কেমন যাবে আজকাল আর বোঝা যায় না। তুমি কখনও ভাবতে পেরেছ ব্রিটেনের ঐতিহ্যমন্ত্রী যৌন-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েও টিকে থাকবে! হ্যাঁ, খবরটা পাওনি দেখছি। যা হোক, আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। বেরুবে নাকি? হ্যাঁ, আমি বের হব। শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করা দরকার। যদি হাঁটতে পারো তাহলে চলে এসো পার্কে। বাই।'

বেলো৷ বারোটা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রবার্ট। রোদ উঠলেও একটু ঠান্ডা থাকবে। হালকা

পুলওভার পরবেন না মোটা হাফস্লিভ? এখন মে মাস। হলুদ রঙটা মন্দ নয়। ওয়ার্ডরোব থেকে জামাকাপড় বের করে তা থেকে পছন্দে পৌঁছাতেই অনেকটা সময় গেল। মাঝে-মাঝে জানলায় যাচ্ছেন তিনি। হ্যাঁ, আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে একটু-একটু করে। মেঘ সরে যাচ্ছে। এই সময় টেলিফোন বাজল।

'হ্যালো।' খুশি মনে রিসিভার তুললেন তিনি।

'মিস্টার রবার্ট স্টিভেনসন প্লিজ।'

'হ্যাঁ, কথা বলোছি।'

'আমি ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন সার্ভিস অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ারস্ থেকে বলছি। আমাদের একজন অনারেবল গেস্ট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনি অনুগ্রহ করে কথা বলবেন?'

'আপনাদের গেস্ট মানে ব্রিটেনের গেস্ট। নিশ্চয়ই বলব।' হঠাৎ নিজেকে খুব মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'হ্যালো। আমার নাম এস. কে. রয়। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

'ভারতবর্ষ!' বিড়বিড় করলেন রবার্ট।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত কিন্তু আমার ঠাকুরদার জন্যে বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি কখনও দার্জিলিং-এ পোস্টেড ছিলেন?'

'দার্জিলিং! হ্যাঁ, ছিলাম। ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলাম।'

'তাহলে ঠিক আছে। আপনার একজন বাঙালি সেক্রেটারি ছিল, মনে আছে?'

'সেক্রেটারি? আমি ওকে বাবু বলে ডাকতাম।'

'ঠিক। তাঁর নাম শশীকান্ত রায়?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। শশীকান্ত। খুব ভদ্র এবং পরিশ্রমী।'

'তিনিই আমার ঠাকুরদা।'

'মাই গড। তা আপনি এখানে কী করছেন?'

'আপনাদের দেশ আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। আমি বিজ্ঞানচর্চা করি। এখানে দিন-তিনেক থাকব। ঠাকুরদা বললেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আচ্ছা, মিসেস স্টিভেনসন এখন কেমন আছেন?'

'মার্থা? সে নেই।'

'ওহো! দাদু আমাকে একটা খাম দিয়েছিলেন মিসেস স্টিভেনসনকে দেওয়ার জন্যে। বলেছেন ওটা যেন অন্য কারও হাতে না দিই। শুনে উনি দুঃখ পাবেন।'

'কী আছে খামে?' রবার্টের গলার স্বর বদলে গেল।

'আমি জানি না। সিল করা। দাদু বলেছেন মিসেস স্টিভেনসনই ওটা ওঁর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। কোনও গোপন ব্যাপার বোধ হয়। দাদুর শরীর ভালো না, তাই ওটা যার জিনিস তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

'আমাকে দেওয়া যাবে না?'

'তাহলে দাদুর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হয় আমাকে।'

অবাক হলেন রবার্ট, 'শশী রায়ের বাড়িতে ফোন আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। ওঁর চেষ্টায় আমার বাবা ডাক্তার হয়ে যাওয়ায় অবস্থাটা বদলে গিয়েছে। ঠিক আছে, যদি যোগাযোগ হয়, আমি খামটাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেব। বাই।'

রিসিভার রেখে দিল ছোকরা। হঠাৎ নিজেকে জড়ভরত বলে মনে হল রবার্টের। তাঁর বাবুর ছেলে ডাক্তার, তার ছেলে বৈজ্ঞানিক হয়েছে আর ব্রিটেন তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে? ভাবা যায়? বাবু ভালো ইংরেজি লিখত একথা ঠিক। মাঝে-মাঝে তাঁর ভুলও ধরিয়ে দিত। বাট আফটার

অল হি ওয়াজ এ বাবু। লোকটাকে শেষের দিকে তিনি অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছিলেন। মার্থা যেন বড্ড বেশি ওর সঙ্গ চাইত। তাঁর সময় ছিল না বলে একবার ওই বাবুর সঙ্গে টাইগার হিলে চলে গিয়েছিলেন মাঝরাতে, সূর্য ওঠার মুহূর্তে হাজির থাকবে বলে। লোকটা এমন অধস্তন যে এ নিয়ে কথা বলা নিচু মনের প্রকাশ হয়ে যেত। কিন্তু মনে-মনে সেটাকে মনে রেখেছিলেন তিনি। জিমখানা ক্লাবে এক বাগানের ম্যানেজার যখন মার্থার সঙ্গে নাচতে চাইল আর মার্থা রাজি হল না, তখন খেপে গিয়ে দু-চার কথা শুনিয়েছিলেন। পুষে রাখা রাগটা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পেরে বেশ হালকা লেগেছিল তখন।

কিন্তু বাবুর কাছে কি জিনিস রেখে আসতে পারে মার্থা? একটা বন্ধ খামে কি কোনও কাগজ, চিঠি আর সেই বাবুকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যাতে অন্য কারও হাতে খামটা না দেয়। অদ্ভুত! পঞ্চাশ বছর কম সময় নয়। এদেশে এসেও মার্থা চল্লিশের ওপর বেঁচে ছিল। কই, তাঁকে একবারও খামটার কথা বলেনি তো! তার মানে মার্থা ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। একটা ব্যাপার যে লুকিয়ে রাখতে পারে সে অনেক কিছুই গোপন করতে সক্ষম। রবার্টের বুকের ভেতরটা কেমন হু-হু করে হেসে উঠল। তিনি ভাবতেই পারছেন না মার্থা এমন কাজ করতে পারে। তাহলে তো তাঁর অজান্তে মার্থা অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করতে পারত, শোওয়াশুয়ি হলেও তিনি জানতে পারতেন না। তাঁর সংসারে সব কাজ ঠিকঠাক করে যে মেয়ে ভারতীয় বাবুর কাছে একটা খাম গোপনে রেখে এসে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে তাঁকে আর বিশ্বাস করেন কি করে।

এই মুহূর্তে সামনে পেলে একটা হেস্তনেস্ত করতেন তিনি। জীবনে কখনও মার্থার গায়ে হাত তোলেননি, এখন—। বড়-বড় নিশ্বাস ফেললেন রবার্ট। হঠাৎ মনে হল তিনি যেন আগ বাড়িয়ে ভেবে চলেছেন। একজন অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে মার্থা এমন কিছু করতে পারে না। কিছুতেই নয়। তিনি ছোট হয়ে যাবেন এমন কাজ তো নয়-ই। হয়তো স্নেহে মার্থা কোনওকিছু উপহার হিসেবে দিয়েছিল বাবুকে। বাবু সেটা রেখে দিয়েছিল। এমন হতেই পারে ব্রিটিশদের প্রতি রাগবশত আজ সেটা ফেরত দিতে চায়। যে দিয়েছে তার হাতে দিলেই ভালো লাগবে বলে নাতিকে মার্থার কথা বলেছে।

এমনটা হতেই পারে। মন হালকা হল, সামান্য। আর ব্রিটিশ সরকারের কী হাল হয়েছে দ্যাখো, একজন ভারতীয়কে ডেকে আনতে হচ্ছে অতিথি হিসেবে বিজ্ঞানের ব্যাপারে। যাকে ডাকছে তার পেডিগ্রি কী? বাবুর নাতি। হুঁঃ।

খুব ধীরে-ধীরে পোশাক পরলেন রবার্ট। টাই বাঁধলেন। ছাতা নিলেন, সঙ্গে টুপি। দরজা বন্ধ করে ধীরে-ধীরে নামছিলেন এমন সময় সেই কিশোরী দরজা খুলল, 'হাই বব্।'

'হ্যালো।'

'আমরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। এইমাত্র মায়ের সঙ্গে আমার কথা হল। অন্য ভাড়াটে জোগাড় করে নাও। উইক এন্ডেই চলে যাব।' মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রবার্ট। ইচ্ছে করছিল বন্ধ দরজায় শব্দ করে বলেন, 'তোমরা এটা করতে পারো না। উঠে যাওয়ার আগে নোটিশ দিতে হবে। কাগজে-কলমে তাই লেখা আছে।' নাঃ, আবার ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

রাস্তায় পা দিলেন রবার্ট। ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গিয়েছে পায়ের তলার জমি। মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টায় ছিলেন হঠাৎ কানে এল, 'হাউ ফার বব্?'

চমকে তাকালেন। সামনের মাখনের দোকানের জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটা রসিকতা করতে চাইছে নাকি? তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার আর আমার থেকে সমান দূরত্ব।' তিনি দাঁড়ালেন না।

*

এডওয়ার্ডদের বিয়ারের দোকানের সামনে পৌঁছাতেই আবার চিৎকার, হাই বব্! সামার এসে গেল শেষপর্যন্ত।'

বব্ হাসলেন। এড্ তাঁর চেয়ে ছোট কিন্তু খুব ছোট নয়।

'ব্যাবসা কেমন চলছে?'

'একইকরম। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা বিয়ারের বদলে ভদকা উইথ টনিক খাওয়া বেশি পছন্দ করছে।' ভুঁড়ির ওপর প্যান্ট তুলতে-তুলতে বিশাল চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল এড্। ওর গোঁফ পেকে ঝুলে পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে এড্ বলল, 'চললে কোথায়?'

'প্রথম সামার!' রবার্ট হাসলেন। তারপর ইচ্ছে করেই বললেন, 'মার্থা খুব ভালোবাসত এমন দিনে হাঁটতে।'

'মার্থা? ওহো! ইয়েস। খুব ভালো মেয়ে ছিল সে।'

'ওর মুখ মনে আছে তোমার?'

'তা থাকবে না? কতদিন যাতায়াতের পথে কথা বলে গেছে।'

'আচ্ছা এড্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'মার্থাকে তোমার কীরকম মনে হত? চরিত্রের কথা বলছি।'

'দ্যাখো বব্, চরিত্র অনেকরকম হয়। ও খুব ভালো মেয়ে এইটুকু মনে আছে।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' রবার্ট হাঁটতে লাগলেন, চরিত্র অনেকরকমেব হয়। সুতরাং এড্ কথাটা এড়িয়ে গেল। যৌবনে এড্ কী না করেছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই পেছনে লাগত। আর মার্থা তো সত্যিকারের সুন্দরী ছিল।

হঠাৎ চিৎকারটা কানে এল। থমকে দাঁড়ালেন রবার্ট। উলটোদিক থেকে গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে-করতে আসছে কেন? একজন একটা প্যাকেটকে এমনভাবে লাথি কষাল যে সেটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। এই চিৎকার এবং বেপরোয়া চলাফেরা যে ওদের আনন্দের প্রকাশ তা বুঝতে সময় লাগল। তিনটে কালো ছেলে আছে ওদের মধ্যে। নিশ্চয়ই আফ্রিকা থেকে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা ছেলে। ব্রিটেনকে ওরাও শেষ করে দিচ্ছে। আর ওই সাদা মেয়েটা, তুই কী করে কালোটাকে কোমর জড়িয়ে ধরতে দিলি! এই বোল্টনেই যদি এমন অবস্থা তাহলে লন্ডনে তো হাঁটাই যাবে না। খুব কষ্ট হচ্ছিল রবার্টের। সারা পৃথিবী যেন ও-দেশটাকে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে।

তিরতিরে রোদ উঠেছে। আহা! পার্কের সামনে পৌঁছে মুখে হাসি ফুটল তাঁর। এমি আসছে। বেচারার হাঁটতে কষ্ট হলেও সেজেছে খুব।

'হ্যালো এমি!'

'হ্যালো বব্!'

'শেষপর্যন্ত এবারের সামারটাকে দেখতে পেলাম।'

'বি.বি.সি-ও ঠিক বলল শেষপর্যন্ত।'

'যা বলেছ। শরীর কেমন আছে?'

'শরীরের কথা ছেড়ে দাও।'

'দ্যাখো, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তবু—।'

'চুপ করো। তোমাকে তিনটে বাচ্চা পেটে ধরতে হয়নি।' এমি খ্যাক-খ্যাক করে উঠল, 'এখন কবরে গেলেই হয়। মাঝে-মাঝে ভাবি মার্থা ভাগ্যবতী।'

'কেন? কেন মনে হয়?'

রবার্ট সতর্ক হলেন।

'চলো, বেঞ্চিটায় বসা যাক। পা ব্যথা করছে।' এমি এগিয়ে গিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কয়েকদিন ভিজে-ভিজে সিমেন্টের বেঞ্চিও কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। রবার্ট বসতে বাধ্য হলেন। প্রশ্নটা যেন এমির কানেই যায়নি। সে তার তোবড়ানো গাল তুলে আকাশ দেখছে। প্রায় এরকম চেহারাই হয়ে গিয়েছিল মার্থার। অ্যাদ্দিন বেঁচে থাকলে বান্ধবীর চেয়ে কম কিছু হত না। কোঁচকানো চামড়া, রোঁয়া ওঠা বেড়ালের মতো।

'মার্থা তোমার খুব বান্ধবী ছিল, না?'

'ব্যাপারটা কী? কথাটা তুমি জানো না?'

'আচ্ছা, আমি ছাড়া মার্থা অন্য কারও প্রেমে পড়েছে কখনও?'

হঠাৎ হেসে উঠল এমি, 'মাই গড! তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার প্রেমে সে পড়েছিল?'

'না না, আগের কথাটার উত্তর দাও।'

'আমার তো উত্তর পেয়ে গেলে।' মুখ ফিরিয়ে নিল এমি।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবার্টের। অতি কুচুটে মহিলা। মার্থা বেঁচে থাকতেই একে তিনি দেখতে পারতেন না। স্ত্রী-র বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ গম্ভীর গলায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'কিন্তু আমি একটা ঘটনা জানতে পেরেছি।'

এমি সন্দেহের চোখে তাকাল, 'কীরকম?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন রবার্ট, 'পেয়েছি!'

'যার কথা বলছ সে এখন কবরে শুয়ে আছে।'

'তাতে তো ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না!' অভিনয় করে যাচ্ছিলেন রবার্ট।

'বুঝতে পেরেছি। জন তোমাকে বলেছে।'

'জন?' বেশ হতভম্ব হয়ে গেলেন রবার্ট।

'ক্যাসিনোর মালিক ছিল। প্রথমে আমার পেছনে লেগেছিল, পাত্তা না পাওয়াতে মার্থাকে জপাতে লাগল। ওর ভদ্রতাবোধকে দুর্বলতা বলে ভুল করল জন।'

'তারপর?' নিশ্বাস চাপলেন রবার্ট।

'তারপর আর কি! এসব পুরোনো ছেঁদো কথায় এখন লাভ কী? দুজনেই তো মরে গিয়েছে। সারাদিন একা থাকত, ছেলেপুলে হয়নি, বেচারা তাই ক্যাসিনোয় যেত।'

'গিয়ে জুয়ো খেলত?'

'তা একটু-আধটু, আমিও খেলেছি।'

'জনের সঙ্গে সম্পর্কটা, মানে, কতদূর এগিয়েছিল?'

'দ্যাখো, জন মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলত, মার্থা শুনে যেত। ব্যস্।'

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন রবার্ট। হ্যাঁ, একসময় মার্থা তাঁকে বলত ক্যাসিনোয় যাওয়ার কথা। তিনি যে সেটা পছন্দ করতেন না তাও সে জানত। কিন্তু জন যে প্রেম-নিবেদন করত তা জানা ছিল না। এমির কথা অনুযায়ী জন প্রেম-নিবেদন করেছে, মার্থা কিছুই বলেনি। তিনি ঘুরে তাকালেন, 'মার্থা তোমাকে ইন্ডিয়ার কথা বলত? মনে করে দ্যাখো তো!'

'হ্যাঁ। ওর খুব ভালো লেগেছিল ইন্ডিয়ায় থাকতে।'

'ভালো লেগেছিল? ও-ই তো জোর করে চলে এল।'

'তা জানি না। যে শহরে থাকত তার গল্প করত খুব। হ্যাঁ, কি একটা জায়গা যেন, যেখান থেকে সানরাইজ খুব ভালো দেখা যায়—'

'টাইগার হিল।' খসখসে গলায় বললেন রবার্ট।

'হ্যাঁ। টাইগার হিলের বর্ণনা করত সে। বলত অত ভালো জায়গা নাকি পৃথিবীতে হয় না।

আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওখানে টাইগার আছে নাকি? সে জবাব দিয়েছিল, একদম না। তবে বেড়ালের মতো স্বভাবের মানুষ সেখানে গেলে কখনও-কখনও টাইগার হয়ে যায়। ওহো, এবার উঠব বব্।'

'এত তাড়াতাড়ি?' রবার্ট বাধ্য হলেন উঠতে, 'ওখানকার কথা সে বলেছে তোমাকে? কোনও বাবু? মানে আমার এক ক্লার্ক যার সঙ্গে সে টাইগার হিলে গিয়েছিল, তার কথা কিছু বলেছিল?'

হাঁটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এমি, তারপর মাথা নাড়ল, 'একজনের কথা খুব বলত মার্থা। লোকটা ওকে কি করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায় শিখিয়েছিলেন। ওহো, মনে পড়েছে। লোকটার সঙ্গে ওর একটা চুক্তি হয়েছিল।'

'চুক্তি!'

'হ্যাঁ। দুজনে যা বিশ্বাস করে তা একটা কাগজে লিখে খামে বন্ধ করে দুজনকে দিয়েছিল। তিরিশ বছর পরে দেখা করে সেই খাম খুলে দেখা হবে তখনও সেই বিশ্বাসটা আছে কিনা। মার্থা প্রায়ই বলত কাজটা করা হচ্ছে না। সে চিঠিও দিয়েছিল লোকটাকে কিন্তু জবাব পায়নি। হয়তো ঠিকানা বদলেছে কিংবা মরেই গেছে।' এমি হাসল, 'মজার খেলা, না? আমি বলতাম সময়ের সঙ্গে মন পালটায়, অতএব বিশ্বাসও পালটাবে। মার্থা তখনও স্বীকার করেনি। তাও তো অনেকদিন হয়ে গেল।'

'তাহলে মার্থার কাছে সেই লোকটার খাম ছিল?'

'থাকার তো কথা। কারণ দুজনের সামনেই সেটা খোলার চুক্তি ছিল।'

এমি চলে গেল। নিজেকে খুব অসহায়, ছিবড়ে হয়ে যাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছিল রবার্টের। তাঁরই এক বাবুর সঙ্গে মার্থা এসব করেছে অথচ তাঁকে কিছুই জানায়নি। এড্ কিংবা জনকে তিনি মেনে নিতে পারেন, ওরা ইন্ডিয়ানদের মতো অত সেন্টিমেন্টাল নয়। বাট দ্যাট বাবু—। রবার্ট থপ-থপ করে হাঁটতে লাগলেন। রোদ চলে গিয়েছে। আকাশে আবার মেঘেদের আনাগোনা, হঠাৎ মনে হল ইন্ডিয়ায় গিয়ে সেই বুড়োটাকে দু-ঘা কষিয়ে দিলে কেমন হয়? শরীরটা নব্বুই বছরের না হলে তিনি নিশ্চয়ই যেতেন। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে রাস্তাটা সংক্ষেপ করতেই এগিয়ে গিয়ে মনে হল পাশেই কবরখানা আর সেখানেই মার্থা শুয়ে আছে। প্রথম-প্রথম প্রতি রবিবার, জন্মদিন, মৃত্যুদিনে যেতেন তিনি ফুল নিয়ে। আজকাল আর যাওয়া হয় না। আজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন নাকি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার মার্থা কেন করল? কবরখানার গেটের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। যাকে জিজ্ঞাসা করবেন তার তো একদম ইচ্ছে করে না। মার্থার পাশের জায়গাটা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা রয়েছে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা ফোটে।

বৃষ্টি নামল। মাঝে-মাঝে রোদ ওঠার একটা খেলা চলল কয়েকদিন ধরে। এই ক'দিনে রবার্টের কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। নিচের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু বাড়তি ভাড়া দিয়ে গেছে। ওদের চলে যাওয়ার কারণ অদ্ভুত। মেয়েটা শব্দ করতে চায়। এ বাড়িতে সেটা নিষেধ বলে চলে যাচ্ছে। এমনটা কে কবে শুনেছে? মার্থার সমস্ত জিনিসপত্র একটা আলমারিতে তোলা ছিল। রবার্ট সেগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন কোনও মুখবন্ধ খাম পান কিনা। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বৃথা হয়েছে। মার্থার রেখে যাওয়া জিনিসপত্রে কোনও গোপন ঘটনা নেই। এমি যা বলেছে তা তাহলে সত্যি নয়। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে মার্থা একটা লকার নিয়েছিল ব্যাঙ্কে। দুজনের নামেই। যতদূর জানেন তাতে কিছুই রাখা হয়নি। রাখার সময় পায়নি মার্থা। তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি বছর লকারের ভাড়া অ্যাডজাস্ট করে নেয় ব্যাঙ্ক। একবার লকারটা দেখতে হবে।

সোমবার সকালে টেলিফোন বাজল। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হচ্ছিলেন রবার্ট। রিসিভার তুললেন। তাঁর এজেন্ট বলল, 'একজন ভাড়াটে পেয়েছি। আগের ভাড়াটের চেয়ে বেটার। মেয়েটি একাই থাকবে।'

'একা মেয়ে?'

'আঃ, তাতে তোমার কি সমস্যা বব্? এ আওয়াজ করবে না।'

'ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটা কী করে?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। অ্যাডভান্স দেবে, থাকবে। ইন্ডিয়ানরা টাকাপয়সার ব্যাপারে—।'

'ইন্ডিয়ান? আমার বাড়িতে? ওহো, না। কিছুতেই নয়।'

'তুমি ঠিক বলছ বব্?'

'একশোবার ঠিক বলেছি। ওরা ব্রিটেনকে ইন্ডিয়া বানাচ্ছে, বোল্টনকে প্রায় বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু আমার বাড়িটাকে—কিছুতেই ঢুকতে দেব না।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বর্ষাতি আর ছাতা নিয়ে।

রাস্তায় লোক নেই, বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। পাগল ছাড়া কেউ বাইরে বের হবে না। কিন্তু তিনি তো পাগলই হয়ে গেছেন। লকার খুলে উঁকি মারতেই একটা বড় খাম দেখতে পেলেন তিনি। কাঁপা হাতে সেটা বের করতে মার্থার হাতের লেখা নজরে পড়ল, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে দয়া করে নিচের ঠিকানায় পোস্ট করে দিও।'

ঠিকানা দেখেই গা জ্বলে উঠল তাঁর। বাড়ি ফিরে এলেন কাঁপা পায়ে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকে বড় খামটা খুলতেই একটা খাম বের হল। এটা তাঁর অফিসের খাম, এতদিন বাদেও চিনতে পারলেন। লোকটা অফিসের স্টেশনারি মিস্-ইউজ করেছে। খামটার মুখ বন্ধ। কী লিখেছে লোকটা? খুলব-খুলব করেও তিনি খুলতে পারছিলেন না। এতদিনকার শিক্ষা বাধা তৈরি করছিল। শেষপর্যন্ত অনেক অস্বস্তি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিলেন ওটাকে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন। মার্থার শেষ অনুরোধ রাখবেন।

সেই বিকেলেই চিঠি এল লন্ডন থেকে। এস. কে. রায় পাঠিয়েছে। সেই বাবুটার নাতি যে ব্রিটেনের অতিথি হয়ে এসেছে। রাগে খামটাকে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও মনে পড়ে গেল। মার্থা ওই লোকটার কাছে যা গচ্ছিত রেখে এসেছিল তাই রয়েছে এখানে। বাবু এতদিন পরে পাঠিয়ে দিয়েছে। খাম খুললেন তিনি। লন্ডন থেকে এস. কে. রায় লিখেছে, 'ডিয়ার স্টিভেনসন, আমার দাদুর সঙ্গে কথা বলেছি। মিসেস স্টিভেনসনের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত এবং আপনাকে সহানুভূতি জানাতে বলেছেন। যা হোক, দাদুর ইচ্ছেমতন খামটা আপনার কাছে পাঠালাম। ধন্যবাদসহ—।'

খামটাকে দেখলেন তিনি। সেই একই খাম। মার্থাও স্টেশনারির মিস্-ইউজ করেছে। কাঁপা হাতে খামটাকে ছিঁড়লেন রবার্ট। একটা ভাঁজ করা কাগজ। কাগজে চোখ রাখলেন। তাঁর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে শরীর তুলে লকার থেকে আনা খামটার মুখ ছিঁড়লেন তিনি। একইরকম কাগজ। ওপরে লেখা—দশই মার্চ, ছেচল্লিশ, টাইগার হিলের সকাল। তার নিচে লেখা, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। আমৃত্যু করব। শশীকান্ত রায়।'

রবার্টের মনে হচ্ছিল তিনি শূন্যে ভেসে চলেছেন। প্রথম কাগজটা আবার তিনি তুলে ধরলেন, 'দশই মার্চ, ছেচল্লিশ, টাইগার হিলের সকাল। আমি ববকে ভালোবাসি। মার্থা স্টিভেনসন।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে। রবার্ট টিভি খুললেন। খবর হচ্ছে। লন্ডনের এক পাড়ায় ভারতীয়দের সঙ্গে সাদা ছেলেদের বিরোধ লেগেছে। তিনজন ভারতীয়কে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। টিভি বন্ধ করলেন তিনি। তারপর টেলিফোন তুললেন, 'ম্যাক, আমি বব্। রবার্ট স্টিভেনসন। হ্যাঁ, তুমি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে পারো। বাই।'

সন্ধেবেলার মানুষ

পরদা উঠলে দেখা গেল মঞ্চ অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত যেতেই আমরা বুঝতে পারলাম এমনটা নাটকে ছিল না। উইংস-এর ওপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। কথাবার্তা যা ভেসে এল তাতে বুঝলাম বৈদ্যুতিক বিভ্রাট ঘটে গেছে।

আমরা উশখুশ করতেই একটা মোমবাতি দেখা গেল। ছোট্ট আলো সামলে যিনি মঞ্চে এলেন তাঁর বয়স আন্দাজ করা মুশকিল।

মুখেই আলো জমায় মোটামুটি বয়স্ক ঠেকছে। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে আধো-আলোয় মধ্যবিত্ত আসবাব দেখতে পেলাম।

'উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা, আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না সেটা বুঝতেই পারছেন। কথা তো অনেক কিছুরই থাকে না, হয়ে যায়, এবং হলে আমরা তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

'যা হোক, চুপচাপ বসে না থেকে আসুন আপনাদের সঙ্গে আমি একটু আলাপ পরিচয় করে ফেলি। আমরা আজ যে নাটকটি করব সেটি আমার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়েই। যেহেতু আমিই একমাত্র রোজগেরে মানুষ, তাই আমাকেই কর্তা বলা হয়। আমার নামে কার্ড এলে স্ত্রী নেমন্তন্ন খেতে যান। তাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে।'

ভদ্রলোক মোমবাতিটা একটা টেবিলে সযত্নে রাখলেন। আলো সরতেই বুঝলাম ওঁর বয়স পঞ্চাশের গায়ে। কথা বলার ধরন মন্দ নয়।

'আমার নাম নিরাপদ মিত্র। একেবারে সাদাসাপটা নাম। আমি জীবনে কখনও কোনও পাপ করিনি। যাকে বলে অন্যায়, তা কখনও করিনি। মিথ্যে কথা বলিনি। এই কথাগুলো আপনাদের কানে সোনার পাথরবাটির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্যি। আমি রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারী এবং এখন পর্যন্ত ঘুষ নিইনি। এই বাড়িটা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কিনেছিলেন। গত কুড়ি বছরে হোয়াইট ওয়াশ করাতে পারিনি পয়সার অভাবে। খুব কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে। এটা নতুন গল্প নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে মনে হয় কষ্টটা আমি একাই করছি। আপনাদের এসব কথা বলছি জানলে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। আমার বেশি কথা বলা বারণ।

'আমরা চারজন এই বাড়িতে থাকি। আমার স্ত্রী নন্দিতা—, দাঁড়ান, নন্দিতার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। পঁচিশ বছর আগে আমরা যখন বিয়ে করেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল বাইশ। এই সাতচল্লিশে চেহারাটা খুব খারাপ রাখেনি। হ্যাঁ, আগে খুব ছিপছিপে ছিল, কথাবার্তায় মিষ্টত্ব ছিল। আমারই দোষে সেগুলো নষ্ট হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ও যে দুটো বড়-বড় ছেলেমেয়ের মা, তা দেখলে বোঝা যায় না। ডাকি ওকে, নন্দিতা, নন্দিতা—!'

'কেন?' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

'একটু এ ঘরে আসবে?'

প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে উত্তর না পেয়ে নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আমি

অবশ্য সচরাচর এমন ডাকাডাকি করি না। অস্বস্তি হয়। আসলে ছেলে বা মেয়েকে যে গলায় ডাকি, স্ত্রী-কে ডাকতে গেলেও তো সেই গলাতেই ডাকতে হয়। ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক নয়, আমার বাবা তো মাকে কোনওদিন নাম ধরেই ডাকেননি।'

এই সময় সালোয়ার কামিজ পরা লম্বা গড়নের একজন ঘরে ঢুকল, 'ডাকছ কেন?'

'তোমাকে নয়, তোমার মাকে।'

'মা সেটাই জানতে চাইল।' মেয়েটার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট।

'অ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'কাজ ছিল।'

'কাজ? ইউনিভার্সিটি ছুটি হয় চারটেয় আর রাত সাতটা পর্যন্ত কী কাজ করো?'

'রাত সাতটা নয়, সন্ধে সাতটা।'

'আমার প্রশ্নের এটা উত্তর নয়।'

'বললাম তো কাজ ছিল।'

'না, থাকতে পারে না। বিকেলবেলার পর তোমার বয়সি মেয়ের কোনও কাজ থাকতে পারে না। যদি দরকার হয়, সেই কাজ দিনেরবেলায় করবে।'

'কেন?'

'আমার চিন্তা হয়।'

'তোমার ছেলে রাত ন-টার আগে বাড়ি ফেরে না। তাকে একথা বলো না কেন?'

'আশ্চর্য! সে ছেলে, নিজের ব্যাপারটা সামলাতে পারে।'

'বাবা, তোমার ধারণা সন্ধে নামলেই কলকাতার রাস্তায় চিতাবাঘ আর হায়না ঘুরে বেড়ায়?'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।'

'না, তুমি আমাকে বোঝাও। সন্ধের পর রাস্তায়-হাজার হাজার মানুষ ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরাও কাজের জন্যে বের হয়। তোমার কি মনে হয়, সেইসময় ছেলেরা আমাদের অসম্মান করবে?'

'করতে পারে।'

'এই ছেলেরা কারা? শ্যামল বা তোমার কারও ভাই অথবা বাবা?'

নিরাপদ যেন স্তম্ভিত, 'তুমি কী বললে!'

'অবাক হয়ো না। কথাটা সত্যি। যারা মেয়েদের অসম্মান করে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে না। আর সেইসব জন্তুগুলো দিনেরবেলাতেও সক্রিয় থাকে। বাবা, আমরা এতকাল ভয় পেতাম আর তোমরা সেই ভয়টাকে হাওয়া করতে। কিন্তু এখন দিন বদলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি অসুস্থ হলে আমাকেই ডাক্তার ডাকতে বেরুতে হবে, তাই না?'

মেয়েটি বেরিয়ে গেল। নিরাপদ মিত্রকে বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিতেই বোকার মতো হাসলেন। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে নীপা।'

অবশ্য অতবার-বাবা ডাক শুনে আমরা সম্পর্কটা বুঝেই গিয়েছিলাম, তাই এটা না বললেও ওঁর চলত। নিরাপদ মিত্র এক পা এগিয়ে এলেন, 'জানেন মশাই, আজকাল নিজের মেয়েকে ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। এমন সব কথা বলে যে, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা মুশকিল হয়ে পড়ে কিন্তু মানতে কষ্ট হয়। হ্যাঁ মানি, আজকালকার মেয়েরা আমাদের মা-মাসিমাদের মতো নয়, কিন্তু কাগজ খুললেই এত ধর্ষণের ঘটনা চোখে পড়ে যে, বাবা হিসেবে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায়? বলুন! যাকগে, মেয়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম কিন্তু যাঁকে ডেকেছি তিনি এখনও এলেন না। শৈশবে দেখেছি ঠাকুরদা বা বাবার কীরকম কন্ট্রোল ছিল ফ্যামিলির ওপর। মুখের কথা খসামাত্র কাজ হয়ে যেত। মা বাবার অবাধ্য হয়েছেন এমন ঘটনার কথা ভাবতেই পারি না। আর আজকাল—। আমিই একমাত্র আর্নিং মেম্বার কিন্তু আমাকেই তোয়াক্কা করে না। মা ভয় পেতেন দেখে আমরাও বাবাকে

ভয় পেতাম। এখন ছেলেমেয়েরা মাকে দেখে শিখছে, কি করে বাবাকে অবজ্ঞা করা যায়।'

'ডাকছ কেন?' আধা-অন্ধকাবে এক মধ্যবয়সিনী প্রবেশ করলেন।

'তোমার মেয়ে আমাকে পাঁচকথা শুনিয়ে গেল।'

'কেন খোঁচাতে যাও!'

'বাঃ, চমৎকার! রাত করে বাড়িতে ফিরবে আর বললেই দোষ!'

'কেন রাত হল জিজ্ঞাসা করেছ?'

'করেছি। বলল, কাজ ছিল। এটা কোনও উত্তর হল?'

'যখন সংসারের কোনও কাজ করবে না, তখন ওটাই উত্তর।'

'তার মানে? আমি সংসারের কাজ করি না।'

'কী করো? সকালে বাজারটা আর ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া। টাকা এনে দিচ্ছ বলে সাপের পাঁচ-পা দেখেছ! নীপা এ ঘরে আসার আগেই তুমি ডেকেছিলে আমাকে!'

নিরাপদ হাত ছুড়লেন, 'মনে নেই। এসব শোনার পর কিছু মনে থাকে না। এক-এক সময় মনে হয় তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। এটা কি স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক? যখনই দেখা হয় তখনই দুরমুশ করছ। আমি যেন পাপোশ, দেখলেই পা ঘষছ।'

'হতে পারে। তোমার সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। যা বোঝার তা একদিনে বুঝে নিয়েছি। যার সম্পর্কে আগ্রহ নেই তার সঙ্গে প্রেম করা যায় না।'

'ও আচ্ছা। তা তো বলবে। পাবলিক তোমার কথা শুনছে। বুঝে যাচ্ছে তুমি কী চিজ।'

'চিজ! আমাকে তুমি চিজ বললে!'

'নয়তো কী? আমার সঙ্গে যখন কথা বলো তখন যেন ড্রাম বাজছে আর যতীন যখন আসে তখন মনে হয় জলতরঙ্গ!'

'যতীনবাবু হাসালে! ওই সিড়িঙ্গে লোকটা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হবে? তুমি তো এর বেশি ভাবতেও জানো না।' এইসময় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই ভদ্রমহিলা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ মিত্র আমাদের দিকে তাকালেন, 'এইরকম এক মহিলার সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে। আমি অভিযোগ করছি না, নন্দিতা, আমি ছাড়া আর সবার কাছে খুব ভালো। কিন্তু আমি আমার দোষটা বুঝতে পারি না। আমি অসৎ নই, মিথ্যে কথা বলি না, কখনও কোনও পাপ করিনি। লাস্ট দশ বছর নন্দিতা মেয়েব সঙ্গে শুচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভাবি আমার সঙ্গে ওর বিয়ে না হলেই ভালো ছিল। ওর সঙ্গে প্রেম করার জন্যে পাড়ার একটি ছেলে ছটফট করত। বাবা-মায়ের ভয়ে তাকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। এ গল্প বিয়ের দু-বছর বাদে শুনেছিলাম। ছেলেটার নাম কী যেন—পার্থ, পার্থ সান্যাল। পার্থর সঙ্গে বিয়ে হলে নন্দিতা সান্যাল হয়ে এখন নিউ জার্সিতে থাকত। নন্দিতাই খবর এনেছে পার্থ এখন আমেরিকান শিল্পপতি। নিরাপদর জায়গায় পার্থ হতেই পারত। ভাবতেই কেমন লাগে! আচ্ছা, এই নিয়ে নন্দিতার মনে আপশোশ নেই তো! মুখে বলেনি কোনওদিন, কিন্তু—।'

হঠাৎ ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'বাড়িতে ভূতের মতো বসে আছ। সমস্ত পাড়ায় আলো জ্বলছে। ফিউজটা গেছে, এটা চেঞ্জ করতে পারোনি!'

সঙ্গে-সঙ্গে নন্দিতার গলা, 'কে করবে? যাঁর করার কথা তিনি তো ওই ঘরে দাঁড়িয়ে কাব্যি করছেন।'

নিরাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এইসময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে ঘরে ফিরলেন। ছেলে না বলে অপোনেন্ট বলাই ভালো। ওর সঙ্গে আলাপটা আপনারা নিজেরাই করে নিন। ততক্ষণ আমি হাতমুখ ধুয়ে নিই।'

নিরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা চোখ বোলালাম। একটি অতি সাধারণ ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। ঘরের দেওয়ালের চুন অনেক জায়গায় খসে-খসে গিয়েছে। একটা সস্তা টেবিল এবং চারটে চেয়ার দেখতে পাচ্ছি একপাশে। এদিকে তিনটে কাঠের চেয়ার মুখোমুখি। নন্দিতা ঘরে ঢুকলেন হাতে দুটো থালা নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রেখে গলা তুললেন, 'খাবার দিয়েছি!' সঙ্গে-সঙ্গে নীপাকে দেখা গেল জলের জাগ এবং তিনটে গ্লাস নিয়ে ঢুকতে। ব্যস্ততা বাড়ল। নন্দিতা কয়েকবার সম্ভবত রান্নাঘরেই গেলেন এবং তিনটে থালায় খাবার ছাড়াও একটা আলাদা পাত্র মাঝখানে রইল। নীপা একপাশে চেয়ার টেনে বসতেই ঘরে শ্যামল এল। মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে সুদর্শন, কিন্তু একটু চোয়াড়ে ভঙ্গি আছে। পরনে গেঞ্জি পাজামা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে খাবারের থালার দিকে তাকাল। ওর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'ওঃ, সেই একঘেয়ে ব্যাপার।'

নন্দিতা বললেন, 'বোস।'

চেয়ার টেনে নিল শ্যামল, 'ধুস! এভাবে খাওয়া যায় না। একদিন একটু ভালো করে রাঁধতে পারো না?'

নীপা বলল, 'ওই সয়াবিনের তরকারিটা আমাকে দিও না।'

ছেলে নয়, মেয়ের দিকে তাকালেন নন্দিতা, 'কী দিয়ে খাবে?'

'ডাল দিয়েই হয়ে যাবে।' নীপা হাত বাড়াল।

শ্যামল মায়ের দিকে ফিরল, 'আজ মাংস করতে বলেছিলাম না?'

নন্দিতা হাসার চেষ্টা করলেন, 'মাংসের কেজি কত করে জানিস?'

'যতই হোক, লোকে তো খাচ্ছে, কারা খাচ্ছে, কীভাবে খাচ্ছে তা আমার জানার দরকাব নেই।'

'তোর বাবা যে টাকা দেয় তা থেকে শেষদিকে মাংস কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠে দেখতে পেলেন নিরাপদ ঢুকছে। সেই গলায় তিনি বললেন, 'এসব কথা রোজ-রোজ শুনতে আমার ভালো লাগে না। তুমি জবাবদিহি দাও!'

নিরাপদ চেয়ার টেনে নিলেন। নন্দিতা বসলেন না। নিরাপদ বলোলেন, 'আমার যা রোজগার তাতে এর চেয়ে বেশি হয় না শ্যামল। তুই পাশটাশ করে চাকরি করলে ইচ্ছেমতো খেতে পারবি।'

'চাকরি যেন হাতের মোয়া, চাইলেই পাব!' শ্যামল রুটি ছিঁড়ল।

নন্দিতা আরও বিরক্ত হলেন, 'এমনভাবে কথা বলছিস যখন, তখন কলেজে যাওয়াই বা কেন? তাতেও তো কিছু পয়সা বাঁচে।'

শ্যামল মায়ের দিকে তাকাল, 'আশ্চর্য! তোমরা কেউ সত্যি কথা ফেস করতে চাও না কেন বলো তো? আজকাল যেখানে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেও চাকরি পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে, সেখানে আমার কোনও চান্স নেই, বুঝলে?'

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার চেষ্টা করেছিস কখনও?' নন্দিতা যেন রাগে পেলেন।

'ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ইচ্ছে করলেই করা যায় না, তার জন্যে প্রতিভা থাকা চাই। বাবা সেকেন্ড ক্লাশে বি. এ. পাশ করেছিল, তুমিও তাই। আমি গাছ থেকে প্রতিভা পেড়ে নেব?'

শ্যামল কথাটা বলামাত্র নীপা উঠে গেল খাওয়া শেষ করে। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী, ওর খাওয়া হয়ে গেল?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, 'আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, পাগল হয়ে গেলাম। ওনার সয়াবিনের তরকারিতে গন্ধ লাগে। নবাব-কন্যা!'

শ্যামল বলল, 'বাবা মোটেই নবাব নয়। সাধারণ মানুষও বলা যায় না।'

নিরাপদ অবাক হলেন, 'আমি সাধারণ মানুষ নই!'

'না। এখন সাধারণ মানুষ শিখে গেছে বাঁচতে হলে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। যে

দুশো টাকা রোজগার করত সে তিনশো পাওয়ার চেষ্টা করে। তুমি যত সব প্রিমিটিভ আইডিয়া নিয়ে বাস করছ। জামা-কাপড়ের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যাবে বাসে চড়লে, তাই দু-কিলোমিটার হেঁটে অফিসে যাও। আসলে রোজ দু-টাকা বাঁচাও। কিন্তু তোমার কলিগ শেয়ার ট্যাক্সিতে যায়, সে কীভাবে টাকা পায়?'

'যতীন ঘুষ নেয়।'

'তো কী হয়েছে?'

'তার মানে? তুই বলছিস কী?'

'আজকাল যখন এ-টু-জেড ঘুষ নিচ্ছে, তখন তুমি সৎ থেকে আমাদের এই সয়াবিন খাওয়াচ্ছ! সারা পৃথিবী আজ জেনে গিয়েছে ধরা পড়ে প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত ঘুষ অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মানুষ একটু সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে।'

নিরাপদ স্ত্রী-র দিকে তাকালেন, 'শুনছ, ও আমাকে ঘুষ নিতে বলছে?'

নন্দিতা জবাব দিলেন না।

শ্যামল বলল, 'মানুষের ধ্যানধারণা চিরকাল এক জায়গায় আটকে থাকে না। আজ থেকে দুশো বছর আগে মেয়েরা পড়বে কেউ ভাবত না। পঞ্চাশ বছর আগে অফিসে চাকরি করার কথা চিন্তা করত না। এখন এ নিয়ে প্রশ্ন কেউ তোলে? এই যে মা, আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত বলো তো? পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে, তাই না?'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বয়স নিয়ে তোর কী দরকার?'

'তোমার ঠাকুমা এমনকী তোমার মাকেও ওই বয়সে দেখেছ? কীভাবে শাড়ি পরত ওরা? দিদিমা-দিদিমা টাইপ না? অথচ মাকে দ্যাখো; নীপার সঙ্গে কোনও ডিফারেন্স পাবে না। এটাই স্বাভাবিক। আর তুমি সেই কথামালা জপে যাচ্ছ।'

নিরাপদ চুপচাপ খাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'দ্যাখো শ্যামল, এইসব কথা, যা তুমি বললে, তা আর আমার সামনে উচ্চারণ করো না। আমি যেভাবে এতদিন চালিয়েছি, বাকি ক-টা দিন সেইভাবেই চালাব। শৈশব থেকে তোমাদের যেভাবে বড় করেছি তাতে কষ্ট থাকলেও স্বস্তি ছিল, আনন্দ ছিল। আজ বড় হয়ে যদি তোমার মনে হয়, আমার আচরণের জন্যে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমার কিছু করার নেই।'

শ্যামল আর কথা বলল না। নন্দিতা চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। কয়েক সেকেন্ড যাওয়ার পর নন্দিতাই পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্যে বললেন, 'শ্যামল, তোর তো ফাইনাল ইয়ার এবার, ইউনিয়ন করা ছাড়'

খেতে-খেতে মুখ না তুলে শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'চাকরি দেবে কে?'

'মানে!' নন্দিতা অবাক।

'তোমার কোনও ক্ষমতাবান দাদা, বাবা, ভাই আছে?'

'না।' মাথা নাড়লেন নন্দিতা।

'তোমার?' নিরাপদর দিকে তাকাল শ্যামল।

'আমাকে কেউ হেল্প করেনি কখনও।'

'কারণ তাঁরা সবাই অর্ডিনারি। আজকাল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সোর্স না থাকলে যে চাকরি পাওয়া যায় না, তা একটা শিশুও বোঝে। আমার কেউ নেই তাই আমি ইউনিয়ন করছি। নীচুতলার নেতাদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেছে। আর একটু ওপরে উঠলে সোর্সটা অনেক বড় হয়ে যাবে। কেউ ইউনিয়ন রাজনীতি বখে যাওয়ার জন্যে করে না, গুছিয়ে নেওয়ার গ্রাউন্ড-ওয়ার্ক এটা। উঠছি।' শ্যামল খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনওদিন বনবে না বাবা।'

নিরাপদ বললেন, 'হয়তো!'

'কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করে যাব।'

'ভালো। তবে না করলেও আমি দুঃখিত নই। তোমাদের বড় করা কর্তব্য, করেছি, কিন্তু তার বদলে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই। যে যারটা বুঝে নিয়ে ভালো থাকলেই হল।'

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। নন্দিতা স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কথাটা ভেবেচিন্তে বললে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর তোমার হাতে কিছু থাকবে? রিটায়ারমেন্টের আর ক-বছর দেরি খেয়াল রাখো? তারপর যদি ছেলে না খাওয়ায়—।'

'তোমাকে খাওয়াবে?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, একশোবার খাওয়াবে। কারণ তোমার মতো হাড়ে দুব্বো গজানো কথা ওদের সঙ্গে আমি বলি না। তখন দেখব তুমি কী করো!' রাগত নন্দিতা থালা-গ্লাস তুলতে-তুলতে কথাগুলো বলে ওগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদর হাতে তখন জলের গ্লাসটা। তাঁর থালা ভেতরে চলে গিয়েছে। জলটা গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের সামনে, 'এই হল আমার সংসার। সবাই সবার মতো ভালো। তা এরকমটা চলে যেত। কিন্তু আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আজ সকালে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি। ওটা এসেছে কুচবিহার থেকে। যখন অফিসে বেরুচ্ছিলাম তখন পিওন আমার হাতে দিল। ওটা পাওয়ার পর আমি যাকে বলে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কাউকে বলতে পারছি না। কী বলব? বললে তো অনেক কথা বলতে হয়। আমি মিথ্যে কথা বলি না। কিন্তু এই সত্যি কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করবে? ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে। ঘেঁচু! মানুষ আদ্যিকালেও সন্দেহ করতে ভালোবাসত, এখনও বাসে। কিন্তু চেপে যাওয়ার উপায় নেই। সর্দি অথবা বসন্ত যেমন শরীর থেকে বের হবেই, এও তেমন। এখন যে চিঠি লিখে বারণ করব তার উপায় নেই। নিজের মুখে বললে অনেক কথা বলতে হয়, তাই সন্ধেবেলায় পোস্টকার্ডটা আমাদের লেটার-বক্সে ফেলে এসেছি। ওরাই বাক্সটা খুলুক, দেখুক। তারপর যা হয় হবে।'

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। আবার আলো ফুটলে দেখলাম পেছনের জানলা খোলা। ওই একই ঘর কিন্তু জানলার বাইরে সকালের কচি আলো। সময়টা সকাল বলেই মনে হচ্ছে। একটা পোস্টকার্ড পড়তে-পড়তে নীপা ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিঠি এসেছে।'

নন্দিতার গলা পাওয়া গেল, 'কার?'

নীপা মন দিয়ে পড়তে লাগল। জবাব দিল না।

ঘুমঘুম চোখে শ্যামল ঘরে ঢুকল, 'কার চিঠি রে?'

'অদ্ভুত!' নীপা বলল, 'মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না। মা, এ ঘরে এসো!'

নন্দিতা ঢুকলেন। নীপা বলল, 'বাবার নামে চিঠি এসেছে।'

'কে লিখেছে?'

'কল্যাণী।'

'সে আবার কে? কোথায় থাকে?'

'কুচবিহার।'

'কুচবিহার! ওখানে ওর কেউ থাকে বলে জানতাম না তো! কী লিখেছে? পড়!'

নীপা পড়তে শুরু করল, **'শ্রীচরণকমলেষু, আশা করি ভালো আছ। দীর্ঘ তিরিশ বছর পর নিতান্ত বাধ্য হয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা পেয়েছি। আশা করছি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। আমার একমাত্র মেয়ে মালবিকা অসুস্থ। এখানকার ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না। তারা কলকাতায় যেতে বলছে অথচ সেখানে আমার কোনও বলভরসা নেই। তাই তোমার সাহায্য চাই। আমরা আগামী মঙ্গলবার তিস্তা-তোর্সায় রওনা হব। যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে**

অবিলম্বে জানাও। প্রণাম নিও। ইতি কল্যাণী।'

নন্দিতার মুখ থেকে শব্দ ছিটকে বের হল, 'কী আশ্চর্য! এখানে এসে উঠছে নাকি?'

নীপা বলল, 'বাবার কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

শ্যামল বলল, 'আর লোক পেল না? বাবা কাকে চেনে?'

নন্দিতা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, 'কোথাকার কে, ফস করে লিখে দিল যে আসছে!'

নীপা বলল, 'বাবার কোনও দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া?'

নন্দিতা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত উলটে বললেন, 'কে জানে!'

এই সময় বাজারের ব্যাগ হাতে নিরাপদ ঘরে ঢুকে বললেন, 'কাঁচালঙ্কা আবার আকাশছোঁয়া হয়ে গেল।'

'কল্যাণী কে?' নন্দিতা প্রশ্নটা ছুড়ল।

'কল্যাণী—!'

'চিঠিটা দে নীপা।'

নীপা চিঠিটা এগিয়ে দিতে নিরাপদ সেটায় চোখ রাখলেন।

'কল্যাণী বলে কাউকে চেনো না?'

'চিনতাম।'

'সে কে?'

'মালদায় থাকত। কুচবিহারে গিয়েছে জানতাম না।' নিরাপদ বললেন, 'মালদার মোকদমপুরে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। আমি তখন কলেজে পড়ি, আর ও, কত হবে ক্লাশ নাইন-টেন—। অবশ্য সেই কল্যাণী আর এই কল্যাণী এক কিনা বলতে পারব না।'

নীপা বলল, 'লিখেছে তিরিশ বছর পরে চিঠি লিখছে, তাহলে এক হতেই পারে। বিয়ের পর মালদা থেকে কুচবিহার চলে গেছে।'

'হতে পারে। ওর বিয়ের আগেই আমরা কলকাতায় চলে আসি।'

নন্দিতা আর পারছিলেন না, 'তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল?'

'সম্পর্ক? তখন আর কি সম্পর্ক হবে! আমার কাছে অঙ্ক করতে আসত।'

'তুমি ওকে পড়াতে?'

'টাকা নিতাম না, দেখিয়ে দিতাম।'

'কোনও সম্পর্ক না থাকলে এতদিন পরে এখানে এসে ওঠে?'

'এখানে ওঠার কথা তো লেখেনি।'

'আর কী লিখবে? শোনো, এখানে ওর ওঠা চলবে না। আজই লিখে দাও।'

'বেশ। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কীসের!'

'যা লিখেছে তাতে তিস্তা-তোর্সায় আজই পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার রওনা হলে বুধবার, বুধবার তো আজই। চিঠি আসতে অনেক সময় লেগেছে।'

'সে কী!' নন্দিতা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'তাহলে কী হবে?'

শ্যামল বলল, 'চেঁচাচ্ছ কেন? যদি আসে, চা খেতে দিও, ফ্রেশ হয়ে গেলে নিজেরাই বলবে কোথায় যাবে! আফটার অল বাবার পরিচিত।'

'তিস্তা-তোর্সা কখন আসে বাবা?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'সকালে।' নিরাপদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নীপা চোখ বড় করল, 'বাবা ট্রেনের টাইম পর্যন্ত জানে!'

'গার্লফ্রেন্ড আসছে তো!' শ্যামল আস্তে করে বলল।

'আসাচ্ছি! উঃ, পেটে-পেটে এত! এতবছর ঘর করছি, কখনও বলেনি।' নন্দিতা গজগজ করতে-করতে চলে গেলেন।

শ্যামল বলল, 'আমার না কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বাবা পোস্টকার্ডটার খবর জানত!'

'হ্যাঁ রে! সিলমোহর না দেখেই সব বলে দিল—চিঠি আসতে সময় লেগেছে।'

'প্লাস তিস্তা-তোর্সার সময় আগে থেকে জানার কোনও কারণ নেই। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে। একটা ট্যাক্সির শব্দ হল মনে হচ্ছে। দাঁড়া, দেখি।'

'মুখ ধুসনি, ভূতের মতো বাইরে যাচ্ছিস? তুই বাথরুমে যা, আমি দেখছি। ও হ্যাঁ, বাবার ঘরে একটা তোয়ালে আছে, ওটা বাথরুমে রেখে দে। গামছাগুলোর যা অবস্থা!' নীপা ভাইকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যামল গালে হাত বোলাল, তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়াল, 'আই বাপ!' তারপর উত্তেজিত গলায় ডাকল, 'মা, মা!'

নন্দিতা এলেন, 'কী হল?'

'এসে গেছে!'

'সেকী!'

'হ্যাঁ, বেডিং নিয়ে এসেছে। তোমার বয়সি মহিলা। ফরসা, সঙ্গে একটা মেয়ে। দেখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।'

'মনে হচ্ছে না?'

'না। দিব্যি নীপার সঙ্গে কথা বলছে।'

'বলাচ্ছি!'

'মা, তুমি আবার ওদের সামনে রাগ কোরো না। আফটার অল দে আর কামিং ফ্রম কুচবিহার।' নীপা সুটকেস নিয়েছে, ভদ্রমহিলা বেডিং।

'তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

'বাথরুমে যাব। যাচ্ছি।' শ্যামল হুড়বড়িয়ে গেল ভেতরে।

নন্দিতা কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছেঁড়া কাপড় তুলে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন, চেয়ারগুলো ঝাড়লেন। এবং তখনই নীপা সুটকেস হাতে ঢুকল, 'মা!'

বেডিং নিচে নামিয়ে কল্যাণী হাতজোড় করলেন, 'নমস্কার।'

নন্দিতা প্রতি-নমস্কার করলেন। তাঁরই বয়সি হতে পারে কিন্তু ভারী চেহারা। মাথায় সিঁদুর নেই, লক্ষ করলেন। নীপা বলল, 'আমি বলেছি আমরা আজই চিঠি পেলাম।'

কল্যাণী বললেন, 'শুনে খুব খারাপ লাগছে—।'

'না, ঠিকই আছে, বসুন। তোমার নাম কী?'

'সতেরো-আঠারোর মেয়েটি শান্ত গলায় জবাব দিল, 'মালবিকা।'

'ওরই চিকিৎসার জন্যে আসা। আপনাদের তো চেনার কথা নয়, যিনি চিনতেন তিনি এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। অনেককাল আগের কথা তো?'

'বাবা চিনতে পেরেছেন। আপনি বাবার কাছে পড়তে যেতেন তো!'

'যাক, মনে আছে তাহলে!'

'মা, বাবা কোথায়? বাবা, বাবা!'. নীপা চেঁচাল।

নন্দিতা বললেন, 'বসুন।'

এইসময় নিরাপদ ঘরে এলেন। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়। বিস্ময় কল্যাণীর মুখেও। প্রথম কথা বললেন কল্যাণীই, 'তুমি প্রায় একইরকম আছ নিরাপদদা।'

'একইরকম কি থাকা যায়, বয়স হচ্ছে না?'

'আমাকে চিনতে পারছ?'

'মুখ পালটায়নি, মোটা হয়েছ।'

'এই আমার মেয়ে। বাঁ-হাতে প্রণাম করা ঠিক নয়, তাই প্রণাম করতে পারছে না।'

'কেন, ডান হাতে কী হয়েছে?'

'ওই তো মুশকিল। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। ডানহাত নাড়তেই পারছে না ও। যা করার বাঁ-হাতে করতে হচ্ছে। অথচ ডানহাত একটুও অবশ হয়নি।'

নীপা বলল, 'মালবিকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

মালবিকা তার মায়ের দিকে তাকাল। কল্যাণী বললেন, 'নিরাপদদা, কলকাতায় আমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। ওর চিকিৎসার জন্যে আমাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। একজন ভালো ডাক্তার আর থাকার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

'আমি তো তেমন কাউকে—!' বিড়বিড় করলেন নিরাপদ।

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' শ্যামলের গলা পাওয়া গেল। পরিষ্কার হয়ে সে ঘরে ঢুকল, 'আমাদের ইউনিয়নের একটি ছেলের বাবা নামকরা নার্ভের ডাক্তার, আপনি চিন্তা করবেন না। মা, এঁরা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, কাঁরে নীপা—।'

'আপনার ছেলে?' কল্যাণী নন্দিতার দিকে তাকালেন।

শ্যামলই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ও বড়, আমি ছোট। এবার বি.এ. দেব।'

নন্দিতা কিছুই বলতে পারলেন না, তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

শ্যামল বলল, 'মা, ওনাকে নিয়ে যাও। কতদূর থেকে এসেছেন, ফ্রেশ হওয়ার দরকার।'

কল্যাণী শ্যামলের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার নন্দিতার কাছে এলেন, 'আপনার ছেলে কিন্তু নিরাপদদার ধরনটা পায়নি, বরং মেয়ের সঙ্গে খুব মিল আছে। আচ্ছা বউদি, আমি এভাবে এসে পড়ায় আপনার তো কোনও অসুবিধে হয়নি?'

'ওমা! আমার অসুবিধে হবে কেন? আসুন। আসলে এখানে জায়গার বড় সমস্যা। সেই আদ্যিকালের বাড়িটাকে বাড়াবার কোনও চেষ্টা করেননি আপনার দাদা।' নন্দিতা উঠলেন। কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালবিকার বাবা—?'

'পাঁচ বছর।'

'ও!' নন্দিতাকে সত্যি বিমর্ষ দেখাল। তিনি কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেলেন।

শ্যামল বেডিংটাকে নিয়ে এল একপাশে। এইসময় নিরাপদ ঢুকলেন। ছেলেকে বেডিং সরাতে দেখলেন, 'তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর বাজার থেকে কিছু আনতে হবে কিনা?'

'এই তো বাজার করে নিয়ে এলে!'

'হ্যাঁ, তবু মানে ওরা—।'

'হলে মা বলবে।' শ্যামল বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ চেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ করলেন। নন্দিতা বললেন, 'বসে না থেকে বেরোও।'

চমকে চোখ খুললেন নিরাপদ, 'মানে?'

'একটা মোটামুটি হোটেল খুঁজে এসো।'

'হোটেল? এ পাড়ায় হোটেল আছে নাকি?'

'যে পাড়ায় আছে, সেখানে যাও।'

'আমার অফিস?'

'খুঁজতে দেরি হলে যাবে না। সি-এল নেবে।'

'বেশ। কিন্তু ওরা দুটি মেয়ে হোটেলে থাকবে, ঠিক হবে?'

'বাঃ, চমৎকার! আমাকে যখন একা আড়িয়াদহে যেতে বলো, তখন এমন দুশ্চিন্তা হয় না। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, আজ বিকেলেই ওদের বিদায় করো।'

'আস্তে কথা বলো নন্দিতা!'

'তোমাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন ভিলেনের মতো আচরণ করছি!' নন্দিতা গলা নিচে নামালেন, 'আমি তোমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করিনি, বিয়ের আগে কতটা প্রেম ছিল? সেই প্রেম স্বর্গে ছিল না মাটিতে নেমেছিল? বুক জ্বলে যাচ্ছে তবু জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ কী জানো?'

নিরাপদ নীরবে মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'ওই যে, আমি কখনও মিথ্যে বলি না, পাপ করি না—! ফস করে যদি সত্যি কথাটা বলে ফ্যালো তাহলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব!'

'সত্যি কথা?'

'নইলে কোন জোরে এত বছর বাদে এখানে এসে ওঠে? তার ওপর স্বামী নেই, সোনায় সোহাগা।'

'স্বামী নেই মানে?'

'পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়েছেন। তার আগে থেকেই স্কুলে পড়ান।'

'ও!'

'শুনে দুঃখু উথলে উঠছে?'

'যা-তা বকছ!'

'শোনো, আমার এখানে তিনটে ঘর। একটায় আমি আর নীপা শুই আর একটাতে তুমি আর শ্যামল। এই ঘরটায় কেউ শুতে পারে না—পারে?'

'এমনিতে পারার কথা নয়। রাত্তিরে আরশোলা বের হয়। ওদের আমি আমার শোওয়ার ঘরে ঢোকাতে পারব না।'

'আচ্ছা!'

'যাও, ওঠো, হোটেল খুঁজে এসো। যাও!'

নিরাপদ উঠলেন এবং নীপা ঢুকল, 'মা, মেয়েটা খুব ভালো।'

নিরাপদ মেয়ের দিকে তাকালেন।

'ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে। চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। আমি অনেক বলতে একটি শোনাল। বেচারা ডান হাতটা একদম নাড়াতে পারে না। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কষ্টে আছে।'

'আর কিছু?' নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আহা, একটা ভালো মেয়েকে ভালো বলব না?'

নিরাপদ বললেন, 'যাই?'

শ্যামল এল ঘরে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'হোটেল খুঁজতে।'

'ইটস টু মাচ। অসুবিধে হলে আমাকে বলো, আমি গেস্টহাউস ঠিক করে দেব।'

'গেস্টহাউস?' নিরাপদ অবাক।

'হ্যাঁ। পার্টির লোকদের ওসব জানাশোনা আছে। খরচ কম হবে।'

'তাহলে তো হয়ে গেল।'

'মা, মালবিকাকে আজ যাতে ডাক্তার দেখানো যায় তার ব্যবস্থা করছি, বুঝলে?'

নন্দিতা কোনও কথা না বলে ভেতরে চলে গেলেন। নিরাপদ বললেন, 'কী-যে সব হয়ে গেল বলো তো।'

নীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কী আবার হবে?'

'ওরা এল, তোদের মায়ের অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি—।'

'মা প্রথম-প্রথম ওরকম করে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বন্ধু, বিপদে পড়েছে—।'

'বন্ধু?'

'বাঃ, একই পাড়ায় থাকতে, তোমার চেয়ে তো বেশি ছোট নয়।'

'আমাদের সময়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব হত না।'

'কেন?'

'বড়রা সেটা স্বাভাবিক চোখে দেখত না।'

'তাহলে মেলামেশা করলে কী বলা হত?'

'ভাইবোনের সম্পর্ক ভাবা হত।'

'উনি তোমাকে দাদা বলে চিঠি লিখেছেন, ওই নিয়েমেই?' নীপা হাসল।

'নিয়ম আবার কী, যখনকার যা চল।'

শ্যামল হেসে ফেলল, 'সমবয়সি হলে?'

'কথাই হত না। হলে সেটা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হত না?'

নীপা হাসল, 'তাহলে কল্যাণীপিসিকে তোমার গার্লফ্রেন্ড বলা যাচ্ছে না?'

'বললাম তো আমাদের সময় ওসবের রেওয়াজ ছিল না।'

শ্যামল ঝাঁকিয়ে উঠল, 'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন মান্ধাতার বাবার আমলের লোক! তিরিশ বছর আগে, মানে নাইনটিন সিক্সটিটু, উত্তমকুমার সুচিত্রা সেনের ছবি সুপারহিট, 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গান গাওয়া হয়ে গেছে। গুল মারছ! আমি বেরুলাম। মালবিকার ডাক্তার ঠিক করে আসি।' শ্যামল চলে গেল।

নীপা পাশে এসে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ বাবা, ষাট-একষট্টিতে অপুর সংসার বেরিয়ে গেছে!'

'তো কী হয়েছে?'

'যুগটা প্রাচীন ছিল না।'

'ওটা সিনেমায়, জীবনে নয়। তখন সন্ধ্যার পর কোনও মেয়েকে ট্রামে দেখা যেত না।'

'তোমার কথা শুনলে মনে হচ্ছে সতীদাহ প্রথা যখন চালু ছিল, তার থেকে ওই সময়টা খুব বেশি এগোয়নি।' নীপা চলে যাচ্ছিল। নিরাপদ তাকে ডাকলেন, 'শোন।'

নীপা দাঁড়াল।

নিরাপদ বললেন, 'কখনও-কখনও এগোয় না। এই যেমন তোর মা। রামমোহনের সময় একজন মা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন, বিরানব্বুইতে ইনি একইভাবে করছেন।'

'ছাই। মা ভয় পাচ্ছে খরচ কুলোতে পারবে না ভেবে। তুমি এক্সট্রা দেবে না।' নীপা বেরিয়ে গেল। একটু চুপ করে বসে নিরাপদ পাঞ্জাবিটা খুলতে গিয়ে সামলে নিলেন কল্যাণীকে ঢুকতে দেখে। হাসার চেষ্টা করলেন।

'তোমার অফিসের দেরি হচ্ছে না নিরাপদদা?'

'না, না।'

'বিশ্বাস করো কোনও উপায় ছিল না।'

'আরে ঠিক আছে।'

'তুমি কিন্তু বেশি পালটাওনি। শুধু চুল খসে গিয়েছে। কী সুন্দর কোঁকড়া চুল ছিল তোমার! ঢেউখেলানো, সামনে সিঙাড়া। আমরা উত্তমকুমার বলতাম, মনে আছে?'

'হুঁ।'

'সব চলে যায়।' নিশ্বাস ফেললেন কল্যাণী, 'আমার কথা তোমার মনে ছিল?'

নিরাপদ ঢোঁক গিললেন, 'ওই, মানে, ছেলেবেলার কথা মনে হলে—।'

'ব্যস?'

'আসলে সংসারের চাপে দম ফেলার উপায় নেই।'

'তোমার ছেলেমেয়েদুটি খুব ভালো। ওদের মা-ও।'

'মালবিকার বাবার কী হয়েছিল?'

'আট বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। দু-বার স্ট্রোক হয়েছিল। তৃতীয়বারে চলে গেলেন।

'ও। সব একাই সামলাতে হচ্ছে?'

'দোকা কোথায় পাব? মেয়েটার বিয়ে দেব ভাবছিলাম, তা দ্যাখো এই কাণ্ড। ওই মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে?'

'কী করে হল?'

'হঠাৎই।'

'নিরাদা, তোমার মনে আছে, তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলে?'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করি, বাচাল না হই, পাড়ার যেসব ছেলে আমার সম্পর্কে আগ্রহী তাদের পাত্তা না দিই, এসব উপদেশ দিয়েছিলে। চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। খুব রাগ হয়েছিল, তাও।'

'হ্যাঁ, তুমি খুব ছটফটে ছিল।'

'আর?'

'মাথায় গোবর ছিল। তিন-চারবার করে বোঝাতে হত।'

'আমি জানি নিরাদা, আমাকে দেখে তুমি খুশি হয়েছ। কিন্তু তুমি ভালো নেই।'

'যা বাজার, তাতে ভালো থাকা যায়! বড় চাকরি তো পেলাম না।'

নিরাপদ উঠে দাঁড়ালেন। নীপা চায়ের দুটো কাপ নিয়ে এল, 'মালবিকা চা খায় তো?'

'মাঝে-মাঝে।' কল্যাণী জবাব দিলেন।

'মালবিকা, এ ঘরে এসো।' নীপা চেঁচাল।

'বাবাকে চা দেবে না?'

'বাবা এককাপ খেয়েছে, আর খাবে না। পিটপিটে আছে তো!'

মালবিকা এল। নীপা বলল, 'নাও। তোমার চা।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি, লাজুক হাসল।

'তাহলে কী খাবে?'

'কিছু না।'

নিরাপদ বলোলেন, 'ওকে মুড়ি এনে দে। আর চা বেশি হলে আমাকেই দিতে পারিস।'

নীপা অবাক হয়ে বাবাকে কাপটা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি খুব ভালো গান গাও?'

'না, না।' লজ্জা পেল মালবিকা।

'শুনলাম। একদিন শুনতে হবে তোমার গান।'

কল্যাণী বললেন, 'কুচবিহারে ও রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম হয়েছে। এই হাতের ব্যাপারটা হওয়ার পরই সব থামাতে হচ্ছে!'

নীপা এল একবাটি মুড়ি নিয়ে। টেবিলে রেখে ইশারা করল মালবিকাকে। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী পড়ো?'

'এম. এ.। জি. আর. ই. দিয়েছি।'

'সেটা কী?'

নিরাপদ জবাব দিলেন, 'পাগলামি। আমেরিকায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পড়তে যাওয়ার জন্যে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। ও জোর করে দিয়েছে।'

'জোর করে কেন?'

'আমাদের ঘরের মেয়ে কি আমেরিকায় পড়তে যেতে পারে?'

'ওরা পড়ার খরচ দেবে না? মানে স্কলারশিপ?'

'তা হয়তো দেবে। কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবে কে?'

'যদি পাশ করে তাহলে তোমার দেওয়া উচিত নিরাপদদা।'

কল্যাণীর কথার শেষে নন্দিতা ঢুকলেন, 'কেন? এদেশে এম. এ. পড়া যায় না?'

নীপা বলল, 'যায়। তারপর আর কিছু হয় না। আর ওদেশে পড়াশুনো করে কেউ বেকার বসে আছে এমন একটা উদাহরণ দেখাতে পারবে না।'

নন্দিতা মাথা নাড়লেন, 'অদ্ভুত! দেখুন তো ভাই, ওই একা মেয়ে অদ্দুরে যাবে? কোনওদিন একা বর্ধমানেও যায়নি। আমি তো প্রার্থনা করছি ও যেন পাশ না করে।'

'তা তো করবেই। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়।'

কল্যাণী বলোলেন, 'অবশ্য খরচের দিকটাও দেখতে হবে।'

'খরচ?' নীপা মুখ ফেরাল, 'আমার বিয়েতে বাবা খরচ করত না?'

কল্যাণী মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, করতেই হবে।'

'সেটা না করে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিক, অনেক কমে হয়ে যাবে।'

'অদ্ভুত কথা! তারপর বিয়ের সময় কী হবে?' নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'সেটা আমি বুঝব। তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।' নীপা গম্ভীরমুখে বলল, 'মেয়েরা বড় হলে বিয়ে ছাড়া তোমরা চিন্তা করতে পারো না। যেন বিয়ে দিলেই কাঁধ থেকে বোঝা নামাতে পারলে। সেই বিয়ে ক্লিক না করলে তো জীবনটাই নষ্ট, তা ভাবতে চাও না। তা ছাড়া বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অনেককিছু করার আছে, এটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

নন্দিতা রেগে গেলেন, 'ঠিক আছে, ও যদি পাশ করে, তাহলে প্লেন ভাড়া দিয়ে দিয়ো। তারপর কোনও প্রয়োজন হলে আমাদের কাছে এসো না।'

কল্যাণী বললেন, 'ওদেশে যদি আত্মীয়স্বজন থাকে, তাহলে একা গেলে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কেউ নেই?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'আমাদের ফ্যামিলির কেউ বিদেশে যায়নি।'

নীপা বলল, 'আমার মামার বাড়ির দিকেও কেউ নেই। অথচ আমার বন্ধুদের কেউ-না-কেউ লন্ডনে অথবা নিউ ইয়র্কে থাকে।'

'নিউ ইয়র্ক। না, নিউ জার্সি—।' উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন নিরাপদ।

'নিউ জার্সি মানে?' নীপা জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা আমেরিকার একটা জায়গার নাম।'

'সেটা জানি। সেখানে তোমার পরিচিত কেউ থাকেন?'

'আমার নয়।' নিরাপদ ফাঁপরে পড়লেন, 'তোর মায়ের পাড়ার একজন থাকত, সে এখন ওখানে আছে। খুব বড় শিল্পপতি।' নিরাপদ বলে ফেললেন।

'আমার পাড়ার? কী যা-তা বলছ?' নন্দিতা খেঁকিয়ে উঠলেন।

নিরাপদ স্ত্রী-র দিকে তাকালেন, 'তোমার এখন মনে নেই।'

'আশ্চর্য। আমার মনে নেই আর তুমি মনে রেখে বসে আছ! তুমি দেখেছ তাকে?'

'না। তুমি বলেছিলে।'

'আঃ, নামটা বলবে তো?'

'পার্থ। পার্থ সান্যাল।' নিরাপদ স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলেন।

'অসম্ভব।' শব্দটা ছিটকে এল নন্দিতার মুখ থেকে।

'অসম্ভব কেন?' নীপা জানতে চাইল।

'ওঃ। তুমি, তুমি এখনও মনে করে রেখেছ? ওর ওখানে নীপা যাবে?'

নিরাপদ মাথা নাড়লেন, 'যাবে বলিনি। কারও নাম মনে পড়ছিল না বলে ওর কথা মনে এল। তা ছাড়া, ভদ্রলোক তো আমাদের বয়সি। ওখানে এখন প্রতিষ্ঠিত।'

'আপনাদের আত্মীয়?' কল্যাণী জানতে চাইলেন।

'না, না। পাড়ায় থাকত। বাজে টাইপের ছেলে। মেয়েদের দেখলেই পেছনে লাগত।' নন্দিতার গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল।

'ছেলে বলছেন!' কল্যাণী একটু অবাক।

'তিরিশ বছর আগে ছেলে ছিল, এখন প্রৌঢ়।' নিরাপদ বললেন।

নীপা হেসে উঠল শব্দ করে, 'মা, তুমি একটা যাচ্ছেতাই! তিরিশ বছরে মানুষের সবকিছু পালটে যায়। ভদ্রলোক ওদেশে প্রতিষ্ঠিত, মানে কি বোঝো না?'

নন্দিতা বলতে বাধ্য হলেন, 'এতগুলো বছর আমি যাকে জানি না, তার কাছে তুই যাবি! তার ঠিকানাও আমার জানা নেই।'

'ঠিকানা বের করতে অসুবিধে কী? আড়িয়াদহে নিশ্চয়ই ওঁর আত্মীয়স্বজন থাকেন, তাঁরাই বলে দেবেন। আমি ঠিকানা জোগাড় করে আনছি। তুমি একটা চিঠি লিখবে মা? প্লিজ।' নীপা আবদার করল।

'মরে গেলেও না।'

এই সময় শ্যামল ঢুকল, 'গম্ভীর ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

নীপা বলল, 'দ্যাখ না শ্যামল, মায়ের ছেলেবেলার একজন যখন আমেরিকায় থাকে, একবারও বলেনি। আমি যদি পাশ করে ওখানে যাই, ভদ্রলোকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মাকে বলছি একটা চিঠি লিখে ভূমিকা করে রাখতে, মা রাজি হচ্ছে না।'

'নো কমেন্টস। বাবাকে ওই ব্যাপারে কথা বলে অনেক জ্ঞান শুনেছি, আর ফারদার ভিক্টিম হতে চাই না। হ্যাঁ, পিসিমা আপনার ব্যবস্থা হয়েছে।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল শ্যামল?'

'আজ বিকেলে ডক্টর এস. কে. সেন মালবিকাকে দেখবেন। ভদ্রলোকের এক মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না, ম্যানেজ করেছি। আর আমার বন্ধুর বাবার একটা গেস্টহাউস আছে, সেখানে দিনকয়েক থাকতে পারবেন। খুব সামান্য চার্জ।'

'এখনই পাওয়া যাবে তো?' কল্যাণী খুব খুশি।

'ইচ্ছে হলে যেতে পারেন।' শ্যামল যেন রাজ্যজয় করে এসেছে।

'সে কী? এখনই যাবেন মানে?' নন্দিতা প্রতিবাদ করলেন।

'না, ও বলছে যখন—।' কল্যাণী থতমত।

'বলুক। এ বাড়িতে পা দিয়ে ভাত না খেয়ে যাওয়া চলবে না। আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বুঝলেন?' নন্দিতা জোর গলায় বললেন।

'পিসিমা থাকুন, কিন্তু আমি বিয়ে করব না মা। শুধু তুমি চিঠিটা লেখো।'

সবাই হেসে উঠল। নন্দিতা রাগ করে ভেতরে চলে গেলেন। শুধু হাসলেন না নিরাপদ। তাঁকে চোর-চোর দেখাচ্ছিল।

*

এখন বিকেল। দৃশ্যান্তর হওয়ায় দেখা গেল সেই একই ঘর। নন্দিতা চুপচাপ বসে আছেন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিরাপদ প্রবেশ করলেন, 'গেস্টহাউসটা খারাপ নয়। শ্যামল আর নীপা ওখানেই থেকে গেল। পরে আসবে।'

নন্দিতা কথা বললেন না। নিরাপদ এক-পা এগোলেন, 'কী হয়েছে?'

'এইভাবে নিজের গায়ের জ্বালা মেটালে?'

'মানে?'

'ছেলেমেয়ে, এমনকী ওই মহিলার সামনে অপমান করলে?'

'কী বলছ?'

'কী বলছি তা বুঝতে পারছ না, না? এতকাল ভাবতাম সরল গোবেচারা। ভুল ভাবতাম। পেটে-পেটে তোমার এত ছিল? ছিঃ!'

'নন্দিতা—?'

'তুমি আমাকে অপমান করেছ।'

'কীভাবে?'

'ওই মহিলাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলায় তুমি প্রতিশোধ নিলে পার্থর কথা তুলে। তুমি আমাকে সন্দেহ করো।'

'না।'

'নিশ্চয়ই করো। তিরিশ বছর ধরে তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করে এসেছ ভালোমানুষের, মনে-মনে সন্দেহ করেছ। আজ সুযোগ বুঝে সেটা ব্যবহার করলে।'

'তুমি ভুল করছ।'

'ভুল? আমার মেয়েকে তুমি পার্থ সান্যালের সাহায্য নিতে পরামর্শ দিচ্ছ! তুমি জানো, পার্থকে আমি কোনওদিন প্রশ্রয় দিইনি। সে যখন জানবে আমার মেয়ে তার কাছে যাচ্ছে তখন—। ওঃ, আমি ভাবতেও পারি না। শোনো, তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কী বলব!'

'ওই মহিলা আসায় তুমি খুশি হওনি? আমি তোমার কাঁটা?'

'দ্যাখো, তুমি তো প্রায়ই বলো আমার সম্পর্কে তোমার কোনও আগ্রহ নেই। দশ বছর তুমি এক বাড়িতে থেকেও আলাদা। তাহলে আমাকে নিয়ে এত জ্বলো কেন তুমি?'

'এর উত্তর আমি তোমাকে দেব না। উঃ, ছেলেমেয়েরা ভাবল তোমার মতো আমারও একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল! বুড়ো বয়সে দাঁত পড়ে গেলে লোকে মাড়ি দিয়ে চিবোয়, তুমি সেই কাজটা করলে।' নন্দিতা কান্না চাপতে-চাপতে বেরিয়ে গেলেন।

নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। তারপর থপথপে পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, 'কী নাটক করার কথা ছিল, কী নাটক হয়ে গেল! নন্দিতা বলে গেল আমি ইচ্ছা করে ওকে অপমান করেছি! ওকে সন্দেহ করি। আমি জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো তাই। তাহলে আমি সত্যি কথা বলি, পাপ করিনি—এসব বলার কোনও মানে হয় না। নন্দিতা আমাকে ভালোবাসে না অথচ কাউকে ভালোবাসতে দেবে না। আমিও নন্দিতাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, অসহ্য হলেও। আচ্ছা ধরুন, না, খামোকা ধরতে যাবেন কেন, নিজের চোখেই দেখুন, আজ যে নাটকটা করার কথা ছিল, তাতেই অভিনয় করছি আমরা, তবে একটু ছোট করে নিতে হচ্ছে, অনেকটা সময় চলে গেছে তো! তবে তার আগে একটু বিরতি দেব। পাঁচ মিনিটের।'

নিরাপদ ইঙ্গিত করতেই পরদা পড়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে সিগারেট খেতে-খেতে আমরা

ঠিক করতে পারছিলাম না নিরাপদ পাপ করেছেন কিনা। বস্তুত সবাইকে আমাদের খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। নিরাপদ একটু ভালোমানুষ, ওরকম স্বামী হলে বিয়ের কিছুদিন বাদে স্ত্রী-রা একটু হম্বিতম্বি করবেনই। তবে পার্থ সান্যালের ব্যাপারটা তোলা নিয়ে আমরা দ্বিমত হলাম।

বিরতির পর মঞ্চটির কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। নন্দিতা খাবারের ব্যবস্থা করছেন। সময়টা রাত। নীপা তাঁকে সাহায্য করছে। নন্দিতা বললেন, 'ওদের ডাক।'

নীপা চেঁচাল, 'খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিরাপদ ঢুকলেন। ধোপদুরস্ত। চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন, 'শ্যামল কোথায়?'

নন্দিতা মাথা নামিয়ে বললেন, 'এই ফিরল। বাথরুমে গিয়েছে।'

'রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফেরা তুমি অ্যালাউ করছ নন্দিতা! দিস ইজ টু মাচ। কলেজে পড়া ছেলের এতখানি স্বাধীনতা আমি বরদাস্ত করব না।'

'বলি, কিন্তু শোনে না।'

নিরাপদ মাথা নেড়ে চেয়ারে বসলেন, 'আমার ওযুধটা।'

নীপা একটা কৌটো এগিয়ে দিলে তিনি সেটা থেকে ক্যাপসুল বের করে মুখে দিয়ে জল খেতেই শ্যামল ঢুকল, 'আজকের মেনু কী?'

'চিকেন কারি, রুটি, স্যালাড আর পায়েস।'

'কাল পুডিং কোরো তো।' শ্যামল বলল।

'বাপের পয়সায় পায়েস পুডিং প্যাঁদাচ্ছ অথচ কোনও কথা কানে যাচ্ছে না!' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকালেন।

'তার মানে?'

'তোমাকে বলেছি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে না।'

'ইউনিয়নের কাজে দেরি হয়ে যায়।'

'ওঃ। শোনো শ্যামল, এ-বাড়িতে থাকতে হলে তোমাকে ইউনিয়ন ছাড়তে হবে।'

'কেন?'

'কারণ আমি চাই না আমার ছেলে একটা হ্যাগার্ড হোক। ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কাঁধে ব্যাগ। ভবিষ্যতের বারোটা বাজানোর পক্ষে যথেষ্ট।'

'তুমি বুর্জোয়াদের মতো কথা বলছ।'

'তাই? কোন সর্বহারা চিকেন কারি আর পায়েস খায়?' নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাদের সর্বহারার নেতার ছেলে তো ক্যাপিটালিস্ট!'

এইসময় দর্শকরা উশখুশ করে উঠল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'পারসোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। নাটক বন্ধ করে দেব।'

নিরাপদ আমাদের দিকে তাকালেন, 'তা আপনারা পারেন। হিটলার কিংবা মুসোলিনি ডিকটেটর ছিলেন। এখন একটা কমিটি সেই ভূমিকায় চলে গিয়েছে। কিন্তু ভাই আপনারাই তো হাসমিকে নায়ক করেছেন, খামোকা ভিলেন হবেন কেন? আমার ছেলে আমার পয়সায় বাউন্ডুলেপনা করলে তাকে বলার অধিকার আমার আছে।' নিরাপদ ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন, 'শ্যামল, তোমার নেতাদের চেহারা ছিয়াত্তরের আগে দেখেছি।'সিড়িঙ্গে ছিল। এখন শাঁসে-জলে। দাদাদের নাম ভাইদের নামেই হয়। কোনওরকমে গ্র্যাজুয়েট হও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে। ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

শ্যামল কথা বলল না। নীপা বলল, 'বাবা, জি আর ই পাশ করলে আমি আমেরিকায় যাব তো?'

নন্দিতা বলোলেন, 'অসম্ভব। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ছাড়।'

নীপা বলল, 'বাবা!'

নিরাপদ বললেন, 'আগে পাশ করো তারপর দেখব।'

নন্দিতা বললেন, 'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ! ওদেশে ও একা থাকবে?'

'একা কেন থাকবে? আমাদের বোস সাহেবের ভাই থাকেন নিউ ইয়র্কে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তার।'

'বাবা, তুমি গ্রেট।'

'খেতে-খেতে নিরাপদ বললেন, 'যতীন খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

নন্দিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী! কেন?'

'আরে রেখে-ঢেকে নে! চোখের পরদা বলে তো একটা কথা আছে! পার্টিদের ট্রাবল দিয়ে টাকা নিলে কমপ্লেন হবে না।'

'তোমার কিছু হবে না তো গো?'

'দূর! আমি অত বোকা নাকি!'

শ্যামল উশখুশ করে বলল, 'বাবা, তুমি অন্যায় করেছ।'

'তা তো বলবেই। উপরির পয়সায় তুমি ফুটুনি করছ আর নিচ্ছি বলে আমার দোষ হয়ে গেল! তা ছাড়া আমি ঘুষ নিই না।'

'নাও না?'

'না। এটাকে ঘুষ বলে না। টিপ্‌স দেয়। ঘুষ নেয় বড়কর্তারা, মন্ত্রীরা। তারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে। সেই ক্ষমতা আমার নেই। মাংস দাও।'

নন্দিতা মাংস দিলেন। নীপা বলল, 'মা আমি পায়েস খাব না।'

'কেন?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

নন্দিতা বললেন, 'মিষ্টি খেলে ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোরা আজকাল কত কনসাস হয়ে গিয়েছিস। ওকে একটু ফল দিয়ো নন্দিতা।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ নীপার মনে পড়ে গেল, 'ওই যাঃ!'

'কী হল?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

'একটা চিঠি এসেছে মায়ের নামে। দিতে ভুলে গিয়েছি।'

'কার চিঠি?'

'খুলিনি। দাঁড়াও আনছি।' নীপা উঠে দাঁড়াল।

'খাবি না?'

'আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।' নীপা বেরিয়ে গেল।

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে আবার কে চিঠি লিখল?'

'জানি না। হয়তো মেজমাসিমা টাকা চেয়েছেন।'

'দ্যাখো, দিতে-দিতে তো ফতুর হয়ে যাব।' নিরাপদ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপরি আছে বলে তোমার গা জ্বলে কিন্তু কত লোককে দিতে হয় তার খবর রাখো? ননসেন্স! শ্যামল, একটু প্র্যাকটিক্যাল হও।'

নীপা ফিরে এল রঙিন খাম হাতে।

নন্দিতা বললেন, 'খুলে পড় না।'

নীপা খামটা ছিঁড়ল। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল,'ও মা, নিউ জার্সি থেকে লিখেছে। সুচরিতাসু, আশা করি ভালো আছ। আমাকে তোমার মনে রাখার কথা নয়। আড়িয়াদহে তোমাদের

পাড়ায় আমি থাকতাম। তোমাদের বিয়ের সময় আমি বেকার ছিলাম। তারপর ঘটনাচক্রে আমেরিকায় আসি। এখন ব্যাবসাপত্তর করে আমি সচ্ছল। দেশে যাইনি আঠাশ বছর। সম্প্রতি আমার বোন-ভগ্নীপতি আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল। তাদের কাছে তোমার ঠিকানা পেলাম। আমি এই মাসে দেশে যাচ্ছি। সবার সঙ্গে দেখা করব। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি থাকে তাহলে আড়িয়াদহের ঠিকানায় জানিয়ে দিয়ো। তরুণ বয়সে বিরক্ত করতাম বলে ক্ষমা চেয়ে আসব। আপত্তি থাকলে যাব না। আশা করি তোমার স্বামী অখুশি হবেন না। শুভেচ্ছাসহ, পার্থ সান্যাল।'

'লোকটা কে মা?' শ্যামল জানতে চাইল।

'বাজে লোক। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন রকে বসে খুব আওয়াজ দিত। গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইত। আমি পাত্তা দিইনি।'

নীপা হাসল, 'রকবাজ রোমিও?'

'ইয়ার্কি মারিস না। তুই লিখে দে আসার দরকার নেই।'

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'বাঃ! চিনি না, জানি না, এখানে এসে কী করবে?'

'তুমি চেনো না, তোমাকে চেনেন। আঠাশ বছর বিদেশে আছেন, দেশে এসে সবার সঙ্গে কথা বলতে তো ইচ্ছে করবেই।'

নীপা বলল, 'তা ছাড়া নিউ জার্সিতে থাকেন, আমার উপকার হতে পারে।'

নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না। সে এ বাড়িতে আসবে না।'

নীপা বলল, 'কেন? তুমি মিছিমিছি রাগ করছ।'

নিরাপদ হাসলেন, 'নীপা ঠিকই বলছে।'

নন্দিতা আচমকাই চলে গেলেন ঘর ছেড়ে, নিরাপদ বললেন, 'তোদের মা ভালো অভিনেত্রী নয়, বুঝলি।'

শ্যামল বলল, 'মায়ের পরিচিত এবং মা আপত্তি করছে যখন, তখন ভদ্রলোকের আসা উচিত নয়। তোমরা যে-যাই বলো।'

দৃশ্য পরিবর্তন হল। কথাটা ঠিক বলা হল না। ঘর এক রইল শুধু সময় পালটে গেল। এখন সকাল। নিরাপদ খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আর তখনই বেল বাজল। নিরাপদ চেঁচালেন, 'কে এল দ্যাখ।'

শ্যামলের গলা পাওয়া গেল, 'নীপা দ্যাখ।'

একটু বাদে নীপার গলা, 'কাকে চান?'

'নন্দিতা আছেন?'

'হ্যাঁ। উনি রান্না করছেন। আপনি?'

তুমি নন্দিতার মেয়ে?

'হ্যাঁ।'

'আমি পার্থ সান্যাল। আমেরিকা থেকে আসছি।'

'ও। আসুন-আসুন। আমরা আপনার চিঠি গতকাল পেয়েছি।'

নীপা ঘরে ঢুকল এক চকচকে প্রৌঢ়কে নিয়ে, 'আমার বাবা। বাবা, ইনি পার্থ সান্যাল।'

নিরাপদ নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিরাপদকে জড়িয়ে ধরলেন, 'অনেকদিন বাদে দেশে এলাম। আপনাদের বাড়িতে এসেছি বলে কিছু মনে করেননি তো?'

নিরাপদ হাসলেন, 'না না, মনে করব কেন?'

'আমি পার্থ সান্যাল। কুইনসে থাকি। ব্যাবসা করি। আপনি?'

'আমি নিরাপদ মিত্র। সরকারি চাকরি করি।' নিরাপদর গলা মিনমিনে শোনাল।

নীপা বলল, 'বসুন।'

পার্থ বললেন, 'দেশে তো আসাই হয় না। তুমি কী করো?'

'পড়ি। এম. এ. দিচ্ছি। জি আর ই দিয়েছি।'

'তাই? আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'যদি সুযোগ পাই—।'

'আলবাত পাবে। আমি আছি ওখানে। আমার কাছে উঠবে। তোমরা কয় ভাই-বোন?'

'দুই ভাই-বোন। মা, মাগো, মা এদিকে এসো।'

নন্দিতা এলেন। একপাশে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়ালেন। পার্থ তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকালেন, 'আমাকে চেনা যাচ্ছে?'

মাথা নাড়লেন নন্দিতা, 'না।'

'আমার ভাই-ই চিনতে পারেনি। বলল, দাদা। তুই এত ফরসা, মোটা আর টাক করে ফেলেছিস মাথায় যে চেনা যায় না। তবে চেহারা দেখছি খুব একটা বদলায়নি। সামান্য মোটা, সেটা স্বাভাবিক। তবে মেয়ে একদম মায়ের ধাত পেয়েছে।'

'আপনি তো আমার আগে ওকে দেখেছেন।' নিরাপদ বললেন।

'দূর মশাই, দূর থেকে দেখতাম। কথা বলার চান্স দিত নাকি! ওহো, তোমার নাম কী যেন?'

'নীপা।'

'হ্যাঁ নীপা, এই নাও।' পার্থ সান্যাল অ্যাটাচি কেস খুললেন। একে-একে বিদেশি পারফিউম, আফটার শেভিং লোশন, চুল শুকোবার ব্লোয়ার বের করে টেবিলে রাখলেন, 'এসব তোমাদের জন্যে।'

নীপা বলল, 'সব?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ নন্দিতা বললেন, 'না। ওগুলো আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

'কেন?' পার্থ সান্যাল অবাক।

'আপনার সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই যে, ওগুলো নেওয়া যেতে পারে!'

'আমি কিন্তু একদম সরল মনে এনেছি।' পার্থ সান্যাল বললেন।

'ঠিকই করেছেন।' নিরাপদ কথা বললেন, 'ভালোবেসে কেউ কিছু দিলে নিতে হয়।'

'থ্যাঙ্ক-ইউ মিস্টার মিত্র। আজ আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

'সে কী! চা খেয়ে যাবেন না?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করলেন।

'নাঃ। আমি কাল দিল্লি যাচ্ছি। ওখান থেকেই ফিরে যাব। আজ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নীপা, আমার কার্ডটা রাখো। যদি ও-দেশে পড়তে যাও, একটা চিঠি আগেভাগে পোস্ট কোরো। তারপর তোমার সব দায়িত্ব আমার।' পার্থ উঠলেন। কার্ডটা টেবিলে রাখলেন।

নিরাপদ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল।'

'একই কথা আমিও বলছি। আচ্ছা আপনাদের ছেলেকে দেখলাম না।?

নিরাপদ নীপাকে বললেন, 'শ্যামলকে এ ঘরে আসতে বলো।'

নীপা চলে গেল। পার্থ সান্যাল একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না। আমার চিঠি পেয়ে অথবা আমি এ বাড়িতে আসায় আপনাদের মনে কোনও প্রশ্ন দেখা দেয়নি?'

নন্দিতা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। নিরাপদ হাসলেন, 'না, না। আপনারা এক পাড়ায় থাকতেন, আলাপ-পরিচয় ছিল, এতকাল বাদে দেশে ফিরছেন, দেখা করতে আসাটা স্বাভাবিক ভদ্রতার মধ্যেই

পড়ে, তাই না?'

মাথা নাড়লেন পার্থ সান্যাল, 'না। আপনি ঠিক জানেন না।'

'বুঝলাম না।'

'নন্দিতার সঙ্গে আমার কখনও কথাবার্তাই হয়নি। আমি যে ওঁর নাম ধরে কথা বলছি, সেটা বয়সের অ্যাডভান্টেজ থেকে।'

'আচ্ছা!'

'আমার এখানে আসার কারণ এক ধরনের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে।'

'কৃতজ্ঞতা?'

নিরাপদ স্ত্রী-র দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ। আমি খুব সাধারণ ছেলে ছিলাম। রকে আড্ডা মারতাম আর মেয়েদের দেখলে টিটকিরি মারতাম। ওইভাবে আর কিছুকাল চললে এদেশের আর একজন ব্যর্থ নাগরিক হওয়া ছাড়া আমার কপালে অন্যকিছু ঘটত না। তা নন্দিতাকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করল। যেচে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, ও ঘৃণা বা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সেদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করছিলাম। বুঝতে পারলাম আমাকে একজন ভালো মেয়ে কী চোখে দেখে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমাকে বড় হতে হবে। যোগ্য হতে হবেই। ওই ধাক্কা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াতে-বেড়াতে শেষপর্যন্ত আমেরিকায় পৌঁছে দিল। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। আপনার স্ত্রী না জেনে আমার বিরাট উপকার করেছিল। জানি এভাবে আসা ঠিক নয়, তবু না এসে পারলাম না।'

'আপনি কি একা এসেছেন?' নিরাপদ জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। আমার বৃদ্ধা মা-ও আমার কাছেই আছেন। উনি আসতে চাইলেন না।'

'আপনার স্ত্রী?'

'কপালে নেই মশাই। এক বঙ্গললনাকে বিয়ে করেছিলাম, তিনি অকালে চলে গেলেন।' পার্থ সান্যাল ম্লান হাসলেন। নীপা এবং শ্যামল ঢুকল।

নীপা বলল, 'ও আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট। ওর নাম শ্যামল।'

'আচ্ছা! কী পড়ো তুমি?'

'কলেজে পড়ছি।'

নীপা হাসল, 'বামপন্থী ইউনিয়ন করে।'

'আচ্ছা! এই যে বুশ সাহেব হারলেন। দেশজুড়ে নির্বাচন হল। ওই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দেশে নীরবে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব হয়ে যায়, তোমরা কী বলো?'

'আমাদের কাছে বুশ বা ক্লিন্টন-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

'ঠিক! এখন পৃথিবীতে যারা রাজনীতি করে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সবাই কিছু পাওয়ার জন্যে করে। আচ্ছা, চলি। নমস্কার মিস্টার মিত্র। নন্দিতা, নীপা এলাম।' পার্থ সান্যাল হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

শ্যামল বলল, 'এইসব জিনিস ওই লোকটা এনেছে?' সে টেবিলের দিকে তাকিয়েছিল।

নীপা বলল, 'হ্যাঁ। লোকটা বলছিস কেন?'

'ঘুষ দিয়ে গেল।'

নিরাপদ হঠাৎ থমকে উঠলেন, 'শ্যামল!'

শ্যামল অবাক হয়ে তাকাল। নিরাপদ রাগত গলায় বললেন, 'একজন ভদ্রলোক ভালো মনে উপহার দিয়ে গেলেন আর তুমি তাকে ঘুষ বলছ?'

'কেউ এমনি-এমনি উপহার দেয় না।'

'তোমরা তাহলে এমনি-এমনি কিউবার জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করছ না?'

'বাবা, দুটো ব্যাপার এক কোরো না। আমেরিকা যাকে এক্সপ্লয়েট করছে আমরা তার পাশে দাঁড়াচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ এখন এক প্ল্যাটফর্মে।'

শ্যামল চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিরাপদ বললেন, 'আর ক'দিন পরে বুঝবে। সবে দাঁত গজালে খুব সুড়সুড় করে, নীপা, এগুলো ভেতরে নিয়ে যা।'

'আমি এই পারফিউমটা নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। শোন, ওই আফটার শেভ লোশনটা শ্যামলের টেবিলে রেখে দিবি।' ঘাড় নেড়ে নীপা উপহারগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরে এখন নন্দিতা আর নিরাপদ। আমরা নন্দিতাকে চুপচাপ কাঁদতে দেখলাম। ওঁর পাশে এসে নিরাপদ সেটা বুঝতে পারলেন, 'একী! তুমি কাঁদছ?'

নন্দিতা হঠাৎ স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমার ভীষণ ঘেন্না করছে।'

'ঘেন্না?'

'ওই লোকটা আমাকে অপমান করে গেল।'

'কী যা-তা বলছ?'

'যাকে আমি অবজ্ঞা করতাম তার দান নিলে তোমরা?'

'আঃ, এভাবে ভাবছ কেন!'

'কিন্তু শ্যামল বলল, এমনি-এমনি কেউ কাউকে উপহার দেয় না। শোনো, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ না তো? বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি।'

'ইটস অলরাইট। তিরিশ বছর আগে তুমি কী করেছ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। উনি আসায় আমাদের বরং উপকার হল।'

'তার মানে?'

'নীপার একটা চ্যানেল তৈরি হয়ে গেল। আর আমরা জানলাম তোমার একজন ভালো বন্ধু আছে। ইটস অলরাইট।'

নন্দিতা উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি স্পষ্ট বলো, আমাকে বিশ্বাস করছ?'

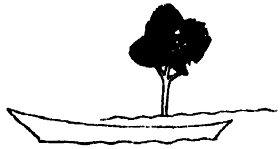
'না করে উপায় আছে?'

'তার মানে?'

'সকাল-দুপুর-বিকেল কাটিয়ে দিয়েছি। এখন এই সন্ধেবেলোায় এসে তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি যে একা হয়ে যাব নন্দিতা। ছেলেমেয়েরা যে-যার মতো জীবন কাটাবে। রাত নেমে আসা পর্যন্ত সময়টায় আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার। অবিশ্বাসে জ্বলেপুড়ে মরার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ঢের ভালো, তাই না?'

নন্দিতা অবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরাপদ তাঁর যাওয়া দেখলেন। এবার এগিয়ে এলেন মঞ্চের সামনে। হাতজোড় করে বললেন, 'ভদ্রজনেরা, এটা নাটক। সময়াভাবে ছোট করে নিয়েছি। এই নাটকে আমি সৎ নই, ঘুষ নিই, দাপটে থাকি। তবু নন্দিতা আমার কাছে জানতে চাইছে, আমি তাকে সন্দেহ করি কিনা! বিশ্বাস করুন, আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারছি না। সৎ বা অসৎ যে-কোনও জীবনযাপনের পরে একটা সময় আসে, যখন পুরুষমানুষ একা হয়ে যায়। মেয়েরা হয় কিনা জানি না। তখন সবকিছু মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নিতে হয়। শান্তি না হোক স্বস্তি হবে তাতে। এটুকুই বা কম কী!'

নিরাপদ ধীরে-ধীরে ভেতরে চলে গেলেন। পরদা পড়ল না, আলো জ্বলে উঠল।



জীবনে যেমনটি হয়

চিত্তপ্রিয় চ্যাটার্জি অবসর নিয়েছেন বছর ছয়েক হল কিন্তু এখনও তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য মজবুতই আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী গত হয়েছেন তিন বছর আগে। যাওয়ার আগে প্রায় তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করেননি চিত্তপ্রিয়। কিন্তু তিন বছর ধরে একজন মৃতপ্রায় মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত বাস করলে শোকের ধার কমে যায় বলেই স্ত্রী গত হওয়ার পর তিনি স্থির আছেন। এখন চিত্তপ্রিয়র সময় কাটে বই পড়ে এবং নিয়মিত ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখে। বড়ছেলে অনুতোষ মাদ্রাজে আছে তার পরিবার নিয়ে। ভালো চাকরি করে সেখানে। মেয়ে অনন্যা দিল্লিতে। এরা সবই তাঁকে কলকাতার বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে তাদের কাছে চলে যেতে বলে। চিত্তপ্রিয় রাজি হননি। একটি চাকরের ওপর ভরসা করে দিব্যি আছেন তিনি।

যেহেতু বয়স বাড়া সত্ত্বেও চিত্তপ্রিয় অশক্ত হয়ে পড়েননি, তাই তাঁর জীবনযাপনের ভঙ্গি একটু অন্যরকম। প্রত্যহ ভোরে তিনি কেডস পরে চার কিলোমিটার হাঁটেন। মদ অথবা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন বছর কুড়ি হল। ইদানীং মাংস এবং ডিম খাচ্ছেন না। দীক্ষা নেওয়ার পর চিন্তাও করেননি, ওসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। বাড়িতে ঠাকুর ও দেবতার কোনও ছবি নেই। ইদানীং তাঁর শখ হচ্ছে বেড়াতে যাওয়ার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যগুলো না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কিন্তু আজকাল চারধারে এত অব্যবস্থা যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে সাহস হয় না। ট্রেনের টিকিট নিয়েই তো কত ঝকমারি। শেষ পর্যন্ত চিত্তপ্রিয় ঠিক করলেন একটি বিখ্যাত 'স্পেশাল' কোম্পানির সঙ্গী হবেন। হয়তো ইচ্ছেমতো ঘুরে দেখা হবে না কিন্তু টাকা দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত তো হওয়া যাবে।

সেইমতো ব্যবস্থা হল। দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ হয়ে কেদার এবং বদ্রীনাথ। নামগুলোর গায়ে তীর্থের গন্ধ থাকায় একটু অস্বস্তি হয়েছিল প্রথমে, পরে ভেবে দেখলেন জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক আকর্ষণ তো কম নয়। তিনি তো পুণ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন না। প্রকৃতি দেখবেন প্রাণভরে। অতএব চাকরের হাতে সংসার ছেড়ে তিনি সুটকেস নিয়ে এক সন্ধেবেলায় হাজির হলেন স্টেশনে।

যে কামরায় তাঁদের যাওয়ার কথা তার সামনের প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে মানুষেরা। বেশির-ভাগ বয়স্ক মানুষদের বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের পরিবার। ব্যবস্থাপকদের বারংবার সাবধান করে দিচ্ছেন যাতে অযত্ন না হয়। কামরায় উঠে মেয়ে মায়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে যাতে অসুবিধে না হয়, ছেলে বাবাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সময়মতো ওষুধ খাওয়ার কথা। চিত্তপ্রিয় লক্ষ করলেন অধিকাংশ যাত্রীরই বয়স হয়েছে এবং কোনও আত্মীয়-সঙ্গী নেই। এতই যখন দুশ্চিন্তা তখন বিদায় জানাতে আসা আত্মীয়রা সঙ্গী হয়নি কেন?

চিত্তপ্রিয়র স্বভাব হল কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা না বলা। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি লক্ষ করলেন, এতদিন অপরিচিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন এমন ভঙ্গিতে যে, অপরিচয়ের গন্ধটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্যাসেজের পাশে জানলার ধারে যে মুখোমুখি দুটো আসন থাকে তার একটি বরাদ্দ হয়েছিল চিত্তপ্রিয়র জন্যে। চিত্তপ্রিয় তাই চেয়েছিলেন। কারও সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসতে হবে না। কেউ গলা বাড়িয়ে কথা শুরু করতে পারবে না। ট্রেন ছাড়ার খানিক পরেই তিনি একটি বই খুলে বসলেন। ট্রেনে ওঠার আগে প্ল্যাটফর্ম থেকে ইংরেজি থ্রিলার কিনেছেন। কিন্তু আলোর তেজ এত কম যে ভালো করে পড়া যাচ্ছে না। নাকি চশমার পাওয়ার বদলাতে হবে! চিত্তপ্রিয় বই বন্ধ করলেন। না, সত্যি তিনি এবার বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। শরীরে মেদ জমেনি বটে কিন্তু চামড়া শিথিল হয়েছে, কুঁচকে যাচ্ছে। চোখের নিচে বেশ ভাঁজ পড়েছে। এগুলো কখন অজান্তে এসে গেল খেয়াল করেননি। চারতলায় উঠতে কষ্ট হয়। দৌড়াবার কথা ভাবতেও পারেন না। চোখের আর দোষ কী!

চিত্তপ্রিয়র উলটোদিকের আসনে যিনি বসেছিলেন তিনিও বৃদ্ধ। এই কামরা শেষ বয়সের মানুষে ঠাসাঠাসি। বৃদ্ধ বললেন, 'আমার শোওয়ার জায়গা পড়েছে ওপরে। বলুন তো, এই শরীর নিয়ে ওপরে উঠি কী করে? এত করে বললাম লোয়ার বার্থ দিতে, কানেই তুলল না। মশাই কি এই প্রথম?'

চিত্তপ্রিয় মাথা নাড়লেন, না। মুখে কিছু বললেন না। কথা বললেই কথা বাড়বে। এবং সেসব কথা যে অভিযোগের নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই। বয়স হলে মানুষ সবসময় অসন্তুষ্ট থাকে!

এইসময় আর এক বৃদ্ধ ট্রেনের দুলুনি সামলে কোনওমতে এসে দাঁড়ালেন, 'ওহে হরিহর, উনি রাজি হয়েছেন।'

'হয়েছেন?' উলটোদিকের বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

'হবে না কেন? পাঁচটা দামড়া বুড়োর মধ্যে কোনও মেয়েছেলে একা বসে থাকতে চায়? বললাম, আপনার এখানে অসুবিধে হলে সিঙ্গল সিটে চলে যেতে পারেন। ওখানে হরিহর আছে, বললে চলে আসবে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু আমার শোওয়ার বার্থ যে ওপরে। ওঁর বয়স কত?'

'যাটের মধ্যেই হবে। আগে এখানে পাঠিয়ে তো দিই তারপর দেখা যাবে। মালপত্র নিয়ে চলে এসো, জমিয়ে গপ্পো করতে-করতে যাওয়া যাবে।'

দুই বৃদ্ধতে মিলে মালপত্র নিয়ে নড়তে-নড়তে চলে যেতে চিত্তপ্রিয় বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন। উলটোদিকে একজন মহিলা বসে থাকলে অনেক ঝামেলা। তাঁকেই হয়তো নিজের লোয়ার বার্থ ছেড়ে ওপরে উঠতে হবে। না, তিনি উঠবেন না। টাকা দেওয়ার সময় পই-পই করে বলেছিলেন বলে বার্থটা পেয়েছেন। এখন সেটা ছাড়তে রাজি নন। সবচেয়ে ভালো, কথা না বলা, প্রশ্রয় না দেওয়া, আর তাহলে ভদ্রতার মুখোশ পরতে হবে না। চিত্তপ্রিয় আবার বই খুললেন। ভালো দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও এমন ভাব করলেন যে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি পড়ে চলেছেন। একটু বাদেই সুটকেস এল। সঙ্গে সাদা কাপড়। চিত্তপ্রিয় মুখ তুলে তাকালেন না।

উলটোদিকের আসনে কেউ বসলে কতক্ষণ না দেখে থাকা যায়? একসময় চিত্তপ্রিয়কে মুখ তুলতেই হল। মহিলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। যদিও এত রাতের অন্ধকারে বাইরের কিছুই চোখে পড়ার কথা নয়। তবু তাকিয়ে থাকা। সাদা শাড়ির নীল পাড় কপালের একটু ওপর থেকে ঘোমটা হয়ে নেমেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট, তবে বোঝা যায়, যৌবন পার হয়ে এসেছেন অনেককাল। আজকাল অনেক মহিলাই এইসব ভ্রমণ-কোম্পানিগুলোর ওপর ভরসা করে বাইরে যেতে পারছেন। ইনিও সেই দলের। নাক এবং হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে গায়ের রং একসময় খুবই উজ্জ্বল ছিল। চিত্তপ্রিয়র স্ত্রী সুস্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু খুবই ফরসা ছিলেন। মেয়ে অনন্যা তার মায়ের রং পেয়েছে। স্ত্রী-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কীরকম ছিল, তা আজও স্পষ্ট নয় চিত্তপ্রিয়র কাছে। কোনওদিন অমর্যাদা করেননি, কর্তব্যে অবহেলা হয়নি, রোগশয্যায় সেবা করেছেন, কিন্তু মারা যাওয়ার পর আবিষ্কার করলেন স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। এখন তো তেমন করে মনেও পড়ে না। প্রেম-ভালোবাসার

যে টানের কথা বইপত্রে পড়া যায়, তার কোনওটাই জীবনে স্ত্রী-র প্রতি অনুভব করেননি তিনি। উলটোদিকে বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনও মহিলার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেননি। এখন পর্যন্ত শব্দদুটো মনে আসতেই হেসে ফেললেন চিত্তপ্রিয় অন্যমনস্কভাবে। এই ঘাটের ওপর পৌঁছে কোনও মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তিনি? যাঁদের প্রতি হলে স্বাভাবিক দেখাবে তাঁদের তো বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। আর পঞ্চাশ ছাড়ালে বাঙালি মেয়েদের মন আর যাই হোক নতুন পুরুষের প্রেম গ্রহণের জন্যে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত থাকে না। বাসনা আসে কিনা জানেন না, কিন্তু তা চেপে রাখতে-রাখতে ও ব্যাপারে চৈত্রের দুপুরের মতো শুনশান হয়ে যান।

ভদ্রমহিলা মুখে ফেরালেন। তারপর দুটো হাত তুলে জানলার কাচ নামাবার চেষ্টা করলেন। ওঁর শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। চিত্তপ্রিয় আর নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'আমি দেখছি, আপনি একটু সরুন।'

ভদ্রমহিলা তাকালেন। সামনের চুলে রুপোলি ছোপ, মুখের চামড়া বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনও টানটান। চশমার ভেতর চোখদুটো। চিত্তপ্রিয় থমকে গেলেন। তাঁর মাথার মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। এইরকম ঘাড় বেঁকিয়ে বড় চোখে তাকানো, না হতে পারে না। মানুষের চেহারা বদলে যায়। ভঙ্গিও। সময় সবকিছু চমৎকার গিলে ফেলে। তাঁর নিজের কুড়ি বছরের চেহারার সঙ্গে এখনকার একটুও মিল নেই। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শুধু চাহনি দেখে দুটো মানুষকে এক করে দেওয়া হঠকারিতা।

চিত্তপ্রিয় অনেকটা শক্তি প্রয়োগ করে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন ভদ্রমহিলা একইভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। সে ছিল ছিপছিপে, রোগা বলা ভালো। হলুদ শাড়ি আর হলুদ জামা পরতে খুব ভালোবাসত। কোঁচকানো চুল হাঁটুর কাছে নেমে থাকত ঝরনা হয়ে। ইচ্ছে করেই তাকে বন্দি করত না সে। আর ওই মুখ দেখে মনে হত পবিত্র শব্দটির বিকল্প আছে। তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই একমাত্র চাহনিটুকু ছাড়া।

চিত্তপ্রিয় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগ বাড়িয়ে কথা বলা তাঁর স্বভাবে নেই। মহিলাও পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। এখন আর বই পড়ার চেষ্টা করলেন না চিত্তপ্রিয়। অনেক, অনেকদিন বাদে সেই অস্বস্তিটা আজ ফিরে এল তাঁর মনে। পেছন ফিরে তাকালে অনেক বছর পেরিয়ে যেতে হয় আর তার সংখ্যাটা মোটেই স্বস্তিজনক নয়। কিন্তু সত্য যা, তা চিরকালই সত্য।

জামসেদপুরে থাকতেন তখন। বাবা চাকরি করতেন টাটা কোম্পানিতে। কুলসি রোডের কোয়ার্টার্সে থেকে সদ্য কলেজে উঠছেন। ওই সময় সাকচিতে মানুষজন কম, সবাই সবাইকে চেনে। স্কুলে থাকতেই চিত্তপ্রিয় ভালো ক্রিকেট খেলতেন, নামও হয়েছিল। সাকচির মাঠে শীতের ছুটির দিনগুলো কাটত। সেদিন ম্যাচ ছিল। ব্যাট করছিলেন তিনি। একটা ফুলটস পেয়ে সপাটে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় চিৎকার উঠল। মাঠের ওপাশে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার মাথায় গিয়ে পড়েছে বলটা। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছে যে, তার পরনে চকোলেট রঙের শাড়ি, বয়স সতেরো কী আঠারো। সবাই ছুটে যেতে চিত্তপ্রিয়ও গিয়েছিলেন। মেয়েটার ফরসা আঙুলের ফাঁক গলে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সবাই মিলে মেয়েটাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। মেয়েটির মা চিৎকার-কান্নাকাটি করে বকাঝকা শুরু করে দিলেন। ওভার বাউন্ডারির আনন্দ মুছে গিয়েছিল, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। ডাক্তার এল। আঘাত তেমন গুরুতর নয় কিন্তু স্টিচ করতে হল। সেদিন আর খেলেননি চিত্তপ্রিয়।

সেই মেয়ে, যার নাম সরমা তার সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল চিত্তপ্রিয়র। আলাপ থেকে প্রেম। সরমার চুলের ফাঁকে তখনও ছোট্ট সাদা দাগ উঁকি মারত। জুবিলি পার্কে হাঁটতে-হাঁটতে সরমা বলেছিল, 'তুমি আমার মাথায় সারাজীবন থেকে গেলে।'

সে বড় সুখের সময় ছিল। সুখের এবং আশঙ্কার। সপ্তাহে দু-দিন লুকিয়ে চুরিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা আর দিনরাত ভাবা। তারপর অবধারিতভাবে সেই দিনটা এল। সরমা কাতর গলায় জানাল, তার বাবা বিয়ের ঠিক করেছেন, কিন্তু সে আত্মহত্যা করবে তবু অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। এখন সবকিছু চিত্তপ্রিয়র হাতে। সে যেটা চায় তাই হবে। চিত্তপ্রিয় নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। সরমাকে বাঁচাতে গেলে তখনই তাঁর একটি চাকরি দরকার। কিন্তু কে তাঁকে চাকরি দেবে? কলেজে পড়া এক তরুণ কোনও চাকরি করতে পারে? বাবা-মাকে বলে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না। বন্ধুরা পরামর্শ দিল সরমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। সেখানে চেষ্টাচরিত্র করে চাকরি জোগাড় করতে। আর সেই জায়গাটা কলকাতা হওয়া উচিত। অত লোকের ভিড়ে কেউ তাদের খুঁজে বের করতে পারবে না। সবাই মিলে চাঁদা তুলে হাজারখানেক টাকা জোগাড় করে দিল। সেই টাকা হাতে পেয়ে চিত্তপ্রিয়র মনে হয়েছিল পৃথিবীটা তার মুঠোয় এসে গেছে। সরমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন তিনি। জামসেদপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা। একটা সাধারণ হোটেলে থেকে চাকরির খোঁজখবর নেওয়া এবং সেটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরমা বলেছিল, 'যদি না পাওয়া যায়?' তিনি বলেছিলেন, 'পেতেই হবে। এ ঝুঁকি না নিলে তোমাকে কখনও পাব না সরমা। তুমি আমার ওপরে ভরসা করতে পারছ না?'

'নিশ্চয়ই করি। আর চাকরি যদি না পাও ক্ষতি নেই, কোনওরকমে পেট চলার একটা কিছু জুটে যাবে। তোমার সঙ্গে বস্তিতে থাকতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু—।'

'শুধু কী?'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী না হয়ে একসঙ্গে যাই কী করে?'

ব্যাপারটা মাথায় ছিল না চিত্তপ্রিয়র। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, সত্যি তো, সরমার সঙ্গে বিয়ে হবে কখন? কী করে? তারপরেই তাঁর খেয়াল হল। বললেন, 'আমরা কলকাতায় পৌঁছেই কালীঘাটের মন্দিরে চলে যাব। ওখানে শুনেছি গেলেই বিয়ে করা যায়। খোদ ঠাকুরের সামনে বিয়ে হলে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কী, রাজি?'

ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প করছিল। একেবারে ভোরের ট্রেন ধরবে ওরা, যাতে বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া সঙ্গে কিছু নেওয়ার দরকার নেই। চলন্ত ট্রেনের জানলার পাশে বসে দুজনে সূর্য ওঠা দেখবে। এখন এই মুহূর্তে শুধু বেড়াতে যাচ্ছি বললেও ওদের দুই পরিবারের কেউ ট্রেনে উঠতে দিতে রাজি হবে না। যেন ট্রেনে উঠলেই তরুণ-তরুণী নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা তখন স্বপ্নে ভাসছিল।

সরমা ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে তার মা পথ আগলে ছিলেন। হয়তো চিত্তপ্রিয়র কোনও বন্ধুই ওই উপকার করেছিলেন, নয়তো মেয়ের স্বাভাবিক ভাবগতিক দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। স্টেশনে অনেকটা বেলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছিলেন চিত্তপ্রিয়। তখন তাঁর অবস্থা উন্মাদের মতো। বন্ধুরা বিকেলে খবর আনল সরমাকে নিয়ে তার বাবা-মা কলকাতায় চলে গিয়েছেন।

তারপর আর কোনও যোগাযোগ নেই। সরমার বিয়ে হয়েছে এ খবর কানে এসেছিল। সে যে আত্মহত্যা করেনি জেনে স্বস্তি পেয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। সময় এমন একটা ওষুধ, যা সব দুঃখের স্মৃতি মুছে দেয় ধীরে-ধীরে। আরও পরে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে তাঁর হাসি পেয়েছিল। সেদিন যদি সরমা ঠিকঠাক স্টেশনে আসত তাহলে দুজনের জীবন কীভাবে ভেসে যেত, তা ভাবলে কষ্টের বদলে হাসি পায়। কারণ দুটো অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ শুধু আবেগ সম্বল করে জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল, এটা হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটু চাপা নিশ্বাস যে বুকের মধ্যে পাক খেত না তাই বা কে বলবে? নইলে অনেক পরে বাবার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করেও তিনি স্বাভাবিক হতে পারেননি কেন? কর্তব্য করা এক জিনিস আর ভেতর থেকে আসা

ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরা আর এক জিনিস। চিত্তপ্রিয় আবিষ্কার করেছিলেন সেই ভেতর থেকে আসার পথ সরমাকে হারানোর পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তাঁর অজানা ছিল বিয়ে পর্যন্ত। যে জাদুমন্ত্রে সেই দরজা খোলা সম্ভব হত, তা তাঁর স্ত্রী-র জানা ছিল না। অবশ্য এত বছর একসঙ্গে বাস করার পর তা নিয়ে আফশোশ করার কথা মনেও আসত না চিত্তপ্রিয়র। সরমার স্মৃতিতে ধুলো জমতে-জমতে কখন তা মনের আড়ালে চলে গিয়েছিল, তা টের পাননি তিনি। আজ হঠাৎই ওই চাহনির ঘূর্ণিঝড় এসে ধুলোর কিছুটা সরিয়ে দিতে অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। চিত্তপ্রিয় উলটোদিকে বসা প্রৌঢ়ার দিকে তাকালেন। এই মেয়ে কি সরমা? তিনি মহিলার চুলের ফাঁকে দাগটা খোঁজার চেষ্টা করলেন দূর থেকে। ওই দাগ নাকি আজন্ম বহন করতে হবে সরমাকে! ছোট্ট একটা কাটা দাগ কি বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যায়? ভালো করে চেহারাটা দেখলেন তিনি। না, তাঁর মনে একটুও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে না। যে সরমাকে এক মাইল দূর থেকে আসতে দেখলেই হৃদয়ে কাঁপুনি আসত, তার বিন্দুমাত্র এখন নেই।

ট্যুর কোম্পানির কর্মচারীরা খাবার দিয়ে গেল। হালকা খাবার। ভালোই লাগল। রাত হচ্ছে। এবার শোওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। রাত ন-টার পরে যে-কোনও যাত্রী ইচ্ছে করলে তাঁর নিজস্ব জায়গায় শুতে পারেন। কিন্তু সেটা করতে হলে ভদ্রমহিলাকে বলা দরকার। ওঁকে ওপরে উঠে যেতে হবে।

কিন্তু কথাটা বলতে পারলেন না চিত্তপ্রিয়। তার বদলে নিজের বিছানা ওপরে করে নিলেন। টয়লেট থেকে ঘুরে এসে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিচের বার্থ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ওপরে উঠতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে—।'

'ধন্যবাদ।'

চিত্তপ্রিয় কোনও কথা না বলে ওপরে উঠে এলেন। বালিশে মাথা রেখে সরমার গলার স্বর মনে করার চেষ্টা করলেন। চল্লিশের বেশি বছর আগে একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর কীরকম ছিল আজ আর কিছুতেই মনে এল না। তবে নিচে যিনি বসে আছেন, তিনি অবশ্যই সরমা নন।

সকালবেলায় আবার মুখোমুখি। দু-একটা কথা হয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে চা-ওয়ালাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। মহিলাও চা চেয়েছিলেন। খুব সামান্য সাধারণ কথা এবং চিত্তপ্রিয়র আর কোনও সন্দেহ রইল না। তিনি স্বাভাবিক হলেন। ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটছিল। ক্রমশ আলাপ হল। ভদ্রমহিলা প্রতি বছরই বের হন। ছেলে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়িয়ে যান। ট্যুরিস্ট কোম্পানির সঙ্গে ঘুরলে কোনও চিন্তা থাকে না। যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন ততদিনই নিজেরাই ঘুরেছেন। একমাত্র ছেলে, বড় চাকরি করে, তার সময়ের খুব অভাব। চিত্তপ্রিয় নিজের কথা বললেন। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'এবার দেখবেন এটাই আপনার নেশা হয়ে যাবে। আমার তো ভারতবর্ষ এদের সঙ্গে ঘুরে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি কি চিরকালই কলকাতায় আছেন?' চিত্তপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। বিয়ের পর এসেছি।'

'ও। বাবা বাইরে থাকতেন?'

'হ্যাঁ। জামসেদপুরে।'

শোনামাত্র নড়ে-চড়ে বসলেন চিত্তপ্রিয়। জামসেদপুর। সেকি ! তাহলে এই কি সরমা? তিনি একটুও বুঝতে পারেননি? বুকের ভেতর বাতাস ধাক্কা মারছে। তিনি বললেন, 'আমিও একসময় জামসেদপুরের সাকচিতে থাকতাম।'

'আচ্ছা কবে?'

'অনেককাল আগে। কলেজে পড়ার সময়।'

'আমি স্কুল শেষ করেই শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেছি।'

'ও। কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি সরমা?'

'না তো। আমি কনক, কনকলতা মুখার্জি।'

বাতাসটা বুক থেকে বেরিয়ে গেল এক নিমেষেই। চিত্তপ্রিয় বললেন, 'ও। আমার নাম চিত্তপ্রিয় দত্ত। একসময় সাকচিতে খুব ক্রিকেট খেলতাম।'

ভদ্রমহিলার কপালে ভাঁজ পড়ল। যেন মনে করার চেষ্টা করলেন, 'আমার দাদাও খুব ক্রিকেট খেলত। অনিল ব্যানার্জি।'

'আরে, অনিল আপনার দাদা? আমরা দুজনে ওপেন করতাম।'

'তাই?'

'অনিল এখন কোথায়?'

'আমেরিকায়। ওখানেই সেট্‌লড। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি কি একবার একটা মেয়ের মাথা বল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন?'

চিত্তপ্রিয় লজ্জা পেলেন, 'আমি ইচ্ছে করে ফাটাইনি। বলটা উড়ে গিয়ে পড়েছিল।'

'দাদার কাছে শুনেছি। তারপর মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাই না?'

'বাঃ, এত কথা মনে রেখেছেন?'

'মনে যে ছিল, তা নিজেই জানতাম না। অল্পবয়সের ব্যাপার একটু খুঁচিয়ে দিলে আপনি উঠে আসে। দাদারা চাঁদা তুলেছিল আপনাদের জন্যে, এটা মনে আছে। কারণ আমাকে জমানো টাকা থেকে দশ টাকা দিতে হয়েছিল। সে সময় দশ টাকার প্রচুর দাম ছিল।' কনকলতা হাসলেন, 'তা তিনিই আপনার সঙ্গে এতদিন—।'

'না। তার বিয়ে হয়েছিল অন্য জায়গায়।'

'সেকি! কেন?'

'সে সময় আমার রোজগার ছিল না।'

'আচ্ছা!'

'তখন মেয়েরা এভাবে ছেলেদের সঙ্গে বেরুতে সাহসও পেত না।'

'তা ঠিক। এই যে আমি একা যাচ্ছি, কতজনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, যেমন আপনার সঙ্গে গল্প করছি চলন্ত ট্রেনে বসে, তা নিয়ে কেউ কিছু ভাববেও না। কেন বলুন তো?'

'বোধহয় বয়সের জন্যে।'

কনকলতা বললেন, 'তার মানে বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায়?'

চিত্তপ্রিয় হাসলেন, 'মানুষ সেরকম ভাবতে পছন্দ করে। এই যে আপনি একা ট্রেনে যেতে-যেতে আমার সঙ্গে গল্প করছেন, কুড়ি বছর বয়সে পারতেন?'

'তখন ভালো-মন্দের তফাত তেমন করে বুঝতাম না। নিজের দায়িত্ব নিতে পারতাম না, তাই আড়ষ্টতা ছিল। এখন তো সেই সমস্যা নেই।'

'আপনার যুক্তি এটা। আত্মীয়স্বজন তখন যে আশঙ্কা করত এখন সেটা করবে না।'

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বোঝা গেল তিনি এখন কথা বলতে চাইছেন না। কিন্তু তাঁর মুখের আদলের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন চিত্তপ্রিয়। একটা তরুণীর টানটান মুখে কতটা চর্বি এবং বয়স মিশিয়ে দিলে এই মুখ হয় জানা নেই, কিন্তু তাঁর মনে হত সরমাকে একদিন পরে দেখলে কি তিনি চিনতে পারতেন না? অসম্ভব।

হরিদ্বারে নামার পর ট্যুর কোম্পানির লোকেরা তাঁদের একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর আলাদা ঘর চাই। সেই ব্যবস্থা হল। দু-রাত কনকলতার মুখোমুখি থাকার পর চিত্তপ্রিয়র একটু খারাপ লাগছিল এখন। যদিও সেই সংলাপগুলোর পর তাঁদের

আর তেমন কথাবার্তা হয়নি। তবু কনকলতার উপস্থিতি তাঁর ভালো লেগেছিল। কনকলতা এই হোটেলেই আছেন। তাঁর ঘর আলাদা। এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া অশোভন বলেই চিত্তপ্রিয় সেই চেষ্টা করলেন না।

সারাটা দিন একা-একাই ঘুরলেন তিনি। বিকেলে গঙ্গার ধারে হাঁটতে-হাঁটতে নানান রঙ্গ দেখলেন। রঙ্গ বলেই মনে হচ্ছিল। এক প্রৌঢ়া কপালে তিলক এঁকে বাজনা বাজিয়ে রামায়ণ গান করছেন, পাশেই গীতা পাঠ হচ্ছে। সর্বত্র বুড়োবুড়িদের ভিড়। গ্যাসের আলো জ্বলছে কথকদের সামনে। হাঁটতে-হাঁটতে ব্রিজের কাছে চলে এলেন তিনি। কনকলতাকে কোথাও দেখতে পেলেন না।

সন্ধে নাগাদ তাঁর শীত-শীত করতে লাগল। তারপরেই দুটো পা দুর্বল হয়ে পড়ল। শরীর ভালো বোধ না হওয়ায় হোটেলে ফিরে এলেন তিনি। হরিদ্বারে এখনও ঠান্ডা তেমনভাবে পড়েনি, তবু লেপের তলায় ঢুকেও শীত করছিল। চিত্তপ্রিয় বুঝতে পারছিলেন তাঁর জ্বর আসছে। অনেক অনেকদিন পরে অসুস্থ হচ্ছেন তিনি।

রাত্রে কোম্পানির লোক খাবার দিতে এসে জানল তাঁর অসুস্থতার কথা। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হল। জানা গেল চিত্তপ্রিয়র শরীরের তাপ তিন ছাড়িয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল যখন তখন সমস্ত শরীরে ব্যথা। মুখ বিস্বাদ। গায়ে জ্বালা। চোখ খুলতেই কয়েকটা মুখ। কোম্পানির ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল, 'কীরকম লাগছে?'

ভালো না বলতে গিয়েও বললেন না চিত্তপ্রিয়। চোখ সরালেন। অবাক হয়ে দেখলেন কনকলতা রয়েছেন এ ঘরে। ম্যানেজার বললেন, 'ডাক্তারের মতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমরা তো কাল পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাব। এ অবস্থায় ওঁকে হাসপাতালে ভরতি করা ছাড়া কোনও পথ নেই। ওঁর পক্ষে একা ফিরে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

চিত্তপ্রিয় তারপরের কথাবার্তা শোনেননি। ঢেউ-এর মতো ঘুম এসে ডুবিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। বিকেল নাগাদ আবার সেই ঘুম ভাঙল। টয়লেট যাওয়া দরকার। উঠতে যেতেই বাধা পেলেন, 'কী হল?'

কোনওরকমে মুখ ফেরাতে কনকলতার দেখা পেলেন। ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আছেন কনকলতা। চিত্তপ্রিয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

'আপত্তি আছে আমি থাকলে?'

'না, কিন্তু—। টয়লেট যাব।'

'পারবেন?'

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন চিত্তপ্রিয়। কাছে এসে তাঁর বাহু শক্ত করে ধরলেন কনকলতা, 'ইস্, জ্বর দেখছি এখনও কমেনি। কী করে বাধালেন?'

'বেধে গেল।'

টয়লেটের দরজা পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিলেন কনকতলা। সাবধান হতে বললেন। টয়লেট সেরে ফিরে আসার পর ভদ্রমহিলা আবার যত্ন করে তাঁকে শুইয়ে দিলেন, 'এবার একটু মুখে দিতে হবে। তারপর ওষুধ।'

'আমাকে হাসপাতালে কখন নিয়ে যাবে?'

'কেন? সেখানে যাওয়ার খুব শখ আছে বুঝি?'

'তা নয়। আপনারা তো কাল চলে যাবেন?'

'যেতাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমি যেতে পারছি না।'

'আপনি আমার জন্যে থেকে যাবেন?'

'কথা বলবেন না। নিন, এই ফলের রসটুকু খেয়ে নিন। কীরকম ডাক্তার এখানকার জানি না, দু-দিনেও জ্বর কমাতে পারল না।'

অনেক অনেকদিন পরে কারও সেবা পেলেন বলে মনে হল তাঁর। চিত্তপ্রিয় কনকলতার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার শক্তি কমে আসছিল। নিস্তেজ, দুর্বল হয়ে কনকলতার দিকে তাকাতে-তাকাতে মনে হল তিনি যেন সরমাকে দেখছেন। কিন্তু সরমা কি এরকম দেখতে হয়েছে এখন? চোখ বন্ধ করলেন চিত্তপ্রিয়।

তৃতীয় দিনে ডাক্তারের নির্দেশে চিত্তপ্রিয়কে হাসপাতালে যেতে হল। ট্যুরিস্ট কোম্পানি অন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেল তাদের প্রোগ্রামমতো। কনকলতা গেলেন না। হোটেল ছেড়ে তিনি একটি আশ্রমে উঠে গেলেন। দু-বেলা হাসপাতালে আসেন, ফল-ওষুধের ব্যবস্থা করেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা-যাওয়া।

একদিন, চিত্তপ্রিয় যখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ তখন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমার জন্যে এত করছেন কেন?'

কনকলতা হাসলেন, 'অনেকে দিতে কার্পণ্য করে বলে জানতাম, কেউ-কেউ নিতেও কুণ্ঠিত হয়, তা আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি।'

'কুণ্ঠা কি অকারণে?'

'হ্যাঁ। আপনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। বিদেশবিভূঁই-এ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন দেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই কী করে? যদি আপনার পরিচয় না জানতাম তাহলে অন্য কথা ছিল।'

'কিন্তু আমার জন্যে আপনার বেড়ানো হল না যে।'

'অনেক কিছুই তো জীবনে হয়নি।'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী?'

'আপনি সরমা।'

'পাগল! আমি সরমা হতে যাব কোন দুঃখে? আপনি তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সে সেই স্মৃতি নিয়ে থাকুক, আমি কেন সরমা হব?'

ট্যুরিস্ট কোম্পানি ফিরে আসার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হননি চিত্তপ্রিয়। ফেরার সময় এক ট্রেন, কিন্তু আগের মতো মুখোমুখি আসন নয়। কনকলতা বসেছেন তিনটে কুপের ও-পাশে। ব্যবস্থাটা কে করল তা চিত্তপ্রিয় জানেন না। তাঁর সামনে বসা বৃদ্ধকে তিনি জায়গা বদল করার কথা লজ্জায় বলতে পারলেন না।

হাওড়া স্টেশনে নামার পর কনকলতা কাছে এলেন, 'একা যেতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে চলি।'

চিত্তপ্রিয় কিছু বলার আগে এগিয়ে আসা এক যুবককে দেখালেন কনকলতা, 'আমাকে নিয়ে যেতে এসে গিয়েছে। ভালো থাকবেন।'

'আমি কিন্তু ঠিকানাটা জানলাম না।'

কনকলতা হাসলেন, 'কী দরকার! চলি।'

কনকলতা চলে গেলেন, প্ল্যাটফর্মে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়। ঠিকানা তিনি ইচ্ছে করলে পেতে পারেন। ট্যুর কোম্পানির খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর ঠিকানা লেখা রয়েছে। কিন্তু সত্যি তো, ঠিকানা নিয়ে তিনি কী করবেন? কনকলতা যদি সরমাই হয় তাহলেই বা কী করা যেতে পারে? হ্যাঁ, তিনি প্রশ্নটা করতে পারেন, কেন সেই দিন স্টেশনে এল না? উত্তর যাই হোক তাতে তো এখন আর জীবন বদলাবে না।

গোমুখে যে জল পবিত্র, হরিদ্বারে যার স্পর্শে শান্তি সেই গঙ্গার জল কালীঘাটে শুধু দুর্গন্ধ ছড়ায়। বয়ে-আসা নদীকে কেউ আর ছেড়ে যাওয়া ঘাটে-ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এরই নাম জীবন। বেঁচে থাকতে হলে এই সত্যিটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

আদ্যশ্রাদ্ধ

প্রথম এসেছিল অমল।

দিল্লি থেকে প্লেনেই উড়ে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু রত্না বলেছিল, 'খামোকা অত টাকা কেন নষ্ট করবে, ট্রেনেই যাও, কোম্পানির পয়সায় তো ট্যুরে যাচ্ছ না!'

কথাগুলো মনে ধরেছিল। অবশ্য টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই মন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। যেন দশমনি একটা পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মনের আংটায়। নড়তে-চড়তে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। নিশ্বাস ভারী। সড়সড় করে সমস্ত ছেলেবেলা, কিশোর এমনকী যৌবনের প্রারম্ভকাল শেকড়-উপড়ানোর মতো চলে এল সামনে। তৎক্ষণাৎ অফিসে গিয়ে ছুটির দরখাস্ত করেছিল সে। মা মৃত্যুশয্যায়, ছুটি তো মঞ্জুর হবেই।

অফিসে বসেই প্লেনের জন্যে চেষ্টা করবে ভেবেছিল অমল। তার আগে বাড়িতে রত্নাকে খবরটা দিল। বৃন্দাবনদা টেলিগ্রাম করেছেন। সব শুনে রত্না ওই কথাগুলো বলেছিল। আর তারপরেই মনে হয়েছিল, খুব একটা দেরি হবে না। রাতের প্লেন ধরে কলকাতায় পৌঁছতে সাড়ে দশটা। মাঝে-মাঝে এত লেট হয় দুটো বাজলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তার চেয়ে বিকেলের রাজধানী ধরে সকালেই পৌঁছে যাওয়া যায়। চটপট কিছু টাকা ব্যাঙ্ক তুলে ও নতুন দিল্লি স্টেশনের সামনে থেকে টিকিটের ব্যবস্থা করে বাড়িতে এসে শুয়েছিল খানিক। তিন বছরের বাপ্পা কাছে ঘেঁষতেই রত্না নিষেধ করেছিল, 'বাপ্পা, বাপীর কাছে যেও না, ঠাকুমার শরীর ভালো নেই। সী ইস লিভিং আস।'

ইংরেজি চারটে শব্দ কানে খট করে বাজলেও চুপ করে থাকল অমল। তার সত্যিই কান্না পাচ্ছিল। কেউ রইল না তার। বাবার সঙ্গে কোনওদিনই সম্পর্ক ভালো নয়। মা-ই তাকে সবসময় আড়াল দিয়েছে। এমনকী রত্নাকে বিয়ের ব্যাপারটায় বাবার আপত্তি মায়ের জেদে নরম হয়েছিল। সেই মা চলে যাচ্ছে, হয়তো কলকাতায় গিয়ে দেখবে চলেই গিয়েছেন। বুকের আংটা ওজনের ভারে যেন খসে পড়েছিল।

প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নেমে সে আর ট্যাক্সির লাইনের জন্যে দাঁড়ায়নি। বাড়তি টাকা দিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ছুটে এসেছিল সল্টলেকে। এখানেই সুইমিং পুলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শতদল দত্ত বাড়ি করেছেন। আধুনিক সেই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। দোতলায় দুটি, একতলায় তিনটি, বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমল নিশ্বাস বন্ধ করে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগটা বাঁ-হাতে নিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াতেই দোতলার বারান্দা থেকে বৃন্দাবনের গলা পাওয়া গেল, 'ওই যে, ছোট দাদা এসে গিয়েছে।' বলার ধরনে এক ধরনের আহ্লাদ ছিল; সিঁড়িতে পা দিতে-দিতে তেমনই মনে হল অমলের। কেউ মরে গেলে এমন গলায় কথা বলা যায় না। অন্তত বৃন্দাবনদার মতো মানুষ তো পারবেই না।

বৃন্দাবনদা দরজা খুলেই বলল, 'যাক, তুমি এসে গিয়েছ! খুব ভালো হল।'

'মা কেমন আছে?' প্রশ্নটা যেন ছিটকে বের হল।

মাথা নাড়ল বৃন্দাবনদা, না, তারপরেই কেঁদে ফেলল, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় আছে? কোন নার্সিংহোমে?'

'না, না, বাড়িতেই আছে।'

'বাড়িতে? বাড়িতে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল বৃন্দাবনদা, 'বয়েস হয়েছে। পনের দিন ধরে ভুগছেন, একটু-একটু করে, শেষে বুকের ব্যথা বাড়ল। বাবু নার্স আনালেন, অক্সিজেন, অক্সিজেন, স্যালাইন—সব বাড়িতেই দেওয়া হচ্ছে, কোনও ত্রুটি হয়নি।'

'দাদাদের খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গেই টেলিগ্রাম করেছি। চল।'

'বাবা কোথায়?'

'তিনি তো মায়ের সামনে দিনরাত বসে আছেন। ওখানেই খান, ওখানেই ঘুমোন। শুধু বাথরুমের সময় ওঠেন। আরও জড়ভরত হয়ে গেল মানুষটা।'

এই সময় বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়াল। বৃন্দবনদা বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

অমল দেখল একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'ভালো করেছেন এসে। ইটস এ লস্ট কেস। শরীর আর রেসপন্স করছে না। আমরা ভেবেছিলাম রাত কাটবে না। এখন যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণই লাভ।'

'আপনি ওঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করছেন না কেন?'

'কোনও লাভ নেই। এটা বয়সের ব্যাধি। নিজের জায়গায় শেষ নিশ্বাস ফেললে উনি বেশি আরাম পবেন। তাছাড়া মিস্টার দত্ত চিকিৎসার ত্রুটি রাখেননি।'

ডাক্তারের পেছন অমল ওপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকেই অমল শতদল দত্তকে দেখতে পেল। জানলার ধারে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে মুখে ফেরাতেই অমলের সঙ্গে চোখাচোখি হল। অজান্তেই কেঁপে উঠল অমল। বৃদ্ধের চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। এগিয়ে এসে প্রণাম করতে যেতেই শতদল বললেন, 'থাক। অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।'

অমল হকচকিয়ে গেল। শতদলও কি অসুস্থ? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ডাক্তার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল মায়ের কাছে।

চারুশীলা শুয়ে আছেন। প্রায় অস্থিসার চেহারা। না, স্যালাইন বা অক্সিজেনের কোনও চিহ্ন দেখল না অমল। ডাক্তার ওঁর নাড়ি দেখছেন। স্টেথোস্কোপটা বুকে চাপলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'মিসেস দত্ত আপনার ছেলে এসেছেন, মিসেস দত্ত?'

মায়ের মুখে কোনও অভিব্যক্তি এল না। তাঁর চৈতন্য এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে জাগতিক কোনও শব্দও পৌঁছয় না। ডাক্তার বৃন্দাবনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নার্স কোথায়?'

'এই মাত্র বাথরুমে গিয়েছে।' বৃন্দাবনদা জবাব দিল।

ডাক্তার চলে গেলেন শতদল দত্তের কাছে, 'আপনি কিন্তু সারাক্ষণ এখানে এভাবে বসে থেকে অন্যায় করছেন। আপনাকে তো ওঁর কথা বলেছি।'

'ও কখন যাবে ডাক্তার।'

সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্ষেত্রে কোনও কিছু করণীয় নেই।'

'তাহলে আমার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।' শতদল দত্ত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর সেই সময় নার্স ঢুকল। মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল অমল। ভদ্রমহিলা সাদা শাড়ি, মানে যাকে বলে নার্সের ইউনিফর্ম পরেছেন বটে কিন্তু এমন লাস্যময়ী নার্স

সে কখনও দেখেনি। ডাক্তার ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওষুধ নিয়ে কথা বললেন। অমল মায়ের দিকে তাকাল। তার বুক কেঁপে উঠল। পাথরের মতো মুখ। মাথায় হাত বোলাল সে। তারপর নিচু গলায় ডাকল, 'মা!'

চারুশীলার মুখে সামান্য কুঞ্চনও এল না। অমল কপাল, গাল, চিবুকে আঙুল বোলাল। তারপর গাঢ় গলায় আবার ডাকল, 'মা! মাগো!

চারুশীলার কোনও পরিবর্তন হল না। নার্স এগিয়ে এলেন, 'এক্সকিউস মি, উনি রেসপন্স করতে পারবেন না। ডেকে কোনও লাভ নেই।'

মেজাজ খুব বিগড়ে ছিল কমলের। সুজাতা টিভি সিরিয়ালের সুটিং করতে গিয়ে ভোররাতে বাড়ি ফিরেছে। সে পইপই করে বলেছিল, টিভিতে অভিনয় করছ করো কিন্তু বাড়ির শান্তি যেন বজায় থাকে। সুজাতা সুন্দরী। যদিও তেত্রিশ বছর বয়েস কিন্তু রাখতে পেরেছে বলে পঁচিশের বেশি মনে হয় না। ফিল্মেও সুযোগ পেয়েছিল সুজাতা কিন্তু রাজি হয়নি কমল। টিভি যেন ঘরোয়া শিল্প, সুজাতারও খুব আগ্রহ ছিল, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। সুটিং-এর জন্যে বাইরে রাত কাটানো এর আগে কখনও হয়নি। ইতিমধ্যে সুজাতার একটা সিরিয়াল নেটওয়ার্কে দেখিয়েছে। অফিসে এই কারণে কমলেরও গ্ল্যামার বেড়েছে। সুজাতার সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ না কেউ তাকাবেই। গর্ব যে হয় না তা নয়,। তাই বলে রাত কাটিয়ে ফিরবে? মেজাজ তাই ভালো ছিল না। এমন সময় টেলিগ্রামটা এল। মা মৃত্যুশয্যায়, তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃন্দাবনদা।

খপ্ করে বুকের বাঁ দিকটায় যেন খিঁচ লাগল কমলের। মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি অন্তত পাঁচ বছর। পাঁচ বছর কলকাতায় যাওয়া হয় না। বাবা সল্টলেকে বাড়ি করেছেন তা পাঁচ বছর আগে দেখে এসেছে সে। জন অ্যান্ড মিল কোম্পানির পাবলিক অফিসার কমল দত্ত এখন এত ব্যস্ত মানুষ যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আত্মীয়দের সঙ্গে রাখতে পারে না। কিন্তু মা অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায়, জানতে পারা মাত্র ওর মনে হল এক্ষুনি কলকাতায় যাওয়া উচিত। ভোররাতে ফেরা সুজাতাকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনাটা বলল সে। সুজাতা বলল, 'অসম্ভব। আমার আগামী চারদিন সুটিং আছে। যাওয়ার ইচ্ছে হলে তুমি যাও।'

প্রচণ্ড রেগে গেল কমল, 'কি আশ্চর্য, আমার মা তোমার শাশুড়ি!'

চোখ ছোট করে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ হঠাৎ খেপে গেলে কেন?'

'মানে?'

'এতগুলো বছর একবারও বুঝতে পারিনি মায়ের ওপর তোমার এমন টান আছে। উনি চিঠি দিলেও তো উত্তর লেখার সময় পেতে না। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা অসুস্থ, আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তুমি তো জানতে ওঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে।'

কমল জানে। জানে বলেই সেইসময় মায়ের ওপর বেশ রেগে গিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে দু-দিন থাকতে-না-থাকতেই সুজাতা হয় দার্জিলিং নয় দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করত। মা বলেছিলেন, 'তাহলে লোক দেখিয়ে এখানে ওঠা কেন বাপু, হোটেলে থেকে ওসব করলেই পারো।' কথাগুলো না বললেই পারতেন মহিলা। জ্ঞান হাওয়া ইস্তক দেখে এসেছে কমল, উনি সোজা কথা মুখের ওপর বলে দেন। বাবার সঙ্গে যে কতবার ঝগড়া এবং কথা বন্ধ হল তার ইয়ত্তা নেই।

অতএব আর কথা বাড়াল না কমল। যতই হোক মা ইজ মা, সে মনে-মনে বলল। অতএব বোম্বে থেকে সকালেই প্লেনে দমদমে পৌঁছে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অবস্থা প্রায় ট্রেনের মতন। এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি ধরতে বেলা বারোটা বাজল। সেখান থেকে সোজা সল্টলেক।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সিগারেট ধরাল কমল। মা যদি চলে গিয়ে থাকে, হঠাৎ বুকের ভেতর মেঘ জমতে শুরু করল, ঠোঁট কামড়াল সে। পা ভারী হয়ে উঠল। সে ধীরে-ধীরে ভেতরে ঢুকে বেল বাজাল। মিনিটখানেকের অপেক্ষা। কমলের মনে হচ্ছিল সে অন্য কারও বাড়িতে এসেছে। বয়স এবং দূরত্ব কিভাবে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। দরজা খুলল। কমল অবাক হল, অমল দাঁড়িয়ে, পরনে পাঞ্জাবি এবং পাজামা। অর্থাৎ কমল তার আগেই এসে গিয়েছে। অমল বলল, 'ওঃ দাদা, এসো।'

কমল ঘরে ঢুকল। অমলকে সে কত বছর পরে দেখছে তা মুহূর্তে মনে করতে পারল না। ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে আরও অস্বস্তি বাড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা?'

'অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার এসেছিলেন একটু আগে। বললেন কোনও চান্স নেই।'

'ঠিক কী হয়েছে?'

'বললেন বয়স হলে যা হয়। কথাও বলতে পারছেন না, কোনও হুঁশ নেই।'

কমল ঠোঁট কামড়াল। হঠাৎ তার কান্না পেল। মুখ চোখ দুমড়ে গেল। চোখ ঝাপসা। ব্যাপারটা অমলকেও আচমকা স্পর্শ করল, 'দাদা, শক্ত হও। শী ইজ স্টিল উইথ আস।'

'মেজ আসেনি?'

'না। আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে টেলিগ্রাম করেছিল বৃন্দাবনদা।'

'আমরা বোম্বে দিল্লি থেকে আসতে পারলাম, আর ও গৌহাটি থেকে—। যাক, বাবা কেমন আছে? শক্ত আছে তো?'

'মনে হয় না। মায়ের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।'

'সেকি! মা কি বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। মায়ের কাছে গিয়ে আমারও তাই মনে হল।'

কমল সোফায় বসে পড়ল। দু'হাতে মুখ ঢাকার চেষ্টা করে আঙুলের ডগায় চোখ মুছল। অমল উলটো দিকে বসল। মুখ গম্ভীর। সে দাদাকে একবার দেখল। বউদি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করছে অথচ দাদার চেহারায় বয়স এসে গিয়েছে বেশ। জুলপি পাকা, সামনের দিকের চুল অনেকটা উঠে গিয়েছে। ভারী হয়েছে শরীর। ছেলেবেলায় দাদাকে সবাই বলত গুডি বয়। লালুভুলু। দাদার চেহারায় সেই মোলায়েম ব্যাপারটা আর নেই। ভালো চাকরি করে, পয়সাও বানিয়েছে কিন্তু অমলের মনে হল সুখে নেই দাদা। রত্না তো বউদিকে সহ্য করতে পারে না। নেট ওয়ার্কের সিরিয়ালে অভিনয় দেখে প্রচুর খুঁত বের করেছিল। কিন্তু আজ অমলের মনে হল দাদার মধ্যে আগেকার ভালো মানুষ ব্যাপারটা এখনও রয়ে গেছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওপরে যাবে না দাদা?'

কমল মুখ তুলল, 'আমি মাকে ওভাবে দেখতে চাইনি অমল!'

এইসময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। অমল নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। তারপরেই গলা তুলে বলল, 'মেজদা এসেছে।'

কমল শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করেও আবার বসে পড়ল। সে শুনল, শ্যামল বলছে, 'মা কেমন আছে?'

অমল তাকে দরজাতে দাঁড়িয়ে একই ঘটনা বলে গেলে সে ভেতরে ঢুকল। শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'ও দাদা, কখন এলে?'

কমল কাঁধ নাচাল। শ্যামল সোফায় বসে বলল, 'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'আমি ওপরে যাইনি এখনও। যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না।' কমল জবাব দিল।

শ্যামল বলল, 'আমি তো টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক। গতবছর একবেলার জন্যে কলকাতায়

এসেছিলাম, মানে রাত্রে এসে পরদিনই চলে গিয়েছিলাম, তবু সময় বের করে এখানে এসে দেখা করে গিয়েছি। মা তখন অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। আমার সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটি হল। তেমন কিছু নয়। কোনও অসুখ তো দেখিনি।'

কমল জানতে চাইল, 'কি নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল।'

'সিলি ব্যাপার! আসলে কলকাতায় এলে বড়শালার কাছে না উঠলে এমন ঝামেলা হয় যে কি বলব। মা তাই নিয়ে—ছেড়ে দাও। আমাকে যে বউ-এর সঙ্গে সারাজীবন বাস করতে হবে তা মায়ের মাথায় ঢোকে না। অথচ বাবা তো চিরকাল বউ-এর দাবি মেনে চললেন। সেটা তো আমরা দেখেছি। সত্যি মারা যাবে?'

কমল বলল, 'অমল তো বলল ডাক্তার তাই বলেছে।'

'উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না।' চোখ বন্ধ করল শ্যামল।

অমল বলল, 'তোমরা ওপর থেকে ঘুরে এসো। কখন যে ঘটনাটা ঘটে যাবে কে জানে!'

এইসময় বৃন্দাবনদা নেমে এল একটা ট্রে হাতে নিয়ে। এদিকে তাকাতেই লোকটার মুখে হাসি ফুটল, 'আমি জানতাম খবর পাওয়া মাত্র তিনজনেই চলে আসবে। হাজার হোক পেটের ছেলে।'

কমল তাকে ইশারায় ডাকল, 'মা কি করছেন?'

'যাও না, দেখে এসো। এতদূর ছুটে এসে এখানে বসে আছ কেন?'

কমলের বারো বছর বয়সে বৃন্দাবন এ বাড়িতে কাজে লেগেছিল। এখন এই কথা বলার ধরনে তার রাগ হলেও সে চুপ করে গেল। বৃন্দাবন বলল, 'দেখা করে এসে হাতমুখ ধুয়ে নাও সবাই, আমি চা বানাচ্ছি। জলখাবার না একেবারে ভাত দেব?'

শ্যামল বলল, 'হোল নাইট ট্রেনে জেগে এসেছি, আমি শুধু চা খাব।'

বাকি দু'জন কিছু বলল না। শ্যামল বলল, 'অমল, তুইও চল সঙ্গে।'

শতদল দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে চারুশীলার মাথায় হাত রাখলেন। বেশ উত্তাপ আছে। কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিলেন। বাঁ হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা আছে, সরিয়ে রাখলেন। প্রথম-প্রথম নার্সের সামনে এসব করতে সঙ্কোচ হত, আজকাল হয় না। কিছু করার না থাকলে মেয়েটা পাশের চেয়ারে বসে সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে। চেয়েও দেখে না তিনি কি করছেন। শতদল ঝুঁকে পড়লেন, 'চারু! শুনতে পাচ্ছ? ও চারু। ইউ কান্ট গো লাইক দিস। আমি তোমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, যাওয়ার কথা আগে আমারই। চারু।'

এইসময় দরজার কাছে শব্দ হল। চমকে সোজা হতে-হতে পেছন ফিরলেন শতদল। তিন পুত্র একই সঙ্গে দরজায়। হঠাৎ তিনি তিনজনের ভালো নাম মনে করতে পারলেন না। তবে বোম্বে গৌহাটি দিল্লির কথা মনে পড়ল। তাঁর তিন প্রবাসী পুত্র।

তিনি কোনও কথা না বলে চুপচাপ জানালার পাশের ইজিচেয়ারে ফিরে গেলেন। ওরা ধীরে-ধীরে চারুশীলার পাশে এসে দাঁড়াল। কমল ডাকল, 'মা, মা!'

নার্স বলল, 'উনি শুনতে পাচ্ছেন না।'

কমল থমকে যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ, যা কান্নারই বহিঃপ্রকাশ, ছিটকে এল গলা থেকে। শতদল কথা বললেন, 'এখনও সময় হয়নি। অসময়ে কান্নাকাটি এই ঘরে হোক আমি চাই না!'

তিন পুত্র একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল শতদল কথাগুলো বলেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছেন। শ্যামল এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

'বাবা!'

'বলতে পারো।'

'বাবা, আপনি এখন আর আমাদের ওপর রাগ করবেন না।'

'আমি রাগ করেছি এই খবর কোত্থেকে পেলে?'

'না, মানে, আচ্ছা মায়ের চিকিৎসা আর একটু ভালোভাবে করা যায় না?'

'খারাপভাবে হচ্ছে তা তোমাকে কে বলল?'

'আমি বলছিলাম যদি ওঁকে নার্সিংহোমে, মানে আমার শালা তো নামকরা ডাক্তার, ওর নার্সিংহোম আছে, আপনি তো জানেন—, আর একটু চেষ্টা করা যেত!'

'তোমার আর কোনও কথা বলার আছে?' শতদল সরাসরি তাকালেন।

এবার কমল এগিয়ে গেল, 'বাবা, আপনার কি মনে হচ্ছে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না? আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমরা কয়েক মিনিট আগে এসে কি করে বুঝে গেলে ট্রিটমেন্ট ঠিক হচ্ছে না। অবশ্য তোমরা ওর ছেলে, তোমরা বলতেই পারো।'

'আপনি যখন বলছেন তখন আমাদের আর কি বলার থাকতে পারে। কিন্তু আপনার এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। এভাবে বসে থাকাটা ঠিক নয়।'

শতদল কমলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তোমরা সবাই একাই এসেছ?'

কমল ঠোঁট কামড়াতে গিয়েও সামলে নিল, 'হ্যাঁ।'

'বেশ তো। তাহলে নিচে যাও, খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও। অনেকদিন বাদে তিনভাই পরস্পরের দেখা পেলে। অন্তত খবর পাওয়া মাত্র এসেছ বলে আমি খুশি।'

বৃন্দাবনদার রান্না খারাপ নয়। যদিও আর একটি কাজের মেয়ে রয়েছে। ওরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাইরের ঘরে এসে বসল। আগে অমল দাদাদের সামনে সিগারেট খেত না, আজ ধরাল। কমল জিগ্যেস করল, 'তোর খবর কী?'

'চলছে। বউদির সিরিয়াল দেখলাম।'

'ওই, হবি আর কি! আমি বাধা দিই না, রত্না কেমন?'

'আছে। আসতে চেয়েছিল, আমি সঙ্গে আনিনি।'

'ভালোই করেছিস। এখানে এত টেনশন—।'

শ্যামল চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'বাবাও কেমন বদলে গিয়েছে।'

কমল হাসল, 'বাবার সঙ্গে চিরকালই আমাদের দূরত্ব ছিল।'

অমল বলল, 'বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসেন।'

কমল বলল, 'আগে বুঝিনি। আজ মনে হল। মানুষের বোধহয় বয়স বাড়লে প্রেমও বাড়ে। তোর মনে আছে শ্যামল, একবার স্কুল থেকে কার রবার চুরি করেছিলি বলে বাবার কাছে জোর মার খেয়েছিলি!'

'এই যাঃ, আমি চুরি করিনি, ভুল করে নিয়ে এসেছিলাম।'

সঙ্গে-সঙ্গে কমল এবং অমল হেসে উঠল। হঠাৎ ওরা অতীতে ফিরে গেল। তিনজনেই স্মৃতিতে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট-ছোট্ট ঘটনা তুলে এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা শুরু করল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সবাই ঘটনাটার বিশ্লেষণে একমত হচ্ছিল না। তবু এই জাবর কাটায় খুব মজা পাচ্ছিল। অনেক-অনেক কাল এই ধরনের কথাবার্তা বলা হয় না। এইসব কথা বলার মানুষও চারপাশে থাকে না। কবে কখন কমল অমলকে চাঁটি মেরেছিল চটি পরার জন্যে, কবে শ্যামল কমলের একটা টাকা চুরি করেছিল, তখনকার রাগ আজ নেহাতই সুখকর স্মৃতি। তিন ভাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইসময় বৃন্দাবন এল, 'অনেক কষ্টে বাবুকে শুতে পাঠিয়েছি। তোমরা একজন ওপরে যাবে?'

অমল তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বাকি দুজনের মনে ওই মুহূর্তে ইচ্ছে এলেও অমলকে উঠতে দেখে তারা আর উদ্যোগ নিল না। অমল চলে গেলে শ্যামল বলল, 'অমলটা সেই ছেলেবেলার মতো রয়েছে। সব কিছু আগে না পেলে কীরকম কান্নাকাটি না করত।'

কমল বলল, 'বুঝলি, অনেক ভেবে দেখলাম, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল ছেলেবেলা। কি ভালোই

না ছিলাম তখন। টেনশন ছিল না, নিজের কথা ভাবতে হত না।'

'সত্যি কথা। এখন টাকা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা—।'

'আমাকে তো ভগবান ও ব্যাপারে দয়া করলেন না।'

'ডাক্তাররা কী বলছে!' শ্যামল জানতে চাইল।

মেজভাই-এর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তবু কমল বলল, 'হবে না।'

শ্যামল নিশ্বাস ফেলল, 'খুব টায়ার্ড লাগছে। রাত্রে ট্রেনে ঘুমাতে পারিনি।'

'ঘুমিয়ে নে।'

'নাঃ। একবার শ্যালকের বাড়ি যেতে হবে। কখন মায়ের কি হয়ে যায়, তখন আর সময় পাব না। আমি বরং ঘুরেই আসি।' শ্যামল উঠল।

অমল মায়ের পাশে বসে দেখল মাঝে-মাঝে গালের চামড়ায় কুঞ্চন হচ্ছে। সে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'মা!'

'উনি শুনতে পাবেন না।' নার্সটি বলে উঠল।

'আপনি এরকম কেস আগে দেখেছেন?' অমল মুখ তুলে মহিলাকে দেখল। চেহারা দেখে নার্স বলে মনে হয় না। বউদির বদলে ইনি টিভি সিরিয়ালে নামলে বেশি নাম করতে পারতেন।

মহিলা ঠোঁট টিপে হেসে নিয়ে বললেন, 'অ-নে-ক। আপনারা মন তৈরি করে নিয়েছেন, শুধু আপনার বাবা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।'

অমল মায়ের পাশ থেকে উঠে বাবার খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

নার্সটি সিনেমার পত্রিকায় নজর রাখল। অমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সবসময় এইভাবে বসে থাকেন? ডিউটি কতক্ষণ?'

'চব্বিশ ঘণ্টার। ইচ্ছে করেই নিয়েছি। টাকার খুব দরকার।' আবার হাসি।

'কত টাকা দেওয়া হচ্ছে?'

'দেড়শো।' পত্রিকাটি পাশে রাখল সে, 'আপনি দিল্লিতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'দিল্লিতে আমার স্বামী থাকেন।'

'ও। আপনারা আলাদা আছেন?'

'অনেক দিন। বছরে একবার দেখা হয়। বাপের বাড়ির খরচ চালাই বলে টাকার দরকার। আমার অবশ্য এই চাকরি করার কথা নয়।'

'আপনাকে দেখে তাই মনে হয়।'

দু'চোখে অদ্ভুত কাজ দেখাল মহিলা, কী মনে হয়?'

'আপনি অন্যরকম।'

মহিলা মুখ নামালেন। অনেকক্ষণ কোনও কথা হল না। হঠাৎ মহিলা বললেন, 'আমি তো আছি। আপনি বিশ্রাম নিন। অতদূর থেকে এসেছেন।'

'আমি এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'না, না।' প্রতিবাদ করলেন মহিলা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাঝে-মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। আর হঠাৎই সেইসময় শিহরণ বোধ করল অমল। ভদ্রমহিলার চোখে অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। এই সময় বৃন্দাবনদা এল, 'যাও, গিয়ে একটু শোও, আমি বসছি।' বসে থাকতে খুব আরাম পাচ্ছিল অমল কিন্তু না উঠে পারল না। ওঠার সময় আর এক দফা চোখাচোখি। অনেক কথা যেন বলা হয়ে গেল।

*

বিকেলে ডাক্তার এলেন। চারুশীলাকে দেখে নেমে এসে বললেন, 'অবস্থা আরও খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা। কিছু হলে আমায় খবর দেবেন।'

ডাক্তার চলে গেলে কমল বলল, 'অন্যান্য আত্মীয়দের খবর দেওয়া উচিত।'

শ্যামল প্রতিবাদ করল, 'আত্মীয়? এঁরা এখানে রয়েছেন কেউ তো দেখতে আসেনি। ছেড়ে দাও ওসব। কিন্তু সন্ধের পর কিছু হলে কী করবে?'

অমল কেঁদে ফেলল। শ্যামল ধমকাল, 'বোকার মতো কাঁদিস না। ওইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে মায়ের যাওয়াই ভালো।'

কমল নিশ্বাস ফেলল, 'খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন।'

অমল ভাঙা গলায় বলল, 'বাবার কী হবে?'

শ্যামল বলল, 'সেটাই ভাবছিলাম। বাবা তো আমাদের কারও কাছে গিয়ে থাকতে পারবেন না। অবশ্য বৃন্দাবনদা আছে এখানে।'

কমল বলল, 'মিছিমিছি খরচ করলেন বাড়িটার পেছনে।'

শ্যামল বলল, 'কথা শুনবেন না। আমি তো বলেছি এ বাড়ির ওপর আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি তো এসে থাকব না কোনওদিন।'

অমল বলল, 'ইন্টারেস্ট আমারও নেই।'

'বাবা না থাকলে বিক্রি করে দিতে হবে।' কমল বলল।

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিভাবে নিয়ে যাবে?'

তিনভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'এসব কথা এখনই বলা কি ঠিক? অবশ্য ডাক্তার বলে গেলেন—।'

কমল বলল, 'তখন মাথা ঠিক থাকবে না। কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া খুব প্রিমিটিভ আইডিয়া।'

শ্যামল বলল, 'গাড়ি পাওয়া যায়। শালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও একটা ফোন নম্বর দিয়েছে। ফোন করলেই চলে আসবে গাড়ি।'

অমল বলল, 'গুড। কাঁচের গাড়ি নিশ্চয়ই।'

'তাই তো।'

'আর ইলেকট্রিক চুল্লিতে কাজ করব। চিতা-ফিতা সহ্য করতে পারব না। তবে কাছাকাছি ইলেকট্রিক চুল্লি আছে কিনা জানি না।'

শ্যামল বলল, 'কাগজে পড়েছি নিমতলাতে আছে। ওটাই কাছে।'

'ফুলটুল—?' কমল জিজ্ঞাসা করল।

'ওই গাড়ির জন্যে ফোন করেই বৃন্দাবনদাকে পাঠাব।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা ভারী আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল। হঠাৎ অমল বলল, 'উঃ, ছেলেবেলায় মা আমাকে ভাত খাইয়ে দিত!'

কমল বলল, 'সবাইকে মা দিয়েছে। যাই বলিস, মায়ের বিকল্প অন্য কোনও মেয়ে হয় না। সুজাতার মধ্যে টের পার্সেন্ট গুণ নেই।'

'রত্নার মধ্যে আছে ভেবেছ? ওই ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট।'

অমল ফোঁস করে উঠল। শ্যামল কোনও মন্তব্য করল না।

কমল বলল, 'কাল সকালের বোম্বে ফ্লাইট কখন রে?'

'কালই চলে যাবে?' অমল জানতে চাইল।

'আর থেকে কি করব! খাঁ-খাঁ করবে বাড়ি।

'তা ঠিক। আমিও ভাবছি দিল্লির ফ্লাইট ধরব। এক্সট্রা কিছু খরচ হবে, রত্না চটবে, বাট নাথিং ডুয়িং।' অমল বলল।

'তোদের টাকা আছে, প্লেনে যা। আমি ভাই ট্রেনে। সকালে শালার বাড়িতে চলে যাব। সন্ধেবেলায় কামরূপ এক্সপ্রেস।' শ্যামল বলল।

অমল বলল, 'ভালোই হল, কাল অফিসে যাওয়া খুব জরুরি ছিল।'

কমল হাত নাড়ল, 'তুই জানিস না, এইভাবে হুট করে চলে এসে কি ক্ষতি করলাম নিজের! ভার্মা এই চান্সকে কাজে লাগাবেই। পেছনে পড়ে আছে আমার! কাল ব্যাটাকে চমকে দেব।'

ছোট বলেই অমলের ওপর দায়িত্ব পড়ল মাঝে মাঝে মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা। এখন শতদল দত্ত চারুশীলার মাথার পাশে বসে আছেন। বারংবার ঢুকতে লজ্জা হল। অমল ইশারায় নার্সকে বাইরে ডাকল, 'যদি মাঝে মাঝে বাইরে এসে আমাকে বলে যান মা কেমন আছে, বুঝতেই পারছেন বাবা মাকে এখন একা পেতে চাইছেন—।'

হাসল মেয়েটি, 'ওঁদের মধ্যে খুব গভীর প্রেম ছিল, না?'

বাপ-মায়ের প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হল না অমলের, সে হাসল।

নার্স বলল, 'ঠিক আছে। আমি নিচে যাব, না আপনি ওপরে আসবেন?'

'আমিই আসব। এত পরিশ্রম করেও আপনি হাসেন কি করে বলুন তো?'

'আমার হাসি আপনার খারাপ লাগে?' চোখে জল এল।

'না, না। দারুণ!'

'আহা।' শরীর ঘুরিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

মিনিট পনের বাদে বন্দাবন ছুটে এল ওপর থেকে। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। তিন ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডাক্তারকে ফোন করে বৃন্দাবন বলল, 'মা কেমন করছে।'

ডাক্তার এলেন। রাত দশটা পর্যন্ত তিন ভাই প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করল। মাঝে-মাঝে সবাই ওপরে যাচ্ছে। আর তখন চারুশীলার গলা থেকে বের হওয়া যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পেল ওরা। চারুশীলা বলছেন, 'উঃ আঃ।'

এগারোটার সময় ডাক্তার নিচে নেমে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। আমার জীবনে এমন কেস কখনও দেখিনি।'

'কী অবস্থা?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার বললেন, 'নার্সিংহোমে ফোন করতে হবে।'

'নার্সিংহোমে? কী ব্যাপার?' কমল চমকে উঠল।

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ জীবনের লক্ষণ ফিরে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করা দরকার। এখনই।'

ডাক্তার ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনতে বললেন। অমল জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আজ রাত্রে কোনও সম্ভাবনা নেই?'

'কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় প্রদীপ নেবার আগে বেশি আলো দেয়। তবে মনে হচ্ছে এবার ফাইট করার সুযোগ পাওয়া যাবে। আসলে আপনার বাবার মনের জোরেই উনি বোধহয়—।'

অ্যাম্বুলেন্স এল। স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হল চারুশীলাকে। তিন ভাই এবং শতদল দত্ত সঙ্গে গেলেন। শতদল দত্তকে নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি শোনেননি। ভরতি হওয়ার পর শতদল অসুস্থ বোধ করলেন। নার্সকে বাড়িতেই রেখে আসা হয়েছিল। অত রাত্রে বেচারা কোথায় যাবে।

নার্সিংহোমে চারুশীলার পাশে থাকতে দেওয়া হবে না শতদলকে। তাঁর শরীর খারাপ লাগছিল। অতএব অমল তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল। আসার পথে শতদল বললেন, 'জীবনে কখনও প্রার্থনা করিনি হে। তোমার মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে করে যাচ্ছিলাম। আমি এখন নিশ্চিন্ত যে সে ফিরে আসবে!

অমল বলল, 'এ নিয়ে ভাববেন না।'

নার্সকে ঘুম থেকে তোলা হল। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে সে শতদলকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। অমল ফিরে এল নিজের ঘরে। দাদারা নার্সিংহোমে। বৃন্দাবন তার বাবুর ঘরে বিছানা করে মাটিতে শুয়েছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। অমল দেখল নার্স দুটো সন্দেশ আর জল নিয়ে তার ঘরে ঢুকছে, 'এগুলো খেয়ে নিন। আজ তো কিছুই পেটে পড়েনি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' হাসল অমল।

'আমার চাকরি গেল।'

'না, বাবাকে দেখাশোনা করবেন আপনি।'

'সত্যি? আপনি কি ভালো!'

অমলের অনেক কিছু ইচ্ছে হচ্ছিল। বিয়ের পর সে রত্না ছাড়া কোনও মেয়েকে কামনা করেনি। আজ সেই ইচ্ছেটা হল। নার্স বলল, 'আপনার মা ভালো হয়ে যাবেন। আমার মন বলছে ভালো হবেনই।'

'তবু আপনি ওঁদের দেখাশোনা করবেন।'

'কিন্তু আপনি তো এখানে থাকবেন না?'

'হুঁ, মাঝে-মাঝে আসব।'

'অদ্ভুত!' ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিথ্যে কথা কেন বলেন? আপনাদের স্ত্রীরা এখানে আসতেই দেবে না মাঝে-মাঝে!'

'একথা আপনাকে কে বলল?'

'আপনার মা। যখন প্রথম এলাম তখন বলেছিলেন।' নার্স ফিরে গেল। অমলের মনে হল সে যেন প্রচণ্ড এক চড় খেয়েছে।

ভোরবেলায় দুই ভাই ফিরে এল। চারুশীলার মধ্যে জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এখন শুধু লড়াই করার সময়। এই লড়াই ক'দিন ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। ডাক্তার বৃন্দাবনদা এবং নার্স আছে। অতএব ছুটি নিয়ে অনন্তকাল কেউ বসে থাকতে পারবে না।

তিনভাই একসঙ্গে শতদলের ঘরে গেল। তিনি তখন বিছানায় বসে। চুপচাপ চারুশীলার খবর শুনলেন। শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, লড়াই করার সুযোগ পেলে সে কখনও হারবে না। আমার জন্যেই তাকে ঘিরে আসতে হবে। দায়, তার, দায় আমার। তা তোমরা এখানে থেকে কী করবে?'

'আমরাও তাই ভাবছিলাম।' কমল বলল।

'ঠিকই ভেবেছ।'

'যদি মায়ের শরীর, মানে কিছু হয়, সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেবেন।'

'কেন?'

'আমরা চটপট চলে আসব।'

'না, না', মাথা নাড়লেন শতদল। 'হিন্দুদের শাস্ত্র আমি ভালো জানি না। তবে মাতৃদায় তো একবারেই মিটে যায়। তোমাদের মিটে গিয়েছে, এই এলে, এসে চুকিয়ে দিলে, দ্বিতীয়বারের কি প্রয়োজন?'



রক্তমাংসের স্বামী

বিয়ের তিন মাস বাদে এক সকালে চা খেতে-খেতে তিয়া বলল, 'শ্যাম, তোমাকে কিছু কথা বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

চায়ের সঙ্গে আনন্দবাজার পড়া ছয় পুরুষের অভ্যেস, তবু কথাগুলো কানে যাওয়ামাত্র চমকে উঠল শ্যাম। এত মোলায়েম গলায় আজকাল কোনও মেয়ে কথা বলে না। মোলায়েম গলায় স্ত্রীর কথা শুনতেন তার প্রপিতামহ। পুরাতত্ত্ব লাইব্রেরিতে ভিডিও টেপে সে ব্যাপারটা দেখে ও শুনে এসেছিল বিয়ের আগে। এখন যেন সেই গলা, নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তিয়া বলল, 'স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল। অ্যাটলিস্ট আমি যা বলি তা তুমি শোনো। স্ত্রী হিসেবেও আমি খারাপ নই। কাজের জন্যে তুমি আমাকে ওয়ান ভোল্টের রোবট কিনে দিতে চেয়েছিলে, আমি নিইনি।'

'আসলে দামি রোবট কিনতে পারিনি, বিয়ের আগেই তোমাকে বলেছিলাম। কম দামিটায় কিছু কাজ চালানো যেত, তুমি নিলে না।'

'টাকাটা জমিয়েছি। এরপর তো কিনতেই হবে পাঁচ ভোল্টের রোবট। এখন তো কোনও কাজ আটকে যাচ্ছে না, তুমি দারুণ কো-অপারেট করছ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, স্বামী হিসেবে তুমি চলেব্‌ল কিন্তু আমার সন্তানের বাবা হিসেবে তোমাকে মানতে পারছি না।' তিয়া চায়ের কাপ শেষ করল।

'কেন?' শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল শ্যামের।

'তোমার পেডিগ্রি দ্যাখো। তোমার বাবা সাধারণ লোক ছিলেন, তাঁর বাবা এমন কিছু করেননি যা তুমিও মনে রাখতে পারো। তাঁর বাবা শুনেছি অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তুমিই বলেছ। তাঁর বাবা নাকি এই আনন্দবাজারেই গল্প লিখতেন। অথচ এখনকার আনন্দবাজারে তাঁর নাম কখনই উল্লেখ করা হয় না। এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তোমার সন্তান কী হতে পারে? সাধারণ একটি মানুষ, তাই না?'

মাথা নাড়ল, 'হুঁ।'

'তোমার সন্তান কীরকম হলে তুমি খুশি হও?'

'খুব নামকরা একজন বিজ্ঞানবিদ্‌। দারুণ আবিষ্কার করবে।'

'ওই পেডিগ্রিতে কোনও চান্স নেই। আমিও একটি দারুণ সন্তানের মা হতে চাই। সারা জীবন গর্ব করতে পারব।' তিয়া উঠে এসে শ্যামের শরীরের সঙ্গে নিজের মাপা শরীর ঘনিষ্ঠ করে বলল, 'আমি তোমাকে খুব প্রাউড ফাদার করতে চাই। তোমার মন খারাপ শুরু হয়ে গেছে তো। বারো ঘণ্টা থাকবে, তারপর আবার এ নিয়ে আমরা কথা বলব। আজ ছুটির দিন, কোথাও বের হব না। এই বারো ঘণ্টা আমি তোমাকে চোখে-চোখে রাখব।' তিয়া শ্যামের মাথায় হাত বোলাল।

দেড়শো বছর আগেও পৃথিবীর মানুষের মন একবার খারাপ হলে কিছুতেই ভালো হতে চাইত না। আত্মহত্যা, যুদ্ধ, খুন—অনেক কিছু করে ফেলত সেই অসহায়। তখন মন ছিল স্যাঁতসেঁতে, শ্রাবণের রাস্তাঘাটের মতো, কাদা প্যাচপেচে।

কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌রা যেসব অসাধ্যকে সাধ্যে এনেছেন তার মধ্যে একটি হল মানুষের মন কখনই বারো ঘণ্টার বেশি খারাপ থাকছে না। জন্মাবার সময় আর ট্রিপল অ্যান্টিজেন পোলিও ভ্যাকসিন প্রয়োজন পড়ছে না। তার বদলে অন্য কয়েকটি ওষুধ দেওয়া হয়। ওরই একটার ফল হল বারো ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে মন একদম চৈত্রের দুপুরের মতো তপ্ত হয়ে যায়। গরম হৃদয় যাকে বলে। বিজ্ঞানবিদ্‌রা চেষ্টা করছেন যাতে সময়টা আরও কমানো যায়। বারো ঘণ্টার মন খারাপে কিছুদিন আগে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগব-লাগব হচ্ছিল। সময়টা কেটে যেতেই শান্তি এসেছে।

সেইদিন রাত এগারোটার সময় শ্যাম টিভি দেখছিল। এখন কলকাতায় বসে সাতানব্বুইটা চ্যানেল ধরা যায়! আইরিশ ফোক সঙ শুনছিল সে। নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির গান। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা তিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তিয়া, তুমি কবে মা হতে চাও?'

'ফাইভ ভোল্টের রোবটটা কিনতে পারলেই।'

'সেটা তো আমরা ইনস্টলমেন্টেও কিনতে পারি।'

'এখন পারি। টাকাটা আমি মাসে-মাসে দিতে পারব। গত মাসেই তো দুজনের ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। খুব ভালো বলেছ।'

শ্যাম খুশি হল। তিয়া প্রশংসা করলে তার খুব ভালো লাগে।

তিয়া একটু ভেবে বলল, 'আমায় বয়স এখন আঠাশ। আর তিরিশ বছর আমার যৌবন থাকবে। তার মধ্যেই ওকে বিখ্যাত হতে হবে।'

শ্যাম টিভির চ্যানেল পালটাল। কোপেনহেগেন। স্পষ্ট ভাসছে। ডেনিশ ভাষায় কোনও আলোচনা সভা চলছে। হঠাৎ ইংরেজিতে সাব টাইটেল ফুটল। 'খুব জরুরি ঘোষণা করা হচ্ছে। আজ কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌ সম্মেলনে আমেরিকার বিজ্ঞানবিদ্‌ যোশেফ পয়টার একটি আলোড়ন তোলা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানবিদ্‌রা তা মেনে নিয়েছেন।'

তিয়ার নজর টিভির ওপর পড়েছিল। সে বিছানা থেকে নেমে শ্যামের পাশে এসে বসল। একজন কালো আমেরিকান এবার ক্যামেরায়। তিনিই যোশেফ পয়টার। ছিপছিপে, পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। যোশেফ ইংরেজিতে বললেন, 'আমি এই পৃথিবীর মা এবং বোনদের জন্যে একটা চমৎকার খবর পরিবেশন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সন্তান জন্মাবার আগে মাতৃগর্ভে দশমাস সময় কাটাতে বাধ্য হত। আর এই সময়টা হবু মায়েরা অত্যন্ত কষ্টে কাটাতেন। শেষের কয়েক মাস তাঁদের প্রায় জড়ভরত হয়ে থাকতে হত। গত দশ বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছিলাম এই সময়টাকে কমানোর জন্যে। আমার বিশ্বাস হয়েছিল ভ্রূণ থেকে পূর্ণ মানুষ করতে প্রকৃতি বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। আমি শেষ পর্যন্ত এই সময়টাকে কমিয়ে তিনমাসে আনতে সক্ষম হয়েছি। এখন থেকে আর কোনও মাকে বাড়তি সাত মাস কষ্ট করতে হবে না। এর ফলে মায়েদের কাজের ক্ষমতা এবং অন্যান্য সৃজনশীলতা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে বিশ্বাস।'

যোশেফকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁর স্ত্রী কী করেন? তিনি বললেন, 'মার্থা বিজ্ঞানচর্চা করে। তার বিষয় রোবট।' পরদায় এবার তিন মাসে মা হওয়া এক আমেরিকান যুবতী এবং তার সন্তানকে দেখানো হল।

খবরটা শেষ হওয়ামাত্র উল্লাসে চিৎকার করে তিয়া লাফ দিল। তারপর শ্যামকে জড়িয়ে ধরে তিনপাকে নেচে নিল, 'উঃ, কি ভালো, কি ভালো।'

শ্যাম গদগদ গলায় বলল, 'তুমি সাত মাস গেইন করছ।'

'গ্রান্ড।' তিয়া শ্যামকে আদর করল, 'সাত মাসে বাচ্চাটাকে আরও অভিজ্ঞ করা যাবে। ওর জীবন সাত মাস বেড়ে গেল।'

এই সময় টেলিফোন বাজতেই শ্যাম সেটা ধরে বলল, 'তোমার মা।'

কর্ডলেস রিসিভার তুলে তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'শুনেছ?'

'শুনছি। কি হবে রে!'

'কি আর হবে। বাঁচা গেল। তোমার কষ্টটা আমাকে ভোগ করতে হবে না।'

'দূর। তাড়াহুড়ো করে তিন মাসে নিয়ে এল, হাত-পা না হয় ডেভলপ্ করাল কিন্তু ব্রেন? ওইটে তো আসল। পরে ক্যাবলা হয়ে রইল। তুই বরং একটু অপেক্ষা কর। ধর, বছরতিনেক। বাচ্চাগুলো জন্মাক, কি হয় দ্যাখ, তারপর বুঝে-সুঝে সিদ্ধান্ত নিস। বুঝলি?'

'মা, তুমি এখনও প্রাগৈতিহাসিক রয়ে গেলে।'

'শ্যামু কী বলছে?' মায়ের গলা পালটে গেল।

'ওর মন খারাপ ছিল বারো ঘণ্টা। এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

কলকাতা শহরে এখন আটটা স্পার্ম ব্যাঙ্ক আছে। ওরা পরদিন বিকেলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে গেল। সুবিধে হল, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কম্প্যুটারে অন্যান্য ব্যাঙ্কের স্টকের বিবরণ দিয়ে দেয়। সাধারণত তিন মাসের বেশি ব্যাঙ্ক ওগুলো প্রিজার্ভ করে না। কি ধরনের মানুষ, তাদের জীবন এবং কাজ কীরকম ছিল তা পরদায় দেখানো হচ্ছে। আরও কয়েকজন মহিলা রয়েছেন সেখানে। এই শহরে সবচেয়ে বড় যিনি বিজ্ঞানবিদ্ তিনি দৃষ্টিশক্তি খারাপ হলে চশমা অথবা কন্ট্যাক্ট লেন্স ছাড়াই শুধু একটি প্রত্যহসেব্য ট্যাবলেটের মাধ্যমে দৈনিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। এঁকে পছন্দ হল না তিয়ার। তারপরে যার ছবি ফুটে উঠল তাকে দেখেই এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি একেই চাই।'

সেলসম্যান আঁতকে উঠল, 'কী বলছেন ম্যাডাম? এই লোকটা খুনি!'

'আপনারা রেখেছেন কেন?'

'স্রেফ মজা করার জন্যে। গতমাসে ওর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

'জানি। কিন্তু আমি ওরটাই চাই।' মহিলা শক্ত গলায় বললেন।

'কিন্তু ম্যাডাম আপনার সন্তান খুনি হতে পারে!'

'আমি তো তাই চাইছি।' মহিলা হাসলেন।

তিয়া আর শ্যাম বেরিয়ে এল বিরক্ত হয়ে। পর পর তিনদিন ওরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল, যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনও আশাও পাওয়া গেল না, যা তিয়াকে উজ্জীবিত করতে পারে। সে রেগে-মেগে বলল, 'যাচ্ছেতাই শহর এই কলকাতা।'

মাথা নাড়ল শ্যাম, ঠিক বলেছ। প্রতিভাবান মানুষের বড় অভাব।'

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখল তিয়া। ঘুম ভাঙামাত্র সে সরকারি মনোবিজ্ঞান দপ্তরে টেলিফোন করল। আধঘণ্টার মধ্যে কর্মীরা এসে গেলেন। তিয়াকে ওদের বাড়িরই একটা সাদা দেওয়ালওয়ালা ঘরে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হল। তার আগে সম্মোহন শক্তি ইলেকট্রিক চার্জারের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে চৈতন্য স্তিমিত এবং মানসিক অবস্থা রি-উইন্ড করা শুরু হল। বিজ্ঞানীরা এইটুকুই করতে পেরেছেন। স্বপ্ন দেখার সময় কিছু করা সম্ভব হয়নি, তার চার ঘণ্টার মধ্যে সেই দেখা অংশটিকে মনের মধ্যে থেকে তুলে এনে দ্বিতীয়বার দেখার কায়দা এখন করায়ত্ত। ফলে ঘুমন্ত অবস্থার স্বপ্ন জেগে উঠেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। অতএব সামনের সাদা দেওয়ালে স্বপ্নের ছবি পড়ল। একটা সুন্দর মেঘের গা ঘেঁষে একদল বক উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের কেউ ডিম পাড়ল। ডিম মাটির দিকে দ্রুত পতিত হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটি ফেটে গেল। এবং তার শাবক শূন্যে ডিগবাজি খেয়েই পাখা নাড়তে-নাড়তে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করল। এই হল স্বপ্ন।

স্বপ্নটা ভিডিও রেকর্ডারে ধরে তিয়াকে সম্পূর্ণ চৈতন্যে ফিরিয়ে এনে দেখানো হল। এবার ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তিয়া মা হতে চাইছে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে খুব অল্প সময়ে মা হতে চায় সে। এবং তার সন্তান অত্যন্ত দ্রুত গতিময় হোক এই বাসনা।

ব্যাখ্যা শুনে তিয়া খুব খুশি হল। একা হওয়ামাত্র সে শ্যামকে বলল, 'অ্যাই শোনো, তুমি যোশেফকে ফোন করে একটা অ্যাপায়েন্টমেন্ট চাও।'

'কোন যোশেফ?' বুঝতে অসুবিধে হল শ্যামের।

'আঃ, তোমার মাথা এত ভাল হয়ে যাচ্ছে! এখন আমি যোশেফ পয়টার ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারি? ভদ্রলোকের গায়ের রং ব্রাউন হলেও কি ছিপছিপে শরীর। আর মেধা? ভাবতেই পারা যায় না।' তিয়া চোখ বুজল।

দুদিন বাদে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেল। এখন কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছতে মাত্র আট ঘণ্টা সময় লাগে। উনি অবশ্য থাকেন মায়ামির কাছে। ওরা সেখানে পৌঁছে সোজা বিচে চলে এল।

কয়েকশো নারী-পুরুষ প্রায় জন্মদিনের পোশাকে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ শরীর দিয়ে শুষে নিচ্ছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়েই তিয়া ঠোঁট ওলটাল, 'বিজ্ঞান এত উন্নতি করছে অথচ মানুষের মনে প্রিমিটিভ নেচার রয়েই গেল।'

'প্রিমিটিভ?' শ্যাম জানতে চাইল।

'নয়তো কী? জন্তু-জানোয়ারের মতো শুয়ে থাকা। ড্যাবডেবিয়ে দেখো না হাঁদারাম। পিত্তি জ্বলে যায়।'

শ্যাম বালিতে চোখ রাখল। রেগে গেলে তিয়া টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির কিছু নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করে। এগুলো ও পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে। একটা সংস্কৃতির মতো যুগ-যুগ ধরে এইভাবে বেঁচে আছে।

যোশেফ পয়টারের নাম এখন মুখে-মুখে। ওরা জানতে পারল বিয়ের আগে নাকি যোশেফের স্ত্রী মার্থা বেশি সম্ভাবনাময় ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্ হিসেবে। যোশেফকে সাহায্য করার জন্যে নাকি তিনি নিজেকে পরদার আড়ালে রেখেছেন। তিয়া শ্যামকে বলল, 'শুনে রাখ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘেরা জায়গায় যোশেফ পয়টারের বাড়ি। মূল দরজার বেল বাজাতে লাগল শ্যাম। মিনিট তিনেকেও কারও সাড়া নেই। হঠাৎ ওপরের ঘরের জানলা খুলে এক ভদ্রমহিলা, তাঁর কালো মুখে বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'কাকে চাই?'

শ্যাম মিনমিন করল, 'মিস্টার পয়টার।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মহিলা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কানের মাথা খেয়েছে। বন্ধ ঘর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি আর উনি বাগানে বসে শুনতে পাচ্ছেন না। বাঁ-দিকের দরজাটা ঠেলে ভেতরে চলে যান।' দড়াম করে জানলা বন্ধ হল।

খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কিছুটা হাঁটতেই দেখতে পেল একজন মধ্যবয়স্ক ছিপছিপে মানুষ খুরপি দিয়ে বালি খুঁড়ছেন। ওদের দেখতে পেয়ে উঠে এলেন তিনি। তিয়া চাপা গলায় বলল, 'দারুণ।'

আলাপ হওয়ার পর তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মতো এত বড় একজন মানুষ এসব ঘরোয়া কাজ করছেন?'

যোশেফ হাসলেন, 'আর বলবেন না। তিন-তিনটে রোবটকে আমার স্ত্রীর জ্বালায় সরিয়ে দিতে হয়েছিল। এখন বাড়িতে কাজের রোবট নেই।'

'কেন? উনি কি রোবট পছন্দ করেন না?' তিয়া অবাক।

'বরং উলটো। তিনি বড্ড বেশি পছন্দ করেন। তবে তাদের কাজ করতে দেননি। তিনি তাদের বুকে হৃদয় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন।'

'বাঃ।' উৎফুল্ল হল শ্যাম।

'আপনি বাঃ বললেন?' বিরক্ত হলেন যোশেফ, 'রোবটেরা যদি মন পায় তাহলে কি আর আমাদের কথা শুনবে? নিজেদের নির্যাতিত ভাববে। আর তারপরেই ইউনিয়ন, বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার আমদানি করবে। আমি তাই এ-বাড়িতে রোবট ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছি। যন্ত্র যন্ত্র আর মানুষ মানুষই।'

তিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলেমেয়ে?'

'নাঃ, নেই। আমার শারীরিক কিছু বিচ্যুতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যোশেফ যেন এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী তো মা হতে পারেন।' শ্যামকে খুব উজ্জীবিত দেখাল।

মাথা নাড়লেন যোশেফ, 'পাচ্ছি না। খুব দুঃখের ব্যাপার কিন্তু ঘটনাটা তাই। আমরা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের সন্তান খুব সহজ সরল সাধারণ হবে। সে তার নিজের মতো বড় হবে। আমাদের জটিলতা রক্তে নিয়ে সে পৃথিবীতে আসবে না। ব্যাঙ্কে গেলে আপনি জটিল মানুষের স্পার্ম পাবেন। তাঁরা আর যাই হোন সরল হবেন না। গত বছর আফ্রিকায় গিয়েও আমরা সহজ মানুষ খুঁজে পাইনি। একটাও মানুষ পেলাম না যে জটিলতার বাইরে আছে। খুব স্যাড ব্যাপার।'

'আপনি সহজ সরল খুঁজছেন কেন?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল তিয়া।

'দেখুন, এখন মাতৃগর্ভে থাকার সময় তিন মাস। ফলে জন্মানোর পরেই ওরা বেশি সময় পাবে নিজেকে গড়ার। সহজ সরল মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে পথ খুঁজে নেবে। আমার বা কোনও ডাক্তারের সন্তান একটি বিশেষ খাতে চলবে। যাক, আমার কাছে আপনাদের আসার কারণ জানতে পারি?'

এবার শ্যাম বলল, 'ওঁর সাধ ছিল খুব বড় বিজ্ঞানবিদ্-এর সাহায্যে মা হতে।'

এই সময় ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল। নারীকণ্ঠের।

আতঙ্কিত যোশেফ দৌড়লেন। পেছন-পেছন ওরা। দেখা গেল মিসেস পয়টার লাফাতে-লাফাতে একটি বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছেন। স্বামীকে দেখামাত্র তিনি চেঁচিয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি পেরেছি, পেরেছি।'

'কী পেরেছ?'

'রোবট।'

'মানে? তুমি রোবট নিয়ে এসেছ?' খেপে গেলেন যোশেফ।

'হ্যাঁ! তুমি যখন বাইরে গিয়েছিলে।'

'তুমি, তুমি আমার অনুরোধ রাখলে না মার্থা?'

'তুমি যে পরীক্ষায় আপত্তি করেছ তা কি আমি করতে পারি?'

'ও।' যোশেফ হাসতে চেষ্টা করেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ! কিন্তু—।'

'আমি ওকে পুরুষ করেছি। ও একটা মানুষের মতো, সেই প্রিমিটিভ মানুষের মতো, সরল বাচ্চার বাবা হতে পারবে।' মিসেস পয়টার বলামাত্র যোশেফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ছুটলেন টেলিফোনে খবর দিতে। মানুষের সৃষ্ট রোবট সরল মানুষের জন্ম দিতে পারবে। বিরাট আবিষ্কার।

তিয়া শ্যামের হাত ধরে টানল, 'অ্যাই, চলো।'

'যাবে? মানে—।' শ্যাম অবাক।

'ডাকছি, চলো।' গম্ভীর মুখে বলল তিয়া।

'কিন্তু রোবটটাকে দেখবে না?'

'রক্তমাংসের থাকতে আমি যন্ত্রের দিকে হাত বাড়াব কেন? এসো।' তিয়ার পেছন-পেছন হাঁটতে লাগল শ্যাম।



হৃদয়ঙ্গম

বিছানায় শুয়েই সূর্য টের পেল বউদি দাদাকে তাতাচ্ছে। ওপাশের বারান্দায় খাওয়ার টেবিল। দাদা ব্রেকফাস্ট খায় টেবিলে বসে। এইসময় বউদি একপ্রস্থ চুকলি কাটবেই। দাদাটা সচরাচর কিছু বলে না। ওই এক অদ্ভুত লোক। অত চুকলি কী করে হজম করে কে জানে। চুকলির নমুনাগুলো মজার। কাল রাত্রে বারোটা পর্যন্ত সূর্য আলো জ্বেলে রেখেছিল। বাপের বাড়ির একটা খবর নিতে বলেছিল বউদি কিন্তু সূর্য যায়নি। 'সকালে গ্যাস ধরাতে পারিনি কালীর মা না আসা পর্যন্ত। রান্নাঘরে দেশলাই রেখেছিল কালকেও, সকালে দেখি নেই। কালীর মাকে দোকানে পাঠিয়ে আনতে হল। তুমি এত রোজগার করো, এক-আধটা সিগারেটও তো খেতে পারো, তাহলে আমার দেশলাই-এর কষ্ট হত না।'

মা মারা গেছেন অনেকদিন। বাবা বছর দুয়েক। বাড়িটা পৈতৃক। হ্যাঁ একথা ঠিক, সূর্য চাকরিবাকরি করে না। কিন্তু প্রতি মাসে একশোটি টাকা খাই-খরচা দেয়। দাদা বলেছিল দরকার নেই কিন্তু তবু সে দেয়। দিলে বেশ ভালো লাগে। খাওয়াটা নিজের খাবার বলে মনে হয়।

দাদা খেয়ে-দেয়ে ভেতরে চলে গেলে সূর্য উঠল। শনি-রবিবার দাদার ছুটি। এই দুটো দিন খুব বিশ্রী কাটে সূর্যর! দাদার সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য প্রায় বারো। কিন্তু চিরকালই দূরত্ব অনেক। মুখ ধুয়ে আসার মুখে সে কালীর মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপ আর দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট নিল। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল।

পেছনের পাতাটা খুলেই চোখ কুঁচকে উঠল তার। বিহারের বিরুদ্ধে বাংলার অধীপ ব্যানার্জী সেঞ্চুরি করেছে। অধীপের ছবিও ছেপেছে কাগজে। এই অধীপের সঙ্গে তার কখনও আলাপ নেই। তবু খুব খারাপ লাগছিল সূর্যর। ছবি এবং খবর বলছে অধীপ তারই বয়সি। একেবারে সেঞ্চুরি করে ফেলল? নিরানব্বুইতে আউট হতে তো পারত। ধরা যাক ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ান ডে হচ্ছে। এর আগে তিন-তিনটে ওয়ান ডে-তে ইন্ডিয়া হেরেছে। ইডেনে ম্যাচ। আগের বিকেলে সে সোজা বাপু নাদকার্নির সঙ্গে দেখা করল, 'একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে বলছি এভাবে ভারতকে বেইজ্জত করার কোনও রাইট আপনার নেই।'

সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান নাদকার্নি হতাশ গলায় বললেন, 'কি করব ভাই। টিমে একটা ভালো বোলার নেই, একটা ব্যাটসম্যান নেই যার ওপর নির্ভর করতে পারি। এই নিয়ে লড়তে হচ্ছে।'

'সূর্য বলল, 'নেই মানে? আপনি টিমকে জেতাতে চাইলে আমি খেলতে রাজি।'

বাপু অবাক, 'আপনি খেলেন?'

সূর্য হাসল, 'কাজে দেখাব। কথা দিচ্ছি টিম জিতবেই।'

বাপু আগ্রহী হন, 'আপনি কি রঞ্জিতে খেলেছেন?'

'না। রঞ্জি, ক্লাব কোনও কিছুতেই খেলিনি আমি। ফালতু খেলাখেলি করে সময় নষ্ট করার লোক আমি নই। ইন্ডিয়া বিপন্ন তাই এগিয়ে এসেছি। আপনার মুখ বাঁচাতে চান তো আমাকে নিন।'

পরের দিন কাগজে খুব লেখালেখি হল। ইন্ডিয়া টিমে সূর্য মিত্র নামে যাকে ঢোকানো হয়েছে

তার ইতিহাস কী। সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। পাড়ার 'মালতি লন্ড্রি' থেকে একজোড়া সাদা শার্ট-প্যান্ট ধার নিয়ে সে যখন সাড়ে আটটায় মাঠে পৌঁছল তখন বাপু দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমার মুখ রাখবেন। আপনি যদি ডুবিয়ে দেন তো সবাই আমাকে ছিঁড়ে খাবে।'

বেঙ্গসরকার টসে জিতে ব্যাটিং নিল। দলের কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি শুনলাম ফাস্ট বোলিং করেন। আট নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন।'

প্রায় এক লক্ষ লোক দেখল ভারতীয় ব্যাটসম্যান ক্রিজে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। সাত উইকেটে পঁয়ত্রিশ, ওভার তখন উনিশ। সূর্য প্যাড পরতে লাগল। ফিতেগুলো বাঁধতে সে একটু হিমশিম খেল। শিরস্ত্রাণ মাথায় তুলে অস্বস্তি বেড়ে যাওয়ায় সেটাকে রেখে দিয়ে ব্যাট হাতে মাঠের দিকে এগোতে লাগল। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সবার কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল দেরি দেখে। সূর্যকে দেখামাত্র হাততালির ঝড় উঠল। এই প্রথম কোনও বাঙালি খেলোয়াড় ওয়ানডে খেলতে নামছে ইডেনে। হঠাৎ হাঁটুদুটো কেঁপে উঠল। প্যাটারসনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কলজেটা নড়ে উঠল। উইকেটের ও-প্রান্তে টিকে আছে অমরনাথ। এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল, 'আমাকে ফেস করতে দিয়ো, তুমি চেষ্টা করো অ্যাভয়েড করতে।'

কথাটা খুব মনে ধরল সূর্যর। কিন্তু শেষ বলটা তো তাকেই ফেস করতে হবে। ইডেন এখন স্তব্ধ। হাঁটুর কাঁপুনি এখন সমস্ত শরীরে। দৈত্যের মতো তেড়ে আসছে প্যাটারসন। বলটাকে বুঝতে পারার আগেই হাততালি উঠল। উইকেটকিপারের হাতে বল। ফিল্ডিং চেঞ্জ হচ্ছে। সে নড়েনি। ব্যাট চালায়নি। অথচ বল হয়ে গেল। পাবলিক কী বুঝল কে জানে। পরের ওভার করল গার্নার। অমরনাথ কোনওমতে ঠেকিয়ে গেল। রান হল না। সূর্য হাসল, এই যদি ফেস করার নমুনা হয় তো সেই নিজেই ওটা করতে পারে। সোজা ব্যাট নিয়ে ঝুঁকে পড়ল সূর্য। প্যাটারসনের বলটা গুড লেংথে পড়ছে। দ্রুত এগিয়ে সে মরীয়া হয়ে ব্যাট চালাল। চিৎকারে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। আম্পায়ার মাথার ওপরে হাত তুলেছেন। ছয়। প্যাটারসন রাগি মুখে দ্বিতীয়বার তেড়ে এল। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল পড়ে আরও বেরিয়ে যাচ্ছিল। সূর্য ঘুরে গিয়ে ব্যাট চালাল। ছয়। পরপর পাঁচটা ছয় মারার পর ফিল্ডাররা চলে গেল বাউন্ডারি লাইনে। ষষ্ঠ বলটা ব্যাট তুলে পায়ের কাছে ফেলে রান নেওয়ার জন্যে ছুটল সে। অমরনাথ ভাবেনি এতে রান হয়। সাত উইকেটে ছেষট্টি, সূর্যর একত্রিশ। এবার গার্নার। পরপর পাঁচ বলে তিরিশ। শেষ বলে এক। দু-ওভার ব্যাট করে সূর্যর রান বাষট্টি, বাইশ ওভারে ইন্ডিয়ার রান সাতানব্বুই। অ্যাভারেজ তখন প্রায় সাড়ে চার। পঞ্চাশ ওভার পর ভারত ফিরে এল সাত উইকেটে ন'শো চল্লিশ। সূর্য নট আউট ন'শো। পৃথিবীর সব কালের রেকর্ড। গ্যালারি থেকে সোবার্স নেমে এসে করমর্দন করলেন। মাঠ তখন পাগল। বাপু নাদকার্নি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসল সূর্য। বলে দিল খেলা শেষ হওয়ার আগে সে কাউকে অটোগ্রাফ দিতে পারবে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট করতে নেমে রানের তুফান তুলল। কপিল আর শর্মার বল মেরে ছাতু। তিন ওভারে ষাট রান। এগিয়ে গেল সূর্য বেঙ্গসরকারের কাছে। একটু অনিচ্ছায় বল তার হাতে তুলে দিল ক্যাপ্টেন। গ্রিনিজ উইকেটে। দূর থেকে ছুটে এসে আঙুল টেনে দিল সূর্য। বলটা গুড লেংথে পড়ে মাটি আঁকড়ে ধরে গ্রিনিজের পাশ কাটিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে উইকেট উড়িয়ে দিল। যে চিৎকার উঠল ইডেনে তা বর্ধমান থেকেও শোনা গিয়েছিল। এক ওভারে ছ'টা উইকেট। ডাবল হ্যাট্রিক। পরের ওভারে হেনেস কপিলের বলে একটা রান নিল। সূর্যর দ্বিতীয় ওভারের প্রথম খদ্দের সে। দশটা বল করতে হল সূর্যকে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তো সে-ই। কিন্তু পুরস্কার নিতে আসতে তাকে দেখা গেল না। বদলে এক অফিসার একটি চিরকুট এগিয়ে দিলেন বাপু নাদকার্নির দিকে। তাতে লেখা আছে, "ইন্ডিয়া জিততে পারে দেখিয়ে দিলাম। পুরস্কার-টুরস্কার নিতে আমার ভালো লাগে না। খেলাখেলি নিয়ে সময় কাটাতেও না। অতএব আমি চললাম। আমাকে আর খেলতে ডাকবেন না। দোহাই। সূর্য মিত্র।"

*

চোখ খুলল সূর্য। তৃপ্ত মুখে খবরের কাগজ সরিয়ে ঠান্ডা হয়ে আসা চায়ের কাপে চুমুক মারল। যেন এইমাত্র একটা স্বপ্নের ইনিংস খেলে এল সে। এরকমটা হতে পারত যদি স্কুলে ক্রিকেট খেলার রেওয়াজ থাকত। হয়নি তাই বলে হতে পারবে না এ কেমন কথা! সূর্য নিশ্বাস ফেলল। ভাবতে যা এত ভালো লাগে তা জীবনে হয় না কেন? সে কখনও ক্রিকেটের ব্যাট হাতে নেয়নি, যেখানে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে থাকলে কথা বলতে ঠিক সাহস পায় না, কিন্তু একা থাকলে এইরকম ছবি স্বচ্ছন্দে এঁকে ফেলতে পারে।

সূর্য মাঝে-মাঝে খুব অসহায় হয়ে যায়। তার কোনও বন্ধু নেই। স্কুল কলেজে দু-তিনজনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু কারও সঙ্গে মন খুলে বন্ধুত্ব করা তাঁর কিছুতেই হয়ে ওঠে না। এখন সুব্রতর সঙ্গে তার সংযোগ আছে। 'দেশ' পত্রিকায় সুব্রতর গল্প ছাপা হয়, একটা স্কুলে পড়ায়। এর মধ্যে অন্তত তিনটে প্রেম করেছে সুব্রত। ওর সঙ্গে দেখা করতে কলেজ স্ট্রিটের চায়ের দোকানে সে যায়। কিন্তু দু'সপ্তাহ আগে সুব্রত যখন বলল, 'দ্যাখ সূর্য, তোকে একটা কথা বলি, তোর এই কমপ্লেক্স তাড়া। সবসময় ভাবছিস পৃথিবীর সবাই তোকে ইগনোর করছে আর তাই কারও সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছিস না। যা ভাবিস তা কাউকে বলতে পারিস না। তুই মরে যাবি শালা!'

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সূর্য। তারপর আর যায়নি কলেজ স্ট্রিটে। সুব্রতটা আজকাল নিজেকে কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছে। সে নিজে যদি গল্প লিখতে শুরু করে! সূর্য একটা ছবি এঁকে নিল। উপন্যাসের ম্যানাসক্রিপ্ট-এর বিষয় সে সুব্রতকে বলেছিল। সুব্রত আনন্দবাজারে গিয়ে তাই নিয়ে গল্প করেছিল। সম্পাদক সেটা শুনেই এত উত্তেজিত যে সূর্যর বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে ম্যানাসক্রিপ্ট দিয়েছিল সূর্য। সেটা পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরোতেই পাঠকমহলে হইচই পড়ে গেল। তাকে সবাই বাংলা সাহিত্যের আলেকজান্ডার বলতে লাগল। এইসময় পেঙ্গুইন থেকে টেলিফোন, 'আপনার উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বের করতে চাই।' সেটাও বেরুল সাগরপার থেকে। সঙ্গে আমেরিকা ইংলন্ডের সমস্ত কাগজের বেস্ট সেলার লিস্টের এক নম্বরে তার নাম। এক বছরে তার রয়ালটি হল পাঁচ লক্ষ পাউন্ড। তারপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকাশক এ বাড়ির দরজায়। সে সবাইকে বলে দিচ্ছে, লেখালেখি আর ভালো লাগে না, সে লিখবে না।

পোশাক পালটে তৈরি হয়ে নিল সূর্য। তিরিশ মিনিটের মধ্যে ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছোতে হবে। আজ অবধি কখনও সে দেরি করে ওখানে যায়নি। পকেটে এখনও সাত টাকা তিরিশ পয়সা পড়ে রয়েছে। মাইনে পেতে দিন দশেক দেরি। চাকরি-বাকরি যতক্ষণ জুটছে না ততক্ষণ টিউশনি দুটোই ভরসা। সকালেরটা হেঁটেই যাওয়া যায়, বিকেলেরটা বেলেঘাটায়। জামার কলারটা ফাটব-ফাটব হয়ে এসেছে। সেলাই করে দেওয়ার লোক এ বাড়িতে নেই। ভালো জামাপ্যান্ট এখন একটাতে ঠেকেছে। সাতটা চাকরির দরখাস্ত এখনও ঝুলছে। আশা-টাশা করা সে ছেড়ে দিয়েছে।

দরজায় শেকল তুলে বারান্দায় পা দিতেই বউদিকে দেখতে পেল। আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে ভদ্রমহিলা এমন উদাস ভঙ্গিতে চলে গেলেন যে সূর্যর পিত্তি জ্বলে উঠল। সুন্দরী বলে খুব অহঙ্কার আছে ওই মহিলার। দশ বছর বিয়ে হয়েছে, স্বাস্থ্য এখন মোটার দিকে তবু হাঁটাচলা দেখলে কচি খুকি বলে মনে হয়। প্রথমদিকে খুব ভাব ছিল সূর্যর সঙ্গে। কিন্তু যেই সূর্য বুঝল তার পয়সায় সিনেমা দেখা রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার মতো সুখ বউদি আর কিছুতেই পায় না তখন থেকেই নির্লিপ্ত হয়েছিল। এবং তারপর থেকেই বউদি তাকে দেখতে পারে না। সুব্রতর একটা কথা মনে পড়ল তার, 'তোকে তোর বউদি নিশ্চয়ই অমল ভাবত, তুই তো একটা গাধা তাই চান্স নিতে পারলি না।'

চান্স নিতে বয়ে গেছে তার। সে কি ইচ্ছে করলে প্রচুর মেয়েবন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত না? এই তো ওপাশে মিত্তিররা থাকে। তাদের ছোটমেয়ে এমনভাবে তাকাত যে সে ডাকলেই দেখা

করত। সে ডাকেনি বলেই তো মেয়েটা মাসতুতো ভাই-এর বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে ফেলল। অবশ্য এটা ঠিক, মানে ওপর থেকে দেখলে লোকে ভাববে যে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার জিভ শুকিয়ে আসে। ঠিক বউদি ছাড়া কোনও কিশোরী বা যুবতী কখনও তার সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা বলেনি। এই নিয়ে সুব্রত তার পেছনে লাগে। বলে, 'তুই শালা একটা মরুভূমি।' জবাবটা দেয়নি সে। সুব্রতর মতো জামা পালটানো প্রেম করার রুচি তার নেই, এটা অবশ্য বলবে ভেবেছিল তখন। তিনদিন পরে একটু নরম করে কথাটা জানাতে সুব্রত মাথা নেড়েছিল, 'নাচতে জানিস না তাই উঠোনটাকে বাঁকা বলছিস। আসলে তোর ভেতরে এত কমপ্লেক্স যে কোনও মেয়ে কাছে ভিড়বে না।'

এই কমপ্লেক্স শব্দটাকে ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সূর্য। হ্যাঁ এটা ঠিক, আর পাঁচটা ছেলের মতো সে ঝটপট কিছু করতে পারে না। কিন্তু ভাবতে তো পারে। কাল রাত্রেও বাড়ির সামনে টাঙানো সিনেমার বিরাট হোর্ডিং থেকে নায়িকা নেমে এসে তাকে বলেছিল, 'আপনি এত একা কেন?'

সে গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল, 'আমি একা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার সঙ্গী।'

নায়িকা বলেছিল, 'আমি আপনার পাশে বসব?'

সে জবাব দিয়েছিল, 'এখানে, মানে আমার এই ঘর কি আপনার উপযুক্ত?'

নায়িকা চুলে হাত দিয়ে ঘাড় কাত করে হেসেছিল, 'যেখানে আপনি থাকবেন সেটাই আমার জায়গা।'

সে বলেছিল, 'কিন্তু দু-দিন পরেই তো আপনি চলে যাবেন। ওরা হোর্ডিং খুলে ফেলবে ছবিটা উঠে গেলেই। তখন? দোহাই, আমাকে স্বপ্ন দেখাবেন না।'

নায়িকা এগিয়ে এসেছিল কাছে, 'না গো, এর পরের ছবি, যার হোর্ডিং ওখানে লাগবে, তার নায়িকাও আমি। আমার হাতে এখন অনেক ছবি। তোমার জীবনে হোর্ডিং-ছাড়া হব না আমি।' তারপরেই বিহুল চোখে নায়িকা তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বলো তো প্রেমের সার্থকতা কীসে?'

সে জবাব দিয়েছে, 'দানে। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ায়। পাওয়ার আশা না করে।'

দু-আঙুলে তার থুতনি ছুঁয়ে নায়িকা বলল, 'তাই করো গো। দান করো উজাড় হয়ে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পাশ দেখে নিল সূর্য। ওপাশের রকে কয়েকটি মস্তান আড্ডা মারছে। ওরা ওকে দেখতে পেলেই ইদানীং টিপ্পনী কাটে। যেহেতু এ পাড়ায় তার কোনও বন্ধু নেই তাই পেছনে লাগতে ওরা সাহস পায়। দূর থেকেই আওয়াজটা কানে এল, 'এসো খুকু, এসো।' কান লাল হয়ে গেল সূর্যর। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ছেলেগুলোর দিকে। ওরা কিছু বলার আগেই সে অমিতাভ বচ্চনদের ওপর শরীর চালাল। সে যেন ব্রুসলি হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু-মিনিটের মধ্যে প্রতিটি ছেলে হাঁটু মুড়ে বসে হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'গুরু ছেড়ে দাও, আর কখনও তোমার পেছনে লাগব না।'

হঠাৎ সূর্যর মনে হল জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে সে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক চিৎকার করে ওদের গালাগালি দিচ্ছেন। বৃদ্ধর সঙ্গে যে কিশোরীটি আসছিল তার উদ্দেশেই কি কথাটা ছুড়েছিল ওরা? তাকে কি ওরা আজ ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেনি? কিন্তু যদি কোনওদিন ওরা কিছু বলে, তাহলে একদিন-না-একদিন সে সত্যি ব্রুসলি হয়ে যাবে। ঘড়ি দেখল সূর্য। একটু দেরি হয়ে গেছে। ছাত্রের পিসি কথা শোনাতে ছাড়বে না। অমন কুশ্রী মহিলা কোন বিধাতার সৃষ্টি, তাই মাঝে-মাঝে জানতে ইচ্ছে করে। দ্রুত পা চালাল সে।

দূর থেকে গাড়িটাকে দেখতে পেল সূর্য। লাল টুকটুকে মারুতি ওদের পাড়ার শেষ প্রান্তের একটি বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার বাড়ির দরজা খুলে যে মেয়েটি বেরিয়ে এল তার হাঁটা, ফিগার দেখে বুকের মধ্যে ড্রাম বাজতে লাগল। একটা মোটা বই হাতে নিয়ে মেয়েটি

গাড়িতে উঠে বসতেই সেটা মসৃণ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। কিন্তু সূর্যর মনে হল গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে মেয়েটির বই থেকে কিছু একটা পড়ে গেল। সে বাড়িটার সামনে এসে বস্তুটিকে কুড়িয়ে পেল। একটা লাইব্রেরির কার্ড। মানসী সোম। ঠিকানাটাও এই বাড়ির। কার্ডের একপাশে মেয়েটির ছবি। অপূর্ব! এইরকম মেয়ে কি ওই একই ভগবান সৃষ্টি করেছেন? ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে প্রায় নীরক্ত হয়ে গেল সূর্য। একটি কবিতার লাইনকে ঘুরিয়ে ভাবল সে, এইরকম একই মুখের জন্যে তিন জন্ম হেঁটে আসা যায়।

কিন্তু যার ছবি, সে তো চলে গেছে অনেকক্ষণ। কার্ডটাকে নিয়ে কী করবে সূর্য? আবার মাটিতে ফেলে যেতে খারাপ লাগছে। বাড়িটার দরজা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নেমপ্লেটের গাম্ভীর্য তাকে সন্ত্রস্ত করল। একজন রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার থাকেন ও বাড়িতে। পরক্ষণেই মনে হল ব্রিগেডিয়ার তো তার কি? সে কার্ড কুড়িয়ে পেয়েছে তাই ফেরত দিতে বেল বাজিয়েছে। ব্যস! আর একটা কাজ অবশ্য করা যায়। কার্ডটা নিয়ে গিয়ে সুব্রতর হাতে দিলে সে এসে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু সুব্রত এটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। অথচ কার্ড হারিয়ে ফেলায় মেয়েটির মানে মানসীর, কতই না অসুবিধে হবে। এইসব ভাবনার পাকে সে যখন পাক খাচ্ছে তখনই মারুতি ফিরে এল। মেয়েটি সূর্যর দশ হাত দূরে নেমে এল গাড়ি থেকে। বিরক্ত মুখে বাড়ির দরজার দিকে যেতে-যেতে অন্যমনে সূর্যর দিকে তাকাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, ওটা কি আমার কার্ড?'

জিভ গলা শুকিয়ে কাঠ, সূর্য কোনওমতে মাথা নাচাল। মানসী সোম বলল, 'এখানে পড়ে গিয়েছিল, না? আমি না এমন কেয়ারলেস! কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!' হাত বাড়াল সে।

সূর্য কার্ডটা হস্তান্তরিত করার মুহূর্তে কি ইলেকট্রিকের শক্ খেল? সমস্ত শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল কেন? তার হাঁটু কাঁপতে লাগল। মানসী কী বলবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অসুস্থ?'

'না।' শব্দটা যত না জোরে উচ্চারিত হল, ঘাড় নাড়া তার দ্বিগুণ হল।

মানসী হাসল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'সূর্য মিত্র। এ পাড়াতেই থাকি।' খুব বেশি এইটুকু বলতে ঘাম তৈরি হয়ে গেল ওর।

মানসী মাথা নাড়ল, 'আবার আপনাকে ধন্যবাদ, সূর্যবাবু। আমি চলি।' রাজেন্দ্রাণীর মতো লাল মারুতিতে সে উঠে বসতেই গাড়িটা উধাও হয়ে গেল। রুমালে মুখ মুছল সূর্য। এরকম হয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এইভাবে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলল? কিছুক্ষণ বাদে সে যখন ছাত্রের বাড়িতে পৌঁছোল তখন ভয় সঙ্কোচ কিংবা আড়ষ্টতা কোথাও নেই, সমস্ত মন জুড়ে শুধু আনন্দ। এমনকী দেরি হয়েছে বলে ছাত্রের পিসি তাকে দুকথা শোনালেও সে একটুও রাগ করল না। কিন্তু পড়াতে একদম ইচ্ছে করছিল না সূর্যর। গত কয়েকদিনে যে পড়া পড়িয়েছিল তার ওপর প্রশ্ন দিয়ে ছাত্রকে লিখতে বলে চোখ বন্ধ করে বসে রইল সে। চোখের পাতায় মানসী। লাল ঠোঁট সামান্য কাঁপিয়ে প্রশ্ন করছে, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'কী মাস্টারমশাই, ঘুমোচ্ছেন নাকি?' ছাত্রের পিসি দরজায় দাঁড়িয়ে প্রায় হেঁকে উঠল।

চমকে চোখ মেলল সূর্য, 'না-না। ভাবছিলাম।'

তিরিশ বছরের পিসির আফ্রিকার ম্যাপের মতো মুখ দুমড়ে উঠল, 'খালি নকশা! দাদা আর মাস্টার পায় না! কোন কাজটা আপনাকে দিয়ে হয় বলুন তো?'

কথাটার মধ্যে কি চাকরি হারাবার সম্ভাবনা আছে? সে সোজা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সব কাজই তো করি।'

'ছাই করেন। ঠিক আছে, শাহেনশা-র টিকিট কেটে এনে দিন তো দুটো।'

'ঢোঁক গিলল সূর্য। কিন্তু আজ ছাত্রের পিসির মুখটা অত কুৎসিত দেখাচ্ছে কেন? বলতে কি, বেশ আটপৌরেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই ছবির টিকিট কাটতে গেলে যে মারপিট করতে হবে। সে কোনওমতে বলল, 'দুটো কেন? ওকে নিয়ে এসব ছবি দেখা কি ঠিক হবে?'

'আপনার ছাত্রকে কে নিয়ে যাচ্ছে! আমাকে নিয়ে যে যাবে সে সময় পায় না টিকিট কাটার। আপনার মতো বেকার লোক নয় তো। শনিবার হলে ভালো হয়।'

বাড়ি ফেরার পথে এটাকেও সে মেনে নিল। ওই পিসির যদি প্রেমিক থাকে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে। মানসী তার সঙ্গে কথা বলেছে। কাল আবার সে ওইরকম মানসীর বাড়ির সামনে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তিনদিন যাওয়া-আসা করেও মানসীর দর্শন পেল না সূর্য। মানসী কি সপ্তাহে একদিনই লাইব্রেরিতে যায়? রাত্রে ঘুম আসছে না, খাবার দেখলেই বিস্বাদ লাগছে। ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছে সূর্য। এবং শেষপর্যন্ত সুব্রতকে সব খুলে বলল সে। চোখ বন্ধ করে সুব্রত চায়ের দোকানে বসে নতুন কাপের অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করতে চাস?'

সূর্যর দু-হাতের দশটা আঙুল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল। 'আর একবার দেখতে চাই?'

'দেখে কি হবে? মানসী কি জিনিস তুই জানিস না। এর মধ্যে দু-ডজন ছেলে লেঙ্গি খেয়েছে। ওর বাপের প্রতাপ ও টাকা দুই-ই আছে। তোকে পাত্তাই দেবে না। ধন্যবাদ দিয়েছে বলে ভিরমি খেয়ো না বন্ধু। মানসী সোম গভীর জলের মাছ। আমাদেরই পাত্তা দেয় না।' ঠোঁট ওলটাল সুব্রত। কিন্তু কথাটা মনে ধরল না সূর্যর। মানসী যখন হেসে তার সঙ্গে কথা বলছিল সেই দৃশ্যটা কিছুতেই তো ভোলা সম্ভব নয়। তার মনে হল সুব্রত তাকে আন্ডার এস্টিমেট করছে।

দু-দিন বাদে সিদ্ধান্ত নিল সে। সুন্দর একটা কাগজে সে আরও সুন্দর করে লিখল, 'সেদিন পথে আপনার লাইব্রেরির কার্ড পড়ে গিয়েছিল বলে আপনি কৃপা করে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমারও যে কয়েকটা কথা বলার আছে। আপনি কি দয়া করে পাঁচ মিনিট সময় আমাকে দিতে পারেন? যে-কোনওদিন যে-কোনও সময়। ব্যাপারটা খুব জরুরি। শুভেচ্ছাসহ, সূর্য মিত্র।' নিচে অনেক ভেবেচিন্তে চায়ের দোকানটার ঠিকানা লিখল। আগামী দশদিন ধরে রোজ সে পিওন আসার সময় যদি বসে থাকে তো চিঠি মার যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ব্রিগেডিয়ারের ঠিকানায় এই চিঠি না পাঠিয়ে সে সোজা লাইব্রেরিতে হাজির হল মুখ বন্ধ করা খাম নিয়ে। একটা বেয়ারাকে ডেকে দুটো টাকা দিয়ে জানতে চাইল মানসী সোম কবে আসে পড়তে। বেয়ারাটির দুটো টাকা খুব ভালো লাগল। সে জানাল, 'দিদিমণি আজই আসবে।'

চিঠিটা তাকে দিয়ে সূর্য পই-পই করে বলে দিল এটা যেন সে দিদিমণির হাতে দিয়ে দেয়। খুব জরুরি বিষয়। অন্য কেউ যেন চিঠি না পায়।

মানসী সোম সেদিন কখন লাইব্রেরিতে এসেছিল সূর্য জানে না। তিনঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে এসেছিল সে। পরদিন আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে বেয়ারাটার কাছে জেনেছিল চিঠি ঠিক হাতে পৌঁছে গিয়েছে। অথচ তারপরে ছয়দিন কেটে গেল, কোনও চিঠি নেই সূর্যর নামে। সকালে পৌঁছোতেই চায়ের দোকানের মালিক সবার সামনে বলে উঠলেন, 'এই যে সূর্যবাবু, আপনার নামে একটা চিঠি এসেছে আমার ঠিকানায়।' হকচকিয়ে গেল সূর্য। ব্যাপারটা কী হল? গতকালও তো পিয়নের কাছে কোনও চিঠি ছিল না।

সুব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'দিন চিঠিটা।'

একটা সুন্দর খাম সূর্যর হাতে দিয়ে মালিক জানালেন, 'আজ ভোরে একটা চাকর গোছের লোক এসে দিয়ে গেছে।'

সে সূর্য ছাড়া কারও হাতে দেবে না বলে জিদ ধরেছিল, মালিক অনেক বুঝিয়ে নিয়েছেন চিঠিটা। সমস্ত শরীরে আবার সেই কাঁপুনি। সূর্যর মনে হচ্ছিল, সে মরে যাবে। মানসী সোম তার চিঠির উত্তর দিয়েছে। তাকে যদি গালাগালিও দিয়ে থাকে তবু তো দিয়েছে। কিন্তু এখন সুব্রতর

কাছে চেপে যাবে কী করে। সুব্রত বলল, 'এখানে বসে চিঠিটা পড়ো গুরু। ডুবে-ডুবে খুব জল খাচ্ছ। হাতের লেখা বলছে তেনাদের চিঠি।'

এই চায়ের দোকানে খামটা খুলতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তবু খুলতে হল। আকাশি রঙের কাগজে সবুজ কালিতে লেখা, 'সেদিন আপনি আমার উপকার করেছেন। এত ভদ্রভাবে কোনও ছেলেকে কথা বলতেও শুনিনি। কিন্তু এখন আমি যে খুব ব্যস্ত। একটা কাজ করা যেতে পারে। আগামীকাল সন্ধেবেলায় রবীন্দ্রসদনে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। ঠিক ন'টা নাগাদ আপনি যদি গ্রীনরুমের দরজার মুখে অপেক্ষা করেন তো আধঘণ্টা কথা বলা যেতে পারে ফেরার সময়। মানসী।'

হঠাৎ খুব উদার হয়ে গেল সূর্য। এই মুহূর্তে কেউ চাইলে সে পৃথিবীটাকেও দান করে দিতে পারত। চোখের পাতায় মানসীর লাল ঠোঁটের হাসি। তার হাত থেকে চিঠিটা ততক্ষণে নিয়ে নিয়েছে সুব্রত। চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কী?'

সূর্যর কথা বলতে সময় লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা জানার পর সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবি?'

'কী করব মানে?' সূর্য মুখ ফেরাল, 'যাব।'

'পাগল! তুই শালা এটা গাধা।' খিঁচিয়ে উঠল সুব্রত।

'মানে?' হঠাৎ যেন ধাক্কা খেল সূর্য।

'তুই কি বুঝতে পারছিস না এটা একটা ট্র্যাপ? অতদিন আগে তোর চিঠি পেয়ে চাকরকে দিয়ে এখানে পাঠাবে কেন আজ এই চিঠি? ওই শালা ব্রিগেডিয়ারই হয়তো লিখেছে। আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি সূর্য, যাস না। বেছে-বেছে রবীন্দ্রসদনের পেছনের গেটে যেতে বলেছে। ওখানে ধোলাই দিলে কোনও পাবলিক বাধা দিতে যাবে না।'

চিঠি ফেরত নিয়ে প্রতিবাদ করল সূর্য, 'কিন্তু খামোকা আমাকে মারতে যাবে কেন?'

সুব্রত এক মুহূর্ত সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার স্ট্যাটাস কী? নাথিং। দুটো টিউশনি করিস। বাড়ির অবস্থা? বুক ফুলিয়ে বলার মতো নয়। কোনও স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন? নাথিং। চেহারা? জনতা ব্র্যান্ডের। তোর চেয়ে একশোগুণ এসব ব্যাপারে কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেটকে বাদ দিয়ে মানসী কেন তোকে সিলেক্ট করবে? প্রেম তোর কাছে স্বপ্নের জিনিস, প্লেটোনিক ব্যাপার, তুই প্রচুর কবিতা পড়িস, এসব ওর জানার কথা নয়। স্রেফ তোকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে প্যাঁদানির জন্যে।'

সারাদিন ধরে ব্যাপারটা ভাবল সে। মানসী তাকে মার খাওয়াবে? যে মেয়ে অমন মিষ্টি করে হাসতে পারে সে এমন খারাপ হতে পারে? কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না মন। আচ্ছা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখলে কেমন হয়? সত্যি গুন্ডারা ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে কিনা বুঝতে পারবে তাহলে। কিন্তু সেসব কিছু না হয়ে যদি সত্যি-সত্যি মানসী এগিয়ে এসে বলে, 'চলুন কোথাও গিয়ে বসি' তাহলে কোথায় বসবে? ও-পাড়ার রেস্টুরেন্ট মানেই তো বিরাট খরচ। নিজে কোনওদিন ঢোকেনি। পকেটে অন্তত দুশো টাকা থাকা দরকার। বেলেঘাটার টিউশনির টাকা আজ যেমন করে হোক আদায় করবে বলে ঠিক করল। ছাত্রের বাবাকে ফোনে জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। তারপর নিজের সেরা জামা-প্যান্ট ঠিকঠাক করে নিতে লাগল।

ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারমশাই, আপনার কী হয়েছে?'

'কিছু না।' রুমালে মুখ মুছল সূর্য, 'তোমার বাবা এখনও এলেন না?'

সে ঘড়ি দেখল সাতটা বেজে চল্লিশ। ছাত্রের মা এল চা নিয়ে, 'ও একদম পড়াশুনো করছে না মাস্টারমশাই। আপনি দেখুন। ওর বাবা বলছিল আপনাকে বলতে।'

চায়ের স্বাদ বিশ্রী লাগছিল। পড়াতেও মন বসছিল না। ঘড়ির কাঁটা যেন স্প্রিন্ট করছিল। ভদ্রলোক এলেন সোওয়া আটটায়। এসে কিছু খোশগল্প করার ধান্দায় ছিলেন কিন্তু তার আগেই সূর্য উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, 'কি মশাই, ট্রেন ধরার তাড়া নাকি আপনার?'

সূর্য মাথা নাড়ল, 'সেই রকমই। একজন বাইরে যাবে।'

টাকা নিয়ে সূর্য যখন পথে নামল তখন আটটা পঁচিশ। টিমটিমে আলো জ্বলছে। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই তেমন। এখান থেকে কোন্ বাস রবীন্দ্রসদন যায়? বাসস্টপে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে কোনও গাড়ি দেখতে পেল না সে। আর পঁচিশ মিনিট। সূর্যর মনে হচ্ছিল তার কলজে ছিঁড়ে যাবে। এখান থেকে দৌড়ে গেলেও পঁচিশ মিনিটে রবীন্দ্রসদনে পৌঁছোনো যাবে না। উদ্বেগে সে অস্থির হয়ে উঠল। অসহায়ের মতো চারপাশে তাকাল। একটাও ট্যাক্সি নেই। ট্যাক্সিতে সে কখনও চাপে না। কিন্তু আর পনের মিনিট রয়েছে হাতে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল সূর্যর সমস্ত পৃথিবীর ওপর। তার কান্না পাচ্ছিল। আর এই সময় মাথায় আলো জ্বেলে একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সিকে ছুটে আসতে দেখল সে। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দু-হাত মাথার ওপরে তুলে সে চিৎকার করতে লাগল, 'রোককে রোককে!' ব্রেক কষেও একটু এগিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ভেতরেও কোনও লোক নেই। দৌড়ে পেছনের দরজা খুলতেই মিটার নামাল ড্রাইভার। স্টার্ট নিতেই ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে প্রায় আর্তনাদ করল সূর্য, 'দাদা, খুব জরুরি দরকার, আমাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে রবীন্দ্রসদনে পৌঁছে দিন। প্লিজ।' আর কী বললে গুরুত্বটা বোঝানো যায় ভেবে পাচ্ছিল না সে।

'ঠিক আছে। পেছনের গেটে নটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।' ড্রাইভার স্পিড বাড়াতেই হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগল যেন। লোকটা কী বলল? পেছনের গেট? এই কথাটা জানল কী করে? প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে নিজের সিটে শরীরটাকে ছেড়ে দিল। ট্যাক্সিটা চলছে না উড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। পেছনের গেট এবং ন-টা—কোনও ট্যাক্সিওয়ালা একথা বলবে না। লোকটা অন্তর্যামী নাকি? সুব্রতর মুখ মনে পড়ল। ব্রিগেডিয়ার একে পাঠায়নি তো? দূর! সে বেলেঘাটায় পড়াতে আসবে এবং এই সময় বের হবে, এতক্ষণ অপেক্ষা করবে, বাসে না গিয়ে ট্যাক্সি ডাকবে, তা কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকটা এদিকে একবারও তাকায়নি। এমনকী বাসস্টপে তাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল। সে তো ডেকে থামাল। কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল সূর্যর। এবং এই সময় রাস্তার আলো পড়তেই সে দেখল লোকটার হাতে সবুজ সুতোর গ্লাভস। হাঁ হয়ে গেল সূর্য। কলকাতার কোনও ট্যাক্সি ড্রাইভার গ্লাভস পরে ট্যাক্সি চালায় এমন দৃশ্য কে কবে দেখেছে। চোখ কচলে নিল সূর্য। না, সে স্বপ্ন দেখছে না। শীতকাল হলে তবু হজম করা যেত কিন্তু এই সময়ে লোকটা গ্লাভস পরে আছে কেন যখন ঘাম বের হচ্ছে অকারণে! সূর্য তাকিয়ে দেখল ট্যাক্সিটা ঠিক পথেই যাচ্ছে। ন-টা বাজতে পাঁচ, এখন তারা কলামন্দির ছাড়াল। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল সে। হঠাৎ গাড়ি গতি কমিয়ে বাঁক নিতেই সে দেখল রবীন্দ্রসদনের পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে ইতিমধ্যে। চেঁচিয়ে উঠতেই ব্রেক কষল লোকটা। আলো জ্বেলে ভাড়ার অঙ্কটা বলতেই টাকা এগিয়ে দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। শুধু গ্লাভস নয়, এ গরমে লোকটা একটা সবুজ মাঙ্কি ক্যাপ পরে আছে। লোকটা যখন টাকা ফেরত দিয়ে আলো নেভাল তখন সে কাঠ-গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি মাথায় হাতে ওসব পরে আছেন কেন?'

শীতল গলায় লোকটি বলল, 'আমার খুব ঠান্ডা লাগে।' বলে গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে ঝুঁকে ইঞ্জিন দেখতে লাগল। ব্যাপারটা মন থেকে সরিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সে ঘড়ি দেখল, ন-টা বাজতে চল্লিশ সেকেন্ড বাকি। সামনে কোনও গুন্ডা ধাঁচের লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সূর্য বেশ কিছুটা ঘুরে আড়ালে দাঁড়াতেই বুঝতে পারল অনুষ্ঠান ভেঙেছে। গ্রীনরুমের ভেতরে থাকা নারী-পুরুষ এবার পেছনের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। মানসী কি একা আসবে? নাকি সঙ্গে কোনও বান্ধবী থাকবে? বন্ধুও তো থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সূর্য সামনে আসবে না।

উত্তেজনা বাড়ছিল। বেরিয়ে আসা জনতা গেটের দিকে চলে গেল। এবং তখনই সে দেখল ট্যাক্সিওয়ালাটা গেটের এপাশে তখনও ইঞ্জিন দেখে যাচ্ছে। এতক্ষণ যে গাড়ি পক্ষীরাজের মতো উড়ল তার ইঞ্জিন হঠাৎ এমন খারাপ হতে পারে? নাকি লোকটা ইচ্ছে করেই ওখান থেকে নড়ছে না? সুব্রতর হুঁশিয়ারি মনে এল, 'তুই কি বুঝতে পারছিস না এটা একটা ট্র্যাপ?' নইলে লোকটা জানবে কী করে সে পেছনের গেটে আসবে। গ্লাভস এবং মাঙ্কি ক্যাপ পরে আছে যাতে কোনও সূত্র কেউ খুঁজে না পায়। এই সময় কোনও ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া না খেটে অকারণে সময় নষ্ট করবে না। তাহলে?

ঢোঁক গিলল সূর্য। পেছনের দরজা দিয়ে আর কেউ বের হচ্ছে না। দু-তিনটে ছাড়া প্রায় সব গাড়ি চলে গেছে এর মধ্যে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সূর্য। ঘ-টা বেজে পাঁচ। মানসী কি আগে বেরিয়ে তাকে না দেখে চলে গেছে? তা কী করে হবে? সে আজ রেডিওর সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়েছে। কিন্তু লাল মারুতিটা তো গোড়া থেকেই ছিল না। ভেতর থেকে সাজুগুজু করা দুটি মানুষ বেরিয়ে আসছে। তাদের একজন মহিলা। টানটান হয়ে দাঁড়াল সূর্য। মানসী কি কোনও বন্ধুকে নিয়ে আসছে। প্রথমবার অবশ্য কোনও মেয়ের পক্ষে একা দেখা করতে সঙ্কোচ লাগবে। কিন্তু ওরা যেভাবে গল্প করছে, হতাশ হল সূর্য। মানসী নয়। ওরা এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল যাবে কিনা। মাথা নাড়া দেখে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। শালা ট্যাক্সিওয়ালা তো যাওয়ার নাম করছে না। আড়াল থেকে বেরিয়ে নন্দনের পেছনের দিকটায় দাঁড়াল সে। এখান থেকে গেটটা সামনাসামনি দেখা যাবে না, গুন্ডা ভাড়া করবে না মানসী। শুধু ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কাউবে নজরেও পড়েনি। একবার ভেতরে গিয়ে খবর নেবে নাকি? সূর্য এগিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় রবীন্দ্রসদনের ভেতর থেকে কথা বলতে-বলতে চারটে লোক বেরিয়ে এল। এরা যদি গুন্ডা হয়, নিজেকে ব্রুসলি ভাবতে চেষ্টা করল। লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরেছে। এইবার সে শূন্যে লাফিয়ে পা-হাত ছুড়বে। কিন্তু তার আগেই সে-যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অজস্র কিল চড় লাথি নেমে আসছে শরীরে।

শূন্যে না ভাসালে শরীরটাকে ব্রুসলি করে তুলবে সে কি করে? মুখে কী রক্তের স্বাদ লাগল? সমস্ত শরীরে এত ব্যথা কেন? দামি জামাটাও ছিঁড়ে গেছে। চোখের সামনে সমস্ত আলো ঝাপসা হয়ে আসছিল। চার জোড়া পায়ের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল। জ্ঞান হারাবার আগে সে গ্লাভস হাতে মাঙ্কি ক্যাপ পরা ট্যাক্সিওয়ালাকে এগিয়ে আসতে দেখল। কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। লোকটা ঝুঁকে তাকে দেখল। তারপর নিজের মনে বলল, 'বড্ড গরম লেগেছিল। বেচারা। এবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

দু-হাতে তাকে এমনভাবে তুলে নিল ট্যাক্সিওয়ালা যেন সে একটা শিশু। ট্যাক্সির পেছনের সিটে শুইয়ে দিতেই সে জ্ঞান হারাল। দক্ষ হাতে ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার বেরিয়ে গেল রবীন্দ্রসদন থেকে।

জ্ঞান ফিরতেই মনে হল সে মরে যায়নি। সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ বন্ধ করেও বুঝল সে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানার ওপরে। তার সমস্ত শরীরে কি এখন ব্যান্ডেজ? সূর্য ককিয়ে উঠল। তার মুখ থেকে উঃ আঃ ধ্বনি ছিটকে বেরুতে লাগল। এবং তখনই সে গলা শুনল, 'ওগুলো বলার দরকার নেই।'

সে চোখ মেলতেই ট্যাক্সিওয়ালার মাঙ্কি ক্যাপ পরা মুখ দেখতে পেল। লোকটা বলল, 'আপনার আর রক্ত পড়ছে না, গায়েও ব্যথা নেই। উঠে বসুন।'

হকচকিয়ে নিজের শরীরে হাত বোলাল সূর্য। কি আশ্চর্য, কোথাও তো আঘাতের চিহ্ন নেই! ব্যথাও নেই! এমনকী ছেঁড়া জামাটাও ঠিক হয়ে গেছে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে আরও অবাক হল। সুন্দর বাগানে ঘাসের ওপর শুয়ে সে এতক্ষণ ভেবে যাচ্ছিল হাসপাতালের বেডে রয়েছে?

নিরুদ্দিষ্ট বালকের মতো সূর্য প্রশ্ন করল, 'আমি কোথায়?'

ড্রাইভার জবাব দিল, 'হাসপাতালে।'

সূর্য চারপাশে তাকাল। গাছপালা, বাগান, ফুল, নীল আকাশ এবং তার গায়ে বউদির বগি থালার চেয়ে বড় একটা হলদে লালে গোলা চাঁদ। বেদম ভড়কে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কেমন হাসপাতাল?'

ড্রাইভার বলল, 'সেটা নিজের চোখে দেখুন।'

'আমাকে এখানে এনেছেন কেন?'

'আপনার খুব গরম লাগছিল। উত্তপ্ত আহত রক্তাক্ত মানুষরা এখানে এলে স্বাভাবিক হন। তখন তাঁদের ঠান্ডা লাগে। হাসপাতালটা ঘুরে দেখুন আপনি। যখন আপনার গরম কেটে যাবে, শীত-শীত করবে, তখন এখানে চলে আসবেন। বুঝে যাবেন আপনি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। উঠে দাঁড়ান।' ড্রাইভার ফিরে গেল দূরে দাঁড়ানো ট্যাক্সির কাছে। তারপর বনেট খুলে আবার ইঞ্জিন দেখতে আরম্ভ করল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় থেকে ঘাসের কুচি ঝেড়ে নিল। কোথাও কি কোকিল ডাকছে? আঃ, ফুলের গন্ধ এত মধুর হয়? এরকম হাসপাতালের নাম কেউ কখনও শুনেছে? সূর্য ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। চারপাশে বড়-বড় গাছ থাকায় জায়গাটা খুব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহরে কি সে এই মুহূর্তে আছে? ট্রাম বাস দূরের কথা, একটা গাড়ির হর্নও কানে আসছে না। আরও কিছুটা এগিয়ে পেছনে তাকিয়ে সে আর ড্রাইভারকে দেখতে পেল না। ইউক্যালিপটাস গাছ পাতা নাড়ছে বাতাসে। হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা বাড়ি দেখতে পেল সে। ছবির মতো আঁকা সেই বাড়ি বড় রহস্যময়। ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এল সূর্য। বাড়িতে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু জানলার শার্সিতে আলো পড়ছে। একটা ছায়া সরে গেল বলে মনে হল। না, ছায়াটা আবার ফিরে এল। অর্থাৎ ওখানে কেউ পায়চারি করছে। সূর্য ধীরে-ধীরে বাড়িটার সদর দরজায় চলে এল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সদর দরজা বলতে যা মনে আসে এটি তেমন নয়। ভেতরে পা বাড়াতেই সে একটা সিঁড়িতে পৌঁছে গেল। দু-পাশে দেওয়াল রেখে সিঁড়িটা সোজা ওপরে উঠে গেছে। নিঃশব্দে উঠে আসতেই গলাটা কানে এল। মোটা গলায় একটা লোক কিছু বলছে। পায়ে-পায়ে বারান্দায় পৌঁছে উঁকি মারল সূর্য। একটা লোক, যার পরনে আলখাল্লা জাতীয় পোশাক, পায়চারি করতে-করতে বলছে, 'ওর শরীরে রক্ত ঝরাতে অথবা ওর তুষারের চেয়ে সাদা চামড়ায় ছুরি বসাতে চাই না আমি। কিন্তু ওকে মরতে হবে। ওকে বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না। ও বেঁচে থাকলে আরও অনেক পুরুষ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবে। প্রথমে আমি আলোটাকে নিভিয়ে দিই, তাহলে ডেসডিমনার জীবনটাকে অন্ধকার করে দেওয়া সহজ হবে। এই আলো নেভালে আমি আবার জ্বালাতে পারব কিন্তু ডেসডিমনা. তোমার জীবনপ্রদীপ যদি নিভিয়ে দিই, প্রকৃতির এই সুন্দর সৃষ্টি যদি ধ্বংস করে দিই, নতুন করে তা নির্মাণ করার কোনও মন্ত্র আমার জানা নেই। গাছ থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে সতেজ রাখার কায়দা আমি জানি না সুতরাং এই প্রস্ফুটিত ফুলটিকেই আপাতত উপভোগ করা যাক।' আলখাল্লা পরা লোকটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ঘরের একপাশে। সূর্য উঁকি মারল। লোকটাকে খুব উত্তেজিত এবং রাগি মনে হচ্ছে। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান নিগ্রোটি একটি বিছানার পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। সেখানে দুধের চেয়ে সাদা বিছানায় এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী শুয়ে আছে। মেয়েটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। লোকটি ঝুঁকে মৃদু চুম্বন দিল মেয়েটির ঠোঁটে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল 'তোমার নিশ্বাসের গন্ধ এত মনোরম যে আমি প্রলুব্ধ হচ্ছি সিদ্ধান্তকে অমান্য করতে। আমি কি তোমাকে শাস্তি না দিয়ে মুক্তি দেব? মৃত্যুর পরেও যদি তুমি এমন সুন্দর থাকো তাহলে প্রথমে তোমায় সেই শাস্তি দেব তারপর আবার ভালোবাসব। তোমাকে আর একবার চুম্বন করি সুন্দরী। এই আমার শেষ চুম্বন। পৃথিবীতে তোমার

চেয়ে মধুর আর আমার কেউ নেই। তোমার মতো মারাত্মক কেউ নেই। চোখের জল আমি এড়াতে পারছি না কিন্তু যে কঠিন সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি তা পরিবর্তন করার কোনও কারণ নেই।'

হঠাৎ মেয়েটি জেগে উঠল, 'কে এখানে? ওথেলো?'

লোকটি সোজা হল, 'আ, ডেসডিমনা।'

ডেসডিমনা বলল, 'তোমার কি ঘুম পেয়েছে? তুমি আমার বিছানায় আসবে?'

লোকটি বলল, 'আজ রাত্রে কি তাই কামনা করেছ ডেসডিমনা?'

ডেসডিমনা হাসল, 'হ্যাঁ।'

ওথেলো সরে দাঁড়াল এক পা, 'তোমার জীবনের কোনও অপরাধের জন্যে যদি তুমি কখনও অনুশোচনা না করে থাকো, তাহলে প্রার্থনা করো।'

ডেসডিমনা অবাক, 'কী বলছ তুমি?'

ওথেলো মাথা নাড়ল, 'সেরকম হলে খুব সংক্ষেপে প্রার্থনাটা সেরে ফেল। আমি কোনও আত্মাকে মেরে ফেলতে চাই না এইভাবে।'

ডেসডিমনা উঠে বসল, 'তুমি মেরে ফেলার কথা বলছ?'

ওথেলো দৃঢ় গলায় জানাল, 'হ্যাঁ বলছি।'

ডেসডিমনা উঠে বসল, 'ও ভগবান, তুমি আমায় দয়া করো।'

ওথেলো বলল, 'হ্যাঁ, আমিও তাই চাই।'

ডেসডিমনা মাথা নাড়ল, 'একথা বললে যখন, তখন তুমি আমায় খুন করতে পারো না। কিন্তু তবু তোমাকে দেখে আমার ভয় লাগছে। তোমার চোখের মণি কী হিংস্রভাবে ঘুরছে। কোনও অপরাধ করিনি আমি কিন্তু তবু তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি।'

'নিজের পাপের কথা চিন্তা করো।'

'তোমাকে ভালোবাসা যদি পাপ হয় তাহলে এছাড়া অন্য কোনও পাপ আমি করিনি।'

'তাহলে ওই জন্যেই তোমাকে মরতে হবে।'

'তোমাকে ভালোবাসার জন্যে আমাকে মরতে হবে?' ডেসডিমনা চট করে বিছানা ছেড়ে নেমে এল, 'আমার অপরাধটা কী, তা জানতে পারি?'

ওথেলোর মুখ ব্যথায় ভরে উঠল, 'যে রুমালটা আমি তোমায় ভালোবেসে উপহার দিয়েছিলাম তা তুমি ক্যাসিওকে ব্যবহার করতে দিয়েছ।'

'না।' চিৎকার করে উঠল ডেসডিমনা, 'মিথ্যে কথা। ক্যাসিওকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করো।'

'মিথ্যে বোলো না। এখনও মিথ্যে বললে নিজের আত্মার প্রতি অবিচার করবে।'

'মিথ্যে বলছি না। কিন্তু আমি কিছুতেই এখন মরতে পারব না।'

'না, মরতে হবেই এবং এই মুহূর্তেই।'

'দয়া করো। তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালোবাসি না। ক্যাসিওকে আমি রুমাল দিইনি।'

'কিন্তু আমি নিজের চোখে ওর হাতে রুমাল দেখেছি। তুমি একটি মিথ্যেবাদী স্ত্রীলোক। তোমার শাস্তি আমি নিজের হাতে দেব।'

'ক্যাসিওকে ডেকে আনো। সে কোথাও কুড়িয়ে পেতে পারে রুমালটা।'

'ক্যাসিও নেই।'

'নেই মানে?'

'তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই বলেই নেই।'

'ও! ভগবান! এ অন্যায়, এ অবিচার।' ডেসডিমনা খানিকটা সরে এল। ওথেলোর হাতে ছুরি ঝলসে উঠল। ডেসডিমনা চিৎকার করে উঠল, 'আমি তোমাকে ঘেন্না করি।'

'ঘেন্না করো? এছাড়া আর কী করতে পারো তুমি? তোমার মতো অসতী মেয়ের আর কী করার ক্ষমতা আছে। প্রতারণা তোমার অভ্যাস।'

'চুপ করো। অনেক সহ্য করেছি আমি। বাবার অমতে আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। কারণ আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু একটি সন্দেহপরায়ণ পুরুষের সঙ্গে ঘর করা আর সাপের খাঁচায় বাস করা যে এক, তা আমি বুঝিনি। তুমি আমার ভালোবাসাকে অপমান করেছ। আমি আর কিছুতেই তোমার সঙ্গে থাকব না।' ডেসডিমনা সরে আসছিল দরজার দিকে।

ওথেলো এগিয়ে আসছিল, 'কোথায় পালাবে তুমি? আমার হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। অসতী স্ত্রীকে শাস্তি না দিলে আমি মহাপাপ করব।'

সূর্য কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। চোখের সামনে একটা খুন হতে যাচ্ছে। সে কি চিৎকার করবে? কী দরকার তার? সেক্সপিয়ারের নাটকে পড়েছিল ডেসডিমনাকে ওথেলো খুন করেছিল। এরা কি সেই নাটক করছে? অভিনয়? এই সময় ডেসডিমনা ছুটে এল দরজায়। আর তার চোখ পড়ল সূর্যর ওপরে। সঙ্গে-সঙ্গে সে সূর্যর হাত আঁকড়ে ধরল, 'আমাকে বাঁচান। দোহাই আপনার, ওই মুরটার হাত থেকে আমাকে বাঁচান।'

সূর্য মুখ ফিরিয়ে দেখল ওথেলো ছুরি হাতে ছুটে এসেছে তার সামনে। ডেসডিমনা আশ্রয় নিয়েছে তার পেছনে। ওথেলো তাকে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হল, 'এ আবার কে?'

সূর্য খুব ঘাবড়ে গিয়ে তোতলালো, 'আ-আ-আমি সূর্য।'

'সূর্য? তা এখানে কী চাই?' ধমকে উঠল ওথেলো।

'কিছু না। আপনাদের রিহার্সাল দেখছিলাম।'

'রিহার্সাল? আমরা নাটক করছি? ওই স্ত্রীলোকটি আমার জীবন নষ্ট করেছে আর তুমি বলছ আমি রিহার্সাল দিচ্ছি? ছাড়ো পথ। আমি ওকে খুন করব।'

ওথেলো তার একটা হাত এমনভাবে নাড়ল যেন মাছি মারছে। সঙ্গে-সঙ্গে ডেসডিমনা আর্তনাদ করে উঠল, 'প্লিজ আমাকে আপনি ওর হাতে ছেড়ে দেবেন না। আমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিনি, ও অন্যায় করছে।'

হঠাৎ সূর্য বলে ফেলল, 'আমি জানি আপনি খুব ভালো। খুব সৎ।'

'সৎ মানে?' প্রায় লাফিয়ে উঠল ওথেলো, 'তুমি—তুমি ওকে চেনো?'

'চিনি না তবে জানি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনারা আসল না নকল?'

ওথেলোর ছুরিটা এবার সূর্যর গলার সামনে চলে এল, 'এই ছোকরা, আর একবার যদি আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করো তাহলে খুন করে ফেলব তোমাকে। কী জানো ওর?'

হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল সূর্যর, 'ওটা নামান বলছি।' ওথেলোর ছুরি ঈষৎ নিম্নমুখী হল। সূর্য বলল, 'আপনি বরং এমিলিয়াকে ডেকে পাঠান। সে সব জানে।'

'এমিলিয়া? আমার প্রিয় ইয়াগোর স্ত্রী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী জানে সে? আমার আর অপেক্ষা করার সময় নেই, বলো কী জানে সে?'

সূর্য ঢোঁক গিলল, 'ক্যাসিও মারা যায়নি।'

'ক্যাসিও মারা যায়নি?' চমকে উঠল ওথেলো।

'হ্যাঁ। ঘাতক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তাছাড়া যে রুমালটা ক্যাসিওর হাতে দেখে আপনি এই ভদ্রমহিলাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন, সেই রুমাল উনি ক্যাসিওকে দেননি।'

'বাঃ! তাহলে আমার স্ত্রীর রুমাল উড়ে চলে গেল ক্যাসিওর কাছে?'

'আজ্ঞে না। ইয়াগো তার স্ত্রী এমিলিয়াকে দিয়ে রুমালটা চুরি করে আনিয়ে নিজে ক্যাসিওর ঘরে রেখে এসেছিল। সেই লোকটা হল ভিলেন। আপনাকে আপনার স্ত্রী-র বিরুদ্ধে বিষাক্ত করেছে।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'বাঃ, আমরা সেক্সপিয়ারের নাটকের ওপর প্রশ্নোত্তর লিখেছি কত, কত ব্যাখ্যা!'

'সেক্সপিয়ার? কে সে?'

'আপনাকে নিয়ে যিনি নাটক লিখেছেন। আপনাকে বিখ্যাত করেছেন।'

'নাটকে কী ছিল?'

'আপনি ডেসডিমনাকে হত্যা করবেন।'

সূর্য কথাগুলো বলামাত্র ডেসডিমনা আর্তনাদ করে উঠল।

'তারপর?' ওথেলো জিজ্ঞাসা করল।

'তারপর? এমিলিয়া এসে আপনাকে অনেক বোঝাতে চাইবে। আপনি বুঝবেন না। সে আপনাকে দোষী করবে, আপনি শুনবেন না। শেষ পর্যন্ত সে যখন চিৎকার করে উঠবে, দি মুর হ্যাজ কিল্ড মাই মিসট্রেস। মার্ডার! মার্ডার! তখন মন্টানো ইয়াগোরা এখানে আসবে।' সূর্য স্মৃতি থেকে বলে যাচ্ছিল, 'সেখানে এমিলিয়া তার স্বামীর মুখোশ খুলে দিলে আপনার চৈতন্য হবে। কিন্তু ততক্ষণে খুন করবে ইয়াগো এমিলিয়াকে। আপনি গ্রেপ্তার হবেন।'

'তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এমিলিয়া এখনও আসছে না কেন?'

'আপনি ডেসডিমনাকে খুন না করলে তো সে মঞ্চে আসতে পারে না।'

হঠাৎ ঠক করে শব্দ হল। সূর্য দেখল ওথেলোর হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেছে। তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। ধীরে-ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওথেলো। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওঃ ডেসডিমনা, প্রিয়া আমার, আমাকে ক্ষমা করো। এই লোকটির মুখে যদি ভবিষ্যৎ না জানতে পারতাম তাহলে কি ভুলই না করতে যাচ্ছিলাম।'

তৎক্ষণাৎ সূর্যর আড়াল থেকে সরে দাঁড়াল ডেসডিমনা, 'না।'

'না? হে প্রিয়, তুমি আমাকে নিরাশ কোরো না।'

'না। তোমার মতো সন্দেহপরায়ণ স্বার্থপর মানুষকে ক্ষমা করা আর নিজের বুকে ছুরি মারা একই ব্যাপার। ভালোবাসার মূল্য তুমি দিতে পারোনি। যে পুরুষ তার নারীকে, নারীর ভালোবাসাকে নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে, তার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। আমি এতকাল ভালোবাসায় অন্ধ হয়েছিলাম। আজ আমার চোখ খুলে গেছে। ওথেলো, আমি চললাম।'

'তুমি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'না যেয়ো না। আমি মিনতি করছি আমাকে ত্যাগ কোরো না।'

ডেসডিমনা হাসল, 'বেশ। হয় তুমি আমাকে খুন করো, করে বিখ্যাত হও, নয় পড়ে থাকো একা, অন্ধকার নিয়ে।' ওথেলো জবাব দিল না। বারংবার মাথা নাড়তে লাগল মুখ নিচু করে।

সূর্য দেখল, ডেসডিমনা বেরিয়ে গেল অন্ধকারে। ওথেলো যখন মুখ তুলল তখন তার পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেছে। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল ওথেলো, 'হে ঈশ্বর, তুমি কেন নারী সৃষ্টি করলে! যাকে দু-হাতের মধ্যে রেখেও মনে হয় হারিয়ে ফেলছি, বিশ্বাস করলেও ভয় সন্দেহকে ডেকে আনে, যাকে না পেলে মরে যেতে ইচ্ছে করে আবার সামান্য বক্র ব্যবহার উন্মাদ করে তোলে! ঈশ্বর, তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে, কারণ তোমায় কোনও নারীর সঙ্গে বাস করতে হয়নি।'

ক্রন্দনরত ওথেলোকে দেখে করুণা হল সূর্যর। একটু আগে দেখা মানুষটিকে ওই নারী কি দ্রুত বদলে দিয়ে গেল। সে পায়ে-পায়ে নিচে নেমে এল। পেছনের বাড়িটি এখন ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ডেসডিমনা হারিয়ে গেছে এর মধ্যে। বড়-বড় গাছপালার মধ্যে দিয়ে পা ফেলে সে এগোতেই পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। ঠিক তার সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে। সূর্য পেছন ফিরে আর বাড়িটাকে দেখতে পেল না। চাঁদের আলোয় পৃথিবী এখন স্বপ্নময়। সামনে যিনি যাচ্ছেন তাঁর

কি খুব তাড়া। গাছের আড়াল সামান্য সরতেই সে ছায়ামূর্তিটিকে দেখতে পেল। সূর্যর সন্দেহ রইল না, ঘাগরা ওড়না এবং পিঠের ওপর মোটা বেণী ঝুলিয়ে যিনি যাচ্ছেন তিনি সন্ত্রস্তা। হঠাৎ একটা বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসতেই ছায়াবৃতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ক্রমশ তাঁর মুখ পেছন দিকে ফিরল। সূর্য বুঝতে পারছিল না, মহিলা তার অস্তিত্ব সন্দেহ করেছেন কিনা। সে একটি দেবদারু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। মহিলা এবার এগিয়ে গেলেন। তাঁর চলায় ছন্দ এল। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি শরীরে ঢেউ উঠল। সূর্য সম্মোহিতের মতো তাঁকে অনুসরণ করল।

গাছপালা যেখানে আচমকা শেষ হয়েছে সেখানে একটি শান্ত নদী থাকবে এবং নদীব তীরে কদম গাছ বাতাসে আন্দোলিত হবে, এমনটা কল্পনা করেনি সূর্য। মহিলা এগিয়ে যাচ্ছিলেন বাঁশির শব্দ লক্ষ করে। কোনও মহিলাকে এভাবে অনুসরণ করা শোভন নয় জেনেও কৌতূহল সংবরণ করতে পারছিল না সে। আচমকা বাঁশি থেমে গেল। সূর্য দেখল মহিলা একটি কদম গাছের নিচে উপস্থিত হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছেন। আর বেশি এগোলে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সূর্য গাছের আড়ালে-আড়ালে যতটা সম্ভব কাছাকাছি চলে এল। মহিলা সুন্দরী, যুবতী। উদাস গলায় যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাছে না এলে আমার কি, সময় ফুরিয়ে গেলেই আমি ফিরে যাব।' সঙ্গে -সঙ্গে পাশের কদম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক তরুণ। এবং সূর্যর আর সন্দেহ রইল না।

রাধা পিঠের বেণী বুকের ওপর নিয়ে এসে অযথা আঙুলের ডগায় সেটাকে নিটোল করতে-করতে বললেন, 'বৃন্দাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলে কেন?'

'জানো না, কেন খবর পাঠাই?' কৃষ্ণর গলায় আমেজ, 'আমার বাঁশির সুর যেখানে পৌঁছায় না সেখানে তো বৃন্দার সাহায্য দরকার হয়ই।'

'আমি এভাবে আসতে পারব না।' কথাগুলো বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে নদীর তীরে পড়ে থাকা একটি শ্বেতপাথরের ওপর গিয়ে বসলেন রাধা।

অবাক হয়ে কৃষ্ণ তাঁর অনুসরণ করে বললেন, 'কেন, আবার কী হল?'

রাধা মুখ ফেরালেন অন্যদিকে, 'কিছুই হয়নি।'

এবার সূর্যর খানিকটা সুবিধে হল। সে এগিয়ে গেল গাছের আড়ালে-আড়ালে ঠিক ওদের পেছনে। কিন্তু শেষ পদক্ষেপে একটি শুকনো পাতা চৌচির হতেই রাধা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে খুব ভীত এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। উদ্বিগ্ন মুখে তিনি পেছনের গাছপালার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ সেটা লক্ষ করে হাসলেন, 'না না, ভয়ে কিছু নেই। এখানে কেউ তোমাকে অনুসরণ করে আসবে না। কোনও কাঠবিড়ালি দৌড়ে গেল। কিন্তু প্রিয়া, তোমার মুখে মেঘ কেন?'

রাধা বললেন, 'আমার শাশুড়িটিকে তো তুমি চেনো না! জটিলা তো জটিলাই।'

কৃষ্ণ বললেন, 'ধ্যেৎ! আমার দিদিমাকে আমি মোটেই ভয় পাই না। গোলমাল করতে পারে কুটিলামাসি। তুমি যখন এখানে এলে তখন ওরা কী করছিল?'

'তোমার মামা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ওঁদের খবর জানি না।' রাধা এক-পা সরে দাঁড়ালেন, কারণ কৃষ্ণ তাঁর ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন।

কৃষ্ণ একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তুমি অন্যদিন এমন করো না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কিছুই বুঝবে না।' রাধা পাথরের ওপর বসে পড়লেন।

'দ্যাখো রাধা, আমার পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার নিশ্বাসে তুমি। প্রতিদিন বেঁচে থাকি কারণ তোমার প্রেম আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে বলে।' কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন।

'মিথ্যেবাদী পুরুষগুলোকে আমি একদম দেখতে পারি না।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রাধা, 'মেয়ে দেখলেই হল, জিভে যেন জল আসে। সবক'টা গোপিনীকে তুমি—'

'ছি ছি ছি!' কৃষ্ণ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সেসব তো অতীন্দ্রিয় প্রেম। তা ছাড়া যখন আমি গোপিনীদের মধ্যে তোমাকে দেখি তখনই তারা আমার মধুরবাক্য শ্রবণ করে। তুমি প্রমাণ দিতে পারবে, আমি কোনও গোপিনীর সঙ্গে একা বিচরণ করেছি!'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। বিরজার ঘটনা আমি ভুলিনি। আমার সখীর সঙ্গে তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে যে, পাঁচজনে গিয়ে আমায় বলল। আমি আসছি জেনে তুমি পালালে আর সেই মেয়েটি নদীতে লুকিয়ে পড়ল। যেই আমি চলে গেছি অমনি দুজনে আবার মিলিত হয়েছ। তোমাদের সাত-সাতটা পুত্র আছে, আমি জানি না ভেবেছ?'

প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণের গলা মিনমিনে শোনাল, 'কে বলল তোমাকে?'

রাধা আর ওই প্রসঙ্গে গেলেন না। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'শোনো, আমি আর এভাবে পারছি না। এই চোরের মতো দেখা করা আমার ভালো লাগছে না।'

কৃষ্ণ জবাব দিলেন না। নিশ্বাস ফেলে নদীর দিকে তাকালেন।

রাধা বললেন, 'কথাগুলো কানে যাচ্ছে না কি!'

কৃষ্ণ বললেন, 'যাচ্ছে। কিন্তু কী করব বলো?'

'তুমি আমাকে চাও না?'

'প্রশ্নটা করতে পারলে?'

'তাহলে তুমি কী ধরনের পুরুষমানুষ? যে পুরুষ নিজের নারীকে পরের কাছে ফেলে রেখে লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতে আসে, তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা রাখা যায়? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এভাবে আমি প্রেম করতে পারব না।' রাধা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন।

'কীভাবে করবে?'

'আমাকে বিয়ে করতে হবে। স্বীকৃতি দিতে হবে।'

'কী আশ্চর্য! তুমি অন্যের বিবাহিত স্ত্রী, তোমাকে বিয়ে করা—'

ই-ইস্! আমার সঙ্গে পরকীয়া প্রেম করা যায় আর বিয়ে করা যায় না?' রাধা মাথা নাড়লেন, 'এই তো একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এক গোপিনীর। তাকে ছেড়ে পরবাসে চলে গেল সে মনের মানুষকে নিয়ে বিয়ে-থা করে। তুমি পারছ না কেন?'

'মানে, হাজার হোক, তুমি আমার মামি।'

রাধা হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কৃষ্ণ কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তিনি ডানহাত বাড়িয়ে রাধার বাজু স্পর্শ করতে চাইলে রাধা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন, 'ছুঁয়ো না তুমি আমাকে। এতকাল প্রেম করার পর এখন বলা হচ্ছে আমি তোমার মামিমা।'

কৃষ্ণ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'না, না, আমি ঠিক সেকথা বলতে চাইনি। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, এই যে তুমি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ, আমি তোমার বিরহে ব্যাকুল হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছি লোকে এইটাই মনে রাখবে। আমাদের প্রেমের মধ্যে যে বিরহের জ্বালা আছে তাই যুগযুগান্তর ধরে মানুষের ভালো লাগবে। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তো এই সব মহান ব্যাপারগুলো থাকবে না। বিবাহিত নারী-পুরুষের প্রেম নিয়ে লোকে মোটেই মাথা ঘামায় না। বিয়ে মানেই আমরা সাধারণের দলে মিশে যাব।' কথাগুলো বলার সময় কৃষ্ণকে খুব সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল।

কিন্তু হিংস্র বাঘিনীর মতো উঠে দাঁড়ালেন রাধা, 'চমৎকার! তোমার মতলব আমি আগে বুঝিনি। ঝুঁকি যা নেওয়ার নিচ্ছি আমি, তুমি সামান্য দায়িত্বটুকুও নেবে না! আমি কী পেলাম বলো? বিয়ের পর যে সংসারে বউ হয়ে এলাম সেখানে মন বসাতে পারলাম না। শাশুড়ি ননদের খোঁটা খাচ্ছি অনবরত। ওদের সন্দেহের বিষ আমার স্বামীকেও বিষাক্ত করেছে। যার জন্যে আমি পাগল তিনি বলছেন, জলে নামব কিন্তু বেণী ভেজাব না।' রাধা এগিয়ে এলেন কৃষ্ণের মুখোমুখি, 'তোমাকে

আজ এই মুহূর্তে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে, আমাকে স্বীকৃতি দেবে কি না?'

কৃষ্ণ কিছু বলার আগেই পেছনে পায়ের আওয়াজ হল। সূর্য মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একটি রমণী গাছের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে আসছে। রমণী এবার দেখতে পেল দৃশ্যটি। তার মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। তারপরেই সে দৌড়ে ফিরে গেল উলটোদিকে।

এই পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্রই কৃষ্ণ চমকে উঠলেন। তারপরেই দ্রুত চলে এলেন গাছের সামনে। এবং তখনই তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে ক্রোধ ফুটে উঠল। খুব ঘাবড়ে গিয়ে সূর্য নমস্কার করল। কৃষ্ণ রুষ্ট গলায় বললেন, 'কে আপনি? পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিধর্মী। এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

সূর্য বলল, 'আজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমি বিধর্মী নই। কিন্তু আপনারা যার পায়ের শব্দ শুনলেন সে আমি নই। একটি রমণী আপনাদের দেখে ছুটে চলে গেল।'

'রমণী।' কৃষ্ণের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কে রমণী?'

'আমি চিনি না। ওই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল। মুখে কুটিল হাসি ফুটেছিল।'

'কী রকম দেখতে সে?' কৃষ্ণ উত্তেজিত। রাধা বেতস পাতার মতো পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন।

'আজ্ঞে, রমণী মোটেই সুশ্রী নয়। কপালে একটা জরুল ছিল মনে আছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে রাধা অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'কুটিলা।'

কৃষ্ণ মাথা নাড়ল, 'তাই মনে হচ্ছে, চলো, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি।'

রাধা ভীত গলায় বললেন, 'এখন কী হবে? বাড়িতে ফিরব কী করে?'

কৃষ্ণ বলল, 'রাত শেষ হতে দেরি আছে। পরে ভাবা যাবে। চলো।'

সূর্য না বলে পারল না, 'কিছু মনে করবেন না, বিপদ কিন্তু আসছে।'

'বিপদ?' কৃষ্ণ অবাক হল।

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমাদের চেনেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে জানি।'

কৃষ্ণ রাধার দিকে তাকলেন। রাধার চোখে বিস্ময়। তিনি জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না, 'আপনি জানেন? আমাদের সম্পর্ক জানেন?'

সূর্য ঢোক গিলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী জানেন?'

কৃষ্ণ হাত তুললেন, 'আঃ, এ সব কথা কেন? আপনি বিপদের কথা কী বলছিলেন?'

সূর্য বলল, 'একটু বাদেই কুটিলাদেবী তার দাদা মানে আপনার মামাকে ডেকে আনবেন। তিনি এসে আপনাদের দেখলে কী হবে, বুঝতে পারছেন?'

কৃষ্ণ বললেন, 'এই কথা! মামা শাক্ত, কালীর ভক্ত। মামা এলেই আমি কালীর রূপ ধারণ করব আর তুমি আমাকে আরাধনা কোরো। ব্যস, তিনি গলে জল হয়ে যাবেন। এর আগেও তো একবার এমন করেছি, তোমার মনে নেই?'

সূর্য সমর্থনের মাথা নাড়ল। এই গল্প সে পড়েছে, একদিন আয়ান যখন কালীপুজা করছিলেন তখন তাঁর বোন কৃষ্ণ-রাধার বনবিহারের খবর দেয়। ক্রুদ্ধ আয়ান রাধাকে মারতে এলে কৃষ্ণ কালীমূর্তি ধারণ করেন এবং রাধা কালীর পায়ে ফুল অর্পণ করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে কালীভক্ত আয়ান রাধার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে কুটিলাকে তিরস্কার করেন ভুল খবর এনে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু রাধা বেঁকে বসলেন, 'অসম্ভব। তুমি মেয়ে সেজে আমার সামনে দাঁড়াবে আর আমি সেই মেয়েকে আবার পুজো করব? পারব না। আমি পারব না। তা ছাড়া এতকাল অনেক ঠকিয়েছি

আমি, নতুন করে ওকে ঠকাতে পারব না। চোরের সাক্ষী মাতাল, ইনি আবার তোমাকে সমর্থন করছেন!'

কৃষ্ণ বললেন, 'এ কি কথা বলছ তুমি? আমার জন্যে তুমি খুশি হয়ে কিছু করবে না?'

'এতকাল তো করেছি। কিন্তু মনে রেখো, আমার যিনি স্বামী তিনি ঘোর তপস্যার পর পৃথিবীর কোনও ধনসম্পদ, ক্ষমতা না চেয়ে শুধু আমাকেই স্ত্রী হিসেবে চেয়েছিলেন। আমি জানি, প্রচণ্ড ভালোবাসা না থাকলে এমন চাওয়া যায় না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁকে আমি ভালোবাসতে পারলাম না। তাই বলে এই যে ক্রমাগত তাঁকে ঠকিয়ে যাচ্ছি, এ আর কদ্দিন ভালো লাগে।' রাধা বললেন, 'তবু আমি পারি যদি তুমি পাঁচজনের সামনে আমাকে স্বীকৃতি দাও।'

'সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন দাঁড়াও, আমি কালীরূপ ধারণ করি।'

'অসম্ভব। আমি ফিরলাম। তিনি আমাকে আজ যে শাস্তি ইচ্ছে দিন আমি সহ্য করব কিন্তু এবাব যেদিন তুমি আমায় ডাকবে সেদিন তৈরি থাকবে স্বীকৃতি দিতে।' রাধা কৃষ্ণের কোনও অনুনয় শুনলেন না। দ্রুত পায়ে পাতা মাড়িয়ে বনের ভেতর মিলিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ হতাশ, করুণ মুখে যেন কী করবেন বুঝতে না পেরে বসে পড়লেন মাটিতে।

সূর্যর খুব খারাপ লাগছিল। নদীর ওপার থেকে বয়ে আসা শীতল বাতাস তাকে একটু কাঁপিয়ে দিল। সে এক-পা এগিয়ে এল, 'আচ্ছা আপনি, মানে উনি যা চাইছেন তা দিচ্ছেন না কেন? দিলেই তো আর সমস্যা থাকে না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'আপনি নাবালক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেম হল পরকীয়া প্রেম। এই প্রেম ধিকি-ধিকি জ্বলা আগুনের মতো। বুকের মধ্যে ওম তৈরি করবে কিন্তু পুড়িয়ে মারবে না। এই যে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, চলে যাচ্ছে—এই ভালো। একসঙ্গে বাস করলেই দুজনের নানান খুঁত দৈনন্দিন দেখায় বড় হয়ে ওঠে। প্রেম তো মহান হয়ে ওঠে বিরহে। প্রেম তীব্র হয়ে ওঠে সন্দেহে। এই যে রাধা সন্দেহ করে আমি গোপিনীদের সঙ্গে মজে আছি, এটা তো ওর প্রেম তীব্রতর করছে। আবার স্বামীর ঘর করছে যে মেয়ে, তার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক কতটা তা নিয়ে তো আমার মন নির্মেঘ নয়। তবু রাধার বিরহে আমি পুড়ে মরি।'

কৃষ্ণ যখন এইসব কথা বললেন, 'তখন ক্রুদ্ধ আয়ান বেরিয়ে এলেন জঙ্গল ভেদ করে। চিৎকার করে বললেন, 'কোথায় সেই পাপিষ্ঠা?'

সূর্য দেখল আয়ানের হাতে তলোয়ার। আয়ানের পেছনে দাঁড়িয়ে কুটিলা বলল, 'এইখানেই ছিল দাদা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। এখনই ওই কৃষ্ণ কালীর রূপ নিয়ে নেবে এবং তোমার বউ কত ভক্তিভরে পুজো করে তোমাকে ঠকাবে।'

আয়ান বললেন, 'ঠকানো বের করছি। এই কেষ্ট, বল কোথায় সে?'

কৃষ্ণ যেন খুব অবাক, এমন গলায় বললেন, 'কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন আপনি?'

'তোর মামি, যে এখানে এতক্ষণ ছিল।'

কৃষ্ণ বললেন, 'আমি তো তাঁকে দেখিনি।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল কুটিলা, 'একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে মায়াকান্না কাঁদছিল। নিশ্চয়ই আছে আশেপাশে কোথাও। দাঁড়াও দেখছি।' কুটিলা জঙ্গল খুঁজতে গেল।

কৃষ্ণ বললেন, 'মামা, তোমার কী হয়েছে বলো তো, যে যা বোঝায় তাই বোঝো। এত রাত্রে মামি এখানে আসতে যাবেন কেন? নারায়ণকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তুমি পেয়েছ মামিকে। নারায়ণ অসন্তুষ্ট হবেন না?'

এই সময়ে কুটিলা হতাশ হয়ে ফিরে এসে সূর্যর দিকে তাকাল, 'এটা আবার কে?'

সূর্য কী করবে বুঝতে পারছিল না। কৃষ্ণ বললেন, 'পরদেশি।'

কুটিলা বলল, 'না দাদা, কীরকম মেয়েলি-মেয়েলি গড়ন। আমার সন্দেহ হচ্ছে। রাধাকে এর

ভেক ধারণ করিয়ে দেয়নি তো!' কথাগুলো বলতে-বলতে সূর্যর হাতে চিমটি কাটল কুটিলা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সূর্য। কুটিলা জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, বউদির গলার সঙ্গে মিল আছে কি?'

আয়ান বললেন, 'মারব এক থাপ্পড়। এই রোগা সিঁটকে পরদেশির সঙ্গে আমার সতী-লক্ষ্মী সুন্দরী স্ত্রী-র তুলনা করছিস তুই? সে এখানে মোটেই আসেনি। তুই তাকে সহ্য করতে পারিস না বলে নিন্দা রটাস।' আয়ানের পিছু-পিছু কুটিলা চলে যেতে-যেতে সূর্যর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

সূর্যর হাত তখনও জ্বলছিল। কিন্তু ওই হাসি দেখামাত্র তার শীত-শীত ভাব এল। কৃষ্ণ তখন পরমানন্দে একটা দূর্বার ডাঁটা চিবোচ্ছেন। সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'রাধাদেবীর কী অবস্থা হবে?'

কৃষ্ণ বললেন, 'এতক্ষণে সে বিছানায় ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে।'

সূর্য বলল, 'আপনি কিন্তু মিথ্যেটাকে সত্যি করে বুঝিয়ে দিলেন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'মিথ্যে? মিথ্যে কোন্‌টা? ভালোবাসা হচ্ছে একটা মহান যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের অন্যতম একটা অস্ত্র হল ছলনা। এই ছলনায় কোনও পাপ হয় না।' কৃষ্ণ চলে গেলেন বিপরীত দিকে।

একা দাঁড়িয়ে কেমন শীত-শীত করতে লাগল সূর্যর। জোলো বাতাস নদীর শীতলতা তুলে নিয়ে আসছে মধ্যরাতে। ভালোবাসা জিনিসটা কী? যে পুরুষের জন্যে নারী জীবন দিতে তৈরি সেই পুরুষ সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ হলে নিমেষে ছেড়ে যেতে পারে? ডেসডিমনার মুখে প্রেম থেকে ঘৃণা তৈরি হতে দেখেছিল সে। ওথেলোর অত অনুশোচনায় কান দিল না মেয়েটা। আবার শুধু প্রেম নয়, স্ত্রী-র মর্যাদা না পেলে নারী নিজেকে প্রতারিত ভাবে। রাধা বলে গেলেন, তিনি আর শুধু প্রেম করতে আসবেন না। কৃষ্ণ যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ওঁদের সম্পর্কের এখানেই ইতি। ভালোবাসার কত মুখ? সূর্যর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। সে দ্রুত পা চালাল নদীর কাছ থেকে সরে যেতে।

কিছুদূর অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটার পর সে বিলাপ শুনতে পেল। কোনও পুরুষ আকুল গলায় কিছু বলছে। সূর্য দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকটা এগোতেই সে রাজপ্রাসাদের মতো একটি অট্টালিকা দেখতে পেল। দুয়ারে কেউ নেই। চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সূর্য ওপরে চলে এল। সামনের ঘর থেকেই সেই বিলাপ ভেসে আসছে। উঁকি মারতে সূর্য সুসজ্জিত একটি ঘর দেখতে পেল। এক বৃদ্ধ চুপ করে বসে আছেন কেদারায়। তাঁর সামনে বসে এক যুবক বিলাপ করছিল। দুজনের পোশাক দেখেই বোঝা যায় এঁদের ধনসম্পত্তি প্রচুর। যুবক বলছিল, 'আর এসবের জন্যে আপনি দায়ী।'

'আমি? পুত্র, তুমি এ কী কথা বলছ?' বৃদ্ধ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়ই। সেই যখন মনসাকে পুজো করবেনই তখন ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার কি দরকার ছিল?'

'সেটা আমার আত্মসম্মানের প্রশ্ন ছিল। মানুষ হিসেবে আমি শেষপর্যন্ত দেবীর অহঙ্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এবং শেষপর্যন্ত বাঁ হাতে তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি।' বৃদ্ধকে এখনও গর্বিত মনে হচ্ছিল।

'কিন্তু আপনাদের এই জেদাজেদিতে আমার এত বড় সর্বনাশ করলেন কেন?'

'কী সর্বনাশ করেছি তোমার? পিতা কখনও পুত্রের সর্বনাশ করতে পারে?'

'আপনি করেছেন। মনসা আমাকে বধ করতে চেয়েছিলেন। আপনার অন্যান্য সর্বনাশের সঙ্গে না হয় আমারও প্রাণহানি হত। কী দরকার ছিল আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করার? আপনি আমাকে

বাঁচাবেন আর দেবী আমাকে মারবেন। আমি পড়লাম মাঝখানে। যখন বাঁচাতে পারবেনই না তখন এই জেদের কোনও মূল্য ছিল?' যুবক উঠে দাঁড়াল। তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু পুত্র, তুমি বেঁচে আছ এখনও।'

'এরকম বাঁচতে আমি চাইনি। ঠিক আছে, আপনি আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

'পুত্র, তোমার কষ্টের কারণ আমায় খুলে বলো।'

'বেশ, না-হয় দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে আমায় লোহার ঘরে রেখেছিলেন যাতে কোনও সাপ দংশন করতে না পারে, কিন্তু আমায় বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?'

'কেন? বেহুলা তো যথেষ্ট রূপবতী, দেবতারা পর্যন্ত তার প্রশংসা করেছেন।'

'ওকথা থাক। আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।'

'বেহুলার মধ্যে যেসব লক্ষণ ছিল তার একটি হল, সে কখনও বিধবা হবে না। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিলে দেবী মনসা তোমাকে বধ করতে পারবেন না বলে আমার ধারণা ছিল। সে যে বিধবা হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই কি তোমার বিলাপের কারণ? আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

কথাগুলো বলে চাঁদসদাগর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সূর্য দেখল, লখীন্দর অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। এই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। সূর্য দ্রুত চলে এল একটা থামের আড়ালে। একজন সুন্দরী মহিলা হাতের রেকাবিতে নানা ফুল ও ফল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বোঝা যায় তিনি পূজা দিয়ে এলেন। লখীন্দরকে দেখে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা প্রফুল্লমুখে বললেন, 'স্বামী পূজার ফুল গ্রহণ করুন।'

'না থাক।' উলটোমুখে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে লখীন্দর তাঁকে যেতে নির্দেশ করলেন, 'আমি একা থাকতে চাই। বিরক্ত কোরো না আমাকে।'

'কী হয়েছে আপনার? আপনি কি অসুস্থ?' নারী এগিয়ে গেলেন।

'অসুস্থ? আমি তার চাইতেও বেশি।'

'আপনি এমন আচরণ করছেন কেন?'

ঘুরে দাঁড়ালেন লখীন্দর, 'শোনো বেহুলা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এসব কথা কখনও বলব না ভেবেছিলাম কিন্তু আমি আর জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।'

'আমাকে নিয়ে আপনি জ্বলছেন?' বেহুলা যেন পাথর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। তোমাকে আমি চিনতাম না। আমার সম্পর্কে তোমার অন্য মমতা থাকার কথাও নয়। পিতা যখন তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করলেন তখন তুমি রাজি হলে কেন?'

'কারণ আপনি সুপুরুষ এবং সৌম্য।'

'কিন্তু আমার মৃত্যুযোগ ছিল।'

'আমার বৈধব্যযোগ ছিল না।'

'বেশ। সাপ যখন আমায় দংশন করল তখন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে কেন?'

'আমাকে দেবী কপটভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন।'

'যখন আমি মৃত তখন তুমি ভেলায় উঠলে কেন?'

'আমাব বৈধব্যযোগ নেই সেটা প্রমাণ করতে।'

'উঃ, আমি আর পারছি না!'

'কী হয়েছে স্বামী?'

'তুমি সতী হতে চাওনি।'

'সতী হওয়া তো আমার ইচ্ছাধীন। কেউ জোর করতে পারত না। এমনকী আমি পুনর্বিবাহ করতে পারতাম।'

'তাহলে তুমি ভেলায় চেপে আমার মৃতদেহের সঙ্গে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলে কেন?'

'আমার মনে বিশ্বাস ছিল, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবই। আপনি যখন লৌহবাসরে নিদ্রামগ্ন, সাপ যখন আপনাকে দংশন করেনি, তখন আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল আমার জীবন ধন্য। আর সেই কারণেই নদীপথের সমস্ত বাধা আমি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলাম।'

'কিন্তু, কিন্তু তুমি কেন দেবসভায় গিয়ে নাচলে?' তীব্র স্বর লখীন্দরের।

'তা না করলে দেবতার কৃপা পেতাম না আমি।'

'কিন্তু ওই নোংরা লোলুপ চোখের সামনে আমার স্ত্রী নাচছে তার যৌবন নিয়ে? যেখানে রম্ভা উর্বশীর মতো বারবনিতা নাচে? তোমাকে দর্শনে ভোগ করল দেবতারা। তুমি শরীরের মোহে তাদের সন্তুষ্ট করে আমায় প্রাণ ফিরিয়ে দিলে। কে চেয়েছিল এই প্রাণ? প্রতিরাত্রে যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো তখন আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি। যে নাচ দর্শককে সন্তুষ্ট করে সেই নৃচে নাচিয়ের অংশ থাকে। তার মনেও সেই সন্তুষ্টি জন্ম নেয়। তুমি দেবতাদের সামনে ওই নৃত্য পরিবেশন করে আমাকে অপবিত্র করেছ।'

'স্বামী, পঙ্কেই পঙ্কজ জন্মায়। তাই বলে পঙ্কজের পবিত্রতা ম্লান হয় না। দেবসভায় আমি এমন কোনও আচরণ করিনি যাতে আপনার অসম্মান হয়, আমার হৃদয় অপবিত্র হয়। আপনার পিতা দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তিনি পরাজিত। আমি ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী। আর কে না জানে, ভালোবাসা এবং যুদ্ধে কোনওকিছুই অন্যায় নয়।'

'চুপ করো। আমি মেনে নিতে পারছি না একথা।'

'স্বামী, এভাবে বলবেন না। আপনি যদি আমাকে সন্দেহ করেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে বাস করতে পারব না। আমার বৈধব্যযোগ নেই কিন্তু আপনার স্ত্রীহানি ঘটবে না একথা কোনও দৈবজ্ঞ বলেনি।' প্রচণ্ড মর্যাদায় পা ফেলে বেহুলা লখীন্দরের সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজের আংটি খুললেন। আংটির ঢাকা সরিয়ে সেটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই আংটিতে বিষ আছে। ভেলা কিংবা দেবসভায় এটি আমার হাতে ছিল। তখন প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু মনে হচ্ছে সেই সময় এসেছে। আপনি আমার মুখে ওই বিষ ঢেলে দিন।'

বেহুলা মুখ তুলে চোখ বন্ধ করে ঠোঁট আলগা করলেন। লখীন্দর কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আড়ালে দাঁড়িয়ে সূর্য কেঁপে উঠল থরথর করে। সে আর দাঁড়াতে পারল না। দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সেই পায়ের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র লখীন্দর চিৎকার করে উঠল, 'কে, কে ওখানে?'

পাগলের মতো দৌড়োচ্ছিল সূর্য। তৃতীয় প্রহরের বাতাস এখন আরও শীতল। তার শরীরে কাঁপুনি এসেছিল। অনেক খোঁজার পর সে সেই ইউক্যালিপটাস গাছটাকে দেখতে পেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে তার তলায় পৌঁছে গেল। সূর্য দেখল ড্রাইভার তখনও গাড়ির বনেট খুলে ইঞ্জিন দেখছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর? ঠান্ডা লাগছে বলে মনে হচ্ছে?'

কোনওরকমে মাথা নাড়ল সূর্য। হ্যাঁ।

'হাসপাতালটা ঘুরে দেখলেন?'

'সব দেখিনি। তবে যা দেখেছি, তাতেই—।'

'উঠে বসুন।' ড্রাইভার নিজের সিটে বসল। গাড়িতে ওঠার আগে সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, বেহুলাকে কি লখীন্দর খুন করেছে এর মধ্যে?'

'জানি না। শুধু জানি, দুটো নারী-পুরুষ যতক্ষণ একত্রিত না হয় ততক্ষণ উষ্ণ থাকে।'

*

কপালে জ্বালা বোধ হওয়ায় হাত উঠে গেল নিজে থেকেই। কিন্তু মশাটা মরল না। সূর্য আবিষ্কার করল সে বসে আছে নন্দনের পাঁচিলে। চারধার শুনশান। তন্দ্রার ঘোর কাটতেই সে ঘড়ি দেখল। ন-টা কুড়ি। এবং এই সময় পায়ের আওয়াজ হতেই চোখে পড়ল রবীন্দ্রসদনের পেছনে দরজা দিয়ে মানসী সোম হাইহিল পরে এগিয়ে আসছে একা। সোজা হয়ে দাঁড়াল সূর্য। মানসী অবাক। তার সামনে অত্যন্ত স্মার্ট একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে। সে বলল, 'খুব দুঃখিত। আসলে ফাংশন শেষ হওয়ার পর সবাই এমন ধরল না! চলুন, কোথাও গিয়ে মিনিট পনেরো বসি।'

সূর্য হাসল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আপনি এসেছেন তাতেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। যদি কখনও সময় পাই দেখা হবে। কথাটা বলার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

মাথা নেড়ে নায়কের মতো পা ফেলে সূর্য রবীন্দ্রসদনের পেছন থেকে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। সে চকিতে দেখে নিল সেই ট্যাক্সি বা তার ড্রাইভার কোথাও নেই। বরং লাল মারুতি অপেক্ষা করছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে খুব হালকা এবং স্মার্ট মনে হচ্ছিল তার।

এই মুহূর্তে আর এক সূর্য যেন তাকে দখল করেছে যে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় হাঁটছিল।



সহাবস্থান

এখন বিকেল। ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছিলেন দিব্যজ্যোতি। সামনে চোখ মেললেই চোখের শান্তি হয়। কোথাও কোনও বাধার প্রাচীর নেই। দক্ষিণ দিক, বোধহয় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একদম খোলা। নিবারণ ঢোল ঠিকই বলে। এত মিষ্টি হাওয়া তিনি কোনওদিন গায়ে মাখেননি।

শরীরটা জুত নেই। আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই এমন হয়। ঠিক সময়ে খাওয়া, শোওয়া, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা এবং বই পড়া, জীবন বলতে এখন এই। লতিকার তাগাদায় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটা মোচড় এল। শোভাবাজারে ঘিঞ্জিতে তিনি হাঁটতে পারতেন না। এখানে এত সবুজ মাঠে হাঁটতে হাওয়া লাগবে। মল্লিকবাড়ির অন্দরে হাওয়া ঢুকত না কিন্তু এখানে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য পর্যাপ্ত। নিবারণকে দেখে তার খারাপ লাগছে না। ওর সঙ্গে কথা বলেও আরাম পাওয়া যাবে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মানুষ যারা আসবে তারা কেমন হয় সেইটেই ভাবনার। দিব্যজ্যোতি খুশি মনে ঘরের ভেতরটা লক্ষ করলেন মুখ ফিরিয়ে। আর অমনি বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কোনও আভিজাত্য নেই, দেশলাই বাক্সের মতো দেওয়াল, শুনতেই সব মিলিয়ে অনেক স্কোয়ার ফুট কিন্তু কেমন খোপ-খোপ। আজন্ম মল্লিকবাড়ির সেই বিশাল থামওয়ালা বড়-বড় ঘরে বারো ইঞ্চি দেওয়ালের মধ্যে থেকে এসে এটিকে খেলাঘর বলে মনে হচ্ছে। খেলাঘর বটে—জীবনের সব পাট চুকিয়ে, আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সব মুখের চেহারা দেখে এই খেলাঘর পেতেছে লতিকা তাকে নিয়ে।

'অত হাওয়া লাগিও না ঠান্ডা লেগে যাবে।' পেছনে এসে দাঁড়ালেন লতিকা। তারপর স্বামীর বুক গলায় একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে দিলেন। ঠান্ডা লাগছিল না কিন্তু এতে বেশ আরাম হল দিব্যজ্যোতির। হেসে বললেন, 'কলকাতা শহরে গরমকালে চাদর জড়িয়ে বসে আছি, কী কাণ্ড। শোভাবাজারে এমনটা ভাবতেও পারেনি লতিকা।' লতিকা চারপাশে তাকালেন, শুধু শূন্য মাঠ আর

দূরে-দূরে অর্ধসমাপ্ত কিছু বাড়ি। আকাশ এখন টকটকে হয়ে আছে; সূর্য ডুবুডুবু। লতিকা বললেন, 'আঃ, এত আরাম ভগবান আমার কপালে লিখে রেখেছিলেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি গো।'

দিব্যজ্যোতি তাকালেন স্ত্রী-র দিকে। বয়স সর্বাঙ্গে স্পষ্ট কিন্তু চুলে পাক ধরেনি, দাঁতও পড়েনি। একটু মোটা হয়ে গেছেন বটে লতিকা কিন্তু খাটতে দ্বিধা করেন না। এখন ওঁর দিকে পেছন ফিরে রেলিং-এ ভর করে পৃথিবী দেখছেন যে মহিলা তিনি তাঁর স্ত্রী। সাদা শাড়িতে রং খুঁজে পাওয়া ভার। দিব্যজ্যোতি ডাকলেন, 'লতু!'

লতিকা চমকে ফিরে তাকালেন। দিব্যজ্যোতি অবাক হলেন, 'কি হল, অমন করলে কেন?'

লতিকা মৃদু মাথা নাড়ালেন, 'না, কিছু না। বলো?'

'কিছু তো বটেই। বলো বলতে চাও না।' দিব্যজ্যোতি নিজের গলায় অভিমান শুনলেন।

লতিকা হাসলেন, 'কি বলছিলে বলো! বুঝেছি চা চাই।'

'তাহলে মন্দ হয় না। কিন্তু তোমার ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ!'

'চা আর ভাতের ব্যবস্থা এসেই করেছি। এ বাড়িতে আজ নতুন তোমার জীবন।'

'হ্যাঁ, কত বয়স হল?'

'বছর গুনো না। বছরের হিসেব আর ভালো লাগে না।' 'কি বলছিলে তখন?' লতিকা পাশে এসে দাঁড়ালেন।

খুব অন্তরঙ্গ কিছু কথা বুকে ছটফট করছিল দিব্যজ্যোতির। তিনি জানেন লতিকা সেই কথাগুলোর আন্দাজ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ভালোবেসে একসঙ্গে থাকলে মাটিও আকাশকে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলে নিজের কানেই অন্যরকম ঠেকবে বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, 'বলছিলাম, আমার গায়ের চাদর জড়িয়ে দিলে কিন্তু নিজে তো এই হাওয়া গায়ে মাখছ।'

লতিকার চোখ ছোট হল। তারপরেই হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'আমার কিছু হবে না। মেয়েদের ঠান্ডা কম লাগে। শোভাবাজারে শীতকালে কীরকম জামা পরতাম? শরীরে এখন এত চর্বি, ঠান্ডাটা ঢুকবে কোত্থেকে? তুমি বসো, আমি চা আনছি।'

লতিকা চলে গেলেন ভেতরে। দিব্যজ্যোতি মাথা নিচু করলেন। এই সময়টা মন্দ কি! দু-জনেই জানেন কথাটা বলা হল না কিন্তু অন্য কথার ভিড়ে তা ডুবিয়ে রাখাই মাঝে-মাঝে আরামদায়ক। সারাটা জীবন শুধু যেমন অন্যের জন্যে খরচ করে যাওয়া!

আর একটু বাদে উঠে দাঁড়ালেন দিব্যজ্যোতি। সত্যি শীত লাগছে এখন। হাওয়ার দাপট বাড়ছে, আকাশের গায়ে একটু কালো ছাপ। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নতুন বাল্বের আলোয় ঘরটা ঝকমকিয়ে উঠল। এইটে তাদের শোওয়ার ঘর। কোনওমতে একটি খাট পাতা হয়েছে। আর কিছুই সাজিয়ে রাখা হয়নি। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সুইচ টিপলেন—এটি দ্বিতীয় শোওয়ার ঘর। আপাতত এখানেই সমস্ত জিনিস স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আলমারি থেকে চেয়ার, লতিকার রান্নার সব জিনিসপত্র। এগুলোও তিনি অনেক-অনেক কাল দেখে আসছেন। শোভাবাজারের বাড়িতে যাদের মানাত এখানে তাদের দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে। এই আধুনিক ফ্ল্যাটে পুরোনো আসবাব বড় বেমানান। কিন্তু নতুন কিছু কেনার সামর্থ্য কোথায়? বাইরের ঘরের দরজায় এসে আলো জ্বাললেন। সোফাসেট। ওই টুলটা ঠাকুরমার আমলের। এখনও কীরকম চকচক করছে। হঠাৎ দিব্যজ্যোতির মনে হল, এই আধুনিক বাড়িতে তিনি বা তাঁরা কতটা মানানসই? এই গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি আর সুতির চাদর? এই সময়ে সশব্দে কলিং বেল জানিয়ে দিল কেউ এসেছে। দরজা খুলতে গিয়ে সচেতন হলেন দিব্যজ্যোতি। আগন্তুক অবাঞ্ছিত কিনা তা জানবার জন্যে এখানকার দরজায় ছোট ফুটো থাকে। তাতে চোখ রেখে ভালো লাগল তাঁর, নিবারণ এসেছে। দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে তাকালেন, 'এসো, নিবারণ।'

'সব ঠিক আছে? কোনও প্রবলেম নেই?' নিবারণ হাত তুলে প্রশ্ন করল।

'বাইরে দাঁড়িয়ে তো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। ভেতরে আসতে বলেছি।'

দিব্যজ্যোতির কথায় ভেতরে ঢুকে নিবারণ বলল, 'একি! জানালাগুলো খোলেননি কেন? ঘরে গুমোট হবে।' বলেই সে জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দিব্যজ্যোতি বাধা দিলেন, 'না-না, থাক এখন, মশা ঢুকবে।'

'মশা? নো মশা হিয়ার। থাকলে একদম রোগা পটকা।'

'থাক না। তুমি বসো। আসলে খুললেও তো বন্ধ করতে হবে।'

ততক্ষণে একটি জানালা খুলে ফেলেছে নিবারণ, 'বন্ধ করার ভয়ে খুলবেন না? ঠিক আছে, যাওয়ার সময় আমি বন্ধ করে দেব। আর দেখেছেন কি হাওয়া! কি পবিত্র!'

'পবিত্র!' দিব্যজ্যোতি চমকে উঠলেন, 'শব্দটা খুব ভালো বললে হে। তুমি কি কবিতা লেখো? পবিত্র হাওয়া। বাঃ!'

নিবারণ লজ্জা পেল, 'না-না। অশিক্ষিত মানুষ, এসব ক্ষমতা আমার কোথায়? মুখে যা আসে বলে ফেলি। বলার পরও কেউ না বলে দিলে বুঝতে পারি না কথাটা ভালো।'

দিব্যজ্যোতি ভালো করে ছেলেটিকে লক্ষ্য করলেন, যে বয়স শুনেছেন, চেহারায় সেটি মালুম হয় না। তিনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'আর সব ফ্ল্যাটের মানুষ কবে আসছেন?'

'এসে গেলেন বলে। আমরা তো তৈরি হয়ে বসে আছি। এখন ঠিক আছে, সবাই এসে গেলে একা আমায় সব ঝক্কি সামলাতে হবে। প্রাণহরিবাবু, চেনেন তো ওঁকে, ওই যে মিটিং-এর দিন যিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের ম্যানেজার। ছি, ছি, এই দেখুন বলি কথাটা ম্যানেজার কিন্তু সঙ্গদোষে জিভে যে উচ্চারণ ঢুকেছিল তাই বেরিয়ে আসে। যা বলছিলাম, প্রাণহরিবাবু মাঝে-মাঝে আসবেন এখানে। অতএব আমার একার ঘাড়ে সব। কিন্তু কাজ দেখে পালাবার পাত্র নই আমি।' নিবারণ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন, ব্যাপারটা লক্ষ করলেন দিব্যজ্যোতি।

তিনি বললেন, 'তোমরা এই বাড়িটার নাম জব্বর দিয়েছ হে!'

'তা যা বলেছেন। বাঙালি থেকে চিনে সবাই আসছেন তখন বাড়ির নাম কলকাতা ভালো মানাচ্ছে। আমি এবার উঠি।' উশখুশ করল নিবারণ।

'উঠবে মানে? এলেই বা কেন?'

'এই প্রথম সন্ধে, আপনারা আছেন কেমন দেখতে ইচ্ছে করল।'

'খুব ভালো ইচ্ছে। বসো তো! তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগছে।'

এই সময় দু-কাপ চা হাতে লতিকা দরজায় এসে দাঁড়াতেই নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল, 'ছি ছি, আপনি আমার জন্যেও চা করলেন?'

'একজনের চা তৈরিতে যে পরিশ্রম, দুজনের কিন্তু তা ডবল হয়ে যায় না, আপনি অনেকদিন বাঁচবেন!' লতিকা টেবিলে চা নামিয়ে রাখলেন।

দিব্যজ্যোতি একটু চিমটি কাটলেন, 'তুমি আবার কখন মনে করলে ওকে!'

'করেছি।' উলটোদিকের সোফায় গুছিয়ে বসলেন লতিকা।

নিবারণ একদৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকিয়েছিল। বিব্রত মুখে লতিকা প্রশ্ন করলেন, 'কি দেখছেন ওরকম করে?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি না কি বলব সাক্ষাৎ মা দুর্গার মতো দেখতে।'

হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন দিব্যজ্যোতি, লতিকার মুখে রক্ত জমল। নিবারণ তার কথায় জোর দিল, 'হ্যাঁ, আমি মিথ্যে বলছি না। আপনার দিকে তাকিয়েই কেমন ভক্তি-ভক্তি ভাব জাগে।'

দিব্যজ্যোতির গলায় তখনও হাসির রেশ, 'ঠিকই বলেছ ভাই। আমার তো সারাজীবন ওই

করে কেটে গেল।'

লতিকা কৃত্রিম রোষ দেখালেন, 'থামো তো! নিবারণবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে। আপনি না এলে আমাকেই ডাকতে যেতে হত। কিন্তু এত বড় বাড়ি একদম খালি হয়ে রয়েছে, ভয়-ভয় লাগে।'

দিব্যজ্যোতি বললেন, 'এখন বাড়ি খালি বলে ভয় পাচ্ছ, বাড়ি ভরে গেলে আবার লোক দেখে হাঁপিয়ে উঠবে।'

'উঠি উঠব তবু শোভাবাজারের বাড়ির মতো ঘরকুনো হয়ে থাকতে তো হবে না। শুনুন, ওঁকে তো বলে কোনও লাভ নেই। একটা কথাও কানে ঢোকে না। আমার একজন পুরুত চাই। ভালো পুরুত।' লতিকা আবদারের গলায় জানালেন।

'পুরুত মানে পুজো করবেন?' এই তল্লাটে কোনও পুরোহিত আছে কিনা মনে করতে পারল না নিবারণ। প্রাণহরিবাবু ব্রাহ্মণ, উনি পুরুতগিরি করেন কিনা সেটা জানা নেই।

'হ্যাঁ। গৃহপ্রবেশ করলাম অথচ একটা পুজো হল না, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। আমি তাই বেশিরভাগ জিনিসপত্রে হাত দিইনি। পুজো করার পর গোছাব। আপনি কাল সকালেই একজন পুরুত এনে দিন। খুব বড় কিছু নয়, একটা পুজো করে নেব।'

দিব্যজ্যোতি মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, 'ছাড়ো তো এসব! পুরুত নয়, আমাদের একটা ভালো কাজের লোক চাই। শোভাবাজারে যারা ছিল তারা পাড়া ছেড়ে এত দূরে আসতে চাইল না। তুমি ভাই একটি ঝি কিংবা চাকর দেখে দাও, নইলে তোমার ওই দুর্গাঠাকুরানির ফাই-ফরমাশ খাটতে-খাটতে আমার প্রাণ জেরবার হয়ে যাবে।'

লতিকা ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে বোকো না। শোভাবাজারে তো পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে। লোক আজ না-হোক কাল পেয়ে যাব কিন্তু পুরুত আমার চাই কালকেই। ভয় পেয়ো না, তোমাকে এই পুজোর ব্যাপারে কিছু করতে হবে না। এখানে কোনও ঠাকুরবাড়ি নেই?'

নিবারণ মাথা নাড়ল, 'আপনি তো কথাটা বলে ফেলেছেন, জোগাড় করার দায়িত্ব আমার। তবে একটা কথা, মন্ত্রটা নিয়ে খুঁতখুঁতুনি করবে না।'

লতিকা শিউরে উঠলেন, 'ওমা, সেকি কথা!'

দিব্যজ্যোতি হাসলেন, 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। বঙ্গগৃহিণীরা এই করেই মরল।'

'মরি নিজের বাড়িতেই মরব। বিয়ের পর থেকেই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হয়েছে। তোমার আর কী! এখন একটু হাত-পা মেলার সুযোগ পেয়েছি, হাজার হোক নিজের বাড়ি বলে কথা।'

এই সময় দুম করে আলো নিভে গেল। নিবারণ বলল, 'এই এক জ্বালা। ঘাবড়াবেন না, জেনারেটর আছে। দেখি গিয়ে।'

নিবারণ অন্ধকারেই চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দিব্যজ্যোতি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'অন্ধকারে যাবে কী করে? লতু টর্চ আনো।'

নিবারণ বললেন, 'কিছু ব্যস্ত হবেন না। প্যাঁচাদের চেয়ে খারাপ দেখি না অন্ধকারে। কলকাতায় থাকতে-থাকতে সেটাও অভ্যাস হয়ে গেছে। কাল আপনি আপনার পুরুত পেয়ে যাবেন ঠিক। সকাল-সকাল আনব।'

বাড়িটা এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। নিবারণ বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা দিয়ে লতিকা বললেন, 'এখানে ভূতের মতো বসে না থেকে বারান্দায় বসবে চলো।'

'মোমবাতি আনোনি?' দিব্যজ্যোতির উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানালা দিয়ে খারাপ হাওয়া আসছে না।

লতিকা বললেন, 'এনেছি তবে এখন খুঁজে পাব না।' বলে অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

গেলেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলেন দিব্যজ্যোতি। খালি বাড়িতে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। দিব্যজ্যোতির মনে হল খালি বাড়ি বলেই এই শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর অস্বস্তি আরম্ভ হল। যেন ঘরের মধ্যেই তিনি শব্দের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন। দিব্যজ্যোতি নিচু গলায় ডাকলেন, 'লতু!' শব্দটা যেন কয়েকগুণ জোরে কানে বাজল। তিনি ধীরে-ধীরে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে ব্যথা লাগল টেবিলের পায়ে ধাক্কা লাগায়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। শোভাবাজারে কোনওকালেও ভূতের ভয় পায়নি। ওর এক জেঠিমা তান্ত্রিকদের খুব মানতেন। বিডন স্ট্রিটে এক তান্ত্রিকের কাছে যাওয়া আসা ছিল তাঁর। তন্ত্রমতে প্রেত পাঠানো যায় কারও ক্ষতি করতে অথবা কেউ ক্ষতি করছে জানলে সেই প্রেতকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো যায় এসব কথা শুনে-শুনে নেশা চড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর মনে অন্যরকমের ভয় এল। এই বিশাল শূন্যবাড়িতে একা থাকাটাই অসম্ভব। শব্দগুলো নানারকম মানে হয়ে কানের ভেতরে ঢুকছে।

দিব্যজ্যোতি হাতড়ে-হাতড়ে বারান্দায় চলে এসে থমকে দাঁড়ালেন। লতিকা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। দিব্যজ্যোতি ঠিক করলেন চশমার কাচ এবার পালটাতে হবে। যতই অন্ধকার হোক, লতিকাকে তিনি বেশ ঝাপসা দেখছেন যেন। বাইরে অনেক দূরে টিমটিমে আলো। আর আকাশটা এখন মেঘমুক্ত কারণ ঠাসঠাস তারারা ঝকঝক করছে। দিব্যজ্যোতি আরও একটু এগোলেন। তাঁর পায়ের শব্দ এতক্ষণে লতিকার কানে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে মুখ ফেরাচ্ছে না। মজা লাগল দিব্যজ্যোতির, মেয়েদের বয়স বাড়লেও মনের মধ্যে অভিমানের বাক্সটা ঢেকেঢুকে রাখে। সময় বুঝলেই খানিকটা খুলে দেখায়। দিব্যজ্যোতি বিকেলে যেটা বলতে গিয়ে পারেননি এই আধা অন্ধকারে যখন তারার আলোর মিশেল চারপাশে, তখন দু-হাত বাড়িয়ে লতিকাকে কাছে টানলেন। লতিকার শরীরটা এই বয়সেও নরম, অন্তত তাঁর চেয়ে নরম। কাঁধে চাপ দিয়ে ওঁকে ঘুরিয়ে মুখ লাগিয়ে লতিকার চিবুক তুলে অনেক-অনেকদিন পরে চুম্বন করলেন তিনি। এক ঝটকায় মনে হল যৌবনের উচ্ছ্বাসের যে স্বাদ লতিকার ঠোঁটে পেতেন তার গন্ধ যেন নাকে লাগল। কিছু বলার জন্য তিনি মুখ খুলতে যেতেই লতিকা হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। তারপর দিব্যজ্যোতির বুকে মাথা রেখে সেই কান্নাটা গিলতে চেষ্টা করলেন।

কাঠ হয়ে গেলেন দিব্যজ্যোতি। কোনওমতে নিজেকে সামলে লতিকার পিঠে আলতো হাত বোলালেন। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, 'you must not, you must not!'

তা এসব বছর পাঁচেক আগের কথা। সময়ের চড়া পড়ে-পড়ে এত সময় কোথাও এক ফোঁটা জল নেই বলে ধারণা জন্মেছিল দিব্যজ্যোতির কিন্তু এ স্রোত চোখের বাইরে দিয়ে বয়! চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। সেই সময় লতিকা বলে উঠল, 'বড়খুকিদের আসতে লিখলাম।'

জামাই ছুটি পায়নি। দিব্যজ্যোতি মনে করিয়ে দিলেন, 'বড়খুকির মেয়ের পরীক্ষা।'

লতিকা জবাব দিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল ছুটি না পাওয়া, মেয়ের পরীক্ষা—এসব বাহানা। কেউ তাঁর ইচ্ছের দাম দিতে চায় না। কিন্তু আজ ওই বারান্দায় যাওয়ার পর, একা দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ওর কথা। মনে হচ্ছিল কোথাও কি ভুল হয়ে গেছে? সে যেসব অন্যায় করেছে, চোরের মতো চলে গিয়ে তাঁরাও কি ওকে বুঝতে ভুল করেছেন?

ছোটবেলায় ছোটখুকি বলত, 'দেখো, আমি বড় হয়ে বিয়েই করব না। বিয়ে করলেই তো তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।' দুই বোনের পার্থক্য ছিল দশ বছরের। বড়খুকির বিয়ের পরে তাঁর কান্না দেখে মেয়ে বলেছিল।

এই বাড়ি নিজের। কোনও শরিক নেই, কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। এই সুখ তাঁর অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। কিন্তু আজ কেন নিজেকে সুখী ভাবতে পারছেন না তিনি? হঠাৎ মুখ তুললেন লতিকা, 'মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কী পার্থক্য জানো? সবাইকে নিয়ে সুখী হতে না পারলে মানুষের সুখ পূর্ণ হয় না।'

'কী বলতে চাইছ তুমি?' দিব্যজ্যোতির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

'আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইব?'

'ভিক্ষে বলছ কেন?'

'ছোটখুকি, ছোটখুকির কাছে একবার যেতে চাই।'

'কেন?'

'জানি না। কিন্তু না গেলে মন শান্ত হবে না।'

'সে যদি তোমায় অপমান করে?'

'আর কখনও যাব না।'

'না লতিকা। যাকে একবার মৃত ভেবেছ, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখোনি, তাকে আর টেনে এনো না। স্মৃতি হাতড়ে পিছু ফেরা ভালো নয়। তোমার বড় মেয়েও খুশি হবে না। তা ছাড়া যে লোকটা ছোটখুকিকে পয়সার লোভে মডেলিং করায়, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা আমার নেই।' দিব্যজ্যোতি কথাগুলো বলছেন যখন তখনই আলো ফিরে এল। শোভাবাজারে লোডশেডিং শেষ হলে অনেক গলা থেকে একসঙ্গে আনন্দধ্বনি ছিটকে উঠত, কিন্তু এখানে কেউ কোনও আওয়াজ করল না। এবং তখনই দিব্যজ্যোতির খেয়াল হল নিবারণ জেনারেটর চালু করতে গিয়েছিল অথচ তার কোনও ফল পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে পরে কথা বলব।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল দিব্যজ্যোতির। লতিকা তাঁকে ডাকছেন।

'কি বলছ?' বিরক্তি মুখে, গলায়।

'বাথরুমে যাব।'

'যাবে তো যাওগে, আমাকে ডাকার কী আছে?'

'কীসব শব্দ হচ্ছে চারপাশে! তুমি একটু দাঁড়াবে?'

লতিকার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবু সেই মুচড়ানো গলায় বললেন, 'কি করব, আজ ওকে ভীষণ মনে পড়ছে। আমাকে ছোটবেলায় এইরকম বারান্দাওয়ালা বাড়ির কথা বলত!' দিব্যজ্যোতি বললেন, 'লতু! তুমিও বলেছ, সী ইজ ডেড টু আস।'

লতিকা নিজেকে মুক্ত করে ধীরে-ধীরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। দিব্যজ্যোতি একটু অসহায় চোখে তাকালেন। তাঁর শরীরে কম্পন আসছিল। হাঁটুদুটো হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। এবং এতদিন বাদে স্ত্রীকে চুম্বনের যে আনন্দ কিছুক্ষণ আগে বেলুনের মতো ফুলছিল তা এখন চুপসে গেছে। ওই কান্না একটি কারণেই আসতে পারে লতিকার, তাঁরও। দুটো মানুষের সূত্র যদি এক হয় তাহলে একের অনুকরণ অন্যে টের পাবেই। তিনি কিছুতেই মুখটা মনে করতে চাইছিলেন না, তখন বারংবার সে ফিরে আসছে। উনিশ বছর বয়সের তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ে, ছোট মেয়ে, একেবারে বিয়ে করে খবর পাঠাল সে কাজটা করেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানানোর সাহস হল না। শোভাবাজারের রক্ষণশীল বাড়ির অন্য আত্মীয়দের কথা ছেড়ে দিলেন। এই চোরের মতো কাজটার জন্যে প্রচণ্ড অপমানিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছিলেন লতিকা। বড় মেয়ে সম্বন্ধ এনেছিল। বড়জামাই-এর অফিসে কাজ করত ছেলেটি। দিল্লিতেই বাড়ি। মেয়েজামাই লিখেছিল ছোটমেয়েকে নিয়ে লতিকা যেন দিল্লিতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। সেখানেই মেয়ে দেখবে ছেলে। সেইমতো টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল আর আজই এই কাণ্ড! ছেলে ছবি আঁকে। নিজের সিগারেটের খরচ যার ছবি বিক্রির টাকায় ওঠে

না সে বিয়ে করেছে দিব্যজ্যোতি মল্লিকের মেয়েকে। লতিকা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ধরে নেবেন ছোট মেয়ে মৃত। মুখ দর্শন করবেন না ঠিক করেও দিব্যজ্যোতিকে অনেকদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। উনিশ বছর তিল-তিল করে যে স্নেহ দিয়ে ওকে গড়ে তুলেছিলেন তা মুছে ফেলা মুশকিল। কথাটা জানার পর মেয়ে আর এ-মুখো হয়নি। দিব্যজ্যোতি জানেন না ফিরে এলে তিনি কি করতেন। তাঁর বিস্ময় লাগে, উনিশ বছরের অভ্যাস ভালোবাসা পরস্পরের হৃদয়ের স্পর্শ ম্লান হয়ে গেল মেয়ের কোন আকর্ষণের তাগিদে? কয়েক বছরের বা মাসের মধ্যে একটি পুরুষ কোন জাদুতে এত মূল্যবান হয়ে ওঠে? তারপর যখন কাগজের বিজ্ঞাপনে মেয়ের মোহিনী ছবি দেখতে লাগলেন, বুঝলেন মডেলিং করছে পেট ভরাতে, তখন তলানিটুকুও চলে গেল মন থেকে।

'দাঁড়াব? আমি? বাথরুমের দরজায়? তুমি কি কচি খুকি?' লতিকা আর কথা না বলে নেমে গেলেন বিছানা থেকে। নতুন জায়গা, দেওয়ালের গন্ধ এখনও মরেনি, ঘুম আসছিল না প্রথম রাতে। তাও যদি এল লতিকার ভূতের ভয় সেটা ভাঙিয়ে দিল। বালিশে মুখ ডুবিয়ে নিজের শরীর অনুভব করেছিলেন দিব্যজ্যোতি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ বাজল। না, খালি বাড়ির শব্দ নয়, লতিকার হাত থেকে মগ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আর ঘুম আসছে না। দিব্যজ্যোতি চিত হয়ে শুতেই মনে হল লতিকা এখনও ফেরেননি। যতই হোক এতক্ষণ কারও বাথরুমে থাকা বাড়াবাড়ি। তিনি শুয়ে-শুয়েই ডাকলেন 'লতু!' কেউ সাড়া দিল না। অথচ বাথরুমটা তো লাগোয়াই। দিব্যজ্যোতি উঠলেন। চশমাটা নিতে গিয়েও নিলেন না। ভেজানো দরজা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া নেই, দিব্যজ্যোতি আবার ডাকলেন, 'লতু? তোমার হয়ে গেছে?'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেও সাড়া না পেয়ে দরজায় চাপ দিতেই বুক নিংড়ে আর্তনাদ ছিটকে উঠল দিব্যজ্যোতির। লতিকা বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন।

দৌড়ে কাছে যেতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলালেন দিব্যজ্যোতি। শরীরটা যে এত বিকল হয়েছে তা আন্দাজেও ছিল না। তাঁর নিজের বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। কোনওরকমে তিনি লতিকার শরীরের সামনে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হাত তুলে লতিকার কাঁধ ধরলেন তিনি, 'লতু লতু। কী হয়েছে লতু? কথা বলো লতু।'

কোনও সাড়া নেই। দিব্যজ্যোতি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর শরীরে এখন এমন সামর্থ্য নেই যে নিচে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করে নিবারণকে ডাকবেন। কিন্তু একজন ডাক্তার আনা দরকার এই বোধ সক্রিয় ছিল তাঁর। নিজের সমস্ত মানসিক শক্তি জড়ো করে শক্ত হতে চাইলেন তিনি। তারপর আঙুল নিয়ে গেলেন লতিকার নাকের সামনে। নিশ্বাস কি পড়ছে? বোঝা যাচ্ছে না। দিব্যজ্যোতির মনে হল তাঁর আঙুলের চামড়া এত মোটা হয়ে গেছে বয়স হওয়ায় যে সামান্য আলতো চাপে ঠাওর করতে পারছেন না। মুখ তুলতেই কল দেখতে পেলেন তিনি। কি মনে হতেই কলের মুখ ঈষৎ খুলতেই জল পড়তে লাগল লতিকার মাথায়। সেই জল তিনি হাতে নিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওঁর গলায় কপালে।

আচমকা অন্যতর ভাবনা এল। এখন লতিকা যদি এইভাবেই চোখ বন্ধ রেখে চলে যায়? ওর এই সাধের নতুন বাড়িতে লতিকা ছাড়া তিনি কেমন করে থাকবেন? শুধু বাড়ি নয়, তাঁর প্রতিদিন অভ্যাসের সঙ্গে যখন লতিকা জড়িত তখন তিনি এর পরের দিনগুলো বাঁচবেন কী করে? বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল দিব্যজ্যোতির। তিনি প্রাণপণে লতিকাকে ডাকতে লাগলেন।

এই সময় চোখ মেললেন লতিকা। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, জলের স্পর্শ এবং কানে নিজের নাম তাঁকে বিহ্বল করে তুলল এবং তখনই তিনি স্বামীর মুখ দেখতে পেলেন। ধীরে-ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন লতিকা। দিব্যজ্যোতি জিজ্ঞাসা করলেন বিপর্যস্ত স্বরে, 'কি হয়েছিল লতু, তোমার কি হয়েছিল।'

ভেজা চুল, সিক্ত জামায় শীত করল লতিকার। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'পড়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মাথাটা—।' দুটি মানুষ পরস্পরকে অবলম্বন করে কোনওক্রমে প্রচুর সময় নিয়ে খাটে ফিরে এল। লতিকা পোশাক পরিবর্তন করার শক্তি পেলেন না। সিক্তবস্ত্র মুক্ত হয়ে চাদরে শরীর মুড়ে পড়ে রইলেন একপাশে। দিব্যজ্যোতি, শক্তিহীন, চোখের সামনে অন্ধকার নিয়ে, বুকভরতি যন্ত্রণায় প্রথম পদক্ষেপ বুঝেও চাদর টেনে তাঁর পাশে শুয়ে। বালিশের নিচ থেকে কৌটো বের করে একটা সরবিট্রেট বের করে নিজের মুখে দিয়ে তারপর দ্বিতীয়টি লতিকার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিতেই শুনলেন, 'কী?'

'সরবিট্রেট!'

'থাক।'

দুটো মানুষের শরীরে সাদা চাদর এমনভাবে পাশাপাশি টানটান যে আচমকা দেখলে দুটি মৃতদেহ মনে হওয়া অস্বাভাবিক হত না। লতিকার হাত বেরিয়ে এসে দিব্যজ্যোতির হাত আঁকড়ে ধরল। বাথরুমের খোলা কল তখন একটানা জল ঢেলে যাচ্ছে।



স্বামীর আত্মা

সকালবেলার সদ্য চায়ের কাপ শেষ করেছে সৌরভ, বেল বাজল।

আজ রবিবার, ক্রমাগত বেল বাজবেই। গত রবিবারে দরজা খোলা নিয়ে তৃণার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। হকারের দল, ঝি, দুধওয়ালা থেকে শুরু করে সৌরভের বন্ধুবান্ধব আসার আর শেষ নেই। আজ সৌরভই দরজা খুলল। খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'একি? আপনারা?'

শাশুড়িঠাকরুন গম্ভীর মুখে বললেন, 'খুশি হওনি মনে হচ্ছে?'

'সেকি! আসুন-আসুন। হঠাৎ না বলে কয়ে এলেন কেন?' সরে দাঁড়াল সৌরভ।

শ্বশুরমশাই দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনু কোথায়?'

'ভেতরে। মানে রান্নাঘরে।'

সঙ্গে-সঙ্গে শ্বশুরমশাই শাশুড়িঠাকরুনের দিকে তাকালেন। যেন খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন। শাশুড়িঠাকরুন দ্রুত ছুটলেন ভেতরে। তারপরই তাঁর গলা পাওয়া গেল, 'ওগো, এদিকে এসো। তিনু লুচি বেলচে!'

'অ, লুচি বেলচে?' বলে শ্বশুরমশাই ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সৌরভ কিছুই বুঝতে পারছিল না। শ্বশুরমশাই বাইরে ঘরের সোফায় বসলেন। অগত্যা তাকেও বসতে হল। টেবিলে রাখা খবরের কাগজটি তুলে শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রোজ আনন্দবাজার পড়ো?'

'হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে ওই কাগজটা...।'

'তুমি কখন বাড়ি ফেরো? অফিস তো পাঁচটায় ছুটি হয়ে যায়।'

'কোনও ঠিক নেই। আটটা ন'টা হবে।'

'আমি যখন চাকরি করতাম তখন সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে ছ'টায় বাড়িতে ফিরে আসতাম। অতক্ষণ বাইরে কী করো?'

'এই মানে বন্ধুবান্ধব, ক্লাব—।'

'ভেগ কথাবার্তা। কোন ক্লাবের মেম্বার তুমি?'

'কেন বলুন তো?' থই পাচ্ছিল না সৌরভ।

'তুমি শেষবার আমাদের বাড়িতে কবে গিয়েছ মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মানে এত ঝামেলায় থাকি...'

'তিনু ভাইফোঁটায় গেল, তুমি গেলে না?'

'ও ওর ভাইয়ের কাছে গেল, আমি আমার বোনের কাছে গিয়েছিলাম।'

'জামাইষষ্ঠীতে যাওনি।'

'দেখুন বিয়ে হয়ে গেছে বছর আটেক, এখনও ওসব....।'

'যখন তুমি বিয়ে করেছিলে তখন সাধারণ ক্লার্ক ছিলে, এখন অফিসার।'

'আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া এটা হত না।'

এই সময় শাশুড়িঠাকরুন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু-প্লেট লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে। সামনে রেখে বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো, আগে মেয়েদের বিয়ে হত এগারো-বারো বছর বয়সে। শাশুড়ির কাছে রান্না শিখত তারা। তাই তাদের বরদের মনে হত মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছি। এখন তো বাইশ-তেইশের নিচে কেউ বিয়ে করে না। যা কিছু শিখে আসে তা নিজের মায়ের কাছেই শেখে। সে রান্না যদি বরদের পছন্দ না হয়, হতেই পারে পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু মানিয়ে নিতে দোষ কি। তোমার ধরো লাল-লাল লুচি পছন্দ, তরকারিতে মিষ্টি একদম সহ্য করতে পারো না, তিনু আবার মিষ্টি দেওয়ার ধাতটা আমার কাছেই পেয়েছে, হুট করে তো টেস্ট পালটাতে পারে না।'

'সৌরভ হতভম্ব গলায় বলল, 'এসব কথা উঠছে কেন?'

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন। তিনি মাথা নেড়ে কিছু ইশারা করতে গিয়েই সামলে নিলেন, বললেন, 'খাওয়া যাক। ঠান্ডা করে লাভ নেই।'

এই সময় আবার বেল বাজল। সৌরভ গেল দরজা খুলতে। ভবমামা দাঁড়িয়ে আছেন। কলকাতা পুলিশের জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। এখনও তাঁর খুব প্রতাপ। ওদের বিয়েটা ভবমামাই দিয়েছেন সম্বন্ধ করে।

'বাড়ির খবর কী?' হুঙ্কার উঠল।

'ভালো।' মিনমিন করে বলল সৌরভ, 'গত পাঁচ বছর ভবমামা এখানে আসেননি।'

'তাহলে বাড়িতে ঢুকতে পারি?' জিজ্ঞাসা করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ভবমামা ভেতরে ঢুকলেন। ঢোকামাত্র তাঁর নজরে পড়ল শ্বশুরমশাই লুচি দিয়ে বেগুনভাজা মুড়ছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গলা থেকে শব্দ বের হল, 'যাক, মিত্তিরমশাই তাহলে জামাই-এর বাড়িতে এসে লুচি খাচ্ছেন। আমি তো ব্রেকফাস্ট না করেই ছুটে এলাম!'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'আপনি কি লুচি খাবেন?'

'নো। শসা টোস্ট, ঘি এবং জেলি ছাড়া আর দু-মুঠো মুড়ি।' ভবমামা সোফায় বসলেন। বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ভাগ্নে হয়ে তুমি, তুমি—।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' সৌরভ কাতর গলায় বলল।

'লুচি খাও? তুমি জানো না লুচি একটা মানুষকে খুন করতে পারে?'

'সপ্তাহে একদিন। আমাকে মা প্রতি রবিবার সকালে লুচি ভেজে দিতেন।'

'দিদির কোনও ডিসিপ্লিন সেন্স ছিল না। তোমার বাবা ব্লাড সুগার, ক্লোরোস্টাল, ইউরিক অ্যাসিড কাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ওইসব খাবার খেয়ে-খেয়ে। আমি তো দিদিকে বলেছি জামাইবাবুকে তুমিই খুন করেছ। তাই আত্মগ্লানিতে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করল।' ভবমামা সশব্দে নিশ্বাস ছাড়লেন।

শ্বশুরমশাই-এর লুচি বেগুনভাজা পোরা হাঁ-মুখ বন্ধ হল না, 'সৌরভের মা আত্মহত্যা করেছেন একথা বিয়ের আগে বলেননি কেন?'

'বললে বিয়ে দিতেন না?' ভবমামা সটান জিজ্ঞাসা করলেন।

'আলবত দিতাম না।'

'ব্যাপারটা ভাবার বিষয়। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর দিদির মনে বৈরাগ্য এল। তিনি লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস তো ছাড়লেনই, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় চারটি ভাত আর একটু তরকারি খেতেন। তারপর সারা বিকেল-সন্ধে-রাত অম্বলের জ্বালায় জ্বলতেন। কাউকে কিছু বলেননি। যখন ধরা পড়ল তখন সিরোসিস অব লিভার। বেশি মদ্যপান করলে যে রোগ হয়। তা আপনি একে আত্মহত্যা বলবেন না মিত্তিরমশাই? জামাইবাবু যদি আমার মতো শসা-টোস্ট-মুড়ি খেতেন তাহলে দিদিকে বিধবা হতে হত না, আর তাহলে সিরোসিস অব লিভারের প্রশ্ন উঠত না।'

এই সময় শাশুড়িঠাকরুন একটা শসা চার পিস করে কেটে দুটো সেঁকা পাঁউরুটির সঙ্গে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এক বাটি শুকনো মুড়ি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন তো?'

'কোথাকার চা?' ভবমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরটা সৌরভকেই দিতে হল, 'কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে।'

'মাই গড! কোন বাগানের চা? দার্জিলিং, ডুয়ার্স না আসাম?'

'হ্যাপি ভ্যালি।'

'গুড। চিনি এবং দুধ ছাড়া।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে-না-হতেই আবার বেল বাজল। সৌরভ দরজা খুলে দেখল রোগাসোগা একজন দাঁড়িয়ে আছেন।

সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন?'

'আপনি মিস্টার সৌরভ দত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আমি লোক্যাল থানার ওসি।'

'ও।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'রান্নাঘরে, লুচি ভাজছে।'

'লুচি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গ্যাসে, না কেরাসিনে?'

'গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল দেবে বলেছে। কেরাসিনেই ভাজছেন।'

'মিস্টার ভবরঞ্জন বসু আপনার মামা?'

'হ্যাঁ। উনি ভেতরে আছেন।'

'ও, তাই নাকি?' ওসি ভেতরে এলেন। ভেতরে এসে মামাকে বললেন, 'আমি এসে গিয়েছি মিস্টার বোস।'

ভবমামা বললেন, 'জীবনে প্রমোশন হবে না।'

'আমি ঠিক...' ওসি থতমত হয়ে গেলেন।

'কেরাসিনের ভয়ঙ্করত্ব জানা সত্ত্বেও আপনি কোনও স্টেপ নিলেন না। উলটে এখানে এসে মিস্টার বোস মিস্টার বোস করছেন। আমাদের আমলে রিটায়ার্ড সিনিয়ার অফিসারদেরও আমরা স্যার বলতাম।' ভবমামা গম্ভীরমুখে শসা চিবোতে লাগলেন।

ওসি ব্যস্ত হয়ে উঠতেই শাশুড়িঠাকরুন তাঁকে জানালেন স্টোভ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপাতত চিন্তার কোনও কারণ নেই। শ্বশুরমশাই ওসিকে বসতে অনুরোধ করলেন। ওসি চেয়ারে বসে ভবমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'স্যার, এবার কী করতে হবে?'

ভবমামা শাশুড়িঠাকরুনকে বললেন, 'মিসেস মিত্তির, আপনি শুরু করুন।'

শাশুড়িঠাকরুন শ্বশুরমশাই-এর দিকে তাকালেন, তিনি মাথা নাড়লেন। শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'কী বলব! এসব তো আমাদের আমলে কখনও ছিল না।'

'কীসব?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

ভবমামা বলে উঠলেন, 'হচ্ছে না। এভাবে হবে না। বউমা কোথায়? বউমা?'

তৃণা মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে।

'এঃ, সাতসকালে ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে গেছে। এত টেনশন হচ্ছে কেন তোমার?'

সৌরভ বলল, 'আজ্ঞে রান্নাঘরে খুব গরম তো!'

'গরম যদি মনে হয়ে থাকে তাহলে ফ্যান লাগাওনি কেন?'

'গ্যাস স্টোভ নিভে যাবে যে।'

'রাবিশ। হ্যাঁ বউমা, ইদানীং তোমার কী হয়?'

তৃণা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর সৌরভের দিকে তাকাল, 'তুমি কিছু মনে করবে না তো? বিশ্বাস করো, আমি একটুও বিশ্বাস করি না, তবু ভয় হয়।'

ভবমামা বললেন, 'ভয় হয়? ওসি নোট করুন। কেন ভয় হয়?'

'খবরের কাগজ পড়ে।'

'কী পড়ো তুমি?'

'গত তিনমাসে একশো বাইশটা বউ হয় খুন হয়েছে নয় আত্মহত্যা করেছে।'

ওসি চমকে উঠলেন, 'মাই গড! স্ট্যাটিস্টিকসটা পেলেন কি করে?'

'খবরের কাগজ থেকে। আমি লিখে রেখেছি।' তৃণা দ্রুত একটা খাতা নিয়ে এল। ভবমামা সেটা নিয়ে চোখ বোলালেন, 'মগরার নমিতা মণ্ডল, গুসকরার অঞ্জলি দাস, লিলুয়ার কৃষ্ণা দত্ত...ও, এগুলো খুনের লিস্ট। আত্মহত্যার লিস্টটা দেখছি বেশ বড়। আত্মহত্যার আবার রকমফের আছে, কেরাসিনের আগুনে, গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে। শেষের দুটো সংখ্যা দেখছি খুবই কম।'

ওসি খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব খবর কাগজে পড়ে আপনার নিজের জন্যে ভয় করে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয় আপনার অবস্থা এইসব মহিলার মতো হতে পারে?'

তৃণা জবাব দিল না। শাশুড়িঠাকরুন ওর পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, 'জবাব দে, তিনু। তোর চিঠি পড়ে আমাদের প্রেশার বেড়ে গেছে। সবাইকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি।'

হঠাৎ ভবমামা বলে উঠলেন, 'ওই ছোকরা তোমাকে খুন করতে পারে বলে সন্দেহ করছ?'

'আজ্ঞে না। তবে—।'

'তবে কী?'

'ওইসব স্বামীরাও তো ভালো ছিল। কাঁপা গলায় জবাব দিল তৃণা।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সব জামাই প্রথম-প্রথম সোনার টুকরো থাকে।'

ওসি বললেন, 'এক মিনিট। বিয়ের সময় যা-যা পণ জামাই চেয়েছিল দিয়ে দিয়েছেন?'

ভবমামা মাথা নাড়লেন, 'নো। সৌরভ এক পয়সা পণ নেয়নি।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কথাটা সত্যি।'

'আপনার স্বামীর জীবনে অন্য কোনও মহিলা এসেছে?'

'কী করে বলব?'

'বলব মানে? স্ত্রীদের ঘ্রাণশক্তি ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।' ওসি বললেন।

'আমি বুঝতে পারি না।'

'তাহলে আসেনি। থার্ড পয়েন্ট, আট বছরে আপনাদের কোনও ইস্যু হয়নি?'

'না।'

'এটা একটা সিরিয়াস পয়েন্ট। কিন্তু ম্যাডাম, কী থেকে মনে হল আপনার স্বামী আপনাকে খুন করতে পারেন?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার ঠিক তা মনে হয়নি, আবার...। আসলে রেগে গেলে ওর চোখ খুনির মতো হয়ে যায়। তখন চিনতে পারি না ওকে।'

'তাই! রাগে কেন?'

'রান্না ভালো না হলে রেগে যায়, এক কথা বারবার বললে রেগে যায়...!'

'তখনই খুনি-খুনি দেখতে হয়ে যায়?'

'ওর চোখদুটো।'

ভবমামা শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'মাতুল বংশের ধারা। আমারও নাকি ওরকম হয়।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'আপনি অবিবাহিত, আপনার চোখ নিয়ে কে ভাবছে?'

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে-কে থাকেন?'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'কেউ না। একটা ঠিকে ঝি আছে। সে দেখছি আজ আসেনি।'

ভবমামা বললেন, 'তাহলে তো বউমাকে সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। ক্রিমিন্যাল।'

এতক্ষণ সৌরভ অসহায় হয়ে শুনে যাচ্ছিল। এবার না বলে পারল না, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি ওকে খুন করতে যাব কেন? তৃণা, তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস করো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'ও তোমাকে অবিশ্বাস করে না। কিন্তু চারপাশে যা ঘটছে, সেটা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে তোমার বাবা-মা-কাকা-জেঠা থাকলে তো ও ভয় পেত না!'

ভবমামা বললেন, 'এটা কীরকম কথা হল? বিয়ের সময় ছেলে বউকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে শুনে খুশিতে ডগমগ হয়েছিলেন, কী হননি?'

'তখন এত খুন আত্মহত্যা হত না।' শাশুড়িঠাকরুন বললেন।

ওসি বললেন, 'দাঁড়ান। আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে দিন। তৃণা দেবী, আপনার কি মাঝে-মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে?'

'তৃণা মাটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'সবর্নাশ! কেন করে?' ওসি চিৎকার করে উঠলেন।

'ও যখন আমাকে ভুল বুঝে রেগে যায়, তখন।'

'আপনি ডিভোর্স চান?'

'ওমা, কেন? ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না। পারব না বলে খুন হতে অথবা আত্মহত্যা করতে একদম চাই না।' তৃণা জোরে-জোরে মাথা নাড়ল।

ওসি ভবমামার দিকে তাকালেন, 'স্যার, আপনি তো আইন জানেন। আগামের ব্যবস্থা এখানে আছে। আগাম জামিন যেমন নেওয়া যায় তেমনই আশঙ্কার কথা থানায় জানানো যায় আগাম। সেটা কেউ করলে পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য।'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'সেটা আমি লিখিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি।'

ওসি বললেন, 'আপনি নন, ওঁকে জানাতে হবে। সেটা পাওয়ামাত্র আমি সৌরভবাবুকে জানিয়ে

দেব যে তৃণা দেবীর আত্মহত্যা অথবা খুনের দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়বে। অন্য কেউ করলেও তিনি রক্ষা পাবেন না।'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'চমৎকার! আমার মেয়েটা যদি খুন হয়ে যায় তাহলে তাকে কোথায় পাব আমি? খুন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন।'

এই সময় আবার বেল বাজল। সৌরভ উঠল না। তৃণাই গেল দরজা খুলতে। একটা বারো-তেরো বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, 'কালোর মা তোমাদের বাড়িতে কাজ করে?'

'হ্যাঁ, কেন রে?'

'আমাকে বলতে পাঠাল আজ আসতে পারবে না। কাল আসবে।'

'কী হয়েছে ওর?'

'কাল রাতে কালোর বাপ মারা গিয়েছে। বডি আনতে হাসপাতালে গেছে সবাই।'

'সেকি, কী করে হল?'

'কী করে আবার? মাল খেয়ে গাড়ির তলায় পড়েছে। সবাই বলছে কালোর মা বেঁচে গেল। খুব প্যাঁদাত তো! কান্নাকাটি করছে না। আমায় বলল খবরটা দিতে।'

এ ঘরের সবাই শুনছিল সংলাপগুলো। ওসি বললেন, 'ও, ওই লোকটার বউ বুঝি এখানে কাজ করে! হ্যাঁ, কাল মারা গিয়েছে। গিয়ে ফ্যামিলিটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যাক গে, সৌরভবাবু, আপনাকে আমার শুধু একটা কথা বলার আছে। মেয়েদের মন খুব টেন্ডার হয়, সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন। আচ্ছা চলি স্যার।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সৌরভ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'না, কেন? ও, আরে বইতে তো পড়েছি। কুসুম কোমল। হে হে হে।' ওসি চলে গেলেন।

ফিরে এসে সৌরভ বলল, 'তৃণা, আমার মনে হয় তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

'একদম নয়। বিয়ের পর কেউ বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে নাকি?' তৃণা প্রতিবাদ করল।

'এই যে আজ যা করলে—।'

'আমি কিছুই করিনি। দেখেছ মা, খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছে। একটু পরেই ওর চোখ লাল হয়ে যাবে, ঠিক খুনির মতো।' তৃণা মায়ের কাছে চলে গেল।

ভবমামা বললেন, 'না সৌরভ, চোখ লাল করার অভ্যেস ছাড়ো। আমার মনে হয় এখন তোমার উচিত ছোটদি, তোমার মেজমামি, বড়মামিদের ডেকে এনে পালা করে বাড়িতে রাখা। আমিও মাঝে-মাঝে থাকতে পারি। আপনারাও আসুন। কী বলেন?'

শাশুড়িঠাকরুন বললেন, 'জামাই-এর বাড়িতে তো বেশিদিন থাকা শোভন নয়, মেয়েজামাই আমাদের ওখানে পাকাপাকি থাকতে পারে।'

তৃণা বলল, 'এখন না মা। ক'টা দিন দেখি, তারপর বলব।'

দুপুরের স্নানখাওয়া শেষ করে ওঁরা বিদায় নিলেন। সৌরভের মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। তৃণাকে সে এত ভালোবাসে, তবু ও তাকে এতটা সন্দেহ করে! কেউ সন্দেহ করলে তার মন জোর করে পরিষ্কার করা যায় না। কালোর বাবার সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই। তবু লোকটা মদফদ খেয়ে জীবনটা তার মতো উপভোগ করে গেছে। নিজেকে প্রচণ্ড অপমানিত বলে মনে হচ্ছিল তার।

এই সময় তৃণা কাছে এল, 'এই, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

সৌরভ জবাব দিল না।

'আসলে জানো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মেলে না।'

'এতদিন বলোনি তো?'

'বললে তুমি শুনতে? আমার যা করতে ইচ্ছে করে তা তোমার ভয়ে করতে পারতাম না।'

'তাই নাকি? যেমন?'

'যেমন ধরো, আমার কোনও ছেলেবন্ধু নেই। বিয়ের আগেও ছিল না, এখন তো কথাই ওঠে না। কিন্তু বইতে পড়ি দ্রৌপদীর সখা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকে ওই ইচ্ছের কথা বললে তুমি শুনতে?'

'বেশ তো, এখন যাও না, শুধু কৃষ্ণ কেন আরও চার পাণ্ডবকে ডেকে আনো।'

'ধ্যাত! ওটা বিশ্রী ব্যাপার।' তৃণা চলে গেল, যেন লজ্জা পেয়েছে।

রাত্রেও তেমন কথা হল না। কথা বলতে ইচ্ছেই করছিল না সৌরভের। কিন্তু সে খুব চেষ্টা করে ক্রোধ সংবরণ করছিল।

পরদিন সকালে কালোর মা এল, 'কাল কামাই করতে হল, কিছু মনে কোরো না বউদি। লোকটা হাজার হোক মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। বডি বের করে না পুড়িয়ে থাকি কী করে!'

'তোমার একটুও কষ্ট হয়নি?' তৃণার গলা।

'নাঃ। বেঁচে থাকতে যা কষ্ট দিয়েছে তাতে সব সয়ে গেছে।'

'এক ফোঁটা কাঁদোনি?'

'না, কাঁদব কেন? বেঁচে গেছি আমি। ও না মরলে আমাকে ঠিক খুন করত।' কাজে লেগে গেল কালোর মা।

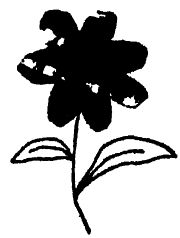
পায়ে-পায়ে ঘরে এল তৃণা। বিছানায় বসে পাথর হয়ে কথাগুলো শুনছিল সৌরভ। তৃণা এসে ওর গায়ে ঠেলা দিল, 'এই, কী ভাবছ? যাঃ, এরকম করে বসে থেকো না। বিধবা হওয়ার কথা ভাবলে আমার এখনই কী কান্না পায়, এই জানো?'

'তখন কেঁদে কি লাভ হবে?' অদ্ভুত গলায় বলল সৌরভ।

'শুনেছি বিধবা বউ কাঁদলে স্বামীর আত্মা শান্তি পায়। বাঙালি মেয়ের উচিত স্বামীকে শান্তি দেওয়া, তাই না? ওঠো বলছি।' তৃণা হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রেগে যেতে-যেতেও নিজেকে সামলে নিল সৌরভ। চাপা গলায় বলল, 'তুমি আমাকে অপমান করেছ।'

তৃণা চেঁচাল, 'মোটেই না, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমি আত্মহত্যা করলে বা খুন হলে পুলিশ তোমাকে ধরতই। সারাজীবন ধরে জেলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে তা থেকে বেঁচে গেলে, একটু কৃতজ্ঞ হও, প্লিজ।'



মানুষের মেটে

এতকাল বাবুর যত রোগ ছিল মনে, এবার শরীরেও। রাত তিনটে পর্যন্ত মাল খেলে সারাটা সকাল পেট চেপে পড়ে থাকে বাবু। তখন ওই বিশাল শরীর থেকে কুঁই-কুঁই শব্দ বের হয়। ঘনঘন ওষুধ ঢালে মুখের গর্তে। ইদানীং এই অবস্থা চলে দু-তিনদিন ধরে। হরিমাধব ডাক্তার এসে গম্ভীর মুখে বলে, 'এবার ওসব ছাড়ুন। লিভারের আর দোষ কি! পচে গেল বলে।'

তা বাবু যখন শুয়ে-শুয়ে ওষুধ গেলে তখন পারোর ছুটি। কিন্তু ছুটি বলতে যে বাড়ি ছেড়ে যাবে তার উপায় নেই। বাবুকে বিশ্বাস নেই। যন্ত্রণা কখন কমবে কেউ বলতে পারে না। আর কমলেই

কমলি এসে মুখ নাড়বে, 'যাও, গাড়ি বের করো। বাবুর বেরুবার মন হয়েছে।'

এ তল্লাটে বাবুর বাড়ি যে দ্যাখে তারই বুকে বেড়াল আঁচড়ায়। অনেকখানি বাগান, সিমেন্ট কাঠ মিশিয়ে প্রাসাদের মতো দোতলা বাড়ি। বাগানের কোণে ছোট্ট ঘরে ডায়নামো আছে। জলঢাকা যখন আলো দিতে পারে না তখন এই ডায়নামো চলে। বাবুর কেউ নেই। বাচ্চা হয়নি। বউ গিয়েছে বছরখানেক আগে পরপুরুষের সঙ্গে ভেগে। আড়াল-আবডাল পেলে কমলি বলে, 'ভাগবে না কেন? আমি হলেও ভাগতাম।'

মালিকদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু বাবুর দৌলতে পারোকে চেনে না একশো কিলোমিটারের মধ্যে কেউ নেই। দশ বছর চাকরি হয়ে গেল এ-বাড়িতে। দুটো জিপ কেনাবেচা হয়ে গেল। কিন্তু কখনও আগবাড়িয়ে কথা বলার অভ্যেস তৈরি হল না। ভোররাতে জিপ নিয়ে ছুটেছিল হরিমাধব ডাক্তারের বাড়ি। হেঁটে আসলে বুড়ো সাতকাহন গাইবে। জিপে বসে বলল, 'আবার মাল খেয়েছে বুঝি? আর বাঁচানো গেল না হে! এত টাকা নয়ছয় করছে, ভেলোরে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আনে না কেন বুঝি না। লিভার খসবে এবার।'

শব্দটা ক'দিন এতবার কানে এসেছে যে অজান্তেই নিয়মভঙ্গ করল, 'লিভার কী?'

ডাক্তার বললেন, 'অ্যাঁ? লিভার জানো না? মেটে। মেটে বোঝো? খাসির মেটে খাও না? তা ওরকম মেটে মানুষের পেটেও থাকে। লাল টুকটুকে। যেই ঘোচে লাল অমনি আসে কালো।'

ওষুধপত্র দিয়ে যাওয়ার আগে ডাক্তার বলে গেল, 'আর আমাকে ডাকবেন না। কোনও কথা শুনছেন না, এর পরে যদি আর এক ফোঁটা অ্যালকোহল পেটে যায় তো শিবের সাধ্যি নেই কিছু করে।'

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পারো কথাগুলো শুনল। বাবু পড়ে আছে মড়ার মতো। কে বলবে কাল বিকেলে সেজেগুজে ওই মানুষ তার জিপে উঠেছিল। উঠে বলেছিল, 'অনেকদিন জুয়ো খেলিনি রে। চল একটু শিবু রায়ের জোতে।' যতই সাজুক বাবুর চোখের তলায় পোড়া হাঁড়ির ছোঁয়া, গায়ের চামড়ায় কালচে ছাপ মাখামাখি। কুড়ি কিলোমিটার জঙ্গুলে রাস্তা পেরিয়ে ডায়না নদীর গায়ে শিবু রায়ের জোতে পৌঁছে দেখতে পেয়েছিল, আরও গোটাতিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নামবার আগে একশো টাকা একটা বান্ডিল ছুঁড়ে দিল বাবু পারোর কোলে, 'এটা সামলে রাখ।' বলে নেমে গেল। ইস্ত্রি করা ঝকঝকে একশো টাকাগুলো কেমন টাইট হয়ে শুয়ে আছে তারের বাঁধনে। এত টাকা সে রাখবে কোথায়? বাকি তিনটে গাড়ির কোনও ড্রাইভার নেই। শিবু রায়ের এই জোত হল জঙ্গলের এক ধারে। অন্তত এক মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই। মেরুদন্ড সোজা করে বসে রইল পারো। বাবু যখন বের হল তখন শিয়ালদের ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে জোনাকি ছিটকে দিচ্ছে আলো। বাবুর পা জড়ায়নি, গলাও। তবে মদের গন্ধ বড় কড়া। গাড়িতে উঠে বসে হাসল বাবু, 'লাকটা খারাপ গেল। দু-হাজার ফুড়ুৎ। চল এবার বিনাগুড়ি।'

এইরকমই আশঙ্কা করছিল পারো। কিন্তু শিবু রায়ের জোত থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে বিনাগুড়ি ছাড়িয়ে নয়াবস্তি পর্যন্ত আসতে একটাও কথা বলেনি, বরং শুনেছে। গাড়িতে হেলান দিয়ে বাবু একটা লাইন বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছে, 'এবার কালী তোমায় খাব।'

পারো জানে কালী মানে কালীমার্কা। শিবু রায়ের জোতে বাবু খেয়েছে ভুটানের মদ। বিউটির ওখানে কালীমার্কা হাঁড়িয়া। মেয়েছেলেটার বয়স হয়েছে। গায়ের রং ফরসা। এককালে শিলিগুড়িতে ছিল। বাবুই এই নয়াবস্তিতে এনে তুলেছে। নাক মুখ চোখ ভালো। কিন্তু গতর যা, তিন বাঘ বলবে কাল আবার খাব। যেমন গতর তেমন গলা। ওই গলার দাপটে বস্তির সবাইকে কেঁচো বানিয়ে রেখেছে বিউটি। বাবু গেলেই একপ্রস্ত গালাগাল শুরু হয়ে যায়। তারপর হাত ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। মাঝরাত্রে পারো যখন জিপে বসে ঢুলছে তখন কানের কাছে চিৎকার শুরু হয়, 'আরে এ বাদশাকা বেটা, এটা তোর ঘুমোবার জায়গা? নে, ধরে তোল বাবুকে। ঠিকঠাক নিয়ে যাবি। জোরে

চালাবি না। হ্যাঁ, কাল যেন ঠিক সময়ে নিয়ে আসিস।'

পারোকে হাত লাগাতে হয়। বাবু তখন সিটে ঢলে পড়ে। পড়তে-পড়তে বলে, 'গুডনাইট বিউটি।'

তারপর গাড়ি চলতে শুরু করলে হাসল, 'কিছু মনে করিস না পারো। আমাকে তো কেউ বকে না, তাই এখানে আসি। মাঝে-মাঝে বকুনি খেতে খারাপ লাগে না।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কালকের রাত্রের ঘটনাটা দু-তিনবার ভাবল। ডাক্তারকে পৌঁছে দিয়ে এসে বাগানে ঢুকে ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবুর মেটের রং পালটাচ্ছে? নিজের পেটে হাত দিল সে। প্রত্যেক মানুষের পেটে মেটে আছে? যতক্ষণ টুকটুকে লাল ততক্ষণ কোনও অসুবিধে নেই, যেই রং পালটায় তখনই গোলমাল। বাবুর বাড়িতে মাংস সপ্তাহে তিনদিন। কমলির মন ভালো থাকলে মাঝেমধ্যে তার ভাগ্যে মেটে জোটে। শেষ কামড় দেবে বলে সে সরিয়ে রাখে পাতের ধারে। মানুষের মেটে আর পাঁঠার মেটেতে তফাত কি? কোনও-কোনও মানুষ নাকি মানুষ খায়। তারা মেটেও খায়? নাভিতে হাত বোলালো পারো। চোখের তলায় কালি নেই, মুখে ছায়া নেই, শরীরে তাগদ আছে এরকম মানুষ মানেই তার মেটে টুকটুকে লাল। ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছিল পারোর। কাঠের কল পরিয়ে শের আলির দোকানে ঝুলিয়ে রাখা মাংসের সঙ্গে মেটেও থাকে। দেখতে কি মোলায়েম। তা সবগুলোই যে খুব লাল তা নয়, কিন্তু যে-গুলোয় হলদে ছিটে লেগেছে সেগুলো বিক্রি হতে চায় না। শেষমেশ কেটেকুটে মিশিয়ে দেয় শের আলি। পাঁঠা তো মাল খায় না, তাহলে তাদের মেটে অমন হয় কেন? অবশ্য হলদে ছিটে-লাগা আর পচে যাওয়া এক জিনিস নয়। পেটের ভেতর মেটে পচলে কি চেহারা হয় ঠাহর করতে পারল না পারো।

বাগানে দাঁড়িয়ে সে যখন পেটে হাত বোলাচ্ছে তখন কমলি বেরিয়ে এল। হনহন করে হেঁটে আসছে বাড়ি থেকে। ওর স্পষ্ট মনে হল, কমলির মেটে নিশ্চয়ই টুকটুকে লাল। চেহারা যা তাতে খুব বড় সাইজের মেটে আছে বলে মনে হয় না। কমলি যে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কোমরে হাত রেখেছে তা খেয়াল করেনি পারো। ধমকানিতে চটক ভাঙল, 'ও মাগো! অমন ড্যাবডেবিয়ে আমার পেটের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

থতমত খেয়ে সত্যি কথা বলে ফেলল পারো, 'মেটে দেখছিলাম।'

'মেটে?' আকাশ থেকে পড়ল কমলি, 'কীসের মেটে?'

সম্বিৎ ফিরে পেল পারো। মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু না।'

'অ, বাবু মরছে যন্ত্রণায় আর উনি মেটের স্বপ্ন দেখছেন! বাবু দেহ রাখলে কি হবে ভাবতে পারছ? কার জিপ চালাবে তখন? কেন নিয়ে গিয়েছিলে কাল ওই বিনাগুড়ির রক্তচোষার কাছে?' কমলির প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না সে। কি উত্তর হবে এর!

জবাবের জন্যে বসে রইল না কমলি, 'ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আমার কি! এ-বাড়িতে ঝি-গিরি করি। বাবু মরলে আর এক বাড়ি কাজ খুঁজে নেব। কিন্তু যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো একটা কিছু করতে হবে। কি বলো?'

সে মাথা নাড়ল। বাবুর জন্যে যদি ওষুধ আনতে কলকাতায় যেতে হয় তাও সে রাজি। কমলি খুশি হল, 'তাই বলি কি, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে আনো।'

'কাকে?' পারোর চোখের সামনে বিউটির বিশাল চেহারা ভেসে উঠল।

'বউদিকে। এখনও তো বিয়ে করা বউ। আইনের ছাড়াছাড়ি তো হয়নি।'

'তিনি তো নিজেই চলে গেছেন, আসবেন কেন আবার?'

'কিছুই বলা যায় না। গিয়ে বলতে দোষ কি।'

'বাবু বলেছিল, আর মুখ দেখবে না। আমি নিজের কানে শুনেছি। শিবু রায়ের জোতে বসে এক বন্ধুকে বলেছিল, খাঁচা থেকে যে পাখি উড়ে যায় আমি তার মুখ দেখি না।'

'ওসব রক্ত গরম থাকলে পুরুষমানুষ বলে।'

'ও। তিনি কোথায় আছেন তা তো আমি জানি না।'

'আমি জানি। বউদির বোনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে। সিনেমা হলের বাঁ-দিকে তিনতলা হলুদ বাড়ি। এই বেলা চলে যাও।'

'জলপাইগুড়িতে তিন-তিনটে সিনেমা হল, কোনটার পাশে?'

'সে আমি জানি না। যে সিনেমা হলের সব কথা বাড়িতে বসে শোনা যায়।' বলেই ছুটল কমলি। পারো ওর পিছু নিল। বাবুর শোওয়ার ঘরে কমলি যত সহজে ঢোকে, সে পারে না। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল বাবু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কমলিকে দেখে কাতর গলায় বলল, 'ডাক্তারবাবুকে ডাক।'

কমলি মুখ ফিরিয়ে পারোর দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'আচ্ছা।'

বাবু বলল, 'পাপ—! আমি তো কোনও পাপ করিনি কমলি। তবে আমার এই দশা কেন?'

কমলি জবাব না দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, তবু। এবং তখনই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পারোর মনে পড়ল সেই একশো টাকার নোটের বান্ডিলটা বাবু চেয়ে নিয়েছিল বিনাগুড়িতে বস্তিতে নামার আগে, সেটা তো ফিরে আসেনি। এইভাবে টাকা বিলিয়ে দেওয়া পাপ কিনা তা তার বোধগম্য হল না। সে দেখল কমলি তাকে ইশারা করছে যাওয়ার জন্যে।

গাড়িতে তেল না থাকলেও অসুবিধে নেই। মন্টুর পাম্প থেকে অ্যাকাউন্টে তেল নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আজ কিন্তু মন্টু মাথা নাড়ল, 'গতমাসের টাকা এখনও পাইনি, ওটা ক্লিয়ার না করলে দিতে পারব না।'

এই গলায় কখনও কথা বলে না মন্টু। পারো বলল, 'বিশ লিটার দিয়ে দাও, পরে কথা হবে।'

'পরে আর চান্স পাব নাকি? হরিমাধব ডাক্তার তো জবাব দিয়ে দিয়েছে, টেঁসে গেলে দাম কে দেবে?'

প্রায় মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পর বিশ লিটার তেল ট্যাঙ্কে ভরতে পারল পারো। গতকালও যে ফুল ট্যাঙ্কিতে আপত্তি করত না, আজ তার পরিবর্তন দেখে সে হিসাব মেলাতে পারছিল না। পাঁচজন সাক্ষী খাড়া করে রাখল মন্টু আজ। মোড়ে দাঁড়াতেই যার সঙ্গে দেখা হল সে-ই জিজ্ঞাসা করে বাবুর খবর। যেন কখন মরবে সেটাও পারো বলতে পারে। মানুষগুলো একটা মৃত্যুর খবর নিচ্ছে অথচ মুখেচোখে একটুও দুঃখ নেই। যে লোকের টাকা থাকে আর সেইসঙ্গে মনের রোগ, তার শরীরের কলকবজা বিকল হলে সাধারণ মানুষের এত সুখ হয় কেন? জিপটা নিয়ে শের আলির দোকানের সামনে পৌঁছে সে ব্রেকে পা রাখল। শব্দ শুনে শের আলি মুখ তুলে তাকাল। মাংস যা বিক্রি হওয়ার সকালেই হয়ে গেছে। কাজের দিনে একটার বেশি কাটে না শের আলি। আজ অর্ধেকও বিকোয়নি। জিপে বসেই ও পাঁঠার মেটে দেখতে পেল। অর্ধেক বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু টুকটুকে লাল ফুলের মত জ্বলছে বাকিটা। নেমে এল পারো। তাকে নামতে দেখে শের আলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? আজ নিশ্চয়ই মাংস চাই না!'

'কেন?' পারো একবার শের আলি আর একবার ঝুলন্ত মাংসের সঙ্গে লেগে থাকা মেটের দিকে তাকাল।

শেয আলির চোখের তলায় কালো ছাপ, শির বের করা রোগাটে শরীর। পারো শের আলির নিজস্ব মেটেটা পরিষ্কার দেখতে পেল। ফ্যাকাশে মেরে গেছে, শুকনো, ছিবড়ে-ছিবড়ে। যে রেটে হাঁড়িয়া খায় তাতে এতকাল পচেনি কেন সেটাই বোঝা যায় না। ওর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শের আলি খুব অস্বস্তিতে পড়ল, 'অ্যাই, কি দেখছ? বাবু তো শুনলাম মরবে আজই, এখন মাংস নিয়ে কি হবে?' মনে-মনে শের আলির জন্যে একটা কষ্ট তৈরি হল। লাল টুকটুকে মেটে বিক্রি করছে যে তার নিজের মেটের অবস্থা তেরোটা। দরদস্তুর করে সে পাঁঠার মেটে কিনল তিনশো গ্রাম।

চকচকে লাল বস্তুটি হাতে নিয়ে আজ বড় মোলায়েম ঠেকল। কি আদুরে! ধারগুলো নেমে গেছে পাতলা হয়ে। মানুষেরা যে দেখতে যত কুৎসিত অথবা সুন্দরই হোক তাদের পেটের মেটে নিশ্চয়ই একরকম থাকে। মাথা নাড়ল পারো, না, মানুষই তা ভিন্ন রকম করে দেয়। কিন্তু পাঁঠারা? তারা কেন নিজেদের মেটে নষ্ট করে?

শের আলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই পারো, কি বলছ মনে-মনে?'

শালপাতার মোড়া বস্তুটির জন্যে তার ন'টাকা বেরিয়ে গেল। মাইনের অবশিষ্ট টাকাটা। খাওয়া-পরা বাবুর বাড়িতে, টাকাও জমে যাওয়া উচিত। কিন্তু জমে না। বড্ড খাওয়ার লোভ পারোর। ফাঁক পেলেই গঞ্জের দোকানগুলোয় বসে যায়। কিন্তু জিপে ফিরে গিয়ে মেটেটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল আজ এটা না কিনলেই হত। রাঁধবে কে? কমলিকে বললে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে। পারো ঠিক করল আগে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসা যাক, তারপর এর একটা বিহিত করবে।

ভালো স্পিডে জিপ চালাচ্ছিল পারো। শালপাতার ঠোঙাটা সে রেখেছে ড্যাসবোর্ডের ওপর। পারো ভাবছিল, বউদির বোনের বাড়িটা সে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা। বাবুকে নিয়ে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি করেছে অজস্রবার কিন্তু সিনেমা হলে যায়নি। বাবুর সিনেমা দেখার রোগটাই যা ছিল না। বিনাগুড়ির মোড় ছাড়াতেই খচর-খচর শব্দ শুনতে পেল পারো। তার গাড়ি নিঃশব্দে চলে। যত্নের হাত সব জায়গায় বোলানো। সামান্য শব্দ হলেই কান খাড়া হয়ে ওঠে তাই। দ্বিতীয়বারের শব্দ বোঝালো এটা গাড়ির কোনও অংশ থেকে নয়। এবং তখনই শালপাতাটার দিকে নজর গেল। শালপাতাটা কি নড়ছে? আচমকা ব্রেক কষে রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল পারো। মুখ নিয়ে গেল শালপাতার কাছে। স্থির হয়ে আছে ওটা এখন। কিন্তু একটু আগে শুধু শব্দই শোনেনি, নিজের চোখে দেখেছে ওটাকে নড়তে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করল পারো। না, আর কোনও নড়নচড়ন নেই। তবে কি ভুল দেখল সে? এমন হতে পারে গাড়ির ঝাঁকুনিতে শব্দটা হচ্ছিল, শালপাতা নড়ছিল। কোনও-কোনও মাছ নাকি মরে গিয়েও মরে না। কড়াইতেও লাফায়। এটা কি সেইরকম কিছু? মেটেসুদ্ধু শালপাতাটাকে ক্লাচের দিকে ঠেলে দিল পারো যাতে ঝাঁকুনি লাগলে কম নড়ে। ফের স্টার্ট দিতে গিয়ে ডান হাতের বস্তিটাকে নজরে পড়ল। কাল রাত্রেও বাবু এখানে এসেছিল। একশো টাকার ইস্ত্রি করা নোটগুলো এখন বিউটির দখলে। বাবু মরতে বসেছে অথচ বিউটি সেই টাকায় ফূর্তি করবে। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল পারোর। বাবু যদি মরে যায় তাহলে কার পরোয়া? সে জিপ থেকে নেমে বস্তিতে ঢুকল। এখন বস্তিটা ফাঁকা। কিছু কুচো খেলছে। জোয়ান মেয়েপুরুষরা কাজে বেরিয়েছে। বিউটির ঘরের দরজা খোলা। সেখানে দাঁড়াতেই কথা খুঁজে পাচ্ছিল না পারো। রাগ যেটা মাথায় এসেছিল সেটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে। পারো দেখল কেউ তাকে লক্ষ করেনি। সুড়সুড় করে সে ফিরে এল জিপে। স্টার্ট নিয়ে নিশ্বাস ফেলল। ভালোই হল, বাবু যদি ভালো হয়ে এখানে এসে শোনে পারো এসেছিল, তাহলে চাকরি খতম হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিউটিকে সে কি-ই বা বলতে পারত?

জিপ চলছে ফুল স্পিডে। গয়েরকটা ডুডুয়া পেরিয়ে ধুপগুড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতেই আবার সেই খচর-খচর শব্দটা কানে এল। পারো তখন ভাবছিল বিউটির মেটের কথা। অত বড় বুক, পাছা আর ধারালো গলার মেয়েছেলে সে জীবনে দেখেনি। অতএব তার মেটের সাইজটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিল না। কিন্তু বিউটির মেটে কীরকম? বাবু মাল খেয়ে আউট হয়ে গেলেও বিউটি ঠিক থাকে। ওর চোখের তলায় কালি পড়েনি, বরং গালে কিছুদিন হল মেচেতার দাগ ফুটেছে। মেচেতা ঢাকতে আজকাল জোর পাউডার মাখে বিউটি। আর এইসময় শব্দটা কানে যেতেই সে একটা চোখ রাখল শালপাতার ওপর। গাড়ির ঝাঁকুনিতে যতটা কাঁপা উচিত ততটাই কাঁপছে ওটা কিন্তু ওর ভেতরের বস্তুটা যেন নড়ছে। খচর-খচর শব্দটা আসছে সেই কারণে। শালপাতার ফাঁক দিয়ে লালচে মেটে দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল। আবার জিপ থামাল পারো। সঙ্গে-সঙ্গে নড়াচড়া

বন্ধ। হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙাটা তুলে নিয়ে সে মেটেটাকে দেখল। শের আলি দেওয়ার সময় মুখ থেকে কেটেছিল। আর এক পাশ কেটেছিল সম্ভবত আগেই, অন্য খদ্দেরকে দেওয়ার সময়। কিন্তু দুটোর বদলে একদিকে এখন কাটার দাগটা দেখা যাচ্ছে, অন্য দিকটা আর এবড়ো-খেবড়ো ঠিক নেই। যদিও মোলায়েম হয়ে এপাশের মতো পাতলা হয়ে যায়নি, কিন্তু কেনার সময় সে স্পষ্ট দেখেছিল দু-দিকেই কাটার দাগ স্পষ্ট। হতভম্ব হয়ে গেল পারো। সে কি ভুল দেখেছিল। মেটেটাকে এখন আরও লাল দেখাচ্ছে। শালপাতায় মুড়ে সে বাঁ-দিকের খোপের চাবি খুলে যন্ত্রপাতির মধ্যে ওটাকে রেখে দিয়ে ফের চাবি দিয়ে দিল।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে পৌঁছাতে আর বেশি সময় লাগেনি। সারাটা পথ ছিল নিরুপদ্রব। শহরে ঢুকে প্রথম দুটো সিনেমা হলের আশেপাশে হলুদ বাড়ি দেখতে পেল না। তৃতীয় হলটির সামনে এসে সে খুশি হল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাড়িটা। জিপ থেকে নামবার সময় হঠাৎ খচর-খচর শব্দটা কানে এল। ড্যাশবোর্ডের বন্ধ ড্রয়ার থেকে আওয়াজ আসছে। পারোর শরীরে আচমকা হিম লাগল। গাড়ি এখন চলছে না, কানকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। মরে যাওয়া পাঁঠার মেটে কি কখনও নড়াচড়া করে? ছাই মাখিয়ে কইমাছ কেটে ফেলার পরেও সেটাকে নড়াচড়া করতে দেখেছে সে। এ পাঁঠাটা কি সেইরকম? পারোর মনে হল সে একটা মেটেভূতকে ওই বাক্সে বন্দি করে রেখেছে। খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়াই ভালো। কিন্তু তখনই শব্দটা থেমে গেল। কান খাড়া করেও কোনও শব্দ শুনতে পেল না সে। এই সময় একটা লোক প্রায় তার ঘাড়ের কাছে এসে বলে উঠল, 'আরে, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! তুমি বাবুর বাড়ির ড্রাইভার না?'

মুখ ফিরিয়ে পারো পরপুরুষটিকে দেখতে পেল। মুঠোর মধ্যে সিগারেট নিয়ে ফুক-ফুক করে টানতে-টানতে কথা বলছে। সে মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল। পরপুরুষ বলল, 'তা এখানে কি করছ চাঁদু? সিনেমার টাইম হয়নি।'

লোকটার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবে ভেবে পাচ্ছিল না পারো। চুলটুলের কায়দা আছে। কোঁচানো ফরসা ধুতি আর কলারতোলা পাঞ্জাবি। চেহারাটি অবশ্য স্বাস্থ্যবান নয়। এর মেটেটা কীরকম? আঃ, তার যদি একটা চোখ থাকত যা দিয়ে জামাকাপড়ের আড়াল ভেদ করে মানুষের পেটের মধ্যে মেটে দেখে নিতে পারত, তাহলে কি আরামটাই না হত। একে সে দেখেছে কয়েকবার। বাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল। কমলির কাছে শুনেছে, বাবু যখন বাড়ি থাকত না তখনই বউদির কাছে আসত।

'আমি সিনেমা দেখতে আসিনি, বউদির কাছে এসেছি।' পারো শক্ত মুখে জানাল।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'অ্যাঁ বলো কি! বাবু পাঠিয়েছে? পাখি খাঁচা থেকে সরে বেরিয়েছে, এবার ফুড়ুৎ করে ওড়ার জন্যে তৈরি! তা কী ব্যাপার?'

পারো উত্তর দিল না। লোকটা বুঝল। বুঝে বলল, 'তাহলে চলো আমার সঙ্গে। দেখা করে কি না দ্যাখো। এখন আমার সঙ্গেও চট করে দেখা করে না। বিশ্বাস হচ্ছে না? গাঁ-গঞ্জের সবাই তো আমাকে দুষছে। পরের বউ ফুসলেছি। আরে আমি হলাম মই। মই বেয়ে উঠে যেই ডালের নাগাল পেয়ে যায় তখন আর মইয়ের দরকার কি?' বলতে-বলতে লোকটা পারোকে নিয়ে হলুদ বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বসার ঘরে ঢুকে বলল,'এই অবধি আমার অধিকার, বুঝলে? এই যে সোনার মা, না-না, আমি নই, তেনাকে বলো তার স্বামীর ড্রাইভার এসেছে দেখা করতে। দরকারটা বলছে না।'

পারো দেখল ভদ্রলোক আয়াস করে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছে। এটা যাদের বাড়ি তাদের কাউকেই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর বউদি এল। খুব বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও! কী ব্যাপার? এখানে কে পাঠিয়েছে?'

খুব ঘাবড়ে গেল পারো। সত্যি কথাটা বলতে দেরি করল না, 'কমলি।'

'কমলি! তার এত সাহস হল? কেন এসেছ?' বউদি দরজায় দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করছিল।

'বাবুর শরীর খুব খারাপ।' বিনীত হয়ে জবাব দিল পারো।

'শরীর খারাপ তো আমার কাছে কেন? ডাক্তার দেখাও।'

'হরিমাধব ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।'

এতক্ষণ লোকটা হাঁ করে শুনছিল। এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'জবাব দিয়ে গেছে? কি জবাব? মাল যদি আবার খায়, তাহলে বাঁচানো যাবে না, তাই তো?'

মাথা নাড়ল পারো, 'না বাবু আর এমনিতেই বাঁচবে না।'

'তোমাকে কে বলল কথাটা?' লোকটা কাছে এগিয়ে এল।

'সবাই জানে। গঞ্জের সবাই। বিছানায় পড়ে আছে বাবু। তাই কমলি পাঠালো।'

'বাঃ-বাঃ, ও রানি, এখন কলকাতায় নয়, তোমার গঞ্জেই ফিরে যাওয়া উচিত। যা গেছে তা যাক, যা আছে তাই বিক্রি করলেও কলকাতায় বাড়ি হয়ে যাবে। মরার আগে যাওয়া দরকার তোমার। হাজার হোক তুমি ওর বিয়ে-করা বউ, প্রকৃত উত্তরাধিকারী।' লোকটা হাসল।

বউদি ঠোঁট কামড়ালেন, 'সে আমার মুখ দেখবে না বলেছিল।'

'অ্যাই, চোখ চেয়ে দেখে কথা বলার অবস্থায় আছে নাকি তোমার বাবু?'

'আজ্ঞে না।' পারো জবাব দিল। যদিও এই ব্যাপারটা সে স্পষ্ট জানে না।

লোকটা খুশি হল, 'ব্যাস, যে চলে যাচ্ছে সে আর কি বলবে। বরং পাঁচ পাবলিক বলবে কি সতীসাধ্বী স্ত্রী গো, স্বামী নিশ্বাস ফেলার আগে ফিরে এল।'

'কি যা-তা বলছ?' বউদি গলা তুলল।

'ঠিকই বলছি। এখন না গেলে সম্পত্তি কে কোথা থেকে হাতিয়ে নেবে তার হদিশ পাবে না। খুড়তুতো মামাতুতোরা নেই? তখন মামলা করে খোসা পাবে। আমার কি? এখন আমি তো আঁটি। কলকাতায় যাওয়ার আগে গুছিয়ে নাও।'

'বেশ। যখন এত করে বলছ। কিন্তু আমার বাসনা ছিল না। যে বাড়ি একবার ছেড়ে এসেছি অত্যাচারিত হয়ে, সেখানে আবার পা রাখব—! তা বলছ যখন এত করে!' বউদি নিজের মনে বলছিল।

'তাহলে বিলম্বের দরকার নেই। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে আনি!'

'তুমি যাবে?' বউদিকে চিন্তিত দেখাল, 'আচ্ছা চলো, একা যেতে ঠিক সাহস হচ্ছে না।'

সমস্ত পথ পারো মুখ বুজে জিপ চালাল। লোকটা কত রকমের পরামর্শ দিল বউদিকে তার হিসেব নেই। বউদি কিন্তু জিপে ওঠার পর মাথায় ঘোমটা দিয়েছে আর চুপটি করে রয়েছে। সে লোকটাকে এও বলতে শুনল, 'আমি তোমার উপকার করে যাব। জানি বাবুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তুমি আমায় বেছেছিলে, মনে নাওনি একবারও, তবু। তা বলি কি, কলকাতা হল বিরাট জায়গা। তোমার ভগ্নীপতির বন্ধু যতই স্বপ্ন দেখাক, তোমার থাকা উচিত এখানেই। চেনা পরিবেশে মানুষ স্বচ্ছন্দে থাকে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। যদি গিয়ে দেখে বাবু আর নেই তো হয়ে গেল। বউদি গাড়ি রাখবে বলে মনে হয় না। স্টার্ট বন্ধ করতেই বউদি বলল, 'শোনো, তুমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এসো আগে।'

'আমি যাব?' লোকটা খুব ঘাবড়ে গেল।

'কি জানি, যদি ফাঁদ হয়, যদি ওকে মিথ্যে শিখিয়ে পাঠিয়ে থাকে—!'

'তাহলে আমি গেলে তো হাড় ভেঙে দেবে! অ্যাই, তুই সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

পারো গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। আর এই সময় কমলি ছুটে এল বাইরে, বউদি এসেছে?' তাকে ঘাড় নাড়তে দেখে কমলি চিৎকার করল, 'ও বউদি তাড়াতাড়ি আসুন, বাবু খাবি খাচ্ছে। ও বউদি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে বউদি ছুটল বাড়ির ভেতর। পেছন-পেছন লোকটা। বাবু খাবি খাচ্ছে! তার মানে শেষ সময় এগিয়ে এসেছে। পারোর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই এতদিনের আরামের চাকরি চলে গেলে—! তার খুব কান্না পাচ্ছিল। এবং তখনই সে খচর-খচর শব্দটা শুনতে পেল। সারাটা পথ খেয়ালই ছিল না ওটার কথা। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে খোপের ভেতর থেকে শালপাতার ঠোঙাটাকে টেনে বের করতেই দেখল ফক্কা। ওটা খালি। ঝুঁকে স্ক্রু-ড্রাইভারের ওপর লালচে মেটেটাকে দেখতে পেল। সন্তর্পণে স্ক্রু-ড্রাইভার ধরে ওটাকে বাইরে বের করে আনতেই মনে হল মেটেটা একবার কেঁপে উঠল। হয়তো চোখের ভুল, কিন্তু যেটা সত্যি সেটা হল মেটের শরীরের কোথাও আর শের আলির ছুরির দাগ নেই, একেবারে নিটোল হয়ে গেছে ওটা। যেন একটা ছোট্ট কাছিম। ঠিক মাঝখানে উঁচু আর চারপাশে পাতলা হয়ে নেবে গেছে। কোথাও কোনও খাঁজ নেই, কোথাও কাটার চিহ্ন নেই। অথচ এসবই ছিল। এত মোলায়েম গোলাকার ছিল না মেটেটা। পারোর মাথা ঘুরতে লাগল। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে সে এবার হাতের তেলোয় মেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। না, কোনও খচর-খচর শব্দ নেই, নড়ছেও না একটু। এতক্ষণ ওসব যদি শোনার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে মেটের চেহারা পালটে গেল কি করে? কিন্তু সেই টুকটুকে লাল রঙটা কি জেল্লা হারিয়েছে? অতটা লাল আর নয় বলে মনে হচ্ছে! কেন এমন হল? হয়তো অনেকক্ষণ পাঁঠার শরীর থেকে আলাদা হয়ে থাকায় রঙটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মেটের গায়ে কোনও রক্ত বা রস নেই। সে যত্ন করে বুকপকেটে রেখে দিল ওটাকে। তারপর ধীরে-ধীরে ভেতরে পা বাড়াল। সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে। চোরের মতো নেমে আসছে। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি করি বলো তো? জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত ওঁকে।'

'কেন?' প্রশ্নটা করতেই বুক কেঁপে উঠল, নাকি মেটেটা নড়ল? বাবু তাহলে মরেনি এখনও?

'এখানে থাকলে রাত পোহাবে বলে মনে হয় না।' লোকটা সত্যি উদ্বিগ্ন, 'এদিকে সন্ধে হয়ে এল।'

এই সময় কমলি এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে, 'বউদি বলল আপনাকে আজ চলে যেতে। বাবুকে নড়ানো যাবে না।' তারপর পারোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সারাদিন তো মুখে কিছু দাওনি। ঘরে ভাত ঢাকা আছে।'

কমলি চলে যেতে লোকটা চোখ ছোট করল। 'আমেদুধে মিশে যাচ্ছে। লাস্ট বাস কখন?'

'আমি জানি না।' পারো কথা শেষ করতে-না-করতেই লোকটা বেরিয়ে গেল।

বাবুর গায়ের রং কালচে হয়ে গেছে। মুখ হাঁ হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে এখন। মাথার পাশে একটা চেয়ারে বউদি বসে। বাবুর পেটের দিকে তাকাল পারো। নির্ঘাত বাবুর মেটে পচে গলে যাচ্ছে এখন। এই মানুষটি জুয়া খেলে বিউটির ঘরে মাল খেয়েছে কে বলবে! বউদির শরীর ভারী। কমলির মতো কাঠি-কাঠি নয়। পারো বউদির পেটের কাছে খোলা চামড়া দেখতে পেল খানিক। ঝুঁকে পড়ে বউদি তখন বলছিল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁগো, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

বাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বউদি বলল, 'খাও, আরও মদ খাও! আমার কথা তো শোননি।'

বউদির মেটে কীরকম হবে? পারোর মনে হল, নির্ঘাত বউদির মেটে লাল নয়। শুধু শরীর

ভালো হলেই মেটে লাল হবে, মনটাকে সেই সঙ্গে ভালো হতে হবে না? পাঁঠারা কারও ক্ষতির কথা ভাবে না, শরীর ভালো হলেই ওদের মেটে লাল হয়। হঠাৎ বুকপকেটটা থরথরিয়ে উঠল। এবার আড়চোখে পকেটের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল পারো। মেটেটা নড়ছে, তার বুকপকেট থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। চট করে বাঁ-হাত দিয়ে সে মেটে সুদ্ধ পকেটটাকে চেপে ধরতে চাইল। আর তখনই কমলি এসে দাঁড়াল পাশে, 'উঃ, একেই বলে পুরুষমানুষের মন! বাবু যাচ্ছে স্বর্গে আর তুমি জুলজুলিয়ে বউদির শরীর দেখছ? অন্য সময় এমন ভান করে থাকো—! পকেটে কি আছে?'

এত বড় একটা অভিযোগের ধকল সামলে উঠতে পারল না পারো। কথাগুলো এমন গলায় বলেনি কমলি যাতে বউদির কানে যাবে না। কাঁটা হয়ে সে দেখল বউদি বাবুকে ছেড়ে এবার তার দিকে মুখ ঘোরাল। আর একটু আড়ালে সরে যেতেই বউদির গলা ভেসে এল, 'ওখানে কে কমলি?'

'হঁয়ে, পারো এসেছে।' কমলির জবাব এবার নরম গলায়।

বউদি কথা বাড়াল না, কিন্তু কমলি ছাড়ার মেয়েছেলে নয়, 'বুকপকেটে কি রেখেছ, হাত সরাচ্ছ না যে বড়?'

'কিছু না।' জবাবটা দিতেই মেটেটা নড়ে উঠল আচমকা।

'তুমি আমাকে মিছে কথা বলছ, অ্যাঁ! তোমার জন্য ভাত ঢেকে রাখি না আমি?'

'মেটে আছে, মেটে।' সমস্যা চাপা দিতে জবাব দিল পারো।

'মেটে? ওমা, মেটে কেউ পকেটে রাখে নাকি? কি অনাসৃষ্টির কথা গো! দেখি!' হাত বাড়াল কমলি। অতএব ওটাকে বের করতে বাধ্য হল পারো। সঙ্গে-সঙ্গে হিসহিসিয়ে উঠল কমলি, 'তুমি কি মানুষ, অ্যাঁ! বাড়ির কর্তা মরতে বসেছে তবু তোমার খাওয়ার এত নোলা!'

পারো কাঁটা হয়ে ছিল। কমলির সামনে যদি মেটেটা লাফিয়ে ওঠে! কিন্তু তার আগেই কমলি সেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল, 'রাঁধতে তো হবে আমাকেই। বাবুর যদি রাত কাটে, তাহলে কাল দুপুরে খেতে পাবে। এবার ভাতগুলো গেলো গিয়ে।'

পুরো ভাত খেতে পারল না পারো। মেটেটাকে হাতছাড়া করার পর থেকেই মন খিঁচড়ে গেছে। খিদেটাও চলে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসতেই সে চাঁদের আলো আর ব্যাঙের ডাক শুনতে পেল। কাল সন্ধেবেলায় যখন চাঁদ উঠেছিল, আজ না ওঠার কোনও কারণ নেই। আর ব্যাঙগুলো খিদে পেলেই এই সময় ডাকে। শুধু খিদে নয়, মৃত্যু-ভয়েও তো ডাকে। দরজায় ফাঁক থেকে লাঠিটা নিয়ে সে পা টিপে-টিপে বাগানে নামল। বাতিল একটা চৌবাচ্চায় বসে ডাকছে ব্যাঙগুলো। এই বিশেষ ধরনের প্রাণিগুলোকে সেই ধরে এনেছে আঙরাভাসা নদীর ধার থেকে। বঁড়শিতে বিঁধিয়ে ভোররাত্রে ডুডুয়ার জলে ফেলে দিলেই মাছ আসবে ধেয়ে। ব্যাঙগুলো ধরাই আছে, মাছ ধরতে যাওয়ার সময় পাচ্ছে না সে। দু-দিন আগে একটা ঢোঁড়া সাপকে দেখেছিল চৌবাচ্চার কাছে আসতে। সে ব্যাটাই এসেছে আজ। লাঠিটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। লোকটা বলল,'এর মধ্যে ব্যাং আছে নাকি?' আমি কাছে আসতেই এমন চেঁচিয়ে উঠল যে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ইয়ে হল কি, বাস পেলাম না। লাস্ট বাস চলে গেছে। তোমার বউদি কি চিজ জানো তো, তাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।'

লোকটা তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়া মাত্র যে ব্যাঙগুলো চুপ করে গেল তা টের পেল পারো। বাবুর বাড়ির লাগোয়া বাগানের শেষপ্রান্তে তার এই ঘর। এখানে যে লোকটা সেঁধোবে তা সে ভাবতে পারছে না। ঘরে ফিরে গিয়ে দেখল লোকটা খাটিয়ার ওপর আরাম করে বসেছে, 'বাঃ, খাসা ঘরটি! ডাইরেক্ট চাঁদ থেকে আলো আসে। কাউকে বলার দরকার নেই এখানে আমি

আছি। তুমি আমাকে দ্যাখো আমিও দেখব। ওই ঝি-টা এই ঘরে আসে নাকি? আসে না? যাক, তবু বাঁচোয়া।'

লোকটা এবার সিগারেট ধরালো, 'ব্যাং পুষছ?'

পারো মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

লোকটা বলল, 'ভালো, বড় মাছ ব্যাং খায়। আমি অবশ্য দেখিনি কখনও। যে মাগিটার কাছে তোমার বাবু যায় তার নাম বিউটি, না?'

পারো আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটা কিছুক্ষণ সিগারেট টানল, 'দু-পয়সা যদি রোজগার করতে চাও তো আমার কথা শোনো। তুমি তো লোক খারাপ নও। যার জন্যে চুরি করলাম সেই এখন চোর বলছে। বিউটির কাছে আমাকে নিয়ে চলো, বুঝলে?'

অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল পারো। বিউটির কথা অবশ্য এ-তল্লাটে সবাই জানে। কিন্তু এ কেন সেখানে যেতে চায়? পারো মাথা নাড়ল, 'বাবু জানতে পারলে মেরে ফেলবে।'

'যে লোকটা খাবি খাচ্ছে সে জানবে কি করে?'

'আমি বাবুর নুন খেয়েছি, আপনার কথা শুনতে পারব না।'

'অ।' লোকটা মাথা নাড়ল, 'তা ভালো। রাতটা আমায় এই ঘরে কাটাতে দেবে তো?'

পারো কিছু বলল না। লোকটা তার খাটিয়ায় শরীর এলিয়ে দিল, 'বড় ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে হে। তবে তোমার এই ব্যাঙপোষা ভালো জিনিস নয়। ব্যাঙের লোভে সাপ আসে।'

পারো নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। লোকটাকে কি বউদি তাড়িয়ে দিল? তাই কি, যার জন্যে চুরি করি কথাটা আওড়ালো লোকটা? কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিউটির কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা বিউটিকে খুঁজছিল। মেয়েছেলেটা বাবুর অনেক টাকা ঝেড়ে নিয়েছে। এখন মরার সময় হয়তো জানতেও পারছে না খবরটা। আর জানলেই যেন ছুটে আসবে এখানে! এলেই বা কি, তাতে বাবুর জীবন তো ফিরবে না!

আজ রাত্রে ঘুমের যখন চান্স নেই তখন মাছ ধরতে যেতেই হয়। ব্যাঙের চৌবাচ্চার পাশে বসে চাঁদ দেখতে-দেখতে কথাটা ভাবল পারো। তারপরেই জিভ কামড়ালো। বাবুর যখন মরণের সময় তখন মাছ ধরার কথা ভাবছে; ছি! পারো উঠে বাগান পেরিয়ে ভেতর-বাড়িতে ঢুকল। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পর এই বাড়ি আরও নিঝুম। অবশ্য বাবু সুস্থ থাকলে এ-বাড়িতে বসে সন্ধে দেখা হয় না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সে বারান্দায় পা দিল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কমলি নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। বাবুর ঘরের দরজার দিকে এগোতে সে খচর-খচর শব্দটা শুনতে পেল। সারাদিনে শব্দটায় এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে পারো চমকে চারপাশে তাকাতে লাগল। এবং তখনই দরজার সামনে ওটাকে দেখতে পেল। চটজলদি মেটেটাকে তুলে নিল পারো। চেহারাটা একই রকম আছে, শুধু আকারে সামান্য বড় লাগছে। কিন্তু এটা এখানে এল কি করে? রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় কমলির হাত থেকে কি পড়ে গেছে? শালপাতাটা তো আলগা ছিল। মেটেটাকে বুকপকেটে রেখে দিল পারো। তারপর দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। বাবু শুয়ে আছে চোখ খুলে। খাবি খাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। বউদিকে দেখা যাচ্ছে না। বাবুর জন্যে খুব কষ্ট হল পারোর। সে পায়ে-পায়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতর খচর-খচর আরম্ভ হল। বাঁ-হাতে বুক চাপল পারো। জামার আড়াল সত্ত্বেও হাতের মুঠোয় মেটেটার বিক্ষোভ সে টের পাচ্ছে।

এবার বাবুর নজর পড়ল তার ওপর। যেন চিনতেই পারছে না। পারোর গলা ভেঙে গেল, 'বাবু!'

বাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটল। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'বিউটিকে বলিস আর যেতে পারলাম না।'

এ কি কথা শুনছে সে? শেষ সময়ে মানুষ মেয়েছেলের কাছে যাওয়ার চিন্তা করে? আর

তখনই বউদি ঘরে ঢুকল। বাবু তার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখচোখ বেঁকে গেল আবার। বউদি এর মধ্যে কী পোশাক পালটেছে? বাবুর মাথার কাছে বসে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে বলল, 'এটা খেয়ে নাও। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ওষুধ খেতেই হবে। আমার সেবায় যদি মন না ভরে, তাহলে তোমার বিউটিকে ডেকে পাঠাব।'

বাবু এবারও জবাব দিল না। বউদি একবার পারোর দিকে আড়চোখে দেখে নিল, 'সেই লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এ-বাড়ি থেকে। কলকাতায় যাব ভেবেছিলাম, আর যাব না। এ-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর কেউ আমার শরীর ছোঁওয়ার সুযোগ পায়নি, বুঝলে? নাও, ওষুধ খাও।'

বাবু বলল, 'আমাকে একটু মদ দাও। মদ খেলে ব্যথা কমে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল বউদি, 'ইল্লি আর কী!'

হঠাৎ নিচের বাগানে কমলির চিৎকার ভেসে এল। কমলি চেঁচাচ্ছে, 'কে? কে আপনি?'

আর তারপরেই সব চুপচাপ। বউদি ওষুধ রেখে তড়াক করে উঠে পড়ল। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পারো কমলির আর্তনাদ শুনেছিল। কিন্তু বাবুর জন্যে এত মন খারাপ হয়েছিল যে সে নড়ল না। বিছানার নিচে বসে বাবুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে। আর তখনই বউদির চিৎকার ভেসে এল, 'পারো!'

এক ঝটকায় নিজেকে তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাগানে নেমে এল পারো। বউদি তার ঘরের সামনে। মা কালীর মতো ভঙ্গি, শুধু জিভটা বের করা নেই। ওকে দেখামাত্র বউদি চিৎকার করল, 'একটা পুরুত ডেকে আনতে পারবি?'

সন্ধে পেরোনো রাত্রে এমন হুকুম শুনবে ভাবতে পারেনি পারো। সে কাছে এগিয়ে দেখল কমলি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে খাটিয়ার পাশে, আর লোকটা সেখানে বসে। বউদি বলল, 'নিয়ে আয় পুরুত। আজ রাত্রেই এদের বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।'

এবার কমলি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'বিশ্বাস করো বউদি, আমার কোনও দোষ নেই।'

'দোষ নেই? তুই এই ঘরে কি মতলবে এসেছিলি?'

'পারো আমাকে মেটে দিয়েছিল, সেটা পাচ্ছিলাম না রান্নাঘরে। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।'

মেটে দিয়েছিল? ঘরের মানুষ মরতে বসেছে আর তোকে মেটে দিয়েছিল?'

'দিব্যি করে বলছি। তা আমি কি জানি অন্ধকারে এ মিনসে শুয়ে আছে? ডাকছি পারো ভেবে, উঠছে না। তখন পিঠে হাত দিয়ে ডাকতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল।' কমলি মুখ নামাল।

'জড়িয়ে ধরল! তা একবার চিৎকার করে থেমে গেলি কেন?' বউদি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

মুখ নামিয়ে কমলি বলল, 'উনি চিৎকার করতে দিচ্ছিলেন না। তুমি বকবে সেই ভয়ও হচ্ছিল।'

'ছি-ছি-ছি! তোমার চরিত্র এই? আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার আগে দিনরাত গুজুর-গুজুর করে প্রেমের বাক্যি শোনাতে, আর একটা ঝি-এর সঙ্গে এসব করছ?' বউদি ধিক্কার দিল।

'এবার মুখ খুলি সুন্দরী! রাজভোগ বাসি ঠান্ডা হলে তার চেয়ে গরম-গরম আলুসেদ্ধ ভাত ঢের বেশি উপাদেয়। তোমার বুকের মধ্যে হিমালয়ের সব বরফ জমা, বাবু পারেনি গলাতে, আমিও না। যাকে ঝি বলছ তার ভেতরে যা উত্তাপ তা তুমি এ-জীবনে সঞ্চার করতে পারবে না।' লোকটা রসিয়ে-রসিয়ে কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়াল।

'দূর হও, দূর হও সামনে থেকে। এই মুহূর্তে এ-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও।'

বউদি আর দাঁড়াল না। হনহনিয়ে বাগান ডিঙিয়ে চলে গেল ভেতর-বাড়িতে। লোকটা কমলির দিকে তাকাল, 'শুনলে তো। তা তুমি যদি চাও তো আমার সঙ্গে যেতে পারো।'

কমলি কোনও জবাব দিল না। লোকটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, 'আমি মানুষ মন্দ নই। তবে বিয়ে থা করতে পারব না বাপু। যাবে তো চলো।' কমলি সরে দাঁড়াল। মুখ তুলল না।

লোকটা এবার বাইরে বেরিয়ে এল। উদাস গলায় বলল, 'দেখি বিউটির ওখানে কি করে পৌঁছানো যায়। আমেদুধে মিশে যায় কিন্তু আঁটি থেকে গাছ বেরোয়।' জ্যোৎস্না মেখে লোকটা চলে যাওয়ার পর পারো কান্না শুনল। তার ঘরের মেঝেতে বসে কমলি কাঁদছে। মেয়েটার মুখ যাই হোক, তার যত্নআত্তি তো কিছু-কিছু করত। লোকটা যে কথাটা বলল সেটা কি ঠিক? বউদি যদি বরফ তবে ওর ভেতরে উত্তাপ আছে? নতুন চোখে কমলির দিকে তাকাতেই ওর বুকটা যেন নড়ে উঠল। পারো বুকে হাত দিল। আর তখনই তার খেয়াল হল বুকপকেটে মেটেটা নেই। সে চকিতে পায়ের দিকে তাকাল। সবকিছু বিস্মরিত হয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল জ্যোৎস্নার আলোয় সেই পথটা খুঁজে দেখল। তারপর প্রায় সম্মোহিতের মতো দোতলায় উঠে এল, কোথাও নেই। মহামূল্যবান কিছু হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা এখন তার বুকে। ঘরে উঁকি মারল সে।

বউদি খাটের পাশে চেয়ারে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। বাবু শুয়ে আছে টানটান। পারো কাঠ হয়ে গেল। বাবু কি মরে গেল? সে পায়ে-পায়ে বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বউদি মুখ তুলল। সাবা মুখে জল। বউদি জিজ্ঞাসা করল, 'আপদ বিদেয় হয়েছে?'

তাহলে কি বাবু মরেনি? মৃতদেহের সামনে বসে কি কেউ এ প্রশ্ন করে? সে মাথা নাড়ল। বউদি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'হারামজাদিটা গিয়েছে সঙ্গে?' পারো মাথা নেড়ে না বলল।

বউদি নিশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, 'তুমি এখানে বসো। আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

বউদি চলে গেলে সে বাবুর মুখের দিকে তাকাল। না, নিশ্বাস পড়ছে। বাবু মরেনি। ঘুমোচ্ছে, কিন্তু বাবুর মুখের সেই কালচে ভাবটা কমল কি করে? অতটা অসুস্থ তো দেখাচ্ছে না? এটা কি তার চোখের ভুল? এই সময় বাবু ঘুমের ঘোরে ককিয়ে উঠল, আঃ! বাবুর একটা হাত পেটে পড়তেই খচর-খচর শব্দটা উঠেই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল পারো। শব্দটা এসেছে বাবুর পেট থেকে। সে ঝুঁকে পড়ল। বাবুর পরনে এখন লুঙ্গি আর গেঞ্জি। ওপরে চাদর ঢাকা। চাদর সরালো সে। কোমরে গিঁট আলগা। হাত দিতেই সেটাও নেমে এল। এবং তখনই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বাবুর পেটের বাঁ-দিকে মেটেটা চেপে বসে আছে। ঘরের মাঝারি আলোয় সেটাকে আরও চ্যাপটা দেখাচ্ছে। চ্যাপটা এবং কালচে। পারো খপ করে মেটেটাকে ছিনিয়ে নিতে গেল বাবুর পেটের ওপর থেকে, তুলবার সময় ওটা এমন আঁকড়ে ছিল, বাবু যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। মেটেটাকে পকেটে পুরে পারো চাদর টেনে দিল। এটা ওখানে গেল কি করে? বুকপকেটে খচর-খচর করছে এবং মেটেটা। বোঝা যাচ্ছে, খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। যন্ত্রণায় মুখে বাবু চোখ মেলল, 'পারো, একটু মদ দিবি?'

পারো জবাব দিতে পারল না। বাবু জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে?'

এবার পারো বলল, 'মদ নেই।'

'আছে। তোর জিপের সিটের তলায়।'

এই সময় বউদি ঘরে ঢুকল। বেশ তাজা দেখাচ্ছে এখন। ঘরে ঢুকেই ছুটে এল বউদি, 'ওগো, তুমি কথা বলছ? কেমন লাগছে? দ্যাখো আমি এসেছি, ফিরে এসেছি।'

বাবু মুখ ফিরিয়ে নিল। বউদি দু-হাতে বাবুকে জড়িয়ে ধরল, 'মুখ ফিরিও না। আমি কি এতই খারাপ? আমি কি শুধুই বরফ?'

'পারোকে বলো মদ আনতে।'

'না-না, তুমি এখন মদ খাবে না। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। কেমন লাগছে?'

'এতক্ষণ ভালো ছিলাম, আবার যন্ত্রণা—।' বাবু মুখ বিকৃত করল।

বুকপকেটে খচর-খচর আরম্ভ হল। বাবু এতক্ষণ ভালো ছিল? এতক্ষণ তো এই মেটে বাবুর শরীরে লেগে ছিল। সরিয়ে নিতেই যন্ত্রণা বাড়ছে। বউদির পেছনদিকে সে। সন্তর্পণে বুকপকেট থেকে

মেটেটা বের করে চাদরের তলা দিয়ে বাবুর পেটের ওপর রাখতেই সেটা পিছলে খানিকটা সরে গিয়ে সেঁটে বসল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, আঃ!

বউদি এখন বাবুর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বাবু সেটা উপভোগ করছে। বাবু বলল, 'তুমি যে চলে এলে বড়!'

বউদি বলল, 'কথা বলো না। আমি আর যাব না।'

'কিন্তু আমি তো মরে যাব।'

'তোমাকে আমি মরতে দেব না।'

কেন?'

'আমি জানি না।'

বাবু ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। বউদি তৃপ্তির হাসি হাসল। পারোর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'মুখটা এখন অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে, না?'

পারো মাথা নাড়ল। বউদি বলল, 'কাল সকালে হরিমাধব ডাক্তারকে ডেকে এনো।'

পারো আবার মাথা নাড়ল। বউদি বলল, 'কমলিকে বলো, আর যেন না হয়, এবার ক্ষমা করলাম।'

পারো চুপ করে রইল। বউদি জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি রান্নাবান্না করেছে?'

পারো মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না।'

'মেটের কথা বলছিল। মেটের ঝোল আর ভাত হলেই তো হয়। বাবুর যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে ওষুধ দেব না: আর হ্যাঁ, বিউটিকে কাল একবার ডেকে এনো তো!'

ঘুমন্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে পারো জিজ্ঞাসা করল, 'বিউটিকে?'

'হ্যাঁ। বাবু বেঁচে থাকলে তারও তো লাভ। ওখানে গেলে যেন মদ না গেলায়, বলব।'

পারোর মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বউদি এত পালটে গেল কি করে! তখনই বাবু চোখ মেলল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। বাবু বলল, 'বিউটিকে যা টাকা দিয়েছি তারপর আর ওর কাছে যাওয়ার দরকার হবে না।' কথাটা শোনামাত্র বউদি বাবুর মাথায় মুখ রাখল। রেখে কেঁদে উঠল। পারো যে পেছনে দাঁড়িয়ে সেই খেয়ালও নেই। পারো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখল চাদরের একটা পাশ যেন কিছুর চাপে ঝুলে পড়েছে। সে সন্তর্পণে দুজনের চোখ এড়িয়ে হাত ঢোকাতেই মেটেটাকে পেল।

মুঠোয় ওটাকে নিয়ে নিচে নেমে এল পারো। সেই পেলব মোলায়েম অনুভূতিটা আসছে না কেন? জ্যোৎস্নায় মুঠো খুলতে অবাক হয়ে গেল পারো। মেটেটার সর্বাঙ্গে কাঁটা-কাঁট' খাঁজ! অনেকটা কাঁঠালের শরীরের মতো। সেই মসৃণ তুলতুলে ব্যাপারটা উধাও। আর ওর শরীরের কোথাও লাল রং খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা পাতায় জড়িয়ে মাটিতে রেখে উবু হয়ে বসল পারো। ঘণ্টাখানেক নজর রাখল। কিন্তু খচর-খচর শব্দ দূরের কথা, একটুও নড়াচড়া করল না বস্তুটা। দুঃখিত মুখে পারো চাঁদ দেখল। মাঝ আকাশে চলে এসেছে। ওটাকে নিয়ে জিপের কাছে চলে এল সে। তারপর বাবু যে সিটে বসত তার তলায় হাত ঢোকাতে একটা হাঁড়িয়ার বোতল খুঁজে পেল। এটাকে কখন রেখেছিল বাবু? আর এটার কথা যখন খেয়াল আছে তখন বাবুর মাথা ঠিক কাজ করছে। পারো নিজে কখনও মদ খায়নি। হাঁড়িয়ার বোতলটাকে ছুঁড়ে দিল দেওয়ালের দিকে। ঠং করে কাচ ভাঙার শব্দ আর সেই সঙ্গে মদের গন্ধ ভেসে এল। পারো অবাক হয়ে দেখল পাতায় রাখা মেটেটা একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ওটাকে নিয়ে দেওয়ালের ধারে ছুটে গেল সে। বোতলের অর্ধেকটা উড়ে গেছে। মদ ছড়িয়ে আছে মাটিতে। মেটেটা যেন তার গন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। পাতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বোতলের বাকি অংশ খানিকটা মদ নিয়ে তেরচা করে পড়েছিল। সন্তর্পণে সেটাকে তুলে নিয়ে মদের ভেতর মেটেটাকে ছেড়ে দিল পারো। সাঁতার কাটছে এমন

ভঙ্গিতে পাক খেল মেটেটা। কিন্তু চাঁদের আলোয় মদের রং পালটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আলকাতারায় মতো কিছু বেরিয়ে আসছে মেটের শরীর থেকে।

মদটা ফেলে দিয়ে মেটেটাকে বের করে দেখল ওটা নরম হয়ে গেছে। পাতায় মুড়ে সে ব্যাঙের চৌবাচ্চার কাছে এল। ভেতর-বাড়ির ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। এখন মধ্যরাত। বউদি কি জেগে আছে বাবুর পাশে? এখন ব্যাং তুলে মাছ ধরতে গেলে কেমন হয়?

ছিপ নেওয়ার জন্যে ঘরে ঢুকতেই সে কমলিকে দেখতে পেল, সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটা। বড় দুঃখ হল পারোর। কাছে গিয়ে সে ডাকল, 'কমলি, এই কমলি?'

কমলি মুখ তুলল, পারো বলল, 'বউদি তোর খোঁজ করছিল।'

'আমি—আমি মরে যাব।' কমলি কেঁদে উঠল।

'কেন?'

'আমাকে জোর করে—।' কমলি কথা শেষ করল না।

'বউকি তোকে তাড়াবে না।'

'তুই?'

'হাঁ হয়ে গেল পারো। সে তাড়াবার কে? কমলি এগিয়ে এল তার পাশে, তুই আমাকে ঘেন্না করবি, বল? তাহলে আমার বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই।'

শরীরে তাপ লাগল যেন। লোকটা বলেছিল কমলির শরীরে উত্তাপ আছে। এর আগে কমলি তার এত কাছে কখনও আসেনি। পারো মাথা নাড়ল, না।

সঙ্গে-সঙ্গে পারোকে জড়িয়ে ধরল কমলি, 'বাবু কি মরে যাবে?'

'না। চেহারা অনেক ফরসা হয়ে গেছে। বউদি সেবা করছে।'

'আমার ওপর তোর রাগ হয়েছে?'

'না।'

পারোর উত্তাপ তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু কমলি তাকে বাধা দিল, 'আজ না।'

'কেন?'

'আজ আমার ঠোঁট এঁটো হয়ে আছে। সকাল হোক, মুখ ধুই, তবে—।'

পারো নিশ্বাস ফেলল। কমলি বলল, 'একটা রাত তো। কিছু খাসনি?'

'না।'

'রান্না নেই কিছু? খিদে পেয়েছে খুব।'

'খাবি?'

পারোর মনে পড়ল। পাতার ভেতর থেকে কুচকুচে কালো মেটেটা বের করল সে।

'কি?' কমলি প্রশ্ন করল।

অন্ধকার এখন এ-ঘরে ঢুকছে। চাঁদ ঢলছে। চাপ দিতেই মেটেটা দু-ভাগ হল। একভাগ মুখে দিতেই গলে যেতে লাগল। পারো অন্য ভাগটা কমলির মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নে, বেশ নরম।'

কমলি জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে এটা?'

'সেই মেটেটা।'



শেষ ঘণ্টা বেজে গেল

যিনি বলেছিলেন লাবণ্য না থাকলে সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না, তিনি একটু কম জানতেন। কুন্তী সুন্দরী একথা ওঁর কুকুর মদনও জানে। কুন্তী যে লাবণ্যবতী তা আয়নাগুলো সোচ্চারে জানিয়ে দেয়। আর এরকম সুন্দরী লাবণ্যবতী এই শহরে অন্তত আট হাজার একুশজন আছেন অথবা থাকতে পারেন। তবে কিনা ওইসব রূপসীদের অধিকাংশই বোকা-বোকা অথবা স্বার্থপর। আর সেই স্বার্থপরতা আড়াল করার কোনও কায়দাও তাঁদের জানা নেই। কুন্তী এই ভিড় থেকে অনেক দূরের। তাঁর সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য তো আছেই, সেইসঙ্গে জড়িয়ে আছে অহঙ্কারের হালকা প্রলেপ। আর এটাই তাঁকে একদম আলাদা করে রেখেছে মিছিল থেকে।

অহংকার মানেই সবজান্তাপনা নয়, নাক তোলা কিন্তু আকাশে রেখে দেওয়া নয়। ওঁর অহংকার একটা হালকা পারফিউমের মতো, শরীরে জড়িয়ে থাকে কিন্তু ঠিক কোনখানে তার উৎস সেটা টের পাওয়া যায় না। সেই রসজ্ঞের দুর্ভাগ্য যিনি কুন্তীকে দ্যাখেননি।

এখন কুন্তী পঁয়তাল্লিশ। ফিল্মস্টাররা যে-বয়সটায় পৌঁছলে আর আড়াল খোঁজার চেষ্টা করেন না, সেই বয়স। যে বয়সের মহিলাকে এককালে বৃদ্ধা বলা হত, দু-দশক আগে প্রৌঢ়া বলে চিহ্নিত করা হত সেই বয়সে পৌঁছনো কুন্তীকে দেখে শ্বাস ভারী হয়, এই যা। চট করে যুবতী বলতে নিশ্চয়ই বাধবে কিন্তু প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা নয়, বাংলার এর কোনও সঠিক শব্দ না থাকার জন্যে আপশোস হবে। কুন্তী নিজের পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি শরীরটাকে যত্নে রেখেছেন।

একটুও ধুলো নয়, আগাছা জন্মাতে দেওয়ার সুযোগই নেই, সার এবং জলের সঙ্গে যত্ন সর্বত্র ছড়ানো। আর এই কারণেই সমবয়স্কাদের সঙ্গ কুন্তী এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন!

খামোকা কোনও নারীকে ঈর্ষান্বিত করে কষ্ট দিয়ে কোনও লাভ নেই। পৃথিবীতে যেযার মতো থাকুক।

কুন্তীর ভোর হয় ভোর হওয়ার অনেক আগে। তখনও তাঁর এই আটতলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কলকাতাকে ভুতুড়ে দেখায়। সারারাত জ্বলে থাকা আলোগুলো নিভে যাওয়ার জন্যে ছটফটিয়ে মরে। সেই আলো না মরা ভোরেই কুন্তী হাঁটতে বের হন। শার্ট প্যান্ট জুতো পরে লিফট চালিয়ে নিচে নামতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দেয়। গুরুসদয় রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলারে পড়ে চক্কর দিয়ে ফিরে আসাটা এখন অঙ্কের মতো হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম সময় কমানোর চেষ্টা করতেন রোজ। এখন করেন না। দু-একবার হঠাৎ উৎসাহী কোনও পুরুষ তাঁকে বিরক্ত করলেও বৃষ্টি না হলে এইভাবে হেঁটে যাওয়া থেকে তিনি বিরত হননি।

মাটিতে রোদ নামার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে আসা, একটু বিশ্রাম। তারপর মিনিট পনেরো আসন। প্রতিদিন আসন করার সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জানিয়ে দেয়, আমরা ঠিক আছি, ঠিক আছি। আর সেটা জানতে পারলেই মন ভালো হয়ে যায়। তারপর স্নান, বেশ সময় নিয়ে আরাম করে। বিত্তি লেবু-চা আর সেঁকা পাঁউরুটি এনে দেয় খবরের কাগজের সঙ্গে। সকাল আটটা পর্যন্ত কুন্তী টেলিফোন ধরেন না।

এই ফ্ল্যাটটিতে কুন্তীর সারা সময়ের সঙ্গী বিত্তি। মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিত্তির ইউটেরাসে

টিউমার হওয়ার জন্যে ওটাকে বাদ দিতে হয়েছিল। এ জীবনে আর মা হতে পারবে না বলে ও বিয়ে করেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। এ ব্যাপারে বিস্তিরও রাখঢাক নেই। চেহারাপত্তর ভালো বলে যেসব পুরুষ বিস্তির দিকে এগোয় তাদের সে সাফ বলে দেয় তার অঙ্গহানির কথা। বিস্তির এখনও ধারণা পুরুষরা মেয়েদের কামনা করে শুধু সন্তানের বাবা হবে বলে।

কুন্তীর কাছ থেকে এই ব্যাপারটাকে ঘেন্না করতে শিখে গিয়েছে সে। তার শিক্ষায় এমন অনেক কিছু ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে যে যার ফলে অন্য কারও বাড়িতে কাজ করা সম্ভব নয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এ-বাড়িতে কাজের লোক কখনই বঞ্চিত হয় না। কিন্তু কী খাওয়া-দাওয়া? কুন্তী লাঞ্চ করেন অফিসে। বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঠিক ন'টায় বেরিয়ে যান। সেই ব্রেকফাস্টে থাকে একটা ডিমের পোচ আর দুটো ফল। লাঞ্চে একটা চিকেন স্টু-ই তাঁর কাছে আসে। ছুটির দিনে একরাশ স্যালাড, চার চামচ ভাত, দু-টুকরো মাছ অথবা মাংস এবং ফল। রাত্রে ফলটা বাদ যায়, বদলে আসে সেঁকা মাংস। এই খেয়ে-খেয়ে বিস্তিরও অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। কুন্তীর কাছে সে জেনেছে বাঙালিরা অপ্রয়োজনে বেশি খায়।

শরীরে যা প্রয়োজন তার বহুগুণ জিভের আরামের জন্যে ভেতরে ঠেসে দেওয়া হয়।

বিস্তি সেটা এখন ভালো করে বুঝে গেছে। এই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য যে-কোনও কাজের লোকের চেয়ে তার ফিগার ঢের-ঢের ভালো। কুন্তী বাড়িতে যখন থাকেন না তখন তার সময় চমৎকার কাটে টিভির সামনে বসে। কেবলে সিনেমা তো আছেই, বিবিসি, স্টার টিভির খুঁটিনাটি এখন তার মুখস্থ। আর এসব কারণেই ডায়মন্ডহারবারের গ্রামের বাড়িতে যেতে হলে দিনে-দিনে ফিরে আসে সে।

এই হল কুন্তীর সংসার। সারাদিন একরকম, সন্ধের পর একটু আলাদা। অন্তত বিস্তির চোখে তো তাই। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে এক কাপ লেবু-চা আর চিকেন স্যান্ডুইচ খেয়ে কুন্তী কোনওদিন টিভির সামনে বসলেন অথবা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটালেন। বন্ধুরা কেউ এলে টেবিল সাজানো হয়। সেই রাতে শুয়ে পড়ে বিস্তি। দিদিমণির আড্ডা ভাঙতে কখনও -বারোটা অথবা কাছাকাছি। কেউ না এলে ঠিক দু-গ্লাস মদ্যপান করেন কুন্তী। বিস্তির প্রথম-প্রথম পছন্দ হত না, এখন আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এক দুপুরে একলা বাড়িতে সে জিভে ঠেকিয়ে অবাক হয়েছিল। এমন বিশ্রী গন্ধওয়ালা জিনিস মানুষ কী করে আনন্দের সঙ্গে খায়।

আজ সকাল থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। দিনটা ছুটির বলেই মনে আলস্য এল। ব্যালকনির বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে চোখ থেকে চশমা সরালেন কুন্তী। প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ! সামনের আকাশে ময়লাটে মেঘের ভিড়। হঠাৎই নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল তাঁর।

পৃথিবীতে একটা কাছের মানুষ নেই যাকে বলা যায়, দ্যাখো তো আমার পিঠে কী হয়েছে?

বিস্তি আছে অবশ্য। কিন্তু এই একাকিত্ব বিস্তিকে দিয়ে পূর্ণ হবে না কোনওদিন।

একজন পূর্ণ পুরুষের জন্যে প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে মৃণালের সঙ্গে ভালবাসা এবং বিয়ে। ভাবপ্রবণতার বেলুনে সমস্ত পৃথিবী তখন আড়ালে। মা-বাবা বাধা দেননি। বস্তুত ওঁরা কখনই কুন্তীর কোনও কাজে বাধা দেননি। কিন্তু তিনবছর যেতে-না-যেতেই মৃণালের চরিত্রের অনেক অসংগতি তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ওর কোনও সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলত, এসব তুমি বুঝবে না। মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিত মহিলাদের সম্পর্কে তার ধারণা কী! তখন চাকরি করতেন না কুন্তী। আর না চাইলে টাকা দিত না মৃণাল। টাকার জন্যে হাত পাততে পারতেন না কুন্তী। মৃণালের কিছু বন্ধুবান্ধব এমন বোকা-বোকা কথা বলত যে প্রকাশ্যেই তাদের সমালোচনা করতেন তিনি।

এইসব ব্যবধান বাড়তে-বাড়তে একসময় বাক্যালাপ বন্ধ হল। তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া। শেষপর্যন্ত ডিভোর্স। এখন এতদিন বাদে মৃণাল সম্পর্কে তাঁর কোনও স্পষ্ট ভাবনা নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষ। শরীরের আনন্দ নিয়ে কথা উঠলেই তার মৃণালের কথা মনে পড়ে।

তিরিশে পৌঁছে রঙ্গন এল। এতদিনে জীবন পালটে গিয়েছে অনেক। ছেলেবন্ধু ছিল কয়েকজন কিন্তু রঙ্গন এসে সবাইকে আড়াল করে দিল। রঙ্গন কম কথা বলে এবং মেয়েদের স্বাধীনতায় হাত দেয় না। সে ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে মুদ্রা আসায় সরকারের প্রিয় পাত্র। সকালে ইচ্ছে হলে দুপুরেই দিল্লি হয়ে সিমলা চলে যেতে পারে।

একটু আনপ্রেডিকটেবল, কিন্তু রঙ্গনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে ভালো লেগেছিল কুন্তীর।

মদ্যপানের অভ্যেসটা রঙ্গনের কাছ থেকে পাওয়া। ফাইভ স্টারের মেনুকার্ড যার মুখস্থ সে এক রবিবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বনগাঁর দিকে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে গ্রামের একটা মেঠো দোকানে ভাত ডাল তরকারি খেলো শালপাতায়, কুন্তীকেও খেতে হয়েছিল বলা ঠিক হবে না, কুন্তী নিজেই খেয়েছিল। রঙ্গন বলেছিল, ইচ্ছে না হলে খেয়ো না, গাড়িতে পার্কস্ট্রিটের খাবার আছে। রঙ্গনকে রোমান্টিক বলা যায় যদি কেউ তার সঙ্গে জীবন-যাপন করে। কিন্তু ক্লাবে, পার্টিতে সে গম্ভীর, উদাসী। বাড়িতে গেস্ট এলে কিছুক্ষণ বাদে হাই তুলে ঘুমোতে চলে যায়। আবার সকালে উঠেই পাশপোর্ট নিয়ে ভিসা করতে ছুটে যায় নায়াগ্রার রামধনু দেখবে বলে। রঙ্গন তাঁকে অনেক দিয়েছে। এই বিত্ত, কর্তৃত্ব বিশাল ব্যাবসা এবং জয়তীকে। তেরো বছরের জয়তী শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মায়ের চেহারা আর বাপের স্বভাব পেয়েছে।

জয়তীর যখন চার আর কুন্তীর ছত্রিশ তখন আটত্রিশ বছরের রঙ্গন এক সকালবেলায় ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আর ফেরেনি। যাওয়ার সময় ও পার্সটাও নিয়ে যায়নি। সাত লক্ষ টাকা যে আয়কর দেয় তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঞ্জাবি। যত রকমের খোঁজখবর সম্ভব সব বিফলে গিয়েছে, পুলিশ শেষপর্যন্ত হার মেনেছে, মানুষটা উধাও তো উধাও। কেন রঙ্গন এভাবে না জানিয়ে চলে গেল তার উত্তর আজও পাননি কুন্তী।

সত্যি কথাটা হল, রঙ্গনের অভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এখন। ব্যাপারটা মনে এলে জ্বালা আসে। কতখানি স্বার্থপর হলে মানুষ এইভাবে চলে যেতে পারে। তাঁকে তো বটেই, মেয়েকেও এক ফোঁটা গুরুত্ব দিতে চায়নি রঙ্গন। টেবিল, চেয়ার, খাট, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, শেয়ার, ইউনিট ট্রাস্ট অথবা ব্যাবসার মতো তাঁদেরও ফেলে যেতে পেরেছিল অনায়াসে। সবচেয়ে আপশোস হয় যখন মনে পড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগের রাত্রে চূড়ান্ত মদ্যপান করে শরীরের আনন্দ খুঁজতে চেয়েছিল রঙ্গন। ও-ব্যাপারে সে কখনই দক্ষ ছিল না, সেই রাত্রেও আলাদা কিছু হয়নি। আর পরদিন সকালে চা খেয়ে কাগজ পড়ে লোকটা চলে গেল। কেউ-কেউ সন্দেহ করেছিল এর পেছনে কোনও অপরাধচক্র আছে, কিন্তু সেটা প্রমাণিত হয়নি, কেউ বলেছে রঙ্গন সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সেটাও এক ধরনের সান্ত্বনা।

কিন্তু রঙ্গনের কথা মনে এলে অপমানবোধ আসে। কুন্তী এটা এড়াতে পারেন না। ন'টা বছর দেখতে-দেখতে কেটে গেল। মাঝে-মাঝে একাকিত্ব প্রবল হলে বাঁধ ভাঙার বাসনা হয়। রঙ্গনের উধাও হওয়ার পরবর্তী পর্যায় নিয়ে আইনজ্ঞরা তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো ঠিকঠাক মানতে গিয়ে তাঁকে সংযত থাকতেই হয়েছে।

কুন্তী উঠলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল দিন গড়ালে মেঘের দুপুর এলে যন্ত্রণা তীব্রতর হবে।

এই সময় কেউ যদি তাঁকে সঙ্গ দিত। কাকে বলা যায়। চোখের সামনে পরিচিত পুরুষদের মুখ ভাসল। এদের বেশিরভাগই বিবাহিত।

বিবাহিত অথচ কুন্তী সম্পর্কে আগ্রহী। এদের কেউ-কেউ বিদ্বান, স্মার্ট, অর্থবান অথচ কুন্তীর সামনে এলেই মদনের মতো লেজ নাড়তে থাকে। বোকা-বোকা স্বভাবের পুরুষদের তিনি দু-চক্ষে

দেখতে পারেন না। আবার কেউ-কেউ অতিরিক্ত স্মার্ট। মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে শরীরে মেদ জমতে দেন না। এই ওপরচালাক লোকগুলো কাছে এলেই তাঁর অ্যালার্জি হয়। ওদের ভেতরের ফাঁপা বেলুনটাতে পিন ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। তৃতীয় দলের পুরুষরা আসেন গম্ভীর মুখে। হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া শব্দ বাড়ান না। যেন এই পৃথিবীর সবকিছু তাঁরা জেনে বসে আছেন। এঁদের দেখলেই কেষ্ট বলে মনে হয়। আর নয় বছর ধরে এইসব থকথকে কাদার মধ্যে পাঁকাল মাছ হয়ে বেঁচে থেকে তিনি যে বর্ম বানিয়ে ফেলেছেন তা হুট করে আজ খুলে ফেলবেন কী করে?

টেলিফোনটা বাজল। বিত্তি গিয়ে রিসিভার তুলল। কথাবার্তা বলে এসে জানাল, 'নাম বলল অণিমা, তোমার বন্ধু ছিল নাকি!'

অণিমা! কে অণিমা? হঠাৎ এক তরুণীর মুখ মনে এল। ফরসা ঝকঝকে, চোখে চশমা। ওঁদের ক্লাসের প্রথম হওয়া মেয়ে। অণিমা সেন। সেনই তো। সে এতদিন পর হঠাৎ?

কুন্তী আবিষ্কার করলেন তাঁর খুব ভালো লাগছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বললেন, 'কুন্তী বলছি। আমি ঠিক—;' ইচ্ছে করেই থামলেন তিনি। ওপাশের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, 'কুন্তী, আমি অণিমা, আমরা একসঙ্গে পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। অনেককাল হয়ে গেল অবশ্য, চিনতে পারা যাচ্ছে কি?'

'ও বাব্বা! তুমি?' কুন্তী এবার বোঝালেন তিনি চিনেছেন, 'কী খবর বলো? হঠাৎ?'

'তেমন কিছু নয়। চৈতিকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে পড়ত, ইন্টার কলেজ ড্রামায় বেস্ট অ্যাকট্রেস হয়েছিল. হ্যাঁ, চৈতি বলেছিল তুমি নাকি এখন বিশাল ব্যাবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী। ক্ষমতায় থাকলে চাও বা না চাও লোকে তোমার নাম জানবেই। আমার এক দেওর সাংবাদিক। তাকে বলতে সে তোমার অফিস আর বাড়ির ফোন নম্বর এনে দিল।'

'ভদ্রলোকের নাম?'

'সর্বজিত সেন?'

কুন্তীর মনে পড়ল। খুব ঝকঝকে চেহারার মধ্য তিরিশের এক সাংবাদিক। অর্থনীতি নিয়ে ভালো কাজ করছেন। কয়েকবার লোকটাকে দেখেছে সে। দেখা অবধি! সাংবাদিকদের নিয়ে তাঁর কোনওকালে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেই লোকটা অণিমার দেওর!

'তোমার দেওর দেখছি দারুণ করিৎকর্মা।'

'তা বলতে পারো। ওয়াশিংটনে একটা বড় কাজের অফার পেয়েছে অথচ বলছে যাবে না। যাহোক তুমি বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

বিন্দুমাত্র না। কী করছ এখন?'

'যা কপালে ছিল। ছাত্রী পড়াই আর সংসার চালাই। তোমার স্বামীর...।'

'ওটা এখন ইতিহাস।' ঝটপট থামিয়ে দিলেন কুন্তী।

'ও! আসলে আমি একটা মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'মেয়ে?'

'হ্যাঁ। বছর তিরিশ বয়স হবে। বেশি পড়াশুনাও নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য ওর চাকরি দরকার। এখনই। কলেজে পড়ালে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তোমাকে যদি অনুরোধ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?'

সঙ্গে-সঙ্গে শিথিল হয়ে গেলেন কুন্তী।

প্রয়োজন ছাড়া যে এই টেলিফোন নয় জানার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'আমার না বলা উচিত। চাকরি করার যোগ্যতা মেয়েটির আছে কিনা তাও যাচাই করার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমার নেই। কিন্তু তুমি বলেই সেটা বলতে বাধছে।'

'অনেক ধন্যবাদ ভাই। ওকে কবে পাঠাব?'

ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। আজকের এই অলস দিনটার কিছু সময় না হয় অতীতের দায় মেটাতেই কাটুক। কুন্তী বললেন, 'আজই দুপুরে।' বলে রিসিভার রেখে দিলেন। তাঁর মনমেজাজ আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

দশটা নাগাদ দ্বিতীয় টেলিফোন এল, 'কেমন আছ?'

কুন্তী কথা না বলে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। ওপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কথা বলতে ইচ্ছে না করলে রিসিভার নামিয়ে রাখতে পারো!'

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম অজস্র কণ্ঠস্বরের থেকে তোমারটা কত আলাদা! হ্যাঁ, বলো।'

'ভালো নেই। একদম ভালো নেই।'

'কেন?'

'উত্তরটা বোকার মতো শোনাবে। তোমার বউ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'ওকে নিয়ে চলে এসো এখানে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুন্তী। এবং তারপরেই আবার ডায়াল করলেন। বেছে-বেছে আরও তিনজন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানালেন সস্ত্রীক তার ফ্ল্যাটে আসতে। শেষপর্যন্ত আয়নার সামনে বসে বিন্তিকে ডাকলেন, 'আজ একটু বেহিসাবি হব। তুমি বাজারে যাও। ইলিশ মাছ নিয়ে এসো।'

'ইলিশ?' বিন্তির চোখ বড় হল। এতদিনে সে জেনেছ ইলিশ শরীরের কিছুই উপকার করে না, 'তুমি ইলিশ খাবে?'

'হ্যাঁ! একদিন না হয় খেলাম। অনেকটা আনবে। আরও আটজন খাবে। মাথাপিছু চার-পাঁচ পিস। পেটি দেখে নেবে। আর খিচুড়ি বানাবে।'

'খিচুড়ি?' হাঁ হয়ে গেল বিন্তি এবং পরক্ষণেই বলল, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'এমনি।'

টাকা দেওয়াই থাকে। বিন্তি চলে গেলে নিজেকে সাজালেন কুন্তী। সাজতে বসলে তাঁর মন ভালো হয়ে যায়, আজও হল। বিন্তির কথা ভেবে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর এই বেহিসাবি খাওয়া মেয়েটা মানতে পারছে না।

একদিন তো!

সাজ শেষ হয়ে গেলে সেলারে গেলেন তিনি।

প্রচুর বিদেশি মদ থরে-থরে সাজানো। ভদকাও আছে। দুপুরে ভদকা এবং বিয়ার।

বিয়ারের বোতল আরও কয়েকটা আনানো উচিত। টাকা বের করে বাইরের ঘরে গিয়ে আবদুলকে হুকুমটা দিয়ে দিলেন। আবদুল রঙ্গনের আমলের কুক কাম বেয়ারা। এখন বৃদ্ধ কিন্তু মোগলাই রান্নার মাস্টার। কিন্তু এ-বাড়িতে আজকাল ওকে রাঁধতে হয় না।

বারোটা নাগাদ অতিথিরা এসে গেল।

জোড়ায়-জোড়ায়। দুপুর বলেই সবাই হালকা পোশাকে এসেছে। মহিলারা ফ্ল্যাটে ঢুকেই কুন্তীর প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। কুন্তী যেন দু-হাতে ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অথচ মুখে নির্লিপ্তের হাসি ওঁদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছিল। ট্রলিতে ভদকা, বরফ জল এবং বোতলে বিয়ার। আবদুল পরিবেশন করে যাচ্ছে। বিন্তি ফিরে এসেছে দু-জোড়া ইলিশ নিয়ে। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি চলছে। এই সময় অমিত জানতে চাইল, 'এই হঠাৎ আমন্ত্রণের কারণ জানা যাক!'

সোফায় বসা কুন্তীর দু-হাতে গ্লাস, মুখ ওপরে তোলা, ঠোঁটে ঈষৎ কুঞ্চন, 'এখন নয়, আরও পরে। তোমাদের ফিরে যাওয়ার আগে।'

এসব আড্ডা জমে গেলে হোস্ট এবং গেস্টের আলাদা কোনও ভূমিকা থাকে না। কিছুক্ষণ

পরেই কুন্তী আলাদা হয়ে যেতে পারলেন।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি অতিথিদের দেখছিলেন। এই চারজন পুরুষই মোটামুটি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী। কিন্তু এঁরা এমন অনেক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে স্পষ্ট তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ অসীম। সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে এসে এরা পোষমানা শেয়ালের মতো আচরণ করছে। অমিতকে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারতেন, আজ সকাল থেকে নিজেকে খুব একা লাগছিল। পেনফুল একাকিত্ব। মনে হচ্ছিল একজন পুরুষমানুষকে সঙ্গী হিসেবে দরকার।

তোমাদের যে-কোনও একজনকে একা ডাকলেই সেটা পেয়ে যেতাম। কিন্তু সেই পাওয়ায় চুরি-চুরি অনুভূতি। তোমরা মদ্যপান করো।

নেশা হোক। তারপর তোমাদের স্ত্রীদের সামনে যদি উত্তরটা ছুঁড়ে দিই তখন দেখতে হবে কী আচরণ করো। ওই দেখার জন্যেই এই আমন্ত্রণ।

দুপুর যখন মাঝপথে, বিয়ার এবং ভদকা যখন অনেকটাই পেটে তখন আবদুল এসে জানাল একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আবদুলের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কুন্তী তাতে অনিমার নাম পড়লেন। তাড়িয়ে দিতে গিয়েও পারলেন না। অতিথিদের কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে তিনি ড্রইংরুমে চলে গেলেন।

একটি কালো রোগা মেয়ে ছাপা শাড়িতে শরীর জড়িয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ ছাড়া হাতে নিঃসঙ্গ শাঁখা দেখতে পাওয়া গেল। কুন্তীকে দেখা মানে যে দেবীদর্শনের কাছাকাছি তা ওর চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। কুন্তী বললেন, 'ইয়েস!'

'দিদি টেলিফোনে—!'

'হুঁ কতদূর পড়েছ?'

'স্কুল ফাইনাল।'

'কী চাকরি করবে? যে-কোনও চাকরি করতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার তা তোমার আছে?'

মেয়েটি মাথা নিচু করল।

'টাইপ জানো? শর্টহ্যান্ড? তাহলে কী জানো?'

মেয়েটি চোখ তুলল, 'লিখতে পারি!'

'লিখতে পারো? কী লেখা?'

'গল্প।'

'মাই গড! তুমি গল্প লেখো নাকি?' কুন্তী বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'হ্যাঁ।'

'কাগজে ছাপা হয়?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'না, ওরা ফেরত দেয়।'

'কেন?'

'জানি না। কেউ বলে না তো কী হয়েছে। অবশ্য দিদি বলেছেন।'

'কী বলেছেন?'

'আমি নাকি পুরোনো দিনের মতো গল্প লিখি। আসলে আমার বাবার দোকানে যেসব বই ছিল তাই পড়ে শিখেছি তো। তবে এখন নতুন দিনের মতো লিখব।'

'তোমার বাবার কীসের দোকান? বই-এর?'

'না, মুদির। ছোট দোকান।'

'কোথায়?'

'বনগাঁয়।'

'আচ্ছা! তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

মাথা নিচু করল মেয়েটি, 'সোনারপুরে।'

'সেখানেই থাকো?'

'না, বনগাঁয়।'

'কেন?'

চুপ করে রইল মেয়েটি!

কুন্তী বিরক্ত হল, 'দ্যাখো, তোমাকে দেওয়ার মতো কোনও চাকরি হাতে নেই। তুমি তোমার দিদিকে একথা বলবে।'

'আমি জানতাম।' বিড়বিড় করল মেয়েটি।

'তুমি জানতে একথা বলব?'

'হ্যাঁ, বড়লোকদের চরিত্র এমন হয়। গল্পে পড়েছি। লিখেছিও। কিন্তু বড়মহিলারা কীরকম হন তা জানতাম না। আপনি রাগ করবেন না, আমি আসি।'

'দাঁড়াও। তোমার তো সাহস কম নয়। অণিমার সঙ্গে কি করে আলাপ?'

'আমাদের গ্রামের এক মাসি ওঁর বাড়িতে কাজ করে। আমাদের গ্রামের সবাই জানে যে আমি লিখি। মাসি গিয়ে দিদিকে আমার কথা বলেছিল—।'

মেয়েটির গলার স্বরে চমৎকার দৃঢ়তা লক্ষ করলেন কুন্তী। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বনগাঁ থেকে এখানে আসছ আজ?'

'হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম স্টেশনে নেমে।'

'কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে?'

'ভোর পাঁচটায়।'

'কিছু খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'বসো।' হুকুম করলেন কুন্তী। মেয়েটি সঙ্কোচ নিয়ে বসল।

'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?'

'অ্যাঁ? না, না। পছন্দ করার মতো কোনও ছেলে আমাদের গ্রামে ছিল না। বাবা সম্বন্ধ ঠিক করতেন, কিন্তু—' মেয়েটি থামল, 'আমি আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখেছি, জানেন?'

'সেটা কি ছাপা হয়েছে?'

'না। আমার হাতের লেখা ভালো। আপনি পড়বেন? না, আপনার সময়ই হবে না।'

'তোমার কাছে গল্পটা আছে?'

মেয়েটি ব্যাগ খুলে ভাঁজকরা কাগজগুলি দিল। প্রথম পাতায় লেখা, 'শবরীর প্রতিক্ষা', লেখিকা—নমিতা দেবী।

কুন্তী বিন্তিকে ডাকলেন। মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন। কিন্তু মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না দিদি, আমার হাতে সময় নেই। এমনিতেই বৃষ্টি পড়ছে, কখন বাড়ি পৌঁছতে পারব জানি না। আপনি এই ডাকটিকিট লাগানো খামটা রাখুন। পড়া হয়ে গেলে এই খামে লেখাটা ঢুকিয়ে পোস্টবক্সে ফেলে দেবেন, হ্যাঁ?'

কুন্তী কিছু বলতে পারলেন না। মেয়েটি একটা স্ট্যাম্প লাগানো খাম টেবিলে রেখে তাঁকে নমস্কার করে যাওয়ার সময় বলল, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনি না খুব সুন্দর। সিনেমার মতো সুন্দর। সিনেমায় নামেননি কেন?'

'নামলে উঠতে পারতাম না, তাই।'

'মানে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বললে না?'

'মেয়েটি বুঝল। বুঝে চলে গেল।

হয়তো ওই লেখা, ওই কয়েকপাতার গল্প পড়তেন না কুন্তী, কিন্তু গোল বাধাল অমিত। ঘরে ফেরা মাত্র বলে বসল, 'কী ব্যাপার ভাই? আমাদের ঘরে বসিয়ে বাইরে কাকে সময় দিচ্ছিলে? মূল্যবান মানুষটি কে?'

কুন্তী না বললে সেটাই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানাত। কিন্তু বললেন, 'তিনি এক লেখিকা।'

'লেখিকা? কী নাম?' অমিতের স্ত্রী জয়ী জিজ্ঞাসা করল।

'নমিতা দেবী।'

ইন্দ্রজিৎ অবাক, 'নমিতা দেবী? নাম শুনিনি তো! আমি অবশ্য বাংলা সাহিত্যের খবর ঠিক রাখি না। তবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর নাম শুনেছি।'

শোভন বলল, 'ছেলেবেলায় মায়ের কাছে পত্রিকা দেখতাম। তখন দেবীদের লেখা ছাপা হত। এই নমিতা দেবীর নাম তখন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ। কোথায় তিনি?'

'চলে গেছেন। যাওয়ার আগে এই গল্প দিয়ে গেছেন।' কুন্তী বললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। হয়তো ভদকা কিংবা বিয়ারের প্রভাব অথবা আলোচনার নতুন কোনও বিষয় না থাকায় সবাই গল্প শুনতে চাইল। আর কুন্তীকেই সেটা পড়তে হবে।

এও এক মজা। কুন্তীর মনে হল স্কুলের স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতন ব্যাপারটা। সারাজীবন যা করব না তা একদিন টুক করে করে ফেলা।

সস্তায় কেনা কাগজ। লাইন টানা। হাতের লেখা গোটা-গোটা। বোঝাই যায় যত্ন করে লেখা হয়েছে। আটটি মানুষ কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কুন্তী পড়া শুরু করলেন।

'আমার নাম শকুন্তলা। যে যুগের নয়, এ-যুগের। এরকম নাম কেন যে আমার রাখা হয়েছিল তা বাবা-মাকে প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি।'

'এক মিনিট।' ইন্দ্রজিৎ বাধা দিল।

'ভদ্রমহিলার নাম নমিতা না?'

জয়ী বিরক্ত হল, 'আঃ, লেখিকা কি নিজের নামে নায়িকার নাম লিখবে? দ্যাখো, পড়ার সময় কেউ কথা বলবে না।'

কুন্তী এগিয়ে দিলেন কাগজগুলো, 'জয়ী তুমিই পড়ো।'

জয়ী খুশি হল। কুন্তী যেন রক্ষা পেলেন।

আমরা খুব গরিব। আমার বাবা একটা সাধারণ দোকান চালান গ্রামে। দিনে কীরকম বিক্রি হয় তা জানি না। আমি কোনওমতে থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাড়িতে বসে ছিলাম। তবে ঠিক বসে থাকা বললে যা বোঝায় তা নয়। আমি রোজ চারপাতা লিখি। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস।

আমি যে গল্প লিখি তা অনেকেই জানে। এমনকী আমাদের সবচেয়ে বুড়ি মানদাঠাকুমাও সেদিন বলেছিল তার গল্প আমাকে লিখতে হবে কিন্তু তার আগে বুড়ি মরে গেল।

আমি দেখতে ভালো নই। রোগা, কালো, স্বাস্থ্যটাস্থ নেই তবে হাইট আছে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমি দেওয়ালে দাগ দিয়ে রেখেছি। সংসারের কাজ পারি, তবে করতে ইচ্ছে করে না। বাবার দোকানে মাসিক পত্রিকাও বিক্রি হয়। কোনও মাসে সেটা না বিকোলে আমি নিয়ে আসি। গোগ্রাসে পড়ি আর তার ঠিকানায় লেখা পাঠাই। এসব করতেও পয়সা লাগে। বাবা দিতে চায় না বেশিরভাগ সময়।'

অমিত হাই তুলল, 'একটু বোরিং মনে হচ্ছে।'

জয়ী বলল, 'শাট-আপ! কেমন সরল-সরল কথাবার্তা—চুপ করে থাকো।'

'আমার বোঝা বাবা নামাতে চাইল। পাত্রপক্ষ আসে। জিজ্ঞাসা করে এটা পারি, ওটা পারি কি না! আমি গান জানি না, সেলাই জানি না। রান্না একটু-আধটু জানি আর জানি লিখতে।

অনুরূপা দেবী না নিরূপমা দেবীর মতো শকুন্তলা দেবীরও একদিন নাম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর লিখতে জানি শুনলেই পাত্রপক্ষের মুখ কেমন হয়ে যেত। তাঁরা অদ্ভুত চোখে তাকাতেন। ফিরে গিয়ে আর সাড়া দিতেন না। শেষপর্যন্ত বাবা আমাকে শাসালেন, কাউকে বলা চলবে না আমি লিখি। যেন লিখতে পারাটা পাপ। বাঙালি মেয়ের যেমন অনেক কিছু করা পাপ তেমনি লেখাও। আর এই করতে-করতে সোনারপুরের হরিপদ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলের বউদি এসেছিল দেখতে। বিধবা বউদি। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে শুনে মা বিশ্বাস করতে চায়নি। লম্বাচওড়া, শরীর একটুও টসকায়নি। আমার মা ওঁর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওঁর স্বামী মারা গেছে পনেরো বছর বয়সে। ষোলোতে শাশুড়ির ছেলে হয়।

এক বছরের ছেলেকে বিধবা বউমার কাছে রেখে তাঁরা গঙ্গাসাগর করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। নৌকাডুবি হয়েছিল। সেই থেকে ইনি এক বছরের দেওরকে মানুষ করেছেন। বিয়ে-থা করেননি। দেওরই ধ্যানজ্ঞান। বিষয়-সম্পত্তি আছে। দেওরকে একটা স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছেন।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। সংসারের কাজ পারি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। গান জানি না সেলাই, নাচ জানি না আঁকা, এসব প্রশ্ন না করে ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভেতরের জামার সাইজ কি! ভয়ে-ভয়ে বত্রিশ বলতে তিনি মাকে বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। ওকে জা করে নিয়ে যাব।'

বাবা যা পারলেন দিলেন। বর এল বিয়ে করতে। স্বাস্থ্যবান যুবক। গায়ের রং কালো হলেও স্বভাব লাজুক। বাসরঘরে একটিও কথা বলল না। সবাই যখন বিশ্রাম নিতে গেল তখন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলব?'

তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে বলো।'

'আমি না লিখি। মানে গল্প-টল্প। বিয়ের পর লিখলে আপত্তি আছে?'

তিনি অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, 'সারাদিন-রাত বসে থাকতে হবে। ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পারো। তবে মাসে দশ টাকার বেশি হাতখরচ পাবে না এইটা মনে রেখো।'

সেই রাত্রে ওই অবধি। কিন্তু আমার চেয়ে সুখী বোধহয় পৃথিবীতে কোনও মেয়ে ছিল না। দশটাকায় যত কাগজ পাওয়া যাবে তা তো সারা মাসে লিখে ফুরোবে না।

শ্বশুড়বাড়িতে এলাম। শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, বউদিই সব। ফুলশয্যার রাত্রে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি। হরিপদর শরীর ভালো নেই, ওকে বিরক্ত করবে না।'

মেয়ে হয়ে মানে বুঝতে পারব না তা কি করে হয়। রাত্রে তিনি যখন শুতে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরীরে কি হয়েছে?'

'কি হবে আবার? কিস্যু হয়নি। ঘুমাও।'

সকালে উঠেই তিনি বেরিয়ে যেতেন দোকানে। দুপুরে খেতে এলে বউদি যত্ন করে তাঁকে খাওয়াতেন। খেয়েদেয়েই আবার দোকানে ছোটা। ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা। তখন স্নান শেষ করে রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিয়ে সিগারেট খেতে বাইরে যেতেন। ফিরতেন কখন টের পেতাম না। এত ঘুম পেত যে জেগে থাকতে পারতাম না।

বিয়ে হল, শ্বশুরবাড়িতে এলাম কিন্তু যেসব ঘটনা এই সময় ঘটে তার কিছুই আমার ক্ষেত্রে ঘটল না। দ্বিরাগমনে গ্রামে ফিরে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব? এখন আমি সকালে উঠি। ঘর গোছাই। বউদির নির্দেশে রান্না করি। তারপর সারাদুপুর লিখি আর লিখি। দুপুরের পর

বউদি সেজেগুজে বেরিয়ে যান, তখন একা। আর এই সময় পাশের বাড়ির বউটা আসে আমার কাছে। আমি লিখেছি দেখে চোখ কপালে তোলে। আমার বিরক্ত লাগলেও কিছু বলি না। বউটা নানান কথা জানতে চায়। স্বামী আমাকে কীরকম আদর করে তাও! ওসব ঘটনা ঘটেনি বলে দিয়েছিলাম। শুনে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'জানতাম।'

এসব চরিত্রের কথা আমি জানি। ঘর ভাঙতে এদের জুড়ি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রও এঁদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই রাত্রে মনে হল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাঁর সত্যি হয়তো অসুখ আছে। অসুখটা কি? অসুখ থাকলে কেউ অত পরিশ্রম করতে পারে! তাহলে বউটাও বা বলবে কেন, জানতাম।

রাত্রে স্বামী এলেন। খাওয়া-দাওয়া হল। বউদি তাঁকে জানিয়ে দিলেন নিয়ম মানতে আগামীকাল আমাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যেতে হবে দ্বিরাগমনে। তবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেই হবে। রাত কাটাতে হবে না। স্বামী কিছু বললেন না।

স্বামী সিগারেট খেতে বাইরে গিয়েছেন। আমি আজ কিছুতেই ঘুমাব না। আধঘণ্টা এক ঘণ্টা চলে গেল। রাত বাড়ছে। সব চুপচাপ। এখনও তিনি ফিরছেন না কেন? শেষপর্যন্ত ওঁকে খুঁজতে বাইরে বের হলাম। লম্বা বারান্দা। পরিষ্কার উঠোন। উঠোনে চাঁদের আলো। তিনি নেই কোথাও। উঠোন পেরিয়ে দরজায় গেলাম। রাস্তা দেখা যাচ্ছে ছবির মতো। এরকম বর্ণনা আমার একটা গল্পে আছে। তাঁকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎ আমার ভয় করতে লাগল। কিছু হয়নি তো তাঁর! মনে হল বউদিকে ব্যাপারটা জানাই। কিছু হলে তিনিই আমাকে দুষবেন না জানানোর জন্যে। বউদির ঘরটা ওপাশে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম ওটা ভেতর থেকে বন্ধ নয়। ঠেলতেই পাল্লাদুটো খুলে গেল। আর আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। এক ছুটে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলাম। তারপর একটু সামলে উঠে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। চোখের পাতায় দৃশ্যটা যেন এঁটে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়ছিল খাটে। বউদি এবং আমার স্বামী পরস্পরকে সাপের মতো জড়িয়ে অদ্ভুত চাপা শব্দ করে যাচ্ছিলেন। মানুষ খুব যন্ত্রণা পেলে মুক্তির জন্যে এমন শব্দ করতে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ওই শব্দগুলো আমার বুকটাকে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছে। চোখ থেকে ঘুম উধাও। শরীর থেকে শক্তি। ওইভাবে পড়ে থাকতে-থাকতে একসময় টের পেলাম পাশের বিছানায় স্বামী এসে শুয়ে পড়লেন।

তারপর ভোর হল। সারারাত আমার ঘুম নেই। স্বামী জাগলেন এবং রোজকার মতো বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম না, এমনকী কলতলাতেও নয়, বউদি এলেন, 'তৈরি হয়ে নাও।'

আমি মাথা নিচু করলাম।

তিনি কিছু ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন, 'আমার ঘরে শব্দ না করে ঢুকে তুমি অন্যায় করেছ।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমাকে একটা কথা বলি। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর অনেক প্রলোভন এসেছিল। শরীর আমার এমনিতেই পুরুষের মাথা ঘোরায়। কিন্তু আমি সংযত ছিলাম। কেউ আমার নামে কোনও দুর্নাম দিতে পারবে না। শরীরে ভরা যৌবন অথচ ব্যবহার করতে পারছি না, এ যে কী যন্ত্রণা তা আমিই জানি। তোমার স্বামী তখন ছোট। তাকে মানুষ করছি দরদ দিয়ে। আমি খাওয়ালে খাওয়া, শোওয়ালে শোওয়া। আস্তে-আস্তে সে বড় হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে শুতে চাইত না। আমারও ভালো লাগত। সেইভাবে কাটিয়ে কখন একদিন আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল আমি নিজেই জানি না। তার কাছে আমিই সব। মা বলো তো মা, সঙ্গিনী বলো তো সঙ্গিনী। আমার কাছে ও যা পেয়েছে তা পৃথিবীর কোনও মেয়ে ওকে দিতে পারবে না।'

'তাহলে ওঁকে বিয়ে দিলেন কেন?'

'না দিয়ে পারিনি। সত্যি বলতে কি, আমি দিতে চাইনি। কিন্তু পাড়ার লোকজন যে আমাদের সম্পর্ককে সন্দেহ করছে তা টের পেলাম। আমার বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যদি শরীর ভাঙত, চুল পাকত, তাহলে কেউ সন্দেহ করত না। তাই ঠিক করলাম ওর বিয়ে দেব। বিয়ে দেব এমন মেয়ের সঙ্গে যার শরীরে আকর্ষণ নেই। যার কোনও গুণ নেই। অনেক খোঁজ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এমনিতেই তোমার বিয়ে হত না। এখন এখানে এসে ভালোই তো আছ। এইভাবেই সারাজীবন থাকতে পারবে যদি ইচ্ছে করো। আর কাল যা দেখেছ তা যদি কাউকে জানাও তাহলে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারবে।'

উনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন আমি কেঁদে ভাসাচ্ছিলাম। কান্না ছাড়া তখন আমার কিছুই করার ছিল না। উনি আমার পাশে বসলেন, 'এত কান্নাকাটির কি হয়েছে? ষোলো থেকে তিরিশ আমি বঞ্চিত ছিলাম, সেটা জানো? আর মেয়েদের ব্যাপারটা মেয়ে বলেই আমি জানি। সব মেয়ে এসবের জন্য কষ্ট পায় না। তোমার মতো রোগা ছেলেছেলে মেয়ের তো কষ্ট হওয়ার কথাই নয়। তুমি এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ সব করো, আমি আপত্তি করব না। তবে হ্যাঁ, তুমি নাকি কীসব লেখালখি করো, এইসব কথা লেখা চলবে না বলে দিলাম।'

হুকুম হয়ে গেল। একটা লেখায় পড়েছিলাম রাজা ইচ্ছে হলে লেখকের লেখা বন্ধ করে দিতে পারতেন। লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন। পরে সরকার সেই কাজ করেছেন, কিন্তু লেখকরা লেখা থামাননি। মনে-মনে স্থির করলাম আমিও হার মানব না। আমার স্বামী আমাকে বনগাঁতে পৌঁছাতে এলেন। সারাপথে একটা কথা নয়। রওনা হতে দেরি হওয়ায় আমরা পৌঁছেছিলাম প্রায় বিকেল-বিকেল। বাবা-মা জোর করে তাঁকে ফিরতে দিলেন না তখনই। বললেন রাত কাটিয়ে যেতে হবে।

নিজেদের বাড়িতে এতকাল আমার আলাদা শোওয়ার ঘর ছিল না। আজ রাত্রে সেই ব্যবস্থা হল। রাত্রে তাঁর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব?'

তিনি ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?'

'আমাকে তোমার একটুও পছন্দ হয়নি, না?'

তিনি উত্তর দিলেন না। না দেওয়াটাই বড় উত্তর। পরদিন সকালেই ফিরে গেলেন কাজের চাপ দেখিয়ে। আমি থেকে গেলাম বাপের বাড়িতে।

দিন গেল। মাসও। সোনারপুর থেকে কেউ আমাকে নিতে আসে না। এমনকী একটা চিঠিও নয়। মা আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। আমি ভয় পেতাম সত্যি কথা বলতে। কিন্তু জানি না জানি না বলে আর কতদিন চাপা দিতে পারব! শেষপর্যন্ত বলতে হল। মা পাথর হয়ে গেল! একি সম্ভব? মায়ের বয়সি মহিলার সঙ্গে? যার কাছে এক্মাস থেকে বড় হয়েছে তার সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক? কিন্তু সত্যি যা তা চিরকালই সত্যি।

অথচ তার মধ্যেই আড়াল। মা বাবাকে এসব জানালেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ থেকে চলে গেলেন সোনারপুরে। পাড়ার সবাই দেখল আমরা গেলাম এবং খানিক সময় বাদে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার চোখে জলও তারা দেখতে পেল। অতএব ওদের কৌতূহল হল। একজন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মা তাদের বলল, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিরাগমনের সময় সেই যে মেয়েকে দিয়ে গেলে হরিপদ আর আনতে এল না। অনেক অপেক্ষার পর নিজে নিয়ে এসেছিলাম মেয়েকে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে দিল, 'মেয়েকে নাকি তার পছন্দ হয়নি।' সঙ্গে-সঙ্গে জনতা গর্জে উঠল। আর আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে হরিপদ এবং তার বউদির কেচ্ছাকাহিনি শুনতে লাগলাম। প্রথম-প্রথম গ্রামের লোক ভাবত মাতৃস্নেহ। তারপর কেউ-না-কেউ কিছু-না-কিছু দেখতে পেয়েছে। লোকের চোখ ঢাকার জন্যে যে হরিপদর বিয়ে দেওয়া হল সেকথা সবাই জানে। এমন

অনাচার মেনে নেওয়া চলে না। বউ ফিরিয়ে নিতে হবে বলে পাড়ার লোক আমাদের সামনে রেখে চিৎকার করতে-করতে চলল। আমার খুব লজ্জা করছিল কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। তাঁর বউদিও নাকি বাড়িতে নেই। দরজায় আঘাত করছিল সবাই। শেষপর্যন্ত তিনি দরজা খুলে চিৎকার করলেন, 'আপনারা করছেন কি? আমাদের বিয়ের ব্যাপারটায় নাক গলাচ্ছেন কেন?' মানুষ তখন খেপে গিয়েছে। তাকে দেখতে পেয়েই কিলচড় শুরু হয়ে গেল। আমি আর পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল সবাই মিলে মারলে তিনি মরে যাবেন। আমি আমার রোগা শরীর নিয়ে ছুটে গেলাম তাঁকে আড়াল করতে। একটা লোক তাঁকে মারতে যাচ্ছে দেখে একটু ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম, দেখলাম সে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। স্বামী ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুনলাম লোকটার নাকি মৃগীরোগ আছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হল। আমি এবং মাও ওদের সঙ্গে গেলাম। লোকটাকে সুস্থ হতে দেখে ফিরে আসছি যখন, তখন একজন সেপাই এসে বলল থানার বড়বাবু আমাদের ডাকছে। আমাকে আর আমার মাকে। গেলাম। দারোগাবাবু জানালেন আমার স্বামী এসে ডায়েরি করে গেছেন যে আমি এবং আমার মা দলবল নিয়ে তাঁকে মারতে গিয়েছিলাম, তাঁকে ধাক্কা দিতে গিয়ে আর একজনকে এমন আঘাত করেছি যে লোকটাকে হেলথ সেন্টারে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ স্ত্রী হিসেবে আমার অক্ষমতা জানার পরই নাকি আমি বাপের বাড়ি চলে যাই। তা ছাড়া ওঁর কাছে আমার লেখা বেশকিছু কাগজ আছে যাতে প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমার চরিত্র ভালো নয়।

দারোগাবাবু হাসলেন। বললেন, 'সবই বুঝলাম কিন্তু কাগজে কি লিখেছেন?'

'গল্প!'

'অ্যাঁ? আপনি গল্প লেখেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেব্বাস, ভাবা যায় না!' দারোগা নাক চুলকে ফেললেন, 'ঠিক আছে, কোর্ট থেকে সমন গেলে হাজির হবেন।'

ব্যাস, হয়ে গেল।

এরপর থেকে আমি বনগাঁয়ে, আমার বাপের বাড়িতে। সংসারে কাজ করে দিই, তিনটে ছাত্রী পড়াই আর দুপুরে গল্প লিখি। বাবার কাছে হাত পাততে হয় না। মুশকিল হল আমার গল্পগুলো ঠিক কোন কারণে ছাপা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না। হলে সোনারপুরে গিয়ে পত্রিকাটা দিয়ে আসতাম। আমার এখন ভালো লাগে না। সাতদিন যে মানুষটার পাশে শুয়েছিলাম তিনি আমাকে খুব টানেন। মাঝে-মাঝে নিজেকে বোঝাই তিনি তখন খুব ছোট ছিলেন, কিছু বুঝতেন না। বউদির সঙ্গে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল হঠাৎই। যেমনভাবে দুর্ঘটনা হয়। তারপর সেইটে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মন মানতে চায়, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হচ্ছে!

আমার এখন সোনারপুরে যেতে ইচ্ছে করে। ভাইরা বড় হচ্ছে। ওরা বুঝতে শিখেছে আমি এ-বাড়িতে বাহুল্য। আমার এখানে থাকার কথা নয়। হঠাৎ আমার এক বান্ধবী আমাকে একটা সত্যি কথা বলল। ভগবান মানুষকে তৈরি করেছেন কতকগুলা নিয়ম মেনে। শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্ধক্য।

কোনওটাতেই কেউ চিরদিন আটকে থাকতে পারে না। তাকে এগিয়ে যেতেই হয়। আমার স্বামীর বয়স এখন তিরিশ, তিনি ছেচল্লিশ। আর কতদিন? বড়জোর বছর চারেক। তারপর তাঁর শরীর থেকে যৌবন উধাও হয়ে যাবেই। আর বাইরের যৌবন যদি বা থাকে ভেতরের যৌবন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তখন তাঁর কোনও আকর্ষণ থাকবে না আমার স্বামীর কাছে। গন্ধ নেই মধু নেই ফুলের দিকে মানুষ কতবার তাকায়! পাঁচ বছর পরে আমার মাত্র তিরিশ বছর হবে। কী-ই বা এমন। তখন তিনি আমাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

আমি তাই মাসে একবার সোনারপুরে যাই। দূর থেকে বউদিকে দেখে আসি। লোক বলে এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হলেও মানুষের শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তেমন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবু এটাই আমার একমাত্র আশা। আমি অপেক্ষা করব।'

জয়ী পড়া শেষ করল। তারপর বলল, 'ইম্পসিব্‌ল!'

অমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'এই জন্যেই বাঙালি মেয়েরা এক্সপ্লয়েটেড হয়ে চলেছে। স্বামী আর একজনের সঙ্গে ফূর্তি করছে দিনের-পর-দিন। আমি অপেক্ষা করব কখন তিনি মুখ ফেরাবেন সেই আশা নিয়ে?' জয়ীর গলায় জ্বালা স্পষ্ট হল।

শোভন বলল, 'কিন্তু গল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু যৌবন দিয়ে অনন্তকাল কেউ কোনও সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এই উপলব্ধিটা গল্পটার চমক।'

ওরা খিচুড়ি এবং ইলিশ খেলো। বিকেল নামতেই যেযার বাড়ি ফিরে গেল ধন্যবাদ জানিয়ে। দেখা যাচ্ছিল গল্পটা কিছুই নয়, খুবই সাধারণ ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও খেতে বসেও এ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করছে না। এক মাসের শিশুকে মাতৃস্নেহে বড় করে কোনও মহিলা শেষপর্যন্ত ওই সম্পর্কে যেতে পারেন কিনা তাও তর্কের বিষয়। কুন্তী কোনও কথা বলছিলেন না। একজন ঠাট্টা করে বলল, 'আহা বেচারা! লিজ টেলার যদি স্বামীর বউদি হত তাহলে ওকে পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হত কম করেও। তদ্দিনে মেয়েটা বুড়ি হয়ে যেত!'

বাড়িটা এখন ফাঁকা। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিলেন কুন্তী। ঘোলাটে মেঘগুলো ব্লটিং-এর মতো সমস্ত আলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে। সন্ধে হয়ে এল বলে। ওপাশের একটা ঘরে টিভি চলছে। দর্শক বিন্তি এবং আবদুল। শব্দ বাইরে বেরুচ্ছে না। কি একটা সিনেমা চলছে সেখানে।

গল্পটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না কুন্তী। বাঙালি মেয়েদের যে বয়সে ওই পর্বটিকে ছেড়ে আসতে হয়, তাঁর ক্ষেত্রে একটু আগেই যেন এসে গিয়েছে। ডক্টর দত্ত বলেছেন, এটা জীবনের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। একটুও মাথা ঘামাবেন না। শরীর নিয়ে চিন্তা করা বোকামি। আসলে মন তাজা রাখাই প্রয়োজন। শুনতে খারাপ লাগে না এইসব উপদেশ। শুনলে স্বস্তি হয় বলেই খারাপ লাগে না।

কিন্তু ওই যে মেয়েটি লিখেছে, গন্ধ নেই মধু নেই এমন ফুলের কথা! এখনও এই সময়ে তিনি যখনই একাকী তখনই এমন কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা করেন যে বোকাবোকা নয়, যে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করে না অথবা যোদ্ধা হওয়ার ভান করে না। এই যে কামনা তা তাঁর বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে। তাঁর শরীরের সবকিছু মন্থন করে নিশ্বাসের মতো আন্তরিক হয়ে ওঠে। রঙ্গন চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুকাল থিতিয়ে ছিল এইসব ভাবনা। এখন একটু-একটু করে প্রবল হচ্ছে। শেষ ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর লোকে যেমন হুড়মুড়িয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ে, ঠিক তেমন। শেষ ঘণ্টা? তাঁর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন কুন্তী। অসম্ভব। এই তো, ভরদুপুরে বাড়ি এসে ভদকা খাওয়ার আগেই মানুষগুলো তাঁর রূপের কত প্রশংসা করে গেল! অফিসে যখন ঢোকেন তখন কর্মচারীদের মুখে যে স্তাবক দৃষ্টি থাকে তা তাঁর অদেখা নয়। ম্যাডাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তারা এক-একজন চকোলেট হয়ে যায়।

সেদিন রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলেন বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে। একটি বছর পঁচিশের ছেলে এগিয়ে এসেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?' কুন্তীর কপালে ভাঁজ পড়েছিল।

'কেন?'

'আপনার মতো কাউকে কখনও দেখিনি।'

'সরি। আমার বাজে কথা বলার মতো সময় নেই।' কুন্তী পাশ কাটিয়েছিলেন অবহেলায় কিন্তু তাঁর ভালো লেগেছিল।

আর এসব শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে কারও জীবনে ঘটে? পৃথিবীতে এমন মেয়ে অনেক আছে যাকে কখনও কোনও পুরুষ প্রস্তাব দেয়নি। যেমন ওই মেয়েটি। কী নাম যেন, হ্যাঁ, নমিতা। চেহারার মতো সাদাসাপটা নাম।

কুন্তী কলকাতার দিকে তাকালেন। ঝাপসা জলের মধ্যে আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে। কলকাতায় সন্ধে নেমেছে বর্ষা জড়িয়ে। দিন শেষ হল। একটা গোটা দিন। কুন্তী ধীরে-ধীরে শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

দেওয়ালজোড়া আয়নায় এখন তিনি। মিষ্টি, অহঙ্কারী। দূর! কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! বরং স্নান করা যাক। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে অবিরত ভিজে চলেছেন তিনি। আজকের দিনটা অবহেলায় কাটল। শরীরটার দৈনন্দিন পরিচর্যা হল না।

একটু আলস্যঘন দিন। আগে মন্দ লাগত না, এখন অস্বস্তি হয়। এই বুঝি ফাঁক গলে শনি ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলেন তিনি। কোনও এক রাজা নাকি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না শনিদেব। কোথাও তাঁর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে রাজা যখন তাঁর পা ধুচ্ছিলেন তখন গোড়ালির কাছে জল পৌঁছায়নি অন্যমনস্কতার কারণে। ব্যাস, সঙ্গে-সঙ্গে শনিদেব সেইখান দিয়ে রাজার শরীরে প্রবেশ করে ধ্বংস ডেকে আনলেন। এমন যেন না হয়, এমনটা হতে দেবেন না কুন্তী।

স্নান সেরে বড় তোয়ালেতে শরীর মুছতে-মুছতে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। না, কপালে ভাঁজ পড়েনি, চোখের তলায় একটু ঢেউ নেই। হাসলে গালে কুঞ্চন ওঠে না। চামড়া কি টানটান। গলায় একটু, নাঃ, এ তাঁর চোখের ভুল। গতকাল যখন ছিল না আজ কোত্থেকে আসছে! মুখ উঁচু করতেই সন্দেহটা মিলিয়ে গেল। কাঁধ থেকে কনুইদুটো এখনও সতেজ। এবং নিজের বক্ষদেশ দেখতে গেলেই মৃণালের ওপর তাঁর খুব রাগ হয়। প্রথম যৌবনে মৃণাল যথেচ্ছাচার যদি না করত তাহলে এখনও ঈশ্বরী ঈর্ষিতা হতেন। সেই সময় তিনি বোঝেননি, মেয়েরা ভালোবাসলে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না অথবা চায় না। সঙ্গে-সঙ্গে গল্পটার কথা মনে এল। নমিতা অথবা শকুন্তলার স্বামীর বউদি, মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ভেতরে জামার মাপ কত? বেচারা, কী অপমানকর প্রশ্ন!

হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখতে ইচ্ছে করল কুন্তীর। পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেও যিনি তিরিশকে শাসনে রেখেছেন। সেই মহিলা নিশ্চয়ই তার মতো এমন বিত্তে নেই, হাত বাড়ালেই সমস্ত পৃথিবীকে পান না! তাঁর কৌশল কী?

সারা শরীর ঢাকা আলখাল্লা পরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছাতেই টেলিফোন বেজে উঠল। কুন্তী রিসিভার তুললেন না। বাজনা থামতেই বুঝলেন বিন্তি ধরছে ও-ঘরে। একটু বাদেই সে এল, 'অণিমাদেবী, কী বলব?'

মাথা নেড়ে ধরবেন বললেন কুন্তী।

রিসিভারটা তুললেন, 'হ্যালো!'

'বিরক্ত করছি। খুব ব্যস্ত?'

'নাঃ। বলো।'

'তোমাকে যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম সে কি দেখা করেছে আজ?'

'এসেছিল।'

কখন?'

'দুপুরে।'

'তারপর? মানে কখন গেল?

'কেন বলো তো?'

'আর বোলো না। ওর খোঁজে বনগাঁ, মানে যেখানে ও থাকে, সেখান থেকে ওর বাবা এসেছেন

আমার কাছে। মেয়েকে নিয়ে এখনই সোনারপুরে যাবেন। অথচ কথা ছিল ও তোমার ওখান থেকে আমার কাছে ফিরে আসবে।'

'তাহলে বনগাঁয় ফিরে গেছে।'

'মনে হচ্ছে। এখন এরা যে কী করবে?'

অণিমা যেন সত্যিই বিব্রত।

কুন্তীর খেয়াল হল, 'সোনারপুরে যাবে কেন? ওর লেখা একটা গল্প দিয়ে গেছে আমায়। সেটা পড়ে তো মনে হয় না যাওয়া উচিত। আর শোনো, এই মেয়েকে দেওয়ার মতো কোনও চাকরি আমার হাতে নেই। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'ও, ব্যাড লাক্! তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে খারাপ লাগছে। মেয়েটার কপালটাই মন্দ। ওর বাবা এসেছেন স্বামীর শেষকৃত্যে নিয়ে যেতে।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে উঠলেন কুন্তী।

'আজ দুপুরেই ওঁরা খবর পেয়েছেন লোকটা নাকি ভোরে আত্মহত্যা করেছে। গলায় দড়ি দিয়ে। শেষকৃত্যে না গেলে সম্পত্তির ভাগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারে।

'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'আমি জানি না। আচ্ছা রাখছি।'

রিসিভার রেখে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়লেন কুন্তী। তাঁর ভিজে চুল এখন তোয়ালেতে জড়ানো। হঠাৎই সেই তোয়ালের হিম তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটা এখন কার জন্যে কীসের জন্যে অপেক্ষা করবে? যার সময় গেলে সে জিতে যাবে বলে ভেবেছিল তার তো আজ ভোরেই সময় চলে গেল কিন্তু ওর তো জেতা হল না! এখন সেই মহিলা, যাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল একটু আগে, হঠাৎই যেন অনেক অন্ধকারে চলে গেলেন। আশ্চর্য, এদের কাউকেই তো তিনি চেনেন না।

কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎই সমস্ত শরীর যেন নির্জল বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। জিভ, গলা, পেট সর্বাঙ্গ। জল মানে চলাচল, জল মানে সরস। অনেক দূরের মহাকাশে যেসব গ্রহ জলহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হিংসুটে চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তৃষ্ণায় বুক জ্বলে-জ্বলে খাক!

কুন্তী প্রচণ্ড শক্তিতে বোতামে চাপ দিলেন।

বিশাল ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে বেল বাজছে। বিন্তি ছুটে এল দরজায়।

কুন্তী বলতে পারলেন, 'জল দাও!'



মানুষের মতো

এই বাড়ি ওর। মাঝে-মাঝে নিজের কাছেই কেমন অস্বস্তিকর মনে হয়। চার কামরার দোতলা এই বাড়িটা সে কিনেছে বারো হাজার পাউন্ডে। দোতলাটা কাঠের কিন্তু সর্বত্র কার্পেট পাতা। ওটা আগে থেকেই ছিল। এমনকী বাথরুমের আধুনিক ব্যবস্থাও। নিচের ঘরের রঙিন টিভি, স্টিরিও, ভি সি আর, কিচেনের যাবতীয় আধুনিকীকরণ যার যে-কোনও একটার দিকে তাকালে দেশে থাকতে চমকে উঠত। পনেরো বছর বিলেতে থেকে এসবের মালিকানা পেয়ে গেছে সে। বাড়ির পেছনে

একটা সরু প্যাসেজে গাড়িটা। গাড়িতে এসি না থাকলে এদেশে বাস করা যায় না, কিন্তু গাড়ি চালাতে-চালাতে সে বাংলা গানের ক্যাসেট শোনে। এটুকুই তার নিজস্বতা। লেক ডিস্ট্রিক্টের চওড়া হাইওয়েতে গাড়ির গতি বাড়িয়ে হেমন্ত মুখার্জির গলা চারপাশে ছড়িয়ে দিলে মনে চমৎকার আরাম হয়। বাড়িটার মতো গাড়িটা অবশ্য এমন কিছু অভিনব নয়। এমনকী তার রেস্টুরেন্টের হেড ওয়েটার আমাদেরও একটা গাড়ি আছে। আমেদকে সে মাইনে দেয় সপ্তাহে দুশো পাউন্ড। এখানে এক পাউন্ড মানে উনিশ টাকা নয়, আমেদ বলে একটা টাকাই। যাই হোক এখন সে বেশ সুখে আছে। প্রতি মাসে হাইলাকান্দিতে টাকা পাঠায়। সিলেট থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে সে একদা মা-বাবার সঙ্গে ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁরা রয়ে গেছেন আসামেই।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কেউ বলতে পারে না কার কীরকম কাটবে। ওসব হাত দেখা কিংবা ঠিকুজি বিচার যদি ঠিক হত তাহলে এতদিনে তো তার মরে যাওয়ার কথা। তিরিশের একটা অতিরিক্ত দিন তার বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু সে দিব্যি বেঁচে আছে ব্রিটিশ পাশপোর্টের মালিক হয়ে।

হাইলাকান্দি থেকে কি করে সে ইংলন্ডে এসে পড়েছিল, এত জায়গা থাকতে কেমন করে এই লেক ডিস্ট্রিক্টের গ্রামের রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়েছিল, ক্রমশ মালিক অসুস্থ হয়ে পড়লে সে পার্টনার হয়ে গেল এবং সবশেষে মালিক হয়ে দোকানটাকে ভারতীয় খাবারের দোকানে রূপান্তরিত করে ফেলল সেটা প্রায় রূপকথার মতো। কিন্তু এখন এটা সত্যি। সে যে রেস্টুরেন্টের মালিক তার নাম 'প্রেম'। সবরকম ইন্ডিয়ান ডিশ পাওয়া যায়। তার খদ্দেরদের নব্বুই ভাগ ব্রিটিশ। দিনের বেলা বন্ধ থাকে। শুক্র শনি সারারাত আর অন্য দিন রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা। সাতজন কর্মচারী তার। তিনজন নিচের কিচেনে, তিনজন সার্ভ করে আর একজন ডোরম্যান। সে নিজে থাকে কাউন্টারে, ড্রিঙ্কস মেপে দেয়, ক্যাশ গুনে নেয়।

রাত্রে যখন রেস্টুরেন্ট থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন তার ভয় লাগে। যদিও এই গ্রামে আজ পর্যন্ত কোনও ডাকাতি হয়নি তবু ওটা তার ভারতীয় অভ্যাসেই থেকে গেছে। এমনি দিনের গড় বিক্রি সাত-আটশোর বেশি হয় না। শুক্র শনি ওটা প্রায় সতেরো-আঠারোশোতে পৌঁছয়। পরের দিন ব্যাঙ্ক না খোলা পর্যন্ত দারুণ অস্বস্তি। একটা পাউন্ড তখন তার কাছে উনিশটা টাকাই হয়ে যায়।

আজ শুক্রবার। দুপুর অবধি ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। কে কবে ভেবেছিল দুটোয় ঘুম থেকে উঠে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে টিভি দেখতে-দেখতে খবরের কাগজের পাজল পাতাটা পেনসিলে ভরবে সে? তারপর চা আর হট ক্রিম পাই খেয়ে বাজারে বেরুবে? ইদানীং নিজের রেস্টুরেন্টে সে খায় না। পেটে সইছে না। সিলেটি রান্না সিলেটের ছেলের পেটে সয় না পনেরো বছরের অভ্যাসে, ভাবা যায়! আজ রেস্টুরেন্ট খুলবে আটটায়। ছ'টা নাগাদ ডিনার কাম লাঞ্চ তৈরি করবে সে ট্যাড়স ভাজা, মুগের ডাল, রুইমাছের কালিয়া দিয়ে। ছিমছাম খাবার। এদেশে মানুষের দাম বড্ড বেশি। হারানের বউ বা বাসুর মা জাতীয় কাউকে পাওয়া গেলে এসব ঝঞ্ঝাট কে পোয়াতো! দরজা খুলে বাইরে বের হল সে। এখন একটা পুলওভারই যথেষ্ট। সামার শেষ হতে চলেছে। এবার তেমন রোদ ওঠেনি। কিন্তু হাওয়ার দাঁত ধারালো হয়েছে এরই মধ্যে। তা ছাড়া গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে আর ঠান্ডা কি! গাড়ির দিকে এগোতে সে থমকে দাঁড়াল। অনেকদিন পরে ববকে দেখতে পেল। দুটো বাড়ির পরে বব থাকে। এই গ্রামের একজন কর্তাব্যক্তি। কিছুদিন আগে হিপিরা যখন এই গ্রামে এসেছিল তখনই বব ছন্নছাড়া হয়ে গেল। ওর বউ লিজা হিপিদের সঙ্গে চলে গেল কাউকে না জানিয়ে। পঞ্চাশ বছর স্বামীর সঙ্গে বাস করে কোনও বৃদ্ধা যে এমন করবে তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল গ্রামবাসীদের। বব ক'দিন যাকে পেত তাকেই জিজ্ঞাসা করত, 'আমার দোষটা কি বলতে পারো? আমি তো ওর ওপর কোনও অত্যাচার করতাম না। হয়তো আলাদা

করে গুরুত্ব দেওয়ার কথা আমি ভাবিনি কিন্তু আমাদের সময়ের মানুষেরা সবসময় বউ-বউ করতে তো অভ্যস্ত ছিলাম না। আমি যেহেতু ওকে নিয়ে খুব একটা ঘোরাঘুরি করিনি তাই পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে গেল? আচ্ছা বলো তো, কার বউ সংসার সামলায় না, বাচ্চাদের জন্ম দেয় না? কিন্তু সেই কারণে কেউ কি নিজেকে নিঃস্ব ভাবে? লিজাটা এতটা পাগল ছিল, বুঝলে! কিন্তু আমার দোষটা কি?'

'হাই বব!' সুদেব যতটা পারল সহজ গলায় ডাকল।

'হ্যালো দেব!' মাথাটা ঝাঁকাল বব। সত্তর ছোঁয়া বৃদ্ধ এখন যেন আরও জরাগ্রস্ত। এই কয়েক মাসেই ওঁর শরীর যেন দ্রুত ভাঙছে। বব সেই ইংরেজ যিনি এখনও হাই বলেন না। অন্যায়কে অন্যায় বলতে যাঁর জিব অসাড় হয় না। ব্রিটিশ টিম হেরে গেলে তিনদিন খুব মন খারাপ হয়ে যায় ওঁর।

'বব, তোমার শরীর কি ভালো নেই?'

'নো ইয়ংম্যান, আমি ঠিকই আছি। সন্ধেবেলায় আকাশে কী করে সূর্য থাকবে বলো!' বব হাসলেন।

'টেডের দোকানে আজকাল আড্ডা হয় না?'

'না, কোথাও যাই না। আসলে ভালো লাগা বোধটাই আমার হারিয়ে গিয়েছে। বেঁচে থাকাটা বড় ক্লান্তিকর দেব।'

সুদেব একটু ইতস্তত করল। তারপর খুব ঘনিষ্ঠ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'লিজার কোনও খবর পেলে?'

'ও হ্যাঁ! মাসখানেক আগে লিখেছিল একটা চিঠি। কেমন আছে লেখেনি তবে আমার কী-কী করা উচিত তাই জানিয়েছে। কোথায় আছে তাও লেখেনি। আই নো শী উইল কাম ব্যাক। পঞ্চাশ বছরের অভ্যেস যে-কোনও ড্রাগের চেয়ে শক্তিশালী। নইলে চিঠি দিয়ে আমাকে সচেতন করাত না। গুডবাই দেব।'

'বাই বব।' শব্দদুটো বলে সুদেব লক্ষ করল বব কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন, ওঁর হাঁটার ভঙ্গিটা মোটেই ভালো লাগল না তার।

অস্কার ছোকরা দাঁড়িয়েছিল ফুটপাতে। নিজের দোকানের চেয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই যেন বেশি ভালোবাসে ও। বব চলে যেতে সোজা সামনে এসে দাঁড়াল, 'তুমি লক্ষ্য করেছ লোকটা যেন কবরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই বলে মেয়েরা হল সব সর্বনাশের মূলে। তুমি বিয়ে না করে বেঁচে গেছ।'

'তুমিও তো বিয়ে করোনি।'

'এবার করতে হবে। জেন উঠে পড়ে লেগেছে। আমি জানি বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু জেনকে তুমি তো জানো, ও একবার যা ভাবে তা থেকে সরানো মুশকিল।' অস্কার মাথা নাড়ল।

'বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে না কেন?' সুদেবের মজা লাগছিল।

'বিয়ে মানেই তো অ্যাডজাস্টমেন্ট। তোমার ভালো না লাগলেও শান্তি ঠিক রাখার জন্যে বউ-এর কথা শুনতে হবে। পঞ্চাশ বছর ঘর করার পরও তো লিজা চলে গেল। আচ্ছা লোকে বলে পঞ্চাশ, বছরটা কি ঠিক পঞ্চাশ?'

'আমি ওদের বিয়ে দিইনি অস্কার যে তোমাকে বলতে পারব। আজ রাতে 'প্রেমে' আসছ?' ওকে কাটাবার জন্যেই সুদেব হাঁটার চেষ্টা করল।

মাথা নড়ল অস্কার, 'না। আমার মায়ের শরীর খারাপ। ওঁর ইচ্ছে একসঙ্গে ডিনার করি। লিজার ঘটনাটার পর মাকে নিয়ে প্রবলেমে পড়ে গেছি।'

অবাক হয়ে দাঁড়াল সুদেব, 'কেন? কি হয়েছে ওঁর?'

অস্কার কাঁধ নাচাল, 'মা বলছে লিজা ঠিকই করেছে। সারাজীবন সংসারের পেছনে ব্যয় করে মাও নাকি কিছু পাননি। শুধু বাবা বেঁচে নেই বলে মা লিজার মতো যেতে পারছেন না।'

সুদেব আর দাঁড়াল না। এই গ্রামে এখন বৃদ্ধাদের খাতির বেড়ে যাবে। লিজা বাড়িয়ে দিয়েছে। কবে কোন বৃদ্ধা উধাও হয়ে যায় সংসার বৈরাগ্যে তাই নিয়ে সবাই চিন্তিত। সঙ্গে-সঙ্গে তার একটা মজার কথা মনে হল। ছেলেবেলা থেকেই দেশে শুনত অমুকের ছেলে বা বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন বাদে খোঁজ পাওয়া গেছে উত্তরকাশীতে কিংবা হরিদ্বারে তাঁকে দেখা গেছে। কিন্তু কখনও শোনেনি কারও বোন বা মা সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন। কেন? মেয়েদের মনে সংসারাসক্তি অত্যন্ত বেশি। ভারতবর্ষে তো মেয়েরা সবচেয়ে বেশি শোষিত ছিল এককালে। বৈরাগ্য তো তাদেরই প্রথমে আসা স্বাভাবিক!

গাড়ির ভেতর আরামে বসে লাইটারের সুইচটা অন করে সিগারেট ধরিয়ে নিল সুদেব। এই গাড়ি এখানে জগাইমাধাইও চাপে কিন্তু ভারতবর্ষে ক'টা মানুষের আছে? এখানে সবাই তাকিয়ে থাকে রোলসের দিকে। সম্রাটের সম্মান ওর। যে মালিক তার টাকা আছে বলেই মালিকানা। লিটারে চার যাবে বা পার্টস পালটাতে সর্ষে ফুল দেখতে হবে বলে যাদের ভাবনা তাদের জন্যে রোলস নয়। মাঝে-মাঝে হাইওয়েতে সে দেখছে অন্য গাড়িগুলো রোলসের জন্যে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এমন দিন কি হবে মা তারা যেদিন সেও রোলস কিনতে পারবে? এক লাখ পাউন্ডের বাক্স!

গাড়ি চালাতে বড় আরাম, একটুও টেনশনে ভুগতে হয় না। রাস্তায় অবাঞ্ছিত পদাতিক নেই, শুধু নিয়মটুকু মাথায় রেখে চালিয়ে যাও। একটা কুটো পড়ে নেই কোথাও। এখন পাব্ কিংবা ক্লাব বন্ধ। স্ন্যাক্সের দোকান খোলা। ফুটে লোকজন বেশ। গ্রামের বিপরীত প্রান্তে পৌঁছে প্যাটেলের পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল সুদেব। মিষ্টি রোদ উঠেছে এখন। কিন্তু ঠান্ডাটাও জানান দিচ্ছে। প্যাটেলের দোকানে ঢুকে সে চারপাশে তাকিয়ে নিল। সামনের হলঘরে যাবতীয় ভারতীয় মশলা এবং তরিতরকারি সাজানো। এলাচ কিংবা দারচিনির দাম হাইলাকান্দির তুলনায় অর্ধেকের কম। ওগুলো আসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। বাদিকের ঘরে শাড়ি এবং জামাকাপড়ের একজিবিশন। প্যাটেলের সমস্ত আত্মীয় সেজেগুজে সেগুলো বিক্রি করে আর সারাদিন টেপে হিন্দি গান বাজায়। এখানে ঢুকলে কে বলবে বিলেতে আছি! মুদির দোকানে কোনও হেলপার নেই। যেযার পছন্দ নিয়ে আসছে ট্রলিতে করে। কাউন্টারে বসে তাই দেখে মেশিনে দাম যোগ করে টাকা নিচ্ছে প্যাটেল। একটু ফাঁকা হতে সুদেব তার পাশে গিয়ে দাড়াতেই প্যাটেল বলল, 'হাই দেব!'

'গতবারে চালটা খারাপ ছিল। ওই মাল এবার দিয়ো না।'

প্যাটেল কাঁধ নাচাল, 'অত ভালো চাল অথচ তোমার অপছন্দ। আসলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে চাল বিক্রি করতে ঝকমারি!'

সুদেব বলল, 'আমি যখন দেশ ছেড়েছি তখন জায়গাটার নাম ছিল পাকিস্তান। এই নাও গত সপ্তাহের চেক। তুমি গলা কাটছ জেনেও এখানে আসছি কারণ আমি আমার ব্রিটিশ খদ্দেরদের সেরা জিনিস সার্ভ করতে পছন্দ করি।'

প্যাটেল কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর ইশারায় কাছে ডাকল, 'তুমি কি খবরটা শুনেছ?'

'কোন খবর?'

'ইন্ডিয়া কমনওয়েলথ থেকে ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে দিতে চাইছে।'

'আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড ইন পলিটিক্স!'

'ওহ্ গড! এর রেজাল্ট তো আমাদের ভুগতে হবে।'

'কেন?'

'ব্রিটিশরা খুব খচে গেছে। মিসেস থ্যাচার বলেছেন এখন থেকে ইন্ডিয়ান বাংলাদেশিদের

ব্রিটেনে ঢুকতে ভিসা লাগবে। অর্থাৎ আমার ভাইপোকে চাইলেই আমি এখানে হুট করে আনতে পারব না।'

সুদেব এই মুহূর্তে তার কেউ আসবে কিনা মনে করতে পারল না। তবে মাকে এখানে একবার নিয়ে আসার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। সে বলল, 'ট্যুরিস্ট ভিসা তো পাওয়া যাবে।'

'সেটা ওদের ইচ্ছে হলে। এদেশে আমাদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে নাকি সরকার খুব উদ্বিগ্ন। লন্ডনের একটা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে তিনজন ইন্ডিয়ান ইলেকটেড হয়েছে। এখন সারা দেশে আমরা ছড়িয়ে। ওরা ভয় পাচ্ছে একদিন আমরা কমন্সে মেজরিটি পেয়ে যাব। তুমি ভাবতে পারো, ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টারের নাম যদি দেশাই হয় তাহলে ব্রিটিশদের কী অবস্থা হবে? তাই ওরা চাইছে আমরা এদেশ থেকে চলে যাই।'

'আমাদের তো ব্রিটিশ পাশপোর্ট আছে। চাইলেই হল।'

'জানি না। এরা দু-শো বছর আমাদের শাসন করেছে। আমরা যুদ্ধ না করে এদের দেশ দখল করে নেব তা এরা বরদাস্ত করবে না। নিশ্চয়ই কোনও কায়দা বের করবে।'

'চলে যেতে বললে তখন দেখা যাবে।'

'বাঃ চমৎকার! এই যে ছোট সুইচটা, দেশে এর দাম বড়জোর পাঁচটাকা। এখানে বিক্রি করছি এক পাউন্ডে। চোদ্দো টাকা প্রফিট। দেশে তা পাব? গভর্নমেন্ট কিছু করলে কেস করতে পারে, কিন্তু শুনছি ওরা আমাদের তাড়াতে ইয়াং ছোকরাদের লেলিয়ে দেবে। কী যে করি!'

প্যাটেলের দোকান থেকে জিনিসপত্র গাড়িতে চাপিয়ে সুদেব চারপাশে তাকাল। এখন এই গ্রাম তার নিজের হয়ে গিয়েছে! ওরা তাদের তাড়াবে? হ্যাঁ, এখন ভারতীয়রা সংখ্যায় হু-হু করে বাড়ছে। লন্ডনের টেলিফোন ডিরেক্টরির কয়েকটা পাতা জুড়ে শুধু ইন্ডিয়ান নাম। একটা পাড়ায় ঢুকলে মনে হয় গুজরাটিদের এলাকায় এসে গেছি। হিথরো এয়ারপোর্টের পোর্টার থেকে সুইপার ইন্ডিয়ান। ইংলন্ডের অনেক টাকা প্রতি মাসে ইন্ডিয়ায় চলে যাচ্ছে। একসময় বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের এইরকম অনুভূতি হত। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা অসহায় বোধ ছড়িয়ে পড়ল। এই দেশে সব আরামের, শুধু দেশটাকে নিজের বলে ভাবতে না পারার অভ্যেসটাই পায়ের তলায় কাঁপুনি ছড়ায়। ফেরার পথে ফুটপাতে মানিকে দেখে সে গাড়িটা থামাল। মানি হাসছে একটা ঢ্যাঙা ব্রিটিশের হাত ধরে। দেড় ফুট বেশি লম্বা ছেলেটার পাশে কালো মানিকে অদ্ভুত লাগছিল। সুদেব চিৎকার করল, 'হাই মানি।'

মুখ ফিরিয়েই মানির মুখ উদ্ভাসিত। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'প্রথমে প্রেমে, তারপর বাড়ি।'

'আমাকে তুমি লিফট দেবে?'

'আপত্তি নেই।'

কথাটা শোনামাত্র মানি তার ঢ্যাঙা বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল, 'আঃ, আমি টায়ার্ড!'

'কোন চুলোয় গিয়েছিলে?'

'ওঃ দেব। আই ডিড ইট। খুব ভয় হচ্ছিল যদি না পারি! কিন্তু পেরে গেলাম।'

'তুমি মরবে। খামোকা কেউ প্যারাসুটার হয়?'

'মরব তো একবারই। কিন্তু কি থ্রিল তা তুমি বুঝবে না। ব্যাপারটা কীরকম হয় জানো? আমরা আটজন বসে আছি প্লেনের ফ্লোরে। কোনও চেয়ার-টেয়ার নেই। ট্রেনার এক-একজনকে ডেকে দরজায় নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সামান্য পুশ আর তোমার শরীর শূন্যে ভাসছে। প্যারাসুটটা নিজে থেকেই খুলে যাওয়ার পর নিচে তাকাও, ওঃ কি দারুণ লাগে পৃথিবীটা!' গাড়ির সিটে মানির শরীরটা নেচে উঠল।

'এসব করে কী হবে মানি, চাকরি-বাকরির চেষ্টা করো।'

'কি হবে চাকরি করে? আমাকে যা বেকার ভাতা দিচ্ছে তাতে চমৎকার চলে যাচ্ছে। চাকরি করলে ওই ফ্ল্যাট আমাকে ছাড়তে হবে। তিন ডবল ভাড়াতেও আর আমি ওরকম ফ্ল্যাট পাব না।'

সুদেব চুপ করে গেল। মানি এককালে ওর রেস্টুরেন্টে কাজ করত। সপ্তাহে দেড়শো পাউন্ড পেত। ওর ব্যবহারে তার খদ্দের বেড়ে গিয়েছিল বেশ। এখন চাকরি না করেও ও সমান টাকা পাচ্ছে বেকারভাতা হিসেবে সরকারের কাছ থেকে। দক্ষিণ ভারতের এই মেয়েটি তিন বছর বয়সে এসেছি মা-বাবার সঙ্গে। এ দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড় হয়ে তাদের মতোই আঠারো পেরিয়ে আলাদা হয়ে একা আছে মা-বাবাকে ছেড়ে। দু-বার দুটো প্রেম করেছিল ভারতীয় ছেলের সঙ্গে। প্রসঙ্গ উঠলেই কাঁধ নাচায়, 'ম্যাড! আর নয়। প্রেমট্রেম আমার দ্বারা আর হবে না। আর ইন্ডিয়ান ছেলে? রক্ষা করো। ওরা সবসময় ডাবল ক্রশ করে। গাছেরও খাব আবার তলারও কুড়োব। এর সঙ্গে মিশবে না, ওর সঙ্গে কথা বলবে না, আর আমি সাদা মেয়ে দেখে যখন ছোঁক-ছোঁক করব তখন চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে। ননসেন্স।'

ইংরেজ ছেলেরা তো আজকাল কালো মেয়ে পছন্দ করে। নিগ্রোদের তাই এখন খুব ডিম্যান্ড। ওদের সঙ্গে—।'

'দূর! ওরা শুধু চমৎকার ঘুমাতে জানে কিন্তু কথা বলতে গেলেই বোবা হয়ে যায়।'

হঠাৎ মানি ওর দিকে ঘুরে বসল, 'হেই দেব, তুমি কাউকে বিয়ে করছ না কেন?'

সুদেব হাসল, 'সেম প্রবলেম। এই দ্যাখো না, তুমি সেবার সারারাত আমার একতলার সোফায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে অথচ আমি দোতলা থেকে নেমেই এলাম না। আমার দ্বারা কিছুই হবে না।'

'তুমি খুব ভদ্রলোক, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। আমি তোমার সঙ্গে একটা মেয়ের আলাপ করিয়ে দিতে পারি। শী ইজ সামথিং। শী লাইকস ইন্ডিয়ান বয়েজ।'

'আই অ্যাম নট ইন্ডিয়ান, আই অ্যাম হোল্ডিং ব্রিটিশ পাসপোর্ট।'

'রাবিশ!' বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে গেল মানি।

হেসে ফেলল সুদেব, এখানকার কট্টর ইংরেজমনা ভারতীয় যুবতীও মনে করে না সে ব্রিটিশ। অথচ এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার কোনও বাসনা তার নেই। মনে-মনে সে হঠাৎ মার্গারেট থ্যাচারকে সমর্থন করল। এদেশের বুকে বসে এদেরই দাড়ি ওপড়ানোর স্বভাব এরা কেন সহ্য করবে?

নিচে ব্যাঙ্ক। তার পাশে হেয়ার ড্রেসার। মাঝখান দিয়ে সিঁড়িটা উঠে গেছে সোজা ওপরে। সিঁড়ির শেষে ভারী কাচের দরজা। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে ডোরম্যান। ইংলন্ডের প্রায় প্রতিটি বার রেস্টুরেন্ট কিংবা ক্লাবে ডোরম্যান রাখতেই হয়। এই গ্রামে ডোরম্যানদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। মোটা বুদ্ধির ছেলেরা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে স্বাস্থ্যচর্চা করে। হাতে পায়ের পেশি ফুলিয়ে নানারকম কায়দা-কৌশল শেখে যাতে শত্রুকে কাবু করা যায়। এরাই ডোরম্যান সাপ্লাই করে। 'প্রেমের' ডোরম্যানের নাম জিমি। বছর চল্লিশেক বয়স, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক, হাতের পেশিগুলো বুঝিয়ে দেয় ওর শক্তির পরিমাণ। কিন্তু জিমি খুব বেশি লম্বা নয়। আর ওর মুখে হাসি লেগেই আছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলেই জিমি দরজা খুলে দাঁড়ায়। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে, 'গুড ইভনিং!'

তিরিশটি টেবিল এবং একশো কুড়িটি চেয়ার। প্রতিটি নতুন খদ্দেরের জন্যে সাদা টেবিল ক্লথ পালটানো হয়। আমেদ, ফারুক আর পল সেজেগুজে তিনটে রো দেখাশোনা করে। প্রত্যেকের পরনে সাদা জ্যাকেট কালো বো, কাউন্টারে ওই একই পোশাকে সুদেব দাঁড়িয়ে। এখন আটটা বাজে। নিচের কিচেনের চার্জে আছেন আকবর ভাই। সিলেটের লোক। বয়স হয়েছে। খুব ভালো রান্না করেন। আমেদের বউ এদেশি। আকবরভাই বিয়ে করেননি। সত্তর সাল থেকে দেশে ফিরে যাননি।

কারণ ওঁর পাসপোর্ট নেই। লুকিয়ে জাহাজে করে চলে এসেছিলেন এদেশে। বেআইনি ঢোকার অভিযোগে একটার-পর-একটা কেস চলছিল। ব্রিটেন এখন কোথায় ফেরত পাঠাবে ওকে? বাংলাদেশ না পাকিস্তানে? মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে আদালতে ছোটেন আকবরভাই। পল ছোকবার বয়স আঠারো। মিষ্টি চেহারা। খুব হাসিখুশি। ইয়ান বথামের ফ্যান। ওকে সাসপেন্ড করার পর পল দু-দিন কথা বলেনি। বিরিয়ানি খেতে খুব ভালোবাসে। রেস্টুরেন্টের সবাই রাতের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেয়। পল আর আমেদ একসঙ্গে ট্যাক্সিতে ফেরে। রাত্রে গাড়ি নিয়ে আসে না আমেদ। ফারুক ছেলেটা নিরীহ। আমেদের মতো চৌখস কিংবা পলের মতো হাসিখুশি নয়, কিন্তু খুব বিশ্বাসী। খাটতে পারে বেশ। এখন ইংরেজদের উচ্চারণ বুঝে নিয়েছে। ও থাকে আকবরভাই-এর সঙ্গে।

প্রথম খদ্দের এল আটটা পাঁচে। জিমি দরজা খুলে ধরে হাসল, 'গুড ইভনিং।'

'হাই জিমি!'

'হাই।'

আমেদ এগিয়ে গেল, 'গুড ইভনিং মিসেস হাটন।'

'সুন্দর হাসলেন মিসেস হাটন। তাঁর শরীরে দুধসাদা স্কার্ট, সোয়েটার। আমেদ বলল, শুক্রবারের সন্ধ্যায় প্রথম অতিথি হওয়ার গৌরব আপনার। বলুন, কোন টেবিলে বসলে আপনার ভালো লাগবে?'

'সো নাইস অফ ইউ। হোয়্যার ইজ দেব? ও দেব! মাই নটি বয়! হাউ আর ইউ?' বালিকার মতো ছুটে এলেন মিসেস হাটন। মিস্টার হাটন অন্তত কোটিপতি। মহিলা এলেই চল্লিশ পাউন্ডের নিচে বিল দেন না। সুদেব খুশি হল, বউনি ভালো হলে রাতটা খারাপ যাবে না। কাউন্টার থেকে প্রসারিত হাতের আঙুলগুলো সযত্নে তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল সে, 'এতক্ষণ মন খারাপ ছিল, এখন ভালো হয়ে গেল।'

হাত ফিরিয়ে নিয়ে ঠোঁট ফোলালেন মিসেস হাটন, 'ওঃ, এত মন রেখে কথা বলতে পারো! অল্প বয়স হলে নির্ঘাত প্রেমে পড়ে যেতাম আমি।'

সুদেব মুখ গম্ভীর করল, 'আই অ্যাম সরি, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাকে আঘাত দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

থতমত হয়ে গেলেন মিসেস হাটন, 'আঘাত দিলাম? আমি! কি বলছ?'

'নিশ্চয়ই। আপনার দিকে তাকালে আমার বয়সের কথা মনেই থাকে না, আর আপনি সেটা মনে করিয়ে দেন।'

'ওঃ। হাউ নটি, হাউ সুইট!' খিলখিলিয়ে হেসে হাত নাড়লেন মিসেস হাটন, 'গিভ মি এ ভদকা উইদ টনিক। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইওর স্পেশ্যাল টু-নাইট?'

'প্রেম স্পেশ্যাল। ইউ নো দ্য মিনিং অফ প্রেম।'

'সো নটি ইউ আর! পে-রেম, লব। ইউ ইন্ডিয়ান আর পোয়েট।' বৃদ্ধার মুখে রক্তাভা।

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আই অ্যাম নো মোর ইন্ডিয়ান। হ্যাভ টু অবটেন ভিসা টু গো দেয়ার।'

'ও।' যেন খুব খারাপ কথা শুনলেন এমনভাবে মাথা নাড়তে-নাড়তে কোণের টেবিলে বসলেন মিসেস হাটন।

কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে পল সংলাপগুলো শুনছিল। এবার বলল, 'দেব, আমার মনে হচ্ছে বুড়ি আজ চল্লিশ পাউন্ড খরচ করবে না। তুমি ভুল করলে।'

'কেন?' সুদেব পলের দিকে তাকাল। ওই বয়সে সে ভালো করে কথাই বলতে পারত না। এই ইংরেজ ছোকরা তাদের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে। কিছু-কিছু বাংলা শব্দ আয়ত্তে। অবশ্য আমেদ নির্বাচিত শব্দ শিখিয়েছে।

'ও তোমাকে ভারতীয় ভাবতেই পছন্দ করে।' তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলা বলল, 'শালা!'

জিমি যার জন্য দরজা খুলেছে তার নাম এরা দিয়েছে হাড়কেপ্পন। সবচেয়ে কম দামের খাবার নিয়ে বুড়ো অনবরত খুঁত ধরার চেষ্টা করে। টিপস দেওয়ার সময় হাত কাঁপতে থাকে। পল এগিয়ে গেল, 'গুড ইভনিং মিস্টার জোন্স। ডু ইউ থিংক রাইস উইথ ড্রাই মিট উইল বি ফাইন ফর ইউ?'

মিস্টার জোন্স কথার জবাব না দিয়ে চারপাশে নজর বোলালেন। তারপর মিসেস হাটনের দিকে তাকিয়ে টুপিটা তুলে বাউ করলেন। মাঝখানের টেবিলে বসে টুপিটা পলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওয়াইন।'

পল হকচকিয়ে গেল, 'এক্সকিউজ মি, ডিড ইউ সে ওয়াইন!'

'ডব্লু আই এন ই। হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক হেল্প অফ হিয়ারিং এইড?'

'শালা বদমাশ।' বলে হেসে মাথা নামাল পল। তারপর টুপিটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে সোজা সুদেবের কাছে পৌঁছাল, 'শাইলক ওয়াইন চাইছে আজ। সামথিং রঙ। আই ডোন্ট নো হোয়াই!'

সুদেব কোনও কথা বলল না। কর্মচারীদের সঙ্গে তরল ব্যবহার সাধারণত করে না সে। খদ্দেরদের সামনে তো নয়ই। এই সময় টেলিফোন বাজল, রিসিভার তুলে সুদেব অভ্যস্ত গলায় বলল, 'প্রেম।'

ওপাশ থেকে জুডির গলা ভেসে এল, 'হাই দেব।'

'হাই জুডি।'

'লুক! তোমাকে একটা ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য এই ফোন করছি। নাইট সারভিস আমরা চালু রেখেছি গ্রামের মানুষের সুবিধের জন্য। কিন্তু তোমার রেস্টুরেন্ট থেকে প্রায়ই ফলস কল আসছে! আমাদের ড্রাইভাররা ওখানে গিয়ে কাস্টমার না পেয়ে ফিরে আসছে।'

'সেটা যদি পাবলিক করে আমার দোষ কি?'

'পাবলিককে আমরা চিনি না, ফোনটা আসছে তোমার রেস্টুরেন্ট থেকে।'

'ও কে। আমি দেখছি। বাট জুডি, কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার মুখটা কেমন আছে?'

'সেটা জানতে হলে তোমাকে এসে দেখতে হবে।' হেসে জুডি লাইন কেটে দিল।

সুদেব দরজার পাশে পাবলিক টেলিফোনটার দিকে তাকাল। পয়সা ফেলে যে কেউ ওখান থেকে ট্যাক্সি নাইট-সার্ভিসকে ডাকতে পারে। কিন্তু ওরা যদি জেনুইন কল অ্যাকসেপ্ট করা বন্ধ করে দেয় তাহলে নির্ঘাত খদ্দের কমে যাবে। কী করা যায়! পাশাপাশি সিগারেট বক্স। পয়সা ফেললে সিগারেটের প্যাকেট বেরিয়ে আসে। এসবই খদ্দেরদের সুবিধের জন্য। ব্যাপারটা নজরে রাখতে হবে।

এগারোটা নাগাদ আজ রেস্টুরেন্ট ভরতি। এই গ্রামের সম্মানিত ইংরেজ পুরুষ-রমণী সুসজ্জিতা হয়ে বিভিন্ন টেবিলে। আমেদরা প্রত্যেক টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে রঙিন জারে। কিন্তু খুব ধীরে দেওয়ালে লুকানো স্পিকারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। ভারতীয় খাবার খেতে হলে ভারতীয় সঙ্গীত শুনতে হয় এমন ধারণা নিতে চায় সুদেব। মিসেস হাটন চলে গেছেন অনেকক্ষণ। তার বিল আজ দশ পাউন্ড ছাড়ায়নি। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। পল মাঝে-মাঝে গজগজ করছে, হাড়কিপটের খাওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এই সময় দুজন সুন্দরী এলেন। জিমি দরজা খুলে বিগলিত গলায় তাদের বলল, 'গুড ইভনিং।'

'হাই জিমি!' সো নাইস অফ ইউ জিমি বয়।'

জিমি খুব খুশি হল, 'একটু বসুন, এখনই সেরা টেবিলটা খালি হয়ে যাবে।'

অ্যান বলল, 'মাই গড। পুরো গ্রামটাই তো এসে গেছে। দেবের খুব ভালো দিন যাচ্ছে তাহলে!'

জিমি বলল, 'এই আর কী!' সে দুটো চেয়ার এগিয়ে দিল। মার্গারেটকে সেখানে বসতে বলে অ্যান এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে। দুই বান্ধবীর বয়স চল্লিশের গায়ে। কিন্তু শরীরের বন্দোবস্ত

এবং চামড়ার তোয়াজ তাদের তরুণী রেখেছে। অ্যানের মুখে একটা মাদকতা আছে এবং সেটা সে চমৎকার কাজে লাগায়। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যান ঘোষণা করল, 'দিস ইজ মি।'

দেব হাসল, 'আঃ বিউটিফুল।'

'ডোন্ট বি সিলি। এই সপ্তাহে তোমার একবারও ফোন করার সময় হল না?'

'তোমার বন্ধুর স্বামী যে গোয়েন্দা অফিসার তা আমি জানতাম না।'

'তাতে আমার কি?'

এবার সুদেবের মনে হল, সত্যিই তো, তাতে অ্যানের কি? অ্যানের স্বামীর তো ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। অ্যান বলল, 'ইউ ইন্ডিয়ান্স আর স্টিল ইন স্টোন এজ। রোজ দুপুরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আমার লাইফ হেল হয়ে গেল। আই ওয়ান্ট এ টেবল, রাইট নাউ।'

সুদেব চোখ তুলে তাকাল। কোনও টেবিল খালি নেই। শুধু হাড়কিপটে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সেপলকে ডাকল, 'টেল মিস্টার জোন্স টু পে দ্য বিল।'

পল অ্যানের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল, 'আমার কথা শুনবে না।'

অ্যান কাঁধ নাচাতে সুদেব উত্তেজিত হল। কাউন্টারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে জোন্সের সামনে দাঁড়াল, 'এক্সকিউজ মি মিস্টার জোন্স।'

খাবারের প্লেট শেষ করে একটা টেবিল দখলে নিয়ে বুড়ো চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সুদেবের ডাকটা শুনতেই পেলেন না যেন। সুদেব উষ্ণ হল। সে খুব আস্তে একটা চামচ তুলে প্লেটে ঠুকল, 'মিস্টার জোন্স!'

চোখদুটো খুব ধীরে ধীরে খুললেন জোন্স। কোনও কথা বললেন না।

সুদেব বলল, 'আপনার যদি খাওয়া শেষ হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে ভদ্রমহিলাদের জন্যে টেবিল ছেড়ে দিন।'

জোন্স ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'লুক লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এই ইন্ডিয়ানটা আমাকে অপমান করছে। আমাকে এই রেস্টুরেন্ট থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এদেশে ওদের বাস করতে দিয়ে বিনিময়ে কী ব্যবহার পাচ্ছি তা আপনারা দেখুন।'

সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দ হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট। সবাই অবাক হয়ে দেখছে। থতমত ভাবটা চটপট কাটিয়ে উঠল সুদেব, 'আমি আপনাকে অপমান করিনি। আপনি চারঘণ্টা ধরে টেবিল দখল করে আছেন সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছি। এবং আপনি জেনে রাখুন আমি ব্রিটেনের নাগরিক।'

জোন্স বেরিয়ে এলেন। তারপর খিকখিক করে হাসলেন সময় নিয়ে, 'ব্রিটিশ। ব্যাঙাচিও নিজেকে মাছ ভাবে। বাট আই উইল লজ কমপ্লেন এগেনস্ট ইউ।'

তিন পাউন্ডের নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন জোন্স। পল তাড়াতাড়ি টেবিল ঠিক করে ডাকতেই অ্যান এসে বসল মার্গারেটকে নিয়ে। জিমি এসে দাঁড়াল সুদেবের পাশে, 'লোকটা এত বুড়ো যে আমি কিছু করতে সাহস পেলাম না। ছুঁলেই যদি মরে যায়।'

সুদেব বিরক্ত গলায় বলল, 'ও-কে। তুমি তোমার কাজ করো।'

অ্যান বলল, 'একটু বসো দেব। লোকটার বয়স হয়েছে, বুড়োরা বেশি কথা বলে।' বলে সে মিষ্টি হাসল।

সুদেব চেয়ার টেনে নিল। ভেতরে-ভেতরে সে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছিল। অনেক বড় গুন্ডাকে সে এই রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে দিয়েছে, কিন্তু এভাবে অপমানিত কখনও হয়নি।

অ্যান বলল, 'মার্গারেটকে তোমার কেমন লাগছে দেব? শী ইজ রিয়েল লোনলি।'

সুদেব মুখ তুলে তাকাল। সাধারণ চেহারা মেয়েটার। সে ভদ্রভাবে বলল, 'আচ্ছা।'

মার্গারেট বলল, 'অ্যান ইজ ডায়িং ফর ইউ!'

সুদেবের আর এদিকে মন ছিল না। সে লক্ষ করছিল খুব দ্রুত রেস্টুরেন্ট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

এই সময় পল এসে তার কানে-কানে বলল, 'কাম হিয়ার বস্।'

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে টেবিল ছাড়ল সুদেব। পল বলল, 'হাড়কিপটে নিচে দাঁড়িয়ে লোক জড়ো করছে। তারা নতুন খদ্দেরদের ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করছে।'

মাথায় আগুন জ্বলে গেল সুদেবের। সে দরজা খুলে অর্ধেক সিঁড়ি নেমে এল। অন্তত জনাদশেক লোক জমা হয়েছে। বুড়ো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সুদেব বলল, 'মিস্টার জোন্স, আপনি এইরকম করতে পারেন না। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে পুলিশ স্টেশনে যান।'

'পুলিশ স্টেশন? লোকটা আমার দেশে থেকে আমাকেই আইন দেখাচ্ছে!' জোন্স চিৎকার করল।

সুদেব বলল, 'আপনারা আমাকে চেনেন। জোন্স যা বলছে সেরকম করতে পারি বলে মনে হয়?'

জনতা কিছু বলল না। খানিক বাদে তারা চলে যেতে জোন্স বিদায় নিলেন।

সেই রাত্রে দরজা বন্ধ করার সময় দেখা গেল শুক্রবারের বিক্রি সোমবারের চেয়েও কম। 'প্রেমে' গোলমাল হয়েছে খবরটা কানে যাওয়ামাত্র খদ্দেররা অন্যমুখো হয়েছে। কিন্তু সুদেবের মনে হচ্ছিল না জোন্সকে টেবিল ছাড়তে বলে সে কোনও অন্যায় করেছে। আজ আমেদ পল আর ফারুক তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করার পর সুদেব সোফায় বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। খুব ক্লান্ত লাগছে, নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। পুলিশ স্টেশন থেকে তাকে তাড়াতাড়ি রেস্টুরেন্টে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনওমতে তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়েই সে পৌঁছে গেল। এর মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। পুলিশ চারপাশে। অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, 'সরি দেব।'

সমস্ত রেস্টুরেন্টটায় কেউ যেন দুরমুশ চালিয়েছে। একটা প্লেট ডিশ চেয়ার টেবিল এবং কয়েক হাজার পাউন্ডের মদের বোতল আস্ত নেই। এমনকী কার্পেটগুলোতেও আগুন ধরানো হয়েছিল। বুকের পাঁজর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল সুদেবের। এবং তখনই তার মনে পড়ল এসবই ইনসুরেন্সের আওতায় আছে। যা গেছে তার অনেক বেশি পাওয়া যাবে। অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

কি বলবে সুদেব। সে শেষপর্যন্ত নামটা বলল। অফিসার দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'নো-নো। ইটস ইমপসিবল। জোন্সের বয়স যা তাতে এসব তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া গতরাত্রে সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গিয়েছে। সেটা করার পর এসব। অন্য কারও কথা ভাবো।'

সুদেব বলল, 'এই গ্রামের কোনও মানুষ আমার শত্রুতা করবে তা ভাবতে পারছি না।'

পুলিশ স্টেশন থেকে বের হতে দেরি হয়ে গেল। যা-যা ক্ষতি হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করে একটা কপি নিয়ে নিয়েছে সে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানির লোক এসে দোকানটা সিল করে দিয়েছে। ওরা ক্ষতির মূল্যায়ন করবে। গাড়িটা বাড়ির পেছনে রেখে কয়েক-পা এগোতে সে ফারুক, আকবরভাই এবং আমেদকে দেখতে পেল। প্রত্যেকের মুখ শুকনো। বাড়িতে ঢোকার পর সে বলল, সাতদিন বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে ঠিকঠাক করে নেব। আপনাদের মাইনে পাবেন। কিন্তু কে করল?'

আকবরভাই বলল, 'দেব ভাই, খবর ভালো নয়।'

'কি খবর?'

'গ্রামে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান ফিলিং জোরদার। সকালে প্যাটেলের দোকানে হামলা হয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো ব্রিটিশ সিটিজেন।'

ফারুক বলল, 'সেকথা তো বেশি লোক জানে না। আমি বাংলাদেশের লোক, আমাকেও

ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ফেলেছে ওরা। ক'দিনের জন্যে এখান থেকে চলে গেলে ঠিক হয়।'

আকবরভাই বলল, 'কোথায় যাবে? আস্তে-আস্তে সমস্ত ইংলন্ডেই এই হবে। তোমাদের অবশ্য দেশ আছে, আমার তো তাও নেই।'

আমেদ চুপচাপ বসেছিল। এবার বলল, 'আমারও অস্বস্তি হচ্ছে। আসবার সময় দুটো ছোকরা আমার দিকে তাকিয়ে সিটি দিচ্ছিল। বউ বলছে ক'দিন লন্ডন থেকে ঘুরে আসতে।'

সুদেব তাকাল। আমেদের বউ ইংরেজ। এখনও সিটিজেনশিপ পায়নি। তবে পেয়ে যাবে। তবু ও ভয় পাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল হিন্দু-মুসলমানদের রায়টের সময় এইরকম ভয়ার্ত হয়ে থাকত দুই ধর্মের মানুষ। আর আজ দুই ধর্মের মানুষ একসঙ্গে ভয় পাচ্ছে সাদা চামড়াকে। ধর্মের চেয়ে অস্তিত্ব এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'আমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছি। ব্রিটেনের ডেমোক্রেসি বিশ্ববিখ্যাত। সরকার নিশ্চয়ই আমাদের প্রোটেকশন দেবে। তা ছাড়া এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি। সামনাসামনি কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।'

এই সময় ফোন বাজল। সুদেব রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো।'

'হাই দেব। অস্কার।'

'ও, অস্কার! বলো, কী খবর?'

'কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত।'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে সুদেব আমেদকে বলল, 'দ্যাখো অস্কার সমবেদনা জানাচ্ছে। সবাই এক গোত্রের নয়।' তারপর হাত সরিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আমি এটাকে দুর্ঘটনা বলে ধরে নিচ্ছি।'

'না, না। এটা দুর্ঘটনা নয়, অ্যান্টি ইন্ডিয়ান ফিলিং ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বাস্তবকে তো মানতেই হবে। বাই দ্য বাই, আমি শুনলাম তুমি নাকি তোমার রেস্টুরেন্ট বিক্রি করে দিতে চাইছ! আমার মনে হয় আমি তোমাকে ঠিক দাম দিতে পারব।'

'বিক্রি?'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম। তুমি বিপদে পড়েছ ভেবে সবাই দাঁও মারতে চাইবে। আমি সেই দলে নই।'

'সরি অস্কার, আমি রেস্টুরেন্ট বিক্রি করতে চাই না।'

'কি যা-তা বলছ? তুমি ওখানে ব্যাবসা করতেই পারবে না!'

'সেটা আমি বুঝব।'

'ঠিক আছে। তবে যদি কখনও বাধ্য হও, টেল মি।' লাইন কেটে দিল অস্কার।

হাওয়া গরম হয়ে উঠল। সুদেবের বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্টেড। এখন শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকা অথবা এশিয়ার অন্য দেশের মানুষ নয়, ভারতীয় এবং তাদের মতো দেখতে বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। কোথাও-কোথাও সংঘর্ষ হচ্ছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কাঠামো ভারতীয়দের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে বিক্ষোভকারীদের ধারণা। টিভি-তে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখানো হচ্ছে। একজন বৃদ্ধ বললেন, 'কুড়ি বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলাম শান্তিতে থাকব বলে। কিন্তু মনে হচ্ছে না ফিরলেই ভালো হত। কারণ, ব্রিটেন আর ইন্ডিয়ার কোনও পার্থক্য নেই। রাস্তায় হাঁটলে তিনজনের মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান। দেশে এসে লাভ কি হল।' লন্ডনের উপকণ্ঠে একটা ভারতীয় এলাকায় গুলি চলেছে। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। পুলিশকে কঠোর হতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারি নীতি খুব শিগগির ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি ব্রিটেনে

বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে কলোনি উঠে যাওয়ায় চাকরি কমে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সমর্থনের প্রশ্ন নিয়েও জটিলতা দেখা দিয়েছে। বেকার সমস্যা যখন প্রবল হতে চলেছে তখন ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং তারা ব্যাবসা করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে—এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

সকালে পুলিশ স্টেশন থেকে টেলিফোন এল। গ্রামের সমস্ত ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশি লন্ডনে চলে গিয়েছে। শুধু সুদেবকে নিয়ে পুলিশ চিন্তিত। যদি সে চায় তাহলে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তার এসকর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে সে ব্যাঙ্কে যেতে পারছে না, দোকানে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু লন্ডনে অবস্থা খুব ভালো। সেখানে যা গোলমাল হয়েছিল তা শহরতলিতে কিন্তু তাও থিতিয়ে গিয়েছে। সুদেব চিন্তা করার সময় চাইল।

টিভি খুলল সুদেব। ভারতীয় বাংলাদেশিরা দলে-দলে ব্রিটেন ছাড়ছে। সরকার যতই প্রতিবাদ করুন, কিন্তু সুদেবের মনে হচ্ছিল যতটা কঠোর হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না। যদিও আজ অবধি তার বাড়িতে কেউ কিছু করেনি কিন্তু—! সুদেব ঠিক করল এইভাবে বোকার মতো সে বসে থাকবে না। মন হালকা করার জন্যে সে অ্যানকে ফোন করল। কিছুক্ষণ বাজার পর অ্যান ফোন ধরল।

'হাই অ্যান, দিস ইজ দেব।'

'ও মাই গড। ইউ আর স্টিল হেয়ার!' অ্যানের গলায় বিস্ময়।

'বাঃ আমি কোথায় যাব! আমি তো ব্রিটেনের নাগরিক।'

'বাট—!'

'না-না, কোনও কিন্তু নেই। কেমন আছ বলো! দেখা হতে পারে? এখন তো আমার কোনও কাজ নেই।' সুদেব খুব মন-খোলা কথা বলার চেষ্টা করল।

'কিন্তু দেব, আমি যে ভীষণ ব্যস্ত!'

'ব্যস্ত?'

'হুঁ। মাইক এসেছে। মাইককে চেনো? ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই লম্বা ছেলেটি যে দারুণ নাচে। আমরা দুপুরটাকে এনজয় করছি। বাই দেব।'

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল দেব। তারপর উঠে জামাকাপড় পরে নিল। ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের প্রমাণস্বরূপ পাসপোর্টটা হিপ পকেটে ভরে নিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। যে পুলিশটি দাঁড়িয়েছিল সে অবাক চোখে তাকাল, 'তুমি বাইরে যাচ্ছ? পারমিশন নিয়েছ?'

'আমারটা আমি বুঝব। তোমার এখানে থাকার দরকার নেই।' কথাটা বলে সে জোরে-জোরে পা ফেলে গাড়িতে উঠল। ববের বাড়ির সামনে এসে সে গাড়ি থামাল। বব একা নন। তাঁর পাশে যে বর্ষীয়সী সুন্দরী দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ডোরা। ববের একদা প্রেমিকা।

সুদেব বলল, 'হ্যালো বব!'

বব ঘুরে দাঁড়ালেন, হ্যালো! দেব না?'

'ইয়েস।'

ববকে আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। বব বললেন, 'ইউ নো ডোরা! ওয়ান্স আপন এ টাইম উই লভড্ ইচ আদার। অ্যান্ড নাউ শী ওয়ান্টস টু স্টে উইদ মি।'

'আই সি।'

'দেব, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক শী ইজ বিউটিফুল?'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আমার তো লিজার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, তাই না?'

'ও বব! লিজা তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

ডোরা এবার সুদেবের দিকে তাকাল, 'বাট হি ইজ ইন্ডিয়ান, ইজন্ট হি?'

'ইয়েস। হি ওনস দি রেস্টুরেন্ট, প্রেম। ভেরি নাইস বয়।'

'বাট হি ইজ ইন্ডিয়ান!' ডোরা যেন আঁতকে উঠল। আর তখনই পরিবর্তন এল ববের।

'হে দেব! ইউ শুড নট স্টে হেয়ার।'

'আই নো বব।' গাড়িটা চালানো সুদেব। রাস্তা পরিষ্কার। চারধার যেমন কাজকর্ম চলছে তেমন চলছে। কেউ তাকে কিছু বলছে না। ক্রমশ মনে বেশ আস্থা এসে গেল তার। 'প্রেমে'-র সামনে এসে সে দেখল দোকানটা তেমনই বন্ধ। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে গাড়ি থেকে নেমে। হঠাৎ তিনটে ছেলে যেন ভগবানের মতো নেমে এল সামনে। আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে-করতে সে চেতনাশূন্য হল।

জ্ঞান ফিরল যখন তখন সে হাসপাতালে। ডাক্তার বললেন, 'ও কে, নাউ ইউ আর আউট অফ ডেঞ্জার। লাকি বয়।'

তার মাথায় ব্যান্ডেজ। সমস্ত শরীরে ব্যথা। সে ধীরে-ধীরে হাতটা নিয়ে গেল হিপ-পকেটে। বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত হল। পাসপোর্টটা ঠিকঠাক আছে। হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেল তার। এই গ্রামটাকে সে নিজের মনে করত। প্রতিটি মানুষকে সে জানে, প্রতিটি ফুটপাত তার চেনা। পাসপোর্টটা পাওয়ার পর থেকেই তার মনে হত সে সবচেয়ে সভ্যদেশে আছে। ছেলেবেলা থেকে যা-যা পায়নি তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। আর এই দেশটাই রাতারাতি অচেনা হয়ে গেল। সে কি করবে? হাইলাকান্দিতে ফিরে যাবে? তার যা টাকা আছে তা নিয়ে হাইলাকান্দিতে গেলে লোকে তাকে বড়লোক বলবে। সে সিদ্ধান্ত নিল, কালই দেশে ফিরবে। আর তখনই তার মনে পড়ল সে ইন্ডিয়ায় হুট করে যেতে পারে না। ইন্ডিয়ায় ঢুকতে গেলে সে-দেশের সরকারের কাছে ভিসা লাগবে। ইন্ডিয়ার চোখে সে বিদেশি। বুকের ভেতর আর একটা কষ্ট পাক দিয়ে উঠল। কিন্তু তবু সে চেষ্টা করবে। এই সময় নার্স আসতেই তাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টা বাজে?'

'এখন রাত এগারোটা।'

'আমার গাড়িটা কোথায়?'

'হাসপাতালের কম্পাউন্ডে। কেন?'

'না, এমনি।'

আরও আধঘণ্টা পরে সে টলতে-টলতে গাড়িতে উঠে বসল। মাথায় লাগছে। কিছুক্ষণ পরে সেটা কমতে সে হাসপাতালের দিকে তাকাল। সে যে বেরিয়ে এসেছে তা কেউ লক্ষ করেনি। চাবি বোর্ডেই ছিল। সেটা ঘোরাতেই ইঞ্জিন সাড়া দিল।

রাতের গ্রাম জনমানবহীন। খুব ধীরে-ধীরে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। আজ শুক্র কিংবা শনিবার নয় যে রাস্তায় লোক থাকবে। যেন এক মৃত্যুপুরীর মধ্যে দিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাইরে। আর একটু এগোলেই হাইওয়ে। গাড়িটাকে সে দাঁড় করাল টেলিফোন বুথের পাশে। তার শীত করছিল খুব। হাসপাতালের বিছানায় কেউ গরমজামা পরে শোয় না। এয়ারকন্ডিশন্ড থেকে বেরিয়ে এখন সারা শরীরে কাঁপুনি আসছে। নাম্বার টিপে সে লন্ডনের অপারেটরের সঙ্গে কথা বলল, 'গিভ মি ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি।'

ওপাশে ফোন বাজল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এল। এত রাত্রে এটা আশা করতে পারেনি সুদেব। 'ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসি।'

'দেখুন, আমি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাই। ওখানে আমার মা-বাবা আছেন। আসামে।'

'যান না, কে মানা করেছে। তবে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব না। হেভি রাশ।'

'কিন্তু আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার। আমার ভিসা চাই।'

'আপনি ভারত থেকে আসেননি?'

'না। বললাম তো আমি ভারতে যাওয়ার জন্যে ভিসা চাই।'

'সরি! এই মুহূর্তে আমরা ভারতে যাওয়ার জন্যে ভিসা দিচ্ছি না। আপনি কয়েকদিন পরে যোগাযোগ করুন। আমরা এখন ভারতীয়দের নিয়ে ব্যস্ত।'

টেলিফোন রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। আমি তাহলে কি? আমি ভারতীয় নই, পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা ব্রিটিশ বলে মনে করে না। আমি এখন কী করব? ফারুক আমেদরা ইচ্ছে করলেই ওদের দেশে ফিরে যেতে পারে, হয়তো গিয়েওছে এতদিনে। হঠাৎ একটা কান্না তার শরীরকে আচ্ছন্ন করল। তার ঝকঝকে বাড়ি, গাড়ি, রেস্টুরেন্ট, ব্যাঙ্কব্যালেন্স, রঙিন টিভির পাশে হাইলাকান্দির মধ্যবিত্ত বাড়িটা যার বাথরুমে কমোড না থাকায় অসুবিধে হয়, তার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ একটি মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে তার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। মানুষটা তার গাড়ির বনেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। কি করবে এখন সে? টেলিফোন বুথ থেকে বের হলেই ও আক্রমণ করবে নিশ্চয়ই। মানুষটা এবার এগিয়ে আসছে। চোখ বড় করে সে তাকাতে অবাক হল। মহিলা, বৃদ্ধা। বৃদ্ধারা কি কখনও খুনি হয়?

সে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। কোনওরকমে উচ্চারণ করল, 'ইউ?'

মহিলার চোখে বিস্ময়। ব্যান্ডেজে মোড়া মুখটাকে চিনতে চেষ্টা করছিলেন তিনি। এগিয়ে এসে হাত ধরল সুদেব, 'কোত্থেকে আসছ তুমি? একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

'আমি ফিরে আসছি। অনেকটা হেঁটে আসছি। আমি আর পারছি না। কিন্তু তুমি কি আমাকে চেনো?' বৃদ্ধার গলায় প্রশান্তি।

'ও আমি সুদেব, দেব, ওনার অফ প্রেম।'

'হায় ভগবান! তোমার চেহারা এরকম কে করল? কী হয়েছে তোমার?' বৃদ্ধা ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আমাকে মেরেছে। আমার রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। দে ওয়ান্ট টু কিল মি।'

'কিন্তু কেন?'

'বিকজ, বিকজ—।' এক মুহূর্ত ভাবল সুদেব, 'বিকজ আই অ্যাম ইন্ডিয়ান!'

'সো হোয়াট?'

সুদেব কাঁধ নাচাল। বৃদ্ধা বিড়বিড় করলেন, 'কি অমানুষ হয়ে যায় মানুষ!'

'তুমি, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'আই অ্যাম কামিং ব্যাক। আই ওয়ান্ট টু সি বব। ডু ইউ নো ও কেমন আছে?' বৃদ্ধা আকুল হলেন।

'ভালো। কিন্তু—!'

'কিন্তু কি?'

'ডোরা ওর কাছে আছে।'

'ডোরা!' হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা মুখে হাত চাপা দিয়ে। সুদেব বলল, 'লিজা, আই কান্ট গিভ ইউ এ লিফট। ওই গ্রামে ঢুকলে আমাকে মেরে ফেলবে।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন লিজা, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আই ডোন্ট নো।' বলেই সে দূরে গাড়ির আলো দেখতে পেল। গাড়িটা এগিয়ে আসছে। সে চঞ্চল হল, 'আমি যাই।'

লিজা বাধা দিল, 'তুমি, তুমি ড্রাইভ করতে পারবে?'

'চেষ্টা করছি।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার হয়ে ড্রাইভ করব।'

লিজা গাড়ি চালাচ্ছে। ওরা উলটো পথে যাচ্ছে। পাশে মাথা হেলিয়ে সুদেবের মনে হল এর চেয়ে আরাম কিছুই নেই। লিজার একটা হাত তার হাঁটুতে। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'হিপিরা কেমন?'

'মানুষের মতো।'

'গেলে যখন চলে এলে কেন?'

'দেখা হয়ে গেল। নতুন করে দেখতে ফিরেছিলাম।'

'তাহলে গ্রামে যাচ্ছ না কেন?'

'আমার সহ্যশক্তি কম, তাই।' নিশ্বাস ফেললেন লিজা, 'তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে পড়ো দেব।'

চোখ বন্ধ করেছিল সুদেব। এবার খুলল। হিপি হয়ে যাওয়ার পর লিজার চেহারাটা বিদিকিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। চুল যেভাবে ছাঁটা তা সহ্য করা মুশকিল। কিন্তু ড্যাসবোর্ডের আলোয় ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ওর মনে হল হাইলাকান্দির উঠোনটায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে কোনওমতে বলল, 'লিজা, গাড়ি চালাতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।' লিজার হাতটা স্নেহ ঝরাল, 'নো মাই বয়। লেটস ফরগেট এভরিথিং। ফরগেট ইওর উন্ড। ফরগিভ দেম। কিন্তু তোমার স্পর্শের জায়গাটা খুলে রেখো মানুষের মতো।'

শেষ কথাগুলো কানে যাওয়ার পরই একটু গুনগুনানি শুনতে পেল সুদেব। নিশুতি রাতের হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া গাড়িতে বসে সে কোনও-কোনও কথা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু সুরটা আজন্ম চেনা। দ্রুত ঘুম এনে দিল তাকে।



পরিবর্তিত পরিস্থিতি

রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন অবনীমোহন। তাঁর বাঁ-দিকে বাসব বসে আছে। বাসবের শরীর ইদানীং এত ভারী হয়েছে যে এক রিকশায় সহজভাবে বসা যাচ্ছে না। পার্টি অফিস থেকে বেরুবার সময় বাসব বলেছিল, 'দাদা, আপনি এখনও রিকশায় যাওয়া-আসা করছেন কেন! গাড়ি তো আছেই।'

অবনীমোহন মাথা নেড়েছিলেন, 'নাহে চল্লিশ সাল থেকে এই শহরে হেঁটে বেড়িয়েছি, শক্তি কমে এসেছে বলে রিকশায় চড়ি কিন্তু গাড়িতে উঠলে হুস করে পৌঁছে যাব। শহরটা দেখতেই পাব না।'

বাসব আর কথা বাড়ায়নি। তাঁর পাশে উঠে বসেছিল। একটু চেপে বসে জায়গা করে দিতে হয়েছে ওকে। বাসব তাঁর হাতে গড়া ছেলে। জেলার এম. পি.। গত নির্বাচনে প্রচুর ব্যবধানে জিতেছে সে। ছেলেটি ভালো।

এখন সকাল। অবনীমোহন দেখলেন যেতে-যেতে বাসব হাত তুলে একে-ওকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। একসময় রাস্তা ফাঁকা হলে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি এখনও এসব ছেঁদো কেস নিয়ে কেন মাথা ঘামান?'

'ছেঁদো কেস!'

'ওই যে সুলতা না কী নাম মেয়েটার?'

'এটা ছেঁদো কেস নয় বাসব। শহরটাকে তো জানো। মানুষ এমন একটা ইস্যু পেলে সমালোচনা করতে ছাড়বে না। হয়তো এই একটা ঘটনাই অনেককে বিরূপ করে তুলবে।'

'সোমনাথরা তো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করতে চাইছে। কেউ জানতেও পারবে না।'

অবনীমোহনের চোয়াল শক্ত হল, 'কেসটা কে নিয়ে এসেছে? কল্যাণ—তাই না? সে আমাদের ছেলে। কল্যাণ মনে করছে সুলতার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আর সেটা যে করা হয়েছে তাতে তো কোনও প্রশ্ন নেই।'

বাসব হাঁটুর ওপর ডানহাত রেখেছিল। সেটা তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে নেড়ে হাসল। রিকশা বেরিয়ে গেলে বাসব হাত নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আমরা সতীদিকে বিপদে ফেলতে পারি না। গত পাঁচ বছরে ভদ্রমহিলা দলের জন্য যা করেছেন তার কোনও তুলনা নেই।'

'তুমি আমাকে আপোশ করতে বলছ বাসব?'

'দেখুন, এখন কিছুই করা যাবে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিল। সতীদির ভাই কলেজে পড়ে। ওকে আমরা বাধ্য করতে পারি না একটা মেইড সার্ভেন্টকে বিয়ে করতে। দুটো লোক, একটা ফ্যামিলির জীবন তাতে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু একটা ছেলে অতবড় অন্যায় করে শাস্তি পাবে না?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। শাস্তি দিতে গেলে পুলিশ কেস করতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের দলের একজন নেত্রীর ভাই এই করেছে। এখন এমন প্রচার আমরা করতে দিতে পারি না। সোমনাথ বলছে সতীদি আগে যা বলেছেন বা করেছেন তা ভুলে গিয়ে সুলতার পুনর্বাসনের জন্যে হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। সুলতাও এতে রাজি হয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে সোমনাথরা কথা বলবে। আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।' কথা শেষ করে বাসব আবার একজনকে হাত নাড়ল। রিকশাওয়ালা খুব যত্ন নিয়ে চালাচ্ছিল। সে জানে এই জেলার সবচেয়ে দামি দুটি মানুষ এখন তার সওয়ার। অবনীমোহনের বাড়ির সামনে পৌঁছে সে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। অবনীমোহন পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন, রিকশাওয়ালা জোরে মাথা দোলাতে লাগল, 'না স্যার, দিতে হবে না। আমি নিতে পারব না।'

'স্যার! তুই আমাকে স্যার বলছিস? ওহে বাসব, এ কি বলছে শোনো।'

'স্যার কথাটা আজকাল সবাই শিখে গেছে দাদা।'

'নাহে। আজ তুমি সঙ্গে আছ বলে ওর মুখে স্যার বেরিয়েছে। টাকাটা ধর, আমি বিনি পয়সায় কাউকে খাটাই না। ধর বলছি।' শেষ শব্দদুটোয় এতটা জোর ছিল যে রিকশাওয়ালা আর আপত্তি করতে পারল না।

গেট খুলে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে বাসব বলল, 'দাদা, এই জন্যে আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করি। তবে আপনাদের মতো মানুষ খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না। বাড়ির বাঁ-দিকের ঘরটি তাঁর। বসা পড়া এবং শোওয়ার। বাড়িটি পৈতৃক, বাকি অংশে তাঁর ভাইয়েরা থাকেন। অকৃতদার অবনীমোহনের একটি ঘরই যথেষ্ট। বেতের চেয়ারে বসতে দিয়ে তিনি বাসবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা খাবে?'

বাসব রুমালে মুখ মুছল, 'আবার ওদের খাটাবেন?'

'বউমা এটাকে খাটনি বলে মনে করেন না। তা ছাড়া, এখন তো বাড়িতে অনেক মেয়ে। ভাইপোর বউ, তাদের মেয়ে এবার ক্লাস টেনে উঠল। দাঁড়াও, বলে দিই ওদের।'

অবনীমোহন ভেতরে চলে গেলেন। বাসব চারপাশে তাকাল। এই ঘরে সে গত কুড়ি বছর

ধরে আসছে। একটুও পরিবর্তন হয়নি কোথাও। তক্তাপোশ, বেতের চেয়ার, আলনা, কুঁজো গ্লাস এবং বই-এর তাক একইরকম রয়ে গেছে। সারাজীবন মাস্টারি করেছেন অবনীমোহন। জেলে গিয়েছেন অনেকবার। এখন তিনি সরকারিভাবে এই জেলার পার্টির সভাপতি। তিনি থাকায় দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রম এসেছে। অথচ অবনীমোহনের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। আজ যাঁরা মন্ত্রী তাঁদের অনেকেই ওঁর পরে দলে এসেছেন। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা মনে করেন অবনীমোহন ইচ্ছে করেই জেলার বাইরে যেতে চাননি।

বাসব বইগুলোর দিকে তাকাল। অবনীমোহন এদের বন্ধু বলেন। একসময় সে এখান থেকে অনেক বই নিয়ে গিয়েছে পড়ার জন্যে। কিন্তু বই-এর তত্ত্ব এবং জীবনের সত্য যখন মুখোমুখি হল তখন তাকে জীবনকেই বেছে নিতে হয়েছে। অবনীমোহন এখনও তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বলা যায় তাঁর বাস এখনও ওই বই-এর লাইনে-লাইনে। ফলে অবনীমোহন দলের মূলস্রোতের সঙ্গে ঠিকঠাক গা ভাসাতে পারছেন না। সোমনাথরা এই কথাই তাকে বলছিল। জেলা থেকে নির্বাচিত এম. পি. বলে তার নিজস্ব কিছু ক্ষমতা আছেই। কিন্তু দলের প্রশাসনিক ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না। আজ যখন অবনীমোহন বলেন তার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চান তখন বাসব আপত্তি করেনি। মনে হয়েছিল এই সুযোগে গুরুকে একটু বাস্তবমুখী করা যেতে পারে। সুলতা-কেসটা নিয়ে উনি খুবই অখুশি। সতী দত্ত অধ্যাপিকা। কল্যাণই তাঁকে দলে এনেছিল। তারপর ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এখন দলের মহিলা শাখার নেতৃত্ব ওঁর হাতে। সেই সতী দত্তের বাড়িতে সুলতা চাকরি করত। কল্যাণের অভিযোগ অসহায় মেয়েটিকে সতী দত্তের ভাই এর কারণে গর্ভবতী হতে হয়েছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে সতী দত্ত সুলতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটির কোনও আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব নিতে চায়নি। মা-বাবা নেই। কিন্তু সুলতা কী করে কল্যাণের কাছে পৌঁছাল সেটাই বিস্ময়ের। আর তারপর থেকে কল্যাণ ওকে সাহায্য করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবু কল্যাণ দলের ছেলে। যদি বিপক্ষের কেউ খবরটা জানত তাহলে বিপাকে পড়তে হত। সতীকে দলের জন্যেই দরকার। অবনীমোহন যেটা চাইছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত। এই ন্যায়বোধের কথা বই-এর পাতায় লেখা থাকে। জীবন আরও ব্যাপক। সেখানে যে সত্যিটা জন্ম নেয় তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। তাই সতীর দেওয়া হাজার টাকা সুলতাকে অখুশি করেনি। সে চলে গিয়েছে শহরের বাইরে।

অবনীমোহন এলেন। পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। তক্তাপোশে বসে হাসলেন, 'তোমাকে যে কারণে নিয়ে এলাম বাসব, আমি এবার বিশ্রাম চাই।'

'বিশ্রাম? মানে?' বাসব চমকে উঠল।

'আমার বয়স ঢের হল। শরীরও ঠিক নেই। আগের মতো খাটাখাটনি করতে পারি না। তার ওপর যেটা সত্যি তা হল, এখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না। নিজের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়। তুমি আমাকে দাদা বলে মনে করেছ চিরকাল, আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।' অবনীমোহন শান্ত গলায় বললেন।

দ্রুত মাথা নাড়ল বাসব, 'অসম্ভব। এখন আপনাকে ছাড়া যাবে না।'

'কেন? যা কিছু সিদ্ধান্ত তোমরাই নিচ্ছ।'

'এটা আপনার অভিমানের কথা। আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করিনি।'

'আমি সম্মতি দিয়েছি। না দিলে কাজ আটকে যেত, তাই।'

'দাদা, আপনি যেভাবে বলছেন তাতে যে কেউ মনে করবে আপনাকে আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সুলতার কেসটা নিয়ে আপনি একটু বেশি ভাবছেন।'

'সুলতা একা নয় বাসব। হাসপাতালে আন্দোলনের নামে যা করা হয়েছিল আমি তার বিরোধী ছিলাম। চা-বাগান অঞ্চলে দলের ছেলেদের পার্টির চাঁদার রসিদবই বিলিয়ে দিয়ে কোনও

হিসেবও না চাওয়া আমি মানতে পারিনি। বাসব, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, নিজেকে কি বোঝাব?' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আমরা ক্রমশ বুর্জোয়া ড্রেসিং রুমের শিকার হয়ে যাচ্ছি।'

বাসব হাসল, 'আপনি সোনার পাথরবাটি চাইছেন। এই সংবিধান মানবার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। নির্বাচনে আর কোনও গরিবদের দল জিততে পারে না। কোটি-কোটি টাকা খরচ করতে হয়। বিশাল মেশিনারি লাগে। বুর্জোয়াদের লালনে যে দল লড়ছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যেতে হয়, অন্তত অর্থবল এবং লোকবলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমরা আমাদের পথে অবশ্যই চলব। কিন্তু কিছু ফাঁক তো থেকেই যায়। দাদা, আমরা যতদিন বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছি ততদিন আপনার ওই বইগুলোর তত্ত্ব আমাদের কাজে লেগেছে। মাঝে-মাঝে মনে হয় সরকার-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথে চলতে পেরেছিলাম। কিন্তু সরকার চালাতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের হয়তো আদর্শচ্যুত হতে হচ্ছে। তবে এখানেও প্রশ্ন, আদর্শ কোনটা? সেটা শালগ্রাম শিলা হতে পারে না। এক পয়সা ট্রামবাসে ভাড়া যখন বাড়ানো হয়েছিল তখন আমরা আন্দোলনে জনসাধারণকে সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তিরিশ বছর পরে সরকার চালাতে গিয়ে খরচের বহরে যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন নিজেরাই ভাড়া বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতিপক্ষ যে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে অগণতান্ত্রিক বলতে বাধ্য হচ্ছি। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর এই সব করেই আমাদের সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় আপনি সরে দাঁড়ালে জনসাধারণ আমাদের সন্দেহ করবে। শাসন যার হাতে তাকে তো সাধারণ মানুষ বন্ধু বলে মনে করে না। আমরা যতই বলি জনসাধারণের বন্ধু আমরা, তবু তারা দূরত্ব রাখবেই। এ অবস্থায় আপনার চলে যাওয়া মানে ওদের ভাবনাকে আরও মজবুত করা।' বাসব কথা শেষ করা মাত্র একটি কিশোরী দু-কাপ চা নিয়ে এল। বাসব তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে নন্দিনী না, কত বড় হয়ে গেছিস?'

নন্দিনী চায়ের কাপ দিয়ে বলল, 'আজকাল তো আপনি আসেনই না।'

'হ্যাঁরে, সময় পাই না। দিল্লি আর কলকাতা করতে-করতে নিশ্বাস ফেলতে পারি না।' চায়ে চুমুক দিল বাসব। নন্দিনী দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'কোন ক্লাশ এবার?'

'টেন। আসছি।' নন্দিনী চলে গেল।

চা খেয়ে বাসব বলল, 'দাদা আপনি নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত চুপ করে থাকুন। এমনিতেই হঠাৎ হাওয়াটা একটু গরম হয়ে উঠেছে। এসব কথা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না।'

'না, আমার মনে হয়েছিল তুমি শিক্ষিত ছেলে, পড়াশুনা করেছ, তুমি বুঝবে।'

বাসব উঠে দাঁড়াল, 'আপনি তো জনসাধারণকে চেনেন। কোনও-কোনও নেতার একটু বেহিসাবি কথায় তারা খেপে উঠেছে। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ এত বিশৃঙ্খল যে তাদের শান্ত করতে বেশি সময় লাগবে না। সেক্সপিয়ার সাহেব তো জনতার চরিত্র বলেই গিয়েছেন।'

অবনীমোহন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বাসবকে, 'ওইটেই বোধহয় ভুল হচ্ছে বাসব। ঢেউ-এর ধাক্কায় কণা-কণা বালি কখন যে নিজেরাই জড়ো হয়ে একটা বিরাট চর হয়ে যায় তা আগে ঠাওর করা যায় না। বিরোধ যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন নেতৃত্ব আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। আমরা এটাই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

বাসব মাথা নাড়ল। রাস্তায় পা দিয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। অবনীমোহন তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষটি সত্যি ভালো। তার আজকের যা কিছু উন্নতি সব ওই একটি লোকের জন্য। না, অবনীমোহনকে এখন কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না। কিছুদিন আগে সুধাময় চৌধুরী কলকাতার পার্টি অফিসে বসে বলেছিলেন, 'বাসব, অবনীর মতো একজন আমাদের দলে আছে এটা ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে। ও জেলা থেকে বেরিয়ে এলে দেশের অনেক বেশি উপকার

হত।' পুরোনোদিনের লোক যাঁরা তাঁদেরই এমনই ধারণা ওঁর সম্পর্কে। চারপাশে তাকিয়ে বাসব একটিমাত্র রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেল। তাকে দাঁড়াতে দেখেই সে রিকশা নিয়ে এগিয়ে আসছে, 'চলুন স্যার।' সঙ্গে-সঙ্গে বাসবের মনে পড়ল এই লোকটাই তাদের নিয়ে এসেছিল। সে হেসে বলল, 'তুমি এখনও এখানে? এর মধ্যে ভাড়া পাওনি?'

'পেয়েছি স্যার। নিইনি। আপনি তো ফিরে যাবেন।'

রিকশায় উঠে বসে বাসব। তার ভালো লাগল। একেবারে, যাকে বলে রুট লেভেলে সে চলে গিয়েছে। একজন রিকশাওয়ালা পর্যন্ত তাকে খাতির করছে। কিন্তু ও কী চায়? এখন জেলায় এলেই যারা ভিড় করে তারা কিছু-না-কিছু চায়। লোকগুলো যখন বোঝে বিধানসভা বা কলকাতার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, লোকসভা বা দিল্লিতেই তার কাজকর্ম, তখন খুব হতাশ হয় সবাই। একমাত্র বড় ব্যাবসায়ী ছাড়া কেউ তাই বিব্রত করতে পারে না তাকে। এম. পি. হয়ে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। মুখ ফিরিয়ে সে শেষবার তাকাল, অবনীমোহন দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনীমোহন শূন্য রাজপথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাসব যা বলে গেল তার সবটাই ওর দিক থেকে সত্যি। বিরুদ্ধ ভাবনাটা তাঁর মনে আজই প্রথম এল না, দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধীরে-ধীরে এমন দানা বাঁধছিল। নিজেকে বুঝিয়েছিলেন মতে মিলছে না বলে সরে দাঁড়ালে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না, ক্ষমতাহীন অবস্থায় ঘরে বসে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারবেন না। তবু জেলার সর্বোচ্চ পদে থেকে তিনি কিছুটা কাজ নিজের মতো করে করতে পারছেন। ভেবেছিলেন বাসব তাঁর কথা বুঝতে পারবে, এখন মনে হচ্ছে বুঝেও বাসব তাকে মানিয়ে চলার নীতি নিতে বলছে। কিন্তু একটা মানুষ কতখানি মেনে নিতে পারে? গ্রামের প্রায় সবগুলো পঞ্চায়েত এখন তাঁদের দখলে। যদিও পঞ্চায়েতের সদস্যরা কিছু চামচে নিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। এখন নির্বাচনে জিততে জনসাধারণের দেওয়া ব্যালটের ওপর নির্ভর করতে হয় না, তাই পরবর্তী নির্বাচনেও ওরা জিতবে। কিন্তু আগুন একদিন জ্বলবেই। পার্টি ফান্ডে হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পারার অপরাধে এক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারের চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ তার জমিতে চাষ করতে যেতে পারবে না। যারা চাষ করত তাদের দিয়ে বেশি মজুরি দাবি করানো হল। পরিবারটি এক বছর চাষ বন্ধ রাখল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অভাবের তাড়নায় বাধ্য হল হাজার টাকা চাঁদা দিতে। এই বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর বুকে আগুন জ্বলছে ধিক-ধিক করে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কখনই ও গ্রামের শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি অত টাকা চাঁদা আদায় করতে। অথচ তারা করছে। এসব খবর জামা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। থানা তো এখন অতিরিক্ত রকমের তাঁবেদার। এই আধা ফ্যাসিস্ত ক্রিয়াকলাপ বেশিদিন চলতে পারে না। কিন্তু একথাও ঠিক, পদত্যাগ করলে তিনি কোনও সুরাহা করার সুযোগই পাবেন না।

অবনীমোহন দেখলেন, শূন্য রাজপথে একটি রিকশা আসছে। রিকশার সওয়ারি এই শেষ সকালেই মাথায় ছাউনি ফেলেছে। রিকশাটি অবনীমোহনের বাড়ির সামনে এসে থামল। রিকশাওয়ালা সওয়ারিকে বাড়িটা দেখিয়ে কিছু বলতেই লোকটা ভাড়া মেটাল, তারপর একটা কাঁধে ঝোলানো বড় ব্যাগ নিয়ে নেমে দাঁড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীমোহন লোকটাকে দেখলেন। বছর তিরিশেক বয়স। ভাঙা গাল। কাঁধ অবধি চুল। চেক শার্ট আর বিবর্ণ জিনসের প্যান্ট পরে কাঁধে ব্যাগ ফেলে এগিয়ে আসছে। প্রায় মুখোমুখি হতেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীমোহনবাবু আছেন?'

'আমিই অবনীমোহন।'

'অ। ভেতরে চলুন, কথা আছে।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। চলুন ভেতরে বসে কথা বলব।'

লোকটার বলার ভঙ্গিতে যে ঔদ্ধত্য রয়েছে সেটা অবনীমোহনকে বিরক্ত করল। অশিক্ষা থেকেই মানুষ এই ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার কি দরকার তা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

লোকটা চারপাশে তাকাল, 'পাবলিক শুনুক আমি চাই না। হোলনাইট জার্নি করে এসেছি। হেভি টায়ার্ড। বসেই কথা বলতে চাই।'

অতএব অবনীমোহন ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। নিজে তক্তাপোশে বসে লোকটাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। লোকটা তাঁর ঘরের চেহারা দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো জেলা কমিটির চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'কতদিন হয়েছেন?'

'আগাগোড়া।'

'যাঃ শালা!'

'মানে?'

'অ্যাদ্দিনেও বাড়িঘরের চেহারা পালটাতে পারেননি?'

'কি চান আপনি?' চোয়াল শক্ত হল অবনীমোহনের।

বুকপকেটে রাখা একটা ভাঁজকরা খাম বের করে অবনীমোহনের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন তিনি। সত্যর চিঠি। অত্যন্ত ক্ষমতাবান মন্ত্রী। বছর কুড়ি হল পার্টিতে এসেছে। কয়েকবার জেলায় এসেছে। তাঁকে খুব দাদা-দাদা করে। সম্ভবত প্রবীণ নেতাদের মুখে তাঁর কথা শুনেছে। সেই সত্য চিঠি লিখেছে।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, পত্রবাহক শ্রীমান বলাই গুপ্ত আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে দলের সদস্য না হলেও সক্রিয় কর্মী। আজ যখন বিরুদ্ধপক্ষের মদত দিতে কিছু বুর্জোয়া কাগজ আমাদের পেছনে লেগেছে তখন আমাদের সংগ্রামে নামতেই হচ্ছে। যাহোক শ্রীমান বলাই-এর নামে কয়েকটি মিথ্যে এফ. আই. আর. করা হয়েছে। মিথ্যে বলেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু খবরের কাগজগুলো প্রতিদিন এমন চাপ দিচ্ছে যে পুলিশকে আর নিষ্ক্রিয় রাখা যাচ্ছে না। তাই ওকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম। অন্তত মাসখানেক আপনি ওর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দলের জন্যে আপনার অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। শ্রীমানকে আশ্রয় দেওয়া দলের প্রতি কর্তব্য বলে মনে করলে বাধিত হব। ওর সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার কথা চিন্তা করছি। নমস্কার সহ—আপনার সত্য দত্ত।'

অবনীমোহন চিঠিটি শেষ করে বলাই গুপ্তের দিকে তাকালেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতা থেকে কীসে এলেন?'

'রকেটে। কৃষ্ণনগর থেকে উঠেছি।'

'কেন?'

'সত্যদা বললেন, বুলু চান্স নিয়ো না। এসপ্ল্যানেডে গেলে পাবলিক চিনে ফেলতে পারে! তাই প্রাইভেট কারে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। ওখানে রকেট এসে থামতেই উঠে পড়লাম।'

অবনীমোহনের মনে হল এই লোকটিকে নিছকই মস্তান বলা যায়। পেশিশক্তির প্রয়োজন আপনা থেকেই হচ্ছে। অথবা পেশিশক্তি যাদের আছে তারা নিজেদের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলের ছায়ায় আসছে। এখন এই অর্থে তত্ত্বসর্বস্ব রাজনৈতিক দল প্রায় সোনার পাথরবাটির মতো ব্যাপার। অবনীমোহনকে মানতে হয়েছে। আটচল্লিশ সালের অবনীমোহনের সঙ্গে সাতষট্টির অবনীমোহনের যেমন অনেক অমিল ছিল, নব্বুইতে এসে তিনি প্রচুর পালটেছেন। এসব সত্যি,

কিন্তু এই শহরে তথাকথিত পেশিশক্তি নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে তাদেরও একটা পারিবারিক দিক আছে। শেকড়ছাড়া কেউ নয়। আর তারা অবনীমোহনের সামনে এসে নিচু করে কথা বলে। অবশ্য সামনে আসার অস্বস্তি থেকে দূরে থাকতেই তারা পছন্দ করে।

অবনীমোহন বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার কিছু জানার আছে।'

বলাই হাত নাড়ল, 'আমি তো মাসখানেক এখানে থাকব। পরে জানলে ক্ষতি আছে? আমার এখনই ল্যাট্রিনে যাওয়া দরকার। হোল নাইট জার্নি করেছি।'

অবনীমোহন উঠলেন। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি স্নানঘর এবং পায়খানা আছে। ব্যবস্থাটা অনেকদিনের। বাড়ির লোকজনকে বিব্রত না করতেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। একসময় তাঁর ঘরেই প্রচুর সভা হয়েছে। অনেক মানুষ ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থাকত। সে সময় ওই ব্যবস্থা করা। বলাইকে ইশারায় তিনি ভেতরে নিয়ে এলেন। এক চিলতে উঠোন। উঠোনের পরেই মূল বাড়ি। সেদিকে না গিয়ে তিনি বলাইকে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

বলাই বলল, 'আমার ব্যাগ বাইরে পড়ে রইল কিন্তু!'

'এখানে কোনও চুরি-চামারির ভয় নেই।'

'ওর ভেতরে মাল আছে। একটু নজর রাখবেন।' বলাই ঢুকে গেল। অবনীমোহন ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। তক্তাপোশে বসে সত্যর চিঠিটা আবার পড়লেন।

সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল অবনীমোহনের। জীবনে তাঁকে দু-বার আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হয়েছিল। পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল আর জরুরি ব্যবস্থা জারি হওয়ার সময়। সেটা ছিল পুলিশের নজর থেকে দূরে সরে থাকা। সাধারণ মানুষের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেক। একটা সততাবোধ সেই সময় তাঁদের অনুপ্রাণিত করত।

পায়ের শব্দে অবনীমোহন চোখ খুললেন। নন্দিনী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, 'কে এসেছে দাদু?'

'কলকাতা থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'কেন?'

'ও এখানে কিছুদিন থাকবে। তুমি ভেতরে যাও।'

'মা জিজ্ঞাসা করল তোমার জলখাবার এখন দেবে কিনা?'

মাথা নাড়লেন অবনীমোহন, 'না, এখন খাব না। তুমি বরং ভেতরে যাও।'

'কেন?'

অবনীমোহন কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। বলাই-এর সামনে নন্দিনী থাকুক তিনি পছন্দ করছেন না, এ-কথাটা কীভাবে বলবেন, নাতনির হাত ধরে তিনি বললেন, 'আমরা এখন কিছু জরুরি কথা বলব তো, তাই তোমাকে ভেতরে যেতে বলছি।'

'ও, তাই বলো। লোকটার নাম কী দাদু?'

'বলাই।'

নন্দিনী হেসে উঠল, 'ওর চুলগুলো দেখেছ? অমিতাভ বচ্চনের নকল করা!'

'তুমি কী করে দেখলে?'

'বাঃ, আমি তো ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বুঝলাম। এবার যাও।'

নন্দিনী যখন চলে যাচ্ছে সেই সময় বলাই ঢুকল। জামাপ্যান্ট পালটানোর চেষ্টা করেনি কিন্তু একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে। চলে যাওয়া নন্দিনীর দিকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অবনীমোহনের এটা পছন্দ হল না।

চেয়ারে বসে বলাই বলল, 'আঃ, এবার আরাম লাগছে। কিষাণগঞ্জের কাছে রাস্তা যা খারাপ ছিল, কি বলব আপনাকে!'

'আপনার ব্যাগে কী আছে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি আছে মানে?'

'বাথরুমে ঢোকার সময় বলছিলেন।'

'অ। রিভলভার।'

'আপনি রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন? লাইসেন্স আছে?'

এবার শব্দ করে হাসল বলাই, 'আপনি কোন জগতে বাস করেন বলুন তো? এই শহরে যারা অ্যাকশান করে তারা কি লাইসেন্স নিয়ে রিভলভার চালায়?'

'এখানে ওসবের প্রয়োজন হয় না।'

'তাই নাকি? প্রথম শুনলাম। আমি কোন ঘরে থাকব?'

'কোন ঘর মানে?'

'বাঃ, সত্যদা বলেছেন আপনি থাকার ব্যবস্থা করবেন!'

অবনীমোহন উঠে দাঁড়ালেন। মনে-মনে বললেন, অসম্ভব। এ বাড়িতে কিছুতেই নয়। এই মুহূর্তে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু সত্যর অনুরোধ তিনি ঠেলতেও পারছেন না। লোকটাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠানো দরকার যেখানে গিয়ে ওকে একদম একা থাকতে হবে। হঠাৎই তাঁর মনে পড়ল সেই ফরেস্ট বাংলোটার কথা। প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে বাংলোটা রয়েছে। সেখানে কোনও ট্যুরিস্ট যায় না। ডি.এফ.ও.-র সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং তার আগে থানাতে যেতে হবে। এই একমাস বলাইকে যেন কেউ বিরক্ত না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

অবনীমোহন বললেন, 'দেরি করে লাভ নেই। চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আপনার একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আমার এখানে সেটা সম্ভব নয়। সারাদিন প্রচুর লোক আসেন। একটা ফরেস্ট বাংলোয় ব্যবস্থা করছি। ওখানে চৌকিদার আছে, সেই রান্না করে দেবে। মাসখানেক জঙ্গলের বাইরে আসবেন না।'

'বাঃ, ওরকম জায়গায় একা থাকলে পুলিশ সবচেয়ে আগে টের পাবে!'

'টের যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি—চলুন।'

অর্ধেকের চেয়ে কম বয়সের লোকটাকে অবনীমোহনের তুমি বলতে ইচ্ছে করছিল না। আর মজার ব্যাপার বলাই তাঁকে একবারও অনুরোধ করেনি তুমি বলতে। এতে স্বস্তি পাচ্ছেন তিনি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর পাশে রিকশায় বসে বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে?'

'বাসে ঘণ্টা দুয়েক লাগে।'

'আমার কাছে বেশি মালকড়ি নেই।'

'ঠিক আছে।' বলতেই মাল শব্দটা থেকেই রিভলভারের কথা মনে হল। অবনীমোহন বললেন, 'আমরা প্রথমে থানায় যাব।'

'থানা? থানা কেন?' চমকে উঠল বলাই।

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে।'

'আপনার মতলবটা কি বলুন তো?'

'সত্য আপনাকে পাঠিয়েছে, তাই ওর অনুরোধ রাখছি। একটা কথা, আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন। পুলিশের চরিত্র আমি বুঝি না। ওরা কিছু করবে না, তবু থানার ভেতরে আপনার কাছে রিভলভার না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পুলিশের নজর এড়াতে এতদূরে এলাম আবার আমাকেই কেন থানায় নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে

পারছি না। দু-নম্বরী কিছু করতে চাইলে সত্যদা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না মনে রাখবেন।' প্রায় শাসানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও ব্যাগ খুলে হাতের আড়াল রেখে রিভলভারটা বের করে অবনীমোহনকে দিল বলাই। অবনীমোহন জীবনে প্রথমবার রিভলভার ধরলেন। কাঁপা হাতে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। বলাই বলল, 'সাবধানে রাখবেন। লোড করা আছে।'

থানার গেট পেরিয়ে রিকশাটা থামতেই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন অবনীমোহন। তাঁকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন, 'আসুন-আসুন, কী সৌভাগ্য! আমাকেই তো ডেকে পাঠাতে পারতেন। আসুন।'

দারোগার ঘরে বসে অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব শক্ত হয়ে বসে আছে। খুব ভয় পাওয়া একটা মানুষের চেহারা এরকম হয়। অবনীমোহন হাসলেন, 'আমাকে একটু টেলিফোনে ডি.এফ.ও.-কে ধরিয়ে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'নিশ্চয়ই। একটু আগে ডি.এফ.ও. বাংলোয় ফিরে গেলেন। দাঁড়ান দেখছি।' রিসিভার তুলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তিনি।

অবনীমোহন বললেন, 'কেমন আছেন ডি.এফ.ও. সাহেব?'

'আর বলবেন না, বয়স হচ্ছে এবার টের পাচ্ছি।'

'একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

মিনিটখানেকও লাগল না, ডি.এফ.ও. খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। তিনি এখনই ওই ফরেস্ট এলাকার অধস্তন কর্মচারীদের জানিয়ে দিচ্ছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।...টেলিফোন রেখে অবনীমোহন বললেন, 'এই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেয়েছে, কিছু আনানো যাবে?'

দারোগা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। কি আনাব? কচুরি তরকারি ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যাবে না এখন। তাই আনাই? আপনি খাবেন তো স্যার? খাবেন না? চা? অ্যাই, কে আছ? গোটাছয়েক কচুরি আর তিনকাপ চা নিয়ে এসো জলদি।'

একজন পুলিশ আদেশ পালন করতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দারোগা এবার হাত কচলালো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোনও অন্যায় হয়ে যায়নি তো—মানে নিজে এখানে এলেন!'

'না-না। আমি এসেছি এর জন্যে। আচ্ছা, একে কি আপনি চিনতে পারছেন?'

দারোগা বলাই-এর দিকে তাকালেন। অবনীমোহন দেখলেন, বলাই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দারোগা কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নেড়ে না বললেন। অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু আগে যে ফরেস্ট বাংলোটার কথা ডি.এফ.ও.-কে বললাম, সেখানে ইনি মাসখানেক থাকবেন। আমাদের কলকাতার একজন বড় নেতা চাইছেন এই সময়টা ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ওটা তো আমার এলাকা নয় স্যার।'

'ওই এলাকার যিনি দারোগা তাঁকে তো আপনি চেনেন।'

'চিনি। তা আপনি কি ওখানে সেপাই পোস্ট করতে বলছেন?'

'না, ঠিক উলটো। নেতা চাইছেন কেউ যেন ওঁর খোঁজ না করে।'

'ও বুঝলাম। ঠিক আছে স্যার, হবে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এত দ্রুত খাবার এসে যাবে কল্পনা করেননি অবনীমোহন। বলাই চেটেপুটে খেল। খেয়ে বলল, 'কচুরিতে যেন কেমন গন্ধ!'

দারোগা হাসল, 'মফস্বলের কচুরি তো, কলকাতার স্বাদ পাবেন কোথায়!'

চা খাওয়া হলে অবনীমোহন উঠছিলেন, দারোগা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যার, এবার মন্ত্রী এলে আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'মনে করিয়ে দেবেন।' অবনীমোহন বেরিয়ে এলেন থানা থেকে। তাঁর পেছন-পেছন বলাই। তার গলায় হাসি ছিল, 'বাপস। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দিন, এবার মালটা দিন।'

'ওটা আপনাকে এই জেলা থেকে চলে যাওয়ার দিন দেব।'

'সে কি! ওটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

কান দিলেন না অবনীমোহন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিচ্ছি। বাস ওই ফরেস্টের পাশ দিয়ে যায়। কিছুটা হাঁটতে হবে। ততক্ষণে ডি. এফ. ও. সাহেবের হুকুম পৌঁছে যাবে। আপনি চলে যান।'

'অ্যা! আমি একা যাব?' বলাই পাশে এসে দাঁড়াল, 'অসম্ভব। সত্যদা বলেছেন আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজে যেতে না পারেন কাউকে সঙ্গে দিন।'

'কাউকে সঙ্গে দিলে জানতে পারবে আপনার কথা।' মাথা নাড়লেন অবনীমোহন। তাঁকে খুব বিষণ্ণ লাগছিল। এই লোকটিকে কেন তাঁকে বহন করতে হচ্ছে? কেন তিনি একে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না? সত্য দত্তর মুখ মনে পড়ল। বলাই অ্যাকশন করত। কীরকম কাজ সেটা তো তিনি এখনও জানেন না। এফ. আই. আর. আছে যখন, তখন—! না, তিনি একে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা দলের কাউকে জানানো চলবে না।

সামান্য হাঁটতেই বাসের দেখা পেলেন অবনীমোহন। হাত দেখাতেই সেটা থামল। কন্ডাক্টর অবনীমোহনকে চিনতে পেরে উদ্যোগ নিয়ে জায়গা করে দিল। পাশাপাশি দুটো সিট। অবনীমোহন জানলার ধারে বসেই টিকিট কাটলেন। কন্ডাক্টর নিতে চাইছিল না টাকা, তিনি বাধ্য করলেন। শহর ছাড়িয়ে বাস বাইরে বেরুলে অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নামে এফ. আই. আর. করা হয়েছে কেন?'

'ওই যে, তখন বললাম। অ্যাকশান করেছিলাম।' নিচু গলায় বলল বলাই।

'কীরকম অ্যাকশান?'

'অনেকগুলো।'

'যেমন?'

'ইলেকশনের সময় বুথ জ্যাম করতে বলা হয়েছিল। দলের লোকজন পারছিল না। তখন বোম নিয়ে রিভলভার নিয়ে নামলাম। সব ভোটার হাওয়া হয়ে গেল। বুথে ঢুকে কাজ শেষ করে চলে এলাম। কোনও ঝামেলা হয়নি।'

'এছাড়া?' চোয়াল আবার শক্ত হল অবনীমোহনের।

'মাসখানেক আগে আমাদের পাশের পাড়ার কয়েকজন খুব গোলমাল পাকাচ্ছিল। কাটা পাঁচুর নাম শুনেছেন? শোনেননি? সত্যদা পাত্তা দেয়নি বলে এমনি হয়ে গিয়েছিল। পুরো বস্তিটাকেই অ্যান্টি করে তুলেছিল। চোলাই, মেয়েছেলে সবরকম ব্যবস্থা করত। একদিন অ্যাকশন করলাম। কাটা পাঁচুর প্রেমিকাকে ধরে রেপ করলাম। ব্যস, সব ঠান্ডা। পুরো বস্তি এখন আমাদের দলে। কাটা পাঁচু ভোগে।'

'ভোগে মানে?'

'লাইনে পড়ে আধাআধি টুকরো হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি রেপ করেছেন?' হতভম্ব অবনীমোহন।

'ওসব তো করতেই হয়। মেয়েছেলেটা আমার নাম পুলিশকে বলে দিয়েছে। ওকে ঠান্ডা করার টাইম পাইনি। ফিরে গিয়ে হিসেব নেব।'

'সত্য জানে আপনি এসব করেছেন?'

'গুরুর পারমিশন ছাড়া কোনও কাজ করি না দাদা।'

অবনীমোহনের বমি পাচ্ছিল। বলাই-এর পাশে বসতে তাঁর ঘেন্না হচ্ছিল। সত্য কাকে পাঠিয়েছে তাঁর কাছে? একি তাঁদের ক্যাডার? সত্যর ক্যাডার? ক্যাডার মানে শিক্ষিত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাহলে?

হঠাৎ অবনীমোহনের সমস্ত শরীরে জ্বলুনি ধরল। তিনি স্থির করলেন এই সামাজিক অপরাধীটিকে কোনওরকম সাহায্য করবেন না। একে অবিলম্বে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তারপরেই মনে হয় পুলিশকে তিনি অন্যরকম অনুরোধ করে এসেছেন। বাড়িতে বসে এসব শুনলে কখনই সেটা করতেন না। এখন নতুন করে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তাহলে? অবনীমোহন ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। বাসবরা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে বলে। বাসব হলে কি করত? তিনি সরে বসলেন। কোনওরকম রাস্তা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ফরেস্টের গেটের মুখে ওঁরা বাস থেকে নামলেন। বলাই বলল, 'যাঃ শালা! এখানে তো মানুষের মুখই দেখা যাবে না, সময় কাটবে কী করে?'

'মানুষের মুখ দেখার মতো মুখ তো আপনি করেননি।' চাপা গলায় বললেন তিনি।

'মানে? কি উলটোপালটা বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। আমার বয়স হয়েছে। আর হাঁটতে পারব না। সোজা ওই কাঁচা রাস্তা ধরে চলে যান। বাংলো পাবেন। একমাসের মধ্যে এখান থেকে বের হবেন না।'

'আমি একা যাব?'

'এতদিন যা করেছেন তা কি একা করেননি?'

'না। সঙ্গী ছিল।'

'আমার কাজ আমি করেছি, যান।'

'মাল দিন। টাকা আর রিভলভার।'

বাস চলে গেছে। কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। গাছে পাখি ডাকছে। হঠাৎ সচেতন হলেন অবনীমোহন। জীবনে কখনও রিভলভার চালাননি তিনি, একটা পিঁপড়েকেও কখনও মারেননি। রিভলভার তাঁর পকেটে আছে। তাতে গুলি আছে বলেছিল বলাই। তিনি যদি এখন ওটা বের করে বলাই-এর বুক লক্ষ্য করে ছোড়েন তাহলে কেউ টের পাবে না। আর এইটেই তাঁর কর্তব্য। একজন মানুষ হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলাই-এর মতো পিশাচকে সরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। তিনি রিভলভার বের করলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বলাই এগিয়ে এসে রিভলভার নিয়ে নিল। তাঁর আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বলাই ওটাকে পকেটে রেখে বলল, 'টাকাটা?'

পকেটে একশোটা টাকা ছিল, 'এটাই আপাতত রাখুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'এতে আর ক'দিন চলবে? পাঠিয়ে দেবেন, নইলে আমাকে আবার আপনার বাড়িতে যেতে হবে। সত্যদাকে খবরটা দিয়ে দেবেন, দিতে বলেছে।' বলাই হেলতে দুলতে জঙ্গলের পথ ধরল। অবনীমোহনের মনে হল একটি জন্তুও ওর চেয়ে অনেক স্বাভাবিক পায়ে হাঁটে।

শহরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। অস্নাত অভুক্ত অবনীমোহন বাড়িতে ঢুকে শুনলেন প্রচুর লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল। সোমনাথরা যেতে বলেছে। তিনি দরজা বন্ধ করে তক্তাপোশে শুয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরছে, বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। নন্দিনী একটু আগে ভেতরে চলে গেছে। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাননি। হঠাৎ মনে পড়ল সকালে বলাই নন্দিনীর দিকে তাকিয়েছিল। যে বলাই প্রকাশ্যে রেপ করতে পারে, যে বলাই রেপের গল্প গর্বের সঙ্গে করতে পারে তাকে তিনি আশ্রয় দিয়ে এলেন। নন্দিনীর মুখ মনে পড়তেই শিউরে উঠলেন।

অনেকক্ষণ পরে অবনীমোহন উঠলেন। আলো জ্বাললেন। তারপর চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসলেন। একটু ভেবে তিনি শুরু করলেন—শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি নিয়ে বলাই আমার কাছে এসেছিল। প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। তারপর ডি.এফ.ও.-র অনুমতি নিয়ে একটি ফরেস্ট বাংলোয় রেখে এসেছি। সেখানে যাওয়ার আগে আমি তার ক্রিয়াকলাপ জানতাম না।

আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সংগ্রাম করে আজ আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই পৌঁছানোটা মূল লক্ষ্যের সিকিভাগও নয়। আমরা চিরকাল জেনে এসেছি জনসাধারণের পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়ানোটাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ঠিক যে কারণে আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে কারণে উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা হেরে গিয়েছে, সেই কারণটা আমাদের যেন ধ্বংস না করে। ক্ষমতায় আসার পর আমাদের আরও সুযোগ এসে গিয়েছে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কয়েক কোটি মানুষকে তাঁবে আনতে আমরা কিছু পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করছি। আজ যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ সে জনগণের শত্রু। অথচ তার ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। যতদিন তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কথা শুনবে। যেদিন প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা যাবে সেদিন সে দলবদল করে তোমার আমার স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এই সত্যটা আমাদের বোঝা উচিত। জনসাধারণের জন্যে কাজ করতে এসে তাদের শত্রু করে তোলার পথ থেকে এখনই আমাদের সরে আসা উচিত। এখন আমরা সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। কেউ সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার মতো যারা বামপন্থী আন্দোলনকে মনে-প্রাণে সমর্থন করেন তাঁরাও একমত হবেন, বর্তমান অবস্থায় আমরা সঠিক পথে চলছি না। আমাদের আত্মশুদ্ধি হওয়া দরকার। ঔদ্ধত্য ত্যাগ করা উচিত। আর এই সমাজবিরোধীদের উৎখাত করে সামাজিক তরুণদের ওপর আস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজ সকালে বাসবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে আমাকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেছিল। আমিও তোমাদের জীবনের সঙ্গে পা মেলাতে অনুরোধ করছি। তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি বলাইকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। এই শহরের দারোগা জানে সে কোথায় আছে। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরো—যাতে মানুষ জানবে আমরা অপরাধীর রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে হাত মেলাইনি।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এইটুকু আমার আবেদন। অবনীমোহন।'

চিঠিটা ভাঁজ করলেন তিনি। খামে ঢোকালেন। তারপর ধীরে-ধীরে ভেতরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল স্নান করার। জলের ধারায় নিজেকে ধুয়ে নিতে। কিন্তু কল পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। শব্দ শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। অ্যাম্বুলেন্স এল হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সারা শহরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন অবনীমোহন। তাঁর মাথার পাশে বসে নন্দিনী আকুল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ দাদু?'

অবনীমোহন জড়ানো গলায় বললেন, 'চিঠি—টে-বিলে—!'

'তুমি চিঠি লিখেছ, কাকে পাঠাব?'

অবনীমোহন চেষ্টা করলেন, কথা বেরুল না ঠোঁট থেকে। এক হাত অসাড়, অন্য হাতে তিনি যেন এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের ঠিকানা আঁকলেন।



প্রতিপালন

'কি আশ্চর্য, তোমার ওই মিডল ক্লাস মানসিকতা এখনও গেল না!' স্বপ্না নিজের নির্লোম পায়ে ক্রিম বোলাতে-বোলাতে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

নবকুমার ভি সি আর বন্ধ করে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, সিম্পলি উই কান্ট অ্যাফোর্ড ইট্ রাইট নাউ। তা ছাড়া অ্যাম্বাসাডারটা তো কোনও ট্রাবল দিচ্ছে না।'

'তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে তো জায়গা ছিল, তাহলে সানি পার্কে উঠে এলে কেন? তোমার কোনও পূর্বপুরুষ কালার টিভি, ভি সি আর, ফ্রিজ, কার্পেট ব্যবহার করেছেন? নবু, আজকের যুগে যে মিনিমাম নিড না মেটালে নয় তার বাইরে আমরা যাচ্ছি না।'

স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। তার ধবধবে সাদা নাইটির প্রান্ত হাঁটুর সামান্য নিচে সঙ্কুচিত হওয়ায় পায়ের গোছে হাঁসের ডিমের আদল আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে নবকুমার তারিফ করল। তার বউটি যাকে বলে সত্যিকারের সুন্দরী। অবশ্য তাদের পরিবারের মেয়েরা দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু বাঙালি মেয়েরা এত শরীর ঢেকেঢুকে রাখতে ভালোবাসে যে তাদের সৌন্দর্যটাই মাঠে মারা যায়।

স্বপ্নার শরীরে হাঁটলেই ছন্দ আসে। কে বলবে তেত্রিশে পড়ল ও! তেষট্টির আগে টসকাবার কোনও চান্স ও নেবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে নবকুমার তড়িঘড়ি বলল, 'ডার্লিং ইউ নো, প্রায় চার হাজার বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতি মাসে ধার শোধ করতে। এই ফ্ল্যাটের টাকা শোধ করার পর মারুতি কিনলে হত না?'

'তুমি একটু ড্যাশি হও তো নবু। ওই বুড়ি অ্যাম্বাসাডার নিয়ে ক্লাবে যেতে আমি লজ্জায় মরে যাই। মিসেস মিত্তির ঠাট্টা করছিলেন সবার সামনে। এটাকে বিক্রি করলে আর হাজার পঞ্চাশেক লাগবে। ওয়েল, তুমি যদি না পারো—।'

'না-না, তা বলছি না। কিন্তু—।'

'নবু, ধরো আমি যদি চাকরি না করতাম, ধরো আমার গোটা-তিনেক বাচ্চা থাকত, তাহলে তুমি কি করতে? ওই শ্যামবাজারের বারোয়ারি বাড়ির এক ঘরের অন্ধকূপে বাকি জীবন কাটাতে বলতে তো?' স্বপ্না এগিয়ে এল নবকুমারের কাছে। একটা আঙুল নবকুমারের চিবুকে রেখে বলল, 'আমরা একটু আরাম করে বাঁচতে চাই, চাই না? একটা থার্ড ইনকামের ধান্দা লাগাও না! তোমার কলিগ গুপ্তাকে দেখেও শিখলে না?'

'গুপ্তা তো লেফট অ্যান্ড রাইট ঘুষ নেয়।'

'আঃ, এটাও একটা মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট। যাক, এখন তৈরি হয়ে নাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে বের হব। তুমি কি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছ? তাহলে বলে ফেলো।' স্বপ্না চলে গেল ঘর ছেড়ে। সেই যাওয়া মনভরে দেখল নবকুমার। তার আট বছরের বিবাহিতা স্ত্রী, অথচ প্রতিদিন নতুন দেখছে বলে মনে হয়।

এজেন্সিতে ফোন করল নবকুমার, 'মেডিকেল চেক আপ হয়েছে এ-মাসে?'

মিস্টার সেন বললেন, 'কোনও প্রবলেম নেই স্যার। ডক্টর খাসনবীশ চার সপ্তাহ অন্তর দেখছেন। একটু আন্ডারওয়েট, এখনও তো সময় রয়েছে।'

নবকুমার বলল, 'বড্ড অভাবী পরিবার থেকে সিলেক্ট করেছেন আপনি। গতবার যখন গিয়েছিলাম তখন রোগা লিকলিকে বাচ্চাগুলোকে দেখে স্বপ্নার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের জন্যে একদিন অফিসে অ্যাবসেন্ট হওয়াও এখন অ্যাফোর্ড করা যাচ্ছে না।'

মিস্টার সেন দুঃখিত গলায় বললেন, 'খব দুঃখিত স্যার। তবে এখনও তো সব শ্রেণির মানুষ যথেষ্ট আধুনিক হয়নি, তবে বছর দশেকের মধ্যে আমরা আরও একটু সচ্ছল পরিবার পাব বলে আশা করছি।'

'মাই গড!' নবকুমার চমকে উঠল, 'তখন আমার কোনও প্রয়োজন থাকবে না। আচ্ছা ডাক্তার খাসনবীশের সঙ্গে আমাদের দেখা করার কোনও প্রয়োজন আছে?'

'না, না, স্যার। ওসব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনাদেরটা নিয়ে এটা আমাদের একশ আটত্রিশটা কেস। প্রতিটি সাকসেসফুল।'

'থ্যাঙ্কু। থ্যাঙ্কু।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে চমকে উঠল নবকুমার। ওপাশের দরজা থেকে রেড জিন্স আর হলুদ শার্ট পরে বেরিয়ে এল স্বপ্না। দু-লাফে দূরত্ব ঘুচিয়ে হাত বাড়াল নবকুমার, 'ওফ্, ভেনাস কোথায় লাগে।'

স্বপ্নার ভুরু বেঁকে গেল আরও, 'যত সেকেলে উপমা। নো, তুমি আমাকে এখন ছোঁবে না। ফ্রেসনেশটা মেজাজে রাখতে চাই।'

বুড়ি অ্যাম্বাসাডারটাকে গলির মুখে রেখে নবকুমার আবার বলল, 'ডার্লিং, তুমি এবার না হয় গাড়িতেই অপেক্ষা করো। আমি ওকে ডেকে আনছি বরং।'

ভারী ব্যাগটা নবকুমারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বপ্না হাঁটতে লাগল কথার জবাব না দিয়ে। বাধ্য হয়ে সমতা রাখতে পা চালাতে হল। প্রায় বস্তি টাইপের এই গলির মানুষগুলো প্রতিবারের মতো এবারও স্বপ্নাকে যেন গিলে খাচ্ছে। এই নিয়ে তিনবার হল এখানে। এই মানুষগুলো কি আন্দাজ করছে তা তারাই জানে। মিস্টার সেন যখন প্রথমবার এখানে নিয়ে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন, 'পাঁচ পাবলিককে নিয়ে কখনও চিন্তা করবেন না।'

চার-চারটে উদোম, আধা-উদোম শিশু বারান্দায় শুয়ে-বসে ছিল। ওদের দেখামাত্র চিৎকার করে প্রায় নাচতে লাগল, 'এসেছে, এসেছে, এসেছে।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্নার নাকে ততক্ষণে রুমাল উঠে গেছে। বড় বাচ্চাটা ততক্ষণে নবকুমারের ব্যাগ আঁকড়ে ধরতে চাইছে, 'কি এনেছ গো, দাও না গো, বড্ড খিদে লেগেছে।'

নবকুমার ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোদের মা কোথায়? ডাক তাকে।'

সেই সময় ভেতরের দরজায় নারী এসে দাঁড়াল। ওদের দেখল। তারপর নিচু স্বরে ডাকল, 'আসুন।'

আশেপাশের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াতে ওরা ভেতরে গেল। ঘুপচি ঘর। গতমাসে একটা টেবিলফ্যানের ব্যবস্থা এজেন্সিকে বলে করিয়ে দেওয়ায় তবু স্বস্তি। একটা ছোট বেঞ্চি সামনে এগিয়ে দিতে ওরা দুটিতে পাশাপাশি বসল। স্বপ্না লক্ষ করল, নারীর কণ্ঠার হাড় বড্ড বেশি প্রকট। নবকুমারের চোখে পড়ল, নারীর মধ্যভাগ স্ফীততর।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছ, না বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছ?'

নারী উত্তর দিল না। মাথা নিচু করল। স্বপ্না ঝাঝিয়ে উঠল, 'এরকম করলে তো চলবে না। তোমার জন্যে আমাদের রাতের ঘুম চলে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন, তোমার শরীরে রক্ত নেই।

রক্ত হওয়ার জন্যে এত সব কিনে দিচ্ছি, প্রতি মাসে পাঁচশো করে মাইনে দিচ্ছি, আর তোমার কি কোনও কর্তব্য নেই?'

নারী বলল, 'মাঝে-মাঝে খাই। আসলে ওরা সামনে থাকলে—।'

স্বপ্না ঠোঁট বেঁকাল। তারপর নবকুমারকে বলল, 'দেখেছ কি চেহারা হয়েছে। চোখের তলায় কালি, হাতগুলো সরু-সরু। এজেন্সিকে বলো না, ওকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে। অন্তত এই কয় মাস!'

এই সময় একটা শুঁটকো লোক বিড়ি টানতে-টানতে দরজায় এসে দাঁড়াতেই নারী তার ঘোমটা আরও বাড়িয়ে দিল। লোকটা হাতজোড় করল, 'ওহো নমস্কার। কি ভাগ্যি! দিন আমাকে ওগুলো দিন।' নবকুমারের হাত থেকে ব্যাগটা সরিয়ে নিল সে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এজেন্সি আপনাদের ঠিকমতো টাকা দিচ্ছে তো?'

'তা দিচ্ছে। কিন্তু তাতে চলে না। রেট বড্ড কম। ওই যে আমার চার মেয়ে দেখছেন, ভালো করে খাবার দিতে পারি না ওদের মুখে। তবে আমি তো দেখছি, আমার চার মেয়ে হওয়ার সময় ওর চেহারা এত খোলতাই হয়নি।'

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল কথাটা শুনে, স্বপ্না সেটা উপেক্ষা করে বলল, 'শোনো, পেট ভরে খাবে, রাত্রে দুপুরে ঘুমাবে। এখন কিছুদিন ঘরের কাজকর্ম কবতে পারো, কিন্তু পরের মাসে মেডিকেল চেক আপে যেন ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাই। এই ব্যাগে কমপ্ল্যান, আপেল, আঙুর আছে। কাউকে না দিয়ে নিজে খাবে, বুঝলে?'

নারী ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। স্বপ্না নিচু গলায় নবকুমারকে কিছু বলতেই সে নারীর স্বামীকে একপাশে ডাকল, 'দেখুন মশাই, কিছু হলে তো আমরা এজেন্সিকে ধরব। কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা আলাদা রাখুন। আপনি একটু যত্নটত্ন করবেন। ওজন আর রক্ত বাড়াতেই হবে ওর।'

শুঁটকো লোকটি হাত কচলাল, 'আপনারা অনর্থক চিন্তা করছেন। ফোর টাইমস এক্সপেরিয়েন্সড। কোনও অসুবিধে হবে না দেখবেন।'

নবকুমার বলল, 'আর একটা কথা, উনি নার্সিংহোম থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওঁকে আপনি কোনওভাবে বিরক্ত করবেন না। বুঝতে পারছেন?'

'আমি বিরক্ত তো করি না। হ্যাঁগো—।'

'দাঁড়ান-দাঁড়ান। চেঁচাচ্ছেন কেন? বিরক্ত মানে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বলছি।'

'অ। কিন্তু সেসব তো চুক্তির মধ্যে ছিল না।' লোকটি মাথা নাড়াতে লাগল।

'ছিল না?'

'না। সেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছা—।'

'পূর্ণ করব। আরও পঞ্চাশ বেশি পড়বে মাসে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

গাড়িতে ওঠার পর নাক থেকে রুমাল সরাল স্বপ্না, 'এই এজেন্সিটা খুব বাজে। তোমার পছন্দের ওপর ভরসা করেই অন্যায় হয়েছিল আমার।'

নবকুমার গাড়ি চালাতে-চালাতে ঢোঁক গিলল, 'কিন্তু ওদের তো খুব নাম।'

'ছাই নাম। হাভাতে হাড়জিরজিরে আধবুড়িটাকে জোগাড় করেছে। গতমাসে যা দেখেছি তার চেয়েও শরীর ভেঙেছে। এইভাবে চললে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগেই—। তখন আমি কি করব? কাকে নিয়ে থাকব?' প্রায় ডুকরে উঠল স্বপ্না।

বাঁ হাতটা ধীরে-ধীরে স্বপার কাঁধে রাখল স্পিড কমিয়ে নবকুমার, 'ওঃ নার্ভাস হয়ো না

ডার্লিং। শুনেছি আমার ঠাকুমার ঠাকুমা হাড়জিরজিরে অবস্থায় দশবার সক্ষম হয়েছিলেন।'

এক ঝটকায় সরে গেল স্বপ্না, 'ওই পেডিগ্রি বলেই তো তোমার এই অবস্থা!'

মারুতি এসে গেল। সানি পার্কের গ্যারাজ থেকে বুড়ি অ্যাম্বাসাডারটাকে চল্লিশ হাজারে বিদায় করার পরেও মাসে আরও দেড় করে আয় কমে গেল নবকুমারের। এখন সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট ছাড়া কিচেনের কোনও ব্যবহার হয় না। দুপুরে লাঞ্চ যে-যার অফিসে, রাত্রে ক্লাবে সই করে ডিনার। সামনে অবশ্য নার্সিংহোমের বিরাট খরচ আসছে। স্বপ্নার বাসনা নার্সিংহোমটা যেন খানদানি হয়। ডাক্তারের সঙ্গে সে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এজেন্সিকে যে টাকা দিতে হচ্ছে নার্সিংহোম তার চেয়ে কম নিচ্ছে না। পরের মাসে স্বপ্না যায়নি। একাই ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছিল নবকুমার। নারীকে এবার একটু স্বাস্থ্যবতী মনে হয়েছিল তার। নিতম্ব এবং বুকের ভার যেন বেড়েছে। কথাটা শোনার পর স্বপ্না বলেছে, 'তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। মিস্টার সেন যা করার করবেন।' যেহেতু স্বপ্না এখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, রাত্রে ভালো ঘুম হচ্ছে না, তাই ও নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেনি নবকুমার।

আজ রাত্রে সমস্ত হৃদয় জুড়ে কল্লোল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। নতুন ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছিল নবকুমার। আগামীকাল সকালে অপারেশন। ডাক্তার কোনও রিস্ক নিতে চাইছেন না। নারীকে পরিচ্ছন্ন করে নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে গতকাল। কিন্তু প্রসব বেদনার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নাও চেয়েছিল সিজার হোক। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশু যে কষ্ট পায় তা ওই নারীর কারণে হোক সে চাইছে না। কিন্তু নারীর শরীরে রক্তাল্পতা, রক্তচাপ প্রতিকূল বলে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ডাক্তার। এজেন্সির মিস্টার সেন অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রসূতির ক্ষতি হলে কোনও দায়িত্ব নেই। কিন্তু সিজারের কারণে যদি কিছু হয় তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে। স্বপ্না বলেছিল, 'নিজে হলে তো আমি সিজার চাইতাম। ওর বেলাতেও তাই হোক।' অতএব ডাক্তার ঝুঁকি নিচ্ছেন।

নবকুমার মাটির অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ তারায়-তারায় জমজমাট। কে যেন বলেছিল পূর্বপুরুষরা উত্তরাধিকারীর জন্মের আগে তারার মতো চেয়ে থাকেন। নবকুমার আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসল, আগামীকাল আমরা বাবা-মা হচ্ছি। আর সেই সময় ভেতর থেকে স্বপ্নার গলা ভেসে এল, 'নবু!'

স্বপ্নার হাতে টেলিফোন। তার পরনে দুধরঙা স্বচ্ছ নাইটি। শরীরে সামান্য মেদেরও জায়গা হয়নি। খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝকঝকে, আকর্ষণীয়া। স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াতেই টেলিফোনে হাত চাপা পড়ল, 'হরিবল্! আমার পক্ষে বোঝানো অসম্ভব, তুমি বোঝাও।'

'কে?'

'তোমার মা। আমাদের বাচ্চা হবে খবরটা দেওয়া দরকার। আফটার অল উনি ঠাকুমা।' রিসিভারটা রেখে পাশের কটে গড়িয়ে পড়ল স্বপ্না। লোভ সামলাতে পারল না নবকুমার। একটা হাত আলতো করে স্বপ্নার কোমরের চৌহদ্দিতে ঘুরিয়ে নিয়ে পেটের ওপর রাখল। হ্যাঁ, এটুকু করতে দিতে ওর আপত্তি হয় না।

'কে বলছ? মা?' রিসিভার তুলে প্রশ্ন করল নবকুমার। 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। ডাক্তার প্রেডিক্ট করেছে, নাতি হবে তোমার। না-না, তোমার বউমা ক্যারি করছে না। দ্যাখো ক্যারি করাটা বড় কথা নয়। আমার আর তোমার বউমার রক্ত নিয়ে ও আসছে, এটাই বড় কথা। তুমি আশীর্বাদ করছ তো?' নবকুমার উত্তরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল, 'না-না, এটা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। তোমার বউমার পক্ষে ক্যারি করা ফিজিক্যালি এবং ইকনমিক্যালি অসম্ভব। বাস্তবকে অস্বীকার করে কি লাভ। বাচ্চা ক্যারি করলে ওর শরীরের কমপ্লিকেশন বেড়ে যাবে। শী উইল লুজ হার ফিগার।

আর অন্তত মাসছয়েক ওকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। সেটাও অসম্ভব। হ্যাঁ, মারুতি কিনেছি আমরা। কি বললে? না-না, ডাক্তার এবং এজেন্সি প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে। আমার স্পার্ম, ওর ওভাম থেকেই শিশু আসছে, এ ব্যাপারে ক্যারিয়ারের কোনও ভূমিকা নেই। জাস্ট ওর ওভারিতে প্লেস করে দেওয়া হয়েছে। আফটার অল উই আর পেইং ফর ইট। মা মা মা—। যাচ্চলে! লাইনটা কেটে গেল।' নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল।

স্বপ্না চোখ বন্ধ করে বলল, 'দিজ ওল্ড পিপল আর রিয়েলি ক্রেজি। আধুনিক ব্যাপারগুলো ওদের মাথায় কবে ঢুকবে কে জানে।'

দারুণ সেজেছে আজ স্বপ্না। নার্সিংহোম থেকে সোজা অফিসে চলে যাবে। নবকুমারের মনে পড়ল ছেলেবেলায় মা বিয়েবাড়িতে যাওয়ার সময়েও এত সুন্দর সাজতে জানতেন না। ডাক্তার খাসনবীশ ওদের দেখামাত্র অগ্রিম অভিনন্দন জানালেন, 'যা ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, অপারেশন আটকাবে না। মিনিট চল্লিশেক অপেক্ষা করুন।'

স্বপ্না বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়। সাড়ে এগারোটায় একটা কনফারেন্স আছে।'

এজেন্সির মালিক মিস্টার সেন এসে গেলেন, 'খুব তো চিন্তা করছিলেন। আরে আমার পছন্দ খারাপ নয়। চার-চারটে বাচ্চার মা। এসব ধকল কিছুই নয়।'

ওরা নারীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। একদিন নার্সিংহোমের তোয়াজ খেয়েই যেন চেহারা পালটে গেছে। পেট এখন পরিপূর্ণ। মিনমিনিয়ে বলল, 'আমার তো এমনিতেই হয় কর্পোরেশনের হাসপাতালে। পেট কাটবে কেন?'

স্বপ্না বলল,'কোনও অসুবিধে হবে না তোমার। একদম ফিট হলে তবেই বাড়ি যাবে।'

নারী চোখ বন্ধ করল, 'এবার বড় জ্বালাচ্ছে।'

স্বপ্না চমকে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বালাচ্ছে মানে? কে জ্বালাচ্ছে?'

নারী পেটে হাত রাখল, 'এইটে। কাল সারারাত লাথি মেরেছে।'

স্বপ্না হাসল, 'তা তো মারবেই। ফরেন ল্যান্ডে কে বেশিদিন থাকতে চায় বলো। তুমি সকালে দুধটুধ খেয়েছ তো?'

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ওসব চিন্তা করবেন না। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে।'

স্বপ্নার বুকে টিপটিপ, নবকুমারের হাতুড়ি পড়ছিল। অপারেশন চলছে। নবকুমারকে মিস্টার সেন বললেন, 'ওর স্বামী এসেছে। বাইরে থাকতে বলেছি।'

'ও'। নবকুমার কি বলবে ভেবে পেল না।

'আজই বাকি পেমেন্ট করে আপনাকে বিল পাঠিয়ে দেব।'

এই সময় ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, 'কনগ্রাচুলেশন। আপনাদের পুত্র হয়েছে।'

স্বপ্না সব ভুলে নবকুমারকে জড়িয়ে ধরল। নবকুমারের মনে হল, এত আরাম সে কখনও পায়নি। স্বপ্না ছিটকে গেল ডাক্তারের কাছে, 'আমার ছেলেকে দেখব ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'দাঁড়ান। ওয়াশ করানো হচ্ছে। আট পাউন্ড ওজন। রিয়েল হেলদি।'

নারীর চেতনা খুব দ্রুত ফিরে এল। সে মুখ ফিরিয়ে নার্সকে দেখতে পেয়েই ডাকল, 'আচ্ছা আমার কী হয়েছে?'

'নার্স গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'ছেলে।'

নারীর মুখে স্বর্গীয় আনন্দ ফুটে উঠল। তার শরীর মন্থন করে একটি শব্দ বেরিয়ে এল,

'আঃ!'

নার্স চমকে মুখ ফেরাল, 'কী হল?'

নারী বলল, 'পর-পর চারটে মেয়ে হওয়ায় সবাই আমাকে খুব বদনাম দিচ্ছিল। এবার তো ছেলে হল। হল তো! আমার ছেলেকে নিয়ে আসুন, একটু দেখব।'

নার্স দোনমনা করল। তারপর পাশের কট থেকে শিশুটিকে তুলে এনে নারীর সামনে ধরল। অপলকে নারী তাকে দেখল। তার মুখে ঈশ্বর তখন নিজের শ্রেষ্ঠ সুখের ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলেন। নার্স বলল, 'দেখা হল?'

নারী আলতো আঙুলে কোনওমতে শিশুকে স্পর্শ করে বলল, 'নাকটা আমার মতো হয়েছে।'

ডক্টর খাসনবীশ বললেন, 'এভরিথিং অলরাইট, তবে আমি শিশুকে আরও দুদিন নার্সিংহোমে রাখতে চাই।'

একটু আগেই নবকুমার এবং স্বপ্না সন্তানদর্শন করে এসেছে। দুজনেই আবেগে টগবগ করছে এখন। ডাক্তারের কথাটা শুনে স্বপ্না আঁতকে উঠল, 'ওমা! কেন? নো ডক্টর, আই অ্যাম ডাইং ফর হিম। এখনই নিয়ে যাই।'

'দুটো দিন ধৈর্য ধরুন না। তদ্দিনে পৃথিবীর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাক। কেমন দেখলেন?'

'একদম স্বপ্নার মুখ বসানো।' নবকুমার জবাব দিল।

'মাতৃমুখী পুত্রসন্তান সুখী হয়।' ডাক্তার জবাব দিলেন।

'নাকটা কিন্তু ওর মতো। ওদের বংশের যা ধারা।' স্বপ্না বলে উঠল, 'রং কেমন হবে ডাক্তার? আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয় করছে কেন?'

'মানলাম আমার আর নবুর ক্রিয়েশন কিন্তু এনভায়রনমেন্টের একটা প্রভাব আছে তো? দশ মাস ওই রোগা-অশিক্ষিত মেয়েটার শরীরে থেকে ও আবার কোনও ব্যাড হ্যাবিট আর্ন না করে বসে!' স্বপ্না শিউরে উঠল।

ডাক্তার হাসলেন, 'শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে একমাত্র মা-বাবার রক্তের কাছেই ঋণগ্রস্ত থাকে। ওই দশ মাস তার স্মৃতি তো চিরদিনের মতোই অন্ধকারে। যেমন ধরুন, নার্সারিতে গেলে দেখতে পাবেন বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি করতে একটা টেম্পরারি বেডের প্রয়োজন হয়। এইটে সেই রকম। দু-দিন পরে আপনাদের সন্তান আপনারা নিয়ে যাবেন, আপনারা যেভাবে মানুষ করতে চাইবেন তাই হবে।'

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। সেই শুঁটকো লোকটা বিড়ি টানছে। ওদের দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে এল, 'সেন সাহেব বলে গেলেন ভালো আছে। আপনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

স্বপ্না বেমালুম জবাব দিল, 'না, ডাক্তার নিষেধ করল। ঘুমাচ্ছে।'

'ও। ছেলে হয়েছে শুনলাম!' লোকটি হাসল।

'হ্যাঁ!' নবকুমার বলল, 'আমরা সব টাকাপয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে সুস্থ হলে নিয়ে যেও। আচ্ছা চলি ভাই।'

'তা তো যাবেন কিন্তু এদিকে যে একটা মুশকিল হয়ে গেল!'

'কি মুশকিল?'

'পেট কাটতে বললেন কেন? একবার পেট কাটলে দু-বছরের মধ্যে পেটে বাচ্চা নেওয়া যায় না। শুনছি সামনের বছর থেকে রেট ডাবল হয়ে যাবে। এক বছর বেকার থাকব, এই ক্ষতিপূরণটা আপনারা করে দেবেন।' লোকটা হাত কচলালো।

নবকুমার স্বপ্নার দিকে তাকাল। স্বপ্না বলল, 'তুমি আবার ওকে ক্যারি করাবে?'

'সেইজন্যেই তো আমরা আছি।'

'বেশ, আমি মিস্টার সেনের সঙ্গে কথা বলব।' ওরা দ্রুত মারুতিতে উঠে বসল।

লিফটম্যান একটা কিশোরীকে দিয়েছে। সে শিশুকে দেখাশোনা করত ওরা বাড়িতে থাকলে। অফিসে বের হওয়ার সময় মিসেস পালিতের ক্রেশে দিয়ে যাবে ওকে। ফেরার সময় নিয়ে আসবে। সমস্যা হল মিসেস পালিত দু-মাসের নিচের বাচ্চাদের রাখেন না। এই দু-মাস কী করা যায়? বারো বছরের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিশোরীকে স্বপ্না বারংবার জিজ্ঞাসা করেছে, সে দু-মাস ম্যানেজ করতে পারবে কিনা! কিশোরী মাথা নেড়েছে। গ্রামের বাড়িতে সে কত শিশুকে ঘুম পাড়িয়েছে। স্বপ্না অবশ্য তাতে ভোলার পাত্রী নয়। সে ডক্টর খাসনবীশের কাছ থেকে শিশুর পরিচর্যা-পদ্ধতি বিস্তারিত লিখে নিয়ে এসেছে। শনিবার-রবিবার তার ছুটি থাকে, অতএব শনিবার সকালেই শিশুটিকে নিয়ে আসা হল।

বাড়িতে যেন উৎসব। নতুন ফ্ল্যাটে শিশুর কান্না, স্বপ্নার ব্যস্ততা, নবকুমারের খুব ভালো লাগছিল। স্বপ্না সমস্ত শরীর একটা সাদা অ্যাপ্রনে জড়িয়ে পাতলা করে বেবিফুড গুলে শিশুর মুখে বোতলটা ধরে বলল, 'সোনামণিটা, খেয়ে নাও।'

শিশু দু-বার ঠোঁট ফোলাল, জিভ ছোঁয়াল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্না খুব নিরাশ হল। নবকুমার বলল, 'ডার্লিং, ঠিক তোমরা স্বভাব পেয়েছে। তুমি যেমন খাবারের নামেই আঁতকে ওঠো—।'

স্বপ্না বলল, 'ডোন্ট বি সিলি। আমাকে ফিগার রাখতে হয়। একে তো খাওয়াতেই হবে। একটু পরে চেষ্টা করব। কি মিষ্টি দেখতে, না?'

'কোলে নিও না। তোমার শাড়ি নষ্ট করবে।'

'করুক।' স্বপ্না আরও ঝুঁকে পড়ল।

তিনটে নাগাদ ডাক্তার ছুটে এলেন। স্বপ্না উদ্‌ভ্রান্ত, নবকুমার কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শিশুটিকে দেখে ডাক্তার বললেন, 'একটু ভুল হয়ে গিয়েছে।'

দু-জনেই একসঙ্গে জানতে চাইল, 'কী?'

'নার্সকে বলে দিইনি যে ওকে যেন মায়ের দুধ না খাওয়ায়। এই ক-দিনে সেই অভ্যেসটা হয়ে যাওয়ায় ও বেবিফুড খেতে চাইছে না।'

স্বপ্না এবং নবকুমার পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সময় বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠতেই কিশোরী বোতলটা মুখে ধরতেই সে প্রতিবাদ করল। এখন আর ওর কান্না থামছে না। স্বপ্না পাগলের মতো ডাক্তারকে একটা রাস্তা বের করতে বলল। এত কষ্টের সন্তান যদি না খেয়ে মরে যায়, তাহলে?

ডাক্তার খাসনবীশ বললেন, 'ব্রেস্ট মিল্ক আর বেবিফুড একসঙ্গে অভ্যেস করাতে হবে। প্রথমটাকে বন্ধ করলে তখন দ্বিতীয়টাকে খেতে আপত্তি করবে না। দেখি কি করা যায়। আপনি বরং একবার এজেন্সিকে ফোন করুন।'

নবকুমার মিস্টার সেনকে ধরল, 'একটি মেয়ে দিন যে আমাদের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারে। মানে বুকের দুধের দরকার।'

মিস্টার সেন টেলিফোনে বললেন, 'দিনে কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'তাই সই।'

স্বপ্না বলল, 'বলে দাও, একটু ভদ্র-সভ্য যেন হয়।'

মিস্টার সেন শুনে বললেন, 'নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। এ রেওয়াজ তো চিরকাল এদেশে আছে।'

দরজা খুলে শুঁটকো লোকটাকে দেখে চমকে উঠল নবকুমার, 'কী ব্যাপার?'

'বুকের দুধ দরকার, সেন সাহেব বলেছেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু—।'

'হাঁটাচলা করছে, সেলাই কেটে দিয়েছে যখন, তখন ওকেই নিয়ে এলাম।'

নবকুমার দেখল নারী কিছু দূরে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। অগত্যা সে ভেতরে আসতে বলল। স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'এত বড় অপারেশনের পর হাঁটাচলা করছ?'

শুঁটকো বলল, 'গরিব মানুষের সব করতে হয়।'

শিশু মাতৃদুগ্ধের স্পর্শ পেতেই আপ্লুত হল। স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নবু, অন্য ঘরে যাও।' নবকুমার দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল। স্বপ্না তাকে অনুসরণ করল, 'একে পাঠানো উচিত হয়নি। নিজের ছেলে বলে ক্লেইম করে না বসে।'

'ব্রেস্ট মিল্ক দরকার যে।' নবকুমার বিড়বিড় করল, 'কনসিভ না করলে যে শরীরে মিল্ক তৈরি হয় না, নাহলে তো তুমিই—।'

'নবু!' ধমকে উঠল স্বপ্না, 'বড্ড স্ল্যাঙ বলছ তুমি আজকাল।'

শিশু ঘুমিয়ে পড়লে শুঁটকো বলল, 'এবার আমরা উঠি।'

'আবার কখন আসবে?'

'রাত্রে তো আসা সম্ভব নয়। তাহলে তো ওকে রেখে যেতে হয়।'

'মাঝে-মাঝেই দরকার হবে যে।'

'তা হবে। তবে খাওয়া-পরা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করলে চল্লিশ টাকা পড়বে।' জানিয়ে দিয়ে শুঁটকো চলে গেল।

নারীর থাকার ব্যবস্থা করে দিল স্বপ্না। শুধু খাওয়ানোর সময় ছাড়া নারী যেন বাচ্চার কাছে না আসে জানিয়ে দিল।

মধ্যরাত্রে শিশু কেঁদে উঠতেই নবকুমার লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল। ওপাশের বিছানায় শোওয়া স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ও কাঁদছে।'

স্বপ্না এবং নবকুমার শিশুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত, শিশু কেঁদে চলেছে। স্বপ্না বলল, 'আজ পাঁচবার খেয়েছে। ওর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট, পাঁচবার খাওয়াবে। এ দেখছি সর্বভুক।'

নবকুমার বলল, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে। ওকে ডাকো না।'

স্বপ্না পাশের ঘরে ঢুকে দেখল নারী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে প্রস্তাবটি নিবেদন করতেই সে মুখ ফেরাল, 'ছিবড়ে করে দিল, ছিবড়ে করে দিল।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল স্বপ্না।

'এর আগে চার-চারটে আমাকে ছিবড়ে করেছে। ওদের মুখে তো বুকের দুধ ছাড়া কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এও আমাকে শেষ করবে। কিন্তু আমার তো দিনে পাঁচবার, কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে আজ।' নারী পাশ ফিরে শুলো।

'কিন্তু ও যে কাঁদছে!' আঁতকে উঠল স্বপ্না।

'কাঁদুক।' নারী আবার ঘুমিয়ে পড়ল।



উনুনের গল্প

ভাতারখাকি বলে বদনামের গল্প যার গায়ে তার কাছে অনেকেই ভনভনিয়ে আসবে এ আর নতুন কথা কি! তবে কিনা একটু আড়াল আবডাল, ধরি মাছ না ছুঁই পানির চোখধারা না থাকলে গাঁয়ে বাস করা যায় না। রাত-বেরাতে কিছু ঘটলে ছেলেপুলের বাপ-মা সংসারী মানুষেরা জিভ নাড়তে পারে না, আবার দিনদুপুরে দেখা পেলেই বুকে বেড়াল আঁচড়ায়।

দৃষ্টান্ত তো ভুরি-ভুরি। মগরা স্টেশনের রেলের ছোটবাবু রসিয়ে হাত ধরেছিল, গেলবার থানার বড়বাবু ওকে জেরা করতে গিয়ে নিজেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বাদলা রাত হলেই ওদিকে পা বাড়ান। অবশ্যি এইসব গল্পগাছার ডানায় আর কতটা জোর, মুখ থুবড়ে একসময় পড়লই। তবে ওই যা, ছাই খুঁচিয়ে আগুন খোঁজার লোকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে। ফরসা জামার তলায় ছেঁড়া গেঞ্জি যেমন জেনেও না জানা হয়ে থাকে তেমনি এইসব নিয়েই দিনরাত দিব্যি কেটে যায়। মুশকিল ঘটল কয়েকটা ঘটনা।

হাত ধরার কয়েকদিনের মধ্যে রেলের ছোটবাবুই লাইন পেরোতে গিয়ে লোকালের চাকায় দু-টুকরো হয়ে গেল। রক্ত আর খুচরো পয়সায় চারদিক থইথই। ক'দিন আগে মাঝরাত্রে যখন আকাশ ঝমঝমিয়ে নামছে তখন ওই বাড়ির সামনে পা পিছলে ছাতি উলটে পড়তে-পড়তে সন্ন্যাস রোগে মুখ বেঁকে গেল পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের। বাঁ-দিকটা অসাড়। দু-দুটো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দারোগাবাবুর যখন-তখন গাঁয়ে ঢোকা বন্ধ হয়ে গেল। চুল্লি জ্বলছে গনগনিয়ে কিন্তু শকুনের দেখা নেই। ভাতার মরলে যদি ভাতারখাকি তবে নাগর মরলে কি? তা একটা নয়, দু-দুটো। সন্ন্যাসে শুয়ে থাকা আর দু-টুকরো হওয়া তো এক কথাই। অতএব ভাতারখাকি হল মরদখাকি। তল্লাটের সেরা মরদ দারোগাবাবুর প্রাণে তাই ভয় ঢুকেছে. তিনি আসেন না, নজরানা যায় ফি-হপ্তায়। এ মন্দের ভালো। সামনে এলে যে সাতপ্যাঁচে অঙ্কটা বাড়ত তা সবাই জানে। তাই ভাতারখাকি বলো আর মরদখাকি বলো, পুরো গ্রামটাকে স্বস্তিতে রেখেছে যে তাকে চোখ রাঙাবে এমন সাধ্যি কার?

চোখ রাঙানো সইতে বয়েই গেছে আতরবালার। এই শ্রাবণে আটাশে পড়ল সে। বাপ নাম রেখেছিল বটে! যে দ্রব্য চোখে দ্যাখেনি তার নামে নামকরণ। ভাতার বলত, 'আমি তোর তাই তুই আতর।' মরে যাই আর কী! এখন দ্যাখো গ্রামটার চেহারা, যেন সবাই নেতিয়ে লেজ নাড়ছে পায়ের তলায়। আতর যদ্দিন আছে তদ্দিন উনুন ভাঙবে না, হাঁড়ি ওলটাবে না। কথাটা সঠিক করে বললে বলতে হয় যদ্দিন ঠমক আছে তদ্দিনই আতরের সামনে লেজ নাড়া। তারপর আর একটা আতর তৈরি হয়ে যাবে ঠিক।

চুল বাঁধতে-বাঁধতে আরশিতে মুখ দর্শন করল সে। রেলের ছোটবাবুর মনটা ভালো ছিল। যদি বলো, বুঝলে কি করে তবে তার উত্তর একটা চাল টিপলেই তা বোঝা যায়। যে পুরুষ সোজা চোখে বুক দ্যাখে অথচ তার দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি হয় না সে মন্দ লোক নয়। মরে যাওয়ার আগে কলকাতা থেকে রেলের ছোটবাবু এক শিশি এনে দিয়েছিল তাকে। হরিণের নাভি থেকে তৈরি আতর। দেওয়ার সময় হাত ধরে বলেছিল, 'এখন মাখিস না। যেদিন আমার ফ্যামিলি থাকবে না কোয়ার্টারে সেদিন মেখে আসিস।' ওই হাত ধরাটা দেখেছিল পাঁচজনে। দু-টুকরো হওয়ার খবর পেয়ে যে কষ্ট হয়নি তা নয়, কিন্তু সে কারণেই শিশিটা খোলেনি এমন নয়। ইদানীং চিবুক বুকে ঠেকালে কেমন

মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগে। এই যে এখন, গরমকাল, দরদরিয়ে ঘাম গড়ায় কপালে গলায়, ডুব দিয়ে এসে গা মুছলেই গন্ধটা যেন জানান দেয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় লাগে। গল্প তো লকলক করছে প্রত্যেকের জিভে। মাঝরাতে মেয়েটা বলে, 'কীসের বাস মা? আতরের?'

ধমকাতে হয় অকারণে, 'হিন্দুঘরের বেধবা, মাঝরাত্তিরে আতর মাখতে যাব কেন?' কিন্তু আতর জানে কথাটা মিথ্যে নয়। একটা গন্ধ বের হয়। কোত্থেকে যে হয় তাই অজানা। ভাতার মরেছে ছয় বছরের মেয়েকে রেখে। তার গলার কাঁটা আবার অন্ধের লাঠি। মেয়ে পাশে শোয় বলে রাতদুপুরে উটকো লোককে ঠেকানো যায়। পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট মোল্লা সাহেব অবশ্যি আসত। এসে বসে থাকত দোরগোড়ায় পিঁড়ি পেতে চুপটি করে। ঘুমন্ত মেয়েটাকে দেখত আর বলত, 'তোর এখন দুটো ঘর দরকার আতর। মেয়ে বড় হচ্ছে হাজার হোক!'

'একলা ঘরে শুয়ে কি করব? আমার ভূতের ভয় লাগে।'

'ভূত! আমি এলে ভূতের বাপের হিম্মত হবে ভয় দেখানোর।'

'আপনি তো বাদলা না হলে আসেন না।'

'এসেই বা কি হবে! এই তো দোরগোড়ায় বসে থাকা!'

মেয়ে ছিল বলেই তো গণ্ডি পার হওয়া সম্ভব হল না এ জীবনে প্রেসিডেন্ট সাহেবের। অবশ্য এখন মরদখাকি বলে নাম ছড়াবার পর কেউ আর সখের বাগান ভাবে না, চোরাবালি বলে এড়িয়ে যায়। নইলে ওই দারোগাবাবুকে এড়িয়ে থাকা যেত? সাত বাচ্চার আধবুড়ো বাপ ধর্মের ষাঁড়ের মতো ধেয়ে এসেছিল প্রায়।

কিন্তু আল পড়ল না হয় বেনোজল ঠেকাতে, দেওয়াল উঠল চৌদিকে চোর-ডাকাত ঠেকাতে, কিন্তু তার নিজের কি হল? এ দেওয়াল যে চৌদিক গ্রাস করে তাকেই নিশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। আটাশ বছর মানে পুরু হলদে সর পড়া দুধ। টানটান সেই সরের ছাতের তলায় গনগনে আঁচে তেতে ওঠা দুধ ছটফটিয়ে মরে। একটু ফাঁক পাওয়ার সুযোগ, অমনি ফিনিক দিয়ে উঠবে। আর সেই বয়সে যার চারপাশে বদনামের লোহার দেওয়াল উঠল কোন মনসার চ্যালা তাতে গর্ত খুঁড়বে?

পান খাওয়া লালচে ঠোঁটে চিলতে হাসি ঝুলল আতরের। মরদখাকি! মন্দ কি? কিন্তু মরদ কোথায়? চারপাশে তাকালে শুধু শেয়াল শকুন নয় নেড়ি। ওই প্রেসিডেন্ট কিংবা দারোগা মানেই তো ওই। রেলের বাবুটার গলায় নরম সুর থাকত। লোকটা বুঝে ওঠার আগেই দুম করে মরে গেল।

তা আটাশ বছর বয়সেও সত্যিকারের পিরীত তো কারও সঙ্গে হল না। ঢলানি করতে হয় গ্রামটার জন্যে, প্রথমে অবশ্যি ছিল নিজের পেট বাঁচানোর তাগিদ, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরো গ্রামের হাঁ বন্ধ করার কারণ। মেয়ে বড় হচ্ছে। আর ক'দিন। তারপর তোমার মনের মানুষ এলেও মনকে চিতায় তুলতে হবে।

এখন তার অকারণে বদনাম ছড়াচ্ছে। ছড়াক যত ছড়াবে, রাতে আঁচল আলগা করে ঘুমানো যাবে। ক'দিন থেকে আবগারির নতুন বাবু তার দিকে তাকায় আবার তাকায় না। এরকম ক্ষেত্রে নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলে আগুনে জল ঢেলে রাখে আতর। কিন্তু ওই মানুষটাকে দেখামাত্রই হাঁটুদুটোয় ঝিঁ-ঝিঁ ধরে, কানে রক্ত জমে। হারানকাকা খবর এনেছে বাবুটির নাম রতন। চাকরিতেও নতুন। স্টেশনে যাওয়ার পথে এর মধ্যে বারতিনেক মুখোমুখি হয়েছে সে। গতকাল গাঁয়ে ঢুকে যে আবগারিবাবুরা শাসিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে রতনবাবুও ছিল। যতবার চোখাচোখি ততবার বুকের মধ্যে পাক খেয়েছে বাতাস। কিন্তু তাতে কার কি? পৃথিবীর কোন ভগবান তাকে নেবে, তার সেরকম ইচ্ছেকে নেবে এবং সেইসঙ্গে ইন্দুকেও? এইটেই তো জ্বালা। চাওয়ার মুখ যার বড় তার পাওয়ার কপাল তো এই একটুখানি।

মায়ের সঙ্গে মেয়েও তৈরি। ঘরে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। একা-একা থাকতেও চায়

না মেয়ে। বাপের স্বভাব। বাপ ভয় পেত ভূত আর পুলিশকে। বাপই নাম রেখেছিল মেয়ের। দেশের মাথা এসেছিলেন ডায়মন্ডহারবারে। তাঁর নামেই নাম। যে মেয়েছেলেকে সারা দেশ ভক্তি আর ঈর্ষা করে তাকে তো কেউ বদনাম দিতে সাহস করে না। সেই মেয়েছেলের স্বামী মরেছে অকালে তবু তো কেউ তাকে বলে না ভাতারখাকি? ইন্দুকে হতে হবে ওইরকম। হেসে ফেলল আতর। কে কাকে খায়? ওসব খাওয়ার জিনিস হল? মরণ!

ইন্দু হাঁটছিল তার মায়ের আঁচল ধরে। এই এক বদ অভ্যেস। হাত ছাড়িয়ে আতর ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'নিজের পায়ে চল। মাথা উঁচু করে হাঁট। এই এরকম। চলতে ফিরতে শুধু আঁচল ধরা!' হাতটা সরিয়ে দিল ঝটকায়। মেয়ে ফ্যালফেলিয়ে তাকাল এবার মায়ের দিকে। কিন্তু তারপরেই সে মায়ের চলা নকল করার চেষ্টা করল। কিন্তু পা ফেললেই মায়ের শরীরে যে নাচন লাগে তা তো তার শরীরে হয় না। হাড়জিরজিরে শরীরের তিন জায়গায় ফেঁসে যাওয়া ফ্রকটা টেনেটুনে নেয় ইন্দু। সকালে পান্তা খাওয়ায় পেট এখন ভারী। ইচ্ছে করেই সে মায়ের কাছ থেকে সরে-সরে হাঁটতে শুরু করে। কাছে থাকলে যা বোঝা যায় না, সামান্য দুরত্ব তা স্পষ্ট করে। যেমন এই মুহূর্তে ইন্দুর মনে হল এই গাঁয়ে মায়ের মতো দেখতে আর কেউ নেই।

দু-পাশে দুটো মজাল পুকুর। মজাল হলেও হাঁটু মুড়লে ওপর থেকে দেখা যায় না। মাঝখানের চওড়া ঢালু জমিটায় রাবণের চিতা জ্বলছে। আহা কি দৃশ্য! দশ হাত দূরে-দূরে দিয়ে শুরু হয়েছিল, প্রয়োজনের চাপে এখন উনুনগুলো ঘেঁষাঘেঁষি হয়েছে। দু-দশটা নয়, বিয়াল্লিশটা, অবশ্য রোজ সবক'টাতে আগুন পড়ে না। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চুল্লুর কারখানা এটা। জন্মইস্তক আতর এই আগুন জ্বলতে দেখেছে। তখন মাল তৈরি হত খুব যত্ন দিয়ে। মাল ফুটিয়ে মাটির হাঁড়িতে মুখ বন্ধ করে হয় মাটির তলায় নয় পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হত ঠিক তিনি হপ্তা। এতে বিষ মারত, স্বোয়াদ বাড়ত। যত জমে তত মজে। তারপর আবার আগুনে তুলে এ-হাঁড়ি থেকে ও-হাঁড়িতে গরমরসের ধোঁয়া পাচার করা হত। সেই ধোঁয়া জমে-জমে যেই রস হয়ে যেত তখন অমৃত তো কোন ছাড়। যত বেশি মজবে তত মাল দামি হবে। কিন্তু এখন দিন পালটেছে। অত সময় নষ্ট করার সময় নেই কারও। পেট খাঁ-খাঁ করছে সবার। এখন ফোটাও ঢালো আর বেচে দাও। তবে হ্যাঁ, এই গাঁয়ের চুল্লু খেয়ে কেউ চোখ উলটেছে এমন বদনাম দেওয়া যাবে না।

সাতসকালেই আজ পনেরোটা উনুন জ্বলছে। কোমরে হাত দিয়ে গুনল আতর। এই উনুন জ্বলা দেখলেই তার যৌবনের কথা মনে পড়ে। ভাতারখাকি। উনুনের কাছে এলেই ভাতারের মুখ মনে পড়ে। রোগা ঢ্যাঙা মাথা মোটা লোকটা। চুল্লুর হাতটাই যা ছিল ভালো। বেচত যত খেত তার কম নয়। রাত্তিরে আতরকে প্রায়ই শবসাধনা করতে হত। পুলিশ দেখলেই চিত্তির হত ওর প্রাণ। চুল্লু বিক্রি করে এক রাত্তিরে ফেরার পথে মাঠের মাঝখানে মরে পড়ে রইল। কে মারল, কীভাবে মরল সে-রহস্য আজও অন্ধকারে। ভাতার মরলে কাঁদতে হয় বলে কেঁদেছিল আতর, কিন্তু কান্নাটা বুক থেকে আসেনি। যা সত্যি তা বলতে ভয় পায় না সে।

বাঁদিকের বেলগাছটার গা-ঘেঁষে যে উনুন সেটাই আতরের। হারান তাতে আগুন জ্বেলেছে সাতসকালে। মাল বেচলে দিনে দশটাকা দিতে হবে এই কড়ার। আঠারো বছরের ছেলেটা খাটতে পারে খুব। তাকে দেখে বলল, 'আজ হাওয়া খারাপ।'

আতর চোখ ছোট করল, 'কেন?'

'হারু সেপাই এসে বলে গেছে উনুন না জ্বালতে আজ।'

'কেন?'

'তা জানি না।'

ওপাশ থেকে শিবুকাকা এগিয়ে এল, 'হারু ভাঙতে চাইল না কিন্তু মন কু গাইছে বড়। একবার থানায় গিয়ে খবর করলে বড় ভালো হত।'

উদাসী মুদ্রা আনল হাতে আতর, 'যান না, পেটের দায় তো সবার।'

'আমরা গেলে তো দোর থেকেই ভাগিয়ে দেবে। নইলে কি যেতাম না ভাবছ?'

অনুরোধ বললে কম হবে, প্রায় কাকুতিমিনতি শুরু হয়ে গেল চারপাশ থেকে। যে পূজার যা মন্ত্র। কানাই জেঠা বলল, 'তুমি হলে গিয়ে মহাশক্তি, তুমি না গেলে অসুরদমন হবে কি করে? আজ বিকেলের মধ্যে মালগুলো পাচার করতে পারলে না হয় দু-দিন বিশ্রাম নেওয়া যায়, কি বলো সবাই?'

চিন্তিত মুখগুলো নড়েচড়ে দ্রুত সায় দিতে লাগল। এইরকম পরিস্থিতিতে আতরের নাকের পাটা বড় কাঁপে। হাঁটুর ওপরটা ভারী হয়ে যায়। রাজেন্দ্রাণীর মতো সে অকাল চারপাশে, একটাও মানুষ নেই—যেন এই জীবসকলের দায়িত্ব একমাত্র তার। সে পুকুরের দিকে মুখ ফেরাল। তারপর সন্ধানী চোখে জরিপ করে বলল, 'জলের তলায় সাতটা আছে?'

কানাই জেঠা বলল, 'হ্যাঁ, আজ সকালেই রেখেছি।'

'দু-ঘণ্টায় যা হওয়ার হয়ে গেলে সবক'টাকে জলের তলায় পাঠানো হোক।'

হারান মাথা নাড়ল, 'এতে বড় বদনাম হয়ে যাচ্ছে বাজারে। এর পরে লোক মাল নিতে চাইবে না। খদ্দের বলছে সরেশ হচ্ছে না।'

সরেস! যে দেশে মেয়েছেলে নেই সে-দেশে হিজড়েও মহারানি। থুতু ফেলল আতর, 'মাল না গেলে তো হাওয়া চাটবে মিনসেগুলো। একদিন সরেস না পেলে চলবে। আগে হাওয়াটা বুঝে আসি। কে যাবে আমার সঙ্গে?'

কেউ মুখ খুলছে না। খুলবে না জানত আতর। দারোগাবাবুর সামনে গেলে সব দু-মাসের শিশু হয়ে যায়। এবং এইটেই চাইছিল সে! হেঁকে বলল, 'যেতে পারি, কিন্তু উনুন প্রতি একটা করে টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন!'

পারিশ্রমিকটা বড়ই ন্যায্য। যেতে আসতে তো একটা টাকাই বাস ভাড়া লেগে যায়। আপত্তি না করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। আতরের চোখে নির্দেশ ঘুরতেই হারান হাত পাততে লাগল উনুনে-উনুনে ঘুরে। চারপাশে এখন ম-ম করছে হাঁড়ির বাষ্পের গন্ধ। আঃ! আতর তাকিয়ে দেখল তার তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ইন্দু সেই গন্ধ নাকে টানছে। তার চোখ বড় হল, 'অ্যাই, খেলতে যা, এখানে কি?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে যাচ্ছ!'

'একি মেয়েরে বাবা! যেখানে যাচ্ছি সেখানে এক তান্ত্রিক বসে আছে, বাচ্চা মেয়ে পেলেই ছাগল তৈরি করে মাঠে ছেড়ে দেয়।'

'আর বড় মেয়ে পেলে?'

হোঁচট খায় আতর, 'সেটা পেলে কি করে তাই দেখতে যাচ্ছি।'

'যদি তোমাকেও ছাগল বানায়?'

'কেটে মাংস খাবে। এমনিতেই তো নোলা ঝরছে। যা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়ি যাবি না। আর খবরদার, পুকুরে নামবি না।'

বারোটা টাকা পাওয়া গেল। বাকি সব ট্যাকখালির জমিদার। এখন এ নিয়ে কচলাকচলি করে কোনও লাভ নেই। টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে রওনা হল আতর। সিকি মাইল কাঁচা রাস্তা পার হলে তবে বাসের দেখা মেলে। অন্তত তিনজনকে কৈফিয়ত দিতে হল এরই মধ্যে। কোথায় যাচ্ছে সাতসকালে তা জেনে যেন মানুষগুলোর স্বস্তি হচ্ছে না। একটু নির্জনে পড়ামাত্র পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজল। সরে যেতে-যেতে দেখল আরোহী দু-পায়ে ব্রেক

কষেছে, 'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'এই একটু, কাজে।' আতর ঠিক বুঝতে পারছিল না তার দাঁড়ানো উচিত কিনা।

'কাজটা কোনদিকে?'

'থানায়।'

'অ। তা এখনও অনেকটা হাঁটতে হবে বাস ধরতে হলে।'

'তাই তো হয়।'

'কথাটা হল কি, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক আলাপটালাপ নেই। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। অবশ্য ইচ্ছে হলে জবাব দেবে নইলে নয়।'

আতর লোকটার দিকে তাকাল। তিরিশের গায়েই বয়স। শহরে থাকে। সেখানে নাকি বই বাঁধাই-এর দোকান আছে। ইদানীং গাঁয়ে আসেই না। প্রেসিডেন্ট সাহেব বিছানায় পড়ার পর আসা-যাওয়া বেড়েছে। বাপের সম্পত্তি হাতাবার সুযোগ কেউ ছাড়ে না। আতর মুখ ঘোরাল, 'পথে দাঁড়িয়ে তো আর জবাব দেওয়া যায় না। সময়ও নেই।

'ঠিক কথা। সময় আমারও নেই। অবশ্য এক কাজ করতে পারো। আমার ক্যারিয়ারে চেপে বসো। পথটাও কমে যাবে, কথাটাও শেষ হবে।'

'আমি কারও বোঝা হতে চাই না।'

'বোঝা মনে করলেই বোঝা। উঠে এসো, অসম্মান হবে না।'

'পাঁচজনে দেখলে কুগল্প রটবে।'

'দ্যাখো বাবা, কে কি বলল তাতে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কারও খাই না পরি? অবশ্য নিজেরটা তুমি ভাবতে পারো।'

'গল্পে তো ডুবে আছি, আর কত গল্প লাগবে শরীরে!' রাস্তাটাও কম নয়। আতর উঠে বসল ক্যারিয়ারে।

প্যাডেল ঘুরিয়ে টাল সামলে প্রশ্ন করল, 'আমার নামটা জানো?'

'জানি।'

'অবশ্য বিয়ের পর যখন তুমি গাঁয়ে এলে তখন থেকেই আমি কলকাতায়।'

'কি প্রশ্ন ছিল?' সিটের পেছনে দুটো গোল রিঙে আঙুল শক্ত করে বসেছিল আতর। ভয় হচ্ছিল শাড়ি না জড়িয়ে যায় সাইকেলের চাকায়।

'বাপ কি তোমার কাছে যেত?'

বুকের ভেতর ছ্যাঁকা লাগল আতরের। মোল্লা সাহেবের সুপক্ক মুখখানা মনে পড়ল।

'উত্তরটা চাই। অবশ্য দিতে ইচ্ছে করলে।'

'তিনি দেখা করতেন।' কথাটা বলামাত্র শরীরের সেই বিশেষ গন্ধটা নাকে লাগল আতরের।

'ঠিক কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'উনি গল্প করতে ভালোবাসতেন।' সামনে বসা লোকটা কি গন্ধটা টের পাচ্ছে?

'কী গল্প?' যেন স্পষ্ট নাক টানল লোকটা। মুখ ফিরিয়ে দু-পাশের গাছ দেখল।

'এই সেই।' কথাটা বলে যেন প্রাণপণে নিজের রোমকূপ ঢাকতে চেষ্টা করল আতর।

'আর কিছু?'

'না।' এবার যেন গন্ধটা কমছে। নিশ্বাস সরল হয়ে এল আতরের।

'বাদলার রাত্রে কি তোমার ঘরে ঢুকেছিল?

'না।'

'অ। তা সবাই বলছে তোমার জন্যেই তার শরীর পড়েছে!'

'পিতৃতুল্য লোকের সম্পর্কে কুকথা বলতে নেই।'

'পিতৃতুল্য?'

'নয়তো কি? আমার বয়স আর তার বয়স?'

কথা বলতে-বলতে আতরের চোখ এড়াল না পথচারীদের দিকে। সবাই হাঁ হয়ে দেখছে।

'তুমি যাই বলো, আমার বাপের মেয়েছেলে দোষ ছিল। যদি তোমাকে বিয়ে করত—।'

'আমি করতাম না।'

'কেন? গ্রামের প্রেসিডেন্ট। চোলাই ছাড়াই ভালো চলে।'

'বুড়ো-হাবড়াকে মন দেব এমন ছাতাধরা মন নাকি আমার?'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপচাপ চালানোর পর আবার প্রশ্ন, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্য নয়?'

'শহরের মানুষেরা শুনেছিলাম বুদ্ধিমান হয়।'

'হুঁ। বাসের রাস্তা এসে গেছে। তা থানায় কেন?'

'পেটের ধান্দায়।' বলে নেমে পড়ল আতর। তাকে নামতে দেখে লোকটাও। আতর চারপাশে তাকাল। বাসের জন্যে অনেকেই দাঁড়িয়ে। তাদের গাঁয়েরই কেউ-কেউ। আর একটা গল্প জিভে-জিভে জন্ম নিচ্ছে। নিক। সে হেসে বলল, 'আবার কেন, বললামই তো, মোল্লা সাহেব খুব ভালোমানুষ ছিলেন।'

'ছিলেন? বাপ কিন্তু এখনও মরেনি। শোনা কথা যাচাই করে নিচ্ছিলাম। তুমি কিছু মনে করো না। পেটের ধান্দায় থানায় কেন?'

তোমার বাপেরও কিছু ছিল না, তোমারও না। বলতে গিয়ে থমকে গেল আতর। গাঁয়ের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোনও কর্তব্যটা করেছে লোকটা? এতগুলো উনুন জ্বলে কিন্তু দারোগাবাবুর সঙ্গে তো লড়াই করতে যায়নি। তার ছেলের মুখের প্রশ্নের জবাব দেবে কেন সে?

তবে লোকটার বোধবুদ্ধি আছে। জবাব না পেয়ে হাসল। বলল, 'তোমার হিম্মত আছে। খুব ভালো। তিনটে নাগাদ ফিরব। যদি আসো তো ক্যারিয়ারে চাপতে পারো।' বাস দেখা যাচ্ছিল। আতর উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

ইন্দুদের দলে নয়জন। প্রায় সমবয়সি সবাই আর একটু বাড়লেই তো ওপাশের উনুনের কাজে লেগে যেতে হয়। পুকুরের উলটোদিকে ওই নয়জন উনুন সাজাচ্ছিল। খেলার উনুন। তিন পাথরের খাঁজে কল্পিত আগুন গুঁজে এই খেলা শুরু হয়। ঠিক যেমন বড়রা করে তেমন করেই খেলা ওদের। খেলতে-খেলতে ব্যাপারটা প্রায় নিখুঁত হয়ে এসেছে। পাঁচ থেকে নয়ের মেয়েগুলোর লিকলিকে শরীর, ছেড়া জামা আর উদোম গায়ের ইজের পরা ছেলের দল সেই খেলায় অংশ নেয়। নকল উনুনে কল্পিত আগুন জ্বলে, পাতার হাঁড়িতে স্বপ্নের রস ফোটে। সেই পাতা পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয় যত্ন করে। নিয়মের কোথাও ভুল নেই। অনেক দূরের সত্যিকারের উনুনগুলোর দিকে পেছন ফিরে এরা নাক টানে, 'আঃ কি বাস, না রে!' তারপর দিনের শেষে যেযার হাঁড়ি নিয়ে শহরে চুল্লু বিক্রি করতে যাওয়ার নাম করে যখন ঘরে ফেরে তখনই খেলা শেষ। কিছুদিন হল এই খেলায় কর্ণধার হল ইন্দু। বাকিরা বোধহয় দেখেছে ওর মায়ের প্রতাপ কীভাবে তাদের বাপকাকারা মেনে নিচ্ছে। হয়তো সেইটেই কাজ করছে ইন্দুর নেতৃত্ব মানতে।

নয়জনের দলটা জড়ো হতেই ইন্দু গালে হাত রাখল, 'সব্বোনাশ হয়েছে!'

কচি মুখগুলো অবাক হল, 'কী হয়েছে রে?'

'মা গেছে থানায়। হারু সেপাই বলে গেছে উনুন না জ্বালতে।' ইন্দু জানাল।

'জ্বললে কি হবে?' সবচেয়ে যে কচি তার প্রশ্ন।

'জ্বাললে কি হয় জানো না? মাঝে-মাঝে ওদিকে যখন পুলিশ হামলা করে তখন কি হয়

দ্যাখো না?' ইন্দু ঝাঁঝিয়ে উঠল।

বড়সড় একজন বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল, ও দ্যাখেনি। শেষবার হয়েছিল এক বছর আগে। ও তখন আসত না।

ইন্দু বলল, 'এলে হাঁড়ি ভাঙে, সব রস পুকুরে ঢেলে দেয়, মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করে। যাকে পায় তাকেই কোমরে দড়ি বেঁধে মারতে-মারতে নিয়ে যায়।'

'তাহলে কি হবে?' আর একজনের উদ্বেগ।

'মা গেছে থানায়। আমার মা তো কখনও হারে না।'

কিছুক্ষণ গজর-গজর হওয়ার পর নতুন খেলাটা জন্ম নিল। ন'জনের মধ্যে চারজন হয়ে গেল থানার দারোগাবাবু, হারু সেপাই এবং দুই বন্দুকধারী। বাকি পাঁচজন যখন উনুন জ্বালবে রস ফোটাবে তখন পুলিশরা ছুটে আসবে রে-রে করে। উনুন ভাঙবে, হাঁড়ি ফাটাবে, রস ফেলবে জলে। শোনামাত্র উত্তেজনা বাড়ল শীর্ণ শরীরগুলোতে। বৈচিত্র্যে কার না আনন্দ হয়। চারজন চলে গেল পুকুরের ওপাশে ঝোপের আড়ালে। পাঁচজনে যখন রস ফোটাতে আড়চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে তখনই হইহই করে ছুটে এল তারা। গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে সেগুলো ঘোরাতে-ঘোরাতে মুখে চিৎকার ছোটাল। খুশিমুখে এই পাঁচজন অমনি সরে দাঁড়াল। যাত্রা দেখার মতো ওরা ভাঙচুর হওয়া দেখল। ইন্দু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দারোগা, তুই হাসছিস কেন?'

ঢ্যাঙা ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'দারোগা হাসে না? সেবার দারোগাবাবু এসেছিল তোদের বাড়িতে, আমি হাসতে দেখেছি।'

কথাটা শোনামাত্র মনে পড়ল দৃশ্যটা। মাকে জেরা করতে-করতে দারোগাবাবু খুব হেসেছিল। চেয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল খেয়েছিল। কিন্তু তবু ঠিকঠাক হচ্ছে না। খেলাটা কিছুতেই জমছে না।

আতরকে দেখে দারোগাবাবুর মুখে কোনও ভাবান্তর হল না। ঘরে দুটো সেপাই আর একটা গুঁফো লোক দাঁড়িয়েছিল। আতর যে ঘরে ঢুকেছে তা তিনজোড়া চোখের ঘুরুনিতে বোঝা গেলেও দারোগাবাবুর কোনও বিকার হল না। শেষপর্যন্ত বাজখাঁই গলায় বিরক্তি ঝরল, 'কি চাই? এরা সব হুটহাট করে ঘরে ঢোকে কি করে? অ্যাই সেপাই, সেপাই?' থানায় ঢোকার আগে তিরিশ পয়সার পানে ঠোঁট লাল করেছিল আতর। দারোগার কথায় সেই লালে মোচড়। বাঁ হাত কোমরে রেখে চোখ ছোট করল সে, 'কথা ছিল!'

'কি কথা?'

'পাঁচজনের সামনে বলতে বললে বলতে পারি!'

দারোগা চট করে গুঁফো লোকটাকে দেখে নিল, 'আপনারা একটু বাইরে যান তো ভাই। ইনফর্মার। বুঝতেই পারছেন। যাও, এঁকে নিয়ে পাঁচ মিনিট পরে এসো।' শেষের নির্দেশ সেপাইদুটোকে। ঘর ফাঁকা হলে দারোগার গলায় খিবক্তি ঝরল, 'কি মতলব?'

চেয়ারে বসার খুব লোভ হচ্ছিল আতরের। কিন্তু পায়ে কোথায় যে আটকায়, সে হাসল, 'আমরা তো সব ঠিকঠাক দিচ্ছি তবে আবার এ ঝামেলা কেন?'

'কীসের ঝামেলা?'

'আজ আবার হামলা হবে বলে শুনলাম!'

'কে বলেছে?' দারোগার চোখ ছোট হয়ে এল।

মাথা নাড়ল আতর, 'খবর তো হাওয়ায় ভাসে। জামাই আদরে আপনাকে পুষছে গাঁয়ের

লোক, তারপরেও?' হারু সেপাই-এর নাম বলে ভবিষ্যতে খবর পাওয়ার পথটা বন্ধ করার মতো বোকা সে নয়।

'পুষছে—কি কথার ছিরি! ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না?'

'ছোটলোকের মুখে বড়লোকের কথা কি করে আসবে?'

'বড্ড বাজে বকো। প্রেসিডেন্টকে কি করেছিলে?'

'আমরা কি কিছু করি? তেনারা নিজেরাই নিজেদের করে থাকেন।'

'বড্ড ঝোলাচ্ছ আমাকে। শালা রেলের ক্লার্কের সঙ্গে মাজাকি করতে পারো, আর আমার জন্যে দরজা খুলতে তোমার বুকে বাত ধরে যায়। লোকে বলছে তোমার ছায়ায় গেলে নাকি দুর্ঘটনা ঘটবে, তাই নাকি?'

'তাহলে আর আসবেন কেন? তবে কারও দুর্ঘটনা ঘটার আগে আমার শরীরে চাঁপার গন্ধ বের হয় এমনি-এমনি। দেখুন-দেখুন।

টেবিল ঘুরে কনুইটা সে নিয়ে গেল দারোগার নাকের সামনে। পুলকিত দারোগা নাক টেনে বলল, 'আঃ কি মেখেছ? আতর?'

'না, রক্তের গন্ধ। আজ হামলাটা বন্ধ করুন।'

তখনও বোধহয় গন্ধটা শরীরে, দারোগা ঘনঘন মাথা নাড়ল, 'দূর, কে তোমাদের গুল মেরেছে! পুলিশ নিয়ে গাঁয়ে ঢোকার কোনও প্ল্যানই নেই। আজ রাত্রে আমি যাব একা-একা, মেয়েটাকে সরিয়ে রেখো। কি মেখেছ গো?'

মদ খাওয়া ঢোল মুখের দিকে তাকিয়ে আতর বুঝতে পারছিল না লোকটা সত্যি বলছে কিনা। হারু সেপাই কি তামাশা করতে অদ্দুর হেঁটে গেল? সে যে সন্দেহ করছে তা দারোগার নজরে পড়ল, 'রাতের উত্তরটা পেলাম না।'

হাসল আতর, 'বেশ তো, আপনার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমার মেয়ের সঙ্গে তখন খেলা করবে।'

'অ্যাঁ!'চোখ বড় হয়ে গেল দারোগার, 'গেট আউট। গেট আউট। আমার ফ্যামিলি নিয়ে ইয়ার্কি!'

আতর বাইরে বেরিয়ে এল। গুঁফো লোকটা তার দিকে তাকাচ্ছে। সে থানার বাইরে এসেই দেখল পাশের চায়ের দোকান থেকে সুড়ুৎ করে চলে এল হারু সেপাই, 'কি বলল শালা? ঠান্ডা করতে পারলে? করে লাভ নেই। কাল ওর বাবারা এসেছিল। টাকা দাও বলে খবরটা দিয়েছি। নাম বলনি তো?'

'না। বাবারা মানে?'

'ওপরতলার অফিসার। দারোগার কিছু করার নেই। গাঁয়ে গিয়ে উনুন নেভাও।'

বাস ধরার আগেই কেবলরামের সঙ্গে দেখা হল। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় চুল্লুর সাপ্লাইয়ের ডানহাত। কেবলরাম অনুযোগ করল আতরের গাঁয়ের মাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মালিক বলছে এইরকম চললে বাজার নষ্ট হবে। কিছুক্ষণ বকর-বকর করতে হল লোকটার সঙ্গে। কেবলরাম আরও খবর দিল, কয়েকটা চুল্লুর আড়তে নাকি এ সপ্তাহে রেইড হবে। ব্যাপারটা সামলানো যাচ্ছে না।

অতএব কিছু করার নেই। দু-ঘণ্টা দাঁড়াবার পর বাসে উঠে আতর ঠিক করল গাঁয়ে গিয়ে জানান দেবে যা হয়েছে, এবার উনুন নেভাও। দিনদুয়েক হাত-পা গুটিয়ে বসা যাক। বাস থেকে নামতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলে ঠেস দিয়ে। ওকে দেখামাত্র এগিয়ে এল, 'এক ঘণ্টা আগেই চলে এসেছ। আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না নাকি?'

'না-না, আমার খুব তাড়া।'

'ও। চলো তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

আতর ভাবল ভালোই হল। পায়ে হেঁটে যতটা, তার সিকি সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাইকেলে। কিন্তু ওকি, ক্যারিয়ারে মালের বস্তা যে! দৃষ্টি লক্ষ করে সে বলল, 'ওসব কিনতে হল বাপের সেবার জন্যে। তুমি এই রডে উঠে বসো।'

আতর চারপাশে তাকাল। বাস স্টপের দশগন্ডা মানুষ ওদের দিকে তাকিয়ে। সবক'টা চোখ এখন ছোবল মারছে। সাহস আছে মানুষটার। সাহসী লোকদের চিরকালই পছন্দ আতরের। অতএব সে রডে চেপে বসল। দু-পাশে দেওয়ালের মতো দুটো সবল হাত হ্যান্ডেল চেপে ধরেছে। সিঁটিয়ে বসতে চেয়েছিল আতর, ধমক খেল, 'ও ভাবে বসলে পড়ে যাব।'

পাঁই-পাঁই করে সাইকেল ছুটল। জনসাধারণ কথা বলার সুযোগটি পর্যন্ত পেল না ওই মুহূর্তে। প্যাডেল ঘোরাতে নাক টানল সে, 'আঃ, নামকরণ সার্থক! কি মেখেছ?'

'কিছু মাখিনি।' এখন শরীরে শরীরের স্পর্শ হঠাৎ গায়ে কাঁটা ফোটে কেন?

'যাঃ, মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।'

'ওটা এমনি-এমনি বের হয় শরীর থেকে।'

'যাঃ!'

'মন ভালো হলে বের হয়।' এবার হাসল আতর।

ব্রেক কষল সে। হ্যান্ডেলের ওপর আচমকা ঝুঁকে পড়তে-পড়তে নিজেকে সামলালো আতর, 'কি হল?'

চোখ ফেরাতেই প্রশ্ন শুনল, 'এখন তোমার মন ভালো?'

কি বলবে আতর। মুখ নামাল। আর সেই সময় গোঁ-গোঁ করতে-করতে তিনটে জিপ ধুলো উড়িয়ে খোয়া পথ অন্ধকার করে ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। পুলিশ।

ছটফটিয়ে উঠল আতর, 'তাড়াতাড়ি চালান। সর্বনাশ হয়ে গেল! পুলিশের জিপ গেল— হাঁড়ি ভাঙবে, কোমরে দড়ি পরাবে।' চোখে অন্ধকার দেখল আতর।

'অ। কিন্তু তুমি গিয়ে কি করবে? পুলিশ চলে যাক তারপর গাঁয়ে ফিরো।'

'না, না। আমি ছাড়া কেউ ওদের সামলাতে পারবে না।'

'একটা কথা বলি, এসব নোংরা কাজ ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দেব?' হাঁ হয়ে গেল আতর।

মাথা নাড়ল সে, 'আমার ওপর ভরসা করতে পারবে?'

এই নির্জনে সাইকেলের রডে বসে কেঁপে উঠল আতর। দূরের ধুলোর ঝড়টা এখন মাঠের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সে বলল, 'পরের কথা পরে, আগে আমি গাঁয়ে ফিরব।'

প্যাডেল ঘোরাতে-ঘোরাতে সে নাক টানল, 'যাচ্চলে! গন্ধটা নেই, কি করে হল?' জবাব দিল না আতর। নিজেকে তখন শাপমুন্যি করছে সে। কেন দেরি করল অকারণ? কেবলরামের সঙ্গে কথা শেষ করে দু-দুটো ভিড় বাস কেন ছেড়ে দিল? কেন সময়টাকে তিনটের কাছাকাছি আনতে চাইছিল? এই সময় সে খেয়ালই করছিল না দুটো হাত হ্যান্ডেল ধরে রেখেও ব্যবধান কমিয়েছে। তার শরীরের অনেকটাই চালকের স্পর্শের মধ্যে। তার চোখ শুধু গাঁয়ের পরিচিত দৃশ্যগুলো খুঁজছিল। এবং তখনই চিৎকার চেঁচামেচি কানে এল যখন সাইকেল ব্রেক কষল। সে লাফিয়ে নামতে গিয়ে দেখল পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরেছে। নিজেকে সামলাবার সময় চালক বলল, 'আমি কাল অবধি গাঁয়ে আছি। ভেবে দ্যাখো।'

'নয়জোড়া চোখ ঝোপের আড়ালে রোগা শরীর লুকিয়ে দৃশ্যটা দেখল। তিনটে জিপ থেকে পনেরোটি পুলিশ নামল রে-রে শব্দ করে লাঠি উঁচিয়ে। কয়েকজন বন্দুক তুলল। ফটাফট হাঁড়ি

ভাঙছে। চিৎকার চেঁচামেচি সমানে চলছে। কেউ-কেউ মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছিল পালাবার জন্যে। তাদের টেনেহিঁচড়ে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সিঁটিয়ে ছিল নয়টি শীর্ণ শরীর। বেধড়ক মার চলছে একতরফা। কয়েকজন পুলিশ যখন নেমে এল পুকুরধারে তখনই ছুটে এল আতরবালা। চিৎকার করে দু-হাত তুলে এলোচুলে আঁচল মাটিতে লুটিয়ে সে যখন দারোগার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন আটজোড়া চোখ বন্ধ হয়ে গেল ভয়ে।

দুই পুকুরের মাঝখানের মাঠ এখন শ্মশান। ভাঙা হাঁড়ি, আধনেভা উনুনের ধোঁয়া আর রসের গন্ধ ছাড়া সেখানে একটি প্রাণের অস্তিত্ব নেই। গাঁয়ের সমস্ত মানুষ বসে আছে রাস্তার পাশে আহতদের ঘিরে। এবারে পুলিশ কারও কোমরে দড়ি পরায়নি। হাতের সুখ করার পর বলে গেছে আবার যদি উনুন জ্বলে তাহলে বাকিটুকু করবে। কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তাদের ছিলও না। যাদের মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টেম্পো ডাকতে লোক ছুটেছে বাস স্টপে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর ভিড় বেড়েই চলেছে। উপুড় হয়ে শুয়েছিল আতর। তার শরীর ছেঁড়া শাড়িতে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাঝে-মাঝে কাঁপছে শরীরটা। কিন্তু নিতম্বের স্ফীতি, পায়ের খোলা গোছের ওপর নজর পড়ছে দর্শকদের। এই সময় সাইকেল চালক এসে দাঁড়াল তার পাশে। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি লাভ হল? বারণ করেছিলাম শুনলে না!'

মাটিতে মুখ গুঁজে আতর শরীরের যন্ত্রণা ঢাকতে-ঢাকতে তখন অন্য একটা গন্ধ আবিষ্কারে বিভোর ছিল। পৃথিবীর শরীরের এমন গন্ধ বের হয় তার জানা ছিল না। প্রশ্ন শোনার পর সে দুলে উঠল। এবং তারপর হঠাৎ সে সশব্দে কেঁদে উঠল উপুড় হয়েই। লোকটার হাত তার পিঠে পড়ার পরও কান্নাটাকে সে থামাতে পারছিল না।

যত মানুষ মার খেয়েছিল তত মানুষই হাসপাতালে গেল না। টেম্পো আসার আগেই বেশির ভাগ উঠে গেল নিজের ঘরে। শরীরের যন্ত্রণার চাইতে হাঁড়ি ভাঙার বেদনা এখন বড় হয়ে উঠেছে। এ কেমন বিচার, প্রতি মাসে টাকা নিচ্ছ অথচ মারার সময় সেটা খেয়াল থাকছে না? কেউ-কেউ বলল, এ দারোগার কর্ম নয়। সে এসেছিল ওপরওয়ালার চাপে বাধ্য হয়ে। তবে আতর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন সুযোগটা হাতছাড়া করেনি এই যা। তখন অবশ্য দৃশ্যটা দেখার মতো সময় ছিল না কারও। প্রত্যেকেই জান বাঁচাতে ছুটছিল। তবে নজরে যে একেবারেই আসেনি তা নয়। আতরের শাড়ি ছিঁড়েছে, জামা টুকরো-টুকরো করেছে দারোগা। এখন কেউ বুঝতে পারছে না সে থানায় গিয়ে দারোগাকে কি বোঝাল?

এতগুলো মানুষের পেটে ভাত যায় যে কাজের জন্যে সেটাই যদি বন্ধ হয়—! শোনামাত্র কেউ-কেউ ধমকালো, বন্ধ হতে যাবে কোন দুঃখে? কালবৈশাখী হয় বলে কি কেউ রাস্তায় বের হয় না?

গুলতানির ফাঁকেই আহতরা সরে পড়ছিল। যাদের উপায় নেই নড়নচড়নের তারাই পড়ে মাটিতে। আতরের পাশে মোল্লা সাহেবের ছেলে তখন বসে। মানুষজনের জিভে রস জমছিল। একজন জানতে চাইল, 'খুব চোট লেগেছে মনে হয় আতরের। অ আতর!'

মোল্লা সাহেবের ছেলে বলল, 'চোট না পেলে কোনও মেয়েছেলে এভাবে শুয়ে থাকে?'

'তা বাবা; মেয়েছেলের শোওয়ার কি কোনও ভাব আছে? আমি তো আজও ঠাওর করতে পারলাম না। তা তুমি যাবে নাকি ওর সঙ্গে হাসপাতালে?'

'আপনারা যখন যাবেন না তখন আমাকেই যেতে হবে। আপনাদের বাঁচাতে বোকা মেয়েটা—'

মোল্লা সাহেবের ছেলে কথা শেষ না করে টেম্পো দেখে উঠে দাঁড়াতে সবাই নিজেদের চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখল। শুয়ে থাকা মানুষদের তুলে নিয়ে যখন টেম্পো চলে গেল তখন ইন্দু পেছন-পেছন ছুটছে।

ইন্দুর কান বাঁচিয়ে গুলতানিটা হচ্ছে না। সবই শুনতে পাচ্ছে সে। মোল্লা সাহেবের ছেলে আতরের পিঠে হাত রেখেছে, টেম্পোতে উঠেছে সর্বসমক্ষে। কেউ বলল, ওদের নাকি এক সাইকেলে আসতে দেখা গেছে। দারোগা তো হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছে। আর সেটা জানার পরেও এত কাণ্ড! সন্ন্যাস রোগে বাপ পড়েছে, ছেলের এবার কি হয় তাই দ্যাখো! কুলকুচি করা জল কেউ মুখে তোলে? অবশ্য একথাও অনেকে স্বীকার করল, আতর যদি তখন ছুটে না যেত তাহলে পুলিশ সবকটাকে সদরে চালান দিত।

মানুষজন যখন যেযার ঘরে ফিরে গেল তখনও ইন্দু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার খুব রাগ হচ্ছিল মায়ের ওপর। যাওয়ার আগে মা তার সঙ্গে একটাও কথা বলে গেল না। কিন্তু মোল্লা সাহেবের ছেলের হাতটা চেপে ধরেছিল। কেন? ওকে তো মা চেনেই না। যদিও লোকটা টেম্পোতে উঠে চিৎকার করে তাকে বলেছিল, 'খুকি, ভয় পেয়ো না, তোমার মা ওষুধ নিয়ে আজ রাত্রেই ফিরে আসবে,' তবু তার রাগটা শরীর জুড়ে ছিল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইন্দু দেখল দূরে তার আট খেলার সঙ্গী বসে আছে দঙ্গল পাকিয়ে। আট জোড়া চোখ দমবন্ধ করে নাটক দেখছিল এতক্ষণ। ওদের কাউকে তো টেম্পো নিয়ে যায়নি হাসপাতালে।

আজ রাত্রে যদি মা না ফেরে তাহলে সে কার কাছে থাকবে? কি দরকার ছিল মায়ের ওভাবে ছুটে যাওয়ার?

আটজনের একজন নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন সব শান্ত। শুধু বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে রসের গন্ধে। পুকুরে লুকিয়ে রাখা হাঁড়িগুলো নিয়ে গেছে গ্রামের লোক পুলিশ চলে যাওয়ার পর। উনুনের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার পরও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হঠাৎ সেই শিশু তার ভাঙা ডালের লাঠি আকাশে উঁচিয়ে ছুটে গেল দুই পুকুরের মাঝখানে। তার মুখে জিপের ইঞ্জিনের শব্দ। কাছাকাছি পৌঁছে সেটা সরু হুঙ্কারে পরিণত হল। এবং সেই সঙ্গে এলোপাথাড়ি আঘাত করল কয়েকটা ভাঙা হাঁড়িতে, যেমন পুলিশরা করেছিল।

দৃশ্যটা দেখামাত্র আর একজন উদ্বুদ্ধ হল। এবং তারপরেই দেখা গেল পুরো দলটা পুলিশ হয়ে ভাঙা হাঁড়িকে আরও টুকরো করছে। কিন্তু এ খেলায় বেশি মজা নেই। আটজনের দলটা দুটো ভাগে আলাদা হল। চারজন চলে এল গাছের এপাশে লাঠি হাতে। তারা পুলিশ। ঢ্যাঙা ছেলেটি নেতা। অন্য চারজন ধোঁয়া বের হওয়া উনুনে ভাঙা হাঁড়ি চাপাল। এই প্রথম সত্যি-সত্যি মনে হচ্ছে খেলাটা। হাঁড়িতে তখনও রস গড়ানো আছে। চোখেমুখে ধোঁয়া লাগায় খেলার চেহারাটা আরও আন্তরিক হল। এই সময় গাছের আড়াল থেকে জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ উঠল। তারপরই চারজন লাঠি আকাশে ঘুরিয়ে লাফিয়ে পড়ল, 'মার শালা, ধর শালা' চিৎকারে। তাণ্ডবটা শুরু হওয়া মাত্র দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে ইন্দু ছুটে আসছে। তার গলায় কাকুতিমিনতি, 'ভেঙে দিও না, আমাদের পেটের ভাত মেরো না, দোহাই তোমাদের।'

ঢ্যাঙা ছেলেটা এই কথা শুনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেইসঙ্গে অন্যরাও। ইন্দু চিৎকার করে উঠল, 'এই গাধা! পুলিশ তখন অমন করে তাকিয়েছিল?'

লজ্জায় জিভ কাটল ঢ্যাঙা,বলল, 'আবার বল।'

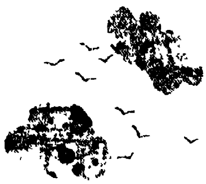
ইন্দু আবার শব্দগুলো ছুঁড়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢ্যাঙার ওপরে। ওপাশে সঙ্গীরা হাঁড়ি ভাঙছে কিংবা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ঢ্যাঙাকে ইন্দু বলল, 'আমার চুলের মুঠি ধর। গালাগাল দে।'

ঢ্যাঙা খপ করে ইন্দুর ঝুঁটি ধরতে গিয়ে একটা পাশ ধরে রাগী ভঙ্গিতে বলতে পারল, 'অ্যাই শালা!'

তারপর দু-তিনবার ঝাঁকাল। এতেই হাড়জিরজিরে শরীরটায় প্রবল যন্ত্রণায় সৃষ্টি হল। তবু

ইন্দু মায়ের ভঙ্গি তুলল সারা শরীরে। ছটফটিয়ে সে চিৎকার করছিল বাধা দেওয়রা জন্যে। ঢ্যাঙা ছেলেটি আবার দিশেহারা। ইন্দু সেই অবস্থায় চাপা স্বরে বলল, 'আমার বুকের কাছটা ছিঁড়ে দে না।' সচকিত ঢ্যাঙা দারোগাকে নকল করল, করে থেমে গেল। ফুঁসে উঠে ইন্দু তার হাড়সর্বস্ব পাঁজরে ঢ্যাঙার হাত নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল. 'খামচে ধর, দারোগাকে দেখিসনি? রক্ত বের করে দে!'

হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে ঢ্যাঙা ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল। তার মাথা দু-পাশে দুলছিল, 'না, আমি পারব না, আমি পারব না।'



হিপিরা এসেছিল

কাল রাতের বুলেটিনে বি বি সি বলেছিল আজ আকাশ মেঘলা থাকবে। চাই কি, কয়েক পশলা বৃষ্টিও নামবে। অথচ সামার এসে গেছে ক্যালেন্ডারে। বছরের এই ক'টা মাস একটু হালকা হয়ে রোদ পোয়ানো, লিজা ঠিক থাকলে গাড়ি নিয়ে ব্ল্যাকপুলে চলে যাওয়ার মজা পাওয়া ববের অনেকদিনের অভ্যেস। কনকনে বাতাসটা নেই, টিপটিপ বৃষ্টি বন্ধ, বরফ পড়ছে না, তার বদলে চারধার সবুজে চমৎকার, ভরদুপুরে সোয়েটারের তোয়াক্কা করতে হয় না, এক-একদিন কী সুখের ঘাম বের হয় শরীর থেকে। কেডস হাফ প্যান্ট আর মোটা গেঞ্জি পরেও পার্কে গিয়ে বসা যায়। মানুষের শরীরটায় যাতে রোদ হাওয়া লাগে তাই তো ঈশ্বর সামার তৈরি করেছেন। মাস দুয়েক, তাই যথেষ্ট। সত্তর বছরের জীবনে যোগ করলে তা অনেক বছর। অথচ এবার মার্চ এসে গেলেও সামারের চরিত্র আসছে না প্রকৃতিতে।

বয়সের অনেক দোষ। কথা বলার ইচ্ছে বাড়ে অথচ লোক কমে যায়। এই গ্রামে তিনটে ক্লাব আছে। একটু বড় ধরনের পাব আর কী। তা সেখানে রাত এগারোটা পর্যন্ত ছেলে-ছোকরাদের ভিড়। বুড়োরা কেউ ধারে কাছে যায় না। বর্ষা বা শীতে তো কারও দেখাই পাওয়া যায় না। সামারে তবু পার্কগুলোর মুখোমুখি হওয়া যায়। জন অবশ্য তাঁকে বলে মাঝে-মাঝে ক্লাবে যেতে। এক বছরের ছোট কিন্তু এখনও টগবগে আছে। নইলে ক্লাব চালায় কী করে। বব জানেন ওখানে গেলে তিনি স্বস্তি পাবেন না। না, ছেলেমেয়েগুলো টকাস-টকাস চুম খাচ্ছে কিংবা মদের ঘোরে এ ওকে জড়িয়ে ধরছে বলে নয়, ওদের দেখলেই নিজেকে খুব অশক্ত মনে হয়। শরীরের অনেক কিছুই হঠাৎ-হঠাৎ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। [illegible] ক্লাবে গেলে সেটা বড় বেশি মনে হয়।

কথা বলার মানুষ নেই। লিজার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললেই ও চোখ বন্ধ করে হাত তোলে, 'ও বব, একটু চুপ করে থাকতে পারো না? ইন্ডিয়ান ফিলসফিতে বলে, যে চুপ করে থাকে সে বেশিদিন বাঁচে।'

'কি লাভ?' বব জানেন লিজার প্রতিক্রিয়া হবে এবার। চুপচাপ উঠে যাবে। হাসি পায় ববের। যত বয়স হচ্ছে তত দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। কেউ যেন কাউকে আগে মরতে দেবে না। প্রথমে যাওয়ার কৃতিত্বটা নিজেরই। কারণ যে পড়ে থাকবে তার অবস্থা অনুমানেও আনা যাচ্ছে না! অবশ্য এখন মরার মোটেই বাসনা নেই ববের। যে পৃথিবীতে সামার আসে, টিউলিপ ফোটে সেই পৃথিবীতে অনেকদিন থাকার ইচ্ছে তাঁর। এই খামার, এই ছবির মতো বাড়ি, লিজা,

এই বসার ঘর, আরাম চেয়ারে আর রঙিন টিভিতে বি.বি.সি-র দুটো চ্যানেল, বিজ্ঞাপনসংস্থার সিরিয়ালগুলো—এসব ছেড়ে চট করে চলে গেলেই হল!

ঝটপট ব্রেকফাস্ট তৈরি করব ভেবেছিলেন বব। লিজা এখনও ওপরে। বয়স বাড়লে মেয়েদের ঘুম বাড়ে একথা জানতেন না। ঘুম বাড়ে আর খিটখিটে হয়ে যায়। অটোমেটিক কেটলির সুইচ অন করে বেসিনের কাছে আসতেই তাঁর বিরক্তি বাড়ল। কাল রাতের ডিনার প্লেট তিনি ধুয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কারির বাটিগুলো বেসিনে রেখে জলে ভিজিয়ে চলে গেছে লিজা। খুব বেশি ঘুম পেয়েছিল, নাকি জানে ভোরে বব আসবে কিচেনে! নোংরা ফেলে রাখতে পারলেন না বব। শীত হলে গ্লাভস পরতে হত। এখন গরম জলের কল খুলে সব ধুয়ে পরিপাটি করে রেখে ডিমের পোচ আর দুটো রুটি সেঁকে নিলেন। একবার মনে হল অ্যাপল পাই উইদ হট ক্রিম নেবেন নাকি সঙ্গে? আজকাল বড় খেতে ইচ্ছে করে তাঁর! কিন্তু সেদিন উইল বলল, 'নো বব, আমাদের এখন খাওয়া কমানো উচিত। যা কিছু এতদিন ভালো ছিল তাই এখন শরীরটাকে খারাপ করার জন্যে নখ বের করে বসে আছে।' উইলি অনেকদিন লন্ডনে ডাক্তারি করেছে। এখন গ্রামে ফিরে এসে সেসব পাটে তুলে দিয়েছে। তবু দেখা হলে ওসব উপদেশ দিতে কার্পণ্য করে না। চা ডিম আর রুটি নিয়ে বব কিচেন থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে চলে এসে ট্রেটা টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার পরদা সরিয়ে কাচের আড়ালে আকাশে তাকালেন। রোদের কোনও লক্ষণই নেই অথচ ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা। সূর্য ওঠার সময় অন্তত আড়াইঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বাগানটায় ঘন ছায়া জড়ানো। এবার আগাছাগুলোকে হাত দেওয়া দরকার। কিন্তু একটু রোদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

খুব মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করলেন বব। তারপর প্লেটগুলো বেসিনে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ধুয়ে আবার আরামকেদারায় ফিরে এলেন। লিজার সাড়া এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাত্রে লিজা বলছিল এবার মাদার্স ডে-তে টেড আসতে পারে। দু-বছর আসেনি কেউ। এবার মাদার্স ডে-তে টেলিগ্রামের বদলে যদি ও আসে তো ভালো। নিশ্চয়ই বউ মেয়ে নিয়ে আসবে না। টেডের মেয়ে, একমাত্র নাতনি ডেফনি আছে ম্যাঞ্চেস্টারে। সে তো এ তল্লাটে আসেই না। সিঙ্গল মাদার হয়েছে জানার পর লিজা একদিন গিয়ে দেখে এসেছিল তাকে। ফিরে এসে বলেছিল ডেফনি নাকি খুব গর্বিতা। এসব ভাবনা বড় অন্যমনস্ক করে দেয় ববকে। এগিয়ে গিয়ে টিভি খুললেন তিনি। বি বি সি-ওয়ান ওয়েদার ফোরকাস্ট করছে লিখে-লিখে। সারাদিন মেঘলা থাকবে তবে বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হতে পারে। কেন যে বিকেলে আকাশ পরিষ্কার হয়! কি লাভ তাতে? অন্য চ্যানেলগুলোতে এখন তেমন কিছু হচ্ছে না। সকালবেলায় বাচ্চাদের পড়াশুনা নিয়ে থাকে টিভির চ্যানেলগুলো। গ্রানাডা খুললেও কোনও লাভ হবে না। বৃষ্টি পড়লে অথবা কোনও কাজ হাতে না থাকলে বব এই আরামকেদারায় বসে বি বি সি-র বদলে গ্রানাডার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। ওদের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো বেশ মজার হয়। আগে ব্রিটিশ টিভির বেশ কনজারভেটিভ মানসকিতা কাজ করত টেলিকাস্টের ব্যাপারে। আমেরিকানদের মতো মেয়েদের শরীর দেখাত না ওরা। মাঝে-মাঝে রাত বাড়লে ওভার এইট্টিন-এ যেসব ছবি আসত তাতে সেক্স নেই বললেই চলে। মহিলা প্রধানমন্ত্রী নানান কাজকর্ম করেছেন বলে শুনেছেন বব। লন্ডনের সোহো থেকে রাস্তার মেয়েদের প্রায় তুলে দিয়েছেন বললেই চলে। কিন্তু টিভিকে অপার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন। গতরাত্রেই যে ছবিটা তাঁরা দেখেছেন দশ বছর আগে তা টিভিতে ভাবা যেত না। লিজা আর তিনি ডিনারের পর পাশাপাশি বসে টিভি দেখছিলেন। বিজ্ঞাপনের পর একটি সজ্জা সিরিয়াল শুরু হল। মডেল মেয়েটিকে চার-পাঁচজন ক্যামেরাম্যান বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসিয়ে ছবি তুলছে। ক্রমশ মেয়েটির ওপরের পোশাক খুলে ছবি তুলল ওরা। কিন্তু সে ব্যাপারে একজন অল্পবয়স্ক ক্যামেরাম্যান নার্ভাস হয়ে পড়ায় পোড়-খাওয়া আর একজন বিভিন্নরকম লাস্যময়ী ছবি তুলতে-তুলতে মেয়েটিকে আরও নগ্ন হওয়ার অথচ সামান্য আবরণ রাখার ইঙ্গিত করতেই মেয়েটি খেপে গেল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ওই ধাষ্টামির

বিরুদ্ধে গালাগাল দিতে লাগল। এই দৃশ্য দেখামাত্রই লিজা উঠে গেল ওপরে। বব-এরও অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে যখন লিজা রাবিশ বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি বলে ফেললেন, 'কোনও-কোনও ছবি আন্ডার এইট্টিন এবং অ্যাবাভ সিক্সটির মেয়েদের দেখতে নেই।' নেহাতই রসিকতা কিন্তু শোওয়ার ঘরে পৌঁছে দেখেন লিজা ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা তাঁর ওপরে অভিমান থেকেই বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আজকাল সময় কাটানোর অদ্ভুত ভালো বন্ধু টিভি! বব-এর অবশ্য এইসব ছবি মন্দ লাগে না। কেমন একটা নস্ট্যালজিক ফিলিংস হয়।

বোতাম টিপে চ্যানেল ঘোরাতেই খবর পড়া শুরু হল। যে মেয়েটি এই সময় পড়ে সে সত্যিই সুন্দরী। মুখখানা যদিও বড় কিন্তু অদ্ভুত আদুরে ভঙ্গি আছে চোখের পাতায়, ঠোঁটের কোণে। শিক্ষা দপ্তরের নবনিযুক্ত সেক্রেটারি একটা প্রাইমারি স্কুলে হাজির হয়েছেন সাতসকালে। হিথরো এয়ারপোর্টে গত রাতে সত্তর হাজার পাউন্ডের মাদকদ্রব্য ধরা পড়েছে। তারপরেই পাঠিকা বললেন, 'হিপিস আর কামিং।'

বব দেখলেন হাইওয়ে দিয়ে একটা বিশাল কনভয় যাচ্ছে। ধারাভাষ্যকার জানাচ্ছেন আড়াই হাজার হিপি তাদের ক্যারাভান এবং গাড়ি নিয়ে ইংলন্ডের শেষ প্রান্তে চলেছে। এইসব হিপিদের মধ্যে যুবক-যুবতী এবং শিশুও আছে। পুলিশ তাদের রুট বদলাতে বললে তারা হাইওয়ে বন্ধ করে দেয় গাড়ি দিয়ে। ফলে হাজার-হাজার গাড়ি জ্যামে পড়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে হিপিদের আলোচনা চলছে। হিপিরা কোনওভাবেই রুট বদলাতে রাজি নয়। পুলিশ এই মিছিলকে বেআইনি ঘোষণা করতে চলেছে। হিপিরা তাদের বক্তব্য থেকে সরতে মোটেই রাজি নয়।

বব সোজা হয়ে বসলেন। দাড়িওয়ালা নোংরা পোশাকের একটি হিপি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল, 'রুট বদলালে আমাদের পেট্রল থাকবে না, খাবার থাকবে না। এমনিতেই খুব টাকার অভাবে আছি আমরা। আমি ভেবে পাই না সাধারণ মানুষ কেন আমাদের বন্ধু বলে ভাবে না।' পুলিশের কর্তা তাদের আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন।

হিপিগুলোকে দেখামাত্র ববের শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। কোনও-কোনও হিপি আবার পাঙ্কদের মতো খোঁচাছাঁট চুলে রং বুলিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে মনে হচ্ছিল ববের। ওরা আছে এই গ্রাম থেকে একশো মাইল উত্তরে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিজেদের রুটে চললে ওদের দেখতে হবে না। বব ভেবে পাচ্ছিলেন না পুলিশ কেন ওদের এত খাতির করছে! নিশ্চয়ই বেকারভাতা হিসেবে ষাট পাউন্ড ডোল পায় ওরা। ষাট পাউন্ড ফালতু পেলে গাঁজা কিংবা ট্যাবলেট খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে একটা সপ্তাহ। তার মনে হল এখনই খবরের কাগজে একটা চিঠি লেখা উচিত। বব উঠে তাঁর লেখার কাগজ এনে বসলেন। টেলিগ্রাফের সম্পাদককে তিনি লিখলেন, ব্রিটেনের একজন নাগরিক হিসেবে তিনি এবং তাঁর মতো যাঁরা নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তাঁদের নিশ্চয়ই জানবার অধিকার আছে কেন তাঁদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় হিপিদের পোষা হচ্ছে। ওরা কেন বেকার ভাতা পায়। এরা যদি সবাই জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হয়েও থাকে তাহলে সেই অধিকার অবিলম্বে কেড়ে নিয়ে ওদের এমন একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যেখান থেকে কখনই সভ্যজগতে ফিরে আসতে পারবে না। পুলিশ যে কেন ওদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের সম্মান দিয়ে ব্যবহার করছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

চিঠিটা শেষ করে খামে পুরে উঠে দাঁড়াতেই লিজা ঘরে ঢুকলেন, 'গুড মর্নিং।'

বব সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো খুব ঘুমাচ্ছ, এদিকে হিপিরা রাস্তা জুড়ে বসে আছে।'

'হিপি? কোথায়? এখানে? আমাদের গ্রামে?' লিজা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আঃ। এখানে হতে যাবে কেন?' বেশ বিরক্ত হলেন, এমন অলক্ষুণে কথায়, 'ওরা হাইওয়েতে আছে। একশো মাইল উত্তরে। এদিকে আসবে কেন ওরা? ও হ্যাঁ, তুমি কারির বাটিগুলো কাল

রাত্রে ধুয়ে যাওনি। অথচ এখানে বসে টিভি দেখলে। তোমার চেয়ে আমি পাঁচ বছরের বড়। অথচ আমাকে সব কাজ করতে হচ্ছে। এটা ভালো কথা নয়।'

লিজা বললেন, 'পাঁচ নয় চার। বব, তোমার আকজাল হিসেবের খুব ভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কী করে হল, যখন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল বাইশ আর তুমি সতেরো!'

'তুমি বিয়ে করনি, আমরা করেছিলাম। তোমার বয়স তখন একুশ। কত বছর বিয়ে হয়েছে একবার গুনে দ্যাখো। বড্ড বাজে কথা বলো তুমি। হ্যাঁ, হিপিদের কথা তোমাকে কে বলল?' লিজা কিচেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

'টেলিভিশন। তুমি তো কখনও নিউজ শুনতে সময় পাও না। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার খবর রাখো? চোখ বুজে পৃথিবীতে বেঁচে আছ কি করে তুমিই জানো।' বব দেখলেন টিভি-তে এবার খেলার খবর দেখাচ্ছে। মেক্সিকোয় ইংল্যান্ড খুব দুরবস্থায় আছে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ। নর্দান আয়ারল্যান্ড আর স্কটল্যান্ড-এর অবস্থা তো আরও শোচনীয়। ব্রিটেনের খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। বব মগ্ন হয়ে গেলেন গতরাত্রে কেন ইংল্যান্ড হারল তার ব্যাখ্যা শুনতে।

লিজা তাঁর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে এসে উলটোদিকের টেবিলে বসলেন। বৃদ্ধা হলেও তাঁর মুখ-চোখে তেমন আঁচড় পড়েনি। যদিও শরীরের চামড়া ঢিলে হয়েছে, চশমার শক্তি বেড়েছে আর বেশিক্ষণ হাঁটলে বড় হাঁফ ধরে। কিছুক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থেকে লিজা বুঝতে পারছিলেন না ও নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে। আজকাল ক্রিকেট টিম তো খেলতে নামলেই হেরে যাচ্ছে অথচ তাতে কারও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। অথচ ফুটবলে হারলেই গেল-গেল রব উঠছে। বব তো জীবনে ফুটবল মাঠে যায়নি, কিন্তু দ্যাখো, এমন মুখ করে বসে আছে যেন ওই টিমের কোচ। লিজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই হিপিগুলোকে দেখতে কেমন?'

বব হাত তুলে কথা বলতে নিষেধ করলেন।

লিজা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'রাবিশ!'

বব বললেন, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এত টাকা খরচ করে টিম করা হল আর একটা ড্র একটা হেরে বসে আছে। এটা আমাদের জাতীয় অপমান।'

'হিপিরা কেমন দেখতে?'

'হিপিদের মতন।' বব অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলেন।

'আঃ বব।' লিজা চোখ বন্ধ করতে টিভির পর্দায় আবার হাইওয়ের ছবি ফুটে উঠল। বব বললেন, 'আবার দেখাচ্ছে। এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন ওরা?'

লিজা চোখ খুললেন। ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট জ্যাকেট পরা দাড়ি-মুখো একটা লোক টিভির প্রতিনিধিকে বলছে, 'পুলিশ আমাদের বলছে রুট পালটাতে। কিন্তু আমাদের যা টাকা আছে তাতে ঘুরপথে তেল যা লাগবে কিনতে পারব না। তা ছাড়া হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে আমাদের, তাই না?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'এই হাইওয়ে সবসময় খুব বিজি থাকে। হিপিরা তাদের ক্যারাভান নিয়ে যেভাবে যাচ্ছে তাতে রাস্তা আটকে থাকছে। ওরা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে আরও সমস্যা তৈরি করছে। আমরা ওদের আটকাতে চাইছি না, শুধু বলছি যাওয়ার পথটা পালটাতে। যে সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ওরা যদি কথা না শোনে তাহলে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব।'

বব বললেন, 'বেশি ভদ্রতা করে আমাদের জাতটা শেষ হয়ে গেল।'

লিজা বললেন, 'ওরা এত কষ্ট করে কেন? চাকরি-বাকরি করে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তো!'

'আহা দ্যাখো-দ্যখো, দুধের বাচ্চাটার পায়ে মোজা পর্যন্ত নেই। ইস!'

বব উঠে পড়লেন, 'আর ইস টিস বলতে হবে না। ক্যারাভান অফ বাস্টার্ডস। হিপিরা কেমন দেখতে জিজ্ঞাসা করেছিলে না? এখন প্রাণভরে দেখে নাও। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'এই ওয়েদারে বাইরে যেতেই হবে? কার্পেটগুলো পরিষ্কার করার কথা ছিল আজ।'

'চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি। ওটা আরও জরুরি।'

মর্নিং জ্যাকেটটা পরার পর ছাতা নিলেন বব। তারপর দরজা টেনে দিয়ে বাইরে এসে চারপাশে তাকালেন। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। ববের বাড়িটা গ্রামের একপাশে। ঠিক উলটোদিকে টেডের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার পাশে নতুন জামাপ্যান্টের দোকান খুলেছে ওস্কার নামের একটা ছোকরা। বব আকাশের দিকে তাকালেন। এখনই বৃষ্টি নামবে মনে হয় না। রাস্তাটা পার হয়ে তিনি টেডের দোকানে ঢুকলেন। দুটো মেয়ে কাজ করে এখানে। টেড শুধু ঘুরে-ঘুরে দ্যাখে। বুড়ি আর্নল্ড তখন জিনিসপত্র ট্রলিতে নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের দিকে আসছিলেন। ববকে দেখে বললেন, 'কি দিন এল বব! সামার বলে একে? ভগবানের কি ইচ্ছে বলো তো?'

বব মাথা নাড়লেন, 'এ কথাই আমি ভাবছিলাম।'

'ভাববেই তো। আমাদের যাদের বয়স হয়েছে তারা তো এই সময়টুকুর জন্যে হাঁ করে বসে থাকি। ববের কথাটা খারাপ লাগল। অন্তত কুড়ি বছর তিনি মিসেস আর্নল্ডকে এই চেহারায় দেখে আসছেন। লোকে আর মিসেস বলে না এখন। বুড়ি আর্নল্ড আজ তাকেও নিজের দলে টানল! তিনি তো অত বৃদ্ধ হননি। দাম মিটিয়ে জিনিসপত্র ব্যাগে ঝুলিয়ে বুড়ি আর্নল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'লিজা কেমন আছে? অনেকদিন দেখিনি মেয়েটাকে। তোমাদের নাতনি শুনলাম সিঙ্গল লাইফ কাটাচ্ছে? লিজাকে বলো তো একদিন আসতে, ওর কাছে গল্প শুনব।'

টেড এল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'হ্যালো বব। দিনটার চেহারা দেখেছ? সামারের অবস্থা যদি এইরকম হয় তাহলে বেঁচে থাকার কোনও মানে থাকে না। চললে কোথায়?'

'চিঠিটা পোস্ট করব বলে বেরিয়েছিলাম। আজ টিভিতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। হিপিরা ক্যারাভান নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস পথটা আমাদের গ্রামের উলটোদিকে। কি চেহারা, ভয়ঙ্কর। আর পুলিশের অবস্থা দ্যাখো, ওদের তোয়াজ করছে।' বব উষ্ণ গলায় খবরটা দিলেন। অথচ টেডের এদিকে মনই নেই। তার চোখ কাউন্টারে বসা একটি মেয়ের দিকে। সে ফোনে হেসে-হেসে কথা বলছে। টেড বলল, 'আজকালকার মেয়েরা প্রেমের অর্ধেকটা টেলিফোনেই শেষ করে দেয়। তুমি বেশ আছ বব। কাজকর্ম তেমন করতে হয় না, টিভি দেখে বেশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছ।'

একটু বিরক্ত হয়েই বব দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। টেডের সঙ্গে আজকাল বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। সব সময় অন্যদের সুখী দ্যাখে ও। ওই সময় কানে এল ওস্কার তাকে ডাকছে, 'হ্যালো বব, চললে কোথায়?'

ওস্কারের মুখের দিকে তাকালেন বব। ছোকরা কথা বলার সময় এমন একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যালো ওস্কার।' তারপর আর কথা না বলে পা বাড়ালেন। গ্রামটা মোটামুটি একটি রাস্তার দু-ধারে বাড়িঘর নিয়ে। বাইলেনগুলো আছে কিন্তু সে দিকটা জমাটি নয়। পোস্টঅফিসে যাওয়ার পথেই তিনটে ক্লাব কাম পাব্। জনের ক্লাব এখন বন্ধ। নির্ঘাত ঘুমাচ্ছে সে। শনি রবি তো রাস্তায় লোক থাকেই না বলতে গেলে। রাত তিনটে পর্যন্ত ক্লাবে-ক্লাবে হইচই করলে কি পরের দিন জেগে থাকা যায়?

ঝকঝকে পিচের রাস্তার দু-পাশে দোতলা বাড়িগুলো। বব জন্মইস্তক এমন দ্যাখেনি। বাড়িগুলো পরে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ আসেনি পাকাপাকি বাইরে থেকে থাকতে। তবে দুটো ব্যাঙ্কে কাজ করতে যারা বদলি হয়ে আসে অথবা অন্য সরকারি অফিসগুলোতে যারা কাজের জন্যে এসেছে তাদের কথা আলাদা। এই গ্রামের যাবতীয় ব্যাবসা গ্রামের মানুষেরাই করে থাকে। এদের প্রত্যেককেই

তিনি চেনেন। 'হ্যালো বব।'

বব ঘুরে দাঁড়ালেন। ওপরের জানলায় ঝুঁকে মেয়েটা তাকে ডাকছে, 'কাম হিয়ার।'

বব একটু ইতস্তত করলেন। চিঠিটা পোস্ট করা দরকার। নইলে বিকেলেও লন্ডনে পৌঁছাবে না। তিনি হাত নাড়লেন, 'আমি আসছি, অ্যান। একটা জরুরি চিঠি পোস্ট করার আছে।'

পোস্ট অফিসে গিয়ে বাক্সে নয়, একদম মিস্টার জোন্সের হাতে খামটা দিলেন বব। মিস্টার জোন্স খুব ঠান্ডা লোক। ব্ল্যাকপুলের দিকে বাড়ি। লাল দাড়ি সুন্দর করে ছাঁটেন। চিঠিতে ছাপ মেরে মিস্টার জোন্স বললেন, 'একটা খবর দিচ্ছি বব। আমাকে ট্রান্সফার করেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে জয়েন করতে হবে কাল। ইনি হচ্ছেন তোমাদের নতুন পোস্টমাস্টার মিঃ হ্যারল্ড স্মিথ।'

উলটোদিকের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে একটা ছোকরা পাইপ খাচ্ছিল। মিস্টার জোন্স তাকে বললেন, 'মিট মিস্টার রবার্ট। এখানকার পুরনো মানুষ।'

'আলাপ করে খুশি হলাম।' মিস্টার স্মিথ বলল, 'কিন্তু জোন্স তুমি এখানে তিন বছর থাকলে কি করে? একটা ভালো ক্লাব নেই, ফূর্তি করার জায়গা নেই।'

মিস্টার জোন্স বললেন, 'এঁরা ছিলেন তাই ওসবের দরকার হয়নি।'

বব বললেন, 'জোন্স, তুমি চলে যাচ্ছ বলে খারাপ লাগছে। পৃথিবীর নিয়মটাই হল ভালোমানুষরা বেশিদিন থাকে না। আমার ঠিকানা তো তুমি জানো, মাঝে-মাঝে চিঠি দিলে খুশি হব।'

বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালেন বব। মেঘ নেমে এসেছে নিচে। একটা ছোকরাকে ওরা পোস্টমাস্টার করে পাঠাল? ছোকরা এখানে এসেই নালিশ করছে ফূর্তি করার জায়গা না পেয়ে! বিয়ে-থা করেছে কিনা কে জানে। যদি উলটোপালটা কাজ করে তাহলে আবার চিঠি লিখতে হবে। ব্রিটিশ সরকার এখনও অভিযোগ করলে বিচার করে।

ওপাশে একটা ক্যাসিনো। জুয়ো খেলার একটা চমৎকার আড্ডা। তবে আঠারো বছরের নিচের ছেলেদের ওখানে ঢোকা নিষেধ। বব নিজেও মেম্বার। কিন্তু হেরে যাওয়ার মতো পয়সা নেই বলে তিনি সচরাচর যান না। বব দেখলেন ক্যাসিনোর দরজা খোলা। একটু বিস্মিত হলেন তিনি। আজ সারা গ্রাম যখন রাত জেগে ঘুমাচ্ছে তখন ক্যাসিনো কি করে খোলা থাকছে? সিঁড়ি ভেঙে দরজা ডিঙিয়ে ঢুকতেই ম্যাথুজকে দেখতে পেলেন। ম্যাথুজ এখানকার একজন ডোরম্যান। এই গ্রামে এটা একটা লোভনীয় চাকরি। পাব্ কাম ক্লাব, রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাসিনোর জন্য ডোরম্যানদের রাখা হয়। কিছু ছেলে যাদের স্বাস্থ্য ভালো, নিয়মিত শরীরচর্চা করে, তারা বক্সিং শিখে নিয়ে এই চাকরিতে যোগ দেয়। ডোরমেন অ্যাসোসিয়েশন আছে একটা, তারাই জোগান দেয়। কিন্তু যেহেতু ওদের চাকরির জায়গা কম তাই বেচারাদের অন্য গ্রামে যেতে হয়। ম্যাথুজ মাথা নাড়ল, 'গুড মর্নিং, বব।'

বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তোমাদের খোলা?'

ম্যাথুজ হাসল, 'মিসেস হোমস সব সময় খোলা রাখতে পারলে খুশি হন।'

খাতায় সই করে ভেতরে ঢুকলেন বব। পুরো ক্যাসিনো ফাঁকা। তিনটে মেয়ে একটা জায়গায় বসে গল্প করছে। আঠারো থেকে কুড়ি ওদের বয়স। বাপ-মাকে তিনি নিশ্চয়ই চিনবেন। ওঁকে দেখে একটি কালো মোটা মেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খেলবে তুমি?'

বব চারপাশে তাকালেন। ওপাশে একটা ডিস্ক ঘুরছে। তার পাশেই লম্বা বোর্ডে ঘর কাটা। প্রত্যেক ঘরে একটা করে নম্বর। সেই নম্বরের একটায় পেনি কিংবা পাউন্ড রাখলে মেয়েটা গিয়ে ডিস্কের মধ্যে একটা সীসের বল ফেলে দেবে। ঘুরতে-ঘুরতে বলটা ডিস্কের সঙ্গে যেখানে থামবে সেখানে একটা নম্বর পাওয়া যাবে। সেই নম্বরের সঙ্গে বোর্ডের নম্বর যদি মেলে এবং তাতেই তোমার পয়সা থাকে, তাহলে তুমি নম্বর অনুযায়ী কয়েকগুণ বেশি ফেরত পাবে। তার পাশে কয়েন বক্সে পয়সা ফেলে হাতল ঘোরালে যদি একই নম্বর পাশাপাশি তিনটে ওঠে তাহলে দশ পেনিতে আড়াই

পাউন্ড পেতে পারো। এদিকে একটা রেসবোর্ড আছে। দশটা প্লাস্টিকের ঘোড়া নিজেদের ট্রাকে সুইচ টিপলে দৌড়ায়। তোমাকে একটায় দশ পেনি বাজি ধরতে হবে। যত নম্বর ঘোড়া প্রথম উইনিং পোস্ট ছোঁবে ততগুণ পয়সা পাবে ফেরত। বব হিসেব করে দেখেছেন একশো পাউন্ড খেললে পাঁচ পাউন্ড ফেরত পাওয়া যায়। তবু লোকে খেলে। একবার হারতে আরম্ভ করলে আরও নেশা চেপে যায়। এই সময় বার কাউন্টার থেকে মিসেস হোমস চেঁচিয়ে বললেন, 'হাই বব! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! তুমি তো জুয়ো খেলার পাত্র নও। এখানে চলে এসো।'

বব সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে দেখলেন মিসেস হোমসের চোখমুখ এখনও ফোলা। বোঝা যাচ্ছে সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়েছেন এখন। জিজারই বয়সি কিন্তু অনেক চটপটে। এক সময়ে এই গ্রামের সেরা সুন্দরী ছিলেন। সেসব সোনার দিন ছিল। হোমসটা ছিল বদমেজাজি। এই ক্যাসিনো করে গোল্লায় গিয়েছিল। ও মরতে যখন মিসেস হোমস দায়িত্ব নিলেন তখনই চব্বিশ পেরিয়েছেন। তারপর থেকে ক্যাসিনোটা স্টেডি চলছে।

ফাঁকা ক্যাসিনো, বার আরও ফাঁকা। একা মিসেস হোমস পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছেন। বব যেতেই একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, 'আকাশের অবস্থা দেখেছ? একেই কি সামার বলে?'

বব বসতেই দেখতে পেলেন মোটা শরীরে ফুলতোলা যে রঙিন গাউন পরেছেন মিসেস হোমস তার বুকের কাছটা আজকালকার মেয়েদের মতো কাটা। সেটা ববের চোখে পড়েছে দেখে মিসেস হোমস বললেন, 'আবার উপদেশ দিও না। ঘরোয়া হয়ে বসো। এককালে তোমরা, তুমি আমার দিকে হাঁ করে তাকাতে, বিলের জন্যে ঘেঁষতে পারোনি, মনে আছে?'

'সেসব কথা মনে করে কি লাভ?'

'যাই বলো বাপু, আমার মনে করতে ভালো লাগে। তোমাকে দেখেই আমার ভালো লাগল। আচ্ছা আমি না হয় বুড়ি হয়েছি তাই বলে একটু চুমু আশা করতে পারি না?'

বব উঠে ঝুঁকে মিসেস হোমসের গালে একটা চুমু খেয়ে ফের ফিরে বসলেন। মিসেস হোমস গলা তুলে বললেন, 'ম্যাগি, ববের জন্যে একটা জিন উইদ টনিক দাও।'

'না-না, এই সকালে—।'

'আঃ রাখো তো! বব, তুমি চিরকালই ভিজে রয়ে গেলে। ইটস অন মি।'

কালো মেয়েটা অকারণে হেসে কাউন্টারে ঢুকে মদ ঢালতে লাগল। এই একটা ব্যাপার হয়েছে। এখন ইংলন্ডের আনাচে-কানাচে কালো ছেলেমেয়ে ছেয়ে গেছে। বব শুনেছেন ছেলেগুলোর বেশির ভাগ পড়তে এসে থেকে যায়। আর ওদের ওপর নাকি ব্রিটিশ মেয়েদের প্রচণ্ড টান। কালোগুলোর মতো ডিস্কো নাকি সাদা ছেলেরা নাচতে পারে না। রাবিশ।

জিন উইদ টনিক হাতে নিয়ে বব বললেন, 'তুমি কালো মেয়ে রেখেছ?'

'আঃ বব। যুগ পালটেছে। এখন যেসব ছোঁড়া এখানে খেলতে আসে তারা ম্যাগিকে বেশি পছন্দ করে। ওরকম বেঢপ হিপ আর ব্রেস্ট নিয়ে যখন তখন তো আর কেউ হাসতে পারে না। দিন পালটাচ্ছে বব। উই মাস্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট।' মিসেস হোমস শরীরটাকে তুলে এগিয়ে গিয়ে ক্যাসিনোটা দেখতে লাগলেন, 'কাল খুব ভালো বিজনেস হয়েছে। চারটে পর্যন্ত লোক ভরতি ছিল। এখন আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই বব কিন্তু শরীরটার দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। খাওয়া ছাড়া কোনও আরাম আমার জন্যে নেই, ভাবতে পারো? সেক্স-এর কথা বলছি না, একটা পুরুষমানুষকে মনের মতো ভালোবাসার কথা ভাবলেই ঘুম পেয়ে যায়। আমার অবস্থাটা বোঝো বব। কি জন্যে বেঁচে আছি? কি হবে টাকা জমিয়ে?'

গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন বব, 'মনটাকে ঝেড়ে ফেল। তোমাকে দেখতে এখনও যে আমাদের ভালো লাগে, আমরা যে আসি এটা কম কথা নয়। ষাট বছর পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্যে বেঁচে থাকে, তারপর বাঁচতে হয় অন্যের জন্যে। বাই মিসেস হোমস।'

'বাই বব।'

আবার রাস্তায় নামলেন বব। আজ আর রোদ উঠবে না। নির্জন রাস্তায় একা-একা হাঁটছিলেন তিনি। আজ একবার গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে। হাইওয়ের ধারে বাগানটায় এই সপ্তাহে যাওয়া হয়নি। একটু আগে শোনা কথাগুলো মনের মধ্যে এখনও টলটল করছে। নিজের উত্তরটাও। তিনি কার জন্যে বেঁচে আছেন? অন্যজন কে? লিজা? তিনি না থাকলেও লিজার ঘুমের অসুবিধে হবে না, আর্থিক অভাব হবে না। এখন রাত্রে শোওয়ার আগে অথবা মেজাজ ভালো থাকলে কোথাও বেরুবার আগে লিজা ওঁকে চুমু দিয়ে যায়। কোনওদিন বলেননি তিনি। করমর্দনে যে উত্তাপ তা চুম্বনেও পান না এখন। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষলে শরীরের কোথাও উত্তেজনা জন্মায় না। বুকের ভেতর কোনও বল ড্রপ খায় না। শরীরের মধ্যে যে শরীর পনেরো বছর বয়সে জেগে উঠেছিল সে কবরে শুয়েছে কবে, শুয়ে মাটি হয়ে গিয়েছে। মিসেস হোমসের তবু খেতে ভালো লাগে তাঁর তো তাও লাগে না। এখন শুধু দেখার জন্যে বেঁচে থাকা। এই গ্রামের মানুষ, বাড়িঘর, প্রকৃতি যা আজন্ম দেখে এসেছেন তাই রোজ চেয়ে-চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। যেন তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

হাঁটতে-হাঁটতে তিনি টু-লেট ঝোলানো বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেন। অ্যানরা ওদের নিচের ঘরটা ভাড়া দিতে চায়। এখন অফিস ব্যাঙ্কের দৌলতে ভাড়াটে পেতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে বেল টিপলেন। দরজা খুলে অ্যান ঠোঁট ফোলালো, 'না, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আমি ডাকলে সমস্ত গ্রাম ছুটে আসে আর তোমার সময় হয় না। এসো, খুব জরুরি পরামর্শ আছে।'

বব হাসলেন, 'আমার কাছে সুন্দরী নারী আর ফুলের মধ্যে কোনও তফাত নেই।'

'খুব কথা শিখেছ।' অ্যান ওঁর হাত ধরে এসে সোফায় বসাল। তারপর একবার ভেতরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'মা ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা বুড়োরা এত ঘুমায় কেন বলো তো?'

'ঘুমোয় না, ঘুমের ভান করে। এটাই কি তোমার সমস্যা?'

'না-না। শোনো, সাইমনকে ডিভোর্স করার পর ঠিক করেছিলাম এখন তিন বছর আর কোনও পুরুষকে পাত্তা দেব না। গ্রামে ফিরে এসে মাকে সাহায্য করছি জমিজমার ব্যাপারে। কিন্তু তুমি তো জানো কেন্ট ছেলেটা কি ভালো। অত ভালো ছেলে চাইলে কি প্রেম না দিয়ে পারা যায়? চারমাস পরে আমরা বিয়ে করব। তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ যেন কিছু জানো না!' চোখ ছোট করল অ্যান।

'জানি। কেন্ট চমৎকার ছেলে। চাষবাসে ভালো মন। তুমি ছাড়া কোনও মেয়েকে মন দেয়নি। ওর সঙ্গে তোমার ভালোবাসাবাসির কথা শোনার পর ভারি ভালো লেগেছিল।'

'লাগবেই তো। আমি কি খারাপ মেয়ে? সাইমনকে বিয়ে করে ভুল করেছিলাম, তাই বলে খারাপ কেউ বলতে পারবে না!' অ্যান মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, যে সমস্যাটার কথা বলছিলাম, তুমি তো চার্লসকে চেনো! আরে চার্লস হল ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। কি সুন্দর দেখতে বলো। তা চার্লস আমাকে প্রেম নিবেদন করেই চলেছে। আমি যত বলি ওর প্রেম নেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় কারণ আমি কেন্টের বাগদত্তা, তো কানেই নেয় না। তোমাকে কি বলব, অতবড় লোকটা কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছে। আমি বাবা কেন্টকে ভালোবাসি, ওসব ঝামেলায় যেতে চাই না। একটু আগে লোকটা ফোন করেছিল। আমার সঙ্গে একবার, মানে আমাকে অন্তত একবারের জন্যে পেতে চায়, না হলে আত্মহত্যা করবে। আমি কেন্টকে বিয়ে করলে ওর তো কিছু করার নেই কিন্তু তার আগে একবার আমাকে পেতে চায়। আর এইটেই আমার সমস্যা। অনেকবার ভেবেছি কাটিয়ে দেব। তোমাকে ভালোবাসি না, তোমার সঙ্গে শোব কেন? কিন্তু তারপরই মনে হচ্ছে, যদি আত্মহত্যা করে? ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে, ক্যাশিয়ার নেই। তা ছাড়া অত যখন ভালোই বেসেছে তাহলে একবারের জন্যে

আশা মিটিয়ে দিই। একবারই তো! আমি কেন্টের জন্যে যেমন মনটাকে রেখেছি তেমনই থাকবে অথচ চার্লসকেও দুঃখ দেওয়া হবে না। কিন্তু কথাটা আমি কেন্টকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। আমরা শরীর-মনের ওপর, যদিও স্বামী হয়নি এখনও তবুও ওর অধিকার আছে, একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। তুমি কি বলো?'

পায়ের ওপর পা রেখে দুটো হাত হাঁটুর ওপরে নিয়ে বব চুপচাপ শুনছিলেন। প্রশ্নটার পর চোখ বন্ধ করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন অ্যান উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। চোখ না খুলে তিনি বললেন, 'এরকম জটিল প্রশ্নের উত্তর তো চট করে দেওয়া যায় না। সময় লাগবে।'

'দিচ্ছি সময়। চুপচাপ বসে ভাবো। দ্যাখো, তোমার মতো অভিজ্ঞ মানুষকেই যখন ভাবতে হচ্ছে তখন আমার কি দোষ! আর কাউকে তো বলা যায় না এসব কথা তোমাকে ছাড়া। ভাবো, আমি ততক্ষণে টিভি দেখি।' অ্যান উঠে টিভি খুলে দিল। চোখ না খুলে বব শুনলেন বি বি সি ওয়ানের সংবাদ পাঠক বলছেন, 'এই ঘটনার পর হাইওয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং হিপিরা তাদের যাওয়ার রুট বদলায়। কিন্তু হিপিরা যাতে পরের গ্রামে আশ্রয় না নেয় রাত কাটাতে সেইজন্যে গ্রামের মানুষ পুলিশের কাছে আবেদন করলে পুলিশ জানায় কোর্টের হুকুম ছাড়া তাদের পক্ষে হিপিদের নিষেধ করা সম্ভব নয়।'

বব চোখ খুললেন। তৎক্ষণাৎ ছবিটা সরে গিয়ে ওয়েদার চার্ট ফুটে উঠল। যেটুকু চোখে এল তাতে দেখলেন হিপিদের ক্যারাভান এগোচ্ছে। ওরা এখন কোন রাস্তায় যাচ্ছে? আহা, যে গ্রামে রাত কাটাবে তাদের কি দুর্দশা। এখন তো কোর্ট থেকে অর্ডার আনার সময় নেই। তাঁকে তাকাতে দেখে অ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবা হল?'

'হুঁ। তুমি বরং চার্লসকেই বিয়ে করো। বেচারা কেন্টের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বাকি জীবনটা ভালোই কাটবে। আমি বলছি, চার্লস আর তুমি খুব সুখী হবে।' বব উঠে দাঁড়ালেন।

হাঁ হয়ে গেল অ্যান, 'তুমি কি বলছ? কেন্টকে আমি যে ভালবাসি।'

'ভালোবাসো। ভালোবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনও মানে নেই। চার্লস কি পাত্র হিসেবে মন্দ?'

'না, তা অবশ্য নয়। তবে ওর তো বদলির চাকরি।'

'ভালোই তো। অনেক জায়গা দেখতে পাবে ওকে বিয়ে করলে। চলি।' বব আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে হল কেন্ট ছোকরাকে একটা ফোন করে সর্তক করে দেওয়া দরকার। এই মেয়েটার বুদ্ধি একটুও বাড়েনি। বাড়বেও না।

অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের একটু-আধটু ফষ্টিনষ্টি সবকালেই থাকে। বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকার নিয়মটা এই গ্রামেও চালু। তার নিজের নাতনি তো মা হয়েছে বিয়ে না করেই। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ শোভন মানসিকতা কাজ করে। যে যাকে ভালোবাসে তাকে না হারানো পর্যন্ত সৎ থাকে। অথবা কি করছি সেটা নিজের কাছে স্পষ্ট থাকলে অন্য কাউকে বিরক্তও করা হয় না। বব নিজে খুব একটা কনজারভেটিব নন। তাঁর যৌবনে লিজা আসার আগে অন্তত দুটো ক্ষেত্রে তিনি নরম হয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা শোভন চেহারা ছিল।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে বব চট করে সরে এলেন বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির তলায়। আর তখনই তিনশো এগারো নম্বর বাসটা এসে দাঁড়াল। এই দোতলা বাসটা তিনটে গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। আজ কোনও যাত্রী নেই, কোনও নামার লোকও নেই। কিন্তু না, একটু ভুল হয়। মাথায় ফুলের ছবি আঁকা টুপি, পরনে জিন্সের প্যান্টের ওপর জ্যাকেট, হাতে বড় সাদা ব্যাগ নিয়ে একজন নামল। তাকে প্রথমে চিনতে পারেননি বব। কিন্তু বাসটা চলে যাওয়ামাত্র ববের মনে হল খুব চেনা-চেনা মানুষটি। যদিও জিনসের প্যান্টে নিতম্ব বড় ভারী দেখাচ্ছে আঁট হয়ে কাপড় সেঁটে থাকায়, কিন্তু একটু আগের চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডোরা যে এখানেই এসে নামবে কে জানত! ষাট

বছর তো অবশ্যই, লিজার সমবয়সিও হতে পারে অথচ লিজার থেকে কী স্মার্ট! শরীর মাঝে-মাঝে স্থূল হয়েছে বটে কিন্তু এখনও চমৎকার চটপটে। আর সেই সময় বব ধরা পড়ে গেলেন। ডোরা ওঁকে দেখে ব্যাগ রাস্তায় নামিয়ে ছুটে এল, 'আঃ বব। তোমাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি। মাই সুইট বব।'

কিছু করার আগেই দু-হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল ডোরা। একটু সামলে নিয়ে বব বললেন, 'যাক, চিনতে পারলে তাহলে!'

'চিনব না? পঞ্চাশ বছর হল, না? পঞ্চাশ বছর আগে তুমিও আমাকে প্রথম নারীত্বের আনন্দ দিয়েছিলে। এই পঞ্চাশ বছরের সব ভুলতে পারি কিন্তু ওই দুপুরটা? অসম্ভব।' ডোরার হাত তখনও ওঁর কাঁধে। দাঁতগুলো কি বাঁধানো? পঞ্চাশের হিসেবটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ডোরার বয়সটা তিনি ভুল হিসেব করেছিলেন।

বব বললেন, 'তোমাকে কিন্তু এখনও চমৎকার দেখাচ্ছে। এখনও অ্যাট্রাকটিভ।'

'রিয়েলি? এই নতুন প্যান্টটা বানাতে সাজেস্ট করল আমার নাতনি। ওঃ, তুমি যদি ওকে দেখতে! ঠিক আমার পনেরো বছর! যাক, সাতদিন এখানে থাকব বলে এসেছি লিজার খবর কী?'

'ভালো আছে। তবে বয়স হলে যা হয়।'

'ওঃ বয়স। ভাবলেই বয়স নইলে কি! লিজা কিন্তু চিরকালই ঘরকুনো, তোমার ওকে বিয়ে করা উচিত হয়নি বব, একথা তোমাকে চিরকাল বলে এসেছি। আমার স্বামীটির সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাত। তা তিনি গেলেন এমন সময়ে যে পাত্র খুঁজে পাব না আমি।' খিলখিলিয়ে হাসল ডোরা।

'চেষ্টা করলে পারতে।' বব কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছিলেন।

মুখ-চোখে কিশোরী হয়ে গেল ডোরা, 'সেকথা কি আর বলব। অন্তত তিনজন সত্তর পার হওয়া বুড়ো আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে। কিন্তু ওদের দিকে তাকালেই নিজেকে কেমন বুড়ি মনে হয়। তোমার মতো স্মার্ট মানুষ একটাও দেখলাম না। আমার ভাইটির খবর কী?'

'ভালো। ও তো গত বছর আর একটা ফলের বাগান কিনেছে। নেশাও কম করে।'

'তাহলেই ভালো। ঠিক আছে, আমি চলি। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে?'

'আমার বাড়িতে এসো।'

'না-না, ওখানে যাব অন্য সময়ে। আমাদের খামারবাড়িতে যাব কাল সকালে। ওখানেই চলে এসো। বাই বব।' হাত নেড়ে চলে গেল ডোরা। কিছুক্ষণ নেশাগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন বব। যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ যেন সমানে ঝড় তুলল। এবং হঠাৎ বব আবিষ্কার করলেন শরীরের রক্তে যেন স্রোত পালটাচ্ছে। এখনও যে জোয়ারভাটা খেলে, খেলতে পারে তা জেনে চমকিত হলেন তিনি। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, এবার হিসাবটা ঠিক, তিন ছেলে আর নাতি-নাতনি নিয়ে অন্য গ্রামে যার সংসার সে এসে ওই আঁটো প্যান্ট আর কথার দোলায় এখনও তাকে দুলিয়ে দিল। সে ছিল না পঞ্চাশ বছর আগের এক উজ্জ্বল দুপুরে খামারবাড়ির খড়ের গাদায় শুয়ে থাকা পনেরো বছরের তেজি মেয়েটা? এই গ্রামে ডোরা যখন আসত তখন কদাচিতই দেখা হত। ওর স্বামী মারা যাওয়ার পর দু-তিনবার দেখা হয়েছে। তখন হয় লিজার সঙ্গে ছিল নয় ওর ছেলেরা। আজ একা-একা কেমন যেন করে দিয়ে গেল মেয়েটা। বাড়ির দরজায় এসে বব হেসে ফেললেন। পঁয়ষট্টি বছরের কোনও বৃদ্ধাকে কি মেয়ে বলা যায়?

তন্ময় হয়ে হিচককের ছবি দেখছিলেন লিজা। এটা সেই গল্প যার শেষে খুনি ওষুধ খাচ্ছে ভেবে ভুল করে কেমিস্টের দেওয়া বিষের পুরিয়া মুখে ঢালবে। অন্তত দুবার দেখেছে লিজা অথচ টিভির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন এর চেয়ে বিস্ময় আর কিছু নেই। বব পাশের সোফায় বসে বললেন, 'একটু আগে ডোরার সঙ্গে দেখা হল।'

'ও।' লিজার ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হল কি না বোঝা গেল না।

'তুমি এই ছবিটা দুবার দেখেছ।'

'ওঃ, ডোন্ট টক। হোয়েন ইউ টক রাবিশ। এটা হিচককের ছবি।' হাত নাড়লেন লিজা। অতএব ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন বব। ল্যাংড়া হয়ে যাওয়া খুনি প্লেনের সিটে বসে হোস্টেসের কাছে জল চাইল। হোস্টেস জল দিতে সে ওষুধ ভেবে তৃপ্ত মনে সেটা মুখে দিয়ে পুরিয়া ঢালল গলায়। ছবিটা শেষ হতেই লিজা বললেন, 'কার কথা বলছিলে?'

'ডোরা! ভাই-এর বাড়িতে থাকবে বলে এসেছে। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

'ডোরা? ও, তোমার ডোরা! ইউ স্লেপ্ট উইদ হার ফিফটি ইয়ার্স ব্যাক! ইজন্ট ইট, হাউ ইজ শী?' নির্লিপ্ত মুখে প্রশ্ন করলেন লিজা। ঠোঁট কামড়ালেন বব। এটা প্রশ্ন করার ধরন হল? বউ-এর কাছে কিছুই লুকোবেন না ভেবে কত বছর আগে বিয়ের পরে ঘটনাটা স্বীকার করেছিলেন। আজ যেন আলমারি খুলে গাউন বের করল। তিনি উত্তর দিলেন না। লিজা সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'যে বয়সের যা। তোমার ডোরাকে বলো একটু যেন আয়নার সামনে দাঁড়ায়। ওর ভঙ্গি দেখে বাইশ বছরের ছোকরারাও রাত্রে ঘুমায় না। কিন্তু ও হল মরুভূমির আলেয়া। ভঙ্গিটুকুই সার।'

চমকে গেলেন বব। এই বাড়ি এবং এই গ্রামের বাইরে জীবনে যায়নি লিজা। অথচ ডোরার হালফিল খবর রাখছে কেমন করে? মেয়েরা কি সবসময় একটা গোপন সূত্র রেখে দেয় স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকাদের জন্যে?

টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। চাঁদে চকোলেট ফেলে এসেছিল একদল নভোচারী। ফলে সেই চকোলেটের লোভে অ্যামিবা এল, তা থেকে পিঁপড়ে জন্মে গেল। পিঁপড়ে থেকে পতঙ্গ, পতঙ্গ থেকে পাখি, পাখি থেকে মুরগি, মুরগি থেকে খরগোশ, খরগোশ থেকে বাঁদর, বাঁদর থেকে শিম্পাঞ্জি এবং শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ। পরের ট্রিপে নতুন নভোচারীরা যেতেই সেই মানুষটি হাত বাড়িয়ে চকোলেটের মোড়ক দেখিয়ে আর একটা চাইল।

তারপরই বি বি সি-র নিউজ বুলেটিন শুরু হল। 'মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন লিবিয়ার সঙ্গে এখন কোনওরকম কথা শুরু করার সময় হয়নি। সিংহলে তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘাতে দশজন রাষ্ট্রীয় সেনা মারা গেছে। ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল এখন বুকিদের কাছে ফেবারিট। হিপিরা পুলিশের আদেশ মেনে রুট পালটেছে। কিন্তু যেসব গ্রামের ওপর দিয়ে তারা যাবে এবং রাত কাটাবে তারা শঙ্কিত। হিপিরা বলছে তাদের টাকা ফুরিয়ে আসছে, গাড়ির তেলও নেই।' বব খবরটা শুনছেন মন দিয়ে। লিজা উঠে গেলেন কিচেনে। সব খবর শেষ হওয়ার পর হিপিদের ছবি এল। বাচ্চাগুলোর পায়ে মোজা নেই। লোকগুলো যেন শয়তানের সন্তান। ববের মনে হল এদের এখনই দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তারপরেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টিভি-র পরদায় হিপিদের যাওয়ার পরিবর্তিত রুট লিখে দেওয়া হবে। প্রথমে এল হিপিদের প্রতিবাদের ছবি। একটা অল্পবয়সি হিপিনি করুণ গলায় বলল, 'কাল সারাদিনে আমি মাত্র দু-পিস রুটি খেয়েছি। বিজি হাইওয়ে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পুলিশ আমাদের যে রাস্তায় যেতে বলছে সেখানে খাবার দেবে কে? আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে আকাশে তলায় থাকতে পারি না। আমি আমাদের বাচ্চাদের জন্যে আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করছি। আমরাও মানুষ।'

মানুষ! বব মাথা নাড়লেন, মানুষ কাকে বলে? ওই সঙের মতো সাজ, নোংরামির জন্যে যাদের কাছে যাওয়া যায় না তারা মানুষ। এই সময় টিভির পরদায় ম্যাপটা আঁকা হল। পরিবর্তিত পথ ধরে হিপিরা কীভাবে যাবে। এবং তখনই তাঁর গলায় চিৎকার ছিটকে উঠল। লিজা ছুটে এলেন, 'কী হল বব? শরীর খারাপ লাগছে? বব!'

বব কোনওরকমে আঙুল তুলে টিভিটাকে দেখালেন। লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? কি দেখেছ ওখানে? কেউ মারা গেছে?'

ততক্ষণে বব লাফিয়ে উঠেছেন। একেবারে টিভি-র পরদার কাছে চলে গেলেন তিনি। যাচ্ছলে।

ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি দেখাচ্ছে। তারপর সেখান থেকে ঘুরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানালেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল লিজা। হিপিস আর কামিং।'

'কোথায়? কখন? কবে?'

'ওঃ। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি বলছি হিপিরা আসছে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে ওরা যাবে। এখন কি হবে? উঃ, আমি ভাবতে পারছি না।' বব ছটফট করছিলেন।

লিজা একটু অবাক, 'তাতে হয়েছে কি? হাইওয়ে দিয়ে যেযার মতো যাবে তাতে তোমার উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? ও বব, দিস ইজ টু-মাচ!'

বব দৌড়ে এলেন, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এরা কারা? পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা জীব। ওরা প্রকাশ্যে সেক্স করে, চুরিচামারি, ছিনতাই ওদের হাতের ময়লা। সবরকমের ড্রাগস ওরা খেয়ে থাকে। স্নান করে না। তার চেয়ে বড় কথা কোনও সামাজিক নর্মস মানে না। এরা যে কি তা শুধু ওরাই জানে। এই লোকগুলো যদি গ্রামে ঢুকে যায়? সমস্ত গ্রামটা বিযাক্ত হয়ে যাবে তাহলে। উই মাস্ট ডু সামথিং।'

বব উত্তেজিত হয়ে আবার ছাতা নিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে টেড দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। বব চিৎকার করলেন, 'হেই টেড। শুনেছ? খবরটা শুনেছ?'

'কী খবর বব?' নির্লিপ্ত চোখে তাকাল টেড।

'দে আর কামিং। হিপিস। ওরা এই গ্রামের পাশ দিয়ে যাবে। ওরা যদি গ্রামে ঢুকে পড়ে। ভাবতে পারছ ব্যাপারটা? আড়াই হাজার হিপি।' বব ওর কাছে চলে এলেন।

এবার টেডের চোখ কপালে উঠল, 'মাই গড। কিন্তু কে তোমাকে খবরটা দিলে?'

'টিভি! টিভিতে এইমাত্র বলল। আমাদের গ্রামের নামও লিখে দিয়েছিল।'

'কিন্তু ওরা যদি আসে কি করতে পারে বলো তো?'

'তুমি জানো না? তোমার দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যেতে পারে। তোমার ছোট ছেলেটাকে ট্যাবলেটের নেশা ধরিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া ওরা যে এইডসের জার্ম ক্যারি করছে না তা তুমি জানো না।'

'দেন উই মাস্ট স্টপ দেম। লেটস গো টু শেরিফ।' দোকান খোলা রেখে পারতপক্ষে বের হয় না টেড। পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর দোকানটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'মাঝে-মাঝে মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত, তাই না বব?'

বব বললেন, 'মাঝে-মাঝে।'

এখনও রাস্তা ফাঁকা! টেড জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার লাঞ্চ হয়ে গেছে বব?'

বব মাথা নাড়লেন, 'না। আমি সাধারণত লেট লাঞ্চ করে থাকি।' ববের খুব খারাপ লাগল। এইরকম সমস্যা যখন ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে তখন টেড খাওয়ার কথা ভাবছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত গ্রাম জেনে গেল হিপিরা আসছে। একা বব নয় অনেকেই টিভির পরদায় খবরটা দেখেছে। তবে বেশিরভাগ রাতজাগা মানুষ তখনও ঘুমিয়ে থাকায় খবরটা তাদের শুনতে হল। বব এবং টেডের উত্তেজনার অনেকটাই তখন ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড় জমেছে। রুটির কারখানার মালিক ফিলিপ চিৎকার করে বলছিল, 'হাইওয়ে দিয়ে ওদের ক্যারাভান যদি যায় যাক কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যেন না ঢোকে।'

আলোচনারত শেরিফের কানে কথাটা পৌঁছাতে তিনি মাথা নাড়লেন, 'ঠিক কথা। বব, কেউ যদি হাইওয়ে দিয়ে কোথাও যায় তাহলে আমরা তার যাওয়া বন্ধ করতে পারি না। হাইওয়ে সরকারের সম্পত্তি। কিন্তু ওরা যদি গ্রামে ঢুকতে চায় তাহলে আপত্তি জানাতে পারি। দরকার হলে আমরা কোর্টে যেতে পারি।'

ইলিংওয়ার্থকে এই গ্রামের সবচেয়ে বিষয়ী মানুষ বলা হয়। হাইওয়ের ধারে তাঁর বিশাল

ফলের বাগান আছে। বৃদ্ধের কৃপণ হিসেবেও ভালো নাম। শেরিফের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কোর্ট?'

'হ্যাঁ। কোর্ট থেকে আমরা ইনজাংশন আনতে পারি। আমাদের এলাকায় কেউ যেন ঢুকতে না পারে। পুলিশ তো ওদের সঙ্গেই আসছে। কোর্টের অর্ডার ওদের দেখালে পুলিশ সেটা মানতে বাধ্য করবে। বাট, স্টিল এসব করার কোনও দরকার নেই বলে আমার বিশ্বাস। আপনারা অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন।' শেরিফ বললেন।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, 'আমরা এই গ্রামের শান্তিপ্রিয় ব্রিটিশ নাগরিকরা আশঙ্কা করছি যে হিপিদের ক্যারাভানটি যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের শান্তি বিপন্ন হবে। তাই মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করছি যাতে তিনি অগ্রিম আদেশ জারি করে ওদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।'

ইলিংওয়ার্থ বললেন, 'কিন্তু কোর্টে গেলে তো খরচ আছে। গ্রামের স্বার্থে সবাই চাঁদা দিক। একটা ফান্ড তৈরি হোক। শেরিফ প্রেসিডেন্ট, আমি ক্যাশিয়ার।'

ফিলিপ প্রতিবাদ করল, 'কেন বাবা? হাইওয়ের কাছাকাছি আমার কোনও সম্পত্তি নেই, আমি চাঁদা দিতে যাব কেন? আর চাঁদা দিলে কে ক্যাশিয়ার হবে তা ভাবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

ডোরম্যান ম্যাথুজ বলল, 'হিপিদের এত ভয় পাওয়ার কি আছে! ওদের চেহারা তো দেখেছি। একটা ঘুষি মারলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'

শেরিফ বললে, 'না-না, কোনও মারামারি নয়।'

ওস্কার ছোকরা বলল, 'শেরিফ। এই গ্রামের লোকগুলো কি পাগল? কোথায় রইল হিপিরা আর এখানে বসে সবাই আকাশ-পাতাল ভাবছে। ওরা একটু নোংরা বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ওদের আমার খুব রোমান্টিক লাগে। ঘর ছাড়া বাঁধন হারা—।'

সঙ্গে-সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিবাদ উঠল। বব বললেন, 'ওস্কার একথা বলতেই পারে। দূরে দাঁড়িয়ে অন্যের বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে কেউ-কেউ তো খুশি হয়। সে এই গ্রামের ছেলে নয়, তাই গ্রামের মানমর্যাদা সেন্টিমেন্ট সে বুঝবে কি করে!' বলতে-বলতে ঘড়ি দেখলেন বব। তারপর বললেন, 'তিন মিনিট বাদেই টিভিতে খবর শুরু হবে। উই মাস্ট ওয়াচ দ্যাট।'

শেরিফের হুকুমে সেখানেই একটা সেট আনানো হল। সবাই উন্মুখ হয়ে দেখল নিউজ বুলেটিন, 'আজ একটু আগে হিথরো এয়ারাপোর্টে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বোমা রাখার খবর আসায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বথামের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। হিপিরা হাইওয়ের পাশে একটি গ্রামে আশ্রয় নেওয়ায় গ্রামবাসীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।'

বব চিৎকার করে উঠলেন, 'লুক, শুধু আমরাই নয় অন্য গ্রামের মানুষেরাও আদালতে যাচ্ছে। ওরা আগে থেকে ইনজাংশন না চেয়ে যে ভুল করেছিল আমরা তা করব কেন? কী হে ওস্কার, এখনও কি ওদের রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

ওস্কার নীরবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। টেড বলল, 'আসলে যে এই গ্রামে জন্মায়নি, বড় হয়নি, সে কি করে বুঝবে গ্রামের সেন্টিমেন্ট!'

শেরিফ বললেন, 'ও. কে! চাঁদা তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। হাইওয়ের পাশে যার জমি অথবা ফলের বাগান আছে সে এখনই কোর্টে যাক। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। ছুটির দিন হলেও স্পেশ্যাল অর্ডার বের করতে অসুবিধে হবে না। এটা করলেই হিপিরা আর গ্রামে ঢুকতে পারবে না।'

বিকেলের মধ্যে এগারোটা আবেদন জমা পড়ল আদালতে। এবং ইনজাংশন পাওয়া গেল। হাইওয়ে বরাবর প্রতিটি বাগান এবং জমি এখন আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। কোনও ব্যক্তি বা দল

মালিকের বিনা অনুমতিতে সেখানে পা দিতে পারবেন না আগামী এক মাসের মধ্যে। মোটামুটি একটা নিশ্চিতভাব এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শেরিফ জানিয়ে দিয়েছেন হিপিরা যখন হাইওয়ে দিয়ে যাবে তখন গ্রামের কেউ যেন সেখানে না যায়। এর ফলে হিপিদের উপেক্ষা করা হবে। সারা বিকেল বব আর টেড যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই বললেন ওই সময় যেন অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের বাড়িতেই আটকে রাখা হয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত আন্তরিক ইচ্ছে হলেও সবাই বলল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো তুমি জানো। তারা কোনও উপদেশই শুনতে চায় না। হিপিরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাই শান্তি পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।'

রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। হিপিরা এখন এই গ্রাম থেকে মাত্র নব্বুই মাইল দূরে আছে। তার মানে ইচ্ছে করলে দুপুরের অনেক আগেই ওরা এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটা কি করবে? যেভাবে ওরা পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে?

ঘুম না হওয়ার আর একটা কারণ লিজা। হঠাৎ কাল রাত্রে শুয়ে-শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ ক্যাসিনোয় গিয়েছিলে?'

বব সরল মনে উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ।'

'তুমি তো জুয়া খেলো না, তাহলে ওখানে যাওয়ার কি দরকার?'

বব হেসে ফেলেন, 'মিসেস হোমসের সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে হল।'

'আমার সঙ্গে তো কথা বলতে গেলে তোমার মুখে হাসি ফোটে না।'

'এই তো হাসছি।'

'শোনো বব। ডোরার সঙ্গে দেখা করবে না আলাদা।'

'কী আশ্চর্য, কথা হচ্ছিল হোমসকে নিয়ে, এর মধ্যে ডোরা আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে। আমি সব আগাম টের পাই।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমার কবরে যাওয়ার বয়স হয়ে গেছে।'

'পুরুষমানুষের স্বভাব যা তাতে কবরে শোওয়ার পর পাশের কফিনে কোনও মেয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া বোকামি।' ধীরে-ধীরে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছিল। প্রতিবাদ করেননি বব। কোনও লাভ হত না। মেয়েরা যখন বাঁকা কথার স্রোত বইয়ে দেয় তখন তাতে যুক্তির বাঁধ দেওয়া বোকামি। কিন্তু তারপর থেকেই মন খারাপ হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলেন আকাশের অবস্থা একটুও পালটায়নি। কিন্তু ওয়েদার ফোরকাস্টে বলল দুপুরের পর রোদ উঠবে। হিপিদের খবরটা আগ্রহ নিয়ে দেখলেন বব। একই অভিযোগ, আমাদের তেল নেই, খাবার নেই, টাকা নেই। কিন্তু কখন তারা বিদেয় হবে তা বলল না ওরা। বব ইলিংওয়ার্থকে ফোন করলেন, 'তুমি কি একবার বাগানটা দেখে আসবে?'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'আমি কাল রাত্রে ওখানে ছিলাম বব। সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আবার লাঞ্চের পর যাব। তবে তোমার জমি আর হাইওয়ের মাঝখানে বাউন্ডারির তার একটু নিচু হয়ে গেছে দেখে এলাম।'

খবরটা শোনার পর আর দেরি করলেন না বব। লিজা ঘুমাচ্ছে এখনও। তিনি দরজা টেনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হলেন। আজও সকালে রাস্তায় লোক নেই। অনেক ঘুরে-ঘুরে জমিতে পৌঁছতে হয়। বুড়ো জন ওকে দেখে এগিয়ে এল, 'গুড মর্নিং, বব। হঠাৎ সাতসকালে—শরীর ঠিক আছে তো?'

বুড়ো জন হল কেয়ারটেকার। অনেককালের লোক। এমন ভালোমানুষ বড় একটা দেখা যায় না। বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ঠিক আছে তো জন?'

'আমি যদ্দিন না মাটিতে যাব তদ্দিন সব ঠিক থাকবে বব। কাল মিস্টার ইলিংওয়ার্থ এসেছিলেন। তাঁর কাছেই হিপিদের খবর পেলাম। ষাট বছর আগে একবার পঙ্গপালের খবর হয়েছিল।

তোমরা সেইরকম ভয় পাচ্ছ দেখছি।'

'ভয় নয় জন। তুমি টিভি দেখলে বুঝতে পারতে।' বব ভেতরে ঢুকলেন। ছোট বাংলো। ফলের বাগান। আর তারপর জমি। তিনি জনকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হাইওয়ের সামনে পৌঁছে গেলেন। মাঝখানে খানিকটা ঢালু জমি আর একটা তারের বেড়া ব্যবধান তৈরি করেছে। এখন ফসল শেষ। তবু এখানে এলেই বুক জুড়িয়ে যায় ববের। ছেলে কিংবা নাতনি এসবের মর্ম বুঝল না। তিনি চলে গেলে এদের কি করে সামলাবে লিজা ! এত সবুজ এত নরম মাটি। বব চারপাশে তাকালেন। ইলিংওয়ার্থ বলেছে সে দেখেছে তার ঝুলে পড়েছে। কিন্তু কোথাও তেমন চোখে পড়ল না। অনেক খুঁটিয়ে দেখার পর একটা জায়গায় সামান্য নিচু মনে হওয়ায় তিনি জনকে বললেন ওখানকার তারটা যেন এখনই ঠিক করে দেওয়া হয়।

জন বলল, 'হোয়াট ফর? ওখান দিয়ে কোনও জন্তু ঢুকতে পারবে না।'

'হিপিরা ঢুকতে পারে জন।'

'মাই গড। কেউ যদি ঢুকতে চায় তো তারটা টপকেও ঢুকতে পারে। জন্তুরা সেটা পারবে না। মানুষ এলে অবশ্য মামলা করতে পারো।'

বব স্বীকার করলেন কথাটা। তারপর বললেন, 'তুমি এখানে একটা বোর্ড টাঙিয়ে দাও জন। বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে শাস্তি পেতে হবে। আদালতের আদেশে সুরক্ষিত এলাকা। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।'

জনকে ওখানে রেখে খামারবাড়িতে ফিরে এলেন বব। কাঠের দুটো ঘর আছে। একসময় লিজাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে দু-তিন দিন থেকে যেতেন। এখন আর আসা হয় না। জন সব ব্যবস্থা অবশ্য ঠিকঠাক রেখেছে। ঘুরে-ঘুরে দেখলেন বব। শৈশবের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এবং তখনই তার মনে পড়ল ডোরার কথা। ডোরা বলেছিল আজ সকালে সে ওদের খামারবাড়িতে আসবে। পঞ্চাশ বছর আগে এক দুপুরে ওদের সেই খামারবাড়িতে তার যৌবনের স্মৃতি রয়েছে।

লিজার কথা মনে পড়ল। ওর আপত্তির কথাও। এবং সেইসঙ্গে প্রতিক্রিয়া হল। তিনি কোনও অন্যায় করছেন না তবু লিজার অন্যায় আপত্তিতে যুক্তি থাকলে অস্বীকার করার প্রশ্নই উঠত না। তিনি আবার গাড়িতে উঠলেন। অন্তত একবার হ্যালো বলে যাওয়া ভদ্রতা, লিজা যাই মনে করুক।

নেশাভাং করে ডোরার ভাই সম্পত্তির অনেকটাই ইলিংওয়ার্থকে বিক্রি করে দিয়েছিল, কিন্তু এখনও যা আছে তা যথেষ্ট। ওদের খামারবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বব ডোরার ভাই-এর গাড়িটাকে দেখতে পেলেন। অর্থাৎ ওরা এসেছে।

পা বাড়াতেই ডোরার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। ষাট ছুঁয়েছে কিন্তু ডোরার চেয়েও বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাঁকে দেখে বলল, 'গুড মর্নিং বব। তুমি এসে ভালোই হল। আমাকে এখনই একটা কাজে যেতে হবে কিন্তু ডোরা চাইছে আর একটু থেকে যেতে। আশা করি তুমি ওকে একটা লিফ্‌ট দিতে আপত্তি করবে না।'

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করে সে চলে গেল। ওর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে গেলে বব চারপাশে তাকালেন। এদের এখানে এত পাখি আসে কোত্থেকে। তাঁর খামারেও পাখি ডাকে কিন্তু এত একসঙ্গে নয়। বব এগিয়ে গাছপালার মধ্যে দাঁড়ালেন। এদের খামারবাড়িটায় তিনটে ঘর। ওপাশে খানিকটা কৃত্রিম জঙ্গল। ওখানেই পঞ্চাশ বছর আগে—। বব নিশ্বাস ফেললেন। মানুষের জীবনটা এত ছোট আর তার চেয়ে দ্রুত ফুরিয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর আগের এই চামড়া দুই আঙুলে টানলেন বব। একটু টান-টান হল কিন্তু তাতে অজস্র সাদা ফাটা দাগ। ছেড়ে দিয়ে এবার আঙুল বোলালেন জায়গাটায়।

কিন্তু ডোরা কোথায়? বব চারপাশে তাকালেন। এখন রোদ নেই কিন্তু উত্তাপ বেড়েছে, বৃষ্টি খুব জলদি আসবে না। বব খামারবাড়িতে ঢুকলেন। নিচের দুটো ঘরে কেউ নেই। সেখানকার

আসবাবও খুব সামান্য। জন তার বাড়ি অনেক ভালো সাজিয়েছে। ডোরা গেল কোথায়? বব কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই ডোরার গলা শুনতে পেলেন, 'কে আসছে?'

'আমি বব।'

'মাই গড! তুমি অনেকদিন বাঁচবে হে। এতক্ষণ তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। সোজা ছাদে চলে এসো। সিঁড়িটা একটু দেখে এসো। বাঁ-দিক ঘেঁষে।' ডোরার উৎসাহী গলা শুনে তিনি সিঁড়িটার দিকে তাকালেন। ডান দিকে কোনও হাতল নেই অথবা ঘেঁষবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। খুব সাবধানে তিনি উঠে এলেন ছাদে। একঘরের ছাদ। তার মাঝখানে একটা আরাম চেয়ারে মাথায় টুপি চাপিয়ে শুয়ে রয়েছে ডোরা। ছোট প্যান্টি আর ব্রেসিয়ার ছাড়া অঙ্গে কিছু নেই। ওকে দেখে ডোরা বলল, 'সূর্য কখন উঠবে বলতে পারো? এটাকে কি সামার বলে? শরীরে একটু রোদ লাগাতে এখানে এলাম। ভাই চলে গেছে?'

হ্যাঁ।'

'যাক। তোমার গাড়িতে ফিরব আমি। বসো। দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তুমিই বলতে পারবে, এই শরীরটাকে তো পঞ্চাশ বছর আগেও দেখেছ, এখন কি পরিবর্তন হয়েছে বলো তো?' ডোরা আবার শুয়ে পড়ল মাথা হেলিয়ে।

বব তাকালেন। সত্তরের কাছাকাছি যার বয়স তার এমন শরীর থাকা সত্যি গুণের কথা। যদিও কোমরের চর্বি একটু ঝুলছে, বুকের ধার ভোঁতা হয়ে স্তূপে পরিণত হয়েছে কিন্তু ডোরার পায়ের গড়ন এখনও চমৎকার। এবং কোনওমতে যে বাঁকগুলো বেঁচে আছে তাকে সময় নষ্ট করতে পারেনি। তিনি হেসে বললেন, 'ডোরা, তোমার মনে নেই।'

'ননসেন্স। সেটাও তোমার ওপেনিং ছিল, না?'

'হলেও। পঞ্চাশ বছর কম কথা নয়। নিজের মুখই মনে পড়ে না।' ববের কথা শেষ হওয়ামাত্র ডোরা উঠে একটা চাদর ছাদে বিছিয়ে দিল। তারপর ববের হাত ধরে বলল, 'আমি তোমার বুকের মাথা রেখে একটু শোব বব। একদম পবিত্র শোওয়া।'

বব বললেন, 'সেই অর্থে আমাদের তো অপবিত্র হওয়ার কোনও ক্ষমতাও নেই।'

হঠাৎ সজোরে চড় মারল ডোরা। বব এমনটা আশা করেননি। তিনি আচমকা আঘাতটা কোনওমতে সামলালেন। গাল জ্বলছে। ডোরা তখন চিৎকার করছে, 'ইউ কাওয়ার্ড। পঞ্চাশ বছর ধরে তুমি আমায় জ্বালিয়েছে।'

'আমি, আমি জ্বালিয়েছি?'

'অফকোর্স। যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যখনই ওই দিনটার কথা মনে পড়ত তখনই তুমি জ্বালাতে।'

ববের শরীরে ক্রোধ এল। তিনি দু-হাতে ডোরাকে ধরেও ঠিক করতে পারলেন না কীভাবে আঘাত করবেন। ডোরা কোনও আপত্তি করল না। হঠাৎ তার বুকে মুখ ঘষে বলল, 'তোমার লেগেছে বব?'

'হ্যাঁ।' নিজের গলা ফ্যাসফেসে শোনাল ববের।

'তুমি আমাকে মারো। আমাকে রক্তাক্ত কর। আমাকে শেষ করে দাও। এইভাবে মৃতের মতো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার মনে সমুদ্র কিন্তু শরীরটা কেন কালাহারি হয়ে গেল বব? আমাকে বাঁচাও তুমি। পাগলের মতো আচরণ এখন ডোরার এবং সেই মুহূর্তে ববের মনে হল উঠে দাঁড়ানোর পর ডোরার এই লাস্যময়ী পোশাকে চেহারাটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি ধীরে-ধীরে ডোরার শরীরে হাত বোলাতে লাগলেন। সেই স্পর্শে বোধহয় স্নেহ একটু বেশিমাত্রায় ছিল নইলে ছিটকে সরে যেত না ডোরা, 'লুক বব, আমি ছয় বছরের মেয়ে নই। তুমি আমায় স্নেহ করছ? আমি ফসিল হয়ে গেছি তাই অনুকম্পা দেখাচ্ছ? আই ডোন্ট মিন ইট। আর কিছু

না থাক তোমার ঠোঁট দুটো তো আছে, দাঁত আছে, আমাকে শুষে নিতে পারছ না? কামড়াতে পারছ না? এগিয়ে এসো, আমি তোমাকে বলছি বব। তোমার এলিজার পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এই শরীর আছে? কাম অন—।'

আর তখন বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। বব চট করে বুক চেপে ধরলেন, মুখে একটু ভাঁজ পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে কৌটো বের করে একটা ট্যাবলেট জিভে ফেলে দিলেন। ডোরা দেখছিল ব্যাপারটা। তার গলায় স্বর বদল হল, 'তুমি কি বুকে ফিল করছ?'

বব চারপাশে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। অন্তত দশ মিনিট লাগবে ট্যাবলেটটার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। অবশ্য জিভে পড়া মাত্র আর বাড়বে না ব্যথাটা। যেন সাপের ফণা নামবার শেকড় নিয়ে চলাফেরা। ক'দিন আগেই বি বি সি একটা সাপুড়েদের ওপর তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল। সাপটা ফণা তুলছে কিন্তু যেই শেকড় দেখছে অমনি নুয়ে পড়ছে। আরামচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করতে ধীরে-ধীরে শরীব স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। এবং তখনই তিনি ডোরার গলা পেলেন, 'বব, আই অ্যাম সরি।' তিনি চোখ খুলে দেখলেন ছাদে বসে আছে ডোরা। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

'আই ডোন্ট নো। আজকাল একটু টেনশন বাড়লেই বুকের মধ্যে লোহার বল ড্রপ খায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।' ডোরা কোনওমতে বললেন।

'ই সি জি করিয়েছ কখনও?'

'না।'

'করিয়ে ফেল। ঠিক আছে, তুমি এই ট্যাবলেটটা জিভে রাখো। ইট উইল হেল্প ইউ। কাম অন বেবি। যে বয়সের যা। ইউ মাস্ট নট ফরগেট দ্যাট। পরম স্নেহে বব ডোরাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন, 'গিলে ফেলো না, লজেন্সের মতো ব্যবহার করো।'

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বললেন না। খোলা আকাশের নিচে দুজনে পাশাপাশি। একজন আরামচেয়ারে চোখ বন্ধ করে অন্যজন ছাদের ওপর বিছানো চাদরে টানটান। দুজনের শরীরে ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে এবং শিগগির অশান্ত হৃদয় আরও জখম হওয়ার বদলে শান্ত হয়ে এল। এই সময় অত্যন্ত ক্লান্তি লাগে। ঘুমোতে পারলে আরও ভালো হত। উঠতে একটুও ইচ্ছে করছিল না ববের। তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন। হাওয়া দিচ্ছে। ঈশ্বর! নিজেই জানেন এখন শুধু অন্যের জন্যে বেঁচে থাকা। কার জন্যে? কীসের জন্যে?

ঘুম ভাঙতে কিছুক্ষণ ঘোরে রইলেন বব। এ কোন জায়গা, সময়টা কি বুঝতে-বুঝতে সময় গেল। তারপর ধড়মড় করে উঠে পাশে তাকালেন। ডোরা নেই, চাদরটাও। চট করে কবজি ঘোরালেন, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। লিজা নিশ্চয়ই খুব খেপে গেছে এতক্ষণ। চিন্তিত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ডোরাকে দেখতে পেলেন, 'শরীর ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'. বব হাসলেন, 'তোমার?'

'সাফোকেশন এখনও যায়নি। এসো লাঞ্চ রেডি।' ডোরা ডাকল।

'লাঞ্চ? আমি তো এখানে লাঞ্চ করব না।'

'কেন? ও, লিজা বসে আছে বুঝি? আমি এতক্ষণ কষ্ট করে—!'

'ও.কে। ঠিক আছে। চলো।'

'না, তোমাকে এখানে খেতে হবে না।' লাঞ্চের প্যাকেটগুলো আবার বন্দি করে ডোরা বলল, 'আশা করি তুমি আমাকে একটা লিফ্‌ট দেবে।'

'উইদ প্লেজার।'

খামার এলাকা ছেড়ে অনেকটা ঘুরে আসতে হয়। পথে কেউ কোনও কথা বললেন না। বাড়ির কাছাকাছি এসে ডোরা বলল, 'আমাকে এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।'

'আর ইউ সিওর?' বব গাড়ি থামালেন। ডোরা ওঁর দিকে তাকাল। হঠাৎ বব ওর হাত ধরলেন, 'আমাকে একটু চুমু খেতে দেবে?'

ডোরা সঙ্গে-সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, 'নো!'

'কেন?'

'আজ চুমু খেলে এটাই আমাদের জীবনের শেষ চুমু হয়ে যাবে। বাই বব।'

বাড়িতে ফিরে বব লিজার চিরকুটটি পেলেন। তিনি মিসেস আর্নল্ডের বাড়িতে গিয়েছেন। যদি বব লাঞ্চ খায় তাহলে সেটাকে তৈরিই পাবে। বুড়ি আর্নল্ডের বাড়িতে এই গ্রামের গুজব তৈরি হয়। ওখানে আজ যাওয়ার কি দরকার ছিল! বব খেয়ে নিলেন। তারপর টিভির সামনে পা ছড়িয়ে বসলেন। হিচককের ছবি দেখাচ্ছে। ছবিটা তিনি এর আগেও দেখেছেন। একটু ঝিমুনি এল দেখতে-দেখতে। বব চোখ বন্ধ করলেন। এরপর কতটা সময় গিয়েছে তিনি জানেন না। হঠাৎ হিপি শব্দটা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠলেন। খবর হচ্ছে। হিপিদের কনভয়টা এগিয়ে আসছে টিভির পরদায়। ওটা কোন জায়গা? রাস্তার নাম পড়তে তিনি চমকে উঠলেন। তাদের গ্রাম থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে আছে ওরা। যেখানেই ওরা থামতে চেয়েছিল সেখানকার গ্রামবাসীরা কোর্ট থেকে নেওয়া আগাম হুকুম ওদের দেখাচ্ছিল। পুলিশ সেটা পরীক্ষা করে হিপিদের গ্রামের মাটিতে পা রাখতে দিচ্ছিল না!

এখন হিপিরা আসছে।

বব এবার ওভারকোট, কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

শেরিফের অফিসের সামনে বেশ ভিড়। হিপিরা এসে পড়ল বলে। শেরিফ নির্দেশ দিলেন যেযার জায়গায় যেন চলে যায় কোর্টের অর্ডার নিয়ে। শেরিফ থাকবেন হাইওয়েতে। তিনি পুলিশকে সাহায্য করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে যেযার গাড়ি নিয়ে রওনা হল জমি-বাগান হাইওয়ের দিকে। ববের মনে হল এটা একটা যুদ্ধের মতো ব্যাপার। এইরকম উত্তেজনাতে তাঁর বুকে কোনও যন্ত্রণা হয় না। আশ্চর্য!

দূর থেকে ওদের দেখা যাচ্ছিল। বিশাল কনভয়টা এগিয়ে আসছে। সামনে পুলিশের একটা গাড়ি। বব ঠোঁট কামড়ালেন, এটা একটু খাতিরের মতো হয়ে যাচ্ছে না? ইলিংওয়ার্থের জমির সামনে কনভয়টা দাঁড়িয়ে গেলে সে চিৎকার করতে লাগল কোর্টের অর্ডার হাতে নিয়ে, 'ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড বাই দা অর্ডার অফ ল।' শেরিফ এবং একজন পুলিশ অফিসার অর্ডারটা পরীক্ষা করে হিপিদের লাউডস্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেই একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা কি পাগলা কুকুর? আমি আর পারছি না!'

বব উত্তেজিত, এবার তাকে অর্ডার দেখাতে হবে। জন তার পাশে দাঁড়িয়ে। দেখতে-দেখতে জন বলল, 'দে নিউ শেলটার, দে মে গো টু পল'স প্লেস।' এখন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কনভয়টা যাচ্ছে। কি নোংরা পোশাক। ! রুগ্ন দলাপাকানো নেশাগ্রস্থ মানুষের গাড়িগুলোর ওপর বসে আছে। ওরা কি বাচ্চাদের নেশা করায়? হঠাৎ কনভয়টা থেমে গেল। পুলিশ আর হিপিরা কথা বলছে। টিভির ক্যামেরা চলছে পাশ থেকে। আলোচনার বিষয়টা বুঝতে পারছিলেন না বব। এই সময় জন তার টপকে এগিয়ে গেল। শেরিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু বলবে জন?'

'ওরা কি চাইছে?'

'ওরা বলছে ওদের কাছে যা গ্যাস আছে তাতে আর মাইল পাঁচেক যেতে পারবে। পুলিশের কাছে ওরা একটা জায়গা চাইছে রাত কাটাবার। কারণ সরকারি সাহায্য কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আবার গ্রামের কোনও জায়গা কোর্টের অর্ডারের বাইরে নেই, তাই না জন?'

'একটু ভুল হয়ে গেছে শেরিফ।' বিনীত গলায় বলল। 'পলের জমিটার অর্ডার আনা হয়নি। পল মারা যাওয়ার পর থেকেই তো একটা ঝগড়া চলেছে ছেলেদের মধ্যে। কেউ মালিক হতে চায় না। ওটার কথা আপনারা খেয়াল করেননি।' জন যেন অনুযোগ করল।

লাল দাড়ির একটি হিপি জনের কথাগুলো শুনে সঙ্গে-সঙ্গে সিটি মারল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। এই হাইওয়ের পাশে একটি জায়গা পাওয়া যেখানে আদালতের হুকুম নেই। কিন্তু কোন জায়গাটা?

বব চিৎকার করলেন, 'হেই জন। কাম ব্যাক!'

জন ফিরে তাকাল। তারপর সুড়সুড় করে নেমে এল হাইওয়ে থেকে। সে ভেতরে ঢোকার পর বব প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'তোমার কি দরকার ছিল ওদের খবরটা দেওয়ার। বদমাস।'

জন মাথা নাড়ল, 'ওদের তো বলিনি। শেরিফ জিজ্ঞাসা করায়—তা ছাড়া, ওই মেয়েটাকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। পাঁচ বছরের বাচ্চা অথচ পায়ে মোজা নেই। ওর কি দোষ? ও যে কষ্ট পাচ্ছে ঈশ্বর কি দুঃখিত হচ্ছেন না?'

ততক্ষণে হিপিরা এসে জড়ো হয়েছে সামনের হাইওয়েতে, 'এই যে ওল্ডম্যান, সেই খালি জায়গাটা কোথায় দেখিয়ে দাও। উই উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ। এই যে, এইদিকে তাকান, আমাদের দেখে কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না? খবরটা অর্ধেক দিলেন কেন? জমিটা কোথায়?'

ক্রমাগত এইরকম অনুরোধ হতে দেখে বব বললেন, 'জন, ভেতরে যাও, জলদি।' সেই সময় একটি হিপিনি ছুটে এল তাদের কাছে, 'এই যে, তুমি যদি আমাদের জমিটার খবর দাও তাহলে আমি তোমার সঙ্গে শুতে রাজি আছি।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র জন দৌড়তে শুরু করল খামারবাড়ির দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর অশ্রাব্য শব্দগুলো ছুঁড়তে লাগল ওরা। এমনকী মেয়েটিও। বব কানে হাত দিলেন। ক্যারাভান আবার চলা শুরু করল।

কিন্তু ওরা জমিটা খুঁজে পেয়ে গেল। গ্রামের শেষপ্রান্তে পলের জমিতে কেউ কোর্টের আদেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকায় ওরা ধরতে পেরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পিলপিল করে নেমে এল ওরা হাইওয়ে থেকে। গাড়িগুলো এমন করে সাজাল যাতে দেওয়াল হয়ে যায়। তারপর ত্রিপল তুলে ঘর বানাল। মুহূর্তেই পলেদের সুন্দর মাঠ আর বাগান নরক হয়ে গেল। মাঠে নামবার সময় অবশ্য পুলিশ এবং শেরিফের সঙ্গে হিপিদের শেষবার ঝগড়া হয়ে গেল। যেখান সেখানে ক্যারাভান রাখার নিয়ম নেই। তার জন্যে নির্দিষ্ট পার্কিং লট আছে। কিন্তু পুলিশ আইনত একটা সময় ঠিক করে দিতে পারে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। হিপিরা স্পষ্ট বলে দিল যতক্ষণ না সরকারি সাহায্যে ওরা তেল কিনতে পারছে ততক্ষণে ওরা এখানে থাকছে। টিভির লোকেরা এখন ছবি তুলছে। ওপরতলায় খবর পাঠিয়ে পুলিশ খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছে। হিপিরা রাত কাটাবার আয়োজনে ব্যস্ত।

যে ভয় করা হচ্ছিল তাই হল। শেরিফ বললেন, 'এখন আর জনকে কিছু বলে লাভ নেই। বুড়ো মানুষ, মুখফসকে বলে ফেলেছে।'

পলেদের এক ছেলে বলল, 'কিন্তু ওরা আমাদের জমি নোংরা করে ফেলেছে এর মধ্যে। শুকনো ডালপালা ভেঙে আগুন জ্বালছে।'

বব রেগে গেলেন, 'এখন এসব বলে কি হবে? ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া করার সময় খেয়াল ছিল না? কাল সকালে দেখবে ওখানে কিছুই পড়ে নেই।'

ইলিংওয়ার্থ বলল, 'দেখতে হবে ওরা যেন গ্রামের মধ্যে না আসে। তবে জিনিসপত্র কিনতে

চাইলে প্রবলেম হবে।'

'কীসের প্রবলেম?' বব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কিছু বিক্রি করবে না। আজ গ্রামের সব দোকান বন্ধ করে দাও।'

ওস্কার ছোকরা বলল, 'দেখছেন ওদের পয়সা নেই আর খামোকা আপনারা ভয় পাচ্ছেন। তবে দেখতে হবে ওদের কাছে এল এস ডি আছে কিনা! আমি কোনওদিন জিনিসটা দেখিনি।'

শেরিফ বললেন, 'নো ওস্কার। কখনও ওসব করো না। তাহলে আমি কঠোর হতে বাধ্য হব। ওদের আজকের রাতটা কাটাতে দাও। পুলিশ কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই ওদের তেল দেবে! ততক্ষণ আমরা ওয়াচ রাখতে পারি।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাহারাদার বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। ঠিক হল হিপিদের দৃষ্টির বাইরে জঙ্গলের আড়াল থেকে নজর রাখা হবে।

ছোট-ছোট তাঁবুও পড়েছে। খোলামাঠটায় আড়াই হাজার মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মাঝে-মাঝে উনুন জ্বলছে। কুৎসিত চেহারার লোকগুলো কাঁদছে। গাছের আড়ালে টেডের পাশে দাঁড়িয়ে বব দেখলেন সন্ধে হয়ে আসছে। আলো জ্বলল। অনেকটা বেদুইনদের মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। তিনটে হিপি মাটিতে বসে গাড়িতে হেলান দিয়ে ওটা কি খাচ্ছে? টেড বলল, 'গাঁজা।' মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য এককালে ভালো ছিল। এখন সবাই টলছে। সন্ধের হাওয়া বইবার পর থেকেই ঠান্ডা নেমেছে। কিন্তু ওই মেয়েটাকে দ্যাখো, পাতলা একটা লুজ খাটো প্যান্ট আর নাভি অবধি নামা শার্ট পরে চোখের তলায় রং বোলাচ্ছে। মেয়েটার থাই ও পায়ে বেশ ময়লা। মোজা দূরের কথা একটা হাওয়াই চটি ছাড়া পায়ে কিছু নেই। অথচ কানে বাহারি গয়না ঝুলছে। বিকট সাজ শেষ হলে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গান ধরল। গানের কথা শুনে চমকে উঠলেন বব। মেয়েটির গান ধরা মাত্র ওপাশ থেকে লিকলিকে রোগা একটা দাড়িওয়ালা হিপি চলে এল গিটার হাতে। মেয়েটা গাইছে, 'পুরুষজাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না। পৃথিবীর সব পুরুষের শরীরের ওপর পা ফেলে আমি জীবনটা কাটিয়ে দিই। আমরা পয়দা করি আর ওরা কৃতিত্ব নেয়। আমাকে একটা পুরুষ দাও যার মুখে প্রথমবার থুতু ফেলার সুখ পাব।'

বব ফিসফিস করে বললেন, 'হরিবল্!'

টেড বলল, 'লুক বব, ওরা গাছগুলোর পেছনে প্রাকৃতিক কাজ শেষ করছে। আড়াই হাজার লোকের আবর্জনায় কাল গ্রামে থাকা যাবে না!' তারপর হেসে বলল, 'পলেরা ভালো সার পাবে অবশ্য।'

বব দেখলেন ক্যারাভানগুলোর ওপর বিচিত্র লেখা, 'আই অ্যাম কেয়ার অফ মি।' 'আই অ্যাম ট্রাভেলিং ফ্রম হেয়ার টু এটারনিটি।' 'হোম ইজ মেড ফর হোমোস।' 'জয়েন টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড।'

রাত বাড়লে একসময় সব শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত মাঠ, চরাচরের সঙ্গে-সঙ্গে হিপিরাও ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে-মাঝে আগুনের কুণ্ডের পাশ থেকে অবশ্য বাচ্চাদের কান্না উঠছে। জড়ানো গলায় তাদের থামানোর চেষ্টা চলছে। কখনও-কখনও কোনও পুরুষকণ্ঠ চিৎকার করে কিছু বলল। ব্যস আর কিছু নয়। পুলিশের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে। বব আর পারছিলেন না। তিনি বললেন, 'মনে হয় এবার আমরা যেতে পারি। ওরা সকালের আগে উঠবে না।'

কিন্তু তখনই একটা ঘটনা ঘটল। ম্যাথুস দুটো ছেলেকে ধরেছে। তাদের বয়স বড়জোর সতেরো-আঠারো। একজন কালো। চোরের মতো কখন হিপিদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। বেরুবার সময় ধরা পড়ে গেছে। ওদের কাছে পাউডার পাওয়া গেল। স্বীকার করল তিরিশ পাউন্ডে ওরা একটা হিপির কাছ থেকে তিনটে পুরিয়া কিনেছে। এর আগে কখনও নেশা করেনি, শুনেই এসেছে।

কৌতূহলী হয়ে আজ এসেছিল। কালো ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়জন এখানকার স্কুলমাস্টার মিস্টার গাওয়ারের ছেলে। শেরিফ বললেন, 'এ নিয়ে জল ঘোলা করে লাভ নেই।' ওদের ছেড়ে দেওয়া হল। পুরিয়া দুটো নষ্ট করে ফেলে স্থির করা হল ব্যাচ বাই ব্যাচ পাহারা দেওয়া হবে। টেড বলল, 'বব, তোমার খামারবাড়িতে রাত্রে থাকা যাবে?' বব আপত্তি করলেন না। তাঁর একবার মনে হল লিজাকে জানানো উচিত। তারপরেই স্থির করলেন, কোনও প্রয়োজন নেই। গ্রামের সবাই জানে তাঁবা কি করছেন।

বারোটা পর্যন্ত বব পাহারায় ছিলেন। এর মধ্যে তিনি অনেকবার অসুস্থ বোধ করলেন। তাঁর মনে হল সেক্সকে এরা হাত ধোওয়ার চেয়ে সহজ করে ফেলেছে। হিপিনিদের তুলনায় হিপিরা সেক্স সম্পর্কে অত্যন্ত নিস্পৃহ। নিজেদের কষ্ট দিতে এদের বেশ আরাম লাগে। ডিনারে যা ওরা খেয়েছে তা কোনও মানুষ খেতে পারে বলে ধারণায় ছিল না। কিন্তু সব ব্যাপারে ওরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। সেই সাজুন্তি হিপিনি তিনজন পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার চেষ্টা করে থুতু ছড়িয়ে এখন আগুনের পাশে চিত হয়ে পড়ে আছে। বারোটার সময় খামার-বাড়িতে ফিরে এলেন তিনি টেডকে নিয়ে। জন খাবার করে রেখেছিল। তাই খেয়ে ওয়াইন নিয়ে বসে বব টেলিফোন করলেন বাড়িতে। এর মধ্যেই লিজা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মিনিট দুয়েক পরে লিজার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো বব।'

বব বললেন, 'আজ আমি খামারবাড়িতে থেকে গেলাম ডার্লিং।'

লিজা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। জন বোকামি করে হিপিদের জায়গা বাতলে দিয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে লিজা বললেন, 'কখনও-কখনও মানুষের মনে দয়ামায়া উঠে আসে, কি করবে বলো।'

কথাটা খুব খারাপ লাগল ববের। তিনি বললেন, 'দে আর রিয়েল বিস্ট। তার চেয়েও অধম। একটা হিপিনি তিনটে লোকের সঙ্গে শোয়।'

লিজা বললেন, 'ওটা রুচির ব্যাপার। বার্ধক্যেও অনেকে যুবতী হতে চায়, তাই না?'

বব আবার হোঁচট খেলেন। লিজা কি ডোরার কথা বলছে? তিনি বললেন, 'যা হোক তুমি চিন্তা করো না। ও হ্যাঁ, আজ ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'জানি। তোমার বুকের ব্যথাটা কেমন আছে ডার্লিং?'

এবার সত্যি ধক্ করে লাগল ববের বুকে। তিনি কোনওমতে বলতে পারলেন, 'এখন নেই, ডার্লিং, গুড নাইট।'

'গুড নাইট বব।' লিজার গলার স্বর কি শীতল!

সকাল আটটায় হিপিরা চলে গেল। সরকারি সাহায্যে তেল কিনে, কিছুটা খাবার পেয়ে ওরা আবার হাইওয়েতে উঠে গেল। শেরিফ, বব, ইলিংওয়ার্থ, টেড, ম্যাথুজ, ওস্কাররা ওদের চলে যাওয়ার পর বিষণ্ন হয়ে পলেদের মাঠের দিকে তাকালেন। নরক হয়ে গেছে ওটা। মাঝে-মাঝে পোড়া ছাই, নোংরা এমনকী মলমূত্র ছড়ানো। বব বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ওরা গ্রামে ঢোকেনি। এই গ্রামের পবিত্রতা ওরা রাত্রে নষ্ট করে দিয়ে যেত তাহলে।'

শেরিফ বললেন, 'তবু প্রত্যেককে চেক করো, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সবাই ঠিকঠাক আছে কিনা।'

না, গ্রামের কারও গায়ে আঁচড় পড়েনি একমাত্র গাওয়ারের ছেলেটার ঘটনা ছাড়া। ওরা দুজনেরই শেরিফের কাছে গ্রামের সবার সামনে ক্ষমা চাওয়াতে ব্যাপারটা মিটেও গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল ববের। দশটা নাগাদ বাড়িতে ফিরলেন তিনি। লিজা এখনও ঘুমাচ্ছে। টিভি খুললেন। বি বি সি হিপিদের দেখাচ্ছে। দেখাক। এখন ওদের দায় পরের গ্রামের। ব্রেকফাস্ট

তৈরি করে খেয়ে নিলেন বব। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে লিজার ঘরে উঁকি মারলেন। লিজা নেই। সাতসকালে কোথায় গেল? হয়তো আর্নল্ডের বাড়িতে।

নিচে নেমে বব আবার টিভি খুলে পা ছড়িয়ে বসলেন। ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। বিজ্ঞাপনের পালা শেষ হলে সেই সুন্দরী সংবাদ-পাঠিকা আবার পরদায় এলেন, 'এখন আপনারা একটি স্পেশ্যাল ইন্টারভিউ দেখতে পাবেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে টিভির পর্দায় হাইওয়ের ছবি ভেসে এল। হিপিদের কনভয় চলছে। পাশের গ্রামের লোকরা তাদের জমির সামনে আদালতের আদেশ হাতে দাঁড়িয়ে। হিপিদের নেতা সেই লাল দাড়ির সঙ্গে টিভির প্রতিনিধি কথা শুরু করল। নেতা বলল, 'মনে হচ্ছে আপাতত আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা দু-হাজার পাঁচশো একজন ঠিকঠাক যেতে পারব।'

'সংখ্যাটা ঠিক অছে? একজন বাড়ল না?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমাদের দলে একজন এসেছেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা ক্যারাভানের দরজায় টিভির ক্যামেরা। আর চমকে সোজা হয়ে বসলেন বব। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। এবার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। কাঁপা হাতে কৌটোটা খুলে ট্যাবলেট জিভে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন বব। পরদায় তখন ক্যারাভনের ভেতরে ছবি ফুটেছে। একটি কিশোরী হিপিনি লিজাকে সাজিয়ে দিচ্ছে একটু-একটু করে হিপিনির চেহারা পাচ্ছেন লিজা। টিভির প্রতিনিধির প্রশ্ন ভেসে এল, 'আপনার নাম যদি অনুগ্রহ করে বলেন।'

লিজার কুঁচকে যাওয়া মুখে হাসি ফুটল, 'আমি লিজা ছিলাম। এখন কি নাম হবে জানি না।'

'আপনি কি এখন জয়েন করলেন?'

'হ্যাঁ। রাত চারটের সময়।'

'আপনি এতকাল কি করতেন?'

'হাউসওয়াইফ ছিলাম। স্বামীর সংসার দেখেছি, তার বাচ্চাদের মানুষ করেছি, তিনি যত কষ্ট দিয়েছেন সয়েছি, যা আনন্দ দিয়েছেন তা ভোগ করেছি।'

'আপনি কখনও গ্রামের বাইরে যাননি?'

'না, কখনও না। যাও বা গিয়েছি স্বামী নিয়ে গেলে তার সঙ্গে। আটচল্লিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। মেয়েদের যা হয়, ক্রীতদাসীর মতো তাঁর ইচ্ছে নিজের ইচ্ছে বলে জেনেছি।'

'তিনি কি অত্যাচার করতেন আপনার ওপর?'

'না। তিনি মানুষ হিসেবে ভালোই ছিলেন। সরাসরি কষ্ট দিতেন না।'

'গ্রামের সবাই তো হিপিদের ঘেন্না করে, তাই না?'

'করে। কিন্তু ওরা ভয় পায় বলেই করে।'

'আপনি কেন হিপিনি হলেন?'

'বললাম তো, বিয়ের পর সংসার আর স্বামী ছাড়া আর কিছুই আমাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। এরা লিখেছে এদের গন্তব্য ফ্রম হেয়ার টু এটার্নিটি। কত ঘুরে বেড়ায় এরা। পৃথিবীটাকে দেখব বলে এদের সঙ্গে চলে এলাম।'

'আপনার স্বামী কিছু বলবেন না?'

লিজার মুখ শক্ত হল, 'আটচল্লিশ বছরে অনেক সুখ দিয়েছি তাঁকে। আমার আর কোনও দায় নেই তাঁর কাছে।'

'শেষ প্রশ্ন, আপনার বয়স কত?'

ফিক করে হেসে ফেলল লিজা, 'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই, জানেন না? আমি

আমার স্বামীর চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলাম।'

সেই সময় কিশোরীটি লিজার চোখের তলায় কালো রং বুলিয়ে দিল। কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় রং বসাতে বেচারার কষ্ট হচ্ছিল।

বব এক হাতে বুক ধরে অন্য হাতে আবার কৌটোটাকে খুঁজছিলেন। ক্রমশ এই ঘর, ঘরের দেওয়াল তাঁর কাছে অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল। শুধু তীব্র একটি চৌকো আলো সমানে জ্বলছে কিন্তু সেটা টিভি কিনা এমন বোধ তাঁর ছিল না। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি বলতে চাইছিলেন, 'লিজা, আমাকে ট্যাবলেটটা খুঁজে দাও।'



ফুলের মধ্যে সাপ

রাস্তাটা যেখানে ঘোড়ার নালের মতো বাঁক মেরেছে সেখানে পৌঁছে বুক জুড়িয়ে গেল অশ্বিনীর। আর, কত লোক। যেদিকে তাকাও গিজগিজ করছে। ট্যুরিস্ট বাসগুলো এখনও আসছে আর মানুষগুলো লাফিয়ে নামছে বালির ওপরে। এতবড় বালির চর এখনই ভরভরন্ত। শীত শুরুর রবিবারে ভিড় হয়ই কিন্তু এত মানুষ কল্পনা করেনি অশ্বিনী।

এখন মাত্র ন'টা বাজে। একটু আগে ভোঁ বেজেছে। অন্তত ঘণ্টাপাঁচেক সময় আছে হাতে। পাঁচটা খদ্দের বধ করতে পারলে পঞ্চাশ টাকা। তার কুড়ি যাবে বিনোদ মাইতির দোকানে। ব্যাটা আজও চেঁচিয়ে গেছে, অনেক বাকি হয়ে আছে খাতায়। কুড়ি টাকা দিতে হবে রাবণের গুষ্টির পেট ভরাতে। আর দশ টাকায় সন্ধেবেলায় ফূর্তি। পঞ্চাশ টাকা রোজ হলে তো বর্তে যেত সে। ছুটির দিন কিংবা রবিবারে যদি দশ ক্রোশের মধ্যে কোনও হাঁচি না পড়ে তো জমে গেল, নইলে দশ টাকা আয় করতে লাল সুতো বেরিয়ে যায়।

পিচের রাস্তা ছেড়ে বালির চরে নেমে গেল অশ্বিনী। এখন যারা জলে নেমেছে তারা ওর খদ্দের নয়। একটু রয়েসয়ে আরাম করে যারা হাঁটুজলে স্নানে নামে তাদের জন্যে সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অশ্বিনী। তারপর হোটেলে-হোটেলে খদ্দের খুঁজতে হয়। সেইসব সাহেব মেমরা যারা সমুদ্র দেখতে আসেন অথচ স্নান করেন শাওয়ারের তলায় তাদের ম্যাসাজ করতে পারলে দিনটা ভালো যায়। মাঝারি কাঠের বাক্সটার শিশি আছে চারটে। তিন রকমের তেল আর একটায় আতর। আছে ছোট তোয়ালে এবং আয়না। তিরিশ টাকার এই সম্পত্তিতে বেশ চলে যায়। অশ্বিনী চারপাশে তাকাল। লম্বা রোগা শরীরটার সবক'টা হাড় গোনা যায়। নীল হাফ প্যান্টের ওপর নীল গেঞ্জি। দাড়িটা কামায় রোজ। বিড়ি খায় না, ওতে বড়মানুষদের কষ্ট হয়, বায়ুটা শরীরে থেকে যায়। কিন্তু খইনি খায়। এই সময় একটা অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়াল। লক্ষ করল অশ্বিনী। বেশ মোটা তিনজন নামল গাড়ি থেকে। একজন মহিলা আর দুজন পুরুষ। পুরুষ দুটোর শরীর ধুতির ওপরে গেঞ্জি আর তোয়ালে! অশ্বিনীর চোখ ছোট হয়ে গেল। এরা চটপট জলে নামবে না। ড্রাইভার একটা বড় সতরঞ্জি নিয়ে সামনে-সামনে হাঁটছে। ভিড় থেকে সামান্য দূরে সেটাকে বালির ওপর বিছিয়ে বসল ওরা।

সকাল বেলায় ঢেউ-এর তেজ বিষঝাড়া সাপের মতন। রাত্রে ফোঁসফোঁসানি এখন নেই। অশ্বিনী সমুদ্রের দিকে তাকাল। তারপর ধীরে-ধীরে দলটার সামনে গিয়ে অভ্যস্ত গলায় বলল, 'ম্যাসাজ

সাব, ম্যাসাজ!'

সবচেয়ে মোটা লোকটা তখন হিন্দিতে জ্ঞান দিচ্ছিল, 'এখানে নামলে সোজা তুমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যেতে পার। তবে এর চেয়ে ভালো বিচ হল গোপালপুর।'

অশ্বিনী আবার বলল, 'ম্যাসাজ সাব, ম্যাসাজ!'

এবার মোটা লোকটা তার দিকে ঘাড় ফেরাল, 'কি চাই তোমার?'

কাছে এগিয়ে গেল অশ্বিনী, 'ম্যাসাজ করে দেব সাব? ইন্ডিয়ান স্টাইল, আমেরিকান স্টাইল; এমন ম্যাসাজ আর কেউ করতে পারে না। আপনার আরাম হবে, খিদে পাবে, রাত্রে ঘুম আসবে, কাজ করতে উৎসাহ আসবে। পা থেকে মাথা, দশ মিনিট দু-টাকা, আধঘণ্টা পাঁচ টাকা, ঘণ্টা দশ। একবার ট্রাই দেবেন সাব!'

মোটা লোকটা তার সঙ্গিনীর দিকে তাকাল, 'ম্যাসাজ করালে মন্দ হয় না, কি বলো?'

দ্বিতীয় পুরুষটি বলল, 'আমার হাসি পায়। বহুৎ কাতুকুতু লাগে।'

অশ্বিনী ততক্ষণে হাঁটু মুড়ে বসেছে, 'স্যার, ম্যাসাজ হল সবচেয়ে সেরা ব্যায়াম। আপনি ব্যায়াম করছেন অথচ আপনাকে একফোঁটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। আমার ম্যাসাজ নিয়ে জলে নামুন দেখবেন আরাম কাকে বলে। সিলভার জুবিলি এক্সপিরিয়েন্স সাব।' কথা বলতে-বলতে বাক্সর ডালা খুলে ফেলল সে।

'আধঘণ্টা দু-টাকা।' মোটা লোকটা মাথা নাড়ল।

'মরে যাব সাব। ফিক্সড রেট। এর নিচে পোষায় না।'

'আরে থোড়া তো কনসেসন করো। ঠিক হ্যায়, চার রুপিয়া।'

বউনিটা হাতছাড়া করতে চাইল না অশ্বিনী। গেঞ্জি খুলিয়ে লোকটাকে শোওয়ালো সে। বিশাল থলথলে চেহারা দেখে তার আরাম হল। আঙুলে বেশি জোর দিতে হবে না। খানিকটা তেল পিঠে উপুড় করে ঢেলে বলল, 'সাহেবের মনে হচ্ছে পেটে খুব বাতাস হয়?'

মোটা লোকটা কিছু বলার আগেই সঙ্গিনী মাথা নাড়ল, 'হাঁ।'

'হজম হয় না ভালো। সব মেরামত করে দিচ্ছি। তবে একটা কথা, কাউকে বলবেন না অশ্বিনী চার টাকায় শরীরে হাত দিয়েছে।' এবার আঙুল চলছিল তার।

মোটা লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে বলল, 'আউর দাবাও।'

অশ্বিনী বলল, 'হবে সাব আস্তে-আস্তে জোরে। প্রথমে তো আলাপ সারতে হবে, ঝালা আসবে সব শেষে। আপনিও করিয়ে দেখুন না সাব!'

দ্বিতীয় লোকটি মাথা নাড়ল, 'নেহি, এসব আমার পছন্দ হয় না। তারা, চলো আমরা একটু ঘুরে আসি। এ কালা তো এখন আধঘণ্টা এখানে শুয়ে থাকবে।'

মোটা লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি জানাল, 'আরে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

তারা বলল, 'আতি হ্যায় জি।'

মোটা লোকটা আবার বালিতে মুখ গুঁজল। আধঘণ্টা পরে যখন হাত থামাল অশ্বিনী, তখন লোকটা ঘুমুচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটা আর সঙ্গিনী এখনও ফেরেনি। অনেক কষ্টে চারটে টাকা আদায় করে আবার হাঁটতে শুরু করল সে।

এগারোটা নাগাদ মাত্র ন'টাকা রোজগার হল অশ্বিনীর। দিনটার গতিক সুবিধের নয়। গ্রামে ফেরার মুখেই দোকানদারকে কুড়িটা টাকা আজ দিতেই হবে। ঝাউবনের দিকে এগিয়ে গেল সে। আজকালকার ছেলেছোকরা কিছুতেই ম্যাসাজ করায় না। যত দিন যাচ্ছে তত খদ্দের কমছে। মধ্যবয়সি মানুষ ছাড়া কেউ আর তাকে পাত্তা দেয় না। এবার হোটেলগুলিতে টহল মারতে হয়। কিন্তু ওখানে খদ্দের পেলে বেয়ারাগুলো কমিশন খায়। অবশ্য তেমন খদ্দের পেলে কোনও লোকসান নেই। এই সময় লোকটাকে দেখতে পেল সে। কোট প্যান্ট পরা, টাই আছে গলায় আর মাথায় বারান্দা টুপি।

চুরুট খেতে-খেতে লোকটা তাকেই লক্ষ করছে। এরা তার খদ্দের নয়। সমুদ্র দেখতে এসেছে, এখানে কোট প্যান্ট খুলে ম্যাসাজ করাবে না। অশ্বিনী দেখল দুটো সাহেব যেন প্রায় উদোম হয়ে বালিতে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। এদের যদি রাজি করানো যায় তাহলে দাঁওটা মোটা হতে পারে। অশ্বিনী কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'ম্যাসাজ সাব, ম্যাসাজ?'

লোকটা হাত নাড়াল, 'নো ম্যাসাজ। উই ডোন্ট নিউ ইট।' শেষ কথাটা বোঝার উপায় ছিল না কিন্তু প্রথমটা থেকেই অর্থ ধরতে পারল অশ্বিনী। গাছগুলোর দিকে তাকাল সে। জোড়ায়-জোড়ায় বসে সমুদ্র দেখছে। ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। ফিরে আসছিল এই সময় লোকটা ডাকল, 'এই!' বারান্দা টুপির সাহেবটার মুখে চুরুট।

অশ্বিনী দ্রুত কাছে গেল, 'ইয়েস সাব।'

'ম্যাসাজ কর?'

'ইয়েস সাব। সিলভার জুবিলি ইয়ার সাব। আমার মতো ম্যাসাজ এখানে কেউ করতে পারে না।'

'তাই নাকি? এসো আমার সঙ্গে।'

পুলকিত হল অশ্বিনী। সাহেব একবারও জিজ্ঞাসা করল না তার দক্ষিণা কত। আধঘণ্টার জন্যে পনেরো টাকা বললে কেমন হয়! অশ্বিনী মনে-মনে হিসেব করতে লাগল। ক্রমশ সে সাহেবের পেছন-পেছন বালিয়াড়ি ছেড়ে পিচের রাস্তায় উঠে এল। সাহেব কোনও কথা বলছেন না। এমন কি সে যে পেছনে আসছে তাও লক্ষ করছেন না। অশ্বিনী খুশি হল। এইসব মানুষই মেজাজি হয়। টাকা দেওয়ার সময় আঙুলে বাত ধরে না। কিন্তু সাহেব যাচ্ছে কোথায়? অশ্বিনীর বুক ছ্যাঁত করে উঠল। ওই হোটেলে তাদের ঢোকা নিষেধ। তাদের মানে যে-কোনও ফিরিওয়ালার। তার কাজটা কি সেটা না বুঝেই ওরা ওকে ফিরিওয়ালার দলে ফেলেছে। যদি সে ভেতরে ঢুকতেই না পায় তাহলে সাহেবের কাজটা করবে কীভাবে? অশ্বিনী ছুটে গিয়ে সাহেবের পাশে দাঁড়াল, 'সাব, আপনি কি ওই হোটেলে যাচ্ছেন, ওখানে আমাদের ঢোকা নিষেধ করেছে।'

'কেন?'

'সবাই এসে ট্যুরিস্টদের খুব বিরক্ত করে তাই।'

'ও। তা তুমি তো বিরক্ত করছ না!' সাহেব এগিয়ে গেলেন।

যথারীতি হোটেলের গেটেই তাকে আটকে দিল। তার বাক্সটা খপ করে ধরে দারোয়ান বলল, 'অ্যাই কাঁহা যাতা হ্যায়?'

সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ওকে আমার দরকার, ছেড়ে দাও।'

দারোয়ানও জানাল, 'হুকার লোগকো অন্দর যানা মানা হ্যায় সাব।'

সাহেব বললেন, 'একে চিনে রাখো। তেমন কিছু হলে তো ধরতেই পারবে।'

দ্বিতীয়বার বাধা পেল কাউন্টারে। সাহেব হেসে বললেন, 'আমিই নিয়ে যাচ্ছি। যে ছেলেটি ম্যাসাজ করে তাকে নিয়ে আসিনি বলেই প্রবলেম হয়েছে। আপনারা একে চেনেন তো?'

কাউন্টারের লোকটি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।' সাহেব ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করতে। হোটেলের বড় বাড়িতে সাহেব ওঠেননি। অশ্বিনীর মন কুলকুলিয়ে উঠল। আঃ মা কালী, জগদম্বা, তোমার কৃপা গো! ওই পেছন দিকের বাগানে যেখানে সাহেব যাচ্ছে সেখানে যে কটেজগুলো আছে তাতে শুধু বড়লোকদের বড়লোক থাকে।

বাগানে বেশ ফুল ফুটেছে। মৌমাছি উড়ছে। গন্ধ ছড়িয়েছে খুব। অশ্বিনীর হৃদয় প্রফুল্ল হল। কটেজে ঢুকে বেল বাজালেন সাহেব। তখনই জানালায় একটি মুখ এবং তারপর দরজা খুলে গেল,

'ও ডিয়ার, তুমি আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলে! আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।'

'মেমসাহেবের কানের কাছে ঠোঁট ঘষে আদর করলেন সাহেব, 'একটু কষ্ট না হলে তুমি তো আমাকে বেশি ভালোবাসবে না ডার্লিং। মাই লিটল মুনিয়াসোনা।'

দু-হাতে সাহেবকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে মেমসাহেব অশ্বিনীকে দেখতে পেলেন, 'এ কে?'

'কে বলো তো? কাল সারাদিন বলছিলে শরীরটায় যত্ন নিতে পারছ না এখানে এসে। তা আজ সি বিচে এই লোকটাকে দেখলাম ম্যাসাজ করতে। বিউটিফুল। ওর আঙুলগুলো যেন সারা শরীরে হার্মোনিয়ামের রিড বাজায়। দুটো লোক তো ঘুমিয়ে পড়ল আমার সামনে । হি ক্যান হেল্প ইউ।'

অশ্বিনী বিগলিত। এমন করে কেউ কখনও তার প্রশংসা করেনি। এবার থেকে খদ্দের ধরার সময় হার্মোনিয়ামের ব্যাপারটা বলতে হবে। মেমসাহেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সুন্দর শরীর সে কোনওদিন দ্যাখেনি। পঁচিশ বছরে অনেক শরীর সে দেখেছে। বুড়ি যুবতী অনেকের শরীরে ম্যাসাজ করেছে। কিন্তু এ যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা। সচকিত হয়ে সে মাথায় হাত ছোঁয়াল, 'আমার মতো ম্যাসাজ কেউ করতে পারে না মেমসাব। ইন্ডিয়ান স্টাইল, আমেরিকান স্টাইল, আপনার আরাম হবে, খিদে পাবে, রাত্রে ঘুম আসবে।'

কথাটা শোনামাত্র মেমসাহেব খিলিখিলিয়ে হাসলেন, 'ইজ ইট! ও হনি, ইউ আর সো সুইট।' সাহেবকে একটু আদর করে মেমসাব বললেন, 'ওকে বলো সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ওয়াশ করতে। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি।'

সাহেব দেখিয়ে দিলেন কোথায় বেসিন কোথায় সাবান। এরকম পিটপিটানি কারও-কারও থাকে। এসব ধরতে নেই। পরিষ্কার হয়ে বাক্সটা নিয়ে মেমসাহেবের ঘরের সামনে দাঁড়াল অশ্বিনী। টাকাপয়সার কোনও কথা এখন পর্যন্ত হয়নি। নিজেকে শাসন করল সে, অত লোভ বড় খারাপ। মেমসাহেবের পোশাক দেখেই বোঝা যায় পয়সা এদের হাতের ময়লা। না চাইলে হয়তো যা পাওয়া যাবে তা কল্পনার বাইরে। সাহেব তাকে ভেতরে ডাকল।

দম বন্ধ হয়ে গেল অশ্বিনীর। একি দেখছে সে? এত সুন্দরী কোনও মেয়ে হয়? অশ্বিনী জানে ওটাকে বিকিনি বলে। লাল আঁটো দুটো কাপড় মাখনের মতো শরীরে চেপে বসে আছে। তাকালে দৃষ্টি পিছলে যায়। কোলের ওপর একটা বালিশ নিয়ে মেমসাহেব ঘাড়ের ওপর সাপের মতো লুটিয়ে থাকা চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিলেন। বুকের মধ্যে বাতাস ছিল না অশ্বিনীর। তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল।

সাহেব একটা সোফায় বসেছিলেন, 'কি দিয়ে তুমি ম্যাসাজ করবে? দেখি।'

উবু হয়ে বসে কাঁপা হাতে বাক্সটা খুলল অশ্বিনী। শিশিগুলো এবং তোয়ালে দেখাল। সঙ্গে-সঙ্গে মেমসাহেব নাক কুঁচকে বললেন, 'নট দ্যাট টাওয়াল। ইস, তেল চিটচিটে হয়ে গেছে। তুমি এই টাওয়াল ইউজ করবে।' হাত বাড়িয়ে তোয়ালে তুলে ছুঁড়ে দিলেন মেমসাহেব।

সাহেব জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কীসের তেল? দেখি?'

শিশিগুলো একে-একে তুলে ধরল অশ্বিনী। একটা তেল সে নিজে যত্ন করে বানায়। এতে হাড় শক্ত হয়। কথাটা শুনে মেমসাহেব শিশিটা নিয়ে নাকের কাছে তুললেন, 'নট ব্যাড স্মেল। শুরু করো। প্রথমে কি করতে হবে?'

'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'ইউ গেট লস্ট ডার্লিং।' হেসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন মেমসাহেব। সাহেব 'ক্যারি অন' গোছের কিছু বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আঙুলে তেল লাগিয়ে মেমসাহেবের মাখনে চাপ দিল সে। আঃ, আঙুল ডুবে যাচ্ছে যেন। মেয়েমানুষের শরীর এত রহস্যময় হয়। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে শাসন করল অশ্বিনী। না, বেচাল নয়, তোমার কর্তব্য তুমি করো। চোখ বন্ধ করল সে। সিলভার

জুবিলির অভ্যেস আঙুল ঠিক চলতে শুরু করল। একটু পরে আর মেমসাহেবের নরম মাখন শরীর নয়, লাল বিকিনির রহস্য নয়, একটি মানুষের শরীরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরাম দেওয়ার সাধনায় মগ্ন হয়ে গেল শুধু দশটা আঙুলের কারুকাজে। আর হাত যখন সরে এল শরীর থেকে তখন মেমসাহেব নিশ্চল। মৃদু নিশ্বাস পড়ছে। চকচকে শরীরটা পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোয়ালেটা মেমসাহেবের শরীরে বিছিয়ে দিয়ে বাক্স নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আর তখনই সাহেবকে দেখতে পেল। সাহেব বললেন, 'গুড। তুমি শুধু ভালো ম্যাসাজই করো না, ব্যবহারও ভালো।' তারপর পকেট থেকে ব্যাগ বের করে দুটো কুড়ি টাকার নোট বের করে বললেন, 'কাল সকালে আসবে। আমরা দুপুরে বেরিয়ে যাব।'

প্রায় আভূমি নমস্কার করল অশ্বিনী। এতটা সে আশা করেনি। আজ আর তার কোনও সমস্যা নেই। সাহেব বললেন, 'ওই তেলটা মনে হচ্ছে সত্যি ভালো। ম্যাসাজ করে কেউ ওকে আজ পর্যন্ত ঘুম পাড়াতে পারেনি। ওটা রেখে যাও। কাল তো আসছ, ম্যাসাজ করে যাওয়ার সময় নিয়ে যেও। নইলে এখন হয়তো আবার কাউকে ওই তেলই লাগাবে।'

খুশি মনে শিশিটা বাক্স থেকে বের করে টেবিলে রেখে দিন অশ্বিনী। বয়ে গেছে আর কাউকে ম্যাসাজ করতে। টাকা তো হলই, কিন্তু চোখের গায়ে যে ছবিটা সেঁটে আছে এবং সেটা মুছতে সে নারাজ।

আট টাকার দিশিতে প্রাণ ভরে গেল অশ্বিনীর। আজ সে কারও সঙ্গে রাগারাগি করেনি। দোকানদারকে কুড়িটা টাকা দিয়েছে, বউকেও। এখন মাঝরাত্রে ঘুমের ঘোরে বউ-এর শরীরে হাত পড়তেই মনে হল নরম মাখনের যত্ন করে তৈরি শরীরটা তার পাশেই। এই অন্ধকারে সে আদর শুরু করল। এবং তখনই বউ চাপা গলায় বলে উঠল, 'হঠাৎ এত যত্ন? কোন দিকে সূর্য উঠল, আজ?'

অশ্বিনীর আঙুল থেমে গেল। পাশ ফিরে শুতে-শুতে বলল, 'এখন রাত, সূর্য উঠবে কেন? ম্যাসাজ করা প্র্যাক্টিশ করছিলাম। ঘুমোও।'

মেমসাহেবদের গলার স্বরও শরীরের মতো রহস্যময় হয় কি করে ভাবছিল সে চোখ বন্ধ করে।

দশটা নাগাদ আজ আবার সেই ঘরে। শুধু তফাত হল সাহেব নেই। সাহেব গেছেন গাড়ি নিয়ে মোড়ের গ্যারাজে। কি একটা গোলমাল হয়েছে ইঞ্জিনে। মেমসাহেব বললেন, 'কাল তুমি আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওটা কী স্টাইল?'

ইন্ডিয়ান মেমসাহেব।'

'আজ আমেরিকান স্টাইল করো। ওতে কি হয়?'

মাথা নিচু করে অশ্বিনী বলল, 'ওতে শরীরে জোয়ার আসে। রক্তে ঢেউ ওঠে।'

'সত্যি?' খুশিতে চিৎকার করে উঠল, 'ওঃ, আই কান্ট ওয়েট। শুরু করো প্লিজ।'

আজ শরীরে কালো বিকিনি। শাঁখের গায়ে কালসাপ পেঁচানো। দম বন্ধ হয়ে গেল অশ্বিনীর। কোনওরকমে বলল, 'আমার তেলটা কোথায়?'

উপুড় হয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিলেন মেমসাহেব। শরীরে বল নেই। যেন সাপের ফণার নিচে ব্যাং হয়ে পড়েছে ওটা। তবু শিশিটা নিয়ে এল সে। কাল যতটুকু তেল রেখেছিল ততটুকুই আছে। মেমসাহেব বললেন, 'তোমরা নাম কী?'

'অশ্বিনী।'

'অ্যাঁ, অশ্বিনী? তোমার কি ঘোড়ার মতো শক্তি?' খিলখিল হাসি উঠল। 'আচ্ছা অশ্বিনী,

তুমি তো এত মেয়েকে ম্যাসাজ করো, নিজেকে ঠিক রাখো কি করে?'

অশ্বিনী শিশির মুখ খুলল, 'রাখতে হয় মেমসাহেব। আমরা হলাম গিয়ে ডাক্তারের মতো। মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে বলে কোনও ভেদাভেদ করতে নেই। নইলে ব্যাবসা গোটাতে হবে। পেট বড় জ্বালা মেমসাহেব।'

'আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। ওখানে গেলে তোমাকে আমি বড়-বড় ক্লায়েন্ট দিতে পারব। নাউ, শুরু করো।'

হাতে তেল মাখিয়ে ছোট-ছোট আঘাত দেওয়া শুরু করল অশ্বিনী। তার চোখ বন্ধ। এখন সে ডাক্তার। আঘাত দিচ্ছে কিন্তু মেমসাহেবের শরীরে ব্যথা লাগছে না। প্রতি শিরায় ছোট-ছোট টোকা। গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে সামান্য মোচড়। কিছুক্ষণ পরেই সাহেব এলেন। আর ততক্ষণে মেমসাহেবের সমস্ত শরীরে জোয়ার, রক্তে ঢেউ।

পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করলেন সাহেব। কিন্তু শিশিটা রেখে দিলেন। এত ভালো তেল তিনি কলকাতায় নিয়ে যাবেন। মেমসাহেব তখন সত্যিকারের উত্তেজিতা। দু-হাতে সাহেবকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে দু-পা ছিটকে সরে গিয়ে সাহেব বললেন, 'নো ডার্লিং, আগে স্নান করে নাও। ইউ আর অয়েলি। তা ছাড়া আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল অশ্বিনীর। তার দুটো হাত কুটকুট করছে এবং উঁচু-উঁচু ব্রণর মতো কিছুতে ছেয়ে গেছে হাতের তালু দুটো। সকালে সেগুলো ঘা-এর চেহারা নিল। ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছি না। ওষুধ দিচ্ছি, নিয়ে যা।'

কারণ বুঝতে পারছিল না অশ্বিনী। এই দুটো হাতের ঘা না মারলে তো খদ্দের জুটবে না। মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। ওষুধেও কমছে না ঘা। বরং রস গড়িয়ে যেন হাড় দেখা যাচ্ছে তার। ডাক্তার বললেন, 'এ রোগ জীবনে দেখিনি। খারাপ মেয়ের কাছে গিয়েছিলি?'

'না তো!'

'কলকাতায় যেতে হবে তোকে। বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে খসে যাবে হাত।'

এখন আঙুল মুড়তে পারছে না। অশ্বিনী। কিছু ধরা অসম্ভব। শেষ সম্বল বিক্রি করে বউ তাকে কলকাতায় খরচ দিয়েছে। কাপড়ে মোড়া হাত দুটো নিয়ে বাসে উঠেছিল সে কলকাতার জন্যে। এই ক'দিন সে কেবলই ভেবেছে কি করে হল এমন। এমন কিছু সে ধরেনি যাতে হাতে এমন ঘা হয়। শেষবার ম্যাসেজ করেছে সে মেমসাহেবকে নিজের তৈরি তেল দিয়ে। ওই তেলে চিরকাল সে ম্যাসাজ করে এসেছে। এতদিন তো কিছু হয়নি আর তখনই তার খেয়াল হল শিশিটার কথা। সাহেব ওটা নিয়ে গেছে কলকাতায়। কেন? কেন সাহেব ওটাকে একদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল? চটপট বাস থেকে নেমে এল সে।

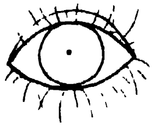
চোরের মতো হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে সে কটেজের কাছে চলে এল। এখনও এদিকে নতুন বোর্ডার আসেনি। বেয়ারারা তাই এপাশে নেই। কটেজের দরজা বন্ধ। ঠিক পাশেই ময়লা ফেলার ড্রামটা চোখে পড়ল। ঝুঁকে পড়ল তাতে অশ্বিনী। ছেঁড়া কাগজ, দামি তোয়ালে আর শিশিটা এখনও পড়ে আছে। সাহেব এটা কলকাতায় নিয়ে যায়নি তাহলে!

অনেক চেষ্টা করে শিশিটা ধরতে পারল সে। ওপরে তেল ভাসছে, তলায় ওটা কি? তার তেল তো কখনও কাটে না। এবং তখনই আঁতকে উঠল অশ্বিনী।

কলকাতার বাস-এ অশ্বিনী বসে ছিল চোখ বন্ধ করে। তার কাপড়ে জড়ানো হাতে তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কাঁধের ব্যাগে একটা দামি তোয়ালে আর সেই শিশি। হাত সারুক বা না সারুক ওই শিশি সে উপুড় করে দেবে একটা মানুষের ওপর। অমন মাখনের মতো স্বপ্নের শরীরে যে মানুষটা

প্যাঁচ কষে রস গড়ানো ঘা করে দিয়েছে। সে তো ওই তেল সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছিল। একটা ফুলের বাগান নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে এতক্ষণে। পাষণ্ডটির সন্ধান তাকে করতেই হবে।

কলকাতার হাঁ মুখ বড্ড বড়। তাই একমাস পরে একটা পুরো হাত তিনটে অন্য হাতের আঙুল খুইয়ে সুস্থ অশ্বিনী প্যাকাটির মতো দুর্বল শরীরে মনুমেন্টের নিচে সমুদ্র সৈকতের বাস ধরবে বলে এসে ব্যাগ থেকে শিশিটা বের করল। তারপর ওই দুটো আঙুলেই সে বিষাক্ত তেলটাকে উপুড় করে দিল কলকাতার ওপর।



প্রতীক্ষার পুরুষ

যে ট্রেনের পৌঁছবার কথা বিকেল তিনটেয়, সেটা এল সাতটা দশে। চার ঘণ্টা লেট, অবশ্য ভারতীয় রেলওয়ের খুব স্বাভাবিক আচরণের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু জয়দেব ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। শেষ বাস চারটে তিরিশে তারপর আর যাওয়ার কোনও উপায় নেই। অথচ কাল সকাল আটটার মধ্যে হাজির না হলে তিন লাখ টাকার অর্ডারটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ট্রেন যত লেট করছিল তত উত্তেজনা বাড়ছিল, এখন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা।

প্ল্যাটফর্ম থেকে ওভারব্রিজে উঠে সে চারপাশে তাকাল। বিরাট জংশন স্টেশন। ট্রেনটা যদি ঘণ্টাখানেক লেট করত, এত বড় ক্ষতি হত না। বাসে এখান থেকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে ছয় ঘণ্টা লাগবে। যদি ভোর ছ'টার বাস ধরা যায় তো বারোটার আগে যাওয়া যাবে না। অথচ আটটার সময় চোপরা বেরিয়ে যাবে বাগান থেকে। এখন একটিই ভরসা, যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। অনেক টাকা নেবে, তা নিক, কিন্তু তিন লাখ টাকার যে অর্ডার, তাতে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিট লাভ।

ওভারব্রিজে দাঁড়িয়েই ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল জয়দেব। তারপরেই টের পেল গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। অন্ধকারে আকাশটার চেহারা বোঝা যাচ্ছিল না, এখন মনে হল মেঘ জমে আছে চাপ হয়ে। মনে-মনে বলল সে, সোনায় সোহাগা।

ওভারব্রিজ থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে দেখল বৃষ্টিটা বেশ তরিবত করেই নামছে। এর আগের বার যখন এই জায়গায় সে এসেছিল, তখন দেখেছিল রিকশা, বাস, ট্যাক্সির বিরাট দঙ্গল গমগম করছে। এখন গোটাদশেক রিকশা আর কয়েকটা ট্যাক্সি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। সুটকেস হাতে জয়দেব দাঁড়াতেই একটা লোক ছুটে এল, 'টাউনে যাবেন সাহেব?'

ঘাড় নাড়াল জয়দেব, তারপর জিজ্ঞাসা করল, ' তোমার ট্যাক্সি আছে?'

'হ্যাঁ সাহেব, পক্ষীরাজ। স্টার্ট নেব আর উড়ে যাবে।'

জায়গাটার নাম বলে জয়দেব জিজ্ঞাসা করল, 'কত নেবে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, 'নেওয়া-নেয়ির কথা ওঠে না সাহেব, আমি যাব না।'

'কেন? কত দিতে হবে বলো না?'

'দুটো পুল গড়বড় আছে, জল বেড়েছে নদীতে, গেলে ফেঁসে যাব।' লোকটা সরে গেল চটপট। জয়দেব ঠোঁট কামড়াল, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে। নদীতে বর্ষার সময় জল বাড়তেই পারে কিন্তু পুলটা গড়বড়ে থাকবে কেন? এক-এক করে প্রত্যেকটা ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে ওই জবাবটাই শুনল সে। কাল ভোর ছ'টার আগে বাস নেই। আর যদি সাহেব রাতটা

এখানকার কোনও হোটেলে থাকেন তাহলে চারটে নাগাদ ট্যাক্সি স্টার্ট করতে পারে কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে চার ঘণ্টার গ্যারান্টিটা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আপ ডাউন ভাড়া দিলে ড্রাইভার প্রাণপণ চেষ্টা করবে পৌঁছে দিতে।

তবু কিছুটা মাটি পাওয়া গেল। চোপরা সাহেবের বেরুবার কথা আটটায়, পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতেও তো পারে। তা ছাড়া রাস্তা যে খারাপ তা না দেখলে তো ঠিক বলা যাচ্ছে না। এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হল জয়দেব। যে টাকা লোকটা চাইছে তা হিসেবের থেকে অনেক বেশি, কিন্তু পঁচাত্তর হাজার টাকার কথা ভাবলে নস্যি। আপাতত রাত্রের জন্যে একটা আস্তানা দরকার। যদি সম্ভব হয় চোপরাকে ট্রাঙ্ককলে ধরতে পারলে সবকিছুর সুরাহা হয়ে যাবে। জয়দেব ঠিক করল ড্রইভারটাকেই বলবে শহরের কোনও ভালো হোটেলে তাকে নিয়ে যেতে। সেখান থেকেই ভোর চারটের সময় যাত্রা শুরু করবে। এই সময় প্রথম লোকটা দৌড়ে তার কাছে চলে এল, 'সাহেব, আপনার কপাল খুব ভালো। ওই যে সাদা অ্যামবাসাডারটা দেখছেন, ওটা হরিণবাড়ির। ওটায় আপনি চলে যান।'

'হরিণবাড়ি কোথায়?'

'আপনি যেখানে যাবেন তার এক ঘণ্টা আগে হরিণবাড়ি।'

'ও কি যাবে?' জয়দেব চিন্তা করছিল দ্বিতীয় প্রস্তাবটা। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে গেল অ্যামবাসাডারটার দিকে। টিপটিপ জলের ফোঁটা কিন্তু তেমন ভেজাচ্ছে না। একটা বুড়ো নেপালি ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ বসে। তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল জয়দেব, 'কোথায় যাবেন ভাই?'

'হরিণবাড়ি।'

'পলাশহাট ওখান থেকে কতদূর?'

'এক ঘণ্টার রাস্তা।'

'আমাকে পলাশহাটে পৌঁছে দিলে কত নেবে?'

'আজ আমি পলাশহাটে যেতে পারব না, হরিণবাড়ি অবধি যেতে পারেন।'

'কেন, এক ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারবে না?'

'না সাব, রাত হয়ে যাবে খুব, তা ছাড়া নদীর জল বেড়েছে।'

জয়দেব নিরাশ হল। তাহলে আর কি হবে! সঙ্গে-সঙ্গে তার খেয়াল হল আজ রাত্তিরে যদি হরিণবাড়িতে পৌঁছানো যায় তাহলে কাল ভোরে সেখান থেকে রওনা হলে আটটার অনেক আগেই পলাশহাটে পৌঁছানো যাবে। এখান থেকে ভোর চারটেতে রওনা হয়ে ঝুঁকি নিতে হবে না। এতক্ষণে বেশ আরাম লাগল তার। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়ি কি হরিণবাড়ির?'

'হ্যাঁ সাব।'

'তুমি বলতে পারো হরিণবাড়িতে থাকার জায়গা আছে কিনা?'

'হ্যাঁ সাব, একটা গেস্টহাউস আছে, খালিই পড়ে থাকে।'

'ঠিক আছে। আমি যাব পলাশহাটে। আজ যদি হরিণবাড়িতে রাত্রে থাকি তাহলে তুমি আমায় কাল সকাল আটটার মধ্যে ওখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ সাব, ও তো মামুলি ব্যাপার।'

জয়দেব খুশি হল, 'তোমাকে কত দিতে হবে?'

ড্রাইভার একটু ইতস্তত করল, 'সাব, ভাড়ার ব্যাপারটায় একটু গোলমাল হবে।'

'কেন?'

'আমি হরিণবাড়ি থেকে এসেছি দুজন প্যাসেঞ্জারকে নিতে। তারা যদি আসে তাহলে আপনি পঞ্চাশ টাকা দেবেন। আর যদি না আসে তাহলে তিনশো। হরিণবাড়ি থেকে পলাশহাটের ভাড়া আলাদা।' ড্রাইভার ভেবেচিন্তে জানাল।

'যারা তোমাকে ভাড়া করেছে তারা যদি আমাকে নিতে রাজি না হয়, তাহলে?'

ড্রাইভার হাসল, 'আপনি আমার পাশে বসে যাবেন স্যার, কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

আগের ড্রাইভারকে নিষেধ করে জয়দেব ফিরে এল। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল, 'যাঁরা যাবেন তাঁরা হরিণবাড়িতেই থাকেন?'

'না সাব। বছরে একবার আসেন। তিনদিন থাকেন। আমাকে ও বাড়ির দারোয়ান খবর দিলে আমি এসে নিয়ে যাই। কিন্তু আজ খুব দেরি হচ্ছে দেখছি।'

'বোধহয় ট্রেন লেট আছে। আমারটাও চার ঘণ্টা লেট ছিল।'

আটটা বাজতে যখন মিনিট পাঁচেক বাকি তখন ড্রাইভার সোজা হল, 'ওই যে ওরা এসে গেছে।' বলে গাড়িটা চালু করে এগিয়ে এল সিঁড়ির গা-বরাবর। এতক্ষণে বৃষ্টির ফোঁটা মোটা হয়েছে। টিনের চালে চড়বড়ে শব্দ বাজছে। ড্রাইভার তার মধ্যেই বেরিয়ে পেছনের দরজা খুলে বলল, 'সেলাম মেমসাব।'

শেষ শব্দটা শুনে জয়দেব ঘাড় ফেরাতে গিয়েও সঙ্কুচিত হল। দরজা খোলা থাকায় গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছিল, এখন গাড়ির ভেতরটা সুগন্ধে ভরে গেছে। দুজনেই উঠে পড়ায় ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পেছনের ক্যারিয়ারে মাল তুলে কুলিকে বিদায় করল সে-ই। অর্থাৎ যাত্রীদের সঙ্গে ড্রাইভারের ভালো জানাশোনা।

ইঞ্জিন চালু করে স্টেশন-চত্বর ছাড়াতেই পেছন থেকে একটা সুন্দর গলা ভেসে এল, 'কেমন আছ মান সিং?'

'জি মেমসাব, কোনওমতে আছি, ভগবানের দয়ায় বেঁচে আছি।' ড্রাইভার খুব সমীহ করে জবাব দিল, 'আজ গাড়ি লেট ছিল?'

'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ তোমাকে বসে থাকতে হয়েছে।'

'ঠিক আছে। এরকম তো হয়েই থাকে।'

বৃষ্টি পড়ছে বেশ। হেডলাইটের আলোয় জলের ফোঁটাগুলো স্পষ্ট। সামনের পিচের রাস্তায় পড়ে কই মাছের মত লাফিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। জয়দেবের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এঁরা তাকে কি মনে করেছেন তা সে বুঝতে পারছে না। ড্রাইভারটাও তার কথা বলেনি ওদের। অন্যের ভাড়া করা গাড়িতে এইভাবে যাওয়ায় এখন নিজেরই খারাপ লাগছে।

'আমার বাংলোর খবর কি মান সিং?'

'সব ঠিক আছে মেমসাব।'

'রোজ বৃষ্টি হচ্ছে এখন?'

'হ্যাঁ মেমসাব।'

'এই সময় তো বৃষ্টি লেগেই থাকে।' মহিলা যেন নিজের মনেই কথাগুলো বললেন, জয়দেব দেখল শহরটা ডানদিকে রেখে গাড়ি বাঁদিকে বাঁক নিল। বৃষ্টির জন্যে খুব বেশি গতি বাড়াতে পারছে না, তবে রাস্তো খুব ভালো, এইটেই সুবিধে, জয়দেবের আর চুপ করে থাকতে ভালো লাগছিল না। সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'নদীর জল বেড়েছে বলেছিলে, 'এদিকে কি বন্যা হয়?'

'হয় সাব। তবে দু-একদিন জল থাকে। পাহাড়ি নদী তো।' কথাটা বলেই বোধহয় ড্রাইভারের খেয়াল হল। সে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'এই সাব পলাশহাট যাবেন, গাড়ি পাচ্ছিলেন না, তাই—।'

ওপাশ থেকে কোনও জবাব এল না। জয়দেবের অস্বস্তি বেড়ে গেল। ভদ্রমহিলা কি তাকে সঙ্গে নেওয়া পছন্দ করছেন না? ওঁর সঙ্গে যে আছে তার গলা একবারও পায়নি গাড়ি ছাড়ার পর থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ ফেরাল জয়দেব, 'আমি হয়তো আপনাদের অসুবিধে করলাম কিন্তু এছাড়া কোনও উপায় ছিল না। আমাকে কাল সকাল আটটার মধ্যে পলাশহাটে পৌঁছাতে হবে।'

দুই মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। অন্ধকারে কোনও মুখই ভালো করে বুঝতে পারছিল না জয়দেব। তবে পেছনের দুজনই যে মহিলা সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না।

'মান সিং কি পলাশহাটে যাচ্ছ?'

'না মেমসাব। এই সাব হরিণবাড়িতে আজ থাকবেন। ভোরে আমি নিয়ে যাব।'

'আপনি কি ট্রেনে এলেন?'

'হ্যাঁ, আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

'পলাশহাটে প্রথম যাচ্ছেন?'

'না, এর আগে একবার গিয়েছিলাম।'

'ওখানে কার কাছে যাবেন?'

'মিস্টার চোপরা। ব্যাবসার ব্যাপার।'

'ও। আমি এদিকের লোকজনকে এখন আর তেমন চিনি না। যারা পুরোনো দিনে ছিল তাদের জানি। চোপরা বোধহয় বেশিদিন আসেননি এদিকে। আগে তো সপ্তাহে তিনদিন আমরা পলাশহাট ক্লাবে গল্প করতে যেতাম। কী নাম আপনার?'

'জয়দেব সেন।'

'বদ্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরাও বদ্যি। গুপ্ত।'

এতক্ষণে একটা ধারণায় আসতে পারল জয়দেব। গলা শুনে মনে হয়েছিল বছর পঁচিশের মধ্যে বয়স কিন্তু কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে তা নয়। তাঁর পাশের মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। তবে ভদ্রমহিলার অঙ্গে কালো শাড়ি-জামা থাকায় গায়ের ফরসা রং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অন্ধকারে। কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জয়দেব জিজ্ঞাসা করল, 'আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে।' তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সিগারেট খান আপনি?' জয়দেব বেশ অবাক হল, কারণ আজ পর্যন্ত কোনও মহিলার মুখে সে এই প্রশ্ন শোনেনি। ব্রান্ডের নাম বলতেই মহিলার গলা থেকে অস্ফুট আওয়াজ বের হল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

বৃষ্টির তেজ মোটেই কমছে না। এর মধ্যে ওরা জঙ্গুলে এলাকায় চলে এসেছে। দু-পাশের খোলা জমিতে জল জমছে। গাড়ির কাঁচ বন্ধ থাকলেও একটু-একটু শীত-শীত ভাব ছড়াচ্ছিল। জয়দেবের মনে হল ধোঁয়া গাড়িতে জমে যাচ্ছে, সে কাঁচ সামান্য নামিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিতেই পেছন থেকে মহিলা বলে উঠলেন, 'কী হল, ফেলে দিলেন কেন? অনেকদিন বাদে গন্ধটা পেলাম।'

জয়দেব কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল, 'ধোঁওয়া জমে যাচ্ছে।'

'তাতে কিছু হত না।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সামনের সিটে বসেও সেটা স্পষ্ট টের পেল জয়দেব। তারপর কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'হরিণবাড়িতে আপনার বাড়ি আছে নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ, রয়ে গেছে। এ জীবনে বিক্রি করতে পারব না। বছরে একবার আমাকে আসতেই হয়, এই দিনটায়। সাধারণত সন্ধের আগেই পৌঁছে যাই। এবার ট্রেনটা—'

জয়দেবের কৌতূহল বাড়ছিল কিন্তু বাড়তি প্রশ্ন করতে শিষ্টাচার আটকাচ্ছে। সে রাস্তার দিকে তাকাল। বৃষ্টি এবার একটু ধরেছে। দু-পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে সরু পিচের রাস্তা। প্রচণ্ড বেগে গাড়ি ছুটছিল। তারপর একটা বাঁক নিতেই ড্রাইভার স্পিড কমিয়ে আনল। জয়দেব দেখল ঘড়িতে এখন দশটা তিন। অথচ বাইরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় বিশ্বচরাচর থেকে বহু দূরে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। গতি কমিয়ে গাড়িটা শেষপর্যন্ত থেমে গেল।

জয়দেব প্রশ্ন করার আগেই পেছন থেকে ভেসে এল, 'কি হল?'

ড্রাইভার ততক্ষণে একটা টর্চ নিয়ে দরজা খুলছে, 'সামনে একটা পুল আছে। নদীর জল বেড়েছে। একবার দেখে নেব।'

ভদ্রমহিলা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সে কি! আমাকে আজ রাত্রেই ওখানে পৌঁছাতে হবে।'

ড্রাইভার জবাব না দিয়ে অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে এগিয়ে যেতেই জয়দেবের মনে হল তার বসে থাকা শোভন নয়। সে ভেজা মাটিতে পা রেখে পিচের রাস্তায় চলে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখন বৃষ্টিটা থমকেছে। কোনও গাড়ি এই পথে এখন যাচ্ছে না। একটু বাদেই ড্রাইভার ফিরে এল, 'জলদি, জলদি, চলে যেতে হবে।

জয়দেব গাড়িতে বসতেই ইঞ্জিন চালু হল। তারপরেই হেডলাইটের আলোয় নদীটাকে দেখতে পেল সে। জল অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে পুলের তলা ছুঁয়েছে। প্রচণ্ড স্পিডে সেটাকে পেরিয়ে আসতেই ড্রাইভার বলল, 'আর কোনও ভয় নেই।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল, 'আপনি পাঁচ ফুট নয়?'

চমকে ফিরে তাকাল জয়দেব। মহিলার মুখটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। গাড়ি থেকে নামবার সময় যে আলো জ্বলেছিল তাতে লক্ষ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মহিলা তখন মুখ নিচু করেছিলেন। হঠাৎ তার উচ্চতা জানতে চাইছেন কেন? সে বলল, 'সাড়ে নয়। কেন?'

'আমার মনে হল নয়। বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ, তাই তো?'

'হ্যাঁ তেতাল্লিশ।'

'অদ্ভুত ব্যাপার।'

'মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চাইছেন!'

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন না কথাটার। যেন আরও কিছুটা অন্ধকার টেনে নিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখলেন। জয়দেবের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মহিলার গলা শুনে বেশ সুস্থই মনে হয়, ড্রাইভারের সঙ্গে যখন কথা বলছেন তখন বেশ স্বাভাবিক, তাহলে তাকে এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?'

এগারোটা নাগাদ হরিণবাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। বাকি পথে কোনও কথাবার্তা হয়নি। এর মধ্যে গভীর ঘুমে জড়িয়ে আছে হরিণবাড়ি। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। আর তখনই বৃষ্টিটা ফিরে এল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'মান সিং, ওঁকে গেস্টহাউসে নামিয়ে দাও আগে।' জয়দেব খুশি হল। এই বৃষ্টিতে তাকে গেস্টহাউস খুঁজতে হবে না বলে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল মহিলাকে। একটা কাঠের বাংলোর সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দু-বার হর্ন বাজাল ড্রাইভার। একটু বাদেই একটা লোক ছাতি মাথায় ছুটে এল। গেট খুলে ড্রাইভার তাকে বলল, 'এই, সাব আজ রাত্রে থাকবেন।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'হুজুর, কামরা তো খালি নেই। একটা বড় পার্টি এসে বুক করে ফেলেছে। অফিস রুমে পর্যন্ত লোক শুয়েছে।'

'সর্বনাশ!' জয়দেব আঁতকে উঠল। লোকটা আর দাঁড়াল না, গেট বন্ধ করে ফিরে গেল।

'আর কোনও জায়গা নেই? কোনও হোটেলে?'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'না সাব। তবে ফরেস্টের একটা বাংলো আছে, সেখানে গেলে—'

'তাই চলো ভাই।'

'গাড়ি ঘুরল। হরিণবাড়ি ছোট জায়গা। বাজার এলাকা পেরোতে সময় লাগল না। ড্রাইভার বলল, 'মেমসাহেব কি নেমে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে একটা বাংলো বাড়িতে ঢুকল। সেই বৃষ্টিতে গেট খুলে

ছাতি মাথায় একটা লোক দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে। গাড়ি সিঁড়ির কাছে পৌঁছাতেই সে ছুটে এসে দরজা খুলল, 'সেলাম মেমসাহেব।'

'কেমন আছ?'

ওঁরা নেমে দাঁড়ালেন। মালপত্র নামানো হচ্ছে। সিঁড়ির ওপর যে হ্যারিকেনটা জ্বলছে তার আলোয় মহিলাকে দেখতে পেল সে। রোগা লম্বা এবং কালো শাড়ির আঁচলে কপাল পর্যন্ত ঢাকা এবং অসম্ভব ফরসা মনে হল। হঠাৎ মহিলা বললেন, 'এক কাজ করুন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, মান সিং ঘুরে দেখে আসুক কোথাও জায়গা আছে কিনা!'

জয়দেব সসঙ্কোচে বলল, 'না, না, আপনারা চিন্তা করবেন না—।'

'চিন্তা তো করছি না। আপনি এখানে নতুন, এক কাপ কফি খেয়ে গেলে আমাদের ভালো লাগবে। এ বাড়িতে কোনও অতিথি এলে কিছু না খেয়ে যেত না।'

অগত্যা সুটকেস নিয়ে নামল জয়দেব। বেশ বড় বাংলো। সামনে বাগান আছে। মান সিং ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যেতেই ওরা ড্রইংরুমে ঢুকল। সেখানে একটা স্ট্যান্ডের ওপর বড় সেজবাতি জ্বলছে। মহিলার আগে দ্বিতীয়জন মালপত্র নিয়ে দোতলায় চলে গেল। দারোয়ানটা হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মহিলা বললেন, 'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ মেমসাহেব।'

'একটু কফি করো। আপনি বসুন, আমি আসছি।' মহিলা ওপরে উঠে গেলেন। জয়দেব একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল। খুব ক্লান্ত লাগছে খিদেও পেয়েছে। সে ঘরটাকে দেখল। সুন্দর সাজানো কিন্তু মহিলা এখানে থাকেন না। কোনও পুরুষমানুষ এই বাড়িতে আছে বলে মনে হচ্ছে না, ওই দারোয়ানকে বাদ দিলে। মুখ দেখেছে সে। মোটেই সুন্দরী নন। মোমের মতো সাদা লম্বাটে মুখ। কিছুক্ষণ তাকালেই অস্বস্তিকর শিরশিরানি হয়। মিনিট দশেক বাদে মহিলা নেমে এলেন। এবার পরনে একটা কালো ম্যাক্সি, চুলে একটা কালো সিল্ক জড়ানো। আর এই সময় কফিও এল।

এক কাপ। জয়দেব বলল, 'আপনি খাবেন না?'

'উঁহু। ও জানে, আজকের রাত্রে আমি কিছু খাই না।' উলটোদিকের সোফায় বসলেন মহিলা।

কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে জয়দেব বলল, 'চমৎকার।'

আবার সেইরকম অস্ফুট শব্দ বের হল মহিলার ঠোঁট থেকে। জয়দেব মুখ তুলল। মহিলা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সেই চাহনি, ঠোঁটের ভাঁজ দেখে শিউরে উঠল জয়দেব। কিছু বলতে হয় এমনভাবে সে বলল,'আপনি এখন কোথায় থাকেন?'

'কানপুরে।' তারপর নিজের মনেই বললেন, 'অদ্ভুত মিল।'

এই সময় মান সিং ফিরে এসে জানাল ফরেস্ট বাংলোতেও জায়গা নেই। জয়দেব উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, আমি তোমার গাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে দেব। আর তো ঘণ্টা ছয়েক। তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

মান সিং বলল, 'সাহেব যেমন ইচ্ছে করবেন তাই হবে।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'আপনি জলে পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে! শুনুন, আমার এখানে একতলায় কেউ থাকেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে যে কোনও ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারেন। গাড়ির ভেতরের চেয়ে সেটা বোধহয় মন্দ হবে না।'

মান সিং ঘাড় নাড়ল, 'তাহলে তো ভালোই হল। আমি ছ'টার সময় আসব।' জয়দেব কিছু বলার আগেই মান সিং বেরিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই ব্যবস্থায় খুশি হননি!'

'না, তা নয়। শুধু-শুধু আপনাকে বিব্রত করা—।'

'মোটেই নয়। এ বাড়িতে গত পাঁচ বছর কোনও পুরুষমানুষ বাস করেনি, আপনি থাকলে

ভালোই লাগবে।' বড় একটা নিশ্বাসের শব্দ হল।

অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্নটা মাথায় পাক খাচ্ছিল এখন সেটা ব্যক্ত করল জয়দেব। গাড়ির তুলনায় ঘরের আরাম অনেক ভালো। একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় যখন পাওয়া গেল তখন প্রশ্নটা করাই যাক, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার স্বামী—।'

'ও নেই।' মহিলার ঠোঁট দুটো নড়ল।

'ওঃ।' জয়দেব অপ্রস্তুত হল।

'পাঁচ বছর আগে ও চলে গেছে। আমার কপাল। আজ ওর মৃত্যুদিন। যেখানেই থাকি আজকের রাতে এখানে না এসে পারি না। আসি, তিনদিন থাকি, চলে যাই।' মমির মতো মুখ নিয়ে বসেছিলেন মহিলা।

জয়দেবের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল, প্রসঙ্গটা না তুলতেই ভালো হত। কিন্তু মুখফসকে বেরিয়ে এল, 'কত বয়স হয়েছিল?'

'তেতাল্লিশ। খুব ভালো স্বাস্থ্য। আপনার সঙ্গে বেশ মিল আছে। আপনি যে ব্রান্ডের সিগারেট খান সেটা ওর প্রিয় ছিল।' মহিলা স্থির হয়ে বসেছিলেন।

'কি হয়েছিল?' অস্বস্তি বাড়ছিল জয়দেবের।

'জানি না। ডাক্তার বলেছে স্ট্রোক, হবে হয়তো। আমার সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করেছিল। অভিমান করে নিচের ঘরে এসে শুয়েছিল সে রাত্রে। মাঝরাত্রে শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখি মাটিতে পড়ে আছে, ডেড।' নিশ্বাস ফেললেন মহিলা, 'সে রাতেও এমনি বৃষ্টি পড়ছিল। সব শেষ হয়ে গেল আমার। ও প্রায়ই বলত, আমি মরে গেলেও তোমার কাছে আসব। এল না, পাঁচ বছর ধরে এই রাত্রে আমি তাই এখানে ছুটে আসি। সারা রাত জেগে বসে থাকি, ওই বাগানে মাটির তলায় সে শুয়ে আছে। মাঝে-মাঝে সমাধিটার কাছে যাই—।' বলতে-বলতে থেমে গেলেন মহিলা।

হঠাৎ ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল জয়দেবের। এরকম সাদা মোমের মতো নীরক্ত মুখ নিয়ে মহিলা তার দিকে কী অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। তারপরেই যেন চেতনায় ফিরে এলেন উনি, বললেন, 'ছেড়ে দিন এসব কথা। আপনার খাবার দিতে বলি!'

ত্রস্তে বাধা দিল জয়দেব, 'না, না, কোনও দরকার নেই। আমার খাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।'

'সে কি। কেন?'

'আমি স্টেশনে খেয়ে নিয়েছি।' বেমালুম মিথ্যে বলল জয়দেব।

'ও। তাহলে রাত করে লাভ কি! ভোরে বেরুবেন যখন তখন শুয়ে পড়ুন।' মহিলা উঠলেন। তারপর ওঁকে অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে গেলেন কোণার ঘরটির দিকে। শুয়ে পড়লে এঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এই আশায় জয়দেব খুশি হল। তিনটে কাচের জানলা। বাইরে সশব্দে বাজ পড়ল একটা। বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সাদা দেখাল আচমকা। মহিলা বললেন, 'এখানেই শুয়ে পড়ুন। পাশেই টয়লেট আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।'

সুটকেসটা খুলল জয়দেব। টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। মহিলা একটা ডিমবাতি এনে দিলেন বড় ঘর থেকে। তারপর জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিনিট তিনকে বাদে পরিষ্কার হয়ে পাজামা পরে বেরিয়ে এসে জয়দেব দেখল মহিলা তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল জয়দেবের। কেমন শিরশিরে দৃষ্টি। মহিলা বললেন, 'আপনি সিগারেটটা ধরান তো, গন্ধটা নিয়ে যাই।'

সম্মোহিতের মতো সিগারেট ধরাল জয়দেব। কিছুক্ষণ পরে সেই অস্ফুট শব্দ হল। চোখ বন্ধ করে মহিলা যেন বাতাস নিলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'ঠিক এরকম।' তারপর

ধীরে-ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দোতলায় উঠে যাচ্ছেন সেটা সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দে বোঝা গেল।

বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকাল জয়দেব। তারপরেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে। মহিলার স্বামীকে নিচের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আজ সেই মৃত্যুর রাত। পাশের বাগানেই তার কবর। এই রাতে নাকি তিনি উঠে আসতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছিল জয়দেবের।

তার সিগারেট, বয়স, উচ্চতা সব ওই লোকটার মতো। মাঝরাতে, এই বৃষ্টির রাতে যদি মহিলা নেমে আসেন এ ঘরে! শিউরে উঠল জয়দেব। ওই মড়ার মতো মুখ, অভিব্যক্তিহীন, বয়স্কা—। দৌড়ে ঘরের কোণের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সে। রাতের অবশিষ্ট সময়টুকু জেগে থাকা ছাড়া উপায় নেই। নিচে, মাটির নিচে যে শুয়ে আছে তার উঠে আসা আর দোতলার ঘরে যিনি গেলেন তাঁর নেমে আসার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।



চৌকাঠে পা

সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। ট্রাম থেকে নেমে হওড়া স্টেশনের ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা জানত বনি। ওপাশ থেকে হুড়মুড়িয়ে লোক নামছে। নীপার বুকের ভেতরে এখন দমকলের ঘণ্টা। বাস থেকে নামার পরই এটা শুরু হয়ে গেছে। বনি বলল, 'তুই ওইরকম মুখ করেছিস কেন? যে দেখবে সেই বুঝবে।' নীপা চেষ্টা করল অন্যরকম মুখ করতে। কিন্তু কীভাবে করতে হয় বুঝতে পারছিল না। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল আশেপাশের যে-কোনও মানুষ হঠাৎ বলে উঠবেন, 'এই নীপা, তুই এখানে?'

হাঁটতে-হাঁটতে বনি বলল, 'আমাদের ইউনিফর্মগুলো ছাড়তে হবে। কোথায় ছাড়ি বল তো?'

নীপা ওর দিকে তাকাল, 'কেন'?

'বাঃ। স্কুলের ইউনিফর্ম দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে আমরা চলে এসেছি।' তারপর থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল, 'আরও ওপরে। আমি আর বাড়িতে যাব না। কখনও না। রেজাল্ট দেখলে মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।' নীপা কিছু বলল না। গতকালই মিস বলে দিয়েছিল কারা-কারা প্রমোশন পায়নি।

আজ রেজাল্ট কার্ড হাতে পেয়েও সেটাই জেনেছে। ফিজিক্স আর অঙ্কে ফেল। বাবা এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। বাবার সামনে ওই কার্ড নিয়ে দাঁড়ানো যায় না। মা হয়তো বকবে, হয়তো কাঁদবেও কিন্তু বাবা—। বনি বলল, 'এসে গেছি। ওই যে বড় ঘড়ি, ওর নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা।'

দুজনের হাতেই কাজ করা চটের ঝোলানো ব্যাগ। ওতেই বই নিয়ে স্কুলে যায় ওরা। আজ তার তলায় লুকিয়ে আনা হয়েছে দুটো স্কার্ট, একটা তোয়ালে, টুথপেস্ট, ব্রাশ, হলদে চিরুনি আর কয়েকটা রুমাল। ওপরে খাতাপত্তর।

গতকাল রেজাল্ট কী হয়েছে জানার পরই এই সিদ্ধান্ত। একটু-একটু করে জমানো একশো সত্তরটা টাকা সঙ্গে এনেছে নীপা। এতদিনে সেটাকে অনেক টাকা বলে মনে হত তার। বনি বড়

ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বলল, 'স্বপনটা চিরকাল লেট লতিফ। সেই সরস্বতী পুজোর সময় মনে আছে? আমাদের পনেরো মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।' স্বপন হল বনির বয়ফ্রেন্ড। যাদবপুরে পড়ে। সরস্বতী পুজোর সময় প্রোগ্রাম করেছিল বনি। সেই সময় অতীনের সঙ্গে আলাপ। সারাদিন চারজনে টইটই করে শহরটা ঘুরেছিল। যেসব জায়গায় বাবার যাওয়ার সম্ভবনা নেই, সেইখানে গিয়ে বসেছিল। এই যেমন ভিক্টোরিয়ায়। আর সেইখানে গিয়েই অতীন তাকে বলেছিল, 'আই লাভ ইউ নীপা। আই অ্যাম ডায়িং ফর ইউ।'

স্বপন বনিকে নিয়ে বসেছিল দূরের একটা গাছের তলায়। অতীন তার পাশে। প্রথম আলাপ, সঙ্গে-সঙ্গে নাকের ডগায় ঘাম জমেছিল। মুখে রক্ত। কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

'ইউ আর সামথিং! তুমি কি তা নিজেই জানো না।'

'যাঃ। তুমি আমাকে চেনোই না, কখনও দ্যাখোনি।'

'শুনেছি। স্বপন বনির কাছে শুনে সব বলেছে। তা ছাড়া কাউকে চিনতে এক মুহূর্তই যথেষ্ট। তুমি আমাকে প্রমিস করো আর কাউকে ভালোবাসবে না?' ওর হাত ধরেছিল অতীন। আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠেছিল নীপা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল, 'ভেবে দেখি।' কিন্তু চোখের সামনে তখন বাবার মুখ। দু-বছর আগে বাবা তাকে জাড়িয়ে ধরে বলত, 'মা গো, একবার বলো, আর কাউকে ভালোবাসি না তোমাকে ছাড়া।'

সেই কোন ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যেস। বাবার গায়ের গন্ধ খুব ভালো লাগত তখন। ইদানীং বাবা এইভাবে আর জড়িয়ে ধরে না। তার শরীর যখন পালটে গেল, সেই গোপন ব্যাপারটা মা যখন আরও গোপনে বুঝিয়ে দিল তখন থেকেই বাবা যেন কেমন দূরে-দূরে। তবু কখনও তার কাঁধ জড়িয়ে আদর করার চেষ্টা করতে সে নিজেই বিরক্ত হয়েছে, 'আঃ বিরক্ত করো না।' বাবা তার দিকে প্রথম-প্রথম আবাক হয়ে তাকাত। সে যে বিরক্ত হয়, হতে পারে তা যেন বিশ্বাস করত না, এখন করে।

বনি বলল, 'এই, লেডিস ওয়েটিং রুমে ঢুকে জামা পালটে আসবি।' নীপা কী বলবে বুঝতে পারছিল না বাঁ-দিকের একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক তাদের দেখছে। সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল তার। বনিকে তো মোটেই নার্ভাস মনে হচ্ছে না। ক্লাসের সবাই বলে বনির মধ্যে কেমন ছেলে-ছেলে ভাব আছে। বনি ঘড়ি দেখল, 'কী ব্যাপার? ওরা তো আসছে না। তুই এখানে দাঁড়া, আমি ফোন করে আসি। ওই যে ওই কোণে ফোনের বুথ আছে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল নীপা, 'না, আমি একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

বনি হাসল, 'তুই একটা কেবলি। চল।'

বনি যে স্টেশনটা ভালো চেনে তা বোঝা যাচ্ছে। ও এমনভাবে হাঁটছে যেন বাড়ির লোকেরা সঙ্গে আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হইচই বেড়েছে।

বাবা বকছে মাকে, মা প্রতিবাদ করছে।

প্রতিবছর রেজাল্ট বের হওয়ার দিন মা-বাবা একসঙ্গে তাকে নিয়ে স্কুলে আসে, আজও এসেছিল। রাস্তার ওপাশে গার্জেনদের ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সবাই চলে গেল অথচ নীপা আসছে না দেখে নিশ্চয়ই হেডমিসট্রেসের কাছে খোঁজ নিয়েছে। আর তখনই জানতে পেরেছে রেজাল্টের কথা। বনির সঙ্গে যে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে ও তা কেউ ভাবতে পারেনি। এখন কী করবে? নিশ্চয়ই বুয়ামামার বাড়িতে খোঁজ নেবে অথবা রীতামাসির ওখানে। পাড়ায় ওর কোনও বন্ধু নেই। মা কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মেয়ে সুন্দরী বলে মায়ের অস্বস্তির শেষ নেই। এবার ক্লাস নাইন হলেও মা চাইত সবাই যেন তার দিকে চোখ বন্ধ করে থাকুক। তারপর বিকাশ জেঠুর কাছে নিশ্চয়ই ছুটে যাবে বাবা। বিকাশ জেঠু লালবাজারের বড় অফিসার। সেটা কখন যাবে?

বুথের সামনে বেশ ভিড়। বনির পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল নীপা। সুযোগ আসা মাত্র বনি ভেতরে ঢুকে বলল, 'ব্যাগটা ধর।' নীপাও বুথের ভেতরে পা রেখে স্বস্তি পেল। যেন এখন তিনদিকের মানুষ তার ওপর নজর রাখতে পারছে না। মিনিট দুয়েক অন্তত দশবার নাম্বার ঘোরাল বনি। প্রতিবারেই রিলে করার মতো বলে যাচ্ছে এনগেজড। এখন আরও দুজন অপেক্ষা করছে টেলিফোন করবে বলে। তার একজন বেশ ছিমছাম চেহারা, মুখের ভঙ্গিটা অনেকটা জ্যাকি শ্রফের মতো, হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'লাইন পাওয়া যাচ্ছে না?' বনি আরও জোরে রিসিভার আঁকড়ে নাম্বার ঘোরাতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা বলল, 'অত জোরে ঘোরালে স্টেশনের টেলিফোন কথা বলবে না। হয় আমারটা আমাকে করতে দাও নইলে তোমাদের সাহায্য করতে পারি।'

'কী সাহায্য করবেন?' বনি খিঁচিয়ে উঠল।

'রাগ করছ কেন? এটা পাবলিক টেলিফোন। দাও, আমি লাইন ধরে দিচ্ছি।' হাসিটা এমন যে, বনিও রিসিভার হস্তান্তর করল। অতএব নীপা নেমে দাঁড়াল। লোকটা স্বচ্ছন্দে তুমি বলছে। বনিকে না হয় বড় দেখায় না কিন্তু—! রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'নাম্বারটা?' বনি ওকে একটা আধুলি আর নাম্বার দিল। শুনে নিয়ে নাম্বার ঘোরাল লোকটা। কিন্তু এবারেও কিছু হল না। বনি মন্তব্য করল, 'পারলেন না তো!' লোকটা জবাব না দিয়ে আবার চেষ্টা করল। এবার ওর ঠোঁটে হাসি ফুটল। নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল নাম্বারটা ঠিক কি না। তারপর রিসিভারটা বনিকে দিয়ে বলল, 'কথা বলো।'

'থ্যাঙ্কু।' বনি স্মার্ট হল, হ্যালো, স্বপন আছে? নেই। কোথায় গেছে? কাল মালদায় গিয়েছে মায়ের সঙ্গে। কবে আসবে? ও। ঠিক আছে। না, আমার নাম বলতে হবে না।' বনির মুখে এখন মেঘ, যেন কেঁদে ফেলবে ও।

কোনওরকমে রিসিভারটা নামিয়ে সে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্বপন নেই, মালদায় গিয়েছে। এখন আমরা কী করব?'

'সেকী! ওরা আসবে না? নীপা হতভম্ব।

'কাওয়ার্ড। ব্যাকবোন নেই।' বনির চোখে এবার জল। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিল সে, 'আমাকে বিট্রে করেছে। আমি কী করব এখন, আমি আত্মহত্যা করব। বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না নীপা।'

কান্না পাচ্ছিল নীপারও। দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু তার একবারও অতীনের জন্যে মন খারাপ করছিল না। অতীন আসবে না ভেবে কষ্টের বদলে কেমন একটা স্বস্তি হচ্ছিল। এবং তার বদলে ভয় করছিল, বনি আত্মহত্যা করতে পারে। ওই তো ওপাশে ট্রেন, তার তলায় পড়ে গেলেই হল। সে বনির হাত ধরল, 'বনি, চল বাড়িতেই ফিরে যাই।'

'না। মাথা নাড়ল বনি। তারপর ছোট্ট রুমালে চোখ মুছল, 'আমি চিঠি লিখে এসেছি। নিজের জীবন নিজে ঠিক করে নিলাম। আমার খোঁজ করো না। এরপর আমি বাড়িতে ফিরতে পারব না। অসম্ভব। আমি আত্মহত্যা করব।'

'এই বনি, প্লিজ, তুই আত্মহত্যা করলে আমি কোথায় যাব।'

'তুই জানিস না নীপা, স্বপন আমাকে বউ বলত। বলত, কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না। আর আজ এখানে আসতে বলে মাকে নিয়ে মালদায় চলে গেল। মা ঠিকই বলে, পুরুষজাতটাই বেইমান।' দ্বিতীয়বার চোখ উপচে জল এল।

'তোমরা এইভাবে কান্নাকাটি করলে পুলিশ নির্ঘাত ধরে নিয়ে যাবে।' একদম পেছনে দাঁড়িয়ে লোকটা কথা বলতেই ওরা চমকে ফিরে তাকাল। লোকটা মিষ্টি করে হাসল, 'টেলিফোনে বন্ধুকে পাওনি তাই কাঁদতে হবে?'

বনি কথাটা শেষ হওয়ামাত্র নীপাকে বলল, 'চল'। আর ঠিক সেই সময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী ব্যাপার? কাঁদছ কেন খুকি?'

সঙ্গে-সঙ্গে নীপা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

লোকটার চেহারা বিকাশজেঠুর মতো, নির্ঘাত পুলিশ। বনিও মাথা নামাল। আর সেই সময় পেছনের লোকটা বলে উঠল, 'ওই যা হয় রেজাল্ট বেরিয়েছে, কান্নাকাটি তাই।'

'পাশ করেনি?'

'হ্যাঁ। দাদা খুব রাগী তাই ভয় পাচ্ছে।'

'আপনার কে হয় এরা?'

'একজন ভাইঝি আর এ পাশের বাড়িতে থাকে।'

'বাড়ি নিয়ে যান।'

লোকটি বলল, 'চলো। এখন কান্নাকাটি করে কী হবে? পড়াশুনা না করার সময় মনে ছিল না? চলো, ট্রেনের দেরি নেই।'

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ওরা কিছুটা দূরে হেঁটে এলে লোকটা বলল, 'আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী! রেলওয়ে পুলিশের বড়কর্তা। আমি না থাকলে তোমাদের এতক্ষণে চালান দিয়ে দিত। পুলিশের খাতায় একবার নাম উঠলে—! কোথায় যাবে তোমরা?'

নীপা বনির দিকে তাকাল। বনির মুখে এখন কান্না নেই। সে বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে কেউ নেই। তারপর বনি বলল, 'আমরা একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

লোকটা বলল, 'শোনো, পাগলামি করো না। তোমরা স্কুল-ইউনিফর্মে ঘুরলে পুলিশ আবার ধরবে। কারও আসার কথা ছিল নিশ্চয়ই?'

প্রশ্নটা নীপার দিকে তাকিয়ে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পায়নি? চলো, ওই রেস্টুরেন্টে বসে স্থির করি কী করা যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। লোকটা আগে-আগে হাঁটছিল। কিছু না ভেবেই ওরা অনুসরণ করল। বনি ফিসফিস করে বলল, 'লোকটাকে কীরকম মনে হচ্ছে রে!'

'জ্যাকি শ্রফের মতন?'

'ভাগ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে না? স্বপনদের থেকে অনেক বড। খারাপ লোক মনে হয়?'

'কী জানি। আমার ভয় করছে। চল, বাড়ি ফিরে যাই।'

'তুই যা। আমি বাড়ি যাব না।' বনি জেদি গলায় বলল।

ফিসফ্রাই খুব ফেবারিট বনির। নীপার আবার ফিস ফিংগার ভালো লাগে। লোকটার নাম জেনেছে ওরা। সুন্দর সেন। বনি বলল, 'আপনাকে প্রফেসর বলে মনেই হয় না। নীপা বলছিল আপনাকে জ্যাকি শ্রফের মতো দেখতে?'

'সে আবার কে।'

সুন্দর এমন মিষ্টি হাসল যে বনি চোখ বড় করল, 'ওমা, আপনি হিন্দি সিনেমা দ্যাখেন না?'

'তোমরা খুব দ্যাখো বুঝি?'

'রবিবারে আর চিত্রহারে।'

'কিন্তু তা তো হল, তোমরা এখন কী করবে? কোনও আত্মীয়ের বাড়ি নেই?'

নীপা বলল, 'আমার এক পিসি থাকেন আসানসোলে।'

'সেখানেও তো খবর যাবে। আসলে মালদা থেকে স্বপন না ফেরা পর্যন্ত তোমাদের একটা কোথাও থাকতে হবে।' সুন্দরকে চিন্তিত মনে হল।

এই আধঘণ্টায় ওরা সুন্দরকে পছন্দ করে ফেলেছিল। খুব স্নেহপ্রবণ, মিষ্টি ব্যবহার এবং

সবসময় ওদের সাহায্য করতে চাইছে। কথা বলছে যখন তখন মনে হচ্ছে সমানে-সমানে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাবা-মায়ের মতো তুচ্ছ করছে না। সুন্দর বলল, 'এ-কাজ করতে পারো। আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলো। সেখানে বউদিরা আছেন। তাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকো। এর মধ্যে স্বপনকে নিয়ে ওখানে হাজির করছি। ভেবে দ্যাখো।'

'ওরা কিছু বলবেন না?'

'কে বউদিরা? ওঁরা আমাকে জানেন। একদম নিরাপদ তোমরা সেখানে।'

বাসে যে এত ভিড় হয় কে জানত। হাওড়া থেকে ট্রেনে একটা জায়গায় নেমে বাসে উঠেছিল ওরা। গ্রামের মানুষগুলো বারংবার ওদের দিকে তাকাচ্ছিল। এ ধরনের বাসে ওরা আগে ওঠেনি। জানলা দিয়ে ধানের খেত, পুকুর, তালগাছ দেখতে কি ভালোই না লাগছিল। বাসটা যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেল সেখানে একটা বিরাট বট গাছ। তার তলায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। বিকেল হয়ে এসেছিল। সুন্দর বলল, 'তোমাদের হাঁটতে কষ্ট হবে এবার। চলো শর্টকাট করি, গাড়ির পথ ধরলে বেশি হাঁটতে হবে।'

খুব মজা লাগছিল ওদের। মাথার ওপরে নীল আকাশটা কী নীল। দু-পাশে থাকা ধানের ঢেউ। ওরা আলের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। সুন্দর হঠাৎ খোলা গলায় গান ধরল, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়—।' সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দরকে আরও ভালোও লাগল নীপার। নিজের অজান্তেই সে গলা মেলাল। এই মুহূর্তে তার বুকে কোনও ভয় জমে ছিল না। মাঠের প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ি। পেছনে পুকুর। অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। ওরা ভেতরে ঢোকামাত্র কয়েকটি মহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। সুন্দর বলল, 'এই হল আমার তিন বউদি। বউদি, এ হল বনি আর ওর নাম নীপা। খুব ভালো মেয়ে ওরা। এখানে ক'দিন থাকবে কিন্তু কেউ যেন না জানে ওরা এখানে আছে।'

'কেন গো, কী ব্যাপার? ছোটজন প্রশ্ন করল।

বড়জন বকে উঠল। 'আরে এখনও পায়ে ধুলো আর প্রশ্ন তুললি তুই। এসো তোমরা।'

বড়বউদি ওদের ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

'আমাদের এখানে অনেকগুলো ঘর। তোমাদের থাকতে মোটেই অসুবিধে হবে না।' আঁচলে বাঁধা একটা চাবির তোড়া থেকে খুঁজে ওপাশের বন্ধ ঘরের তালা খুললেন তিনি। চমৎকার সাজানো ঘর। এরকম ফাঁকা মাঠের মধ্যে এমন ঘর ভাবা যায় না। বউদি বললেন, 'এখানেই তোমরা থাকবে, কেমন! এদিকের জানলায় দাঁড়ালে কেউ তোমাদের দেখতে পাবে না। ওপাশে জলা। বড় রাস্তা বাড়ির এপাশে। সেদিকে না গেলেই হল। ও হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু ভাই সাহেবি বাথরুম নেই। পুকুরে স্নান করি ভোরবেলায়। তবে তোমাদের জন্যে হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিচ্ছি। নিচে কলপায়খানা আছে। তা কী ব্যাপার, বাপমায়ের সঙ্গে ঝগড়া?'

এবার মুখ নিচু করল নীপা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মা-বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে।

মুড়ির সঙ্গে নারকোল খেতে-খেতে বনি বলল, 'দারুণ, না?'

নীপা মাথা নাড়ল। তার মুড়ি খেতে ভালো লাগে না। চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু এক প্লেট ফিশ ফিংগার সেই সকালে খাওয়ার পর এটা অমৃত লাগছে। ওদের সামনে ছোট দুই বউদি বসে আছে হাঁটু মুড়ে। ছোটবউদি বলল, 'তোমাকে কী মিষ্টি দেখতে! ঠিক সিনেমার নায়িকার মতো। তা প্রেমিকরা এল না কেন ভাই?'

বনি কিছু বলল না। মুখ নামাল। নীপা প্রতিবাদ করল, 'ওর বয়ফ্রেন্ড আছে।'

বনি প্রতিবাদ করল, 'এই, অতীন তোকে বলেছে আই লাভ ইউ। আমি শুনেছি।'

'আমি তো বলিনি।'

'শুধুই কথাই বলেছে আর কিছু করেনি? বলো না ভাই, আমাদের স্বামীরা তো শহরে থাকে, হপ্তার বার। পাঁচদিন একা-একা থাকি। চুমু-টুমু খায়নি ওরা?' ছোট হেসে গড়িয়ে পড়ল।

মেজো ওকে চড় মারল আলতো করে, 'কী মুখ রে বাবা। খেলে তোকে বলবে কেন?'

ছোট বলল, 'আমাদের সুন্দরবাবু তো মেয়েদের থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন, সেই ছেলে তোমাদের নিয়ে এল। পছন্দ আছে।'

এখানে ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেন জ্বলছে। ওরা দুজন জানলার পাশে বসে মাঠ দেখছিল। সেখানে অজস্র জোনাকি। বউদিরা নিচে রান্না করতে গিয়েছে। ওদের দেখার পর আর একটুও ভয় করছিল না। সুন্দর সেই যে গিয়েছে আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তার। নীপা ফিসফিস করে বলল, 'এদের টয়লেট ভীষণ নোংরা।'

'গ্রামের দিকে এইরকম হয়।'

'তুই কখনও পুকুরে স্নান করেছিস?'

'না। মা সবসময় ঠান্ডা-গরম জলে স্নান করতে বলে।'

'আমাকেও।'

'তোর মন কেমন করছে?'

'হুঁ।' নীপা বলল, 'একসাইটেড হলে মায়ের বুক ব্যথা করে, হাঁফ ধরে। বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। জানিস, বাবা না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমার কপালে একবার হাম খেত।'

'হাম!' হেসে ফেলল বনি, 'হাম তো বাচ্চাদের খায়। তুই কি বাচ্চা?' কথাটা খারাপ লাগল নীপার। হঠাৎ তার মনে হল বাবাকে কোনওদিনও সে দেখতে পাবে না। টপটপ করে জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে। বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল।

হ্যারিকেনটা পেছনে থাকায় বনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বনি বলল, 'স্বপন এলে আমি খুব বকব।'

'তারপর কী করবি?'

'কোথাও চলে যাব ওর সঙ্গে।'

'আমি কী করব?'

'আঃ, স্বপন একা আসবে নাকি? অতীনকে নিয়ে আসবে।'

'আমি অতীনের সঙ্গে যাব কেন?'

'বাঃ, তোকে ও ভালোবাসে না?'

'আমি তো ভালোবাসি না।' নীপা মাথা নাড়ল, 'এমনি ভালো লাগে।'

'তাহলে তুই এলি কেন?'

'একা-একা বড় হব বলে। মা-বাবার সাহায্য ছাড়া বড় হয়ে ফিরে যাব। মা প্রায়ই বলে আমার ভবিষ্যৎ নাকি ঝরঝরে। সেটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করব।'

'কী করে?'

'জানি না।' কেঁদে ফেলল নীপা।

'কাঁদিস না।' নীপার পিঠে হাত রাখল বনি, 'স্বপন অতীন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এত ঝাল রান্না কখনও খায়নি নীপা। আর কী সব তরকারি। বাড়িতে হলে ছুঁয়েও দেখত না সে। হাঁটু মুড়ে খেতে বসে কষ্টও হয়েছিল। রান্না কিন্তু ভালো। মা রোজ একই মেনু করে। মাছ অথবা মাংস। ঝাল সত্ত্বেও মাছের প্রিপারেশন দারুণ লেগেছিল। আর পায়েসটা? উঃ ফ্যানটাস্টিক! কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। বনিরও। এই প্রথম বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে ওরা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কিন্তু বাইরে শেয়াল ডাকছে। কয়েকবার মনে-মনে কেঁদেছে সে। একবার মনে হল বনিও কাঁদছে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল মালদা থেকে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? নীপা জানে না, জবাবও

দিতে পারেনি। ভোর হতেই দরজায় শব্দ। ওরা দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে কে বলল। ছোট বউদির গলা ভেসে এল, 'চলে এসো, স্নান করতে হবে।'

বাড়ির পেছনেই পুকুর। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ওরা তোয়ালে নিয়ে ছোট বউদির সঙ্গে সেখানে এল। আশেপাশে কেউ নেই। এখনও আলো ফোটেনি। ছোটবউদি বলল, 'তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে নাও। তোমাদের দেখলেই লোকে বুঝবে শহরের মেয়ে।' খুব ভয় লাগছিল জলে নামতে। কিন্তু জল তত ঠান্ডা নয় কিন্তু কেমন ঘোলাটে। পায়ের তলায় কাদামাটি। নীপার মনে হল কয়েক পা গেলেই ডুবে যাবে। সে গায়ে জল ছিটিয়ে স্নানের চেষ্টা করতেই ছোটবউদি তার কাঁধ জলে চেপে ধরে ছেড়ে দিল। রাগ এবং ভয়টা কেটে যেতে খুব মজা লাগল তার। বনি এখন বারংবার ডুব দিচ্ছে। ছোটবউদি এবার তাগাদা দিচ্ছে ফেরার। নীপা বলল, 'আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দিতে হবে।'

ছোটবউদি বলল, 'শেখাতে হবে না, ঠিকই শিখে নেবে।' গলার স্বরটা যেন কেমন!

সারাদিন ঘরে বসে থাকা আর লুডো খেলা। আর দারুণ-দারুণ খাবার। কচু দিয়ে মাছের প্রিপারেশন দারুণ। দুধপুলিটা অসাধারণ। ছোটবউদি আজ দুজনকেই শাড়ি পরিয়ে দিল।

সন্ধের পরেই বড়বউদি ছুটে এল, 'খবরদার কথা বলবে না তোমরা।'

চোখমুখ দেখে চমকে উঠল ওরা, 'কেন?'

'পুলিশ এসেছে গ্রামে। বাড়ি-বাড়ি খুঁজে দেখছে।'

বড়বউদি ওদের হাত ধরে টানতে-টানতে রাস্তার দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক জিনিসপত্র ঠাসা। দুই বউদিকেও সেখানে থাকতে বলল। তাকে হ্যারিকেনের আলোয় খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বড়বউদি চলে গেলে নীপা জানলার কাছে গেল। বাইরে অন্ধকার। এদিকটা ওরা দ্যাখেনি। বাড়ির গায়ে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ত্রিপল ঢাকা। মেজোবউদি ওর হাত ধরে টানল, 'মরার ইচ্ছে হয়েছে, না? চলো এসো এদিকে। একটা কথা বলেছ কি কেটে ফেলব।' নীপা বিস্ফারিত চোখে দেখল মেজোবউদির হাতে বড় ছুরি। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

বনি অনেকটা শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা এই গ্রামে এল কী করে?'

'তোমরা যখন বাস থেকে নেমেছিলে তখন একজন স্কুলমাস্টার দেখেছে। কাগজে খবর পড়ে সে ব্যাটা জানিয়েছে। পুলিশ চলে গেলে তোমরা নেমে একটা ট্রাকে উঠে পড়বে। আর ত্রিপলের তলায় চুপটি করে শুয়ে থাকবে। সুন্দর তোমাদের নিয়ে তোমাদের প্রেমিকের কাছে যাবে।'

নিচে খুব হইচই হচ্ছে। ওরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আওয়াজটা ওপরে উঠে এল। বড়বউদির গলা ভেসে এল, 'হাজারবার বলছি কেউ নেই তবু বিশ্বাস করছেন না। দেখলেন তো সব ঘর।'

পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওই ঘরে কে আছে?'

'আমার জায়েরা। অল্পবয়সি। বাইরের পুরুষের সামনে বের হবে না।'

'তবু একবার দেখব। ওপরওয়ালার হুকুম।'

টর্চের আলো পড়ল ঘরে। দুই বউদি ওদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিভে যেতে বড়বউদি বলল, 'হল তো! আপনাদের জন্যে মা-বোনের ইজ্জত থাকবে না। চলুন নিচে।'

দ্বিতীয় একটি গলা কথা বলল, 'আপনাদের বাড়ির বউরা কি বব ছাঁট চুল রাখে স্যার, দেওয়ালে দুটো বব ছাঁটের ছায়া দেখলাম। আপনি ভেতরে ঢুকুন।'

খাটের ওপর হাঁটুতে মুখ খুঁজে বসেছিল নীপা। পাশের ঘরে বাবা। লালবাজার থেকে নিয়ে আসার পথে এবং এখানে আনার পরে বাবা একটাও কথা বলেনি। ওঘরে এখন ভিড়। পাশের বাড়ির মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম ট্রাক রেডি ছিল, রাত্রেই পাচার করে দিত লখনউ। খুব বেঁচে গেছে। যাই বলো দীপ্তি, তোমরা মেয়ে মানুষ করতে পারোনি।'

সবাই চলে গেলে বাবা ঘরে ঢুকল, 'নীপু, বল তো, আমি তোকে কী দিতে পারিনি?'

পেছন থেকে মা চিৎকার করে উঠল, 'কথা বলো না ওর সঙ্গে। ও রাক্ষুসি, মরে গেলি না কেন, কেন এই—! আমাদের মুখ পুড়িয়ে কেন এলি!'

বাবা বলল, 'এতদিন মেয়ের জন্য অজ্ঞান হচ্ছিলে আর এখন মরে যেতে বলছ। এভাবে কথা বলো না। ওকে খেতে দাও। তুমি আবার দয়া করে খাব না বলো না। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ইচ্ছে ছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। সুন্দর লোকটা অধ্যাপক নয়, মেয়ে ধরে চালান দেয়—কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তিন বউদি আর সুন্দরকে কোমরে দড়ি বেঁধে এনেছে পুলিশ। ওরা যে মিষ্টি গল্প করত—সেসব?

খাওয়ার টেবিলের সামনে মা। ওপাশে বাবা চুপচাপ বসে। সেই এক মেনু। মাছের ঝোলটা মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল সে। সঙ্গে-সঙ্গে মা বলে উঠল, 'কী, মুখে উঠছে না? সেখানে কি রাজভোগ খেতে?'

মাথা নাড়ল নীপা, 'ওরা ফ্যানটাস্টিক রান্না করত। বাড়িতে কখনও এমন রান্না খাইনি!'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মা, 'কী, কী প্রশংসা হচ্ছে? যারা তোমাকে জন্মের মতন বিক্রি করে দিত তাদের প্রশংসা করছ? কালসাপ, কালসাপ—'

নীপা বাবার দিকে তাকাল। এঁটো হাতে টেবিলে রাখা বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরল সে, 'আমি ওখানে খুব ভালো ছিলাম বাবা। ওরা খুব ভালো খাওয়াত, পুকুরে স্নান করতে দিত। পুকুরে ডুব দিতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। কেমন হলুদ-হলুদ পৃথিবীটা, কেমন হলুদ-হলুদ।'



ভাঙা দাঁত

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে সোমবার চার মাস কাবার হয়ে গেল। এখনও শরীরে তেমন বল আসেনি। তাছাড়া, পায়ের হাড় জোড়া লাগলেও মনে হচ্ছে এই বুঝি ভেঙে গেল ফের। মুখচোখের কাটা দাগগুলো মিলিয়েছে। তবে কিনা চারবেলা ভালোমন্দ ঠিক সময়ে পেটে পড়ত, হাসপাতালে এইটেই আরাম। সদর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাস ধরে সে যখন আবার হাতিমবাড়ি চলে এল, তখন তার পকেটে মাত্র একটি টাকা পড়ে আছে।

হাতিমবাড়ির লোকজন তাকে দেখে ভিড় করে এল। গল্পটা এখন জানাজানি হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর দরজায় মাথা ঢুকিয়ে এভাবে বেরিয়ে আসতে আর কাউকে দ্যাখেনি এখানকার মানুষ। এতদিন তারা গল্পটা শুনেছে অন্যের মুখে, খানিকটা অনুমানের ওপর সেটা তৈরি। সোমরাকে হাতের কাছে পেয়ে টাটকাটাটকি জানতে চায়, কি হয়েছিল, কি করে সে বেঁচে গেল।

এত মানুষ তাকে খাতির করছে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল সোমরা। ফ্যালফ্যাল করে সে প্রথমে ভিড়টাকে দেখছিল। এদের অনেককে সে চেনে। এক সময় যারা তাকে পাত্তা দিত না, তারা কি করে আজ এত সদয় হল? দত্ত স-মিলের ম্যানেজারবাবু তাকে বাঁচাল, 'আঃ, কি করছেন কি আপনারা! সবে লোকটা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল আর সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরলেন গল্প শুনবার জন্যে। আরে, সোমরা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া স্বয়ং দেবরাজের দয়া পেয়েছে ও, মিছিমিছি বিরক্ত করবেন না।'

অর্ধেক কাজ হল কথাটায়। কারণ ম্যানেজারবাবু যখন তাকে আদর করে স-মিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছু মানুষ তখনও পেছন-পেছন আসছিল। সোমরার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। পাঁচ মাস আগে এই ম্যানেজারবাবুর পা ধরেছিল সে। একটা কাজ দিতে লোকটার দয়া হয়নি। বলেছিল, 'মুদির দোকানে ওজন মাপিস, কাঠের কলে কাজ করবি কী করে? যা, আর একটা মুদির দোকান খুঁজে নে।'

কিন্তু হাতিমবাড়িতে মুদির দোকান মাত্র দুটো। সে যেটায় কাজ করত, তার মালিকের ছেলে সাবালক হয়ে ও দোকানে বসছে বলে ছাঁটাই হতে হয়েছে তাকে। অন্যটায় কাজ খালি নেই। শেষ পর্যন্ত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে ঢুকিয়ে নিয়েছিল রেঞ্জারবাবু। সাইকেলে চেপে বিটে-বিটে ঘুরে খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ। পাঁচ টাকা রোজ। ওটা কোনও পাকা চাকরি নয়, রেঞ্জারবাবু দয়া করে যা দেবেন তাই নিতে হবে। কিন্তু তাতেই বেঁচে গিয়েছিল সে। মুদির দোকানে খাওয়াপরা নিয়ে পঞ্চাশ টাকার বেশি পেত না। এক মাসে এখানে একশ টাকা হয়েছিল। রেঞ্জার সাহেবের একটা পুরোনো সাইকেল—। এই কয়মাস হাসপাতালে শুয়ে সে সাইকেলটার কথা ভাবত। ওটা আর সারানো যাবে না। রেঞ্জার সাহেব যদি দাম ফেরত চায় তো হলে গেল! ভয়টা মাঝে-মাঝেই পাক খায় বুকের মধ্যে।

স-মিলের বারান্দায় ওকে নিয়ে বসল ম্যানেজারবাবু, 'এবার বল, তোর শরীর কেমন?' মাথা নাড়ল সে, ভালো। কারণ উলটোটা বললে আর কাজ পাওয়া যাবে না এখানে। 'আমরা তো ভেবেছিলাম তুই গেলি, আর বাঁচলি না।' ম্যানেজারবাবু বলল।

'জান খুব কড়া।' স-মিলের ক্যাশিয়ারবাবু মাথা নাড়ল।

'আঃ, আমাকে জান দেখিও না। এ হল ঈশ্বরের কৃপা। নইলে ওই অবস্থা থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না। চা খাবি?' ম্যানেজারবাবু নরম মুখে হাসল।

মাথা নাড়ল সে। চা আনার হুকুম দিয়ে ম্যানেজারবাবু বলল, 'এবার বল তো বাবা, ঠিক যা যা হয়েছিল বলে যা।'

সোমরা কৃতার্থ হল। ম্যানেজারবাবুর দয়া হচ্ছে নিশ্চয়। তা যদি হয়, তাহলে এখানে একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারে সে। চারপাশে কাঠের গুঁড়ি, চেরা কাঠ স্তূপ করে রাখা আছে। তার কাঁচা গন্ধ আসছে নাকে। সোমরা দেখল সবাই তার মুখের দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে। নিজেকে খুব বড় লাগছে এখন। সে গল্প শুরু করল।

রেঞ্জারবাবুর দু-নম্বর সাইকেলে চেপে সব বিটে-বিটে ঘুরে খবর দেওয়া-নেওয়া করে সোমরা। সেদিন পাঁচ নম্বর বিটে চিঠি পৌঁছে দিতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে অনেক ঘোরাফেরা করেছে সে। এই জঙ্গলে একমাত্র হাতি আর বাইসন ছাড়া ভয়ের কিছু নেই। দুটো বুড়ো বাঘ আর কয়েকটা চিতা আছে যদিও, তাদের নজর মানুষের ওপর নেই। কিন্তু সন্ধে হলেই জঙ্গলের বুকে ছমছমে আঁধার জমে। তাই খুব দ্রুত প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল সে। ভাবল নদীর মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করবে। অন্তত এক মাইল রাস্তা বাঁচবে তাহলে। তা নদীতে আজ জল ছিল না এক ফোঁটা। বালি আর পাথরে বোঝাই সিকি মাইল চওড়া নদীতে সাইকেল চালানো মুশকিল। খোলা জায়গা বলে দেরিতে আঁধার নামে। কোনও মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। প্রায় মাঝনদীতে সে চলে এসেছে যখন তখনই চোখে পড়ল। একটা এইটুকুনি হাতি ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে বালি ছড়াচ্ছে। বড়জোর চার ফুট লম্বা হবে কি হবে না। সোমরাকে দেখে একটুও ভয় পেল না বাচ্চাটা। কিন্তু সোমরা ভয় পেল। ওই বাচ্চা যখন ওখানে আছে তখন ওর মা-বাপও ধারেকাছে রয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু খোলা শুকনো নদীর বুকে আর কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। মরিয়া হয়ে সে প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। বালির ওপর গতি পাচ্ছে না চাকা দুটো। এবং পাথরে লেগে সে সাইকেল নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। তেমন কিছু লাগেনি তার, সাইকেলের পেছনের চাকা পড়ে গিয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছিল

আর সেটাই হল কাল।

বাচ্চাটা দৌড়ে এল সাইকেলের কাছে। এসে শুঁড় দিয়ে চাকাটাকে থামাল। তারপর আবার ঘোরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু চাকা আর ঘোরে না। তখন শুঁড় দিয়ে সাইকেলটাকে তুলে একটু দূরে ছুড়ে ফেলতেই সামান্য ঘুরল ঝাঁকুনিতে। এটাই খেলা পেয়ে গেল ও। সাইকেল তুলছে আর ছুড়ছে। সোমরা ফ্যালফ্যাল করে দৃশ্যটা দেখছিল। সে বুঝতে পারছিল এবার সাইকেল অকেজো হয়ে যাবে। তা যদি হয়, রেঞ্জারবাবু তাকে শেষ করে ফেলবে। হাতিটা যদিও খুব বাচ্চা, তবু হাতি তো। গায়ের জোরে সে পারবে কেন? এদিকে ততক্ষণে চাকা আর ঘুরছে না। সোমরা মুখে আওয়াজ করতে বাচ্চাটা সরে দাঁড়াল। তখন সে সাহস করে দৌড়ে সাইকেলটাকে তুলে সিটে বসতেই বাচ্চাটা তার কোমর পেঁচিয়ে ধরল। পরমুহূর্তেই সোমরা দেখল সে শূন্যে ভাসছে এবং তারপরেই একটা পাথরের চাই-এর ওপর আছড়ে পড়তেই পৃথিবীটা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। জ্ঞান ফিরতেই পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। বাচ্চাটা তখন সাইকেলটাকে শুঁড়ে তুলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। উঠে বসার চেষ্টা করল সোমরা, পারল না। তার তখনই নজরে পড়ল দুটো পাহাড়ের মতো বিশাল হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। সামনে এসে সাইকেলটাকে শূন্যে তুলে ধরল বাচ্চাটা। দু-হাতে মুখ ঢেকে চোখ বন্ধ করল সোমরা। আর তখনই সাইকেলটা নেমে এল বিদ্যুৎগতিতে। মাথাটা বাঁচল, কিন্তু মনে হল সমস্ত শরীর চুরমার হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

যখন চেতনা হল, তখন চাঁদ উঠেছে। সোমরা বুঝতে পারল রক্তে শরীর ভেসে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। এবং বেঁচে আছে বুঝতে পেরে চোখ খুলতেই সে আবার ঘোরের মধ্যে পড়ল। সেই কালো বিশাল হাতি দুটো তার সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তারপর আর তার খেয়াল নেই। জ্ঞান ফিরেছে হাসপাতালে গিয়ে।

ম্যানেজারবাবু চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। একটা চাকর সোমরার হাতে চায়ের গ্লাস দিল। চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ম্যানেজারবাবু চোখ খুলল। 'ওই দুটো হাতি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের বাহন। পরদিন হাটের লোকজন নদী দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো হাতিকে দেখতে পায়। বাচ্চাটা একটু দূরে ঘুমোচ্ছিল। মানুষ দেখে হাতি দুটো বাচ্চাকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। এরা ভয়ে প্রথমে এগোয়নি। তারপর একজন তোকে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। তুই তো তখন অজ্ঞান। আশ্চর্যের ব্যাপার, তোর শরীরে একটা গাছের পাতা ছিবড়ে করে চেপে দিয়েছিল হাতি দুটো। ওই রস না লাগলে তুই বাঁচতিস না। আমার মনে হয়, হাতি দুটো সারারাত পাহারা দিয়েছিল যাতে অন্য কোনও জন্তু তোকে না খায়। ওদের বাচ্চার অন্যায় ওরা এভাবেই শুধরে দিতে চেয়েছিল। আহা তুই কি ভাগ্যবান, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের দয়া পেয়েছিস।'

চারপাশে গুঞ্জনটা ছড়াল। ভিড় পাতলা হলে সোমরা হাতজোড় করল, 'ম্যানেজারবাবু, একটা কাজ দিন।'

'কাজ?' চোখ ছোট করল ম্যানেজারবাবু, 'এখানে কাজ কোথায়? তাছাড়া তোর এখন ভাবনা কিসের! পুরো জেলার লোক এখন তোর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। গল্পটা বল আর টাকা কামা। নে, নে, ওঠ। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

কাকুতিমিনতিতেও কাজ হল না। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় বেরিয়ে এল সোমরা। যে তাকে দেখছে, সে-ই ডেকে বসতে বলে গল্প শুনতে চায়। কাজ দেওয়ার মানুষ একটাও নেই। একজন তো বলেই দিল, 'এই শরীর নিয়ে কি কাজ করাই বল, খাটতে তো পারবি না!'

শেষ পর্যন্ত ভয়ে-ভয়ে ফরেস্ট অফিসে ঢুকল সোমরা। রেঞ্জারবাবু বারান্দায় বসেছিলেন। দেখামাত্র বললেন, 'তোমার খুব ভাগ্য, তাই বেঁচে গেলে। শুনেছি অনেকক্ষণ এসেছ এখানে। কাজ খুঁজছ। কিন্তু আমার এখানে কাজ নেই। কোনও ক্যাজুয়াল পোস্ট খালি নেই। হলে এসো, দিয়ে দেব।'

বাইরে বেরিয়ে এল সোমরা। একটা বাঁচোয়া যে রেঞ্জারবাবু সাইকেলটার কথা বললেন না। কিন্তু এখন সে কী করে? দিনটা তো চোখের ওপর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তিন কাপ চা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। এক টাকারই মুড়ি কিনে নিল সে।

আর তখনই চাকরিটা পেয়ে গেল সোমরা। নসু রায়ের লোক তাকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়িতে। বুড়োর নানান ব্যবসা। বন্ধকি কারবার থেকে শুরু করে ট্রাক, চালকল এবং জোত। নসু রায় তাকে গল্পটা বলতে বলল। মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে, তাছাড়া বারংবার বললে গল্প বাড়ে। নসু রায় তামাক খেতে-খেতে সমস্তটা শুনে বলল, 'দুটো পাহাড় আর একটা বাচ্চা, তাই তো?'

মাথা নাড়ল সোমরা।

'কাজ করবি?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'বহুৎ আচ্ছা। আমার একটা জোত আছে জঙ্গলের গায়ে। যে লোকটা পাহারা দিত, সে হাতির ভয়ে থাকতে চাইছে না। মাসে একশটা টাকা দেব আর বিশ কেজি চাল। খবরদার, আমার জোতে যেন হাতি না ঢোকে! করবি?'

সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের তলায় যে মাটি জমছিল সেটা হাওয়া হয়ে গেল। হাতি তার সর্বনাশ করেছে আর হাতি তাড়াবে সে? খালি হাতে? অসম্ভব! কিন্তু একশ টাকা আর বিশ কেজি চাল। লোভ সামলাতে পারল না সোমরা।

' বেশ, রাতটা আমার এখানেই থেকে যা, ভোর-ভোর রওনা হবি।' নসু রায় খুশি হল।

জঙ্গলের ধার ঘেঁষে নসু রায়েব জোত। জোত না বলে রাজ্য বলাই ভালো। ভুট্টার শরীরে দুধ জমছে। চারপাশে হাজার রকম ফলের গাছ। এখন ধানের সময় নয়। নইলে সেটাও মন্দ হয় না। জঙ্গলের গা ঘেঁষে বলে রাজ্যের পাখি জড়ো হয়েছে এখানে। খেতের মধ্যে টিন বাঁধা আছে অনেকগুলো। দড়ি টানলে সব ক'টি টিন একসঙ্গে বেজে ওঠে। আম-কাঁঠালের মধ্যে একটা টিনের ঘর। যে লোকটা সঙ্গে এসেছিল, সে দেখিয়ে বিদায় হতেই সোমরার মনে হল পৃথিবীতে আর মানুষ বেঁচে নেই।

দিনটা যত বাড়তে লাগল তত সোমরার খারাপ লাগা একটু-একটু করে কমতে শুরু করল। খারাপ কি! দুবেলা পেট পুরে ভাত খাবে আর জন্তু এলে তাড়াবে। তা ছাড়া এই গাছগুলোয় নিশ্চয়ই ফলটল হবে। একটা গুলতি বানিয়ে নিলে ঘুঘু শিকার করলে খাওয়াটা জমবে ভালো। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে অন্তত আশিটা টাকা বাঁচাতে পারা যাবে। চার-পাঁচ বছর কাজ করলে হাতিমবাড়িতে একটা দোকান নিয়ে বসতে কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু মুশকিল হল সে হাতি তাড়াবে কি করে! অবশ্য হাতি যে আসবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু যদি আসে! সারাদিন ধরে অনেক কাঠ জোগাড় করল সোমরা। জঙ্গলে এই জিনিসটার অভাব নেই। তারপর ভাতেভাত ফুটিয়ে পেট পুরে খেয়ে সন্ধের আগেই আগুন জ্বেলে শুয়ে পড়ল টিনের ঘরে।

ঘুম ভাঙল মাঝরাত্তিরে। ভাঙতেই মনে হল বাইরে কেউ হাঁটছে। এই জঙ্গলে চোর-ছ্যাঁচোড় আসার কথা নয়। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এপাশ-ওপাশ তাকাতেই দমবন্ধ হয়ে গেল যেন। সেই বাচ্চা হাতিটা। তবে এখন আরও লম্বা হয়েছে। নিজের অজান্তে চিৎকার করে উঠল সোমরা। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল সে। আর তখনই বাচ্চার পাশে এসে দাঁড়াল সেই পাহাড় দুটো। রাগি শব্দ করে সোমরার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দুটোই। ওদের একটা পায়ের চাপেই গুঁড়ো হয়ে যাবে সোমরা। মরণ সামনে অথচ পালাবার শক্তি নেই পায়ে। হঠাৎ একটা শুঁড় এগিয়ে এল সামনে। চোখ বন্ধ করে তার স্পর্শ পেল সোমরা। চোখ খুলল যখন তিনটে হাতিই নেই। চারধার যেমন শান্ত তেমনি রয়েছে। বাইরের কাঠের আগুন কখন নিভে গিয়েছে।

আর ঘুমোতে পারল না সোমরা। চুপচাপ মড়ার মতো পড়ে থেকে স্থির করল আগামীকাল ভোরেও যদি সে বেঁচে থাকে, তাহলে ফিরে গিয়ে নসু রায়কে বলবে, তার দ্বারা এ কাজ হবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

জঙ্গলের অন্ধকার বেদম কালো। তখনও ভোর হয়নি, দুমদাম আওয়াজ শুনতে পেল সোমরা। কেউ বা কারা যেন কিছু ছুঁড়ছে। সোমরা ভাবল একবার দেখে আসে ব্যাপারটা কি! তার পরেই ইচ্ছেটা ত্যাগ করল। সে তো আর চাকরি করছে না, অতএব এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার? ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত সে নড়ল না।

দরজা বন্ধ করে সে বাইরে খানিকটা এগিয়ে আসতেই চমকে উঠল। ওগুলো কী? কাঁচা পাকা কলার কাঁদি স্তূপ হয়ে রয়েছে সামনে। নসু রায়ের জোতে কলার চাষ হয় না। এগুলো এল কোত্থেকে? বিব্রত সোমরা যখন কোনও কূল পাচ্ছিল না, তখন মানুষের গলার আওয়াজ পেল। চারজন লোক পথ চিনে-চিনে ভেতরে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এই কলার কাঁদিগুলো নাকি গতকাল দুটো হাতি তাদের বাগান থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনেছে। কিন্তু হাতিগুলো কলা না খেয়ে নসু রায়ের বাগানে ফেলে গেল কেন?

লোকগুলো যখন কলা নিয়ে যেতে চাইল তখন বাধা দিল সোমরা। এর মধ্যে তার মাথায় কিছু বুদ্ধি এসে গেছে। সে লোকগুলোকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে নসু রায়ের বাড়িতে পৌঁছল। ও পক্ষের বক্তব্য শুনে নসু রায় সোমরার দিকে তাকাল, 'হাতি কি আমার গাছ নষ্ট করেছে?'

সোমরা মাথা নাড়ল, 'না বাবু। আমাকে দেখতে পেয়ে ভোরবেলায় ওগুলো পৌঁছে দিয়ে গেল। এখন ওগুলো ফেরত দেবেন কিনা, সেটা আপনার ইচ্ছে।'

নসু রায় হাসল। তার মতলব হাসিল হয়েছে। এখন আশেপাশের সমস্ত জোতবাগানে হাতিরা অত্যাচার করবে, শুধু তারটি ছাড়া। যদ্দিন সোমরা ওই জোতে থাকবে, ততদিন হাতিরা তাকে খুশিতে রাখবার চেষ্টা করবে। লোক চারটেকে নসু রায় বলল, ' তোমরা তোমাদের জিনিস নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু ঘরে রাখতে পারবে না।'

'কেন? ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলো ফুঁসে উঠল।

'হাতিরা সোমরাকে প্রণামী দিয়ে গেছে। দেবরাজের অনুগ্রহ পেয়েছে সোমরা। সেই প্রণামী ফিরিয়ে নিয়ে গেলে হাতিরা রুষ্ট হবেই।' নসু রায় জানাল।

লোকগুলো হতভম্ব হয়ে চলে গেল। নসু রায় তখন সোমরাকে আলাদা ডেকে বলল, 'আমি লোক পাঠাচ্ছি, তাদের ঘাড়ে কলাগুলো চাপিয়ে দে। আর এখন থেকেই দশ দাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তোর।'

খবরটা চাউর হতে বেশি সময় লাগল না। মৃত্যুর হাত থেকে দেবতা রক্ষা করেছেন, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু দেবতার নির্দেশে হাতিরা ফল পৌঁছে দিচ্ছে এটা দৈব-অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়। খবরটা যত ছড়াল তত তাতে রং লাগল। যে দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছে, তাকে ধরলে অনেক দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে, কারও কারও এরকম মনে হল। হাতিমবাড়ির মানুষজন তাই দিনের আলোয় কয়েকজন হেঁটে উপস্থিত হল নসু রায়ের জোতে। তাদের প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও কারণে কষ্ট পাচ্ছে, সোমরাকে তা দূর করে দেওয়ার জন্যে দেবতাকে বলতে হবে।

দশ টাকা মাইনে বাড়ার লোভ এবং হাতিদের কাছ থেকে এক ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বোধ হওয়ায় জোতে ফিরে এসেছিল সোমরা। কিন্তু এত মানুষের অনুনয়-বিনয় শুনে ঘাবড়ে গেল শেষ পর্যন্ত। সে যত বোঝাতে চায় যে দেবতা অনুগ্রহ করেছেন কিনা তার জানা নেই। কারণ কোনও দেবতার দর্শন সে পায়নি। লোকগুলো একথা মানতে চায়নি। তারা ঘটনাগুলোকে নিয়ে নানান বিশ্লেষণ করছিল। শেষ পর্যন্ত সোমরা বলতে বাধ্য হল হাতি দুটোর দেখা পেলে সে ওদের কষ্টের কথা জানাবে, যাতে দেবরাজ কিছু করেন। নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে বলা কথাগুলোয় মন্ত্রের মতো কাজ হল। একটা জায়গায় বসে সোমরাকে সব দুঃখের কথা শুনতে হল। কারও রোগ সারছে

না, কারও মামলা চলছে, কারও পুত্র হচ্ছে না। শুনতে-শুনতে সোমরার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এর কষ্টের সঙ্গে ওর কষ্ট গুলিয়ে ফেলছিল।

এসব কাজে মানুষ খালি হাতে আসে না। সোমরা দেখল তার সামনে অনেক খাদ্যদ্রব্য ওরা নিবেদন করেছে। এই সময় জঙ্গলে শব্দ হল। একজন চিৎকার করে উঠল, 'ওরে হাতি বের হচ্ছে।'

তৎক্ষণাৎ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। ভয়ে মুহূর্তেই জোতটা ফাঁকা হয়ে গেল। লোকজন দূরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়ে এদিকে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করতে লাগল। হাতি আসছে জেনে সোমরার দুই পা কাঁপছিল। ওই লোকগুলোর সঙ্গে পালাতে পারলে সে খুশি হত। কিন্তু সেটা করলে যে সে ফালতু হয়ে যাবে এটা বোঝার ক্ষমতা তার ছিল। বসে বসেই সে দেখল সেই পাহাড় দুটো আর বাচ্চাটা জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ তাকাবার পর সোমরার ভয় কমল। যদি ওরা তাকে মারতে চাইত, তা হলে কাল রাত্রেই সেটা পারত। সোমরা পায়ে-পায়ে এগোল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'মানুষের বড় কষ্ট! কেউ রোগে কষ্ট পাচ্ছে, কেউ মামলায় সর্বস্বান্ত হচ্ছে, কারও সন্তান হচ্ছে না। তোমরা এই কষ্ট দূরে করে দাও।' হাতিগুলো নড়ল না।

সোমরা আর এক পা এগিয়ে ওই বাক্যগুলো বলল। এবার সে ওই সঙ্গে কয়েকটা নামও চেঁচিয়ে বলল, হঠাৎ ছোট হাতিটা শুঁড় বাড়িয়ে একটা ডাল ছিঁড়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার তুলে নিল দৌড়ে। কিন্তু তার বাবা গর্জন করে উঠতেই সে ডালটাকে ফেলে সুড়সুড় করে ফিরে গেল মায়ের কাছে। বাপ-হাতিটা শুঁড় তুলে সামান্য নাচিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল পরিবার নিয়ে।

সোমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাতি দুটো আজও তার ক্ষতি করল না। বরং বাচ্চাটা এগিয়ে আসছে দেখে ধমক দিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে ভাঙা ডালটা তুলে নিতেই মানুষের উল্লাস শুনতে পেল। আড়াল থেকে এইসব ঘটনা হাতিমবাড়ির লোকেরা দেখেছে। সোমরার কথা হাতিরা সমীহ করে শুনেছে এই দৃশ্য তাদের খুব নাড়া দিল। তারা আনন্দিত হয়ে ছুটে এল সামনে। সোমরা বিস্মিত হয়ে দেখল মানুষগুলো তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তারপর একজন জোড়হাতে ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে ওযুধ দাও।'

সোমরা দেখল লোকটা রোগগ্রস্ত, কিন্তু সে ওযুধ পাবে কোথায়? এই সময় সবাই একসঙ্গে ওর হাতে ধরা ডালটিকে দেখতে লাগল। সোমরা পলকেই বুঝে ফেলল রহস্যটা। যেহেতু বাচ্চা হাতিটা তার প্রার্থনার পর ডালটাকে ছুঁড়েছিল, তাই এরা মনে করেছে ওইটি দৈবপ্রেরিত ওষুধ। সোমরা দেখল, ওরা ডালটাকে ভাগাভাগি করে খুশি মনে ফিরে গেল হাতিমবাড়িতে।

কিছুদিনের মধ্যেই নসু রায় তার বাড়িখানার শ্রী ফিরিয়ে দিল। সোমরাকে এখন আর বাগান-জোত পাহারা দিতে হয় না। নসু রায় তার জন্যে আলাদা লোক রেখেছে। হাতির উপদ্রব্য অন্য জোতে হলেও এদিকে তারা ভুলেও আসে না। সোমরার জন্যে একটা সুন্দর ঘর তুলে দিয়েছে নসু রায়। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে বসে আছেন—এই মূর্তি শহর থেকে তৈরি করিয়ে সেই ঘরের সামনে চালা করে প্রতিষ্ঠা করেছে নসু রায়। প্রতিদিন অগণিত দুঃখী মানুষ নানান উপঢৌকন নিয়ে সোমরাকে তাদের কষ্টের কথা শোনাতে আসে নদী পেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে। ইন্দ্রের মূর্তির সামনে একটা উঁচু আসনে বাবু হয়ে বসে সোমরা সেই কাহিনিগুলো শোনে। যে গাছের ডাল হাতির বাচ্চাটা ভেঙেছিল, তার পাতা দুঃখী মানুষদের হাতে তুলে দেয়। মানুষগুলো সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় নিজেদের গ্রামে। সারাদিনের জমা হওয়া প্রণামীগুলো থেকে কিঞ্চিৎ সোমরার জন্যে রেখে নসু রায়ের লোক পুঁটুল বেঁধে নিয়ে যায় হাতিমবাড়ি। ব্যয়ের চেয়ে অনেকগুণ বেশি আয় হচ্ছে নসু রায়ের।

এখন আর খাওয়াপরার কষ্ট নেই সোমরার। নসু রায়ের দেওয়া মাইনে ছাড়াও যা জমছে তা কম নয়। কিন্তু মাঝে-মাঝেই আজকাল তার ধন্দ লাগছে। দেবতা কি সত্যি তাকে অনুগ্রহ করেছেন? সে তো কখনও দেবতাকে ডাকেনি। বাপ-মা মরে যাওয়ার পর পেটের ধান্দা করতেই তার দিন

কেটেছে। এসব ব্যাপার সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারছে না। এত মানুষ তাকে রোজ কষ্টের কথা শোনাচ্ছে, তারা ভাবছে ওকে বললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু হাতি দুটো আর ভুলেও বাচ্চা নিয়ে এই পথে আসবে না। প্রায় মাস দুয়েক দেখা পায়নি ওদের। এদিকে যে গাছ থেকে ডাল ছিঁড়েছিল, সেটা এখন ন্যাড়া হয়ে গিয়েছে। সোমরার মনে হচ্ছিল হাতি দুটো এদিকে না এলে তার প্রতিপত্তি কমে যাবে। হ্যাঁ, একটু-একটু করে এই অবস্থাটাকে সোমরার ভালো লেগেছে। এত মানুষ আসছে, তাকে খাতির করছে রোজ, এ তো কম কথা নয়। এমনকী নসু রায় নিজে এসে তাকে খাতির করে গিয়েছে।

তবে আর একটা ব্যাপার সোমরাকে আজকাল খুব অন্যমনস্ক করে রাখে। প্রতিদিন মানুষের কষ্টের কথা শুনতে-শুনতে পৃথিবীতে এত দুঃখ অছে তা সে জানত না। এত কষ্ট মানুষের? তার তো শুধু খেতে না পাওয়া আর শোওয়ার জায়গা না পাওয়ার কষ্ট ছিল। এগুলোর তুলনায় ও দুটো তো কিছুই নয়। অথচ মানুষের মুখ দেখে বোঝাই যায় না প্রত্যেকে কি দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে!

এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল। ওই গাছের পাতা মাদুলিতে পুরে দুটো মানুষ প্রচণ্ড উপকার পেয়ে গেল। একজন হারা মামলা, জিতল, অন্যজন ডাক্তারের বাতিল-করা রোগ থেকে সেরে উঠল। এই ঘটনা হাতিমবাড়ির মানুষকে নাড়িয়ে দিল। এর মধ্যে যাদের মনে সন্দেহ জন্মাচ্ছিল, তারাও বিগলিত হল। মানুষের ভিড় আরও বাড়তে লাগল এবং সোমরা বিচলিত হয়ে পড়ল।

হাতি দুটোর দেখা পাওয়া দরকার। সে অনুমানে ওই গাছের পাতা জঙ্গল থেকে ছিঁড়ে এনে দুঃখী মানুষদের দিচ্ছে। কিন্তু এতে কোনও কাজ হবে বলে তার বোধ হচ্ছে না। ভক্তদের উৎসাহে সে মনে-মনে বিশ্বাস করে ফেলেছে যে হাতি দুটো নিশ্চয়ই ঈশ্বপ্রেরিত। এখানে যা কিছু হচ্ছে, তা ভগবানের ইচ্ছেয়; এবং তিনি অনুগ্রহ করেছেন বলে তার দেহেও ঈশ্বরের কিছু-কিছু আর্শীবাদ এসে গেছে। ইদানীং তার নিজের অজান্তেই কথাবার্তা বলার ধরন পালটে নিয়েছে। নিজেকে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাবতে খুব আরাম লাগে। কিন্তু হাতি দুটোকে খুঁজে বের করা দরকার। এতদিন সে অন্য মানুষের দুঃখকষ্টের কথা বলার চেষ্টা করেছে, নিজের জন্যে কখনও চায়নি। এবার ওদের খুঁজে বের করে বলবে, আমাকে তুমি সেই ক্ষমতা দাও যাতে আমি মানুষের কষ্ট দূর করে দিতে পারি। প্রতিবারে তোমার ওপর নির্ভর করে থাকতে ভালো লাগে না।

একদিন পালকিতে বউকে চাপিয়ে নসু রায় এল। মেয়েদের এই পথ ভেঙে আসা খুবই কষ্টকর। কিন্তু ইদানীং তারাও আসছে। তারা আসার পরই সোমরার সন্ন্যাসী ভাবটা বেশি বেড়েছে। পায়ের ওপর পড়ে মেয়েরা এত কান্নাকাটি করে যে নিজেকে খুব বড় মনে না করে উপায় থাকে না।

সেদিন লোকজন কম ছিল। তাদের বিদায় করে নসু রায় এসে সোমরার সামনে বিনীত ভঙ্গিতে বসল। সোমরা লক্ষ করেছিল কিছুদিন থেকে নসু রায়ের ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়েছে। কথাবার্তায় সমীহভাব ফুটেছে। কিন্তু এতখানি বিনয় কখনও লক্ষ করেনি। নসু রায় বলল, 'এত মানুষ উপকৃত হচ্ছে আর আমি চুপচাপ বসে দেখছিলাম। আমার গিন্নি রোজই তাগাদা দেন, কিন্তু ভাবতাম তুই আমার দুঃখটা বুঝতে পারবি। আমার দিকে কেন তাকাচ্ছিস না, বল?'

সোমরা হকচকিয়ে গেল। নসু রায়ের আবার কি দুঃখ থাকতে পারে। নসু রায় ইশারায় তার স্ত্রীকে কাছে ডাকল। মধ্যবয়সি মহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ল সোমরার পায়ে, 'বাবা, দয়া করো, আমাকে বাঁচাও।'

তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে সোমরা বলল, 'আহা কি করছেন মা, ছি ছি।'

নসু রায় বলল, 'এবার কষ্টটা দূর করে দে।'

কাঁপা গলায় সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের কষ্ট?'

'বাতের। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না, অমাবস্যায় যন্ত্রণা বাড়ে। এমনকী আমাকে একটু সুখ

পর্যন্ত দিতে পারে না। ওটা তুই সারিয়ে দে।' নসু রায় বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে নসু রায়ের বউ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'না বাবা, অত বড়-বড় ছেলে যার, তার এখনও ছোঁকছোঁকুনি গেল না। আমি বাতে পড়ে আছি বলে উনি যুবতী ঝি রেখেছেন। সে মাগীর রোয়াব কত! আমার বাতটা সারিয়ে দাও, আমি সে বেটিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিই।'

নসু রায় বলল, 'ঘরের কেচ্ছা বাইরে বলে না গোলাপ। তা বলেই ফেললে যখন তখন তো আর ফেরানো যাবে না। তুমিও তো সব শুনলে, ওটা সারাও।'

সোমরা হাতজোড় করল, 'বাবু, আমি জানি না কি করে বাত সারে!'

'আঃ, তুমি জানো না সেটা তো আমিও জানি। তুমি ওই হাতিদের বলো একটা কিছু উপায় বের করতে।' নসু রায় উষ্ণ হল, 'এই ব্যাপারটার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ছি না। রাজ্যের লোক এসে আমাদের বলে যাচ্ছে তোমার পাতা খেয়ে উপকার পাচ্ছে, আর আমাদের বেলায় জানি না বললে চলবে?'

সোমরা ঘামতে লাগল। নসু রায় স্ত্রীকে নিয়ে টিনের বাড়িতে ঢুকলেন। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হল। সোমরা ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে? অন্য লোক পাতা নিয়ে গিয়ে উপকার না পেলে ফিরে আসে না। কারণ যারা উপকার পায়, তাদের কথা ভেবে মনে করে নিজেদের কোনও গলতি ছিল। সন্দেহটা আর ব্যক্ত করতে সাহস পায় না। কিন্তু নসু রায় তার অন্নদাতা। যে কোনও উপায়েই হোক ওর উপকার করতেই হবে।

মাঝরাত্রেও ঘুম আসছিল না সোমরার। পাশেই জঙ্গল থেকে অনবরত নানান শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ মনে হল চালাঘরে কেউ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল সোমরা। আর এসেই চমকে উঠল। সেই বাচ্চাটা! তার দরজার দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখামাত্রই বাচ্চাটা উলটোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। সোমরা চারপাশে তাকাল, পাহাড় দুটোকে দেখা যাচ্ছে না। বাচ্চাটা কয়েক পা গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে, আর শুঁড় নাড়ছে। সোমরার মনে হল বাচ্চাটা তাকে অনুসরণ করতে বলছে। সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টুকটুক করে ছুটছে বাচ্চাটা। পরিষ্কার চাঁদের আলোতেও তাল রাখতে পারছিল না সোমরা। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর একটা বিরাট ঝোপের মধ্যে গিয়ে বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল সোমরা। বিশাল পুরুষ-হাতিটা হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে। তার শুঁড় নড়ছে আর নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের করছে মাঝে-মাঝে। বাচ্চাটা হঠাৎ ঘুরে দুদ্দাড় করে ছুটে চলে গেল জঙ্গল ভেঙে। তারপর স্থির হয়ে গেল চারপাশ। কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু শায়িত হাতির নিশ্বাস ছাড়া। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল সোমরা। খুব করুণ চোখে তার দিকে তাকাল হাতিটা। ওরকম বিশাল চেহারার জন্তুটা কেমন অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সোমরা বুঝতে পারছিল হাতিটা খুব অসুস্থ। অসুস্থ হাতিরা মৃত্যুর আগে একা হয়ে যায়। একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে দেহত্যাগ করে। এর বোধহয় সেই সময় উপস্থিত। হঠাৎ সোমরার মনে হল, এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। সে দু-হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে সামনে বসল, 'আমাকে বাঁচাও, ওই নসু রায়ের বউ-এর বাত সারিয়ে দাও, নইলে আমার মান থাকবে না।' নানান ভাষায় একই প্রার্থনা করে যেতে লাগল সোমরা কিন্তু হাতির কোনও পরিবর্তন হল না। সোমরা উঠল এবং তখনই তার চোখে পড়ল একটা বিশাল ক্ষত হাতির পেটে। এখন সেটা ঘা হয়ে গিয়েছে এবং রাজ্যের মাছি সেই জায়গাটা ঢেকে রেখেছে। অসুস্থতার কারণটা বুঝতে পারল সে। নিশ্চয়ই ওকে মেরে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কোনও নব্য যুবক হাতি। ফলে মা-হাতিটাকেও এখানে চোখে পড়ছে না। সোমরা দৌড়তে লাগল।

জোতে ফিরে এসে সে প্রথমে ভেবেছিল নসু রায়কে ডেকে খবরটা দেবে। কিন্তু পরে মত

পালটাল। সাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পোকামাকড় মারবার জন্যে টিন-টিন ফিনাইল এনেছিল নসু রায়। তারই একটা বড় টিন আর দুটো খালি বস্তা নিয়ে সে আবার ফিরে গেল জঙ্গলে। হাতিটা চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। ওকে ফিরে আসতে দেখে আবার করুণ চোখে তাকাল। টিনের মুখ খুলে সোমরা সামান্য ফিনাইল ক্ষতের ওপর ছড়িয়ে দিতে মাছিগুলো উড়ল এবং কিছু মরল। হাতিটার শরীর যেন কেঁপে উঠল। একটা কাঠি নিয়ে বস্তার কোণা ফিনাইলে ভিজিয়ে সোমরা জোর করে ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হাতিটা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল। কিছুক্ষণ বাদে বড়-বড় সাদা পোকা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। হাতিটা তখনও চিৎকার করছে, শরীর নাড়ছে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারছে না। আধ ঘণ্টা ধরে একই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পর আর নতুন কোনও পোকা বের হল না। ভালো করে ফিনাইলে ভিজিয়ে বস্তা দুটো দিয়ে ক্ষত চাপা দিল সোমরা। তারপর অনেকগুলো ডালপালা ভেঙে হাতির সামনে ফেলে দিয়ে ভোরবেলা ফিরে এল জোতে।

নসু রায়কে সকালে সোমরা বলল, 'না বাবু, গিন্নিমার বাত সারবে না।'

'তুই ঠিক জানিস সারবে না?'

হঠাৎ উল্লসিত হল নসু রায়। অবাক হয়ে গেল সোমরা। তার আশঙ্কা ছিল নসু রায় খেপে যাবে। সে মাথা নাড়ল, 'কাল রাত্তিরে আমি হাতিদের বলেছি, তারা কোনও ওষুধ দেয়নি।'

'হাতি! কাল হাতি এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

নসু রায় খুব ঘাবড়ে গেল, 'কই, আমরা তো শব্দ পাইনি!'

'ওই দেখুন, ওখানে ওদের পায়খানা পড়ে আছে!' বাচ্চাটার মল দেখাল সোমরা, নসু রায় অবাক গলায় বলল, 'হাতিগুলো তোকে খুব মান্য করে, না?'

সোমরা ঘাড় নাড়ল। নসু রায় ফিরে গেল ঘরে। একটু বাদেই টিনের ঘর থেকে নসু রায়ের বউ-এর কান্না শোনা গেল। তারপরই ছুটে এল নসু রায়ের বউ, 'আমি কী দোষ করেছি? কী পাপ করেছি আমি? আমাকে ভগবানের বাহনের কাছে নিয়ে চলো, আমি জিজ্ঞাসা করব। না, আমি এই রোগ নিয়ে ওই বাড়িতে ফিরব না। ওই গতরখাকির মুখ দেখতে চাই না আমি।'

লোক আসছে, লোক যাচ্ছে কিন্তু নসু রায় স্ত্রীকে নড়াতে পারছেন না। ওদিকে খবর আসছে হাতির দঙ্গল নাকি এই জঙ্গল ছেড়ে চলে গিয়েছে। সার দিয়ে তাদের যেতে দেখেছে ফরেস্টের বাবুরা। এর ফলে পরের দিন থেকে ভিড় কমল। নসু রায় বোঝাচ্ছিলেন, হাতি না এলে যখন কাজ হবে না তখন ফিরে চলো বাড়িতে। কিন্তু বউ-এর কথা, সে ঘরে ফিরবে না। রোজ রাত্রে সোমরা যায় জঙ্গলে। ঘা-টা আর বাড়ছে না। একটু-একটু করে চারদিনে শুকিয়ে এল ক্ষতটা। কিন্তু চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না হাতিটা।

পঞ্চম রাতে যখন সোমরা জঙ্গলের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তখন সামনে এসে দাঁড়াল নসু রায়ের বউ, 'বাবা, আমি সঙ্গে যাব!'

'মানে? অবাক হয়ে গেল সোমরা।

' রোজ রাত্রে দেখি তুমি চুপি-চুপি জঙ্গলে ঢুকে যাও, আজ আমি ছাড়ছি না তোমাকে!'

'বাবু?'

' সে আফিঙ খেয়ে ঘুমুচ্ছে।'

'আপনি হাঁটতে পারবেন না।'

'পারব।'

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোমরাকে রাজি হতে হল। অনেক কষ্টে জঙ্গল পেরিয়ে নসু রায়ের বউ গিয়ে হাজির হল হাতির সামনে। আর দেখামাত্রই দৌড়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল হাতির মুখের সামনে, 'বাবা, আমাকে সারিয়ে দাও। আমার সংসার বাঁচাও।' হাতিটা কয়েকবার শুঁড় নাচাল।

তারপর চকিতে ওই অবস্থায় নসু রায়ের বউ-এর শরীর তুলে নিল শুঁড়ে। সোমরা চিৎকার করে উঠল। হাতিটার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। হিংস্র আক্রোশে সে শুঁড় দুলিয়ে যাচ্ছে। ছুটে এল সোমরা। লাঠি দিয়ে সেরে ওঠা ক্ষত খোঁচাতে লাগল। নতুন করে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ হাতির শরীরটা নড়ে উঠল। শুঁড়টা এলিয়ে পড়তেই নসু রায়ের বউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লাঠিটা ছুড়ে ফেলে সোমরা নসু রায়ের বউ-এর শরীরটা সরিয়ে নিল নিরাপদ দূরত্বে। পড়ে যাওয়ার আঘাত ছাড়া অন্য কোনও চোট লাগেনি। সে এবার হাতির দিকে তাকাতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। হাতিটা মুখ নামিয়েছে। ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। দুটো চোখ সোমরার ওপর স্থির এবং তা থেকে জলের ধারা নেমেছে। ধীরে-ধীরে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

আর তখনই জ্ঞান ফিরল নসু রায়ের বউ-এর। চিৎকার করে উঠল সে আতঙ্কে। সোমরা তাকে জড়িয়ে ধরে বোঝাচ্ছিল আর ভয় নেই, হাতিটা মরে গেছে। নসু রায়ের বউ-এর ভয় তবু কমে না। সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার লাগেনি তো মা? ঠিক আছে তো?'

মাথা নাড়ল নসু রায়ের বউ।

'তা হলে চলুন ফিরে যাই।'

কয়েক পা হাঁটতেই চিৎকার করে উঠল নসু রায়ের বউ। পাগলের মতো উল্লাস ফুটে উঠল সেই চিৎকারে। প্রথমে বুঝতে পারেনি সোমরা। সে উদগ্রীব হল, 'কী হয়েছে মা?'

'আমার হাঁটতে আর কষ্ট হচ্ছে না। দেখি লাফাই তো। এই যে, আমি লাফাতে পারছি। আমার বাত সেরে গেল কী করে?' নেচেকুঁদে একসা হল নসু রায়ের বউ। তারপর সোমরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি জানতে এই করলে আমি ভালো হব, না?'

'না, না আমি কিছু জানি না।'

'ঢং, সব জানো তুমি। ঠিক আছে, সে আমি পরে বুঝব। এখন তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। নইলে বুড়োর নেশার ঘুম ভেঙে গেলে আমাকে চরিত্রহীন ভাববে। যদ্দিন বাত ছিল, সন্দেহ ছিল না। বাত ঘুচলেই সন্দেহ শুরু হবে। আমি দ্বিতীয় পক্ষ তো! দৌড়তে লাগল নসু রায়ের বউ। পরমুহূর্তেই চিৎকার ভেসে এল, 'ও মা গো, আমি হাঁটতে পারছি না, পা তুলতে পারছি না। ও বাবা গো! এ কি হল গো!'

আর তখনই মৃত হাতির দিকে তাকিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সোমরা। কাল সকালেই সবাই জানবে হাতিটা মরে গেছে। আর ভিড় হবে না এখানে। হঠাৎ তার নজর পড়ল দুটো ভাঙা দাঁতের ওপর।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল রাত থাকতেই এই দাঁত দুটো কী করে খুলে ফেলা যায়?

দেশলাইয়ের বাক্স এবং নির্বারুদ কাঠি

সিগারেটের তামাক সরু তার দিয়ে পটু হাতে বের করে চেটোয় রাখল নীতা, তারপর কাগজের পুরিয়া খুলে বস্তুটি মেশাল সেই তামাকে। পুনরায় ফাঁকা সিগারেটটা নব্য মশলা দিয়ে টাইট হয়ে যেতেই একটা অপার্থিব আনন্দ ফুটল নীতার মুখে। অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলল সে, 'কে প্রথম ভালোবাসবে?'

তিনটি হাত উঠল। জিনা বলল, 'হাই, আমি ভালোবাসার জন্যে মরে যাচ্ছি!'

সীতা মাথা নাড়ল, 'ও মাই সুইটি স্টিক, লিটল স্টিক!'

নীতা চোখ পাকাল, 'সিলি! একজন হাত তোলেনি। অতএব সে-ই শুরু করবে।' সিগারেটটা এগিয়ে দিল সে রিয়ার দিকে।

নীতাদের এই ঘরভরতি বই, এত বই, বিভিন্ন বিষয়ের যে রিয়ার মনে হয় এখানে তাকে সারাজীবন বন্দি করে রাখলে ক্ষতি হত না। এই ঘরে কোনও চেয়ার নেই। দামি কার্পেটের ওপর আধশোয়া হয়ে ও ফিউচার শক পড়ছিল। মুখ না তুলে হাত নাড়ল, 'নো, আই কান্ট স্ট্যান্ড।'

'ইটস মাইন্ড। ফ্রেশ ফ্রম মণিপুর।' নীতা উঠে দাঁড়াল সিগারেটটা নিয়ে, 'কী বই ওটা? ফিউচার শক? দ্যাটস রাবিশ। টেক দিস শক অ্যান্ড ইউ উইল ফিল সামথিং!'

রিয়া বান্ধবীদের দিকে তাকাল। ওই সিগারেটের ভেতর আজ নীতা কি পুরেছে তা সে জানে না। হয়তো কোনও ড্রাগ, পাউডার বা স্রেফ গাঁজা। কড়া ধাতের গাঁজা। আর তার টান নেওয়ার জন্যে প্রত্যেকে উদগ্রীব। এই সব মেয়েরা, রিয়ার বন্ধুরা ছেলেদের পাত্তা দেয় না। প্রেমট্রেম এদের ধাতে সয় না। ওদের জিজ্ঞাসা করলেই বলবে, যে-কোনও একটা লোককে তুলে নাও এবং তার নাম দাও, যে-কোনও নাম দাও, দেখবে সেই লোকটাকে ওই নামে চমৎকার মানাবে। ছাত্রী হিসেবে এরা প্রত্যেকেই ভালো ছিল, পড়াশুনা কারোরই খারাপ নয়।

'উই লিভ অন ড্রাই।'

এই কথাটা এখন খুব চালু নিজেদের মধ্যে। ডোন্ট গো ফর ওয়াটার, উই লিভ অন ড্রাই। নীতাদের এই ঘর, এই আড্ডা রিয়ার খারাপ লাগে না। শুকনো মাদক তাকে তেমন টানে না। মাঝেমধ্যে সঙ্গ রাখার জন্যে সে দু-একটা টান দেয় মাত্র। সেই মুহূর্তে মাথার ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শরীরে ঝিম লাগে। অলস অবসন্ন সময় ফুড়ুৎ করে ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু বেশিরভাগ দিনই সে বই নিয়ে আধশোয়া হয়। নীতার এই ঘরের বাড়ি কেউ ঢোকে না, ঢুকবে না। বাড়ির কেউ বলতে নীতার মা। বাবা থাকেন জলে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান জাহাজের কাজে। মা সোস্যাল ওয়ার্কার। প্রায় প্রত্যেকের, এই ঘরে যে সব মেয়ে আছে, প্রায় প্রত্যেকের মা ডিগনিফাইড সোস্যাল ওয়ার্কার। এক-একটি চিজ সব। রিয়ার নিজস্ব মা পর্যন্ত। কোয়ালিটিতে দুপুরের বিয়ার পার্টিতে না গেলে সামাজিক কর্তব্য করা হয় না।

নীতার প্রসারিত হাতের দিকে তাকিয়ে রিয়ার হঠাৎ মনে পড়ল ওর কোনও আত্মীয় নেই। বাবা-মা এবং সে। সত্যি কথা বলতে কি, ওর বান্ধবীদেরও একই দশা। কারও-কারও হয়তো একটি ভাই বা বোন থাকতে পারে, কিন্তু সেইসব পিসি মাসি কাকা কাকিমাদের দিন ওভার। তাদের নিজেদের ফ্ল্যাটে ওসব মানুষ জন্মইস্তক আসেননি। বাবা রাখেননি তাঁর পূর্ব-পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ, মা ছেদ করেছেন তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক।

সিগারেটটা হাতে নিয়েই হেসে ফেলল রিয়া। সীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? এটা কি তোমাকে হাসির কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে?'

'নো। ছোট পরিবার সুখী পরিবার।'

'সো। হোয়াট?'

'আমাদের পরিবারগুলো এত ছোট যে বাড়ি গেলে কেউ কারও দেখা পাই না। আগুন জ্বালাও।'

একটা নীলচে আগুন আর তারপরই গলা দিয়ে নেমে যাওয়া ধোঁয়ার সোয়াদ চোখে আবেশ আনল। রিয়া টের পেল না সিগারেটটা ততক্ষণে হাতবদল হয়ে গেছে। উৎকট একটা গন্ধ তখন ঘরে পাক খাচ্ছে।

'ফিউচার শক' বইটা সরিয়ে রেখে দু-পা ছড়িয়ে বসল রিয়া। আজ শুক্রবার। কারও বাড়িতেই

খোঁজখবর করার কেউ নেই রাত দুটোর আগে। উইক-এন্ড কাটাতে বাবা-মায়ের দল কলকাতার লম্বা-লম্বা ফ্ল্যাটবাড়ির যে-কোনও একটায় ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে গেছে। কিংবা ভি.সি. আর-এ লেটেস্ট হট কিছু একটি তাদের সময় জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এই চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে থমকে থাকা বাবা এবং মায়েরা সারা সপ্তাহ খেটে আজ বড্ড ক্লান্ত। তাই নীতারা চুটিয়ে আনন্দ নিচ্ছে গলায়।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে টলে গেল রিয়া। তারপর নিজেকে সর্তক করে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। এই সময় টয়লেট ছাড়া কেউ কোথাও যায় না। মাঝরাতে নীতার গাড়ি প্রত্যেককে ড্রপ করে দেবে দেশলাই বাক্সমার্কা ফ্ল্যাটগুলোর গেটে। ওই বুড়ো ড্রাইভারকে সবাই জনি বলে ডাকে আদর করে। রিয়ার তো ওই কালো বৃদ্ধটিকে দেখলেই আঙ্কল টমের কথা মনে পড়ে। হি ইজ সো নাইস! নেশাগ্রস্ত কয়েকটা মেয়েকে কি মমতায় ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। নীতার বাবা-মা বোধহয় সে খবর রাখে না।

পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়িটা ছেড়ে রিয়া বেরিয়ে এল। ওর পরনে জিনস আর সাদা শার্ট। পায়ে হাওয়াই চটি। বাইরের ঠান্ডা বাতাসটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র মাথা ধরে গেল আচমকা। কেমন বমি-বমি পাচ্ছে। এখন রাত অনেক। কত? হু কেয়ারস? নীতাদের বাড়ি থেকে ওদের ফ্ল্যাটটা বেশি দূরে নয়। এই সব বড়লোকি পাড়ার রাস্তায় চমৎকার আলো জ্বলে। বাস ট্রাম চলে না। মাথা ধরা সত্ত্বেও হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল ওর। ওদের বাড়িতে নিষিদ্ধ একটি গান হঠাৎ চিৎকার করে গাইতে ইচ্ছে করল, দোলাও-দোলাও আমার হৃদয়!

বাংলা পড়তে জানে না রিয়া, কারণ তাকে কখনও সেটা পড়ানো হয়নি। বাড়িতে কোনও বাংলা গল্পের বই নেই। থাকলেও সেটা হিব্রু কিংবা টিবেটিয়ান বলে মনে হত রিয়ার কাছে। নেই তাই রক্ষে। বাংলা রেকর্ড নেই। মা বলে, 'বাংলা গান মানেই তো প্যানপেনে রবীন্দ্রসঙ্গীত। শুনলেই নপুংসকদের কথা মনে হয়।'

বাবা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাইরেও গান আছে হনি। ছিলও।'

মা খিলখিল করে হেসেছিলেন, 'সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি? ওই মিথ্যে কথা সুর করে গাইলেই গান বলতে হবে? বি স্মার্ট রিয়া, জীবনটাকে টগবগে করো, বাঙালি, সেন্টিমেন্ট ধোপার দেওয়া মাড়ের মতো। সুতির কাপড় শক্ত করে কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ায়। ওসব এ বাড়িতে বলবে না।'

দোলাও-দোলাও আমার আপন—। লিফটম্যানকে দেখে চুপ করে গেল রিয়া।

এই লোকটা বাঙালি। যদি গানটা জানা থাকে তাহলে হয়তো ভুল ওয়ার্ডিং কিংবা টিউন ধরে ফেলবে। সোঁ-সোঁ করে ওদের ফ্লোরে চলে এসে শান্তি।

তিনবার বোতাম টিপল রিয়া। ভেতর থেকে কোনও শব্দ নেই। তারপর হিপপকেট থেকে কিছু টাকা আর চাবি বের করল। এই ফ্ল্যাটের তিন বাসিন্দার জন্যে তিনটে চাবি বরাদ্দ। যে যখন ইচ্ছে ঢোকো এবং বের হও।

ড্রইংরুমেই পরিচিত দৃশ্য। বাবা চিত হয়ে পড়ে আছেন সোফায়। মাথার পাশে পিটার স্কটের বোতলটা খালি। গ্লাসে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। টাই দূরের কথা, জুতো পর্যন্ত খোলেননি বাবা। মুখ হাঁ। আউট, মাই পাপা ইজ আউট! রিয়া এগিয়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। সামান্য ঝুঁকল। কালো রং সামান্য ফেড হয়ে যাওয়ায় লালচে রূপোলি চুল ঝিলিক মারছে। এই মুহূর্তে বাবাকে খুব বুড়ো মনে হচ্ছিল। বুড়ো এবং অসহায়। কফিনে শুইয়ে দিলে বোধহয় চমৎকার শান্তি পেত। ভোর অবধি এইভাবেই পড়ে থাকবেন বিখ্যাত কোম্পানির ডিরেক্টর। সকালে ক্লিন শেভড হয়ে ঝকমকে হাসবেন, বলবেন, হা-ই।

রিয়া মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল। নীলচে আলো জ্বলছে। কোনও শব্দ নেই। সে নিচু গলায় ডাকল, 'মাম্মি!' দুটো মুহূর্ত, কোনও সাড়া এল না। ভারী পরদা সরিয়ে পা বাড়াতে শূন্য ঘর চোখে এল। ঘড়িতে তখন দুটো কোকিল পালা করে ডেকে জানাল বারোটা বাজছে। মায়ের বিছানার পাশেই

ম্যাগনেটিক রিসিভার। ন্যুয়ের্ক থেকে আনানো। কডবিহীন রিসিভার নিয়ে এই ঘরের যে-কোনও প্রান্তে গিয়ে কথা বলা যায়। রিয়া টেলিফোনের বোতামটা টিপতেই মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, 'হা-ই, গোয়িং আউট ফর দ্য নাইট। ডোন্ট ওয়েট্ ফর মি।'

বোতামটা ছেড়ে দিতেই ঘর শান্ত। মেসেজ রেখে গেছেন সোস্যাল ওয়ার্কার। উইক-এন্ড কাটাতে গেছেন তিনি। সারারাত আমি চরে বেড়াব, আমার জন্যে কেউ বসে থেকো না। অন্তত বাবা বসে থাকেননি। ছাব্বিশ আউন্স পেটে পুরে সটান পড়ে আছেন।

এই বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। ঠিক নেই বললে ভুল হবে। একটা নেপালি ছোঁড়া আসে ভোরে। ব্রেকফাস্ট করে দিয়ে চলে যায়। আর সব সেলফহেল্প। মা বলেন, পৃথিবীর যে-কোনও সভ্যদেশে এটাই নিয়ম। তোমার খাবার তুমিই করে নেবে। ফ্রিজে সব রাখা আছে। সপ্তাহে দু-দিন মায়ের ড্রাইভার সেগুলো কিনে এনে দেয়। যেহেতু ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় তাই নেপালিটির আগমন, নইলে, সেটাও বন্ধ হলে মা খুশি হতেন। বাবার সমস্ত আধুনিকতা এখানেই হোঁচট খায়। কিন্তু এই বাড়িতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মায়ের। মা লাঞ্চ ডিনার বাড়িতে খাচ্ছে এমন দিন হাতে গোনা যায়।

নিজের ঘরে ফিরে এল রিয়া। এখন তার শুয়ে পড়া উচিত অথচ ঘুমের কোনও সম্ভাবনাই নেই। বরং উৎকট মাথা ধরে আছে। এই ছোট পরিবারে কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। খুব আপশোস হচ্ছিল ওর। ফট করে না উঠে এসে নীতাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কাটালে নেশাটা জমত। আচ্ছা, এখন স্নান করলে কেমন হয়?

টয়লেটের সঙ্গেই শাওয়ার। জানলাটা খুলতেই ঝকঝকে আকাশ চোখে পড়ল। নীতাদের ওখান থেকে আসবার সময় খেয়াল হয়নি আজ জ্যোৎস্নার রাত। একটু বেড়ালে কেমন হয়? একটু ঘুরে বেড়ালে এই রাতদুপুরে? চমচমে জ্যোৎস্না কীরকম কিলবিল করতে লাগল রিয়ার সামনে। সে পোশাক না ছেড়ে বেরিয়ে এল। পিতৃদেব তখনও একই অবস্থায় পড়ে আছেন। বাবা কতদিন তাঁর বাবাকে দ্যাখোননি কে জানে? রিয়া শুনেছে ওই বুড়ো মানুষটা মালদার একটা গ্রামে বাস করেন। বাবার মা মারা যাওয়ার খবর এলে যেসব নিয়ম পালন করতে হয় তা এ-বাড়িতে করা হয়নি। তখন রিয়া আরও ছোট ছিল, কেন হয়নি তা সে জানে না। তবে সেই মুহূর্তে মায়ের আড়ালে বাবাকে খুব দুঃখী বলে মনে হয়েছিল, তা ঠিক। এই সময় যেমন বাবাকে খুব সরল বলে মনে হচ্ছে, ঘুমন্ত মানুষ কোনও প্রিটেনশন করতে পারে না এই জন্যেই কি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রিয়া। লিফট নয়, সিঁড়ি ভেঙে সে নামছিল। নামবার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। আমার শরীর ঠিক আমার নয়। পৃথিবীর গভীর থেকে নিঃশব্দে হেঁটে যাওয়ার মতো এই নামা। প্রতিটি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। এই সফিস্টিকেটেড ম্যাচবক্স বসতিটার মানুষজন বাইরে নেই। শুধু আমিই নেমে যাচ্ছি।

গেটের বাইরে এসে তার মন ধাতে এল। কোথায় যাওয়া যায়? এসব জায়গায় ডাকাতি বা ছিনতাই হয় বলে শোনা যায় না। আমি একটু আমার মতো পৃথিবীতে হাঁটতে চাই, খামোকা, কেন তাতে বাধা দেবে কেউ? নিজের কাছে গড়ে নেওয়া এই সরল বিশ্বাসে আশ্বস্ত রিয়া পা ফেলতে লাগল। ভালোবাসার গন্ধের মতো কিংবা ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতো একটা জ্যোৎস্না বেরিয়ে আসছিল চাঁদের শরীর থেকে। আর তাতে ক্রমশ জবজবে হয়ে যাচ্ছিল রিয়া। এমন একটা সুখের সন্ধান সে কখনও পায়নি। এরকম রাত কখনও বলে না ডোন্ট ওয়েট ফর মি। বরং সেই দোলাও-দোলাও শব্দ দুটো বারংবার ফিরে-ফিরে আসে।

রিয়ার খেয়াল হল লেকটার কথা। মাত্র মিনিট পাঁচেক দূরে সেই লেকটা, যেখানে এককালে সে বেড়াতে যেত। তখন একটা আয়া ছিল তার জন্যে। ফুটফুটে অনেক বাচ্চা আমাদের গা ঘেঁষে বসে জল দেখত। অনেককাল সেখানে যাওয়া হয়নি, আজ গেলে কেমন হয়?

জ্যোৎস্নারাত্রে জলের মতো সুন্দরী আর কেউ হয় না। আকাশের মুখ জলের বুকে সাঁতারে

ভালোবাসার ঘ্রাণ নেয় চাঁদের সঙ্গ পেয়ে। একটা স্ট্যাচুর ধাপে বসে রিয়া এই দৃশ্য দেখছিল।

কখন চাঁদ মরে গেছে, কখন রাত ফুরোল, কখন জলের রং কালো হল রিয়া জানেনি। কারণ তার শরীর শীতল বাতাস পেয়েছিল, মাথা হেলেছিল স্ট্যাচুর স্তম্ভে। হালকা ঘুম ছড়িয়ে প্রকৃতি তার রাতের শেষ খেলা খেলে নিল। এবং তখনই কানে এল কিছু শব্দ। উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে কেউ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। যার সুর এবং ধ্বনি অদ্ভুত একটা মায়ালোক তৈরি করে ফেলছে চারপাশে। রিয়া দেখল ভোর হচ্ছে। আকাশের অনেকটাই এখন লাল ছোপ মেখেছে। শব্দতরঙ্গ তাকে কৌতূহলী করছিল। ধীরে-ধীরে সে পা বাড়াল।

গাছের আড়াল সরতেই তার দৃষ্টিতে এক দীর্ঘকায় মানুষ ধরা দিলেন। তাঁর দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে আবদ্ধ। পরনে ধুতি এবং সাদা ফতুয়া। তন্ময় হয়ে সূর্যের প্রতীক্ষায় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সেই মন্ত্রের অর্থ রিয়ার জানা নেই। শব্দগুলো তার অবোধ্য। তবে সংস্কৃত বাক্যগুলোকে উচ্চারণে অনুমান করতে পারল সে। ঠিক সেই সময় আকাশকে চমকে দিয়ে জলের ওপর উঁকি মারল দিনের প্রথম সূর্য। লাল সোনালি আভায় পৃথিবী ছেয়ে যেতে বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ শেষ করলেন। তারপর প্রণাম জানিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রিয়ার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। রিয়া হাসবার চেষ্টা করল, 'হাই!'

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যালো!'

রিয়া প্রশ্ন করল, 'তুমি এতক্ষণ কী করছিলে?'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন। তাঁর উচ্চারণে দক্ষিণ ভারতের টান, 'প্রার্থনা করছিলাম। যাতে সূর্য ওঠে, অন্ধকার দূর হয়। তুমি বুঝতে পারোনি?'

মাথা নাড়ল রিয়া, 'না।'

'সেকী? তুমি তো ভারতীয়, তুমি সূর্যস্তোত্র শোননি?'

'ভারতীয়!' রিয়া মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। তুমি কী বলছিলে এতক্ষণ?'

দক্ষিণ ভারতীয় বৃদ্ধটি বললেন, 'আমি প্রার্থনা করছিলাম যাতে সূর্যদেব ওঠেন, জগতের মঙ্গল হয়, কারণ অন্ধকার মানেই অপবিত্র।'

রিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই প্রার্থনায় তোমার কি উপকার হবে? তোমার তো বয়স হয়েছে, তাই না?'

বৃদ্ধ বললেন, 'বয়স? হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা পৃথিবীতে আছ, অনেকদিন থাকবে, এই প্রার্থনা তাদের উপকারে আসবে। আমরা সবসময় কি নিজের জন্যে সবকিছু করি?'

ঠিক সেই সময় একটি কিশোর দূর থেকে চিৎকার করে উঠল। ছুটে আসছিল সে পাগলের মতো। এসে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধকে। তারপর দ্রুত নিজের ভাষায় কিছু বলে গেল। বৃদ্ধ সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যেতে রিয়া আবার প্রশ্ন করল, 'এ তোমার কে হয়?'

'নাতি। আমাকে ডাকতে এসেছে।'

'কেন?'

'আমার ছেলে আর বউমা চায়ের টেবিলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই।' বৃদ্ধ হাসলেন। তারপর চলে যেতে-যেতে বললেন, 'বাই!'

শূন্য জলের ধারে ভোরের রোদ কখনও-কখনও জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দরী করে তোলে প্রকৃতিকে। সেই আলোয় আলোকিত রিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সে দেখল তার ঠোঁট নড়ছে। আর সমস্ত শরীর মন্থন করে অমৃতের স্বাদ মাখা একটা শব্দ সেই ঠোঁটের ফাঁক গলে পৃথিবীর শরীরে মিশে গেল, 'বা-ই!' তারপরেই বুক ভরে বাতাস নিল সে। নিয়ে বলল, 'বাই দাদু!'



তিন সিংহ ধান খায়

প্রথম দর্শনে লোকটিকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হইলেও মদনমোহন তাহার বাম হস্তের ঘড়িটিকে লক্ষ করিয়া ধারণা পরিবর্তন করিল। সন্ন্যাসীরা ঘড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। যদিও লোকটির পরনে রক্তাম্বর আলখাল্লা বাবরি চুল এবং শ্মশ্রুল মুখ কিন্তু মদনমোহনকে লক্ষ করিয়া প্রসন্ন হাসি তাহার অধরে খেলিয়া গেল।

এখন ঊষাকাল। সূর্যদেব ভালো করিয়া উদিত হন নাই। আধুলি গ্রামের মানুষজনের আলস্য ভাঙে নাই। এইসময় চাষবাস হয় না। বৃষ্টি না হওয়ায় পথ শুষ্ক। মদনমোহন এই অপরিচিত মূর্তিটিকে দূর হইতে দেখিয়ো অবাক হইতেছিল। কারণ শহর অন্তত আড়াইক্রোশ দূরে। এই লোকটি কী উদ্দেশ্যে কাঁধে ঝোলা লইয়া আধুলিতে আগমন করিল? কিন্তু হাসির বিপক্ষে সৌজন্য দেখানোই যুক্তিযুক্ত। মদনমোহন বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু বলবেন?'

লোকটি আবার হাসিল। বড় মধুর সে হাসি। তারপর উদাত্ত কণ্ঠে কহিল, 'আমি বলার কে! বলবেন তিনি যিনি চোখ দিয়েছেন দেখবার, মুখ দিয়েছেন বলবার, কান দিয়েছেন শুনবার— আর মন দিয়েছেন, মন দিয়েছেন কেন বলো তো?'

মদনমোহনের কৌতুকবোধ হইতেছিল। সে রহস্য করিতে কহিল, 'বুঝবার।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি খুশিতে আটখানা হইল, 'সাবাস! বুঝবার! বোঝ হে রসিকজন যে জানো যেমন। তা ভাইটির নাম কী?'

'মদনমোহন বিশ্বাস।'

'চমৎকার নাম। কী করা হয়?'

এই বিষয়ে মদনমোহনের কিঞ্চিৎ গর্ব আছে। আধুলি গ্রামের অধিকাংশই ভাগচাষি। একমাত্র সে—শহরে নিত্য যাতায়াত করে, কারণ সরকারি আপিসের পিওনের চাকরি পাইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে। সে উত্তর করিল, 'চাকরি করি। শহরে। আপনি এই ভোরে কার কাছে এসেছেন?'

'আমি কি এলাম ভাই, তিনিই আনালেন। এখন বলো শিবকালীর বাড়ি কোথায়? তাকে আমার দরকার, তারও আমাকে প্রয়োজন।'

শিবকালীর নাম শুনিয়া মদনমোহনের ললাট কুঞ্চিত হইল। আজকের দিনটিতে আর কি কি অঘটন ঘটিবে তাহা ঈশ্বর জানেন নতুবা এইরকম সময়ে ওই নাম শুনিতে হয়! শিবকালী ঘোষের হস্ত সর্বদা চিৎ হইয়া থাকে। এই গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিক সে, গোলাভরতি ধান। অথচ বছর কয়েক আগেও শিবকালী অতি দরিদ্র ছিল। হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রে সে বড়লোক হইয়া গেল তাহা রহস্যময়। অন্তত লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইয়াছে বলিয়া মদনমোহনের অনুমান। এই কৃপণ ব্যক্তিটিকে গ্রামের মানুষ ঈর্ষা করে কিন্তু এড়াইতে পারে না। মদনমোহন আগন্তুকের দিকে নজর করিল, 'আপনার পরিচয়?'

'আমি, আমি ঈশ্বরের সেবক।' সেই প্রসন্ন হাসি অধরে।

নতুন মানুষের কাছে মনের কথা বলিয়া কোনও লাভ নাই। মদনমোহন বলিল, 'এই সাতসকালে কি ওদের কেউ ঘুম থেকে উঠেছে! ওই যে বাঁক দেখছেন, ঘুরলেই একটা গেটওয়ালা

সিমেন্টের বাড়ি দেখতে পাবেন।'

উষাকালে মানুষের মন শান্ত থাকে। কিন্তু শিবকালী ঘোষের হৃদয় আজ অত্যন্ত চঞ্চল। বিনিদ্র রাত্রি শেষে শিবকালী বাগানে দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতে করিতে সেই চিন্তায় মগ্ন ছিল। পারুলবালা দুইদিন হইল হাসপাতালে পড়িয়া আছে। তাহার উদরে যন্ত্রণা দীর্ঘকালই হইত, এইবার অসহ্য বোধ হওয়ায় শিবকালী তাহাকে সদরে লইয়া যায়। ডাক্তারবাবু উদরের ছবি তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন অবিলম্বে অপারেশন করিতে হইবে। আগামীকাল সকালটি এইজন্যে নির্দিষ্ট।

স্ত্রীর ওপর শিবকালীর অন্যবিধ আকর্ষণ নাই। সে রূপসী নহে, কিঞ্চিৎ ক্ষীণাঙ্গীও বটে। অন্য নারীতেও সে আসক্ত নহে। এই বয়সেই নারীমাংস সম্পর্কে শিবকালী নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও তাহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া একটি আক্ষেপ ছিল, ইদানীং তাহাও বিলীন হইয়াছে। দ্বিতীয়বার কোনও রমণীর দাসত্ব যখন সে গ্রহণ করিবে না তখন আর আক্ষেপের কি দরকার। পারুলবালা টেবিল চেয়ার কিংবা খাটের মতোই এই বাড়িতে পড়িয়া ছিল। কিন্তু গত দুইদিনে শিবকালী হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়াছে, ওই স্ত্রীলোকটিকে তাহার প্রয়োজন, নহিলে এই সংসার বিকল। গতকাল ডাক্তারের মুখে যে সংবাদ সে শুনিয়াছে তাহাতেই তাহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে। পারুলবালার অবস্থা ভালো নহে, জীবন এবং মরণের পাল্লা দুটির শেষেরটিতে ভার বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রথম শিবকালীর মনে হইল ডাক্তারবাবুকে অতিরিক্ত অর্থ দান করিলে নিশ্চয়ই পারুলবালা সুস্থ হইবে।

এইসময় সে দেখিল একটি রক্তবস্ত্রধারী তাহার বাঁশের গেটে উপস্থিত হইয়া মৃদু হাস্য করিতেছে। দেবদ্বিজে কোনওকালেই তাহার ভক্তি নাই, সন্ন্যাসীদের সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। তিক্ত গলায় সে খিচাইয়া উঠিল, 'কী চাই?'

'আমার তো চাওয়ার কিছু নেই। তিনি যা চাওয়ান তাই চাই। বড় চঞ্চল তোমার মন শিবকালী!'

'আপনি আমাকে চেনেন?' আগন্তুকের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া শিবকালীর সমস্ত অঙ্গে শীতল স্রোত বহিয়া গেল।

'না। আমরা কেউ কি নিজেকেই চিনি যে অপরকে চিনব! বড় ছায়া পড়েছে রে, কালো ছায়া, এই বাড়ির ওপরে।' তারপর কণ্ঠের স্বরে কঠোরতা আসিল, 'অমন লক্ষ্মী মেয়েটাকে জেনেশুনে খুন করছ শিবকালী?'

'খুন? কার কথা বলছেন?'

'যাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছ। ও মরে যাবে, নির্ঘাৎ মরে যাবে।'

'কী বলছেন?' শিবকালীর মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। এক লাফে সে বাঁশের গেটের নিকট চলিয়া আসিল, ' কে আপনি? আবার বললে জিভ টেনে নেব।'

'তাতে তো বউটা বাঁচবে না বাবা। শিবকালী, যে চায় সে আকাশেও হেলান দেয়। দেওয়ার ইচ্ছেটাই আসল। অপারেশন করিও না।'

শিবকালী এবার হতভম্ব হইয়া পড়িল। আগন্তুক তাহার পরিবারের সমস্ত খবর রাখে! এই মানুষটি কি প্রতারক? তবে শোনা কথা কেউ-কেউ নাকি—! সে সন্দেহযুক্ত কণ্ঠে কহিল, 'করব না?'

'না। অস্ত্র শরীরে লাগলেই যমদূতের বাঁধন খুলে যাবে।' এইবার আগন্তুকের ঝুলিতে হস্ত প্রবেশ করিল। দুই চক্ষু বন্ধ, অধরে কিছু নিঃশব্দ উচ্চারণ। তারপর ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়া তাহার শরীর স্থির হইল, 'এই শেকড়টা নিয়ে এক্ষুনি শহরে যাও। এটাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে নিতে বলো তাকে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে—যদি দ্যাখো কোনও যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই, সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসো। আমি রইলাম।'

সম্মোহিতের ন্যায় শিবকালী শেকড়টি গ্রহণ করিল। মাত্র দুই ইঞ্চি লম্বা পরিচ্ছন্ন শেকড়।

শিবকালী বুঝিতেছিল তাহার অঙ্গে টান ধরিতেছে। ইহা কি ধরনের টান তাহা সে ধারণা করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার বোধ হইতেছিল যে নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সে হারাইতে বসিয়াছে। তবু যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তাহা সঞ্চয় করিয়া সে ঘোষণা করিল, 'ঠিক আছে আমি সদরে যাচ্ছি। যদি এসব ভাঁওতা হয় তাহলে আধুলি থেকে জন্মের মতো বের হওয়া বন্ধ করে দেব। আমার নাম শিবকালী ঘোষ, আমি পিঁপড়ের পোঁদ টিপে মধু বের করে কাশি সারাই।'

আগন্তুকের অধরে আবার হাসি খেলিয়া গেল। বাঁশের গেট খুলিয়া তাহাকে ভেতরে প্রবেশ করিতে দিল শিবকালী। তখনও ঘাসে এবং গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু মুক্তোর মতো জ্বলিতেছে। নবীন সূর্যকিরণে পৃথিবীকে চমৎকার দেখাইতেছিল। গোয়ালঘর হইতে গাম্ভীর ডাক ভাসিয়া আসিল। এইরকম ডাক সদ্যপ্রসবা না হইলে ডাকা যায় না। শিবকালী দ্রুত গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এইসময় তাহার ডান চক্ষু অকস্মাৎ নৃত্য শুরু করিল।

মুখভরতি দাড়ি যার সেই লোকটিকেই নেতা বলে ভাবা অন্যায় হবে না। কারণ সে কথায়-কথায় বিরক্ত হচ্ছিল। তার কথার ভঙ্গিতেও সেটা স্পষ্ট। তাকে ঘিরে ছয়জন যুবক বসে আছে। যুবকেরা আধুলি গ্রামের মানুষ। নেতা শহর থেকে এসেছেন, 'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এটা তিরাশি সাল অথচ আপনাদের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার! আপনাদের গ্রামের শতকরা নিরানব্বুইজন সারা বছর আধপেটা খেয়ে থাকে, শিবকালী ঘোষের জমি চাষ করছে, এই মানুষগুলোকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা আপনারা করবেন না? তাহলে রাজনীতি করতে এলেন কেন?'

যুবকদের একজন মিনমিনে গলায় বলল, 'আমরা চেষ্টা করছি—।'

'কী চেষ্টা করছেন?' নেতা তাঁর দাড়িতে হাত রাখলেন, 'না না, এ ভালো কথা নয়। আপনারা হলেন পার্টির ক্যাডার। আপনাদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে—। আচ্ছা আপনারা আমার প্রশ্নের জবাব দিন, লোকটা জোতদার?'

'হ্যাঁ।'

'বুর্জোয়া?'

'হ্যাঁ।'

'মজুতদার?'

'হ্যাঁ।'

'শোষক?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাস। আর কী দরকার? এইরকম মানুষ দেশে যত থাকবে তত সর্বহারাদের সর্বনাশ। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করে উৎখাত করতে হবে। আপনারা সেটা জানেন না?'

'জানি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে গ্রামের মানুষদের নিয়ে। তারা লোকটাকে পছন্দ করে না, সকালে উঠে কেউ নাম উচ্চারণ করতে চায় না, ঘৃণাই করে, আবার ওই লোকটার বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস পায় না।'

'এসব পুরোনো সেন্টিমেন্ট। একবার ভেঙে দিলেই চুকে যাবে।'

'কিন্তু আর একটা ব্যাপার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কী ব্যাপার?'

'গ্রামের মানুষ জানে লোকটার একসময় কিছুই ছিল না। খেতে পেত না। সেই যে বাংলাদেশ থেকে ওর দুই পিসি সোনার গয়না নিয়ে এল সেটা হাতিয়েই ওর রবরবা। তা সেইসময় কংগ্রেসিরা ওকে খুব খাতির করত।'

'করে, সেটাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের চরিত্র সাধারণ মানুষকে বোঝানো।'

'কিন্তু লোকটা ঠিক কংগ্রেসিও ছিল না। গতবার পঞ্চায়েতে দাঁড়াবার জন্যে আমাদের পার্টি থেকেও ওকে অনুরোধ করেছিল। মুশকিল হল খবরটা গ্রামের লোক জানে। লোকটা রাজি হয়নি। শহরের নেতারা ওর বাড়িতে এসেছিল।'

নেতাকে একটু সঙ্কুচিত মনে হল কিন্তু তাঁর মুখ দাড়িতে ঢাকা থাকায় অভিব্যক্তি বোঝা গেল না। নেতা শেষ পর্যন্ত কাঁধ নাচালেন, 'ওরকম একটু-আধটু হয়ই, পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক সময় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। মার্কস বলেছেন, শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। এ আপনারা বুঝবেন না। হিটলারকে ঠেকাতে আমরা ব্রিটিশদের সমর্থন করেছি, কেন করেছি? অনেক গভীরের কথা। যাক, আমার বক্তব্য হল এই শোষকটিকে আপনারা নাজেহাল করুন। ওর জমিতে যাঁরা চাষ করেন তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ সংগঠিত করুন। ওর লোকজন বাধা দিতে এলে সংগ্রাম শুরু করুন।'

এবার আর একজন বলল, 'শিবকালীর ছেলেমেয়ে নেই।'

'গুড। তাতে তো আরও ভালো হল। ওর মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি এই গ্রামের জনগণের হয়ে যাবে। এতগুলো সর্বহারার মধ্যে একজন বুর্জোয়া থাকবে তা মেনে নেওয়া যায় না। শহরে সর্বহারার সংখ্যা কম, বুর্জোয়ার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ উলটো। লোকটার সম্পত্তির হিসাব পেয়েছেন?'

'জোতজমি এবং ধানগম নিয়ে লক্ষ টাকার মতো হবে।'

'আর আপনাদের? আপনাদের পকেটে কিছু নেই—টুঁ-টুঁ! তাছাড়া লোকটার মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব নেই। আর দেরি করবেন না, আমরা আগামীকাল আবার বসব এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করতে। একটা গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমান করতে পারি তাহলে সমস্ত দেশ উদ্বুদ্ধ হবে।'

নেতার কথা শেষ হলে সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেককেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। নেতা যা বলছেন তাতে তারা মিথ্যে কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু শিবকালীর কাছে গ্রামের মানুষ যে ঋণগ্রস্ত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, সকালে উঠে লোকটার নাম শুনলে হাঁড়ি ফেটে চৌচির হয়।

মদনমোহন সাইকেলে চাপিয়া সদরে যাইতেছিল। শিবকালী ঘোষের বাড়ির সামনে আসিতেই সে ডাক শুনিতে পাইল, 'চললে কোথায়? আপিসে?' সে দেখিল শিবকালীর গেটের নিকট দাঁড়াইয়া সেই আগন্তুক হাসিতেছে। নিকটে কেহ নাই।

মদনমোহন গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ করিয়া জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এখানে প্রসাদ নিয়ে যেও।'

মদনমোহনের কিছুই বোধগম্য হইল না। কিসের প্রসাদ, কোথায় পাওয়া যাইবে এইসব বৃত্তান্ত অজানাই রহিল। তাহার যথেষ্ট বিলম্ব হওয়ায় সে দ্রুত ওই স্থান অতিক্রম করিলেও হঠাৎ ঠাওর হইল প্রত্যূষে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, এই অল্প সময়ের ব্যবধানে সে মালিকের ন্যায় কথা বলিতেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শিবকালীর সম্মুখে একটি অভিনব দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। পারুলবালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, তাহার বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নার্স শিবকালীকে কহিয়া গেল, আগামীকাল নহে ওইদিন অপরাহ্নেই অপারেশন করিতে হইবে নহিলে অবস্থা বিপজ্জনক হইতে পারে। তিনবার পত্নীর নাম উচ্চারণ করিয়াও শিবকালী কোনও সাড়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল এই স্ত্রীলোকটি গত হইলে তাহার অতিশয় দুর্দশা হইবে। অতএব যেমন করিয়া হোক ইহাকে সুস্থ করিতেই হইবে। ডাক্তারবাবুরা যখন অপারেশন একমাত্র উপায় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তখন তাহা মানিয়া লওয়াই শ্রেয়। সে আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর রাখে না। কিন্তু ওই সাধুবাবা তো আর

মিছিমিছি তাহার কাছে আসে নাই। বস্তুত এখন পর্যন্ত তাহার একটি পয়সাও তিনি খসান নাই। পকেটে যে শিকড়টি আছে তাহা গোপনে পারুলবালাকে খাওয়াইলে কেমন হয়! যদি কোনও সুপ্রতিক্রিয়া না দেখা দেয় তাহা হইলে যথানিয়মে অপারেশন হইতে দেওয়া মঙ্গল। শিকড়ের জন্যে যদি কোনও মন্দ প্রতিক্রিয়া হয় তাহাতে ভয়ের কিছু নাই কারণ অপারেশন অনিবার্য। এইসব সাতকাহন ভাবিয়া শিবকালী চারপাশে তাকাইল। পাশাপাশি বিছানায় অনেক মহিলা শুইয়া আছে। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভিড় এখন। কেহই এইদিকে লক্ষ করিতেছে না। শিবকালী গোপনে শিকড়টি পারুলবালার মুখের ভিতরে গুঁজিয়া দিল। সেই মুহূর্তে বোধহয় পারুলবালার যন্ত্রণা তীব্র হওয়ায় সে শেকড়টিকে দাঁতের তলায় চাপিয়া ধরিল। শিবকালী নিম্নস্বরে কহিল, 'খেয়ে নাও, চিবিয়ে খেয়ে নাও, যন্ত্রণা কমে যাবে।'

অসহায় পারুলবালা একবার স্বামীর মুখ দর্শন করিল তারপর পাশ ফিরিয়া শুইল। খানিকবাদেই নার্স আসিয়া কহিল, 'উনি ঘুমুচ্ছেন, এখন আর বিরক্ত করবেন না। যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।'

শিবকালী উঠিল না। একটু আগে যে মানুষ কাতর ছিল সে শিকড় মুখে দেওয়ামাত্র নিদ্রিত হইল। হঠাৎ তাহার শরীর শিহরিত হইল। সাধুবাবা কি দৈবপ্রেরিত? কিন্তু তবু সংশয় হইতেছিল। আধঘন্টা নিদ্রা যাওয়ার পর পারুলবাবা নয়ন মেলিল, 'ওমা, কখন এলে?'

শিবকালীর জিহ্বা আড়ষ্ট, 'কেমন আছ? যন্ত্রণা—।'

পারুলবাবা কহিল, 'সকালে খুব ছিল, এখন—।' সে নিজের পেটে হাত বুলাইয়া কহিল, 'টাটিয়ে আছে কিন্তু ব্যথা নেই গো! কী করে হল?'

শিবকালীর হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠিয়া আসিল। সে দুই উজ্জ্বল চক্ষু মেলিয়া কহিল, 'উঠে দাঁড়াও তো, বিছানা থেকে নামো—।'

পারুলবালা কহিল, 'না, পারব না। আজ দুদিন বিছানা থেকে নামিনি। মাথা ঘুরে যাবে আর যন্ত্রণাটা বাড়বে।'

শিবকালী একটু কঠোর হইল, 'নামতে বলছি নামো!'

পারুলবালা চিরকালই এই মানুষটিকেই সমীহ করে। বাংলাদেশি আত্মীয়দের স্বর্ণালঙ্কার উধাও হইবার পর সে তটস্থ হইয়া থাকে। অতএব আদেশ অমান্য করিবার সাহস রইল না। মাটিতে পা ফেলিয়া সে নিজেই তাজ্জব হইয়া গেল। সামান্য ব্যাথাও বোধ হইতেছে না, এমনকী আড়ষ্ট ভাবটিও মিলাইয়া গেল। পারুলবালা স্বচ্ছন্দে খানিকক্ষণ পদচারণ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আমার আর কোনও কষ্ট হচ্ছে না গো, আমি ভালো হয়ে গিয়েছি।' তাহাকে শিশুর ন্যায় দেখাইতেছিল।

শিবকালী আরও কিছুক্ষণ স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল।

ঠিক দ্বিপ্রহরে শিবকালী সস্ত্রীক আধুলিতে প্রত্যাগমন করিল। ইতিমধ্যে পারুলবালার রক্তশূন্য মুখে প্রাণের ছোঁওয়া লাগিয়াছে। তাহার চেহারা দেখিয়া ডাক্তার খুবই বিস্মিত হইয়াছিল। নানারূপ পরীক্ষা করিয়াও পারুলবালার পূর্বের রোগটিকে পাকড়াও করা যায় নাই। শেষপর্যন্ত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শিবকালীর নিকট হইতে বন্ড লইয়া পারুলবালাকে মুক্তি দিয়াছেন। পথে স্ত্রীর নিকট সাধুবাবা এবং তাহার শিকড়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শিবকালী কহিয়াছিল, 'ভাগ্যিস, তোমার গায়ে অস্ত্র ছোঁয়ায়নি, নইলে আর দেখতে হত না।'

পারুলবালা স্বাস্থ্যের ফুর্তিতে জবাব দিয়াছিল, 'মরলে তো সুবিধে হত, আর একটা ছুঁড়িকে জুটিয়ে আনতে। ব্যাটাছেলেদের চরিত্তির!'

দূর হইতে রক্তাম্বর দেখা যাইতেছিল। রিকশা হইতে পড়ি কি মরি করিয়া নামিয়া আসিল শিবকালী, পাগলিনীর মতো প্রায় পারুলবালা। তারপর দুইজনে সাধুবাবার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ হইল।

সাধুবাবা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'তাহলে অপারেশন হল না! বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি।'

শিবকালী আপ্লুত কণ্ঠে কহিল, 'তুমিই বাঁচালে। তোমার কৃপা।'

'আমি কে? আমি কেউ না। সবই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ছায়া নেমে আসল, কালো ছায়া। সর্বনাশ এগিয়ে আসছে ধীরে-ধীরে।'

পারুলবালা কোনওক্রমে কহিল, 'বাঁচান, আমাদের বাঁচান।'

সাধুবাবা বলিলেন, 'ওঠ। পড়ে থাকিস না, এখন তোদের দাঁড়াবার সময়।'

শিবকালী উঠিল। সাধুবাবার দুই চক্ষুর দিকে তাকাইলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়। সে কহিল, 'বাঁচান, বাঁচান।'

সাধুবাবার মুখশ্রী কঠোর হইল, 'তোদের চারপাশে এখন অনেক শত্রু। এদের দূর করতে হবে। মায়ের নামগান করতে হবে। বাহাত্তর ঘণ্টার নামগান। এখানে শামিয়ানা টাঙা। তিনদিন ধরে নাম চলবে। আমি যজ্ঞ করব। তিনদিনের পর ছায়া সরে যাবে, তোদের নতুন জীবন শুরু হবে। কি, রাজি আছিস?'

পারুলবালা সোৎসাহে কহিল, 'হ্যাঁ বাবা, আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন।'

অপরাহ্নে মদনমোহন সাইকেলে চাপিয়া আফিস হইতে ফিরিতেছিল। সেইদিনই মাহিনা পাওয়ায় তাহার পথে দাঁড়াইবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু শিবকালী ঘোষের গৃহের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। কয়েকজন কিষাণ পরিশ্রম করিতেছে। শিবকালী নিজে দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছে। এইসময় একজন দৌড়াইয়া মদনমোহনকে খবর দিল, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

বাবাটি কে তাহা অনুমান করিল মদনমোহন। নিতান্ত কৌতূহলে সে ভিতরে প্রবেশ করিতেই সাধুবাবার দর্শন লাভ করিল। যজ্ঞের কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার নিকটে উচ্চ আসনে সাধুবাবা প্রশান্ত মুখে বসিয়া কহিলেন, 'কিহে, বাড়ি ফিরছ?' মদনমোহন নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতেছিল। আজ প্রভাতে যাহাকে নিতান্তই সাধারণ মনে হইতেছিল অপরাহ্নে তাহাকেই মহাশক্তিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। যে শিবকালীর আঙুল ফাঁক হয় না সে ইহার সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান। মদনমোহন নীরবে মস্তক দোলাইল। সাধুবাবা কহিলেন, 'বেশ বেশ। আজ থেকে এখানে নামগান শুরু হচ্ছে। সন্ধের পরে এসে প্রসাদ নিয়ে যেও। আর একটা কথা, এই নামগান যজ্ঞ যেমন শিবকালীর অমঙ্গল দূর করবে তেমনি গ্রামের মানুষদের উপকার হবে। তাই যে দুবেলা এখানে প্রসাদ না নিতে আসবে সে নিজের ক্ষতি করবে। একথা গ্রামের মানুষকে বলে দিও।'

মদনমোহনের মনে হইল সাধুবাবা নন স্বয়ং মহাদেব কথা বলিতেছেন। সে পরম ভক্তিদের প্রণাম জানাইলে সাধুবাবা কহিলেন, 'যাও বাবা, সারাদিন খাটুনি খেটে এলে, এবার একটু বিশ্রাম করো। রাতে ঠিক এসো বাড়ির মানুষদের নিয়ে।'

মদনমোহন খানিকটা কৃতজ্ঞচিত্তে বাহিরে আসিতে-আসিতে নিজেকে ধিক্কার দিল। তাঁহার দুই চক্ষু কেবলই সাধুবাবার ঘড়ির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। বড় সন্দেহপরায়ণ সে। সন্দেহ মানুষকে ছোট করিয়া দেয়।

হরিনাম নয়, তারানাম শুরু হইল রাত্রি আট ঘটিকায়। শহর হইতে চারজন বাদ্যযন্ত্র লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। ওপাশে দুইটি উনুনে প্রসাদ পাক দেওয়া হইতেছে। খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুনভাজা আর দুইটি রসগোল্লা। যজ্ঞ হইবে বাহাত্তর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইলে। সাধুবাবা নামগানে যোগদান করিতে করিতে মাঝে-মাঝে বাহিরে আসিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন সবাই প্রসাদ ঠিকমতন পাইল কিনা। প্রথম রাত্রে মাত্র দুশো মানুষ প্রসাদ পাইল। পার্শ্ববর্তী গৃহের মহিলারা পারুলবালার পার্শ্বে বসিয়া আবিষ্কার করিল এ পারুলবালা সে পারুলবালা নহে। সাধুবাবার শিকড় মানুষটিকে মাটির মানুষ করিয়া দিয়াছে। এমনকী শিবকালী ঘোষও বিনীত ভঙ্গিতে প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছিল।

অধিক রাত্রে যখন কয়েকজন নামগানকারী সুর বাঁচাইয়া র'খিয়াছে তখন সাধুবাবা শিবকালীকে কহিলেন, 'বাবা শিবু এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। কাল তো সাতসকালে উঠতেই হবে। যাও।'

নিভৃতে আসিয়া শিবকালী পারুলবালাকে কহিল, 'শরীর কেমন?'

পারুলবালা উজ্জ্বল হইল, 'খুব ভালো। কোনওদিন অসুখ করেছিল বলে মনেই হয় না। ওঃ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি!' তারপর একটি প্রশান্ত হাসি অধরে রাখিয়া কহিল, 'আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হল। আগে ভাবতাম খোকা হলে অন্নপ্রাশন করব, শামিয়ানা টাঙিয়ে লোক খাওয়াব। সে সাধ তো পূর্ণ হচ্ছিল না। আজ হল।'

শিবকালী কিয়ৎকাল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'সাধুবাবা বলেছেন এসব করলে আমার ভালো সময় আসবে। যা খরচ করব তার ডবল ফিরবে, কি বলো? আমারই টাকায় হাভাতেগুলো গিলবে আর আমি কিছু পাব না—!'

পারুলবালা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল, 'ছিঃ, ওরকম কথা বলো না। যিনি আমার জীবন দিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখো।'

পরদিন সকালে শিবকালীর বাড়ির সম্মুখে যেন মেলা বসিয়া গেল। আধুলির মানুষ বটেই, নিকটবর্তী অন্য গ্রামের মানুষজনও এই সাধুবাবার দর্শনে উপস্থিত হইল। সাধুবাবার আদেশ, কেহ যেন যজ্ঞবাড়িতে আসিয়া প্রসাদ না লইয়া না ফেরে। গৃহে যা ছিল তা গতরাত্রের আয়োজনে ব্যয় হইয়াছে। অতএব শিবকালী শহর হইতে চাল ডাল সবজি আনাইল। উনুনের সংখ্যা বাড়িল। শহর হইতে একাধিক বামুনঠাকুর আনাইতে হইল। সাধুবাবার আদেশমতো পরদিবসে গ্রামের সমস্ত বাড়িতে উনুন আর জ্বলিল না। মদনমোহন স্নান করিয়া যজ্ঞবাড়িতে প্রসাদ খাইয়া আপিস করিতে গেল। দ্বিপ্রহরে তিন হাজার মানুষ খেপে-খেপে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলিতে লাগিল। তারামায়ের নামগান তখন সোচ্চার। বোধহয় দুইক্রোশ দূর হইতে তাহা শোনা যাইতেছিল। যে আসে সেই খানিকটা চেঁচাইয়া যায়। শিবকালী দুইদিনে যেন কিছুটা কৃশ হইয়াছে। দুই বেলা এখন সমস্ত দিনে বিস্তৃত হইয়াছে। যে যখন ইচ্ছা আসিলেই প্রসাদ পাইতেছে। শিবকালীর আর নামগান করিবার সময় নাই, চরকির ন্যায় তাহাকে প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে চারিধারে ছোটাছুটি করিতে হইতেছিল। মদনমোহন অতি স্বল্পমূল্যে তাহার নিকট হইতে পাঁচমণ গম ক্রয় করিল। শিবকালীর গমে প্রয়োজন নাই।

নেতা বললেন, 'দেখুন, লোকটার স্পর্ধা দেখুন। দুবেলা খাইয়ে সমস্ত গ্রামের মানুষকে কিনে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই ইলেকশনে দাঁড়াবে। এই জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে আমরা কনটেস্ট করতে পারব।'

একজন বলল, 'না, ঠিক সেরকম নয়। এক সাধুবাবা এসে বলেছে যজ্ঞ করে লোক খাওয়ালে ভালো হবে, তাই—।'

'ছাড়ো! একটা না একটা ধান্দা ঠিকই আছে। এই ফাঁকে গ্রামের মানুষ লোকটার জয়গান করবে। অ্যাদ্দিন হিংসে করত, নিন্দে করত, এখন প্রশংসা করবে, যাক। আমরা কী দেখছি? দেখছি লোকটা পুঁজিপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর। টাকার গরমে পৃথিবীকে নস্যাৎ করছে। এরকম মানুষ পৃথিবীতে থাকলে বিপ্লবের ক্ষতি হবে। কারণ এরা মানুষকে ভুল পথে চালায়। এদের কাছ থেকে মানুষের কোনও উপকার আসে না, এরা যা করে তা নিজের স্বার্থের জন্যে করে। এ বিষয়ে কারও বক্তব্য আছে? নেতা বাঘের মতো সামনে বসা মুখগুলোর দিকে তাকালেন, ' নেই। থাকতে পারে না। কারণ আপনারা সবাই বিচক্ষণ মানুষ। সর্বহারা মানুষ। আপনারা শুনেছেন লোকটার স্ত্রীর অপারেশন অনিবার্য ছিল। ওই সাধুর শেকড় খেয়ে মহিলা ড্যাঙডেঙিয়ে চলে এলেন। এই বিজ্ঞানের যুগে কেউ একথা বিশ্বাস করবে? পুরো ব্যাপারটাই বানানো। ওর বউ-এর কিছুই হয়নি। ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল, যাতে ওই সাধুবাবার কীর্তির কথা সাহকাহন করে শোনানো যায়। গ্রামের সরল মানুষদের ব্ল্যাকমেল করছে লোকটা।'

একজন একটু উসখুস করছিল। নেতা থামতেই বলল, 'কিন্তু এত টাকা খরচ করছে কেন

তাহলে?'

এ্যাই, এ্যাই হল প্রশ্ন। হোয়াই? নিশ্চয়ই কোনও ধান্দা আছে। যা খরচ করছে তার দশগুণ কামাবে। এছাড়া হতেই পারে না। কই, আমার আপনার বাড়ির কারও অসুখ হলে তাকে বাঁচাতে তো সন্ন্যাসী আসে না। গ্রামের মানুষ যখন বুঝবে তখন ওদের কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু আমরা তো সেটা হতে দিতে পারি না। কিছু ভাবলেন আপনারা?'

একজন বলল, 'মাথায় কিছু আসছে না। এই উৎসবের পরে তো ওর ভাগচাষিদের উত্তেজিত করা মুশকিল হবে।'

নেতা বললেন, 'ঠিক। আমাদের দেশের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে আরও কঠোর হতে হবে। ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিন। এই সর্বহারাদের মধ্যে ওর স্থান নেই। দিন ঠিক করুন।'

একজন বলল, 'এখন তো ওর বাড়িতে হাজার-হাজার মানুষ। এখন কিছু করতে গেলে পাবলিক খেপে যাবে।'

'না, না, এখন নয়। তবে খুব দেরিতেও নয়। ওদের যজ্ঞ কবে শেষ হবে?'

'পরশু রাত্রে।'

'গুড। তারপর যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে?'

হ্যাঁ, আর থেকে কী করবে?'

'এই কদিনের পরিশ্রমে শিবকালী ঘুমে নেতিয়ে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তখনই—তখনই আসল সময়। এ খবর এই ঘরের বাইরে যেন না যায়। আর অ্যাকশন পার্টিতে আপনারাই থাকবেন।' নেতা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

শিবকালীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল। পারুলবালা তাহাকে ধরিয়া যজ্ঞের নিকট লইয়া আসিল। বিশাল অগ্নিকুণ্ড হইতে তাপ বিকিরিত হইতেছিল। সেই লেলিহান শিখার পার্শ্বে বসিয়া সাধুবাবা মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। গ্রামের সমস্ত মানুষ পরমভক্তিভরে তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিল। শিবকালীকে দেখিয়া সাধুবাবা কহিলেন, 'বাবা শিবু, আমার যজ্ঞ শেষ। তোর বাড়িতে যে গভীর কালো ছায়া নেমেছিল তাকে সরিয়ে দিয়েছি। বল, আর কোনও বাসনা আছে?'

শিবকালী দুর্বল কণ্ঠে কহিল, 'বাবা, সব দিলাম তোমাকে, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো।'

সাধুবাবা হাসিলেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে। মা, মা, মা! পাবি সব পাবি। খুব বেশি করে পাবি। তার আগে দুটো প্রশ্ন করি, কি চাস তুই?'

শিবকালীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে ওই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া যেন অনেক কিছু দেখিতে পাইল। অনেক অর্থ, অনেক জমি, শস্য ইলেকশনের অনুরোধ, পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়া, রাশি-রাশি সোনা কিন্তু ও কে? ওই যে বিধবা? সাদা থান পরা, হাতে পুঁটুলি যাহাতে সোনার গহনা আছে। যে পুঁটুলি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ওই বিধবা তাহার কাছে পরম বিশ্বাসে গচ্ছিত রাখিয়াছিল! কিন্তু সেই বিধবাকে তো সে তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কেন এখন ওই অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়াইয়া সমস্ত সম্পদ আড়াল করিয়া রাখে? বারংবার চক্ষু রগড়াইয়াও শিবকালী সেই মৃত বিধবাকে সরাইতে পারিল না। তাহার এই আত্মীয়টি যেন মিটিমিটি হাসিতেছে। সে উত্তর করিতে পারিল না। তখন সাধুবাবা পারুলবালার দিকে চাহিলেন, 'তোমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী? তাই চাও, তুমি তাই পাবে মা।'

পারুলবালা মাথার ঘোমটা আর একটু টানিল। কোনটি যে মূল্যবান তাহা সে কিছুতেই ঠাওর করিতে পারিতেছিল না। শেষ পর্যন্ত বাল্যকাল হইতে শোনা বাক্যটি তাহার স্মরণে আসিল, পতিই পরম দেবতা, স্বামীই স্ত্রীর সবচেয় বড় সম্পদ। সে নিম্নস্বরে কহিল, 'ওঁকে সুস্থ রাখুন।'

সমবেত মানুষজন সপ্রশংস বাক্য কহিতে লাগিল। সাধুবাবা হাসিলেন, 'তথাস্তু। সাবিত্রীসমান হও মা।'

আধুলি গ্রাম এখন নিস্তব্ধ। এমনকী কুকুরেরাও এখন নিদ্রিত। যজ্ঞ শেষ হওয়ামাত্র যে যার বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছে। সাধুবাবা গরুর গাড়িতে শহরে রওনা হইয়া গিয়াছেন। যজ্ঞের শেষে ওইস্থানে থাকা নাকি তাঁহার গুরুর নিষেধ। শহর হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সাধুবাবার অনুগামী হইয়াছে। এখন শিবকালীর গৃহের সম্মুখে ছেঁড়া কলাপাতা উড়িতেছে, অজস্র ভাঁড় এবং উচ্ছিষ্ট চারিধারে ছড়াইয়া আছে। সমস্ত পরিবেশ শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে।

এতদিনের ক্লান্তি অদ্যরাত্রে পারুলবালাকে আজ নিষ্কৃতি দেয় নাই। ঘরের ভিতর মড়ার মতো ঘুমাইতেছে সে। শিবকালীর চক্ষে কিন্তু ঘুম নাই। সে ধীরে-ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বসিল। চারিপাশে এখন রাত্রির কালো ছায়া। শিবকালী দুই হস্তে মুখ লুকাইল।

এইসময় একটা জিপ প্রায় নিঃশব্দে শিবকালী ঘোষের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। টপাটপ কয়েকজন মানুষ ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। প্রত্যেকের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, হাতে ছুরি এবং তলোয়ার। আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে আছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছিল না। তারা সতর্ক চোখে চারধার দেখল। তারপর বাড়ির পেছন চলে এল। খিড়কির দরজা খোলাই ছিল। আগন্তুকরা একটু অবাক হল। প্রতিরোধ নেই কেন? খবরটা ফাঁস হয়ে গেল নাকি? তারা সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল। গোটাচারেক ঘর। কিন্তু কোনও ঘরেই আসবাব পর্যন্ত নেই। সব খাঁ-খাঁ করছে। একটি ঘরে পারুলবালা শুয়ে আছে। ওরা চটপট ওকে বেঁধে ফেলল। পারুলবাবাকে খুন করার পরিকল্পনা ওদের নেই। তারপর সিন্দুক খুলল। বিশাল লোহার সিন্দুকের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগন্তুকদের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এইসময় তারা শিবকালীকে আবিষ্কার করল। দ-এর মতো বারান্দায় বসে আছে। ওরা ছুরি বের করে নিঃশব্দে শিবকালীর পেছনে এসে দাঁড়াতেই একজন থাকতে ইঙ্গিত করিল। এই মানুষ কি সেই মানুষ! এমন হতশ্রী বৃদ্ধের চেহারায় ওরা শিবকালীকে কল্পনা করেনি। ওদের মনে হচ্ছিল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

দুজনকে পাহারায় রেখে বাকিরা আবার তদন্তে বের হল। গোলায় ধান নেই, গোয়ালে গরু নেই। ওরা ফিরে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, ' গোলায় ধান নেই, কোথায় গেল? সিন্দুক খালি, মাল কোথায় গেল?'

শিবকালী ইহাদের চিনিতে পারিতেছিল না। সে মাথা নাড়িল, ' বেচে দিয়েছি—সব বেচে দিয়েছি।'

'বেচে দিয়েছে? কেন?'

'হুঁ বাবা! বিশ হাজার লোক খেয়েছে চারদিনে—কত টাকা লাগে, অ্যাঁ! যত জমি ছিল, যত গয়না ছিল, ধানগম ছিল, গরু বলদ ছিল সব বেচে লোখ খাইয়েছি।'

'এখন কি আছে তোমার, এই বুর্জোয়া?'

'এখন শুধু এই প্রাণটা। আমার বউয়ের পরম সম্পদ।' শিবাকালী চক্ষু বন্ধ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

'তুমি 'এরকম করলে কেন?' একজন ছুরিটা গলায় ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়িল শিবকালী, 'সবই তাঁর ইচ্ছে, সবই তাঁর ইচ্ছে! এই বসতবাটিটাও বন্ধক রেখেছি মদনমোহনের কাছে। যাও, খবর নাও।'

ছুরিটা সরে গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকাল। কেমন অসহায় বোধ করছিল সবাই। শেষ পর্যন্ত একজন কথা বলল, 'যাঃ শালা! আর একটা সর্বহারা বাড়ল। এখন একে খুন করে কী করব?'

ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। বুর্জোয়া যদি সর্বহারা হয়ে যায়, তাহলে? বারান্দার শীতল

বাতাসে বসিয়া শিবকালী তখন আপনমনে গুনগুন করিতেছিল, 'সব হারিয়ে এসে গেছি, আয় মা এবার কাছাকাছি।'

ওরা পকেট থেকে একটা টাকা বের করে টস করল। তিন সিংহ শূন্যে দুটো ধানের শিষ গপগপিয়ে গিলে ফেলছিল।



জোড়া পা

কেউ একজন সাইকেলে এসে গাছতলায় বলে গেল, 'লাইনের পাশে বসে জগাদা বমি করছে, হেভি রক্ত!' যে বলল সে আর দাঁড়াল না।

গাছতলার আড্ডাটা থতমত খেয়ে গেল। পাঁচজন এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কোনও কথা না বলেই পাঁচজন একসঙ্গে দৌড়ল লাইনের দিকে। যারা দূর থেকে দেখল তারা ভাবল আজ আবার হুজ্জুতি হবে। এ পাড়ার লোক এমন দৌড়নো দেখতে অভ্যস্ত। এর পরেই বোমা ফাটবে। গাছতলার পাশের সিগারেটের দোকানে হরিপদ উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল। সামনে দাঁড়ানো জগন্নাথ মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? দোকান বন্ধ করব?'

জগন্নাথ গোড়ালি তুলে এদের ছুটে যাওয়া দেখতে দেখতে বলল, 'একটু দাঁড়াও, সবই তো রেডি আছে, বোমের আওয়াজ পেলেই ঝাঁপ ফেলবে?'

হরিপদ বলল, 'দূর শালা! আর ভাললাগে না!'

জগন্নাথ হাসল, 'ঝড় পেরিয়ে এলে কত এখন দমকা হাওয়ায় ভয় পাচ্ছ ভাই?'

নিবারণ বিষ্ণু ওই পথেই আসছিল। কথাটা তার কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ল, 'হরিপদদা, গুজব ছড়িও না। সে সব দিন চলে গিয়েছে। এখন পাড়ায় যথেষ্ট শান্তি। তবে কেন ওভাবে ছুটে গেল তাই জানতে হচ্ছে।'

জগন্নাথ বলল, 'জগা, মানে আমাদের জগন্ময় লাইনের ধারে বসে রক্তবমি করছে। একজন সাইকেলে চেপে এসে জানিয়ে গেল।'

নিবারণ আঁতকে উঠল, 'সর্বনাশ! রক্তবমি কেন?'

জগন্নাথ বলল, 'নিশ্চয়ই মাল খেয়েছে। দিনরাত মাল খেয়ে পড়ে থাকে।'

নিবারণ আপত্তি করল, ' তোমাদের এই হুট করে কথা বলার অভ্যেস আর গেল না। জগন্ময় আগে ও সব খেত, এখন তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু রক্তবমি হবে কেন? যাই, একবার তারকদাকে খবরটাকে দিয়ে আসি।'

নিবারণ বিষ্ণু চলে গেলে হরিপদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, 'থাক গে! তারকদা এসে গেলে আর হুজ্জুতি হবে না।'

জগন্নাথ মাথা নাড়ল, 'তা অবশ্য। সব শালার টিকি ওর কাছে বাঁধা।'

হরিপদ চাপা গলায় বলল, 'আস্তে কথা বল।'

দেখা গেল পাশের বস্তি থেকে লিকলিকে রোগা রুক্ষ চুল নিয়ে একটি বউ ছুটে বেরিয়ে এল, তার পেছনে, পাঁচটি বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা। বউটি এদিক-ওদিক চেয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে ছুটে এল সিগারেটের দোকানের সামনে, 'কী হয়েছে? ওর কী হয়েছে?'

হরিপদ সহানুভূতি আনল গলায়, 'পাড়ার ছেলেরা সব গিয়েছে। ওর বন্ধুবান্ধব।'

'কোথায় গিয়েছে? কেন গিয়েছে?' বউটি চেঁচিয়ে উঠল। তার হাড়-সর্বস্ব শরীর থেকে যে আওয়াজ ছিটকে বেরুল তা বস্তির অনেক মানুষকে বাইরে টেনে আনল।

জগন্নাথ হরিপদর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে চুপ করতে বলে ঘুরে দাঁড়াল, 'শোনা কথা, সঠিক কি হয়েছে জানি না মা। তবে শুনলাম জগন্নাথ রক্তবমি করছে লাইনের ধারে বসে।'

শোনামাত্র ডুকরে কেঁদে উঠল বউটি। তারপরেই পড়িমড়ি করে ছোটার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে তাকে জড়িয়ে ধরেছে পাশে দাঁড়ানো একটি মেয়ে, 'কমলা বউদি, ও কমলা বউদি, শান্ত হও, ওরা তো গিয়েছে।'

জগন্ময়ের বউ কমলা তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগল, 'ও মাগো, আমার কি হল গো, এই পাঁচ-পাঁচটা অনাথকে কে দেখবে গো? বয়সের কথা ভুলে যায়, মাল খেয়ে আবার কোথায় মারপিট করে মরেছে গো!'

তাঁকে ঘিরে মেয়েদের ভিড় জমছিল। একজন ধমকে উঠল, 'আঃ, থামো তো। মাল তো এই বস্তির সব ব্যাটাছেলেই খায়। মানুষ না মরে গেলে কেউ ওভাবে কাঁদে? তোমার শাশুড়ির কথা ভাবো।'

দেখা গেল জগন্ময়ের মা খানিকটা দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রোগা বেঁকে যাওয়া শরীর, চোখে ভালো করে দেখতে পায় না, মাথার চুল কদমফুলের মতো ছাঁটা। ময়লা আঁচল বাঁ হাতে তুলে মুখে চাপা দিয়েছে।

এইসময় একটা ট্যাক্সিকে এদিকে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি আসতেই পাড়ায় শোরগোল পড়ে গেল। ট্যাক্সির ভেতর থেকেই ছেলেরা চেঁচাচ্ছে। একজনের গলা কানে এল, 'কাপড় চাই, নইলে গামছা, হেভি রক্ত বের হচ্ছে।'

ট্যাক্সি দাঁড়তেই দেখা গেল, অর্থাৎ বিশাল ভিড়ের মধ্যে যারা জানালায় পৌঁছতে পারল তারাই দেখল পেছনের সিটে জগন্ময় পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার মুখের চারপাশে রক্ত। ছেলেরা সেই রক্ত বাঁচিয়ে ট্যাক্সির মধ্যেই কোনওমতেই রয়েছে।

কমলা ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'কী হয়েছে? ওগো তোমার কী হয়েছে? হায় কপাল, কি রক্ত! এত রক্ত কেন? কে মেরেছে?'

পাঁচজনের একজন সুনীল, সে ধমকে উঠল, 'কেউ মারেনি। হঠাৎই হচ্ছে। এই দেখি, তোর গামছাটা দে তো!' উৎসুক একজনের ঘাড় থেকে গামছা টেনে নিল সে হাত বাড়িয়ে 'হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তারকদকে খবর দাও কেউ। চলুন ভাই।'

গামছাটা সে জগন্ময়ের মুখের সামনে পেতে দিল। জগন্ময়ের চোখ বন্ধ। ট্যাক্সির একজন বলল, 'বউদিকে সঙ্গে নিবি না?'

'বউদি? জায়গা কোথায়? তাছাড়া মেয়েছেলে ওখানে কী করবে? চলুন দাদা!'

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ সব শান্ত। ভিড়টা কিন্তু নড়ছিল না। মারপিট হয়নি, মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। একজন গম্ভীর গলায় বলল, 'বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে।' সঙ্গে-সঙ্গে সবাই তার দিকে তাকাল।

'হয় ক্যান্সার নয় টিবি। ক্যান্সার হলে বাঁচানো যাবে না। টিবি হলে বিস্তর খরচ।'

হরিপদ বলল, 'টিবি হলে অত রক্ত পড়ে নাকি! খুকখুক কাশি, একটু-আধটু রক্ত। খেতে না পাওয়া রোগ। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো এই বস্তির অনেকেরই ওই রোগ আছে!'

তারপরেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ক্যান্সার কত খারাপ অসুখ এই নিয়ে মানুষগুলো প্রায় বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে লাগল। কমলাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবাই এখন একমত, পরিবারটা একদম ভেঙে গেল। জগন্নাথের গলাই সবচেয়ে উঁচুতে উঠল, 'চিকিৎসাই

বের হয়নি, কারণ কি থেকে ক্যান্সার হয় তাই কেউ জানে না। আমাদের কোম্পানির মালিকের বাবা, কোটি-কোটি টাকা, বুকের ক্যান্সার হল, আমেরিকায় নিয়ে গেল, বাঁচাতে পারল? ওসব গরিব বড়লোক বলে বাছবিচার নেই, ক্যান্সার হল সাক্ষাৎ মৃত্যু।'

'প্রচণ্ড রক্ত বের হয় আর কি যন্ত্রণা, চোখে দেখা যায় না। যার হয় সে তো গেল, সঙ্গে-সঙ্গে তার সংসারটাকে শেষ করে দিয়ে যায়।' একজন মতামত দিল।

'কেন? সংসার শেষ হবে কেন?'

'চিকিৎসার খরচ কি জানো? মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'বাঁচবেই না যখন তখন চিকিৎসার চেষ্টা কেন?'

'সেটা কে বোঝে?' লোকটা বিড়ি ধরাল, 'এই জগার বউ বুঝবে?'

'ওদের তো এই অবস্থা, পয়সা পাবে কোথায়?'

এই সময় তারকদাকে আসতে দেখা গেল। ভিড়টা এবার তাকে কেন্দ্রবিন্দু করে ছড়িয়ে পড়ল। সব শুনে তারকদা মাথা নাড়লেন, 'আমরা তো কেউ ডাক্তার নই যে চট করে রোগের নাম বলে দেব। রক্ত অনেক কারণে উঠতে পারে। মারপিট হয়নি যখন তখন বুকের কোনও শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে হঠাৎ। মাল খেয়েছিল?'

একজন বলল, 'হ্যাঁ।'

'খালি পেটে?'

'মালের পয়সার জন্যে ছোঁক-ছোঁক করত, খাবার পাবে কোথায়?'

'দ্যাখো এই হল ডিফারেন্স। বড়লোকেরা মদ খায় সেইসঙ্গে প্রচুর ফুড থাকে। শসা, মাংস, বাদাম। অ্যালকোহল পেটে গেলে সেগুলোকে হজম করতে-করতে অকেজো হয়ে যায়। আর যাদের পয়সা নেই, ফুড কিনতে পারে না। তাদের পেটে গিয়ে অ্যাকোহল সোজা পেটের ভেতরটাকেই খেতে শুরু করে। যাক গে। কি হল, মানে হাসপাতালের ডাক্তার কি বলল তা আমাকে জানিও। এমনি-এমনি তো হাল ছেড়ে দিতে পারি না।' তারকদা চলে গেলেন।

হরিপদর সিগারেটের দোকানের পাশে উবু হয়ে বসে ন্যাপা মাতাল তারকদার লেকচার শুনছিল। সে চলে যেতেই পিক করে থুতু ফেলল। তাই দেখে হরিপদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল তোমার? অমন করলে কেন?'

'আচ্ছা বল তো হরি, মানুষ নিজে যেটাকে ঠিক মনে করে সেইটাকেই অন্যের ওপর চাপায় কেন? এই যে থুতু ফেললাম, পরীক্ষা করলে দেখবে এর মধ্যে ওই অ্যালকোহল আছে। কাল রাত্রে শেষ খেয়েছি। তবু আছে। কারণ গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি খেয়ে আসছি। এক ঠোঙা ছোলা আর গলাতক দিশি, দিব্যি বেঁচে আছি। বাদাম মাংস শসার পয়সায় আর এক বোতল হয়ে যেত। যত জ্ঞানদাস!' ন্যাপা মাতাল থুতু ফেলল। যারা এখন সবে মদে হাত দিয়েছে তারা এই প্রবীণ মাতালের কথা শুনে মনে-মনে খুশি হল। জগন্ময় যেভাবে হাসপাতালে গেল তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই।

এখানে উত্তেজনা বেশিক্ষণ থাকে না, যদি না উপলক্ষ্যকে সামনে দেখা যায়। ভিড় পাতলা হতে আরম্ভ হল। জগন্নাথ ন্যাপা মাতালকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে জগা মাল খেত?'

'নো। কভি নেহি। হাঁটুর বয়সি ছেলে ও। তাছাড়া আমি যাই চল্লুর ঠেকে। এইসব ছেলেদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ওই যারা ট্যাক্সিতে গেল তারাই দল বেঁধে বের হত। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে না?' ন্যাপা মাতাল উঠে পড়ল।

ঘন্টাতিনেক বাদে ছেলেরা ফিরে এল। ট্যাক্সি থেকে জগন্ময়কে ধরাধরি করে বস্তির মধ্যে চলে গেল ওরা। একজন ছুটে গেল তারকদার বাড়িতে। ভিড় জমল গলিতে। টালির ছাদ, একটা তক্তাপোশ, মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাচ্চারা, জগন্ময়কে ওই তক্তাপোশে শুইয়ে দেওয়া হল। একজন

একটা প্ল্যাস্টিকের বালতি ওর মুখের পাশে রাখল, রেখে বলল, 'সাবধানে থাকবেন বউদি, খুব ছোঁয়াচে রোগ। বাচ্চারা যেন কাছে না যায়।'

কথাটা কমলার কানে গেল না। সে হাঁটু গেড়ে জগন্ময়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এমন হল কেন গো? কী বলল ডাক্তার?'

চোখ বন্ধ অবস্থায় জগন্ময় চিঁচি করে জবাব দিল, 'টিবি।'

ঘরের দরজায় যারা উঁকি মারছিল তাদের গলা থেকে একটা আওয়াজ বের হল, 'ওঃ টিবি! তা হলে ক্যান্সার নয়! টিবিতে কোনও ভয় নেই, চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়েছিল জগন্ময়ের মা। তার কথা শোনা গেল, 'হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনলে কেন? সেখানে কত ডাক্তার—।'

'না মাসিমা, এ হাসপাতালে টিবি রুগি রাখে না। টিবির জন্যে আলাদা হাসপাতাল আছে। সেখানে নিয়ে যেতে হবে। কোনও চিন্তা করবেন না, আমরা আছি। এই সরো-সরো, ভিড় হটাও। এ ঘরে আলো বাতাস আসতে দাও।' ছেলেরা হইহই করে ভিড় সরাল। জগন্ময় হেঁচকি তুলল। ওর বউ সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের বালতি তুলে ধরল মুখের সামনে। ওপাশ থেকে জগন্ময়ের মা বলে উঠল, 'ও বউমা, ভাঙা কুঁজোটা নিতে পারতে, ওই বালতিতে কত কাজ হয়!'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে মুখ-ভাঙা কুঁজোটা আনতে ছুটল কমলা।

তারকদা সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। শুনে শব্দ বের করে নিশ্বাস ফেললেন, 'এ হবেই। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় এ হাওয়া অবধারিত। অসম সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফসল ফলবেই। দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষ দুমুঠো ভালোভাবে খেতে পায় না, তাদের ফুসফুস অক্রান্ত হবেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলেছে, চলবে।'

সুনীল বলল, 'কিন্তু তারকদা, চোখের ওপর জগা মরে যাবে?'

'মরবে মানে? আমরা কি মরে গেছি।' তারকদা প্রতিবাদ করলেন।

'কিন্তু এই হাসপাতাল কিছুতেই রাখতে চাইল না।'

'তা তো রাখবেই না। ইনফেকসাস ডিজিজ!'

কালোমানিক বলল, 'তাহলে কী হবে? বাড়িতে রাখলে ওর ফ্যামিলির হবে, পুরো বস্তির হবে।'

তারকদা বললেন, 'তেমনভাবে রাখলে কিছুই হবে না। কিন্তু ভালো ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। ওকে এখনই টিবি হাসপাতালে ভরতি করে দিতে হবে। তোমরা নিয়ে যাও।'

'নিয়ে গেলেই ভরতি করে নেবে?'

'নেওয়া উচিত। তবে সারা দেশে অভাবী মানুষের সংখ্যা এত যে সিট খালি পাওয়া মুশকিল। ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি, তোমরা যাও।' তারকদা বললেন।

সুনীল বলল, 'একটা প্রব্লেম হয়েছে। এই যে ট্যাক্সিতে নিয়ে গেলাম এলাম এতেই আমার কুড়ি টাকা খরচ হয়ে গেছে। টিবি হাসপাতালে যেতে তো অনেক লাগবে।'

কালোমানিক বলল, 'তারপর চিকিৎসার খরচ, অতদূরে রোজ যেতে হবে—।'

তারকদা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, ভালো-ভালো খাবার, ফলমূল। আসলে পথ্যটাই আসল। তারও তো খরচ প্রচুর।'

সুনীল বলল, 'ওর কাছে এক পয়সাও নেই।'

তারকদা চোখ তুললেন, 'তা হলে?'

কালোমানিক বলল, 'চোখের সামনে ন্যাংটো বয়সের বন্ধু মরে যাবে?'

তারকদা বললেন, 'অসম্ভব। এর প্রতিরোধ সবাই মিলে করতে হবে। এটা একটা জরুরি মানবিক ইস্যু। তোমাদের আবেদনে পল্লীবাসীরা নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। জগন্ময়ের চিকিৎসার খরচ তোলার জন্যে একটা ফান্ড তৈরি করো। সুনীল তুমি ট্রেজারার থাকবে। মনে রেখো, জনসাধারণের টাকা, প্রতিটি পয়সার হিসেব রাখবে।'

সুনীল বলল, 'কিন্তু পাড়ার পাবলিক দেবে?'

'দেবে। মানুষকে এত অবজ্ঞা করো না। যাও, গাছতলায় একটা মাইক নিয়ে সবাইকে জড়ো করো। আমি ফোনটোন করে আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।' তারকদা উঠলেন।

জগন্ময় টিবি হাসপাতালে ভরতি হয়ে গেল। প্রথম দিনেই পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠেছে। তারকদার ফোনে কাজ হয়েছে। তারচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে বক্তৃতায়। পাড়ার এক প্রবীণ প্রধান শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তারকদা। তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, 'জাপান বাহরিন আমেরিকায় টিবি হয় না। কারণ তাদের টাকা আছে। ওখানে এইডস হয়, কারণ ওটা বড়লোকের রোগ। এ দেশের না খেতে পাওয়া মানুষদের টিবি হয়। দেশের নাগরিক না খেয়ে রোগে পড়ছে কিন্তু সরকারের মাথাব্যথা নেই। আজ জগার হয়েছে কাল আপনার হতে পারে। একে পেটে খাবার নেই তার ওপর চারপাশে ধোঁয়া, কুৎসিত আবহাওয়া। এর সঙ্গে লড়াই করতে হলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। তাই জগন্ময় জীবনরক্ষা প্রকল্পে উদার হাতে দান করুন। একটি টাকা দান মানে আপনি বিপদের দিনে একজন বন্ধু পাচ্ছেন।' খুব কাজ হয়েছে। গাছতলায় টেবিল পেতে ফেস্টুন লাগানো হয়েছে, 'জগন্ময় জীবনরক্ষা প্রকল্প।' ভোর থেকে রাত পর্যন্ত মাইক বাজছে হেডমাস্টার মশাইয়ের লিখিত বক্তৃতা উদ্ধৃত করে। যক্ষ্মার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে দলে-দলে মানুষ যে যার মতো দিয়ে যাচ্ছে। সেই টাকা নিয়ে সুনীল-কালোমানিকের দল টিবি হাসপাতালে ছুটছে দু-বেলা। আপেল আঙুরের সঙ্গে ওষুধ কিনে দিচ্ছে। ওষুধ পড়ার পর জগন্ময়ের মুখের চেহারা বদলেছে।

তৃতীয় দিনের সকালে কমলা এল বাচ্চাদের নিয়ে গাছতলায়। সুনীল তখন হাসপাতালে যাবে বলে হিসেব করছিল। কমলা বলল, 'আমরা দুইদিন খেতে পাইনি।'

'খেতে পাইনি মানে?'

'সে নেই, রোজগারও বন্ধ। যে বাড়িতে কাজ করি তারাও ফান্ডে টাকা দিয়েছে। বাজার করার পয়সা নেই। বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাতে পারছি না।'

কমলা চোখে আঁচল দিল।

কালোমানিক বলল, 'কিন্তু আমরা কী করব?'

কমলা ক্যাশবাক্সের দিকে তাকাল, 'ওর নামে তো টাকা উঠেছে!'

'আরে এটা জগার চিকিৎসার জন্যে, অন্য খাতে খরচ করার অর্ডার নেই।'

'সে ওই টাকায় ভালো হয়ে এলে দেখবে আমরা মরে গেছি না খেয়ে, সেটা ভালো হবে?'

আপেল আঙুর কেনা হয়েছিল। জগন্ময়ের বড় ছেলে আবদার ধরল সে আপেল খাবে। একজন তাকে ধমকাল। সুনীল শেষ পর্যন্ত দশটা টাকা এগিয়ে দিল, 'লোকে জানতে পারলে আমায় প্রশ্ন করবে, তবু দিচ্ছি। আর বিরক্ত করো না।'

তিনদিনে পনেরশো টাকা উঠেছে। ওরা ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতেই শুনল ডাক্তারবাবু ডেকেছেন। অবস্থা কি খারাপ হল? দুই বন্ধু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। জগাকে বাঁচাতেই হবে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি গম্ভীর হলেন, 'এই পেশেন্টকে নিয়ে যান।'

'কেন?'

'এখানে ওকে রাখা যাবে না।'

'আশ্চর্য! এটা টিবি হাসপাতাল, জগার টিবি হয়েছে, রাখা যাবে না কেন?'

'আমার অন্য পেশেন্টের স্বার্থেই রাখা যাবে না। পেশেন্টের সিফিলিস আছে, তা জানেন?'

সিফিলিস?' চমকে উঠল ওরা।

'ইয়েস। ট্রিটমেন্ট করিনি। খুব খারাপ অবস্থা। ওটা আগে সারিয়ে আনুন, তারপর টিবির চিকিৎসার জন্যে ভরতি করব।'

'দুটো চিকিৎসা এখানে হয় না?' সুনীল মিনমিন করল।

'না, হয় না।'

'সিফিলিসের কোনও হাসপাতাল আছে?'

'আমার জানা নেই। যান। রিলিজ করে দিচ্ছি।'

'যদি টিবিতে মরে যায়?'

'মরবে না। মরলে আগে সিফিলিসেই মরবে।'

অগত্যা জগন্ময়কে ধরে ধরে ওরা হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল। সুনীল খুব খেপে গেল, 'তুই শালা সিফিলিস বাধালি কী করে?'

জগা মুখ নামাল, 'জানি না।'

কালোমানিক বলল, 'মাল খেয়ে হুঁস থাকে না, কার না কার সঙ্গে—।'

জগা চিনচিনে গলায় বলল, 'তোরা যেখানে যেতিস সেখানেই গেছি।'

সুনীল চাপা গলায় বলল, 'তোর হয়েছে, আমাদের হল না কেন?'

'কার হয়েছে আমি জানব কী করে? হাসপাতালে না এলে তোরা জানতে পারতিস?'

'কিন্তু ডাক্তার বলল তোর অবস্থা খুব খারাপ!'

হঠাৎ কেঁদে ফেলল জগন্ময়, 'আমি কি করব! ধন্য কবিরাজ তো ওষুধ দিচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই কমছিল না। এসব কথা কি কাউকে বলা যায়?'

'সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটার নাম কী?'

জগন্ময় মাথা নাড়ল, 'জানি না।'

'দেখলে চিনতে পারবি?'

'হ্যাঁ।' যন্ত্রণা হচ্ছিল জগন্ময়ের। ওকে সিঁড়িতে বসিয়ে রেখে সুনীল ইশারায় বন্ধুদের অন্যদিকে সরিয়ে নিল। জগন্ময়ের মুখেও এখন দাগ ফুটে বেরিয়েছে। যতই গামছা জড়িয়ে বসে থাক, কদিনেই বোঝা যাবে।'

সুনীল জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করা যায়?'

কালোমানিক জবাব দিল, 'আর কি হবে, বাড়ি নিয়ে চল।'

সুনীল মাথা নাড়ল 'অসম্ভব। পাড়ার লোকেরা যদি জানতে পারে ওর সিফিলিস হয়েছে, তা হলে কি হবে বুঝতে পারছিস?'

কালোমানিক বলল, 'কী আর হবে? সিফিলিস তো সেরে যায়।'

'যায়, কিন্তু কেউ সিফিলিসের চিকিৎসার জন্যে সাহায্য দেয় না। পাবলিক ঘেন্না করে রোগটাকে। জগন্ময় জীবনরক্ষা প্রকল্প একদম ভোগে চলে যাবে। পয়সা ফেরত চাইতে পারে অনেকে। এখন ওর সিফিলিস সারাতে হবে, তারপর টিবি। অন্তত একবছর ধরে ফান্ড তুলতে হবে। কিন্তু খবরটা পাড়ায় পৌঁছলে সব খতম।' সুনীল গম্ভীর গলায় বলল।

কালোমানিক এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। তিনদিনে পনেরশো উঠেছে। খরচ হয়েছে চারশোর মতো। রোজ অবশ্য পাঁচশো করে উঠবে না, পঞ্চাশও যদি ওঠে একবছরে আঠারো হাজার। পুরো টাকাটা চোখের সামনে থেকে চলে যাবে? সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হবে গুরু?'

সুনীল বলল, 'ওকে অন্য কোথাও রাখা দরকার।'

' কোথায় রাখবে? একে টিবি তার ওপর সিফিলিস!' হাসল কালোমানিক, 'ওর বউ পর্যন্ত এখন আর ঘরে রাখতে চাইবে না।'

'কিন্তু আমাদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। যদ্দিন জগার টিবির চিকিৎসা হবে তদ্দিন—, তুই বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?' সুনীল আড়চোখে জগন্ময়কে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে কালোমানিককে মতলবটা খুলে বলল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ওদের ট্যাক্সিটা যেখানে পৌঁছল সেখানে এই প্রায় দুপুরেও দু-তিনজন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে। জগন্ময়কে ট্যাক্সিতে বসিয়ে রেখে সুনীল নামছিল কালোমানিক বাধা দিল, 'ওকে না নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। চেনা যাবে না।'

অগত্যা জগন্ময়কে নামানো হল। জগন্ময়ের মুখ এখন গামছায় মোড়া। ধরে-ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে। টালির বস্তি। সস্তার বারবণিতারা এদের দেখে উঁচুগলায় ডাকাডাকি করছিল। সুনীল জগন্ময়কে জিজ্ঞাসা করল, 'এদের মধ্যে কেউ?'

গামছা সরিয়ে জগন্ময় পিটপিট করে তাকাল। সব মুখ একরকমের মনে হচ্ছিল তার। সে মাথা নাড়ল। কালোমানিক ধমকাল, 'ঠিক করে দ্যাখ, এখানেই আসতিস তো?'

গামছা সরানো মাত্র একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও সুধা, দ্যাখ তোর পাখি এসেছে।'

সুধা নামের মেয়েটি তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ক্ষয়াটে চেহারা। চোখমুখ বসা। কিন্তু মাথার চুল চকচকে! চিঁচিঁ গলায় জগন্ময় বলল, 'ওই যে।'

ওরা জগন্ময়কে নিয়ে সুধার ঘরে ঢুকল! একটা তক্তাপোশ, আলনা, আয়না। একপাশে কাপড়টানা। সম্ভবত রান্না হয় সেখানে। জগন্ময়কে তক্তাপোশে বসিয়ে কালোমানিক ঘুরে দাঁড়াল, 'তোমার রোগ আছে?'

'একি কথা মাইরি! ঘরে ঢুকে বদনাম দিচ্ছ!' সুধা খিঁচিয়ে উঠল।

'সত্যি কথা বল, নইলে এক চড়ে ঘাড় ভেঙে দেব।' কালোমানিক চিৎকার করল।

সুধা পিটপিটিয়ে তাকাল, 'আমার যাই থাকুক, তোমাদের কী?'

'আমাদের এই বন্ধু তোর কাছ থেকে অসুখ পেয়েছে।'

'ইল্লি আর কি! কচি খোকা! প্রমাণ আছে যে আমার কাছ থেকে পেয়েছে?'

সুনীল এগিয়ে এল, 'কথা বাড়াচ্ছিস কেন? শোন সুধা, এখন থেকে তোর কাছে জগা থাকবে।'

'মানে? থাকবে মানে?'

'থাকবে। তুই খেতে দিবি। তোদের পাড়ায় তো ওইসব অসুখের চিকিৎসা জানা ডাক্তার আছে, তাদের দিয়ে চটপট ওকে সারিয়ে ফেলবি। এর জন্যে যত টাকা লাগে আমরা দেব।' সুনীল বলল।

'টাকা দেবে?' সুধা জগন্ময়ের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। তুই না বললে তোর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। ওর যে অসুখ আছে তাতে তো তোর কোনও ভয় নেই। হিসেব করে বল কত টাকা লাগবে?'

'বলছ যখন তখন আমার আপত্তি কি! কিন্তু ও থাকলে আমার ব্যবসা চৌপাট হয়ে যাবে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেবে তো?'

'না।'

'তা হলে?'

'তোর ওই পরদার ওপাশে ওকে রেখে দিবি না হয়। এই নে, দুশো টাকা রাখ। আজই ডাক্তার ডাকবি। কালোমানিক এসে আবার তোকে টাকা দিয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার, পাড়ার কেউ এলে ওর কথা বলবি না, মনে থাকে যেন।' সুনীল শাসাল।

*

টিবি হাসপাতালে জগন্ময় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাকে বাঁচাবার জন্যে উদার হাতে অর্থসাহায্য করুন। জগন্ময় জীবনরক্ষা প্রকল্পের শরিক হন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা মাইকে ওরা যে আবেদন করে যাচ্ছিল তাতে দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে আর তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বড়জোর তিরিশ-চল্লিশ উঠেছিল। মাইকটা সুনীলের নিজের তাই হাল ছেড়ে দেয়নি ওরা। এই টাকাই বা কে দেয়! তৃতীয় সপ্তাহের সকালে ওরা মাইকে আবেদন করছে তখন দেখা গেল রিকশা থেকে সুধা নামছে। নেমেই তেড়ে এল। আবেদন বন্ধ করে কালোমানিক রেগে কাঁই, 'তুই এখানে এসেছিস কেন?'

'আসব না? তোমরা ঠগ, জোচ্চোর, আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

মহিলা কণ্ঠের চিৎকার শুরু হলে বস্তির মানুষ পুলকিত হয়ে শুনতে আসে। আজও সবাই ভিড় জমাল। কালোমানিক বেগতিক দেখে সুধাকে সরাতে চাইল, 'ঠিক আছে, কি বলতে চাস আমাকে আলাদা বল। ওঠ রিকশায়।'

প্রায় জোর করেই ওকে রিকশায় তুলল কালোমানিক। পাড়ার বাইরে আসতেই রিকশা দাঁড় করাল সুধা, 'তোমরা আমাকে ঠকিয়েছ। জগার শুধু আমাদের অসুখ হয়নি, ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তারবাবু বলল টিবি। তোমরা চেপে গিয়েছিলে।'

'আঃ, টিবি তো কি হয়েছে!'

'কী হয়েছে মানে? কী ছোঁয়াচে রোগ! খবর শুনে সব্বাই আমাকে দুষতে লাগল। কারও যদি টিবি হয় তো নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে আমাকে।'

'বাঃ, টিবি কি সিফিলিসের চেয়ে খারাপ অসুখ?'

'ওসব জানি না। ওকে নিয়ে এসেছি। ওই রিকশায় পড়ে আছে। তুমি নামো, আমি চললাম। ডাক্তারবাবু বলেছে ফিনাইল দিয়ে ঘর ধুতে। এই জন্যে বলে, কারও উপকার করতে নেই।'

কালোমানিককে নামিয়ে সুধা রিকশা নিয়ে চলে গেল। ফাঁপড়ে পড়ল কালোমানিক। সুনীলটা ধারেকাছে নেই। মুখে গামছা জড়িয়ে রিকশায় পড়ে আছে জগা। শালা আর রক্ত তোলার সময় পেল না। হাসপাতালের ওষুধে যে কাজ হয়েছিল তাতেই এতদিন চাপা ছিল। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার নইলে ফান্ড বন্ধ হয়ে যাবে। রিকশাওয়ালাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে সে পাড়ায় এল। মাইক বন্ধ। সে সোজা কমলার ঘরে পৌঁছে গেল, 'একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'মরে গেছে? কমলা আঁতকে উঠল।

'না, না। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।'

হাসি ফুটল কমলার মুখে, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' কালোমানিক বাচ্চাগুলোর দিকে তাকাল। 'ওর যৌন রোগ হয়েছে।'

কমলা বোকা হয়ে গেল, 'মানে?'

কালোমানিক চোখ সরাল, 'জগা খারাপ পাড়ায় যেত। সেখানে রোগ পেয়েছে।'

কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল কমলা। তার দশ মিনিটের মধ্যে জগন্ময়কে প্রায় পাঁজাকোলা করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল ওর নিজের ঘরে। মাইক বন্ধ হল, ক্যাশবাক্স উধাও। আর হাওয়ার আগে খবর ছড়িয়ে গেল মহল্লায়। ছি-ছি শব্দ ছিটকে বেরুতে লাগল মানুষের মুখ থেকে। তক্তাপোশে শুয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে ছিল জগন্ময়, এবার কাতরাতে লাগল। বোঝা যাচ্ছিল তার যন্ত্রণা বাড়ছে। বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের কোণে দাঁড়ানো কমলা স্বামীকে দেখছিল, হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'তুমি এদের বাপ?'

জগন্ময় জবাব দিল না।

'মুখ ঢাকা। তুমি যে এদের বাপ তা বুঝব কী করে?'

চিঁচি গলায় কথা শোনা গেল, 'কমলি আমাকে বাঁচা।'

'বাঁচাব? যারা এতদিন আহা বলত তারা ছ্যা-ছ্যা করছে। মদ গিলে সে পাড়ায় যাওয়ার সময় মনে ছিল না? কী খেয়েছ সকাল থেকে?

'কিছু না।' কথা শুনতে হলে কান পাততে হয়।

'বাচ্চাদের জন্যে একটু মুড়ি ছিল, খাবে?'

ক'দিন ধরে গাছতলায় খুব গুলতানি চলল। একইসঙ্গে টিবি আর সিফিলিসের রুগিকে বস্তির মধ্যে রাখা ঠিক কিনা। এতদিন ধরে যে টাকা উঠেছে তার কি হবে। এই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার শিকার একটি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে সবাই উদার হাতে দান করেছিল, কিন্তু সেই মানুষই এমন ঘৃণ্য রোগ বাঁধিয়ে বসে আছে যখন তখন আর কোনও সহানুভূতি পেতে পারে না। কিছু একটা করা দরকার। কেউ-কেউ বলছে টাকাগুলো কমলাকে দেওয়া হোক বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্যে। জগা তো আজ নয় কাল মারা যাবেই।

সুনীলরা গেল তারকদার কাছে। তারকদা বললেন, 'এই হল ভবিতব্য। মানুষ লড়বে কার জন্যে? ঠিক সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া অভ্যাস কিলবিলিয়ে ঢুকে যাবে।'

সুনীল বলল, 'ওই রোগ তো গরিবদেরই হয়।'

'কিন্তু এনেছিল বড়লোকরা। এই দ্যাখো জগন্ময়ের লড়াইয়েব সূত্র ধরে জনগণকে এক করলে তোমরা সেই ঐক্যে ভাঙন ধারনোর জন্যে এই রোগ চলে এল। তা এখন কী করতে চাও?'

'খুব বদনাম হয়ে যাচ্ছে। লোকে ফান্ডের টাকা ফেরত চাইছে।'

'ফেরত চাইলেই হল?'

'চাইছে তো। বলছে টিবির জন্যে দিয়েছি সিফিলিসের জন্যে নয়।'

'তা ঠিক।'

'আপনি একটা উপায় বলুন। জগাকে সামনে রেখে তো আর কিছু করা যাবে না।'

তারকদা সুনীলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'কে বলল?'

'ওর নাম শুনলেই পাবলিক খেপে যাচ্ছে। বস্তিতে রাখতে চাইছে না।'

'ঠিকই তো। ওকে বাইরে বের করে আনো।'

'মানে?'

'ওর চেহারা কেমন এখন?'

'মুখ ঢেকে রাখে। হাঁটতে পারে না।' সুনীল জানাল।

কালোমানিক বলল, 'মুখজুড়ে ঘা হয়ে গেছে।'

তারকদা খুশি হলেন, 'খুব ভালো। জগার টিবি তোমাদের সেলিং প্রোডাক্ট ছিল। যেমন ধরো আঙুর। বিক্রি হয়। শুকিয়ে গেলে কিসমিস। তাও বিক্রি হচ্ছে। তোমরা জগাকে অস্বীকার করো। বলো ও তোমাদের প্রতারণা করেছে। শুধু তোমাদের নয়, বউ ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে দরিদ্র জনসাধারণকে প্রতারণা করেছে। এরকম করলে শাস্তি পেতেই হবে। সেই শাস্তি কি তা সাধারণ মানুষ নিজের চোখে দেখে যাক। দেখে শিক্ষা নিক। আর এই দেখার জন্যে তোমরা মাথাপিছু কুড়ি পয়সা চাঁদা নিতে পারো যা ওর পরিবারকে দেওয়া হবে। বুঝলে?'

কালোমানিক মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারেনি।

'তোমাদের গাছতলায় ডেকোরেটারকে দিয়ে একটা টেম্পোরারি ঘর বানিয়ে তার ভেতরে মাচা তৈরি করে জগাকে শুইয়ে দাও। পয়সা দিয়ে লোকে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওর চিকিৎসা?'

'টিবির ওষুধ খাওয়াও। কয়েকমাসের বেশি কোনও ফসলের সিজন থাকে না।'

'সুনীল হাতজোড় করল, 'ওর বউ যদি না আনতে দেয়?'

'সেটা তোমাদের কপাল।'

'তারকদা, আপনি—আপনি গ্রেট!' সুনীল বলে ফেলল।

পাড়ার মানুষ প্রথমে বুঝতে পারেনি। ডেকোরেটারের লোকজন বাঁশ পুঁততে হরিপদ আপত্তি করছিল। নিবারণও। কেউ ওদের কথা শোনেনি। সুনীল এসে বলেছিল, 'হরিদা, এখন তোমার যা বিক্রি তার চারগুণ হবে, তোমার দোকান আড়াল করছি না।'

বেশ মজবুত ব্যবস্থা হয়ে গেলে সুনীল কমলাকে ডেকে বোঝাল, 'সবাই আপত্তি করছে। পঞ্চাশ টাকা রাখো। জগাকে একটু খোলা হাওয়ায় রাখা দরকার। অবশ্য পাড়ায় যদি না থাকতে চাও তো ওকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারো।'

কালোমানিক বলেছিল, 'ডেইলি দশ করে পাবে কথা শুনলে।'

অতএব আর আপত্তি ওঠেনি। মাঝরাত্রে ওরা বাঁশের খাটিয়ায় চাপিয়ে জগন্ময়কে গাছতলার ঘরে নিয়ে এল। জগন্ময় চিঁচিঁ করে আপত্তি জানাল। সুনীল গম্ভীর গলায় বলল, 'একদম চুপ। তুই বিখ্যাত হয়ে গেছিস এখন। হাজার-হাজার মানুষ তোকে দেখতে আসবে। উত্তমকুমার মরে গেলে যেমন দেখতে গিয়েছিল।'

পরদিন ভোর থেকে মাইক বাজল। 'আসুন-আসুন, দলে-দলে আসুন, পাপের বেতন কি তা নিজের চোখে দেখে যান। ভগবান কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। এই জীবনে পাপের শাস্তি মরার আগেই পেতে হয়। নিজের ছেলেমেয়ে বউকে বঞ্চিত করে শুধু লালসা মেটাতে গিয়ে মানুষের কি হাল হয় নিজের চোখে দেখে যান। দর্শনমূল্য মাত্র কুড়ি পয়সা। আসুন, আসুন, মরে যাওয়ার আগে দেখে যান।'

একটু-একটু করে ভিড় জমল। সন্ধের মুখে বিশাল লাইন। চার হাত দূর থেকে জনসাধারণ দেখল সারা গায়ে দগদগে ঘা নিয়ে জগন্ময় পড়ে আছে। উঃ কী বীভৎস! রাত দশটায় দরজা বন্ধ হলে দেখা গেল আটশো টাকা উঠেছে। কালোমানিক হাসতে-হাসতে দশ টাকা পৌঁছে দিয়ে এল কমলার হাতে।

লিফলেট ছাপানো হল। তাতে একটি বীভৎস ছবি। ওপরে লেখা পাপের শাস্তি নিজের চোখে দেখে যান।

মানুষের ভিড় কমছে না। কমলা বা তার বাচ্চাদের এদিকে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় রাত্রে কমলা আর পারল না। চারধার ফাঁকা হয়ে গেলে সে কালোমানিকের পায়ে পড়ে গেল, 'আমাকে একবারটির জন্যে ওকে দেখতে দাও।'

'কী হবে দেখে?' ওরকম বীভৎস স্বামীকে দেখার কী দরকার?'

'আমি ওর মুখে থুতু ফেলব।'

'কী? কালোমানিক চমকে উঠল।

'হ্যাঁ। বেঁচে থেকে আমাকে জ্বালিয়েছে, এখন আধমরা হয়ে জ্বালাচ্ছে।'

শুধু থুতু ফেলবে আর চলে আসবে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, রাত একটার সময় এসো। তখন হরিদার সিগারেটের দোকানও বন্ধ হয়ে যাবে।'

কমলা গেল না, দূরের রকে বসে রইল। তার হাড়জিরজিরে শরীর নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু

একটা বাজতে না বাজতেই সে উঠে দাঁড়াল। সময় আন্দাজে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা এখন তার আয়ত্তে। সে পা বাড়াল।

চারপাশ নিস্তব্ধ। পাড়ার মানুষজন ঘুমোতে গিয়েছে। কালোমানিকরা দরজা বন্ধ করে একজনকে পাহারায় রেখে গিয়েছিল। সে কমলাকে দেখে বলল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে।!'

কমলা মাথা নাড়ল। ছেলেটা দরজা খুলে দিল। ভেতরটা অন্ধকার।

'আলো নেই?' কমলা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল।

'আলোর কি দরকার? যা শরীরের অবস্থা, আলোয় দেখলে তুমিই কষ্ট পাবে।' ছেলেটি ছোট্ট করে হাসল। তারপর একটা টর্চ এগিয়ে দিল, 'নাও, এটা নিয়ে যাও।'

কমলা টর্চ জ্বালাল। সামনে দর্শকদের বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা। বাঁ-দিকে মোটা বাঁশের রেলিং। রেলিং-এর দু'হাত দূরে মাচার ওপর জগন্ময় শুয়ে আছে। পেটের নিচ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একটা কাপড় ছড়ানো। কমলা ধীরে-ধীরে রেলিং-এর নিচ দিয়ে উবু হয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি এল। এই তার স্বামী? নাক মুখ বীভৎস রকমের ফোলা। লালচে দাগ কানের পাশে। চোখ বন্ধ। আলো নিচে নামাল কমলা। সারা গায়ে চাকা-চাকা দাগ।

'খুব খিদে পেয়েছে।' জগন্ময়ের মুখ থেকে চিঁচিঁ শব্দ বের হল।

'এরা খেতে দেয় না?'

'দু'বারের বেশি দেয় না।'

'দু'বার? তোমার ছেলেমেয়ের তো একবারও জোটে না!'

'কমলি, আমাকে বাঁচা। আমি মরে যাব। এত থুতু দেয় লোকে! কমলি রে!'

'থুতু দেয়?'

'হ্যাঁ। উঃ মরে গেলাম, কি ব্যথা!' গোঙাতে লাগল জগন্ময়।

কমলা ওর বুকে আলো ফেলল। এত ঘা এই কদিনে কী করে বের হল? সে জগন্ময়ের শরীরে চাপা দেওয়া কাপড়টার কোণ দিয়ে ঘায়ের ওপর চাপ দিতে সেটা উঠে গেল। একটু-একটু করে সারা শরীরের নকল ঘা তুলে ফেলল কমলা। পরিষ্কার চামড়া বেরিয়ে এসেছে। এবার মুখের দাগ মুছতে যেতেই কাশির দমকে মাথা তুলল জগন্ময়। তারপর ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। সেই রক্তে সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেল তার। রক্ত পড়ল কমলার শাড়িতে, পায়ে।

টর্চটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে। দু'হাত বাড়িয়ে শূন্য ধরার চেষ্টা করতে-করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কমলা।

মিনিট পনের বাদে পাহারাদার ছেলেটি দেরি হচ্ছে দেখে ভেতরে পা বাড়াল। মাটির সমান্তরাল টর্চের আলো ধাক্কা মারছিল কমলার অজ্ঞান হয়ে থাকা দুই পায়ে। জোড়া পা দুটো টকটকে লাল, আলোয় আরও লাল হয়ে উঠেছে।

এমন দৃশ্য ছেলেটি কখনও দেখেনি। সে লাফিয়ে উঠল। তারপর পাঁই-পাঁই করে ছুটল সুনীলকে খবর দিতে। এই দৃশ্য দেখালে আরও বেশি দর্শক আসবে। একজনের জন্যে কৌতূহল বেশিদিন থাকে না। সে মনে-মনে আগামীকালের মাইকের ঘোষণার খসড়া তৈরি করছিল, 'আসুন, আসুন, জোড়া মানুষ লালে লাল, পতির পাপে সতীর শাস্তি দেখে যান, কুড়ি পয়সা, কুড়ি পয়সা!'



কালরাত্রি

টিফিনের সময় ক্লাসে কেউই থাকে না। কাত্যায়নী টিফিনের বাক্স বের করে সুবর্ণাকে ডাকল, 'আয় ভাই, টিফিনটা সেরে নিই।'

সুবর্ণা তার ঝোলা থেকে একটি সুদৃশ্য কৌটো বের করল, 'এখানে না খেয়ে মেয়েদের কমনরুমে চল। সেই হাঁদাকান্ত প্যাটপেটিয়ে চেয়ে আছে।'

কাত্যায়নীর মুখে গরম হাওয়া লাগল, 'দেখুক। এটা আমাদের ক্লাস, আমরা খাব।'

দুই সুন্দরী যখন মনোযোগ দিয়ে আহার শুরু করতে যাচ্ছে তখন কিঞ্চিৎ দূরে বসা শ্যামাকান্ত আর পারল না। তার বুক কেঁপে উঠল এবং দুই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে বাতাস বেরিয়ে এল। ক্লাসরুমে একটা চমৎকার গন্ধ পাক খাচ্ছে। সেই গন্ধ যেন শ্যামাকান্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আঘাত শুরু করল। শ্যামাকান্ত উঠল। তার শরীর বলবান কিন্তু সেই সঙ্গে মেদের আধিক্য থাকায় বেশি ভারী দেখায়। প্রথমে সে প্যান্ট-শার্ট পরত। ইদানীং এক বন্ধুর পরামর্শে ধুতি পরে। মধু যেমন মৌমাছিকে টানে শ্যামাকান্ত সেই মতো হাজির হল সুন্দরীদের সামনে। আর তখনই কাত্যায়নী বলে উঠল, 'এই রে সেরেছে!'

সুবর্ণা মুখ তুলে তাকালেই শ্যামাকান্ত বলল, 'বড় মিষ্টি গন্ধ। আমাদের বাড়িতে তো আর এসব হয় না! গন্ধে-গন্ধে চলে এলাম।'

কাত্যায়নী মুখঝামটা দিল, ' কেন হয় না?'

'কে করবে? আমাদের বাড়ি তো মরুভূমি।'

'মরুভূমি মানে?'

'বলছি। ওটা বুঝি ডিমের ডেভিল?' আঙুল বাড়িয়ে সুবর্ণার কৌটো দেখাল শ্যামাকান্ত।

সুবর্ণা হকচকিয়ে গেল, 'আপনি খাবেন?'

ডিম আমার প্রিয়। খুব প্রিয়। আমি প্রায়ই ডিমের স্বপ্ন দেখি। সার-সার ডিম, নাদুসনুদুস, নিটোল। আমি ডিমের ওপর শুয়ে আছি—।'

'আপনি শুলে কোনও ডিমই আর আস্ত থাকবে না।' কাত্যায়নী মুখ ফেরাল।

সুবর্ণা একটু ইতস্তত করে ডিমের ডেভিল তুলে দিল শ্যামাকান্তর হাতে। খাদ্যদ্রব্য একটি মানুষের মুখ কতটা প্রফুল্ল করতে পারে এর আগে সে জানত না। শ্যামাকান্ত চিবোতে-চিবোতে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'নুনটা একটু কম কিন্তু জিনিসটা জম্পেশ।'

কাত্যায়নীর যেন একটু কৌতুক বোধ হল। সে একটা বড় 'আবার খাব' সন্দেশ এগিয়ে দিল, 'মরুভূমির কথা কি যেন বলছিলেন?'

ততক্ষণে সন্দেশ চালান হয়ে গেছে। শ্যামাকান্তর দুই চোখ আবেগে বুজে আসছিল, 'কেউ নেই। শুধু বাবা দাদারা আর আমি। আমরা সবাই মা-মরা। বোনও নেই। রান্না করে হরিদা। পোস্তর ঘ্যাঁট আর ভাত। থার্ড আইটেম জানে না। মাছ আসে না বাড়িতে, জানেন?'

'সেকি? কেন?' সুবর্ণার ঠোঁট থেকে শব্দ দুটো ছিটকে এল।

'বাবা বলেন তিনি মরলে মা বিধবা হতেন। মা কি তখন মাছ খেতেন? খেতেন না। এখন

মা নেই তাই বাবা সেই অনারে মাছ খাবেন না। মেজদা ঠাট্টা করে বলে, বাবার নিশ্চয়ই অল ইন্ডিয়া বিধবা অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হওয়ার ইচ্ছে।'

কাত্যায়নী ফোঁস করল, 'ইসস।'

'আর কি বলব! বাড়িতে রোজ ভোরে চিরতার জল, দুটি বিস্কুট এবং হরলিক্স, নো চা। তারপর ফল, ফলের রস। তারপর পোস্ত অ্যান্ড ভাত—! আর একটা মিষ্টি হবে?' কথা বলতে-বলতে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ায় সুবর্ণা প্রথমে ধরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নিজের সন্দেশ তুলে দিল সে শ্যামাকান্তর হাতে।

শ্যামাকান্ত বলল, 'আমার না, কারও সঙ্গে এখনও ভাব হল না। নতুন ক্লাস তো।'

কাত্যায়নী জানতে চাইল, 'আপনি বাড়ি থেকে টিফিন আনেন না কেন?'

' কে করে দেবে? হরিদা টাইম পায় না। বাবা রোজ একটা করে টাকা দেয়, তা সেটা কলেজে আসার আগেই শেষ হয়ে যায়। এক টাকার কোনও দাম আছে, বলুন?'

দুই সুন্দরী স্বীকার করতে বাধ্য, না নেই।

পরদিন কলেজে বের হওয়ার আগে সুবর্ণা তার মাকে বলল, 'মা আজ টিফিন একটু বেশি করে দিও।'

'কেন রে?'

'আর বলো না। আমাদের ক্লাসে এক হাঁদাকান্ত আছে, খাওয়ার সময় এমন জুলজুল করে চেয়ে থাকে না যে খাওয়া যায় না।'

'সেকি? চেয়ে থাকে কেন?'

'কাল আমার সব খাবার খেয়ে নিয়েছে। মা বেঁচে নেই। বোধহয় পেটুক।'

সুবর্ণার ছোটবোন শুনছিল, বলে উঠল, 'ওর সামনে খাস কেন? অন্য জায়গায় গিয়ে খেতে পারিস না? হাঁদাকান্ত ওর সত্যিকারের নাম?'

সুবর্ণা হাসল, 'কাত্যায়নী ওকে তাই বলে। হাঁদা নয়, শ্যামা—শ্যামাকান্ত।'

সুবর্ণারা থাকে মফস্বলে। বালিব্রিজ পেরিয়ে গেলেই তো মফস্সল। সেখানকার মানুষ শ্যামবাজারে যাওয়ার সময় এখনও বলেন কলকাতায় যাচ্ছি। তাকে কলেজে আসতে হয় রীতিমতো পরিশ্রম করে। দু-বার বাস পালটাতে হয়। কাত্যায়নী থাকে বাগবাজারে। নতুন কলেজে এই দুজনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। পরদিন টিফিনের সময় শ্যামাকান্তকে আর ডাকতে হল না। কৌটো খোলার আগেই সে সটান চলে এল। কাত্যায়নী বলল, 'আজ আবার কী মনে করে?'

'বাঃ, কাল বলে দিলাম না—।' শ্যামাকান্ত বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ নয়।

সুবর্ণা হেসে বলল, 'আপনি খুব খেতে ভালোবাসেন, না?'

'খুউব। তবে একেবারে বেশি নয়। একটু-একটু করে। দু-তিন ঘন্টা পরপর খিদে পেয়ে যায় আমার। কী আছে আজ?'

সুবর্ণার কৌটোয় যদি ডিমের ওমলেট বের হল তো কাত্যায়নী একদম ডিমসেদ্ধ, নুন মরিচ মাখানো। সুবর্ণা লক্ষ করল ডিম দেখামাত্র শ্যামাকান্তর চোখ চকচক করে উঠল। একটা অপার্থিব খুশি ফুটে উঠল তার মেদজমা মুখে। যেন পৃথিবীর জাগতিক সুখ-দুঃখের বাইরে চলে গেছে সে এই মুহূর্তে। ঘাড় কাত করে বলল, 'দুজনেই ডিম। এত খাওয়া যায়? দিন, একটু-একটু করে খাই।'

দুই সপ্তদশী দেখল একটি মানুষের তৃপ্তি কিসে হয়। শ্যামাকান্তর চোখ বন্ধ, দুই চোয়াল নড়ছে। কাত্যয়নী জিজ্ঞাসা করল, 'বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়েছেন?'

শ্যামাকান্ত সেই অবস্থায় ঘাড় নাড়ল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, 'গিরিশ ঘোষের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের গলিতে একটা দোকান আছে। সেখানে যা রসগোল্লা করে না। অনেকদিন খাইনি।'

'ওটা আমাদের পাড়া।' কাত্যায়নী সগর্বে জানাল।

'তাই? একদিন আনবেন তো!'

'ইস! রসগোল্লা বয়ে আনব! খেতে হলে যেতে হবে।'

'যাব। কবে যাব? আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই।'

কাত্যায়নী খিলখিল করে হেসে উঠল। সুবর্ণার মনে হল ছেলেটি সত্যি সরল। কিন্তু খাওয়া ছাড়া সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের অন্য কোনও আকাঙ্খা থাকবে না এ কেমন কথা! সেইসঙ্গে কাত্যায়নীর ঝরনা হাসি তাকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর করল। পয়সা নেই শুনে অত হাসির কি আছে?

বাগবাজারের পথটুকু শেষ হতে সময় লাগল না। কলেজ শেষ হলে সুবর্ণা বেশি দেরি করে না বাড়ি ফিরতে, আজ কাত্যায়নীর চাপে এল। গিরিশ ঘোষের বাড়ির কাছে সেই মিষ্টির দোকান দেখে হতভম্ব হল সে। কাত্যায়নীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল এই জীর্ণ দোকানটিকে সে আগে দ্যাখেনি। কিন্তু সারা রাস্তা বকর-বকর করতে-করতে আসা শ্যামাকান্ত বলল, 'হেঁ-হেঁ, এদের রসগোল্লা যেমন তুলতুলে তেমন টাইট। মুখে দিলেই টের পাবেন।'

মিষ্টিতে মেয়েদের সচরাচর আগ্রহ হয় না। দুই সপ্তদশী শ্যামাকান্তর অনুরোধ রাখতে পারল না। এক ডজন রাসগোল্লা খেয়ে শ্যামাকান্ত বলল, 'আজ এই অবধি থাক। বেশি খেলে স্বাদটা ঠিক পাওয়া যায় না।'

কাত্যায়নীর বাড়ি বেশি দূর নয়। সুবর্ণাকে শ্যামবাজার থেকে বাস ধরিয়ে দিতে শ্যামাকান্ত হাঁটছিল। হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'নকুড়ের সন্দেশ খেয়েছেন?'

ঘাড় নাড়ল সুবর্ণা, 'না।'

'আঃ, ফার্স্ট ক্লাস! কিন্তু বড্ড দাম।'

'কত করে?'

'দু-টাকা আড়াইটাকার নিচে কড়াপাক মুখে দেওয়া যায় না।'

'আপনি বুঝি খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন?'

'কেন, একথা মনে হল কেন?'

'বয়সের তুলনায় আপনি বেশি মোটা, আর সবসময় মিষ্টি-মিষ্টি করছেন!'

'তা যদি বলেন আমি ঝালটাকেও বেশ ভালোবাসি। ওই যেমন শ্যামবাজারের মোড়ে একটা কষা মাংসের দোকান আছে, দারুণ! গ্রে স্ট্রিট আর সেন্টাল এভিন্যুর মোড়ে একটা দোকানে চিংড়ি মাছের ফ্রাই করে। খেলে মুখ জুড়িয়ে যায়। তারপর ধরুন বৌবাজারে—।'

সুবর্ণা তাকে থামিয়ে দিল, 'থাক। এটুকু বুঝেছি কলকাতায় যেখানে ভালো খাবার পাওয়া যায় তার সব হদিশ আপনি জানেন। আমি তো থাকি বালিতে। সেখানে কি ভালো পাওয়া যায় বলুন তো?'

শ্যামাকান্ত ঘাড় চুলকাল। বালির খবর তার জানা নেই। সে বলল, 'ঠিক আছে। দুদিন সময় দিন। তবে ভালো জিনিস না হলে বলব না।'

শ্যামাকান্তের পরিবারের সর্বসময় কর্তা তার পিতা কৃষ্ণকান্ত। পাকানো চেহারার এই মানুষটির জীবিকা ওকালতি। চারটি সন্তান হওয়ার পর স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেননি। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে সন্তানদের মানুষ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁর পরিবারে বেশ কিছু নিয়ম আছে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অনাগ্রহ তাঁর একটি। বড় তিন ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কিংবা হতে চলেছে। তাদের বিয়ে দেওয়ার কথা এখনও ভাবেননি কৃষ্ণকান্ত। ছেলেরাও বাবাকে ভক্তি এবং ভয় করে। কৃষ্ণকান্তর একমাত্র দুশ্চিন্তা কনিষ্ঠ শ্যামাকান্তকে নিয়ে। পড়াশুনায় মতি নেই। ইংরেজি কিংবা ইকনমিক্সের বদলে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভরতি হয়েছে। ভবিষ্যৎ ঝরঝরে। কলেজের ক্লাস শেষ হলেই বাড়ি ফিরে

আসার কথা, কিন্তু সে প্রায়ই দেরি করছে। এবং চাকর হরি তাকে জানিয়েছে শ্যামাকান্ত বৈকালিক জলযোগ বাড়িতে করতে চায় না। পি সি রায় বলেছিলেন, মুড়ি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু। শ্যামাকান্ত কিছুদিন হল সেই মুড়ি স্পর্শ করছে না। অথচ পেটুক এই ছেলেটি উপবাসে থাকার পাত্র নয়— এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত কৃষ্ণকান্ত। তাঁর কেবলই মনে হয় শ্যামাকান্ত মায়ের ধাত নিয়ে জন্মেছে। যখন বেঁচে ছিল তখন নিয়ত কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে ঝগড়া করত। মরে গিয়ে সে তাকে টাইট দিয়ে গেল। কিন্তু কে কাকে টাইট দেয়!

মা-মরা ছেলেটির ওপর সুবর্ণার মায়ের বেশ স্নেহ পড়েছে। মেয়েকে তিনি ধমকেছেন, একটু না হয় খেতে ভালোবাসে তাই নিয়ে অত ঠাট্টা কিসের! নিজের হাতে শ্যামাকান্তকে লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে বলেছিলেন, 'সময় পেলেই এসো বাবা।'

খুব খুশি হয়েছিল শ্যামাকান্ত। সুবর্ণাকে বলেছিল, ' তোমার চেয়ে তোমার মা অনেক বেশি ভালো। ঠিক মা-মা ভাব।'

সুবর্ণা চোখ তুলেছিল ওপরে, 'ওমা, এই যে আপনাকে সারা কলকাতায় ঘুরে-ঘুরে চপ কাটলেট ফ্রাই মিষ্টি খাওয়াচ্ছি তার কোনও মূল্য নেই, না?'

'তা বলিনি, তা বলিনি।' শ্যামাকান্ত ঢোঁক গিলল।

'আর কি বলতে বাকি রেখেছেন। কাত্যায়নী আজকাল আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, জানেন?'

'কেন, কেন? কথা বলে না কেন? এই তো পরশু, তোমাকে ফড়েপুকুরের দই খাওয়াল। বাসস্টপে দেখা হতেই বলল, কী খাবেন? তা ওখানে তো দই ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।'

'আপনি দই খেলেন?' সুবর্ণা আঁতকে উঠল, 'কেন, আমাকে বললে আমি দই খাওয়াতে পারতাম না? সারারাজ্য ঘুরে-ঘুরে কত কী খাওয়াচ্ছি আর সামান্য দই পেয়ে তা-ই খেতে যাওয়া হল! ছি-ছি-ছি! যান আর আপনাকে আমি কিছু খাওয়াব না।'

'কিন্তু কাতু তো আপনার বন্ধু।'

'ইস, আবার কাতু বলা হচ্ছে আদর করে। না, খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনও বন্ধুটন্ধু নেই। খাওয়ানো ইজ খাওয়ানো। ওকে কাতু বললেন, আমাকে কী বলে ডাকবেন?' তীব্র গলায় জিজ্ঞাসা করল সে।

'কি বলে, সুবর্ণা! না, না। সুবু! সুবু! ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। কী কথা হল?'

'এই খাওয়া-দাওয়ার কথা। খিদিরপুরে—। ওই যাঃ, আপনাকে একটা কথা বলতে খুব ভুলে গিয়েছিলাম! বলব?'

'কী?'

'দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে নেমেই একটা দোকান পাবেন। চমৎকার ছানার জিলিপি করে। এরকম ছানার জিলিপি জীবনে খাননি।'

সুবর্ণা ঘাড় কাত করে তাকে দেখল। তারপর বলল, 'চলুন। আপনাকে আজ ছানার জিলিপি খাওয়াব। তারপর হেঁটে বালিব্রিজ পেরিয়ে বাড়ি ফিরব।'

এক ডজন ছানার জিলিপি কম নয়। সুবর্ণা দেখল শ্যামাকান্তর সেটা শেষ করতে বিলম্ব হল না। সে নিজে একটির বেশি খেতে পারেনি। এত মিষ্টি যে শরীর গুলিয়ে ওঠে। খাওয়া শেষ হলে ওরা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে সুবর্ণা বলল, 'আপনি এত খবর পান কি করে, কোথায় কি আছে—।'

'এইটেই তো আসল কথা। পেতে হয়।' শ্যামাকান্ত হাসল।

'আচ্ছা কাত্যায়নী আর আমি—কে বেশি ভালো?'

'আপনি।'

'কেন?' সুবর্ণার বুকের রক্ত চলকে উঠল।

'আপনি রোজ আমায় খাওয়ান। মাসিমা কি ভালো খাবার করেন।'

বালিব্রিজের ওপর ওরা দাঁড়াল। পাশাপাশি। রেলিং-এ হাত রেখে সুবর্ণা ঝুঁকে নদী দেখছিল। গঙ্গার বুক থেকে জলো গন্ধ উঠছে। বাতাসে হিমভাব। নৌকো ভাসছে ইতস্তত। দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্ছে। পবিত্র সময়। শ্যামাকান্তও নদী দেখছিল। দেখতে-দেখতে খেয়াল হল বাবা বলেছেন যে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরতে। আজও দেরি হবে। কিন্তু ছানার জিলিপি বাবার চেয়ে বেশি মিষ্টি। সে কী করবে? সে শুনল সুর্বণা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছে। রবীন্দ্রনাথের গান। সে নিজে অবশ্য একটা গান জানে। সেটা এইসময় গাওয়া ঠিক নয়। পেটভরতি খাওয়ার পর গান গাইলে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। শ্যামাকান্ত বাঁ দিকে তাকাতেই সুবর্ণার কনুই এবং জামার ঠিক নিচের হাত দেখতে পেল। এবং তখনই তার চোখ স্থির হল। কনুই-এর ওপরে কিছু একটা আটকে আছে। মিষ্টির দোকানে যখন টেবিলে হাত রেখে সুবর্ণা বসেছিল তখনই কি ওটা হাতে লেগে গিয়েছিল। সুবর্ণাকে বলতে সঙ্কোচ হল শ্যামাকান্তর। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওটা ছানার জিলিপির একটা টুকরো। দুটো হাত ভাঁজ করে রেলিং-এর ওপর রেখে সে দাঁড়িয়েছিল। চোখ সামনে রেখে সে ডান হাত বাঁ দিকে একটু বাড়িয়ে দিল। না, তবু নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। সে আঙুলগুলো প্রসারিত করল। তারপর আরও চেষ্টার পর শরীর না নাড়িয়ে সে সুবর্ণার কনুই স্পর্শ করামাত্র একটা কম্পন টের পেল।

সে দেখল সুবর্ণা আচমকা ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখমুখ আরক্ত। যথাসম্ভব দূরে সরে গিয়ে সে ফোঁস করে উঠল, 'আপনি আমার হাত ধরলেন যে? কী পেয়েছেন আপনি? আমি ফালতু?'

'না, না।' শ্যামাকান্ত তোতলাতে লাগল।

'তাহলে? বলুন, কেন আমার হাত ধরলেন?'

'মানে—ইয়ে—ছানার—মানে আমি আপনার বন্ধু—।'

'বন্ধু? ওরকম বন্ধুত্ব আমি চাই না। আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

শ্যামাকান্ত নিমেষে স্থির হয়ে গেল। তার চোখের সামনে অজস্র জিলিপি, রসগোল্লা, সন্দেশ, ফ্রাই এবং বেগুনভাজা নুয়ে-নুয়ে পড়তে লাগল। সে চকিতে সেইসব খাদ্যবস্তুর বাগানে সুবর্ণাকে বেনারসির ঘোমটা পরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল। এইসময় সুবর্ণা আর একবার তর্জন করতেই তার ধন্দ কাটল। সে অত্যন্ত নিরীহ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'যাঃ,' চকিতে আরক্ত হল সুবর্ণা। গঙ্গার ওপরে বড় বেশি ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আপনি একটা যাচ্ছেতাই। অত মোটা ছেলেকে আমি—। তার চেয়ে কাতুর কাছে যান।'

'কাতু? বিড়বিড় করল শ্যামাকান্ত। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'খবরদার, কাল থেকে ওর সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলবেন।'

শ্যামাকান্ত যে ঘনঘন বালি যাচ্ছে এখবর কৃষ্ণকান্ত পেয়ে গেলেন। পেলেন পুত্রের মুখ থেকেই। সেদিন একটা বিশেষ দরকারে বেলুড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, পথে ওদের দেখতে পেলেন। শ্যামাকান্ত এবং একটি সপ্তদশী বোকা-বোকা ভাঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। এই ভঙ্গিটা খুবই মারাত্মক।

কৃষ্ণকান্ত। তুমি আজ বিকেলে কোথায় ছিলে?

শ্যামাকান্ত। বিকেলের কোন সময়ে বলছেন?

কৃষ্ণকান্ত। বালিব্রিজে কী করছিলে?

শ্যামাকান্ত। বালিতে যাচ্ছিলাম বাবা।

কৃষ্ণকান্ত। আমাকে না বলে তুমি বালিতে যাচ্ছিলে? তোমার এত পরিবর্তন? ছি-ছি!

শ্যামাকান্ত। ছি কেন বাবা। বালিতে যাওয়া কি অন্যায়।

কৃষ্ণকান্ত। নিশ্চয়ই। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে তো বটেই। সেখানে কী দরকার?

শ্যামাকান্ত। সুবর্ণাদের বাড়ি। সুবর্ণার মা আজ আমাকে দুধপুলি খাইয়েছেন। পুলিটা যা জমেছিল না!

কৃষ্ণকান্ত। সুবর্ণা! ওটি কে?

শ্যামাকান্ত। আমার ক্লাসে পড়ে। খুব ভালো মেয়ে। তুমি লাউ-চিংড়ি খেতে ভালোবাস শুনে বলেছে শিখে নেবে।

কৃষ্ণকান্ত। চুপ করো। দ্যাখো শ্যামা, তুমি জন্মমাত্র মাতৃহারা, আমিই তোমার পিতামাতা। কখনও এইসব স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ো না। নারী নরকের দ্বারী। ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। তোমার কোনও দাদা স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ায়নি। তুমি উনিশবছর বয়সেই—! আর যেন না শুনি। তুমি ওই মেয়েটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করো, এই আমার আদেশ।

শ্যামাকান্ত নিষ্প্রভ হয়ে বসে রইল। সে সুবর্ণাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ওই বাড়িতে তার খাতির দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। নিত্য কত রকমের খাওয়া-দাওয়া। বাবার হুকুম পালন করতে গেলে সুবর্ণাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তুলে নিতে হবে। ব্যাস, সঙ্গে-সঙ্গে এতসব খাবারদাবার—। শ্যামাকান্তর মন খারাপ হয়ে গেল। কৃষ্ণকান্তর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হচ্ছে না। সে ঠিক করল শেষবার সুবর্ণার বাড়িতে যাবে। গিয়ে বলে আসবে আর নয়, এই শেষ।

আজ কলেজের ছুটি। কৃষ্ণকান্ত আদালতে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়ল। কলেজ না থাকলে পয়সা পাওয়া যায় না। অতএব হাঁটা শুরু। পথে তার তিনরকম প্রিয় খাবারের দোকান পড়ল। পকেটে পয়সা নেই, পাশে সুবর্ণাও নেই। শ্যামাকান্তর বুক টনটন করছিল।

ভরদুপুরে শ্যামাকান্তকে দেখে একই সঙ্গে আনন্দ এবং লজ্জা পেল সুবর্ণা। ঘরে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়ে এসেছ?'

শ্যামাকান্ত মাথা নেড়ে না বলল। সুবর্ণার মা আড়ালে ছিলেন। শুনে বললেন, 'সেকি! হাতমুখ ধুয়ে নাও। আজ মুরগির মাংস আছে, তাই—।'

শ্যামাকান্ত সুবর্ণার তৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মত পালটাল। এখনই বলা ঠিক হবে না। খাওয়া-দাওয়া সারা হোক। অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অপরাহ্নে শ্যামাকান্তর মনে হল আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। জলখাবারটা এলেই বলে ফেলবে। ঠিক তখনই সুবর্ণা বলল, 'ঠাকুমা বায়না ধরেছে। মা বলছেন তোমাদের বাড়িতে লোক যাবে। এ মাসেই যদি লগ্ন ঠিক হয়—।'

শ্যামাকান্ত। লগ্ন? কিসের লগ্ন?

সুবর্ণা। আহা ঢং। লগ্ন কিসের তা জানেন না?

শ্যামাকান্ত। মাইরি বলছি, আমাদের বাড়িতে এইসব কথা কেউ বলে না।

সুবর্ণা। ঠিক আছে। লোক গিয়ে যখন পিতৃদেবকে বলবে তখন জানবেন।

শ্যামাকান্ত। পিতৃদেব? ওরে বাবা, কেউ যেন বাবার কাছে না যায়। বাবা এসব পছন্দ করেন না। খুব রাগি। উনি আমাকে বলে দিয়েছেন কোনওরকম সম্পর্ক যেন তোমার সঙ্গে না রাখি।

সুবর্ণা। বলে দিয়েছেন?

শ্যামাকান্ত। হ্যাঁ। আজই এই বাড়িতে আমার শেষ খাওয়া।

সুবর্ণা। তার মানে?

শ্যামাকান্ত। আমি আর আসব, না। সুবর্ণা।

সুবর্ণা। বেশ, তাহলে আপনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান এখান থেকে।

সুবর্ণা দ্রুত ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকল শ্যামাকান্ত। জলখাবারের আগেই কথাটা বলা ঠিক হয়নি। এরপর আর অপেক্ষা করা উচিত নয় বলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। তার পা ভারী, হৃদয় ভারাক্রান্ত।

গলি থেকে বের হওয়ার আগেই সে নিজের নাম শুনতে পেল। পেছন ফিরে দেখল সুবর্ণার বোন হাঁপাচ্ছে, 'শ্যামাদা, শিগগির আসুন, দিদি কুয়োর ওপর উঠে বসেছে আর কাঁদছে।'

শ্যামাকান্ত বলল, 'যাঃ!'

'মাইরি বলছি। এই না মাইরি বললাম, চলুন গিয়ে নিজের চোখে দেখবেন।' মেয়েটি ছটফট করতে লাগল।

শ্যামাকান্তর শরীর অবশ হয়ে গেল। সুবর্ণা কুয়োর ওপরে কেন? সম্বিত ফেরামাত্র সে ছুটে গেল বাড়ির পেছনে। সেখানে একটি ডুমুবগাছের ছায়ায় কুয়োর ওপরে দুপা তুলে উদাসীন ভঙ্গিতে সুবর্ণা বসে আছে। যেন পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। শ্যামাকান্ত মৃদু গলায় ডাকল। 'এই, ওখানে কেন?'

সুবর্ণা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিচের দিকে তাকাল। সেখানে কালো জল।

শ্যামাকান্ত। নেমে এসো। আঃ, কী হচ্ছে কী?

সুবর্ণা। কেন, নামব কেন?

শ্যামাকান্ত। জলে আমার খুব ভয়! সাঁতার জানি না।

সুবর্ণা। বসে আছি তো আমি। যেখানে যাওয়া হচ্ছিল সেখানেই যাওয়া হোক। আসতে কে বলেছে!

শ্যামাকান্ত। তাই বলে তুমি আত্মঘাতী হবে?

সুবর্ণা। ভালোই তো। শ্রাদ্ধ খেতে পাবে।

শ্যামাকান্ত আর এক পা এগোল, 'সুবু নেমে এসো।'

সুবর্ণা কোনও কথা বলল না। তাকে আরও উদাসীন দেখাল। কিন্তু চোখে জল দেখা দিল। মুহূর্তে কৃষ্ণকান্তর মুখ বিস্মৃত হল শ্যামাকান্ত। এই বিশ্বরাচরের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে শুধু সুবর্ণার চোখের জল বড় হয়ে উঠল। গভীর আবেগে সে বলল, 'সুবু, তুমি নেমে এসো, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

সুবর্ণা বলল, 'ভ্যাট।'

শ্যামাকান্ত বলল, 'সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।'

সেদিন বিকেলে কৃষ্ণকান্ত খবরের কাগজ পড়ছিলেন। শ্যামাকান্ত তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'চললে কোথায়?'

'বালি।' 'কম্পিত গলায় উত্তর হল।

'আবার বালি?' কাগজ রেখে সোজা হয়ে বসলেন কৃষ্ণকান্ত, 'তোমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করিনি নির্বোধ?'

'হ্যা, সেইটে বলতেই যাচ্ছি। একবার তো জানানো দরকার আর আমি যাব না। আপনি তো অভদ্র হতে বলেননি।'

'হু। বেশ, জানিয়ে এসো। আর হরিকে দুধপুলি করতে বলেছি।'

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে মন খারাপ হয়ে গেল শ্যামাকান্তর। দুধপুলি তার প্রিয় এবং সেটা

থেকে আজ বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এইসময় সে বন্ধুদের প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়েও কাউকে সে দেখল না। সে প্রত্যেক বন্ধুকে বলেছিল ধুতি পাঞ্জাবি এবং দশটা টাকা পকেটে নিয়ে আসতে। তারা বরযাত্রী যাবে। আজ শ্যামাকান্তর বিয়ে।

সুবর্ণার এক মামা থাকেন আলিপুরে। তিনি সব শুনে এই বিয়েতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর মতে ছেলের বাড়ি যদি কড়া হয় তাতে কোনও অসুবিধে নেই। একবার বিয়েটা চুকিয়ে ফেললেই সবাই সুড়সুড় করে মেনে নেবে। সুবর্ণার বাড়ির কারও কারও কিন্তু-কিন্তু ভাব ছিল, মামা সেটাকে উড়িয়ে দিলেন এই বলে, আঠারো বছরের ছেলেমেয়ের মনের মিলটাই আসল কথা।

শ্যামাকান্ত আজ বন্ধুদের তাই সেজেগুজে আসতে বলেছিল কিন্তু কেউ এল না। সে নিজে কৃষ্ণকান্তের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বলে ভালো পোশাক পরেনি। পকেটে একটাকা বারো আনা পড়ে রয়েছে। এটা তার জমানো পয়সা, তাই নিয়ে সে বাসে চাপল।

বালিতে নামতেই মহাকাণ্ড। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, মামা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটায় তুললেন। 'তোমার বরযাত্রীরা কোথায়?'

শ্যামাকান্ত বিরস গলায় জানাল, 'কেউ আসেনি।'

মামা বললেন, 'কোই পরোয়া নেহি। আমি বরযাত্রী রেডি করে রেখেছি।'

শ্যামাকান্ত খুব নার্ভাস। কৃষ্ণকান্তর মুখ বারংবার সামনে ভাসছে। সেটাকে মুছিয়ে সুবর্ণাকে আনতে চেষ্টা করেও পারছিল না। গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল এক অচেনা বাড়ির সামনে। সেখানে দুজন সুন্দরী মহিলা অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা বললেন, 'বাবা শ্যামাকান্ত, যাও স্নান করে নাও। সেখানে পোশাক আছে।'

'আমি কোথায়—?' হরিণের মতো প্রশ্ন করল শ্যামাকান্ত।

'এখান থেকেই বিয়ে করতে যাবে।'

চারধারে সুন্দরী রমণীদের ভিড়, সুগন্ধ এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহিত হয়ে গেল শ্যামাকান্ত। জীবনে প্রথমবার সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, সোনার বোতাম এবং আংটি পরে নিজেকে রাজকুমার বলে মনে হচ্ছিল। বিয়ের পর সুবর্ণা গর্বিতা রাজকুমারীর মতো তার পাশে বসে ফিসফিস করে বলল, 'এখন যা খাবার দেবে তার দিকে বেশি নজর দিও না।'

'তার মানে?'

'নতুন বরের বেশি খেতে নেই।'

কথাটা মনে ধরল না। মহিলারা যখন খাওয়াতে এলেন মনে হল এতদিন কেন তার বিয়ে হয়নি! এত খাবার! এত সুন্দরীর খোঁপায় ফুল! আঃ!

সেইরাত্রে কেউ ঘর থেকে যাচ্ছিল না। মধ্যরাত্রে শ্যামাকান্তর খুব ইচ্ছে করছিল সুবর্ণার হাত ধরতে। এই হাত তাকে এখানে এনেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে হাত ধরে কি করে? কে যেন ফোড়ন কাটল, 'জামাই কিভাবে তাকিয়ে আছে দ্যাখ, যেন ছানার জিলিপি খাবে।'

রাতটা কাটল। কিন্তু খুবই ক্ষিপ্ত হল শ্যামাকান্ত। এবং তখনই তার মনে হল এই প্রথম সে একটা গোটা রাত বাড়ির বাইরে না বলে কাটাল। এখন কৃষ্ণকান্তর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা দেখার পর স্থির করল বাবার সামনে দাঁড়াবার দরকার নেই। এত আরাম এত খাবার ছেড়ে কোন পাগল সেখানে যায়!

কিন্তু বেলা বাড়ার পর বিয়েবাড়িতে ব্যস্ততা দেখা দিল। মামা এসে বললেন, ' তৈরি হয়ে নাও। বউ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে তো।'

'বাড়ি? কার বাড়ি?'

'কেন? তোমার বাড়ি?

'মাথা খারাপ। আমি সেখানে যেতে পারব না।'

'সেকি! বউ না নিয়ে গেলে লোকে বলবে কি? আহা, বাবার ভয় পাচ্ছ কেন? বউ নিয়ে গেলে দেখবে তিনি জল হয়ে গেছেন।'

'আমি আমার বাবাকে চিনি। আর এমন তো কথা ছিল না।'

'মানে?'

'আমার বিয়ে করার কথা ছিল, বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল না।'

' কোথায় থাকবে?'

'এখানে।'

সঙ্গে-সঙ্গে রুদ্ধদ্বার সভা বসল আত্মীয়-অতিথিদের কান বাঁচিয়ে। বর বাড়ি ফিরছে না শুনলে টি-টি পড়ে যাবে। কি করা যায়। মামা বললেন, 'ঠিক হ্যায়। আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা এমনভাবে বের করে দিন যেন ও বউ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। পাড়ার লোক টের পাবে না।'

বিকেলে শ্যামাকান্ত বরবেশে সুবর্ণার পাশে বসে চলে এল আলিপুরে। বিশাল ফ্ল্যাট। নির্জন। সুবর্ণার মামা বললেন, 'এখানে কিছুদিন থাকো, এর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মামি বললেন, 'বাবার কাছে ক্ষমা চাইলেই—।'

শ্যামাকান্ত মাথা নাড়ল, 'সে আমি জানি না। আমার বিয়ে করার, করেছি।'

মামা-মামির মুখে মেঘ জমল।

সে রাতে বৃষ্টি নামল। সুখাদ্য খাওয়ার পর শ্যামাকান্ত দেখল সুবর্ণা নেই। সে দরজায় দাঁড়াল, 'ঘুম পেয়েছে।'

মামি বললেন, 'আহা, পাবেই তো। কত খাটুনি গেল। শুয়ে পড়ো বাবা।'

'সুবর্ণা কোথায়?'

'সে শুয়ে পড়েছে।'

'ওমা, আমি বিয়ে করে একা শোব?'

জিভ কাটলেন মামি, 'আজ তো বাবা কালরাত্রি। স্বামী-স্ত্রীতে মুখ দেখাদেখি নেই।'

'আমি ওসব কালরাত্রি মানি না। ওকে ডেকে দিন।' শ্যামাকান্ত ঘরে ফিরে বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসল।

মামা এলেন, 'বাবা শ্যামাকান্ত, হিন্দুধর্মের নিয়ম—অত অস্থির হয়ো না।'

'ধর্মটর্ম আবার কী? আমি কি নিয়ম মেনে বিয়ে করেছি?'

'করোনি?'

'মোটেই না। আমার বাবা জানে না দাদারা জানে না। আমি কালরাত্রি মানি না।'

শেষপর্যন্ত সুবর্ণা এল, 'কি পাগলামি করছ? আজ আলাদা শুতে হয়।'

শ্যামাকান্ত। আমি পারব না। কাল থেকে আমি তুই আলাদা নই।

সুবর্ণা। এতে খারাপ হবে।

শ্যামাকান্ত। হয় হোক, আমি তোমাকে ছাড়ব না।

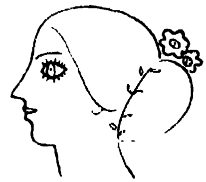
সুবর্ণা। একসঙ্গে শুয়ে কি হবে তোমার?

শ্যামাকান্ত জবাব দিতে পারল না। তার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে একসঙ্গে শুতে। কিন্তু তাতে কি হবে তা সে জানে না। সে বলল, 'তোমার হাত ধরব।'

সুবর্ণা হাসল, 'পাগল।'

আলো নিভিয়ে সুবর্ণা বয়স্কা নারীর মতো তার পাশে শুয়ে পড়ল। বালকের ভঙ্গিতে শ্যামাকান্ত সুবর্ণার হাত দুই হাতে নিয়ে বুকে চেপে বলল, 'আঃ!' অতিরিক্ত চিন্তা এবং পরিশ্রমে সে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাতে তার মনে হল হাতটা নেই। ঘর অন্ধকার। এবং সে ক্রমশ বিছানার একপ্রান্তে চলে এসেছে। তার নিম্নভাগ ঝুলছে। এবং বিছানার ওধার থেকে তীব্র নাসিকাগর্জন ভেসে আসছে। সে দুহাতে সুবর্ণাকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলতে গেল, মেয়েদের নাক ডাকতে নেই, কিন্তু সেই মুহূর্তে সে একটি পুরুষ্টু গোঁফের খোঁচা পেল। সুবর্ণা নেই। দরজা খোলা। তার বিকল্প মামা ঘুমের ঘোরে মামিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আঃ, বিরক্ত করো না!'



কাঁকলাস

বিলিতি মদ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে পায়ের শুকনো চামড়া নরম হয়ে যায়। তারপর একটু-একটু করে উঠতে উঠতে সাফসুতরো—, এই পরামর্শ দিয়েছিল গদাধর। টায়ারের জুতো পরে-পরে চামড়াটা মোষের ঘাড়ের মতো হয়ে গেছে। ব্যথা নেই, রস গড়ায় না কিন্তু চোখ পড়লেই বিশ্রী হয়ে যায় মনটা। তার এখন যে বয়স তাতে শরীরের খোলতাই কেউ আশা করে না। হাজামের কাছে উবু হয়ে বসতে কখনও-কখনও দিনদশেকও পার হয়ে যায়। খাঁকি শার্ট আর রঙিন পাজামার ঘাম জমে-জমে বিদঘুটে যে গন্ধটা তৈরি হয় তার সঙ্গে পাকা কাঁচা খোঁচা দাড়ি চমৎকার মানিয়ে যায়। এইজন্যে অবশ্য মালিকের কাছে কোনও কটু মন্তব্য শুনতে হয় না জীবনে। তবে গাড়িতে উঠলে নাক কুঁচকে যায় মেমসাহেবের। অবশ্য মেমসাহেব এ গাড়িতে উঠেছেন গোনাগুনতি তিনবার। এই পাগলা গাড়িতে কেউ উঠতে চায় না। যদি পেটে কিছু না পড়ে।

তিনবছর জিপটা চালাচ্ছে আকাশলাল। এর আগে সে ছিল শিলিগুড়িতে। বলরামবাবুর অ্যাম্বাসাডার চালাত। তার আগে কাটিহারে। জীবনভোর কত গাড়ি চালানো হল। সবকটা গাড়ির চরিত্র আলাদা। মর্জি না বুঝেছ তো ফাঁসলে। এই সব জেনেশুনে চালাত বলে আকাশলালের খ্যাতি হয়েছিল। বলরামবাবুর ওখান থেকে তাকে নিয়ে এল এই মালিক। লোকটাকে দেখে তার ভালো লেগেছিল। ঝকঝকে চেহারা, ফরসা, বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছে। দেখলে বেশ স্নেহ-স্নেহ বোধ জাগে। বলরামবাবু বলেছিল, 'চলে যাও ডুয়ার্সে। কাজের ঝামেলা কম। তোমারও তো বয়স হচ্ছে। তিরিশ টাকা বেশি মাইনে দেবে। ছোকরার এখন খুব ভালো সময় যাচ্ছে। কোনও নেশাভাঙ করে না, অনেক উঁচুতে উঠবে।'

কি যেন মন বুঝল। বলরামবাবুর গ্যারাজ ছেড়ে চলে এল নতুন মালিকের সঙ্গে। তখন এই মালিকের দুটো গাড়ি ছিল। ফিয়াটটা চাপত মেমসাহেব। জিপে বড্ড হাওয়া ঢোকে, হুড খোলা থাকায় আব্রু থাকত না বলে ফিয়াটটাই পছন্দ করত মেমসাহেব। ফিয়াট চালাত একটা নেপালি ছোকরা। খুব সাজগোজ ছিল তার। তার পোশাক-আশাক এবং বয়স দেখে কথাই বলতে চাইত না ছোকরাটা। সেই গাড়ি নেই, সেই ছোকরাও নেই। তখন মালিক আর মেমসাহেবকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখন দেখতে ইচ্ছে করে না।

তিন বছর আগে হুইলে বসত আকাশলাল। সকাল সাতটায় মালিক নাস্তা খেয়ে চটপটে পায়ে এসে জিপে উঠত। সোজা সাইটে কিংবা সদরের ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে ছুটে যেতে হত তাকে। ভোর-ভোর স্নান সেরে পুজো করে নিয়ে পবিত্র মনে স্টিয়ারিং ধরে ভোরের হাওয়া রোদ মাখতে খুব আরাম লাগত আকাশলালের। ডুয়ার্সের ঝকঝকে রাস্তায় দুপাশে গাছের সারি রেখে ছুটে যেতে কি যে আরাম লাগত! শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে এসে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে বলে মনে হত। এইরকম হাওয়া শরীরে লাগলে বেঁচে থাকাটা বেশ আরামদায়ক হয়। যেতে-যেতে মালিক জিজ্ঞাসা করত, 'এই জিপটাকে চালাতে তোমার কেমন লাগছে আকাশলাল?'

'বহুৎ আচ্ছা মালিক, ঠিকই হ্যায়।'

'আমার বউ এই জিপটায় উঠতেই চায় না, বুঝলে? কেন উঠতে চায় না জানো?'

'নেহি মালিক।'

'ও বলে জিপ হচ্ছে কাটখোট্টা পুরুষের মতো, রসকস নেই!' কথাটা বলে হো-হো করে হেসে উঠত মালিক। কথাটা আকাশলালের মন খারাপ করে দিত। ড্রাইভার হিসেবে সে যে ওই নেপালি ছেলেটার চেয়ে ঢের ভালো এটা মেমসাহেবের জানা উচিত।

রবিবার মালিক বাড়ির বাইরে বের হত না। সেদিনটা চমৎকার কাটত আকাশলালের। ছিপ নিয়ে বেরিয়ে যেত ঝিলে। বিশাল ঝিল। কালো জল সেখানে স্থির হয়ে থাকে অনেক রহস্য নিয়ে। পুঁটি, কাতলার বাচ্চা চটপট উঠে আসে। কিন্তু তাদের সাইজ এক বিঘতের মধ্যে। আকাশলাল মাছ মাংস মদ খায় না। শিকার করা মাছগুলো সে পৌঁছে দিত মালিকের বাড়িতে। প্রথম দিনই মালিক মাথা নেড়েছিল, 'এই মাছ কে খাবে আকাশ? ছোট মাছে বেজায় কাঁটা। আমার বউ কাঁটা বাছতে পারে না। তুমি খেয়ে নিও।'

'আমি তো মাছ খাই না মালিক।'

'আচ্ছা তাহলে ধরো কেন?'

'ধরতে ভালো লাগে।'

'তাহলে রেখে যাও। চাকরবাকর খাবে।'

তাই করত আকাশলাল। তিন রবিবার। শেষ পর্যন্ত ছিপ নিয়ে বের হওয়া বন্ধ করল। সারাদিন কাঠের ঘরের সিঁড়িতে বসে দেখত প্রচুর মানুষ দঙ্গল বেঁধে বসে গেছে ঝিল-এর চারপাশে। মানুষ যা পারে তা ঈশ্বরও পারেন না। দেখতে-দেখতে ঝিলটা ফাঁকা হয়ে গেল। বঁড়শি পড়লে ফাৎনা নড়ে না। শুধু মাঝখানে জল তোলপাড় করে একটা বিশাল মাছ শরীর মোচড়াত। অনেকে অনেকরকম চেষ্টা করেছে, কোনও টোপই চেখে দ্যাখেনি মাছটা। হতাশ মানুষেরা রটিয়ে দিয়েছে মাছটার শরীর এত পেকে গিয়েছে যে তার শক্ত মাংস খাওয়া যাবে না। এখন দু-একজন ঝিলের পাশে বসে কি বসে না। এ দৃশ্য উদাস চোখে চেয়ে দ্যাখে আকাশলাল। দ্যাখে আর পায়ের শক্ত চামড়ায় হাত বোলায়। গদাধর বলেছিল বিলিতি মদে ভিজিয়ে রাখতে। বিলিতি মদের দাম অনেক। যারা বিলিতি পেটে ঢালে তারা পায়ের চামড়ায় কি নষ্ট হতে দেবে! কয়েক মাস আগে হলে সে নিজেই একটা বিলিতি কিনে ফেলতে পারত। তারপর তুলোয় জড়িয়ে পায়ের চামড়া ভেজাত। কিন্তু তিন মাস আগে শেষ টাকা পেয়েছে মালিকের কাছ থেকে। বড় ভয় লাগে জমানো টাকা খরচ করতে। আগে এমন হলে চট করে সে অন্য একটা গাড়ির স্টিয়ারিং ধরার চাকরি নিয়ে চলে যেত। গেছেও তো কতবার। কিন্তু এবার পারছে না। বয়স হয়েছে তার? সে কথা ঠিক। এমনকী শরীরের চামড়াও কুঁচকেছে। কিন্তু তাই বলে খাটবার শক্তি তো যায়নি। তবু যেতে ইচ্ছে করছে না কোথাও। অস্বস্তি না ভয়, সেটা বুঝতে পারে না আকাশলাল। ডুয়ার্সের এই জায়গাটা তার মন থেকে শেকড় নামিয়েছে হাজারটা। তাছাড়া গত কয়েকমাস সে কবার স্টিয়ারিং ধরেছে গুনে বলতে পারে। গাড়ি না চালিয়ে না চালিয়ে চালাবার মনটায় কেমন জং ধরে গেছে। যা টাকা তার কাছে আছে তাতে আরও এক

বছর এই ঘরে বসে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মালিকের জন্যে। এইখানেই একটু গোলমাল হয়ে যায় আকাশলালের। ঈশ্বরকে মানুষ খেলায় না মানুষকে ঈশ্বর? ছয়মাস আগে হলে সে প্রতিদিন রাত্রে বোতল-বোতল বিলিতি মদ পায়ে ঢালতে পারত। তখন তো পায়ের চামড়াটা শক্ত হয়নি। এখন চেষ্টা করলে মালিকের সঞ্চয় থেকে আধ বোতল দিশি সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দিশিতে এটা সারবে না বলে জানিয়েছে গদাধর।

বড় কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা ছিল মালিকের। শিলিগুড়ির হরি সাহার কাছে গিয়েছিল খোশমেজাজে। যাওয়ার সময় মালিক জিপে বসে বলেছিল কাজটা এত বড় যে তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ওটা করতে পারলে সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা যাবে। শিলিগুড়ির হরি সাহাও কাজটা চায় কিন্তু তার একার দ্বারা হবে না। অতএব দুজনে মিলতে চায়। পার্টনারশিপে ব্যবসাটা চালাবে শুধু এই কাজটার জন্যে। কখনও-কখনও মালিকের মন ভালো থাকলে এইসব কথা বলত। ব্যাপারটা ভালো লাগেনি আকাশলালের। অন্যের ওপর বিশ্বাস কতদিন টিকে থাকে? কিন্তু কিছুই বলেনি সে। তার সাজে না মতামত জানানো।

কিন্তু সেই রাত্রে, জলপাইগুড়ি শহরের বাইপাস দিয়ে হু-হু করে গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময় একদম বেহুঁশ হয়ে থাকা মালিকের শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করেছিল, 'এটা ঠিক না মালিক। নিজের শরীরটা অন্যের কাছে ছেড়ে দিলে কুকুরও লাথি মারে। নিজের ব্যবসা অন্যের সঙ্গে জুড়লে তার ইচ্ছেটাও রাখতে হয়। লোকটা আপনার বন্ধু নয় মালিক। প্রথম রাত্রে এত মদ খাওয়ায় যে, সে আপনার বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু সেসব কথা শোনার ক্ষমতা ছিল না মালিকের। বাড়ির সামনে জিপ থামিয়ে আকাশলাল দেখেছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেটা ভালোই বলে মনে হয়েছিল তার। মালিকের ওই অবস্থা অন্য চাকরবাকর দেখুক সে চাইছিল না। মালিকের শরীরটা কাঁধে তুলে নিয়ে গেট খুলে সোজা দোতলায় উঠে গিয়েছিল। কোন ঘরে মালিক ঘুমোয় তা সে জানত না। দরজা বন্ধ সবকটা ঘরের। তার মনে হয়েছিল যে বাড়ি মালিক যত্ন করে বানিয়েছে তার দরজা অন্য মানুষরা বন্ধ করে রাখে কেন? সে চাপা গলায় ডেকেছিল, 'মেমসাব, মেমসাব, মালিক আয়া হ্যায়।'

দক্ষিণের ঘরের দরজা খুলে গেল। মেমসাহেব আলো জ্বেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

'আমি মেমসাব। মালিকের শরীর ঠিক নেই।' তারপর মালিককে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চুপচাপ নেমে এসেছিল নিচে। সেই রাত্রে তার খুব খারাপ লেগেছিল। মালিকের মদ খাওয়ার জন্যে তো বটেই, আরও খারাপ লেগেছিল এই জন্যে মেমসাহেব কি করে ঘুমিয়ে ছিল? অতরাত্রে বিনা নোটিশে মালিক কখনও বাড়ি ফিরত না!

একবার আগল ভাঙলে জল ঢোকা বন্ধ করে কার সাধ্য। সন্ধেবেলায় মালিকের যাওয়ার জায়গা বেড়ে যেতে লাগল। আজ শিলিগুড়ি তো কাল হাসিমারা, সামচি থেকে মালবাজার ছুটোছুটি করতে হত আকাশলালকে। আর গভীর রাত্রে বেহুঁশ একটা শরীর কাঁধে তুলে পৌঁছে দিয়ে আসত আকাশলাল। তখন ঘর অন্ধকার থাকত। তাকে ডাকতে হত না। মেমসাহেব কোনও কথা বলত না। কাজ শেষ করে সে চুপচাপ নেমে আসত। ক্রমশ মালিকের শরীরটা পালটে যেতে লাগল। একটা কালো ছায়া চেহারাটাকে মুড়ে ফেলল ধীরে-ধীরে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটল। হরি সাহার কাছে গিয়েছিল মালিক। বাড়ির বাইরে জিপ নিয়ে বসেছিল আকাশলাল রোজ যেমন বসে থাকে। রাত বাড়লে, রাস্তায় মানুষ-চলা শেষ হলে ভেতর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। তারপর মালিক বেরিয়ে এল টলতে-টলতে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল। হরি সাহা পেছন-পেছন ছুটে এসে চিৎকার করল, 'প্রমাণ করো আমি তোমার টাকা মেরেছি। ফের যদি এই নিয়ে কথা বলো তাহলে লাশ নামিয়ে দেব। আজ রক্ত দেখিয়ে দিলাম মাত্র।'

আকাশলালের হাত নিসপিস করছিল। কিন্তু মালিক গাড়িতে উঠে সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে

কোনওমতে বলল, 'বাড়ি চলো, বাড়ি চলো।'

আকাশলালের মনে হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়া উচিত। মালিক বিড়বিড় করে নিজের মনে উচ্চারণ করেছিল, 'সব শেষ, ফতুর হয়ে গেলাম।' তাপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল আকাশলালের। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, 'কিছুই শেষ হয় না মালিক। সব শেষ মানেই কিছুর শুরু। আপনি কাঁদবেন না।' তার আগেই মালিক চিৎকার করে উঠেছিল, ' কোথায় যাচ্ছ এদিকে?'

'হসপিটাল মালিক।'

'কোন শুয়োরের বাচ্চা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছে? ঘোরাও গাড়ি!'

'মালিক আপনার বহুৎ খুন—।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মালিক তাকে বলেছিল গাড়ি থামাতে। হসপিটালের কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামানো মাত্র মালিক তাকে বলল, স্টিয়ারিং থেকে সরে যেতে। ভয়ে-ভয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে পেছনে উঠে বসল। তারপরেই শুরু হল ছুটে যাওয়া। ছুটে যাওয়া না বলে উড়ে যাওয়া বললেই ভালো হত। গাড়ি একবার রাস্তার এপাশে চলে যাচ্ছে আর একবার ওপাশে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল আকাশলাল। মালিককে তখন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। তার চিৎকারে কোনও কাজ হচ্ছিল না। প্রাণের ভয়ে সে সরে এল পেছনে। মাথার ওপরের রড দুহাতে ধরে পা ঝুলিয়ে রাখল বাইরে। যে মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হবে সেই মুহূর্তেই যাতে লাফিয়ে পড়তে পারে এমন ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে থাকল সে। যে রাস্তা তার আসতে লাগত একঘণ্টা মালিক চলে এল প্রায় আধা সময়ে। বাড়ির সামনে জিপের ইঞ্জিন বন্ধ করে টলতে-টলতে ঢুকে গেল বাড়িতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল আকাশলালের। ওই জিপটাকেও তার মনে হচ্ছিল একটা পাগলা ঘোড়ার মতো। মালিক চলে যাওয়ার পরও সে ঝুম হয়ে বসে ছিল একই ভঙ্গিতে। চেতনা সচকিত হল মেমসাহেবের গলায় নিজের নামটি শুনে। চমকে লাফিয়ে নেমেছিল জিপ থেকে। মেমসাহেব বলেছিলেন, 'অনেকক্ষণ তোমাকে ডেকেছি, ঘুমুচ্ছিলে নাকি? গাড়ি চালিয়ে এল কে?'

'মালিক।' আকাশলাল এত রাত্রে মেমসাহেবকে এখানে দেখবে তা কল্পনাও করেনি। কিছু বোঝার আগেই মেমসাহেব ফিরে গেলেন বাড়িতে।

দুদিন গাড়ি বের হয়নি তারপর। বেহুঁশ ছিল মালিক জ্বরে। ডাক্তার যাওয়া-আসা করেছে। ডাক পড়েনি আকাশলালের। ঝিলের ধারে কাঠের বারান্দায় বসে সে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করেছিল। খানা পাকাতে ইচ্ছে করেনি, ছাতু খয়েছে একদিন। তারপর ছিপ নিয়ে বসে থেকেছে জলের ধারে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বেশ সময় কেটে যায়।

মালিকের বাড়িতে দুটো ঘটনা ঘটল। নেপালি ড্রাইভারটার চাকরি গেল। গাড়িটা বিক্রি করে দিল মালিক। কানে আসে, মেমসাহেব নাকি আপত্তি করেছিলেন। বিক্রি করতে হলে জিপটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। মালিক শোনেনি। সকাল বেলায় মাদারিহাটের কাছে একটা সাইটে তাকে নিয়ে যেত আকাশলাল। ওটাই মালিকের শেষ কাজ। রাস্তা তেরি হচ্ছে। কনস্ট্রকাশনের কাজও চলছে। স্নান করে ফিটফাট হয়ে যখন মালিক জিপে চাপত তখন স্টিয়ারিং হাতে খুশি হত আকাশলাল। কিন্তু সাইটে গিয়েই মদের বোতল খুলত মালিক। একটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল কাজের জন্যে জল তুলতে, সেটা ভরে উঠল মদের বোতলে। অর রাত বাড়লে যখন কোনও হুঁশ নেই তখন প্রাণ ধড়াস-ধড়াস করত আকাশলালের। চিৎকার করে তাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিতে বলত মালিক। টলতে-টলতে গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলেই ওটা একটা বন্য জন্তু হয়ে যেত। দুটো পা বাইরে ঝুলিয়ে মাথার ওপরের রড ধরে রামনাম জপ করতে শুরু করে দিত আকাশলাল। হেডলাইট অন্ধকারকে ফালা-ফালা করে ছুটত দুপাশে জঙ্গল রেখে। কতটা জোরে ওই জিপ ছুটতে পারে তা বোধহয় ওর নির্মাতাও জানত না। মদ খেলে মানুষটা কেন এত গতি চায়? এবং এই করতে গিয়েই জিপটা একরাত্রে নেমে এল পাশের মাঠে। জঙ্গল কম, বুনো লতাপাতা ভেদ করে লাফাতে-লাফাতে শেষ

পর্যন্ত আটকে গেল উঁচু ঢিবিতে। রাস্তা ছাড়ার সময় লাফ দিয়ে নিচে পড়েছিল আকাশলাল। সেই অবস্থায় জিপটাকেও মাতাল বলে মনে হয়েছিল তার। ওপাশে কোনও শব্দ নেই। হেডলাইটের আলোটা শুধু ঢিবির গায়ে স্থির হয়ে আছে। গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে পিচের রাস্তা এবং মনুষ্যহীন জঙ্গলমহল। হুড়মুড়িয়ে ছুটেছিল সে জিপটার কাছে। তারপর উদ্বেগে চিৎকার করেছিল, 'মালিক, 'মালিক!'

কোনও সাড়াশব্দ নেই। মালিক স্টিয়ারিং-এ মাথা হেলিয়ে পড়ে আছে। প্রথমে ধক করে উঠেছিল বুক। তারপর ঠোঁট নড়তে দেখে সে চিৎকার করল, 'মালিক, আপনি ঠিক আছেন?'

কয়েকবার ডাকাডাকির পর মালিক হাত বাড়াল, 'ড্রিঙ্ক! হুইস্কি!'

গলায় এমন একটা সুর ছিল যে সম্মোহিত হয়ে গেল আকাশলাল। গাড়ির খোপ থেকে বোতল বের করে হাতে দিতে গিয়ে দেখল মালিকের হাত উঠেছে না। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মতো সে মালিককে মদ খাওয়াল। সেটা পেটে যেতে মালিক বলল, 'সাবাস!' তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ল। আকাশলাল যেটুকু বুঝল তাতে নিশ্চিন্ত হল মালিকের শরীর ঠিকই আছে, রক্ত বের হচ্ছে না। জিপটারও কিছু হয়নি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যার ডাকে তাকে এখানে আশা করেনি আকাশলাল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেমসাহেব হুকুম করল। 'তাড়াতাড়ি করো, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।' মেমসাহেব আর দাঁড়ায়নি। তৈরি হয়ে দুদ্দাড় করে ছুটল সে। মেমসাহেব ঝি-এর হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে এলেন একটু বাদেই। সঙ্কুচিত হয়ে স্টিয়ারিং-এ বসতেই মেমসাহেব বললেন, 'তুমি স্নান করো না? কী বিচ্ছিরি গন্ধ!'

'জি মেমসাব, রোজ করি। শুধু এটাই হপ্তাতে একবার কাচতে হয়। কোন স্টেশন যাব?'

'কেন, ফালাকাটায় চলো। ওখান থেকে সকালে ট্রেন পাব।'

আকাশলাল কোনও কথা বলল না। হাইওয়েতে পড়ে নিবিষ্টমনে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করতে লাগল সে! পথে কোনও কথা বলেনি মেমসাহেব। আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেনি সে। এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি সে কোনওদিন, আজ কেন করবে?

ফালাকাটায় নেমে মেমসাহেব একশটা টাকা দিল তাকে, 'কলকাতার টিকিট কিনে নিয়ে এসো। জিজ্ঞাসা করো ট্রেন কখন আসবে?'

খবর নিয়ে ফিরে এল আকাশলাল, 'এখন কোনও ট্রেন নেই মেমসাহেব। দুপুরের আগে কলকাতার কোনও ট্রেন নেই। টিকিট কাটব?'

'অন্য কোনও স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন পাওয়া যায় না?'

'জানি না মেমসাব, তবে গিয়ে দেখতে পারি।'

'তাই চলো।'

এপাশে যদি ব্রডগেজ ওপাশে ন্যারো গেজ লাইন। দুটোর মধ্যে ব্যবধান তিরিশ কিলোমিটার। আধঘণ্টায় পৌঁছে গেল তারা। ন্যারো গেজের স্টেশনের অবস্থা খুব খারাপ। লোক খুঁজে পেতে সময় লাগল। আকাশলাল ফিরে এসে জানাল, 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আসার কথা বেলা বারোটায়। সেটা রোজ ছয় ঘণ্টা লেট করে।'

মেমসাহেব খবরটা শুনে খুব হতাশ হলেন। তারপর নিজের মনেই বোধহয় বললেন, ' কিন্তু আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। এখানে কোনও ভদ্রমানুষ বাস করতে পারে না।'

আকাশলাল বিনীত গলায় বলল, 'আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে তৈরি হয়ে এলে মনে হয় ঠিক হবে মেমসাব। এইসব ট্রেনে খুব ভিড় হয়, আমি দেখেছি।'

'খুব ভিড় হয়?'

'হ্যাঁ মেমসাব। মেয়েছেলের ইজ্জত ঠিক থাকে না।'

মেমসাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তার মাথা ঈষৎ পেছনদিকে ঝুঁকল। এই ভঙ্গি দেখে আকাশলালের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, তাকে খুব দুঃখী-দুঃখী লাগছে এখন। অত ফরসা মুখে কালো ছায়া দুলছে। মেমসাহেব বললেন, 'শিলিগুড়িতে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এই ভয়টাই করছিল আকাশলাল। ওখানে গিয়ে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও মেলে। সে হাউমাউ করে বলে উঠল, 'আপনি চলে গেলে মালিক বাঁচবে না মেমসাব।'

'সে কি এখন বেঁচে আছে? এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে? না, আমি বাপেরবাড়িতেই ফিরে যাব। ওর সঙ্গে থাকার কোনও প্রবৃত্তি নেই আমার।' মেমসাহেব মাথা নাড়লেন।

আকাশলাল বলল, 'ঠিক আছে মেমসাব।'

কথাটা শোনামাত্র মেমসাহেব তার দিকে চমকে তাকালেন। তারপর দৃঢ়গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো!'

আকাশলাল খুব সঙ্কুচিত হল, 'কিছু না মেমসাব। আমি কি বলতে পারি।'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। চলো, ফিরে চলো। আমি ওকে বাঁচাবার জন্যে ফিরে যাচ্ছি না, আমি নিজে বাঁচতে যাচ্ছি। আর মাথা নিচু করে থাকব না। উঠে এসো।'

ফেরার সময় মনটা প্রসন্ন হল আকাশলালের।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই মেমসাহেব নেমে গেলেন। ব্যাগটা কাঁধে করে পৌঁছে দিতে গেল সে। এবং গিয়ে জানল মালিক বাড়িতে নেই। মেমসাহেব বাড়ি ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর থাকার জায়গা আলাদা করতে হবে, মালিকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। মালিক থাকবে নিচের তলায়, ঢোকার মুখে। এবং তারপর মেমসাহেব তাঁর নির্দেশটি জানালেন, আকাশলাল যেন মেমসাহেবের অনুমতি না নিয়ে জিপ না বের করে। এই বাড়ি ও সম্পত্তি মেমসাহেবের নামে আইনত লেখা। অতএব এখন থেকে সব কাজ তাঁর হুকুমেই চলবে।

এত রাগ কেন বুঝতে পারে না আকাশলাল। স্বামী ব্যবসা করত, টাকা আসত। ব্যবসা চোট খেল, টাকা গেল। স্বামী মদ ধরল। এসব তো নিত্যদিন ঘটছে। তাই নিয়ে এরকম ব্যবহার করার কি মানে আছে! জিপের চাবি চলে গেল মেমসাহেবের কাছে। আর মালিককে খুঁজতে বের হল আকাশলাল। এই গঞ্জ এলাকায় মালিক বড় একটা কারও সঙ্গে আড্ডা মারত না। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় হাঁটতে দ্যাখেনি সে এই ক'বছরে। কিছুক্ষণ পথে-পথে ঘুরতেই এলাকাটা শেষ হয়ে গেল। মেমসাহেবের ঝি বলেছে মালিক নাকি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে গদাধরের সঙ্গে দেখা হল তার, 'এই যে আকাশভাই, তোমার নাকি চাকরি চলে যাচ্ছে?'

চমকে উঠল আকাশলাল, 'তুমি কি করে জানলে?'

'আমার মালিক বলছিল। তোমার মালিকের সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে। জিপটাও বিক্রি করবে।'

জিপের মালিক মেমসাব, মালিক নয়।'

'ও সবই সমান, হাতের এপিঠ ওপিঠ। পুরুষমানুষই হল মেয়েদের পরিচয়। যাচ্ছ কোথায়?'

'মালিককে খুঁজতে।

হ্যাকহ্যাক করে হাসল গদাধর, 'তোমার মালিক মাল খাচ্ছে।'

'কোথায়?' অবাক হল আকাশলাল। এই গঞ্জে মালিককে সে কখনও মদ্যপান করতে দ্যাখেনি। কিছুটা অবিশ্বাসের গলায় সে প্রশ্ন করল 'কার বাড়িতে?'

বাড়ি কেন হবে! বলে আঙুল তুলে ইশারা করে দেখাল পাঁচু শা-এর ভাটিখানাটাকে। বিশ্বাস করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না আকাশলালের। এই ভাটিখানায় দিশি মদ বিক্রি করে পাঁচু। তার খদ্দের হল যত কুলিকামিন আর ট্রাক ড্রাইভার। দু-টাকায় অনেকখানি গলায় ঢালা যায়। মালিক কেন যাবে ওখানে? গদধর বলল, 'যাও যাও, গেলেই দেখা পাবে। চৌমাথায় সবাই গিয়ে দেখে

এসেছে। দেখার মতো দৃশ্য বটে!' এরপর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। আকাশলাল একটু ইতস্তত করল। তারপর পা চালাল। বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলি নেমে গেছে নিচে। দুপাশে পরিত্যক্ত ড্রাম আর ছেঁড়া টায়ারের স্তূপ। উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। পাঁচুর দোকানের সামনে বিশাল চালার নিচে ছেঁড়া মাদুরে বসে কুলিকামিনরা মদ খায়। সেখানেই দেখতে পেল মালিককে সে। পাজামা পাঞ্জাবি পরে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মুখটা লাল, সামনে প্রায় শেষ হওয়া বোতল পড়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে কাউন্টার থেকে একজন চিৎকার করে বলল, ' পুরো আউট! হাঁটতে পারবে না!'

আকাশলাল উবু হয়ে বসল, 'মালিক, মালিক, আমি আকাশ।'

মালিকের কাঁধ ঝাঁকাতে মাথা টলল। এই মানুষকে নিয়ে সে বাড়িতে ফিরবে কি করে। আকাশলাল ছেড়ে দিল। তারপর কিছুটা দূরে চুপচাপ বসে রইল। এই সকালে মাল খেতে মোটেই ভিড় হয়নি। দু-একজন যারা আসছে তার বোতল কিনে ফিরে যাচ্ছে। এখন কারও মদ খাওয়ার সময় নয়। তারা মালিককে দেখে হাসছে। কিন্তু কিছু করার নেই তার।

দুপুর যখন পার হব-হব তখন মালিক চোখ খুলল। ইংরেজি ভাষায় কি সব বলল বিড়বিড় করে। তারপর পড়ে থাকা বোতলটা টেনে নিয়ে গলায় ঢালতেই লাফিয়ে কাছে চলে এল আকাশলাল, 'মালিক, আর খাবেন না মালিক।'

'হু আর য়্যু? কে বাবা?'

'মালিক আমি আকাশলাল।'

'আকাশলাল! আমার বউকে নিয়ে ভেগেছ?'

'নেহি মালিক, এরকম কথা উচ্চারণ করবেন না। শুনলেও পাপ।'

নিঃশব্দে হাসতে লাগল মালিক, তারপর বলল, 'পাপ? পাপ মানে কী? আমার বউকে নিয়ে তুমি ভেগেছ আকাশলাল, তোমাকে আমি মাটিতে টেনে নামাব।'

'মালিক, মেমসাহেব বাড়িতেই আছেন।'

'বাড়িতেই আছেন মানে? সে ফিরে এসেছে? হায় কাপাল!' মালিকের চোখেমুখে ভীতি ফুটে উঠল, 'ও কলকাতায় চলে যায়নি?'

'নেহি মালিক।'

'ভাগ হিঁয়াসে। যা শালা, তোর মেমসাহেবের পা চাট। কেউ আমাকে বিরক্ত করবি না। এখানে তোকে কে আসতে বলেছে? সেই ডাইনিটা?'

'নেহি মালিক, আমি নিজেই এসেছি। এবার আপনি ঘর চলুন।'

পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিল মালিক, 'ঠিক হ্যায়, খানা লিয়াও চিকেন আউর রোটি।'

'মালিক, বাড়িতে গিয়ে খাবেন, আমার সঙ্গে চলুন।' টাকাগুলো কুড়িয়ে ফেরত দিল আকাশলাল। তারপর সাহস করে মালিকের হাত ধরল।

'তোমার ধান্দাটা কি বলো তো? আমার আর পয়সাকড়ি নেই, তোমাকে মাইনে দিতে পারব না। এবার কেটে পড়ো এখান থেকে। জিপটাকে শালা বিক্রি করে দিলে কিছুদিন চিন্তা করতে হবে না আমাকে।' মালিক এবার আকাশলালের সাহায্যে উঠল, 'জিপ কোথায়?'

'বাড়িতে। মেমসাব চাবি নিয়ে নিয়েছে।'

'শালা হারামি। এখানে কি মুখ দেখাতে এসেছ? তুমি বিয়ে করেছ?'

'না মালিক।'

'কোনও মেয়েছেলের সঙ্গে শুয়েছ?'

'না মালিক।'

'আরে ব্যাস! এ তো দেখছি বুড়ো বয়সে ভার্জিন। হুঁ-হুঁ বাবা, তোমার তো কোনও জ্ঞানই হয়নি। জন্মটাই বৃথা গেল। আমাদের আগের নেপালি ড্রাইভারটা, আরে যেটা ফিয়াট চালাত, পদম না কি যেন নাম, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ মালিক।'

'আমার বউ-এর সঙ্গে শুতো। মাইরি বলছি। ওকে ছাড়তে চায়নি বউ, তোমাকে তাড়াতে চেয়েছিল। তুমি বুড়ো বলে কোনও আগ্রহ নেই, তার ওপর তোমার গায়ে বোঁটকা গন্ধ। তবে তুমি ভার্জিন জানলে কি করবে জানি না!' মালিকের এবার হেঁচকি উঠল।

'এসব কথা বলবেন না মালিক।'

'কেন বলব না? আমি আমার বউকে সুখ দিতে পারি না, বাচ্চা দিতে পারিনি এটা তো সত্যি কথা। কারও দোষ না। ভগবান দেয়নি তাই আমি পারি না। কিন্তু কেউ যদি পারে তাহলে দেখতে দোষ কি এটাই বউটা বোঝে না!'

'মালিক!' শিউরে উঠল আকাশলাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

হি হি করে হেসে উঠল মালিক, 'মাল্লু, মাল্লু, মাল্লু যদ্দিন থাকবে তদ্দিন সব চাপা থাকবে, ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নেচে যাও কেউ রা কাড়বে না, কিন্তু সেই ফতেবাবু হয়ে গেলে অমনি ব্যাঙাচিও লাথি মারবে। ঘাগুলো দগাদগিয়ে উঠবে চাঁদ।'

মালিককে নিয়ে পথে নেমেছিল আকাশলাল। লোকজন তাকিয়ে আছে হাঁ করে। মালিকের তাতে গ্রাহ্য নেই। বাড়ির কাছাকাছি এসে মালিক মাথা নাড়ল, 'না না, ওই হারামির বাড়িতে আমি যাচ্ছি না, প্রাণ থাকতেও না।'

হতভম্ব আকাশলাল জানিয়েছিল, 'ওটা মালিক আপনারই বাড়ি।'

'সেকথাই তো বলছি। ওখানে আমি যাচ্ছি না। তোমার ওখানে চলো!'

'আমার ওখানে? মালিক আপনি কী বলছেন?'

'ঠিক বলছি আকাশলাল। তুমি আকাশ, আমার বউকে নিয়ে ভেগেছ, তোমাকে ঠিক বলব না? আমার বউ হল পায়রা, বকবকম পায়রা, ওড়ে তো আকাশেই।'

আকাশলাল ভেবেছিল মালিক নেশায় আছে। সে বাধ্য হয়েছিল ঝিল-এর ধারে তাকে নিয়ে আসতে। ঘরে ঢুকে মালিক সতরঞ্চির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলেছিল, 'আঃ কি আরাম!' তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। আকাশলাল ছুটে গিয়েছিল মালিকের বাড়িতে। মাথা নিচু করে মেমসাহেবকে জানিয়েছিল মালিক এখন কোথায় আছেন। মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'এখন ভাটিখানায় জুটেছে! ছি! ও মদ নিয়েই থাকুক আকাশলাল। এ বাড়িতে না ঢুকলেই আমি শান্তি পাব। ও হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম জিপটাকে বিক্রি করে দেব। কিন্তু পরে মত বদলেছি। চলুক না চলুক একটা গাড়ি থাকা দরকার। তুমি ওই ঘরটাতেই থাকো। যখন দরকার হবে ডাকব। বাকি সময়টা ইচ্ছে করলে অন্য কাজ করতে পারো।'

আকাশলাল কথাটার অর্থ বুঝতে পারেনি সঠিকভাবে। মেমসাহেব কি তাকে ঠিকে হিসেবে রাখতে চাইছেন? নিয়মিত মাইনেপত্র দেবেন না? তাহলে তার চলবে কি করে? সে অবশ্য গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করতে পারে। কিন্তু এখন আর ওসব ধান্দা করতে একটুও ইচ্ছে করে না। সে মেমসাহেবকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করবে। তার টাকা পয়সা বেশি চাই না। খাওয়া পরা আর খইনির পয়সা হলেই চলে যাবে। আকাশলাল ফিরে এল ঝিলের ধারের ঘরে। খিদেতে পেট জ্বলছে। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। ঘরে এসে সে দেখতে পেল মালিক নেই। আশেপাশে কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা করবে হদিশ। আবার খুঁজতে বের হওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না আকাশলালের। সে ছাতু মেখে মুখে তুলল। ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত ছিল। এক মালিক ছিল, তাকে নিয়ে নিল আর একজন। সে যেন একটা খেলনা, যে যার ইচ্ছেমতো খেলাচ্ছে। এই

সময় ঝিলের জলে বেশ শব্দ করে খেলা করে গেল মাছটা। তারপর সব শান্ত।

আর তখনই আকাশলাল আবিষ্কার করল দাগটা। পায়ের অনেকটা জায়গায় কালচে ছায়া পড়ছে। আঙুল দিয়ে ঘষলেও উঠছে না। বরং মনে হচ্ছে সাড়টা কম। ভালো করে ঝিলের জলে পা ধুয়ে এল সে। দাগটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। আকাশলালের মন খারাপ হয়ে গেল। এটা আবার কি ধরনের অসুখ।

মালিকের বাড়ি থেকে কখনও-কখনও ডাক আসে। সেদিন মেমসাহেব সেজেগুজে বসে থাকেন আগেভাগে। এখন তার প্রতি কড়া নির্দেশ গন্ধওয়ালা জামা পরে গাড়ি চালানো চলবে না। প্রথমদিন বিকেলবেলায় মেমসাহেব পাশে বসে বলেছিলেন, 'শিলিগুড়ি!' পথে কোনও কথা হয়নি, শহরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হরি সাহার কাছে চলো।'

চমকে উঠেছিল আকাশলাল। যে লোকটা মালিককে মেরে শাসিয়েছিল, পথে বসিয়েছে, তার কাছেই যেতে চাইছে মেমসাহেব। কিন্তু নির্দেশ মান্য করাই তার কাজ। পরিচয় দেওয়ার পর হরি সাহার কর্মচারী তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে মেমসাহেবকে জিপে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল হরি সাহা। হাত কচলে বলেছিল, 'আজ আমি কৃতার্থ। মন চাইলেই চলে আসবেন, আমি সবসময় আপনার সেবায় তৈরি আছি।'

গাড়ি চললে মেমসাহেব আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, 'সব মানুষই খারাপ নয় আকাশ, ভালো ব্যবহার করলে শয়তানও ঈশ্বর হয়ে যায়।'

না, বাড়িতে কেউ আসত না। কিন্তু মেমসাহেবের বাইরে যাওয়া বন্ধ হল না। আজ হরি সাহা, কাল প্রতীম সিং পরশু বদরিনারায়ণ। এরা সবাই মালিকের ব্যবসার বন্ধু। মেমসাহেব যখন ফেরেন তখন তাঁর পাশে জিপে বসে গন্ধ পায় আকাশলাল। গন্ধটাকে চেনে। সেই সঙ্গে তার মনে একটা ভয় পাক খেতে থাকে। কবে মেমসাহেব স্টিয়ারিং কেড়ে নেবেন আর তাকে বসতে হবে পেছনে পা ঝুলিয়ে! সেই অবস্থায় মেমসাহেব একদিন জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'তুমি খুব ভালো আকাশ, খুব ভালো। কিন্তু তুমি মদ খাও না!'

'জি নেহি মেমসাব।'

'কেন খাও না?'

'ইচ্ছে হয় না মেমসাব। তাছাড়া পয়সাও নেই।'

'ওই লোকটা তো ভিক্ষে করে মদ খায়। দিশি মাল শুনেছি। ভোরবেলায় তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় ভাটিখানায়, তুমি ওকে পয়সা দাও আকাশলাল?'

'জি মেমসাব।'

'কেন দাও?'

'মালিক চাইলে না বলতে পারি না।'

'কে তোমার মালিক? আমি না সে? তুমি হাতবদল হয়ে গেছ আকাশ, মনে থাকে যেন। ওকে আর পয়সা দেবে না।'

'মালিকের বড় কষ্ট মেমসাব। ঠিকমতো খান না। আমি আর কি খাওয়াতে পারি, ঝিলে মাছও নেই।'

'ঝিলে একটা পাকা মাছ আছে শুনেছি, ওটা আমার চাই।'

'ঠিক আছে মেমসাব। কিন্তু মাছটা বঁড়শি খায় না।'

'নিশ্চয়ই খাবে। খাওয়াতে হবে। তোমার মালিক যদ্দিন আমাকে বাইরে যেতে দেয়নি তদ্দিন আমি তাই জানতাম। ও নিজে পারত না বলে অন্যকে লেলিয়ে মজা দেখত। কিন্তু এখন আমি জেনে গেছি যত বড় মাছ হোক ঠিক মতন বঁড়শি ফেললে খাবে।'

দুইজন দু-প্রান্তের। দু-প্রান্তেরই বা কি করে বলা চলে। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মাঝখানে সে।

আকাশলাল অসহায় হয়ে পড়ে। মালিকের প্রতি তার কোনও দায় নেই তবু তাকে ছাড়তে পারে না। মেমসাহেব অবশ্য তাকে মাইনে দিচ্ছে এখন, কিন্তু সেটা মানতে পারে না সে। এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার মনটা এখন অসাড় হয়ে গেছে। কী করবে সে? চব্বিশ ঘণ্টায় খুব কম সময় মালিক হুঁশে থাকে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সব সময় পয়সা চাইলে হ্যাঁ বলে না আকাশলাল। খারাপ লাগে তবু বলে না। আজ বিকেলে মালিক ছিল আধা হুঁশে। আর সেই সময় মাছটা ঘাই মারল। সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মালিক, 'আকাশলাল, মাছটার ওজন কত হবে মনে হয়?'

'জানি না মালিক।'

'বিশ কেজি তো বটেই। তার মানে পঁচিশ করে হলে পাঁচশো। মাছটাকে আমার চাই। ধরে দাও আকাশ। তোমাকে একশো দেব। চারশোতে আমার দু-মাস আরামসে চলে যাবে।' চোখ বন্ধ করল মালিক আবেশে।

'ও মাছ টোপ খায় না মালিক।'

'কিসের টোপ?'

'ময়দা, ফড়িং, কাঁঠালের কোয়া—কোনওটাই না।'

'ব্যাঙ ফেল, জ্যান্ত ব্যাঙ, যে ব্যাঙের গা থেকে গন্ধ বের হয়।'

'ব্যাঙ খাবে মাছ?'

'হ্যাঁ বাবা, আমি বাপের কাছে শুনেছি। বঁড়শিতে গেঁথে ব্যাঙ ফেল জলে। নড়েচড়ে বেড়াবে, মাছ বুঝতে পারবে না, ওটা গিললে বঁড়শি আটকাবে। ও মাছ আমার চাই আকাশলাল। তোমার একশো, একদম পাকা কথা।' ফুর্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল মালিক। যাওয়ার সময় বলে গেল ছিপ সুতো বঁড়শি আছে ও বাড়িতে। মাছের বাপের সাধ্যি নেই সেই সুতো ছেঁড়ে।

একশো টাকা! রোমাঞ্চিত হল আকাশলাল। চারশো হাতে পেলে মালিক নিশ্চয়ই আর তাকে বিরক্ত করবে না কিছুদিন। আর একশো পেলে সে কয়েকটা ছোট বিলিতি কিনে ফেলবে মালিককে লুকিয়ে। পায়ে বড় শক্ত হয়ে গেছে চামড়াটা। গরুর ঘাড়ের মতো। পুরো বোতল দিয়ে চামড়া ভিজিয়ে রাখলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে। হাঁটতে আজকাল কষ্ট হচ্ছে বেশ।

আকাশলাল মালিকের বাড়িতে এসে ছিপ বঁড়শি সুতো প্রার্থনা করল। মেমসাহেব হাসলেন, 'মাছটাকে ধরতে পারবে তো আকাশলাল? ভালো ফ্রাই হবে। সামনের বুধবার পার্টি আছে, আমি ফ্রাই খাওয়াব সবাইকে।'

'মালিক মাছটাকে চায় মেমসাব।'

'কে চায়? ওর চাওয়ার কোনও অধিকার আছে? মাছ ধরবে তুমি—তুমি আমার লোক, ও চাইবে কেন? তুমি কাকে দেবে আকাশ? ওকে না আমাকে? মদির হাসলেন মেমসাহেব। বুকের ভেতর চিতা জ্বলল আকাশলালের।

'জি মেমসাব।'

'কত বড় মাছ?'

'বিশ কেজি।'

আঃ! ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না মেমসাহেব।'

কাছে এগিয়ে এল মেমসাহেব, 'ওর নাকের ডগা দিয়ে ঝুলিয়ে আনবে মাছটা। তারপর আমি তো আছি আকাশলাল।'

ব্যাঙ কোথায় পাওয়া যায়, যার গায়ে গন্ধ আছে! সে গন্ধ মাছকে টানবে। হ্যারিকেন হাতে রাতদুপুর পর্যন্ত ব্যাঙ খুঁজে বেড়াল আকাশলাল। কত রকমের ব্যাঙ চোখে পড়ল কিন্তু তাদের গায়ে তো গন্ধ নেই। খুঁজতে-খুঁজতে চলে এল ভাটিখানার পেছনে ডোবার ধারে। সেখানে পড়ে থাকা

মদ ফেলে দেয় চাকর-বাকর। বোতল ধোয় জলে। গোটাচারেক ব্যাঙ পেয়ে গেল আকাশলাল। নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দেখল গন্ধ ছাড়ছে যেন। মদমদ মিঠে গন্ধ। মদ ধোওয়া জলে বাস করে শালারা মাতাল হয়ে বসে আছে। পা চালিয়ে ঝিলের ধারের ঘরে ফিরে এল সে। মালিক পড়ে আছে চিৎ হয়ে, জ্ঞান নেই।

সকাল-সকাল তোড়জোড় শুরু করল আকাশলাল। যেখানে জল গভীর তার কাছে পাড়ে সে বঁড়শি ফেলল জলে। ব্যাঙের পেটের কাছে এমন ভাবে বঁড়শি ঢুকিয়েছে যাতে একটুও অস্বস্তি না হয় ওটার। বঁড়শির এক বিঘৎ ওপরে সিসে বেঁধেছে। বেশ কিছুটা দূরে ব্যাঙটা জলের তলায় খেলা করছে। ফাৎনাটা তালে-তালে ঘুরছে। এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল আকাশলাল। ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল, মাছটার কোনও চিহ্ন নেই, এর মধ্যে মালিক ঘুরে গেছে —'খাচ্ছে? ঠোকরাচ্ছে?'

'না মালিক।'

'খাবে, ঠিক খাবে। আমি খদ্দের ধরতে যাচ্ছি। চারশো টাকা।'

মালিক যাওয়ার ঘন্টাখানেক বাদে মেমসাহেব এল। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেমসাহেব বলল, 'আহা বসো বসো। মাছটা ধারেকাছে আছে?'

'জানি না মেমসাব।'

'ধরতে পারলেই ডাকবে। আমি জ্যান্ত দেখতে চাই ওকে। খুব সুন্দর একটা জিনিস দেব তোমাকে। সে কোথায়, তোমার আগের মালিক?'

'খদ্দের দেখতে গেলেন মাছটার জন্যে মেমসাব।'

'দেখাচ্ছি খদ্দের। আমি তোমার মালিক মনে থাকে যেন।'

তারপর আরও দুঘন্টা কাটল। নির্জন ঝিলের ধারে হাওয়া বইছে। চোখ টনটন করছে ফাৎনার দিকে চেয়ে-চেয়ে। মাছটার কোনও পাত্তাই নেই। একবার বঁড়শি তুলে দেখেছে ব্যাঙটা দিব্যি আছে। ক্রমশ মনে হতে লাগল এই টোপ খাবে না মাছটা। কিন্তু কে অপেক্ষা করবে সন্ধে পর্যন্ত! দুটো মানুষকে দুঃখ দিতে পারবে না সে। দুটো লোকই চায় মাছটা উঠুক, সে চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু খিদেতে এক সময় অবসন্ন বোধ করল সে। অথচ ছিপ ফেলে ওঠাও যাবে না। ঘুম পাচ্ছে তার।

বুদ্ধি করে ছিপের ডগা থেকে সুতোটাকে খুলল আকাশলাল। তাতে ফাৎনাটা একটু কাঁপল মাত্র। তারপর সুতোর প্রান্তটা বাঁধল নিজের পায়ে। যেখানকার চামড়া শক্ত এবং কালো সেখানে বাঁধনটা পড়তে তার ব্যথা লাগল না। নিশ্চিন্তি। এবার টানটান শুয়ে পড়া যাক। টোপ গিললেই সে জেগে যাবে।

চিৎ হয়ে শুয়ে সে আকাশটাকে দেখতে পেল। রোদ নেই। ঘোলা হয়ে আছে। হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশলালের ক্লান্তি শিরায়-শিরায়। ঘুম এল লাফিয়ে। সমস্ত চরাচর তখন শব্দহীন। জলে ঢেউ কাঁপছে বাতাসের খেয়ালে।

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান লাগল শরীরে। ঘুম-ভাঙা-হতভম্ব আকাশলাল বুঝতে না বুঝতে অনেকটা নেমে এল জলের ধারে। ঘোর কাটতে উবু হয়ে শক্ত কালো চামড়া থেকে টনসুতোর বাঁধন খুলতে গিয়ে আবার টান এল। সরসরিয়ে তার শরীরটা নেমে যাচ্ছিল নিচে। প্রাণপণে সে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইল। কয়েক মুঠো ঘাস নিয়ে সে আছড়ে পড়ল জলে। ব্যাপারটা এমন আকস্মিক যে একটা চিৎকারও তার গলা থেকে বের হল না। একটানে অনেকটা জলের তলায় গিয়ে আলগা হল সুতোটা। বাতাসের জন্যে ছটফটিয়ে ভেসে উঠল আকাশলাল। চোখ মেলে দেখল পাড় অনেক দূর। তখন হ্যাঁচকা টান। কাঠির মতো ডুবে গেল তার শরীর। জলের মধ্যে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিতে। চোখে ঘোলা জল। হাঁ করতে তাই ঢুকে গেল পেটে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আকাশলাল প্রাণপণে ওপরে উঠে এল। তার চোখে অন্ধকার।

বাতাস ঢুকল বুকে। ঝিলের মাঝখানে সে। আবার টান এল। শরীরটা পেছনে পা সামনে

ছুটে যাচ্ছে। এইসময় চেতনার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে সে মাছটাকে দেখতে পেল। চোয়াল শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণপণে সুতোটাকে ছাড়াতে চাইল সে মাছটার শরীর থেকে। মাছটা ভয় পেল। জলজ শ্যাওলার মধ্যে সে ঢুকে যেতেই আকাশলালের শরীরটা এলিয়ে পড়ল। ছেঁড়া কাগজের মতো ভাসতে-ভাসতে শ্যাওলার মধ্যে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

সিসেটা আটকে গিয়েছিল দাঁতে। মাছটার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কারণ ইতিমধ্যে তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। একটা সুগন্ধী ব্যাঙকে কপাৎ করে গিলে ফেলতেই অতবড় একটা ওজন তাকে টানতে হবে সে ভাবেনি। মরিয়া হয়ে এতক্ষণ ঝিলময় ছুটে বেরিয়েছে সে। কিন্তু কিছুতেই ওজনটা তাকে ছেড়ে যায়নি। শেষপর্যন্ত সে কারণটা বুঝতে পারল। ওই নেতিয়ে পড়া মানুষটার সঙ্গে সে এক সুতোয় বাঁধা পড়ে আছে। বাঁচতে হলে সুতোটাকে খুলতে হবে। কারণ ইতিমধ্যে বোঝা গেছে সুতোটাকে ছিঁড়বার সাধ্য তার নেই। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি হচ্ছিল অন্য কারণে, তার গলার কাছে ব্যাঙটা নড়ে বেড়াচ্ছে। ওটাকে বের করে দিতে পারলে খুশি হত সে। তার এমন যন্ত্রণার সময় ব্যাঙটা নড়ছে কেন? সে ওটাকে গিলতেও পারছে না শক্ত সিসের জন্যে। মাছটার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এই ঝিলের সম্রাট সে। চেহারায় অহঙ্কার আছে। সে মানুষটার শরীরের কাছে এসে লেজ দিয়ে একটা আঘাত করল। নরম কাদায় মানুষটার মুখ সামান্য নড়ল মাত্র। এবার মাছটা সুতোর অন্য প্রান্ত দেখতে পেল। মানুষের পায়ে বাঁধা আছে। টানাটানিতে আরও টাইট হয়ে গিয়েছে। কয়েকবার আঘাত করা সত্ত্বেও সুতো ছিঁড়ল না। সে আবার সাঁতরাতে লাগল। শ্যাওলার বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষের শরীরটাকে তার এবার বেশি ভারী লাগল। যতক্ষণ মানুষটার প্রাণ ছিল ততক্ষণ তাকে টেনে বেড়ানো সহজ ছিল। তবু বন্ধনমুক্তির আশায় মাছটা সমস্ত ঝিলময় ছোটাছুটি করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে বিশ্রামের জন্যে একসময় শান্ত হল। তবে এই ভেবে সে স্বস্তি পেল, আর যাই হোক মানুষটার ক্ষমতা নেই তাকে আক্রমণ করার। শুধু গলার কাছে ব্যাঙটা যদি না থাকত! কত সময় কেটেছে মাছটা জানে না। এরমধ্যে প্রয়োজনে সে ওপরে উঠেছে, বাতাস নিয়েছে। মানুষটা শুয়ে আছে তেমনি, একাকী। মাছটা তার ঘ্রাণ নিয়েছে। সুতোটা খুলে গেলে সে একবার দেখবে মানুষটাকে খুবলে। ক্রমশ ওর গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। লোভনীয় খাবার বলে মনে হচ্ছে। অনেকদিন পেট ভরাবে মানুষটা। শুধু সুতো খুলতে যা দেরি, ক্লান্ত মাছ ঘোরের মধ্যে ছিল, হঠাৎ সে টান বোধ করল। কেউ তাকে ওপরদিকে টানছে। চকিতে প্রতিরোধ করল সে। কিন্তু ওপাশের শক্তি বেশ বেশি। বিহ্বল হয়ে সে দেখল নিচে শ্যাওলার মধ্যে শরীরটা নেই। সে টান লক্ষ করে ওপরে উঠে দেখল মানুষটা আরও ফেঁপে ফুলে ওপরে ভাসছে। জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের শক্তি যে এত বেশি আবিষ্কার করে মাছটা আবার ছুটতে শুরু করল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কারণ ওই মানুষটা কিছুতেই জলের তলায় নামতে চাইছিল না। মাছটা আরও কাহিল হয়ে পড়ছিল। শরীরটা ডুবছে আর ভাসছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল সে। তার বোধ হল মানুষটা তার শত্রু নয়, সে মানুষটার নয়, সর্বনাশ করেছে সুতোটা। এইটে থেকে মুক্তি পেলে ওরা দুজনেই বেঁচে যেত।

লগি দিয়ে টেনে-টেনে আকাশলালের বীভৎস শরীরটাকে তীরে নিয়ে আসা হল। যারা ভিড় করে কাণ্ডটা করছিল তারা আকাশলালের চেয়ে নিঃস্ব মানুষ। উৎসাহটা তাদেরই বেশি। মালিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। আকাশলালের বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে তিন হাজার টাকা পাওয়া গেছে। মাছ ধরতে গিয়ে লোকটা মরে গেল। চারশো টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে লোকটা তিন হাজার দিয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'সৎকার খরচা আমার। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি।' তারপরেই হিসেব করে নিল দুহাজার নয়শো পঞ্চাশে তার কতদিন চলবে। ঠিক অত টাকা নেই কাছে, কারণ মৃত্যুর খবর আর অর্থপ্রাপ্তির পর সে উদার হয়েছে। দিশির বদলে আশি টাকা দিয়ে বিলিতি কিনে এনেছে। সেইটে হাতে নিয়ে সে উৎসাহ দিচ্ছিল এবার দেহটাকে টেনে তুলতে।

এইসময় মেমসাহেব এলেন। তাকে দেখে পথ ছেড়ে দিল অধনগ্ন মানুষগুলো। মেমসাহেব

আকাশলালের শরীরটার দিকে তাকিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, 'আহা বেচারা! ওর সৎকারের টাকাটা আমি দেব।'

'না, আমি।' চিৎকার করে উঠল মালিক।

মেমসাহেব ঠোঁট বেঁকালেন। দেহটাকে তোলা হল। ফুলে পচন শুরু হয়েছে। এবং তখনই একজন আবিষ্কার করল ওর পায়ে সুতো বাধা। কালো পুরু চামড়ায় সেটা বসে আছে। মেমসাহেব তিনহাত পিছিয়ে গেলেন, 'ইস, কি গন্ধ!'

মালিক এগিয়ে এল, 'গন্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি, কয়েক পেগ না হয় যাক।' তারপর বোতলের মুখ খুলে কিছুটা মদ ছড়িয়ে দিল আকাশলালের শরীরে। এবং পুরু কালো চামড়ায় পড়ল কয়েক ফোঁটা।

মেমসাহেব বললেন, 'হঠাৎ দেখছি বিলিতি?'

মালিক বলল, 'আরও অনেক কিছু দেখবে—যেমন দেখাচ্ছ!'

'দেখাবই তো!' চাপা গলায় বলল মেমসাহেব, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

আড়চোখে মেমসাহেবের পেটের দিকে দেখে নিয়ে মালিক বলল, 'তাই?' এইসময় হইচই উঠল। কয়েকটা হাতের টানে সুতো উঠে আসছে। এর শেষতক মাছটাকে দেখা গেল। কয়েকজন নেমে গেল জলে। মাছটা কোনও প্রতিবাদ করল না। হয়তো তার সেটা করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আকাশলালের মৃতদেহের পাশে সেই বিশাল মাছটাকে ফেলে দিতেই সে কয়েকবার শেষ চেষ্টা করল লাফাতে। ভিড়টা ভয় পেয়ে ছিটকে গেল দূরে। কয়েকবার আছাড় খেয়ে মাছটা আকাশলালের শরীর ঘেঁযে শুয়ে পড়ল. চোখ বন্ধ আকাশলালের পাশ থেকে সরিয়ে আনল তাকে দুজন।

মালিক নিজের মনে বলল, 'বড্ড পাকা মাছ, বিক্রি হবে না।'

মেমসাহেব মাথা নাড়ল, 'ফ্রাই-এর মাংস হবে না।'

মালিক বলল, 'তুমি পঁচিশ দাও, আমি পঁচিশ দিচ্ছি।'

মেমসাহেব ভুরু তুলল, 'কেন?'

'সৎকারের জন্যে। কপালে পুণ্যি হয় শুনেছি।'

'আধাআধি পুণ্যি!'

মালিক চিৎকার করে বলল, 'কেটে ফেল মাছটাকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ছুরি এসে গেল। ঝপাৎ করে কোপ পড়ল পেটে। গলগল করে রক্ত এসে পড়ল মৃত শরীরের পাশের মাটিতে। একজন সন্তর্পণে বঁড়শিটাকে বাঁচাতেই বোধহয় মাছের মুখ ফাঁক করে সিসে খুলে সুতোটাকে টেনে ছুরি চালিয়ে বঁড়শি আলগা করতেই ব্যাঙটাকে দেখা গেল। মানুষেরা হেসে উঠল, কারণ ব্যাঙটা বেঁচে আছে এখনও।

সন্তর্পণে তাকে মুক্ত করে মাটিতে ফেলে দিতেই সে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ পড়ে রইল। তারপর নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে লাফ দিতেই মৃত মাছটার শরীরে গিয়ে পড়ল, প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয় লাফটা তাকে টেনে নিয়ে এল আকাশলালের গলায়। এবং অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এখন ব্যাঙটা পরিচিত গন্ধ পেল। ভিজে-ভিজে মদের জল সে চুকচুক করে চেটে নিল জিভে। তৃতীয় লাফে সে নেমে গেল ঝিলের জলে। মেমসাহেব চাপা গলায় বললেন, 'তোমার নোংরা জামা থেকে আকাশলালের গন্ধ বের হচ্ছে।'

মালিক হাসল, 'তোমার কথায় আঁশটে গন্ধ, মাছটার মতো।'

মেমসাহেব চকিতে সেদিকে তাকালেন। তারপর অজান্তে একটা হাত উঠে গেল পেটে। সেখানে এক দুই এবং তৃতীয় লাফ দিয়ে কেউ শান্ত হল। আপাতত।



আঁচড়

এখন দিনদুপুরেই বাড়িটাকে ভূতুড়ে বলে মনে হয়।

এই বাড়ির শেষ অধিবাসী হরশংকর রায় দুপুরবেলায় চিঠি পড়ছিলেন। বর্ধমানের জীবনবাবু লিখেছেন, আপনার মেয়েকে আমাদের ভালো লেগেছিল। পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু সে যদি বিবাহ করবে না বলে স্থির করেই থাকে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন অপমান নাই বা করতেন!

চিঠিটা পড়ে পাংশু চোখে ভেতরের দিকে তাকালেন হরশংকর। বিশাল লম্বা বারান্দায় ক্যারামের বোর্ড পাতা হয়েছে। খটাখট স্ট্রাইকারের শব্দ উঠেছে। এপাশে একটি বাচ্চা ছেলে, ওপাশে যে সে খুব সিরিয়াস। অসম সঙ্গীর সঙ্গে খেলাতেও তার মনোযোগ দেখবার মতো। পঁচিশের গায়ে বয়স, এক নজরে চোখ জুড়িয়ে যায়, শুধু বাঁ কপালে ইঞ্চিখানেক গভীর দাগ ছাড়া। ওপাশে রেডিওতে নাটক হচ্ছে, রেডিওটা ক্যারামবোর্ডের পাশে।

দ্বিতীয় চিঠিটা খুললেন হরশংকর। কলকাতার চৌধুরী কোম্পানির চিঠি। এর আগে অনেকগুলো পেয়েছেন। এই বাড়ির অন্যান্য শরিকরা তাদের অংশ ওই কোম্পানিকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন কর এত বাকি ছিল যে বাড়ি নিলামে উঠতে যাচ্ছিল। তাছাড়া এই পাড়াগাঁয়ে কেউ আজকাল পড়ে থাকতে চায় না। শহরে একটা ব্যবস্থা করে যে যার মতো সরে পড়েছে। এই পুরোনো শরিকি বাড়িতে কে থাকবে। কোম্পানি লিখেছে আর একমাস পরেই তাদের কাজ শুরু হবে। অতএব ওই সময়ের আগেই তাঁকে এই বাড়ি ছাড়তে হবে। কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে একজন ইঞ্জিনিয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসবেন।

রেডিওতে যে নাটক তার এখন শেষ পর্ব। প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডা চলছে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে। হরশংকর ব্যস্ত হলেন। তাঁর নজর গেল ক্যারামবোর্ডের দিকে। দুটো হাতে কান চাপা দিয়ে মেয়েটা পাথরের মতো বসে আছে। মুখচোখে অদ্ভুত যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। হরশংকর তাঁর অনড় শরীর নিয়ে দৌড়ে যাওয়ার আগেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। সঙ্গী বালক বিস্ময়ে তাকে দেখছে। হরশংকর রেডিওটা বন্ধ করে মেয়েকে ধরলেন। মুহূর্তে নেতিয়ে পড়ল সে। হরশংকর উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকলেন, সুবর্ণা, মাগো।

একমাস সময় এমন কিছুই নয়। তিন ছেলের সঙ্গে এই নিয়ে মনোমালিন্য। তারা চাইছে হরশংকর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তাদের কাছে থাকুক। কিন্তু কলকাতা শহরে এই মেয়ে কিছুতেই যাবে না। কোনওরকম চিৎকার চেঁচামেচি ওর নার্ভ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনলেই সে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ করে। এই কারণে মেয়েটা কলেজে পড়তে শহরে যেতে পারেনি, এই জন্যেই গ্রামের নির্জনতা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। ওই রকম ঘটনা ঘটলে সারাটা দিন আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকে মেয়েটা। অবশ্যই এটা একটা মানসিক ব্যাধি, মনের ডাক্তার দেখানো দরকার। ছেলেরা বলেছেও। কিন্তু কিছুতেই সুবর্ণাকে এই গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আজ রেডিওতে অমন নাটক হবে তা কে জানত। শায়িত কন্যার পাশে বসা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হরশংকর বললেন, আজ আবার চিঠি এসেছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসছে।

কেন? সুধাময়ী মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে থেমে গেলেন।

বাড়ির দখল নিতে বোধহয়। একমাস সময় দিয়েছে। কি যে করি!

এখানেই থাকতে হবে। দত্তরা শুনছিলাম বাড়ি ভাড়া দেবে।

অসম্ভব। এই গ্রামে আমি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকব?

তাহলে?

তাহলে শহরেই যেতে হবে। বর্ধমানের জীবনবাবু চিঠি দিয়েছেন। বেশ কড়া চিঠি। তোমার মেয়ে বিয়ে করবে না যখন তখন আর পাঁচটা লোককে বিরক্ত করা কেন? হরশংকর উত্তেজিত হতে গিয়ে সামলে নিলেন। সুবর্ণা ঘুমুচ্ছে। সুধাময়ীর চোখে জল, আঙুল সুবর্ণার কাটা দাগের ওপর।

পরনে হলুদ শাড়ি, খোলা চুল সুবর্ণা তাদের বারদালানে এসে দাঁড়াল। তার মুখ শান্ত, চেহারায় স্নিগ্ধতা কিন্তু একটা গাম্ভীর্যের ছায়া চাহনিতে, ঠোঁটের কোণে। বারদালানের সামনে অপেক্ষা করছিল চার থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা। এরা সবাই এই গ্রামের নিম্নশ্রেণীর চাষি পরিবারের। এদের পোশাক দেখলেই সেটা বোঝা যায়। সুবর্ণাকে দেখেই সবাই কলকল করে উঠল। সুবর্ণা বলল, আস্তে-আস্তে চিৎকার করে একসঙ্গে কথা বলতে নেই।

শিশুরা শান্ত হল। এখন ওরা সুবর্ণার সামনে। প্রতিদিন দুপুরে যদি কোনও বিঘ্ন না ঘটে তাহলে এটা সুবর্ণার নেশা। গ্রামের এই সব শিশুদের সে পড়ায়। এদের অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে। বিভিন্ন রকমের ছড়া শেখার পালা চলছে। এই একটি কাজ করে আনন্দ পায় সুবর্ণা। এইসব অবহেলিত শিশুদের সঙ্গে এইভাবে সময় কাটিয়ে সে তৃপ্ত হয়।

সুবর্ণা ছড়া বলছিল, শিশুরা তাই কচি গলায় আওড়াচ্ছিল। এক সময় সুবর্ণা চুপ করতেই শিশুরা সরল গলায় উচ্চারণ করল, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।

সুবর্ণা চোখ বন্ধ করে ছিল, হঠাৎ শিশুরা থেমে যেতে সে অবাক হয়ে চোখ খুলতেই দেখল একটি সুঠাম পুরুষ শিশুদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সুবর্ণার কপালে ভাঁজ পড়ল।

যুবক বলল, মাপ করবেন, আমি হয়তো ব্যাঘাত ঘটালাম। এই ছড়াটা শুনে মজা লাগল।

সুবর্ণা বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল, মজা লাগল মানে? কখনও শোনেননি?

এই মানুষকে সে কখনও দ্যাখেনি। তবে সে যে এই গ্রামের মানুষ নয় এটা পরিষ্কার।

শুনেছি, কিন্তু কখনও মানেটা বুঝতে চেষ্টা করিনি।

মানেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বোঝাতে হবে না?

হবে। কারণ সাত নয়, এখন বোধহয় সাতের কোটি হয়ে গেছে সংখ্যাটা।

আপনি রেগে যাচ্ছেন। যুবক হাসল, মানুষ হয়নি বাঙালি হয়েছে এটা বোঝা সোজা। কিন্তু অত কোটি বাঙালির জননী মুগ্ধ হলেন কোন যুক্তিতে এটা ভেবেছেন!

আপনি কী চান?

কিছু না। এই বাড়িতে হরশংকর রায় থাকেন, কিভাবে তাঁর দর্শন পাব?

ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরে উঠে যান।

ধন্যবাদ। যুবক বিনম্র ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট পথে এগোল। সুবর্ণার কপালের ভাঁজ কিছুতেই মেলাচ্ছিল না।

হরশংকর বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে এই যুবককে আপ্যায়িত করবেন। সুধাময়ী বিস্মিত হয়ে মাথায় আঁচল ঢেকে হরশংকরের পেছনে দাঁড়িয়ে। ওপাশের চেয়ারে যুবক। যুবকের নাম সোমনাথ।

হরশংকর বললেন, আমি আজই জীবনবাবুর চিঠি পেয়েছি। আমার খুব লজ্জা করছে, উনি ঠিকই লিখেছেন।

সোমনাথ বলল, আপনাদের অসুবিধেটা কোথায়?

এবার সুধাময়ী বললেন, কোনও অসুবিধে নেই বাবা। মেয়ে জেদ ধরেছে যে সে বিয়ে করবে না।

সোমনাথ হাসল, সেটা জানি। কিন্তু কেন? কোনও ব্যাক্তিগত অসুবিধে আছে?

হরশংকর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন, না না, মেয়ে আমার খুব ভালো।

আমার ব্যাপারে কোনও আপত্তি আছে?

না, তোমার মতো ছেলে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

আপনারা জানেন আমি কোথায় চাকরি করি?

শুনেছি কলকাতায়। খোঁজখবর নেওয়ার আগেই তো...।

কিছু মনে করবেন না, আপনারা বলছেন কোনও অসুবিধে নেই অথচ আপত্তি আছে। এটাই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। শুনে আমার কৌতূহল হল। ওঁকে বাইরের দালানে দেখলাম। দেখে অবশ্য কিছু বোঝা গেল না। সোমনাথ উঠল।

সুধাময়ী ব্যস্ত হলেন, না বাবা, আমার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ।

সোমনাথ বলল, এটা আপনাদের ব্যাপার। আপনাদের তো এক মাসের মধ্যে এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!

হরশংকর চমকে উঠলেন, তুমি কি করে জানলে? এ খবর তো গ্রামের কেউ জানে না।

আমি জানি। কবে ছাড়বেন?

হরশংকর কিঞ্চিৎ হতভম্ব। এই খবর গ্রামের কেউ জানে না। বললেন, দেখি। মেয়েটার জন্যেই—।

সোমনাথ বলল, একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি। আমি ইঞ্জিনিয়ার। চৌধুরী কোম্পানিতেই আছি। এই গ্রামের পাশের নদীতে যে কাজ হবে সেটা করার দায়িত্ব আমার ওপর। সেই সঙ্গে এই বাড়িটির দখল নিয়ে অফিস শুরু করতে কোম্পানি আমাকেই পাঠিয়েছে। চাকরি বজায় রাখতে গেলে আমাকে সবসময় ভদ্র কথা না-ও বলতে হতে পারে। আচ্ছা নমস্কার, চলি।

দুটি বিস্মিত মানুষকে সেই অবস্থায় রেখে সোমনাথ নেমে এল। বিশাল বাড়ি। সবকটি মহল এখন তালাবন্ধ। এই এলাকাটা খালি হয়ে গেলে কাজ শুরু হবে। পাশের নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। বিরাট অর্ডার পেয়েছে কোম্পানি।

সামান্য শব্দ হলেই মনে হয় অনেকগুণ হয়ে ফিরে এল। একটা বুকচাপা শূন্যতা চারধারে। সোমনাথ জুতোয় শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল সামনে সুবর্ণা। তার আঁচল পিঠে ঘেরা, শিশুরা নেই। সোমনাথ পাশ কাটিয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুবর্ণা ডাকল, শুনুন।

সোমনাথ ফিরে দাঁড়ল জিজ্ঞাসু চোখে।

সুবর্ণা বলল, মুগ্ধ জননী—এই শব্দ দুটোতে আপনার আপত্তি কেন?

আপত্তি আছে। বোধহয় কবিও সেটাই ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। সতের কোটি মানুষের মা কোন যুক্তিতে মুগ্ধ হন যদি তিনি তাদের মানুষ করতে না পারেন? কোনও অধিকার নেই, তাঁর মা হওয়ার, মুগ্ধ হওয়া তো অনেক দূরের কথা, তাই না?

সুবর্ণা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সোমনাথের মুখের দিকে। সোমনাথ হাসল, এই ধরুন, সারা দেশে কত নদী। আমরা কবিত্ব করে বলি নদীমাতৃক দেশ। আমরা যদি বাঁধ না গড়তাম, যদি নদীর জল নিয়ন্ত্রিত না করতাম, তাহলে এই নদীমাতৃক দেশটা সারাবছর বন্যায় ডুবে থাকত। শুধু আবেগ নয়, সেইসঙ্গে দায়িত্ববোধ না এলে জননী শব্দটির প্রতি সম্মান জানানো হয় না। আমি বোধহয়

আপনাদের পড়শুনায় আজ ক্ষতি করেছি, খুব বিরক্ত করলাম তার জন্য আমি আবার ক্ষমা চাইছি। চলি। সোমনাথ পাশ ফিরে বেরিয়ে গেল। সুবর্ণা কোনও কথা বলল না। ওর দৃষ্টি শূন্য। কোনও বোধ যেন কাজ করছে না।

নদীর ধারে জরিপ চলছিল। বিশাল নদী প্রতি বছর কূল ছাপিয়ে দেশ ভাসায়। এই নদীর গায়ে বাঁধ পড়বে। বিজ্ঞান চেষ্টা করবে সেই প্রতিহত জল সঞ্চিত করে চাষের জন্যে নির্জলা জমিতে পৌঁছে দিতে। নদীর ধারে অস্থায়ী তাঁবু পড়েছে।

তাঁবুর সামনে নিচু টেবিলে প্ল্যান রেখে সোমনাথ দেখছিল। তার কিছু সঙ্গী দুপাশে। এই সময় চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল সুবর্ণা এগিয়ে আসছে। সঙ্গীদের কাজটা চালাতে বলে সে মুখোমুখি হল, আরে আপনি?

আপনারা কবে থেকে বাড়ির দখল চান? শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল সুবর্ণা।

যে-কোনও দিন হলেই হয়। তবে আপনাদের একমাস শেষ হতে তো দেরি আছে। সোমনাথ হাসল, এখানে আপনাকে বসতে বলব তার কোনও উপায় নেই।

আমি বসতে আসিনি, কিন্তু আপনি আমাদের বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন? কোম্পানির হুকুমমতো বাড়ির দখল নিতে, না আমি কেন বিয়ে করতে চাইনি তার খোঁজ নিতে? ঠোঁট কামড়াল সুবর্ণা।

যদি বলি দুটোই!

তাহলে সীমা ছাড়িয়েছেন। কোম্পানির হয়ে যেটুকু জানার সেটুকুই জানতে চাওয়া আপনার উচিত ছিল। আপনারা যেদিন চান তার তিনদিন আগেই জানাবেন, আমরা বাড়ি ছেড়ে দেব।

কোথায় যাবেন?

সেটা আপনার জানার অধিকারে নেই।

ঠিক এইসময় নদীর ধারে একটি গোলমাল শুরু হল। জরিপ করতে আসা দলের একজন শ্রমিক চিৎকার করে একজনকে কিছু বলতেই সে উত্তেজিত হয়ে গালাগাল দিতে লাগল। ক্রমশ উত্তেজনাটা শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সোমনাথ তার এক সহকারীকে ব্যাপারটা জানতে পাঠিয়ে সুবর্ণার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। মেয়েটার মুখ অসম্ভব পালটে গেছে। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সোমনাথ এগিয়ে এল, আপনার কি হয়েছে?

এই সময় গোলমালটা থেমে গেল। সোমনাথের সহকারী তাদের সঙ্গে কথা বলছে। সোমনাথের সেদিকে লক্ষ নেই, সে এই মেয়েটির পরিবর্তন ঠাওর করতে পেরে বিব্রত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত চেতনার শেষপ্রান্ত থেকে ধীরে-ধীরে নিজেকে ফিরে পেল সুবর্ণা।

এবং তখনই তাকে প্রচণ্ড অবসন্ন দেখাল। নীরক্ত মুখে সে বলল, চলি।

কিন্তু আপনাকে প্রচণ্ড অসুস্থ দেখাচ্ছে, কি হয়েছে আপনার?

কিছু না। আচ্ছা—।

সুবর্ণা ফিরতেই সোমনাথ তাকে বাধা দিল, অসম্ভব। এইভাবে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না। চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

সুবর্ণা শেষবার আপত্তি জানাল, মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন!

সোমনাথ বলল, আমি জানি, আপনি খুব জেদি মেয়ে। কিন্তু এবার আপনাকে আমার কথা শুনতেই হবে।

সার্ভের কাজের জন্যে আনা একমাত্র জিপটাতে সোমনাথ সুবর্ণাকে পৌঁছে দিচ্ছিল। ড্রাইভিং সিটের পাশে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল সুবর্ণা। বিশাল বাড়িটার সামনে এসে জিপটাকে দাঁড় করিয়ে

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন লাগছে?

সুবর্ণা মুখ তুলল। সামান্য মাথা নেড়ে নামবার জন্যে পা বাড়াতেই সোমনাথ আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আপনার কপালে এই আঁচড়টি কিসের?

সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল সুবর্ণা। তারপর বলল, আমার দুর্ভাগ্যের।

দুর্ভাগ্য?

সোমনাথবাবু, আপনাদের অপমানিত করা হয়েছে বলে যদি মনে হয় আমি ক্ষমা চাইছি। আমি, আমি—, আমার বিয়ে করার কোনও মানসিকতা নেই।

এর সঙ্গে ওই আঁচড়ের কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে। আয়নায় এই আঁচড়টার দিকে তাকালেই মুগ্ধ জননীর অমানুষদের ছবি দেখতে পাই। তাছাড়া দেখলেন যে, আমি কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ি হঠাৎ হঠাৎ! আর কাউকে বিব্রত করতে—। সুবর্ণা কথা শেষ না করে ঠোঁট কামড়াল।

সোমনাথ বন্ধুর গলায় বলল, ছবিগুলো আমাকে দেখাবেন?

খানিক ভাবল সুবর্ণা। তারপর অন্য রকম স্বরে বলল, আমার কাছে একটা অ্যালবাম আছে। সেই অ্যালবামে প্রথম ছবি ওই বাড়িটার। এতটা জীর্ণ তখন ছিল না। এই গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আমার বাবা ছিলেন অষ্টম সন্তান। সমস্ত বাড়ি গমগম করত আট ভাইয়ের ছেলেমেয়ের চিৎকার চেঁচামেচিতে। আমি তখন শিশু। ঠাকুরদা মারা যাওয়ামাত্র চেহারা পালটে গেল বাড়িটার। যে যার সম্পত্তি আলাদা করে নিতে চায়। অধিকার ভাগাভাগি যে কি জিনিস সেটা তখন না বুঝতে পারলেও যে চেহারাগুলো চিনতাম সেগুলো অচেনা হয়ে গেল। দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি। কোনও ভাই যেন আর রক্তের বন্ধন সহ্য করতে পারছে না। আমি, সেই পাঁচ বছরের আমি, ওইরকম শুরু হলেই ভয় পেয়ে ঠাকুরমার কাছে চলে যেতাম। সেই মুগ্ধ জননী তখন ঠাকুরঘরে চোখ বন্ধ করে বসে তাঁর শালগ্রামশিলার সামনে কেঁদে যেতেন। আমি তাঁর আঁচল ধরে চুপ করে বসে ভাবতাম এই ঘরে যেন ওই স্বার্থের চিৎকারগুলো না ঢোকে। কিন্তু শহরে ঘরে আগুন লাগলে মন্দিরও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়িটার ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষ হয়ে গেলে জেঠারা ছুটে এলেন ঠাকুরঘরে। সেখানে ঠাকুরমার শালগ্রামশিলা রয়েছেন যে সোনার সিংহাসনে সেটাকে আটভাগ করতে হবে। সিংহাসন টুকরো করার জন্যে স্যাকরাকে সঙ্গে এনে হামলা করলেন তাঁরা। ঠাকুমা অনেক মিনতি করলেন তাঁর ঈশ্বরের সিংহাসনকে রেহাই দিতে। তাঁকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হল। আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে যখন সিংহাসনের ওপর শায়িত শালগ্রামশিলার দিকে ওদের নোংরা হাত এগিয়ে যাচ্ছে সেই সময় ঠাকুমার চিৎকার শুনতে পেলাম, খুকু, আমার ঠাকুরকে বাঁচা!

পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিলাম সামনে আর তখনই এক জেঠা সেই পাথরটাকে ছুঁড়ে দিলেন কোনও লক্ষ না করে। আর আমার কপাল যেন সেটাকে টেনে নিল। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। শুধু জ্ঞান হারাবার আগে রক্তের লাল পরদা চোখের সামনে চলে আসতে মানুষগুলোকে অন্যরকম মনে হয়েছিল।

নিশ্বাস নিল সুবর্ণা, এইসব ছবি আমার অ্যালবামে নেই। কিন্তু যখনই মানুষের স্বার্থসন্ধানী চিৎকারগুলো কানে আসে তখনই আমি কয়েকটা লাল নেকড়ের মুখ দেখতে পাই।

সোমনাথ মমতায় তাকাল, আপনার ঠাকুমা মুগ্ধ জননী ছিলেন কিন্তু সন্তানদের মানুষ করেনি!

হয়তো।

হয়তো নয়, নিশ্চয়ই। আপনাকে বলেছিলাম না, নদীর জল ভালো, কিন্তু তার শরীরে বাঁধ প্রয়োজন। মানুষেরও তেমনি, শিক্ষার বাঁধ, রুচির বাঁধ, সংযমের বাঁধ—কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বলুন!

আপনি নিজেকে নষ্ট করতে চান, কেন?

নষ্ট করতে চাই?

নিশ্চয়ই। অতীতের একটি স্মৃতি কেন আঁকড়ে আছেন?

আমি না, স্মৃতিই আমাকে আঁকড়ে আছে। এই দায় নিয়ে আমি কারও জীবন অসুস্থ করতে চাই না। তাছাড়া আমার যেসব সন্তান আসবে তারাও তো একদিন সিংহাসন টুকরো-টুকরো করে নিতে পারে, পারে না?

সুবর্ণা নেমে দাঁড়াল। সোমনাথ বলল, দাঁড়ান। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বলল, মানুষ যখন প্রথম আগুনের ব্যবহার করেছিল তাতে তার হাত পুড়েছিল, কিন্তু তখনই যদি আগুনকে বাতিল করা হত তাহলে সভ্যতা তো এখনও আদিম গুহায় মুখ গুঁজে থাকত, তাই না?

মানে?

শুধু মুগ্ধতাই নয় তার সতর্ক ব্যবহার চাই, এটুকু নিশ্চয়ই জানেন! আপনার কপালের ওই আঁচড় এখন থেকে অন্য অর্থে ব্যবহার করুন।

কী অর্থ?

অভিজ্ঞতাই মানুষকে অভিজ্ঞ করে। আর অভিজ্ঞ মানুষই ঠিক কাজ করেন। শুনুন, আপনি মোটেই অসুস্থ নন। সতের কোটি মানুষের এই দেশে আপনার চেয়ে সুস্থ কেউ হতে পারে না। সেই সুযোগ কেন হারাচ্ছেন?

আমি ভয় পাই কেন! সুবর্ণার মুখে দ্বিধায় ছায়া।

সোমনাথ বলল, নদীর একদিকে বাঁধ দিলে অন্যদিক ভেসে যেতে পারে। কিন্তু দুটো দিক যদি বেঁধে ফেলা যায় তাহলে জল নিয়ন্ত্রিত হবেই। আপনি যদি আমাকে সেই সুযোগ দেন তাহলে সোনার সিংহাসন আর টুকরো-টুকরো হবে না।

সুবর্ণা হেসে ফেলল। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখল সোমনাথ। তারপর শূন্য বিশাল বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, এই এখান থেকে আপনার মাকে ডাকুন তো?

মাকে? এখান থেকে? কেন?

উত্তরটা একটু পরেই দেব।

শুনতে পাবে না বোধহয়।

শুনতে পায় এমন গলায় ডাকুন। একটি মেয়ে তার মাকে ডাকছে!

সুবর্ণা একটু দ্বিধা এবং মজা পেল। তারপর গলার স্বর উদাত্ত করে চিৎকার করে ডাকল, মা-আ—আ!

আর ওই একটি নাভি-নিঃসৃত ধ্বনি যখন সামনের বাড়ির কক্ষে-কক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল তখন তার মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা আচমকা পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। তার উজ্জ্বল মুখের সামনে একঝাঁক পায়রা ওই ধ্বনি শুনে পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল শরিকদের পরিত্যক্ত কক্ষ থেকে।

এই অমৃত শব্দটি কানে ফিরে আসতেই মুগ্ধ চোখে তাকাল সুবর্ণা সোমনাথের দিকে। সোমনাথ বলল, আপনার বাবা-মা ওপরের বারান্দায়। আমি কি ভেতরে যেতে পারি আপনার সঙ্গে?

নির্মেঘ সুবর্ণা সূর্যের মতো হাসল, হেসে মাথা নাড়ল।



টাটকা বরফের মাছ

ঠিক তিনদিনে মুকুন্দর গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গেল। এত মোটা যে হাঁটু গেড়ে বসতে কষ্ট হয়, কনুই ভাঁজ করা মুশকিল। সারাক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, চেয়ারে বসতেও কেমন অস্বস্তি হয়, টান ধরে। এছাড়া আর কোনও অসুবিধে নেই, জ্বরজারি, যন্ত্রণা অথবা কোনওরকম শারীরিক কষ্ট হচ্ছে না।

তিনদিন আগে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হয়েছিল সমস্ত শরীর শিরশির করছে। চামড়ার তলায় যেন কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরে দুজন বিখ্যাত ডাক্তার আছেন। গত তিনদিনে তাঁদের ওষুধ কোনও কাজ দেয়নি। চামড়া যে মোটা হয়েছে তা চট করে ধরা যায় না। হাত দিলে বোঝা যায় বেশ খসখসে, লোমগুলো ঝরে গেল দ্বিতীয় সকালে। আজ ব্লেড বসাতে গিয়ে হেরে গেল মুকুন্দ। ব্লেড বেঁকে গেল কিন্তু চামড়ায় আঁচড় পর্যন্ত পড়ল না। মুকুন্দর মাথায় এমনিতেই চুল কম ছিল, বংশের ধারা, সেগুলোও ঝরে গেল এর মধ্যে, দাড়ি কামাবার ঝামেলা আর নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে খুঁটিয়ে নিজেকে লক্ষ করেছে, মোটা চামড়ার জন্যে তার শরীরের কোনও পরিবর্তন হয়নি, ফোলেনি। ডাক্তার দুজন এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা সরাসরি দেশের সব বড় ডাক্তারদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। মুকুন্দ তাঁদের কাছে জেনেছে এদেশে কেউ এরকম পরিবর্তনের কথা শোনেনি। প্রতিকারের জন্যে একমাত্র বিদেশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মুকুন্দর সেই টাকা নেই তাছাড়া চতুর্থ দিন সকালে সে আবিষ্কার করল তার তিন-চারটে ছাড়া অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু একটি ব্যাপারে ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। খালি গা হলেই ওর একটা অভ্যেস হল দুহাতে নিজেকে একটু আদর করা। বগলের নিচে অথবা পেটে হাত বোলালে বেশ শিহরণ জাগত। তিনদিনে সেই অনুভূতিটা হারিয়ে গেল। এখন হাত বোলালে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

এবার মুকুন্দর পরিচয়টুকু সেরে নেওয়া যাক। পঞ্চাশ বছর বয়স, সাধারণ স্বাস্থ্য এবং নির্বাচনে ভোট দেয়। বন্ধুবান্ধব নেই, পিতামাতাও পরলোকে এবং একটি সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান। স্ত্রী তাকে তিনটি সন্তান দিয়েছেন। এর মধ্যেই বোঝা গেছে তাদের আগামী কালে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরে থাক, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ব্যারিস্টার হওয়ার যোগ্যতাও নেই। মুকুন্দ কোথায় পড়েছিল একমাত্র দুষ্ট চরিত্রের মহিলারাই প্রৌঢ়া বয়সে যুবতী থাকেন। তাই সে নিয়ত স্ত্রীর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাত। কিন্তু তাকানো আর সেটা প্রকাশ করা ভিন্ন কথা। সুন্দরী স্ত্রীদের আধিপত্য চিরকালই সংসারে স্বীকৃত এবং মুকুন্দ তাই এই সংসারে খুব নিরীহভাবে বাস করে। ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর তাদের শোওয়ার জায়গা আলাদা হয়েছিল এবং মুকুন্দ বুঝতে পারছিল যৌবন যাওয়ার সময় বড্ড কাঁদিয়ে যায়। মুকুন্দ যে চাকরি করে তাতে খাওয়াপরার তেমন অসুবিধে হয় না। সেই সুবাদে তার একটি রিভলভার আছে। সপ্তাহে দুটি দিন সে সেটা পকেটে রাখতে পারে। অবশ্য আজ অবধি কখনও ট্রিগারে হাত দিতে হয়নি।

তিনদিন বাদে যখন মুকুন্দর স্ত্রী বুঝেছিল এটা শুধু চামড়ার পরিবর্তন, তখন তার কান্না থেমেছিল। এই তিনদিন সে মাঝেমাঝেই ককিয়ে কেঁদেছে। এমন উদ্ভট রোগেও মানুষটা যে মরে

যাচ্ছে না তাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিল, 'তা বাবা, তোমার গায়ের চামড়া চিরকালই মোটা—!'

মুকুন্দ এইরকম সংলাপে আশ্বস্ত হল। গত তিনদিনে স্ত্রীর বিলাপে সে মনমরা হয়ে ছিল। খুব আদরের কেউ বিলাপ করছে অথচ তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না এটা ভাবা যায় না। প্রথম দিনে পিঠে শুধু হাত রেখেছিল। তার নিজের কোনও অনুভব হয়নি কিন্তু স্ত্রী শিউরে উঠেছিল। কান্না-কান্না গলায় আঁতকে বলেছিল, 'ওমা, কি ভারী হাত? সরাও সরাও।' শেষের শব্দ দুটোতে ধমকের সুর স্পষ্ট।

তৃতীয় রাত্রে শুতে গিয়ে মুকুন্দ আবিষ্কার করল তার খাটের মশারি টাঙানো নেই। এখানে চড়ুই পাখির সাইজে মশা ঘুরে বেড়ায়। বিরক্ত হয়ে সে বড় ছেলেকে ডাকল। আঠারো বছরের ছেলে দাঁত বের করল, 'মা তোমার চামড়ার এক্সপেরিমেন্ট করবে বলছে। মশা কামড়ালে চেঁচিয়ে ডেকো।'

'তোর মা কোথায়?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন অনেক কেঁদেছে তো!'

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। কানের কাছে ভনভন শব্দ হচ্ছে। ইচ্ছে করে বেডসুইচ নেভাল না সে। বিশাল চেহারার একটা মশা এসে তার ডান হাতে বসল। বাঁ হাতটা নিঃশব্দে তুললেই ব্যাটাকে খুন করা যায়। কিন্তু মশাটা হুল ফোটাতে চাইছে অথচ তার একটুও লাগছে না। মুকুন্দ পিটপিটিয়ে দেখল মশাটা বেশ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তারপর ভোঁ করে উড়ে গলে। এই পুরু চামড়া ভেদ করতে গিয়ে বেচারার হুলটাই ভেঙে গিয়েছে। তারপর আরও তিনটে এল। খা তোরা, কত রক্ত খাবি খা! মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে তিনটেই উড়ে গেল। মুকুন্দ চোখ বন্ধ করল। অথচ ঘুম আসছে না। কানের কাছে শব্দ হলেই ভয় লাগছে। সে শেষ পর্যন্ত দুটো কাপড়ের টুকরো কানের ফুটোয় গুঁজে দিল।

পরদিন সকালেই বড় ছেলে চেঁচাল, 'মা দ্যাখো, বাবাকে একটাও মশা কামড়ায়নি!'

স্ত্রী ছুটে এলেন। খানিকটা দূর থেকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'তাই তো! তুমি আর মানুষ নেই গো! তোমাকে খোঁচালেও রক্ত পড়বে না।'

মেজ ছেলে বলল, 'খুঁচিয়ে দেখব বাবা?'

মুকুন্দ চমকে উঠল, ' খোঁচাবি কি? আমি তোর বাবা না?'

'স্ত্রী বললেন, 'আহা, ছেলেটার সাধ হয়েছে, তোমার সবতাতে না!'

মেজ ছেলে একটা শিক নিয়ে এসে মুকুন্দর পিঠে ঠেকাল। স্ত্রী বললেন, 'আস্তে চাপ দিস।' শেষ পর্যন্ত সরু শিকটা বেঁকে গেল। কিন্তু মুকুন্দর চামড়ায় সামান্য আঁচড় পড়ল না। একটু কষ্ট হল না মুকুন্দর, শুধু চাপ বোধ করেছিল। ছেলেরা হাঁ হয়ে গেল। স্ত্রী আবার ডুকরে উঠলেন, 'তুমি, তুমি আর মানুষ নেই!'

শোক পুরোনো হয়ে গেলে তার ওজন কমে যায়। চারদিনের দিন মুকুন্দকে বাজারে যেতে হল। আর যখন কিছুই করার নেই তখন সংসারের দিকে নজর দেওয়া দরকার। তিন দিনে দুই ছেলে বাজার থেকে বেশ মেরেছে। বাজারে গিয়ে সে হোঁচট খেল। একটাও মানুষ নেই সেখানে। শোনা গেল সরকারি অফিসে শহরের লোক লাইন দিয়েছে আলু-পেঁয়াজের জন্যে। এখন আর বাজারের জায়গায় বাজার বসছে না। প্রায় শূন্যহাতে ফিরে আসতেই ছেলে দুটো ফিক করে হাসল। স্ত্রী বললেন, 'তুমি লাইন দিতে পারলে না? ওদের দিলেই তো টাকা মারবে! আমার হয়েছে জ্বালা!'

'টাকা মারবে আর তুমি কিছু বলবে না?'

'কী করে বলব? এটা নাকি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ!'

মুকুন্দ থতমত হয়ে গেল। কিন্তু সে আবিষ্কার করল তার তেমন রাগ হচ্ছে না। এমনিতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা তার কমে এসেছে। ব্যাপারটা সে ইচ্ছে করেই কাউকে বলছে না। সারাদিন না খেলেও

তেমন খিদে পাচ্ছে না। বাজার থেকে মারুক আর যাই করুক তাতে তার কি এসে যায়! আবিষ্কার আর প্রতিবাদ যাদের ব্যাপার তারাই করুক। সে শুধু মাইনে এনে দিয়ে খালাস।

চতুর্থ দিনে দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটল। বিকেলবেলায় প্রণব এল খবর নিতে। মুকুন্দর সঙ্গে কাজ করে। মুকুন্দ তিন দিন অফিসে যায়নি কেন সে তা জেনে গেছে। প্রত্যেক শুক্রবার অফিস থেকে যে কাজটা করতে মুকুন্দকে ষাট কিলোমিটার যেতে হয় প্রণব তার সঙ্গী। মদ জুয়ো ইত্যাদিতে প্রচণ্ড আসক্ত কিন্তু ব্যবহারে কোনও খুঁত নেই। প্রণব জানতে এসেছিল সে কতদিন ছুটিতে থাকবে! প্রণবকে মোটেই পছন্দ করে না মুকুন্দ। কথা বলতে-বলতে প্রণবের চোখ শুধু স্ত্রীর ওপর আটকে যায়। আর বয়স্কা সুন্দরী মহিলা হলে যা হয়, প্রণব এলে যেন হেসে গলে পড়ে। এই নিয়ে বলতে গিয়ে মুখঝামটা খেয়েছে মুকুন্দ আগে।

তা আজ প্রণব এসে যখন ঘরে ঢুকল তখন সে খাটে শুয়ে। প্রণবের পেছনে এলেন স্ত্রী, ' দেখুন না, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই কিন্তু ভেতরে-ভেতরে চামড়া মোটা এত হয়েছে যে মশাও কামড়ায় না।'

মুকুন্দর হাতে হাত রেখে প্রণব জিজ্ঞাসা করল, 'কদ্দিন থেকে মোটা হচ্ছিল?'

'তিন দিন।'

'তাই! ইদানীং বস তোমাকে ঠুকলে তোমার গায়েই লাগত না। হাঁটাচলা করতে অসুবিধে হচ্ছে?' প্রণব প্রশ্নটা স্ত্রীকে করল।

' মোটেই না। দিব্যি আছে।' স্ত্রী জবাব দিলেন।

'তাহলে কাল অফিসে আসছ?'

'দেখি।'

'তবে তোমার শরীর বেশ শক্ত হয়ে গেছে। কেউ মারলেও লাগবে না।'

প্রণব দাঁত বের করে হাসতেই মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল। তারপর কথাটার জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার জলবিয়োগ করার দরকার ছিল। কিন্তু বাথরুমের দিকে তাকাতেই দেখল দরজাটা বন্ধ। সে বাগানে নেমে এল। নামেই বাগান, আগাছার ভিড়ে চারধার ঢাকা। হঠাৎ তার মনে হল ওই ঘরে প্রণব আর স্ত্রীকে সে একলা রেখে এল, ছেলেরাও ধারেকাছে নেই, অথচ তার তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আগে হলে সে প্রাণ থাকতেও এটা পারত না, এখন ওই মনে হওয়া ছাড়া কোনও অনুভব নেই। প্রণবকে সন্দেহ করে বুক জ্বলে যাচ্ছে না বরং বেশ আরাম লাগছে।

জলবিয়োগ করা হয়ে গেলে দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল। বড়-বড় ঘাসের গায়ে ব্যাটা আটকে ছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল মুকুন্দর পায়ে। আঁতকে উঠতে গিয়ে শব্দটা গিলে ফেলল সে। জোঁকটা যেন ছটফট করছে। কয়েকবার পায়ের বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত পা থেকে ঘাসে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেল। দৃশ্যটাকে চোখের ওপর ঘটতে দেখল মুকুন্দ।

বাগানে ঘোরাফেরা করতে করতেই স্ত্রীর ডাক শুনতে পেল, 'কী হল, শুনছ? আমি প্রণব ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু বের হচ্ছি, ডাক্তারের কাছে যাব।'

মুকুন্দ ঘাড় নাড়ল, যাবে যাও। আর তখনি সে ছোট মেয়েকে আসতে দেখল। এটি সবার শেষে, বড্ড মায়াময় চোখ দুটো, একটু বেশি বয়সে হওয়ায় এখনও বয়স সাতে পড়েনি। মুকুন্দকে দেখে সে যেন ভয়ে-ভয়ে তাকাল, তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভালো মা। খুব ভালো।'

'তোমার গায়ের চামড়া খুব মোটা হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ মা, জোঁকটাও পালাল।'

'সাপ কামড়াতে পারবে না?'

'বোধহয় না।'

'তোমার ব্যথা লাগবে না—কি মজা, তাই না! তাহলে মা বলল কেন তোমার কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকতে!'

আগে হলে মুকুন্দ এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র করত। আজ হাসল। মেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাবা, তোমার যখন ব্যথা করে না তখন তুমি খুব বীর, না?'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল। সেটা কি অর্থে সে নিজেই জানে না। তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়। অনেকেই তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। মুকুন্দ দেখল একটা মিছিল চাই-চাই দাবিতে চলে গেল। এবং তাদের পেছন-পেছন প্রণব আর স্ত্রী।

পরদিন স্নান-খাওয়া সেরে মুকুন্দ বের হল। আজ রাত্রে সে ফিরবে না, এটা চাকরির অঙ্গ। বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখল বেজায় ভিড়। অনেকক্ষণ গাড়ি আসছে না, সবাই সরকারি ব্যবস্থার সমালোচনায় সোচ্চার। মুকুন্দ একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটা শুরু করল। মাইলখানেক, আগে খেয়েদেয়ে রোদ মাথায় নিয়ে হাঁটার কথা ভাবতে পারত না, এখন সেসব খেয়ালেই এল না। মাঝপথে বাদুড়ঝোলা বাসটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল। একটা লোক বলল, 'এ শালার দেশে বাস করা যায় না!'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল। সেটা কি অর্থে তা সে নিজেই জানে না।

অফিসে যাওয়ামাত্র সবাই উৎসুক চোখে মুকুন্দকে দেখতে লাগল। তাদের এই অফিসে মানুষের সংখ্যা কম, কোনও ইউনিয়ন নেই, মালিকই অফিসার। আর তার ম্যানেজার বড়বাবু। মুকুন্দ ঢোকামাত্র বড়বাবু চোখ ছোট করলেন, 'কি মশাই, আপনি নাকি গন্ডার হয়ে গেছেন?'

'গন্ডার?' মুকুন্দ মাথা নাড়ল।

'গায়ের চামড়া মোটা হয়েছে তো অফিস কামাই করেছেন কেন? এ তো আর অসুখবিসুখ নয় যে বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে! ওয়ার্থলেস!'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল, তারপর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। আজ প্রণব আসেনি। একটা নাগাদ মালিক তাকে ডেকে পাঠালেন, 'শরীর কেমন আছে?'

'ভালো।'

'বিনা নোটিশে কামাই আমি পছন্দ করি না। আপনাকে আজ যেতে হবে না, আপনি বরং হাসপাতালে যান।'

'হাসপাতালে কেন?'

'আপনার বাড়িতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

মুকুন্দ একটু অবাক হল। তার বাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে অথচ সে জানে না! মালিক আবার বললেন, 'প্রণববাবুর কাছে খবর এসেছে, তিনি আপনাকে জানাতে বলে বেরিয়ে গেছেন দরকারি কাজে।'

মুকুন্দ মাথা নাড়ল। আজকের রাতটা বাঁচা গেল। পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাগ কোলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে সজাগ হয়ে বসে থাকতে হয় পুরো জঙ্গুলে পথটা। সঙ্গে প্রণব থাকে বটে তবে সারাটা পথ ও মাল খায়। পথে নানান ধরনের বিপদ, বিশেষ করে হাতি আর ডাকাতের। তাদের সঙ্গে রিভলভার থাকে বটে কিন্তু কোনওদিন বিপদে পড়তে হয়নি। ওই টাকা পৌঁছে দিলে কোম্পানির কারখানায় পেমেন্ট হয়। শুক্রবার রাতের মধ্যে টাকাটা পৌঁছে দেওয়া চাই।

হাসপাতালের গেটেই বড়ছেলের সঙ্গে দেখা হল, 'তাড়াতাড়ি যাও। বুড়িকে গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

মুকুন্দ পা চালাল। বুড়ি তার ছোট মেয়ে। তাকে গাড়ি চাপা দিয়েছে? কি করে দিল কে জানে!' নিশ্চয় রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। বুড়ি মরে গেলে—। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক মৃত মানুষের মুখ মনে পড়ে গেল। তাদের কথা আজকাল মনেও পড়ে না, কষ্টও হয় না।

পাগলের মতো কান্নাকাটি করছিল স্ত্রী। মেজছেলে তাকে ধরে রেখেছে, মুকুন্দকে দেখে ছুটে

এলেন স্ত্রী, 'কী হবে, বুড়ির কী হবে?'

মুকুন্দ নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় একজন এলেন, 'ওকে রক্ত দিতে হচ্ছে। মনে হয় বেঁচে যাবে। আপনাদের রক্ত ডোনেট করতে হবে, আসুন।'

স্ত্রী পাগলের মতো এগিয়ে চললেন, মুকুন্দ পেছন-পেছন। হঠাৎ স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'রক্ত চাইল যে!'

'আঃ, তোমার গায়ে ওরা ছুঁচ ফোটাতে পারবে? ওই চামড়া ভেদ করতে পারবে? আয় খোকা।' মেজছেলেকে নিয়ে স্ত্রী ভেতরে ঢুকে গেলেন।

মুকুন্দর একটু অস্বস্তি হল। সত্যি তো, তার গায়ে ছুঁচ ঢুকবে কি করে! মেয়েটাকে একবার দেখার চেষ্টা করেও পারল না সে। এখন দেখতে দেবে না। অতএব তার কিছুই করার নেই। নেই যখন তখন খামেকা কামাই করে কি হবে?

মালিক তাকে দেখে চমকে উঠলেন, 'একি, আপনি ফিরে এলেন যে!'

'কিছু করার নেই স্যার।'

মালিক খুশি হলেন। বোধহয় নিজেই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, বেঁচে গেলেন। তার আধঘণ্টা বাদে মুকুন্দ ড্রাইভারের পাশে বসে। কোলের ওপর টাকার ব্যাগ, হাতে রিভলভার। আজ প্রণব আসেনি। তার নাকি শরীর খারাপ। মালিক কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন, কিন্তু মুকুন্দ মাথা নেড়েছিল, সে একাই পারবে। প্রণব তো বসে মাল খায়!

দেরি হয়ে গিয়েছিল আজ। খুনিয়ার মোড়ের কাছেই বিকেল হয়ে গেল। দুপাশে ঘন জঙ্গলে ঝিঁঝি ডাকছে। ছায়া ঘন হয়ে আসছে। এখন কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে মানুষ নেই, এই সময় গাড়িও যায় না। প্রচণ্ড স্পিডে ছুটছিল গাড়িটা। ড্রাইভার মাঝে-মাঝে তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরতেই অনেক দূরে ঠিক রাস্তার ওপরে কিছু নড়তে দেখেই ড্রাইভার গাড়ি থামাল ব্রেক কষে। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'হাতি মালুম হোতা হ্যায়।'

এটা অবশ্য তেমন কিছু নয়, এ রাস্তায় হাতি বের হয় এবং যায়। মিনিট পাঁচেক বসে থাকার পরই রাস্তা পরিষ্কার হল এবং ঝুপ করে অন্ধকার নামল। ড্রাইভার স্টার্ট নিতে গিয়ে আবিষ্কার করল ইঞ্জিনটা শুধু গোঙানি ছাড়া অন্য কাজ করতে চাইছে না। একটা অশ্লীল শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে ড্রাইভার নেমে গেল। তারপর মুখ শুকিয়ে এসে বলল, 'বেল্ট টুট গিয়া সাব!'

অর্থাৎ এখন এক পা যাওয়ার উপায় নেই। মুকুন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। আজ রাত্রে টাকাটা পৌঁছে দেওয়ার কথা, কাল ভোরে পেমেন্ট না হলে কুরুক্ষেত্র হবে। আর এই নির্জন জঙ্গলে এইভাবে বসে থাকা মানে আত্মহত্যা করা। এখন ভরসা যদি কোনও গাড়ি এই পথে যায়। তাহলে তার পেছনে জিপটাকে জুড়ে দেওয়া যায়।

জঙ্গলে খুব দ্রুত অন্ধকার নামে। ড্রাইভার লোহার হ্যান্ডেলে ন্যাকড়া পেঁচিয়ে পেট্রলে ডুবিয়ে মশাল জ্বালল। গভীর অন্ধকারে ওই আগুন দেখলে জন্তুরা আসবে না। কিন্তু খানিক বাদে ন্যাকড়া ছাই হয়ে গেলে মুকুন্দ দেখল ড্রাইভার একটু ইতস্তত না করে নিজের গেঞ্জি-শার্ট পেট্রলে ডোবাল। সেটা শেষ হলে মুকুন্দ নিঃশব্দে নিজের গেঞ্জিটা এবং পরে শার্ট দিয়ে দিল। আলোটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নটা নাগাদ মুকুন্দ প্যান্টে হাত দিল। তলায় আন্ডারওয়ার আছে। আর এই সময় সামনেই বৃংহিত শুনতে পেল। জঙ্গলটা যেন কেঁপে উঠল আচমকা। ড্রাইভার বলল, 'সাব, ভাগিয়ে!' বলে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। এখনও হ্যান্ডেলে প্যান্টটা জ্বলছে। মুকুন্দ গাড়ি থেকে আন্ডারওয়ার পরে নেমে বনেটে উঠে বসল। চিৎকার করলে নাকি হাতি কাছে আসে না। সে একা বনেটে উঠে

লাফাতে লাগল আর প্রাণপণে চিৎকার শুরু করল। জিপের ওপর লাফানোর শব্দ আর মুকুন্দর চিৎকারে বৃংহিত থেমে গেল কিন্তু মুকুন্দ থামল না। ওর মনে হচ্ছিল এই শব্দ বন্ধ করলেই হাতিরা এগিয়ে আসবে। কিন্তু একসময় গলা ধরে আওয়াজ মিইয়ে গেল, কিন্তু শরীরের নাচুনি থামাল না— আর তখন প্যান্টটা সম্পূর্ণ ছাই।

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেক দূরের গাছের মাথা থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'সাব, পেড়মে উঠ যাইয়ে।'

মুকুন্দ একহাতে রিভলভার অন্য হাতে টাকার ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়াতে দেখল তিনদিকে হাতিরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এখন রিভলভার ছোড়ার কোনও মানে হয় না। হাতিদের টাকারও প্রয়োজন নেই। ওগুলোকে জিপের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে পেট্রলের টিনটা নিয়ে রাস্তার ওপর উপুড় করে দিল। দিয়ে দেশলাই জ্বালাল। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। হঠাৎ মুকুন্দর কি খেয়াল হল, আগুনে হাত রাখল। একটুও ছ্যাঁকা লাগছে না তার। মুকুন্দ স্বচ্ছন্দে আগুনের মধ্যে চলে আসতেই তার আন্ডারওয়ার জ্বলতে-জ্বলতে খসে পড়ল।

এখন সম্পূর্ণ নিরাবরণ মুকুন্দ আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বুড়ির কথা মনে করতে পারল। সে জানল না হাতিগুলো এই দৃশ্য দেখে সরে-সরে যাচ্ছে। মুকুন্দ ভাবছিল, তার চামড়া মোটা হয়ে গেছে এটা প্রমাণিত কিন্তু শরীরে কি রক্তও নেই? গাড়ির ভেতর একটা ছুরি ছিল, সেটা নিয়ে সে আগুনের মধ্যে আবার ফিরে এল। তারপর পাগলের মতো নিজের শরীরে খোঁচাতে লাগল। ছুরিটা বসছে না, আগুন তাকে পোড়াচ্ছে না, মশা জোঁক তাকে কামড়ায় না। সেই আদিম জঙ্গলে মুকুন্দ সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবু, ছুরিটা বেঁকে গেলেও তার হাত থামছিল না। এক ফোঁটা রক্তের দর্শন চাই।



জমা জমি

চাষযোগ্য ভূমির বড্ডই অভাব এই গ্রামে। সেই কবে পূর্বপুরুষরা পাহাড়ের গায়ে-গায়ে যে-মাটি নিজেদের জন্য চিহ্নিত করে গিয়েছিল তার বেশি একটা বাড়েনি। এক পুরুষ আগেও জঙ্গল কাটা যেত, জমির শরীর বাড়ানো যেত সুবিধে পেলে। এখন সরকার সেটাও বন্ধ করেছেন। তা ছাড়া এই পাহাড়ের মাটিতে এত পাথর যে চাষ সহজ নয়। অনেক খাঁ-খাঁ প্রান্তরে দিনরাত হাওয়ারা খেলা করে। বিনি পয়সায় সেই জমি দিলেও কেউ মুখ ফেরাবে না। অতএব যেটুকু চাষযোগ্য জমি তার ওপরে মায়া প্রতিটি পরিবারের, সারা বছরের পেট ভরার যা অবলম্বন। কিন্তু তাই বা ভরে কই? দিন-দিন নতুন মানুষ আসছে সংসারে। তাদের পেটের জায়গা বাড়ছে। অথচ জমি বাড়ছে না এক ফোঁটাও।

এই গ্রামের মানুষেরা শহরে যায় না, যেতে চায় না। বড় শহর নয়, মোটামুটি গঞ্জ এলাকা বলতে মানেভঞ্জন, তাও আট ঘণ্টার হাঁটাপথ। সেখানে গেলে যে কাজকর্ম পাওয়া যায় না তা নয়। মাল বইবার লোক দরকার হয় ব্যবসায়ীদের। হাতে নগদ পয়সা আসে। কিন্তু তা নিয়েও ঝামেলা আছে। আরও দশ-বিশটা গ্রামের মানুষ সেই একই ধান্দায় হাজির হয় সেখানে! এর ওপর আছে খোদ মানেভঞ্জনের বেকাররা। ওরা তাদের ভালো চোখে দেখে না। ফলে দিন-দিন কাজ কমে যাচ্ছে দ্রুত। আরও দূরে যে শহর দার্জিলিং সেখানে নাকি খুব বড়-বড় মানুষ থাকে, এই গ্রামের মানুষ

অত দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আশেপাশের জঙ্গলে আছে প্রচুর কাঠ। মেয়েরা তাই চুপিসাড়ে নিয়ে আসে ভোজালি চালিয়ে। এখন বুক ফুলিয়ে কাঠ কাটার দিন নেই। মাঝে-মাঝেই ফরেস্ট গার্ডরা টহল মারে। তবু কাঠ আসে গ্রামে। শীতকালে যখন হু-হু বাতাস করাত চালায় তখন ওই কাঠ প্রাণ বাঁচায়। দুটো মাস তো সাদা হয়ে যায় গ্রামটা বরফে। জমির মুখ দেখা তো দূরের কথা, গাছের পাতাও চেনা মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন যার উনুনে আগুন জ্বলে তার মতো ভাগ্যবান আর কে এই তল্লাটে! ওই জঙ্গলে এককালে জানোয়ারগুলোকে পাওয়া যেত। খিদে পেলে তির ছুঁড়ে তাদের কাঁধে তুলে আনা যেত অনায়াসে। এখন জঙ্গলটাও খাঁ-খাঁ করে। তার ওপর আছে ওই ফরেস্ট গার্ড। সব সময় শাসিয়ে যায়, খবরদার, বনের পশুর গায়ে কেউ হাত দেবে না। সব সরকারি মাল।

জঙ্গল সরকারি মাল, জঙ্গলের পশুও সরকারি মাল, তাহলে জঙ্গলের মানুষ কেন সরকারি মাল হিসেবে ঘোষিত হবে না? এই সরল সত্যটি কেন ওদের মাথায় ঢোকে না? তাহলে ওদের দেখভাল করার দায়িত্ব পড়ত ফরেস্ট গার্ডদের ওপর। সারা বছর ওই চাষের জমি আর কতটুকু খাবার জোগান দিতে পারে? কম্বলটা সমস্ত শরীরে জড়িয়েও কাঁপুনি যাচ্ছিল না মানে লেপচার। বাতাসের দাঁত গজিয়েছে এর মধ্যেই। গাছের পাতাগুলো লাল থেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শেষ ফসল কাটা হয়ে গেছে প্রত্যেকের। এখন জমি খাঁ-খাঁ করছে। ক'দিন বাদেই সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যাবে চৌদিক। মানে তাদের জমিটাকে দেখছিল। এই জমি তাদের পরিবারের পনেরো জনের পেট ভরায় কোনওরকমে।

আগামী বছরে পনেরো বছর পূর্ণ হয়ে যোলোয় পা দেবে মানে। বংশের ধারা অনুযায়ী চেহারা হয়নি, বেশ ছিপছিপে এবং লম্বাটে, মুখের চামড়া মোমের মতো মোলায়েম। দাড়ি দূরের কথা, ফিনফিনে লোমও উঁকি মারেনি নাকের তলায়। চোখের পাতায় সুন্দর ভাঁজ আছে যা কিনা এই গ্রামের আর কারও নেই। মানে একবার পেছন ফিরে তাকাল। গ্রামের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানেই তাদের বাড়ি। আর ওই বাড়িতেই আজ দুপুর থেকে চলছে ব্যাপারটা। জবরদস্ত আলোচনা। থুক শব্দ তুলে থুথু ফেলল সে। তারপর দূরের সান্দাকফু পাহাড়ের দিকে তাকাল। অন্তত দশবার গিয়েছে যে সান্দাকফু। কোনও মজা নেই, শুধু সাদা পাহাড়গুলোকে দেখতে পাওয়া ছাড়া। তা সেই দেখতে আসে কাঁহা-কাঁহা থেকে মানুষজন। হেঁটে সান্দাকফুতে পৌঁছে এমন ভাব করে যেন রাজ্য জয় করে এল। এই গ্রামের পাশ দিয়েই উঠতে হয় ওদের। ওসব দৃশ্য দেখা বেশ মজার। এক হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে চড়াই ভেঙে, ফোঁস-ফোঁস করে জিজ্ঞাসা করে, 'কিতনা দূর?' তা এইরকম একটা দল তাকে নগদ বিশটা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তিন হপ্তা আগে। চারজনের দলের সঙ্গে কোনও কুলি ছিল না। কাঁধের ব্যাগটা এত ওজনদার হয়েছিল যে সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানে। এমন কিছুই না। লোকগুলো কতরকম খাবার খেয়েছিল পথে, ভাগ পেয়েছিল সে। জীবনে কখনও ওইরকম খাবার জিভে পড়েনি তার। তারপর থেকে একটা নেশা হয়ে গেছে মানের। এই ঢালু জায়গাটায় এসে বসে থাকে সে। আবার যদি কোনও বাঙালিবাবুর জিভ বেরিয়ে আসে তাহলে পকেটে কাগজ আসবে। কাগজের বড্ড দাম এই গ্রামে।

মনে হল, ওপরে যাওয়ার শৌখিন বাবুদের আজ আর পাওয়া যাবে না। ঠান্ডা বাড়ছে হু-হু করে। আলো কমছে। সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত দুটো, হয় বড়াভাবি বেরিয়ে যাবে, নয় থাকবে। রিম্বিক থেকে বড়াভাবির বাপ আর ভাইও এসেছে। জোর ব্যাপার।

মানে চোখ বন্ধ করে বড়াভাই-এর মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। দু-কুড়ি দশ বছর বয়স ছিল লোকটার। সবসময় হাসত। পরিবারের কর্তা হিসেবে সব দায় নিজের কাঁধে নিত। দুঃখ পেলেও হাসিটা ছিল মুখে। মানের যখন তিন বছর বয়স তখন বাপ মারা যায়। মা গিয়েছিল জন্ম দিয়েই।

বড়াভাই তার বাপ হয়ে গেল। বড়াভাই-এর বাচ্চা নেই, বড়াভাবি তার মা হল না কিন্তু। তার জন্যে ছিল মরা বাপের মা। তার কাছেই পরিবারের সব বাচ্চাদের থাকতে হত। সে বুড়িও চোখ বুজেছে বছর তিনেক। বড়াভাই ছিল মাটির মানুষ। লেপচাদের কথা খুব ভাবত সে। লেপচারা সংখ্যায় দিন-দিন কমে যাচ্ছে, বেশির ভাগই সাহেবদের ধর্ম নিয়ে নিয়েছে। বড়াভাই-এর এসব ব্যাপার একদম পছন্দ ছিল না। প্রায়ই তাদের কাছে ওই খারাপ লাগার কথা বলত। বলত, আমাদের পরিবারের যেন কোনও ভাঙন না দেখা দেয়। ওই জমি আমাদের পনেরো জনের রক্তের মতন। ওই জমি আমাদের মা, আমাদের একই সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

কিন্তু বড়াভাবি একদম মান্য করত না বড়াভাইকে। সারাদিন ঝগড়াই লেগে থাকত। বুড়ি দাদি গজগজ করত, একটা বাচ্চা পেটে দিতে পারলেই নাকি ঝগড়া থেমে যাবে। কিন্তু মাথার ওপরে যে ভগবান আছে সে নিজের কাজকর্ম ভালো করে বোঝে না। তা ছাড়া বড়াভাবির গায়ে নানান দুর্নামের গন্ধ লাগতে শুরু করেছিল। এই গ্রামের নিয়ম হল কোনও বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে নটঘট করলে কড়া শাস্তি হবে। কিন্তু অভিযোগ তুলতে হবে সেই মেয়ের স্বামীকে। বড়াভাই সব জেনেও চুপ করে বসে থাকত। তারপর হঠাৎ এই সেদিন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল বড়াভাই-এর। আর দুদিনেই শরীর স্থির। সারা গ্রামের মানুষ বলেছিল, এরকম লোক আর জন্মাবে না।

কিন্তু তাতে কার কী লাভ হল? বড়াভাবি এবার চলে যাবে রিম্বিকে। যাওয়ার সময় পনেরো ভাগের দু-ভাগ জমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার আর বড়াভাই-এর অংশ। ওই জমি চলে গেলে পেটে হাত পড়বে সবার। জমি যদি ছেড়ে দিতে না চায় তো পরিবারের বাকি লোক তা কিনে নিতে পারে বড়ভাবির কাছ থেকে। কিন্তু সে-টাকা কই? খামোকা নিজের জমির জন্যে টাকা দিতে ধার করবে কেন সবাই? কিন্তু আর একটা আইন আছে লেপচা পরিবারে, জমি বাঁচাবার জন্যে যে আইন করে দিয়েছিল পূর্বপুরুষেরা। সেই আইনে বড়াভাবিকে বেঁধে রাখা যায়। আর তাই নিয়ে আলোচনা সভা বসেছে বাড়ির উঠোনে। মেজোভাই এই সভার উদ্যোক্তা।

মানে আর একবার বাড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের পাতলা চাদর ঝুলবে এখনই। সে খানিকটা চড়াই ভেঙে পরিত্যক্ত চালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই চালাটা ছিল একটা বুড়ির। তার না ছিল জমিজমা না ছিল সন্তান। লোকের কাছে হাত পেতে বেঁচে থাকত। কিন্তু মানুষটা ছিল অদ্ভুত। প্রত্যেক বাচ্চা ছেলেকে বলত আমি মরলে আমার বাড়িটা তোর। ওই বাড়িতে হাওয়া ঢোকে, বরফ আটকায় না, জল হলে ন্যাতা হয়ে যায়। কে থাকতে যাবে সেখানে! বুড়ি মরার পরও কেউ হাত দেয়নি, চালাটা অমনি আছে। মানের মতলব এল, এটাকে সারিয়ে নিয়ে থাকলে কেমন হয়! গাঁয়ের আর পাঁচজন যদি আপত্তি না করে তাহলে বেশ একা-একা থাকা যাবে! এই সময় কলরব শোনা গেল। চারটে মেয়ে কলবলিয়ে উঠে আসছে নিচের ঝোরা থেকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভরা কলসি। মানের খেলার সাথী ছিল একদিন। বড় হয়ে যাওয়ার পর ওরা এখন ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। মানেকে দেখামাত্র ওদের হাসি বেড়ে গেল। কলসি নামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে মুখরা সে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'এ মানে, ছি-ছি, আজ তুই ওইরকম নোংরা জামা পরে আছিস, ছি-ছি!'

মানে নিজের জামা দেখল, মোটেই নোংরা নয়। তা ছাড়া এর অনেকটাই তো কম্বলের তলায় ঢাকা আছে। সে বলল, 'যা ভাগ। নিজের কাম কর।'

'কাম? মেয়েগুলো আরও গলিত হল যেন। তারপর একজন গালে হাত রেখে বলল, 'পেট ভরে মিঠাই খাব কিন্তু। মানেভঞ্জন থেকে আনবি না সুখিয়াপোখরি?'

'মিঠাই? মিঠাই কেন খাওয়াতে যাব তোদের?'

'আই বাপ!' আজ বাদে কাল তোর বিয়ে আর মিঠাই খাব না?' সঙ্গে-সঙ্গে হাসির বাজনা বাজল যেন। তারপর ওরা কলসি তুলে নিল আবার মাথায়। এবং এতক্ষণ যে মেয়েটি একদম

কথা বলছিল না, সঙ্গিনীদের হাসির সঙ্গে তাল রাখছিল মাত্র, সে বলে উঠল, 'ওই বুড়ি জমিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক।'

এই কথায় কোনও হাসি বাজল না। ওদের শরীর দ্রুত গাঁয়ের দিকে ফিরে যাওয়া মাত্র বাতাসে হাঁক ভেসে এল, 'মানে, এ মা-নে, মানে দা-জু-উ-উ!'

হাঁকটা দিচ্ছে ওর মেজো ভাইপো। মাত্র আট বছর বয়স, তার খুব ন্যাওটা। কিন্তু বুড়ি জমিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে বলল কেন মেয়েটা? ওই জমি তাদের প্রাণ, অন্নদাতা তাদের রক্ত। ওই জমিকে ভালোবাসব না তো তোকে জড়াতে যাব আমি? মেয়েটির উদ্দেশে একটি গালাগাল সজোরে উচ্চারণ করতেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলল, ভাইপো, 'এ দাজু, সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? চলো, চলো।'

'খুঁজছে কেন?' মানে খিঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে কী দরকার? বড়াভাবি বাপের বাড়িতে চলে যায়নি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভাইপো। না, যায়নি। তার মানে পরিবারের জমি পরিবারেই থাকছে। একটু ভালো লাগা শুরু হতে না হতেই আর একটা দম বন্ধ উত্তেজনা জন্ম নিল বুকে। মেজোভাই গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু সঠিক উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের সভায় স্থির ছিল যদি বড়াভাবির বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বন্ধ করা যায় তাহলে সেই সন্ধানটি আজকেই মিটিয়ে ফেলা হবে। মানের সমস্ত রক্ত কম্বলের তলাতেও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

উঠোনে আগুন জ্বলছে। জংলি কাঠের আগুন। পরিবারের এবং গাঁয়ের মাতব্বররা সেই আগুনের চারপাশে জড়ো, গোল হয়ে বসে ধূমপান করছে। চারপাশে ঘরের আড়াল থাকায় এখানে হাওয়া ঢোকে না, ঠান্ডাটা, কম। মেয়েরা কেউ এই আলোচনায় নেই। তারা বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে-ঘরে কান পেতেছে। মানে সভায় ঢুকে শরীর থেকে কম্বলটা খুলল। আগুনের তাতে চমৎকার গরম ছড়াচ্ছে। মেজোভাই তাকে দেখে বলল, 'এই যে, মানে এসে গিয়েছে। আয় মানে, এখানে বস।' এত আদর করে তাকে কখনও ডাকেনি মেজোভাই। মানে একবার সমবেত মাতব্বরদের দিকে তাকাল, তারপর আগুনের সামনে গিয়ে বসল।

মেজোভাই বলল, 'বড়া দাজু, আপনি কথা শুরু করুন।'

বড়া দাজু হলেন এই গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। চার কুড়ির ওপর বয়স। মানে চোখ তুলে দেখল বড়াভাবির বাবা কিংবা ভাই এই আলোচনা সভায় নেই। ওরা কখন চলে গিয়েছে তা সে জানে না। বড়া দাজু বললেন, 'এ বড় খুশির কথা, খুশির কথা। ভগবান আমাদের পেট ভরানোর মতো জমি বেশি দেননি। যা দিয়েছেন তাই আমরা যত্ন করে রাখতে চাই। পাহাড়ের নিচের মানুষদের অনেক জমি, সেখানে ভগবান অনেক জল দেন, খুব ফসল ফলে। আমাদের মেহনত করতে হয় অনেক বেশি কিন্তু তাও পেট ভরে না। সেই জমি যদি ভাগ হয়ে যায়, কেউ তার অংশ নিয়ে চলে যায় তাহলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মানে?'

মানে মাথা নাড়ল, সে বুঝতে পারছে।

'ভালো। তোমরা চার ভাই। তোমাদের বড়াভাই-এর মতো মাটির মানুষ আমি দেখিনি। ভালোমানুষদের ভগবান খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যান তাঁর কাছে। তোমার মেজোভাই অত্যন্ত বিচক্ষণ। খুব ঠান্ডামাথার মানুষ। তোমার সেজোভাই-এর ওপর ভগবান করুণা করেননি। জন্ম থেকেই সে হাঁটতেও পারে না, কথা বলতে পারে না। বড় কষ্ট তার। আর ছোটভাই হিসেবে তোমার জন্যে আমরা গর্ব করি। কী সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়েছেন ভগবান তোমাকে! সেজোভাই-এর সব খামতি তোমার মধ্যে তিনি পূরণ করে দিয়েছেন। এখন কথা হল, তোমার বড়াভাই মারা যাওয়ার পর তোমার বড়াভাবি কি করবেন! তার বয়স মাত্র দুই কুড়ি চার। এখনও তাকে যৌবন ছেড়ে যায়নি। কোনও সন্তান নেই। সে আবার বিবাহ করতে পারে। তার বাপ আজ এসেছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যাওয়ার সময় সে নিয়ে যাবে জমির ওপর তার দাবি, স্বামীর অংশ। বুঝতেই পারছ তোমাদের সংসারের

ওপর কি আঘাত নেমে এসেছিল। তোমাদের এমন অর্থ নেই যে অংশটা বড়াভাবির কাছ থেকে কিনে নেবে। ওরা তো ছাড়বেই না। কিন্তু আমাদের আইনে, ধর্মে যে বিধান আছে তা সবাই মানতে বাধ্য। বিধানটা হল যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার সবচেয়ে বড় অবিবাহিত দেওর। সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার পরের ভাই। যদি কোনও ভাই অবিবাহিত না থাকে তাহলে জেঠা বা কাকার ছেলেদের সঙ্গে ওই বিবাহ হতে পারে।'

বড়া দাজু নিশ্বাস ফেলল, 'কিন্তু তোমার বড়াভাবি এসব বিধান শুনতে চাইছিল না। তোমার মেজোভাই বিবাহিত অতএব সেজোভাই-এর পবিত্র অধিকার ভোগ করার কথা। সে অবিবাহিত। কিন্তু তাকে প্রত্যাখান করেছে বড়াভাবি। আমাদের বিধানে অবশ্য এ ব্যাপারে সমর্থন করা আছে। এখন একমাত্র তুমিই অবিবাহিত এবং তোমাদের জমি এবং বড়াভাই-এর প্রতি সম্মান দেওয়ার সুযোগ পেয়েছ। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

মানে শূন্য চোখে আগুনের দিকে তাকাল। বড়াভাবিকে বিয়ে করতে হবে তাকে? আজ সকাল থেকে এই ভয়টা তাকে টোকা মেরে যাচ্ছিল। এখন আগুনের সামনে বসে তার শীত আরও বেড়ে গেল। বড়াভাবির মাথার চুলে পাক ধরেছে। খুব কাছে গেলে সেই দুই-একটা বেরিয়ে আসা সাদা চুলকে দেখা যায়। শরীর বেশ ভারী। বুক দুটো পাথরের মতো, সান্দাকফু পাহাড়কে কেটে বসিয়ে দেওয়া। সে যখন জন্মেছিল তখন বড়াভাবির বয়স এক কুড়ি সাত। মানের কোনওদিকে মন ছিল না। সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল। সে বিয়ে করবে একটা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েকে যার এই শীতেও নাকের ডগায় টলটলে ঘাম জমে। একটা বুড়ি মোষের সঙ্গে এরা কেন তাকে জুতে দিচ্ছে? ওই বুড়ি যদ্দিন মারা না যাবে তদ্দিন সে বিয়ে করতে পারবে না। যদি দু-কুড়ি বছর পর বুড়ি মারা যায় তাহলে সে নিজেও বুড়ো হয়ে যাবে। আর তখন কে তাকে বিয়ে করবে! মানের শরীরে কম্পন এল।

আর এই সময় বড়া দাজু বলল, 'মানে, তুমি রাজি?'

সে কিছু বলার আগেই মেজোভাই উঠে দাঁড়াল, হ্যাঁ, ও রাজি। আমি মানেকে জানি। ওর মতো শান্ত ভালো ছেলের দাদা বলে আমি গর্বিত। ও কখনও আদেশ অমান্য করে না। তা ছাড়া এই জমিকে ও প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এবারে ও সারা মরসুম আমার সঙ্গে চাষ করেছে। এর ওপরে আরও একটা কথা আছে, আমাদের বড়াদাদার বিধবা বলেছে যে এই পরিবারের কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে মানেকেই করবে, অন্য কাউকে নয়। মানে তার পছন্দের সম্মান রাখবে। মানে, ভাই আমার, হ্যাঁ কি না?'

মেজদাদার কথাগুলো হঠাৎ বিবশ করে দিল মানেকে। সে সম্মোহিতের মতো ঘাড় নাড়তেই সমবেত মানুষ হর্ষধ্বনি করে উঠল। মেজোভাই হাত জোড় করে বলল, 'তাহলে আর দেরি নয়। দ্বিতীয় বিবাহে তো বেশি নিয়মের দরকার হয় না। আজই কাজ সেরে ফেলা যাক।' বড়া দাজু সম্মতি দিলেন এই প্রস্তাবে।

পাহাড়ে রাত নামে সন্ধের আগেই। আর সেটা ঘন হয় বাতাসের ঝাপটা লাগলেই। নিয়মকানুন চুকে গেলে মানে চোরের মতো বসেছিল। গাঁয়ের বিভিন্ন ঘর থেকে যারা এসেছিল তারা রাতের দোহাই দিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে শুনল এর পরের পূর্ণিমায় খাওয়া-দাওয়া হবে। শেষ লোক যে গেল তার নাম পূরণ। জাতবজ্জাত লোকটা। হাতে কাঁচা পয়সা আছে। জমির ধার ধারে না, মানেভঞ্জন দার্জিলিং-এ গিয়ে ট্যুরিস্টবাবুদের গাইড হয়। যাওয়ার আগে সে কানে-কানে বলে গেল, 'তোর বউ-এর খাঁই খুব। শরীরটা যেন চোরাবালি। চট করে ডুবে যাস না যেন। তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে।'

শেষ কথাগুলো যে একদম বুক থেকে বলা তাতে সন্দেহ নেই। তার ডবল বয়সের এই লোকটা এতদিন তাকে পাত্তাই দিত না অথচ আজ এমন ভঙ্গিতে বলে গেল যেন কতকালের বন্ধু।

শালার যে বড়াভাবির ওপর নজর ছিল তা এই গ্রামের কার না জানতে বাকি আছে! মানে উঠল। বিয়ের পর বউকে সে-রাতের মতো সরিয়ে নেয় না কেউ, কিন্তু বড়াভাবি নিজেই উঠে গেছে তার নিজের ঘরে যেখানে সে বড়াভাইয়ের সঙ্গে শুতো।

মানের নিজের কোনও ঘর নেই। আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে বুড়িদাদির ঘরে তার রাত কাটত। সে ঘরে নিশ্চয়ই এখন রাত কাটানো যাবে না। মানে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই তাকে দেখতে পেল মেজোভাই, 'আই, কোথায় যাচ্ছিস?'

'ঘুরতে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এই ঠান্ডায় কেউ বাইরে যায়?' তারপর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল মেজোভাই, 'আজ তুই আমার বুকে শান্তি এনে দিয়েছিস মানে। এই জমির অংশ চলে গেলে আমাদের পরিবারটা বাঁচত না। ওই পূরণ শালা জমিটা কিনবার জন্যে ঘুরঘুর করছিল, তুই বাঁচিয়েছিস। যাক, এখন এই তুই ওকে বড়াভাবি বলে ভাববি না, নিজের বউ-এর মতো দেখবি। প্রয়োজনে কড়া হবি। যা ঘরে যা।'

'কোন ঘরে?'

'বড়াদাদার ঘরে।'

'না, ওই ঘরে আমি শোব না। বড়াভাই আমার বাপের মতো।'

মেজোভাই হকচকিয়ে গেল, 'তাহলে? আমাদের আর একটা নতুন ঘর তুলতে যে সময় লাগবে?'

'লাগুক। তাতে আমার কী? আমি চললাম বুড়ির চালায়।'

'বুড়ির চালা? ওখানে তো হাওয়া ঢোকে।'

'ঢুকুক। আমার কম্বল আছে।' কথাটা বলে হনহন করে হাঁটতে লাগল মানে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন হুটহাট করে ঘটে গেল যেন সে একটা পুতুল।

ক্রোধ মানুষের অন্য অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দেয়। মানে জানলই না ঠান্ডার কামড় কতখানি। চালায় ঢোকার পর সে প্রথম ঠান্ডা টের পেল। কম্বলের তলায় শরীরটা কনকন করছে। চালাটা নোংরা নয়। বোধহয় বাচ্চারা এখানে খেলা করে বলেই বেশি ধুলো জমেনি। ধুলো জমলে নাকে গন্ধ আসত। ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস আসছে। একটা দেওয়াল ঘেঁষে বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশ পেতে খাট করা। কোনও বিছানাপত্র নেই। দরজা একটা আছে বটে তবে সেটা ঠান্ডা বাঁচানোর জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে নয়। একটা আলো সঙ্গে রাখলে ভালো হত। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় যে উত্তেজনাটা বুকে ছোবল মারছিল এখন সেটার মাজা ভেঙেছে। অন্ধকারেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চোখ সয়ে নিয়ে সেই আলোটাকে আবিষ্কার করে। মানে সেই আলোর ফাঁক-ফোঁকরগুলো ভরতি করতে চাইল। প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় বাতাস ঢোকা বন্ধ হল। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাময়িক প্রতিরোধ। একটু ঝড় উঠলে বা বরফ পড়লেই যে-কে সেই হবে।

বাঁশের মাচাটা কনকন করছে ঠান্ডায়। আর একটা কম্বল আনলে হত। বাবুরা পাহাড়ে বেড়াতে যায় এক ধরনের থলি নিয়ে। শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিলে আর ঠান্ডা লাগে না। সেরকম একটা হলে বেশ হত। কম্বল মুড়ি দিল মানে। এই চালাটা কারও নয়। জমিটায় পাথর বলে কোনও মালিক নেই। এই চালাটাই সারিয়ে নিলে কেমন হয়। বড়া দাজুর কাছে অনুমতি নিতে হবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা পাঁচটা ওজর দেখাবে সঙ্গে-সঙ্গে।

শরীরটায় ঠান্ডা কিছুতেই যাচ্ছে না। মানে উঠল। ঘরের কোণায় কয়েকটা মোটা কাঠ দেখেছিল। সেগুলো জড়ো করে কয়েকটা কুচো কাঠে দেশলাই ঠুকল সে। যদিও এই কাঠে রস নেই তবু ধরানো খুব মুশকিল। ফুঁ দিতে-দিতে শেষপর্যন্ত আগুনের দেখা পেল। তারপর সেটাকে লালন করতে-করতে আরও একটু বাড়ল। দুটো হাত সেঁকে নিল মানে। আর তার পরেই চোখে পড়ল একটা নেড়ি জুলজুল করে তাকে দেখছে মাচার নিচে বসে। এটার বোধ হয় এটাই আস্তানা

এখন। তাড়াতে গিয়েও মন পালটালো সে। থাক বেচারা। আগুনটা মাঝখানে বাড়ছে। বেশ তাত ছড়াচ্ছে। চালায় একটা লালচে আভা কাঁপছে। আবার কম্বলটাকে টেনে নিল সে। মোটা কাঠের গুঁড়িটায় আগুন ধরেছে। সারারাত জ্বলবে নিশ্চয়ই। শরীরে আর তেমন ঠান্ডা ভাব নেই। শুধু বাঁশের খাঁজগুলো পিঠে লাগছে। চোখ বন্ধ করল মানে। আজ তার বিয়ে হয়ে গেল। কত সোজা ব্যাপার যেন। অথচ সে বিয়ে করতে পারত একটা ডাঁসা মেয়েকে। ওই আজ যারা কলসি মাথায় করে জল নিয়ে এসেছিল তাদের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়েটাকে। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল সে। নিজের শরীরে যে যৌবনের ফুলকি জন্মেছে সেটা কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু——। হাঁ করে নিশ্বাস নিতেই দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন শব্দটা ইচ্ছে করেই করল। দরজাটা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপরেই চাপা গলায় প্রশ্ন, 'এখানে এসে শোওয়া হয়েছে যে?'

মানে সাড়া দিল না। বড়াভাবির বলার ধরন এইরকম। সে যখন বাড়ন্ত হল, হাতপায়ের গুলি শান্ত হল তখন থেকেই ওইরকম ঠোকরানো কথাবার্তা।

'আজকের রাতে কেউ আলাদা শোয় নাকি?'

'আমি এখানেই শোব।' চোখ না খুলে বলল মানে।

'এখানেই শোব? ই-ই! শোব বললেই হল! শুতে দিচ্ছে কে? এই খোলা মাঠের মধ্যে আমি শুতে পারব না। ওঠো, ঘরে চলো। লোকে বলবে কী?' শেষ বাক্যটা এমন নরম গলায় যে চোখ না খুলে পারল না মানে। আর খুলতেই সে চমকে উঠল।

বিয়ের আসরে বড়াভাবিকে সে দেখতে পায়নি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা ছিল তার। ঘোমটার ফাঁকে চিবুকের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেদিকেও নজর দিতে ইচ্ছে করেনি? কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি সে ওদিকে তাকাতে। কিন্তু একী সাজ সেজেছে বড়াভাবি। গায়ে কম্বল জড়ানো বটে কিন্তু মাথার চুল খুব কায়দা করে বাঁধা, মুখে পাউডার, খোঁপায় ফুল, আর দু-হাত ভরতি নানান রঙের চুড়ি। কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে। প্রতিদিনের আটপৌরে গন্ধটা একটুও শরীরে নেই।

বড়াভাবি ততক্ষণে মাচায় এসে বসেছে। বসে বলল, আমার অবশ্য ওই বাড়িতে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। আমি তো বাপের বাড়িতে চলে যাব বলে ঠিকই করেছিলাম। ওখানে কত ছেলে আমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। শুধু ওখানে কেন, এই গ্রামে নেই নাকি? যেমন ধরো পূরণ। সে বলেছিল তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও আমি তোমাকে সাদি করে ফের এই গ্রামে নিয়ে আসব। কিন্তু লোকটা ধান্দাবাজ, একসঙ্গে পাঁচটা মেয়ের পেছনে ঘোরে। তারপর যখন তোমার মেজোভাই আমার হাতে-পায়ে ধরল. বলল, জমি বাঁচাও, বিধান মানো, আমার বাপটাও যখন তাই বোঝাল, তখন আমি বললাম, মরে গেলেও ওই রদ্দি নুলো দেওরটাকে বিয়ে করতে পারব না। বিয়ে যদি করতেই হয় তো তোমাকে।' কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে মানের চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে মদির হাসল সে, 'তরতাজা জোয়ান, যত বয়স হবে তত গাছের মতো মজবুত হবে। এইরকম জোয়ান না হলে সুখ হবে কি করে বলো! তাই রাজি হয়ে গেলাম। চলো, ওঠো, ঘরে যাই।' দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে হাই তুলল বড়াভাবি।

'আমি এখানেই থাকব।' মিনমিন করে বলল মানে।

'এখানে কেন? এই নোংরা জায়গায় আমি থাকতে পারব না।' ফোঁস করে উঠল গলার স্বর।

'বড়াভাবি, তুমি আমাকে মাপ করে দাও।'

'ব-ড়া-ভা-বি।' হি-হি করে হেসে উঠল, যেন এর চেয়ে হাসির কথা সে জীবনে শোনেনি, 'আমি আজ থেকে তোমার বউ, তুমি আমার সম্পত্তি। ওসব বলে খবরদার ডাকবে না।'

দু-চোখ বড় করে তার রক্ত দেখাল যেন সে, আমার নাম নিমা, তাই বলবে।'

মানে ঢোঁক গিলল, 'ওই ঘর বড়াভাই-এর। ওখানে গেলে—।'

'ও এই কথা। দূর পাগল। তোমাদের বড়াভাই একটা মানুষ ছিল নাকি! একটা পিঁপড়ের ক্ষমতাও ওর চেয়ে বেশি ছিল। যে পুরুষ বউকে সুখ দিতে পারে না সে আবার পুরুষ নাকি? তার জন্যে মন কেমন করার কোনও দরকার নেই। চলো।' এবার হাত ধরে টানল নিমা।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল মানে, 'আমার মন মানছে না।'

'কেন, মন মানছে না কেন? আমি কি খারাপ? গ্রামের সব ছোঁড়াবুড়ো আমায় পেলে বর্তে যায়, তা জানো?' গর্জে উঠল নিমা, 'নাকি অন্য মতলব! কোনও বাচ্চা মেয়ের কাছে ফেঁসে গেছ এর মধ্যে! ডাগর ছাগল পেলে রাক্ষুসিরা তো ছাড়ে না। সত্যি বলো?'

'না, আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

'নেই তো? ভালো। শোনো, তোমায় একটা কথা বলি। ওই যে হাড়জিরজিরে বাচ্চা মেয়েরা, ওরা কোনও কম্মের নয়। এক-হাঁটু ঝোরায় স্নান করতে কী মজা লাগে? স্নানের জন্যে চাই ডুবজল, ইচ্ছেমতন সাঁতার দেওয়া যায় যেখানে। কথাটা মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মানে, 'তা হোক, তবু আজ আমি এখানে থাকি।'

কিছুক্ষণ কথা না বলে নিমা ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন মতলবটা বুঝতে চাইল। আগুনটা এখন জব্বর জ্বলছে। তার লাল আভায় নিমার মুখটা রহস্যময় দেখাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত একটা নিশ্বাস ফেলে সে উঠে দরজার কাছে গেল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সরিয়ে নিল, 'আই বাপ, কী ঠান্ডা!'

তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল কিছু সময়, 'এটা তো বন্ধই হয় না। না হোক, এত ঠান্ডায় আর কে আসবে! সরো কম্বলটা পেতে দিই ওই মাচার ওপরে। একটা নিচে আর একটা গায়ে দেব। তুমি ততক্ষণে আগুনটা আরও জোরদার করে দাও। তাহলে রাতটা গরমে-গরমে কাটবে।' চোখ মটকে হাসল নিমা।

হুকুম পালন করতে-করতে বড়াভাবি, না নিমার সুবৃহৎ নিতম্ব দেখে মানে আরও জবুথবু হয়ে যেতে লাগল। এই মেয়েমানুষটাকে খুড়ি, জেঠি এবং বড়াভাবি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এখন ওর মতলব এই চালাতেই রাত কাটানো। মানে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে আগুনে ধরিয়ে নিল। তারপর চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল তার কি করা উচিত। ভেবে কূল পাচ্ছিল না সে।

'উঃ, কী ঠান্ডা রে বাবা! আমাকে সুখটানটা দাও তো!'

মানে চোখ তুলে দেখল একটা সাদা পাইথন তার সামনে নড়ছে। ওটা যে নিটোল হাত, যার কোথাও আবরণ নেই, কম্বলের তলায় শোওয়া শরীরটা থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে প্রত্যাশায় আঙুল নাড়ছে তা বুঝতে সময় লাগল। সে সম্মোহিতের মতো বিড়িটা এগিয়ে দিতেই লাল ফুলকিটা টিপের মতো আর একটা ঠোঁটে আটকে গেল যেন। তারপর ভুল করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বিড়ির শেষ অস্তিত্বটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে ডাকল, 'এই এসো!'

মানে এবার আবিষ্কার করল বড়াভাবি কিংবা নিমা যে কিনা এখন থেকে তার বউ সমস্ত কাপড়জামা ওপাশে ছেড়ে রেখে কম্বলের তলায় শুয়ে আড় ভাঙছে আর সেই ভঙিমায় কম্বল সরে যাওয়ার আগুনের রং লাগছে খোলা চামড়ায়।

'এসো, এসো না!'

জঙ্গলে আগুনের হাত শক্তিশালী হলে বাতাস তার বন্ধু হয়ে যায়। কোনও ঝরনার সাধ্য নেই সেই আগুন নেবায়। এই নিস্তব্ধ চরাচরে, বাইরে যখন ধারাল বাতাস বইছে শীতের ছুরি মুখে, কোথাও কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই তখন আগুনের বুকে কাঠের জোড়গুলো ফাটছিল নিঃশব্দে।

এত ক্লান্তি এই জীবনে আসেনি মানের। একটা দেশলাই কাঠি যখন একগাদা শুকনো কাঠের ওপর পড়ে তখন আগুনের চেহারাটা বদলে যায়, কাঠিটাই পুড়ে মরে। ভোরের আগে হাতেপায়ে

ধরেছিল নিমা। বারংবার ক্ষমা চেয়েছিল, নিষ্কৃতি চেয়েছিল এই রাত্রের জন্য। একটা পনেরো বছরের উদ্দামতার কাছে হার মেনেছিল সে। জলে ওঠার পর মানে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেই নিশ্বাসে সমুদ্র শুষে নেওয়ার পর তাকে দেওয়ার কিছু ছিল না নিমার। পরাজিতা অথচ ভীষণ সুখী দেখাচ্ছিল তাকে। এখন চালার মাঝখানে জ্বালানো নিবন্ত আগুনে শিশুর মতো তার ঘুমন্ত মুখটা দেখে উঠে দাঁড়াল মানে। ক্লান্তি শরীরে, কিন্তু ঘুম আসছে না।

সমস্ত শরীর কম্বলে মুড়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই ঠান্ডা চাবুক কষাল। মানে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরে একটুও শক্তি নেই। কিছুদিন আগে তার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। ওদের জমির পাশে যেখানে পাহাড়ের শুরু সেখানে খানিকটা সমান জায়গা আছে। সারাদিন কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়েছিল সে। অনেকটা জমি কোপানোর পর যে আনন্দ তা টুক করে চলে গেল বিকেলবেলায়। কোদালের ফলা ঠং করে বাজল পাথরে। জমির তলায় পাথরের আস্তরণ। তখন যে ক্লান্তি শরীরে এসেছিল এটা সেইরকম। কোথায় যাচ্ছিল খেয়াল নেই, পাতলা অন্ধকারে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ ও মাটির গন্ধ পেল। তারপর মুখ তুলে দেখল সামনের আকাশে লালের ঘোর লেগেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শরীরে রং পালটাচ্ছে। আর সে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শূন্য চাষের জমির সামনে।

এই ফসলকাটা হয়ে যাওয়া খেত আর কোনওকালে বাড়বে না। উবু হয়ে বসে ভাঙা মাটিতে হাত রাখল মানে। বড়াভাবি কিংবা নিমা অথবা তার বউয়ের মা হওয়ার বয়স ফুরতে আর বেশি দেরি নেই। অথচ সে বাপ হতে পারে আরও দু-কুড়ি বছর। তদ্দিন যদি বড়াভাবি কিংবা নিমা অথবা তার বউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বংশধর আসবে না। না এলে সংসার বাড়বে না। বড়াভাই ছেলেমেয়ে রেখে যায়নি। সেজোভাই পঙ্গু, অথর্ব। সে-প্রশ্নই নেই। চারভাই-এর এই জমিটা আর কিছুকাল পরেই মেজোভাই-এর দুই ছেলের হয়ে যাবে। চার থেকে দুই-এ। কাল রাত্রে সোহাগের সময় মেয়েছেলেটা বলেই ফেলল সে আর বাচ্চা চায় না, তাতে যৌবন মরে যায়। এ থেকে আর একটা রহস্যের আড়াল সরল। বড়াভাই-এর কি সবটাই দোষ ছিল?

মানে আরও কয়েক পা হাঁটল। সেই পাহাড় কেটে সমান করা জমিটার সামনে ও এখন। এই জমি কেউ ছোঁয় না, কারও লোভ নেই। সারাদিন কুপিয়ে যখন সে এর তলায় পাথরের আস্তরণ পেয়ে ভেঙে পড়েছিল হতাশায় তখন গ্রামের মানুষ হেসেছিল। এই অচাষযোগ্য জমির ওপর কারও লোভ নেই, তাই মমতাও নেই। মানে নিজেদের চাষযোগ্য জমিটার দিকে তাকাল। মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করে সে ওই জমিটাকেই শুধু বাঁচায়নি, জমির অনেক দায়ও বাঁচিয়ে দিল। এখন থেকে ফসল খাওয়ার মুখ কমবে এই পরিবারে।

হাত বাড়িয়ে পাথুরে জমির মাটি স্পর্শ করল সে। শিশিরে কাদা-কাদা হয়ে আছে। এই মাটি ফসল ফলাবে না, তাই কারও আকাঙ্খা নেই, ভালোবাসা নেই এর ওপর। কিন্তু এর তলায় যে পাথরের আস্তরণ তার সীমা কতদূর! পৃথিবীর গভীর থেকে গভীর নিশ্চয়ই চলে যায়নি। ওই পাথরের আস্তরণের নিচে নিশ্চয়ই নরম মাটি আছে উর্বর হয়ে। একবার যদি পাথরের আস্তরণটা তুলে ফেলা যায়—মানে রোমাঞ্চিত হল। পাওয়া যায়? একথা কেউ তাকে বলেনি।

দূরে কুয়াশায় ঢাকা বুড়ির চালাটার দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হল। সামান্য মাটি খুঁড়ে সে পাথরটাকে আবিষ্কার করেছিল কিন্তু আরও খুঁড়লে যদি উর্বর মাটি মেলে? কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বলেছে পাথরের শক্তিও সীমিত। তাহলে?

জ্যা-মুক্ত তিরের মতো মানে ছুটল তাদের বসতবাড়ির দিকে, একটা কোদাল খুঁজতে।



জঠর

কুঁচকে যাওয়া পাটসিলকের ঝোলা পাঞ্জাবি খাটো ধুতি আর প্রায় সাদা হয়ে আসা মোজাহীন জুতো পরা লোকটা নগদ টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজল। ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো সাবির মিঞা। সাবিরের পেছনে সদ্য কেনা ছাগল আর মুরগির পালগুলো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকেই মওকা পেলে মাল কিনছে সাবির। মেলা এখন জমজমাট। তিনমাস অন্তর এই ভবানীর থানের মাঠে জন্তু-জানোয়ারের কেনাবেচার মেলা বসে। মাইক বাজে, তেলেভাজা আর জিলিপির দোকানে গন্ধ ফোটে। চার-পাঁচ ঘর ফুর্তির জায়গা তৈরি হয়ে যায় সেই-ফাঁকে। দিশি মদের ভালো জোগান থাকে। পয়সা থাকলে এই সময় আকাশ ছোঁওয়া যায়।

বুড়ো সাবির বলল, 'অনেকদিন পর দেখা হল। মেলায় আসো না কেন?'

সিলকের পাঞ্জাবি লাল দাঁত বের করে হাসল, 'চার-চারটে মাদি ছাগল, ওরা না বিয়োলে এখানে এসে কি ফায়দা। মুরগিগুলো ডাগর হতে নিয়ে এলাম। তবে হ্যাঁ, বিইয়েছে একটা ছাগল, পরের মেলায় আসব।'

লোকটি গলায় একটা রঙিন রুমাল বাঁধল, 'ও হ্যাঁ, মিঞা সায়েবের সন্ধানে কাজের লোক আছে?'

'কাজের লোক? মিঞা ফোকলা দাঁতে হাসল, 'সারা দেশের লোক কাজ খুঁজছে। তা কীরকম লোক চাই? জোয়ান না যুবতি?'

'না-না। মেয়েছেলের আমার ডোরায় ঢোকা নিষেধ। বাচ্চা চাই। খাবে কম খাটবে বেশি।'

'হঠাৎ লোক চাই কেন?'

লোকটা মুখ নামাল, 'কাউকে বোলো না। শরীরটা বিগড়েছে আমার। হপ্তায় তিনদিন জ্বর আসে। কথা নেই বার্তা নেই কাঁপুনি আর জ্বর। শালা সাড় থাকে না শরীরের। ওই সময় জানোয়ারগুলোর জন্যে একটা বাচ্চা চাই।'

'ডাক্তার দেখাও। এ জ্বর ভালো না।'

'দুস শালা। পয়সা খরচ করে সুঁই ফোঁড়াব এমন বান্দা আমি নই। লাল ওষুধ দিচ্ছে কম্পাউন্ডারবাবু, তাই গিলি। সন্ধানে আছে তেমন?'

সাবির মিঞা হাত তুলল, 'সকালে দেখলাম পুবের মাঠে জনমজুর ভিড় করেছে। গিয়ে দ্যাখো একবার। মওকা পেলে ছাগলের চেয়ে কম দাম।'

মাটি থেকে চটের থলেটা তুলে হেলতে-দুলতে মেলা ফুঁড়ে লোকটা চলে এল পুবদিকে। সেখানে গাছের তলায় শীর্ণ মানুষেরা বসে আছে কাজের আশায়। লোকটার চোখ চরকির মতো ঘুরছিল। সব শালা খাঁচা বুকে নিয়ে বসে আছে, গোনা যায় প্রত্যেকটা হাড়। একটা ছোঁড়া চাই ছোঁড়া!

শেষতক একটা গাছের সামনে গিয়ে সে হাঁকল, 'অ্যাই কাজ করবি?'

প্রৌঢ় লোকটি উবু হয়ে বসেছিল। তার উদোম ঊর্ধ্বাঙ্গে হাড় কাঁপছে।

প্রশ্ন শোনামাত্র লোকটার চোখের চেহারা পালটে গেল। দুটো হাত আকাশের দিকে তু

বলল, 'হ বাবু হ। দ্যান বাবু একটা কাম।'

'দূর শালা! তোকে নিয়ে আমার কী হবে? আমার কাজ শক্ত কাজ। জঙ্গলের মধ্যে আমার খেতি। সেখানে আছে ছাগল মুরগি শুয়োর। সেসব দেখতে হবে। এ জন্মে তোর সেই শক্তি হবে না। এটি কে?'

'আমার ছাওয়াল। একমাত্র ছাওয়াল।'

'এ কাজ করবে? কী রে, কাজ করবি? দশ টাকা দেব। দু-বেলা ভাত পাবি। যাবি?'

প্রৌঢ়ের গা-ঘেঁষে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে কুচকুচে কালো একটি বালক দেখছিল লোকটাকে। তার মুখে সাড় এল না। প্রৌঢ় বলল, 'দুধের ছাওয়াল বাবু, নয় মাইয়া আর এই ছাওয়াল। কথা কইতি পারে না। আমারে নেন বাবু, আমি পারুম। সব কাজ পারুম।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'না। তোমাকে শালা একসের চাল খাওয়াতে হবে আর ও ব্যাটা একপো পারবে না। ও যদি পারে তো আসুক। আমি মিঞার দোকানে আছি। ঠিক দুটোয় জঙ্গলে ফিরব, হাঁ!'

পাটসিল্কের পাঞ্জাবি চলে যেতে প্রৌঢ় অতীব মায়ায় পুত্রের মুখ দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে বালকের মুখ হাঁ হয়ে গেল। জিহ্বা নেড়ে সে বোঝাতে চাইল, ভাত? প্রৌঢ় মাথা নাড়ল। তারপর প্রবল আক্রোশে চুল খিমচে ধরল। ছেলেটা বাপকে ধরে দু-হাতে টানতে লাগল। তারপর বাপের অর্ধকুঁজো শরীরটার সঙ্গে ফিরে গেল আধ মাইল দক্ষিণের নদীর চরে। সেখানে হোগলার ছাউনিতে তাদের বাস।

'কাম পাইলা না?' দড়ি হয়ে আসা একটি নারী যাকে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধ বলা যায়, নদীর চরে হোগলার ছাউনির সামনে ছেঁড়া চট বিছিয়ে রোদ্দুরে শুয়ে কাতর গলায় প্রশ্ন করল। তার আশেপাশে নটি বিভিন্ন বয়সের শিশু। বড়টির বয়স বারো কিন্তু শরীর বাড়ে নি। প্রৌঢ়ার শরীরে জীর্ণ শাড়ি অথচ উদর স্ফীত। মুখের চেহারায় বোঝা যায় শরীরে জ্বর রয়েছে বেশ।

প্রৌঢ় দেখল শিশুকন্যারা তাকে দেখামাত্র দৌড়ে এসে জড়ো হয়েছে সামনে। সে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়তেই নারীর কণ্ঠে আক্ষেপজনক শব্দ বের হল, 'তিনদিন কামে যাই নাই। লোক আসছিল খুঁজতে। শাসায় গেল অনেক।'

এই সময় এক বছরের শিশু এগিয়ে এল হামা দিয়ে। মায়ের কাপড়ের তলায় শুকনো স্তনে মুখ গুঁজল খাদ্যের আশায়। রুগ্ন হাতেও ঝটকা এল, 'মর-মর' সব চুষে-চুষে মেরে ফেলল আমারে। হা কপাল!' নদীর চরে সেই চিৎকারের সঙ্গে ছিটকে পড়া শিশুর কান্না উত্তাল হল। বাকিরা ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখছে তাদের কনিষ্ঠাকে। তবু তার মধ্যেই একটি কচি গলায় শব্দ ছিটকাল, 'ক্ষুধা লাগছে বাপ, মুড়ি খামু।'

প্রৌঢ় উবু হয়ে বসল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'একটা লোক কাম দিতে চায় খোকারে। পেটভাত আর দশ টাকা। ছাগল মুরগি দেখনের কাম। দিবা?'

চকিতে উঠে বসল নারী। অপলক চোখে বালকের দিকে তাকাল। তারপর ডুকরে উঠল মুখচাপা দিয়ে, 'তোমারে দিয়া হইব না?'

'না'। প্রৌঢ় মাথা নাড়ল, 'আমার প্যাট বড়, শরীরে রোগ। দশ টাকা কম না, চাপ দিলে পনের টাকা হইতে পারে?'

'কুথায় ঘর?'

'জঙ্গলে।' প্রৌঢ় আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'হপ্তায় একদিন ছুটি।'

শেষ মিথ্যেটা কানে গেল না নারীর। শক্ত গলায় শুধাল, 'কবে থিকা?'

'আজই। দুটায় যাত্রা।'

'হা কপাল!' নারীর নিশ্বাস পড়ল।

ভালো জামা নেই। যেটি ছিল সেটিকে টানটান করে পরিয়ে দিল দিদি-বোনেরা।

মুখ মুছিয়ে চুল আঁচড়ে দিল নারী। বারংবার বলতে লাগল সে যেন দুষ্টুমি না করে, না কাঁদে, হপ্তায় একদিন এসে দেখে যায়। এই পৃথিবীর নয় বোন আর মা বাপ শুধু তাকিয়ে আছে। বড় বোন বলল, 'মা, ছাগলে দুধ দেয়?'

নারী ঘাড় নাড়ল, 'দামি দুধ। খাইলে তাগদ বাড়ে।'

আর একজন বলল, 'মুরগির ডিম?'

নারী মাথা নাড়ল। প্রৌঢ় জোগান দিল, 'তার সাথে একপো ভাত। ভাবন যায় না।'

নয়টি শিশু চকচকে চোখে তাদের ভাইকে দেখতে লাগল। বালক দুধ ডিম-এর ভাতের প্রাসাদে যাচ্ছে। একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'হপ্তায় যখন আসবি একটু দুধ আনবি। দুধ আমি কখনও খাই নাই।' আর একজন বলল, 'ডিম আনবি দাদা? মুরগির ডিম?'

বালক অপলক দেখছিল, শুনছিল। তার ঠোঁট দুটো শুধু থরথরিয়ে উঠল। শেষ সঞ্চয়ের মুড়ি বের হল তিনমুঠো আর আধ-ভাঙা বাতাসা। নয় বোন বৃত্তাকারে বসে। নারী খাইয়ে দিচ্ছে বালককে। দুমুঠো খাওয়ার পর বালক মাথা নাড়ল। প্রতিবাদ করল। এই মুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা চোখগুলোর দিকে নজর পড়তেই সোজা উঠে দাঁড়াল। ছোটজন থাবা বাড়াল মুড়িতে। দশটি পাঁজরের নিশ্বাস শরীরে নিয়ে বালক পিতার সঙ্গে যাত্রা করল জীবিকার সন্ধানে। যেমন করে বধূকে শ্বশুরগৃহে যাওয়ার সময় বিদায় জানানো হয় তেমনি করে দশটি শরীর পিছু-পিছু এগিয়ে এল অনেকটা, তারপর একটা চাপড়া বেঁধে পড়ে রইল শোক অথচ আশার কাঁপন নিয়ে নদীর চরে।

ধু-ধু মাঠ আর বাঁশঝাড় পেরিয়ে জঙ্গল। জঙ্গলের গায়ে আবাদ। তার পাশে লোকটির ঘর, খেতি আর পোষা জীবদের ডেরা। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল তখন ঘুঘু ডাকছে, চারধার নিঃসাড়। বালক আর হাঁটতে পারছিল না। লোকটি বলল, 'এই হল আমার জায়গা। সব দেখে নে। ছাগল দেখবি, মুরগি দেখবি। কারও যদি অযত্ন হয় তো পেটে পা ঢুকিয়ে দেব শালা। পনেরো টাকা দিতে হবে, কাজ যদি সেরকম না হয় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। শরীরটা আবার টিসোচ্ছে রে। জ্বর এল বুঝি। আজ রাত্রে খাওয়া বন্ধ। আমি ওই ঘরে শুচ্ছি। তুই এই বারান্দায় শুবি। কাল সকালে ভাত করব তখন খাবি। এদিকে আয়।'

লোকটা বালককে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে জীবগুলোকে দেখাল। এক ডজন মুরগি আর ছাগল। তারা মুখ তুলে দেখল, পেছনে বাচ্চাগুলো তিড়িং-তিড়িং করে নাচছিল। 'সাবধানে এদের দেখবি। ও-পাশের খেতে যেন না যায়। সামনের মেলায় ছাগলছানাগুলো গায়েগতরে হলে বেচে দিয়ে আসব। আজ কিছু মুরগি বেচেছি মিঞার কাছে। দর দিল না শালা।' নিজের মনে কথা বলতে-বলতে কেঁপে উঠল লোকটা। তারপর দু'হাত বুকের ওপর চেপে বলল, 'উহু বড্ড শীত লাগে রে, আমি আলো জ্বালি না। মাটিতেলের দাম খুব। তুই কাজে লাগ। আর হ্যাঁ, ছানাগুলোকে মা-ছাগলটার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবি, বাঁটে দুধ জমুক, কাল সকালে তাই দিয়ে পথ্য করব আমি।'

কাঁপতে-কাঁপতে লোকটা ঘরের দরজায় তালা খুলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল।

সমস্ত চরাচর জুড়ে এখন নিশ্বাসের শব্দ। গাছপালার শরীরে বাতাস পাক খাচ্ছে। বালক সেই নির্জনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল। শব্দহীন কান্নায় বুকের খাঁচা কাঁপতে লাগল তার। এবং সেই সময় মুরগিগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠে ডানা ঝাপটাতে লাগল। সেই বিকট এবং সম্মিলিত চিৎকার বালককে শূন্যবোধ থেকে মুক্ত করে ছুটিয়ে নিয়ে এল চালার সামনে। এবং সেখানে আসতেই তার নজর পড়ল সাপটার ওপর। পায়ের পাতা ডোবা ঘাসের মধ্যে শরীর রেখে মুরগিদের দিকে এগোচ্ছিল, বালকের ছুটে আসার শব্দ তাকে থমকে দিয়েছে। আজন্ম নদীর চরে থাকায় বালক সাপ চেনে। সাপ দেখলেই তারা বালির চরে ছুটত সেটাকে মারতে। নারী বলত, সাপকে আক্রমণের সুযোগ দেওয়ার আগেই মেরে ফেলা উচিত। পড়ে থাকা একটা বাঁশ তুলে নিয়ে বালক ছুটে গেল সামনে। বিপদ দেখে সাপটি পালাবার চেষ্টা করেও বিফল হল। তার মৃত শরীরকে বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে

বালক নিয়ে এল লোকটির ঘরের দাওয়ার সামনে। তার প্রথম কাজ সে যেন লোকটাকে দেখাতে চায়।

মুরগিগুলো ডাকছে না। কিন্তু তাদের চোখে অসীম কৃতজ্ঞতার ভাষা পড়তে পারল বালক। সে ছাগলগুলোর দিকে তাকাল। তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু ছানারা স্থির হয়ে রয়েছে। লোকটা এখন উঠবে না। ঘরের ভেতর থেকে কোঁকানির শব্দ ভেসে আসছে। সাপটাকে সেখানেই ফেলে রাখল সে। আর তখনই মনে পড়ল মায়ের কথাগুলো। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মাকে বলতে শুনত, 'তুমি একটা সাপ, ছোবল মাইর‍্যা-মাইর‍্যা এই শরীরটারে বিষ কইর‍্যা দিয়াও শান্তি নাই!'

সে তাকাল সাপটার দিকে। তার বাবা কী করে সাপ হল কে জানে। মা-বাবার ভাষা মাঝে-মাঝে সে বুঝতে পারত না। হঠাৎ খুব অবসন্ন বোধ করল বালক। খিদেয় পেটের ভেতরটা গোলাচ্ছে। সে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। লোকটা বলেছে কাল ভাত হবে। কিন্তু দুমুঠো মুড়ি ছাড়া সে কিছুই খায়নি। তার মা বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে ভাত নিয়ে আসত থালায় বেঁধে। বাপ কাজ পেলে চরে উনুন জ্বলত। তারা দশ ভাই-বোন সেই ভাত পেটে পুরে রাত্রে ঘুমুত। তিনদিন মা কাজে যায়নি, বাবা কাজ পায়নি। তাই ভাতও নেই পেটে।

বালক চারপাশে তাকাল। বাগানময় গাছ, কিন্তু গাছে কোনও ফল নেই। তার মনে পড়ল লোকটা বলেছে ছানাগুলোকে মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে। এগিয়ে গেল সে। দরজা খুলে দিতেই তিড়িং-তিড়িং ছন্দে তিনটে ছানা বেরিয়ে এল। মা-ছাগলটা বের হওয়ার আগেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। খানিকক্ষণ সব বিস্মৃত হয়ে বালক ছাগল ছানাগুলোর সঙ্গে মুক্ত আকাশের নিচে খেলা করতে লাগল।

ওপাশে মুরগি এবং ছাগলগুলো ডাকছে। সারাদিন অভুক্ত থাকায় তারা চিৎকার শুরু করল। এই সময় ঘরের ভেতর থেকে জ্বরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'ও-পাশের দাওয়ায় ছাগল আর মুরগির খাবার চাপা দেওয়া আছে, দিয়ে দে। ওরে বাবারে, কি শীত!'

বালক হুকুমটা পালন করামাত্র জন্তুগুলোর খুশির নিশ্বাস শোনা গেল। সে ব্যাকুল চোখে দেখল কি তৎপর হয়ে ওরা খাদ্য গলাধঃকরণ করছে। বালকের চোয়াল নড়তে লাগল। হাত বাড়িয়ে সেই খাদ্যপদার্থ তুলে নিয়ে জিভে দিতেই শরীরটা গুলিয়ে উঠল। না, এটা খাওয়া যাবে না। সে ছানাগুলোকে ওই খাদ্য এনে দিল। তৎপর ছানারা তাতে মুখ দিয়েও ফিরিয়ে নিল। ওই খাদ্য তাদেরও পছন্দ নয়।

সন্ধের ছায়া নেমেছে। আর জঙ্গলের মাথায় উবু হয়ে বসেছে তরমুজের মতো চাঁদ। তারই আলোয় চারটে ছানা নিয়ে বসেছিল বিষণ্ণ বালক। ছানাগুলো সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। বালকের চোখের সামনে নদীর চর, হোগলার ঘর এবং নয় বোনের মুখ ভেসে উঠতেই সে কেঁদে ফেলল। আর তখনই একটি ছানা চট করে জিভ বের করে তার গরম অশ্রু চেটে নিল। একটা কষ্টের কান্না কীভাবে যে হাসিতে রূপান্তরিত হয় তা বালক বুঝল না, কিন্তু পলকেই দুঃখ ভুলে সে ছাগলটাকে জড়িয়ে ধরল। ও-পাশে মা-ছাগলটা এখন ছানাদের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছে। ছানা চারটের পা একটা দড়িতে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও তারা ছুটে যেতে চাইছে মায়ের কাছে। একটুও ছেলেমানুষি নেই ওদের আচরণে। লোকটা বলেছে ছানাগুলোকে আলাদা রাখতেই হবে। নইলে মা-ছাগলটার বাঁটে দুধ জমবে না, 'সেই দুধে লোকটা পথ্য করবে আগামীকাল', অনেক চেষ্টার পর ছানাগুলো নেতিয়ে-নেতিয়ে পড়ল। যেমন করে সে আর তার বোনরা বালির চরে নেতিয়ে থাকত না ফিরবে খাবার নিয়ে এই আশায়। এবার নিশ্চয়ই ছানাগুলো ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়লে খিদে থাকে না, এটা সে জানত। কিন্তু তখনই মুরগিগুলো চিৎকার শুরু করল। চমকে উঠল বালক। তারপর বাঁশটা তুলে ছুটে যেতে কিছু একটা পালিয়ে গেল পাশের জঙ্গলে। মুরগিগুলো সরে গিয়েছিল একপাশে। এবং

তখনই বালক অবাক হয়ে দেখল জিনিসটাকে। খাঁচার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে ডিমটাকে বের করে নিয়ে এল বাইরে। এটা ডিম। খেলে তাগদ বাড়ে। ঘ্রাণ নিল সে। কোনও ঘ্রাণ নেই। শক্ত খোলটা হাতের চাপেও স্থির। বিকেলে এটা ছিল না এখানে। লোকটা নিশ্চয়ই জানে না। ডিম কি কাঁচা খায়? এই সময় মা-ছাগলটা অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। বালকের মনে পড়ল, শূন্য নদীর চরে নারী যখন চিৎকার করে তাদের ডাকত তখন তার গলাটা অনেকটা এইরকম শোনাতো। সে উঠে গেল মা-ছাগলটার কাছে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় মা-ছাগলটা কাতর চোখে তাকে দেখল।

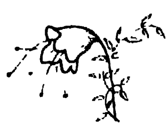
সম্মোহিতের মতো বালক এগিয়ে গেল। ছাগলটি সন্দিগ্ধ হয়ে সরে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। এবং এই প্রথম বালক সচেতন চোখে দুধ দেখতে পেল। বালক নতজানু হয়ে বাঁট স্পর্শ করতেই পুরন্ত শরীর থেকে দুধ ছিটকে এল তার হাতে। বিস্মিত বালক এই প্রথম মাতৃদুধের স্পর্শ পেয়ে এমন হতবাক হয়ে গেল যে মা-ছাগলটির খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া আটকাতে পারল না। হাতটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে অমৃতের স্বাদ পেল সে। তারপর চেতনা ফিরতেই সে ছুটে বাইরে এসে দেখল দুটি ছানা মায়ের দুই বাঁটে মুখ ডুবিয়ে তৃপ্তিতে স্থির, বাকি দুজন নাচছে তাদের ঘিরে। তারা চেষ্টা করেও বাঁটের দখল পাচ্ছে না।

বালক ভীত হল। ছানাগুলো যদি সব দুধ খেয়ে নেয় তাহলে কাল লোকটার পথ্য হবে কিসে? জবাবদিহির ভয়ে সে যখন বাঁশটা নেবে ভাবছে ঠিক তখন ঘরের মধ্যে থেকে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'পাহারা দিবি সারা রাত। শেয়াল আসে মুরগি খেতে। কিছু হলে দেব ভাত ঢুকিয়ে।'

সঙ্গে-সঙ্গে স্থির হয়ে গেল বালক। তার হাতের মুঠোর ধরা ডিম শক্ত হল। এই মুহূর্তে যদি লোকটা বেরিয়ে আসে, তাহলে—। সে ডিমটাকে পাথরের মতো আঁকড়ে ধরল। কিন্তু লোকটি বের হল না। বালকের হঠাৎ মনে হল তার বাপ যদি সাপ হয় তাহলে ওই লোকটা শেয়াল। নারী বলত শেয়াল খুব চালাক। নইলে নিজের জ্বর হয়েছে বলে তাকে ভাত দেবে না কেন? সে মাটি খুঁড়ে ডিমটাকে পুঁতে রাখল নিচে। চরে বিচি পুঁতলে সে দেখেছে তরমুজের গাছ বের হয়। নিজেকে একটা গোপন সম্পত্তির মালিক বলে মনে হল তার।

বালক এগিয়ে গেল। তারপর অপেক্ষারত দুটো ছানার সঙ্গে বসে রইল মা ছাগলটার দিকে তাকিয়ে, নদীর চরে উনুন জ্বললে যেমন তারা বসে থাকত। আর মা-ছাগলটা হঠাৎই মমতা এবং ভারমুক্তিতে সস্নেহে বালকের গাল চেটে দিল। এতক্ষণে পরিবেশটা ভীষণ পরিচিত হয়ে গেল।

শূন্য চরাচরে সহজ বালক অপেক্ষা করে যায়। পৃথিবীর সব দৃশ্য মুছে গেছে তার সামনে থেকে, শুধু টৈটুম্বুর খাদ্যভাণ্ডার বিশ্ব জুড়ে, যা দখলের জন্যে কুশলী হতে হবে তাকে। সে আর তৃতীয় এবং চতুর্থ ছানা হতে চায় না।



চর, শহর এবং একটি বেকুফ

দিনরাত এখানে হাওয়া উথালপাথাল হয়। চিকন বালির সর গায়ে মেখে পাক খায় নিচু আকাশে। সূর্যের কড়া টানে ঝুরু-ঝুরু হয়ে গিয়েছে চরের বালি। কাশ আর বুনো ঝোপে ছেয়ে গেছে চওড়া নদীর বুক। শুধু এক পাশে, সেই সে-পাড়ে, পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা জলের ধারা তিরতিরিয়ে বয়ে যায় বাংলাদেশের দিকে। ওপারের গরু হেঁটে পেরিয়ে আসে এদিকের চরে। স্বচ্ছন্দে।

দুই মাইল চওড়া এই নদী সেদিনও পৃথিবী কাঁপাতো। ছ-মাস নিরীহ সাপের মতো গা এলিয়ে যে ঘুমুতো, তার গায়ে খুঁটি পোতার সাহস হয়নি কারো। যেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, পাহাড়ে নাচন শুরু হল বর্ষার, সঙ্গে-সঙ্গে নদী দাঁড়াতো ফণা তুলে। তারপর ছোবল আর ছোবল। দু-মাইল চওড়া ঘোলা জল দিনরাত গর্জে উঠত আর পাশের শহরটার প্রাণ সেই শাসানিতে হয়ে থাকত আধমরা। হঠাৎ একদিন জলগুলো নদী ছেড়ে উঠে এল দুই পাড়ে। দুমড়ে মুচড়ে শহরটাকে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে নেমে গিয়েছিল আবার। লোকে বলল, প্রলয়, মহাপ্রলয়। মানুষ মরল, সম্পত্তি গেল, অতবড় শহরটাকে মৃত্যুপুরীর মতো দেখাচ্ছিল।

ব্যাস, সঙ্গে-সঙ্গে নদীর দাঁত ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেল। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল নদীটাকে। সেই পাহাড়ের তলা থেকে বোল্ডার সাজানো হল, বাঁধ তোলা হল শহরের খানিক ওপর থেকে। ফণা তোলার আগেই কোমরে ঠিকঠাক ঘা মেরে রাখা হল। পোষা কুকুরের মতো তখন ওই পঞ্চাশ গজে জল নেমে যায় বাংলাদেশের দিকে।

আশ্চর্য, নদী এই বাঁধন মেনেও নিল। আর তার ফণা নেই, নেই ফোঁসফোঁসানি। যদি কিছু বাড়তি জল বর্ষায় নেমে আসে তা চালান করে দেয় অন্য দিকে। পাহাড়ের গা থেকেই আর একটা ধারা অন্য দেশ অন্য গ্রাম দিয়ে বয়ে যায়। তাই শহরের মানুষ নিশ্চিন্ত। আর দিনের পর দিন বয়ে যাওয়া জল ক্রমাগত বালি ফেলে-ফেলে চরের শরীর মোটা করেছে। নদী তাই নিজের বালি নিজেই অতিক্রম করতে পারে না। পঞ্চাশ গজেই প্রাণভোমরা ধুকপুক করে।

শহরটা কিন্তু চটপট নিজেকে সারিয়ে নিল। বেশ রঙচঙে হয়ে উঠেছে আবার। সেখান থেকে একটা লোক একদিন উঠে এল বাঁধে। উঠে জরিপ করল নদীর বুক। তারপর পেছন ফিরে চিৎকার করল শহরটার উদ্দেশ্যে। তার ঝুপড়িটা ভেঙে দিয়েছে নগরপাল। ঘর ভাড়া পাওয়া ওখানে স্বপ্নের মতো ব্যাপার। শুধু দিনমজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না। একটা ভিখিরিকেও এই শহরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ঝুপড়ি ভেঙে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেলখানায়। তিনদিন বেদম পিটুনি দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। পকেটে যার টাকা নেই তাকে কে দেবে ঘর! অন্য মজুররা ওই ভিনদেশিকে দেয়নি ঠাঁই। ফলে লোকটা উঠে এল বাঁধে। এসে বলল, শহরের মুখে আমি ইয়ে করি।

লোকটা বালির মধ্যে হেঁটে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর কয়েকটা বাঁশ আর দরমা দিয়ে তৈরি করে নিল মাথা গোঁজার জায়গা। নিচু হয়ে ঢুকতে হয় কিন্তু জানালা কেটে নিল সে। ফুরফুরে বাতাস ঢুকতে লাগল অবিরত।

আর তাই দেখে শহরের লোক উঠল আঁতকে। একি পাগল! ওই সাপের গালে গাল রেখে কেউ ঘুমাতে পারে? খবরটা পৌঁছালো নগরপালের কাছে। তাঁরা কাগজ নেড়ে দেখলেন নদীর চর শহরের সম্পত্তি নয়। অতএব যে মরতে চায় সে মরুক, শহরের লোকের তাতে কি যায় আসে! অতএব তিনমাসের মধ্যেই চালার গায়ে লতানো গাছের কচিপাতা বাতাসে দোল খেতে লাগল। সারাদিনে মজুরের কাজ সেরে বিকেলে ফিরে যায় লোকটা চালায়। শহরের লোক ভুলেও চরে পা দিত না। দূরের বাঁধে দাঁড়িয়ে তারা চালাটাকে দেখত আর হাসত। লতানো গাছে কী যেন একটা ফলও ফলিয়েছে লোকটা। খবরটা শহরের নিচুতলায় পৌঁছে গেল। যারা কোনওমতে ঘর জোগাড় করে আধপেটা খেয়ে পড়েছিল তাদের দু-জন সাহস পেল। কোনওরকমে আর একটা চালা তৈরি করে নিল খানিক তফাতে। তবে সে কিনা সংসারী মানুষ, বউ বাসন মাজে বাড়ি-বাড়ি। দ্বিতীয় লোকটা অবশ্য সেই পয়সার খায় না। তার গাঁজার মশলার হাত চমৎকার। এরকম একটা নির্জন চরে ব্যাবসা জমে গেল খুব। সন্ধে হলেই শহরের ছোকরারা বাঁধ পেরিয়ে নেমে আসে গাঁজার টানে। অবশ্য বউটি ফিরে এলেই হাওয়া হয়ে যায় বাউন্ডুলেরা। তখন চড়চাপড় পড়ত গেঁজেলের ওপরে। প্রথম লোকটা শেষে চিৎকার করে বলেছিল, 'আই, যা কিছু ঝামেলা শহরে গিয়ে করবি, এই চরে

যেন কোনও শব্দ না হয়।' লোকটার বিশাল চেহারা, একমুখ দাড়ি দেখে ভয় পায় এরা।

তারপর একদিন মেঘ পাক খায় আকাশে। ফিনকি দিয়ে জল ঝরতে থাকে। দ্বিতীয়জনের বউ ছুটে যায় প্রথমজনের কাছে, 'কী হবে, বর্ষা.এল যে!'

লোকটা হাত ঘোরায়, 'যা ভাগ! বৃষ্টি দেখতে দে। ভয় তো এলি কেন?' গায়ে পড়া ভাবটা একদম সহ্য হয় না তার। বউটা দুতিনদিন চেষ্টা করেছিল ভালোমন্দ খাওয়ার পাঠিয়ে দিয়ে ভাব জমাতে। যেমন আছ তেমন থাকো, অত গা শোঁকাশোঁকির কী দরকার? গেঁজেলের খদ্দের কমেছে। বৃষ্টিতে চরে আসতে ভয় পায় সবাই। বউটা একটু নরম হয়েছে যদিও কিন্তু হঠাৎ জলের ভয় ধরেছে গেঁজেলেরও মনে। কিন্তু নদীটা যেন চিরে গেল হঠাৎ। ওপাশে ছিল পোষা কুকুরের মতো, একটা ধারা হঠাৎ এপাশে এসে গেল বর্ষার জল পেয়ে, কিন্তু স্বভাব হল আদুরে বেড়ালের। মাঝখানের চরটা উঁচু হয়ে শক্ত বালি আর দুটো চালা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগল বেশ। এখন বেশ সুবিধে হয়েছে বউটার। জলের ধারায় গা ডুবিয়ে স্নান করে। চরের দিকে ফিরে বুকের কাপড় ছাড়ে। লোকটাকে চোখ বন্ধ করতে হয়। ছুটে গিয়ে শাসায় গেঁজেলটাকে, 'ভালোভাবে যদি এখানে না থাকো তাহলে উড়িয়ে দেব চালা।'

'গেঁজেলটা বুঝতে পারে না কিন্তু বউটা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ঢং।'

একটা বর্ষা ফুরোলেই শুকনো বালি ওড়ে হাওয়ায় আর দুটো রিকশাওয়ালা নেমে আসে চরে। তাদের ডেরা ভেঙেছে নগরপাল। সুন্দর উদ্যান হবে সেখানে। এসে জিজ্ঞাসা করে প্রথমজনকে, 'এখানে ঘর তুলব? শহরে থাকার জায়গা নেই।'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তবে আমার চালা থেকে তফাতে।' আঁটোসাঁটো চালা বানায় তারা। তাই দেখে ভরসা বেড়ে গেল শহরের নড়বড়ে আধ-পেটাদের। তিনমাস না ঘুরতে পনেরো ঘর বাসিন্দা হয়ে গেল চরের। বালির ওপর বুনো ঘাস গজাচ্ছে, নধর লতানো গাছে চালাগুলো ছেয়ে যায়। আর একটা চালায় রেডিও বাজে সারাক্ষণ। তবে লোকটা ফিরে এলেই তার গলা নেমে যায়। শহরের লোক সকাল বিকেল বাঁধে বেড়াতে এসে বলাবলি করে, সাহস খুব। একটা বর্ষা কোনওমতে কেটেছে কিন্তু পরের বর্ষার নদী খেপলে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে ব্যাটারা। নদীর স্বভাব জানে না এই পরগাছাগুলো। কিন্তু একদিন দারোগাবাবু এলেন চারজন পুলিশ পেছনে নিয়ে। বাঁধ থেকে বালিতে পা উঠিয়ে চালা অবধি হেঁটে এসে হাঁক দিলেন, 'এই, তোদের মোড়ল কে? সর্দার কোন হ্যায়?'

গেঁজেলটার বউ আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল আলাদা চালাটাকে। দারোগা তার সামনে গিয়ে গর্জন করল, 'কে আছিস বেরিয়ে আয়!'

সারাদিন খেটেখুটে লোকটা তখন সবে শুয়েছিল, অবাক হয়ে বেরিয়ে এসে দেখল পুলিশ।

'তুই এই চরের মোড়ল?'

লোকটা ঠোঁট নাড়ল। সে মোড়ল হতে যাবে কেন? সে কারও সাতে-পাঁচে থাকে না।

পিছন থেকে বউটা চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ বাবু ও মোড়ল।'

'শোন! এই চর তোমাদের ছাড়তে হবে।' দারোগাবাবু হুকুম করলেন।

'ছাড়তে হবে?' লোকটার চোখ ছোট হল, 'কেন? অপরাধটা কী?'

'এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামারি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায়। এটা বেআইনি বসতি অতএব উঠে যাও তোমরা। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।' দারোগাবাবু লাঠি নাচালেন।

লোকটা মাথা চুলকালো, 'অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

'কী?'

'আপনার হাতে খারাপ ফোঁড়া হয়েছে।'

'আমার হাতে?' দারোগাবাবু হকচকিয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, 'কই, নেই তো! ইয়ার্কি হচ্ছে হারামজাদা শুয়ার—!'

লোকটা হাতজোড় করল, 'অভয় দিয়েছেন তাই বললাম। হুজুর, খারাপ ফোঁড়ার কথা শুনেই আপনি সেটাকে ডাক্তার দেখাতে গেলেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ঠিক কিনা? তাই তো?'

'কী বলতে চাস?'

'হুজুর ভালো করে দেখুন, এখানকার কেউ চুরি করে কিনা। সত্যি হলে আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

দারোগাবাবু হাসলেন, 'বুদ্ধিমান লোক মনে হচ্ছে। বেশ, ধরতে পারলে আমি সব চালায় আগুন ধরিয়ে দেব, মনে রাখিস।'

দারোগাবাবু চলে গেলে আনন্দিত লোকগুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে, 'দাদা, তুমি বাঁচালে এ-যাত্রা। তোমাকে আমরা সবাই মোড়ল বলে মেনে নিলাম।'

লোকটা হুংকার দিল, 'ভাগ শালারা। আমাকে একা থাকতে দে।'

লোকগুলো হেসে বলল, 'দাদার মন সরল, ঠিক সন্ন্যাসীর মতো।'

লোকটা চেঁচাল, 'দারোগা কী বলে গেল সবাই নিশ্চয় শুনেছ। চোর-ছ্যাঁচোর এখানে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

লোকগুলো হেসে উঠল, তারপর ফিরে গেল যে যার ডেরায়। এই সময় একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এল হেলতে দুলতে। তার শরীর ভারি এবং চোখ চড়ুইপাখির মতো উড়ছে বসছে। এসে বলল, 'চুরিচামারি মানে কী?'

লোকটা নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে তাকাল, 'এটা আবার কে?'

দ্বিতীয়জনের বউ এগিয়ে এল পাশে, 'আমার বোন। এখন থেকে এখানে থাকবে।'

'অ। তা বোনকে চুরির মানে শিখিয়ে দাও।'

'আহা, তুমিই ব'লো না শুনি। হুকুম করলে, চোর-ছ্যাঁচোর থাকতে পারবে না। তা চুরি করা কাকে বলে সেটা বলে দাও।' মেয়েটি চোখ ঘোরাল।

'অন্যের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হয়।' লোকটি ভেবেচিন্তে জবাব দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, ' কেউ যদি জিনিসটা হারিয়ে ফেলে, আর একজন যদি তা টুক করে তুলে নেয়?'

'সেটাও চুরি বলে।' লোকটা গম্ভীর গলায় জবাব দেয়।

'তাই?' চোখ ঘোরাল মেয়েটা, 'তাহলে তো চোর খুঁজতে যেতে হয়।'

'মানে?'

'আমার একটা জিনিস যে চুরি গেছে।'

'কী জিনিস?'

আঙুল তুলে ধীরে-ধীরে বুকের ওপর রাখল মেয়েটা। রেখে হেসে উঠল উচ্চস্বরে। সঙ্গে -সঙ্গে তার বোন আঁতকে উঠল, 'ওমা, কখন?'

'ওই যে, যখন দারোগার সঙ্গে কথা বলছিল। কী চমৎকার কথা বলে, না দিদি?'

লোকটা আর অপেক্ষা করল না। চালায় মাথা নামাবার আগে চিৎকার করল, 'ওসব ছেনালি কথাবার্তা আমার কাছে বলে সুবিধে হবে না। আমি মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াই না।'

সঙ্গে-সঙ্গে হাসির ফোয়ারাটাকে তুলে নিল হাওয়া, সমস্ত চরময় ছড়িয়ে দিল যেন।

নদীর বুকে বালি জমে যাওয়ায় খালটার অবস্থা কাহিল। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে খালটা

বয়ে যেত। জল গিয়ে পড়ত নদীর বুকে। সেই মহাপ্রলয়ের সময় এই খালটাকেও সঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেছিল নদী। নিজের জল উজিয়ে দিয়েছিল খালের বুকে। শহরের মানুষ সে রাস্তাও বন্ধ করেছে বাঁধ বেঁধে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছে লম্বা খালটা। একটু-একটু করে মজে গেছে জল, তলায় শ্যাওলারা পর্যন্ত অখুশি এখন। গেল বিজয়ার ভাসান পর্যন্ত নৌকোয় চেপে হয়নি খালের বুকে। একটা মরা আঁশটে গন্ধ ছড়ায় খালটা সারাদিন। শহরের মাতব্বররা বলল, এভাবে খালটাকে মেরে ফেলা ঠিক নয়। বেশ টলটলে জল থাকবে, নৌকো চলবে। হাউসবোট ভাসলে লোকে বেড়াতে আসবে এখানে, শহরটারও ইজ্জত বাড়বে। নানারকম ফন্দিফিকির চলতে লাগল খাল উন্নয়নের জন্যে কিন্তু কোনও রাস্তা বের হয় না। খালের সামান্য ঘোলাটে জল বাঁধের গায়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বাঁধের ওপাশে বালির চর। তার বহুদূরে নদীর ধারাটি বয়ে যায়। আগের মতো খাল তার বুকে মুখ ডোবাতে পারে না। এমন কি তার শরীরের মাছগুলো গত গ্রীষ্মে পেট উলটে ভেসে উঠেছে। এখন চওড়া খালের ওপরের সুন্দর সেতুগুলোকে কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়।

তবে এটা ঠিক, খালটা শহরের লোকের কাছে নদীর তুলনায় অনেক আপন। এটা যদি সম্পূর্ণ বুজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হাজার টাকায় কাঠা কিনে বাড়ি বানাবার লোকের অভাব হবে না। বোধ হয় তাই এই মরা খালের গায়ে কোনও চালাঘর তুলতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। আবর্জনা বাড়াতে দেওয়া চলবে না। বাস করতে চাও চলে যাও নদীর চরে। সেখানে তোমার কি হল না হল তাতে কর্তৃপক্ষের কোনও দায়িত্ব নেই। তবু শহরের মানুষ অবাক হয়ে দ্যাখে নদীর চরের মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। বেশ গাছগাছালির লাগানো শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঘরদোরের গঠনও পালটাচ্ছে। বেশ শৌখিন আর মজবুত চেহারা নিচ্ছে সেগুলো। রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালা দিনমজুর আর ঠিকে ঝিদের চমৎকার পাড়া হয়ে গিয়েছে ওটা। বর্ষায় যখন এদিকে একটা ধারা গজিয়ে যায় তখন ভেলা করে পারাপার করে ওরা। সুন্দর হাওয়া বয় সারাদিন ওখানে। চাষবাসের একটা চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। রাত্রে কাছে পিঠে শেয়াল ডাকে না। শহরের কিছু বাউন্ডুলে ছেলে চলে যায় ওখানে। লুকিয়ে গাঁজা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওরা। এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই আছে। আর গেল বর্ষায় খালটা জলে ভরে গিয়েছিল। সেই জল স্থির হয়ে থেকে একটা পচা গন্ধ আরও তীব্র হয়ে শহরে ছড়াচ্ছে। অসুখবিসুখ হচ্ছে মানুষের। খালের জল ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন এবার খালটাকে বুজিয়েই ফেলবেন। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার যে পরিকল্পনা ছিল, অর্থাভাবে বাতিল করে দিয়ে মোটা দামে জমি বিক্রি করে আর পাঁচটা ভালো কাজ করা যাবে।

সন্ধে নাগাদ চরে ফিরে এল লোকটা একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে। চমৎকার নাদুস-নুদুস কাৎলা মাছ। এসে ঝাঁপ খুলে ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'যা খুব ভুল হয়ে গেল। লোভে-লোভে কিনে ফেললাম, এখন কাটবে কে?'

'চিন্তা কি, কেটে দেব, রেঁধে দেব, খাইয়েও দিতে পারি।'

'কে?' চমকে উঠল লোকটা। ঘরটায় এখন আঁধার, 'এই ঘরে কে?'

লোকটার হাঁকডাকের উত্তরে একটা ছোট্ট হাসি বাজল, 'পেতনি। চরের পেতনি।'

দ্রুতহাতে কুপি জ্বালাল লোকটা। তারপর সেটাকে উঁচু করে লোক খুঁজল। আলো পড়তে বুকে আঁচল টানল মেয়েটা, 'আঃ, লজ্জা লাগে না। ব্যাটাছেলের চোখ না তো করাতের দাঁত। নামাও ওটাকে।'

বাজ পড়ল ঘরে, 'অ্যাই, এখানে কী চাই? চুরি করার মতলব?'

'চুরি!' হাসল মেয়েটা, 'ডাকাতের ঘরে চুরি? লোকে হাততালি দেবে।'

'মানে? আমি ডাকাত?'

'নিশ্চয়ই। আমার মন ডাকাতি করেছ গো।' তারপর সুর ধরল, 'ও যে দিন-দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই।' শুয়ে-শুয়ে পা নাচাল, 'কী মাছ গো?'

লোকটি তখন তার বিশাল চেহারা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না নিচু ছাদের জন্যে। ঘাড় নামিয়ে তবু ছুটে এল পাশে, 'অ্যাই ওঠ, বেরো এখান থেকে। যা, চলে যা।'

'কোথায় যাব?'

'কেন তোর দিদির ঘর নেই! সেখানে গিয়ে জামাইবাবুর গাঁজা সাজ।'

'ওই জন্যে তো পালিয়ে এলাম। যত রাজ্যের বাবু ছোকরাগুলো দিনরাত সেখানে জাঁকিয়ে বসে থাকে। আমি গেলেই ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। বুকের আঁচল ফেলে যে শোব তার উপায় নেই। রাক্ষসগুলোর মধ্যে আমি থাকতে পারি, তুমি বলো?' ঠোঁট ফোলাল মেয়েটি।

'কেন, তোর দিদি কোথায়? সে মাগির তো বড় মুখ।'

'অ, দিদির কথা বলো না। সে তো এখন জামাই-এর দোসর হয়েছে। গাঁজা খেতে এসে ছোকরাগুলো ভালো টাকা দেয় বলে রসের কথা বলে। দিদির এখন গতর খাটিয়ে ঝি-গিরি করতে বয়েই গেছে। ছিলিমে টান দিচ্ছে আর এর ওর সঙ্গে রস করছে। ওর মনে খুব দুঃখ।'

'দুঃখ? দুঃখ কেন?'

'বাঃ, দুঃখ হবে না? তোমার দিকে নাকি প্রথমে ঝুঁকেছিল। তখন এই চরে তোমরা দুই ঘর ছাড়া নামি মানুষ ছিল না। তা তুমি পাত্তা দাও নি।'

'পাত্তা দেব কেন? সে অন্যের বউ না?'

'তাই তো। তবে কাচ তো আর ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তার জন্যে হীরে চাই।' বলে খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েটি।

'তা আমি কী করব এসব শুনে? যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাও, আমায় একা থাকতে দাও।' লোকটার গলার স্বর ভাঙছিল।

'বাঃ, তুমি জানে' না তো কে জানবে? তুমি এখানকার মোড়ল।'

'না, আমি কেউ নই। একা থাকতে চরে এলাম তাও সব ভিড় জমালো।'

'তাহলে ওরা ঠিকই বলে।'

'কী বলে?'

'তুমি পুরুষমানুষ নও। তাই লুকিয়ে থাকতে চাও।'

'কে বলে? গর্জে উঠল লোকটা।

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। আমি বলি কী, আজকের রাতটা এখানেই থাকি।'

'না কক্ষনো না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, চেঁচিয়ে ওদের জানিও না, তাহলে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে আমাকে। কাল সূর্য উঠলে আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে দুচোখ যায়। মেয়েছেলের শরীরে যৌবন থাকলে ঠিকানার অভাব হয় না। এখন মাছটা কাটব?'

'মাছ?'

'ওই যে পড়ে আছে। দেখি-দেখি, ভালো করে আলো ফেলো তো! এমা, এ যে পোয়াতি মাছ। ব্যাটাছেলেদের কাটতে নেই।'

'পোয়াতি?'

'হ্যাঁ, দেখছ না পেটভরতি ডিম?'

লোকটা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সত্যি মাছটার পেট বেশ ফোলা। কোনওরকমে

বলল, 'ঠিক আছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফুঁ দিয়ে কুপির আলো নিবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা, 'তুমি কেমন পুরুষ দেখব আমি!'

ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চাইল লোকটা। কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরে মেয়েটা চাপা গলায় হিসহিস করল, 'ওরকম করলেই চেঁচাব। বলব তুমি আমার ইজ্জত নিয়েছ।'

'আমি?' লোকটার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'হুম। লোকে দেখবে আমার শরীরে কাপড় নেই। দ্যাখো না, দ্যাখো! মিথ্যে বলছি না!'

মাঝরাত্তিরে লোকটার মনে হল মেয়েরা হল নদীর মতো। শুকিয়ে থাকলে মরা চর আর ঢল নামলেই কালনাগিনীর মতো হিংস্র, যতক্ষণ না গিলছে ততক্ষণ শান্ত হয় না। এই যে মেয়েটা এখন তার শরীরের ওপর হেলান দিয়ে কি আরামেই না ঘুমোচ্ছে। দু-দুবার সে ঝড় তুলেছে তবে এই শান্তি। অবশ্য সুন্দর করে মাছ রেঁধেছিল, তাই দিয়ে পেট ভরে ভাত খাওয়া গেছে। বেশ সুখী-সুখী লাগছে আজ। ঘরে মেয়েছেলে থাকলেই হবে না, সে মেয়েছেলেকে সুখ দিতে জানতে হবে তবেই পৃথিবীটাকে অন্যরকম লাগবে। তবে এ মেয়ে নির্ঘাত ভালো মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই অনেক ঘাট ঘুরছে এর মধ্যে, নইলে এত ছলাকলা শিখল কী করে? যদি ভাবো খারাপ তো খারাপ, নইলে নয়। ওই নদীর কথাটাই ফিরে আসে। এ ঘাটে ছলাৎ ও ঘাটে ছলাৎ, কেউ করল স্নান কেউ কাচল কাপড় কিন্তু পরের ঘাটে নদী আবার নতুন। লোকটা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। ঘুম ভেঙে হাঁসফাঁস করল মেয়েটি অস্ফুট আওয়াজ বেরুল, 'কী হল?'

লোকটা বলল, 'বাঁধ দিলাম, বেঁধে নিলাম।'

মেয়েটি হেসে ফেলল অস্বস্তিতে, 'ওমা, আমি কি নদী?'

লোকটি বলল, 'তাই।'

রোদ উঠলে চরে শুরু হল হইচই। মেয়েটির বোন আর গেঁজেলটা এল তেড়ে। চেঁচিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, 'সোমত্থ মেয়েকে নিয়ে শুয়েছে সারা রাত, বিচার চাই।'

লোকজন উত্তেজিত হল। মেয়েটার জন্যে যাদের জিভে লালা জমত তারা বলল বেশি। থানায় যাও, পুলিশ ডাকো। একি কেলেঙ্কারি, যাকে মোড়ল ভাবা হয় সে-ই কিনা এই পাপ করল। লোকটা মেয়েটার দিকে তাকল, 'কী বলছে, সবাই, শুনেছিস?'

মেয়েটা শরীর মোচড়াল, 'তুমি শোন, ঘুম পাচ্ছে আমার।'

মেয়েটার বোন তাতে ভোলে না। তার টাকা চাই। ক্ষতিপূরণ করতে হবে। খাইয়েছে পরিয়েছে যাকে, তাকে বেইজ্জত করেছে। লোকটা বলল, 'আমার টাকা নেই।'

এরা নাছোড়বান্দা। কাজে যাওয়া হল না লোকটার। দুশ টাকা চাই। নগদ। এক পয়সা কম নয়। লোকটা মাথা নাড়ে, অসম্ভব। দুপুর নাগাদ ঘুমিয়ে টুমিয়ে মেয়েটা বেরিয়ে এল চালা থেকে, 'দিয়ে দাও দুশো।'

লোকটা বলল, 'কোথায় পাব?'

মেয়েটা বলল, 'তা বললে চলে। ঠিক আছে, আমি দিদির কাছে রইলাম, তুমি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো আমাকে। গতর দুলিয়ে সে চলে গেল বোনের সঙ্গে। লোকটার সামনে শুয়েছিল একটা নেড়ি, প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সেটা চর ফাটাতে লাগল চিৎকারে। কী করা যায় বুঝতে পারছিল না লোকটা। ভিড় এখন পাতলা। রেডিও বাজছে কোনও এক চালায়। গেজেলের ঘরে মেয়েটা

সেঁধিয়েছে বোনের হাত ধরে। সেখানে জমেছে শহরের ছোকরাগুলো। লোকটা ছটফট করছিল। টাকা তার আছে। সর্বসাকুল্যে আড়াইশো টাকা। তার নিজের চালার তলায় বালি খুঁড়ে এক হাত গেলে টিনের কৌটোয়। কিন্তু সে টাকা জমিয়েছে আপদবিপদের জন্যে। দূরের চালাগুলোর দিকে তাকাল সে। বেশ সংসারী-সংসারী চেহারা। ওপাশের ধুধু-চর ঝলকাচ্ছে এখন। বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠল। চালায় ঢুকতেই মোচড় দিল মন। এরকমটা কখনও হয়নি। কালকের রাতটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি তবু খিদে পাচ্ছে না। বিছানার দিকে তাকাতেই কষ্টটা বেড়ে গেল। মেয়েমানুষের শরীর, তার ব্যবহার, দুটো কথাবার্তার টোকা আর রান্নার স্বাদ শালা পাইথনের মতো। একবার গিললে আর ছাড়ে না। দ্রুতহাতে বালি খুঁড়ে কৌটোটা বের করল সে।

গেঁজেলের চালার দরজা সরিয়ে উঁকি মারতেই মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। বাপরে বাপ। গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর এখন ভাসছে। ওকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। পা ছড়িয়ে সে শুয়েছিল বোনের পাশে। সেই পায়ে হাত বোলাচ্ছে শহরের ছোকরা। লোকটা চেঁচাল, 'উঠে আয়।' তারপর ছুঁড়ে দিল টাকাগুলো। বোনটা দ্রুত হাতে কুড়িয়ে নিয়ে গুণে বলল, 'দুশো।' তড়াক করে বেরিয়ে এল মেয়েটা, 'তবে যে বললে টাকা নেই। মরণ! এই না হলে পুরুষমানুষ!'

মাসতিনেক বাদে এক সকালে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। অবাক হয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

মেয়েটা পা ছড়িয়ে বলল, 'কী হবে আমার। পেটে একজন এসে গেল সাত তাড়াতাড়ি।'

লোকটা হেসে বলল, 'এই কথা।'

'হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কী দিয়ে? কটা টাকা কামাও? আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দিকি।' মেয়েটা চোখ ঘোরাল।

লোকটার জিভ শুকিয়ে এল। শহরে মাংসের দাম অনেক। মাল বয়ে যা পায় তাতে দুবেলা ভাত আর সেদ্ধ জোটে। তবু কোনওরকমে একজনের জন্যে মাংস নিয়ে এল বিকেল বেলায়। চেটেপুটে খেয়ে নিল মেয়েটা। খেয়ে বলল, 'আমি খাচ্ছি না, পেটেরটা খেলো। কাল একটু ইলিশ এনো।'

লোকটা বলল, 'টাকা নেই। অত নোলা কেন?'

মেয়েটা বলল, 'পুরুষমানুষ তো বাচ্চা ধরে না, বুঝবে কি!' লোকটা গোঁজ হয়ে রইল।

দুদিন বাদে মেয়েটা বলল, 'দিদির যে কাজ ছিল শহরে তা আমায় নিতে বলল। ভালোই হবে, দুটো পয়সা পাব।'

লোকটা বলল, 'খবরদার, তুই শহরে যাবি না।'

'কেন, গেলে কি আমাকে খেয়ে ফেলবে? পেটে বাচ্চা আছে না?' মেয়েটা রুখে দাঁড়াল। লোকটা ভাবল, তা বটে। রক্ষাকবচ তো পেটে বাঁধা। ভয় কী!

দুদিন বাদে বেশ রগরগে ইলিশ রাঁধল মেয়েটা। লোকটার পাতে ধরে দিয়ে বলল, ' পেটি খাও।'

লোকটা অবাক গলায় বলল, 'পেলি কোথায়? এর তো বহুত দাম।'

মেয়েটা হাসল, 'যে বাড়িতে কাজ করি তার বাবু দিয়েছে। বাজার থেকে আসছিল, পথে দেখা হতে হেসে বললাম, কতকাল খাইনি! বাবু গলে গিয়ে দিয়ে দিল।'

মাথায় আগুন চড়ে গেল লোকটার, 'খবরদার, ও বাড়িতে আর ঢুকবি না।'

মেয়েটা বলল, 'কেন?'

'ও তো সর্বনাশ করবে।' লোকটা গর্জালো।

'মাথা খারাপ তোমার। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কাল সন্দেশ আনব।'

'কোত্থেকে?'

'আর একটা বাবু দেবে বলেছে।'

লোকটা আর পারল না। লাথি মারল ইলিশ মাছে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সেদ্ধভাতে সুখ হবে কিনা বল?'

মূর্তি দেখে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। ভয়ে-ভয়ে বলল, 'হবে।'

লোকটা চেঁচাল, 'শহরে কেউ তোর গায়ে হাত দিয়েছে?'

মেয়েটা সভয়ে মাথা নাড়ল, 'না।'

দুদিন বাদে মেয়েটা আবার উসখুস করল। লোকটা বলল, 'কী চাই?'

'আচার। আমের।'

'এই চরে ওসব পাওয়া যায় না। আমার কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করিস কেন, দিদির কাছে গিয়ে চাইতে পারিস না?' লোকটা মুখ ফেরালো।

'দিদির কাছে চাইলে তোমার মানে লাগবে না?'

'একি কথা! বোন দিদির কাছে চাইলে আমার মান যাবে কেন?'

তিনদিন বাদে এক বোতল বড় আচার এল। লোকটা বলল, 'বাবাঃ, এত কে দিল?'

মেয়েটা লাজুক হাসল, 'খেয়ে দ্যাখো।'

'কে দিল? তোর দিদি?'

'না, দিদির খদ্দের। ওই যে শহরের লোকটা যে গাঁজা খেতে আসে। আমার ইচ্ছের কথা শুনে শহর থেকে এনে দিল।'

'এমনি-এমনি কেউ দেয়? কী করেছিলি ও?

'কিছু না। শুধু বলেছিল তোমার মিষ্টি হাতে গাঁজা সাজিয়ে দাও, দিয়েছিলাম।'

আগুন হল লোকটা, 'খবরদার, আর ও ঘরে যাবি না। হাত কেটে ফেলব।'

অনেক রাত্তিরে মেয়েটা আদর খেতে-খেতে বলল, 'তবে যে তুমি বল আমি নদীর মতো, তাহলে এত অবিশ্বাস করো কেন?'

লোকটা সরল গলায় বলল, 'নদীর মতো হারামি আর কেউ নেই।'

এবার বর্ষার রোয়াব যেন বেড়ে গেল দশগুণ। ভেলায় চেপে পারাপার শুরু হল চর থেকে। শহরের ভেতর যে খাল সেটা হয়ে গেল টইটুম্বর। সাত দিনেও বৃষ্টি থামে না। বৃষ্টির জল জমছে শহরের রাস্তায়। খালের জল উপচে উঠল দু-পাশের শহরে। জলটা বাড়ছেই কারণ বেরিয়ে যাওয়ার মুখ বন্ধ। সেখানে বাঁধ আছে নদীকে আগলাতে। খবর এল পাহাড়ে জব্বর জল ঝরছে। সব ঝোরা এসে লাফিয়ে পড়ছে নদীতে। পুলিশ হেঁকে বলে গেল, চরের লোক পালাও নইলে এবার ডুববে। পড়ি কি মরি করে পালানো শুরু হল। যা কিছু শখের তাই নিয়ে লোকজন উঠল বাঁধে। প্রসববেদনা সামলে মেয়েটা বলল, 'পালাবে না?'

লোকটা মাথা নাড়ল 'না।'

মেয়েটা আঁতকে উঠল, 'জল আসছে, ভাসবে সব।'

'আসুক আগে। অত মানুষের দঙ্গল আমার ভালো লাগে না।' বলে মেয়েটির স্ফীত উদরে হাত বুলিয়ে দিল, 'এখানেই বাচ্চাটা হোক। এই নিরিবিলিতে।'

'তুমি কি পাগল? যেটা আসছে তার কথা ভাবো।' মেয়েটা ককিয়ে উঠল।

'ভাবনার কিছু নেই।'

মেয়েটা অসহায় চোখে তাকাল। এখন এই লোকটার ওপর নির্ভরতা এত বেড়েছে যে একা চলে যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। সে দুহাতে লোকটাকে জড়িয়ে কষ্ট সামলাল।

নদীর বুকে ঢল নেমেছিল পাহাড়ের নীচে। সেটা গড়িয়ে আসতে-আসতে দুদিকে ছড়িয়ে

পড়ছিল। চরের বালি এত উঁচু যে সোজা আসতে পারছে না। ফলে জলের ধারা মাঠ ভাসিয়ে পাকা রাস্তাটাকে বেছে নিল খাত হিসেবে। যেহেতু নদীর বিপরীত দিকে তাই ওই অংশ বাঁধ গড়া হয়নি। নিচু জমি পেয়ে ছুটে যাচ্ছিল জল। বৃষ্টি থামছিল না। ময়লা ন্যাতার মতো চপচপে আকাশটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ছিল। নদীর জল সেই মদত পেয়ে ঢুকে গেল খালে। টইটুম্বর খালটা বহুদিন পরে নদীর স্পর্শ পেয়ে ছিটকে উঠল আকাশে। আর তখনই ডুবে গেল শহরটা। উলটো দিক থেকে জল ঢুকছে কিন্তু বেরোবার পথ বাঁধের জন্যে বন্ধ। সমস্ত শহরের লোক যে যেভাবে পারে ছুটে এল বাঁধের ওপর প্রাণ বাঁচাতে। জলটা পাক খাচ্ছে শহরে। একতলা বাড়িগুলো গেল তলিয়ে। মানুষ আর জন্তুর মৃতদেহ ভাসতে লাগল সেই ঢেউয়ে। অতবড় শহরটা অতিকায় হ্রদ-এর চেহারা নিয়ে নিল এবার। বাঁধগুলো তার দেওয়াল।

বাঁধে আর মানুষ ধরে না। হঠাৎ ওদের নজর পড়ল চরটার দিকে। বিশাল নদীর চর শুকনো পড়ে রয়েছে। নিজের জমা করা বালি ঠেলে নদীর জল এদিকে আসতে পারেনি। কিছু লোক নেমে এল চরে। এসে হাত-পা ছড়িয়ে বলল, 'কী আরাম!'

তাদের আরাম দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হল। মুহূর্তেই বাঁধের সংকীর্ণ জায়গা ছেড়ে শহরের সব মানুষ পিল পিল করে নেমে এল চরে। বাতিল চালার মালিকরা অসহায় চোখে দেখছিল তাদের চালাগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারাও মিশে গেল শহরের লোকদের মধ্যে। এই মুহূর্তে পোশাক আচরণে ওদের আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

লোকটা এক হাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে দেখছিল এই জনস্রোত। এখন তার চারপাশে শুধু মানুষের মুখ। সে চাপা গলায় বলল, 'শালা!'

মেয়েটা বলল, 'ওরা যে শহর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এল।'

লোকটা দ্রুত হাতে বালি খুঁড়ে টাকা বের করে বলল, 'চল।'

'কোথায়?' মেয়েটা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। মেয়েটাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বাঁধের ওপরে। তখন শহরের কোনও মানুষ বাঁধে নেই। এমনকি চরের লোকেরাও এখন সেখানে। লোকটা দেখল শহরটা এখন বিশাল হ্রদ, জল ফুঁসছে। আর চরটা যেন আচমকা শহর হয়ে গিয়েছে। রাত ঘনালে চরে আলো জ্বলে উঠল। লক্ষ-লক্ষ হায়নার চোখের মতো জ্বলতে লাগল চরটা। আর শহরটা গভীর জঙ্গলের মতো অন্ধকারে মাখামাখি। মেয়েটার যন্ত্রণা বাড়ছিল। শেষে চিৎকার করে উঠল, 'ও মাগো!'

লোকটা তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। এবার কষ্ট মুছিয়ে দেওয়ার গলায় বলল, 'বিয়ো, খুশি মনে বিয়ো।' মেয়েটার কানে সে কথা ঢুকল না। কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল সে। ওলট-পালট হওয়া শহর আর নদীর শব্দ শুনতে-শুনতে গালে হাত দিয়ে লোকটা বিহ্বল গলায় বলল, 'এখানে কেউ নেই, এই বেলা সেরে নে।'



যুদ্ধক্ষেত্রে একজন

ছয় ক্রোশ কাদা ভেঙে জোড়খালি গাঁয়ে বাইরের লোক বড় একটা আসে না। শীতকাল হলে তবু গরুর গাড়ি চলে, জলের সময় তো কথাই ওঠে না। তবু পার্টির বাবুরা এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে সবাইকে ডেকেডুকে। সমস্ত পৃথিবীটা এখন বদলে যাচ্ছে, জোড়খালির মানুষজনের পিছিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। লাঙল যার জমি তার। কে একজন কয়েক পুরুষ আগে গাঁয়ের সব জমি কিনে নিয়েছিল আর সেই সুবাদে পায়ে পা দিয়ে তিন ভাগের দুভাগ ফসল তুলে নেবে এ আর হতে পারে না। যারা রক্ত দিয়ে জমির মুখে হাসি ফুটিয়েছে তাদেরই হক সবচেয়ে বেশি। হিসেবটা উলটে যাওয়া উচিত। দুনিয়ার না খেতে পাওয়া মানুষরা এখন এক।

তিন দলে ভাগ হয়ে গেল জোড়খালির মানুষ। একদল, যাদের বয়স একটু বেশি, তারা কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারল না। হরিশ রায় চার পুরুষ ধরে এই গ্রামের জোতদার কিন্তু কখনই ওদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। ঠিক বাইরের লোক বা শত্রুপক্ষ হিসেবে হরিশ রায়কে চিন্তা করা যাচ্ছে না। খামোকা একটা হুজ্জৎ বাধিয়ে কি লাভ? দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে তাতে জোড়খালি গাঁয়ের কি এসে গেল? গরীব মানুষ চাষ করে দুবেলা পেটপুরে খেতে পাচ্ছে এই তো বেশ। পুজো-পার্বণ যে কটা গাঁয়ে হল তার সব খরচ হরিশ রায়ের। কারও অসুখ-বিসুখ করলে হরিশ রায় ছয় ক্রোশ রাস্তা পালকি চড়িয়ে ময়নাগুড়ি নিয়ে যায়। যে প্রাইমারি স্কুলটা আট বছর চলছে সেটাও হরিশ রায় করেছে।

দ্বিতীয় দল মুখ খুলল না। দুভাগে ফসল পেলে কার না লাভ হয় কিন্তু তাই বলে সরাসরি এই গাঁয়ের মাথার সঙ্গে লড়াই করা? সেটা ঠিক ভালো লাগছিল না ওদের।

তৃতীয় দল একটুতেই উত্তেজিত। ওদের বয়স কম, ময়নাগুড়ির পার্টি অফিসের রমরমা ব্যাপার ওরা দেখে এসেছে। মেহনতি মানুষের লড়াই বাঁচার লড়াই— কথাগুলো ঠিক স্পষ্ট নয় কিন্তু এটা তো ঠিক, ওদের চাষ-করা জমির ধান শুধু বীজধান, সার আর জমির সুবাদে হরিশ রায়ের ঘরে চলে যাচ্ছে। যদিও এখন কংগ্রেস সরকার কিন্তু তাই বলে পার্টির বাবুদের কথা মিথ্যে তো নয়। লাল ঝান্ডার দল আর দিদিমনির দল এর আগে এসেছে জোড়খালিতে ভোটের সময় শুকনো রাস্তা ডিঙিয়ে। এবার জলের মধ্যে পার্টির বাবুরা তো কেবল স্বার্থে আসেনি। তৃতীয় দলের শিবু রায়ের মনে একটা কথা খুব ধরেছে, দুনিয়ার না খেতে পাওয়া মানুষ এক হোক। এটা ঠিক, সারা বছরের খাবার ওই এক ভাগের চলে যায়। টানাটুনির সংসার তাদের। তিনকুলে শিবুর কেউ নেই আর। বউটাকে ঘাড়ে গছিয়ে দেওয়ার পর গেল শীতে তার মামা পটল তুলেছে। সব ঠিক, শুধু একটা ব্যাপারে শিবু বউ-এর কাছে মাথা নীচু করে থাকে। মামার সঙ্গে ময়নাগুড়ি গিয়ে সিল্কের শাড়ি দেখে এসেছিল বউ। প্রায়ই বায়না ধরে। এই গাঁয়ের কোনও মেয়েছেলে সিল্ক হাত দিয়ে দ্যাখেনি, এমন কি অত যে বড়লোক হরিশ রায় তার বাড়ির মেয়েদেরও কেউ পরতে দেখেনি। গেলবার জলপাইগুড়িতে পুজোর সময় হরিশ রায়ের সঙ্গে গিয়েছিল শিবু। তখন একটা দোকানে ঢুকে দাম জিজ্ঞাসা করে চোখ কপালে উঠে যাওয়ার দাখিল। সারা বছরে ওই টাকা তার হাতে উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে না। হরিশ রায় শুনে বলেছি, 'বাবা শিবু, তেলাপোকাও পতঙ্গ আবার সেও আকাশে ওঠে।

কিন্তু বাজপাখির সঙ্গে তুলনা করা কি উচিত কাজ?' তা সেই হরিশ রায় যে বেগুনটুলির পাশের গলিতে গিয়ে দুঘণ্টা কাটিয়ে এল তাকে একটা মুদির দোকানে বসিয়ে, পা যে তার টানছিল, সেটা কি উচিত কাজ?

কচি পালংশাকের আঁটি নিয়ে হরিশ আসছে, পথেই দেখা হয়ে গেল। হেসে বলল, 'ও বাবা, সব দলবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিস কোথায়? এই শিবু বনমালীর মাকে এই শাকগুলো দিয়ে দিস তো, বড় মুখ করে খেতে চেয়েছিল, কবে ফট করে চলে যাবে।' নধর পালংগুলো হাতে নিয়ে শিবু দলের হয়ে বক্তব্য পেশ করল। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় নেড়েছিল হরিশ রায়, 'ঠিক আছে, তাই হবে। একথা তো সোজা আমাকেই বললে পারতিস। বাইরের বাবুরা এসে না শেখালে মাথায় ঢুকছিল না? এত বড় বোকা পাঁঠা তোরা!'

কথা শুনে হকচকিয়ে গেল সবাই। একটুও প্রতিবাদ নেই, চোখরাঙানি নেই। এক কথায় দানসাগর। হরিশ রায় বলল, 'আমার বাপ-পিতামহ তোদের বাপ-পিতামহের সঙ্গে কোনওদিন ঝগড়া করেনি, আমি করি কোন সাহসে? তবে আধাআধি হলে বীজধান, সার দুগগাপুজোর খরচ, এসব বাপু দিতে পারব না।'

এই নিয়ে তর্ক উঠল। হরিশ রায় কোনও কথা না শুনে যাচ্ছে দেখে শিবুর মুখফসকে বেরিয়ে গেল, 'দুনিয়ার খেতে না পাওয়া মানুষ এক হোক।'

কথাটা শুনে চমকে ফিরে দাঁড়াল হরিশ রায়। দলের সবাই বেশ অবাক হয়েছে শিবুর মুখে কথাটা শুনে। কেন যে ওই কথাগুলো জিভ থেকে ছিটকে এল এখন বুঝতে পারছে না শিবু। সে জুড়ে দিল, 'মানে যারা খেতে পায় না তারা এক দলের।'

'তুই খেতে পাস না?'

'পাই। তবে—।' শিবু বলি-বলি করেও সিল্কের শাড়ি কিংবা নিত্য অভাবের কথা তুলতে পারল না। সর্বাঙ্গে শিবু রায়কে দেখে নিয়ে হন-হন করে ফিরে গেল হরিশ রায়। যাওয়ার আগে বলে গেল, আজ বারের পুজো, সবাই যেন সিন্নি নিয়ে আসে। এক কথায় মেনে নিল লোকটা—দলের সবাই এখন হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে। বীজধান বা সার—তার দাম কত! সেটা হরিশের কাছ থেকে আদায় করা যাবে? স্বীকার করতে বাধ্য সব মানুষই খারাপ নয়। পার্টির বাবুরা যাদের শত্রু ভাবে, হরিশ রায় সে জাতের নয়।

ভোররাত্রে জোড়খালি গাঁয়ে পুলিশ এল। একজন কনস্টেবল একাই একশ। এর আগে দেশে কত কি ঘটে গেছে, জোড়খালিতে পুলিশ আসেনি। কাল সন্ধে থেকে বৃষ্টি, সেই ফাঁকে হরিশ রায়ের বাড়ির সামনে যে ছটা শালগাছ পুরুষানুক্রমে বেড়ে চলেছিল তার একটা কে কেটে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রহরে পালকি পাঠিয়ে থানায় খবর গিয়েছিল, ভোরে সেই পালকি চেপে কনস্টেবল গাঁয়ে ঢুকল। হরিশ রায়ের শোকটা খুব বড় ধরনের। গাছের দাম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা থেকে মূল্যবান হল ওটা তার প্রপিতামহ লাগিয়েছিলেন।

বৃষ্টি একটু ধরলেই পুলিশ সাহেবকে সামনে নিয়ে গাছ খুঁজতে বের হল হরিশ। যেহেতু চারপাশে জলকাদা তাই চোর প্রমাণ লোপ করতে পারেনি। একটা মোটা দাগ খানিকটা দূর ঘুরে শিবু রায়ের বাড়ির সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ভেঙে পড়া গলায় হরিশ উচ্চারণ করল, 'শিবু, এই শিবু!'

পুলিশ গিয়ে শিবুর ঘুম ভাঙাল। খড়ের চালের ঘর জলে ছপছপ করছে। দরজা খুলে শিবু ব্রহ্মাণ্ড দেখল। কোনওরকমে বলতে পারল, 'আই বাপ, গাছ কে কাটল? এ যে দেখি পুলিশ!'

পুলিশ বলল, 'আই, তুম গাছ কাটা হ্যায়?'

হতভম্ব শিবু কোনওরকমে বলতে পারল, 'আমি? আমি তো বউ-এর সঙ্গে ঘুমুচ্ছিলাম।'

'তব কোন কাটা হ্যায়?'

'আমি জানি না। মাইরি বলছি, আমি কাল বেহুলার মতো ঘুমুচ্ছিলাম!'

'তব ও গাছ ইঁহা কাহে?'

'ও হরিশ দাদা, একি বলে গো?'

পুলিশ শুনল না, কোমরে দড়ি বেঁধে শিবুকে থানায় নিয়ে চলল। পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে শিবুর বউ মড়াকান্না কাঁদতে লাগল। গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছে। অনন্ত এগিয়ে এসে বলল, 'বোকার মতো কেউ পরের গাছ কেটে নিজের ঘরে রাখে? তাছাড়া অতবড় গাছ একা কেউ টেনে আনতে পারে? হরিশদা, শিবুকে ছাড়ান। ওর কোনও দোষ নেই।'

কথাটা যেন মাথায় ধরল হরিশের। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সে ছুটল পুলিশের কাছে। পুলিশ তখন পালকিতে চেপেছে। তার হাতে দড়ির শেযপ্রান্তে শিবু হাপুস কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে দাঁড়িয়ে। হরিশ কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে পুলিশকে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে বাপ। শিবু তো একা অত বড় গাছ টানতে পারবে না। ওকে ছেড়ে দিন।'

পালকি থেকে গলা বাড়িয়ে পুলিশ বলল, 'থানামে যাকে বলো। হামরা কেস চাহিয়ে।' কোনও কথা না শুনে পালকি ফিরে গেল শিবু রায়কে নিয়ে।

অনন্ত বলল, 'ঠিক আছে, আমরা সাক্ষী দেব। শিবু কিছু করেনি। হরিশদা, এটা ভালো হল না।'

হরিশ বলল, 'আরে আমার কি দোয! গাছটা আমার, আর সেটা কাটা হয়েছে এ কথা তো ঠিক? আচ্ছা তোমরা আমার সঙ্গে থানায় চলো, আমিই ছাড়িয়ে আনছি।'

থানার নাম শুনে দেখা গেল সবাই এক একটা জরুরি কাজের কথা বলছে। অগত্যা সেই জলকাদা ভেঙে হরিশ রায় নিজেই যাওয়া সাব্যস্ত করল।

বড়বাবু বললেন, 'ব্যাপারটা খুব কাঁচা কাজ হয়ে গেল হরিশবাবু। অতবড় গাছ একজনের পক্ষে কাটা সম্ভব নয়। সাক্ষী পাবেন? তাছাড়া আমার বাড়ির সামনে পাওয়া গেছে বলেই আমি কেটেছি তার কোনও প্রমাণ নেই। না, এ কেস টিকবে না।'

হরিশ বলল, 'কোনও রকমে একটা ব্যবস্থা করুন বড়বাবু। ছেলেটা খারাপ নয়, শুধু ওর যে দাঁতে একটু বিষ জমেছে সেটাই খসিয়ে দিতে চাই। এই বয়সে আর নতুন দাঁত গজাবে না।'

বড়বাবু বললেন, 'তা তো হল, কিন্তু ওই কেস আদালতে গেলে আমারই বদনাম হয়ে যাবে। আমি বরং তিন দিন ওকে হাজতে রেখে দিই। একটু মারধোর করে ছেড়ে দেব। আগে থেকে আলোচনা করলে ভালো একটা গ্রাউন্ড দিতে পারতাম আপনাকে। আমারটা খেয়াল আছে তো?'

গাঁয়ে ফিরে খবরটা জানিয়ে দিল হরিশ রায়। তিনদিন এমন বেশি কিছু না। বাহাত্তর ঘণ্টা মাত্র। তিন কেজি চাল ডাল ডিম পাঠিয়ে দিল সে শিবুর বউকে। কথাটা শুনে সবাই একটু নিশ্চিন্ত, যাক ছোঁড়াটার জেল হল না। কিন্তু দুদিনের মাথায় খবর এল হরিশকে বড়বাবু ডাকছেন। হন্তদন্ত হয়ে থানায় এলে বড়বাবু সংবাদটা জানালেন, 'সারা দেশের মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। নেতারা জনতাকে উত্তেজিত করছে সরকারের বিরুদ্ধে যেতে। কেউ কোনও কথা শুনছে না। তাই দিল্লির সরকার সারা দেশে জরুরি অবস্থা চালু করেছেন। কেউ এখন কোনও ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না। সবার সব অধিকার বাতিল এখন।' বড়বাবুর কাছে নির্দেশ এসেছে, এই তল্লাটে যেসব লোক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক তাদের একটা তালিকা পাঠাতে। কোনও হ্যাপা নেই, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। সারা জীবন জেলে পচবে অথচ আদালতে যেতে পারবে না। আইনটার নাম হল মিসা। এ মশাই ক্যান্সারের চেয়ে মারাত্মক।

মিইয়ে গেল হরিশ রায়। দেশে এতসব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ জোড়খালিতে কেউ জানেই না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভালোমতন শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু—

বড়বাবু বললেন, 'জোড়খালির সবাইকে চিরকাল একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার। এই লোকটির

নাম আমি সদরে পাঠাচ্ছি।'

আঁতকে উঠল হরিশ রায়, 'না না, শিবু ছেলেটা খারাপ নয়। সারা জীবন জেলে থাকলে—।'

থামিয়ে দিলেন বড়বাবু 'অত দুর্বল হচ্ছেন কেন? অধিকার পেতে হলে পাকাপাকি পাওয়াই ভালো। তাছাড়া আমার এখানে বেশি লোকও পাচ্ছি না।'

শিবু রায়ের মিসা হবার খবর জোড়খালি গাঁয়ে পৌঁছাল। মিসা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যা একবার ছুঁলে আর ছাড়ে না। সারা জীবন জেলে পচতে হয়, মৃত্যুর পর কবর দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শিবুকে ওই আইনে ধরা হল কেন? সে তো কোনও অন্যায় করেনি। কে একজন খবর আনল, গেল পুজোয় শিবু রায় জলপাইগুড়িতে গিয়ে এমন কিছু করেছিল, এতদিনে সেটা ধরা পড়ে গেছে। অনন্তরা খুব উত্তেজিত হয়ে ছয় ক্রোশ রাস্তা ভেঙে পার্টি অফিসে গিয়ে দেখল সেখানে বড় তালা ঝুলছে। শুনল, জরুরি অবস্থার ভয়ে বাবুরা সব গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাহলে মিসাকে বাবুরাও ভয় পান! খবর এল যার মিসা হয়েছে তার সংস্পর্শে থাকলে অন্যেরও মিসা হবার সম্ভাবনা। ভালো আলু খারাপ আলুর পাশে থাকলে পচে যায়। দিশেহারা হয়ে গেল জোড়খালি। হরিশ রায় খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় কদিন ঘোরাফেরা করল। তার এক কথা, যদি থানায় খবর সে না দিত তাহলে বড়বাবু শিবু রায়ের হদিস পেত না। জলপাইগুড়ি শহরে গিয়ে দুঘণ্টা শিবু তার চোখের বাইরে ছিল। তখন সে কী করেছে হরিশ জানে না। কেউ-কেউ সন্দেহ করল কিন্তু মুখ খুলতে পারল না। থানার বড়বাবু তার মধ্যে একদিন পালকি চেপে হরিশ রায়ের বাড়ি ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে শিবু রায়ের বাড়ির চারপাশে কেউ মাড়ায় না। জোড়খালির মানুষ শান্তিপ্রিয়, শিবুর বউ-এর সঙ্গে মেলামেশা রাখলে যদি কিছু অশান্তি হয়। শিবুকে জলপাইগুড়ি সদরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একদিন খবর এল, সেখানেও শিবু নেই। সেই গঙ্গার ওপারে বহরমপুর না কোথায় শিবু আছে এখন। সেখানকার জেল খুব মারাত্মক। আলো-হাওয়া ঢুকতে পারে না। এক নম্বর আসামিরা সেখানে থাকে।

হরিশ রায় মিটিং ডাকল। এক গাঁয়ে থেকে এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। শিবু নেই, ধান উঠেছে, অথচ তার ভাগটা করা যাচ্ছে না। এদিকে শিবুর বউ-এর খাবার জুটছে না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। বেচারা না খেতে পেয়ে মরে যাবে সেটা এ গাঁয়ের লজ্জার কথা। একটা কিছু বিহিত করা দরকার। কেউ একজন এগিয়ে এসে ভার নিক শিবুর বউ-এর। না, এ-কথায় জোড়খালির কেউ রাজি হল না। নিজে পায় না আবার অন্যকে দান করা! তাছাড়া অমন জোয়ান সমত্থ বউকে ঘরে নিতে কারও সাহস নেই। গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষই বিবাহিত এবং তারা বউদের যথেষ্ট ভয় করে।

হরিশ বলল, 'তাহলে মেয়েটা না খেয়ে মরবে? ওর তো শুনেছি তিনকুলে কেউ নেই। আর শিবে হতচ্ছাড়াটা তো কোনওদিন জেল থেকে ফিরবে বলে মনে হয় না। এক কাজ করা যাক, শিবুর বদলে যে জমি চাষ করবে সে মেয়েটাকে সংবচ্ছরের খাবার দেবে।'

একটু গুঞ্জন উঠল। অনন্ত হরিশের প্রস্তাব সমর্থন করা মাত্রই বনমালী আপত্তি জানাল, 'এটা ঠিক হবে না। ওই বয়সের মেয়েছেলের কোন কাজকর্ম না থাকলে, মাথার ওপর পুরুষ না থাকলে দুদিনে সারা গাঁয়ে পেত্নিনৃত্য শুরু করে দেবে। কথায় বলে বল্গা ছাড়া ঘোড়া আর পুরুষ ছাড়া মেয়েমানুষ একই জিনিস।'

কথাটা অনেকের মনঃপূত হল। হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'শিবু যদি আর নাই ফেরে তবে ওর বউ-এর আবার বিয়ে করতে কোনও দোষ নেই। সেরকম করলেই মঙ্গল।'

হরিশ রায় বলল, 'কিন্তু যদি ফিরে আসে, তাহলে পরিস্থিতিটা চিন্তা কর।'

বনমালী একটা উপায় বাতলাল, 'সবচেয়ে ভালো হয় যদি শিবুর বউ তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকে। তুমি বয়স্ক মানুষ—খারাপ দেখাবে না। তাছাড়া বউদি তো সাত বছর দেহ রেখেছেন, ছেলের

বউদের সেবা আর কত নেবে? তাদের রান্নার কাজেও সাহায্য হবে।' সবাই সমস্বরে এই প্রস্তাব সমর্থন করল। হরিশ রায় ইচ্ছে করলে দশটা মানুষ খাওয়াতে পারে, মিসায় ভয় পাওয়ার লোক নয় কারণ বড়বাবুর জানাশোনা। সবচেয়ে বড় কথা ঘরে বউ নেই যে চোখ রাঙাবে।

নিরুপায় হরিশ প্রস্তাব মেনে নিল, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছ—।'

২

পৃথিবীটা এতদিন এত ছোট ছিল যে শিবু মনে করত সে যা জানে সেটাই শেষ কথা। যেমন, যত কষ্টই হোক জোড়খালি গ্রামে বেশ শান্তিতে থাকা যায়। ময়নাগুড়িটা মোটামুটি দেখার মতো জায়গা, কারণ সেখানে একটা সিনেমা হল আছে, স্কুল কলেজ আছে আর বড় বাজার বসে, কিন্তু জলপাইগুড়ি হল সত্যিকারের শহর। সেখানে তিন-তিনটে সিনেমা হল, মেয়েরা প্রজাপতির মতো সেন্ট মেখে ঘুরে বেড়ায়, গাড়িঘোড়া হরদম ছুটছে, এমন কি বেগুনটুলির পাশের গলিতে পয়সা দিয়ে মেয়েমানুষ কেনা যায়। এসব ঠিকঠাক জানা ছিল। কিন্তু এখন বুঝল তার জানাটার পর অনেক অজানা জিনিস পড়ে আছে। এটা আবিষ্কারের পরই মন দুর্বল হল। ডাঙায় তোলা মাছের মতো লাগছে নিজেকে। প্রথম কথা, সে জীবনে কোনও অন্যায় করেনি তবু থানায় যেতে হয়েছিল। বিনা কারণে যথেষ্ট ধোলাই খাওয়ার পর যখন আশা হচ্ছিল ছেড়ে দেবে তখনই শুনল তার মিসা হয়ে গেছে। একজন পুলিশ বলল যে, রাষ্ট্রদ্রোহী হলে, ভেজালদার হলে মিসা হয়। যার মিসা হয় তার জীবনটাই বরবাদ। প্রথমটার মানে বোঝা গেল না। কারণ রাষ্ট্র জিনিসটাই শিবুর মাথায় ঢুকছিল না। সে আজ অবধি চাষবাস করেছে, বিয়ের পর বউকে ভোগ করেছে এবং একবারই হরিশ রায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ঘুরে এসেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়া কি যায়? তাছাড়া সে ভেজাল দেবেই বা কী করে? তার তো কোনও দোকান নেই? তাহলে? প্রথম-প্রথম পাগলের মতো চেঁচিয়েছে শিবু, হাপুসনয়নে কেঁদেছে, কিন্তু একসময় বুঝেছে এতে কোনও লাভ নেই। বরং চুপচাপ সব দেখা যাক। একজন পুলিশ বলেছিল, মিসার বন্দিরা জেলখানায় জামাই-এর মতো থাকে। কাজকর্ম তেমন করতে হয় না চোর-ছ্যাঁচোড়দের মতো। ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলে যখন তাকে আনা হল তখন চারধারে কেমন গা-ছমছমে ভাব। দু-দুটো পুলিশ বন্দুক হাতে তার সঙ্গে। রাস্তার লোক অবাক চোখে তাকে দেখেছে। একজন লোক বলেছিল, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই খুনি।' পুলিশটা শুধরে দিয়েছিল, 'নাহে, মিসা হয়েছে।' সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার মুখের চেহারা, চোখের চাহনি পালটে গিয়েছিল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুব ধন্দে পড়ে গেছে শিবু। চাহনিটার মধ্যে ঘেন্না নেই কেন?

জলপাইগুড়ি জেলের খাবার খেয়ে কান্না পেয়ে যেত শিবুর। অন্যান্য বন্দির আত্মীয়রা কত কি খাবার নিয়ে আসে কিন্তু তাকে দেখতে কেউ আসে না। গাঁয়ের একটা লোকও আসতে পারল না? অন্তত-অনন্ত তো সাহসী ছিল। একদম শেষ দিনে হরিশ রায় এল। এত অবাক হয়ে গিয়েছিল শিবু যে মুখ থেকে বাক্য বের হয়নি। গরাদের ফাঁক দিয়ে হরিশ রায় খুব কষ্টের গলায় বলেছিল, 'এ কি হল শিবু!'

কথা বলতে পারেনি সে। ময়নাগুড়ি থানায় যাওয়ার পর মনে হয়েছিল হরিশ রায় ছল করে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। নিজের গাছ নিজে কেটে তার বাড়ির সামনে ফেলে রেখে ধরিয়ে দিয়েছে। কেন ধরিয়ে দিল? পার্টির বাবু চলে যাওয়ার পর সে হরিশ রায়ের মুখের ওপর কথাগুলো বলেছিল বলে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কিন্তু এছাড়া অন্য কোনও কারণ মনেও পড়ছে না। ভেতরে-ভেতরে তাই হরিশ রায়ের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ জমেছিল তার। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলে সেই লোকটাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল শিবু। কেউ যখন এল না তখন হরিশ রায় এল কেন? তাকে ধরিয়ে যদি

মজা করতে চায় তো খামেকা আসতে কে ওকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?

'শিবু, আমার ওপর তোর খুব রাগ, না? কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি এসব চাইনি।' হরিশ রায় বলল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' শিবু কোনওরকমে বলতে পারল।

'আমি উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিন্তু কেউ আশা দিল না। তোর কোনও ইচ্ছেটিচ্ছে থাকলে বল আমাকে, যত টাকা লাগুক আমি করতে চেষ্টা করব।' হরিশ রায় বলল।

'কী বলি বল, সব আমার কপাল। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কোনও অন্যায় করিনি।' শিবু কেঁদে ফেলল।

'আমি জানি, আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে।' হরিশ রায়ের কথা জড়িয়ে গেল।

খানিক বাদে হরিশ রায়ের দিকে চেয়ে শিবু বলল, 'তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

'কাকে? ওঃ, তোর বউকে? কিন্তু শুনলাম তোকে কালই বহরমপুর জেলে নিয়ে যাবে! সেখানে কী করে নিয়ে যাব?' হরিশ রায়ের কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেল শিবু। বহরমপুর? সেটা আবার কোথায়? কেউ তো তাকে খবরটা দেয়নি? হরিশ রায় ভাগ্যিস তাকে জানাল।

সে মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে থাক, কিন্তু আমি থাকব না, তাকে যদি একটু দেখাশোনা করা যায়!'

হরিশ রায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে চিন্তা তুই করিস না, আমি আছি রে, আমি আছি।'

তা তার পরদিনই ট্রেনে চেপে চলে এল বহরমপুর। প্রথম ট্রেনে চাপা, উত্তেজনাটা মনে আনন্দ জাগালো না। শুধু বোবা চোখে চারধার চেয়ে-চেয়ে দ্যাখা। হঠাৎ শিবুর মনে হল চারধারে নানান শ্রেণির মানুষ, সবাই ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। এদের মধ্যে কারা-কারা না খেতে পাওয়া মানুষ? কারা এক হয়ে কাজ করবে? কী কাজ? কিন্তু কাউকেই যেন না-খেতে পাওয়া মানুষ বলে মনে হয় না! বাবুরা কি ভিখিরিদের কথা বলেছে?

বহরমপুরে এসে শিবু হকচকিয়ে গেল। এখানকার জেলে যেমন চোর-গুন্ডা-পকেটমার দিনরাত খিস্তি করে যাচ্ছে তেমনি অনেক ভদ্রলোক বাস করেন। তাঁদের কেউ-কেউ কলকাতা থেকে এসেছেন। রাজনীতির জন্যে এঁদের নাকি মিসা হয়েছে—সবাই রাষ্ট্রদোহী। শিবু রায়কে সেই দলে ফেলা হয়েছে তাই বাবুদের ছায়ায় আসতে হল তাকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে শিবুর। তাহলে ভদ্রলোকদের মিসা হয়? মিসা হলেও অমন হেসে-হেসে কথা বলা যায়? কী কথা বলে ওরা? শিবু একটা বড় দলের কাছাকাছি গিয়ে বসা শুরু করল।

কলকাতার বাবু বললেন, 'ইমার্জেন্সি চালু করে একটা দেশকে চুপ করিয়ে কতদিন রাখা যায়? একটা সময় আসবেই যখন মানুষ মুখ খুলবে, তখন?'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ওদের আর্মস আছে। মিলিটারি আছে।'

কলকাতার বাবু বললেন, 'থাকুক। কিন্তু পেছনে মানুষ নেই। ওদের এই অত্যাচার দেখে রেভ্যুলিউশন আনতে হেল্প করবে। তুমি দেখে নিও সুপ্রিয়, নকশালরা যা পারেনি এই ইমার্জেন্সি তাই পারবে।'

'কিন্তু এদেশে মার্কস কতটা সত্যি? মার্কসের ব্যাখা ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ সম্ভব?' —তৃতীয়জন বলল।

কলকাতার বাবু বললেন, 'এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিছু অসুবিধে আছে। যখন জনতা তৈরি হয়নি তখন যদি আমরা আঘাত হানতে চাই তবে সেটা হবে অ্যাডভেঞ্চার করা আর যখন জনতা তৈরি তখন যদি চুপ করে বসে থাকি তবে সেটা প্রকৃত সুবিধেবাদী।'

সুপ্রিয় বলল, 'কথাটা মাওসে-তুং-এর, না?'

কলকাতার বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এই রকম ইমার্জেন্সি যত আসবে মানুষ তত তৈরি হবে।'

তৃতীয়জন বলল, 'চিনে যেভাবে মাওসে-তুং মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন অথবা রাশিয়াতে লেনিন যেভাবে হাল ধরেছিলেন এখানে সে রকম নেতৃত্ব কোথায়?'

কলকাতার বাবু বললেন, 'নেতৃত্ব কখনও আকাশ থেকে পড়ে না, প্রয়োজনই নেতা সৃষ্টি করে। যেমন চে গুয়েভারা। যিনি বলতে পারেন, যুদ্ধে জিতি কি হারি সে প্রশ্ন নয় কিন্তু আমরা যে লড়াই করেছি এটাই সত্য। চারুবাবুর একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে, যে নিজে স্বপ্ন দেখে না বা অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না, সে কখনই বিপ্লবী হতে পারে না।'

মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল শিবুর। এরা কী ভাষায় কথা বলে? মাও সে-তুং, লেনিন, মার্কস কোন দেশের মানুষ? সেই সেবার যখন ছেলেদের সঙ্গে পুলিশের খুব লড়াই হয়েছিল ময়নাগুড়িতে তখন প্রথম লোকটার নাম দু-একবার শুনেছিল বটে। কিন্তু বাবুরা দেশের মানুষের কথা বলছে। দেশের মানুষের কথা যারা চিন্তা করে তারা কি মিসায় জেলে আসে?

পরদিনই ধরা পড়ে গেল শিবু। একজন বাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তুমি এখানে বসে কী শুনছ?'

'কিছু না বাবু।' অস্বীকার করার চেষ্টা করল শিবু।

'তুমি কি চোর না পকেটমার?'

'না বাবু, তার চেয়ে খারাপ।'

'খারাপ! খুন করেছ নাকি?'

'না, মিসা হয়েছে।'

'মিসা? কেন হল?'

'জানি না বাবু। আমি দোষ করিনি। একজন বলল, রাষ্ট্রদ্রোহী!'

'অ্যাঁ?' হো-হো করে হেসে উঠল বাবু, 'সেটা খুনের চেয়ে খারাপ? কী বুদ্ধি তোমার! ও সুপ্রিয়, এই আর একজন মিসা বন্দিকে দ্যাখ।' তাকে ধরে বাবুদের কাছে নিয়ে আসা হল।

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ধরেছে তোমাকে।'

'জানি না বাবু। আমি কোনওদিন কোনও পাপ করিনি বিশ্বাস করুন।' শিবু হাতজোড় করল।

'দূর ছাই, পাপের কথা কে বলেছে? রাজনীতি, মানে কোনও পার্টি করতে?'

'আমি পাটি-মাটি করি না বাবু, আমাদের জোড়খালির কেউ করে না।'

কলকাতার বাবু এবার কথা বললেন, 'দ্যাখো কাণ্ড! ওহে, তুমি পার্টি করতে না, খাদ্যে ভেজাল দিতে না, তবু তোমার মিসা হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'রাষ্ট্রদ্রোহী না কি একটা কথা বলছিলে? রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?'

ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে শিবু ঘাড় নাড়ল, না, সে বোঝে না কিছু।

কলকাতার বাবু বললেন, 'মজা দেখুন। একটা নিরপরাধ লোককে মিসায় পুরে দিয়েছে। তোমার গাঁয়ের নাম কী বললে ভাই?'

'জোড়খালি, ডাকঘর ময়নাগুড়ি।'

আর একজন বাবু এতক্ষণ কথা শুনছিলেন, জায়গার নামটা কানে যেতেই বলে উঠলেন, 'ময়নাগুড়ি? আরে তুমি আমার জেলার লোক। কী করে দিন চলত?'

'চাষ করতাম বাবু।'

সুপ্রিয় বলল, 'দাদা, একদম সন অব সয়েল। এর কাছ থেকে একদম খাঁটি খবর পাওয়া যাবে। দেশের কৃষকদের রিঅ্যাকশন কী জেনে নিন।'

কলকাতার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজের জমি চাষ করো?'

ঘাড় নাড়ল শিবু, 'না, হরিশদার জমি।'

জলপাইগুড়ির বাবু বললেন, 'খুব খারাপ অবস্থা আমাদের জেলার চাষিদের। জোতদারগুলো রক্ত চুষছে বাদুড়ের মতো। এক একটা গ্রাম আছে যেখান রাজনীতি প্রবেশ করতে পারেনি। খুব রক্ষণশীল ওরা। শোষিত হবে কিন্তু মাথা তুলবে না।'

কলকাতার বাবু বললেন, 'ওকে রাজনীতি-সচেতন করা দরকার। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেখানে কৃষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ওকে জানাতে হবে। বিশ্বের সর্বহারা এক পতাকার তলায় সামিল হচ্ছে এ খবর না জানলে ও পা ফেলবে কী করে? সুপ্রিয়, তুমি ওর দায়িত্ব নাও। একদম নরম কাদা পাচ্ছ, ইচ্ছেমতন তৈরি করতে পারবে। গ্রামে ফিরে গিয়ে ও যেন আরও দশটা গ্রামকে তৈরি করতে পারে এটা লক্ষ রেখো। জেলখানায় যদি বেশি দিন থাকে তা হলে চোর-বদমাস হয়ে বেরুবে, সেটা হতে দেওয়া ঠিক নয়।'

শিবু রায় স্বীকার করে, তার জানাটা খুব কম ছিল। পৃথিবীতে এত সব ব্যাপার হচ্ছে, আরে ব্বাস! সেই পার্টির বাবুরা যে বলেছিল পৃথিবীতে দুটো দল আছে, একদল খেতে পায় অন্য দল পায় না, সে কথাটা খুব ঠিক। সুপ্রিয়দা ওকে একটা নতুন জগতে হাত ধরে নিয়ে এসেছেন। যারা এতদিন শোষিত ছিল তারা আজ মাথা তুলছে। শোষিত কে? না যারা রক্ত দিয়ে পরিশ্রম করে। শোষক কে? না যারা সেই পরিশ্রমের ফসল পায়ে পা দিয়ে ঘরে তোলে। তার মানে হরিশ রায় শোষক, আবার বড়-বড় ব্যবসাদার শোষক। এই সরকার যে তাকে মিসা করেছে সেও শোষক। কারণ সে ব্যবসাদারের বন্ধু। গাঁয়ের হরি মুদি বেশি দাম নেয়, অতএব সে একজন শোষক। প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনে ধর্মঘট করতে পারে, এটা তার অধিকার। শহরের মেয়েছেলেরা যেমন সিল্কের শাড়ি পরে, তার বউ-এর তেমান সেই শাড়ি পরার অধিকার আছে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? সেই জন্যে গরিব বড়লোকের অবস্থা সমান করতে মার্কস বলে একজন সাহেব কতগুলো পথ বলে দিয়েছেন। সেই পথে চলতে হবে।

কলকাতার বাবু একদিন তার সামনে সুপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছাত্রটি কেমন হে?'

সুপ্রিয় বলল, 'খুব ভালো প্রগ্রেস করেছে। এতটা ভাবিনি। ওকে বক্তৃতা দেওয়া শেখাচ্ছি। যখন ফিরে যাবে তখন দেখবেন কী কাজের হবে। শুনবেন নাকি ওর বক্তৃতা?'

'বক্তৃতা? না না. ঠিক আছে। তবে দেখো, একবারে ক্লাস থ্রিতে ভরতি করো না। অ আ ক খ শিখিয়ে দিও।' কলকাতার বাবু বললেন।

সুপ্রিয় বলল, 'মুশকিল তো ওইখানে। শুরুটাই যে আমার গুলিয়ে যায়।'

কলকাতার বাবু বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। ডক্টরেট করলে কে-জি ক্লাস ম্যানেজ করা কঠিন।'

৩

জলপাইগুড়ি জেলে আজ সেই রাত। কাল সকালে ছাড়া পাবে ওরা—শিবু রায় এবং সেই জলপাইগুড়ির বাবু যিনি বহরমপুর জেলে ছিলেন। বহরমপুর জেলটা ছিল বড় ভালো। জোড়খালির শিবু রায় অত বড়-বড় বাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছে, কত খবর জেনেছে। কিন্তু হঠাৎ নাকি ইমার্জেন্সিটা উঠে গেল। কলকাতার বাবু আফসোস করে বলেছিলেন, 'খুব বুদ্ধিমতী মহিলা, যদি আরও কিছুদিন ইমার্জেন্সি থাকত তাহলে দেশে যে বিপ্লব আসত তাতে সন্দেহ নেই। সেটাই পিছিয়ে দিলেন উনি। যাক, ইলেকশন কল করছে যখন তখন বুঝবে ঠ্যালা। এবার দেশের মানুষ ওঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সাগরে। ভোটের বাক্সে হবে বিপ্লব। শিবু, তুমি ভাই নর্থবেঙ্গলের দশটা গ্রামের দায়িত্ব নাও। প্রত্যেক চাষীকে বোঝাও, ভোটের বাক্সই হল বিপ্লবের হাতিয়ার।'

জলপাইগুড়ির বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কালই গ্রামে ফিরে যাবে হে?'

শিবু রায় বলল, 'যদি কোনও কাজ থাকে তো যাব না। কাজ আগে তারপর অন্য কিছু।'

জলপাইগুড়ির বাবু বললেন, 'গুড। কাল রাত্রে পার্টি অফিসে এসো। আলাপ পরিচয় হবে।'

সকালবেলা তাজ্জব হয়ে গেল শিবু রায়। জেল থেকে বেরিয়ে এত লোক দেখে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। জলপাইগুড়ির বাবু হাসলেন, 'আমাকে রিসিভ করতে এসেছে হে। তুমিও সঙ্গে চল। মিসার ক্যান্ডিডেট যখন তখন তুমি সম্মান পাবেই।'

শতিনেক লোক বাবুর নামে জিন্দাবাদ দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিল। বাবুর কথায় শিবুর গলায় মালা দিতে ওর মনে হল সে গলে-গলে পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে অন্যরকম লাগছে এখন। একমাত্র বউ ছাড়া আর কেউ মালা দেয়নি গলায়। সে মেজাজি পা ফেলে বাবুর সঙ্গে একটা খোলা জিপে উঠল। তারপর যেটা হল সেটা শিবু কখনও স্বপ্নেও দ্যাখেনি। অতগুলো লোক শোভাযাত্রা করে সারা শহর ঘোরাল তাদের। আইব্বাস, কি লোক কি জিন্দাবাদ আর কি হাতনাড়া! বাবুর দেখাদেখি সেও হাত নাড়ল আর হাসিমুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল। জিপটা চলছে আস্তে-আস্তে। হঠাৎ নজর পড়ল হরিশ রায় রাস্তার পাশ ধরে হাঁটছে। চোখাচোখি হতে হরিশ তাকে নমস্কার করতে শিবু সঙ্গে-সঙ্গে হাতজোড় করল। এবং এই প্রথম তার মনে হল, ভাগ্যিস মিসা হয়েছিল নইলে এতদিন সেই জোড়খালিতে গড়াতে হত। এই যে এত লোক হাত নাড়ছে, মালা পরাচ্ছে, জিপ চড়াচ্ছে—এসব হত? হরিশ রায় জন্মে তাকে নমস্কার করেছে? মন খুব প্রফুল্ল হয়ে গেল শিবু রায়ের। নিজের খুব বড় মনে হচ্ছে।

পার্টি অফিসের সামনে মিছিল শেষ হতেই হরিশ রায় এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সবাই শিবুকে দেখছে। হরিশ গদগদ গলায় বলল, 'ও শিবু, দ্যাখ আনন্দে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। জোড়খালি গাঁয়ের আর কেউ একরকম সম্মান পায়নি। তুই গাঁয়ের মুখ রাখলি।'

শিবু গম্ভীর গলায় বলল, 'ছাড়ুন। এখন আমার অনেক কাজ। তাছাড়া আপনি একজন শোষক।'

হরিশ মিইয়ে গেল, 'মানে? আমি খারাপ মানুষ?'

শিবু বলল, 'খারাপ ভালো বলিনি, কিন্তু আপনি শোষক। গ্রামের লোকের রক্ত খান। ঠিক আছে, এসব কথা পরে হবে। প্রত্যেককেই সুযোগ দিতে হবে পরিবর্তনের।'

হরিশ ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'তা এখন গাঁয়ে যাবি তো। আমি সবাইকে বলেছি।'

মাথা নাড়ল শিবু, 'না না, আমার এখন অনেক কাজ। সারা দেশের মানুষ আজ শোষিতদের সঙ্গে সামিল। এখন গল্প করার দিন নয়। গ্রামে তো যেতেই হবে। দশটা গ্রামের ভার আমার ওপর। শিক্ষিত করতে হবে তাদের ভোটের আগে। আজ হবে না, কাল যাব দশটা নাগাদ।'

হরিশ রায়ের মুখের ওপর দিয়ে শিবু পার্টির অফিসে ঢুকে গেল বাবুর খোঁজে। একজন হরিশকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কে হন উনি?'

হরিশ বলল, ' কে হয় বুঝতে পারলেন না? ভাই, ভাই হে, ভাই ভাই!'

ঠিক দশটা দশ মিনিটে ময়নাগুড়ির তেমাথায় শিবু রায় বাস থেকে নামল। আসার সময় একটা দারুণ কাণ্ড ঘটেছে। জলপাইগুড়ি শহরে বাসে চাপতেই একটা লোক তাকে নমস্কার করল। ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে প্রতিনমস্কার করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে না থাকতেই লোকটা বলল, 'কাল আপনারে দেখছি। ওই যে, মিছিল কইর‍্যা যাইতেছিলেন!'

শিবু গতরাত্রে পার্টি অফিসের কর্মীদের ব্যবহারে মনে করেছিল ওই মিছিল করে আসাটা নিয়ে তেমন গর্ব করার নেই। কারণ ওটা রোজ-রোজ ঘটবে না। বিয়ের কনে বিয়ের দিনেই মাথায় থাকে, দুদিন বাদেই হাঁড়ি ঠেলতে হয়। কিন্তু এই লোকটার ব্যবহারে যেন বাহারি গন্ধ লাগল মনে। কন্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলে সেই লোকটি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে তার কানে ফিস-ফিস করতেই

সে প্রতিমা দেখার মতো শিবুকে দেখতে লাগল। সকালের বাসে ভিড় কম। বাসের অনেকেই তাকে লক্ষ্য করছে। শিবুর মনে পড়ল সুপ্রিয়দা বলেছিল, পাঁচজন অজ্ঞ মানুষ একসঙ্গে থাকলেই তাদের রাজনীতি-সচেতন করবে। তা এই সুযোগে বাসের লোকদের কিছু নিবেদন করলে কেমন হয়! কিন্তু কোত্থেকে শুরু করবে এটা সে বেছে উঠতে পারল না। মুশকিল হল, পেটের ভেতর সদ্যজমা কথাগুলো সব একসঙ্গে বের হয়ে আসতে চায়। সুপ্রিয়দার মতন ঠিকঠাক সাজাতে পারে না শিবু।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ময়নাগুড়ি চলে এল। অবাক কাণ্ড, টিকিট লাগল না। শিবু শুনেছে বাসে নাকি পুলিশের টিকিট লাগে না। তাহলে মিসা যাদের হয় তাদের সম্মানটা দ্যাখো! জোড়খালি গ্রামের কোনও মানুষ স্বপ্নে ভাবতে পারবে না। গম্ভীর মুখে বাস থেকে নামতেই একটা হই-হই শুনতে পেল শিবু। এই এতগুলো মাসে ময়নাগুড়ির চেহারাটা একই রকম আছে। চারপাশে তাকাতেই হরিশ রায়কে দেখতে পেল সে। সঙ্গে অনন্ত, বনমালী, গ্রামের আরও জনদশেক আর সেই পার্টির বাবুরা যারা গাঁয়ে গিয়েছিল।

বিস্তর ভিড়ের মধ্যে হরিশ রায় একছড়া নয়নতারা ফুলের মালা শিবুর গলায় পরিয়ে দিতে পার্টির এক বাবু চিৎকার করে উঠল, 'শিবু রায় জিন্দাবাদ, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা নিপাত যাক।'

যদিও কণ্ঠটা একাকী তবু শিবুর শরীর টলতে লাগল। গতকাল জলপাইগুড়ির নেতার নামেই জয়ধ্বনি হয়েছিল, তাকে কেউ মুখে আনেনি। আজ সেই কাজটা হল। সুপ্রিয়দার কথা মনে পড়তেই শিবু বেঞ্চির ওপর লাফিয়ে উঠল। তার সামনে এখন ছোট জনতা। আশেপাশের দোকানের লোক সাগ্রহে দেখছে। জীবনে প্রথমবার সুপ্রিয়দার অনুপস্থিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্য হাত তুলে সে সবাইকে থামাল, 'বন্ধু, আজ আনন্দের দিন নয়, এখন সংগ্রাম করতে হবে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষ আজ লড়ছে। বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে।'

হঠাৎ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে শিবুর। কথাগুলো সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। একসঙ্গে পেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঠোকাঠুকি লেগে পেটের ভেতরই দলা পাকাচ্ছে। শিবু একটু থেমে বলল, 'আজ এই পর্যন্ত, আমার অনেক কাজ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

হাততালির মধ্যে হরিশ রায় এসে শিবুর হাত ধরল, 'বাবা শিবু এবার চলো।'

শিবু বলল, 'কোথায়?'

হরিশ আঁতকে উঠল। 'কোথায় মানে? তোমার গাঁয়ে! এই দ্যাখো অনন্ত এসেছে, বনমালী এসেছে। গাঁয়ের সবাইকে আমি কালকের কথা বলেছি। আহা কি দৃশ্য!'

বনমালী এগিয়ে এসে বলল, 'শিবে, চিনতে পারছিস? হেঁ-হেঁ, তুই গেলি শোঁপোকা হয়ে আর ফিরে এলি একদম প্রজাপতির মতো ডানা মেলে।'

শিবু বলল, 'কিন্তু এখন আমার অনেক কাজ। রংমালি বটেশ্বর ধোয়ালি—এইসব গ্রাম ঘুরতে হবে আমাকে। পার্টি থেকে দায়িত্ব দিয়েছে।'

অনন্ত বলল, 'তা হোক, জোড়খালি গ্রামও তো তোর। সেখানেই যাওয়া উচিত আগে।'

পালকি এনেছিল হরিশ রায়। এখন যদিও জলকাদা নেই তবু গাঁয়ের সম্মান বলে কথা, কিন্তু শিবু পালকিতে চড়ল না, 'সেকি কথা, আপনারা হেঁটে যাবেন আর আমি যাব মানুষের কাঁধে চেপে? দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এখন এক। তা হয় না।'

শিবু আর হরিশের পেছন-পেছন গাঁয়ের মানুষ ফিরে চলল। অন্যমনস্ক হয়ে শিবু হাঁটছিল। অতগুলো মানুষ তার বক্তৃতা শুনল? ক'দিন আগে অবধি সে পাঁচজনের সামনে গলা খুলে কথা বলতে পারত না, আর আজ কেমন পালটে গেছে সে! নিজেকে একদম আলাদা মনে হচ্ছে। এবার ভোট আসছে। এই ভোটটা অন্য বছরের ভোটের থেকে একদম অন্য ধরনের। এই ভোট বাঁচা কিংবা মরার। ভোটের বাক্সে বিপ্লব করলে দেশের মানুষের আর কোনও অভাব থাকবে না।

হরিশ রায়ের গলা শুনে চমক ভাঙল শিবুর, 'কিছু বলছিলেন?'

হরিশ হাসল, 'কী ভাবছিলে বাপ? হ্যাঁ বলছিলাম কি, অতশত কথা শিখলে কী করে? তুমি যে একদম বাবুদের মতো শিক্ষিত হয়ে গেছ।'

শিবু বলল, 'আপনারা তো চান চিরকাল গরিব পড়ে-পড়ে মার খাক!'

হরিশ বলল, 'ছি-ছি! তা চাইলে কি আর তোমার কাছে আসতাম?' হরিশ পেছনদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, বাকি দল বেশ দূরত্বে রয়েছে। সে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে ওইসব কথাবার্তা একটু শিখিয়ে দেবে শিবু?'

কীসব কথা?' শিবু ধরতে পারল না।

'ওই যে গরম গরম কথা! শুনলেই রক্ত কেমন করে। তুমিও তো জানতে না, শিখেছ, তাই আমাকে শিখিয়ে দিলে ক্ষতি নেই।' হরিশ যুক্তি দেখাল।

মনে-মনে খুশি হল শিবু। সুপ্রিয়দা বলেছিলেন মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। অবশ্য হরিশ রায় একজন শোষক, কিন্তু সে যদি বদলে যায় তাহলে তো অর্ধেক কাজ শেষ। তা ছাড়া সুপ্রিয়দা এও বলেছেন, বড় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে ছোট শত্রুর সঙ্গে সাময়িক বন্ধুত্ব করতে হবে। সে শান্ত মুখে বলল, 'বেশ তো, কী জানতে চান বলুন?'

হরিশ বলল, 'ওই যে একটা কথা শুনি, কালকেও শহরে শুনলাম, আজও পার্টির বাবু চিৎকার করে বলল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! এই কথাটার মানে কি?'

শিবু রায় চোখ বন্ধ করল। কথাটা তো বহুবার শোনা। বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে বুকে বল আসে। কিন্তু কথাটার অর্থ তো সুপ্রিয়দা বলেননি। শিবু বুঝতে পারছিল দুধ কেটে ছানা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা হতে দেওয়া ঠিক নয়। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'জিন্দা মানে জানো না? হিন্দি কথা, জিন্দা মানে বেঁচে থাকা।'

'অ। আর ইনকিলাব?' হরিশ রায় আগ্রহ দেখাল।

এইবার হোঁচট খেল শিবু 'কিলাব বোঝ না? শহরের বাবুরা কিলাব করে, মানে একসঙ্গে সবাই বসে খেলে। কথাটার মানে দাঁড়াল, একসঙ্গে সবাই এসো তাহলে বেঁচে থাকবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' সুন্দর লাগল নিজেরই কানে এই ব্যাখ্যাটা।

জোড়খালি গ্রামের মানুষ তাজ্জব হয়ে গেছে। শিবু রায়ের মিসা হওয়ার পর সবাই নানারকম জল্পনা করেছিল। লোকটা জেল থেকে আর ছাড়া পাবে না, মিসা যার হয় তার ছায়া মাড়ানো মানে নিজের মাথা নিজে কাটা। এসব তো বেশ চলছিল। হঠাৎ শোনা গেল আবার ভোট হবে আর মিসা যাদের হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কাল হরিশ রায়রা জলপাইগুড়ি গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছে সেই শিবু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মোটরে চেপে শহরের বাবুদের সঙ্গে মালা পরে ঘুরছে। তার মানে মিসা হলে লোকের সম্মান বেড়ে যায়? আজ যে ফকির কাল সে রাজা? একি অদ্ভুত নিয়ম! শিবুর নাকি হাবভাবও পালটে গেছে। আজ সে গাঁয়ে ফিরছে। দলে-দলে লোক এসে গ্রামের প্রান্তে ভিড় করল।

শিবু রায় গ্রামে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানাল। এইসব চিরপরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, বেচারারা এখনও কি অন্ধকারে আছে! এদের শিক্ষিত করতে হবে। সবাইকে এক করতে হবে। তার চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সে গলা তুলে বলল, 'বন্ধুগণ, আবার আমি ফিরে এলাম। সরকার আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কারণ পৃথিবীর মেহনতী মানুষ এখন জেগেছে। এখন আপনাদের আর অলসভাবে থাকলে চলবে না। নিজেদের অধিকার আদায় করুন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

সবাই হই-হই করে উঠল। সেই শিবু আর নেই, কী সুন্দর বলছে শিবু! হরিশ হাত ধরল, 'বাবা, এবার একটু বিশ্রাম করো।'

শিবু মাথা নাড়ল, 'এখন বিশ্রামের সময় নয়, হাতে অনেক কাজ।'

হরিশ বলল, 'কাজ তো আছেই। তবু একটু জল খেলে গাঁয়ের লোক খুশি হত।'

শিবু বলল, 'ওই তো আপনারা ভুল করেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আমাকে এখন দশটা গাঁয়ে যেতে হবে। সব মানুষকে এক করতে হবে।'

অনন্ত বলল, 'তবু একটু বসে যা।'

হরিশ বলল, 'এদিকে এসো বাপ, আমার বাড়িতে চলো।'

শিবু বলল, 'আপনার বাড়ি কেন? আমার বাড়ি কী দোষ করল?'

অনন্ত বলল, 'সে বাড়িতে এখন ঢুকতে পারবি না। গেল ঝড়ে খড় উড়ে গেছে, সারাতে হবে। তোর বউ ওখানে থাকে না।'

'সে কোথায়?'

হরিশ বলল, 'আমার বাড়িতে বাপ। সেই যে জেলে তোমায় বলে এসেছিলাম।'

অনন্ত জানাল, 'হরিশদা না থাকলে বেচারা খুব বিপদে পড়ত।'

একটু ভেবে নিয়ে শিবু বলল, ' বেশ চলুন, তার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

হরিশ রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে সবাইকে সরিয়ে দিল। তার বাইরের ঘরে শিবুকে বসিয়ে বলল, 'এবার হাত-মুখ ধুয়ে নিলে হয়।'

শিবু বলল, 'না-না, আগে তাকে খবর দিন।' জেলখানায় যাওয়ার পর প্রথম-প্রথম বউটার জন্য খুব কষ্ট হত। বেচারা কিছুই বোঝে না, সরল। বহরমপুরে যাওয়ার পর এতরকম আলোচনা হত দিনরাত, আর মনে করার সময় পাইনি।

বউ এসে দরজায় দাঁড়াতে হরিশ রায় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিবু বউয়ের দিকে তাকাল। একমাথা ঘোমটা, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে চেহারা দেখে মনে হয় একটু মোটা হয়েছে। শিবু বলল, 'ফিরে এলাম।'

বউ সামান্য নড়ল, কথা বলল না। শিবু বলল, 'জেলখানায় কষ্ট হয়নি। আমার চেহারা কেমন লাগছে?'

'বাবুদের মতো ফরসা।' বউ কথা বলল।

ভালো লাগল শুনে, 'এখন আমার অনেক কাজ। দশটা গাঁয়ের ভার আমার ওপর। কাল শহরে আমায় নিয়ে কী কাণ্ড, শুনেছ?'

ঘাড় নাড়ল বউ, হ্যাঁ, সে শুনেছে।

'তা হরিশখুড়ো ভালো মন্দ খেতে দেয়?'

ঘাড় নাড়ল বউ, হ্যাঁ।

'শুনলাম ঘরটা নাকি পড়ে গেছে, এখন সারাবার সময় নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

'কোথায়?' ঘোমটা সরে গিয়ে চোখ দেখা গেল।

'সারা দেশে ভোট আসছে, আমাকে খুব খাটতে হবে। তুমি এখন কী করবে?'

'যা বলেন।' চোখ দুটো খুঁটিয়ে দেখছিল।

'চলো আমার সঙ্গে। অবশ্য খাওয়া থাকা নিয়ে অসুবিধে হবে।'

'আপনি চাষ করবেন না?'

'দূর পাগল। এখন আমার অনেক কাজ।' শিবু হাসল।

'তাহলে যাব না।' বউ ঘুরে দাঁড়ল।

'মানে? আমি তোমার স্বামী না?' বিরক্ত হল শিবু রায়।

'ইস! বউ-এর পেটে যে ভাত দিতে পারে না সে আবার কীসের ভাতার' কথাটা শেষ করেই হন-হন করে ফিরে গেল বউ, ঘোমটা সরিয়ে।

ললাট লিখন

গ্রামের নাম ত্রিশূল। মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিন্তু জমিদার মানুষটা বড্ড খরচে। দুহাতে টাকা খরচ করেন। তাঁর নানান রকমের শখের মধ্যে একটি হল জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া। ভারতবর্ষের বড়-বড় জ্যোতিষীর কাছে যান আর নিজের ভাগ্য জেনে আসেন। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর মিল হয় না কিন্তু মূল ব্যাপারটি অভিন্ন থেকে গেছে। যে কথাটা সবাই বলেছেন তা হল যতই খরচ করুন তাঁর পকেট খালি হবে না। এতেই জমিদারবাবুর শান্তি, পকেটে মাল থাকলে যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে জমিদারবাবুর একটু অস্বস্তি আছে। ত্রিশূল গ্রামের ঠিক মুখটাতে যে বিরাট বটগাছ কয়েক দশক ধরে ছায়া বিলোচ্ছে তার তলায় এক সাধুবাবা বাস করেন। প্রায় কুড়িবছর হয়ে গেল সাধুবাবা সেখানেই অবস্থান করছেন। প্রথম-প্রথম লোকে ওঁকে একটু সন্দেহের চোখে দেখত কিন্তু মানুষটার ওপর একটু একটু করে সবার শ্রদ্ধা জমেছে। কুড়িটা বছর বড় দীর্ঘ সময়। এই সময় কেউ ওঁকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া আসন ছেড়ে উঠতে দ্যাখেনি। গ্রামের লোক খেতে দিলে খান, না দিলে অনশনে কাটান। শরীর ক্রমশ শীর্ণ হলেও মুখে এক ধরনের জ্যোতি জন্ম নিচ্ছে। কথা বলেন খুব কম। সাধুবাবা কিছু চান না, কাউকে স্তোকও দেন না, নিজের মনেই থাকেন। এই মানুষটি সম্পর্কে জমিদারবাবুর প্রথমদিকে কোনও কৌতূহল ছিল না, এখন হচ্ছে। দুতিনদিন সাধুবাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি, চামচেদের দিয়ে সাধুবাবার মত জানতে চেয়েছেন কিন্তু কোনও উত্তর পাননি।

জমিদারবাবুর স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। আজ ভোরে উঠে জমিদারবাবুর মনে হল স্ত্রীর গর্ভে পুত্র কিংবা কন্যা আছে, কিন্তু ঠিক কী আছে তা তিনি জানেন না। কোনও জ্যোতিষী এই ব্যাপারে মুখ খোলেননি। সাধুবাবাকে প্রশ্নটা করলে কেমন হয়? তাঁরই জমিদারির মধ্যে একজন সাধু বাস করছেন অথচ তিনি আগামীকালের কথা আগাম জানতে পারছেন না এ কি করে সহ্য করা যায়! খোঁজখবর নিয়ে জানলেন ঠিক দুপুরবেলায় সাধু একা থাকেন। কাঠফাটা রোদ্দুরে কেউ আর গ্রামের বাইরে যায় না। দুপুর অবধি কোনওরকমে ধৈর্য ধরে থাকলেন জমিদারবাবু, তারপর কাউকে সঙ্গে না নিয়ে নিশব্দে ছাতি মাথায় বেরিয়ে পড়লেন।

দূর থেকে সাধুবাবাকে দেখতে পেলেন তিনি। নির্জন বটগাছ আর তার নীচে সাধুবাবা ধ্যানমগ্ন। একটা নেড়িকুকুর ছায়ায় বসে একদৃষ্টিতে সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জমিদারবাবু সাধুর সামনে এসে প্রণাম জানালেন। সাধুর চোখ বন্ধ, তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জমিদারবাবু বুঝতে পারলেন না। অথচ ধ্যান ভাঙাতেও ঠিক সাহস হচ্ছে না। বেশ কিছুসময় প্রতীক্ষায় কেটে গেল। সাধু চোখ খুলছেন না। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়লেন জমিদারবাবু। শেষে তাঁর মাথায় একটা মতলব এল। পড়ে থাকা গাছের ডাল কুড়িয়ে সজোরে নেড়িকুকুরটিকে প্রহার করলেন তিনি। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে কুকুরটি সাধুবাবার আসনের দিকে ছুটে গিয়ে শেষমুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে উধাও হল। কিন্তু ততক্ষণে জমিদারবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সারমেয়র চিৎকারে সাধুবাবার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তিনি চোখ মেলে দেখলেন জমিদারবাবু করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পলায়মান নেড়িকুকুরটির দিকে তাকিয়ে চিৎকারের কারণ বুঝতে অসুবিধে হল না, বিরক্ত সাধুবাবা প্রশ্ন করলেন, 'কৃষ্ণের জীবটিকে

কি তুমি প্রহার করেছ?'

জমিদারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ বাবা।'

'কেন?'

'না হলে আপনার ধ্যানভঙ্গ হত না। শুনেছি বরফ-পাহাড়ের সামনে খুব জোরে আওয়াজ করলে তবেই বরফ ফাটে।'

সাধুবাবার মুখে হাসি দেখা দিল। লোকটি বুদ্ধিমান বটে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল এই মানুষটি এর আগে তাঁর কাছে কয়েকবার এসেছেন একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে। ইনি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান। ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি, ঈশ্বরের নাম করেন, কিন্তু কোন বিদ্যায় ভবিষ্যতের খবর জানা যায় তা তাঁর জানা নেই। জানতেও চান না। ঈশ্বর তাঁকে করুণা করলেই তিনি ধন্য। অথচ এই সাধারণ মানুষগুলো মনে করে যেহেতু তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছেন তাই মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ জেনে বসে আছেন। তাঁর যে সেরকম কোনও ক্ষমতা নেই, ক্ষমতার লোভে তিনি এগোননি, একথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এই কারণেই তিনি খুব কম কথা বলেন, লোকালয়ের কাছে না থাকলে না খেয়ে মরতে হবে তাই এখানে থাকা।

সাধুবাবার হাসি দেখে জমিদারবাবু বললেন, 'বাবা আমার বংশে সন্তান আসছে—আপনি বলুন সে পুত্র হবে তো?'

সাধুবাবা মাথা নাড়লেন, 'বিধাতা যা চায় তাই হবে।'

জমিদারবাবু বললেন, 'সেকথা ঠিক, কিন্তু মন তো জানতে চায়। আপনি তো সবই জানেন, দয়া করে বলুন।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি সে ক্ষমতার অধিকারী নই। ঈশ্বরের করুণা পাওয়ার জন্য বসে আছি, তিনি প্রসন্ন হলেই আমার মুক্তি।'

'আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।' জমিদারবাবু অসহিষ্ণু হলেন।

'আমি মিথ্যে কথা বলব কেন তাই বুঝতে পারছি না।'

জমিদারবাবু একথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। তিনি উষ্ণ গলায় বললেন, 'আগামীকাল আবার আমি এই সময়ে আসব। আশা করি তখন আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।'

ক্ষুণ্ণ জমিদারবাবুকে চলে যেতে দেখলেন সাধুবাবা। কী আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান না। সেই ক্ষমতা কী করলে আয়ত্ত হয় তাও তিনি জানেন না। দিনরাত ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া আর কোনও কিছুই যে তিনি জানেন না। শুনেছেন বড় সন্ন্যাসীরা এসব পারেন কিন্তু বড় সন্ন্যাসী হতে গেলে কী করা দরকার সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই।

সাধারণ মানুষের দোষ দেন না সাধুবাবা, তারা তো জানতে চাইবেন। ক্রমশ তাঁর মনে অভিমান এল। এত বছর কেটে গেল ঈশ্বরের প্রত্যাশায় তবু তাঁর করুণা পেলেন না। শীর্ণ জটাধারী তপ্ত মধ্যাহ্নে আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে একখণ্ড মেঘও নেই। মনে-মনে প্রার্থনা করলেন, হে করুণাময়, তুমি দয়া করো। আমি কিছুই চাই না তোমার কাছে, শুধু তোমার লীলার স্বাদ নিতে চাই।

সেই সন্ধ্যায় সাধুবাবা কিছু খেলেন না। গ্রামের ভক্তরা অবশ্য নিত্যদিনের উপাচার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে এসেছিল আর একটি বিশেষ থালা। ওটি জমিদারবাবু পাঠিয়েছেন। রাজভোগ, রাজসন্দেশ এবং রাজফলে সেটি পরিপূর্ণ। সাধুবাবা কোনও দিকেই তাকালেন না। চিত্ত স্থির করে ক্রমশ ডুবে যেতে লাগলেন এক অসীমে। যেখানে গেলে কোনও জাগতিক কোলাহল কর্ণে প্রবেশ করে না।

মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়ে আকাশ একটু-একটু করে চেহারা বদলাচ্ছিল। ফিকে জাফরান রঙের

সমারোহ সেখানে। নবমীর চাঁদ ননীর রং মেখে ঝুলে রয়েছে মধ্যগগনে। শুকতারা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে এখন। শেষ প্রহরে সাধুবাবার চেতনা ফিরে এল। বড় নির্জন হয়ে আছে পৃথিবী। বিশ্বচরাচর এখন ঘুমের অতলে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সাধুবাবা চোখ মেললেন। হঠাৎ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় সতর্ক হল। দ্রুতপায়ের আওয়াজ কানে আসছে। এই শেষরাতে কে আসছে? ঠিক তখনই নজরে এল। ত্রিশূল গ্রামের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে বলা চলে। আকৃতি দেখে চিনতে পারলেন না সাধুবাবা। অথচ এই গ্রামের প্রতিটি মানুষকে তিনি ভালো করে চেনেন। কোনও কুমতলব শেষ করে লোকটা ফিরে যাচ্ছে না তো! গ্রামের মানুষ তাঁর ভক্ত, তাঁকে সেবা করে। ওদের কোনও ক্ষতি করে আসছে না তো লোকটা?

চোখের সামনে দিয়ে যখন সে হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সাধুবাবা তাকে ডাকলেন, 'ওহে এদিকে একবার শোন!'

লোকটি একটু শ্লথ হয়ে আবার চলতে শুরু করলে সাধুবাবা গলা তুললেন, 'তুমি কে হে? ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?'

এবার লোকটি থামল। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছেন তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।'

সাধুবাবা হাসলেন, 'অত ব্যস্ত কেন? দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যাও না?'

লোকটি বিরক্ত মুখে এগিয়ে এল, 'কী বলছেন?'

'তোমাকে তো কখনও দেখিনি বাপু, কোথায় থাকো?'

'এতদিন চোখ ছিল না তাই দ্যাখেননি, এখন চোখ হয়েছে তাই দেখছেন। কী কারণে ডাকছেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

সাধুবাবা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসো।'

'না-না, বসার সময় নেই। এক্ষুনি ভোর হবে, তার আগেই আমাকে পাশের গাঁয়ে যেতে হবে। আগে কাজ পরে কথা।'

সাধুবাবার শরীর রোমাঞ্চিত হল, 'আমি কি ঠিক দেখছি?'

লোকটি হাসল, 'হ্যাঁ, ঠিকই দেখছ। এতদিন অন্ধ ছিলে, আর পাঁচজনের মতো চোখ থাকতেও আমায় দেখতে পাওনি। এতবছরের সাধনার পর আজ তোমার দৃষ্টি ফুটেছে তাই দেখতে পেলে। আমি বিধাতাপুরুষ।'

সাধুবাবা সঙ্গে-সঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, 'আমি ধন্য, আমি ধন্য।'

বিধাতাপুরুষ বললেন, 'ঠিক আছে। এখন কেন ডেকেছ তাই বল?'

সাধুবাবার মাথায় কোনও জিজ্ঞাসা সহসা এল না। তস্কর ভেবে তিনি বিধাতাপুরুষকে ডেকেছিলেন। এখন কি জবাব দেবেন ভাবতে গিয়ে জমিদারবাবুর মুখ মনে পড়ল। বেচারা জানতে চায় তার ছেলে হবে না মেয়ে হবে! সাধুবাবার আর কোনও খেয়াল রইল না, এই প্রশ্নটাই বিধাতাপুরুষকে করলেন।

বিধাতাপুরুষ হাসলেন, 'আমি তো তার বাড়ি থেকেই আসছি হে। আজ তৃতীয় প্রহরে তার স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করেছে। সেই পুত্রের ললাটে ভাগ্যলিপি লিখে ছুটে আসছি। যেতে হবে পাশের গাঁয়ে। সেখানে এক চাষির কন্যা জন্ম নিচ্ছে। তারও ললাটে লিখতে হবে ভবিষ্যৎ। এখন এত কাজের চাপ একা সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তুমি পিছু ডেকে দেরি করিয়ে দিলে। মানুষ ভাবে বিধাতা হয়ে আমি খুব সুখে আছি!'

সাধুবাবা নতজানু হয়ে বললেন, 'ভগবান, এত যদি করুণা হল তবে দয়া করে আর একটু বলে যান। ওই দুই নবজাতকের ললাটে কী লেখা হল বা হবে।'

বিধাতাপুরুষ বললেন, 'তুমি ভক্ত লোক, তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। তাছাড়া আমি একবার

ললাটে যা লিখে দেব পৃথিবী গেলেও তা মিথ্যে হবে না। হ্যাঁ, জমিদারের ছেলের কপালে লিখলাম, কয়েকবছর সে বেশ আদরে মানুষ হবে। কিন্তু জমিদারের বেহিসাবী খরচের জন্যে জমিদারি নিলামে উঠবে। বাপ, মা মরে গেলে ছেলেটি একদম অনাথ নিঃস্ব হয়ে জীবন কাটাবে। তবে অতি দীন অবস্থায় তাকে বাঁচাবার জন্যে একটি কালো গরুর ব্যবস্থা রেখেছি। সেই গরুর দুধ বিক্রি করে সে বেঁচে থাকবে।'

বিধাতাপুরুষ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে সাধুবাবা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ওই চাষির মেয়ের কপালে কি লিখবেন?'

মুখ ঘুরিয়ে বিধাতাপুরুষ বললেন, ' সে মেয়ের বিয়ে হবে ষোল বছর বয়সে। ঠিক সতেরো বছরে বিধবা হবে। তার এক ভাসুর তাকে নষ্ট করবে। বাধ্য হবে সে পথে বেরিয়ে আসতে। তোমাদের পাশের গঞ্জে সে ঘরভাড়া নেবে। খুব কষ্টে তার দিন কাটবে কিন্তু একদম যাতে না খেয়ে মারা যায় তাই রোজ রাত্রে অন্তত একজন খদ্দের সে পাবেই—এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আর কথা বাড়িও না-বাপু, ভোর হয়ে এল বলে, আমি চলি।' বিধাতাপুরুষ প্রায় দৌড়ে গেলেন পাশের গ্রামে।

সাধুবাবা সেই ছুটে যাওয়া নয়নভরে দেখলেন। তারপরেই তাঁর খেয়াল হল স্বয়ং ঈশ্বর এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ নিজের জন্যে কিছু চাওয়ার কথা তাঁর মনেই আসেনি। তা থাক, তিনি তো এখন এই পৃথিবীর দুটি মানুষের ভবিষ্যতের কথা জানেন। এই ক্ষমতা তো ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে গেলেন। তারপরই তাঁর মনে হল, আহা, ওই ছেলেমেয়ে দুটো কত না কষ্ট পাবে! কোনও উপায়ে কি তাদের কষ্ট দূর করা যায় না? তিনি ভেবে রাখলেন, জমিদারবাবু যদি আবার আসেন তাহলে ওঁকে বলবেন মিতব্যয়ী হতে। সন্তানের জন্যে যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে যেতে। পাশের গাঁয়ের চাষীকে গিয়ে বলে আসবেন সে যেন খবরদার তার মেয়েকে ষোলো বছর বয়সে বিয়ে না দেয়। তারপরেই মনে হল, মানুষের কর্মফল তো ভোগ করতে হবে, তিনি কেন বাধা দিতে যাবেন? তাছাড়া ঘটনগুলো আদৌ ঘটে কিনা তাও জানা দরকার।

এই ঘটনার পরে আরও কুড়িটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই একই আসনে সাধনা করে সাধুবাবা আরও শীর্ণ হয়েছে। এখন তাঁর শরীর কয়েকটি হাড়ের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কুড়ি বছর পর এক মধ্যাহ্নে সাধুবাবার স্মরণে পড়ল ঘটনাটার কথা। এই কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি বিধাতাপুরুষকে আর দেখতে পাননি । কিন্তু এখন প্রতিমুহূর্তে মর্মে-মর্মে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন। জাগতিক সুখদুঃখ তাঁকে আর বিব্রত করে না। ঘটনাটা মনে পড়ায় তাঁর কৌতূহল হল। ঈশ্বরের লীলা কী প্রকৃতির তা দেখা যাক। তিনি আসন ছেড়ে উঠলেন।

সাধুবাবাকে গ্রামের পথে দেখতে পেয়ে ভিড় জমে গেল। চল্লিশ বছর ধরে ওঁকে কেউ গ্রামে ঢুকতে দ্যাখেনি। সাধুবাবা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, জমিদারের বাড়িটা কোন পাড়ায়? ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জানাল, 'জমিদারের বাড়িটা এখন আর নেই। ধারপত্তর করে তাঁদের অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে সব নিলাম হয়ে গিয়েছে। বাড়িটা যারা কিনেছিল তারা ভেঙে ফেলে গুদাম করেছে। জমিদারবাবু নেই, শুধু তাঁর ছেলে খুব কষ্টসৃষ্টে একটা ভাঙা বাড়িতে কোনওরকমে থাকে।'

সাধুবাবার ইচ্ছায় ওরাই তাঁকে একটা জীর্ণ বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেখানে একটি তরুণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে সাধুবাবাকে অভ্যর্থনা করল, 'বাবা, এ আমার কী ভাগ্য যে আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন!'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জমিদারের পুত্র?'

'হ্যাঁ বাবা, তাই ছিলাম কিন্তু এখন অতি দীনদরিদ্র, আপনার সেবা করার যোগ্যতাটুকুও নেই। আপনি আমার দুঃখ দূর করুন।'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চলে কী করে?'

ছেলেটি বলল, 'আমার তো সবই গিয়েছে, শুধু একটা কালো গরু কোনওরকমে টিকেছিল।

তার দুধ বিক্রি করে বেঁচে আছি।'

সাধুবাবা শিহরিত হলেন। তাহলে বিধাতাপুরুষের বাক্য মিথ্যে হয়নি! তিনি কিছুক্ষণ নয়ন বন্ধ করে চিন্তা করতেই এক ধরনের হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল।

আচ্ছা একটু মজা করলে কীরকম হয়? দেখা যাক, এতে ছেলেটির কোনও উপকার হয় কিনা। তিনি জমিদারপুত্রকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি যদি আমার উপদেশমতো চলো তাহলে তোমার দুঃখ দূর হতে পারে।'

ছেলেটি তাঁর পায়ে হাত রাখল, 'আপনি আদেশ করুন, আমি পালন করব।'

সাধুবাবা বললেন, 'বেশ। তুমি তোমার কালো গরুটিকে গোয়াল থেকে খুলে বাজারে নিয়ে যাও। সেখানে সেটা ভালো দামে বিক্রি করে এসো।'

ছেলেটি আঁতকে উঠল, 'একি কথা বলছেন বাবা, ওই আমার সবেধন নীলমণি, ওকে বিক্রি করলে খাব কী?'

সাধুবাবা বললেন, 'আমার কথা শোনো, তোমার অমঙ্গল হবে না।'

ছেলেটি তবু দোনামনা করছে দেখে সাধুবাবা কপট ক্রোধ প্রকাশ করলেন, 'যা বলছি তাই যদি না করো, তোমার—।' বাক্য সমাপ্ত না করে তিনি ফিরে চললেন নিজের আসনে।

সারারাত মন চঞ্চল হয়ে রইল। ছেলেটি তাঁর নির্দেশ মান্য করল কিনা বুঝতে পারছেন না তিনি। ভোর হতে না হতেই দেখলেন ছেলেটি ছুটে আসছে তাঁর কাছে। সাধুবাবার মুখের তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। ছেলেটি এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'এ আপনার কী লীলা বাবা! গতকাল আপনার আদেশমতো আমার কালো গরুটাকে বিক্রি করে ফিরে এলাম। খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে চারটের সময় অভ্যেসমতো ঘুম ভেঙে যেতেই হাম্বা ডাক শুনতে পেলাম। গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে দেখি সেখানে একটা কালো গরু দড়ি দিয়ে কে বেঁধে রেখে গেছে।'

সাধুবাবা বললেন, 'এই সবই ঈশ্বরের লীলা, তাঁকে করতেই হবে। কাল কত দাম পেলে?'

'চারশ টাকা।'

'বেশ, আজই ওই গরুটাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাও। দেখবে কাল সকালে গোয়ালে আর একটি গরু বাঁধা থাকবে। তোমার দৈনিক আয় জমিদারির আয়ের চেয়ে কম হবে না হে। যাও।'

ছেলেটিকে বিদায় করে মনে-মনে তৃপ্ত হলেন সাধুবাবা। তারপর লাঠি হাতে আবার বেরিয়ে পড়লেন পাশের গঞ্জের দিকে। এর মধ্যেই লোকমুখে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে সাধুবাবার অলৌকিক ক্রিয়ার কথা। সবাই এসে নিজের কষ্ট জানিয়ে সাধুবাবার আশীর্বাদ চায়। কোনওক্রমে তাদের এড়িয়ে সেই গঞ্জের খারাপ পাড়ায় উপস্থিত হলেন তিনি। এখানে কয়েকঘর স্বৈরিণী বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিধাতাপুরুষের বলে যাওয়া মেয়েটি কোনটি হবে? জনে-জনে জিজ্ঞাসা করা শোভন নয়, কিন্তু সাধুবাবাকে বেগ পেতে হল না, স্বৈরিণীরা সবাই ছুটে এল তাঁর কাছে, এসে পায়ে পড়ে বলল, 'বাবা আমাদের উদ্ধার করো।'

সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কার ষোলোতে বিয়ে হয়ে সতেরোতে বিধবা হতে হয়েছিল?'

সুন্দরী এক যুবতি বলল, 'আমি সেই হতভাগিনী।'

সাধুবাবা দেখলেন মেয়েটি সুন্দরী কিন্তু তার সাজপোশাক অত্যন্ত জীর্ণ। বোঝাই যায়, খুব কষ্টে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী রকম আয় হয়?'

মেয়েটি বলল, 'সে পাপের কথা মুখে আনতে লজ্জা করছে বাবা। তবু যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন বলছি, সারারাত কুপি জ্বেলে বসে থেকে কোনওরকমে একটা খদ্দের জোটে।'

সাধুবাবা শুধোলেন, 'কোনও রাত খদ্দের ছাড়া গেছে?'

মেয়েটি জানাল, 'না বাবা, সেরকম হয়নি। একটা টাকা দিক কি দুটো দিক, একজন না একজন এসেছে। এই বাজারে কি আর ওই রোজগারে চলে।'

সাধুবাবা প্রফুল্ল হলেন, 'ঠিক আছে। আমি যা বলছি তাই করবে। আজই গঞ্জে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, আজ রাত্রে যে এই বেশ্যার ঘরে আসবে তাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।'

মেয়েটির চোখ কপালে উঠে গেল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না সে। তারপর তড়বড়িয়ে বলে উঠল, 'একি কথা বলছ বাবা! লোক আমায় পাঁচটা টাকা দিতেই পাঁচকথা শোনায়, তুমি আমায় হাজার টাকা চাইতে বলছ? অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা কজনের আছে? আর দেবেই বা কেন?'

সাধুবাবা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, 'আমি যা বলছি তাই না করতো তোমার—।' বাক্য শেষ না করে সাধুবাবা গঞ্জের বাইরে এক গাছতলার আসনে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকাল হতেই মেয়েটি ছুটে এল সেখানে, 'বাবা তোমার কী লীলা, সত্যিই পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবু এসেছিল গো আমার ঘরে। শুনে-শুনে এক হাজার টাকা দিয়ে গেছে আমাকে। তাই দিয়ে সব ধার শোধ করে এলাম। ঢ্যাঁড়া শুনে জমিদারবাবু নাকি অবাক হয়ে দেখতে এসেছিলেন।'

সাধুবাবার মুখে হাসি ফুটল, ' বেশ, আজ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও তোমার ঘরে ঢুকতে হলে দুহাজার টাকা দিতে হবে।'

মেয়েটি ঢোঁক গিলল। কিন্তু এক হাজার টাকার আনন্দে ছুটে গেল ঢ্যাঁড়া পেটাতে। পরদিন মেয়েটি এল একটু বেলায়। সাধুবাবা দেখলেন, ওর অঙ্গে ভালো শাড়ি উঠেছে। হাঁটা-চলার ঢংটাই পালটে গেছে। এসে মুচকি হেসে বলল, 'এসেছিল গো! ঢ্যাঁড়া যখন দেওয়া হচ্ছিল তখন এক রাজাসাহেব গাড়িতে চড়ে শিকারে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনে বললেন, 'কী ব্যাপার, এই রাজত্বে দুহাজারি মাল আছে? দেখতে হয়! এই বলে আমায় দুহাজার দিয়ে গেলেন।' একটা পান গালে ফেলে মেয়েটি হাসল, 'তা হ্যাঁ বাবা, আজ কি তিন হাজার বলব?'

সাধুবাবা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তাহলে?' মেয়েটি যেন দমে গেল।

'আজ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, যে মানুষ আজ রাত্রে তোমার ঘরে আসতে চাইবে তার অন্তত তিনটে হাত থাকতে হবে। তিন হাজার নয়, তিন হাত না হলে তুমি কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না—যাও।'

মেয়েটির চোখ কপালে উঠল, 'একি খেলা বাবা, মানুষের কি তিন হাত হয়, হতে পারে?'

সাধুবাবা বললেন, ' তোমার যখন পাঁচ টাকা রোজগার হত না, সেখানে কাল দু'হাজার হল কী করে? যাও আর কথা বাড়িও না, যা বলছি তাই করো, খবরদার আদেশ অমান্য করো না।'

মেয়েটি কালো মুখে চলে গেলে সাধুবাবা হাসলেন, এইবার দেখা যাক কী হয়। সেদিন সন্ধে হতে না হতেই সাধুবাবা নিশব্দে পতিতা পাড়ায় প্রবেশ করলেন। মেয়েটি যে বাড়িতে থাকে তার ঠিক সামনেই একটা বড় কাঁঠাল গাছ দেখতে পেয়ে তার নিচে আসন নিলেন তিনি। অন্ধকারে কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তিনি সব দেখছেন। কারণ দরজায়-দরজায় লণ্ঠন আলো হাতে নিয়ে স্বৈরিণীরা দাঁড়িয়ে। খদ্দের আসছে এবং দরজা বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু সাধুর নজর বিশেষ ঘরের দিকে। সেখানে অত্যন্ত গরবিনির ভঙ্গিতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সাধাসাধি করলেও সে কাউকে ঘরে তুলছে না।

ক্রমশ রাত বাড়ল। পাড়াটা ঝিমিয়ে এল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সব আলো নিভে গেল, সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাধুবাবার অস্বস্তি শুরু হল। রাতের তৃতীয় প্রহর এখন। এতবড় গঞ্জ ঘুমে কাদা হয়ে আছে। মাথার ওপর অম্বুরী তামাকের গন্ধের মতো ঝলমল জ্যোৎস্না এসে পড়ল। এখন চরাচর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাধুবাবা দেখছেন রাত খুব দ্রুত

ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় পায়ের শব্দ হল।

সাধুবাবা সচকিত হলেন। একটি মানুষ হনহন করে ছুটে আসছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সে মেয়েটির বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়ল। দুবার শব্দ হতেই ভেতর থেকে মেয়েটির গলা পাওয়া গেল, ' কে রে?'

লোকটি জবাব দিল, 'আমি।'

'আমি-টা কে?' ভেতর থেকে ঘুমজড়ানো গলা ভেসে এল।

'তোমার কাছে রাত্তিরে কারা আসে?'

'অ। তা তোমার তিনটি হাত আছে? সাধুবাবা বিধান দিয়েছেন।'

'বেরিয়ে দ্যাখো আছে কি নেই?'

দরজা খুলল। লন্ঠনের আলো এসে পড়ল আগন্তুকের মুখে। সাধুবাবা গলা বাড়িয়ে লোকটির মুখ দেখতে চেষ্টা করলেন।

মেয়েটি বলে উঠল, 'ওমা, তাই তো! এরকম আবার হয় নাকি? সাধুবাবা ঠিক বলেছেন দেখছি। তিন হাতে আদর খাব আজ।'

লোকটি মুখ বিকৃত করল, 'এইজন্যে আগেভাগে জানাতে নেই। উত্তরটা জেনে ব্যাটা খুব চাল চালল। চলো।'

সাধুবাবা দেখল বিধাতাপুরুষকে নিজের মর্যাদা রাখতে তিন হাতে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে। ঈশ্বরের ললাটে এইটে কেউ লিখে দিয়েছিল কিনা কে জানে। ভাবতেই হাসি পেল। ঈশ্বরের ললাটে লেখার ক্ষমতা আবার কার আছে? মানুষ ছাড়া?



রুদ্রায়ণ

দুপুর একটু গড়ালেই এখানে ঠান্ডা হাওয়া বয়। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশে এমন একটা হিমভাব ছড়ায় যে রোদ্দুরটাকে গায়ে লাগে না। তারপর যখন ছায়ারা গাঢ় হয়, নিচের জঙ্গলের অন্ধকার গায়ে মেখে তারা যখন ওপরে উঠে আসে তখন থেকেই কনকনানিটা শুরু হয়। রাত যত বাড়ে তত তার দাঁত ধারালো হয়। সন্ধের পর পথেঘাটে মানুষ আর বের হয় না। আলোগুলো জ্বলতে থাকে ভূতুড়ে চোখের মতন। শুধু বাতাসের একটানা গোঙানি দিয়ে রাতটা থাকে জড়ানো।

দূরের ওই আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকা মাঠটার বুকে ছোট-বড় যে তাঁবু পড়েছিল রাজকুমারের অভিষেকের সম্মানে সেগুলোকে তুলে নেওয়া হয়েছে। গত তিনদিন প্রচণ্ড খাটুনি গেছে জয়ন্তীর। মহারাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষে এই পাহাড়ি শহরে ছুটে আসতে হয়েছে দিল্লির দেইলি সান কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে। প্রাত্যহিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েও তাঁর কাজ শেষ হয়নি। একটা রঙিন ফিচার লিখতে হবে তাঁকে। রাজপরিবার এবং তাঁকে নানানরকম কাহিনি সাজিয়ে এই পটভূমিকে প্রাণবন্ত করতে হবে কাগজের পাতায়। এ-ব্যাপারে অবশ্য জয়ন্তীর সুনাম আছে। অভিষেক মিটে গেলে জয়ন্তীর ইচ্ছে হল এখানে আরও কয়েকটা দিন রয়ে যেতে। ছবির মতো ছোট্ট শহর বিশ্রামের পক্ষে সত্যি খুব ভালো। পরিশ্রম বেশি হয়ে যাওয়ায় মন আরাম চাইছিল। কাগজ থেকে অনুমতি মিলতেই হাঁফ ছেড়েছিলেন তিনি। যাক, এখন দশটার আগে বিছানা ছাড়বেন না, সন্ধের

পরেই লেপের তলায় ঢুকবেন। দিল্লিতে যা করা হয় না তাই করবেন তিনি এখানে।

জয়ন্তীর আস্তানাটা চমৎকার। শহরের ঠিক ওপরে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে পরপর যে ছবির মতো বাংলোগুলো তারই একটা ভাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি কপালজোরে। একটি বৃদ্ধ ভুটানিদম্পতি দেখাশোনা করে এটিকে। মালিক থাকেন আরও ওপরের রাজধানীতে। বৃদ্ধ বাগান করে সামনের চিলতে জমিতে, বৃদ্ধা সুন্দর রান্না করে দেয় জয়ন্তীকে। প্রথম কদিনের পরিশ্রমে যা চোখে পড়েনি এখন এই বিশ্রামের সময়ে তাই চেখে-চেখে দেখছেন তিনি। এই পাহাড়ি মাটিতে শীতের ফুলেরাও বৃদ্ধের হাতে কি সুন্দর হয়ে ফোটে! এই দম্পতির যেন কোনও ব্যাপারেই কৌতূহল নেই। জয়ন্তী এখানে রয়েছেন এবং কদিন থাকবেন একাকী তাও যেন ওদের কাছে স্বাভাবিক।

চল্লিশটা বছর কখন নিশব্দে খরচ হয়ে গেল। অথচ শরীরটার দিকে তাকালে চল্লিশ শব্দটাকে মনেই পড়ে না। এখন তাঁর চামড়া তেমনি টানটান, মুখের কোথাও আঁচড় পড়েনি, স্বাস্থ্য সেই তিরিশেই ঠেকে রয়েছে। শুধু একটা মোলায়েম রুক্ষতা জয়ন্তীর সর্বাঙ্গে ছড়ানো যা কিনা তাঁকে বর্মের মতো আড়াল দেয়।

এখনও ঠান্ডা বাতাস নেমে আসেনি, মিষ্টি ওম রোদ্দুরে মাখানো। জয়ন্তী কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দূরে কালো চাপ জঙ্গলমাখা পাহাড়ের শরীর ঘেঁষে বেশ চওড়া নদীর সাদা খাদটা চোখে পড়ল। কী নাম যেন, তোর্সা? যে সব ভেঙে ফেলে? এখন কি বিষাদ নিয়ে শুয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে! জল বইছে সরু ধারায়, বাকিটা সাদা হাড়ের মতো পাথরে ছড়ানো। অদ্ভুত নির্জনতা এখানে। জয়ন্তী ঝুঁকে নিচের রাস্তাটা দেখলেন। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ওরা আসছে। পায়ে-পায়ে, খুব সন্তর্পণে। গতকালই আলাপ হয়েছে। দুটো বাড়ির ওপাশে বাঁকের মাথায় যে বাংলো সেখানে থাকে ওরা। মহিলাটি মাঝবয়সি, ট্রেইনড নার্স ছেলেটি বছর পনেরর হবে কিনা সন্দেহ। অত রোগা এবং সাদা চামড়ার কিশোরকে জয়ন্তী আগে কখনও দেখেননি। প্রথম দেখায় বুঝতে পেরেছিলেন বেশ অসুস্থ ছেলেটি। এইটুকুনি পথ হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। প্রতিটি পা ফেলছে আর বড়-বড় নিশ্বাস নিচ্ছে।

দ্রুত নিচে নেমে এলেন জয়ন্তী। ছোট্ট বাগান পেরিয়ে কাঠের গেটের সামনে দাঁড়ালেন। এখন ওঁর শরীরে একটা হালকা শাল অথচ ছেলেটির আপাদমস্তক গরম উলে মোড়া। মাথায় মাঙ্কিক্যাপ। যে চামড়াটাকে প্রথমে সাদা মনে হয়েছিল তা যে রক্তহীন সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কথা বলার চৌহদ্দিতে আসা মাত্র জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো আজকে?'

ছেলেটির চোখে লজ্জা ফুটল কি! ঘাড় নাড়ল সে, ভালো।

গতকাল ওকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নার্স। যেই ওই পাহাড়টার মাথায় কুয়াশারা এসে জমা হয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে সে তাড়া দিয়েছিল, 'চলো, রোদ মরে আসছে। তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।'

ছেলেটির কাতর চোখের চাহনিতে তার মন গলেনি। জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কী করব বলুন! ডাক্তার পই-পই করে নিষেধ করেছে ঠান্ডা না লাগাতে, অথচ রোদ্দুরে একটু পায়চারিও করাতে হবে। এদিকে পদ্মপাতায় জল কখন যে টুপ করে ঝরে পড়বে আর দোষ হবে আমার। আর দাঁড়াতে হবে না, ফিরে চলো।'

ছেলেটির ফিরে যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু বোধহয় অর্জন করতে শেখেনি সে। আজ জয়ন্তী গেট খুলে রাস্তায় চলে এলেন। দু-একটা ভেড়া ছাড়া পিচের পথটায় কোনও প্রাণী নেই। জয়ন্তী বললেন, 'কাল তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি!'

ছেলেটির ঠোঁট নড়ল। শুধু চোখ নাক আর গালের পাশ দিয়ে ঠোঁট নজরে আসছে। নার্স বলল, 'নাম বলো!'

'তাপস সেনগুপ্ত।'

বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তোমার। চলো আমি তোমার সঙ্গে একটু বেড়াই। তোমার আপত্তি নেই তো?' তাপসের পাশে এসে দাঁড়ালেন জয়ন্তী।

দ্রুত মাথা নাড়ল সে, না কোনও আপত্তি নেই।

কয়েক পা হাঁটতেই নার্স চাপা গলায় বলল, 'আঃ অতজোরে হাঁটতে মানা করেছি না? এমনভাবে হাঁটবে যাতে কষ্ট না হয়।'

'আমার কষ্ট হচ্ছে না।' জয়ন্তী লক্ষ করলেন তাপসের কণ্ঠস্বর বয়সের তুলনায় বেশ সরু কিন্তু খুব মিষ্টি।

'কিসে কষ্ট হবে তা যদি বুঝতে পারতে। এখানে একটু বসো। জিরিয়ে নাও। আর যেতে হবে না ওদিকে। এক্ষুনি রোদ পড়ে আসবে। তোমার বাবা শুনলে আমায় আস্ত রাখবে না।' নার্স তাপসকে হাত ধরে রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসিয়ে দিল। জয়ন্তী লক্ষ করছিলেন নার্সের শাসন। এর মধ্যে তাঁর কথা বলা শোভন নয়। তবে নার্স ঠিকই বলেছে বলে মনে হল তাঁর। এটুকু আসতেই ছেলেটি হাঁপাচ্ছে। মুখে ঘাম জমছে, বুকের ওঠানামা পুলওভার আড়াল করতে পারেনি।

ওর অসুখটা কী তা জয়ন্তী জানেন না। গতকাল নার্সটি বলেছিল, ও খুব অসুস্থ। বিশ্বাস করতে চাননি কিন্তু এখন মনে হল সেটা খুব বেশি রকমের কিছু। জয়ন্তী ছেলেটির দিকে তাকাতেই স্থির হয়ে গেলেন। এক একটা স্পর্শ কিংবা গন্ধ অথবা চাহনি আছে যা মুহূর্তেই সমস্ত পলেস্তারা খসিয়ে হাঁ করে দেয় গাঁথুনিকে। এক মুহূর্তে ঠেলে নিয়ে যায় সেখানে যেখানে স্মৃতি থাকে মুখ বুজিয়ে। ছেলেটি যেভাবে তাঁর দিকে বিশাল চোখে তাকিয়ে আছে, সেই চাহনি জয়ন্তীকে এবার কাঁপিয়ে দিল। পঁচিশ বছর আগের আর একজোড়া চোখ কী করে এই চোখে দৃষ্টিটাকে এঁকে দিল হুবহু?

মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে চোরকাঁটা সরাচ্ছিল নার্সটি। জয়ন্তী ওর কাছে এগিয়ে গেলেন যেন চাহনিটার সীমা ছাড়াতেই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা কী হয়েছে ওর?'

কথা শোনার দূরত্বে নেই ছেলেটি, তবু নার্স আড়চোখে একবার দেখে নিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বাঁচবে না।'

'সেকি!'

নীরবে মাথা নাড়ল নার্স তারপর বলল, 'শরীর রক্ত হয় না। কলকাতা বোম্বাই দিল্লি ঘুরে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কোনও লাভ হয়নি। গরম জায়গায় থাকলে অ্যাদ্দিন চলে যেত। ঠান্ডা পাহাড়ি অঞ্চল অথচ ঠান্ডা লাগবে না বলেই এই জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতিসপ্তাহের শনিবারে রক্ত দিতে হয়। বাড়িতেই সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'ওর বাবা-মা?' জয়ন্তী ছেলেটির দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

'মা তো মরে গেছে জন্ম দিয়ে। বাপের খুব আদুরে ছেলে। খরচা করছে খুব। কিন্তু বেশিদিন ভুগলে কজনের আর ধৈর্য থাকে। চাকরি বাকরি ছেড়ে তো আর এখানে পড়ে থাকতে পারে না। শনিবার আসে সোমবার ভোরে চলে যায়। এটাই বোধহয় শেষ মাস।'

'কেন?' চমকে উঠলেন জয়ন্তী।

'জানি না। ডাক্তার ওর বাবাকে তৈরি থাকতে বলেছেন। আর দেরি করব না দিদি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। চলি।' নার্স তরতর করে এগিয়ে গেল তাপসের দিকে। জয়ন্তী লক্ষ্য করলেন এতক্ষণে তাপসের বুক কিছুটা স্থির। নার্স বলল, 'ওঠো, সন্ধে হয়ে আসছে।'

'এখনও তে রোদ আছে।' কাতর হল তাপসের গলা।

'থাক। আর বসে কাজ নেই।'

'আর একটু থাকো না।'

'না।'

'আর একটুখানি। আমার খুব ভালো লাগছে।' আবদার না প্রার্থনা তা বোধহয় ও নিজেই জানে না বলে মনে হল জয়ন্তীর। নার্সের পাশে পৌঁছে জয়ন্তী বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না, আপনি এগিয়ে যান আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

নার্সটি বুঝতে পারছিল না এ কথায় বিরক্ত হওয়া উচিত কিনা। সে বলল, 'আপনি জানেন না দিদি, ওর সঙ্গে হাঁটা কি কষ্টকর।'

জয়ন্তী হাসলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ভালোভাবে নিয়ে যাব ওকে।'

একটু কি স্বস্তি নার্সটির? মুখে আরামের ভাঁজ? বলল, 'তাহলে বেশি দেরি করবেন না। ওর বাবা শুনলে আমাকে খেয়ে ফেলবে। ভীষণ রাগী মানুষ। শোনো, তুমি আবার অন্য কিছুর বায়না করবে না, বুঝলে? তাহলে আমি আসি।'

'হ্যাঁ।' জয়ন্তীর মুখ থেকে শব্দটি বের হওয়া মাত্র নার্স বাড়ির পথ ধরল। সেদিকে একবার তাকিয়ে জয়ন্তী তাপসের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'তুমি কিন্তু খুব ঘামছ।'

তাপস ওঁর দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। জয়ন্তী চারপাশে নজর বোলালেন। এখনও আকাশ রোদ্দুরে রাঙানো, কুয়াশারা গতকালের মতো জমতে শুরু করেনি। ঠান্ডা হাওয়াটা এখনো নামেনি পাহাড় থেকে। ওঁর মনে হল অতিরিক্ত গরম জামা কাপড় তাপসকে অস্বস্তি দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'মাঙ্কি ক্যাপটা খুলে ফেললে হয়তো আরাম লাগবে তোমার, খুলবে?'

একটু শঙ্কিত হল তাপস। সরু গলায় বলল, 'আন্টি বকবেন।'

'এখন খুলে বসো, যাওয়ার সময় আবার পরে নিও।'

ছেলেটি নিজে খুলতে পাবল না, জয়ন্তীকে হাত দিতে হল। ভীষণ দুর্বল ও, কাগজের মতো সাদা দেহে কোথাও শক্তি অবশিষ্ট নেই। অথচ চোখ দুটো কি দারুণ উজ্জ্বল। মাথার চুল চেপে বসে গিয়েছিল। জয়ন্তীর খুব ইচ্ছে করছিল কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে। কয়েকদিনের মধ্যে যে মরে যাবে তার সম্পর্কে সঙ্কোচ হওয়ার কোনও মানে হয় না। কিন্তু ছেলেটি যে আরাম বোধ করছে এটা বোঝা গেল। মুখের চেহারার পরিবর্তন হচ্ছিল ঘামে বাতাস লাগায়। মাঙ্কিক্যাপটা হাতে নিয়ে জয়ন্তী পাশের পাথরটা ওপর একটু আরাম করে বসলেন, 'এসো আমরা এবার গল্প করি। তুমি এখানে কতদিন এসেছ?'

প্রশ্নটা শুনে মনে-মনে হিসেব করতে চাইল তাপস। তারপর বলল, 'ঠিক বিরানব্বই দিন।' অবাক হলেন জয়ন্তী। এইভাবে দিন গুনতে কাউকে কখনও দেখেননি তিনি। স্বচ্ছন্দে তিনমাস বলতে পারত ও।

'আমি এসেছি এক সপ্তাহ হয়নি।'

'জানি।'

'কী করে জানলে? দারুণ অবাক হলেন জয়ন্তী।

'দেখেছি।'

'ও। তোমার কেমন লাগছে এই জায়গাটা?'

'ঠোঁট বেঁকাল তাপস, 'ভালো না।'

'সেকি! কেন!'

'আমি তো বাড়ি থেকে শুধু এই পর্যন্ত আসি।'

'তুমি আর কোথাও যাওনি? নিচে কত বিরাট মেলা হল, ওদিকে নদীর বুকটা কি চমৎকার। একটা গুম্ফা আছে ওপাশে যার ঘণ্টা বাজে মাঝে-মাঝে—। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে আসব। দেখবে, তোমার তখন এই জায়গাটাকে খুব ভালো লাগবে।'

'সত্যি আমাকে নিয়ে যাবে?' উৎসাহে উজ্জ্বল হল তাপসের মুখ।

ঘাড় কাত করলেন জয়ন্তী। এবং হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর কথা বলার ধরন যেন বদলে গেছে। দিল্লির ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক জয়ন্তী রায় নয়, পঁচিশ বছর আগের সেই বালিকার গলা যেন আচমকা শুনতে পেলেন তিনি। শুনে মজা লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এই নিরক্ত কিশোরটির সঙ্গে এইভাবে কথা বলাই স্বাভাবিক।

এবার কুয়াশারা জমতে শুরু করেছে পাহাড়ের মাথায়। খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে রোদ্দুরের চেহারা। জয়ন্তী মাঙ্কিক্যাপ এগিয়ে ধরলেন, 'এবার এটা পরে নাও।'

তাপস মাথা নাড়ল, 'না, এই ভালো লাগছে।'

'উঁহু, তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।'

'লাগবে না। তুমি আন্টির মতো কথা বলো না।'

হেসে বললেন জয়ন্তী, 'বেশ। শুধু আজকের দিনটায় পরো।'

অনিচ্ছায় আবার সেটাকে মাথায় চাপাল তাপস। জয়ন্তী তাকে সাহায্য করলেন।

'এবারে চলো, আমরা আস্তে-আস্তে ফিরে যাই।'

'না, আর একটু থাকব।'

'বাঃ, বিকেল হয়ে আসছে না?'

'সবাই তো বিকেলেই বেড়ায়। আমার বাড়িতে যেতে ভালো লাগে না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। একা-একা শুধু কান্না পায়।'

জয়ন্তী তাপসের কাঁধে হাত রাখলেন, 'চলো আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব কিছুক্ষণ।' দোনামনা করে রাজি হল তাপস। ওর সঙ্গে জোরে হাঁটা যাবে না। ধীরে-ধীরে ওঁরা তাপসদের বাংলোয় চলে এলেন। জয়ন্তী দেখলেন, একই প্যাটার্নের বাংলোগুলো সাজানো। কাঠের সিঁড়ি, সামনে চিলতে বাগান, কাঠের গেট। এটুকু হেঁটে আসতেই তাপস বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। গেট ধরে জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি ভেতরে আসবে না?'

এবার অস্বস্তিতে পড়লেন জয়ন্তী। ছেলেটির সঙ্গে সামান্য আলাপে বাড়ির ভেতরে যাওয়া শোভন হবে না। যদিও শুনেছেন আর কেউ এখানে নেই, তবু। জয়ন্তী হেসে বললেন, 'আজ থাক। কালকে আসব।'

'তাহলে আমি কার সঙ্গে গল্প করব?'

'তাই তো! কিন্তু তোমার বাবা যদি রাগ করেন!' কথা ঘোরাতে চাইলেন জয়ন্তী।

'বাবা!' শব্দটি উচ্চারণ করেই থমকে গেল তাপস। ওর চোখ এখন দূরে লেপ্টে আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন জয়ন্তী। একটা গাড়ি আসছে উঠে। তাপস বলল, 'বাবাকে আমি ভয় পাই না।'

'বেশ তাহলে কাল থেকে—।'

'আমি তোমার নামই জানতে পারিনি, কী বলে ডাকব তোমাকে?'

ঠিক সেই সময় গাড়িটা এসে থামল বাড়ির সামনে। এক প্রায়-বৃদ্ধ দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো তাপসবাবু, বেড়ানো হয়ে গেল?'

তাপসের ঠোঁটে সামান্য হাসি, মাথা কাত করল সে।

'গুড। চলো আমরা ভেতরে গিয়ে গল্প করি।' ভদ্রলোকের গলার স্বর শুনেই নার্স প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে তাপসের কাঁধে স্পর্শ করতেই সে বিরক্তির সঙ্গে হাতটাকে সরিয়ে দিল। জয়ন্তী এতক্ষণে বুঝে গেছেন ইনি ডাক্তার। ততক্ষণে ভদ্রলোক ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জয়ন্তীকে লক্ষ্য করছেন উনি, 'আপনি—। ও হ্যাঁ, আপনি তো এদিকের একটা বাংলোয় উঠেছেন। জার্নালিস্ট?'

'সেকি, আপনি জানলেন কী করে?'

'কী আশ্চর্য, এরকম একটা ছোট জায়গায় কোনও খবর চাপা থাকে?'

'আপনি তো ডাক্তার?'

'গুড গড! সেটাও কি আমার মুখে লেখা আছে?' কৃত্রিম চমকে উঠলেন ভদ্রলোক।

'না। আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে।'

চকিতে নিজের কোটের পকেটের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে স্টেথোটাকে একবার ছুঁলেন ডাক্তার, 'যাক, আমাদের তাপসবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার! খুব ভালো ছেলে তবে একটু অভিমানী।'

এরকম বিকেলে একা বসে থাকতেই ইচ্ছে করে না। ছায়ারা যত ঘন হয় তত বিষণ্ণ লাগে চারধার। জয়ন্তী নিজের বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে ফিরে এসে বসতেই আকাশ থেকে আলো নিবে গেল। এখানে সন্ধে হয় আচমকা। সূর্য ডুবে গেলেও এক ধরনের মায়াবী আলোয় মাখামাখি হয়ে কিছুক্ষণ পৃথিবী চুপচাপ অপেক্ষা করে। জয়ন্তী অনেকদিনের একটা পুরোনো চাপ বুকের মধ্যে নতুন করে অনুভব করলেন। সেটা কি তাপসের ওই রকম তাকানোর জন্যে, নাকি মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি তাকে দেখছে বলে? বুড়ি এসে দাঁড়াল পেছনের দরজায়, 'মেমসাব, চা আনব?'

ঘাড় কাত করলেন জয়ন্তী। তারপর চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। পঁচিশ বছর আগের সেই কিশোর চোখ দুটো এখন নিশ্চয়ই অনেক পোক্ত হয়েছে। সেই চোখের মালিক এখন কোথায় আছে কে জানে। ধীরে-ধীরে সময় পুরু হতে-হতে যে আস্তরণ ছড়িয়েছিল তা ভেদ করার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। সে থাকল কি থাকল না এখন আর কিছুই এসে যায় না। পনেরো বছর বয়সটা একসময় হাবুডুবু খেয়ে স্থির শক্ত হয়ে গেছে। চল্লিশে এসে তাকে নেহাতই শৈশবস্মৃতি বলে মনে হত। মাঝে-মাঝে সেই সময়ের চাপল্য অথবা দুঃখবোধের কথা ভেবে নিজেরই অবাক লাগত। তাহলে আজ কেন এমন লাগছে? একটি নিরক্ত কিশোরের চোখ এবং কথা এমন শিকড় ধরে টানছে কেন?

তারপর বেশ ভাব হয়ে গেল তাপসের সঙ্গে। আজও নার্স এসেছে ওকে নিয়ে। জয়ন্তী গেটে দাঁড়িয়েছিলেন, ওদের দেখে বেরিয়ে এলেন। নার্স বলল, 'আপনি ওকে জাদু করেছেন দিদি। সারাদিন আপনার কথা বকবক করছে।'

জয়ন্তী হাসলেন, 'কেমন আছো?'

তাপস সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল, ভালো। নার্স বলল, 'দিদি, আপনি ওকে পৌঁছে দেবেন? আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—।'

জয়ন্তী বললেন, 'বেশ তো। তুমি যেতে পারো।'

নার্স তাপসকে বলল, 'দিদির অবাধ্য হবে না। একদম ঠান্ডা লাগাবে না। রোদ পড়ে যাওয়ার আগেই চলে আসবে, বুঝলে?'

তাপস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নার্স চলে গেলে বলল, 'আমার একটুও ভালো লাগে না। সবসময় শাসন করে।'

'না, উনি তোমায় ভালোবাসেন তাই এসব বলেন।' জয়ন্তী বললেন, ' তোমার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'মোটেই না। আমার আজকে খুব ভালো লাগছে।'

'তাহলে চলো আমরা ওই কালভার্টটায় গিয়ে বসি। ওর তলায় একটা ছোট্ট ঝরনা বয়ে যায়।'

তাপস তাকাল। দূরত্বটা ওর পক্ষে বেশ দূরের। একটু নার্ভাস দেখাল ওকে, 'আমি ওখানে যেতে পারব?'

'কেন পারবে না? তুমি আমার হাত ধরো।' খুব সন্তর্পণে ওর সঙ্গে পায়ে-পায়ে হাঁটতে থাকলেন জয়ন্তী। ছেলেটির শরীর পাখির মতো হালকা। জয়ন্তীর একবার মনে হল ওকে কালভার্টের

কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা। কিন্তু তাপসের মুখ বেশ খুশি-খুশি। কয়েক পা হেঁটে সে বলল, 'আমি তোমাকে কী বলে ডাকব?'

জয়ন্তী বললেন, 'তোমার যা খুশি।'

'আমি তোমাকে নতুনদি বলব।'

'বাঃ, তোমার তো বেশ বুদ্ধি। আর কোনও দিদি আছে বুঝি?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল তাপস, তারপর উদাস গলায় বলল, 'আমার কেউ নেই।'

'ওকথা বলো না। তোমার বাবা আছেন না? আমার তো তেমন কেউ নেই।'

তাপস ওর মুখের দিকে তাকাল, তারপর নীচু গলায় বলল, 'তোমার খুব কষ্ট, না?'

জয়ন্তী বিব্রত হলেন। এ প্রশ্নের তিনি কী জবাব দেবেন?

কালভার্টে পৌঁছে ভীষণ খুশি হল তাপস। নীচে কুলুকুলু শব্দে শীর্ণ জলের ধারা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। ছোট নুড়ি পাথরগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মুখ তুললে গুম্ফাটা চোখে পড়ে। কতগুলো ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁক দিয়ে গুম্ফাটার শরীরে ঝোলানো ছোট ঘণ্টাগুলোর শব্দ বাতাস বয়ে আনছে। তাপসের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল জয়ন্তীর। নানান কথা যার হয়তো কোনও মানে নেই, সারাক্ষণ বকবক করে গেল দুজনে। জয়ন্তীর মনে হল তাপস যেন এতদিন পাথরচাপা ছিল, আজ হঠাৎ মুখ খোলা পেয়ে ফিনকি দিয়ে উঠেছে।

রোদ্দুরের রং পালটাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী আনমনে এক কলি গেয়ে ফেললেন। শুনেই তাপস বলল, 'বাঃ, তুমি তো বেশ সুন্দর গান করো!'

জয়ন্তী বললেন, 'এই ছেলে, ঠাট্টা হচ্ছে, না?'

'না, সত্যি বলছি।'

'তুমি গাইতে পারো না?'

'আমি? আমাকে কেউ কোনদিনও গান গাইতে বলেনি।'

'সেকি! গান তো নিজে থেকেই আসে। বেশ, আমি বলছি, তুমি গাও আমার সঙ্গে।' তাপসের পিঠে হাত রেখে জয়ন্তী একটা লাইন গাইলেন, 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা।' বললেন, 'গাও আমার সঙ্গে, আমার মতন করে।' তাপসের ঠোঁট কাঁপল। ক্রমশ ওর মুখচোখ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। জয়ন্তী লাইনটি বারংবার গাইতে লাগলেন ওকে সাহস দেওয়ার জন্যে। তাপসের সাদা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, নিচু গলায় সে গলা মেলাতে চেষ্টা করছিল। একটা নতুন ধরনের আনন্দে সে জয়ন্তীর হাত চেপে ধরতেই তিনি হঠাৎ শিহরণ অনুভব করলেন। সেই হাত এবং স্পর্শ যা কিনা পঁচিশ বছরেও মরে যায়নি। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন জয়ন্তী। তাঁর মুখ লাল শরীর অস্থির। তাপস ওঁর মুখ এবং আচরণে অবাক হয়ে গেল, 'কী হল নতুনদি?'

কোনওরকমে শক্তি ফিরিয়ে আনলেন, জয়ন্তী, 'কিছু না। চলো, ওঠা যাক। ঠান্ডা পড়তে শুরু করছে।'

'না, আর একটু বসো। আমার এখানে বসতে খুব ভালো লাগছে।'

'উঁহু, ওঠো।'

'আর একটু বসো না, তোমার পাশে আর একটু বসব।'

এই সময় দূরে গাড়ির শব্দ উঠল। জয়ন্তী মুখ ফিরিয়ে দেখলেন ডাক্তারবাবু আসছেন। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা, 'আরে তাপসবাবু, তুমি আজ এতদূর এসে পড়েছ? ফাইন!'

জয়ন্তী একটু বিব্রত গলায় বললেন, 'আমারই দোষ, এতদূরে আনা—।'

'না-না, দোষ বলছেন কেন? এইটে ওর প্রয়োজন ছিল। দেখুন তো, ওর মুখের চেহারা পালটে যাচ্ছে। আমরা ওষুধে যা পারি না তা মনের পরিবর্তনে অনেক সময় সম্ভব হয়। তবে আর দেরি নয়, এখনই টুপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। আপনারা বরং আমার গাড়িতে উঠে

আসুন। এসো তাপসবাবু।'

জয়ন্তী বললেন, 'এইটুকু পথ, আমি না হয় হেঁটেই ফিরছি।'

'আরে আসুন তো!' দরজা খুলে দিলেন ডাক্তার।

প্রথমে খুব সন্তর্পণে তাপসকে বসিয়ে নিজে উঠলেন জয়ন্তী। গাড়ি চলতে শুরু করলে ডাক্তার বললেন, 'খুবই অবিশ্বাস্য। তিনদিন আগেও ভাবতে পারিনি ও এতটা হাঁটতে পারবে।'

কথাটা ইংরেজিতে বললেন তিনি। তাপস ইংরেজি জানে কিনা বুঝতে পারলেন না জয়ন্তী। তাই অনেক জিজ্ঞাসা থাকা সত্ত্বেও চুপ করে বসে রইলেন। ওঁর বাংলোর সামনে গাড়ি থামলে নেমে দাঁড়ালেন, 'ধন্যবাদ।'

ডাক্তার হেসে আবার ইঞ্জিন চালু করলেন। জয়ন্তী দেখলেন, 'তাপসের চোখে কাতরতা। আর দাঁড়াতে পারলেন না জয়ন্তী। এক দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন বালিশে মুখ গুঁজে। এই মুহূর্তে তিনি স্পষ্ট জানেন না কেন এমন শরীর কাঁপিয়ে কান্না আসছে। পঁচিশ বছরে এমনভাবে কখনও কাঁদেননি তিনি!

পরদিন মেঘলা ছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জয়ন্তী। হাতের স্পর্শে ঘুম ভাঙল। চমকে উঠে বসতে-বসতে হেসে ফেললেন, 'ওমা, তুমি কখন এসেছ?'

দরজায় নার্সটি দাঁড়িয়ে, 'কিছুতেই ছাড়বে না, আপনার কাছে আসবেই। দুদিনে বাবু যেন সেরে উঠেছেন। তারপর আজ সকালে ডাক্তারবাবু বলে গেছেন যে আপনার কথা শুনতে। ব্যাস, একদম সাপের পাঁচ পা দেখেছে।'

জয়ন্তী হাসলেন। প্রশ্রয় বোধহয় একেই বলে। বললেন, 'এই ছেলে, বসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

অগোছালো চুল দু-হাতে জড়িয়ে খোঁপা করে নিলেন তিনি। নার্সটি বলল, 'আমি তাহলে যাই দিদি?'

ঘাড় কাত করলেন জয়ন্তী।

নিশব্দে ফিরে গেল নার্সটি। সেদিকে তাকিয়ে তাপস বলল, 'আমার সঙ্গে বেড়াতে হয় না বলে আন্টি খুব খুশি হয়েছে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন জয়ন্তী। নার্সটি দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাই? কেন?'

'সুনীতদার সঙ্গে গল্প করতে পারে না বেরোতে হলে।'

'সুনীতদা কে?'

'কম্পাউন্ডার। আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে আসে।'

'তুমি রোজ ইঞ্জেকশন নাও?'

'না। তবু আসে। যখন ইঞ্জেকশন দিতে হয় না তখন এলে কারও সামনে বের হয় না, এমনকি ডাক্তারবাবু এলেও না।'

'ও।'

জয়ন্তী বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটাকে কীভাবে এড়ানো যায়।

'জানো নতুনদি, ওরা নিজেরা থাকলে অনেক কথা বলে, আমি থাকলে চুপ করে যায়। কী কথা বলে ওরা?'

জয়ন্তী বললেন, 'তা আমি কী করে জানব? ওরা হয়তো খুব বন্ধু।'

'যাঃ, ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়?'

এই অপাপবিদ্ধ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হল জয়ন্তীর, আর পাঁচটা ছেলের মতো স্বাভাবিকতা এর মধ্যে আসেনি। আলনা থেকে কাপড় টেনে নিয়ে জয়ন্তী বললেন, 'বাঃ কেন হবে না?'

'তোমার ছেলে বন্ধু আছে?'

'আমার?' জয়ন্তী শক্ত হতে গিয়ে সামলে নিলেন, 'উঁহু।'

'তবে?'

'বাঃ, আমার নেই বলে আর কারও হবে না?'

'জানো নতুনদি, আন্টি না সুনীতদাকে চুমু খায়। আমি দেখেছিলাম বলে খুব রেগে গিয়েছিল সুনীতদার ওপরে। ছেলে বন্ধুকে চুমু খেলে কি অন্যায়?'

কী বলবেন জয়ন্তী। মজা করতে ইচ্ছে হল, 'না, অন্যায় হবে কেন?'

'আমি তোমার বন্ধু হলে আমাকে চুমু খাবে তুমি?'

জয়ন্তী মুখ তুলে তাকালেন। সমস্ত শরীরে সেই কাঁপুনিটা ফিরে এল। মুখ নামিয়ে বললেন, 'আগে সত্যিকারের বন্ধু হও—।'

'আমি তোমার সত্যিকারের বন্ধু হব নতুনদি, তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না তো?'

হাত বাড়িয়ে ওর চুলে আঙুল রাখলেন জয়ন্তী, 'তুমি বড় ভালো ছেলে।' নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। তারপর কাপড়টাকে আবার আলনায় রেখে দিয়ে বললেন, 'নাঃ, আজ আর বেরোব না। এসো আমরা বারান্দার বেতের চেয়ারে গিয়ে বসি।'

'সেই কালভার্টের কাছে যাবে না?'

'উঁহু, তার চেয়ে এসো আমরা বারান্দায় বসি।'

'তুমি গান গাইবে?'

'আমি? গাইতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে গাও।'

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল তাপস। জয়ন্তীর মনে হল ওকে আজ আর অসুস্থ বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।

গতকাল বিকেলে বেড়ানো হয়নি। জয়ন্তী আজ সাততাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। বারান্দার রেলিং-এ ভর রেখে সামনের পাহাড় দেখতে-দেখতে তাঁর জায়গাটাকে আরও বেশি ভালো লাগল। এখানে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। ভাবতে গিয়েই হাসি এল। বহু ব্যবহারে সব কিছুই ঘষা আধুলির মতো হয়ে যায়। জয়ন্তী ডান দিকে মুখ ঘোরাতেই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তাপস আসছে। কিন্তু নার্স নয়, আজ ওর সঙ্গে যে ভদ্রলোক তাঁর হাঁটার ভঙ্গিটি সদর্পের। এই কি সেই সুনীতদা? মন বলল, না। আজ কী বার? নিশ্চয়ই ইনি তাপসের বাবা। কোনও কারণ নেই এটা বুঝতে পারছেন তবু জয়ন্তীর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। একবার ভাবলেন ভেতরে চলে যান। কিন্তু ওরা যে তাঁকে দেখে ফেলেছে, কারণ ভদ্রলোকের মুখ এদিকেই।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। কিন্তু তাপসের মুখ নামানো। ভদ্রলোক কথা বলছেন খুব কম। লম্বা, মেদহীন একটু পোড়খাওয়া চেহারা। জয়ন্তীর মনে হল, ইনি সেই রকম মানুষ যিনি নিজের অনেক অভিজ্ঞতা সযত্নে চেপে রাখতে জানেন। তাপস বাংলোর কাছাকাছি এসে মুখ তুলল। তুলেই নামিয়ে নিল। ঠিক নীচে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তারপর সহাস্যে দু-হাত জড়ো করে বললেন, 'নমস্কার। আমি সুভাষ সেনগুপ্ত। এবার এসে আপনার নাম সবার মুখে শুনছি।'

দুহাত যুক্ত করে নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন জয়ন্তী। ওঁরা এখনও দাঁড়িয়ে অতএব অনিচ্ছে সত্ত্বেও নীচে নেমে এলেন তিনি। গেট খুলে বাইরে এসে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল তাপস, ভালো। ছেলেটি বারংবার তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে কিন্তু হাবভাবে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। সুভাষ বললেন, 'ডাক্তার বললেন, আপনার সঙ্গে মেশার পর ওর স্বাস্থ্যের অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'ছি-ছি, একি কথা বলছেন!' সত্যি লজ্জিত হলেন জয়ন্তী।

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি। গত সপ্তাহে আমি ওকে নিয়ে এতটা আসব ভাবতেই পারিনি। কিন্তু শুনলাম আপনার সঙ্গে খোকা কালভার্ট অবধি গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি ঘটনা। প্রতি সপ্তাহে ওকে ব্লাড দিতে হয়। আজ সকালে ডাক্তার অবাক হয়েছেন। ওঁর মনে হচ্ছে আরও কদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। এর একমাত্র কারণ ও আপনার সঙ্গে মেলামেশা করে একধরনের মানসিক আনন্দ পেয়েছে। আপনি জানেন না মি...।'

'জয়ন্তী রায়।'

'আপনি জানেন না জয়ন্তী দেবী, এতে আমি কী রকম স্বস্তি পেয়েছি।'

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন।'

সুভাষ হাসলেন, 'চলুন, একটু হাঁটা যাক।'

জয়ন্তী আপত্তি করলেন না। দুপা হেঁটে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার, তুমি আজ চুপচাপ কেন?'

তাপস মুখ ঘুরিয়ে নিল। জয়ন্তীর এটা ভালো লাগল না। খুব ধীরে হাঁটছে ওরা। সুভাষ বললেন, 'ও চিরকালই এরকম। ওর মা তো জন্ম দিয়েই মুক্তি নিলেন। ঝি-চাকরের হাতে মানুষ হওয়ায় কারও সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়নি। তারপর গত কয়েকবছর ধরে তো এই বিপদ। কথাই বলতে চায় না। আর পাঁচটা ওই বয়সের ছেলের তুলনায় তাই মানসিক ডেভলপমেন্ট হয়নি।'

'না, একথা ঠিক নয়। তাপস আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে।' জয়ন্তী সস্নেহে তাপসের দিকে তাকালেন। তাপস দৃষ্টি ফেরাল না।

'কথা বলে? স্ট্রেঞ্জ। সত্যি ওর অনেক কিছু বদলে দিয়েছেন আপনি। আমি একা মানুষ হয়তো ঠিক ওর যত্ন নিতে পারি না। চাকরি বাঁচিয়ে ছুটে আসি প্রত্যেকবার ভয় নিয়ে, কী জানি কী দেখব। এবার এসে অবাক হলাম।'

'আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন!' জয়ন্তীর চোখ ছিল তাপসের দিকে। ওর কপালে এই ঠান্ডায় গুড়ি-গুড়ি ঘাম। হঠাৎ মনে হল তাপসের যেন কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত ওর হাত ধরলেন তিনি, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

কথা না বলে মুখ নামাল তাপস। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে একটু বসে জিরিয়ে নেবে?'

সবেগে মাথা নাড়ল তাপস, মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ বের হল। ঘাড় শক্ত, জেদি ভঙ্গি। জয়ন্তী সুভাষকে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওর শরীরটা ঠিক নেই।'

'সুভাষ কাছে এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে? খারাপ লাগছে?'

'আমি বাড়িতে যাব।' তাপস যেন কোনওরকমে বলতে পারল।

ওরা কেউ আর কথা বলল না। ধীরে-ধীরে ফিরে চলল। নিজের বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে জয়ন্তী বললেন, 'আমি চলি।'

সঙ্গে-সঙ্গে তাপস চোখ তুলে তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। সুভাষ বললেন, ' সেকি, এখনও তো বিকেল যায়নি। শুনেছি আমার ওখানে একবারও যাননি, আজ আসুন।'

অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হল না। তাছাড়া তাপসের জন্যও দুশ্চিন্তা ছিল। ছেলেটার আজ হঠাৎ এমন পরিবর্তন হল কেন?

বারান্দায় উঠেই জয়ন্তীর মনে হল অযত্ন শব্দটাকে কেউ চারপাশে সাজিয়ে রেখেছে এখানে। নার্স বেরিয়ে এসেছিল, সুভাষ বললেন, 'ওর শরীরটা ঠিক নেই। জামাকাপড় চেঞ্জ করিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। ডাক্তার তো এখনি আসবেন। আর আমাদের কফি দিতে বলো।'

জয়ন্তীর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাপসের কাছে কিছুক্ষণ বসেন। কিন্তু সুভাষের কথা বলার ধরনে

সঙ্কোচ হল। বন্ধ জানলার সামনে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলেন ওঁরা। সামনে পাতলা লাল-হলুদ-গোলা রোদ। সুভাষ বললেন, 'আপনি দিল্লিতেই থাকেন? কোথায়?'

'পুসা রোডে।'

'ও। দিল্লিতে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে। এখন তো আর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি কোন কাগজে আছেন?'

'ডেইলি সান।'

'বেশ ভালো চাকরি আপনাদের।'

'ওই আর কি!'

'আমি এখন ওই ছেলের কাছে দায়বদ্ধ। ওর মা চলে গেছেন কতদিন হল, আর এ তো যাওয়ার মুখেই।'

সুভাষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'এই প্রথম এসে আমি স্বস্তি পেলাম। ওর মুখে এই প্রথম রক্ত দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। সত্যি, আপনি ওকে জীবন দিয়েছেন। আপনি না এলে খোকা বাঁচত না।'

জয়ন্তী এইরকম কথায় খুব স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ভদ্রলোক যেন বারবার তাঁকে জড়াতে চাইছেন। যেটা ছিল তাঁর এবং তাপসের সহজ ব্যাপার সেটার ওপর একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যেন। হঠাৎ ডানদিকে চোখ ফেরাতেই আঁতকে উঠতে গিয়ে সামলে নিলেন জয়ন্তী। পেছনের জানলার কাচে একটা সাদা মুখ লেপ্টে ছিল এতক্ষণ। চোখ দুটো পাথরের মতো তার দিকে স্থির। তিনি তাকাতেই ছবিটা ভেঙে গেল। চট করে মুছে গেল জানলা থেকে। সুভাষ ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'কী হল?'

জয়ন্তীর তখন বুকের মধ্যে দম আটকানো অনুভূতি। সেই চোখ দুটো যেন বসে যাচ্ছে গভীরে। কোনওক্রমে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি যাই।'

'সে কি! কী হল আপনার?' সুভাষ বিস্মিত।

'কিছু না। আমি—। শরীরটা—।' জয়ন্তী অনেক দিন পরে এমনভাবে কথা বললেন।

'কিন্তু কফি হচ্ছে, কফি খেয়ে যান।'

'মাপ করবেন। আর একদিন হবে।'

বুঝতে পারছেন এটা অভদ্রতা এবং এতদিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে যা তিনি কখনও করেননি তাই আজ করলেন। সুভাষকে গেটে দাঁড় করিয়ে রেখেই দ্রুত ফিরে চললেন নিজের বাংলোয়। প্রতিবার তিনি পা ফেলছেন আর যেন মনে হচ্ছে আরও যদি দূরত্ব বাড়ানো যেত!

নিজের বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ শোওয়ার পর বুক শান্ত হল। না, সত্যি আজ অন্যায় ব্যবহার হয়ে গেল। সুভাষবাবু যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন। অসুস্থ ছেলের বাবা হিসেবে ওঁর কথাবার্তা সঙ্গত। কিন্তু তাপসের চোখদুটো অমন জ্বলছিল কেন? কেন ও বেড়াতে বেড়িয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখছিল? কেন অমন চোরের মতো তাঁকে দেখছিল সে কাচের আড়াল থেকে। পঁচিশ বছর আগের সেই জেদি অভিমানী দৃষ্টিটাকে আজ নতুন করে দেখতে পেয়ে সব বেসামাল হয়ে গেল তাঁর। জয়ন্তী উঠে বসলেন। বাইরে এখন সন্ধের আঁধার। তির তির করে ঠান্ডার মেজাজ বাড়ছে। হঠাৎ জয়ন্তী সিদ্ধান্ত নিলেন, কাল সকালের বাসেই তিনি ফিরে যাবেন, এখানে আর একদিনও নয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বলে দিয়েছেন খাওয়ার সময়। টাকাপয়সা মিটিয়ে দেবেন সকালে। সাতটায় নীচের বাজার থেকে প্রথম বাস ছাড়ে। আলো জ্বেলে বই পড়ার চেষ্টা করছেন, এমন সময় মেয়েলি গলা পাওয়া গেল। কেউ তাঁকে ডাকছে।

দরজা খুলেই নার্সটিকে দেখতে পেলেন, 'দিদি, ডাক্তারবাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন। আপনি এক্ষুনি চলুন।'

'কেন, কী হয়েছে?' হৃৎপিণ্ড বুঝি গলায় আটকে গেল।

'খোকা খুব অসুস্থ।'

আর দাঁড়ালেন না জয়ন্তী। আলনা থেকে একটা শাল টেনে নিয়ে ছুটলেন তিনি। প্রায় এক দৌড়েই তাপসের ঘরে পৌঁছে গিয়ে থমকে গেলেন জয়ন্তী। খাটের ওপর দুতিনটে কম্বল গায়ে চাপিয়ে তাপস শুয়ে আছে। ডাক্তারের হাতের মুঠোয় ওর কব্জি। তাপসের চোখ বন্ধ। মুখ যেটুকু বেরিয়ে আছে তাতে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। মৃত্যু এবং জীবন এই মুহূর্তে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সুভাষ ওর পায়ের কাছে বসে কাতর চোখে তাকালেন। ডাক্তার হাতটি নামিয়ে ওঁকে দেখলেন, 'যাক, আপনি এসে গেছেন! যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আপনার নাম শুনতে হয়েছে আমাদের।'

ধীরে-ধীরে ওর মাথায় পাশে এসে বসলেন জয়ন্তী। কাঁপা হাত ওর কপালে রাখতেই মনে হল বরফের স্পর্শ পেলেন, 'কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না। সকালে দেখলাম খুব ইম্প্রুভড। সন্ধে থেকে এমন খারাপ হল কি করে কে জানে! ব্লাড চেঞ্জ করতে হবে ইমিডিয়েটলি। আজকের রাত যদি কোনওমতে কেটে যায় তবেই ভালো। কাল সকালের আগে ওটা করা যাবে না। আমি আর একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।'

সুভাষ বললেন, 'হাঁটাচলায় কি—।'

'নো নো। মনে হচ্ছে মেন্টালি আপসেট। আপনারা কেউ কি ওকে কিছু বলেছেন?'

'না।' দৃঢ় গলায় প্রতিবাদ করলেন সুভাষ, 'এ কি কথা বলছেন?' তারপরেই যেন কিছু মনে পড়ায় জয়ন্তীর দিকে তাকলেন।

এগারোটা বেজে গেল। এখন নিশিরাত। তাপসের দু-চোখ বন্ধ। অনিয়মিত নিশ্বাস পড়ছে। ডাক্তার উঠলেন, 'মনে হচ্ছে রাতটা শান্তিতেই কাটবে। আমি ভোরেই চলে আসছি। আপনি আর বসে কী করবেন? এখন ও ঘুমুক।'

ধীরে-ধীরে চুল থেকে হাত সরিয়ে নিল। এতক্ষণ কি জয়ন্তী তাঁর মধ্যে ছিলেন? দ্রুত সামাল দিলেন নিজেকে। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে ঘরের বাইরে আসার আগে আর একবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তাপস নিস্পন্দ।

সুভাষ বেরিয়ে এলেন সঙ্গে। ডাক্তারের গাড়ি বেরিয়ে গেলে বললেন, 'চলুন, আমি আপনাকে এগিয়ে দিই।'

জয়ন্তী ঘাড় নাড়লেন, 'না। আপনি বরং ওর কাছে থাকুন।'

সুভাষ ইতস্তত করলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন এমন হল।'

জয়ন্তী বললেন, 'কিছু হবে না। ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে।'

সুভাষ মুখ তুললেন, 'আপনাকে আমি আজই দেখলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি থাকলে আমার মন জোর পাবে।'

চকিতে শক্ত হয়ে গেলেন জয়ন্তী। তারপর সুভাষকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে গেলেন। এখন এই শীতের কোনও অনুভূতি তাঁর আসছে না।

ঘুম আসছে না। জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। জয়ন্তী চোখের পাতা বন্ধ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। বন্ধ করলেই সেই মুখ, যা কিনা পঁচিশ বছর আগে মিলিয়ে গিয়েছিল তা বেঁচে উঠে সেই চাহনি নিয়ে ফিরে আসছে। এখনও হাতের আঙুলে তাপসের কপালের হিমস্পর্শ, ছটফট করতে লাগলেন জয়ন্তী। ও কি মরে যাচ্ছে? ডুকরে একটা কান্না উঠে এল। কেন হয় এমন? কেন তিনি নিজেকে কপট করতে পারলেন না?

বন্ধ জানলার বাইরে অন্ধকার স্থির হয়ে আছে। আকাশের এক কোণে নবমীর চাঁদ মেঘে

জড়ানো। একটু সরে আসতেই লাইটহাউসের মতো আলোটা চোখে পড়ল। ওটা যে সুভাষবাবুদের বাংলো এখন বুঝতে অসুবিধে নেই। আশেপাশের কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না। সুভাষবাবুদের অন্য ঘরগুলোতেও আলো নেই। শুধু আলো জ্বলছে যেখানে সেখানে একটি শরীর কম্বলের তলায় স্থির হয়ে রয়েছে। শরীরের সব রক্ত দ্রুত মরে যাচ্ছে তার। এই দূরে একা বসে জয়ন্তীর সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চোখ সরাচ্ছিলেন না জয়ন্তী, একটা চেয়ার টেনে বসে সেই আলোটিকে আঁকড়ে ধরলেন যেন।

এখন কত রাত জানা নেই। বসে থাকতে-থাকতে কখন ঘুম জুড়ে বসেছিল চোখে টের পাননি। শব্দটা কানে আসতেই চেতনা এল। ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ। একবার হয়েই থেমে গেলেও জয়ন্তীর কানে লেগে রয়েছে। দূরের সেই আলোটা এখন অস্পষ্ট কুয়াশায় মাখামাখি। শব্দটা কোথায় হল? জয়ন্তীর মনে ভয় এল। তিনি চাপা গলায় বৃদ্ধাকে ডাকলেন। কোনও সাড়া এল না। চেয়ার ছেড়ে দরজার পাশের জানলার পরদা সরালেন। কুয়াশা বা হিমবাতাস জল জমিয়ে দিয়েছে জানলার কাচে। খানিকটা মুছে নিতেই বারান্দাটা নজরে এল। নবমীর চাঁদ বুঝি এখন মাথার ওপরে। তার ফিকে আলোয় ভীষণ মায়াবী মনে হচ্ছে চারধার। আর তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল একটা সাদা নগ্ন হাত কাঠের সিঁড়ির মুখে বারান্দায় নেতিয়ে আছে। চিৎকার করে উঠলেন জয়ন্তী। অন্য কোনও ভাবনা এল না, পাগলের মতো ছুটে এলেন দরজা খুলে।

সিঁড়িতে অর্ধেক দেহ, অর্ধেকটা বারান্দায়, একটা হাত প্রসারিত, তাপস চেতনা হারিয়ে পড়ে আছে। গায়ে গরমজামা নেই। কম্বলের তলায় যে অবস্থায় শুয়েছিল সেই অবস্থায় পড়ে আছে এখানে। চাপা আর্তনাদ করে হাঁটু মুড়ে বসে জয়ন্তী ওকে জড়িয়ে ধরলেন। দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা আর্ত চিৎকার তাঁর বুক নিংড়ে ছিটকে এল। সেই শব্দে চোখ খুলল তাপস। ঠোঁট নড়ল। কিছু কী বলছে ও? জয়ন্তী নিজের উত্তপ্ত মুখ ওর গলার কাছে নিয়ে কান পাতলেন ঠোঁটে। জড়ানো গলায় ঘড়ঘড়ে শব্দ কিন্তু স্পষ্ট যেন শুনতে পেলেন জয়ন্তী, 'তুমি আমার বন্ধু।' শেষটা হয়ত কানে আসেনি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন সবটা। নিজের উষ্ণ ঠোঁটে শীতল স্পর্শ লাগতেই উন্মাদিনী হয়ে গেলেন জয়ন্তী। হয়তো বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কান্নাটা কিংবা তাপসের শরীরের শীতলতাকে দূর করতে চুম্বন করতে লাগলেন ওর গালে ঠোঁটে গলায়।

দুহাতের বাঁধনে তাপসের নিথর শরীর। একে টেনে নিয়ে ঘরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। জয়ন্তীর মাথায় কিছু এল না। পাগলের মতো চুম্বন করে যেতে লাগলেন ওই নিথর শরীরে। মুখ তুলতে তাঁর এখন ভীষণ ভয় করছিল। তাপসকে উত্তাপে ভরিয়ে দিতে নিজের শরীরকে নিংড়ে দিতে চাইছিলেন জয়ন্তী। ওই হিম নতুন করে সইবেন কী করে, এই চল্লিশ বছর বয়সে?



জন্ম বৃত্তান্ত

'একটু আস্তে হাঁটো।'

'ঠিক আছে।'

'উঁহু, ঠিক নেই। অত জোরে হাঁটা এই সময় ঠিক নয়। বরং চলো, ওই বেঞ্চটায় বসি।'

'না, ওখানে কে একজন বসে আছে।'

'থাকুক, তাতে আমাদের কী এসে গেল। আজ অনেক হাঁটা হয়েছে।' সুনীত নীপার হাত

ধরতে চাইলে সে ছাড়িয়ে নিল। এখন রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। শীতের আকাশটা ময়লাটে। চারধারে একটা ধোঁয়াটে ভাব। সুনীত দেশবন্ধু পার্কের মাঝখানে যে ফিনফিনে অন্ধকার সেখানে চোখ রাখল, 'শালা, উত্তর কলকাতায় বেড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। আমাদের গাড়ি থাকলে তোমায় গড়ের মাঠ কিংবা লেকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম।'

'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।' নীপা চাপা গলায় বলল।

'আদিখ্যেতা! এটা আদিখ্যেতা হল? ডাক্তার তোমাকে রোজ বেড়াতে বলেনি?'

'ওসব ডাক্তাররা বলেই থাকে। তুমি এমন করছ যেন আর কারও—'

নীপা কথাটা শেষ করল না। ওরা বেঞ্চির কাছে এসে গিয়েছিল। একজন বৃদ্ধ বিহারী সেখানে বসে আছে দেখে সুনীত নিশ্চিন্ত হল। এই সময় বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে নীপার অসুবিধে হয়। সুনীত ঠিক করল দশ মিনিট বসেই বাড়ি ফিরবে। এখান থেকে ওদের ফ্ল্যাট বেশি দূরে নয়। টু-রুম ফ্ল্যাটটার একটাই সুবিধে, সুন্দর দক্ষিণমুখো ব্যালকনি আছে। ইদানিং নীপা বিকেলে বেরুতেই চায় না। রাস্তার লোকরা নাকি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। সেটা অবশ্য সুনীতেরও চোখ এড়ায়নি। ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তখন। কিন্তু কিছু করার নেই। মানুষ তার অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা খুব দ্রুত ভুলে যায়।

এই সময় নীপার কাছে কারও থাকা উচিত। এখন অফিসে বসে খুব চিন্তা হয়। সুনীতের মা নেই, দিদিরা দিল্লিতে। দূরসম্পর্কের এমন কোনও আত্মীয়া নেই যাকে এই সময় আনা যায়। আর নীপা তো ওর বাপের বাড়িতে যাবেই না। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবার পর তাঁরাও সম্পর্ক রাখেননি। এতদিন কোনও মুশকিল হয়নি। বরং কেউ নেই বলে খুব ভালো লাগত। শুধু অফিসটুকু ছাড়া ওদের ছাড়াছাড়ি হয় না। নীপাকে এই দুবছর ধরে দারুণ ভালোবেসেছে সুনীত। সে সময় আর কারও উপস্থিতি অসহ্য হত।

'এই, তুমি রোজ-রোজ অত ফলমূল আনবে না।' নীপা চাপা গলায় বলল।

'কেন?'

'বড্ড বেশি খরচ করছ। সামনে আরও বড় খরচ আসছে।'

'সে আমি বুঝব। ডাক্তার সেন বলেছেন এই সময় মেয়েদের শরীরে রক্ত কমে যায়। অ্যানিমিয়া হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না।'

'আমি কি না খেয়ে আছি? আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে।'

সুনীত নীপার হাতটা ধরল, 'উঁহু অ্যাদ্দিন তুমি নিজের জন্য খেতে আর এখন আর একজনের কথা ভাবতে হবে।'

নীপা সঙ্গে-সঙ্গে চিমটি কাটল, 'অসভ্য!'

সুনীতের ব্যথা লাগলেও হাসলো, 'যাই বল, যত দিন যাচ্ছে তুমি সুন্দর হচ্ছো।'

'ছাই! নীপা মুখ তুলে আকাশ দেখল, 'আচ্ছা, আমি যদি নার্সিংহোম থেকে না ফিরি তাহলে তুমি ওকে ভালোবাসবে?'

সুনীত মুখ ফিরিয়ে নিল। সম্প্রতি এই এক বুলি হয়েছে। শুনলেই বুকের মধ্যে ক্ষরণ শুরু হয়ে যায় সুনীতের। প্রথম-প্রথম প্রবল প্রতিবাদ করত, এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি যদি না ফিরি তাহলে এই শাড়িগুলোর কী হবে? আমি যদি না ফিরি তাহলে এই খাটে প্লিজ শুয়ো না; এই শোনো, আমি যদি না ফিরি তুমি আবার বিয়ে করবে? এইসব শুনতে-শুনতে এক ধরনের বিষাদে ডুবে যায় সুনীত। মাঝে-মাঝে মনে হয় এইসব শুনতে হবে জানলে কে সন্তান চাইত! কিন্তু শোনার জন্যেই বোধহয় মাঝে-মাঝে সুনীতেরও মনে হয় যদি তেমন ঘটনা ঘটে? কী করে সহ্য করবে সে? নীপা নেই একথা ভাবা যায় না। কাগজপত্রে পড়েছে এখন শিশুমৃত্যুর হার খুব কম এবং মায়েরা হাজারে একজন দুর্ঘটনায় পড়ে। সেই একজন যদি নীপা হয়!

সুনীত উঠল, 'চলো।'

অদ্ভুত সুন্দর হাসল নীপা, 'রাগ করলে?'

'না, কথাটা শুনতে আমার খুব ভালো ল্যাগল।'

'তোমরা ছেলেরা সব পারে। আমার মেসোমশাই মাসিমা মারা যাওয়ার ছ মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করেছিলেন। ছোট বাচ্চা থাকলে তাকে দেখাশোনার দোহাই দেয় সবাই।'

'সে যে করে সে করে, আমাকে দলে ফেলছ কেন?'

নীপা উঠল। তারপর খুব ধীরে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'নাগো, তোমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু ভয় হচ্ছে খুব।'

'কেন?'

'কদিন আগে যেন মনে হল কিছু নড়ছে।'

'কোথায়?'

'আঃ, কোথায় আছে জানো না?'

সুনীত থতমত খেল। নীপার শরীরের সব কিছু সে জানে। কোথায় হাত রাখলে কাতুকুতু লাগে, কোথায় হাত দিলে আরাম পায়—সব। কিন্তু এই কথাটা জানা ছিল না তো! সে একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'ডাক্তারকে বলেছ?'

'তখন হয়েছিল নাকি? খুব সামান্য।'

'উঁহু ভালো কথা নয়। এখনই নড়ানড়ির কী আছে!'

'রাখো তো! তুমি কিছু জানো যে মাথা ঘামাচ্ছে! পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমা বলেছেন এই সময় নাকি শুরু হয়।'

'কালকেই চলো ডাক্তার সেনের কাছে।'

'এখনও তো মাস শেষ হয়নি।'

'তা হোক।'

প্রত্যেক মাসের এক তারিখে সুনীত নীপাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সেই তৃতীয় মাস থেকে এই চলছে। ডাক্তার সেনের মুখটা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা অবশ্য চিনচিন করে। ব্যাটা প্রণবের পাল্লায় পড়ে এই দুরবস্থা। এমন করে প্রশংসা করতে লাগল ডাক্তারের যেন ধন্বন্তরি। নিজেরই নার্সিংহোম, কোনও অসুবিধে নেই। তা অবশ্য সুনীতদের ফ্ল্যাট থেকে নার্সিংহোম রিকশায় মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু ওর ইচ্ছে ছিল কোনও মহিলা গাইনিকে দিয়ে কাজটা করায়। নীপাও তাই চেয়েছিল। প্রথম দিন ডাক্তার সেনের কাছে গিয়ে নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ভিজিটার্স রুমে অন্তত গোটাদশেক মা-হতে যাওয়া মহিলা অপেক্ষায় ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা রয়েছেন। শরীরের গড়নের জন্যে তৃতীয় মাসে নীপাকে কিছু বোঝা যায়নি। কিন্তু ওদের মধ্যে বসে থাকতে রীতিমতো অস্বস্তি হচ্ছিল। টেবিলের ওপর জড়ো করা ম্যাগাজিনের একটা তুলে নিয়ে আড়াল করেছিল নিজেকে। আর মজার ব্যাপার, ওইসব মহিলারা সবাই নীপা এবং ওকে দেখছিলেন। ডাক্তার সেনের ঘরে যখন ডাক এল তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে।

ঘরের ভেতর নীলচে আলো এবং মোটাসোটা নার্স। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ডাক্তারের বয়স এবং বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা। চশমার আড়ালে চোখ দুটো বেশ ঝকঝকে এবং ঠোঁটে সর্বদাই হাসি ঝোলানো। ওদের বসতে বলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন?'

সুনীত নীপার দিকে তাকাল। মুখ নামিয়ে বসেছে ও। সুনীত গলা পরিষ্কার করল, 'আমাদের দুবছর বিয়ে হয়েছে, এই প্রথম!'

'আচ্ছা! কী নাম আপনার?'

স্লিপে সুনীত নিজের নাম লিখেছিল। ডাক্তারের প্রশ্ন যদিও নীপার উদ্দেশ্যে কিন্তু সে চটপট

জবাব দিল, 'নীপা মিত্র।'

ডাক্তার একবার সুনীতের দিকে তাকিয়ে আবার নীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেষ কবে?'

নীপা মুখ তুলছিল না। ডাক্তার সেন হাসলেন, 'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনি নিঃসঙ্কোচে কথা বলুন।'

সুনীত উত্তর দিল, নিজেই সময়টা জানিয়ে দিল। সেটা শোনার সময় কি ডাক্তারের মুখে একটু বিরক্তির ভাঁজ পড়েছিল। বোঝা যায় নি, সুনীত কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে ডাক্তারকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। তারপর কয়েকবার নিয়মিত ব্যবধান শুধু যাওয়া আসা। পরের দিকে নীপা অনেকটা স্বচ্ছন্দ। ডাক্তার বেশ জমিয়ে কথা বলেন। ওঁরই নার্সিংহোমে নীপার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু শেষবার সুনীতকে বেশ অস্বস্তি নিয়ে ফিরতে হয়েছে। নীপাকে একটি মেয়েলি প্রশ্ন করতে বেচারা থতমত হয়ে গিয়েছিল দেখে সুনীত নিজেই জবাবটা দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল, 'মিস্টার মিত্র, আমি ওঁকে প্রশ্ন করছি তাই ওঁর মুখ থেকেই জবাবটা শুনতে চাই।'

বেরিয়ে এসে নীপা বলেছিল, 'তুমি খামোকা কথা বলতে যাও কেন?'

'বাঃ, তুমি উত্তর দিচ্ছ না আর আমি জানি তাই।'

'জানলেই বলতে হবে? শোভন অশোভন বলে কিছু নেই?'

নীপার কথাটা শুনে ডাক্তারের ওপর তার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। নীপার মনের সমস্ত আনাচ-কানাচ, শরীরের সব রকম রি-অ্যাকশান সে যতটা জানে নীপা ততটা জানে কিনা সন্দেহ। অতএব সে কথা বললে দোষ কি? যেহেতু নীপা সুন্দরী তাই ওর সঙ্গে কথা বলার মতলব লোকটার। এইজন্যেই সর্বপ্রথম ওর লেডি ডাক্তারের কথা মনে এসেছিল। ব্যাটা প্রণবের জন্যে। অন্য সময় হলে কি করত ঠিক নেই কিন্তু এখন অপমানটা হজম করতে হল। নীপা এর মধ্যে কোনও অন্যায় দেখতে পাচ্ছে না সেটাই আশ্চর্যের কথা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে সুনীত ঘরে ঢুকল। ইদানীং রাত্রে রান্নার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে ওরা। শুধু রুটিটা করে নেয় নীপা। কিন্তু বাকি কাজ সব সুনীত করে অনেক কষ্টে নীপাকে এটা মানতে বাধ্য করেছে সে। একে শীতের সময়, তারপর এই অবস্থায় নীপাকে দিয়ে পরিশ্রম করাতে চায় না সে। নীপা অবশ্য সমানে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে! গরিব-দুঃখীদের তো করতেই হয়। কত গল্প শোনা গেছে, ধান কাটতে-কাটতে বেদনা উঠল, মেয়ে নিজেই সরে গিয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে এসে আবার ধান কাটতে লাগল। কিন্তু এসবে ভুলবার পাত্র সুনীত নয়। কোনও ভারি জিনিস তুলতে দেয় না, এমন কি পারলে নীপার নিজস্ব কাজেও হাত বাড়ায়।

নীপা শুয়েছিল। ঘরে নীল আলোটা জ্বলছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল সুনীত। শীতের হাওয়ার জন্যে সবকটা জানলা বন্ধ। এই বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া নীপার ক্ষতি করতে পারে। কোথায় যেন পড়েছিল গর্ভস্থ ভ্রূণ নাকি সিগারেটের ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয়। কথাটা মনে আসতেই সুনীত সিগারেট টেবিলে রেখে সটান নীপার কাছে চলে এল, 'কী হয়েছে?'

'চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল নীপা, সামান্য হাসল, 'কেন?'

'অমন করে শুয়ে আছো?'

'এমনি।'

সুনীত খাটে বসে নীপার খোলা পায়ের পাতায় হাত রাখল। কেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে। চমকে পা সরিয়ে নিল নীপা, 'ইস, ছি-ছি, পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?' কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'কি যে করো!'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'একটু।'

'আগে জানলে—!'

'কী?'

'এসব চাইতাম না।'

'পাগল! তোমার ওপর খুব চাপ পড়ছে অবশ্য।'

'মোটেই না।' সুনীত ঝুঁকে পড়ে নীপার গলায় চুমু খেল। ওখানে চুমু খেলেই নীপার চোখ বুঁজে যায় হাত আপনি উঠে আসে সুনীতের পিঠে। সেই অবস্থায় সুনীত বলল, 'তোমার ছেলে আর কষ্ট দিচ্ছে না তো?'

'ছেলে?'

'যে নড়ছিল?'

'ছেলে ভাবছ কেন, মেয়েও তো হতে পারে!'

'তুমি তো ছেলেই চেয়েছিলে।'

'চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?'

'যায়। যে চাইতে জানে তার নাকি কোনও অভাব হয় না।' হেসে সুনীত বলল কথাটা। তারপর মুখ সরিয়ে নিয়ে আলতো করে নীপার পেটে কান রাখল। নীপা মাথাটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তারপর হাল ছেড়ে দিল। শোওয়ার সময় নীপা একটু আলগা হয়ে শোয়। শরীর বড় হওয়ার পর আর আঁটোসাঁটো হয়ে থাকতে পারে না। সুনীত সেই মসৃণ পেটের ওপর কান রাখল। না, কোনও তৃতীয় সত্তার উপস্থিতি টের পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর সে হতাশ গলায় বলল, 'কই, কিছু নড়ছে না তো!'

নীপা হাসল, 'তুমি আড়ি পেতেছ জেনে চুপ করে গেছে। তোমারই ছেলে তো!'

রিকশার রাস্তা কিন্তু ট্যাক্সি নিল সুনীত। এখন সামান্য ঝাঁকুনি মোটেই সুখকর নয়। নীপাকে দেখে ড্রাইভার আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেল এটা বুঝতে পারল ওরা। মাড় দেওয়া সুতির শাড়ি পরেছে নীপা, এতে নাকি আব্রুটা অনেক বাড়ে। ট্যাক্সিতে বসেই নীপা চোখ বন্ধ করে ঠোঁট চাপল।

'কী হল?'

সুনীত ওর হাত চেপে ধরতেই নীপা হাসবার চেষ্টা করল, 'কিছু না।' তারপর একটু বাদেই সহজ হল।

সুনীতের ব্যাপারটা ভালো লাগছিল না। আজ অফিসে গিয়ে প্রণবকে ঘটনাটা বলেছে।

প্রণব হেসেছিল, 'এরকম তো হবেই, পেটের ভেতর বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়বে না? তবে তোমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেন একটু আর্লি হচ্ছে!'

তাই বা হবে কেন? কোনও অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না তো? এই চিন্তাটা ক্রমাগত সুনীতের মাথায় পাক খেতে লাগল।

ভিজিটার্স রুম দেখে আজও মেজাজ খিঁচড়ে গেল। এত লোকের একসঙ্গে বাচ্চা হয়? প্রণবের কাছে শুনেছে, সভ্য মানুষেরা নাকি শীতকালেই সন্তান জন্ম দিতে পছন্দ করে আজকাল। তাই? এখন নীপা এখানে অনেক স্বচ্ছন্দ। কয়েকবার এসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নতুন কোনও মেয়ে এলে সে-ই হাসি-চোখে তাকায়।

ডাক এল আটটা নাগাদ। ডাক্তার সেন টেলিফোনে কথা বলছিলেন। ওদের ইঙ্গিতে বসতে বলে কথা শেষ করলেন। তারপর সেই মিষ্টি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনাদের কি আজকে আসার কথা ছিল?'

'সুনীত বলল, 'না। কিন্তু একটা প্রব্লেম হওয়াতে—।'

'প্রবলেম? কী হয়েছে আপনার?' ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল।

নীপা সুনীতের দিকে তাকাল। কীভাবে কথাটা বলবে বুঝে উঠছিল না বোধহয়। সুনীত বলল, 'পেইন ফিল করে। ভেতরে বোধহয় নড়ছে।'

ডাক্তার সেন কিছুক্ষণ সুনীতের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, তারপর নীপাকে বললেন, 'হচ্ছে আপনার কষ্ট আর আমি ওঁর মুখে শুনছি। সেই চালু কথাটা যেন না শুনি, আপনার পেইন উঠলে উনি আপনাকে জানিয়ে দেবেন। ভেতরে আসুন।'

ডাক্তারের চেয়ারের পেছনে আর একটা ঘরের দরজা। নীপাকে ইশারা করে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। নার্সটি এবার ডাক্তারের অনুসরণ করল। নীপা ইতস্তত করছে দেখে নার্স বলল, 'কী হল? চলে আসুন!'

নীপা উঠে দাঁড়াতে সুনীতও উঠল। ভেতরে নীপার কী দরকার তা ওর বোধগম্য হচ্ছিল না। নীপার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত যেতেই নার্স বলে উঠল। 'আরে, আপনি আসছেন কোথায়? যান, চেয়ারে বসে থাকুন।'

সুনীত দেখল ডাক্তার একটা পাতলা গ্লাভস পরছেন। ঘরের ভেতর ছোট্ট কিন্তু উঁচু খাট এবং জোরালো আলো রয়েছে। কথা বলতে গিয়েও সে ফিরে আসল। নীপাকে ওই ঘরে একা ছেড়ে আসতে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে চেয়ারে বসতেই নার্স ঘরের পরদা টেনে দিল। সুনীত প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো। এই রকম ব্যবহার সে মোটেই আশা করেনি। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সঙ্গে থাকার তার সব সময় অধিকার আছে।

কয়েকটা টান দেবার পর আচমকা নড়ে উঠল সুনীত। কানের পরদায় এখনও নীপার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা আছাড় খাচ্ছে। তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা হয়েছে নীপার। সে কি ওই ঘরে যাবে? একটু দ্বিধা করে সে কান পাতল। না, আর কোনও শব্দ হচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত বাদেই-বাদেই পরদাটা সরিয়ে নীপা বেরিয়ে এল। মুখে রক্ত জমেছে, চোখ নীচের দিকে ফেরানো, হাঁটছে খুব কষ্টে আড়ষ্ট পায়ে। সুনীত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরল। নীপার হাত ঠান্ডা, খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে ওর এমনটা হয়। সুনীত জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

নীপা মাথা নাড়ল, 'কিছু হয়নি।'

'কিন্তু তুমি চিৎকার করলে কেন?'

'চুপ করো। নীপার গলায় ধমক না অনুরোধ?

এই সময় ডাক্তার তোয়ালেতে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন। মুখে সেই হাসি যা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায় সুনীতের, 'না, সব ঠিক আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে মনে হচ্ছে আপনারা ডেট গোলমাল করেছেন।'

সুনীত বলল, 'না, মানে আমরা তো বেশ নিশ্চিন্ত।'

ডাক্তার সেন প্যাডে কিছু লিখতে-লিখতে বললেন, 'আপনারা লাস্ট যেটাকে ধরছেন সেটা ফলস হতে পারে। আমি এই ওষুধগুলো লিখে দিলাম, আজ রাত থেকেই পারলে খাওয়াতে শুরু করুন।'

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে সামান্য দেখে সুনীত একটু নার্ভাস গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে ওর?'

'কিছুই হয়নি। রক্ত দরকার শরীরের, মাথা ঘোরে বললেন, সেটাও। তবে মনে হল ওর পেলভিস বোন ছোট আছে। সেক্ষেত্রে ডেলিভারির সময় আমাদের অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'সিজার?' প্রায় আর্তনাদ করল সুনীত।

ডাক্তার বললেন, 'সেকি! আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? বিদেশে এখন মায়েরা নিজে থেকেই সিজার করাতে চান। নর্মাল ডেলিভারির চেয়ে ওটা কম কষ্টকর এবং ফিগার ঠিক থাকে।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা নর্মালের জন্য চেষ্টা করব প্রথমে—!'

'কিন্তু আপনি সিজার হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন কী করে?' সুনীত অনুভব করল ওর দুটো পা কেমন নিঃসাড়।

ডাক্তার সেন এবার ধীরে-ধীরে বুঝিয়ে দিলেন, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হয়। তবে সব কিছুই প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া। প্রথমে ধরে নেওয়া হয় নর্মাল ডেলিভারি হবেই। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে তবেই ওই প্রশ্ন আসে। অতএব এখনই এই নিয়ে চিন্তা করবার কিছু নেই।

প্রায় নিশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল সুনীত; সঙ্গে আড়ষ্ট নীপা। এই লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো? সুনীত শুনেছে অনেক নর্মাল ডেলিভারির কেসও নাকি ডাক্তাররা পয়সার লোভে সিজার করে থাকে। কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করার পথ তার জানা নেই। এই ডাক্তার সে রকম কিছু করছে কি না কে বলতে পারে!

ট্যাক্সিতে উঠেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'তখন কী হয়েছিল?'

নীপা প্রশ্ন করার সময় তাকিয়েছিল, শুনে চট করে বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল। সুনীত লক্ষ্য করল ওর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি চলকে উঠল। ওরকম আর্তচিৎকারের পর এই হাসি আসে কি করে বুঝতে না পেরে সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এই, কথা বলছ না কেন?'

নীপা মুখ ঘুরিয়েই বলল, 'জানি না, যাও!'

সুনীত খুব হতাশ হল, 'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

নীপা এবার সহজ হতে চেষ্টা করল, 'ইন্টারন্যাল পরীক্ষা করছিল। আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম তাই!'

সঙ্গে-সঙ্গে সুনীতের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ইন্টারন্যাল পরীক্ষা! ওর চোখের সামনে ডাক্তারের গ্লাভস পরা হাত ভেসে উঠল। সে নীপার দিকে আবার তাকাল। আজ অবধি সে ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ নীপার শরীরে হাত দেয়নি। আর ওই লোকটা তারই কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার স্ত্রীর—। মাথা ঘুরে গেল সুনীতের। বন্ধুবান্ধব কেউ বলেনি ডাক্তাররা এসব করে। কাউকে একথা জিজ্ঞাসাও করা যাবে না। হাসপাতালে যাদের বাচ্চা হয় তাদের নিশ্চয়ই এই রকম অভিজ্ঞতা হয় না। সুনীত ঠিক করল, কোনও লেডি ডাক্তারকে টেলিফোন করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে এটি অবশ্যই করণীয় কিনা। সে নীপার দিকে তাকাল। নীপার মুখ এখন অনেকটা স্বাভাবিক! আশ্চর্য, একটি সুশ্রী পরপুরুষ কিছুক্ষণ আগে এমন আচরণ করা সত্ত্বেও এমন স্বাভাবিকত্ব আসে কী করে? সুনীত এর আগের সাক্ষাৎকারগুলোর কথা ভাবতে লাগল। না, ডাক্তার এবং নীপার মধ্যে সামান্য গোলমাল সে দ্যাখেনি। তাহলে নীপার সমস্ত শরীর যা কিনা সুনীতের একদম নিজস্ব তা অন্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও নীপা এমন নির্বিকার কেন? হ্যাঁ, তখন চিৎকার করেছিল বটে, আড়ষ্ট পায়ে লজ্জিত হয়ে হেঁটেও ছিল, কথাও বলতে পারেনি বেশ কিছুক্ষণ। ব্যাস, তারপরই তো যে কে সেই।

বাড়ি ফিরে সুনীত প্রথম কথা বলল, 'শোন, এই ডাক্তারকে আমার ভালো লাগছে না।'

নীপা জামা কাপড় ছাড়বে বলে এগোচ্ছিল, থেমে গেল, 'কেন?'

'মনে হচ্ছে গোলমাল আছে। তুমি পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করো তো এই সময় ইন্টারন্যাল একজামিনেশন করে কিনা!' সুনীত চেয়ারে বসে ব্যালকনির দিকে মুখ করে কথাটা বলল।

নীপা হেসে ফেলল, 'কী পাগলের মতো যা তা বকছ!'

সুনীত কঠিন গলায় বলল, 'তুমি এতে খুশি হতে পারো কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'কী বললে?' নীপার গলা তীক্ষ্ন হল।

'একটা লোক তোমার শরীরের ভেতরে হাত দিচ্ছে অথচ তোমার কোনও রি-অ্যাকশন নেই?

তাজ্জব ব্যাপার!' সুনীত ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'ছি-ছি! তোমার মন এত নীচ!' নীপা কাঁপছিল, 'ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছু জানো তুমি? এই সময় ওই রকম পরীক্ষা করাটা নিয়ম। তাতে পরে বিপদে পড়তে হয় না। আর তুমি একজন ডাক্তারের ওপর জেলাস হচ্ছো! রি-অ্যাকশন! মেয়েরা শরীরে কোনও পুরুষের স্পর্শ পেলেই বুঝতে পারে তার মন কী বলছে। উনি পরীক্ষা করলেন অথচ আমি এরকম নির্লিপ্ত হতে এর আগে দেখিনি। যে মানুষ আমার উপকারের জন্য কর্তব্য করছেন আমি তাঁকে খারাপ ভাবব কেন? আসলে তুমি আমাকে সন্দেহ করো। তোমার মনে অন্ধকার। ছি ছি!'

শেষের দিকে কথাগুলো এমন উঁচু পরদায় উঠে গেল যে বিব্রত চোখে সুনীত মুখ ফিরিয়েছিল। আর তখনই নীপা দুহাতে নিজের মাথা ধরে টলতে লাগল। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে এক লাফে সুনীত এগিয়ে এসে যদি নীপাকে জড়িয়ে না ধরত তাহলেই দুর্ঘটনাটা ঘটে যেত। সুনীত চিৎকার করে নীপাকে ডাকল। এখন ওর বুকের কাছে নীপার মুখ নিঃসাড়ে নেতিয়ে রয়েছে। দাঁতে-দাঁত আঁটা, শরীর শিথিল। কোনওরকমে সে নীপার শরীর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কয়েকবার ডাকল, নীপার কোনও সাড়া নেই। বুকের মধ্যে কনকনে হিম জমতে লাগল সুনীতের। নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে বুঝল নীপা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কী করা উচিত বুঝতে পারছিল না সে। নীপা মরে গেলে পৃথিবীতে তার আর কিছু থাকবে না। এটা বোধে আসতেই সুনীত ডাক্তারের কথা ভাবল। ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। যেতে হলে হয় দরজা খুলে নয় পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমাকে ডেকে যেতে হয়। এক ধরনের নার্ভাসনেস যা ওকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা কাটিয়ে ওঠার মুহূর্তে নীপার শরীর নড়ে উঠল। এবং তার চোখের পাতা উন্মুখ হতেই সুনীতের মনে হল এর চেয়ে ভালো সময় ওর জীবনে আর কখনও আসেনি। সে দ্রুত নীপার পাশে এসে বলল, 'কেমন লাগছে এখন?'

নীপা কোনও জবাব না দিয়ে উঠে বসতে যেতেই সুনীত বাধা দিল, 'উঠতে হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি।'

খুব দুর্বল গলায় নীপা বলল, 'না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, ঠিক আছি।'

সুনীত একবার সন্দেহের চোখে তাকাল। নীপার মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা ক্রমশ সহজ হচ্ছে। কিন্তু তাকে মান্য করেছে ও, ওঠার চেষ্টা করেনি, তেমনি নেতিয়ে শুয়ে আছে। মুখ একপাশে ফেরানো। সুনীত চটপট রান্নাঘরে চলে এল। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে দুধ বসিয়ে দিল। মনে পড়ছে এই সময় ব্র্যান্ডি এবং দুধ খুব কাজে লাগে। বাড়িতে একটা ব্র্যান্ডি রাখতে হবে। এখন ওর নার্ভ সহজ হয়ে এসেছে। ঠান্ডা মাথায় সে ব্যাপারটা ভাবল। মনে হচ্ছে নীপার আর কোনও ক্ষতি হবে না। তবে ঘটনাটা ডাক্তারকে জানানো দরকার। ডাক্তারের কথা মনে হতেই সেনের মুখটা ভাসল। নীপা তার, সেখানে আর কোনও পুরুষের মাতব্বরি সে সহ্য করতে পারবে না। ডাক্তার বলেই সাতখুন মাপ হবে এ কেমন কথা! লোকটা বলছে নীপার পেলভিস বোন ছোট, কই, সে তো কোনও অস্বাভাবিকত্ব টের পায়নি। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে এক্সরে করতে বললেই চলত, হাত দেওয়ার কী আছে! সুনীত মাথা নাড়ল, লোকটা স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অন্য কোনও লেডি ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ব্যাপারটা ভাঁওতা বলে প্রমাণ করিয়ে একটা কেস ঠুকে দিলে কেমন হয়! মুশকিল হল, এই সময় ডাক্তার চেঞ্জ করিয়ে সমস্যা বাড়বে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, সে একটা অন্যায় করেছে। নীপার এ ব্যাপারে কোনও দোষ ছিল না। সে রাগের মাথায় ফট করে ওই কথা বলে ফেলেছে। নীপা তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু সুনীতের মতো নয়, এ কথাটা কেমন করে বোঝানো যায়!

'এটা খেয়ে নাও!' সুনীত ডাকতেই নীপা মুখ ফেরালো। আর তক্ষুনি সুনীতের মনে হল ওর কলজে কেউ খামছে ধরেছে। নীপার দুই চোখের কোল জলে ভরে আছে। এত ব্যথা একসঙ্গে

ওই দুই চোখের কোলে জমা হতে পারে সুনীত জানত না। কাপ পাশের টেবিলে রেখে সুনীত দুহাতে নীপাকে জড়িয়ে ধরল।

নীপা শক্ত শরীরে কাঠকাঠ গলায় বলল, 'তুমি আমাকে সন্দেহ করো?'

'না, মোটেই না। ক্ষমা করো, আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি।' ডুকরে উঠল সুনীত। সে যেন বলতে চাইছিল এই মুহূর্তে যে কোনও শাস্তি তার অপরাধের জন্যে নিতে রাজি আছে।

'তাহলে ওই কথা বললে কেন?'

'আমি ছাড়া তোমাকে কেউ জানুক আমি সইতে পারি না।'

'তুমি আমার সব জানো?' নীপার গলার স্বর এখন একদম অচেনা।

'জানি।'

'পাগল, কেউ কারও সব জানতে পারে?' নীপা হাসল।

'ওসব তত্ত্বের কথা। আমি তোমার সব জানি আর যদি কিছু অজানা থাকে তাহলে সেটা আমিই আগে জানতে চাই।'

সুনীত নীপার গলায় ঠোঁট রাখল। আশ্চর্য, আজ নীপার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। স্থির, তেমনি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সুনীত পাগলের মতো ওর ঠোঁট, গলা কপাল, বুকে চুমু খেতে লাগল। যেন প্রতিটি চুম্বন দিয়ে সে নীপাকে সহজ করতে চায়। নীপা শেষ পর্যন্ত হাসলো, 'চিন্তা নেই, আমি এত সহজে মরছি না।' সুনীত থেমে গেল। ওর খুব অসহায় লাগছিল নিজেকে।

তারিখ পেরিয়ে গেল। সুনীত অফিস থেকে মাসখানেকর জন্য ছুটি নিয়েছে। নীপাকে সে এখন কোনও কাজ করতে দেয় না। প্রতিটি মুহূর্তে ওর সজাগ নজর থাকে, নীপার সামান্য অসুবিধে ঘটতে দেয় না। তারিখের আগের দিন মনে হয়েছিল এবার নীপার বাড়িতে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা তুলতে সাহস পায়নি। তার পরই মত পালটেছিল, সে একাই সব দিক সামলাবে। নীপাকে কোনও অভাব টের পেতে দেবে না। এখন নীপা আবার আগের মতো স্বাভাবিক। ডাক্তার সেনের কাছে এখন প্রায় ঘনঘন যেতে হচ্ছে। নীপার আপত্তিতে সেই অজ্ঞান হবার ঘটনাটা ডাক্তার সেনকে বলতে পারেনি সুনীত। কেন হয়েছিল সেটা বোঝাতে কিছু মিথ্যে কথা বলতে হত। এর মধ্যে আর একবার নীপাকে ভেতরের চেম্বারে যেতে হয়েছিল। না, কোনও চিৎকার ভেসে আসেনি কিন্তু সুনীত চোয়াল শক্ত করে বসেছিল। কী হয়েছে বা হয়নি এই নিয়ে পরে ওরা কোনও আলোচনাই করেনি। সুনীতের কয়েকবার ইচ্ছে হলেও সেই ঘটনার কথা ভেবে মুখ বুজে থেকেছে।

দশদিন পার হওয়ার পর ডাক্তার সেন চিন্তিত হলেন, বললেন, 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, আপনি কোনও পেইন ফিল করছেন না?'

সুনীত জবাব দিল, 'না।'

ডাক্তার সেন এবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'আঃ, আপনি সব কথার জবাব দেন কেন?'

'মানে, আমি সব জানি, তাই—।'

'গুড গড! ঠিক আছে, আপনি আসুন। আজই ডিসিশন নেব।' নীপাকে ডেকে ডাক্তার ভেতরের চেম্বারে গেলেন। নীপা উঠল। এখন ওর শরীর এত ভারি যে হাঁটতে কষ্ট হয়। এক পা হাঁটতেই ওর মুখ বিকৃত হল। সুনীত চমকে বলে উঠল, 'কী হয়েছে?'

কোনওরকমে সামলে নিয়ে সুনীতের হাতটা টেনে তলপেটে রাখল নীপা। এখন এই ঘরে কেউ নেই। নার্সও ভেতরে চলে গেছে। হাতের চেটোর তলায় সুনীত শক্ত এবং উঁচু কিছু অনুভব করল। তারপরেই সেটা নড়ে উঠে মিলিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নীপা বলে গেল, 'পা কিংবা হাত!'

সুনীতের রোমাঞ্চ হল। তার সন্তানকে সে এই প্রথম অনুভব করল। অন্যদিন অনেক নিবিড় বা সেবার মুহূর্তেও সে ওকে টের পায়নি। বেচারা নীপার শরীরের অন্ধকারে ছটফট করছে এখন!

চুপচাপ বসে সে স্পর্শটার কথা চিন্তা করতে লাগল। ওইটুকুন শরীরে অত শক্তি!

হাত মুছতে-মুছতে ডাক্তার সেন চেয়ারে বসে বললেন, 'শুনুন। আমি আর সাত দিন দেখব, তারপরেই অপারেশন করতে হবে। বাচ্চার হেড শক্ত হয়ে গেছে।'

'হেড? সুনীত অবাক হল, 'কী করে বুঝলেন?'

'স্পর্শ করে। ও, আপনি তো সব জানেন। কিন্তু এটা জানতেন না। দয়া করে আর জানার চেষ্টা করবেন না। সাতদিনের মধ্যে যদি পেইন ওঠে, চটপট নিয়ে আসবেন।' ডাক্তার সেন ঘাড় ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসা নীপাকে দেখে বললেন, 'অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'মাঝে-মাঝে পা ফুলছে।' নীপা বলল।

সুনীত ভ্রূ কুঁচকে একবার স্ত্রীকে দেখল। ডাক্তার সেন ঘাড় নাড়লেন। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে সুনীত বলল, 'তোমার পা ফুলছে একথা আমাকে বলনি কেন?'

'বললেই তো সাতপাঁচ চিন্তা করবে।'

সুনীত মুখ ঘুরিয়ে নিল। খুব বিস্বাদ লাগছিল ওর।

গতরাতে একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি সুনীত। নীপাও জেগেছিল অনেকক্ষণ। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, কিন্তু কেউ কথা বলছিল না। সাতটা দিন কেটে গেল। কোনও লক্ষণ নেই তার আসার। আগামীকাল সকালে নীপাকে নার্সিংহোমে যেতে হবে। একটু আগে নীপা ঘুমিয়েছে। ঘুমোনোর আগে প্রথম কথা বলেছিল, 'এই, আমাকে আদর করবে না?'

সুনীত চমকে উঠেছিল। তারপর আলতো করে নীপার কাঁধ ও পিঠে হাত রেখেছিল। নীপা বলল, 'উঁহু আরও জোরে জড়িয়ে ধরো।'

সুনীত একটু দুর্বল গলায় জানাল, 'তোমার লাগবে।'

'লাগুক। আর হয়তো তোমার পাশে শুতে পাব না। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, না? আমি না ফিরলে তুমি সব ভুলে যেও।'

শিশুর মতো কাঁদতে লাগল নীপা। অন্যসময় হলে সুনীত কী করত জানে না কিন্তু এখন ও হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল, চাপা গলায় বলল, 'এই কাঁদছ কেন বোকা মেয়ে! এই অপারেশন জলের মতো সহজ, কেউ মরে না। এইসময় কাঁদলে ওর ক্ষতি হবে।'

অনেকক্ষণ বাদে নীপার কাঁপুনি কমলো এবং তারপর একটু-একটু করে ঘুমে আচ্ছন্ন হল। কিন্তু সুনীতের আর ঘুম আসছিল না। ঘরে পাতলা আলো জ্বলছে। নীপার মুখের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। না, তার আগে নীপা কখনই যেতে পারে না। এই মেয়ে তার আর এক অস্তিত্ব। তার মনে কোনও কষ্ট হলে নীপা ঠিক বুঝতে পারে। নীপার সামান্য অভিমান চাপা থাকলেও সে টের পায়। এই নীপাকে হারাবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ওর পেটে যে দশমাস ধরে তিল-তিল করে বড় হয়েছে সে যে অস্থির হয়ে উঠছে! অথচ বেরুবার পথ না পেয়ে বেচারা—। ডাক্তার সেন বলছেন, ওর মাথা শক্ত হয়ে গেছে। তার এবং নীপার রক্তে গড়া সৃষ্টির কোনও তথ্য সে জানে না। পুরো ব্যাপারটাই যে ডাক্তারের ভাঁওতা এখন আর বলা যাচ্ছে না। লোকটার হাতে এমন নিঃশর্তে সমর্পিত হওয়া তার ভালো লাগছিল না। শেষ রাতটুকু সে খুব একা হয়ে যেতে লাগল।

বিকেলে নীপাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেল সুনীত। বাইরে থেকে কোনও খুঁত পেল না সুনীত। সুন্দর বিছানা। আজ খুব যত্ন করছে ওরা নীপাকে। মাঝখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাইরে গিয়েছিল সুনীত কিছু জিনিসপত্র আনতে। ফিরে এসে দেখল নীপা মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। সুনীত জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

নীপা লজ্জা-লজ্জা চোখে তাকাল, 'যাচ্ছেতাই। নার্সটা খুব অসভ্য।'

'কেন কী করেছে?' সুনীত বুঝতে পারছিল না।

'তোমার শুনে কাজ নেই। আমাকে পরিষ্কার করতে এসে বলল, দেখুন এটা কি ন্যায়বিচার হল। তেনারা ফূর্তি করবেন আর আমাদের এই কষ্ট সহ্য করতে হবে! তা ভাই, আপনার কর্তাটিকে বলবেন ছেলে হলে নাম রাখতে অভিমন্যু।'

সুনীত ঠোঁট কুঁচকালো। নার্সের এইসব কথা তার পছন্দ নয়, তবু বলল, 'কেন?'

'সহজে এসেছিল কিন্তু বেরুবার সামর্থ্য নেই।' বলে হাসল নীপা।

সুনীতের কী হল সে নিজেই জানে না। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে নীপাকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ রেখে স্থির হয়ে রইল। নীপার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে। আর একটু নিচে কান পাতলে আর একটি হৃদযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যাবে। ওরা এখন তিনজন অথচ পিতা এবং স্বামী হিসেবে সে কিছুই করতে পারছে না। পুতুলের মতো তাকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

সেই রাত্রে একা এই ফ্ল্যাটে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে ঘুমিয়ে পড়ল। বিয়ের পর প্রথম দুজনে এখানে এসেছিল। একটি রাত্রের জন্যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেনি। রাত্রে ফিরে সুনীতের অসহ্য লাগছিল। অথচ কখন যে ঘুম এল জানে না। শুধু স্বপ্নটা তাকে ধড়মড় করে জাগিয়ে দিল। সুনীতের গলা শুকিয়ে কাঠ। দমবন্ধ হবার যোগাড়। চোখের সামনে এখনও ছেলেটার মুখ দেখতে পাচ্ছে, 'বাবা, তুমি মাকে ভালোবাসতে?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আমি যখন অন্ধকারে ছিলাম আর খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম, মা যখন আমার শরীর-শরীরে নিয়ে খুব যন্ত্রণা পাচ্ছিল তখন তুমি কী করছিলে?'

'কিছু না, বাবা।'

'কেন?'

'আমার ক্ষমতা ছিল না।'

'অন্য কেউ কাজ করবে এবং তুমি ফলের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'তাই নিয়ম, বাবা।'

'তাহলে আমি তোমাকে বাবা বলব কেন? তুমি কী করেছ?'

'দয়া করো, দয়া করো।'

মুখভরতি ঘাম অথচ সারা শরীর ঠান্ডা, সুনীত কথাটা আবৃত্তি করল, দয়া করো, দয়া করো। তারপরেই তার হুঁশ এল। উঠে এক গেলাস জল খেয়ে চারপাশে তাকাল। ওই কোণের বাক্সটা নীপা কিছুদিন আগে কিনেছে। ওতে কী রাখা আছে প্রশ্ন করেনি সুনীত কিন্তু সে জানে। কয়েকটা সুন্দর কাঁথা, কয়েকটা শিশুদের জামা ইজের। নীপার সংগ্রহ করে রাখা যাতে এসেই বিপদে না পড়তে হয়। মা তার সন্তানের আগামীকালের কথা ভেবেছে। বাবা হয়েছে বলে তার কোনও করণীয় নেই। কিন্তু স্বপ্নটা যে চোখের মধ্যে আঙুল তুলে দিয়েছে।

নীপাকে যখন ও-টিতে নিয়ে যাওয়া হল সুনীত তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে, চোখ বন্ধ। সুনীত দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ডাক্তার সেনের দিকে। ডাক্তারের গায়ে এখন সাদা অ্যাপ্রন। সুনীতকে দেখে সেই মিষ্টি হাসলেন, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। সব ঠিকঠাক যদি চলে তাহলে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।' উনি ফিরে দাঁড়ালেন।

'ডাক্তারবাবু!' সুনীত ডাকল।

'বলুন।'

'আমি ভেতরে যাব।'

'হোয়াট?'

'আমি অপারেশনের সময় থাকব।'

'মানে?'

'আমাকে ওর দরকার হতে পারে।'

'নো, নেভার।'

'সুনীত জেদের গলায় বলল, 'আমি যেতে চাই। আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাই।'

ডাক্তার সেন কিছুটা হতভম্ব, ' দেখবেন, আমিই ডেকে দেখাব।'

'ও যেখানে আছে সেই জায়গাটা দেখতে চাই।'

'হোয়াই?'

'আজ না দেখলে কোনওদিনই দেখা হবে না। আমি আমার সন্তানের জন্মের সাক্ষী, থাকতে চাই।'

'নো। ইটস নট পসিবল। আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না। এরকম অদ্ভুত অনুরোধ জীবনে শুনিনি। ডাক্তার চট করে ভেতরে ঢুকে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সুনীত বদ্ধ দরজার গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

ওর সমস্ত শরীরে এখন ঝিমঝিমে ভাব। এখন নীপার শরীর কাটবে ওরা। ওর পেটের ভেতর অজস্র আবরণের আড়াল থেকে শিশুটিকে বের করে আনবে। দিয়ে জুড়ে দেবে নীপাকে। একটা সেলাই এর দাগ সাক্ষী হয়ে থাকবে এই ঘটনার। অথচ সে পিতা হয়েও জানতে পারবে না তার সন্তানের আবাস কী রকম ছিল। সে স্বামী হয়েও নীপার শরীরের অভ্যন্তরের খবর পাবে না। শুধু উদ্বেগ এবং অস্থিরতা নিয়ে তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

আশরীর ভালোবাসা এবং আবেগ নিয়ে সুনীত তাকিয়ে ছিল কাচের ঘরটার দিকে। তার এখন কিছুই করার নেই। ডাক্তার সেনের ওপর এই মুহূর্তে তার কোনও ঈর্ষা নেই। ওর মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর যে কোনও সৃষ্টির কৃতিত্বের পেছনে পিতার কোনও কৃতিত্ব নেই। এমন কি কোন রাত্রের আনন্দের ফলে এই সন্তান আসছে তাও সে জানে না। সন্তানরা নিজেরাই মাতৃশরীর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে আগামীকালের পথে পা বাড়ায়। আমরা খামোকা পিতৃত্বের দাবি বা বড়াই করি। আর এইখানেই নীপার কাছে হেরে গেল সে। আজ অবধি সব ব্যাপারে নীপা সমান-সমান ছিল, এখন নীপা অনেক এগিয়ে গেল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে কখন জানে না সুনীত। একটি লাল রং চোখের সামনে ফুটতেই সে সজাগ হল। ডাক্তার সেন দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর সমস্ত শরীরে রক্তের দাগ। মুখে হাসি। ডাক্তার সেন, বললেন, 'অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি বাবা হয়েছেন।'

সুনীত তখন রক্ত দেখছিল। নীপার রক্ত এবং এই প্রথম লোকটাকে সুন্দর লাগছিল ওর। ঈশ্বরের মতো সুন্দর। ও হেসে ফেলল, ঈশ্বরকে ঈর্ষা করা যায় না।

ডাক্তার সেন বললেন, 'খুশি তো! আপনার মেয়ে হয়েছে।'

সুনীত আবার হাসল।

ডাক্তার সেন বললেন, 'আপনার স্ত্রী ভালো আছেন। একটু বাদেই সেনস ফিরে আসবে, তখন কথা বলবেন। তবে এক মিনিটের জন্যে।'

সুনীত আবার হাসল।

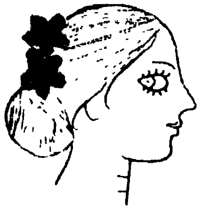
'ডাক্তার সেনের যেন অস্বস্তি হল। বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' ওপাশের একটি বন্ধ ঘরের দরজা ঠেলে সুনীতকে নিয়ে ঢুকলেন তিনি। ছোট্ট একটা কটের সামনে দাঁড়াল ওরা। ডাক্তার সেন সুনীতের দিকে তাকালেন।

কটের ভেতরে তোয়ালে জড়ানো ছোট্ট শরীর। মাথাটি বেরিয়ে আছে। মাথা ভরতি কোঁকড়া

চুল। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত হঠাৎ উত্তেলিত হল। লাল টুকটুকে মুখে প্রতিবাদের ভাঁজ। সুনীত ঝুঁকে পড়ল। কুচকুচে কালো চোখ দুটো এবার ঢেকে গেল। এবং সজোরে একটা কান্না আছড়ে পড়ল সুনীতের ওপর।

সুনীত সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার সেন বললেন, 'নতুন পরিবেশে যতক্ষণ খাপ না খাওয়াতে পারবে ততক্ষণ এইভাবে প্রতিবাদ করবে ওরা।'

সুনীত আবার হাসল। সে মনে-মনে বলল, ঈশ্বর, কোনওদিন যেন ও খাপ খাওয়াতে না পারে।



ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সেই যে, কে যেন বলেছিলেন, 'অনেক হল, এবার মরণের পাশে শুতে চাই নিশ্চিন্তে!' কেউ জবাব দিয়েছিল, 'এখনই! তাহলে যে মরণও গর্ভবতী হবে।'

চমকে উঠেছিলেন তিনি। ভোঁ-কাটা ঘুড়ির সুতোটাকে গুটিয়ে নেওয়ার মতো মুখ করে নিজের মনেই বলেছিলেন, 'হায়, তাহলে যে আর একটি সন্তান জন্ম নেবে। এবং নিঃসন্দেহে জানি তার নাম শয়তান।'

তিনি ঠিক জানতেন না, মরণের কাছেই তো সবাই জীবনকে গচ্ছিত রেখে যায় এবং সেই অর্থে তো মরণের বিরাট বন্ধকি কারবার। যে জানে সে জানে মরণই পারে জীবনকে ফিরিয়ে দিতে। শুধু তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা জানতে হয়। যেমন, এই শহর যে কিনা সেই অর্থে মৃত (যদি পাশাপাশি কোনও ঝকমকে নগরকে রাখা যায়), তার কাছে আসুন। দেখবেন ফিরে যাওয়ার সময় একটা জীবনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন যদি ঠিক চাবি ঠিকঠাক ঠিক তালায় পড়ে।

সব দেশ ঘুরে যখন পকেট আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না তখন এইরকম আহ্বান এল। পড়েই মনে হল, বাহ চমৎকার! এরকম ডাক তো অন্যদেশের ট্যুরিস্ট ব্যুরো দেয়নি কখনও। কাজের তাগিদে আমাকে পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে হয়। পাঁচ বছরে একবার। অথচ এই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়েনি কখনও যদিও কতবার ওই শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি। পকেটে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তা দিয়ে দুটো রাত কোনও হোটেলে থাকা যায়। তার মানে একটা বিরাট দিন হাতে থাকার দেখবার এবং ওই যে বলেছে ঠিকঠাক তালাটা যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া হলেও হতে পারে।

কাল রাতে এই শহরে পা দিয়েছি। রাতের বেলায় সব আকাশের মোটামুটি দুই চেহারা, মেঘ থাকলে এবং না থাকলে। ঘুমোলে যেমন বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া সমান-সমান। কথাটা-কথায় জড়িয়ে হোঁচট খেল, বোধহয়, সমান-সমান হয়েও সমান নয়। ঘুম তো স্বপ্ন দেখায়, এইটুকুও ওর বাড়তি অহংকার।

হিসেবে দেখা গেল দু-রাতের হোটেল খরচ চালিয়ে সামান্যই থাকবে আমার। কী আছে এই শহরে যা আমি কোথাও দেখিনি তাই দেখে নিতে পারি। হোটেলের রিসেপশনে নামলাম ব্রেকফাস্ট খেয়ে। ঝকঝকে তকতকে আয়নায় মোড়া চারধার। যে দিকেই তাকাই নিজের পঁয়ত্রিশ বছরের মুখটাকে দেখি। মানুষের শুনেছি অনেক মুখ থাকে, আমার ক'টা?

এখানে শীত নেই এবং গরম পড়ে না বললেই নেই। এতদিন বাদে একটু হালকা হয়েছি পোশাকে। চোস্ত পাজামা আর চাপা পাঞ্জাবিতে বোধহয় এখানে আমি একক। কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না, নজর কেড়েছি এর মধ্যেই অনেকের। হোটেলের অভ্যর্থনাকারীরা এত হাসি কোত্থেকে সংগ্রহ করে কে জানে! কাল রাতেও দেখেছি, এখনও এদের বোধহয় হাসির পুঁজি ফুরোয় না।

বললাম, 'আপনাদের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ায় এই শহরে এসেছি।'

কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে ছেলেটি জবাব দিল, 'আমাদের সৌভাগ্য।'

বললাম, 'বলুন তো কী-কী আছে এখানে দেখবার। আজ সারাদিনে সেসব ঘুরে দেখে নিতে হবে।'

ছেলেটি হাসল, 'একদিনে দেখতে চান! তাহলে বেশ পরিশ্রম হবে।'

বললাম, 'তা হোক। দেখবার জন্যেই তো এসেছি।'

ছেলেটি জানাল, 'এত ছোট-বড় জিনিস চারধারে ছড়িয়ে আছে যে একদিনে একা-একা সব দেখে উঠতে পারবেন না। তা ছাড়া কোনও জিনিসকে এমনি দেখলে একরকম, আবার তার গোপনকথা জানলে আর একরকম হয়ে যায়। তার জন্যে আপনার একজন গাইড নেওয়া দরকার।'

গাইড! চমৎকার। জীবনের প্রতি পায়েই কেউ-না-কেউ আমায় গাইড করেছে। যখন করেনি তখনই হোঁচট খেয়েছি। বললাম, 'গাইড কোথায় পাব?'

'আপনি নেবেন?'

'হ্যাঁ।'

ছেলেটি টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজে তুলে এনে আমায় দিল। পনেরোটা নাম পরপর, তাদের বয়স এবং দৈনিক দক্ষিণা। দক্ষিণার চেহারা দেখে আমার চোখ কপালে। এ যে আমার দু-রাতের হোটেল ভাড়ার সমান। পকেটে যা আছে তা দিয়ে এদের দু-ঘণ্টার বেশি পাওয়া যাবে না, দিন তো দূরের কথা! তারপরেই মনে হল, হয়তো এখানে লিখতে হয় বলে বেশি লেখা আছে, দর করলে হয়তো আমার সাধ্যের মধ্যেই পেয়ে যাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদের যে-কোনও একজনকে পাওয়া যাবে?'

'চেষ্টা করতে পারি।'

'কত দিতে হবে?'

'মানে?'

'নিশ্চয়ই কম হবে!'

ছেলেটি আমাকে বড়-বড় চোখে দেখল। যেন এরকম প্রস্তাব সে জীবনে শোনেনি। কথা বলছে না দেখে আমি বললাম, 'দক্ষিণাটা আমার পক্ষে বেশ বেশি।'

'দুঃখিত, এটাই ন্যায্যমূল্য।'

'বেশ। এরা ছাড়া আর একটু সস্তা দরের গাইড পাওয়া যাবে না?'

'সস্তা গাইড! হায়! না, তাদের সন্ধান আমার জানা নেই। আপনি নিশ্চয়ই অন্ধ হয়ে থাকতে চান না!'

মাথা নেড়ে হোটেল ছেড়ে বাইরে এলাম। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলেই একদল দালাল আর ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে ছেঁকে ধরে। কিন্তু এখানে ওরা কেউ নেই। ট্যাক্সিওয়ালারা খুব নির্জীব চোখে আমাকে দেখল। রাস্তা ঝকঝকে নয় আবার নোংরাও বলা যাবে না। বাড়ি-ঘরদোর দেখলে মনে হচ্ছে আমি যেন হঠাৎ ভুল করে জুলিয়াস সিজারের আমলে চলে এসেছি। এমনকী রাস্তা দিয়ে যেসব মানুষ যাচ্ছে তাদের হাঁটাচলায় ব্যস্ততা নেই এবং পোশাকও মোটেই আধুনিক নয়। কিন্তু হোটেলওয়ালা অথবা ট্যাক্সিড্রাইভার তো আর পাঁচটা দেশের মতনই একই চেহারার।

চোখের সমানে অন্যরকম দৃশ্য তাই কৌতূহল বাড়াল। রাস্তায় নামলাম, ধুলো নেই কিন্তু লালচে ভাব আছে। একটা গাইডম্যাপ রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে চেয়ে আনলে হত। কোনও অলস ছোকরাকে দেখছি না। পেশাদার গাইডের চেয়ে ওরা কম কাজের হয় না। দোকানপাটগুলো দেখে আরও অবাক হলাম। চেহারায় তো আধুনিক মোটেই নয়, এমনকী, যা সব জিনিস বিক্রি করছে তাদের এখন কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। প্রাচীন রোম কিংবা মদিনায় এইসব দোকান দেখা যেত। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা সিনেমার সেটে এসে পড়েছি এবং একটু পরেই এখান দিয়ে ক্লিওপেট্রা চলে যাবেন। তবে একটা কথা ঠিক, লোকেরা আমায় দেখছে। মুখ নয় পোশাকটাকে। মেয়েরা কি এই সময় খুব কম বের হয়? কারণ খুব সুশ্রী অল্পবয়সি মেয়ে চোখে পড়ছে না।

একটু বাদেই আমি দিশেহারা এবং সেই সময়েই চোখে পড়ল। ওটা কি পানশালা? এই পরিবেশে রেস্তরাঁ শব্দটাকে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে। ওপরের সাইনবোর্ডে কিছু একটা লেখা রয়েছে যার ভাষাটা আমার কাছে অবোধ্য। লম্বা কাউন্টার, তার ওপাশে দাঁড়িয়ে পাকা আমের মতো এক বৃদ্ধ স্খলিত চোখে আমাকে দেখলেন। তারপর আমার চেনা ভাষাটাকে ভেঙে-ভেঙে বললেন, 'কফি খাবেন?'

তেমন দরকার ছিল না কিন্তু ওই যে লম্বা টুলটায় বসতে পারার লোভে মাথা নাড়লাম। ঘর নয়, কারণ তার তিনদিক খোলা। থামের ওপরে মাথার ছাদটা আটকানো। মাঝে-মাঝেই লম্বা লম্বা টুল রাখা আছে। এটা তাহলে কফির দোকান! মদের হলেই বরং বেশি মানাতো।

হুকুমটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ এবার আমার পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অনেক যত্ন করে আমার চেনা দর্জি সেখানে কাজ করেছে আকাশি সুতো দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'নতুন এসেছেন এই শহরে?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আজ একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

হাতটা ঈষৎ নেড়ে তিনি বললেন, 'দেখুন।'

কফি এল। বড় ভালো স্বাদ। চুমুক দিয়ে বললাম, 'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?'

'বলুন।'

বয়স হলে কি মানুষ এমন নিরাসক্ত হয়ে যায়?

'আমার একজন ভালো গাইড চাই। কিন্তু বেশি টাকা দিতে পারব না।'

'তা কি হয়? যে আপনাকে পথ চেনাবে তাকে আপনি উপযুক্ত সম্মান দেবেন না? তাহলে সে ভুল পথ চেনাবে, ক্ষতি তো আপনারই।'

'তা ঠিক। তবে কিনা আমার পকেটে বেশি পয়সা নেই কিন্তু ইচ্ছে আছে শহরটা দেখবার। বলছিলাম কি, আপনার জানা কোনও বেকার ছেলে আছে যে এই শহরটাকে চেনে?'

'থাকবে না কেন? কিন্তু তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা তো আপনি বুঝবেন না। ওকে ভাড়া করে কোনও লাভ হবে না।'

ব্যাপারটা বুঝলাম। এখানকার খুব কম মানুষই অন্যভাষা শিখেছে। তাই যারা শিখেছে তারা তো মূল্যবান হবেই। এই সময় একটু খসখসে অথচ সুরেলা গলা কানে এল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

আমি ঘাড় ঘুরিয়েই মুগ্ধ হলাম। এত সুন্দরী মেয়ে এই শহরে আছে? আহা, শহরটাই যেন সুন্দরতর হল। মেয়েটি আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে। বিনীত গলায় বললাম, 'ভারতবর্ষ!'

মেয়েটি এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল, তারপর খুব নিরাসক্ত গলায় বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনার সমস্যাটা জানতে পারি?'

দেখলাম, মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ শিষ্ট ভঙ্গি আছে। আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'উনি একজন গাইড চাইছেন আমাদের শহরটাকে দেখবেন বলে। কিন্তু ওর

পকেটে যা আছে, তাতে—।' যেন এক টুকরো ভাঙা হাসি আমার সুতোটাকে কেটে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

'গাইড আপনার পক্ষে খুব দামি হয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে। আমি অনেক জায়গা ঘুরে দেশে ফিরতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসে পড়েছি। আমাকে আবার পাঁচ বছর পরে এখানে আসতে হবে। তখন শুরু করব। এই শহর দিয়েই, যাতে টাকাপয়সা কোনও সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়।' আমি ঘোষণা করলাম।

মেয়েটি এবার চুপচাপ কফি শেষ করল। মাথায় একরাশ সোনালি চুল, চোখদুটো আশ্চর্যভাবে গভীর। মুখের আদলে একটা নরম আনন্দ। কিন্তু তার সঙ্গে কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়া চিবুকে এবং চোখে জড়ানো। পায়ের পাতা ঢাকা এক কাপড়ের ঢিলে পোশাক মেয়েটির শরীরকে আড়াল করেছে। কোমরের কাছে একটা ফিতে সরু হয়ে এটে আছে, দুই কাঁধে পোশাক দুই বাঁধনে আটকানো। মেয়েটির বয়স বোঝা গেল না কিন্তু ও যে ভরা যুবতি তা বুঝতে অসুবিধে নেই।

কফি খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি রুমালে ঠোঁট মুছল। সঙ্গের ঝুলি থেকে একটা আয়না বের করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখে নিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এই শহরে আমি পঁয়ত্রিশ বছর আছি। শেষবার শহরটাকে দেখেছিলাম কুড়ি বছর বয়সে। অনেকদিন এই শহরটাকে আমার দেখা হয়নি।'

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। সেটা লক্ষ করেই সে বলল, 'পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে আমি জন্মেছিলাম।'

'ও।' মেয়েটি আমার সমবয়সি, অথচ কত ছোট দেখাচ্ছে ওকে।

'দেখুন, আজ আমার সারাদিনে তেমন কোনও কাজ নেই। আমি যদি গাইড করি তাহলে কেমন হয়?' মেয়েটি মিটিমিটি হাসছিল।

'আপনি?'

'না, না, ভয় পাবেন না। আমি যখন পেশাদার গাইড নই তখন আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার কথা শুনে মনে পড়ে গেল অনেকদিন এই শহরটাকে দেখা হয়নি, পনেরো বছর কম সময় নয়। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আপনাকে সময় দেব, আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?' মেয়েটি এবার কফির দাম দিচ্ছিল।

আমি বাধা দিলাম, 'দয়া করে ওটা আমাকে দিতে দিন।' তাড়াতাড়ি দুটো কফির দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লক্ষ্য করলাম, আমার হোটেলের কফির দাম আর এই সাধারণ দোকানের কফির একই দাম।

দাম দিতে হয়নি বলে মেয়েটি কিন্তু একটুও বিমর্ষ হয়নি। বলল, 'আজ সারাদিন যা খরচ হবে তা তাহলে আপনিই মেটাবেন?'

'সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

'ব্যাস, তাহলে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল।'

এইরকম সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আজ আমার সারাটা দিন কাটবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কখন যে কার ভাগ্যে কী ঘটবে তা আগাম জানা যায় না বলেই জীবনটা এত সুন্দর রহস্যময়। ঢিলে আলখাল্লায় শরীর ঢাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারছি ওর সম্পদ সাধারণের ঈর্ষার বস্তু। লক্ষ্য করলাম ওর অনেক কুচি দেওয়া পোশাকের বাঁ-দিকটা হাঁটু অবধি কাটা, বোধহয় হাঁটাচলার সুবিধার জন্যেই।

'চৌমাথায় এসে মেয়েটি দাঁড়াল, 'প্রথমে আমরা ঠিক করে নিই কোথায়-কোথায় যাব! উম্‌, হ্যাঁ চলুন, শেষ থেকে শুরু করি। তার আগে বলুন তো এই বাবদ আপনি কত ব্যয় করতে পারবেন?'

এই প্রথম আমি একটু সন্দেহের চোখে ওকে দেখলাম। সারা পৃথিবী ঘুরি আমি, ঠগ-জোচ্চোরদের নানান ফন্দির কথা আমার জানা আছে। যা পারি তা থেকে কমিয়ে ওকে বললাম।

শুনে একটু চিন্তা করে ও রাস্তার পাশে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার গাড়িকে কাছে আসতে বলল। গাড়িগুলো অদ্ভুত। ঘোড়া এবং তার সওয়ার আগে, গাড়িটা বেশ পিছনে। কোচোয়ানের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা শেষ করে মেয়েটি বলল, 'উঠুন।'

খুবই ছোটগাড়ি, টু-সিটার। মুখোমুখি বসতেই হাঁটুতে হাঁটু ঠেকল। গাড়িগুলো ছোটে বেশ জোরে বোঝা যাচ্ছে। চ্যারিয়ট চ্যারিয়ট মনে হচ্ছে। এবার মেয়েটি বলল, 'আমি এই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষকে দেখালাম।'

'বললাম, 'আপনি কিন্তু চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন।'

মেয়েটি বড় চোখে তাকাল। তার ঠোঁটে টান-টান হাসি, 'নইলে আপনার কথা বুঝতেই পারতাম না।'

এ চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। বুকের ভেতর কখন যে টলানি শুরু হয়েছে বুঝিনি, এই মুহূর্তে ধরা পড়ল। মুখ নামিয়ে বললাম, 'আমরা কিন্তু এখনও আমাদের নাম জানি না।'

সে বলল, 'নাম? একদিনের জন্যেই তো আলাপ, বিকেল পাঁচটা অবধি, তারপর তো নাম স্মৃতি হয়ে যাবে। না মশাই, আমি আর স্মৃতির বোঝা ভারি করতে একটুও রাজি নই।'

গাড়িটা থামল একটা ছোট্ট পাহাড়ের তলায়। এদিকের পাহাড় যেমন হয়, একটাও গাছ নেই। এত নেড়া যে চোখের আরাম হয় না। দুজনে সেই পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলাম। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কী দেখার আছে?'

'দেখার কী কিছু থাকে, দেখে নিতে হয়।' ও হাসল।

পাহাড়ি পথটায় মানুষের হাঁটার সুবিধে আছে কিন্তু কোনও মানুষ চোখে পড়ছে না। বেশ কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে ওপরে উঠতেই গর্জন কানে এল। যত এগোচ্ছি তত সেটা বাড়ছে। এবার আর রাস্তা নেই। এ পাথর ডিঙিয়ে ওই পাথরের খাঁজ ধরে এগোতে হয়। কেউ পথ না দেখালে আমি কোনওকালেই এখানে আসতে পারতাম না। শেষ পাথরটার আড়াল সরতেই দৃশ্যটাকে দেখতে পেলাম। পাহাড়ের একটা গহ্বর থেকে বিশাল জলরাশি রামধনুর মতো ছিটকে উঠে এসে আবার বেঁকে নিচের গহ্বরে ঢুকে গেছে। অর্ধবৃত্ত এই জলের ধারার তলায় স্বচ্ছন্দে দাঁড়ানো যায়। শব্দটি জলের ওঠাপড়ার জন্যেই হচ্ছে। এই বিশাল ধারার রং নীল।

আমি মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটি দেখছিলাম। পৃথিবীর কোথাও এমন সাজানো ছবি আমি দেখিনি। সাজানো কারণ গহ্বর থেকে বেরিয়ে আর একটা গহ্বরে প্রবেশের সময় এই বিশাল ধারাটির ক্ষুদ্র অংশও বাইরে পড়ছে না। আবিষ্কার করলাম আমরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

মেয়েটি বলল, 'একজন মানুষ প্রতিজ্ঞা করেছিল সে মরবে না, দেবতারা যেমন মরেন না। অনেক সাধনার পর দেবতারা রাজি হলেন। তবে তাঁরা একটা শর্ত দিলেন, সুখ পেতে গেলে দুঃখকে আগে জানতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যদি মানুষটির জানা হয়ে যায় তাহলে সে অমরত্ব পাবে। মানুষটি বলল, এ তো সোজা কথা, দুঃখ জানতে আর কষ্ট কীসের। সেদিন থেকেই সে দুঃখ জানতে লেগে গেল। পৃথিবীর সব দুঃখ জানতে লোকটির শরীর নীল হয়ে গেল। এত বিষ ধারণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। নিজের শরীরের জ্বালা নিবৃত্ত করতে সে এই পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নিল। কিন্তু পাতালও তো পৃথিবীর দুঃখ সইতে পারে না। সে মানুষটিকে ঠেলে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। স্বর্গের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে দেবতারা বিপদে পড়লেন। স্বর্গে দুঃখ যদি একবার প্রবেশ করে—! তাঁরা তাড়াতাড়ি মানুষটাকে আবার পৃথিবীর তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। সেই থেকে মানুষটি ওই জলের আকার নিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে আবার ডুবে যাচ্ছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সব দুঃখ জেনেও মানুষটি অমর হল না কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'একটা দুঃখ তার জানতে বাকি ছিল। লক্ষ করে দেখুন একদম ওপরে অত

নীলের মধ্যে একটা সাদা জলের রেখা বইছে। ওইটুকুই ওর অজানা। কিন্তু দেবতারা বললেন, তবু সে অমরত্ব পাবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এই জলের ধারা বেঁচে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'না জানতে পারা দুঃখটি কী?'

মেয়েটি বলল, 'দুটো মানুষের মন অবিকল হয়েও মেলে না কেন?'

'কেন?'

মেয়েটি হাসল, 'ওটা তো আমিও জানি না। ভালোবাসা মানে যদি সুখ তবে তা থেকে এত দুঃখ পায় কেন মানুষ!'

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম নীল-জল স্পর্শ করতে কিন্তু মেয়েটি পেছন থেকে আমার হাত টেনে ধরল, 'কী করছেন?'

'ওই জলে হাত দেব।'

'পাগল! সাধ করে কি কেউ দুঃখকে ছোঁয়?'

নিচে নেমে এলাম। কেন যে এমন ভারি হয়ে গেছে মন, কিছুই ভালো লাগছে না!

মেয়েটির হাঁটুতে আমার হাঁটু, চ্যারিয়ট ছুটছে। সে এখন শূন্য চোখে বাইরে তাকিয়ে। খুব নরম এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। ইচ্ছে করছিল ওর একটা হাত দু-হাতে নিই। কিন্তু মেয়েটির শরীরের চারপাশে একটা ব্যক্তিত্বের বর্ম আছে যা ভেদ কবে কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়।

রথ যেখানে এসে থামল সেটা একটা উদ্যান। মেয়েটি বলল, 'আসুন, এবার আমরা অনন্ত যৌবন দেখব।'

বিস্মিত এবং আগ্রহী হয়ে মেয়েটিকে অনুসরণ করলাম। চারধারে অজস্র ফুল। পৃথিবীর সব রং উজাড় করে তাদের সাজানো হয়েছে। এদের অনেককেই আমি চিনি না কিন্তু ফুল কি কখনও অনাত্মীয় হয়? মেয়েটি বলল, 'এদের কোনও গন্ধ নেই।'

'সেকি! এত সুন্দর তবু গন্ধ নেই?' বলতে-বলতে অবিশ্বাসে গোলাপের বুকে নাক রাখলাম। না, মেয়েটি ঠিকই বলেছে।

বললাম, 'একটাও মৌমাছি কিংবা ভ্রমর দেখছি না কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'কারণ এই সুন্দর ফুলেদের বুকে মধুও নেই।'

যে ফুলের গন্ধ এবং মধু নেই সে কেমন ফুল? কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চোখ সরাতে হয়। মেয়েটি হাসল, 'এই হল অনন্ত যৌবন।'

'কী রকম?'

'স্বর্গের অপ্সরীরা লুকিয়ে-চুরিয়ে আসত পৃথিবীতে। হয়তো রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে তাদের ভালো লাগত। দেবতাদের তো সব আছে শুধু রক্তমাংস নেই। তাই বোধহয় মুখ বদলাতো অপ্সরীরা। একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। দেবতারা বললেন, ' বেশ তাই হোক, তোমরা পৃথিবীতেই থেকে যাবে।'

অপ্সরীরা বলল, 'তাই যদি হয় তাহলে আমাদের যৌবন কেড়ে নিও না।'

দেবতারা বললেন, 'অবশ্যই। তোমরা অনন্ত যৌবন পাবে।'

'অপ্সরীরা এখানে এসে দেখল তাদের মানুষ-প্রেমিক প্রকৃতির নিয়মে বুড়ো হচ্ছে, মরে যাচ্ছে কিন্তু তারা একই থেকে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, প্রেমিকের ছেলেরা যুবক হয়ে আবার তাদের সঙ্গে প্রেম করছে। তখন তাদের দেবতারা এখানে এই ফুলের চেহারায় সাজিয়ে দিল। যে যৌবন অনন্ত তাতে কোনও রহস্য নেই। অনেক বলেই দেওয়ার ক্ষমতা শূন্য। সে শুধুই শোভা, তাই ভ্রমর আসে না, সুবাস ছড়ায় না। এই যৌবনের অন্য নাম অভিশাপ।'

আমি হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলতে গেলাম, মেয়েটি বাধা দিল, 'কি করছেন! সাধ করে কি কেউ অভিশাপ নিয়ে যায়?'

সারাদিন ধরে আমরা শহরটাকে দেখলাম। সারাদিন ধরে মনে হচ্ছিল আমি জুলিয়াস সিজারের রাজত্বে আছি। এত কিছু আমার অজানা ছিল। হায়, দেশলাই কাঠি জ্বলতে-জ্বলতে শেষপর্যন্ত আগুনের স্পর্শ লাগল আঙুলে। সময় ফুরিয়ে আসছে। আজ আমি জীবনের অন্য এক আলো দেখতে পেলাম। এখানে না এলে এ দেখা হত না। এই মৃত শহরে এত জীবন গচ্ছিত ছিল।

মেয়েটিকে যত দেখছি তত মুগ্ধতা বাড়ছে। দুপুরে একসময় সে আলখাল্লা খুলেছিল স্বস্তি পাওয়ার জন্যে। তার তলায় পা-ঢাকা ঢিলে সিল্কের জামা। সুন্দর এবং রুচিময়।

কিন্তু তার যৌবন যে টলটলে তা বুঝে আমি ক্রমশ উত্তাল হচ্ছিলাম। কী করে মেয়েটিকে বলি আমি তাকে কামনা করছি! কী করে ওর মন পাওয়া যাবে? মন পেলেই শরীর সহজেই আসবে। যেহেতু আমার পকেটে কিছু নেই তাই আগামীকাল ফিরে যেতে হবেই। থাকলে নিশ্চয়ই ওকে পেতে চেষ্টা করতাম। মুখ ঘষছে বুকে। মেয়েটি কি আমার মনের কথা বুঝেছে? না হলে সে অমন করে মাঝে-মাঝে ঝুঁকে পড়ছে কেন? ওর বুকের ভাঁজ যে আমাকে দমবন্ধ করে দিচ্ছে। ওকি তা বোঝে না? বোধহয় বোঝে বলেই এমন করে বোঝা চাপায়।

বিকেল নাগাদ আমরা শহরের মাঝখানে ফিরে এলাম। এখন বেশ ব্যস্ততা চারপাশে। কিন্তু আমি ছাড়া আরও বিদেশি দেখতে পাচ্ছি। বিদেশিরা যেমন হয়, দু-হাতে পৃথিবীটাকে কিনে নেওয়ার মহড়া দিচ্ছে। একটা ছোট্ট পাঁচিলের আড়ালে ওটা কি কোনও মন্দির! মেয়েটি বলল, 'আর আমার সময় নেই। পাচটা বেজে এল। চলুন, এইটে দিয়ে আমাদের দেখা শেষ করি।' ইচ্ছে করছিল না ওর কথা মানতে কিন্তু বুঝতে পেরেছি সে নির্মম।

চাতালের মধ্যে বিরাট একটা মুখ। এ মুখ মানুষেরও নয় আবার পশুরও নয়। একই সঙ্গে হিংসা, ভয়, আনন্দ এবং কান্না মেশানো রয়েছে অভিব্যক্তিতে। চমকে সরে আসতে হয় আবার সরেও যাওয়া যায় না। তিনমানুষ লম্বা একটা পাথরের চাঁই কেটে যেন মুখটাকে তৈরি করা হয়েছে। তার মুখের গহ্বরে অন্ধকার। মেয়েটি বলল, 'এর নাম মহাকাল।'

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম।

মেয়েটি বলল, 'আমরা বিশ্বাস করি ওর মুখের ভেতর হাত রেখে যদি কোনও কিছু প্রার্থনা করা যায় তাহলে অবশ্যই তা পূর্ণ হবে।'

অবিশ্বাসে তাকালাম, 'সত্যি?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, 'বিশ্বাসই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।'

আমি শিহরিত হলাম। বেশ, এবার পরীক্ষা হয়ে যাক। এই মুহূর্তে আমি মেয়েটিকে ছাড়া তো আর কিছুই কামনা করতে পারি না। মেয়েটি বলল, 'অনেকদিন এখানে আসা হয়নি। আপনি কিছু প্রার্থনা করবেন?'

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মহাকালের মুখে হাত রাখলাম। শীতলতম এ কোন স্পর্শ। প্রার্থনা সেরে ফিরে আসতেই মেয়েটি এগিয়ে গেল। তারপর চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে সে তার প্রার্থনা সেরে নিল।

বাইরে বেরিয়ে মেয়েটি বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে, আপনি কি হোটেলে ফিরতে পারবেন?'

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

সে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে জানতে পারি কি আপনি কী প্রার্থনা করলেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'নিশ্চয়ই। আমি পাঁচ বছর পর এই শহরে আসব। প্রার্থনা করলাম, তখন যেন আমি একমাত্র আপনার দেখা পাই। কারণ সেই সময় আমি স্বচ্ছল থাকব।'

মেয়েটি যেন কেঁপে উঠল। তারপর অদ্ভুত মায়াবী চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামাল। তার ঠোঁট দাঁতের তলায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি প্রার্থনা করলেন জানব?'

মেয়েটি মুখ ফেরালো। ওর বুক নড়ে উঠল। তারপর বলল, 'প্রার্থনা করলাম আজ থেকে যেন প্রতি রাত্রে তিনজন খদ্দের পাই।'

চমকে উঠলাম।

মেয়েটি বলছিল, 'পাঁচ বছর পর যখন আপনি আসবেন তখন আপনার বয়স মাত্র পাঁচ বছর বাড়বে। কি আর এমন! কিন্তু আমার যে পনেরো বছর বেড়ে যাবে। আপনার একটা রাত মানে যে আমার তিনটে রাত।'



নিরুদ্দেশ-প্রাপ্তি-হারানো

চারদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেন বাড়ির আবহাওয়ায় টান লাগল। মাধুরী নীচু গলায় শাশুড়িকে জানাল, 'মা, বাবাকে ওঁর খবর নিতে বলবেন?'

'কেন, ক'দিন হল' ফুল তুলতে-তুলতে শোভনা প্রশ্ন করলেন।

'চারদিন।'

'সেকি! ও তো দু-দিনেই ফিরে আসে। তোমাকে কিছু বলে যায়নি?'

নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী। শোভনা আড়চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। অনেক খুঁজে খতিয়ে এই মেয়েকে এনেছিলেন তিনি বেআক্কেলে ছেলেটাকে বাঁধবার জন্যে। এরকম সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না, ব্যবহারটিও ভারি মিষ্টি। কিন্তু কিছুই হয়নি। সেই মাঝরাতে টলতে-টলতে বাড়ি ফেরা, চিৎকার চেঁচামেচি, অবিরত শহরের মানুষের নালিশ এবং পুলিশের শাসানি একটুও বন্ধ হয়নি। না, ঠিক হল না। মাসছয়েক হল, বিয়ের দুমাস পর থেকেই চিৎকার চেঁচামেচিটা শোনা যাচ্ছে না। কখন বাড়িতে আসছে কখন বের হচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

শোভনা বললেন, 'ঠিক আছে যাও, আমি দেখছি।' মাধুরী ফিরে গেল। মেয়েটার শরীরে ঈশ্বর সব দিয়েছেন। শোভনার নিজের যৌবনের দিনেও এত পাননি। অথচ ছেলেটা এসব চোখ মেলে দেখল না। ভাগ্যিস ওর বাপ নেই, মায়ের অবস্থা ভালো নয়! নইলে এই মেয়েকে একমাসও ধরে রাখা যেত না!

ঠাকুরঘরে বসেও শোভনার অস্বস্তি হচ্ছিল। চারদিন উধাও হয়নি কখনও ছেলেটা। যখন পেটে কিছু থাকে না তখন খুব ভালো ব্যবহার, অমন ছেলে হয় না। স্বর্ণকমল অত্যন্ত সুদর্শন। দীর্ঘদেহ, গলা খুলে হাসতে জানে। কিন্তু কতক্ষণ? ঘুমের সময় বাদ দিলে বড়জোর ঘণ্টাচারেক। তবে ইদানীং একটা কালচে ছায়া শরীরে। তিরিশ বছরেই অত্যাচারের চিহ্নগুলো শরীরে ফুটছে। কোনও কিছুতেই পালটানো গেল না তাকে।

যে নিজে সুন্দর তার কেন সুন্দর পছন্দ হয় না বুঝতে পারেন না শোভনা। যা কিছু কুৎসিত, কুরুচির ছাপ যাতে তার দিকেই ঢলে ছেলেটা। ডাক্তার অনিল সেনের ছেলে দল বেঁধে মারপিট করছে, বাড়ির যুবতি কুশ্রী ঝি-এর সঙ্গে রসিকতা করছে কী করে তার কোনও কারণ খুঁজে পান না শোভনা। সেই ছেলে চারদিন উধাও হয়ে আছে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামলেন শোভনা। এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাওয়ার

সময়। সকালে এই সময় যা কিছু কথা সারতে হয়। শহরের সবচেয়ে দামি এবং ব্যস্ত ডাক্তার অনিল সেন। নীচে নেমে দেখলেন ডাক্তারবাবুর জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে। চিরকালই সাহেব মানুষ, নিজের কাজ নিজে করতে ভালোবাসেন। স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'দাগটা কেমন আছে?'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'তোমার ওষুধে কমবে না।'

'দেখি।' হাত বাড়ালেন ডাক্তার। মাসখানেক হল শোভনার ডান বাজুতে একটা সাদা-কালো-মেশা দাগ জন্মেছে। প্রথমে ভেবেছিলেন শ্বেতী কিন্তু একটু-একটু করে বোঝা গেল তা নয়। ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছেন, অথচ কাজ হচ্ছে না তেমন।

শোভনা হাত নাড়লেন, 'ও এমন কিছু না। তোমাব সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ডাক্তার বললেন, 'আবার কী হল?'

শোভনার গলায় উদ্বেগ, 'তুমি খোকার খবর নাও।'

'খোকা! কী হয়েছে তার?' ডাক্তারের গলায় বিস্ময়।

'চারদিন বাড়ি ফেরেনি।'

'কিছু বলে যায়নি?'

'না। বলে গেলে তোমায় বিরক্ত করতাম না।'

বউমা কী বলছে?'

'এ অবস্থায় একটা মেয়ে কী বলতে পারে?'

'আমি বুঝি না, সত্যি বুঝতে পারি না। স্বামী মাতলামি করছে, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশছে, দিনরাত বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকছে আর স্ত্রী হয়ে বউমা এসব সহ্য করছে কী করে? ওর তো ইতিমধ্যেই ডিভোর্স নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'

'আমরা কী করে সহ্য করছি?' শোভনা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

'তোমার জন্যে, নইলে আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতাম।'

'করনি যখন, তখন এটুকু করো।'

'কী করব?'

'ওর একটু খোঁজ নাও।'

'চমৎকার! আমি যত গুন্ডা বদমাশ মাতালদের কাছে গিয়ে বলব ও মশাই আমার পুত্ররত্নটিকে দেখেছেন? অসম্ভব! তোমার ছোট ছেলেকে পাঠাও।'

অনিল সেনের এই কথাগুলো শোভনাকে হজম করতে হল। তিনি স্বামীর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে নিজেই যেন নিজেকে শোনালেন অনিল ডাক্তার, 'চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। ও ছেলের কোনও ক্ষতি হবে না। আরে বাবা, যারা খুনখারাপি করে তারাই তো ওর বন্ধু। যাবে কোথায়, পেটে টান পড়লেই ফিরবে।'

শোভনা দোতলার কোণার ঘর চলে এলেন। ছোটছেলে অরুণদীপ্তি বিছানায় উপুড় হয়ে তার কলেজের পড়া করছিল। ফরসা, দাদার মতনই লম্বা, অত্যন্ত রোগা শরীর। ছাত্র হিসেবে এই জেলার প্রথম সারির। শোভনার একমাত্র গর্বের কারণ। শোভনাকে দেখে অরুণদীপ্তি উঠে বসল, 'কিছু বলবে মা?'

'তোকে একটা কাজ করতে হবে বাবা। স্বর্ণ চারদিন বাড়ি ফেরেনি। এরকম কখনও করে না। তোর বাবাকে বললাম তিনি আমলই দিলেন না। তুই একটু খোঁজ নিবি?'

'কোথায় খোঁজ নেব? দাদা কোথায় যায় আমি জানি না!'

শোভনা এই নিরীহ ছেলেটির দিকে আদরের চোখে তাকালেন। বাড়ল কিন্তু বড় হল না। ওর দাদা এই বয়সেই পেতলে একটা দাঁত বাঁধিয়ে বাড়িতে অশান্তির ঝড় তুলেছিল। শোভনা বললেন, 'ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর নে। বড় হয়েছিস, নিজের বিচার-বিবেচনা নেই? ছোট্ট একটা শহরে

সে কোথায় থাকতে পারে খুঁজে দ্যাখ।'

স্বর্ণকমলকে অরুণদীপ্তি ইদানীং এড়িয়ে চলে। তার দাদা গুন্ডা-বদমাসদের বন্ধু, দিনরাত মদ খায়, এই তথ্যগুলো তাকে ভীষণ হেয় করে। স্বর্ণকমলের ভাই এই পরিচয় তাকে পীড়িত করে। শোভনা চলে যাওয়ার পর সে খুব বিরক্ত মনে পোশাক পালটে বের হতেই মাধুরীকে দেখতে পেল। এই সুন্দরী সুশীলা বউদিটির প্রতি সে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ বোধ করে। প্রায়শই নিজেকে অমল এবং মাধুরীকে চারুলতা হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু স্বর্ণকমল ভূপতি? কস্মিনকালেও নয়।

অরুণদীপ্তি এগিয়ে গেল, 'বউদি?'

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'ওমা, পড়া হয়ে গেল?'

'হল কোথায়? মাতৃদেবীর আদেশ হয়েছে রামচন্দ্রকে খুঁজতে যেতে হবে।' অরুণাদীপ্তি মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরে এত সুন্দরী মেয়ে সে আর একটিও দেখতে পায়নি। তাকালেই মন নরম হয়ে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন লাগে। মাধুরী মুখ নামিয়েছিল, অরুণাদীপ্তি শুধাল, 'দাদা কোথায় যেতে পারে বলো তো?' নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী, সে জানে না।

'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা করো না, আমি দাদাকে ধরে এনে দিচ্ছি।' বউদির জন্যে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশি হল অরুণদীপ্তি। স্বর্ণকমলের ওপর তার যা কিছু বীতরাগ তা মাধুরীকে দেখলেই উবে যায়।

পাড়াতেই স্বণকমলের এক বাল্যবন্ধু থাকে। স্থানীয় স্কুলের মাস্টার। অরুণাদীপ্তির তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাকে দেখে মাস্টাবমশাই বললেন, 'কী খবর অরুণ?'

'আমার দাদাকে দেখেছেন?'

'কে, স্বর্ণ? না তো! কী হয়েছে ওর?'

'জানি না। চারদিন বাড়িতে ফেরেনি।'

'ও। তা আমার সঙ্গে তো ইদানীং যোগাযোগ নেই। মানে তুমি বুঝতেই পার ওর জীবন আর আমারটা আলাদা। তুমি থানায় খবর নাও।'

'থানা? অরুণদীপ্তি চমকে উঠল, 'বাবাকে না জানিয়ে থানায় যাব?'

'ও, মেসোমশাই জানেন না বুঝি! তাহলে এক কাজ করো, রঞ্জিতকে চেনো?'

'রঞ্জিত!'

'ওই যে চৌমাথায় যে লন্ড্রিটা আছে তার মালিক। তোমার দাদার এখন খুব বন্ধু। ওর কাছে চলে যাও, ও জানতে পারে।'

সাইকেল চালিয়ে রঞ্জিতের লন্ড্রিতে চলে এল অরুণদীপ্তি। দোকানটা সবে খুলেছে। বড় গোঁফ মোটাসোটা লোকটাই রঞ্জিত! আসা যাওয়ার পথে দেখেছে অরুণদীপ্তি। সে দোকানে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'আমি স্বর্ণকমল সেনের ভাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জিতের কপালে ভাঁজ পড়ল, মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল, 'ও।'

'আমার দাদাকে আপনি দেখেছেন?'

'আমি? না তো! কেন?'

অরুণদীপ্তি হতাশ হল, 'দাদা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি তাই।'

'না ভাই, আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি।'

'আচ্ছা, দাদা কোথায় যেতে পারে বলতে পারেন?'

রঞ্জিত দু-মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'তোমরা কিছু জানো না?'

'না।'

'তাহলে আমার মুখে নাই বা শুনলে। ঠিক আছে, দেখা পেলে পাঠিয়ে দেব।'

অরুণদীপ্তি বুঝল এখানে দাদার খবর পাওয়া যাবে না। লোকটা যেন তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সে মাথা নীচু করে রাস্তায় নেমে সাইকেলটা ধরে হাঁটতে লাগল। এবার কার কাছে যাওয়া যায়? কোনও সূত্র জোগাড় না করে বাড়িতে ফিরলে খুব অসম্মানের ব্যাপার হবে। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ও মানুষ দেখছিল। এখন অফিসের সময়। রিকশা এবং সাইকেলের মিছিল শুরু হয়ে গেছে। কী করা যায় বুঝতে পারছিল না অরুণদীপ্তি। এই সময় একটা রিকশা এসে সামনে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক ভাড়া মিটিয়ে চলে গেলে রিক্সাওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কী খোকাবাবু, এখানে?'

বিরক্ত হল অরুণাদীপ্তি, 'এমনি।'

রিকশাওয়ালা অনিল সেনের কাছে ওষুধ নিতে আসে প্রায়ই। সেই সূত্রে বোধহয় ওকে চেনে।

হঠাৎ ওর মনে হল প্রায় রাতেই দাদা নেশা করে রিকশায় চেপে বাড়ি ফেরে। সে রিকশাওয়ালাকে ডাকল, 'শোনো।'

রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা নিয়েই সামনে এগিয়ে এল। অরুণদীপ্তি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কাল পরশু তুমি আমার দাদাকে দেখেছ?'

'স্বর্ণবাবু! না, কদিন তো দাদাকে দেখিনি।'

'আচ্ছা, তুমি কি রাত্রে দাদাকে কখনও এনেছ?'

রিকশাওয়ালা হাসল, 'হ্যাঁ বাবু, অনেকবার।'

'দাদা কোত্থেকে রিকশায় উঠত?'

রিকশাওয়ালার মুখ কুঁকড়ে গেল। বোধহয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

অরুণদীপ্তি সেটা লক্ষ্য করে আশ্বাস দিল, 'তুমি নির্ভয়ে বলো। দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় নেশা করত জানলে খোঁজ করতে পারি।'

এবার রিকশাওয়ালা বলল, ' সে বড় খারাপ জায়গা বাবু।'

'আমাকে নিয়ে যেতে পারো?'

আপনি যাবেন! পাড়াটা ভালো না।'

অরুণদীপ্তির রোখ চেপে গেল। সে দুগ্ধপোষ্য নাকি! কড়া গলায় বলল, 'দিনদুপুরে গেলে আমার কী হবে! তোমাকে বলছি দাদাকে দরকার—চলো, আমি যাব।'

রিকশাওয়ালা তখনও কিন্তু-কিন্তু করছিল, 'ডাক্তারবাবু জানলে—! অবশ্য শহরের অনেকেই জানে স্বর্ণবাবুকে ওখানেই পাওয়া যায়—বেশ, চলুন তবে।'

খালি রিকশার পেছনে-পেছনে অরুণদীপ্তি সাইকেল চালিয়ে শহরের এক প্রান্তে চলে এল। এদিকে একটা বড় বাজার আছে। ভীষণ ঘিঞ্জি এলাকা। বাজার পেরিয়ে একটা গলির মুখে এসে রিকশাওয়ালা তার গাড়ি থামাল, 'স্বর্ণবাবু এই গলি থেকে বের হয়।'

অত্যন্ত নোংরা রাস্তা। পাশেই নর্দমা। সেখানে শুয়োরের পাল চলছে। দুতিনজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক এই বেলায় ব্যাগ হাতে বাজারে যাচ্ছে। অরুণদীপ্তি বন্ধুদের মুখে এই গলির কথা শুনেছে। শহরের গণিকাদের বাস এখানে। তারা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অঞ্চলে কোনও ভদ্রসন্তান পথ ভুলেও পা দেয় না।

'ওখানে মদের দোকান আছে?' অরুণদীপ্তির অস্বস্তি হচ্ছিল।

'হ্যাঁ খোকাবাবু, হরি শার দোকান আছে।' তারপর কী ভেবে বলল, 'এক কাজ করুন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি খোঁজ নিচ্ছি, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার একা যাওয়া ঠিক নয়, গলিটা খারাপ।'

রিকশাওয়ালার পেছন-পেছন অরুণদীপ্তি গলিতে ঢুকল। দু-ধারে চাপা-চাপা ঘর। তার বারান্দায় বসে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা গল্প করছে। অরুণদীপ্তির মনে হল এত কুৎসিত চেহারার মেয়েকে সে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে নাগর, মুখ তুলে

চাও!' আর একটি কণ্ঠ খিলখিলিয়ে উঠল, 'কচি ছাগল।'

রিকশাওয়ালা চাপা গলায় বলল, 'এসব কথায় কান দেবেন না ছোটবাবু, দিলেই পেয়ে বসবে।'

অরুণাদীপ্তির মুখে রক্ত জমেছে, খুব রাগ এবং ঘেন্না লাগছিল তার। দাদা এই জায়গায় মদ খেতে আসে? আশ্চর্য! ওরা নিশ্চয়ই দাদার সঙ্গেও এইসব কথা বলে।

হরি শার দোকান ঠিক মাঝখানে। তখন সবে দোকান খুলেছে। রিকশাওয়ালা তাকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেল। অরুণদীপ্তি দেখল চারপাশে খুব জোরে রেডিও বাজছে, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে এবং তারই মধ্যে একটি বালিকা অশ্লীল পোশাক পরে নেচে নিল কয়েক পাক।

রিকশাওয়ালা বলল, 'ছোটবাবু, স্বর্ণবাবু চারদিন মাল কেনেনি এখান থেকে।'

অরুণাদীপ্তি হতাশ হয়ে পড়ল, 'তাহলে?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'এরা সব স্বর্ণবাবুকে খুব ভয় পায়। মিথ্যে কথা বলবে না। আপনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন, হরি শার ছেলে তাই বলল।'

'কাকে?'

'এখানে পদ্মা বলে একটা মেয়েছেলে থাকে দুটো ঘর নিয়ে। একটা ঘরে নাকি স্বর্ণবাবু থাকত।'

'লোকে বলে, তুমি বুঝতেই পারছ ছোটবাবু। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার একটা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। তোমাকে ঘরটা চিনিয়ে দিচ্ছি চলো। রিকশাটা সেখানে সরিয়ে রেখে লোকটা তাকে নিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। সরু ময়লা গলি। কোথাও খুব ঝগড়া বেধেছে। টিনের চাল আর কাঠের দেওয়াল দেওয়া দুটো ঘর দেখিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'এখানে পদ্মা থাকে। তুমি কথা সেরে চলে যেও। এসব জায়গায় বেশিক্ষণ থেকো না।'

রিকশাওয়ালা চলে যেতে অরুণদীপ্তি নাকে রুমাল দিল। বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে। একটা বুড়ো মতন রোগা লোক দাওয়ায় বসে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

অরুণাদীপ্তি রুমাল সরালো না, 'এখানে পদ্মা বলে কেউ থাকে?'

'থাকে, কিন্তু এখন ঘরে বসাবে না।' বুড়ো মুখ ফেরালো!

'মানে?'

'সাতসকালে বাচ্চা ছেলে ঘরে নেওয়ার মেয়ে পদ্মা নয়। তাছাড়া ওর মেজাজ খুব খারাপ আছে, অন্য ঘর দ্যাখো।'

এবার বুঝতে পারল অরুণদীপ্তি এবং বোঝামাত্র সে সঙ্কুচিত হল। এবং সেটা এড়াতে বেশ রাগত গলায় বলল, 'আমার ওঁর সঙ্গে দরকার আছে। ডাকুন ওঁকে।'

বুড়ো একটু অবাক চোখে তাকে দেখল। তারপর বসে-বসেই চিৎকার করল, 'ও পদ্মা, পদ্মা, তোকে ডাকে দ্যাখ।'

একটু পরেই একটি থ্যাবড়ামুখো স্ত্রীলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ত্রিশের নীচে নয় বয়স, মোটাসোটা কিন্তু বুক এবং পাছা অত্যন্ত ভারি, গায়ের রং বেশ কালো। প্রথম দেখায় খুবই বিরক্তিকর মনে হয় এবং একটু বোকা-বোকা দেখায়।

'কী চাই? ওমা, এ-যে দেখছি দুধের দাঁত পড়েনি। এই বুড়ো, তোকে বলিনি এখন আমাকে বিরক্ত করবি না!' কোমরে হাত রেখে খিঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

'আপনি কি পদ্মা?' সাহস করে বলল অরুণদীপ্তি।

'হ্যাঁ। নামও জানা আছে দেখছি।'

'আপনি স্বর্ণকমল সেনকে চেনেন?'

এবার দুটো চোখ যেন মাংসের আড়ালে চলে গেল, 'চিনি।'

'উনি আছেন?'

'কে আপনি?'

'আমি ওঁর ভাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে আঁচলটা পিঠে জড়ালো পদ্মা, 'ও। কিছু মনে করবেন না ভাই, আমি মানে—আসুন-আসুন।'

'না, দাদা আছে কিনা তাই বলুন।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে খারাপ ভাববে। আপনি স্বর্ণবাবুর ঘরেই বসবেন। দয়া করে আসুন।' পদ্মা এতবাব অনুনয় করতে লাগল যে এড়াতে পারল না অরুণদীপ্তি, পাশের ঘরে একটি তক্তপোশ পবিষ্কার করে পদ্মা বলল, 'এখানে কোনও ছিরিছাদ নেই ভাই, কষ্ট করে বসতে হবে। আমার কি সৌভাগ্য!'

অরুণদীপ্তি দেখল ওই তক্তপোশ এবং বালিশ ছাড়া ঘরে কিছু নেই। নেই বললে ভুল হবে, অনেকগুলো খালি মদের বোতল পড়ে আছে। এইটে তার দাদাব ঘর? দাদা এখানে ভাড়া নিয়েছিল? এই স্ত্রীলোকটি? অরুণদীপ্তির শরীর গুলিয়ে উঠল। বউদির শরীরের ছায়া এর থেকে ঢের সুন্দর। দাদা এই প্রায় কুৎসিত স্ত্রীলোকটির সঙ্গে থাকত? ঘিনঘিন ভাবটা বেড়ে গেল তার। আব ওই স্ত্রীলোকটি এমনভাবে খাতির করছে যেন সে তার পরমাত্মীয়। অরুণদীপ্তি জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা আছেন?'

মাথা নাড়ল পদ্মা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে ফেরেনি, না?'

'ফিরলে আমি এখানে আসব কেন? কোথায় গিয়েছে জানেন?'

হঠাৎ আঁচলের কোণা মুখে গুঁজে পদ্মা যেন কান্না চাপল, 'আমার কথা শুনল না!'

'কী কথা?'

'ওরা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বর্ডার থেকে কীসব জিনিস আসবে, অনেক টাকার ব্যাপার—আমার খুব ভয় করছে।' পদ্মার গলার স্বরে কান্নার টোকা।

'কারা ডাকতে এসেছিল?' অরুণদীপ্তি অবাক হয়ে গেল।

'চারজন। ওর পরিচিত। নাম বলতে পাবব না। ওরা আমাকে কেটে ফেলবে। তবে স্বর্ণবাবুব যদি কিছু হয় তাহলে আমি ছেড়ে দেব না।'

'দাদা এই ঘরে থাকত?'

'হ্যাঁ। সারাদিন এখানে শুয়ে মদ খেত। আমার কাজে বাধা দিত না।'

অরুণদীপ্তি ভেবে পাচ্ছিল না বাড়ি ফিরে দাদার এইসব ঘটনা বউদিকে বলতে পারবে কিনা। সে উঠল, 'দাদা যদি ফেরে তাহলে বাড়িতে যেতে বলবেন।'

পদ্মা বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। আমিই তো জোর করে রোজ ওকে বাড়ি পাঠাতাম।'

অরুণদীপ্তি বেরিয়ে আসছিল, পদ্মা বলল, 'আপনি প্রথম এলেন, একটু মিষ্টি খেয়ে যাবেন?'

অরুণদীপ্তি জবাব দিল না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তত ভালো।

ফাঁকা রাস্তায় প্যাডেল ঘোরাতে-ঘোরাতে অরুণদীপ্তি ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখল। মাধুরীর মতো অমন সুন্দরী বউকে ছেড়ে দাদা ওই পাড়ায় ঘর নিয়ে মদ গিলত? আর পদ্মার বেঢপ স্বাস্থ্য ছাড়া আর সব যে-কোনও ঝি-এর চেয়েও অস্বস্তিকব। দাদা তাই নিয়ে পড়ে থাকত? মেয়েছেলেটা অবশ্য তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে, যেন স্বর্ণবাবুর আত্মীয় ওরও নিকটজন! এসব কথা বাড়িতে বলা চলবে না। কিন্তু দাদা কোথায় গিয়েছে? পদ্মা বলল চারজন লোক দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। দাদা কি স্মাগলিংও করত? হয়তো। কারণ দাদার কোনও রোজগার ছিল না এবং বাড়ি থেকেও পয়সা নিত না। বিয়ের সময় দাদা ব্যবসা করছিল কিন্তু বিয়েব পরেই সেটা তুলে দেয়। অন্য পথে টাকা না এলে দাদা খরচ চালাত কী করে? ওই পাড়ায় বাড়ি ভাড়া মদ খাওয়ার তো খরচ আছে!

এলোমেলো কিছুক্ষণ সাইকেল চালিয়ে অরুণদীপ্তি হাসপাতালের সামনে এসে পড়ল। আচ্ছা, দাদার যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? উঁহু, তাহলে ওরা খবর পেত। স্বর্ণ সেনকে এই শহরের

প্রত্যেকটা মানুষ চেনে। তাছাড়া বাবার তো বিরাট পরিচয়। অতবড় ডাক্তার এই শহরে দ্বিতীয়টি নেই। অরুণদীপ্তির মনে পড়ে ছেলেবেলায় সে দাদাকে অন্যরকম দেখেছে। খুব ভাল ফুটবল খেলত, হইহই করত সর্বক্ষণ। সেই দাদা বড় হয়ে যা কিছু সুন্দর তা থেকে এমন দূরে সরে গেল কী করে!

বাড়ি ফিরে আসার সময় ওর মনে পড়ল পদ্মা সেই চারটে লোকের নাম বলেনি, বললে লোকগুলো নাকি পদ্মাকে মেরে ফেলবে। লোকগুলো কে? কথাটা বাবাকে বলা দরকার। কিন্তু বাবাকে সে সবসময় এড়িয়ে যায়। অত রাশভারি এবং রাগী মানুষ বলে ছেলেবেলা থেকেই একটা দূরত্ব থেকে গেছে। কী করা যায়?

শোভনা ছোটছেলের মুখে শুনলেন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মুখ ভার হয়ে গেল তাঁর। অরুণদীপ্তি আর বউদির সামনে গেল না। খেয়েদেয়ে কলেজে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় অনিল সেন বাড়ি ফিরলেন, 'দারোগাকে বলে এলাম খোঁজখবর নিতে। আর বলতে গিয়ে যা শুনে এলাম তাতে আর এই শহরে থাকা যাবে না।'

শোভনা চকিতে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন, 'আস্তে বলো, কী শুনলে?'

'তোমার ছেলে বেশ্যাবাড়িতে বসে মদ খেত। এর আগেও এক-আধবার ওই ধরনের কথা কানে এসেছিল, বিশ্বাস করিনি। আজ খোদ দারোগার মুখে শুনলাম।' চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে রইলেন ডাক্তার অনিল সেন।

'যা শুনেছ-শুনেছ, এই নিয়ে চেঁচামেচি কোরো না। বউমার কানে না যায়!'

'কার ওপর চেঁচামেচি করব? ঘরের সুন্দরী বউদের চিরকালই বেশ্যারা হারিয়ে দেয়, না? ঠিক আছে, তোমরা সরে যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' অনিল সেন হাত নাড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো শুনে অরুণদীপ্তির বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। যাক, কোনও কথা তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না।

বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অরুণদীপ্তি থানায় গেল। সারাটা দুপুর ওই চারটে লোকের কথা মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। পুলিশ যদি পদ্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে-তাহলে নিশ্চয়ই একটা সূত্র পাওয়া যাবে। সে ঠিক করেছিল চুপিচুপি দারোগাবাবুকে খবরটা দিয়ে আসবে। এর আগে কখনও সে থানায় ঢোকেনি। চারধারে পুলিশ এবং বিচিত্র চেহারার লোকজন।

স্লিপ পাঠিয়ে শুনল দারোগাবাবু খুব ব্যস্ত, এখনই বের হবেন। কিন্তু তার ডাক এল। ঘরে ঢুকে দেখল কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দারোগাবাবু কথা বলছেন। তাকে দেখে কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ডাক্তার সেনের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী দরকার বলুন। আমি খুব ব্যস্ত। আপনার দাদার ব্যাপার তো? কিছু মনে করবেন না, উনি এই শহরে নেই জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। শুধু ডাক্তার সেন খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাই—।' দারোগাবাবু জানালেন।

একজন অফিসার মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'স্যার, ওই ডেডবডিগুলোর কথা বলবেন বলছিলেন ডাক্তারবাবুকে—।'

'ও হ্যাঁ, গত তিনদিন আমরা দুটো বেওয়ারিশ ডেডবডি পেয়েছি। আমার লোক আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। আপনারা দেখতে পারেন।'

'ডেডবডি?' অরুণদীপ্তি কেঁদে উঠল।

'হ্যাঁ। একটা নেপালির। নিশ্চয়ই আপনার দাদা নন। অন্যটি মনে হচ্ছে বুড়ো মানুষের। তবে ডিসফিগারড। মাথার চুল সাদা।'

অরুণদীপ্তি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, 'আমার দাদা বুড়ো নয়।'

'জানি। তাই গা করিনি। এটা আমাদের রুটিন চেক।' দারোগাবাবু বললেন।

'আমি একবার দেখব দারোগাবাবু?' মেয়েলি গলা শুনে চমকে উঠল অরুণদীপ্তি। সে দেখল ঘরের এক কোণায় বেঞ্চিতে বসে আছে পদ্মা। মাথায় ঘোমটা। ও যে এই ঘরে আছে তা সে লক্ষ্যই করেনি এতক্ষণ।

'আঃ, তখন থেকে নাকে কাঁদছে। ল্যাংটো ব্যাটাছেলে না দেখলে নোলা শুকোচ্ছ না! স্বর্ণবাবু কোথায় গিয়েছে তুমি জানো না?'

'না বাবু, আমি তো বারবার বলছি, আমায় কিছু বলে যায়নি সে।'

'ওষুধ খাবে নাকি?'

'আমি সত্যিকথা বলছি বাবু, উনি শুধু আমার ওখানে থাকতেন, আর কিছু না।'

'নেকি! লীলা করতেন নীল মাখতেন না! ঠিক আছে যাও, কিন্তু ডাকলেই যেন পাই। আর মিথ্যে কথা বলেছ জানলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব।' দারোগাবাবু টুপিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আপনার বাবাকে বলবেন আমরা চেষ্টা করছি।'

অরুণদীপ্তি বলতে গেল যে এই মেয়েছেলেটা চারটে লোকের খবর জানে, ওকে চাপ দিন। কিন্তু তার আগে পদ্মা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'দারোগাবাবু, আমাকে একবার মড়া দেখতে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'আশ্চর্য! ও-দুটোর সঙ্গে স্বর্ণবাবুর কোনও মিল নেই তবু দেখতে চাইছ কেন? আর তোমার চেয়ে ওর ভাইকে দেখালে বেশি কাজ হবে!'

'ওই যে আজ বললেন পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে!'

'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

'পাহাড়ের কাছেই তো বর্ডার!'

'হ্যাঁ।'

'স্বর্ণবাবু কিছুদিন আগে বর্ডারের কথা বলছিলেন।'

'আই সি! এতক্ষণ বলোনি কেন?'

'অনেক কথাই তো বলত। সব মনে রাখা যায়?'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু এই লোকটা তো বুড়ো! আপনি কী দেখবেন?' প্রশ্নটা অরুণদীপ্তিকে।

অরুণদীপ্তি বলল, 'যদি বুড়োমানুষ হয় তাহলে দেখে কী করব? তাছাড়া আমার দাদার চুল সাদা ছিল না।'

এই সময়ে বাইরে হইচই শুরু হল। দারোগাবাবু অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে অরুণদীপ্তি আর দাঁড়াল না। এই মুহূর্তে দারোগাকে ওসব কথা বলা যাবে না। পদ্মাকে যখন পুলিশ এখানে এনেছে তখন কাল সকালেই বললে চলবে। সে হনহন করে বারান্দা ডিঙিয়ে সাইকেলে উঠল। পদ্মার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি তার ছিল না।

অনিল সেনের বাড়ির পেছনে সুন্দর বাগান এবং পুকুরঘাট আছে। অপরাহ্নের ম্লান ছায়ায় সেই ঘাটে বসে জলের শরীর দেখছিল মাধুরী। দু-দিন না বলে-কয়ে যে উধাও হয়ে গিয়েছে সে চারদিন হতে পারে, তবু চারদিন তাই সে শাশুড়িকে জানিয়েছিল। স্বর্ণকমল কখন আসে কখন যায় এ বাড়ির কেউ খবর রাখে না। বেশিরভাগ দিন বাড়িতে খায় না, থাকলে ঘর ছেড়ে বের হয় না। অনেক কান্নাকাটি অনেক চেঁচামেচির পর এখন সম্পর্কটা থিতিয়ে রয়েছে। স্বর্ণকমল সেদিন নেশার ঘোরে বলেছিল, 'কেন পড়ে আছো বুঝি না! চেহারা ভালো স্বাস্থ্য ভালো—ডিভোর্স চাও দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি কী দোষ করলাম?' মাধুরী স্পষ্ট শুধিয়েছিল।

'কিছু না। সুন্দরী মেয়ে আমার সহ্য হয় না। পুতুল-পুতুল লাগে।'

'তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

'এই 'কেন'র উত্তর যদি জানতাম। ডাক্তার অনিল সেনকে জিজ্ঞাসা করো কেন আমি বিয়ে করেছি। তাছাড়া তোমাকে দেখলে আমার একটুও উত্তেজনা আসে না।'

মাধুরী কিছুই দেখছিল না। একটা অবশ অনুভূতি সর্বাঙ্গে নিয়ে বসেছিল। আট মাস তো হয়ে গেল। এবার বাপের বাড়ি চলে গিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেই হয়। লোকটা তো তাই চাইছে। আর এখন যদি সে মুক্ত হয়, তাহলে—! মাধুরী দু-হাতের বেড়ে চিবুক রাখল। না, পুরুষের অভাব হবে না তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে। এই আটমাসে লোকটার ওপর তার একটুও মায়া পড়েনি। নিজের কাছেই অবাক লাগে, সে এখনও কুমারী রয়ে গেল! মাধুরী সিদ্ধান্ত নিল, এবার লোকটা ফিরলে কথা বলে ছেদ টানতে হবে। তার বিয়ের আগে তো কৃপাপ্রার্থীর অভাব ছিল না, তাহলে নিজেকে সে বঞ্চিত করবে কেন? মাধুরী দেখল, কী একটা পুকুরে পড়ল। শব্দ হল, ঢেউ কাঁপুনি ছড়ালো এবং একসময় মিলিয়ে গেল। বাঃ, চমৎকার।

'কী ভাবছ বউদি?'

মাধুরী চমকে মুখ তুলল। তারপর হেসে বলল—'আমার ভাগ্যটার কথা।'

'দূর! ওসব ভেবে কী হবে? ওঠো তো!' অরুণদীপ্তি তাগাদা দিল।

'কেন?'

'এক জায়গায় বসে থাকতে হবে না। দাদা-দাদার মতো আছে তুমি তোমার মতো থাকো না! চলো, হাঁটি।' অরুণদীপ্তি হাত বাড়াল।

'কী নিয়ে থাকব অরুণ?

'কত কী আছে পৃথিবীতে!'

'ছেড়ে দাও এসব কথা। কোনও খবর আসেনি, না?'

'না।'

'খবর না আসা পর্যন্ত আমি যেতেও পারছি না।'

'যাবে, কোথায় যাবে?'

'তোমাদের বাড়িতে আমার সংসার করা হল না অরুণ। তোমার দাদা আমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছেন। এভাবে তো কোনও মানুষ থাকতে পারে না। ভেবেছিলাম একবছর দেখব। কিন্তু না, ও ফিরে এলেই আমি চলে যাব।'

এই সময় একটি চাকর বাগানে এসে দাঁড়াল, 'ছোটবাবু, আপনাকে ডাকছে।'

'কে?'

'একটা মেয়েছেলে। নাম জানি না।'

অরুণদীপ্তি অনুমান করতে পারছিল না। হনহন করে সে সামনের গেটে পৌঁছে হোঁচট খেল। পদ্মা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে সেই বুড়োটা। রাগে মাথায় আগুন জ্বললো। সে চকিতে পেছন ফিরল, না, কেউ নেই। কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই? এখানে কেন?'

পদ্মা যেন সেসব গায়েই মাখল না। তার গলা কাঁপছে, 'আমি মড়া দেখে এলাম।'

'তা আমাদের কী?'

'আমার মনে হচ্ছে', ডুকরে উঠল পদ্মা, 'মনে হচ্ছে ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর।'

'কী যা-তা বলছ?' চিৎকার করল অরুণদীপ্তি, 'দারোগা বলল লোকটা বুড়ো!'

ঘনঘন মাথা নাড়ল পদ্মা। তার চোখ জলে বন্ধ, ঠোঁট টিপে রেখেছে। অরুণদীপ্তি আবার আড়চোখে বাড়ির দিকে তাকাল। মা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ওখান থেকে যদিও কোনও কথা শুনতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানতে চাইবেন। হঠাৎ পদ্মা বলল, 'আপনারা একবার দেখুন। আমি প্রায় নিশ্চিত যে উনিই স্বর্ণবাবু। তবু মানুষের তো ভুল হয়।'

'দারোগা বলেছিল লোকটার চুল সাদা, দাদার তো কালো চুল!'

'উঁহু, উনি মাথায় রং মাখতেন। একটু পাকতে আরম্ভ করলেই রং মাথা শুরু করেছিলেন। আপনার মা-বউদিকে জিজ্ঞাসা করুন।'

পদ্মা তখনও কেঁদে যাচ্ছিল। আর বুড়োটা মাঝে-মাঝে বলছিল, 'কাঁদিস না পদ্মা, কাঁদিস না।'

অরুণদীপ্তি ভেতরে-ভেতরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। দাদার মাথার চুল সাদা ছিল? এক বাড়ির ছেলে হয়ে সে জানত না? হঠাৎ এই স্ত্রীলোকটিকে সে ঈর্ষা করতে আরম্ভ করল। এবং সেই কারণেই ক্রোধ প্রকাশ করতে পারল অরুণদীপ্তি, 'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তুমি।'

'বাঃ, আমি কাঁদব না? আমি তো কিছুই চাইনি, একটু কাঁদতে পারব না? আপনি আর দেরি করবেন না। আমি পুলিশকে বলে এসেছি। আপনি গিয়ে একবার দেখুন, আপনার বউদি যদি যায় খুব ভালো হয়। আপনারা যদি চিনতে পারেন তাহলে আমি ওই চারজনকে ছাড়ব না। একবার শুধু বলে দিন ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর, তাহলেই আমি বদলা নেব।' হিসহিস শব্দ করল পদ্মা।

এবার নাড়া খেল অরুণদীপ্তি। সেই চারজনের প্রসঙ্গ মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এদের কথা তুমি পুলিশকে বলেছ?'

'মাথা খারাপ! সঙ্গে-সঙ্গে ওরা পিছলে বেরিয়ে যাবে। আপনি আসুন, আমি ওখানেই যাচ্ছি।' পদ্মা ফিরে গেল বুড়োকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ কী করবে বুঝতে পারল না অরুণদীপ্তি। পেছনে ফিরলেই মা তাকে ইশারায় ডাকবেনই। না, নিজের চোখে দেখবে সে। নিজের দাদাকে সে ভালো চেনে। কে কী বলল আর সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নিতে হবে! বরং ফিরে এসে মাকে গল্পটা বলা যাবে। অরুণদীপ্তি গেট খুলে বেরিয়ে এল।

নদীর পাশে মর্গ। অরুণদীপ্তি পৌঁছে দেখল পদ্মারা তার আগে এসে গিয়েছে। একজন পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অরুণদীপ্তি তার সাহায্যে মৃতদেহের কাছে পৌঁছাল। উৎকট পচা গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। তখন মর্গে মাত্র দুটো মৃতদেহ। নাকে রুমাল দিয়ে তাদের সামনে পৌঁছে অরুণাদীপ্তি দেখল পদ্মাও তার সঙ্গ নিয়েছে। ডোমটা দেখাল। একটি নেপালির তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয়টির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠল যেন। উঃ, কি ভয়ানক!

লোকটার চোখ দুটো নেই। দুটো ঠোঁট কেটে নেওয়া হয়েছে। বুকের কাছে বিশাল ক্ষত। হাত এবং পা, কবজি এবং গোড়ালির ওপর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। থাই-এই কাছে ক্ষত। সমস্ত শরীর বেঢপ ফুলে নীলচে কালো হয়ে রয়েছে। দু-বার তাকালেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এবং চুল সাদা কিন্তু একটা কালচে ভাব আছে। অরুণদীপ্তি মাথা নাড়ল, না, এ তার দাদা নয়। দাদার শরীরের আকৃতির সঙ্গে মিলছে না। নাক কান তো সব মানুষের একরকম হতে পারে। সে মাথা নাড়ল।

সেটা দেখে পদ্মা বলল, 'যাতে কেউ চিনতে না পারে তাই ওইরকম কেটে দিয়েছে। স্বর্ণবাবুর বুক আর থাই-তে জরুল ছিল, সেখানটাই কেটেছে।'

মাথা নাড়ল আবার অরুণদীপ্তি, 'এ আমার দাদা নয়।'

'দাঁত দেখুন, ভেতরের দাঁত, পেতলে বাঁধানো।' চাপা গলায় বলল পদ্মা।

ডোম হাঁ-মুখ দেখার ব্যবস্থা করে দিলে অরুণাদীপ্তি চমকে উঠল। হ্যাঁ পেতলের দাঁত এবং পেতলের ওপর এস লেখা, খুব সূক্ষ্মভাবে। তার মাথাটা ঘুরে গেল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পুলিশটা জিজ্ঞাসা করল, 'কী, চিনতে পারলেন?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি। না। তারপর প্রায় দৌড়ে বড় রাস্তায় চলে এসে রিক্সা নিল।

মায়ের ঘরে ঢুকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর টলছিল। চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন শোভনা। তারপর উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন, তিনি, 'কী হয়েছে?'

'দাদা! মর্গে। ওরা দাদাকে মেরে ফেলেছে!'

'কোথায়?' শোভনার মুখে উদ্বেগ। বুঝতে পারছিলেন খবরটা ভালো নয়।

একটা আর্তনাদ ছিটকে এল শোভনার গলা থেকে, 'কী বললি?'

বিছানায় বসে দুহাতে মুখ ঢাকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর কাঁপছিল।

'কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।' শোভনা ছেলের দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন।

অরুণদীপ্তির সময় লাগল। স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। তারপর এক-এক করে সে সমস্ত ঘটনা উগরে গেল। শেষ হওয়ামাত্র শোভনা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তুই দেখেছিস পেতলের ওপর লেখা?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি, হ্যাঁ।

'আর শরীব? হাত পা মুখ?'

'চেনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু চেনা যাচ্ছে না।'

'পেতলে এস লিখে কেউ তো দাঁত বসিয়ে দিতে পারে, পারে না?'

অরুণদীপ্তি চমকে উঠল, 'কেন বসাবে?'

'যারা খুন করেছে লোকটাকে তারা লুকোতে চাইবে। আবার এও তো হতে পারে আর একটা লোকের পেতলের দাঁতে এস লেখা ছিল। একটা পেতল দিয়ে মানুষ চেনা যায়? না, আমি বিশ্বাস করি না। যে ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি তার শরীর একবার দেখলেই আমি চিনতে পারব। আমি না দেখা পর্যন্ত তুই কাউকে এসব কথা বলবি না।' শোভনার কণ্ঠ কঠোর।

পরদিন ভোরে দারোগাবাবু এলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনাদের খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন উপায় নেই। যে লোকটিকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না তার সম্পর্কে গতকাল একটি স্ত্রীলোক দাবি করেছিল স্বর্ণবাবু বলে। আমরা আমল দিইনি।'

'স্ত্রীলোক!' অনিল সেনের চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। বাজারের মেয়ে। কিন্তু আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। খুনী ধরা পড়েনি। মনে হচ্ছে সে চিনতে পেরেছে বলেই খুনি তাকে বাঁচিয়ে রাখেনি।'

'একটা বাজারেব মেয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আপনার নয়! স্বর্ণবাবুর তো সুনাম ছিল না। বডি যদি স্বর্ণবাবুর হয় তাহলে [illegible] খুব জটিল হয়ে যাবে। সমস্ত শহরেব লোক জেনে গিয়েছে। এখন আপনাবা একবার যদি আইডেন্টিফাই করে দেন তাহলে মেয়েটির খুনি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারি।' দারোগাবাবু জানালেন।

অনিল সেনের চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো স্বর্ণকে চেনেন। আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না?'

'না। কারণ, ওর হাত-পা-চোখ-ঠোঁট সব কেটে নেওয়া হয়েছে। শরীরের রং পালটে গেছে, চুল সাদা এবং অনেক ক্ষত।'

চুল সাদা? আমার ছেলের চুল সাদা ছিল না।'

'আমরা তাই জানি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কাল বলেছে স্বর্ণবাবু চুল রং করত। আজ আমি সেটা দেখে প্রমাণ পেয়েছি। আমার মনে হয় একমাত্র আপনার স্ত্রী এবং বউমা ছাড়া আর কারও পক্ষে এই অবস্থায় ওকে চেনা মুশকিল।' দারোগাবাবু বললেন।

অনিল সেন এবার প্রতিবাদ করলেন, 'আমার বাড়ির মেয়েবা যার-তার মড়া দেখতে যাবে? অসম্ভব!'

ঠিক তখনই শোভনা এলেন, 'আমি যাব।'

'তুমি যাবে?' অনিল সেন চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ। ভুল বোঝাবুঝির শেষ হওয়া উচিত। বউমাকে আমি বলেছি, সে-ও যাবে।'

অনিল সেন হতাশ গলায় বললেন, 'যা হয় করো, আমার আর মুখ দেখানোর উপায় রইল না। তবে ওটা যদি স্বর্ণ হয় তাহলে বউমা বেঁচে গেল, এইটুকুই লাভ।'

সমস্ত শহর মর্গের সামনে ভেঙে পড়েছে বললে খুব বেশি বলা হবে না। স্বর্ণকমল সেনের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে পাহাড়ে। এই শহরের এককালের টেরর স্বর্ণকে কেউ খুন করেছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না ভালো করে। শহরের এক বেশ্যা যে কিনা স্বর্ণর রক্ষিতা ছিল সে চিনতে পেরেছে বলেই খুন হয়ে গেছে। রহস্যের গন্ধ এতটা প্রবল যে সবাই ভিড় করে এসেছে খবর পেয়ে। এই অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে শোভনা বউমা আর ছোট ছেলেকে নিয়ে মর্গের সামনে নামলেন। সাদা পোশাকেও রুচির ছাপ রয়েছে। চারপাশে গুঞ্জন শুরু হল। দারোগাবাবু ওঁদের নিয়ে দরজার সামনে এলেন, 'আপনারা একটু শক্ত থাকবেন। বডি পচছে। খুব দুর্গন্ধ। একসঙ্গে যাবেন?'

শোভনা বললেন, 'আমি আগে যাব। আমি না চিনতে পারলে বউমা যাবে।'

দারোগা একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন। ডোম নিয়ে গেল ঘরে। শিউরে উঠলেন শোভনা। ভগবান, মানুষ এত নির্দয় হয়! কিন্তু একি স্বর্ণ? শরীবের যেসব জায়গায় ক্ষত সেখানেই চিহ্নগুলো ছিল। ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ ভাঙা ছিল, সেটাও এখন প্রমাণ করা যাবে না। চিনতে না পেরে এই দুর্গন্ধটাকে সহ্য করে ফেললেন শোভনা। ডোমকে বললেন, 'ওদের ডাকো।'

মাধুরী এল। মুখে আঁচল চেপে। ফ্যালফ্যাল করে দেহটাকে দেখল। এই প্রথম একটি নগ্ন পুরুষের দেহ দেখল সে। স্বর্ণকমল কখনও তার সামনে নগ্ন হয়নি। দারোগা জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পারছেন? ওর চুল সাদা ছিল?'

একদিন চুলের গোড়া সাদা দেখেছিল মাধুরী, পরদিনই কালো। বাইরে রং করে আসতেন। কিন্তু এত সাদা? সে জিজ্ঞাসা করল, 'দাঁত দেখব? মনে হয় দাঁতটা বাঁধানো ছিল!'

'ও হ্যাঁ। কাল স্ত্রীলোকটি তাই বলেছিল বটে। আমার খেয়াল ছিল না।' দারোগার নির্দেশে ডোম দাঁত দেখাল। দুটো দাঁত নেই। কিন্তু কোনও পেতল দেখা গেল না। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন শোভনা, 'না, এ আমার ছেলে নয়।'

দারোগা ডোমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'পেতলের দাঁত কোথায়?'

ডোম মাথা নাড়ল, 'হামি জানে না সাব।'

দারোগা বিড়বিড় করলেন, 'কী আশ্চর্য! স্ত্রীলোকটি বলল একটা পেতলের দাঁত আছে আর এখন দুটো দাঁত উধাও!' তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে কেউ এখানে ঢুকেছিল?'

ডোম সজোরে প্রতিবাদ করল, 'নেহি সাব।'

শোভনা পুত্রবধূকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, দারোগা তাঁকে আবার অনুরোধ করলেন, 'মিসেস সেন, ভালো করে দেখুন, আর কোনও চিহ্ন আছে কিনা!'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'কী আশ্চর্য! আমার ছেলেকে আমি চিনব না?'

দারোগা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে? ইনি আপনার স্বামী নন?'

কী বলবে মাধুরী! স্বর্ণকমলকে যতটা সে দেখেছে তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? সে নীচু গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখনই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। মা এবং স্ত্রী বলছে ওটা স্বর্ণকমলের শরীর নয়। নাটকটা জমল না বলে ভিড় পাতলা হল। দারোগা বললেন, 'ওই স্ত্রীলোকটির জন্যে আপনাদের বিব্রত করলাম, উপায় ছিল না। তবে ভালোই হল, স্বর্ণবাবু বেঁচে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি কেন খুন হল বুঝতে পারছি না!'

এই সময় স্ত্রীলোকটি মৃতদেহ নিয়ে আসা হল মর্গে। ক্ষতবিক্ষত চেহারা। কারা যেন কুপিয়ে

মেরে গেছে। শোভনা সেদিকে না তাকিয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে রিকশার কাছে চলে এলেন। অরুণদীপ্তি রিকশার পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'চিনতে পারলে না?'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'না, তোর দাদা নয়। ওরা বলছিল পেতলের দাঁত ছিল, কিন্তু আমরা তো দেখতে পেলাম না। অত কুৎসিত শরীর তোর দাদার নয়।' কথাটা শুনে আঁতকে উঠল অরুণদীপ্তি। সেই চারজন লোক। চকিতে পদ্মার কথা মনে পড়ল। ওর মুখ দেখে শোভনা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে কী দেখছিস? তাড়াতাড়ি বাবাকে খবর দে। এ স্বর্ণ নয়, আমাদের কিছুই হারায়নি, তিনি মাথা উঁচু করে প্র্যাকটিশে যেতে পারেন। যা।'

বিহ্বল অরুণদীপ্তি বেরিয়ে গেলে শোভনা রিকশায় উঠলেন। হঠাৎ শোভনা আবিষ্কার করলেন, মাধুরী ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে আছে। অসহিষ্ণু গলায় তিনি ডাকলেন, 'কী দেখছ ওদিকে, উঠে এসো!'

মাধুরী নিঃস্ব গলায় বলল, 'ওই মেয়েটাকে ওরা এক ঘরে ঢোকাচ্ছে, মা!'

শোভনা বললেন, 'তাতে তোমার কী!'

মাধুরী ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমার কী!'



কেউটের জাত

সাধারণত খুব সক্কালে ঘুম ভাঙে রতনের। তখন একটা মিহি ছায়া জড়ানো থাকে ঘরটায়। হাত বাড়িয়ে সীমাকে জাগাতে একটু সময় লাগে।

আজ মধ্যরাতে বৃষ্টিপাতের দরুনই সম্ভবত ঘুম একটু বেশি সময় ছিল। চোখ খুলে অভ্যাসে হাত বাড়াতে রতন বুঝল পাশে কেউ নেই। সীমা কখন উঠে গেছে। রতন তড়াক করে উঠে বসার চেষ্টা করে দেখল সে শুয়েই আছে, শরীরটা সামান্য কেঁপে উঠেছে মাত্র। সঙ্গে-সঙ্গে সচেতন হল এবং শুয়ে-শুয়েই সীমার নাম ধরে বারকতক ডাকল।

সীমা সাড়া দিচ্ছে না। রতন বিছানায় গড়াল। গড়াতে তার কোনও অসুবিধে হয় না! সীমা যেখানে শুয়েছিল, সেখানে চিমসে হওয়া পাশবালিশ ছাড়া আর কিছু নেই। রতন অজান্তেই উচ্চারণ করল, 'শা-লা!'

ঠিক তখনই যে সীমা ঢুকবে তা ভাবতে পারেনি রতন। কথাটা কানে যেতেই যে গলাটা বাজলো তাতেই মাথা ধরে গেল রতনের, 'কী বললে? ছি-ছি-ছি! বাপ হয়ে এইসব আওড়াচ্ছো ছেলেমেয়েরা তো শিখবেই। কি ছোটলোকের পাল্লায় পড়েছি গো!'

রতন কিছুক্ষণ বউ-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। ছিমছাম দেখতে এখনও, মুখে জল দিলে বেশ দেখায়। সীমা আবার বলল, 'তুমি কাকে শালা বললে?'

রতন বিড়বিড় করল, 'ঠিক কাউকে নয়—!'

'মিথ্যে কথা। তুমি মিথ্যেবাদী। কাল রাত্রেও তাস পিটিয়ে এসেছ আর বেমালুম বলে গেলে অফিসে ছিলে!'

'কে বলেছে?' রতনের গলাটা দুর্বল শোনাল। কাল রাত দশটায় বাড়ি ফিরেছে সে। তখন তো কথাটা বিশ্বাস করেছিল সীমা, এর মধ্যেই ফাঁস হয়ে গেল কী করে?

'তুমি, তুমি! ঘুমের মধ্যে নোট্রাম-নোট্রাম বলে চেঁচাচ্ছিলে!'

রতনের ইচ্ছে করল নিজেকে ঠাস করে চড় মারে। ঘুমের মধ্যে কথা বলা ওর একটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নিজের কিছু করার উপায় থাকে না অথচ কত গোপনীয় কথা বেমালুন উগরে দেয় সে সময়। আর এই মেয়েছেলেটা বোধহয় তক্কে-তক্কে থাকে সেই সব শোনার জন্যে। আজই ডক্টর সেনের কাছে যাওয়ার কথা তার। ভদ্রলোক যদি এটা বন্ধ করতে পারেন তো বাঁচা যায়।

রতন করুণ গলায় বলল, 'দাও।'

সীমার চোখে এখনও বিষ দৃষ্টি। সেই সময় মোক্ষদা বাইরে থেকে বলল, 'বউদি, বাজার নেই।'

'যাচ্ছে।' সীমার গলাটা পালটাল। তারপর দ্রুতহাতে জিনিসটা রতনের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'চটপট বাজার করে নিয়ে এসো। তারপর চা খাবে।'

সীমা আর দাঁড়ায়নি। রতন দেখল জিনিসটা প্লাস্টিকের। কিছুতেই আসলটা হাতছাড়া করবে না সীমা। প্লাস্টিক বলেই সারাদিন সতর্ক হয়ে থাকতে হয়, বেশি চাপটাপ পড়লে যদি ভেঙে যায় তাহলে হয়ে গেল। কিন্তু ওই জাঁহাবাজ মেয়েছেলে যে মহা ধড়িবাজ!

ঠিকঠাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রতন বাইরে দাঁড়াতেই শুনল, 'বেলা আটটা অবধি ঘুমুলে, না খেয়ে অফিসে যেতে হবে। বাজারটা করে তবে চা গিলো।'

সাতসকালে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হল না রতনের। মুখে জল দিয়ে বাজারে ছুটল সে। সত্যি আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। অন্যদিন এই সময় দুধের দোকানে লোক থাকে না, আজ লম্বা লাইন। বাজার বসার আগেই সে বাজারে গিয়ে হাজির হয়। তখন মনে হয় সে যদি দোকানদারগুলোকে রাত্তিরে বলে আসতে পারত, ভাইসব, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, ভোরে আমায় জিনিসপত্র দিতে হবে, তাহলে চমৎকার হত। সীমার জন্যে পাতিলেবু এবং আমড়া অবশ্যই চাই। আমড়া না পেলে চালতে। দেরি হয় এই জন্যেই। এসবের চাটনি ভরদুপুরে সীমা খায় রসিয়ে-রসিয়ে, আর সেই কারণেই রতনের ওসব একটুও খেতে ইচ্ছে করে না। সীমা অবশ্য বলে, 'ব্যাটাছেলে টক খাবে কী!'

বাজারের থলে নিয়ে ফিরছিল রতন, এমন সময় চায়ের দোকান থেকে কে যেন ডাকল। ঘাড় ঘোরাবার যার সময় নেই, দুবার ডাক শুনলে সে কী করে। অপরেশ! বেঞ্চিতে পা তুলে বসে চা খাচ্ছে। রতন চেঁচাল, 'কী বলছ?'

'এদিকে এসো দাদা, জরুরি খবর আছে।'

রতন কাছে এল, 'তাড়াতাড়ি বলো, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

'আঃ দেরি! চা খাবে?'

'না।' বলতে বিশ্রী লাগল যদিও।

'তুমি মাইরি বউদিকে বড্ড ভয় করো।'

কোন শালা করে না! চটপট বলো যা বলবে।'

'তোমার কোথায় অপারেশন হয়েছিল?'

'কেন?'

'আমারও আলসার হয়েছে।'

রতন শক্ত হল। অপরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু জরিপ করল। তারপর বলল, 'হাসপাতালে যাও, হাসপাতালে যাও।'

বলে আর দাঁড়াল না। অপরেশটা রসিকতা করছে কিনা কে জানে! রতনের সব হারানোর মূল তো ওই আলসার। আহা, কী আরামেই না তখন দিনগুলো কাটত! সীমা টিকটিক করত কিন্তু পাত্তা দিত না রতন। তারপর যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ তখনই ওই মেয়েছেলেটা তাকে কব্জা করে ফেলল। সেবার নাম করে-করে ওকে শিশু বানিয়ে দিল। নার্সিংহোমে মতলবটি হাসিল করে এখন দুপুরে চাটনি খাচ্ছে।

অফিসে বসেই সামনের প্যাডে চারটে জিনিসের নাম লিখে রাখল রতন, যদি ভুলে যায়! জামাকাপড় পরে বের হওয়ার সময় অর্ডারটা ছুঁড়ে দিয়েছিল সীমা। সারাটা পথ জপতে-জপতে আসা হয়েছে। ছেলের বাবার ঘন দুধের টিন, কর্নফ্লেক্স, আর-আর—একটা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে রাখল রতন। এটাও অপারেশনের পর তাকে দিয়ে আনাচ্ছে সীমা। প্রথমদিন যখন দোকানদারকে স্লিপটা দিয়ে ঢাউস প্যাকেটটা হাতে নিয়েছিল তখন নিজেকে চোর বলে মনে হয়েছিল। যতই প্যাকেটের লেবেল খবরের কাগজে ঢেকে নিয়ে যাক লোকে বুঝতেই পারছে কী বস্তু নিয়ে হাঁটছে সে।

সাড়ে দশটায় অফিস ফাঁকা। তার তখন দু-একজন ছাড়া কেউ টেবিলে নেই। আজকাল লেটফেটের তোয়াক্কা করে না কেউ। এই কারণেই মনে-মনে এক ধরনের গ্লানি অনুভব করে রতন। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয় ওপরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে, এটা কী নিয়ম? কিন্তু সীমা বলেছে, তোমার কী দরকার? নিজের চরকায় তেল দাও।

এই অফিসে উপরিটা খুব চালু। পাবলিক, মানে হালদার পাবলিক নিয়ে কারবার বলেই সব সময় পাত্তি হাওয়ায় ওড়ে। রতন যে সেকশনের চার্জে, সেখানে কন্ট্রাক্টরদের আনাগোনা। না চাইতেই পকেট ভরে যায়। অবশ্য সেগুলো নির্বিকার মুখে খালি করে সীমা। মুখে বলে, 'তোমার অপারেশনের সময় হাত ফরসা হয়ে গিয়েছিল গো। তা নিজে একা খেয়ো না, অন্যদেরও দিও। তাহলে কোনও অসুবিধে হবে না। ছেলেবেলায় বাপ মা শেখায়নি দিয়ে খেতে? কী মানুষ বাবা!' তারপরেই গলা নামায়, 'ভাগ না দিলে পেছনে লাগবে সবাই, মনে রেখো।'

মিষ্টি গন্ধটা নাকে যেতেই বুকের ভেতর বাতাসটা ভারি হয়ে গেল। রতন মুখ তুলে দেখল কেতকী মুখার্জি সামনে দাঁড়িয়ে। আহা, কি ফিগার। সরকারি অফিসে সুচেহারার মহিলাদের দেখা যায় না। কেতকী যে কী করে এলেন তিনিই জানেন। ওদের ঠিক নিচের তলায় মহিলার আসন। রতনের সঙ্গে কখনও বাক্যালাপ হয়নি; সুন্দরী রমণীরা উন্নাসিকা বলেই আকর্ষণীয়া। রতন দূর থেকে দেখত আর গপ্পো শুনত। আজ টেবিলের সামনে এঁকে দেখে কেমন নার্ভাস হয়ে গেল সে।

'আপনিই তো রতনবাবু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন-বসুন, কী সৌভাগ্য।' রতন সোজা হয়ে বসতেই মচ করে শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হল সে। বেশি নড়াচড়া করলেই দ হয়ে যেতে হবে।

'সৌভাগ্য কেন?'

জিভ ভারি হয়ে গেল রতনের। কেতকী যে সীমার চারগুণ বেশি সুন্দরী, দশগুণ মদির এবং একশো গুণ উত্তপ্ত—তা কী করে বোঝানো যায়, রতন হাসাল। হাসি অনেক সময় উত্তরের বিকল্প হয়।

কেতকী বললেন, 'আমাকে এস্টাব্লিশমেন্টের স্বপন পাল বলল একমাত্র আপনি হেল্প করতে পারেন। তাই চলে এলাম। আমার অবশ্য বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে!'

রতনের পিঠ টনটন করছিল। সীমা মাইরি জীবনে অমন বড় গলার ব্লাউজ পরল না। কী সুন্দর কচি তালশাঁসের মতো দেখাচ্ছে! ব্যথাটাকে অস্বীকার করে রতন বলল, 'না, না, আপনি হুকুম করুন।'

'আপনি কী ভালো।' কেতকী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, 'ব্যাপার হল, আমার একটা স্টাফড চিতাবাঘ চাই।'

ঠিক শুনেছে কিনা বুঝতে পারছিল না রতন, 'কী?'

'স্টাফড চিতাবাঘ। আপনার এক কন্ট্রাক্টরের দোকান আছে চৌরঙ্গিতে। আপনি বললে সস্তায় পাওয়া যাবে।' হাসলেন কেতকী, 'জ্যান্ত পাব না তাই মরায় শখ মেটাই।'

এতক্ষণে বুঝে গেছে রতন। জন্তুজানোয়ার মরলে তার নাড়িভুঁড়িমাংস ফেলে দিয়ে খোলসটাকে এমনভাবে ফুলিয়ে রাখা হয় যে দেখলে মনে হবে আসলটি, এইমাত্র হেঁটে যাবে। কেতকী তাই

চাইছেন। দোকানটা যে পানওয়ানির তা জানতে সময় লাগল না। এই মুহূর্তে পানওয়ানির একটা কাজ আটকে আছে রতনের কাছে। অতএব—। সে একগাল হাসল, 'এ তো তুচ্ছ ব্যাপার, কখন চাই?'

'সত্যি! আজই ভালো হয়—চারটে নাগাদ বের হবেন?'

চারটে শুনে একটু মুষড়ে গেল রতন। ছুটির আগে বের হওয়া অভ্যাস নেই। সে বলল, 'পাঁচটার পর গেলে হয় না?'

'হয়, কিন্তু এত ভিড় বাড়ে। ঠিক আছে।' কেতকী বলেছিল যে একসঙ্গে না বেরুলেই ভালো। অফিসের লোকেরা বড্ড কেচ্ছা করে। শুনে বুকের ভেতরটা নড়বড়ে হয়ে গেল। গ্লোব সিনেমার সামনে তাই দাঁড়িয়েছিল রতন। আগে জানলে একটু ভালো জামা-কাপড় পরা যেত। আজ কিছু আমদানি হয়নি বলে অফিস থেকে পঞ্চাশটা টাকা ধার করে এনেছে সে। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় কেতকী এলেন। আহা, মেয়েরা সারাদিন অফিস করেও এত সুন্দরী থাকে কী করে? কেতকী বললেন, 'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না?'

'না, না, এই তো এলাম।'

'সত্যি আপনি খুব ভালো। এতদিন যে কেন পরিচয় হয়নি!'

রতন খুব সাহস করে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য বলে!'

'আমারও হতে পারে।' কেতকী আড়চোখে তাকালেন।

রতন খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলল। সীমা কোনওকালে এই গলায় কথা বলেনি। এই যে কেতকীর পাশাপাশি সে হাঁটছে, ভিড় বাঁচাতে দু-তিনবার কেতকীর কাঁধ ওর বাজুতে ছুঁয়েছে তাতে যে এমন নেশা-নেশা লাগে তাই বা কে জানত!

পানওয়ানি খুব খাতির করল। না করে অবশ্য উপায় ছিল না। প্রায় বিশহাজার টাকার একটা বেনিফিট ওর কাছে পাবে ব্যাটা। টেন পার্সেন্ট যে জলে চলে গেল এটা টের পেতেই একটু চিনচিন করে উঠল পিঠটা। কেতকীকে যে সুবিধা দিচ্ছে পানওয়ানি, তার পরে আর মাল পাওয়া যাবে না। সহকর্মীদের কথা ভাবছে না রতন, সীমাকে কী কৈফিয়ত দেবে সে! রাত্রে বিছানায় বডি ফেলে সেসব গল্প করে সীমার কাছে। সম্ভাব্য এই উপরিটার কথাও যে বলা হয়ে গেছে। অবশ্য বলা যায়, হল না, লোকটা চামার তাই সৎ হতে হল। বিশ্বাস করবে না সীমা। রতন যে একটা ঠগ, জোচ্চোর, অসৎ মিথ্যেবাদী—এটাই ওর দৃঢ় বিশ্বাস।

কেতকী ডাকলেন, 'আপনার পছন্দ হয়েছে রতনবাবু?'

একটা ফুটদুয়েক উঁচু চিতাবাঘের বাচ্চা। চট করে দেখলে একদম জ্যান্ত বলে মনে হয়। চোখে বোধহয় মার্বেল ঢোকানো—রতনের গা শিরশির করল। সে ঘাড় নাড়ল। চারধারে বিভিন্ন মৃতপশুকে জ্যান্তের ভানে দাঁড় করানো আছে। অমন যে হিংসুটে বাজপাখিটা সেও মৃত। বিভিন্ন মুডে পশুগুলোকে রাখা হয়েছে। হঠাৎ রতনের মনে হল একজন মেমসাহেব ওকে দেখছে। তাকেও কী স্টাফড মনে করছে বুড়ি। সে চোখের পাতা ফেলল, হাত নাড়ল এবং তারপর কেতকীকে প্রশংসার গলায় বলল, 'আপনার পছন্দ আছে।'

কেতকী গলিত হলেন। কিন্তু পানওয়ানিকে খুব জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে রতনের, মানুষের শরীর স্টাফড করা যায় না কেন?

ট্যাক্সিতে উঠে কেতকী বললেন, 'আপনি কোনদিকে?'

'উলটোডাঙা।'

'ওমা, তাই নাকি! আমি সল্টলেকে। কী ভালো, উঠে আসুন নামিয়ে দিয়ে যাব। সত্যি, আপনি না থাকলে এত সস্তায় এ জিনিস পেতাম না।'

মাঝখানে চিতাবাঘটা হিংস্র চোখে দাঁড়িয়ে, দুই জানলায় ওরা দুজন। মনে-মনে মাথা নাড়ল রতন। কেতকী তাকে বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামালেই সর্বনাশের বাকি থাকবে না। 'আমাকে

নিয়ে বের হতে গেলে তোমার অম্বল হয় অথচ পরের মেয়েছেলে নিয়ে ফুরতি করতে খুব মজা লাগে!'

গাড়িটাকে ভি.আই.পি. রোডে যেতে দেখে স্বস্তি পেল রতন। যাক, ওখান থেকে আর উলটোডাঙায় উজিয়ে যাওয়া যাবে না। কেতকী বললেন, 'জানেন, আমি না খুব ছিমছাম থাকতে ভালোবাসি। আমার কর্তা বলেন এটা নাকি আমার বাতিক।'

বেশ অবাক হল রতন। কেতকী যে বিবাহিতা তা টের পায়নি সে। না কোনও চিহ্ন, না অফিসের সূত্রে! অবশ্য শেষটি সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল নয়, কারণ তাদের বসার জায়গা আলাদা ফ্লোরে।

সে জানে না কেন, তবু দুঃখিত গলায় বলল, 'বাতিক কেন হবে?'

'বলুন! জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারের আর যাই থাক—।' কথা শেষ করলেন না কেতকী।

'উনি জাহাজের?'

'হ্যাঁ। ছ'মাস তো জলেই ভাসেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। রতনের কেবলই মনে হচ্ছিল, কেতকীর সঙ্গে কথা বলে, হেঁটে, গাড়িতে বসে তার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠছে।

কেতকী বললেন, 'আপনার যদি অসুবিধে না হয়, চলুন না আমার বাড়ি দেখে আসবেন। এত করলেন আমার জন্যে, আজকাল তো স্বার্থ ছাড়া কেউ কিছু করে না।'

'না থাক।'

'কেন?'

খুব সাহস করে রতন বলল, 'হয়তো আমার কোনও স্বার্থ বেরিয়ে পড়বে।'

হাসিতে ভেঙে পড়লেন কেতকী, 'বাব্বা, আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা যায় না। না, কোনও কথা শুনতে চাই না, একটু কফি খেতেই হবে।'

ইচ্ছে করছিল কিন্তু জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারকে দেখতে চাইছিল না রতন। বলল, 'আপনারও তো অসুবিধে থাকতে পারে!'

'ওমা, তাহলে বলব কেন? বাড়িতে আমার শাশুড়ি ছাড়া কেউ নেই।'

'তিনি?'

'ও, তাই বলুন। তিনি এখন প্রশান্ত মহাসাগরে সাঁতার কাটছেন। আমার মতো ছোট বিলে আসার সময় নেই।'

'বিল না দিঘি?'

আবার হেসে বিগলিত হলেন কেতকী।

সত্যি বড় সুন্দর বাড়ি কেতকীর। খুব যত্ন করে চা দিলেন তিনি। চিতাবাঘটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'এটাকে দেখলেই আপনার কথা মনে পড়বে।'

রতনের আর একটু দুঃসাহসী হতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পিঠে বড্ড ব্যথা হয় ওসব বাসনা হলে। বিদায় নেওয়ার সময় কেতকী বললেন, 'এই, ইচ্ছে হলেই চলে আসবেন, হুঁ?'

মাথা নাড়ল রতন। নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছিল ওর। শেষমুহূর্তে কেতকী বললেন, 'একটা কথা, অফিসের কাউকে এসব বলবেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালিরা ভীষণ কুচুটে হয়!'

প্রায় উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরছিল রতন। ব্যাপারটা যখন গোপন রাখতে চাইছেন কেতকী তখন অনেক সম্ভাবনা আছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই নিজের অজান্তে পা ভারী হয়ে গেল তার। হ্যাঁ, বড্ড রাত হয়ে গেছে। সীমার মুখখানা নিশ্চয়ই গনগনে। কিন্তু এটা তো হতেই পারে, পুরুষমানুষের দশটা কাজে জড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মনে-মনে তৈরি হল সে। আজ কোনও তোয়াক্কা করবে না।

দরজা খুলেই সীমার চোখ ছোট হল, 'কোথায় ছিলে?'

'কাজ ছিল।'

'বলে যাওনি তো?'

'হঠাৎ হল।'

'কী কাজ?'

'সব কৈফিয়ত দিতে হবে তোমাকে?'

নিশ্চয়ই। খবরদার মুখে-মুখে কথা বলো না। ট্যাক্সিতে কার সঙ্গে যাচ্ছিলে চিতাবাঘ নিয়ে?'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল রতন। এতক্ষণের প্রস্তুতির দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। সে সটান বাথরুমে ঢুকে গেল। বাইরে সীমা গজরাচ্ছে, 'লম্পট, চরিত্রহীনের সঙ্গে ঘর করা যায় না। ভাগ্যিস পাশের ফ্ল্যাটের রায়বাবু ধর্মতলায় গিয়েছিলেন, নইলে জানতেই পারতাম না এত। চোখে-চোখে রাখছি তবু স্বভাব পালটালো না। পুরুষমানুষকে চিতায় তুললেও বিশ্বাস নেই।'

সহ্য করতে পারল না রতন। ছিটকে বেরিয়ে এল সে বাইরে। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার বলছি, একদম টিকটিক করবে না। বাপমায়ের শিক্ষা পাওনি তাই এত নিচু মন।'

'কী! বাপ-মা তুলে কথা বললে? অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে ফুর্তি করবে আর বললেই দোষ! আমাকে শেষ করে ট্যাক্সি চড়িয়েছ? আজ তোমার তেজ বের করব, দাঁড়াও!'

'কী করবে তুমি? সীমার রণরঙ্গিণী মুখ দেখে ঘাবড়ে গেল রতন। সীমা হঠাৎ এক ঝটকায় মত পালটে চলে গেল সামনে থেকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন রতনের। অনেকদিন বাদে বিদ্রোহ করা গেল। কিন্তু একটু বাদেই ক্রমশ শীতল হয়ে যাচ্ছিল সে। গেল কোথায় সীমা? যা রাগী মেয়ে, আত্মহত্যা-টত্যা করে বসবে না তো! সে পাশের ঘরে উঁকি মারল। খোকা একলা ঘুমুচ্ছে। ফ্ল্যাটে সীমা নেই। ধক করে উঠল বুকের খাঁচা। পিঠটা এমন টনটন করছে যে দাঁড়াতে পারছে না সে। বাইরের দরজা হাট করে খোলা। উঁকিঝুঁকি মেরেও সীমার দর্শন পাওয়া গেল না। কোথায় গেল ও? রেগেমেগে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে গিয়ে বসে নেই তো? না, এত রাত্রে নিশ্চয়ই যাবে না। সীমা যদি আত্মহত্যা করে?

হঠাৎ কেমন অসহায় বোধ করল রতন। এবং অবসন্ন। নিজেকে শেকড়-ছেড়া বৃক্ষের মতো মনে হচ্ছিল তার। এবার আর দাঁড়াতে পারছিল না সে। দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিজের অজান্তেই।

ঘুমিয়ে পড়েছিল হয়তো, কারণ কখন সীমা ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি। কটকটে আলো জ্বলছে ঘরে। হাত-পা নাড়তে গিয়ে চিৎকার করে উঠল রতন। ওপর-নীচ দুদিকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বিন্দুমাত্র নড়তে পারছে না।

চোখের সামনে সীমা কোমরে হাত রেখে বিজয়নীর হাসি হাসল, 'খুব তেল হয়েছে, না? অপারেশনের সময় আসলটা খুলে প্লাস্টিকেরটা ঢুকিয়েছি তাতেই এত তেজ! এবার ঠান্ডা করছি।'

রতন ডুকরে উঠল, 'না, না, প্লিজ, তোমার পায়ে পড়ছি মাইরি—।'

'পুরুষমাত্রই বাঁদর, আর কখনও বিশ্বাস করি? ভাবলাম প্লাস্টিক ভেঙে যাবে এই ভয়ে বেশি বাঁকাবে না! তাতেও রক্ষা নেই!'

এই মুহূর্তে সীমাকে দক্ষ সার্জেনের মতো লাগছিল। সামনের আলমারির পাল্লা খোলা। ওর চাবি কখনও হাতছাড়া করে না সীমা। কয়েক পা এগিয়ে এসে রতনের পিঠের ওপর হাত রাখল। হাতটা দ্রুত নীচে নেমে গিয়ে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে স্থির হল। সেখানে একটা ছোট্ট গর্তের মুখ চাকতিতে ঢাকা। সেটা সরিয়ে টান দিতেই রতনের মনে হল সমস্ত শরীর ছিঁড়ে যাচ্ছে। পরিত্রাহি চিৎকার করল সে।

হিসহিসে গলায় সীমা বলল, 'এঃ এর মধ্যেই প্লাস্টিকেও মাংস গজিয়ে ফেলেছ! কি ধুরন্দর বেটাছেলে! একদিনেই এত?'

বেশ কয়েকবার টানাটানির পর ওটা সরসর করে খুলে এল। সাদা প্লাস্টিকের লম্বা বস্তুটিকে আলোয় ধরে জরিপ করল সীমা। যে রাতে সে বিরক্ত হতে চায় না সেই রাতে এটাকে খুলে রাখে, যেমন গতকাল রেখেছিল। আজ একদিনেই মাংস লাগছিল, সামান্য চিড় ধরলেও ভাঙেনি। মোটেই ভালো কথা নয়।

আলমারির ভেতর সযত্নে রাখা আসল মেরুদণ্ডটির পাশে প্লাস্টিকেরটাকে শুইয়ে দিল সীমা। এটিও চলবে না। তারপর মসৃণ আর একটি মেরুদন্ড বের করে রতনের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'একদম বেয়াদপি করবে না, এটা মোমের বেঁকালেই ভাঙবে। কী জানি বাবা, বেটাছেলে বলে কথা, মোমেও মাংস গজাবে হয়তো! কেউটের জাত!'

চোখ খুলে সামনের আয়নায় রতন দেখল একটি স্টাফড মানুষ শুয়ে আছে।

চার দেওয়াল এবং একটি খাট

ভালোবাসা মরে গেলে ঘৃণা হয়ে যায়। কিংবা এমনও তো বলা যেতে পারে, যে কোনও ঘৃণার আগে সেই ভালোবাসার শব রয়ে যায়, ডিঙিয়ে কিংবা এড়িয়ে ঘৃণায় বিদ্ধ হতে হয়। কিছু ফিরে তাকিয়ে বুকে জমা মেঘগুলোকে স্পর্শ করতে চাইবার আগেই কখন যে তপ্ত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, হায়, একটা জলের দাগও রেখে যায় না। এখন সেই ভাঙা টুকরো আগুন যা কিনা পোড়া কাঠের তলায় গনগনে তাই আগলে বসে থাকা, শুধু সতর্ক চোখে বাতাসের পথ রুদ্ধ করা যাতে দাবানল না ছড়ায় এবং এইভাবেই দিনগুলোকে খরচ করে যাওয়া। নীতিশ আর পৃথার সম্পর্ক এই রকম মুখ বুঁজে থাকায়।

ভাইরা শরিক কিন্তু বন্ধু নয়। পাঁচজনের পাঁচটি ঘরকে এখন কারোরই অন্ধকূপ মনে হয় না। পিতৃদেবের রেখে যাওয়া এই নোনালাগা বাড়ির আধা-আলো-মাখা ঘরটিতে নীতিশকে রাত থমকে গেলে ফিরে আসতেই হয়। খাটের ওপর, যে খাট তোষক গদি পনেরো বছর আগের ভালোবাসা নিয়ে বিয়ের সকালে এসেছিল মুটের মাথায় পৃথার বাড়ি থেকে, শুয়ে আছে ছড়িয়ে গুটিয়ে তিন ছেলেমেয়ে উলঙ্গ রাজার মতো। পনেরো বছর তোষক গদি হয়তো বা খাটটাকেও নিঃশেষ করেছে, আরামের ফাঁপা তুলো এখন গুটিয়ে একাকার। পৃথা আগে বলত, এখন মুখ বুজে থাকে, ওটাকে পালটানোর কথা ভুলে গেলে চোখে ঠেকে না। রোজ দেখে-দেখে অনেক কিছুই চোখ সয়ে নেয়। ওই যেমন চিমসে তোষক তেমনি পৃথার শরীর, যা ছিল রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো তা কিনা হ্যাঙারে ঝোলানো খাটো হয়ে যাওয়া শার্ট, শরীর কোনও শরীরকে টানতে পারে না আর। এখন চারধারে হাঁ-হাঁ অভাব, নিত্য কলহ শরিকদের সঙ্গে, মাসান্তের বেঁধে দেওয়া টাকাটা তুলে দিতে প্রাণান্ত হয় নীতিশের, যা দিলে বারোয়ারি ভাত ডাল দুবেলা আসে একান্নবর্তী হেঁসেল থেকে। বিয়ের, ভালোবাসার বিয়ের দু-বছর ছিল খুব মোলায়েম। প্রথম সূর্যের রং-লাগা জীবন, বড় পাবলিসিটি ফার্মের শিল্পী নীতিশ তখনও আধুনিক ছবি আঁকে, বন্ধুদের নিয়ে অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনী সাজায়, হয়ত কখনও বিক্রি হবে এই আশায়। অর্থ আসে সব কিছু মানিয়ে নেওয়ার মতন। রাতগভীরে পৃথা বুকে মুখ গুঁজে যে শব্দ উচ্চারণ করত না তা হল এখানেই মরে যেতে চাই।

তারপর যা কিনা অমোঘ তাই হল সিঁড়ি না ভেঙেই। বেপরোয়া বশ্যতা স্বীকার ধাতে নেই নীতিশের। চাকরি গেল কিন্তু অন্যত্র এল ফিরে। সেখানে মিলল না যখন মন তখন নিজেই স্বাবলম্বী হবার জেদ এল। তুলিটা জানা ছিল কিন্তু ব্যবসাটাকে নয়। ধারে-ধারে বিকিয়ে যেতে-যেতে সামাল দিল পৃথার গয়না। আর অক্ষমতা এবং অভাব কখন কুরে-কুরে খেয়ে নিল সম্পর্কটাকে। যা ছিল এতদিন ঔদার্যের ঢাকনা দেওয়া তাকে একটানে ছুঁড়ে ফেলা হল একদিন। সন্তানেরা এসে গেছে এতদিনে। তাদের মুখ চেয়ে পৃথা প্রথম প্রথম কাঁদত। হায়, কান্নার জল যে আগুনের থেকেও উষ্ণ কখনও। এখন ওরা পরস্পরের সম্পর্কে নিরাসক্ত। শুধু দিন পার করে যাওয়া। বিয়ের খাটটার একপাশে পা গুটিয়ে শোয় পৃথা, সারাদিন শরিকদের বউ-এর হাজার খোঁটা হজম করে ক্লান্ত শিরায় জড়ানো। হাত তবু নেতিয়ে পড়ে থাকে শিশুদের ওপর। খাটের অন্য কোণে চিলতে জায়গায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুম ডুবিয়ে দেয় নীতিশকে। বিছানার চাদরটার গায়ে সূচ-সুতোর সঙ্গে পৃথার স্পর্শ পিঠে ঠেকে না তার।

ডালহৌসির তিনতলায় সদ্যপ্রাপ্ত চাকরির নামটি বেশ ভরাট, বেতন নয়। ভেসে না বেড়িয়ে এখানেই দু-মাস নোঙর গেড়েছে নীতিশ। সাকুল্যে দুটি পরিষ্কার শার্ট এবং নিত্য দাড়ি কামানো সত্ত্বেও পায়ের প্লাসটিকের চটি অস্বস্তি দেয়। নীতিশ শেষ প্রতিজ্ঞা করেছে অবাধ্য হবে না এখানে। সেদিন সকালে একজন বড় ক্লায়েন্ট এলেন। তাঁর জুতোর ব্যাবসা। বিজ্ঞাপনের লে আউট করে রেখেছিল নীতিশ, মালিকের ঘরে ডাক এলে নিয়ে গিয়ে দেখাল। ক্লায়েন্ট নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'আরও স্ট্রাইকিং করলে ভালো হত। জুতো নিয়ে আধুনিক কবিতা কেউ লিখছে কিনা খোঁজ নেবেন?'

মাথা নেড়েছিল নীতিশ, অবাধ্য হবে না সে।

ক্লায়েন্ট বলেছিল, 'আপনি ছবি আঁকেন?'

মালিক বলেছিল, 'হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনের ছবি।'

সেই দুপুরেই বিজ্ঞাপনটিকে আর একবার পালটে ওর অফিসে নিয়ে গিয়ে দেখানোর হুকুম হল। পিয়ন যায় এসব কাজে। মালিক বলল, 'বড় পার্টি, আপনিই যান।'

আধুনিক কবিতার লাইন পেয়ে গেছে নীতিশ। এবারও অবাধ্য হল না। ঠান্ডা ঘরে বসে সেটা দেখে ক্লায়েন্ট বেশ খুশি। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে এখনকার বড় মডার্ন আর্টিস্টদের আলাপ আছে?'

না বলতে নেই, এতদিনে জেনে গেছে নীতিশ।

'তাহলে আমার একটা উপকার করুন। আমার এক বান্ধবী এসেছেন সুইজারল্যান্ড থেকে। ওর ভারি শখ এখানকার আধুনিক ছবি দেখার। আমি তো আদার ব্যাপারি, আপনি একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?'

সামান্য দ্বিধা কিন্তু মুহূর্তেই হাঁসের ডানা ঝটকালো নীতিশ।

হুকুমমতো গ্র্যান্ড হোটেলে চলে এল সে। বান্ধবীর বয়স হয়েছে। কিন্তু পঁয়ত্রিশে পৃথা যা হারিয়ে বসে আছে পঞ্চান্নে ইনি তা সাজিয়ে রেখেছেন। বাঙালির ছেলে কম বললে ইংরেজিটা ভালো হয়। দামি গাড়িতে করে বিদেশিনিকে নিয়ে নীতিশ এল অ্যাকাডেমিতে। ওখানে তো প্রদর্শনী লেগেই থাকে। মহিলা ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। কোনওটায় ফরাসি প্রভাব কোনওটায় জাপানি—চুলচেরা বিচার করে তিনজন নামীর নাম বললেন, ওঁদের ছবি দেখতে চান। অনেক কষ্টে অ্যাকাডেমি থেকেই ঠিকানা জোগাড় করে ছোটা হল। জানা গেল কেউ দিল্লি কেউ বোম্বাই আবার কেউ সাগরপারে পাড়ি দিয়েছেন। খুব নাম হয়ে গেলে এদেশে থাকার সময় পাওয়া যায় না বোধহয়। কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকলে বাঙালিরা বেশ ভাব করে নিতে পারে। ভাঁড়ের চা খেয়ে বিদেশিনি শুধোলেন, 'তুমি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট?'

ঘাড় নাড়ল নীতিশ, 'তবে এককালে ছবি আঁকতাম।'

'আচ্ছা! চলো তোমার বাড়িতে গিয়ে ছবি দেখে আসি।'

সঙ্গে-সঙ্গে পাথর হয়ে গেল নীতিশ। চার শরিকের নোনাধরা চোখের সামনে ঘেমো গন্ধমাখা পৃথার অগোছালো ঘরে এঁকে নিয়ে যাওয়া যায়?

মহিলা নাছোড়বান্দা। বললেন, 'সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। ভ্যানগগ, রঁদার জীবনী পড়োনি?'

খেয়াল মাথা চাড়া দিলে আকাশ হাতের মুঠোয় আসতে বাধ্য হয়। বিশাল গাড়ি অবশ্য গলিতে ঢুকল না। বিদেশিনিকে দেখে কৌতূহল সবার। নীতিশ পা ফেলছে ইঁদুরের মতন। হায়, একটা কাপও নিটোল নেই যাতে চা দেওয়া যায়! বাড়ির সামনে এসে নীতিশ বলল, 'আপনার খুব অসুবিধে হবে কিন্তু।'

'ফ্যান্টাসটিক!' মহিলা ঘুঁটে দেখছিলেন, 'তোমার স্টুডিও কোথায়?'

স্টুডিও! হাসি পেল নীতিশের। সরু প্যাসেজ দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই তেরো বছরের ছেলেকে দেখতে পেল, 'চটপট মাকে গিয়ে বল খাটের তলা থেকে ছবিগুলো বের করে ধুলো ঝেড়ে রাখতে।'

জন্মইস্তক এই বাক্যটি না শোনায় ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে বিদেশিনির পা দেখতে লাগল হকচকিয়ে। নীতিশ কী করবে বুঝতে পারছিল না। এঁকে কোথায় বসানো যায়? এ বাড়িতে একটিও বাড়তি ঘর নেই। শেষ পর্যন্ত সবার চোখের সামনে দিয়ে সে আধা অন্ধকূপে নিয়ে এল বিদেশিনিকে। অনেকদিন পর মনে হল এই ঘরটায় সত্যি মানুষ বাস করে না। এত নোংরা হয়ে কোনও মানুষ থাকতে পারে না। বিছানায় ছেঁড়া চাদর, আলনায় স্তূপ হয়ে থাকা কাপড়, দরজায় দাঁড়ানো শরিকদের বউ এবং ছেলেদের মুখ দেখতে-দেখতে একটা নড়বড়ে চেয়ার এগিয়ে দিল সে বিদেশিনিকে, 'এটা আমার ঘর।'

'তোমার স্টুডিও?'

'একদিন এটাই আমার স্টুডিও ছিল।' কথাটা শেষ করে উবু হয়ে খাটের তলা থেকে ধুলো এবং ঝুল জমে থাকা ছবিগুলো বের করতে গিয়ে একটু হোঁচট খেল সে। কতদিন এদের দ্যাখেনি সে কিন্তু প্রথমে ছেঁড়া কাপড় এবং তার নীচে কাগজ মুড়ে সযত্নে রাখা আছে ছবিগুলো। কে করল, জিজ্ঞাসা নয়, কবে করল এটাই ঢেউ তুলল আচমকা।

ধুলোর প্রলেপ কাপড়েই লেগেছিল। কিন্তু বোঝা যায় প্রায়ই হাত পড়ে এখানে। বাঁধন থেকে মুক্ত করতেই ঝকমকে ছবিগুলো বেরিয়ে এল। পনেরো বছর আগে সেই খাঁটি বাংলোদেশের গন্ধমাখা আধুনিক মননের ছাপ যে ছবিগুলোতে সেগুলো দেখে নিজেরই বুকে কাঁপুনি এল। সেকালে শুধু প্রদর্শনীতেই ঝুলেছিল মাত্র।

বিদেশিনি গালে হাত দিলেন। ছবিগুলোকে কীভাবে এই ছোট্টঘরে সাজানো যায়? শব্দে মুখ ফেরাল নীতিশ। পৃথা এখন ঘরে। ছোট্ট দুটো শব্দ 'কী হবে?'

নীতিশ প্রশ্ন শুনল অনেকদিন পরে, 'উনি সুইজারল্যান্ড থেকে এসেছেন। ছবি দেখতে চাইছেন। —আমার স্ত্রী।'

বিদেশিনি হাসলেন। পৃথা নিজেকে দেওয়াল করে একটার পর একটা ছবি তুলে ধরছে। বিদেশিনি চেয়ার ছেড়ে সেগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছেন। সাকুল্যে আটটি, কিন্তু পৃথাকে দুবার দেখাতে হল। শেষ পর্যন্ত দুটি ছবিকে বারংবার দেখলেন মহিলা। পৃথাকে বললেন, 'তোমার স্বামীর হাত কিন্তু বেশ মিষ্টি। এই ছবি দেখলে কেমন একা লাগে নিজেকে।' ইংরেজি শব্দ, অস্পষ্ট উচ্চারণ কিন্তু ভঙ্গিতে যে মায়া থাকে তাতে বোধের তারে কাঁপন লাগে। পৃথা মুখ নামাল।

প্যাক করার মতন ব্যবস্থা নেই এ ঘরে। মুড়ে দিতে হল। বিদেশিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম বল?'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আকাশপাতাল ভাবল নীতিশ। বিদেশিনি বুঝলেন কিনা জানা নেই,

ব্যাগ খুলে দু-হাজার টাকা টেবিলে রাখলেন। বললেন, 'আমি জানি না, কম দিলাম কিনা, তবে তোমার ছবি আমার দেশে দেখাব। হয়তো তোমার কাছে আরও অর্ডার আসবে। তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও এখানে।'

দামি গাড়ি ছবি দুটোকে নিয়ে ফিরে গেল হোটেলে। নীতিশ এখন আড়ষ্ট। ছবিগুলো অমন সুন্দর হয়ে ছিল কী করে? উত্তরটা সে জানে বলেই আড়ষ্টতা বেশি। এরকম কখনও হয়? মহিলার যেচে এসে ছবি কেনা এবং অজান্তে ছবিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা, কোনটা বেশি সত্যি?

খবর হাওয়ায় ছড়ায়। ঈর্ষান্বিত হলেও মুখে হাসি রাখতে জানে। রাত্রে বাড়িতে ফিরতেই শরিকদের সেই সব হাসিমুখের কৌতূহল মেটাতে হল। ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে দু-হাজার টাকা তেমনি একটা কিছু চাপা দেওয়া। বড় দুই ছেলে সেদিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

খাওয়া হল। রোজ যেমন হয়। ছেলেরা শুয়ে পড়লে নীতিশ বলল, 'ওগুলো বাইরে পড়ে আছে। দিনকাল খারাপ।'

পৃথা বলল না কিছু। মাথা আরও নীচু হল তার।

আজকের রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থাটা একটুও পালটালো না। তবে চিলতের বদলে আরও একটু বেশি জায়গা পেল নীতিশ। এখন লোডশেডিং। এই ঘরে হাওয়ারা আসে না। নীতিশের খুব ইচ্ছে করছিল পৃথাকে স্পর্শ করতে। ছোট শিশুর মতো পায়ের তলায় গুটিয়ে শুয়েছে পৃথা, রোজ যেমন শোয়।

নীতিশ বলল, 'বড্ড গরম।'

পৃথা জবাব দিল না।

নীতিশ বলল, 'শোওয়ার বড় অসুবিধে হচ্ছে না?'

পৃথা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'খাটটাকে বাড়ালে অসুবিধে হবে না।'

'খাট?'

নীতিশ মৃদু গলায় জানাল, 'খাটটাকে বাড়ালে দেওয়ালে ঠেকবে না?'

খুব ধীরে অথচ স্পষ্ট গলায় পৃথা বলল, 'তাহলে দেওয়ালটাকে সরিয়ে দাও আর একটু।'

ভালোবাসা মরে গেলে ঘৃণা হয়? কোথাও কি জলের দাগ লেগে থাকে না? কিংবা এমনও তো বলা যায় যে চোখের জলে তাপ লাগলে গনগনে আগুন জ্বলে, সেই জল জুড়িয়ে গেলে নিশ্চুপ অভিমানে মুখ লুকোয়। নীতিশ কোথায় যেন এমনটা পড়েছিল। কিন্তু সে জানত না ঘৃণা। বেঁচে উঠলে ভালোবাসায় পৌঁছে যায়। শুধু দেওয়ালটাকে বড় করার জন্যে যেটুকু অপেক্ষা।



রঙিন জামা এবং সাদা গেঞ্জি

সুধা বলেছিল, 'পুরুষজাতটাকে বাপু কোনওদিন বিশ্বাস করতে পারব না।'

সুধাময় জানে, তবু শুধিয়েছিল, 'কেন?'

'তোমাকে তো দেখছি।' সুধার মুখে কিছু আটকায় না।

সুধার সব ভালো, শুধু মাঝে-মাঝে এই কথাগুলো বেলকাঁটার মতো ফোঁটে। টেনে বের

করলেও দপদপানি কমে না। খুব অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও সুধা একই স্বভাবের। বুকে মুখ রেখে বলে, 'আমি জানি এটা ঠিক করছি না আবার না করেও যে পারি না।'

মেঘ ঘনানো মুখে বলে 'তুমি আমাকে নষ্ট করেছ।' কিন্তু তার দু-হাতের বেড় একটুও শিথিল হয় না।

প্রথম গ্রহণের পর সুধা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, 'কেন ক'বছর আগে আমাদের দেখা হল না গো।'

বুকের ভেতর তখন রক্ত ঝরে সুধাময়ের। পৃথিবীটাকে লাথি মেরে সরিয়ে শুধু সুধার সঙ্গে যদি বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। মুখে বলেছিল, 'কি জানি, হয়তো এতদিনে সম্পর্কটা বিশ্রী হয়েও যেতে পারত।'

'যেমন অঞ্জলির সঙ্গে তোমার হয়েছে?'

সুধা এই কথাটা না বললেও পারত। যা সত্যি তা সবসময় দেখতে ইচ্ছে করে না যদি তাতে দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকে। সুধা তাই করবে। যখনই দুজনের নিভৃতে কথা হয় তখনই ওর শব্দগুলো ভাঙা কাচ হয়ে যায়। কিন্তু সুধাময় জানে, সুধা তাকে যতখানি ভালোবাসে ঠিক ততখানি ঘৃণা করে কিংবা যতখানি ঘৃণা করে সেই পরিমাণেই ভালোবাসে।

মাঝে-মাঝে সুধাময়ের উদ্দাম হতে ইচ্ছে করে। অঞ্জলি কিংবা সন্তানদের নস্যাৎ করে দিতে ইচ্ছে হয়। সুধার এই সন্দেহ সহ্য হয় না তার। প্রমাণ দিয়ে দেবে সুধাই তার সব, সব শেষ কথা।

কিন্তু যে সুধা তাকে নিবিড় করে চায়, পায় না বলে জ্বলে এবং জ্বালায়, সে নিজে অছিলা বের করে অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। এসে বলল, 'এত সাদামাটা গ্রাম্য টাইপের মেয়েকে বিয়ে করলে কী করে?'

সুধাময় পুরনো কথাটা বলেছিল, 'যাচাই করিনি, জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'অথচ তাই নিয়ে তো বেশ রয়েছ। আমার দিন কাটে কি করে ভেবেছ?'

'ভেবেছি।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমাকে ভালোবাসলে কেন?'

'ফাঁদ পেতেছিলে তাই। নিজের ঘর ঠিকঠাক রেখে আমার সঙ্গে খেলা করে যাচ্ছ, ছিঃ!' ঘেন্নাটা যেন ছিটকে উঠল।

সুধাময় মুখ ভার করেছিল, 'আমি তো ডিভোর্স চেয়েছিলাম, তুমি আপত্তি করেছ একথা ভুলে যেও না।'

সুধা মাথা নেড়েছিল, 'না, কক্ষনো না।'

'তাহলে? তোমার কথাবার্তা শুনলে নিজেকে লম্পট বলে মনে হয়।'

'তা বাবা তুমি একটু তাই আছ।' সুধা এবার হেসেছিল।

আর পাঁচটা পুরুষেরা যেরকম মানিয়ে নিতে পারে সুধাময় তাই পারত, যদি সুধা ওর জীবনে না আসত। অঞ্জলির সঙ্গে মনের ফারাক সামান্য ব্যবধানেই ধরা পড়েছিল। বাড়ি থেকে বের করতে জোর খাটাতে হয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা দূরের ব্যাপার, সুধাময়ের বন্ধুদের সামনে দু-দণ্ডের বেশি দাঁড়ায় না। অঞ্জলির কাশীবৃন্দাবন হল তিন কামরার ফ্ল্যাটটা। তাকে ঘষেমেজে সাজানো, প্রয়োজনের সবক'টা হাঁ-মুখ দু-হাতে ভরাট করে যায় সারাদিন। সুধাময় অনেক বোঝাতে চেয়েছিল প্রথম-প্রথম। পুরুষের শরীরে গেঞ্জিটাই সব নয়, একটা জামাও দরকার বাইরে বের হতে গেলে। অঞ্জলি বলত, 'তুমি তোমার বাইরের জগৎ নিয়ে থাকো না, আমি তো বাধা দিচ্ছি না।'

একবার টোল খেয়ে গেলে পাত্র মাটিতে সমানভাবে বসে না। প্রায়ই ঝগড়া বাধত সামান্য সূত্র ধরে। আক্ষেপ প্রকাশে কোনও দ্বিধা থাকত না। জৈবিক নিয়মে যে সন্তানেরা পৃথিবীতে এসেছে

তারা এখনও অবোধ। সুধাময় ভাবে, এইরকম শিকলের বোঝা সারা জীবন বয়ে যেতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হব-হব অবস্থায় যখন গরম তোয়ালে দরকার তখন অঞ্জলি ভেজা গামছার মতো শীতল। এই সময় সুধা এল। আচম্বিতে। এসে ঝড়ের দোলায় কুটোকাটার বাঁধ উড়িয়ে দিল।

অথচ অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ জমে গেল সুধার। ওয়াকিং গার্লসদের হোস্টেল থেকে প্রায়ই আসে সে। অঞ্জলি তার কথা শোনে বড়-বড় চোখে, বাচ্চা সামলায় আর রকমারি রান্না করে খাওয়ায়। সুধাময়ের সঙ্গে সুধার কী সম্পর্ক তা হয়তো বোঝে না অঞ্জলি কিংবা বোঝে বলেই বোঝায় না।

সুধাময় যখন একটা কিনারায় ফিরতে উৎসুক তখন বাধা দিল সুধা। বলল, 'না, একটা ঘর ভেঙে আর একটা ঘর গড়বে, সেটাও যদি না টেকে?'

'সুধাময় বলেছিল, 'তোমার ওপর আমার ভরসা আছে।'

সুধা বলেছিল, 'আমার নেই। যদি আমি তোমাকে সুখী না করতে পারি, যদি আমার অঞ্জলির মতো অবস্থা হয়!'

চমকে উঠেছিল সুধাময়। সুধা তাকে সন্দেহ করছে? নিজেকে দুই চাকার মধ্যে দেখল সে। অথচ সুধাকে না দেখলে, সুধার কথা না শুনলে বুকের ভেতরটা টনটন করে। সুধা যেন সেই অভিধান যা কোনওকালেই মুখস্থ করা যায় না আর অঞ্জলি সহজপাঠের মতো, চোখ বোলালেই দুবার ছুঁতে হয় না।

আজ দুপুরে সুধা এসেছিল বাড়িতে। বড় মেয়ে ঝুমা বায়না ধরেছিল কিছুদিন থেকেই, চিড়িয়াখানায় যাবে। তিন বছর বয়সে সে একবারই গিয়েছিল সেখানে বাবার সঙ্গে। পাঁচে পড়ে শখ হয়েছে আবার। তিন বছরের ভাইটাও তাল মিলিয়েছে ওর সঙ্গে। সুধা বলল, 'চলুন বউদি, সবাই ঘুরে আসি।'

অঞ্জলি আপত্তি করেছিল কাজের অছিলায় কিন্তু সুধা শোনেনি। সুধাময়কে বলেছিল, 'ট্যাক্সি ডাকুন মশাই, আজ আপনার খরচ করিয়ে ছাড়ব।' একান্ত না হলে সুধা তুমি বলে না সুধাময়কে। দু-সময় দু-রকম সম্বোধন খুব সহজেই বের হয় জিভ থেকে। ভিন্ন স্বাদ আনে।

আপত্তি ছিল মনে-মনে, অঞ্জলিকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার। কিন্তু সুধার চাপে মেনে নিতে হল। অঞ্জলি সঙ্গে আছে থাক, সুধার সঙ্গে ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেড়ানো যাবে তো!

ওরা পেছনে বসল, সুধাময় ড্রাইভারের পাশে! সারাটা পথ বাচ্চা দুটো সুধার সঙ্গে বকবক করে গেল। সুধাময় দেখছিল মেয়েটারও অসীম প্রাণশক্তি! ওদিকে অঞ্জলি চুপচাপ জানলা দিয়ে শহর দেখছে। যেন আসতে হয় তাই আসা।

চিড়িয়াখানায় সামান্য ঘুরে অঞ্জলি বলল, 'আর পারি না ঘুরতে। আমি বরং এখানটায় বসি, তোমরা ঘোরাঘুরি করো।'

এইটে চাইছিল সুধাময়। সুধা সামান্য আপত্তি করে মেনে নিল। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ওরা নানান খাঁচা ঘুরে-ঘুরে দেখল। ভীষণ ভালো লাগছিল সুধাময়ের। যেন সুধাই ওদের মা বলে মনে হচ্ছিল তার। ছোটটাকে কোলে নিয়ে সুধার হাঁটা দেখে বুক ভরে যাচ্ছিল যেন। সেই সময় অফিসের সামান্য আলাপী এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। সুধাময় তাকে দেখেও দেখল না। আলাপ হলে সুধার পরিচয় দিতে কী সঙ্কোচ হত। ব্যাপারটা বুঝতে দিল না সে। বাচ্চা দুটো সুধার সঙ্গে বেশ সেঁটে গেছে। ঘুরতে-ঘুরতে ওরা বাঘ সিংহের খাঁচার কাছে এল। বাঘ দেখে ছোটটা ভয়ে কাঁটা। বড় ঝুমা কিন্তু খুঁটিয়ে দ্যাখে, 'কি সুন্দর, না বাবা?'

সুধা বলে, 'তোমার তো খুব সাহস, বাঘকে সুন্দর বলছ!'

সিংহের খাঁচার সামনে এসে ঝুমা বলল, 'কেমন রাজার মতো হাঁটছে না বাবা।'

সুধা মুখ টিপে হাসল। সুধাময় খুশি হল মেয়ের চোখ আছে বলে। পরের খাঁচার সামনে এসে ঝুমা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী বাঘ?'

সুধাময় হেসে বলল, 'না একে বলে টাইগন। ওর বাবা বাঘ মা সিংহ।'

নাক কোঁচকাল ঝুমা 'ইস কি বিচ্ছিরি।'

সুধা বলল, 'বিশ্রী কেন?'

ঝুমা জবাব দিল, 'দ্যাখো না, বাঘের মতন না, আবার সিংহের মতনও না।'

সুধার চোখ চকিতে সুধাময়কে ছুঁয়ে গেল। এবং তারপর থেকেই ওর মুখ অন্ধকার। চাপা গলায় বলেছিল, 'দোঁ আশলারা এইরকমই হয়।'

এরপর পথটা যেন আচমকাই ফুরিয়ে গেল। ওরা ফিরে এল অঞ্জলি যেখানে বসেছিল সেখানে। সুধাময় সুধার পরিবর্তনটা ধরতে চাইছিল বলে একটু অন্যমনস্ক, মেয়ের কথা শুনতে পায়নি। ঝুমা ওর হাত ধরল, 'খিদে পেয়েছে বাবা।' সুধার যেন ইচ্ছে ছিল না, বড় চুপচাপ হয়ে গেছে সে। তবু যেতে হয় তাই যেন রেস্তোরাঁতে ঢুকল। ছোট্ট কেবিনে পরদার আড়ালে। সুধা চা ছাড়া কিছু খাবে না, অঞ্জলিও তাই। অর্ডার দিয়ে মুখ ফেরাতেই জানলার পরদার তলা দিয়ে বাইরেটা নজরে এল সুধাময়ের। সেখানে একটি রঙিন শাড়ির আভাস। বেশ দূরে বলেই রহস্যময়। পুরোটা দেখার আগ্রহে পরদা সরাতে হাসি এল। রঙিন লুঙ্গি পরনে উদোম গায়ে কেউ ঢং করে হাঁটছে।

ঝুমা জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেখছ বাবা, হাসছ কেন?'

সুধাময় সরল গলায় বলল, 'ওই লোকটাকে আমি মেয়ে ভেবেছিলাম।'

হঠাৎ সুধার তীক্ষ্ণ গলা বাজল, 'ছি। লজ্জা করে না!'

প্রতিটি কথায় একটা হিসহিস শব্দ জড়ানো ছিল। এমন করে পৃথিবীতে কেউ কখনও ঘৃণা প্রকাশ করেনি। সুধাময় অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাতেই শুনতে পেল অঞ্জলি নরম গলায় বলছে, 'তুমি কিছু মনে করো না ভাই, মুখেই ওর যত, আসলে কিন্তু ঠিক উলটোটা।'



উৎসবের রাত

এখনও অনেক কিছু পারেন না প্রতিভা। এই যেমন, একা-একা বাড়ির বাইরে যাওয়া, ছেলে-মেয়েদের উঁচু গলায় ধমক দেওয়া, বউমাদের খোঁটা দিয়ে কথা বলা কিংবা অপরেশ ঘরে থাকলে তাঁর সামনে কাপড় পালটানো। শেষেরটি নিয়ে নিয়ত কথা শুনতে হয় তাঁকে। তুমি কি এখনও আঠারো বছরের খুকি যে আমায় দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছ! পঞ্চাশ বছর ঘর করছি তবু যে এত লজ্জা কোত্থেকে আসে বুঝতে পারি না। যে পুরুষের সঙ্গে সারারাত শোওয়া যায়, পঞ্চাশ বছর ঘর করা যায়, দিনের আলোয় তাঁর সামনে বেআব্রু যদি না হতে পারেন তো তিনি কি করবেন! পারেন না এইটেই শেষ কথা।

অথচ অপরেশ এই নিয়ে অনর্গল খোঁটা দিয়ে যাবেন। মাঝে-মাঝে মনে হয় প্রতিভার তাঁর কি লজ্জাটজ্জার বাড়াবাড়ি আছে? নেই-নেই করেও সত্তর বছর হয়ে গেল। সত্তর বছরে স্ত্রীলোকের শরীরে আর কী রহস্য থাকে? চল্লিশের পর থেকেই একটু মোটার দিকে ধাত ছিল কিন্তু এমন মোটা নন যাতে চলা-বসায় কষ্ট হয়। মেয়েদের বয়স হলে যেসব রোগ জোটে, বলতে নেই, সেগুলো এখনও তাঁকে স্পর্শ করেনি। মন ভালো থাকলে অপরেশ তাঁকে ভুবনেশ্বরী বলে ডাকেন। নাতনি কাজল বলে, দিদা, তোমার স্কিন দেখলে হিংসা হয়। মাইরি এই বয়সেও কী করে ম্যানেজ করে

রেখেছ কে জানে! ব্লাউজ ছেড়ে এখন সেমিজ পরেছেন প্রতিভা তবু ছুঁড়ির কথার ছিরি দ্যাখো। যার দুদিন বাদে বিয়ে হবে তার মুখে রকের ভাষা শুনলে গা রিরি করে। কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই। ওর বাবা, মানে প্রতিভার বড় ছেলে ধীরেনেরও হাত-পা বন্ধ ও ব্যাপারে। কাজল অপরেশের চোখের মণি। নাতনিকে কিছু বললেই দাদু কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। তা তেনারও তো পঁচাত্তর পেরিয়ে গেছে গত শ্রাবণে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। চশমা ছাড়াই কাগজ পড়ার চেষ্টা করেন মাঝে-মাঝে। সারাজীবন নেশাভাঙ করেননি, এখন প্রতিভার পান চেয়ে নেন মাঝে-মাঝে। প্রতিভা ওঁর মুখে জরদার গন্ধটা পান কিন্তু সেটা আসে কোত্থেকে বুঝতে পারেন না। কারণ সেবার প্রেসারে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে অপরেশের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। তা এই মানুষের যদি এখনও শখ হয় সত্তর বছরের বুড়ির কাপড় ছাড়া দেখবেন, তাহলে ভীমরতি ছাড়া আর কি বলা যায়! পুরুষমানুষের বোধ হয় চিতায় না শোওয়া পর্যন্ত ওই ভাবটা মরে না। ভগবান যৌবন কেড়ে নিয়েছেন শরীর থেকে অনেকদিন তবু তার ছায়ায় রং বোলানোর চেষ্টা। যত বয়স হচ্ছে তত মুখে আগল থাকছে না। কিন্তু রাত্রে যখন শুতে যান প্রতিভা তখন একটা হাত ওঁর গায়ের ওপর রেখে শিশুর মতো ঘুমোন অপরেশ।

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। সকালবেলায় স্নান সেরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে কাপড় ছাড়ছেন এমন সময় তিনি এলেন। অথচ এই সময় সামনের বাগানে থাকার কথা অপরেশের। চমকে উঠে কাপড়-চোপড় নিয়ে তিনি ঠাকুরঘরে সেঁধিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারলেন আজ কথার হুল সইতে হবে। কিন্তু ঘরে যখন ফিরে এলেন চিরুনির জন্যে তখন অপরেশ ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে কাগজ পড়ছেন। তিনি ঘরে ঢুকেছেন তা নজরেই নেই। খটকা লাগল, এরকম তো হওয়ার নয়। কাছে গিয়ে বললেন, 'আজ কোনদিকে সূর্য উঠেছে?'

গলার স্বর পেয়েই যেন চমকে উঠলেন অপরেশ। চকিতে কাগজটা ভাঁজ করে সন্ত্রস্ত চোখে তাকালেন তিনি, 'কী বলছ, কিছু বলছ?'

'অমন করছ কেন?' স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন প্রতিভা।

'কই, কিছু না তো! স্নান হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

একটু-একটু করে হাসি ফুটল অপরেশের মুখে, 'না না, আমি ভালো আছি। তোমার একথা মনে হল কেন?'

প্রতিভার সন্দেহ তবু ঘুচল না। একটা কিছু লুকোচ্ছে মানুষটা। কী সেটা? বললেন, 'দশটার মধ্যে মেয়েদের এসে যাওয়ার কথা।'

'হুম।'

প্রতিভা আর দাঁড়ালেন না। কতক্ষণ আর! আজ অবধি যখন কোনও কথা না বলে থাকতে পারেনি তখন এটাও চেপে রাখতে পারবে না। আজ প্রচুর কাজ, এই নিয়ে থাকলে তাঁর চলবে না!

বারান্দায় পা দিতেই বড় বউমা বলল, 'একি মা, আজকে নতুন শাড়ি পরলেন না?'

প্রতিভা হাসলেন, 'আর লজ্জা দিও না বাপু, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর তোমরা—।' সত্যি ওঁর মুখটা লালচে হয়ে উঠেছিল।

'না, তা বললে শুনছি না। বড়দি এলে কী বলবেন?'

'ঠিক আছে সে হবে খন। তোমরা কিন্তু তিলকে তাল করছ। কেউ যেন আর পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে থাকে না। লোকে শুনলে কী বলবে?'

পাশ কাটাচ্ছিলেন প্রতিভা কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কাজল উদয় হল, 'এম্মা দিদা, তুমি এখনও ঝি হয়ে আছ! উফ, তোমাকে নিয়ে পারি না। জানো না, সেদিন কাগজে বেরিয়েছে একটা পেয়ার

পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে থাকার পর ফ্রেস বিয়ে করেছে। বিয়ে দিয়েছে ছেলেমেয়েরা। সে রকম একটা কিছু করলে হত।'

'গ্র্যান্ড আইডিয়া!' বড় নাতি সুব্রত চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা আগে বলিসনি কেন?'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। এখনই করা যেতে পারে।' কাজল হেসে বলল।

'তাহলে আমাদের ঠাকুরমশাইকে ডেকে আনি। দিদা, না বললে কিন্তু শুনছি না।' সুব্রত এগিয়ে এসে দুহাতে প্রতিভাকে জড়িয়ে ধরল আচমকা, 'আঃ, মাইরি তুমি কী নরম!'

প্রতিভার তখন হাঁসফাঁস অবস্থা, 'ছাড়-ছাড়, উঃ, কি দস্যি ছেলে রে বাবা!'

এই সময় বড় মেয়ে সুনীতা এসে গেল। পঞ্চাশও হয়নি কিন্তু এর মধ্যেই মাথার চুল প্রায় সাদাটে। পেটের গোলমালে খুব ভোগে বলে একটু খিটখিটে স্বভাবের হয়ে গেছে। সঙ্গে দুই ছেলে আর ওর স্বামী সুখেন। দৃশ্যটা দেখে সুনীতা পর্যন্ত হেসে ফেলল, 'এই অত জোরে চাপিস না, লেগে যাবে।'

সুব্রত প্রতিভাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'না পিসি, দিদার মোটেই লাগবে না। দাদু বলেন যৌবনে উনি নাকি গামার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত উঠোনটায় হাসির ফোয়ারা উঠল। প্রতিভা এমন অপ্রস্তুত যে পালিয়ে পথ পান না। যেমন নাতি তেমন নাতনি, কারোরই মুখে কিছু আটকায় না। অপরেশই এদের মাথায় তুলেছেন, ছেলেমেয়েরা এরকম ছিল না।

রান্নাঘরে তখন লেলকালাম কাণ্ড। ঠাকুর উনুন ধরিয়ে বসে আছে। জলখাবারের তরকারি কাটা হয়নি। এটা ছোট বউমার দায়িত্ব। অন্যদিন যেমন তেমন, আজ সে বেচারা পেরে উঠছে না। বছর চারেক বিয়ে হয়েছে, এখনও পেটে কিছু আসেনি। কাজকর্ম যা কিছু বিয়ের পর প্রতিভাই শিখিয়েছেন। বলেছিলেন, 'ঠাকুর চাকর যতই থাক, যে মেয়ে স্বামীর মনের মতো খাবার তৈরি করতে পারে না সে কিন্তু কখনওই ভালো স্ত্রী নয়।'

প্রতিভা বললেন, 'তুমি সরো ছোট, আমাকে দাও।'

ছোটবউমা মাথা নাড়ল, 'সেকি, না মা, আপনি আজকে কাজ করবেন কেন? ছি, ছি আমার হয়ে এসেছে।'

প্রতিভা দ্বিতীয় বঁটিটা টেনে নিলেন, 'পাকামি করো না তো! এত লোক খাবে, তুমি ছেলেমানুষ একা কি করে পারবে?'

কিন্তু প্রতিভার পক্ষে তরকারি কাটা বেশিক্ষণ সম্ভব হল না। সুপ্রিয়া ওর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেই হই-চই বাধিয়ে দিল, 'একি বউদি, তুমি আজও মাকে খাটাচ্ছ!'

গলা শুনে বড়বউমা ছুটে এল, 'ওমা, এ আপনি কী করছেন?'

চেঁচামেচি শুনে বড় ছেলে ধীরেন বারান্দায় নেমে এল, 'ছি-ছি, তোমরা কী! বাড়িতে এতগুলো বউ মেয়ে, আর মাকে আজকের দিনে হেঁসেলে ঢুকতে হচ্ছে। তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই কাজল, দিনকে দিন ধিঙ্গি হচ্ছ, একটু রান্নাঘরে গেলে কি মান যাবে?'

কাজলের গলা শোনা গেল, 'দিদাই তো আমাকে ঢুকতে মানা করেছে ওখানে। তুমি খামোকা আমাকে দোষ দিচ্ছ বাবা।'

ছোটছেলে প্রাণেশ নিজের বউয়ের উদ্দেশে চেঁচাল, 'মাত্র এই কটা লোকের খাবার, তাতেও যদি মায়ের সাহায্য নিতে হয় তাহলে বলার কিছু নেই।'

ব্যাপারটা এমন হচপচে হয়ে গেল যে ছোটবউ হাঁটুতে চোখ রাখল। প্রতিভা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর ছোটবউয়ের কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় বললেন, 'একটা কথা বলি ছোট, পুরুষমানুষের কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করবে। ওদের কথায় শুধু হুলই থাকে কিন্তু হুলে বিষ নেই। ওদের কথা শুনে কাঁদবে কেন বোকা মেয়ে!'

বড়বউমা পাশে এসে বসল, 'আজকের দিনে মন খারাপ করিস না ছোট। ওদের কথাই ওইরকম। আর আপনিও কিছু মনে করবেন না মা, একটা দিন কাজ না করলেই কি নয়!'

অতএব প্রতিভাকে উঠতে হল। বাইরে বেরিয়ে আসতেই দুই ছেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল জামাইদের নিয়ে। কাজল বলল, 'তোমার জন্যে খামেকা বাবার কাছে বকুনি খেলাম।'

প্রতিভা বললেন, 'আহা মাখনের পুতুল, গলে গেলেন!' বলার ভঙ্গি দেখে কাজল পর্যন্ত হেসে উঠল।

সুপ্রিয়া এগিয়ে এল, 'একি মা, তুমি আজ নতুন শাড়ি পরোনি?'

সুনীতা মায়ের দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে মুখ ফেরাল, 'সত্যি বড়, তোমরা এ বাড়িতে কী করতে আছ বুঝতে পারি না। আজকের দিনে মাকে পুরোনো কাপড় পরিয়ে রেখেছ!'

প্রতিভা বলে উঠলেন, 'আরে কী যা-তা বলছিস! বউমা তো বলেছিল, আমি রাজি হইনি। এই বুড়ো বয়সে এমন আদেখলেপনা মানায় না।'

'কী যা-তা বলছ মা!' সুনীতা প্রতিবাদ করল, 'স্বামী-স্ত্রী পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে আছে, এরকম কটা ঘটনা চোখে পড়ে! আমাদের মতন ভাগ্যবান আর কে আছে বলো। এরকম দিনে আমরা একটু আনন্দ করব না!'

এই সময় সুব্রত অপরেশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসে গলা তুলে বলল, 'না, না, এখন পুরোনো শাড়ি অঙ্গে থাক। আমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

সুপ্রিয়া বলল, 'কী ব্যবস্থা?'

সুব্রত জানাল, 'আমি চাকরি পেয়েছি বলে তোমবা খেতে চেয়েছিলে। তা সেই টাকাটা আমি অন্যভাবে খরচ করব আজ। দুই পিসি এবং মা কাকিমা, তোমরা পাঁচ মিনিটের জন্যে বাবার ঘরে এসো। ও, ওখানে তো সবাই আছে, ভালোই হয়েছে। একটা জরুরি আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। আর দিদা, তোমার হাজব্যান্ড তোমাকে ডাকছেন কিন্তু আমি বলেছি আজ বিকেলের আগে দেখা হবে না। কাজল, তুই দিদার কাছে থাক। দিদাকে আজ চা ছাড়া কিছু সলিড খেতে দিবি না।'

কাজল বোধহয় বুঝেতে পেরেছিল, ছুটে এসে সে প্রতিভার দুহাত চেপে ধরল।

এরা যে এতটা করবে প্রতিভা বুঝতে পারেননি। একই সঙ্গে অস্বস্তি, সঙ্কোচ, এমনকী বেশ রাগও হচ্ছিল। রাগটা অপরেশের ওপর। ঘটা করে নাতি-নাতনিদের বলতে যাওয়া হয়েছিল! এখন উনি তো সেঁধিয়ে আছেন ঘরের কোণে। যত জ্বালা হয়েছে প্রতিভার। প্রতিভা বললেন, 'হাত ছাড় বাপু, আর পারি না।'

কাজল চোখ পাকিয়ে বলল, 'যাবে কাথায়? উঁহু দাদুর ঘরে তোমার যাওয়া চলবে না। ঠিক আছে, তুমি এই ঘরে এসো।'

প্রতিভা হাল ছেড়ে দিলেন। কাজল ওঁকে ওর ঘরে নিয়ে এল।

'ইস, কী নোংরা করে রেখেছিস ঘরটাকে। এত বড় মেয়ে, একটুও লক্ষ্মীশ্রী নেই!'

'তোমাদের মতো অত পিটপিটুনি আমার ভালো লাগে না।'

'তাই বলে বাসি শাড়ি পেটিকোট চারধারে ছড়ানো থাকবে? বইগুলোর কী দশা!'

'ঠিক আছে, দশা তো দশা, তুমি এখানে চুপ করে বসো।' কাজল দ্রুত হাতে বিছানাটা ঠিক করে বলল, 'তোমার বিয়ের বেনারসিটা এখনও তোলা আছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত জল যেন বরফ হয়ে গেল। প্রতিভার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কাজল সেদিকে লক্ষ না করে বলল, 'ঠিক আছে, না থাকলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। তুমি এখান থেকে নড়ো না, আমি ওদিকে কী হচ্ছে দেখে আসি।'

কাজল বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিভা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। ওঁর বুকের ভেতর সেই চাপ কষ্টটা যেন ওজন বাড়াচ্ছিল। একী গেরোতে পড়লেন তিনি! পঞ্চাশ বছর পরে এদের

খেলার সামগ্রী হতে হল! হ্যাঁ, বেনারসিটা এখনও যত্ন করে তোলা আছে। পঞ্চাশ বছর আগে যেটা পরে তিনি অপরেশের সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিলেন। কিন্তু বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল শুরু হল প্রতিভার। এই ঘরে বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না তিনি। পা টিপে-টিপে দরজার কাছে এসে দেখলেন বারান্দা কিংবা উঠোন ফাঁকা। ওরা বোধহয় এখন ধীরেশের ঘরে।

বারান্দা পেরিয়ে নিজেদের ঘরে চলে এলেন প্রতিভা। নিজের বাড়ি নিজের বারান্দা তবু হাঁটতে অস্বস্তি হচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন অপরেশ বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ বোজা। বুকের ওপর খবরের কাগজটা ভাঁজখোলা হয়ে রয়েছে। ছিলা ছাড়া তীরের মতো ছিটকে এলেন প্রতিভা, অপরেশের মুখের সামনে এসে চাপা গলায় শুধোলেন, 'এসব কী করছ?'

চমকে উঠেছিলেন অপরেশ, খবরের কাগজটা পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন, তারপর দুচোখে প্রশ্ন করলেন 'কী?'

'সুবুকে তুমি লেলিয়ে দিয়েছ!'

'ওই নিজে থেকে বলল।'

কিন্তু তুমি রাজি হলে কেন?'

'ওটা হওয়া দরকার।' অপরেশের গলা পরিষ্কার।

'দরকার? এতদিন এই দরকারি কথাটা মনে ছিল না?'

'ছিল, কিন্তু গুরুত্ব দিইনি।'

'তার মানে বুড়ো বয়সে তোমার পাপবোধ হল?' প্রতিভার গলাটা ধরে গেল।

অপরেশ উঠে বসলেন, 'না, পাপ আমি কখনও করিনি। প্রায়শ্চিত্তের কোনও প্রশ্ন তাই ওঠে না। তুমি এই ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন?'

প্রতিভার চোখে জল, গলায় কি যেন কি, বললেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে আজকের রাত্রে তুমি কী বলেছিলে ভুলে গেলে?'

'ভুলিনি। প্রভা, পঞ্চাশ বছরে এমন একটা দিনের কথা বলতে পারো যেদিন আমি তোমার অসম্মান করেছি?' অপরেশ কাতর গলায় প্রশ্ন করলেন।

প্রতিভা জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর দু চোখের ধারা বন্ধ হচ্ছিল না।

অপরেশ নিচু গলায় বললেন, 'ওরা যা করছে করতে দাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিভা মুখ তুললেন, 'বুড়ো বয়সে টোপর পরার খুব শখ হয়েছে না? লজ্জার মাথা খেয়েছ?'

অপরেশ এবার হাসলেন, 'এ-কথাই যদি বলো তো আমাদের এমন একটা বয়স যখন লজ্জাঘেন্না থাকার কথা নয়। আর কখনও তো টোপর পরিনি, তাই আজ যদি নাতি-নাতনি ওটা পরায় তো একটু লোভ হয় বইকি।'

প্রতিভা কিছুক্ষণ শূন্যচোখে অপরেশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অদ্ভুত নিস্তেজ গলায় বললেন, 'আমার ভয় করছে।'

'কেন?'

'সব যদি ভেঙে পড়ে!'

'কিছুই ভাঙবে না। স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলো প্রভা। ভাসতে-ভাসতে দেখবে কিছু-না-কিছু গায়ে এসে ঠেকবে, সেইটুকুই লাভ।'

'সেটা তো নোংরাও হতে পারে।'

'নাও তো হতে পারে।'

'যাই বলো আমার মন মানছে না। এতদিন ধরে তিল-তিল করে এই সংসারটাকে সাজালাম, যদি কিছু হয়—!'

'কিছু হবে না।' অপরেশ যেন নিশ্চিন্ত।

প্রতিভা ওঁর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। কী সাধারণ গলায় কথা বলছে মানুষটা! কোনও তাপ-উত্তাপ নেই! প্রতিভা এবার সত্যি কথাটা বললেন, 'ওরা ছেলেমানুষি করছে আর তুমি তাতে সায় দিচ্ছ, কিন্তু আমি পারব না।'

'প্রভা!' এবার অপরেশ একটু বিচলিত।

'হ্যাঁ। সেই রাত্রের কথা আমার—, আমি পারব না।'

'পঞ্চাশ বছরেও সেই রাতটাকে ভুলতে পারলে না প্রভা!'

'ভুলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করো তাকে আমার একটুও মনে নেই। একবার হয়তো দেখেছিলাম কিন্তু আজ মুখটাকেও মনে করতে পারব না। কিন্তু বিয়ের আসরটাকে—!'

'প্রভা, তুমি তোমার চার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছ।'

'দিয়েছি। তুমি কি আমাকে একবারটির জন্যেও ওদের বিয়ের আসরে যেতে দেখেছ!'

অপরেশ কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রমশ ওঁর মুখ কালো হয়ে আসছিল। মাথা নিচু করে বললেন, 'ভেবেছিলাম সব ভুলে গেছ তুমি।'

প্রতিভা কী করে বোঝান ওটা একটা কাটা দাগের মতো। কবে রক্ত পড়েছিল জ্বালা করেছিল এখন শুধু শরীরে দাগ রয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানো নয়। সময়ে সেটা মিলিয়ে যেতে-যেতে যেটুকু রয়ে গেছে সেটুকু ভুলেও চোখে পড়ার কথা নয়। কেউ যদি মোটা আঙুল সেই দাগে বোলায় তখনই হয়তো জ্বালা কিংবা রক্ত নয়, কিন্তু অনুভূতিটা ফিরে আসে। এও ঠিক সেইরকম।

খবরের কাগজটাকে ভাঁজ করে অপরেশ বললেন, 'আমি তোমাকে কোনওদিন শাসন করিনি প্রভা, কোনওদিন জোর করে কিছু চাপিয়ে দিইনি, কিন্তু আজ আমি বলছি নাতি-নাতনিরা যা চাইছে তাই হোক!'

'এতদিনে নিজের ওপর বিশ্বাস হারালে?'

'এতদিনে মুক্ত হলাম।'

'মুক্ত! মানে?'

'সব মানে জানতে চেয়ো না প্রভা। আমরা তো জীবনের পঁচানব্বই ভাগ শেষ করে এসেছি। এখন ঈশ্বর ছাড়া কারও কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু ওই পাঁচ ভাগের জন্যে মানুষকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে। ওদের খেলা যদি আমাদের মুক্ত করে সেইটুকুই লাভ।'

'কী মুক্তি বলছ? আমি কি তোমাকে জোর করে বেঁধে রেখেছি?'

'ছি! প্রভা, অবুঝ হয়ো না!'

ঠিক এইসময় উঠোনে ওদের কথাবার্তা শোনা গেল। প্রতিভা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাইরে কাজলের গলা পাওয়া গেল, 'দিদা, দিদা কোথায় গেলে?'

প্রতিভা চাপা গলায় বললেন, 'এখনই চেঁচামেচি শুরু করবে।'

ঠিক বালিকার মতো প্রতিভা দ্রুত পাশের ঠাকুরঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাজল দরজায় এসে দাঁড়াল, ভ্রু কুঁচকে ঘরটাকে দেখল, তারপর বড়-বড় পা ফেলে অপরেশের সামনে এসে বলল, 'দিদা এই ঘরে এসেছিল?'

'ওকি এল, ওকি এল না, বোঝা গেল না।' অপরেশ নাতনির হাত ধরলেন।

'ইস মাগো, একটুও লজ্জা নেই! বিয়ের নামেই গান গাওয়া হচ্ছে!'

'তবে বিয়ের পাত্রী যদি বদলে যেত তাহলে আরও নির্লজ্জ হতে পারতাম।'

'থাক অনেক হয়েছে। আচ্ছা, তোমাকে বাবা কাকা পিসিরা এত ভয় পায় কেন?'

'আর একটা নাম বললি না তো।'

'কে? হ্যাঁ, দিদাও। শোনো, আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি আজ সন্ধেবেলায় তোমাদের সুবর্ণজয়ন্তী বিবাহ পালন করা হবে। একদম ঠিকঠাক যেমন করে বিয়ে হয় সেইসব নিয়ম মেনে। তবে তোমাদের বয়স হয়েছে বলে বর-কনের মতো সব নিয়ম মানতে হবে না, মানে খেতেটেতে পারো। এটা অবশ্য বাবার অর্ডারে আমাদের মানতে হয়েছে।'

'তাহলে আমার পাঞ্জাবিটাকে গিলে আর ধুতিটাকে কুচিয়ে রাখিস।'

'ওমা! তুমি যে পা বাড়িয়ে বসে আছ আর দিদা বিয়ের নামে উধাও হয়ে গেছে। দেখি কোথায় গেল!' কাজল যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল। অপরেশ এবার খাট ছেড়ে নিচে নামলেন। তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একটা উপায় ভাবছিলেন। এটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। অবশ্য যে জায়গাটায় ওটা ছাপা হয়েছে সেটুকু ছিঁড়ে ফেললেই ল্যাটা চুকে যায় কিন্তু ছিঁড়লেই তো সকলের নজরে পড়বে। বয়স হয়ে গেলে লুকোবার জায়গাগুলো বড্ড কমে যায়।

'কেমন আছ বাবা?' সুনীতা ঘরে এসে দাঁড়াল, পেছনে ওর স্বামী।

অপরেশ মেয়েকে দেখলেন। ঠিক উনপঞ্চাশ বছর বয়স এখন। ও যখন হল তখন খুব সামান্য রোজগার করতেন তিনি। ওর ছেলেবেলায় অপরেশ ওকে কিছুই দিতে পারেননি। বললেন, 'কখন এলি?'

'এই তো। আজ তোমাদের নিয়ে খুব কাণ্ড হবে।'

'হুঁ।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'ওই আর কী! তুই কেমন আছিস?

'আমার কথা আর বলো না। পেটটাই শত্রু হয়ে গেল। একটু রিচ কিছু খেলে তিনদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। ছেলেমেয়েদের ধকল সামলে হাঁপিয়ে উঠি।' সুনীতা স্বামীর দিকে তাকাল।

বড় জামাই বলল, 'রোজ যদি তিনটে বাজিয়ে দেয় খেতে তাহলে শরীরের কি দোষ বলুন। নিজে যদি নিজের শরীরের অযত্ন করে তাহলে ওষুধে কি হবে!'

এই সময় সুপ্রিয়া এল। বড় ও ছোটর বয়সের ব্যবধান অনেক, ব্যবহারেও। সুপ্রিয়া এসে চুপ করে বসে রইল খাটে। ওর স্বামী বোধহয় প্রাণেশের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। এই মেয়ের বিয়েটা ঠিকঠাক হয়নি বলে মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর। ওদের দুজনের স্বভাবের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। কতদিন মানিয়ে থাকতে পারবে কে জানে!

'তোর শরীর ভালো আছে তো?' ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন অপরেশ।

নীরবে মাথা নাড়ল সুপ্রিয়া।

'তোরা দুই বোনে কিছুদিন থেকে যা না এখানে।'

'সুনীতা বলল, 'তাহলেই হয়েছে। দুদিন সংসার ছেড়ে এলে ওদিকে ত্রাহি রব উঠবে। একমাত্র শ্মশানে যাওয়ার আগে মুক্তি পাব না।'

'আঃ, যত বাজে কথা! তোর স্বভাব খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। এসব কুকথা খামেকা না বললে সুখ পাস না, না?' বেশ জোরেই ধমক দিলেন অপরেশ।

সুনীতা কিন্তু রাগ করল না। হেসে বলল, 'তুমি বুঝবে না। কখনও তো সংসার চালাওনি, সব ঝক্কি মা একা সামলাচ্ছে।'

'কিন্তু তোমার মা কোনওদিন এসব বাজে কথা বলেনি!' কথাটা বলেই অপরেশের মনে হল বলাটা ঠিক হয়নি। কারণ ওদের মুখের হাসিটা অস্বস্তিকর।

বড় জামাই নিচু গলায় বলল, 'এখন এই হয়েছে বাবা, মেজাজ কিছুতেই ঠান্ডা থাকে না।'

এই সময় ছোট বউমা অপরেশের খাবার নিয়ে এল। ট্রেতে এক গ্লাস হরলিক্স আর গোটাচারেক

বিস্কুট। অথচ এই সময় রোজ পেটভরতি জলখাবার খান অপরেশ। ট্রের দিকে তাকিয়ে ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ছোট বউমার দিকে একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার।'

ছোট বউমা মাথা নিচু করে বলল, 'ওঁরা বললেন, আজ এই দিতে।'

'কেন? আমি কি আমাশার রুগি?'

সুনীতা বলল, 'বাঃ, আজ তোমাদের বিয়ে দিচ্ছে নাতিনাতনি, বিয়ের দিন কি কেউ খায় নাকি?' কথা শেষ করে সে হাসল। এবং অপরেশ বুঝলেন ব্যবস্থাটায় এদের প্রত্যেকের সম্মতি আছে।

এইসময় কাজল ফিরে এল, 'কী আশ্চর্য, ও বড় পিসিমা, দিদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি?' সুনীতা চমকে উঠল, 'পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'সমস্ত বাড়ি খুঁজে কোথাও দেখতে পেলাম না। বাথরুমেও নেই।'

প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সুনীতা, ছোট বউমা এবং জামাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অপরেশ দেখলেন সুপ্রিয়ার নজর ঠাকুরঘরের দিকে। তিনি হাসলেন, 'ঠিক ধরেছিস। যা, ওকে ডাক।'

'বাবা!'

হরলিক্সে চুমুক দিয়ে অন্যমনস্ক গলায় অপরেশ জবাব দিলেন, 'কী?'

'বাবা!' এবার সুপ্রিয়ার গলা ধরে এল।

'কী হয়েছে মা?' অপরেশ গ্লাসটাকে টেবিলে রেখে মেয়ের দিকে তাকালেন। দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল সুপ্রিয়া, 'আমি কখনও মা হতে পারব না।'

বুকের ভেতর লোহার বলটা যেন ছিটকে উঠল। অপরেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত গলায় স্বর ফুটল, 'কী করে জানলি?'

'ডাক্তার বলেছে।'

ঘরে তখনও সুপ্রিয়ার কান্না ফোয়ারার মতো ছিটকে উঠছে। কি করবেন অপরেশ? এখন চেয়ে থাকা ছাড়া আর কি বা করা যায়? এই মেয়ে একটু-একটু করে বড় হল, চোখের সামনে পূর্ণতা পেল, তাকে নিষ্ফলা জানার পর কিছু কি করার থাকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কোনওকালেই মেশার সময় পাননি কিন্তু এইটের ওপর তাঁর খুব টান ছিল। বিয়ের পর চারপাশ ফাঁকা লাগত। সেই মেয়ে আজ কি শোনাল! অপরেশের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরতে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বলতে পারলেন, 'ভেঙে পড়িস না মা, ডাক্তার ভুল করতে পারে। এরকম কত ঘটনা আমি জানি।'

এই মুহূর্তে কোনও ঘটনা তিনি জানতেন না কিন্তু বলতে পেরে হালকা লাগল কিছুটা।

সুপ্রিয়া নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, এমন সময় ঠাকুরঘরের দরজা খুলে প্রতিভা বেরিয়ে এলেন। মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না অনেকখানি কেঁদে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে। অপরেশ দেখলেন দুটো মুখে একই মেঘ, একজন অতীতের কথা ভেবে অন্যজন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

অপরেশ স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করলেন, 'ওই তো, তোদের মা এসে গেছেন। কোথায় থাকো? এদিকে বাড়িসুদ্ধ লোক তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

প্রতিভা কথাটাকে আমলই দিলেন না। একটু বিস্মিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাছে এগিয়ে গেলেন, 'কি হয়েছে তোর?'

ঘাড় নাড়ল সুপ্রিয়া, 'কিছু না।'

'ওরকম মুখ করে বসে আছিস কেন?' প্রতিভা একবার মেয়ে আর একবার অপরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কারণটা বুঝতে চাইছিলেন।

অপরেশ তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'আমি ওকে বকেছি বলে কাঁদছে।'

'কেন, কি করেছে ও? সত্যি, ওই একটি জিনিস ছাড়া তুমি বোধহয় কিছু জানো না।'

প্রতিভা ঘরের বাইরে যেতেই উঠোনে হইচই উঠল। তার দেখা পেতেই যেন সবাই নিশ্চিন্ত

হয়ে গেল। অপরেশ মেয়ের কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, 'চুপ করে বসে থাকিস না মা। ভগবানেরও যে ভুল হয়, ডাক্তার তো সাধারণ মানুষ। ওঠ, সহজ হ।'

সুপ্রিয়া উঠল। তারপর মাথা নিচু করে বাইরে পা বাড়াল। হঠাৎ কি হল অপরেশের, কোনওদিন যা বলেন না আজ তাই বললেন, 'এবার আমার কাছে কিছুদিন থেকে যাবি মা?'

সুপ্রিয়া যেন এরকম কিছুর প্রত্যাশায় ছিল, মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে বারান্দায় নামল।

দুপুরেও আহার জুটল না। সরবত আর মিষ্টি খেতে হল। বয়স বাড়ার পর মিষ্টিটাকে এড়িয়ে চলেন অপরেশ। ডায়াবেটিস এখনও থাবা বাড়ায়নি। কিন্তু ওৎ পেতে যে নেই তাই বা কে জানে! সেবার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বলে দিয়েছিল দুশ্চিন্তা একদম করবেন না। বললেই যেন দুশ্চিন্তা বন্ধ করা যায়। কাজলকে দিয়ে এক কৌটো জরদা আনিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, পানের সঙ্গে সেটা খেলে গা গরম হয়। কিন্তু তা খেতে হয় প্রতিভাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে। কৌটোটা রয়েছে রবীন্দ্র রচনাবলীর পেছনে। প্রয়োজনে বের করা সম্ভব হয় না প্রতিভা ঘরে থাকলে।

খাবার নিয়ে ভেবেছিলেন চেঁচামেচি করবেন। বুড়ো বয়েসের একটা মানুষকে ওরা না খাইয়ে রাখছে এ কেমন রসিকতা! কিন্তু সুব্রত আর কাজল যেভাবে বুঝিয়ে গেল তাতে সে ইচ্ছেটাকে বাতিল করতে হল। বড় ছেলে ধীরেশ এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেনি কিন্তু শেষপর্যন্ত সেও চুপ করে গেল। প্রতিভা যে সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন আর ফিরে আসেননি।

মিষ্টি খেয়ে অপরেশ বারান্দায় এলেন। হায় ভগবান, ওরা এর মধ্যেই বাড়িটার হাল পালটে দিয়েছে। উঠোনে ছাদনাতলা হয়েছে। কলাগাছ পোঁতা হয়ে গেছে। মাথার ওপর সামিয়ানা। কে যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, গায়েহলুদটা হল না তো?' বড় বউমা বোধহয় জবাব দিলেন, 'ভরদুপুরে ও কথা মনে করে কি হবে।'

অপরেশের বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল। একটু আগে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হবে কিনা। তিনি 'না' বলে দিয়েছেন। বন্ধু বলতে তো এখন কেউ নেই। দু-একজন সমবয়সি পরিচিত আছেন মাত্র, তাঁদের বলে কি হবে। ডেকোরেটারের লোকজনদের দেখে বুঝতে পারলেন ওরা অনেককেই হয়তো নিমন্ত্রণ করেছে। অপরেশ আবার ঘরে ফিরে এলেন। আর তখনই কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল। টেবিলের ওপর সেটা নেই। কে নিয়ে গেল? লুকিয়ে রাখবেন ভেবেছিলেনব কিন্তু রাখা হয়নি। দুটো কাগজ আসে এই বাড়িতে। সাধারণত অপরেশের কাগজ নিয়ে টানাটানি করা হয় না। তিনি আবার দরজায় এসে গলা তুলে বললেন, 'কাগজটা কে নিয়ে গেল?'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর বড় বউমার গলা শোনা গেল, ' কে নিয়ে এসেছে কাগজ?'

একটু বাদেই বড় জামাই কাগজটা নিয়ে ওঁর সামনে এল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনার পড়া হয়ে গেছে!'

ঈষৎ মাথা নেড়ে সেটি হস্তগত করে বিছানায় ফিরে এলেন তিনি। তারপর সন্তর্পণে সেটিকে বালিশের তলায় চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন অপরেশ। সকালবেলায় কাগজের দ্বিতীয় পাতায় ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেননি। কিন্তু নিচের লেখাগুলো পড়ার পর থেকেই তাঁর যেন খুব ভয়-ভয় করছিল। সুব্রত কাজল যখন আবদার করল তখন মনে হল এটাই ওই ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা। চট করে রাজি হয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তাদের একসঙ্গে থাকার কাল। পঞ্চাশটা বছর ধরে একসঙ্গে অনেক সুখ এবং দুঃখকে ওঁরা মেনে নিয়েছেন। দুজন থেকে আরও চারজন এসেছে। তাদের বিয়ে-থা দিয়ে এখন তো ভরা সংসার। চিরকালই উগ্র আধুনিকতা তিনি পছন্দ করেন না আর এই স্বভাবটা পেয়েছে বড়ছেলে। ফলে এই বাড়িতে একটা আপাত কনজারভেটিভ

পরিবেশ আছে। এসবই ভেঙে পড়বে, দুমড়ে মুচড়ে থেবড়ে যাবে যদি ওরা জানতে পারে অপরেশ এবং প্রতিভার মধ্যে কখনই আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি।

এতদিন এসব কথা ভাবেননি অপরেশ—আজ ভাবছেন। কি হতে পারে ওরা যদি জানতে পারে একথা! ওরা কি নিজেদের জারজ ভাববে? ধর্ম ও আইনের স্বীকৃতি ছাড়া যে বন্ধন তার ফসল হিসেবে নিজেদের গায়ে থুতু দেবে? অপরেশ জানেন, বড়ছেলে এটা সহ্য করতে পারবে না। হয়তো আত্মহত্যা করতে পারে সে। মেয়েদের ওপর নিশ্চয়ই চাপ আসবে তাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে। কাজল আর সুব্রত কি করবে তিনি জানেন না কিন্তু এক মুহূর্তেই এই সুন্দর সংসার তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নিজে প্রেম করে বিয়ে করেও ছেলেমেয়ের প্রেম সহ্য করতে পারে না এমন ঘটনা তো আকছার দেখা যায়। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা অবিবাহিত—এই সত্যটি সহ্য করা যে বড় মুশকিল হবে ওদের কাছে। শোনার পর কি ছেলেমেয়েরা ওঁদের মৃত্যুকামনা করবে? বড় ভয় হল, তাই সুব্রতদের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর পর ওরা বিয়েটার নবীকরণ করতে চাইছে, সেই সুযোগে আসল কাজটি সেরে নেওয়া যেতে পারে। তারপর যে যাই বলুক কিছু এসে যায় না।

কিন্তু এতদিন কি কিছু এসে যাচ্ছিল? এতদিন কি বুক ফুলিয়ে অপরেশ পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াননি? একথা ঠিক প্রতিভা বাড়ি থেকে একদমই বের হত না কিন্তু চেষ্টা করলে কি অপরেশের খোঁজ পাওয়া যেত না? এটাই ওঁর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। সেই মানুষটা এত নির্লিপ্ত হয়ে রইল কী করে? একটাও খোঁজ করল না, পুলিশকে জানাল না! প্রতিভার মামা না হয় লজ্জায় ঘেন্নায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া চলে। ব্যাপারটা প্রথম দিকে অপরেশের ভাবনায় আসত। কিন্তু কখনই তিনি প্রতিভার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেননি গোড়ার দু-তিনটে মাস কেটে গেলে প্রতিভা ভুলেও এসব প্রসঙ্গ তোলেননি। বছরের ধুলোগুলো জমে-জমে ঢেকে দিয়েছে সেই রাতটাকে। কিন্তু আজ সকালের খবরের কাগজটা যে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে ওটাকে নগ্ন করবে এটা কল্পনা করেননি অপরেশ।

অপরেশের প্রথম চাকরি কানপুরে। ভার্গবদের বিরাট চামড়ার ব্যবসায় মোটামুটি মাইনেতে ওঁর একার চলে যাচ্ছিল। তখন বয়স চব্বিশ চলছে। টগবগে যৌবন। বিয়ে-থা করার জন্য কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে। এই সময় উনি প্রতিভাকে দেখতে পেলেন, প্রথম দেখায় জড়িয়ে গেলেন।

কাছাকাছি বাড়ি অথচ দুই-একবার কথা হয়েছে কি হয়নি। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি প্রতিভারা ব্রাহ্মণ, বাপ-মা নেই, মামার কাছে মানুষ। প্রতিভার মামার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভাগনিকে ঘাড় থেকে নামাতে তিনি একটি সৎ ব্রাহ্মণ পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত। অপরেশ ব্রাহ্মণ নন জানার পর তাঁর সম্পর্কে কোনও আগ্রহ ছিল না ভদ্রলোকের। এই সময় প্রতিভার চিঠি এল অপ্রত্যাশিতভাবে, 'আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিছু একটা করুন।'

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল অপরেশের। এই মাইনেতে বিয়ে করা যায় না। অথচ প্রতিভাকে তাঁর চাই। বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত ছেড়ে ছেড়ে তখন তিনি ক্লান্ত। শেষপর্যন্ত গৌহাটির এক ওষুধের কোম্পানি থেকে ডাক এল ইন্টারভ্যুর। চাকরিটা হবে ভাবতে পারেননি। খুশি মনে কানপুরের পুরোনো পাট চুকোতে ফিরে এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই নদীর জল অনেক এগিয়ে গেছে। সেদিনই প্রতিভার বিয়ে। পাত্র কানপুরের একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর গৌহাটিতে চাকরি পাওয়ার খবর ওখানে না জানিয়ে তিনি ভার্গবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। সেই রাতের ট্রেনে ফিরে যাবেন এমন ব্যবস্থা ঠিক।

রাত এগারটায় ট্রেন। স্টেশন তেমন দূরে নয়। প্রতিভার বিয়ে সন্ধে-লগ্নে চুকে গেছে। জিনিসপত্র নিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময় সে এল। বেনারসি নয়, সিল্কের শাড়িতে প্রতিভা ঝকঝক করছে। এই সময়, যত কাছেই হোক, বিয়ের কনে বাড়ি থেকে বের হতে পারে তা কল্পনায় ছিল না।

উত্তেজনায় কাঁপছিলেন প্রতিভা, 'চিঠিটা পেয়ে কিছুই করলেন না?'

অপরেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, 'তুমি!'

'শুধু প্রশ্নটা করব বলে এসেছি।'

'করতে চেয়েছিলাম। যখন করলাম তখন সময় পেরিয়ে গেছে।'

'সময় কি সত্যি পেরিয়ে গেছে?'

'ওঁর হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। অপরেশ কথাটার মানে বুঝতে পারছিলেন না।

'আমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে?'

'না, নেই।'

অপরেশ ওই দুটি কথাই বলতে পেরেছিলেন। এবং সেই রাত্তিরেই কানপুরের ট্রেন ধরেছিলেন ওঁরা। একটুও দ্বিধা করেননি প্রতিভা। স্টেশন অবধি কী আশঙ্কায় কেটেছিল! প্রতিভাকে দেখে বিয়ের কনে বলে না মনেও হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। কানপুর বলে তবু রক্ষে কিন্তু কনের বাড়ি থেকে যে লোকজন বেরিয়ে পড়বেই খোঁজাখুঁজি করতে, অথচ কিছুই হল না—স্বচ্ছন্দে গৌহাটি চলে এলেন ওঁরা। নতুন জায়গায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে চমৎকার মানিয়ে গেলেন দুজনে। শাঁখা-সিঁদুর থাকায় কোনও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন মনে হত এই বুঝি পুলিশ এল! সেই আশঙ্কায় একটার-পর-একটা চাকরি ছেড়েছেন আর জায়গা পালটেছেন অপরেশ। প্রতিভা কোনওকালেই বাইরে বের হতে চাইত না, কানপুরের কেউ দেখে ফেলবে সে আশঙ্কা তাই কম ছিল! মাঝখান থেকে অপরেশের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে কোনওদিন আপশোস হয়নি। যে সত্যটা তাঁকে খুব আলোড়িত করত তা হল, সামান্য আলাপ এবং কোমল সম্পর্কটাকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিল প্রতিভা যে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে সরাসরি চলে এসেছিল যাচাই করতে। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সেই এলে তো বিয়ের আগে এলে না কেন?'

প্রতিভার যুক্তিতে সত্য ছিল। সেদিনই তো তিনি কানপুরে ফিরেছেন। ফিরে খবর শোনার পর আর বাড়িতে থাকেননি। সব কিছু চুকিয়ে সন্ধের পর ঘরে এসেছিলেন। প্রতিভার পক্ষে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না। জানতে চেয়েছিলেন, 'যদি রাজি না হতাম তোমার কথায়?'

প্রতিভা হেসেছিলেন, 'ভেব না বলব, আত্মহত্যা করতাম। আমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতাম তোমাকে কাপুরুষ ভেবে।'

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাদের আইন বা ধর্মের বিয়ে হয়নি, তুমি কি তাই চাও?'

এক মুহূর্ত ভেবেছিলেন অপরেশ, তারপর হেসে বলেছিলেন, 'কোনও দরকার আছে? মনের চেয়ে কি ধর্ম এবং আইন বড়? যে মুহূর্তে তুমি আমার কাছে এসেছ সেই মুহূর্তে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার বিবেক পরিষ্কার তো?'

অপরেশ জানিয়েছিলেন তিনি এ-ব্যপারে মুক্ত।

তারপর তো পঞ্চাশটা বছর কেটে গেল। একটাও ঢেউ ওঠেনি, আর পাঁচটা বিবাহিত দম্পত্তির মতো তাঁরা সহজ স্বচ্ছন্দ। ঠিক এই সময় ওই কাগজে দেখতে পেলেন অপরেশ খবরটা। সঙ্গে-সঙ্গে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা ভয়, যা কিনা বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই উঠে আসছে। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই নাতি-নাতনিদের আবদারে সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন অপরেশ। কিন্তু একথা তো বোঝানো যাবে না প্রতিভাকে। জানেন, এ নিয়ে কথা বললে প্রতিভার কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে তাঁকে। অতএব এই ভালো, এখন তো ধর্মের বিয়েতে আপত্তি নেই।

খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল। কারণ বিকেল হতেই আত্মীয়স্বজনরা এসে পড়লেন। পাড়াপ্রতিবেশীও। এমনকী কাগজের লোকেরাও। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে হল অপরেশকে।

সন্ধে নাগাদ সুনীতা এল নতুন পাঞ্জাবি-ধুতি নিয়ে। বলল, 'বাবা, এগুলো পরে নিতে হবে।' তখন ঘরভরতি লোক। বয়স্কারই এখানে বসেছেন। অপরেশ লক্ষ করছিলেন, যে কোনওদিন তাঁর সামনে হালকা কথা বলার সাহস পেত না সেও আজ রসিকতা করছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে এবার একটু দুর্বল বলে মনে হল নিজেকে। শেষপর্যন্ত ওর হাতে ছেড়ে দিলেন সব।

প্রতিভার দর্শন সকালের পর আর পাননি তিনি। সারাদিন ধরে ইচ্ছে করছিল নিভৃতে ওর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সুযোগ পাওয়া যায়নি কিংবা প্রতিভা নিজেই সুযোগ দিতে চাননি। খবরের কাগজটাকে এখন নিরাপদে রেখেছেন অপরেশ। আলমারির জামাকাপড়ের তলায় পাতা পুরোনো কাগজ ফেলে দিয়ে আজকেরটাকেই ভাঁজ করে রেখেছেন। কারও চোখে পড়বে না।

হাসি চিৎকার চেঁচামেচিতে উঠোনটায় বিয়েবাড়ির পরিবেশ। ওখান থেকে যখন হুকুম হল বর আনো বর আনো, তখন ছুটে এল সুব্রত আর কাজল। দাদুকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে এল আসরে। সমবেত দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল ওঁকে দেখে। আসবার সময় কাজল তাঁর রূপটি দেখিয়ে দিয়েছে আয়নায়। ভাঙা গাল, বয়সের নখবসা মুখ অথচ সব মিলিয়ে কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মাথায় টোপর পরার পর সত্যি বলতে কি, একটু লজ্জাই লাগছিল তাঁর। জীবনে প্রথমবার এই বেশধারণ।

কিন্তু ছাঁদনাতলায় ও কে বসে? লাল বেনারসির পুঁটুলিটাই কি প্রতিভা? মাথা নিচু করে থাকায় মুকুটটি বর্শার মতো দেখাচ্ছে। কেউ যেন চেঁচাল, 'ও দিদিমা, দ্যাখো দাদুকে কেমন দেখাচ্ছে!'

কাজল কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'পঞ্চাশ বছরে কোনও চেঞ্জ হয়েছে?'

বিয়ের প্রতিটি কাজ মেয়েরা যত্ন নিয়ে করছে। ছোট জামাই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, বাপের বিয়ে দেখা কি উচিত?' বোধহয় সুপ্রিয়ার প্রতি কটাক্ষ এটা কিন্তু অন্যদেরও মনে লাগল কথাটা। কিন্তু পুরুতমশাই জানিয়ে দিলেন, 'সুবর্ণজয়ন্তীর বিবাহ তো ছেলেমেয়েরাই দেয়।'

আলোচনা কানে আসছিল, কত ভাগ্য হলে তবেই না পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানো যায়। কজনার ভাগ্যেই বা ঘটে এমন?

জামাইরা এসে পিঁড়ি ধরল। অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ, প্রতিভাকে পিঁড়িতে বসিয়ে ওরা তাঁকে পাক দিচ্ছে। তারপর মুখোমুখি হলেন ওঁরা। এবং যতই মুখ নামিয়ে থাকুন অপরেশ, বুঝতে পারলেন যে-কোনও মুহূর্তেই প্রতিভা কেঁদে ফেলবেন। ওঁর হাতের আঙুল কাঁপছে। অপরেশের খুব ইচ্ছে করছিল বলেন, প্রভা, একটু শক্ত হও। অন্তত সবার সামনে কিছু করে বসো না। এই সময় চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান রাখা দায়। সুব্রত বলল, 'দাদু, এবার মালাবদল হবে।' কাজল বলল, 'সেকি রে! আগে শুভদৃষ্টি হোক, তারপর তো—।' জামাইরা বলল, 'আর পারছি না ধরে রাখতে, তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি—।' কে যেন ফুট কাটল, 'পঞ্চাশ বছরের ভার জমেছে তো হাজার হোক।'

কাপড় দিয়ে চাঁদোয়া করা হল। কাজল এল দাদুর পাশে, সুব্রত দিদার। বলল, 'এবার দাদুর চোখের দিকে তাকাও।'

কাজল বলল, 'খবরদার দাদু, দিদাকে এখন চোখ রাঙাবে না, বেশ রোমান্টিক চোখে তাকাও তো।'

অনেক অনুরোধো প্রতিভা মুখ তুললেন। চোখের পাতা খুলতেই অপরেশ সেখানে টলটলে জল দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শাঁক বাজল, উলু দিল মেয়েরা। শুধু কাজল বলল, 'ওমা দিদা, তুমি কাঁদছ কেন?' প্রতিভা মুখ নামালেন। ওঁর শরীরে এখন কাঁপুনিটা ছড়িয়ে পড়েছে।

যা আশঙ্কা করছিলেন অপরেশ তা ঘটল না। বিয়েটা নির্বিঘ্নেই ঘটে গেল। ছাঁদনাতলা থেকেই অপরেশ চলে এলেন নিজের ঘরে, প্রতিভাকে নিয়ে গেল মেয়েরা। ঘরে ঢুকে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন অপরেশ। এর মধ্যে ওরা বিছানাটাকে ফুলে-ফুলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। কাজল বলল, 'এখন শুধু টোপরটা খোলো। শোওয়ার আগে পাঞ্জাবি ছাড়বে না। পুরুতমশাই বলেছেন তোমাদের কালরাত্রি করতে হবে না, আজই ফুলশয্যা।'

তারপর আরও রাত বাড়লে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে প্রতিভাকে নিয়ে ওরা এল। এখন অবশ্য প্রতিভার মাথায় মুকুট নেই কিন্তু বেনারসি আর ফুলের মালায় হঠাৎ অপরূপা বলে মনে হল অপরেশের। কাজল বলল, 'নতুন বউকে দিয়ে গেলাম দাদু, একটু দেখো।'

দরজা ভেজিয়ে ওরা চলে যেতেই প্রতিভা ধীরপায়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। ইজিচেয়ার ছেড়ে অপরেশ অস্থির চোখে ঠাকুরঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দরজার আগল তুলে দিলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বসলেন ইজিচেয়ারে। খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। সারাদিন ধরে কম ধকল গেল না।

কাজের বাড়ির লোকজনের গলা ধীরে-ধীরে মিইয়ে এল। শেষপর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন অপরেশ। পায়ে-পায়ে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে দেখলেন প্রতিভা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন সেখানে। খুব নিচুগলায় তিনি ডাকলেন, 'প্রভা!'

চেতনা এল যেন শরীরে। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন প্রতিভা। আলো নিভিয়ে এই ঘরে এসে বললেন, 'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ো।'

অপরেশের গলায় যেন কিছু আটকাল, 'প্রভা!'

প্রতিভার চিবুক অকস্মাৎ বুকে গিয়ে ঠেকল, 'তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'তুমি হওনি?'

'আমি? হ্যাঁ হয়েছি। তুমি খুশি হলেই তো আমি খুশি হব।'

প্রতিভা গলা থেকে মালা খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর ওপাশের আলনা থেকে আটপৌরে শাড়িটাকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে কি একটা ভাবলেন। অপরেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যে ঘটনাটা কখনও ঘটেনি এখন তাই ঘটল। এই ঘরে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিভা শাড়ি পালটাচ্ছেন। নিজের কাছেই অস্বস্তিকর মনে হল অপরেশের। তিনি যেন লক্ষ করছেন না এমন ভাব করে পাঞ্জাবি খুলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন।

এখন টুকিটাকি কাজ সারছেন প্রতিভা। রোজই যেমন করেন। অপরেশ টানটান শুয়ে ফুলের গন্ধ পেলেন। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। আহা, এরই নাম ফুলশয্যা! বালিশ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে একটু দূরে রাখলেন তিনি। আর এই সময় কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল।

আজ তাঁর শ্রাদ্ধ। কাগজের দ্বিতীয় পাতায় যে বৃদ্ধের ছবি ছাপা হয়েছে তাঁকে দেখে চিনতে পারেননি অপরেশ। ইদানীং শোকসংবাদ দেখলেই চোখ বোলান, চেনাজানা কেউ গেল নাকি! বৃদ্ধের ছবির তলায় লেখাটাই তাঁকে টালমাটাল করে দিল। কানপুরের বিখ্যাত ব্যাবসায়ী অমুকচন্দ্র অমুক গত দোসরা বৈশাখ সাধনোচিতধামে গমন করেছেন। আগামী পনেরোই বৈশাখ তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতি কাম্য।

এর একটু নিচে ব্যক্তিগত কলমে আর একটি বিজ্ঞাপন—'দাদা যাওয়ার আগে আপনার কথা বলতেন। আপনি আছেন কিনা জানি না, কোথায় আছেন তাও জানি না। যদি এই কাগজ চোখে পড়ে তাহলে পনেরোই বৈশাখে দাদার কাজ করলে তিনি তৃপ্ত হবেন।'

আজ সেই পনেরোই বৈশাখ। পঞ্চাশ বছরে একটি কথাও প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখেননি তিনি, আজ রাখতে হল। সারাদিন ধরে যত ভাবছেন তত ছবিটা তাঁকে তাড়া করছে। যে মানুষটা পঞ্চাশ বছর নিরাসক্ত হয়ে রইল সে ছবি হয়ে তাঁকে বিব্রত করতে পারল?

সকালবেলায় ছবিটি দেখেই যে চিন্তাটা তাঁর মাথায় চলকে উঠেছিল তা হল আইন এবং ধর্মের চোখে প্রতিভা আজ বিধবা হয়ে গেল। কথাটা মনে হতেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তাই সুব্রত যখন এসে আবদার করল তখন সম্মতি দিয়েছিলেন বিয়েতে। হ্যাঁ, এখন তো কোনও বাধা নেই।

আলো নিভিয়ে প্রতিভা পাশে এসে শুলেন। অপরেশ শক্ত হয়ে শুয়ে ওঁর নড়াচড়া অনুভব

করছিলেন। প্রতিভা কথা বলছিলেন না, তিনিও। ক্রমশ এই নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠতেই ওঁর সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। কথা বলতে চেষ্টা করলেন অপরেশ, 'ছোট মেয়ের কথা শুনেছ?'

প্রতিভা জবাব দিলেন না। কয়েক মহূর্ত অপেক্ষা করে অপরেশ বললেন, 'খুব ভেঙে পড়েছে বেচারি।'

আর ঠিক তখনই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন প্রতিভা। বালিশে মুখ গুঁজে থাকা সত্ত্বেও কান্না ছিটকে উঠছিল। অপরেশ হতভম্ব গলায় ডাকলেন, 'প্রভা!'

প্রতিভা কান্না গিলতে চাইছেন, পারছেন না। অপরেশ উঠে স্ত্রীর পিঠে হাত রাখলেন, 'কি হল তোমার?'

'আমি পারছি না, আজ কেবলই সেই রাতের কথা মনে পড়ছে।' স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন প্রতিভা। অপরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

প্রতিভা বললেন, 'কেন তুমি রাজি হলে? তুমি যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে আমি তাঁকে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনেছি। ও, ভগবান বিশ্বাস করো, এতদিন বাদে নিজেকে বেশ্যার মতো মনে হচ্ছিল!'

অপরেশ অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তিনি তো আজ না-ও থাকতে পারেন। তাহলে—।'

প্রতিভা ধীরে-ধীরে অপরেশের কোলে মাথা রাখলেন। তারপর কেমন করুণ গলায় বললেন, 'দ্যাখো, আমার হাত দ্যাখো, আজ আমি নতুন শাঁখা, নতুন নোয়া পরেছি।'

অপরেশ নিজেকে সংবরণ করলেন। না, খবরটা কিছুতেই দেবেন না তিনি। সস্নেহে বললেন, 'তুমি খুব সরল।'

'জানি, এরকম কান্না বোকামি। আর কাঁদব না, দেখো। পঞ্চাশ বছরের পুরোনো নোয়াটাকে যে আজ গঙ্গায় ফেলে দিলাম।'

রাজার মতো যাওয়া

আজকাল রাত না ফুরোতেই ঘুম ভেঙে যায়। আসলে ঘুম বলা ঠিক উচিত নয়, ঘুমের একটা ঘোর গোছের ব্যাপার শুরু হয় একটা নাগাদ। তারই চটকা ভেঙে যায় অন্ধকার কাটতে-না-কাটতেই। তারপর বিছানায় শুয়ে ছটফট করা আর জানলা দিয়ে আকাশ দেখা। ভোরের আকাশ দেখা একটা দারুণ ব্যাপার। এটা এক ধরনের নেশা হয়ে গেছে অবনীর। নীল বেনারসি শাড়ির মতো আকাশটা, জমজমে আকাশটা ক্রমশ উদাস-উদাস হয়ে যায়। জ্বলে যাওয়া শাড়ির রঙের মতো নেতিয়ে থাকে। যে তারাগুলো এতক্ষণ মাত করে রেখেছিল দাপটে, সেগুলোকে চোরের মতন মনে হয়। তারপর একসময় ফুটো বেলুনের মতন রাতটা চুপসে যায়। ভোরের টাটকা বাতাস আর মেয়েদের, অল্পবয়সি কোনও মেয়ের, হাতের ছোঁয়ার মতো ভোরের রোদ্দুর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অবনী চুপচাপ দ্যাখে। এপাশের জানলায় আকাশ আর পাশ ফিরলেই সুনীপা, একদম ঘুমে কাদা হয়ে সাত বছরের বাচ্চার মতো গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা সুনীপা।

বিছানার ওপর উঠে বসে অবনীভূষণ ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। সারারাত একটা জিরো পাওয়ারের নীলচে আলো জেলে রাখে সুনীপা। অন্ধকারে থাকতে খুব ভয় ওর। যদিও এখন রাত নেই তবু এই আলোটা সারা ঘরে দুধের সরের মতো জড়িয়ে আছে। অবনীভূষণ মাথার কাছে রাখা

মাঝারি টেবিল ভরতি ওষুধগুলো দেখল। এগুলো কি হবে? সব তো শেষ হবে না। এত দামি-দামি ওষুধ সব!

ভোরবেলায় এ সময়টায় ওর রোজই সুনীপার জন্যে কষ্ট হয়। এই সময় দেওয়ালে আলোর নিচে টাঙানো তার আর সুনীপার ছবিটাকে বড্ড ঝকঝকে দেখায়। তিন বছর আগের তোলা ছবি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে এক দোকানে ছবিটা তুলেছিল ওরা। বিয়াল্লিশ বছরের অবনীভূষণ আর তার দুবছরের ছোট সুনীপা। একটু বেশি বয়স, তবু হয়ে গেল। না, প্রেম-ট্রেম করে নয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ। মন্ত্র পড়ে বিয়েতে দেখা গেল দুজনেরই আপত্তি। ছবিটার দিকে তাকাল অবনীভূষণ। কেমন ছিমছাম দেখাচ্ছে তাকে। সুনীপাকে অবশ্য একদম যুবতী-যুবতী দেখাচ্ছে। অবশ্যি শরীরটা ওর এখনও ভাঙেনি। কিন্তু অবনীর মুখ, চিবুক, গলা? অজান্তে হাত বোলাল ও, চটচট করল আঙুলের ডগা। রোজই হয়, কিন্তু তবু এই আঙুলের ডগার শিরশিরানিটা জানান দেয়, না হে, তোমার হয়ে আসছে। রোজই সকালে গলার, চিবুকের ব্যান্ডেজ পালটাও। কেমন গন্ধ বের হয় আজকাল ব্যান্ডেজ থেকে।

সুনীপার ঘুম ভাঙবার আগেই ও বাথরুমে চলে আসে। দরজা বন্ধ করে আলোটা জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। মুখ চোখ ফোলা-ফোলা। চিবুক ঢেকে যে ব্যান্ডেজটা মাথার ওপরে গিয়ে গিঁট খেয়েছে সেটার ওপর নজর রাখে অবনীভূষণ। চিবুকের তলায় গলার ওপরটা ভিজে গেছে। কালচে-কালচে দাগ। রক্ত বেরিয়েছে। ঠোঁট দুটো ব্যান্ডেজের চাপে বেঁকে ফুলে গিয়েছে। এবার হসপিটাল থেকে ফিরে যন্ত্রণাটা আর বাড়েনি। প্রথমবার রে নেওয়ার আগে ভুগিয়েছিল খুব। রে নেওয়ার পর মাসকয়েক মোটামুটি ভালোই ছিল সে। তারপর আবার যেতে হল। এবার অপারেশন। কিন্তু এ অপারেশন আর শুকোল না। ডাক্তার রায় প্রায় স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, 'দেখুন, এখন শুধু বরাতের ব্যাপার।'

অথচ এখন কাগজে মাঝে-মাঝেই বের হয়—পৃথিবীর এপাশে-ওপাশে কেউ-কেউ ক্যান্সার সারাচ্ছে। সুনীপার আগ্রহে দু-এক জায়গায় চিঠি দিয়েছিল; না, কোনও জবাব আসেনি। ডাঃ রায় ভালোই বলেন, বরাতের ব্যাপার। লটারির টাকা পাওয়ার মতন। কেউ-কেউ তো পেয়েও থাকে।

প্রথম-প্রথম অস্বস্তি হত, আজকাল হাত রপ্ত হয়ে গেছে। ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলে নতুন ব্যান্ডেজ করে নিল অবনীভূষণ। পুরোনোটায় আজ যেন বেশি রক্তের দাগ। সপ্তাহে একদিন ড্রেসিং করার কথা। রোববারের সকালে।

চোখে জল দিয়ে বাইরে এল অবনীভূষণ। আজকাল আর দাঁত মাজার ব্যাপারই নেই। সে পাট চুকে গেছে অনেকদিন।

এখন বেশ রোদ উঠেছে। ছিমছাম পরিষ্কার রোদ। এরকম রোদের সকালে মনটা বেশ প্রফুল্ল থাকে। এমনিতে শরীরে আর কোনও অসুবিধে নেই। হাত-পা বেশ সচল। তবে ক'দিন থেকে শরীরটা কেমন ঝিমঝিম লাগছে, ডাঃ রায় যাকে উইকনেস বলেন। বেশিদূর হাঁটাচলা করতে একটু কষ্ট হয়। বাইরের ঘরে এল অবনীভূষণ। আসার সময় দেখল, সুনীপা উঠে পড়েছে।

খবরের কাগজটা হাতে নেওয়ার একটা উত্তেজনা আছে। নতুন ছাপার কালির গন্ধ বেশ লাগে। কত খবর হচ্ছে রোজ পৃথিবীতে; কালকের খবর আজ বাতিল; এইভাবেই চলতে থাকে। অবনীভূষণ যখন থাকবে না, তখনও খবরের কাগজ ছাপা হবে, টাটকা-টাটকা খবর, কিন্তু অবনীভূষণ সেগুলো পড়তে পারবে না। অতদূর কি, কলকাতাটাই ভালো করে দেখা হল না। মধুসূদনের সমাধিটা দেখা হয়নি—সেই 'দাঁড়াও পথিকবর' কবিতাটাই পড়েছে ছোটবেলা থেকে। বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, ভিক্টোরিয়ার ভেতরটা—এসব দেখার সময়ই পাওয়া গেল না। না, একদিন সব দেখে নিতে হবে। নইলে কখন কি ফাঁকি হয়ে যায়—বুকের ভেতরটা কেমন করে।

সুনীপা এল চা নিয়ে। তেপায়া টেবিলে চা রেখে বলল, 'আজ কেমন আছ?'

মাথা নাড়ল অবনী। যার মানে, এই আর কী! রোজ সকালে সূর্য ওঠার মতো নিয়ম করে এই প্রশ্ন জিগ্যেস করে সুনীপা। খারাপ নেই জানলে একটু নিশ্চিন্ত হয়। বোধহয় আর একটা দিন কেটে যাওয়ার আশ্বাস পায়। তাই আজকাল শরীরের সামান্য কষ্ট হলে বলে না অবনীভূষণ। 'কেমন আছ' কথাটা শুনতেও কেমন অস্বস্তি হয়।

বাজারের থলি নিয়ে দরজায় আসতেই রিকশা পেয়ে গেল সে। প্রথম-প্রথম সবাই আপত্তি করেছিল। সবাই বলতে বাবা আর ছোট ভাই সুনীপার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল। বাজার সে কোনওকালেই করত না, কিন্তু অপারেশনের পর একটা কেমন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষপযন্ত ওরা হাল ছেড়েছে, লোকটা একটা কিছু নিয়ে থাকুক—এইরকম ভাব আর কী।

রিকশাওয়ালা ওকে চেনে। ব্যান্ডেজবাঁধা বাবুকে বাজারে নেওয়ার ব্যাপারে ওর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বাবু এখন যাবে গলির শেষ বাড়িটায়। গিয়ে অবনীভূষণ হাঁকবে, 'গুপ্ত আছ নাকি?'

গুপ্তগিন্নি দরজা খুলবেন, 'আসুন, ও দুধ আনতে গিয়েছে।' অবনী জানে গুপ্ত এখন থাকবে না।'

'না, এখন যাব না, কই বাজারের ব্যাগটা দাও।'

মুখ-চোখে কেমন একটা লজ্জার ব্যাপার দেখল অবনী। গুপ্তগিন্নিকে এবার ধমক দিল, ও, 'কী হল, দাঁড়িয়ে কেন? ব্যাগটা আনো?'

'ও বলছিল, রোজ-রোজ—।' গুপ্তগিন্নি মিনমিনি গলায় বলতে চাইলেন।

'তুমি কি চাও তার সঙ্গে কথা বন্ধ করব! আরে ক'দিনই বা আছি, একটু—।' আর কথা শুনতে দাঁড়িয়ে নেই গুপ্তগিন্নি। বাজারের ব্যাগটা এনে দিলেন তাড়াতাড়ি। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল অবনী, 'কী মাছ আনব?'

'যা খুশি।'

'আঃ, তোমরা মনের কথা মুখে বলতে পারো না কেন? অফিসের সময় কুচো মাছ আনলে হাড়ে-হাড়ে টের পাবে।'

রিকশা ঘোরাতে বলল ও। তারপর আরও দুটো বাড়ির ব্যাগ আদায় করে বাজারে চলল অবনী। এই তিনটে সংসারের মোটামুটি খরচ জানা আছে তার। বিশেষ করে গুপ্ত লোকটাকে দেখে ওর অবাক লাগে। সব সময় হাসিখুশি, রাত এগারটায় যখন বাড়ি ফেরে তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোতলার জানলায় দাঁড়ানো অবনীর সঙ্গে বকবক করে যায়—কিন্তু এত এনার্জি লোকটা পায় কোত্থেকে? গুপ্ত মাইনে কত পায় অবনী জানে। মোটামুটি এই তিনটে পরিবারের অবস্থা ওর জানা। এই টাকায় ওরা কীভাবে বেঁচে থাকে—সবরকম হাসিখুশি নিয়ে, এটাই বুঝতে পারে না ও। দ্বিতীয়বার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে এইসব চিন্তা মাথায় জমছে ওর।

মোড়ের মাথায় গুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুহাতে দুটো বোতল ঝুলিয়ে মুখে একটা চারমিনার চেপে আসছে গুপ্ত। বেঁটেখাটো কদমছাঁট চেহারা। 'এই শালা, এই তোমার সকাল হল! কেন, আর একটু আগে গতর তুলতে কি হয়?' রিকশা দাঁড় করিয়ে খিঁচিয়ে উঠল অবনী।

দুটো বোতল এক করে মাথায় ঠেকাল গুপ্ত। চারমিনারটা ঠোঁটের কোণে সরিয়ে ফিক-ফিক করে হাসল। তারপর দুলে-দুলে বলল, 'সকাল কোনওদিন দেখিনি সাহেব, ওকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত, পুণ্যাত্মাদের জন্য সংরক্ষিত।'

অবনী আর দাঁড়াল না। গুপ্তর সঙ্গে কথা বলা যায় না। এত কথা ও পায় কোথায় কে জানে। সেল ট্যাক্সের অফিসার অবনী, গুপ্ত ওকে সাহেব বলবেই। হোক না কেন রোববারের তাসের পার্টনার।

রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা বলে ওকে নিয়ে বাজারে ঢুকল ও। মোটামুটি একই জিনিস চারটে থলেতে কিনবে ও। এই সময়টা অদ্ভুত একটা উত্তেজনা মনে। এই দর করে বাজার করা।

'কত?' আলুর দোকানে দাঁড়াল অবনী।

'বিশ বাবু।'

'বিশ? ইয়ার্কি? কাল এক দশে নিলাম। তোমরা পেয়েছটা কী বলো তো? এখনই এই অবস্থা, কয়েক মাস পরে দু-টাকা বলবে!' টনটন করল ঠোঁটের কোণাটা। কথা বলতে অসুবিধে হয় ব্যান্ডেজের জন্য, 'কিন্তু এরকম হল কেন?'

'তা কি করব বাবু, বাজারের যা অবস্থা, দেখুন না সামনের বছর কী হয়।' দোকানি পাল্লায় আলু চড়াল।

সামনের বছর কি হয়! অবনী একটু থতিয়ে গেল। সামনের বছর যদি আলুর দর পাঁচ টাকা হয় অবনী জানবে না। কিন্তু গুপ্তদের কী হবে? সর্বত্র এক অবস্থা। পটল বেগুন কি আদার দর দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পটল বিক্রি করে যে ছোকরাটা তার কাছে এল ও। এর সঙ্গে ক'দিন আগে প্রায় হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল অবনীর। ব্যাটা পাকামো করে বলেছিল, 'দর করবেন না বাবু। যে ক'দিন আছেন খেয়ে যান।' আজকে ইচ্ছে করেই দর জিজ্ঞাসা করল না সে। ছোকরা অবাক হল। যেতে বলল, 'একই দর বাবু, আপনার কাছে কম দাম নিলাম। বাজারে দেখুন দেড় টাকা কিলো।' অবনী আজকাল হাসতে পারে না। ঘাড় নাড়ল শুধু। না, দর বাড়াওনি, কিন্তু ওজনে মারছ। ভিজে পটলে লাভ অনেক। কিন্তু অবনী কিছু বলল না। আজকাল কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

সুনীপা একটু সাজতে ভালোবাসে। স্কুলে যাওয়ার সময়ও চুল বাঁধা আর স্নো-পাউডারে ওর বেশ সময় খরচ হয়। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে বসেছিল অবনী, সুনীপা আসতেই উঠে দাঁড়াল। সুনীপার স্কুল সেই পার্ক সার্কাসে। এখান থেকে যাওয়া-আসা করা মুশকিল। কিন্তু তবু চাকরিটা ছাড়তে চায় না। হেডমিসট্রেস হওয়ার সুযোগ আছে। মাইনে খারাপ দেয় না স্কুলটা। গলির ভেতর একটা ট্যাক্সি ঢুকেছিল, দরজায় দাঁড়িয়ে ধরে ফেলল সুনীপা। অবনী ভাবল আজ কপালটা ভালোই যাবে। অন্যদিন রিকশা করে মোড়ের মাথায় গিয়ে ট্যাক্সির জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয়। গলির মুখে আসতেই ট্যাক্সি থামাতে বলল অবনী। সুনীপা ভ্রু কুঁচকে একপাশে সরে যেতে-যেতে বলল, 'আদিখ্যেতা।' অবনী হাসল। সুনীপা এসব ভালো চোখে দেখছে না। এই বাজার করা, ধার দিয়ে তাগাদা না করা, অফিসে যাওয়ার সময় ট্যাক্সিতে লিফট দেওয়া। ছোট ভাইয়েরও ধারণা অসুখের পর দাদার মাথাটা গোলমেলে হয়েছে। আর এই লোকগুলো তার সুযোগ নিচ্ছে। ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না অবনীর। টাকা সে অনেক রোজগার করেছে। মাইনের চেয়ে বাঁ হাতে এসেছে বেশি। যে চাকরির যা দস্তুর। সুনীপার ভবিষ্যতের কোনও আশঙ্কা নেই। তার ওপর জি পি এফে আছে মোটা টাকা। তবু যে কেন ওরা এরকম করে!

ডালহৌসি ঘুরে গেল ট্যাক্সিটা। তিনজনকে সেখানে নামিয়ে ও গেল পার্কসার্কাসে। সুনীপাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অফিস। তেতলায় ওর ঘর। আগে সিঁড়ি ভাঙত, এখন লিফটে ওঠে। এইটুকুনিতেই আজ কেমন ক্লান্তি লাগছে।

নিজের ঘরে বসে অবনীর কেমন অসহায় বোধ হল। অসুখের পর থেকে ওর আর অ্যাসেসমেন্ট নেই। কাজের চাপ আর সহ্য হয় না। অথচ যতক্ষণ না নিজে চাকরিটা ছাড়ছে ততক্ষণ কেউ ওকে চলে যেতে বলবে না। সবাই জানে, গাঙ্গুলিসাহেব যে কোনওদিন মারা যাবেন। ক্যান্সার বলে কথা। দু-দুবার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন ভাগ্যের জোরে।

ছোটখাটো কয়েকটা ফাইল দেখল অবনী। তারপর টেবিলে রাখা গেলাসটার জল আকণ্ঠ খেয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ক'দিন বাদে এই চেয়ারে অন্য কেউ বসবে। লোকটা নিশ্চয়ই অবনীর কথা জানবে। কেমন মনে হবে ওর! ওই জানলা, জানলা দিয়ে দেখা গির্জার চূড়া এসব ওর কেমন লাগবে! আচ্ছা, লোকটা যখন এই চেয়ারে বসে কোনও পার্টির কাছ থেকে ঘুষ নেবে তখন নিশ্চয়ই

ভাববে অবনীও নিত। অবনী অনেক ঘুষ নিত, শেষপর্যন্ত অবনীর ক্যান্সার হল! ঘুষ নিত অবনী তাই ক্যান্সার হল এরকমটাও ভেবে নিতে পারে লোকটা। লোকটা নিশ্চয়ই ভয় পাবে। কারণ ক্যান্সার থেকে মুক্তি নেই লোকটা জানে। মনে-মনে একটা ভীত অথচ লোভী মুখের ছবি আঁকল অবনী। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছবিটা বার-বার পরিষ্কার ছিমছাম দাড়ি কামানো অবনী হয়ে যাচ্ছে। গালে হাত দিল অবনী। আজকাল ব্যান্ডেজ বাঁচিয়ে দাড়ি কামাতে হয় ওকে।

আজ শনিবার। একটা নাগাদ উঠি-উঠি করছে অবনী, এমন সময় সেই ভদ্রলোক এলেন। ক'দিন থেকেই ইনি আসছেন। অবনী অনেকবার ঘুরিয়ে বলেছে এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক হাসলেন, 'কী করলেন স্যার?'

মুখটা দেখল অবনী। তেল-চকচকে মুখ। সুখী-সুখী চেহারা।

'আমার এখন কিছুই করার নেই, আপনি তো জানেন।' অবনী রিক্ত গলায় বলল।

সামনের চেয়ারে বসে ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর, 'এ ব্যাপারে আপনার একটা দায়িত্ব আছে তো। কাজটা আপনার শেষ করার কথা ছিল। বলুন ছিল কিনা?'

'হ্যাঁ ছিল, কিন্তু আপনি জানেন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আপনার অ্যাসেসমেন্ট আমি আর করছি না। আর আপনাকে আমি বলেছি ওটা আপনি ফেরত নিয়ে যান। আমার এসব ভালো লাগছে না।' একটু হাঁপ ধরে কথা বলতে, গলার কাছটাতে টনটন করছে।

জিভ বের করল লোকটা, 'টাকাটা স্যার ফেরত নেব বলে দিইনি। আপনি শুধু ফাইলটা আনিয়ে ব্যাকডেটে অর্ডারটা করে দিন। তারপর বাকি কাজ আমি করে নেব।'

'না, হবে না। আমি আর ওসব পারব না। বরং সোমবার এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন। বলা যায় না তো, একদিন হঠাৎ দেখবেন আমি নেই। তখন টাকাটাও যাবে।' উঠে দাঁড়াল অবনী।

'যন্ত্রণা হয় স্যার?'

'তা হয়।'

'কোনওদিন সারবে না?'

'না।'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল লোকটা, 'আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে, ভাবতেই কেমন লাগে। চললেন স্যার?'

'হ্যাঁ, আসুন আপনি।' অবনী বাথরুমের দিকে এগোল।

'বাড়ি যাবেন, তাহলে আমি লিফট দিতে—।'

লোকটাকে থামিয়ে দিল অবনী একটা হাত তুলে। তারপর বলল, 'আপনি যান, আমি বাড়ি যাব না। আজ শনিবার, আমি রেসের মাঠে যাব।'

বলে দরজা ভেজিয়ে দিল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল লোকটা, তারপর নিজের গলায় হাত বুলিয়ে বলল, 'শা-লা!'

গেট থেকে একটা বই কিনে নিল অবনী। তারপর দশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে পা দিল। এখানে পা দিলেই শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা হয়। গ্র্যান্ড এনক্লোজারে যারা আসে তাদের বেশবাস মুখ-চোখে একটা ভদ্র ছাপ থাকে। কিন্তু উত্তেজনায় সবাই টই-টম্বুর। বাঁ-দিকে প্যাডকে এল অবনী। ঘোড়াগুলো ঘুরছে। প্রত্যেকের গায়ে নম্বর আঁটা। জকিগুলো মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেনারদের সঙ্গে প্ল্যান আঁটছে। একগাদা লোক হুমড়ি খেয়ে রেলিং ধরে ঘোড়াগুলো দেখছে। কোন ঘোড়াটা কীরকম ফিট জরিপ করছে সবাই। অবনী সরে এল। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখ রেসের মাঠে দেখে বোধহয় একটু অবাক হচ্ছে। অপারেশনের পর আজ প্রথম এল অবনী। আগে আসত। এখানে এলে বুকের ভেতরটা টগবগ করত। কিন্তু আজ কিছুই হচ্ছে না। মানে সে ধরনের কোনও একসাইটমেন্ট নেই। শুধু চেয়ে-চেয়ে দ্যাখা।

প্যাডক থেকে সরে এল অবনী। বুকিদের কাউন্টারে খুব হইচই। প্রথম রেসটা বি-ক্লাসের। টালিগঞ্জের ঘোড়াগুলো দৌড়বে। মোটামুটি ফেবারিট ঘোড়াটার দর ইভন মানি। বোর্ডের দিকে তাকাল অবনী। ফেবারিট ঘোড়াটার কাঁটা ডগা ছুঁয়েছে। ঘোড়াটা জিতবে না, অবনী মনে-মনে বলল। অবনী বইটা খুলল। টাকটা গন্ধ। প্রথম রেসের ঘোড়ার তলায় ফেবারিটটাই টিপ। জিতবে না, জিততে পারে না। পাতা ওলটাল অবনী। থার্ড রেস থেকে জ্যাকপটের লেগ। আটটা ঘোড়া আছে। নামগুলো পড়ে গেল অবনী। বাপ-মায়ের ঠিকানা, অতীতের ফলাফল এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। পর-পর পাঁচটা এক নম্বর ঘোড়া নিয়ে দশ টাকার জ্যাকপট কাটল ও। কেটে সোজা দোতলার ব্যালকনির কোনায় চুপচাপ বসে পড়ল অবনী। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে, ঝিমঝিম ভাবটা বেড়েছে।

প্রথম রেস শুরু হয়ে গেছে। অবনী দেখল ফেবারিট ঘোড়াটা বাকিগুলোকে কুকুরের মতো পেছনে রেখে জিতে গেল। মাঠে বেশ খুশি-খুশি ভাব। অবনীর ভালো লাগল। লোকগুলো টাকা পেল।

ডান দিক বাঁ-দিক নিচে শুধু মানুষের মাথা। এত লোক—সবাই বড়লোক হতে চায়। প্রত্যেকের মনের মধ্যে বাসনার পোকা কুটকুট করছে। অবনী দেখল, তার পাশের লোকটা একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে, টাকা নিয়ে যাবে বলে। অবনী হাসল, এখান থেকে কেউ জিতে যেতে পারে না, কেউ নয়। তবু সবাই আসে, জিতে যেতে আসে। লড়ে যাও ভাই, লড়ে যাও! অবনী গালে হাত বোলাল।

জ্যাকপটের চারটে লেগ শেষ হতে অবনী নড়েচড়ে বসল। সমস্ত মাঠ ঠান্ডা। পর-পর চারটে এক নম্বর ঘোড়া জিতে গেল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটু আগে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হল, 'হ্যালো, হ্যালো! ইন দি জ্যাকপট পুল দেয়ার আর টু টিকেটস অ্যালাইভ আফটার দি এন্ড অফ ফোর্থ লেগ।'

দুটো টিকিট আছে। বাঃ। বাঃ। টোটাল পুল কত? দু লাখ হবে। একনম্বর ঘোড়া যদি শেষ রেসে জেতে তাহলে এক লাখ করে ভাগে। বাপস! অবনী বুঝল কপালে ঘাম হচ্ছে। আজ সকাল বেলায় ট্যাক্সি পাওয়া থেকেই মনে হচ্ছে সব যেন কীরকম ভালো। ডাঃ রায় বলেছেন বরাতের ব্যাপার। রেস খেলেনি অবনী। এর আগে অনেকদিন এসে চুপচাপ দৌড় দেখে গেছে। পকেট থেকে কোনও রিস্ক নেই। আজ লাক ট্রাই। পরপর পাঁচটা জিতে গেলে মিনিমাম এক লাখ। ক্যান্সার সারা নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি বরাতের নয়। চন্দননগরে নাকি কে এক তান্ত্রিক আছে, যেতে হবে। জলপড়া না কি খেতে দেয়। বরাতের ব্যাপার। পাশের লোকটা মুখ চুপসে বসেছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি হয়েছে?'

'কিছু না তো।' অবনী হাসল, 'একটা জ্যাকপট কেটেছি। দেখছি খুব মিলে যাচ্ছে।' টিকিটটা বের করে দেখাল অবনী।

ঝুঁকে পড়ে দেখল লোকটা। তারপর লাফিয়ে উঠল, 'আপনার হয়ে গেছে, লাইনে দাঁড়ান গিয়ে। লাস্ট রেসে এক নম্বর জিতবে আমার খবর। আমি পাঁচ হাজার হেরেছি, বাকি পাঁচ হাজার এবার এক নম্বরে লাগাব। এ ঘোড়ার মার নেই। মিনিমাম তিনের দর। থ্রি টু ওয়ান।'

যাঃ শালা! এত টাকা নিয়ে কি করব? সুনীপার কথা ভাবল অবনী। সব শালা বউয়ের ভাগ্যে। ক্যান্সার বউয়ের ভাগ্যে জ্যাকপটও বউয়ের ভাগ্যে।

'অল দি হর্সেস হ্যাভ অ্যারাইভড ইন দি স্টার্টিং পয়েন্ট।' মাইকে ঘোষণা হল। অবনী দেখল মাঠের ওপাশে টাটা বিল্ডিংটার দিকে ঘোড়াগুলো জড় হয়েছে। বোর্ডের দিকে তাকাল ও। দু-নম্বর ফেবারিট। বই খুলে নাম দেখল, লাকি স্টার। এক নম্বরটার নাম 'ফুল অফ লাইফ।' ঘোড়াটা যখন যায় অবনী লক্ষ করেছে দারুণ ফিট। পাশের লোকটা নেই। বোধহয় টাকা লাগাতে গেছে।'

রেস শুরু হল। বারোশো' মিটারের দৌড়। এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে প্রথমে আসছে। মাইকে লাকি স্টারের নাম শুনতে পেল অবনী। লোকগুলো চেঁচাচ্ছে। যেযার নিজের পছন্দের ঘোড়ার নাম বলছে। বেন্ট ঘুরে এল ঘোড়াগুলো। এবার সোজা পথ। মাইকে 'ফুল অফ লাইফ'

শুনতে পেল অবনী। উত্তেজনায় সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবনী উঠে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে দড়াম-দড়াম করছে। ফুল অফ লাইফ রেলিং ধরে ছুটে আসছ। তার তিন লেংথ পেছনে লাকি স্টার। হুইপ করছে জকিটা। না, ধরতে পারবে না। বুলেটের মতো যাচ্ছে ঘোড়াটা। আর পঞ্চাশ গজ বাকি—চল্লিশ তিরিশ। হঠাৎ সারা মাঠে চিৎকার উঠল। পায়ে-পায়ে লেগে পড়ে গেল ফুল অফ লাইফ। উইনিং পোস্টের দশ গজ এপাশে পড়ে ছটফট করতে লাগল। লাফ দিয়ে ছিটকে পড়ল জকিটা। ততক্ষণে লাকি স্টার জিতে গেছে। দু-নম্বর জিতে গেল। ফুল অফ লাইফ ছটফট করছে। ওঠার চেষ্টা করছে, পারছে না। পা-ভেঙে গেছে, কে যেন চেঁচাল। অবনী দেখল, স্বাস্থ্যবান চকচকে একটা সাদা ঘোড়া মাঠের ধুলোয় ছটফট করছে। মুখ তুলে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। টার্ফ ক্লাবের দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই সময়। কয়েকটা লোক এসে ঘোড়াটার পা দেখল। একজন হাত নেড়ে ইশারা করতেই অবনী দেখল একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে। ছ-সাত জন কুলি গোছের লোক অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে ত্রিপল দিয়ে ফুল অফ লাইফকে ঘিরে ফেলল।

কে যেন বলল, 'এবার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে।'

'মেরে ফেলবে?' অবনী ভীষণ ধাক্কা খেল।

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, তাই নিয়ম। রেস চলার সময় কোনও ঘোড়া অকেজো হয়ে গেলে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।'

অবনী বলল, ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'কেন ঘোড়াটার পা সারিয়ে গাড়ি-ফাড়ি টানাতে পারে তো!'

'না, তা হবে না। রেস রাজার খেলা, রাজার মতো যেতে হবে। অকেজো বাতিল হয়ে কেউ বেঁচে থাকবে না।'

অবনী দেখল মাঠে পূর্ণ নীরবতা। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। ওপরে থাকার দরুন অবনীরা ফুল অফ লাইফকে দেখতে পাচ্ছে। একটা টুপি পরা লোক রিভলভার বের করে ঘোড়াটার মাথা ছুঁয়ে নমস্কার করল। আর একটা লোককে বিড়বিড় করে কিছু বলতে দেখল অবনী। তারপরই গুলির শব্দ। খানিক ছটফট করে মরে গেল ঘোড়াটা। মাঠে একটু শব্দ নেই। পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে শেষ সন্মান।

নেমে এল অবনী। নামতে গিয়ে দেখল হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মুখ-চোখে কেমন একটা তাপ। এখন লোকজন কথা বলছে, ঘোড়াটার কথা বলছে। অবনী কোনওরকমে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফিরল অবনী অনেক রাত্রে। গুপ্ত দাঁড়িয়েছিল গলির মোড়ে। দেখে এগিয়ে এল, 'দাদা কোথায় ছিলেন? একি, শরীর খারাপ নাকি আপনার?'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গুপ্তর কাঁধে হাত রাখল অবনী, 'তুমি কি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?'

'হ্যাঁ। বউদি খবর পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে নাকি অফিসে ফোন করে পাওয়া যায়নি।' গুপ্ত অবনীকে ধরে নিয়ে চলল।

'গুপ্ত, আমার ব্যান্ডেজটা কি ভিজে গেছে? অবনী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল।

'একটু একটু, সে তো হয়ই।' গুপ্ত ওকে নিয়ে দরজায় দাঁড়াল।

'গুপ্ত, আমার গলা থেকে কোনও গন্ধ পাচ্ছ?

'দাদা!' চাপা গলায় বলল গুপ্ত। বলে কলিং বেল টিপল।

হাসল অবনী, 'আজ সাহেব বলছ না কেন, গুপ্ত? সাহেব শুনতে ভালো লাগে। গন্ধ পাচ্ছ গুপ্ত?'

'হুঁ।'

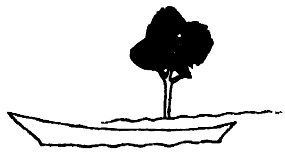
'গলাটা পচছে হে। এরপর শরীর পচবে।' হাঁপাতে লাগল অবনী।

ভেতরে শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলতে আসছে কেউ।

'গুপ্ত, কেউ যদি আমাকে গুলি করে মারত আমি তাকে এক লাখ টাকা দিতাম।'

দরজা খুলল সুনীপা। অবনীকে দেখেই চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, আমি ভেবে-ভেবে মরি—তুমি আমার কথা—।'

হেসে ফেলল অবনী। তারপর গুপ্তর দিকে ঘুরে বলল, 'এই জন্যেই শুয়ে-শুয়ে দুঃখ সইয়ে দিয়ে যেতে হবে গুপ্ত। এটাও তো একটা দায়িত্ব, কি বলো।'



নিস্তার নৌকো

দক্ষিণ খোলা বাড়িটা তৈরি করতে সুধাময়ের একটু বেশি খরচ পড়েছে। অধ্যাপকের পক্ষে কলকাতা শহরের ভাড়াটে বাড়িতে থেকে নিজে তদারকি করে বাড়ি বানানো অসম্ভব। সে কারণেই বন্ধুর পরিচিত কন্ট্রাক্টরের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল। প্রতি রবিবার খেয়েদেয়ে ভবানীপুর থেকে সল্টলেকে সুধাময় আর দময়ন্তী চলে আসত। ভিত খোঁড়া থেকে শুরু করে একটু-একটু করে বাড়িটা খাড়া হচ্ছে, বাড়ির আদল নিচ্ছে। শুরুর আগে যে দ্বিধা ছিল, অনিচ্ছা ছিল, সেটা কখন মরেহেজে একটা নেশার চেহারা নিয়ে সুধাময়কে প্রতি রবিবার এখানে টেনে আনত। দময়ন্তীর ইচ্ছেমতন বাড়ির প্লান অদলবদল হয়েছে। মেয়েদের যেমন হয়, চিরকাল ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে যেসব চাপা বিরক্তি থাকে সেগুলোকে দূরে হটিয়ে নিজের আশ-মতন ঘরদোরগুলোর বিলিব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। প্ল্যানটা পাশ করাতে সামান্য খরচা হয়েছে। এখন তো এমন অবস্থা যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতি পায়ে ওটা করতেই হয়।

যেটুকু আইনে আটকায় সেটি ছাড়া সামনে কোনও জমি নেই, তারপরই রাস্তা। গেট খুলেই গ্যারেজের প্যাসেজ। সুধাময়ের গাড়ি নেই কোনওকালে, তবু ওটা করতে হয়েছে দময়ন্তীর চাপে। যখন দোতলা হবে এবং একতলায় ভাড়া দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠবে তখন গ্যারেজ না থাকলে কোনও ভালো ভাড়াটে পাওয়া যাবে না। মেয়েদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কখন কীভাবে খোলে—দময়ন্তীকে না দেখলে সুধাময়ের অজানা থাকত। তিরিশ বছর ধরে দময়ন্তীকে দেখছে সুধাময়। সেই ছোট্ট নরম শরীর এবং বোকা-বোকা চাহনির মেয়েটি একটু-একটু করে কখন যে রাশভারী হল, শরীরে মেদ এসে মোহ সরিয়ে মর্যাদা এনে দিল! যেন এই পরিণতিতে পৌঁছবার জন্য দময়ন্তীর যাত্রা শুরু। তিরিশ বছরের দময়ন্তী সুধাময়কে দুহাতে আগলে রেখেছে। বিয়ের পর ঝিয়ের খরচ বাঁচাতে নিজেই রাতদিন খেটেছে, মেয়েদের পড়িয়েছে। অভাবের সঙ্গে রীতিমতো মারামারি করে সেটাকে দরজার বাইরে রেখেছে। তারপর যখন সুধাময়ের লেখা বইটার খুব নামডাক হল, কলেজের ছেলেমেয়েরা সেটাকে পরীক্ষা পাশের একমাত্র অবলম্বন করল তখন থেকে অবস্থা ফিরল। সেই নিয়মিত হিসেবের বাইরে আসা টাকা দময়ন্তীকে ভেতরে-ভেতরে নাড়াল। কোনওদিন কোনও চাহিদা ছিল না দময়ন্তীর। বিয়েতে পাওয়া জামাকাপড় কবে শেষ হয়েছে সুধাময় জানে না, শাড়ি গয়না তিরিশ বছরে দময়ন্তী চায়নি সুধাময়ের কাছে। প্রয়োজনে কাপড় কেনার ব্যবস্থা নিজেই করত সে, সুধাময় সংসার নিয়ে বিব্রত হয়নি কখনও। সেই দময়ন্তী হঠাৎ নিজেই উদ্যোগী হয়ে কখন দরখাস্ত দাখিল করেছে এবং লটারিতে তিন কাঠা জমির মালিক হয়েছে সুধাময় খেয়াল করেনি। টাকাটা দেওয়ার সময় সুধাময় অস্বস্তিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। সুধাময়ের কাছে বাড়ি বানাবার কোনও যুক্তি নেই। এতদিন কষ্ট করে জমানো

টাকাগুলো বাড়ির পেছনে ঢাললে চাকরির শেষের দিনগুলো চলবে কি করে? দময়ন্তী হিসেব করে দেখাল সুধাময়ের রিটায়ার করার মুখে কত টাকা জমবে এবং তার কতটা বাড়ির পেছনে যেতে পারে। যদি দোতলা শেষ করা যায়, তাহলে সল্টলেকের যা চাহিদা বাড়বে তাতে একতলা ভাড়া সুধাময়ের মাইনের কাছাকাছি চলে যাবে। অসুবিধে হওয়ার কোনও কারণ নেই।

সুধাময়ের হিসেবে ভালো লাগছিল না, মোক্ষম প্রশ্নটি করল সে, কার জন্য বাড়ি বানাবে? সুধাময়ের বংশে বেশি দিন বাঁচার উদাহরণ নেই। তা ধরা যাক, এই ছাপ্পান্নর পর সে আরও বছর কুড়ি বাঁচতে পারে। আর দময়ন্তীর মেদবৃদ্ধির পর কতগুলো রোগ স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ওযুধের সঙ্গে। অতএব সেও কুড়ি বছরের বেশি আশা করতে পারে না। তারপর বাড়িটার কি হবে? ছেলে নেই বলে কোনও আপশোস নেই, এবং ছেলে নেই বলে বাড়ি বানাবার প্রয়োজনীয়তাও নেই। কয়েক মুহূর্ত থিতিয়ে ছিল দময়ন্তী। কিন্তু মেয়েরা একবার জেদি হলে যুক্তি পেতে ওদের কষ্ট হয় না। দময়ন্তী বোঝাল, পরে কি হবে তার জন্য আজ কেউ চিন্তা করে না। মরে যেতে হবে জেনেও নব্বই বছরের বৃদ্ধ শরীর সারাতে ওযুধ খায়। অতসীর জন্য রাখা যে টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিট আছে সেটা পেতে আরও সাত বছর। সে সময়ের আগেও তো ওরা মারা যেতে পারে। অতএব যে ক'দিন আছে সে কদিন নিজেরাই ভোগ করে যাবে। দুটো দিন নিজের বাড়িতে হাত-পা খেলিয়ে বাঁচবে। তারপর যা হওয়ার হবে, মেয়েরা এসে ভোগ করুক।

সুধাময় দময়ন্তীকে মেয়েরা উচ্চারণ করতে শুনে চকিতে একবার দেখে নিলেন। দময়ন্তীর মেয়েরা হল মানসী আর অতসী। মানসী আছে আম্বালায়। সুখেন ওর স্বামী, দময়ন্তীর আদরের জামাই। ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, সুখেন খুব ভদ্র এবং কর্তব্যজ্ঞান প্রচুর। ওদের মেয়েটাও হয়েছে ফুটফুটে। তা আম্বালা থেকে সল্টলেকে এসে কোনওকালে যে সুখেনরা বাস করবে এমন মনে হয় না। দ্বিতীয়টি অতসী। ঠিক এক বছর হল অতসী এ বাড়িতে ঢোকেনি। দময়ন্তী ঢুকতে দেয়নি। এম-এ পাশ করা মেয়ে প্রেম করে বেজাতের একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলেকে চট করে বিয়ে করে ফেলল যার মাইনে চারশোর বেশি নয়—দময়ন্তী মানতে পারেনি। এ বাড়ির একটা নিয়মই ছিল, মানসী মায়ের অতসী বাপের, তা অতসী যে এত কাণ্ড করছে সুধাময় নিজেও টের পায়নি। অথচ খবরটা জানার পর দময়ন্তী ওকেই দায়ী করেছিল। প্রশ্রয়েই এটা সম্ভব। ত্যজ্য কন্যা কাকে বলে জানা নেই, মুখের ওপর মেয়ে-জামাইকে বলে দিয়েছিল দময়ন্তী, ওরা যখন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছে তখন এই বাড়িতে যেন কখনও প্রবেশ না করে। অতসী কেঁদেছিল কিন্তু পায়ে পড়েনি। সুধাময় ইজিচেয়ারে বসে চুপচাপ দেখল সে মায়ের মতো ঘাড় তুলে গম্ভীরমুখে কথাগুলো শুনছিল। দময়ন্তী প্রণাম নেয়নি, ওরা যখন সুধাময়কে প্রণাম করে গেল তখন ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল স্ত্রীকে। দময়ন্তীর এই চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। সুধাময় নিজেও অতসীকে সমর্থন করতে পারছিল না অবশ্য। কলেজে পড়াতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেম করতে দেখেছে, ক্লাসিক থেকে বর্তমানের গল্প-উপন্যাসে প্রেমের ছড়াছড়ি পড়ে তৃপ্ত হয়েছে। অথচ নিজের মেয়ের প্রেমকে সমর্থন করতে কোথায় বাধছিল। মানসীর বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে, খরচ বেশি হয়নি তখন, সামর্থ্যও খুব একটা ছিল না। তবে দময়ন্তীর গয়নার অনেকটাই বেরিয়ে গিয়েছিল। সোনার দর ছিল তখন একশো আশি-নব্বই। অতসীর জন্য সোনা কিনব-কিনব করে দময়ন্তী পেরে উঠছিল না। তারপর নোটবই থেকে যখন থোক টাকা হাতে এল, সোনা তখন সোনার হরিণ—লাফিয়ে সাত-আটশোতে চলে গেছে। ওর বিয়ের খরচ বাবদ টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে রাখা হয়েছে, যদি কখনও সোনার দর নেমে আসে! মেয়ে অবশ্য সে চিন্তা থেকে ওদের মুক্তি দিয়ে গেছে। দময়ন্তী হিসেব পালটে ফেলল। দোতলা করার সময় অতসীর নামে জমানো টাকাটা কাজে লাগাবে। ছেলে না থাক, একটা বাড়িকে যত্ন করে তৈরি করলে ছেলের কাজ দেবে। বড় মেয়ে মানসী যেমন থাকতে আসছে না, ছোট মেয়ে অতসীও তো প্রবেশাধিকার পাবে না। তাহলে ও বাড়িতে থাকবে কে? দময়ন্তী বোঝাল, আফটার জহরলাল হু? কিংবা ইন্দিরার

পর কে? এসব প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ না পাওয়া গেলেও যেমন একসময় সময় এসে সব ঠিক করে দিয়েছে তখন এ নিয়ে ভাবনার কোনও কারণ নেই।

তৃতীয় প্রশ্নটা করতে পারেনি সুধাময়। যদি দময়ন্তী আগে মারা যায়, তাহলে সে একা-একা কি করে থাকবে? দময়ন্তী নেই অথচ ও বেঁচে আছে চিন্তা করা যায় না। আবার উলটোটাও হতে পারে। তখন দময়ন্তী কি করবে? মেয়েদের উৎসাহ যখন আকাশ-ছোঁয়া হয় তখন—সুধাময় ঠিক করল দময়ন্তীকে যখন সারা জীবনে কিছুই দেওয়া হয়নি তখন ওর এই সাধটা পূর্ণ করবে।

কিন্তু খরচটা বেশি হয়ে গেল। এখন সল্টলেকে তেমন বাড়িঘর ওঠেনি। দুটো রুটের বাস যাতায়াত করে। বাড়ি তৈরির পর আর একটি সদ্য ওঠা বাড়ির সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল প্রায় কুড়ি হাজারের মতো বেশি গেছে কন্ট্রাক্টরের পকেটে। যতই পরিচিত হোক, পৃথিবীতে বোধহয় সৎ মানুষের বড় অভাব। তবে এখন বাড়ি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অতসীর নামের টাকাটা অবশ্য সময় পেরোবার আগেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে হয়েছে এই সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য। নতুন রঙের গন্ধ, মোজায়েক করা মেঝে, দেওয়ালের রং আর পেছনের বাড়ি তৈরির সময় লাগানো গাছগুলোর ডাগর হয়ে বেড়ে ওঠা—সুধাময়কে বলল পৃথিবীতে যদি সুখ কোথাও থাকে তো এখানেই। অনেকদিন থেকে গৃহপ্রবেশের তোড়জোড় চলছিল। আম্বালায় চিঠি গেছে নিয়মিত। মানসীরা জানিয়েছে গৃহপ্রবেশের পরদিন ওরা উপস্থিত হবে। সুখেনের ছুটি পাওয়া অনেক কষ্টে সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে দময়ন্তী ঠিক করলে গৃহপ্রবেশের দিন শুধু পুজোই হবে, খাওয়া-দাওয়া পরের রবিবার। অর্থাৎ মানসীকে বাদ দিয়ে কিছু নয়। লিস্ট হল, সুধাময়ের কলেজের বন্ধুবান্ধব, প্রকাশক আর আত্মীয়স্বজন। খাওয়াদাওয়াতে খরচ করাতে আপত্তি ছিল সুধাময়ের। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল দময়ন্তী, এত বড় সুখ একা-একা ভোগ করব? সবার সঙ্গে না মিললে সুখের কোনও মানে হয়?

অতএব আজ ছাব্বিশে ফাল্গুন, বুধবার সকালে ওদের গৃহপ্রবেশ হল। টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত অবশ্য দময়ন্তী আগে থাকতে এই বাড়িতে তুলেছে। আজ ভাড়াটে বাড়ি চিরদিনের জন্য ছেড়ে এল। সকালে ট্যাক্সিতে উঠেই দময়ন্তী বলল, 'বাব্বা, এতদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরের বাড়িতে যে আর থাকতে হবে না এইটুকুই স্বস্তি। তোমার ওপরও ভরসাও করলে হত না।'

সুধাময় হাসল। কথাটা সত্যি। দময়ন্তীর উদ্যোগ ছাড়া হত না। তিনটে শোওয়ার ঘর, একটা ডাইনিং স্পেস, বিরাট রান্নাঘর এবং সেখানে যাতে দক্ষিণের বাতাস ঢোকে সেটা লক্ষ ছিল। ভেতরের বারান্দার দিকের ঘরটা ওদের শোওয়ার ঘর, বাকি দুটো মানসীরা এসে অথবা অন্য কেউ অতিথি এলে ব্যবহার করবে। সবই দময়ন্তী ঠিকঠাক করছে। বাইরের ঘরটা ড্রইংরুম। বাঁকুড়ার পুতুল থেকে আরম্ভ করে শান্তিনিকেতনি দেওয়াল মাদুর দিয়ে আগেই সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিল ঘরটা। আজ ঘরে ঢুকে শেষ কথাটা বলল দময়ন্তী, 'দুটো জিনিস দরকার।'

সুধাময় দেখছিল দরজার রঙটা এক জায়গায় সমান পড়েনি, বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী?'

'একটা ছোট ফ্রিজ আর টিভি।'

অবাক চোখে তাকাল সুধাময়। অবশ্যই জিনিস দুটো দরকার, কিন্তু এত খরচের পর দময়ন্তী একথা উচ্চারণ করল কী করে?

'আমি এখনই কেনার কথা বলছি না। কিন্তু ফ্রিজ থাকলে তোমাকে রোজ বাজারে যেতে হবে না। ঠেলে-ঠেলে তো পাঠাতে হয়, তোমারই সুখ। আর সন্ধেবেলায় তো কিছু করার থাকবে না, তখন টিভি দেখে সময় কাটাবে।' দময়ন্তী ভেবেছে বেশ।

হাসল সুধাময়, অনেকদিন পর রসিকতা করল, 'কেন, সন্ধেবেলায় তো এখানে কেউ দেখতে আসছে না, শিয়ালটিয়াল ডাকে, তোমার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করব!'

তিরিশ বছর আগের সেই মেয়েটার মতো চোখের মোচড় দিল দময়ন্তী, 'যাও, কত ক্ষমতা

জানা আছে, দু-পা দৌড়লেই হাঁফাও! তা দুজনে মিলেই তো টিভি দেখব।'

আজ সকাল থেকে এখানে আসার পর দময়ন্তীর চেহারাটা যেন পালটে গেছে। ঠিকে কাজের লোকের সঙ্গে সমানে ছুটোছুটি করছে, যে পুরুতটা পুজো করতে এসেছে তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। বয়স যেন রাতারাতি থার্মোমিটারের পারার মতো নেমে এসেছে। সময়, দুশ্চিন্তা এবং রোগ মানুষকে উত্তপ্ত করে বয়সের পারদ বাড়িয়ে দেয়—এই রকমের সুখ এলে সেটা নেমে আসতে পারে। প্রথম বা মধ্য যুবতীর মতো লাগছে দময়ন্তীকে। অনেকদিন পর ভোরে স্নান করে সিল্কের শাড়ি পরেছে, আজকাল তো রঙিন কিছু গায়ে ওঠাতই না। সে তুলনায় নবীন হতে পারছে না সুধাময়। আনন্দ নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু কোথায় যেন খচখচ করে উঠছে মাঝে-মাঝে। নিজেকে দময়ন্তীর তুলনায় বৃদ্ধ বলে বোধ হচ্ছে।

আজ দময়ন্তী উপোস করেছে। পুজো শেষ করে খাবে। বারণ করেছিল সুধাময়। প্রতিবেশী বলতে নতুন তৈরি বাড়ির মালিক একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার। আলাপ হয়েছিল আগেই, একটু আগে তিনি ঘুরে গেলেন একবার। সুধাময় ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বসেছিল। দময়ন্তী এক গ্লাস সরবত দিয়ে গেছে। আজ চা তৈরির ঝামেলা চায় না ও। বাড়িটার একটা নাম দেওয়া দরকার। বাতাস আসে বলে সুধাময় ভেবেছিল নাম দেবে বাতাস-বাড়ি। একদম পছন্দ হয়নি দময়ন্তীর। কী নাম দেওয়া যায় ভাবতে-ভাবতে সুধাময় ঠিক করল স্ত্রীর নামেই বাড়ির নাম থাকুক। চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডাকল সে। খিঁচিয়ে উঠে দময়ন্তী ছুটে এল, শুনে বলল, 'মরণ। পুরুতমশাই ওদিকে পুজো করছেন আর তোমার যত আদিখ্যেতা! একদম ডাকবে না আমাকে। গৃহপ্রবেশের পুজো—একদম ইয়ার্কি নয়।'

এত বড় বাড়িতে ওরা দুই বৃদ্ধ থাকবে, তিরিশ বছর আগে না হয় অন্যরকম লাগত, এখন লোকজন না হলে ভালো লাগে? অবশ্য মানসীরা কাল সকালে আসবে। ক'দিনের জন্য হলেও বাড়িটা জমবে। মানসীর কথা মনে হতেই সুধাময় অতসীর মুখটা দেখতে পেল। অতসী মানসীর মতো সুন্দরী নয় কিন্তু বড় গম্ভীর মেয়ে, ওকে ঠিক বুঝত। এক বছর কোনও খবর নেই মেয়েটার। দময়ন্তী ঘুণাক্ষরে নাম করে না। এই যে আজ এত বড় আনন্দের দিন, মানসী আসছে সেই আম্বালা থেকে, অথচ কাছেই মানিকতলা থেকে অতসী আসছে না। ওকে জানানোই হয়নি এই সুখের কথাটা। মনে-মনে অনেকবার ইচ্ছেটা নিশ্বাস নেওয়ার জন্য নাক তুলে ভুল করে ডুব দিয়েছে ফের—সুধাময়ের যাওয়া হয়নি কখনও। যদিও দময়ন্তী ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তবু মেয়েটা তো একবার আসতে পারত। অন্ততপক্ষে ওর কলেজে গিয়ে দেখা করতে পারত। ছেলেবেলা থেকে যে অসম্ভব জেদের জন্য অতসী মায়ের কাছে মার খেত সেটা এখনও গেল না। মেয়েমানুষের এত জেদ ভালো নয়। সবাই বলে অতসী বাপের স্বভাব পেয়েছে, কিন্তু জেদটা তো একদম মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।

তবু এমন একটা হীনতা চারপাশ ছেয়ে ধেয়ে এল, সুধাময় ঠিক করল দময়ন্তী যাই বলুক না কেন, একদিন অতসীর সঙ্গে দেখা করে আসবে। যে মেয়েটাকে একটু-একটু করে বড় হতে দেখল, কাদার তালটাকে মানুষের ছাঁদে ফেলল, দুদিন আগে একটা ছেলে এসে তাকে কতটা পালটে দিতে পারে তা নিজের চোখে দেখে আসবে। মেয়ের প্রতি যে অভিমান এতটা কাল চারপাশে দেওয়াল রেখেছিল সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন উঠে দাঁড়াল সুধাময়। সুখের কালে মানুষকে উদার হতে হয়। ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে ডাক এল, হোম শুরু হচ্ছে। দময়ন্তী তাকে সঙ্গে পেতে চাইছে।

অবেলায় খাওয়া একদম সহ্য করতে পারে না দময়ন্তী। বিকেল নাগাদ অম্বল হয়ে গেল। সুধাময় অম্বল যাওয়ার ট্যাবলেট খাওয়াল তাকে। বাড়িতে ওষুধের একটা ছোটখাটো স্টক আছে। দুপুরে ঘুম হয়নি, শুয়েছিল কিন্তু দেরিতে খাওয়ার দরুনই হোক অথবা নতুন জায়গা বলেই হোক ঘুম এল না। বিকেলটা ওরা বাগানে বসে কাটাল। চোখের সামনে সূর্য নিবতে-নিবতে অন্ধকারে

মুখ ডুবিয়ে সন্ধেটাকে টেনে আনল। সন্ধে রাত হবে। মানুষের সুখগুলো কেন সকালবেলায় আসে না? সারাটা দিন কেমন হেসেখেলে কাটানো যায় তাহলে।

এই যে এখন ওরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছে, কথা হচ্ছে কম। আর কথাই বা কি। একটা দিনরাতের কাজের লোক দরকার। সল্টলেকে লোক পাওয়া যায় না। ভবানীপুরে বলে রেখেছে দময়ন্তী। বুড়ো মানুষও চলবে না, মেয়ে হলেই ভালো হয়। ছোকরা চাকর চুরিচামারি করবে। এখন সল্টলেক ফাঁকা, চোরদের সুবিধে খুব। বাচ্চা চাকরকে হাত করতে ওদের অসুবিধে হবে না। অল্পবয়সি মেয়ে রাখারও ঝামেলা। বাজারে পাঠালে কার সঙ্গে কি করবে, চাপ আসবে বাড়ির ওপর। একমাত্র চল্লিশ পার হওয়া শক্তসমর্থ ঝি চাই। সুধাময় চুপচাপ শুনছিল। বছর পনেরো-কুড়ি আগে ঘরের মানুষের প্রতি সজাগ হয়ে যুবতী ঝি রাখত না দময়ন্তী, এখন চিন্তা বাইরের লোকের জন্য। হেসে ফেলল সে।

দময়ন্তী মুখ তুলল, 'হাসলে কেন?'

'এককালে ঝি রাখার সময় আমার কথা চিন্তা করে রাখতে না!' সুধাময় স্মৃতি ধরল।

দময়ন্তীও হাসল, হ্যাঁ, এককালে। পুরুষমানুষের মন না মতি। তোমাদের বাবা বিশ্বাস করা যায় না।'

'এখন করো? সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'হুঁ। এখন তুমি তো শৈশব। শিশুর মতো সরল।'

তিরিশ বছর আগে দুজনে এরকম নিভৃতে বসলে এ ধরনের কথা অবশ্যই হত না। আপশোস করে লাভ নেই। কারণ দময়ন্তী যখন বলল, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, মানসীদের ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছচ্ছে ভোর-ভোর, ওরা নতুন বাড়ি চেনে না, ঠিকানা খুঁজে বাড়ি পাওয়া এখন সল্টলেকে খুব সহজ নয়, অতএব সুধাময়কে স্টেশনে যেতে হবে, কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায় সেই চিন্তায় সে তখন এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তিরিশ বছর আগের কথা আর খেয়াল থাকল না। অত ভোরে বাস ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। এক হয়, মিনিট পনেরো হেঁটে ভি আই পি রোড থেকে বাস ধরা। সেটাই করতে হবে। ঠিক হল সুধাময় পাঁচটার আগেই বেরিয়ে যাবে। আজকাল সকাল বড় তাড়াতাড়ি হয়।

প্রথম রাত বলেই খাওয়া-দাওয়ার বেশি ঝামেলা করেনি দময়ন্তী। সুধাময় দুধ খায় অথচ এখানে সে ব্যবস্থা এখনও হয়নি। কৌটোর দুধ দিয়ে কাজ চালাতে হল। দময়ন্তী শোওয়ার আগে প্রত্যেকটা ঘর ভালো করে দেখে সবক'টা দরজায় তালা দিয়ে এল। সাবধানের মার নেই কিছু।

সুধাময় শুয়েছিল, বিছানায় ভারী শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে দময়ন্তী বলল, 'একটা বেড-সুইচের ব্যবস্থা করো। বারবার উঠতে ভালো লাগে না।'

নতুন বাড়ি, পায়ে-পায়ে প্রয়োজনগুলোর কথা মনে ঠেকছে। সুধাময়েরও কিছু-কিছু পরিবর্তন দরকার। বুকসেলফটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়নি। একটা নতুন লেখার টেবিল দরকার। দময়ন্তী উঠে বসে জামা খুলল। আটোসাঁটো হয়ে শুলে ঘুম আসে না। আপদগুলোকে পায়ের কাছে সরিয়ে রেখে ওর মশারির কথা মনে পড়ল। ভবানীপুরে এই ঝামেলাটা ছিল না। কিন্তু সল্টলেকের মশা চড়ুইপাখির মতো, মশারি না থাকলে কাল সকালে সমস্ত শরীরে গোদ হয়ে যাবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেল ওর। কেমন নিশ্চিন্তে শুয়ে পা দুটো ওপাশ-এপাশ করছে। নিশ্চয়ই মশা কামড়াচ্ছে, তবু উঠে টাঙানোর চেষ্টা নেই। রাগে টং হয়ে দুমদাম করে উঠে মশারিটা খুলে ফ্রেম থেকে চারটে খুঁট টাঙিয়ে দিল হুকে। মশারিটা গুঁজে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যার দরকার সে করবে। খানিকবাদেই মনে হল প্রথম দিন আজ, আজ না হয় রাগারাগি নাই বা হল। মানুষটার স্বভাব যা তার বাইরে যাবে কী করে? তিরিশ বছর ধরে তো দেখছে দময়ন্তী। কথাটা মনে হতেই মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিতে-দিতে বলল, 'আমার মতো বউ পেয়েছিলে বলে বর্তে গেলে।'

সুধাময় নিঃশব্দে স্ত্রীর আচরণ দেখছিল, ভঙ্গিগুলো খুব চেনা। খুব শিগগির ঝড় উঠবে ভাবছিল, তার বদলে এমন বাক্য শুনে অবাক হয়ে বলল, 'একদম সত্যি কথা।'

'ঢং!' বলে দময়ন্তী ওর পাশে শুয়ে পড়ল। বিবাহিত জীবনের প্রতিটি রাত, শুধু দময়ন্তীর মা হওয়ার দিনগুলো ছাড়া ওরা আলাদা শোয়নি। সুধাময়ের একটা পরিচিত ভঙ্গি আছে শোওয়ার, দময়ন্তীর পাশ ফিরে থাকা জঙ্ঘার ওপর পা তুলে পাশবালিশের মতো ব্যবহার করে ওর চুলের ঘ্রাণ নিতে-নিতে কখন ঘুম এসে যায়। এত বছরে দময়ন্তীরও এই ভঙ্গিটা অভ্যাস হয়ে গেছে। যৌবন চলে গেছে অনেকদিন, শরীব আর অন্য প্রয়োজনের কথা ভাবে না। কোন্ শৈশবে সুধাময় যেমনটি মায়ের পাশে শুয়ে থাকত জড়িয়ে মিশিয়ে, জীবনের এই শেষ অপরাহ্ণে এই আরামটুকু ছাড়া ঘুম আসতে চায় না। দময়ন্তীর সঙ্গে ওর অনেক বিষয়ে মেলে না, প্রায়ই ঝগড়া হয়, মুখ খিঁচিয়ে দময়ন্তী ওকে কথা শোনায়, কাটা-কাটা কথা বলে স্ত্রীকে বিদ্ধ করতে তখন সুধাময়ের আটকায় না, কিন্তু রাতের শোওয়ার সময় এই আশ্রয়টুকু তার চাই। সুধাময় জানে দময়ন্তী তার রক্তে মিশে গেছে। আজ সারাদিনের খাটুনিতে দময়ন্তীর শরীর খুব দ্রুত শিথিল হয়ে আসছিল। ফিসফিস করে সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খুশি দমু?' জড়ানো গলায় স্বামীর বুকের ওপর মুখটাকে সরিয়ে এনে দময়ন্তী সুখের জানান দিল।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল সুধাময়ের। দময়ন্তী ডাকছে। নতুন জায়গা, চোরটোর আসতে পারে, দ্রুত উঠে স্ত্রী দিকে তাকাল সে। মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দময়ন্তী, ওকে বসতে দেখে বলল, 'বাথরুমে যাব, একটু দাঁড়াবে চলো।'

চট করে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল সুধাময়ের, 'আচ্ছা জ্বালা তো, বুড়ো হয়ে মরতে চললে তবু বাচ্চাদের মতো ভয় গেল না। দরজা খুলেই বাথরুম, যেতে হয় যাও আমি দাঁড়াতে পারব না।'

দময়ন্তী তবু দাঁড়িয়ে, 'চলো না।'

'আঃ, ঘুমটাকে নষ্ট করো না তো। এখানে আরশুলা কিংবা ভূত নেই। যত্ত ছেলেমানুষি!' সুধাময় আবার শুয়ে পড়ল। দরজা খোলার শব্দ হল, দময়ন্তী বাথরুমে চলে গেল। কখন আবার ফিরেছে ও, বিছানায় শুয়েছে টের পায়নি সুধাময়। হঠাৎ উঃ-আঃ শব্দে ঘুমটা চটে গেল। চোখ মেলে দেখল ঘর অন্ধকার, দময়ন্তী ছটফট করছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালল সুধাময়। দময়ন্তীর দুটো হাত বুকের ওপর, কপালে ঘাম। ঝুঁকে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, অমন করছ কেন?'

'বুকটা কেমন করছে।' দময়ন্তী দাঁতে দাঁতে চাপল।

দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে সুধাময় মাথা নাড়ল, 'অম্বল উইন্ড ওপরে ঠেলেছে। এত করে বললাম উপোস করো না, সেই অবেলায় খেয়ে এখন মাঝরাত্তিরে ঝামেলা। যা সয় তাই করো।' গজগজ করতে-করতে টেবিলের ওপর রাখা ওযুধের বাক্স খুলে জোয়ানের আরকের শিশিটা বের করল সে। চাপা দিয়ে রাখা গেলাসের জলে ঢেলে দময়ন্তীর কাছে এগিয়ে এসে সুধাময় বলল, 'নাও এটা গেলো।'

দময়ন্তী বড়-বড় চোখে ওর দিকে তাকাল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, বুকের ওঠানামা আর হাত দুটোকে মুষ্টিবদ্ধ দেখল সুধাময় এবং এই প্রথম সে ভয় পেল। স্ত্রীর মাথার পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে দুবার নাম ধরে ডাকল। দময়ন্তী তাকিয়ে আছে, কথা বলছে না। মুহূর্তে সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল সুধাময়ের। এটা তো সাধারণ অম্বল নয়। কী করা যায়। দ্রুত গেলাসটাকে রেখে স্ত্রীর ওপর হুমড়ি খেয়ে বুকে ম্যাসেজ করতে চেষ্টা করে বুঝতে পারল এতে কোনও লাভ হবে না। এখন যেমন করেই হোক একজন ডাক্তার আনা দরকার। সন্টলেকে এত রাত্রে ডাক্তার—প্রতিবেশী ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল ওর। কিন্তু ভদ্রলোক প্র্যাকটিস করেন না, তবু ডাক্তার তো। কিন্তু

ডাকতে গেলে দময়ন্তীকে একা ফেলে যেতে হয়। এসব চিন্তা করার সময় নেই এখন। সুধাময় দরজা খুলে বাইরে বেরুতে যেতে ডাইনিং রুমের দরজায় হোঁচট খেল। জায়গাটা অন্ধকার, আলো জ্বেলে দেখল বাইরের ঘরে ঢোকার দরজায় তালা দেওয়া। অতিরিক্ত সর্তক হয়েছিল দময়ন্তী। এখন আশেপাশে তাকিয়ে, ডাইনিং টেবিলের ওপর কোথাও চাবিটাকে খুঁজে পেল না সুধাময়। দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে ডাকল সে। দময়ন্তীর তখন কথা বলার মতো অবস্থা নেই। অসহায় হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সুধাময়। নিজের বাড়ির ভেতর বন্দি হয়ে রয়েছে সে। এমন মেয়ে, চাবিটা যে সুধাময়ের প্রয়োজন হতে পারে তা খেয়াল করবে না কখনও। তালাগুলো খুব মজবুত দেখে কিনেছিল সুধাময়। ওগুলোকে ভাঙার চেষ্টা করা বৃথা। জমাদারের আসার পথটা মনে হতেই বাথরুমের ছুটল সে। ল্যাট্রিনের পেছনের দরজায় ভেতর থেকে খিল এবং শেকল তোলা। ছোট্ট একটা টিনের তালা আছে অবশ্য, তবে সেটা ভেঙে ফেলতে অসুবিধা হল না ওর। ছোট্ট প্যাসেজ দিয়ে, গ্যারেজের পাশ কাটিয়ে গেটে এসে গেল সুধাময়। দরজাটা খোলাই থাকল, সেদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই এখন। গেটটা ছোট, তালা দেওয়া হয়নি, তাই সহজেই ডিঙিয়ে যাওয়া যায়।

এখন কত রাত কে জানে! বেশ হাওয়া দিচ্ছে। তামাম সল্টলেকে কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। ভবানীপুরে সিগারেটের দোকান সারারাত খোলা থাকে। বাড়িঘর হয়নি, মানুষ নেই এখানে। সুধাময় যতটা পারে দৌড়ে দৌড়ে ডাক্তারের বাড়ির সামনে এল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। লম্বা মাথা গেটে তালা ঝুলছে। প্রায় আধঘন্টা চেঁচামেচির পর ভদ্রলোককে পেল সুধাময়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে ওঁকে আসতে আরও কিছু সময় ব্যয় হল। বাথরুমের দরজা দিয়ে ভদ্রলোককে যখন দময়ন্তীর কাছে পৌঁছালেন তখন তিনি রীতিমতো নার্ভাস। বোঝা যায় প্র্যাকটিস ছাড়ার পর সাধারণ বৃদ্ধের সঙ্গে ওঁর কোনও তফাত নেই। তবু দময়ন্তীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার সুধাময়কে বললেন, ওঁকে এখনই হাসপাতালে দেওয়া দরকার।

হাসপাতাল। সুধাময় কিছুই ভাবতে পারছিল না। সল্টলেকের এই উপান্তে কোনও গাড়িঘোড়া নেই। কোন বাড়িতে আছে কে জানে। যদি সম্ভব হত দময়ন্তীকে কাঁধে করে নিয়ে যেত সে। প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার ভঙ্গিতে সুধাময় বলল, 'সকাল অবধি কোনওরকমে রাখা যায় না ডক্টর?'

একটু স্বাভাবিক হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, ব্যাগ খুলে ইঞ্জেকশন দিলেন। 'বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, হার্ট খারাপ ছিল?'

'কই না তো!' সুধাময় দময়ন্তীর অনেক অসুখের মধ্যে এটা মনে করতে পারল না।

আধঘন্টা বাদে ভোর চারটে বেজে বাইশ মিনিটে দময়ন্তী চলে গেল। যাওয়ার আগে কোনও কথা বলেনি, বলার মতো ক্ষমতা ফিরে পায়নি।

সুধাময় বাবু হয়ে বসেছিল দময়ন্তীর মাথার পাশে। ডাক্তার ভদ্রলোক ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। কিছু কথা যা এই অবস্থায় বলা উচিত বলেছিলেন, 'শেষতম পৃথিবীটা কার, সবাই আমার আমার বলে চেঁচাই, কিন্তু এটা যে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমরা জানি না। আপনার স্ত্রী সাধ মিটিয়ে বাড়ি করলেন, ভোগ করতে পারলেন না। সুধাবাবু, তার চেয়ে সব সময় যাওয়ার জন্য তৈরি থাকাই ভালো, তাতে কষ্ট হয় না। এখানে বেড়াতে এসেছিলেন ভাবলেই ভালো। তা কাউকে খবর দিতে হবে কিনা বলুন?'

সুধাময় ঘাড় নেড়েছিল। একটু বাদেই মানসীরা এসে পড়বে। যা কারার ওরাই করবে। ডাক্তার আবার আসবেন বলে চলে গেলেন।

সুধাময় স্ত্রীর দিকে তাকাল। ভোরবেলায় দময়ন্তী এইরকম ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে থাকে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক, দাঁত চিকচিক করে, মুখের চেহারায় শ্রী আনে বেশ। এই নতুন বাড়িতে ভোর রাতের নির্জনে সুধাময় স্থবিরের মতো বসে-বসে স্ত্রীকে দেখছিল। আঙুল তুলে দময়ন্তীর গালের ওপর রাখল সে, এখনও গরম। চোখের পাতায় চুমু খেতে বড় ভালো লাগত প্রথম যৌবনে। এখন এ মুখে হাঁসের

পায়ের ছাপের মতো বয়স দাগ ফেলেছে প্রচুর। তবু সেগুলো বড় আদরের। বুকের ভেতর হাঁসফাঁস শুরু হল সুধাময়ের দুহাত দিয়ে দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরতেই শরীর মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু কান্না আসছে না কিছুতেই, সুধাময় গলা তুলে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারছে না। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে ওর। তারপর এক সময় দময়ন্তীর কপালের ওপর শীতল হাত রেখে পাথরের মতো বসে রইল সে।

ওরা এল। এর মধ্যে কখন বেলা গড়িয়েছে, চারধার রোদে রোদ। ডাকাডাকি করে সাড়া পায়নি মানসীরা। ডাক্তার বোধহয় নজর রেখেছিলেন, বাথরুমের দরজাটা তিনিই চিনিয়ে দিলেন। আর তার পরেই কান্নাটা আছড়ে পড়ল ঘরে। দু-রাত ট্রেন-জার্নি করে এসে মানসী মায়ের বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে। সুখেন হতভম্ব। বাচ্চাটা মুখে হাত দিয়ে দাদুকে দেখছে। এই প্রথম হুঁস হল সুধাময়ের। এই কান্না ওর হুঁস ফিরিয়ে আনল। কী করে হল, কেন হল, এই সব প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে ওকে দিতে হচ্ছে না কিন্তু মানসীর পাগলের মতো আকুলিবিকুলি দেখেও কান্না আসছে না। সুখেন স্ত্রীকে সামলাল। মেয়েরা বোধহয় খুব দ্রুত শোক সামলাতে পারে। খানিক বাদে মানসী বাবার পাশে এসে দাঁড়াল, 'বাবা—!'

সুধাময় মুখ তুলে তাকাল। মোটা হয়েছে মানসী এবং ওর তাকানোটা ঠিক দময়ন্তীর মতো।

'একি হল বাবা।' কান্নাচাপা গলায় বলল মানসী।

চোখ বন্ধ করল সুধাময় 'চলে গেল। আমি এখন কী করব।'

মানসী বাপের বুকে হাত রাখল, 'তুমি ভেব না, মা নেই কিন্তু আমি আছি।'

'তুমি আছ?' সুধাময় চোখ খুলে দময়ন্তীকে দেখল, 'কিন্তু ও নেই, আমি থাকব কি করে?'

সুখেন সবাইকে খবর দিল। সমস্ত বাড়ি ভরতি লোক এখন। যারা গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন খেতে আসত তারাই এসে বাড়ি ভরিয়েছে। সেই রাত থেকে একঠায় হয়ে বসে আছে সুধাময়, বাথরুম করতেও ওঠেনি। কিন্তু দুপুর নাগাদ ওকে ওঠাতে চাইল সবাই। আর দেরি করা যায় না।

এ ঘরের জানলা দিয়ে খোলা আকাশ, সামনের মাঠ আর রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। ছোট্ট দলটা দময়ন্তীকে কাঁধে নিয়ে চলে গেল একটু আগে। হরিধ্বনি উঠছে মাঝে-মাঝে। সুধাময়ের অবস্থা দেখে ওকে শ্মশানে নিয়ে যেতে চায়নি সুখেন। মুখাগ্নি সে-ই করবে। মাকে তিরিশ বছরের পুরোনো বেনারসিতে সাজিয়ে দিয়েছে মানসী। মাথায় সিঁদুর মেখে পূর্ণ সুখের চেহারা নিয়ে দময়ন্তী চলে যাচ্ছে। ঘাড় তুলে জানলা দিয়ে ওদের যাওয়া দেখল সুধাময়।

এই সময় মানসী ঘরে ঢুকল, 'বাবা ওঠো, হাত-মুখ ধোবে চলো। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুধাময় উঠল। সমস্ত ঘর জুড়ে দময়ন্তী। কিন্তু সুধাময়ের বুক ফাঁকা চোখ শূন্য। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। মানসী স্থির নেই, ডুকরে-ডুকরে উঠছে মাঝে-মাঝে। ওর মেয়েটাকে ডাক্তার তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। মুখ-চোখ ধুতে সাহায্য করল মানসী। বাবাকে বাইরের বারান্দায় বসিয়ে চায়ের জোগাড় করতে গেল সেই অবস্থায়।

রোদে সল্টলেক পুড়ছে। বাতাস বইছে গরম হয়ে। সুধাময় মনে-মনে বলল, 'সেরকমটাই হল, যেরকমটা তার আশঙ্কা হয়েছিল। এত সহজে যদি মানুষ মরে যেতে পারে তবে পৃথিবীতে এত সমস্যা কেন? সুধাময় কেন চট করে মরতে পারছে না? আর এই সময় সেই হারটার কথা মনে পড়ল ওর। চিৎকার করে মানসীকে ডাকল সুধাময়।

মেয়ে ছুটে বাইরে এলে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সুধাময়। হাঁপটা কমতে বলে উঠল চেঁচিয়ে, 'তাড়াতাড়ি আলমারি খোল। লকারে ছোট্ট গোল ভেলভেটের বাক্স আছে, সেইটে নিয়ে এসো।'

মানসী বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন?'

ধমকে উঠল সুধাময়, 'আঃ, যা বলছি করো।'

'চাবি? মানসী অবাক হচ্ছিল।

'আলমারির ওপরেই আছে।' বলেই মনে পড়ল কাল রাতের কথা। আলমারির মাথায় আর বালিশের তলায়—দময়ন্তীর চাবি রাখার এই প্রিয় দুটো জায়গার কথা কাল রাতে একদম খেয়াল ছিল না। সকালে সুখেন বালিশের তলায় চাবিটা পেয়েছে। মানসী বাক্স এনে দিলে সুধাময় হারটা বের করে দেখল। খুবই পাতলা অল্প সোনার হার। তিরিশ বছর আগের অল্প টাকার চাকুরে সুধাময় ফুলশয্যার রাতে দময়ন্তীকে উপহার দিয়েছিল হারটা। এই গরিব দেখতে হারটা দময়ন্তীর বড় প্রিয় জিনিস। বলত, আমি যদি আগে মরি তাহলে এই হারটা আমার গলায় পরিয়ে দিও শ্মশানে যাওয়ার সময়।

সুধাময় বাক্সটাকে হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পাজামার ওপরেই শার্ট পরে নিল। মানসী জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

সুধাময় যেতে-যেতে উত্তর দিল, 'তোমার মায়ের কাছে। এই জিনিস ওর পরে যাওয়ার কথা ছিল।' মানসী বাধা দিতে গিয়ে চুপ করে গেল। কাঠফাটা রোদে প্রায় দৌড়ে যাওয়া বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে একবার কেঁদে উঠল সে।

পক্ষীকুঞ্জ ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেও ওদের চোখে পড়ল না। ঘোরের মাথায় হেঁটে এসে রোদ্দুরে গিয়ে সুধাময়ের মাথা ঘুরতে লাগল। ওপাশ থেকে আসা একটা সাইকেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানল—মাথায় করে নয়, একটা টেম্পোতে মৃতদেহ নিয়ে কয়েকজনকে যেতে দেখেছে সে। তাহলে কি ওরা মাঝপথে টেম্পো ধরে নিয়ে গেল দময়ন্তীকে? এখান থেকে নিমতলা অনেক দূর। টেম্পোতে অবশ্যই ওদের সুবিধে হবে। কিন্তু সুধাময় এখন কি করবে? কোনও বাস সরাসরি নিমতলায় যায় না। শরীর কাঁপছে, পা চলছে না। এই সময় ন-নম্বর বাসটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ভরদুপুরে সল্টলেকে যাত্রী নেই। দুহাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে উঠে বসল সে। মানিকতলায় বাসটার শেষ, নেমে প্রথমে কি করবে ভাবতে গিয়ে অতসীর কথা মনে পড়ে গেল সুধাময়ের। বেচারা জানে না ওর মা মরে গিয়েছে। অতসী নামটা তো দময়ন্তীরই দেওয়া। কোনওদিন আসা হয়নি কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। জীবদ্দশায় যা হওয়ার হোক, মরে যাওয়ার পর মানুষের শরীরে ক্রোধ কিংবা অভিমান থাকে না। মানিকতলায় এসে অতসীকে খবরটা না দিলে বড় পাপ হয়ে যাবে। একটু দেরি হবে হয়তো কিন্তু শ্মশানে গিয়েই তো দাহ করা যায় না। মাকে শেষবার যেন দেখতে পায় অতসী। সুধাময় নির্দিষ্ট নম্বরে কড়া নাড়ল। বেশ খানিক বাদে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে? এত জোরে কড়া নাড়ে কে?'

সুধাময় দেখল একজন ঝি মতন বুড়ি জানলা খুলে তাকে দেখছে। 'অতসীরা কি এ বাড়িতে থাকে?' সুধাময়ের গলা শুকিয়ে কাঠ।

'হ্যাঁ, কী চাই?'

'একটু ডেকে দাও।'

'ডাকব কী করে? সে তো হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে? কেন?' আবার চমক সহ্য হচ্ছিল না সুধাময়ের।

'বাচ্চা হয়েছে, পরশু দিন। কে গা তুমি?'

পরিচয় দিতে গিয়ে থেমে গেল সুধাময়, 'কোন হাসপাতালে?'

'নীলরতন না কি বলে। শ্যালদার পাশে।'

চুপচাপ চলে এল সুধাময়। অতসী—অতুর বাচ্চা হয়েছে। সেই ছোট্ট মেয়েটা গুড়গুড় করে হাঁটত, যার গায়ের ঘাম-গন্ধ এখনও সুধাময় নাক টানলে পায়, তারও বাচ্চা হয়ে গেল! কে গো তুমি—ঝি-এর প্রশ্নটার উত্তরে সুধাময় যদি পরিচয় দিত তাহলে কি ও বলে উঠত, কেমন বাপ গো, মেয়ের খবর রাখো না!

মানিকতলার মোড়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল সুধাময়। চোখের সামনে সব সাদা লাগছে কেন?

এতক্ষণ ওরা নিশ্চয় শ্মশানে পৌঁছে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে যদি দ্যাখে আগুন লেগেছে শরীরে, তাহলে—কেঁপে উঠল সুধাময়। না, সে দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তিরিশ বছর ধরে যে শরীরটায় মুখ ডুবিয়ে একটু-একটু করে তার পরিবর্তন দেখেছে, আজ সেটাকে বিকৃত হতে দেখতে পারবে না। অনেকক্ষণ রকে বসে পাথর হয়ে থাকল সে। তারপর উঠে শ্লথ পায়ে ন-নম্বরের দিকে এগোতেই খালি ট্রামটা চোখে পড়ল।

সুধাময় হাসপাতালের সামনে নেমে দেখল বিকেলের ছায়ামাখা রোদে প্রচুর মানুষ গেটে ভিড় করেছে। ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হতেই সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চেনে না, কোনওদিন আসেনি। জিজ্ঞাসা করে-করে মেটার্নিটি ওয়ার্ডে পৌঁছে গেল সে। খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গেল সুধাময়। কেবিনগুলোতে নেই অতসী। আবার এনকোয়ারিতে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছে এমন সময় চিৎকারটা কানে এল, 'বাবা!'

মুখ ঘুরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে বিরাট হলঘরটার দিকে তাকাল সুধাময়। অনেক খাট পাশাপাশি। একটা খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে ওটা কে? অতসী নাকি? পায়ে-পায়ে কাছে আসতেই চমকে উঠল সুধাময়, অতসী যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে গিয়েছে। গায়ের জামাকাপড় ঢলঢলে, শরীর রোগা।

'বাবা, তুমি এখানে? কী চেহারা হয়েছে—' নিজের কথাটা মেয়ের মুখে শুনতে পেল সুধাময়। অতসী তখন বিছানা থেকে আস্তে-আস্তে নামছে। বিছানার এক পাশে টুল থেকে ছোট জামাই উঠে দাঁড়াতে দেখল বাচ্চা মেয়ের মতো অতসী বাবার হাত ধরল, ' কে খবর দিল বাবা?'

'ভগবান।' ফিসফিস করে বলল সুধাময়।

'তুমি—তুমি, আমি জানতাম, একদিন তুমি আসবে।' অভিমান ঝুরুঝুরু ঝরছিল অতসীর গলায়।

'তুই আসতে পারলি না!' প্রথম কথা বলল সুধাময়।

জামাই এসে টুলটা এগিয়ে দিল, 'বসুন।'

ঘাড় নাড়ল সুধাময়। তারপর পাশের ছোট্ট খাটটার দিকে তাকাল। দুদিনের কচি মুখ এখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। ফরসা, একমাথা কোঁকড়া চুল। ঠিক এইরকম ছিল অতসী। এই শরীরটা একদিন তিল-তিল করে বড় হবে, সুখ পাবে, দুঃখ পাবে এবং একদিন দুঃখ দিয়ে দময়ন্তীর মতো চলে যাবে। পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সটা বের করে হারটা শিশুর গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুধাময়। এখন তার অশৌচ চলছে। এই মুহূর্তে সেই শরীরটা হয়তো দগ্ধ হয়ে গেছে। এখন কি ওকে ছোঁওয়া উচিত? হারটা মেয়ের হাতে দিল সুধাময়, 'ওটা ওকে পরিয়ে দিস।'

হাসিমুখে হারটা নিয়ে অতসী বলে উঠল, 'আরে, এটা তো মায়ের হার! মা পাঠিয়ে দিল বুঝি?' ঠোঁট চেপে ঘাড় নাড়ল সুধাময়। তৃপ্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ওটা শিশুর গলায় পরিয়ে দিল অতসী। সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল শিশু, হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করে ঘুমন্ত হাসল। সেদিকে চেয়ে অতসী বলে উঠল, 'দ্যাখো-দ্যাখো বাবা, আমরা দুজন বলাবলি করছিলাম, তুমি দ্যাখো—হাসলে একদম ওকে তোমার মতো দেখায়।'

খাটের বাজু নেই, মেয়েকে ধরে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে থরথর করে কেঁপে উঠল সুধাময়। আর কী আশ্চর্য, কাল রাতের পর থেকে এই প্রথম, সমস্ত শরীর থেকে তেড়েফুঁড়ে জলগুলো ছুটে এল চোখের বাইরে।

সুধাময় কাঁদতে লাগল শিশুর মতন। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'ভুল দেখছিস। ও তোর মায়ের মতন হবে। তাহলে দেখবি কোনওদিন কষ্ট পাবে না।'



অক্টোপাস

এই মেঘ অসময়ের। তবু দু-দুটো দিন এঁটুলির মতো লেগে আছে আকাশের গায়ে। অভিরাম ভেবেছিল ঝড়ো বাতাস নুনের ছিটে দেবে। কিন্তু দুটো দিনরাত কাটল, কেটেই গেল।

যে কোনও মুহূর্তেই মেঘগুলো জল হয়ে নামতে পারে। ব্যস, তাহলে আর রক্ষে নেই। সব গেল। এ যেন সব পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া বুড়ি মেয়েছেলেদের শরীরে নতুন আঁচড় পড়ার মতো ব্যাপার। ঝরেও ঝরে না জল, শুধু খটাং-খটাং শব্দ বাজে মেঘের হাড়ে-হাড়ে। যৌবনের কাঠঠোকরা বড় মারাত্মক। ঠুকে ঠুকে ঠোঁট ভোঁতা তবু অভ্যেস মরে না।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে অভিরাম। চারপাশের জঙ্গলটাও থম মেরে আছে। মেঘ দেখলেই, গাছের পাতা অসাড় হলেই পাখিগুলোর গলা পালটিয়ে যায়। জঙ্গলের শরীরে কালো রং লাগে, সেই রং বোধহয় পাখিদের শ্বাসে মাখামাখি হয়। তিনযুগ হয়ে গেল এই ভারতবর্ষের জঙ্গলে কেটে গেল অভিরামের, চরিত্র বোঝা এখনও হয়ে উঠল না। লোকে বলে মেয়েমানুষের মন নাকি দেবতারাও জানে না, হয়তো কিন্তু একটা গোমস্থ জঙ্গলের মন চরিত্র বোঝ দেখি কেমন হিম্মত?

পুরুষ্টু টাকের মতো কিছুটা খোলা জমি, তার একদিকে অভিরামের তাঁবু। ওপাশে চালার নিচে আগুন জ্বলে, রান্না হয়। ছয়জন মানুষ খায়-দায়-শোয়। রাত্রে নেশা করে, দিনে পরিশ্রম। গুনতিটা ঠিক হল না। ছয়জনের মধ্যে দুজন এখন ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর জীবন তাদের। ঠিক মধ্যিখানে একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে শেকলে বাঁধা হীরামতি। এখন ওদের সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে, চাপড়া বেঁধে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। ওদের বয়স হয়েছে, বেশ বয়স। অভিরামের কাছেই রয়ে গেছে অনেক বছর। এখন ওদের নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা। হাতি দুটোও অভিরামের মনের কথা টের পেয়ে যায় বেশ।

অভিরাম ও-দুটোর পাশে এসে দাঁড়াতেই শুঁড়জোড়া তাকে ছুঁয়ে গেল। পায়ে শেকল বাঁধা কিন্তু ঘুরতে ফিরতে অসুবিধে নেই। জোড়া হাতি অভিরামের শরীরে আদর ছড়িয়ে দিয়ে শব্দ করল। যেন নিশ্বাসে জানাল, বয়েস হয়ে গিয়েছে গো, তোমার এবং আমাদেরও। এই পুরুষ এবং স্ত্রী হাতি দুটো অনেককাল একসঙ্গে রয়েছে। অথচ এদের সন্তান আসেনি। ওরা আজকাল শুধু জাবর কাটতেই ভালোবাসে। কাজ না থাকলে হাঁটু মুড়ে ঝিমোয়। কাছাকাছি থাকা ছাড়া পরস্পর সম্পর্কে কোনও আকর্ষণ নেই। দুটো পাথরের মতো, চলন্ত পাথর।

পাকা দাড়িতে হাত বোলায় অভিরাম। কোনও মেয়েছেলের শরীরে এই জীবনে যাওয়া হয়নি। আজকাল যাওয়ার ইচ্ছেটাই হয় না। শরীরের ভেতরে যে শরীর আছে তার মুখ ঠিক ব্রহ্মার মতো। একটা মুখে লোভ চটচট করে, দ্বিতীয়টায় লকলকে খিদে। যা কিছু খাওয়া যায় তাই গেলো, পেটে না যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। পেটে গেলেও তা যেতে না যেতেই খিদে। তৃতীয় মুখে অহঙ্কারের লাল লোহা টং হয়ে থাকে। একটু জলের ছিটে লাগলেই ছ্যাঁক শব্দ। আর এখন চতুর্থ মুখের জিভ শুকিয়েছে, দাঁত নড়বড়ে। তার খাঁজে খাঁজে যে সুড়ঙ্গ তাতে ভয়ের বাসা। যদি সামান্য চাপেই ঝরে যায়! ন্যাংটো মাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসা মানে নিজের অক্ষমতা পাঁচজনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। কি লাভ তাতে? ফলে অভিরামের চতুর্থ মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, ঠোঁট দুটো টসটসে হাসিতে

ভিজিয়ে রাখাই সার। দুহাতে দুটো শুঁড় জড়িয়ে ধরল অভিরাম, 'আর দুটো বছর, দুটো বছর তোরা আমার সঙ্গে থাক। অন্তত গোটাচারেক বাচ্চা বিক্রি করতে দে। তারপর তোদের ছুটি, আমারও। যৌবনটা গেল, কখন এল টেরই পেলাম না।'

এই একটা ভাবনায় স্থির হয়ে রয়েছে অভিরাম। আর দুটো বছর। তারপর ছুটি। এই জঙ্গলের শরীর থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে কোথাও। কোথায়—সেইটে ঠিক নেই, তবে যাবে। জঙ্গলও তো মেয়েছেলে, বলা যায় গরম মেয়েছেলে, যতক্ষণ তার সঙ্গে তাল ঠুকতে পারবে সে রাখবে। যেই তুমি কমজোরি হলে তো তোমার পায়ের তলার মাটি সরল। তখন সরে যাওয়া ভালো। কিন্তু মুশকিল হল, এতদিনের যৌবনবেলা একসঙ্গে কাটিয়ে এই জঙ্গল বুকের গভীরে ঢুকে কখন যে সব যাওয়ার জায়গাগুলো ঢেকে দিয়েছে অন্ধকারে! বিষ, বিষের নেশার মতন। কিন্তু আর নয়। দু-বছরে আরও কিছু টাকা জমিয়ে পালাবে এখান থেকে। কোনও শহর কিংবা গাঁয়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বাকি দিনগুলো খরচ করবে।

সরকারি ইজারা নেওয়া আছে। প্রতি বছর হাতি ধরে দিতে হবে। বুড়ো-হাবড়া নয়, টাটকা কিশোর। বিনিময়ে টাকা পাওয়া যাবে, অঙ্কটা যদিও মোটেই ভালো নয় কিন্তু তাই বা কে দেয়! হাতি ধরা অভিরামের পেশা। ডুয়ার্সের এই বিশাল জঙ্গল এলাকায় আজকাল হাতি থিকথিক করে। কিন্তু তাদের ধরতে যাও, তোমার চৌদ্দপুরুষের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে ওরা। চোরা শিকারিরা আসে ওদের মেরে দাঁত চুরি করতে। সরকারি প্রহরীরা গুলি ছুঁড়তে পারে না ওরা বেয়াদপি করলেও। অথচ হাতিগুলো সংখ্যায় বাড়ছে। আগে ওরা বেড়াতে যেত বার্মায়। জঙ্গলে-জঙ্গলে চমৎকার পথ ছিল। কিন্তু সেই পথ এখন বন্ধ। মানুষগুলো গাছ কেটে পথ হাওয়া করে দিয়েছে। ফলে এই একই জায়গায় ঘোরাফেরা। সারা বছর এই জঙ্গলে তাই খাবার জোটে না হাতির, দলবেঁধে বেরিয়ে হামলা করে তাই আশেপাশের গাঁয়ে, চা-বাগানে। লুটপাট করে, মানুষও মারে। যত দিন যাচ্ছে তত মানুষের ওপর অত্যাচার করতে ভালোবাসছে ওরা। মানুষের সবরকম প্রতিরোধের ছলাকলা ওরা জেনে ফেলেছে আজকাল। ইলেকট্রিক তারকে পর্যন্ত ভয় পায় না, গাছের ডাল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে তার ছিঁড়ে পথ করে নেয়।

এই হাতিদের ধরতে কম পরিশ্রম আর বুদ্ধির দরকার! তাও এলোপাথাড়ি ধরলেই চলবে না, কাউকে আহত করাও চলবে না। দল থেকে টাটকা কিশোর খুঁজে ধরে নিয়ে আসতে হবে, এ যেন সাপের মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বিষের থলি সরিয়ে নেওয়ার মতো ব্যাপার। টাকাটা ওরা মুখ দেখে দিচ্ছে না, আর এই কাজটাই করতে হয় অভিরামকে। একটাও গুলি না ছুঁড়ে, এক ফোঁটা রক্তপাত না করে হাতির বাচ্চাকে দল থেকে বের করে নিয়ে এসে সরকারের হাতে তুলে দিতে হয় আর এই কাজের সহায়ক চালার নিচে বসে থাকা কজন মানুষ আর দীর্ঘকালের পোষা হাতি দুটো।

অভিরাম চালাটার দিকে তাকাল। লোকগুলো রান্নাবান্নার আয়োজন করছে। পরনে ঢলঢলে হাফ প্যান্ট, খালি গা। ওরা আসে ভুটানের একটা পাহাড়ি গ্রাম থেকে। ওই গ্রামের মানুষগুলোর জন্মই যেন হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে। কলজে থেকে যেটা জন্মমাত্র ঝরিয়ে ফেলে তার নাম ভয়। এত সাহসী এবং বিনয়ী মানুষ কোথাও দ্যাখেনি অভিরাম, দুপুরুষ ধরে ওদের চেনে সে। শাসন করলে শাসিত হয়। হুকুম ওদের কাছে শেষ কথা। বছরের শুরুতে দাদন পাঠাতে হয়। ওরা আসে। হাতি ধরে দিয়ে ফিরে যায়। না ধরতে পারলে পরের বছর ফিরে আসে অভিরামের ঋণ শোধ করতে।

মাঝে-মাঝে নিজেকে শোষক বলে মনে হয়। সামান্য কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সে লোকগুলোকে কিনে রেখেছে। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা সে জানে। খাবার ওদের কাছে স্বর্গের চেয়ে বেশি লোভনীয়। সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে। মাঝে-

মাঝে অভিরামের মনে হয় এটাই নিয়ম। কেউ কাউকে নিয়ে খেলছে। যে খেলাচ্ছে তাকে নিয়েও আর একজন খেলে যাচ্ছে। এই জঙ্গলের নিয়মের রকমফের সমস্ত জগতে ছড়ানো। আর এইসব ভাবলেই বিকেলের বুদবুদগুলো বেশ ফেটে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে অভিরাম হাঁকল, 'মাইনু!'

'হোই।' সাড়া এল চালার নিচ থেকে। অভিরামকে অপেক্ষা করতে হল না, ঢলঢলে হাফপ্যান্টের তলায় লিকলিকে পায়ের জোড়া যেন উড়ে এল। বেঁটে প্রৌঢ় লোকটা ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'জি?'

'হাতিগুলোকে দেখতে পেয়েছিস?'

'হুঁ। কিন্তু ওরা মেঘ দেখে আর নড়ছেই না। আরও কাছে না এলে—।'

'কতক্ষণের পথ।'

'পুরা দিন।'

হিসেবটা ভালো লাগল না অভিরামের। যেতেই যদি দিন কাবার হয়, তাহলে—। আকাশের দিকে তাকাল সে। বুড়ো মেঘেদেরও কি একই অবস্থা হয়? অভিরাম এবার ফিরল। অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। অন্তত দশ মাইলের মধ্যে দলটা যদি না আসে তাহলে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। সে হাতি দুটোর কাছে এসে ডাকল, 'এ্যাই, তোরা নেমে আয়।'

সঙ্গে-সঙ্গে সরসর শব্দ হল। দুটো হাতির শরীর বেয়ে দুটো বেঁটে মানুষ টুক করে মাটিতে পড়ল। কাদায় ওদের মুখ চোখ দেহ প্রায় ঢাকা। সেই কাদা শুকিয়ে এঁটে বসেছে শরীরে। গত পাঁচ দিন ধরে ওরা এই অবস্থায় রয়েছে। দিনরাত ওদের হাতি দুটোর সঙ্গে থাকতে হয়। সমস্ত শরীর উদোম, শুধু কোমরে একটা কাদা মাখা কৌপিন। শিকারে যাওয়ার সময় সেটাকে খুলে যেতে হবে। এই কদিন ওদের মাছ ডিম পেঁয়াজ রসুন খাওয়া নিষেধ। এই কদিন মদ, বিড়ি, খইনি, খাওয়া কিংবা স্ত্রীসঙ্গ করা বেআইনি। অত্যন্ত পবিত্র হয়ে হাতির শরীরের গন্ধ নিজেদের শরীরে মাখতে হবে ওদের। দিনরাত হাতির সঙ্গে থেকে থেকে মানুষের চামড়ায় হাতির গন্ধ লেগে যাবে। এ বছর হাতি ধরার অপারেশন এই প্রথম। প্রথম দলটা যাতে কোনওভাবে অকৃতকার্য না হয় অভিরাম সে বিষয়ে সজাগ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছিস?'

দুটো লোকই মাথা নাড়ল, 'না।'

'যা খেয়ে আয়।' তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হয় বৃষ্টি নামবে না। যদি নামে চট করে হাতির পিঠে উঠে বসবি।'

একটার বয়স বছর পঁচিশ, অন্যটা তিরিশ ছাড়িয়েছে। হুকুম পাওয়া মাত্র ওরা চালাঘরের দিকে ছুটল। পঁচিশের পায়ে যেন বেশি জোর। খাওয়া বলতে আলুসেদ্ধ নুন আর ফেনাভাত। যদ্দিন হাতি না ধরা পড়ে অন্যরাও চেষ্টা করে এই খেতে।

ওপাশের জঙ্গলে হাসির রোল উঠল। তারপরেই ওদের তিনজনকে দেখা গেল জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। মাথায় ঝাঁকা, তাতে নানান ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। দুটি কিশোরী আর একটি যুবতী। অভিরামকে দেখে এগিয়ে এসে ঝাঁকা নামিয়ে বলল, 'হিসেব মিলিয়ে নে।'

অভিরাম হেসে তার পাকা দাড়িতে হাত বোলালো। এই জঙ্গলে বাস করতে গেলে যেসব জিনিস একান্ত প্রয়োজন তাই রয়েছে ঝাঁকায়। জঙ্গলের গায়ে যে ছোট্ট লেপচা গ্রাম সেখান থেকেই আসে এই সওদাগুলো। ওই যুবতীর বাবার একটি শীর্ণ মুদির দোকান আছে ওখানে। সে বলল, 'চুরি করলে তুই করবি, তোর বাবা তো চোর নয়। যা ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

যুবতী ঠোঁট ওলটালো, তারপর সঙ্গীদের ঝাঁকা তুলতে ইশারা করা মাত্রই অভিরাম বাধা দিল, 'না, তুই না, ওরা যাক।'

'আমি না কেন?'

'তোকে দেখলে যদি ওদের বুকে ঢেউ লাগে!' অভিরাম হাসল।

ঢেউ তো ওঠে নদীতে। ওরা তো ডোবাও না।'

'কী জানি! তোদের বিশ্বাস নেই। ডোবাকেও সমুদ্র করে দিতে পারিস। তুই আমার সঙ্গে আয়, দাম নিয়ে যা। ওরা চালাতে মাল দিয়ে আসুক। অভিরাম তাঁবুর দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার কথা শুনে যুবতীর মুখে কালো ছায়া নেমেছে সেটা তার নজর এড়ায়নি। না, ওর এখানে আসা বন্ধ করতে হবে। ওর বাপকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। মুশকিল হল ওই গ্রামে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। তারপরেই অভিরাম হেসে ফেলল। সে বোকার মতো এসব ভাবছে। তার কর্মচারীরা আধবেলা খেয়ে থাকে, গ্রামে, কেউ-কেউ জীবনেও শহর দ্যাখেনি, কৌপিন কিংবা হাফপ্যান্ট ছাড়া পোশাক নেই অঙ্গে, ওদের প্রেমে পড়বে এই যুবতী? অসম্ভব। যতই গরিব হোক, ঠাট-বাট আর অহঙ্কারটি এর ষোলআনা খাঁটি।

তাঁবুতে ঢুকে ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে-করতে যুবতী পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। অভিরাম জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা বলেছে তোর বাপ?'

'কুড়ি।

অভিরাম চোখ তুলে তাকাতেই বুকের ভেতর ঢেউটাকে টের পেল। মেয়েটা তাঁবুতে ঢুকেই খাটিয়ায় বসেছে। ওর বুকের খাঁজ দেখতে পাচ্ছে অভিরাম। টাইট জামার ওপর যে কালো ওড়না সেটা সময় বুঝে সামান্য সরে গেছে। অনেক অনেকদিন পরে যুবতীর বুকের দিকে তাকিয়ে অভিরামের শরীর বেইমানি করল। যেন পূর্ণ চাঁদের আকর্ষণে তার শরীরের শিরায়-শিরায় জোয়ারের টান লেগে গেল আচমকা।

'টাকা দে।'

অভিরামের অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। তার বয়স হয়েছে ঠিক কিন্তু সত্যিকারের বুড়ো তো হয়ে যায়নি। যা টাকা জমেছে আর দুবছরে যা জমবে তাই নিয়ে এইরকম একটা যুবতীর সঙ্গে বাকি জীবনটা যদি কাটিয়ে দেওয়া যেত—। কিন্তু সে কিছুই বলল না, চুপচাপ টাকাটা দিয়ে দিল।

যুবতী জামার মধ্যে সেটাকে চালান করে দিয়ে বলল, 'হাতি ধরবি কবে?'

'যদি বৃষ্টি না নামে তাহলে কাল—।'

'হায় ভগবান, যেন বৃষ্টি নামে। খুব-খুব।' তারপর শরীর দুলিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

অভিরামের স্থির হতে সময় লাগল। কিন্তু তার মনে একটা তিরতিরে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। তার শরীর বিকল হয়নি, আঃ!

'জি।'

বাইরে থেকে গলা ভেসে আসতেই অভিরাম বাইরে এল। বুড়ো সর্দার মাইনু একটু উত্তেজিত গলায় জানাল, 'হাতিগুলো আরও সরে এসেছে। এখন মাত্র আধ বেলার পথ।'

অভিরামের ঠোঁটে হাসি ফুটল। মুখে বলল, 'সাবাস!'

মাঝখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তিনজন পাহারা দিচ্ছে তিনদিকে। অবশ্য সেটার যে খুব দরকার পড়ে তা নয়। বন্যজন্তুর পা একদিকে পড়লেই হাতি দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবু ব্যাটাদের বয়স হয়েছে বলেই অভিরামের ঠিক ভরসা হয় না। অভিরামের সামনে দুজন দাঁড়িয়ে। অভিরাম কথা বলছিল, 'আমি আর নতুন কি বোঝাব তোদের। মাইনুর কাছে তো সব জেনেছিস। শুধু লক্ষ রাখবি হাতিটা যেন ছটফটে আর তাগড়াই হয়। তুই তো এর আগেও গিয়েছিস, তোকে নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু তুই ভয় পাচ্ছিস না তো?'

পঁচিশ বছরের মাথাটা দ্রুত আপত্তি জানাল, 'না।'

'একটুও ভয় পাবি না। তুই হীরামতির ওপর ছেড়ে দিবি। সে তাকে ঠিক দলের মধ্যে নিয়ে

যাবে। যা, এখন শুয়ে পড়। আজকের রাত্রে তোদের ঘুম দরকার। ঠিক চারটের সময় রওনা হতে হবে। মাইনু!' অভিরাম পেছন ফিরল।

'জি!'

'খাদ ঠিকমতো ঢেকে রেখেছিস?'

'জি।'

অভিরাম তাঁবুতে ফিরে এল। আর তখনই টপটপিয়ে বৃষ্টি নামল। অভিরামের কপালে ভাঁজ পড়ল। বৃষ্টির ধাক্কায় হাতিগুলো আবার দূরে সরে না যায়! অভিরাম খাটিয়ায় শরীর এলিয়ে দিতেই মনে পড়ল যুবতী এখানে বসেছিল। তার মন চনচনিয়ে উঠলেও শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ব্যাপারটা যত সে ভাবছিল তত বুকের ওপর একটা পাথর চেপে বসছিল। নিজেকে অক্ষম ভাবতে তার একটুও ভালো লাগছিল না। খাটিয়ায় উঠে বসল অভিরাম। এখনই একটা ছাতি নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়! সোজা গিয়ে যুবতীর বাবাকে প্রস্তাব দেবে, আমি তোমার মুদির দোকানটাকে ভালোমতন সাজিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার মেয়েটাকে আমায় দাও। আমি দেখতে বুড়ো কিন্তু আমি সত্যিকারের বুড়ো নই। আর যেটুকু বুড়োটে দেখায় তোমার মেয়েকে পেলে সেটাও চলে যাবে।

অভিরাম হাসল। ঠিক কথা। ও মেয়ে সঙ্গে থাকলে যৌবন ফেরত আসতে বাধ্য। আজ যখন তাঁবুর ভেতরে ঢুকেছিল তখনই নাকে বাস এসেছিল। না, কোনও দোকানি গন্ধ নয়, স্রেফ যৌবনের বাস। সব মেয়ের শরীরে ওই বাস থাকে না। যার থাকে তার গায়ে গা ছোঁয়ালে যৌবন ফেরত আসতে বাধ্য।

বৃষ্টিটা বাড়ছে কমছে। কাল বিকেলে হাতির বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই গ্রামে যেতে হবে। তার সম্পত্তি তার বীরত্ব তার---। একটু থমকে গেল অভিরাম। যুবতীকে বোঝাতে হবে, যে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে তার চেয়ে যে তাকে পেছন থেকে হুকুম করে সে অনেক বড় বীর। আর তখনই এক ফাঁকে প্রস্তাবটা দিয়ে দেবে সে। আজ রাত্রে গেলে তো খালি হাতে যেতে হবে। অভিরাম শুয়ে পড়ল আবার, আজকাল শরীর এলিয়ে শুলে বেশ আরাম লাগে।

এখনও আকাশে মেঘ। তবে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে। পায়ের তলায় ঘাস ভিজে চপচপে। গাছের ডাল থেকে জল ঝরছে টুপটুপিয়ে। নিভে যাওয়া রাতের আগুনটাকে নতুন করে জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। দুটো হাতি এখন হাঁটু মুড়ে বসে আছে মাঝখানে। ওদের পা থেকে লোহার শেকল খুলে দেওয়া হয়েছে। অভিরাম ইশারা করতে লোক দুটো হাতির পিঠে চড়ে বসল। তারপর দুহাতে কৌপিন খুলে ছুঁড়ে দিল সঙ্গীদের সামনে। মাইনু এগিয়ে গেল ওদের মাঝখানে। ওর হাতে গোল করে পাকানো শক্ত দড়ি যার একপ্রান্তে বড় ফাঁস। দুজনই দুটো হাতির ঠিক মাথার নিচে এমনভাবে বসল যাতে দুটো পা টানটান করে ছড়াতে হাতির কানের নিচে ঢাকা পড়ে যায়। হাত বাড়িয়ে মাইনুর হাত থেকে দড়ি নিল দুজন। দুটো বারো হাত লম্বা দড়ি কায়দা করে গোটানো। ওরা দড়িজোড়া যে যার পেটের তলায় এমন গুছিয়ে রাখল যাতে তার কোনও অংশ বাইরে থেকে না দেখা যায়। তারপর বসা অবস্থায় শরীরটাকে মিশিয়ে দিল উপুড় হয়ে হাতির মাথায়। শুধু চিবুকটা মাথার খাঁজে ঢুকিয়ে ওরা দেখার সুবিধে করে নিল। হীরামন আর হীরামতি নির্বিকার। এই মানুষ দুটো তাদের শরীরে এই কদিন ধরে শোওয়া-বসা করায় ওদের ওজন নিয়ে আর ওরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। অভিরাম লোক দুটোকে শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে একটা কথা না বলেও ওই হীরামন হীরামতিকে সব কথা বোঝানো যায়। ওই যে দুটো পা দুই কানের নিচে ঢোকানো সেখানেই আছে হাতিকে নির্দেশ দেওয়ার কায়দা। বাঁ-দিকে যেতে চাও বাঁ পা দিয়ে টোকা দাও, ডানদিকে তো ডান কানে। দু-পা একসঙ্গে সোজা সামনে। আর দু-পা একসঙ্গে কানের পেছনে ঘষলে হাতি বুঝবে আর এগোতে হবে না, সামনে বিপদ।

হাতির উদোম পিঠে যে নগ্ন মানুষ দুটো বসে আছে তাদের সামনে আঁকড়ে ধরার কিছু

নেই। দুটো হাত হাতির মাথার খাঁজে এমনভাবে রাখতে হবে যে সেটাই তোমার ব্যালেন্সের কাজ করবে। তবে দীর্ঘকালের অভ্যেসে হাতির পিঠে ওইভাবে বসে থাকার জন্যে কিছু ধরার দরকার ওদের হয় না।

মাইনু চিৎকার করে ওদের ভাষায় কিছু বলল। লোক দুটো সেই সঙ্গে মাথা নাড়ল। অভিরাম জানে এটা মন্ত্রপাঠ, যাতে ওদের কার্যসিদ্ধি হয়। ওরা যাবে জঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর মাঝখানে। খুব বোকামি না করলে অবশ্য প্রাণের আশঙ্কা নেই। তবু বুনো হাতির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে বুকের জোর লাগে। একটু বেচাল হল তো সব শেষ।

অভিরাম সংকেত করামাত্র হাতি দুটো উঠে দাঁড়াল। বুড়ো শরীরে সেই চনমনানি নেই। শরীর সোজা করে উঠতেও কষ্ট হয়। ওরা দাঁড়ালে অভিরাম ঘুরে-ঘুরে পরীক্ষা করল। না, লোক দুটোকে দেখা যাচ্ছে না, হাতির শরীরে মিশে গিয়েছে ওরা। অভিরাম দেখল হীরামন আর হীরামতি তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বনবাসে পাঠাচ্ছে ওদের এইরকম চাহনি। আজ ওদের কোথায় যেতে হবে সে সম্পর্কে ওরা সচেতন। এই যাওয়াটা মোটেই পছন্দ করছে না ওরা। একদল যৌবনের মাঝখানে মতলবে যেতে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একটুও ইচ্ছে করছে না। অভিরাম বুঝল। তারপর এগিয়ে গেল ওদের সামনে। দুটো শুঁড় উঠে এল ওর কাঁধে। অবসন্নভাবে হেলান দিল তার কাঁধে। যেন বলছে, আর কত ঝুঁকি নেব তোমার জন্যে!

চাপা গলায় নির্দেশ দিতেই দুটো হাতি যাত্রা শুরু করল। ডানদিকের জঙ্গলের পথে ঢুকে গেল ওরা। না, শিকারি দুজনকে কিছুতেই দেখতে পাবে না বুনো হাতির দল। হাতির শরীরের সঙ্গে চমৎকার মিশে আছে। নিশ্চিন্ত হল অভিরাম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবু অভিরাম বাকি দল নিয়ে চলল বাঁ দিকের পথটা ধরে। পায়ের তলায় প্যাচপেচে জল, ওপরের জঙ্গলের গা থেকেও জল ঝরছে। এখন সারা শরীরে জোঁক ঝুলছে কিন্তু কিছু করার নেই। মেঘ না থাকলে পথটা দেখা যেত, এখন আন্দাজে যাওয়া। যেতে হবে যেখানে মাইনুরা দক্ষ হাতে গর্ত করে ঢেকে রেখেছে। জায়গাটা এমন নির্বাচন করা হয়েছে যাতে তার চারপাশে গাছ থাকে। সেই গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না শিকার আসে।

হীরামন-হীরামতি তো ভয় পাবেই। বুনো হাতির দল যদি বুঝতে পারে ওরা পোষা তাহলে ছিঁড়ে ফেলবে। দুই বুড়ো-বুড়ির তো নড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ওরা অভিনয় করতে জানে। এখন বোধহয় আর নিজেদের ওপর ঠিক ভরসা রাখতে পারছে না।

মানসচোখে দেখতে পাচ্ছে অভিরাম। হীরামন আর হীরামতি নিঃশব্দে দলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দলটার কাছাকাছি না পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা থামবে না। জঙ্গলের যেখানে বুনো হাতির দলটা রয়েছে তার কাছে গিয়ে ওরা লক্ষ করবে তারা কী করছে। সাধারণত সকালের দিকে হাতিরা একটু অলস থাকে। গাছপালা ভাঙে, পাতা খায়। ছোটরা খুনসুঁটি করে। সদ্য কিশোর যারা তারা ছটফটিয়ে এপাশ-ওপাশ যায়, আবার দলে ফিরে আসে। দলের যিনি নেত্রী তিনি পাতা খেতে-খেতে উদাস চোখে তাকিয়ে দ্যাখেন সবাই ঠিক আছে কিনা। তাঁর কাছাকাছি থাকে সেই দাঁতাল পুরুষটি। হস্তিনীর সেবক এবং স্বামী। উঠতি ছোকরাদের সম্পর্কে তার বেশ বিরক্তি। এরাই সামান্য বড় হলে তার পদটি বিপন্ন হতে পারে। কোনওরকমে এদের দল থেকে কাটিয়ে দিতে পারলে সে খুশি হয়। কিন্তু নেত্রীর সামনে সেটা প্রকাশ করতে পারে না সে। তাকে সবসময় সজাগ থাকতে হয়। যে-কোনও মুহূর্তে নেত্রীর হুকুমে শত্রুর মোকাবিলা করতে হতে পারে। এমনকী চিবোবার সময়েও সে চোখ বন্ধ করার সুযোগ পায় না।

হীরামন আর হীরামতি যখন বোঝে দলটা অলস হয়ে আছে তখন তারা আলাদা হয়ে এগোয়। যেতে যেতে ডাল ভাঙে, পাতা চিবোয়, যেন কোনও মতলব নেই এমন ভঙ্গিতে পা ফেলে। দলের হাতিরা তাদের দিকে তাকালে এমন অভিনয় করে যে ওরা বাইরের কেউ নয়। কিন্তু ওদের লক্ষ

থাকে নেত্রীর দিকে। খুব সাবধানে তাকে এড়িয়ে ওরা দলে মেশে। কিছুক্ষণ কাটানোর পর সংকেত পায় কানের তলায়, কোনদিকে তাদের যেতে হবে। ওই যে চঞ্চল কিশোরটি দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে সাহসী পায়ে, তার দিকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে ওপরের মানুষ। অথচ চটপট পায়ে গেলে চলবে না। কেউ যাতে সন্দিগ্ধ না হয় এইভাবে ওই কিশোর হাতির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই মুহূর্তে ওরা দুজন কিশোরের দুই পাশে। কিশোর মনের আনন্দে ডাল ভাঙছে। ওরা শরীরের পেছনদিকটা দিয়ে একসঙ্গে চাপ দিতেই কিশোর সামনে এগিয়ে যাবে। স্বভাবতই সে বিরক্ত হবে কিন্তু যখন দেখবে ওরাও পাতা ছিঁড়ছে তখন সে আর একটু এগিয়ে পাতায় শুঁড় দেবে এই ভেবে যে দলটা তার সঙ্গে আছে। মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর আবার একই কৌশল। দুপাশ ঘিরে পেছনে চাপ দিলে কিশোর সম্মুখগামী হবেই। এইভাবে অন্তত আধঘন্টার পর ওকে বের করে আনবে হীরামন আর হীরামতি। এই সময় লক্ষ রাখতে হবে দলের কেউ যেন সন্দেহ না করে। কিশোর যেন বিদ্রোহ না করে বসে। একটু নিরাপদ সীমায় আসা মাত্র মানুষ দুটো আচমকা খাড়া হয়ে বসে চিৎকার করে উঠবে। অনেক-অনেক ট্রেনিং নিতে হয় ওই চিৎকার নিখুঁত করার জন্যে। শব্দটা অবিকল কোনও হাতি বিপদে পড়লে করে থাকে। সেটা কানে যাওয়ামাত্র কিশোর ভাববে সেও বিপদে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে শুঁড় তুলে চিৎকার করতে চাইবে। যেই তার শুঁড় ওপরে উঠবে অমনি দুটো দড়ির ফাঁস তাতে গলিয়ে দেবে মানুষ দুটো। ভয় পেয়ে শুঁড় নামিয়ে নেওয়া মাত্র কিশোরের গলায় ফাঁস এঁটে বসবে। তৎক্ষণাৎ ছুটতে শুরু করবে হীরামন আর হীরামতি। দৌড়াবার সময় তারা দড়ির দুই প্রান্ত নিজেদের মুখে নিয়ে নেয়। ওপরের মানুষ দুটো কোনওক্রমে ঝুলে থাকে তাদের শরীরে। দড়ির টান লাগামাত্র কিশোর ছুটতে থাকে মাঝখানে। তখনও ধারণা যে সে সঙ্গীদের সঙ্গে আছে। এই দৌড় চলবে সেই লুকানো খাদ পর্যন্ত। সেখানে এসে এই খাদের দুইপাশ দিয়ে দৌড়য়। আর কিশোর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গোপন ফাঁদে। তখনই চটপট নেমে আসে অভিরামরা, গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিটাকে সুন্দর করে ঢেকে দিয়ে সবে যায় আরও দূরে। বিশেষ করে দাঁতাল যদি বুঝতে পারে কিশোর হাতিটি বিপদে পড়েছে তাহলে সে সরে যাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে এই ভেবে যে তার একটি ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী কমে গেল। এইবার ফাঁদে পড়ে থাকা কিশোরটিকে কব্জা করা অভিরামদের কাছে কিছুই নয়। এই অভিযানে মানুষ এবং হাতি দুটোর বুদ্ধির সমন্বয় থাকা দরকার। হীরামন আর হীরামতির ওপর অভিরামের ভরসা আছে। বুনোদের দলে মিশে যাওয়ার সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার ওপর ওই পঁচিশ বছরের ছেলেটি আজ প্রথম যাচ্ছে। অভিরাম মাইনুকে জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন ছোকরাটা পারবে তো?'

মাইনু লাল দাঁতে হাসল, 'ওর বাপ অত বড় শিকারি ছিল আর ও পারবে না!'

অভিরাম মাথা নাড়ল। ছিল কথাটায় তার মোটেই আস্থা নেই। তারও তো যৌবন ছিল। সে সময়টা জঙ্গলে-জঙ্গলে গাছের নেশায় কেটে গেল। আজ যুবতীকে দেখার পর থেকেই সেই যৌবনটা ল্যাজ নাড়ছে শরীরে কিন্তু তাই বলে কি সে যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? বাপ শিকারি ছিল বলেই ছেলে পারবে এমন নাও হতে পারে। দুটো লোকের কাঁধে চেপে অভিরাম গাছের ডালে উঠল। দুটো ডাল গুলতির বাঁটের মতো ছড়ানো। সেখানে বসে হাঁপ ছাড়ল সে। এখন এখানে অনন্তকাল বসে থাকতে হবে। হৃৎপিণ্ড শান্ত হতেই চোখের সামনে যুবতীর শরীরটা ভেসে উঠল। হাতিটা ধরা পড়া মাত্রই প্রস্তাবটা পেশ করবে সে। শরীরে বড় নেশা ধরেছে, এই নেশা নিয়ে মরেও সুখ নেই।

হীরামন আর হীরামতি আগু পিছু হাঁটছিল। মাঝে-মাঝে শুঁড় তুলে বাতাস যাচাই করে পথ পালটাচ্ছে। এই মেঘবৃষ্টিতে ওদের হাঁটতে মোটেই ভালো লাগছিল না। মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে হীরামন হীরামতির শুঁড় জড়িয়ে ধরছিল। একবার জঙ্গলে ঢুকে গেলে কথা বলা নিষেধ। তবু পঁচিশ বছর চাপা গলায় বলল, 'এ দুটো ঠিক ভয় পেয়েছে মনে হয়।'

বয়স্ক পুরুষটি জবাব দিল না। শুধু জিভে যে শব্দ করল তার অর্থ, কথা বলবি না। দুটো পা কানের তলায় চালিয়ে শরীর বেঁকিয়ে পঁচিশ বছর হাতির মাথায় চিবুক রেখে জিভ কাটল, কথা বলা নিষেধ সে ভুলে গিয়েছিল। অনেক কিছু সে ভুলেছিল কাল রাত্রে, এটা তো তার কাছে কিছুই না। কিন্তু হাতি দুটো ভয় পেয়েছে সেটা ওদের শরীরের কাঁপুনিতে মালুম হচ্ছে।

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর জঙ্গলটা যখন আরও ঘন তখন হীরামন আর হীরামতি থমকে দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করে শব্দ করল। মানুষ দুটো কান পাতল। দূরে গাছভাঙার শব্দ হচ্ছে। সারাটা পথ মাথার ওপর ভিজে গাছে বসে পাখিরা চিৎকার করেছে, বানরগুলো ছটফটিয়েছে। হাতির ওপর মানুষ লুকিয়ে আছে সেটা বুঝেই ওদের অস্বস্তি। এখানে জঙ্গল বেশ ঘন। বয়স্ক মানুষটি সন্তর্পণে হীরামনের কানের তলায় পায়ের আঙুলের ডগা দিয়ে সঙ্কেত করামাত্র হাতিটা সোজা হাঁটতে লাগল। দেখাদেখি পঁচিশ বছর হীরামতিকে নিয়ে এল পাশে। হাতিদুটো নির্লিপ্ত হয়ে ডাল ভাঙছে। পাতা খাচ্ছে। মেপে-মেপে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা হাতিকে দেখতে পেল ওরা। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে এসে হীরামনদের দেখে থমকে গেল। তারপর আবার সহজ হয়ে একটা ডাল ভেঙে ফিরে গেল ভেতরে।

এখান থেকে হীরামন সরে গেল হীরামতির কাছ থেকে। বয়স্ক পুরুষটি ধীরে-ধীরে হীরামনকে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে নিতেই দেখল গোটা বারো বুনো হাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাতা খাচ্ছে, গাছ ভাঙছে। সে যে দলে ঢুকছে সেটা কেউ খেয়াল পর্যন্ত করল না। আটটা বড় আর চারটে বাচ্চা। সে দলনেত্রীটাকে খুঁজে বের করল। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাতা চিবোচ্ছে! তার ঠিক সামনেই দাঁতালটা। হীরামন ওদিকে যাবে না। সে ধীরে দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করল দুবার। লোকটি বুঝতে পারছিল না হীরামনের মতলব। বুনো হাতি দেখে অন্য কোনও ইচ্ছে হচ্ছে নাকি! তারপরেই সে কিশোরটিকে দেখতে পেল। বেশ বেপরোয়া ভাব। বারংবার দল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বয়স্ক লোকটি হীরামনকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া স্থির করল। হীরামন এখন অভিনয় করছে। পাতা ছিঁড়ছে আর মুখে পুরছে। কিন্তু একা গেলে চলবে না। বয়স্ক লোকটি সামান্য মুখ ফিরিয়ে হীরামতিকে খুঁজতে লাগল।

হীরামতি ওপাশ দিয়ে দলে ঢুকছে। শুঁড় তুলে একটা গাছের পাতা ধরল। তার ওপরে পঁচিশ বছর যে শুয়ে রয়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এবার হীরামনকে সে কিশোরের দিকে নিয়ে এল। ওর যাওয়া দেখে হীরামতিকে নিশ্চয়ই পঁচিশ বছর এদিকে আনবে। তাদের শিকার কোনজন বুঝে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু হঠাৎ দলনেত্রীকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল বয়স্ক লোকটি। হাতিটার চেহারা চট করে পালটে গেল। শুঁড় ওপরে তুলে যেন বাতাসে একটা ঘ্রাণ খুঁজতে চাইল। তারপর দুপা এগিয়ে আবার বাতাস টেনে হুঙ্কার ছাড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতালটা ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুতপায়ে সে ছুটে এল নেত্রীর পাশে। বয়স্ক লোকটি বুঝতেই পারছিল না এইরকম কেন হচ্ছে। তার বুক কেঁপে উঠল। সে দেখল হীরামতি যেন অস্বস্তিতে পড়েছে। একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। দলনেত্রীর লক্ষবস্তু যে সে, তা টের পেয়েছে হীরামতি। এই সময় নেত্রী চেঁচিয়ে উঠতেই হীরামতি ঘুরে দৌড়তে আরম্ভ করল। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতালটা ছুটল তার পিছে। বাকি দলটাও অনুসরণ করল ওদের।

বয়স্ক লোকটি জানে এখন অন্য কোনও আচরণ করা যাবে না। তাকেও দলের সঙ্গে ছুটতে হবে। এবং এই অবস্থায় পঁচিশ বছরকে সাহায্য করার কোনও সুযোগই নেই। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না কী করে হীরামতি ধরা পড়ল। তার দিকে তো কেউ লক্ষই করছে না। হীরামনের পা দ্রুত চলছিল, যেন হীরামতিকে বাঁচাতে সে উদ্দাম হয়ে উঠছিল। ওদিকে হীরামতি ছুটছে প্রাণের দায়ে। তার ওপর ওই অবস্থায় বসে থাকতে পারল না পঁচিশ বছর। হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরতে গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতালটা তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দলনেত্রীর সামনে। বয়স্ক

লোকটি চোখ বন্ধ করার শক্তিও পেল না। হীরামতি ততক্ষণে চোখের বাইরে। পুরো দলটা থমকে দাঁড়িয়েছে দেখে হীরামন শান্ত হল।

পঁচিশ বছর কোনও আওয়াজ করল না। দলনেত্রীর ভারী পা যখন তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে তখন দলটা আবার সহজ হয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গি করে ওরা আবার জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল। দলনেত্রী এবং দাঁতাল আগে-আগে যাচ্ছে। এই জায়গাটা নিরাপদ নয় সেটা বুঝতে পারছিল বোধহয়।

ক্যাম্পে এখন শোকের ছায়া। পাঁচটা মানুষ পাথরের মতো বসে আছে। খুঁটিতে হীরামন আর হীরামতি চেনে বাঁধা। হীরামতি ছটফট করছে আর তার শরীরে শুঁড় রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হীরামন। অভিরাম দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিল। তার সামনে বস্তায় জড়ানো পঁচিশ বছরের শরীরের অবশিষ্ট। বারংবার সে বয়স্ক পুরুষটির কাছে বৃত্তান্ত জেনেছে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না ওরা হীরামতিকে কী করে আবিষ্কার করল। হীরামতির শরীরটাকে সে ভালো করে যাচাই করছে। কোনও খুঁত নেই। কোনও চিহ্ন নেই যা ওকে ধরিয়ে দিতে পারে।

অভিরাম ডাকল, 'মাইনু!'

'জি।' প্রৌঢ় বেঁটে শরীরটা সাড়া দিল। দল থেকে উঠে এল না।

'ও কি মাছ ডিম রসুন পেঁয়াজ খেয়েছিল?'

'না। ওসব আমরা সাতদিন খাইনি।'

'হাড়িয়া? নেশা করেছিল?'

'না। করলে আমি জানতে পারতাম। জানলে পাঠাতাম না।'

'তাহলে কী করে হাতিগুলো ওকে ধরল? কারণটা কী?'

'আমি জানি না। এখন ওর মাকে কী জবাব দেব গ্রামে ফিরে গিয়ে!'

অভিরাম জানে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। থানায় জানাতে হবে। কিন্তু কী করে এমন হল সেটা না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। সে বয়স্ক লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল সারারাত ও হাতির পিঠে ছিল?'

লোকটা ভাবল একটু। তারপর বলল, 'মাঝরাত্রে নেমেছিল।'

'কেন?'

'পায়খানায় যাবে বলে।'

'কতক্ষণ পরে ফিরেছিল?'

'একঘণ্টা হবে।'

সময়ের মাপটা এদের কখনই ঠিক হয় না অভিরাম জানে। তার সব প্ল্যান আজ নষ্ট হয়ে গেল। এবছর আর এই দলকে হাতি ধরতে পাঠানো যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কারণটা জানা দরকার, অথচ সে জানতে পারছে না।

মৃত্যু-খবর মানুষকে চিরকাল উৎসাহিত করে। থানায় খবর দিতে লোক পাঠিয়েছে অভিরাম। তার কাছেই গ্রামের মানুষ জেনেছে হাতির বাচ্চা ধরা পড়েনি বরং একজনকে মেরে ফেলেছে। বিকেলে ওদের অনেকে জঙ্গলে এল। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ছেলেটা বড় ভালো ছিল। গতবারও দেখেছি, বেজাত হলে কী হবে মুখটা ভারি মিষ্টি ছিল।'

'তোমাদের গাঁয়ে যেত নাকি?'

'গতবার খুব যেত। এবার দুই-একবার।'

অভিরামের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কার কাছে যেত?'

'ঠিক কারও কাছে না। মুদির দোকানে বসে থাকত।'

'মুদির মেয়ের সঙ্গে কথা বলত?'

'যৌবনের ধর্মই তো কথা বলার।'

অভিরামের বুকের মধ্যে ছোবল মারল কালকেউটে। টর্চ হাতে সে হাঁটতে লাগল গ্রামের দিকে। গ্রামে ঢোকার মুখেই সাঁকো। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। হঠাৎ টর্চের আলোর বৃত্তে মূর্তিটাকে নজরে পড়ল। ঝরনার গায়ে একটা পাথরের ওপর যুবতী স্থির হয়ে বসে আছে। একা।

অভিরামের বুকের মধ্যে যেন ঝরনাটা উঠে এসেছে। বুড়ো কলজে কলকল করছে। সে টর্চ না নিভিয়ে এগিয়ে যেতেই মুখ ফেরাল মেয়েটি, চোখ ঢাকল।

এবার টর্চ নেভাল অভিরাম, 'তুই এখানে?'

জবাব দিল না যুবতী। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'তুই লোকটাকে চিনতিস?'

'কোন লোক? যুবতীর গলায় কাঁপন।

'যে আজ মরল!'

'হ্যাঁ।'

'কাল রাত্রে তোর কাছে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'এখানে।'

'কী করেছিলি তোরা?'

এবার অদ্ভুত একটা শব্দ এল, 'পুরুষেরা যা করে।'

অভিরামের হৃদপিণ্ড নড়তে লাগল, 'তুই জানতিস না শিকারে যাওয়ার আগে ওসব করতে নেই? শরীরে যৌবন লেগে থাকলে তা বাতাসে ভাসে?'

'আমি না বলেছিলাম, ও শোনেনি। বলল, যদি না ফিরি তাহলে সাধ ঘুচবে না ওর।'

অভিরামের জিভ শুকিয়ে গেল, 'তুই ওকে মেরে ফেললি!'

'আমি না, ওর যৌবন।'

হিলহিলে শীত অভিরামের শরীরে খেলা শুরু করল। একটু উত্তাপ নেই। তার অঙ্গে যৌবনের সামান্য দপদপানি বন্ধ হয়ে গেছে আচমকা।

যুবতী দুপা এগিয়ে এল, 'কে টের পেয়েছিল? হাতি না হস্তিনী?'

'হস্তিনী।' অভিরাম বিড়বিড় করল, 'মেয়েরাই তো মেয়েদের টের পায়।'

ওদিকে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। যারা জঙ্গলে গিয়েছিল মৃত্যুসংবাদ শুনে তারা ফিরে আসছে। যুবতী ঘুরে দাঁড়াল, 'বলো সত্যি কি আমি দোষী?'

'দোষ?' অভিরাম শূন্য চোখে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে উলটোপথে হাঁটতে লাগল। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ তাকে শীতল থেকে শীতলতর করছিল। তবু যুবতীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে সে আর এক ধরনের আরামের সন্ধান পেল।

সেই উৎসাহটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। কিছু ছেড়ে গেলে এত মুক্ত লাগে!

ভগীরথ

চিৎ হয়ে শুয়েছিল শিবনাথ। পা থেকে চাদরটা কপাল অবধি টানটান করে টানা, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকার আরামটা পাওয়া যায়। একটু আগে ঘুম ভেঙেছে কেলে পঞ্চাননের চিৎকারে। পাশে হরেকেষ্টর চায়ের দোকানে চা খেতে এসে এমনভাবে দাঁড়-কাকিয়ে ডাকে যে শান্তিতে ঘুমোবে তার জো নেই। আর হরেদারও হয়েছে এক ঢং, চারটে বাজতে-না-বাজতে দোকান খুলে বসে থাকে ঝিগুলোর জন্য। সাত বাড়িতে কাজ করতে যাওয়ার পথে হরেদার দোকানের চা গিলে যায়। চোখ বন্ধ করে আর একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল শিবনাথ। কিন্তু ভোরের ঘুম শালা যৌবনের মতো, একবার গেলে ফেরাবে কার সাধ্যি! চোখ থেকে চাদরটা নামিয়ে পিটপিটিয়ে তাকাল সে। ওটা কী দেখা যায়, একদম চোখের সামনে? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা করে চোখ বন্ধ করল শিবনাথ। দিলে দিনটাকে নষ্ট করে। এই শালা পাড়াটা হয়েছে ভাগাড়খানা। দিনভর পলিটিকস, সন্ধেবেলায় মালটানা আর ভোররাতে লুঙ্গি কোমরের ওপর তুলে ফুটে শুয়ে থাকা—কারোর আর লাজ-লজ্জা রইল না। এখন এই লুঙ্গি তোলা পাছা দেখে চোখ বন্ধ হবে আর?

পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ আটকে গেল। আহা, দেহ নয় তো মর্তমান কলা। মাথা নিচু করে কলের তলায় ধরেছে, জল পড়ছে সারা গায়ে, পিঠ-কোমর উদোম। কোমরের থেকে পাক খেয়ে আঁচলটা বুকের ওপর জড়ো—সেদিকটা অবশ্য শিবনাথ দেখতে পাচ্ছে না। রাস্তার ওপর এই কলটায় বস্তির কোনও মেয়ে দিনদুপুরে স্নান করে না। আহা, ভোরবেলায় চোখ মেললে কত সুন্দর-সুন্দর জিনিস দেখা যায়। লোকজন নেই, অন্ধকার সরে গেল মাত্র, স্নানের সময় লজ্জাটাও তাই কম। ভোরবেলায় মানুষের মনমেজাজ নরম থাকে, সারারাত বিশ্রামের পর জল পড়ে শরীরেরও চেকনাই বাড়ে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে বেশ রসালো হওয়ার পরই শিবনাথ মনে-মনে নিজের গালে চড় মারল। শালা কে বলে তার ঘুম গেছে! নইলে চোখ চেয়েও সাত বছর ঘর-করা বউটাকে চিনতে পারে না! নিজের বউ কাকভোরে দেহ ভেজাচ্ছে আর সে ভাবছে মর্তমান কলা! হঠাৎ সব রস ভুস করে উবে গেল যেন, পাশ ফিরল সে। পরপর ফুটপাথ জুড়ে ঘুমন্ত আধা-ঘুমন্ত মানুষের ছড়াছড়ি। এই বস্তির ঘরগুলোর ফ্যামিলিকে জায়গা করে দিতে খোলা আকাশের তলায় ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমটা বেশ হয়। শিবনাথ দেখল, খানিক দূরে কে একজন চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। মদন না? গোঁফ গজায়নি ভালো করে, এখন থেকে পরের বউ-এর স্নানের শরীরে চোখ লেপটে বসে আছে চাঁদ! আবার চোখে আড়াল দেওয়া হয়েছে! ও গতরটাকেও তো দেখছ কিন্তু ওর ভিতরে যে মালটা আছে তাকে খেয়াল রেখো হে, মনে-মনে বলল শিবনাথ, বাপকেলে শ্বশুরটা ওর গলার ভিতরে একডজন তাড়কাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল জন্মাবার সময়। নইলে কোনও বউ তার স্বামীকে হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা বলার সাহস পায়! আর তা ফিসফিস করে নয়, পাড়ার সবাইকে জানিয়ে। স্বামীকেই যখন এই কথা বলে তখন তুই মদনা সেদিনের পুঁচকে তোকে কী বাক্য দেবে একবার ভাব দিকিনি। মনে-মনে নিজেই বাক্যটার তল্লাশ করতে-করতে আনন্দে চোখ বুজল শিবনাথ।

বস্তির অনেকটা ভিতরে একখানা ঘর তবে সেটা বেশির ভাগ সময় বন্ধই থাকে। বৃষ্টিবাদল হলে রান্নাবান্না আর খুব ঝগড়াঝাঁটি হলে এক-এক রাতে শোয়ার জন্য দরকার হয়। তা ছাড়া এই ঘরটা আছে বলে এই ব্লকের বাথরুম ল্যাটিনের ওপর হক আছে গঙ্গার। সি. এম. ডি. এ থেকে

ঝকঝকে সিমেন্টের ল্যাটিন করে দিয়েছে। পায়খানা শোয়ার ঘরের মতো চেহারা নিলে সাহেবরা ল্যাটিন বলে এটা বস্তির সবাই শিখে নিয়েছে। ব্যাটাছেলেদের তো কোনও বালাই নেই, রাস্তার পাশে বসে গেলেই হল, শুধু ল্যাটিনটাই পারে না ওরা। শিবনাথ অনেকবার চেয়েছে ঘরটা ছেড়ে দিতে, কুড়িটা টাকা নাকি ফালতু মাসে-মাসে গলে যায়। গঙ্গার জন্য পারেনি। গঙ্গার জন্য অনেককিছু পারে না গেঁজেলটা, নইলে অ্যাদ্দিনে এই সংসার দোকান সব পগারপার হয়ে যেত।

ভেজা শাড়ি পরে দ্রুত দোকানে ফিরে এল গঙ্গা। দেরি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক ছ'টার সময় যাওয়ার কথা। ফুটপাথের ওপর একটা বড় পাথরে পা রেখে সামান্য লাফিয়ে দোকানের ওপর উঠতে হয়। ঝটপট দোকানে উঠে ভিতরদিকে চলে গেল ও। তিন-তিনটে শরীর কাঠের মেঝেতে শুয়ে আছে। ছোটদুটো উদোম, বড়টা শুধু ইজের পরা। গঙ্গা একদম দোকানের শেষ প্রান্তে চলে এসে দ্রুত হাতে কাপড় ছাড়তে লাগল। এই রাবণের গুষ্টি পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে, কারও ওঠবার নাম নেই। বিড়-বিড় করে কথাগুলো উচ্চারণ করে কোমরে সায়ার গিঁট বাঁধতে-বাঁধতে ওর খেয়াল হল গতবার রথের মেলা থেকে যে চার ফুট বাই দুই ফুট আয়নাটা কেনা হয়েছিল, সেটার দিকে রাস্তা থেকে যে-কেউ তাকালে ওর সবকিছু দেখতে পাবে। কিন্তু গঙ্গা সরল না জায়গাটা থেকে জামাকাপড় পরা শেষ না-হওয়া অবধি। এই বস্তির কোনও লোক তার শরীরের দিকে অন্য চোখে তাকাবার সাহস রাখে না। গরম বেশি পড়লে দোকানে বসে ছোটটাকে বুকের দুধ খাওয়াতো ও, সিগারেট বিড়ি কিনতে এসে ছোকরাগুলো সেদিকে ফিরেও তাকাত না। গঙ্গার গলার জোর জানে না এমন কেউ নেই। হরেদা তো বলে, 'মাইরি শিবুর বউ, তোমার খিস্তির স্টক থেকে আমাকে কিছু দাও।' বলে আর ওর দিকে তাকায় না। হ্যাঁ, এই বস্তিতে ওই হরেদাই যা একটু প্রশ্রয় পায় গঙ্গার কাছে, হাজার হোক বউ-মরা পুরুষ তো আর বয়সও হয়েছে বেশ।

সেজেগুজে একমাথা সিঁদুর পরে গঙ্গা প্রায় লাফিয়ে মাটিতে নেমে হনহন করে হরেদার দোকান পেরিয়ে চলে এল। হরেদার দোকানে এখন রস ফুটছে টগবগ করে। পদ্মবালা এসেছে চা খেতে। দু-চক্ষে দেখতে পারে না গঙ্গা। যে বাড়িতে কাজ করে সেই বুড়োবাবু রোজ পাঁচটাকা করে দেয় পদ্মকে গিন্নিকে লুকিয়ে। হাত-পা নেড়ে আবার বলে, 'কি করব ভাই, বুড়ো মানুষটা বুকে মুখ রেখে এমন ছেলেমানুষের মতো কাঁদে না! ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার! শরীর দেখিয়ে একটা ঘাটের মড়ার কাছে টাকা নিচ্ছে, জানে ভয়ের কিছু নেই, আর তাই খলবলিয়ে বলে বেড়ায়! স্বামীটা হল এক নম্বরের ম্যাদামারা। হরেদারও পদ্ম এলে চা বানানো শেষ হয় না। ব্যাটাছেলে জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল গঙ্গার। কারও চরিত্তির বলে কিছু নেই।

এক হ্যাঁচকা টানে চাদরটা মুখ থেকে টেনে সরিয়ে আনল গঙ্গা। টানের চোটে মুন্ডুটা নড়ে উঠল কিন্তু চোখ খুলল না। হাতের মুঠোয় ধরা চাদরের দিকে তাকিয়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। কী নোংরা আর দুর্গন্ধ, বাপের জন্মে কাচাকাচি হবে না গঙ্গা না করে দিলে। শরীরের দিকে চেয়ে দ্যাখো, এক ইঞ্চি ময়লা চামড়া কামড়ে বসে আছে। কতদিন যে শরীরে জল ঠেকায় না, যেন সেটাও গঙ্গার দায়। এখন দ্যাখো, কেমন হারামজাদা লোক, চাদর ধরে এত যে টান দিল গঙ্গা, মরা মানুষও চিতায় উঠে বসে, এনার চোখ খুলল না। হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত, ইচ্ছে করে চোখ এঁটে শুয়ে আছে, ভোরবেলা গঙ্গার মুখ দেখবে না! এ-কথা চিন্তা করতেই গুলতির বাঁট থেকে পাথরটা ছিটকে বেরিয়ে এল, ক-টা বাজে খেয়াল আছে? দুপুর গড়িয়ে এল, এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুম মারছ? রাত্রে ফুটে শোয়ার নাম করে ফের গ্যাঁজা টেনেছে রে-এ-এ।' প্রথমটায় বেশ চোখ বন্ধ করেছিল শিবনাথ, কিন্তু শেষেরটা শুনে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারল না। পট করে চোখ খুলে আস্তে অথচ গঙ্গা যাতে শুনতে পায় এমন গলায় বলল, 'মাইরি বলছি খাইনি।'

'খাওনি?' খেঁকিয়ে উঠল গঙ্গা, 'চেহারা দেখেছ নিজের?' এত দাম দিয়ে আয়নাটা কিনলাম সেদিকে একবার ভুলেও তাকায় না রে! এমন একটা গেঁজেল আমার কপালে ছিল।'

না, আর শোয়া যাবে না। এমন মেয়েছেলে যে কোন মায়ের গব্বে পয়দা হয় কে জানে! চট করে ও মদনার দিকে তাকাল। ছোঁড়া এখন গাঁদের আঠায় চোখ এঁটে ঘুমুচ্ছে। বউ-এর পায়ের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ যা বলল সেটা শুধু গঙ্গাই যেন শুনতে পেল।

'নিমতলায়।' প্রায় ভেংচে বলে উঠল গঙ্গা, 'এখন বাপের জমিদারি থেকে গতর তুলে দোকানে ঢোকো, আমি বেরুচ্ছি।' কথাটা শেষ করে হাতের চাদর শিবনাথের দিকে ছুড়ে ফেলে গঙ্গা দপদপিয়ে চলে গেল।

চাদরটা নাকের কাছে ধরল শিবনাথ, বোধ হয় একটু গন্ধ হয়েছে। তা পুরুষমানুষের শরীরে থাকলে গন্ধ হবে না? সেই সেবার ঝগড়া হয়ে যাওয়ার পর থেকে ও গঙ্গাকে বলে দিয়েছিল ওর জামাকাপড় যেন সে না কাচে। কিন্তু চাদরটা কি জামাকাপড়ের মধ্যে পড়ে? স্বামীভক্তি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই আর। প্রথম বাচ্চা হওয়ার আগে শরীর ছিল, বেড়ালের মতো নরম ছিল মনটাও, দ্বিতীয়টা হওয়ার পরও শরীরটা টিকে ছিল, মুখটার বাপ-মা চলে গেল। আর তিন নম্বর বাঁশটা আসার পর শিবনাথের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে। গাঁজার আড্ডার কালীদা রেস খেলে, প্রায়ই সে শিবনাথকে বলে, 'ভাই শিবু, পেডিগ্রি না দেখে বিয়ে করলে এমনটা তো হবেই। ঝগড়াঝাঁটি মেয়েদের এক জন্মে খোলে না, পেডিগ্রিতে সেটা থাকতে হয়।' শিবনাথ মনে-মনে মাকে ডেকেছিল, তুমি মাইরি মা, দেখে এসে বললে আর আমি বিয়ে করলাম। ঠিক হ্যায়, কিন্তু তোমার সাত-তাড়াতাড়ি পটল তোলার দরকার ছিল কি? তুমি থাকলে গঙ্গাটা যিশুখ্রিস্ট হয়ে থাকত, নট নড়নচড়ন—পেরেক পোঁতা। তোমার সঙ্গে পারত হলে আরও তিনটে জন্ম নিয়ে আসতে হত। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শিবনাথের, মা জেনেশুনেই এই মেয়েটাকে ঘরে এনেছে।

সারা শরীরে আলস্যি নিয়ে শিবনাথ দোকানের সামনে এসে পুঁটলি পাকানো চাদরগুলো ভিতরে ছুড়ে ফেলে রাস্তার কলে মুখ ধুতে গেল। ইদানীং আর দাড়ি কামায় না ও, মাঝে-মাঝে আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে। স্নানটান সাজগোজ এসবের ইচ্ছেটাই আর করে না। মনে-মনে ভাবে সে, ছেলেমেয়ে দোকান সব গঙ্গার, তার কাজ শুধু বিড়ি বেঁধে যাওয়া। দোকানের মুখটাতে বসে কুলোটাকে কোলের ওপর রেখে পাতা কাটা আর দুলে-দুলে তামাক পুরে গোটা-গোটা বিড়ি তৈরি করা। এই সারাটা দিন একভাবে বসে কাজ করে যাওয়া, শিবনাথ কারও সঙ্গে বাক্য ব্যবহার করে না। হ্যাঁ, এ পাড়ার কেউ শিবনাথের মুখে কথা শোনেনি দুটো ছেড়ে তিনটে। কালীদা বলে, তুই মাইরি একদিন ঠিক বোবা হয়ে যাবি। গ্যালপ না করালে ঘোড়া নষ্ট হয়ে যায়। তা বিড়ির হাত কিন্তু বেশ ভালো ওর। আগে মানিকতলার বিপিন ঘোষের দোকানে বিড়ি বাঁধত ও। ঠিকমতো টাকাপয়সা দিত না অথচ তাই নিয়ে খুব একটা ঝগড়া করত না সে। শেষ পর্যন্ত একদিন গঙ্গা ঝাঁটা মারি অমন চাকরির মুখে বলে ওকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের দোকানেই বসিয়ে দিল। দোকানটা এত ছোট, নড়তে-চড়তে অসুবিধে হয়, তা ছাড়া গঙ্গার সামনে সারাদিন বসে থাকা—আসতে চায়নি সে। কিন্তু দোকানে তাকে বসিয়ে গঙ্গা গোরাপঞ্চাননকে দিয়ে ছোট্ট সাইনবোর্ড লিখিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল, শিবনাথের নেশার বিড়ি। নেশা কথাটা আছে বলেই বোধ হয় বিক্রি ভালো হয় গঙ্গার, রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দ্যাখে পড়ে নেই কিছু। সংসার-টংসার টাকাপয়সা সব দায়িত্ব গঙ্গার, ওর শুধু মাঝে-মাঝে সিগারেট আর খিদের সময় খাওয়া চাই, ব্যস! শিবনাথ সাতও জানে না পাঁচও জানে না।

লুঙ্গিটাকে পেটের ওপর আলতো করে বেঁধে একটু লুকিয়ে দোকানে উঠে ও দেখল গঙ্গার তিন কন্যা ফেলাট হয়ে পড়ে আছে। ওদের দেখে এক-এক সময় মনটা খারাপ হয়ে যায় শিবনাথের। ঘুম ভাঙলেই নিচে ফুটপাথে নামে, রাত না হওয়া অবধি ফুটেই চরে বেড়ায়। বস্তির ভিতরের অন্ধকার ঘরটায় কেউ যেতে চায় না। বড়টাকে গঙ্গা এ বছর কর্পোরেশন স্কুলে ভরতি করেছে। প্রত্যেক সকালে গঙ্গার মুখ আর হাত চলে মেয়েটার ওপর। বহুৎ ধড়িবাজ মেয়ে। বিড়ি

বাঁধতে-বাঁধতে শিবনাথ লক্ষ করেছে দোকানের ক্যাশ থেকে মেয়েটা পাঁচ-দশ পয়সা সরায় মাঝে-মাঝে। কিছু বলেনি কখনও, ওর কি! স্কুল-ফেরত শিবনাথের সামনেই মেয়েটাকে দোকানে বসায় গঙ্গা। দোকান বলতে বাইশ বয়াম কেক-বিস্কুট-লজেন্স, এক ঝুড়ি পুঁইশাক, কুমড়োর ফালি, ঝিঙে, আলু আর কাঠের আসনের ওপর সিগারেটের স্তূপ, বিড়ির বান্ডিল। যেন শিবনাথ দোকান সামলাতে পারে না বলেই মেয়েটাকে এসব শেখাচ্ছে গঙ্গা।

বিড়ির কুলোটা টেনে নিয়ে বাবু হয়ে বসল শিবনাথ। এখন হাত মেশিন হয়ে গিয়েছে। কাঁচি দিয়ে পাতা কাটার সময় একটাও ছোট বড় হয় না, চোখ বেঁধে বিড়ি বাঁধতে পারে। মেয়েগুলোকে একবার ডাকবে কিনা ভাবল সে, তারপরই চিন্তাটা ত্যাগ করল। শালা ঘুম থেকে উঠলেই ঘ্যান-ঘ্যান শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এককাপ চা পেলে হতো। মুখ বাড়িয়ে দেখল হরেদার দোকানের সামনে পুরো বস্তিটাই যেন গেলাস-মগ হাতে উঠে এসেছে। বড়টাকে ওঠালে ওর ফাঁক গলে এনে দিতে পারত। দারুণ সেয়ানা মেয়ে। মা না থাকলে মুখ খারাপ করে বেশ। বাপ যে বসে আছে খেয়াল করে না, যেন শিবনাথ আর একটা বয়াম। মনে-মনে মজা পায় শিবনাথ, দেখে যাওয়ার মতো আরাম আর কি আছে, পৃথিবীতে যারা ঝুট-ঝামেলায় জড়ায় তাদের মধ্যে সে নেই।

দুলতে-দুলতে কুঁজো হয়ে বসে শিবনাথ বিড়ি বাঁধছিল, এমন সময় চিৎকারটা শুনতে পেল। বাবুদা রাস্তার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে কী একটা বলতে-বলতে এদিকে আসছে। বাবুদা যখন রাস্তায় হাঁটে তখন সবসময় তিন-চারজন চামচে সঙ্গে রাখে। এ পাড়ায় সবরকম ভালোমন্দের ভার বাবুদার ওপর। বয়সে ওর চেয়ে অনেক ছোট, সুন্দর চেহারার বাবুদা যখন টাইফাই পরে অফিসে বেরোয় তখন সাহেব-সাহেব দেখায়। তা এ পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা ওকে বাবুদা বলেই ডাকে। আজ অবধি ওকে মারপিট করতে দ্যাখেনি শিবনাথ কিন্তু ওর চামচেরা এক-একজন গব্বর সিং। এক-একটা ডায়ালগ রকে পা তুলে এমনভাবে বলে যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। চামচেগুলোর নাম রেখেছে গঙ্গা। শিবনাথ সিনেমা দ্যাখেনি অনেকদিন।

বাবুদা এসে ওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফিলটার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতে সেদিক থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নিল শিবনাথ। কিন্তু পেছনের আয়নায় চোখ পড়তে দেখল বাবুদার মুখ খুব গম্ভীর, নখ দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলছে। এ পাড়ার উঠতি ছোকরারা এসে প্যাকেট খুলে নিজের হাতে সিগারেট বের করে পয়সা রেখে চলে যায়। গঙ্গা থাকলেও এটা চলে তবে গঙ্গা লক্ষ রাখে যাতে পয়সাটা ঠিকঠাক পড়ে। তা শিবনাথের বাবার ক'টা পাঁজর আছে যে বাবুদা নিজে না দিলে সিগারেটের দাম চাইবে। তবে ব্যাপার সুবিধের নয়। বাবুদার মুখ গম্ভীর, পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ শিবনাথের কাল রাত্রের ঘটনা মনে পড়ল, সেই কেলোটা নয় তো!

সিগারেট ধরিয়ে বাবুদা হাঁক দিল, কেষ্টদা!

হরেকেষ্টর চায়ের দোকানে তখন খদ্দের থিকথিক করছে কিন্তু ডাকটা সবার মাথা টপকে ঠিক আসল জায়গায় পৌঁছে গেল। অন্য কেউ হলে যা কখনওই হতো না। হরেকেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদিক তাকিয়ে বাবুদাকে দেখতে পেয়ে সুড়সুড় করে নিচে নেমে গেল। ওকে দেখতে পেয়েই বাবুদার গলা বাজখাই হয়ে গেল, 'কাল রাত্রে কে উড়ছিল?'

হরেকেষ্ট ঘাড় নাড়ল, 'আমি জানি না, মাইরি বলছি।'

সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বাবুদা চিৎকার করল, 'এটা কী ভদ্রলোকের পাড়া না বেশ্যাপাড়া? আমাদের মান ইজ্জত বলে কিছু নেই?'

হরেকেষ্ট বলল, 'আমি তখন দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলাম।'

বাবুদা বলল, 'কিন্তু কোনও কথা শুনব না। নেহাত আমার পাড়া বলে পুলিশ আসেনি, এই আমার মুখ চেয়ে, বুঝেছেন? সে মাল কোথায়?'

হরেকেষ্ট বলল, 'কে?'

সঙ্গে-সঙ্গে বাবুদার একনম্বর গব্বর বলে উঠল, 'গুরু, একে স্লাইট মেরামত করা দরকার, কেমন নেকু হয়ে আছে দেখছ?'

ঘাড় নাড়ল বাবুদা, তারপর তিন চার পা পায়চারি করে গলা তুলে বলল, 'কাল রাত্রে যা হয়েছে তার সাক্ষী কে আছে, কে দেখেছে? এতক্ষণে আরও ভিড় জমেছে। পিল-পিল করে বস্তি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। শিবনাথের দোকানের সামনে একটু লোক কম কারণ সেখানে স্বয়ং বাবুদা দাঁড়িয়ে।

কাউকে উত্তর দিতে না দেখে বাবুদা আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'মাল খেয়ে একজন মেয়েছেলের হাত ধরে টানছে আর তোমরা সব ভেড়ুয়া তা হজম করছ—পুরো বস্তি জ্বালিয়ে দেব বলে দিলাম, একটাকেও এখানে থাকতে দেব না।' হঠাৎ ঘুবে দাঁড়িয়ে বাবুদা বলল, 'এই শিবুদা, তুমি কাল রাত্রে গাঁজা খেয়েছ।'

বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ঘাড় নাড়ল সে, না। এত লোকের সামনে আবার এসব কথা কেন? খিঁচিয়ে উঠল বাবুদা, 'তা তখন কি চোখের মধ্যে কল্কে ঢুকিয়ে বসেছিলে, নাইট শো ভাঙার আগে কোন শালা ফুটে ঘুমোয়?'

হঠাৎ কী হল শিবনাথ কুলোটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ঝুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে তাহলে ওরা এখানে আসত না। ঝুকু ছেলেটা খারাপ নয় কিন্তু বাবুদা যেরকম গরম হয়ে আছে তাতে মনে হয় ওর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথাটা যদি বলে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ঝুকু বেঁচে যেতে পারে। শিবনাথকে ওইভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাবুদা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিড়ি বাঁধা ছাড়া অন্য কোনও ভঙ্গিতে একে সে দ্যাখেনি, মুখে বাক্যি শোনেনি। নিশ্চয়ই অরিজিনাল কিছু পাওয়া যাবে।

দোকান থেকে নেমে শিবনাথ চারপাশে তাকাল। সমস্ত ভিড়টা ওর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে এখন। নিজেকে বেশ অন্যরকম মনে হচ্ছে। এতক্ষণে খেয়াল হল ওর গায়ে গেঞ্জি অবধি নেই আর লুঙ্গির পিছনে বেশ কিছুটা ফেঁসে গেছে। আর এই প্রথম মনে হল ওর শরীরটা খুব ছোট, বাবুদার পাশে খুব অসহায় লাগে।

একনম্বর গব্বর শিবনাথের কাছে এগিয়ে এল, 'কেসটা কী?' অনেকদিন পর নিজের কণ্ঠস্বর শুনল শিবনাথ, 'হরেদার দোকানের ওপাশে আমি বিছানা করে শুয়েছিলাম। এমন সময় নাইট শো ভাঙল আর রিকশা, লোকজন যেতে লাগল। তারপর ঝুকু এল, এসে বলল সিগারেট দাও। ও খুব মাল খেয়েছিল, টলছিল, কিন্তু আমি যখন বললাম দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন বুঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার জন্যে কিচ্ছু খোলা নেই।'

একনম্বর বলল, 'অ্যাই সর্টকাট কর।'

শিবনাথ বলল, 'সর্টকাট করতে গিয়েই তো গণ্ডগোল হয়। আমি বললাম, ঝুকু তুই বাড়ি যা। ঝুকু বলল, 'তাই যাই।' বলে এদিক দিয়ে না গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে সর্টকাট করতে গেল। তা নেশার জন্যে পা ঠিক ছিল না, এদিক ওদিক হচ্ছিল দেহ, ঠিক সেই সময় দুটো মারোয়াড়ি বউ সিনেমা দেখে গল্প করতে-করতে আসছিল। আমি দেখলাম একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজনের গায়ে এট্টুসখানি টাচ লেগে গেল ঝুকুর। সঙ্গে-সঙ্গে বউদুটো চেঁচিয়ে উঠতে ঝুকু সর্টকাট করে কেটে পড়ল। হাঁপিয়ে পড়েছিল শিবনাথ, বলা শেষ হওয়ামাত্র দোকানে উঠে পড়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একনম্বর গব্বর বলল, 'শালা ফের কথা বলছে। হাত ধরে টানা আর টাচ লাগা এক হল?' বলে শিবনাথের বুকের খাঁচায় আলতো করে ধাক্কা দিল। টাল সামলাতে পারল না শিবনাথ, ঘুরে গিয়ে ছিটকে ফুটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। পড়ার সময় চাপ লেগে লুঙ্গিটা আরও ফেটে গেল শব্দ করে। বুকে হাঁটুতে একটা ব্যথা তুবড়ির মতো ছিটকে উঠল। আর সেই সময় একটা কচি

গলায় কানফাটা চিৎকার উঠল, 'বাবাকে মেরে ফেলল, ও মা বাবাকে মারছে।' শোয়া অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে শিবনাথ দেখল বড় মেয়ের মুখটা হাঁ হয়ে আছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে মায়ের গলায়। কখন ঘুম ভেঙেছে টের পায়নি শিবনাথ। দুই নম্বর গব্বর ধমকে উঠতে চুপ করে গেল মেয়েটা। খুব আস্তে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে শিবনাথ উঠে তাকাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে মন না দিয়ে ও বাবুদার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে পাশে দাঁড়াল।

বাবুদা জনগণকে বলল, 'আজ আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম, এই বস্তির কেউ যদি মেয়েমানুষের ইজ্জত নষ্ট করে তাহলে আমি পাশে দাঁড়াব না। কাল রাত্রে যাঁদের ঝুকু বেইজ্জত করেছে তারা আমাদের ওয়েল উইশার, তাই ঝুকুর কপালে ভোগ হয়ে গেছে। আপনারা সবাই মনে রাখবেন আগে মা বোনের ইজ্জত তারপর অন্য কিছু। ঝুকু শালা দোষ না করলে পালাল কেন? আপনি আমি তো পালাইনি—হা হা হা।'

অনেকটা শাসিয়ে ওরা চলে গেল। শিবনাথ দেখল সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হরেদা এগিয়ে এল, 'আমি মাইরি তাজ্জব হয়ে গিয়েছি, আমাদের শিবু কথা বলছে তাও আবার ঝুকুকে সাপোর্ট করে বাবুদার সামনে। তুমি দেখালে, শিবু।'

শিবনাথ মাথা নিচু করে লাফিয়ে দোকানে উঠে পড়ল। বসতে গিয়ে টের পেল, তার পাছা একদম কাঠের ওপর ঠেকছে। মাঝখানে কাপড়ের আড়ালটা নেই। ছোট-মেয়েদুটো উঠে বসে পিটির-পিটির করে তার দিকে দেখছে, বড়টা খ্যানখেনিয়ে বলল, 'তোমাকে মারল তুমি কিছু বললে না শালাদের।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল শিবনাথের, ওইটুকুনি পুঁচকে মেয়ে মায়ের প্রশ্রয়ে কোথায় উঠেছে। গম্ভীর হয়ে ইঙ্গিত করে কাছে ডাকল ওকে শিবনাথ। বাপ কোনওদিন এভাবে ডাকে না, কিন্তু একটা গোলমাল আঁচ করে মেয়েটা কাছে এল না, দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী বলছ?'

রাগটা শিবনাথের দাঁত গলে বেরিয়ে এল, 'ফের মুখ খারাপ করলে মেরে হাড় ভেঙে দেব। হারামজাদী।' সঙ্গে-সঙ্গে শিবনাথ অবাক হয়ে শুনল দুটো কচি গলা তোতাপাখির মতো আওড়াচ্ছে, 'হারামজাদী, হারামজাদী।'

চিৎকারটা হঠাৎই শুরু হয়ে গেল। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতে সময়টা খেয়াল ছিল না শিবনাথের কিন্তু গঙ্গার গলাটা কানে যেতেই সোজা হয়ে বসল। দ্রুত চিৎকারটা দোকানের দিকে আসছে, কি মতিচ্ছন্ন রে, আমাকে সাত তাড়াতাড়ি বিধবা করানোর মতলব রয়েছে, হারামজাদার। আবার কুঁজো হল শিবনাথ, হাত চালাতে-চালাতে বুঝতে পারল বড় মেয়েটা শালা আগবাড়িয়ে মাকে রিপোর্ট করেছে। তারপরই গঙ্গার থমথমে মুখ আয়নায় দেখতে পেল সে। সরাসরি দেখার চেয়ে আয়নায় দেখা অনেক ভালো। সুন্দর দেখায়।

'তুমি এই গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলে, খুব রস হয়েছে না? দু'দণ্ড দোকানে নেই আর আমার পিণ্ডি চটকাবার মতলব গো! কি দরকার ছিল তোমার বলতে যাবার, সবাই ঠুলি পরে ছিল আর তুমি কোথাকার মাতব্বর এলে অ্যাঁ। মেরে ফেলে দিল মাটিতে, লজ্জা করল না?' প্রায় হামলে পড়ে গঙ্গা গায়ের ওপর। কোনওরকমে পাশ ফিরে শিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল, 'মারেনি।'

'ও বাবা এ যে দেখছি বুলি ফুটেছে গো, মারেনি—প্রেম করেছে।'

'অ্যাকটিং করছিলাম।' শিবনাথ না তাকিয়ে বলে।

'কী করছিলে?' হাঁ হয়ে যায় গঙ্গা।

'ওমা! কি মিথ্যেবাদী গো। গায়ে এক বিন্দু ক্ষ্যামতা নেই আবার মিথ্যে কথা বলে। হারামজাদা মিনসে আমার ঠিক সর্বনাশ করবে একদিন। বাপ মা কেন গেঁজেলটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল রে।' চিৎকারটা কতক্ষণ চলত ঠিক নেই কিন্তু হরেকেষ্ট গঙ্গাকে এই সময় ডাকল, 'ও শিবুর বউ, অত রাগ করে না।'

'কি বলো হরেদা, আমার কপাল পুড়বে আমি দেখব বসে-বসে, অ্যাঁ?'

'কিন্তু এসব কথা এত জোরে-জোরে কেউ বলে? নাও, সকাল থেকে চা খাওনি, এই গেলাসটা ধরো।'

গজগজ করতে লাগল গঙ্গা, 'এত করে বলেছি, কারোর সঙ্গে কথা বলবে না, হাড় জ্বালিয়ে খেল। চা খেয়েছ?'

ঘাড় নাড়ল শিবনাথ। গঙ্গা বলল, 'তাতেই এত! হরেদা দুটো চা দাও।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শিবনাথ, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে নেই। শালা কোন ব্যাটাচ্ছেলে সংসার করে?' স্তূপ করে রাখা চাদর দুটো টেনে বগলে নিয়ে শিবনাথ দোকান ছেড়ে দুপ-দুপ করে নেমে এল। শ্যাম পার্কে সারাদিন এখানে-ওখানে ছায়া থাকে। এক ছিলিম খেয়ে যদি শুয়ে পড়া যায়, ব্যস দিনটা কেটে যাবে।

গঙ্গা ওর চলে যাওয়া শরীরের পিছনটা দেখে খানিকক্ষণ চোখ বড় করে থেকে বলল, 'বয়েই গেল।'

গাঁজার আড্ডায় পুলিশ হামলা করে তিনজনকে তুলে নিয়ে গেল। রাত্রে শ্যাম পার্ক থেকে উঠে সেখানে গিয়ে খবরটা পেল শিবনাথ। সকালে যখন খেয়ে গেল তখন এসবের আঁচ পায়নি। সারাদিন না খেয়ে এখন গাঁজা না পেয়ে শালা পেটের ভেতরটা প্রাইভেট বাস হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড খিদের সময় ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই। শিবনাথের হঠাৎ খেয়াল হল যে দোকানটা তার। গঙ্গা পরের বাড়ির মেয়ে। দোকান থেকে কয়েকটা টাকা যদি সে গিয়ে নিয়ে আসে কারোর চৌদ্দ পুরুষের তাতে কিছু বলার নেই।

কাছাকাছি হতে শিবনাথ থমকে দাঁড়াল, 'কোথায় গেলি রে তোরা, নিমতলায় না ক্যাওড়াতলায়?' না তাকে নয়, মেয়েগুলোকে খেতে ডাকছে গঙ্গা। সে যে সারাদিন নেই তাতে কিছু এসে যায় না। দূর থেকে মেয়ে তিনটেকে দেখতে পেল, দোকানের ভিতর পাট হয়ে ঘুমুচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়ে গঙ্গা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল, তারপর বলল, 'ভাত আর পোস্ত আছে, গিলবে তো গেলো।'

দোকানের তলায় গঙ্গার রান্নাঘর। সেদিকে তাকিয়ে শিবনাথ কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় হাউমাউ করে একটা কান্না শুরু হল। এখন রাত বেশ হয়েছে তবে নাইট শো ভাঙেনি। আশেপাশের দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় আলো কম। শুধু তাদের দোকানের আলোটাই চোখে পড়ে। শিবনাথ দেখল ঝুকু টলতে-টলতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীরের চাপে আর কান্নার দমকে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। সেইরকম গলায় ঝুকু বলল, 'তুমি মাইরি আমার গুরু। এই বস্তির সব শালা মাইরি হিজড়ে, কারোর হিম্মত নেই, সত্যি কথা বলার। তুমি মাইরি, শিবুদা, দেখিয়ে দিলে মরদ কাকে বলে।'

কোনওরকমে শিবনাথ বললে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'না মাইরি, ঠিক নেই। তোমাকে প্রণাম করতে আমি লাইফ রিস্ক করে ছুটে এসেছি। শালা বাবুদা আমাকে খতম করতে চায়, আমিও শালা সঙ্গে মাল রেখেছি তাই, বদলা হয়ে যাবে।' শিবনাথ দেখল ঝুকুর হাতে একটা বড় ছোরা চকচক করছে। গঙ্গা এতক্ষণ কথা বলেনি, শিবনাথ আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল গঙ্গা তাকে ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বলছে। ঝুকু বলল, 'কই গুরু, তোমার পা কোথায়, প্রণাম করব। মানুষের বাচ্চা তুমি, পা-টা দাও।' ঝুঁকে তার পা ছুঁতে গিয়ে কাণ্ডটা হয়ে গেল। টাল রাখতে না পেরে ঝুকু উলটে পড়তে-পড়তে গঙ্গার সঙ্গে ধাক্কা খেল। গঙ্গা আঁতকে উঠে চিৎকার করতেই ঝুকু দাঁড়াতে গিয়ে একটা কিছু অবলম্বন ধরতে চেয়ে গঙ্গার শাড়ি ধরে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে গেল শিবনাথের। গঙ্গা কাপড় বাঁচিয়ে চেঁচাচ্ছে সমানে। দৌড়ে গিয়ে

দুমদাম লাথি মারল শিবনাথ ঝুকুর পিঠে। ঝুকু কোনওরকমে মুখ তুলে কে মারছে দেখতে চেষ্টা করলে ও হেঁচকা টানে ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সমস্ত শক্তি দিয়ে শিবনাথ ঝুকুর গালে একটা চড় মেরে ফিসফিস করে বলল, 'যা পালা।'

ঝুকুর এক হাতে তখনও ছোরাটা ধরা। সেদিকে একবার তাকিয়ে সে মাথা ঝাঁকিয়ে থু-থু করে থুতু ফেলে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাক, প্রণামটা হয়ে গেল।' বলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল টলতে-টলতে।

এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল একটা লোকও কাছে এল না। হরেদার দোকান বন্ধ কিন্তু ফুটপাথ জুড়ে সবাই ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। শিবনাথের শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। পেটের ভিতর ব্যথা-ব্যথা লাগছিল। উত্তেজিত হলেই এটা হয়। লুঙ্গিটা ভাঁজ করে হাঁটু থেকে কোমরে এনেছে তবু ঝুকুটা পা খুঁজে পেল না, আশ্চর্য।

দোকানের ওপর জিনিসপত্র সরিয়ে খাওয়া-দাওয়া হয়। খিদের জ্বালায় অনেকটা ভাত সাঁটিয়ে কিছুটা তৃপ্তি হল শিবনাথের। ঝুকুটাকে মারা ঠিক হয়নি। আজ অবধি কাউকে মারেনি ও, আয়নায় একটা রোগা পাঁজর বের করা খোঁচা দাড়ি আর না-ধোয়া জটা চুলের একটা মানুষের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল সে।

মেয়েদের মুখে প্রায় ঠেসে খাবার পুরে গঙ্গা খাওয়াচ্ছিল। শিবনাথকে বালিশ চাদর বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'দাঁড়াও, দরকার আছে।' শিবনাথ কী করবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু গঙ্গাকে একটু অন্যরকম লাগছে এখন। ঝুকু চলে যাওয়ার পর একটি বাক্য মুখ থেকে বের হয়নি। এখন এই বলাটার মধ্যে চিৎকার নেই। আজ শালা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। খাওয়া শেষ করে গঙ্গা যখন মেঝে মুছছিল তখন শিবনাথের সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেয়ে তিনটে ঘামে জবজব করছে, গরমে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে গায়ে, তবু ঘুমের কোনও ব্যাঘাত নেই এদের।

নাইট শো ভাঙল। রিকশার ভিড় হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। খানিক বাদেই চারধার আবার নিঝুম হয়ে যাবে। এই ক্যাচক্যাচ না থেমে গেলে ফুটে শুয়ে ঘুম আসবে না কিছুতেই।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল শিবনাথ হঠাৎ কনুইয়ের ওপরে হাতে কিছু একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল। ও দেখল গঙ্গা ওর হাতে একটা লাল সুতো বাঁধছে, সুতোর মাঝখানে একটা ছোট্ট কিছু বাঁধা।

'এটা কী?' খিঁচিয়ে উঠল শিবনাথ।

'মায়ের তাগা।'

'সেই সক্কালবেলায় গেলাম না স্নান করে, নিয়ে এসেছি। ভীষণ জাগ্রত।'

আদুরে-আদুরে ভঙ্গি নিয়ে বলল গঙ্গা।

হারামজাদা, জানোয়ার, শুয়োরের বাচ্চা। গালাগালগুলো স্মরণ করে গঙ্গার মুখের দিকে তাকাল শিবনাথ। ঝুকুর ওপর হাত-পা চালানোর পর থেকে মনে বেশ আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে। একটু ওলটপালট করেছ কি আজ ছেড়ে কথা নেহি বোলে-গা। গঙ্গার বাঁধা শেষ হলে ঝট করে উঠে দাঁড়াল শিবনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গা বলল, 'থাক আজকে আর ফুটে শুতে হবে না।'

'কেন? মেঘ নেই আকাশে, শোব না কেন?' গঙ্গা সরে না গেলে দোকান থেকে নামতে পারছে না শিবনাথ।

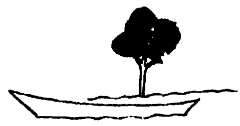
'মায়ের এই তাগাটা যে রাত্রে বাঁধে সে রাত্রে আলাদা শুতে নেই। আজ দিনটাও ভালো।' বেড়ালের মতো ভঙ্গি গঙ্গার।

'কী পিণ্ডি হবে এতে?' ঠিক বুঝতে পারছিল না শিবনাথ।

'পুত্র হবে।' গঙ্গা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, 'আমার কি, এই তিনটে নিয়ে হাড়ভাজা হয়ে গেছি! তবু বাপের পিণ্ডি দেবার জন্যে একটা ছেলেও থাকবে না—তাই সাত সকালে স্নান করে নিয়ে এলাম তাগাটা।'

পা দুটো হঠাৎ ভারী হয়ে গেল শিবনাথের। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে খুব ধীরে-ধীরে সে উচ্চারণ করল, 'সেটাও তো জানোয়ার, হারামজাদা হবে।'

গঙ্গা বলল, 'জানিই তো।'



দুলতে-দুলতে যাওয়া

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বেশ সন্ধে হয়ে গেল। অনেকদিন পরে কলকাতায় আসা—রাস্তাগুলো কেমন গুলিয়ে যায়। তা ছাড়া বিজনবাবুর বাড়িতে আমি কোনওদিন আসিনি—আসার কোনও কথাও নয়। বছর তিনেক আগে একবার নৈনিতালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। হোটেলের ডাবল সিটের শরিক হয়েছিলেন বিজনবাবু. আমি থাকি চণ্ডীগড়ে, কলকাতার লোক পেয়ে বেশ জমে গিয়েছিলাম। দেখা গেল আমাদের বয়স এক, দুজনেরই একটিমাত্র সন্তান। তা নৈনিতাল থেকে উনি আগেই চলে এসেছিলেন। আর আমারই মতো অন্যমনস্ক লোক বোধ হয়, চলে যাওয়ার পর ওঁর একটা নতুন দামি প্যান্ট খাটের তলায় আবিষ্কার করেছিলাম। তারপর চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়েছিল। চণ্ডীগড় থেকে প্যান্টটা পার্সেল করে পাঠাতে চেয়েছিলাম আমি, উনি ঠাট্টা করে লিখেছিলেন পরের ছুটিতে সিমলা যাওয়ার পথে নিয়ে যাবেন, সুটকেসের বোঝা কমবে। ওঁর আর যাওয়া হয়নি, আমারও খেয়াল ছিল না। এবার অফিসের কাজে কলকাতায় আসার সময় ওটা সঙ্গে করে এনেছি, বিজনবাবুকে লিখেছিলাম, অন্যলোকের প্যান্ট বাড়িতে রাখা বিশ্রী ব্যাপার।

ছোট গলির মধ্যে বাড়ি। পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। দরজা খোলা, সামনে দুটি লোক গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। আমি 'বিজনবাবু' বলতেই ওরা ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল। হয়তো অন্য ভাড়াটে হবে—আমি দেখলাম একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। দোতলায় উঠতেই কান্নার শব্দ পেলাম। স্ত্রী-কণ্ঠের ইনিয়েবিনিয়ে কান্না। খুব অস্বস্তি হল। একটি কিশোরকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম, 'বিজনবাবু—!' সে আমাকে পাশের ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। দরজার কাছে দাঁড়াতেই আমি চমকে উঠলাম। ঘরের মেঝেতে বিজনবাবু শুয়ে আছেন। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরানো হয়ে গেছে। কপালে চন্দনের টিপ। একজন, আমার স্ত্রী-র বয়সি মহিলা বিজনবাবুর বুকে মাথা রেখে কাঁদছেন, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে বসে একটি বছর দশেকের মেয়ে। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটি শোকগ্রস্ত মুখ ছড়ানো, আমার দিকে ওঁরা তাকালেন। আমি বিজনবাবুর প্যান্ট প্যাকেটে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বিজনবাবুর মুখচোখ অবিকল সেইরকম যেমন নৈনিতালে দেখেছিলাম। শেষ চিঠিতেও অসুখের উল্লেখ নেই। একজন আমার কাছে উঠে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখন?'

খুব বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন, 'দুপুরে। খেয়েদেয়ে উঠে বুকে ব্যথা হল—ডাক্তার ডাকার সময় পাওয়া যায়নি।'

মনে পড়ল নৈনিতালে বিজনবাবু বলতেন, 'দূর মশাই, আমার তো ছুটোছুটি একদম ভালো

লাগে না—শুয়ে থাকার মতো আনন্দ আছে নাকি!' মনে হল এখন উনি সেইরকম কিছু বলে উঠবেন।

খানিক বাদে একটু হই-চই উঠল, পাড়ার ছেলেরা এসেছে খাটিয়া ফুল নিয়ে। দেহ নামাতে হবে। আমার মতো ভারী শরীর, ওদের নামাতে কষ্ট হচ্ছে। বিজনবাবুর স্ত্রী-কে কোনওরকমে সরিয়ে দেওয়া হল। একটি ছোকরা আমায় বলল, 'দাদা একটু হাত লাগান।' আমি প্যান্টের প্যাকেটটা সামলে বিজনবাবুর পা ধরলাম। এর মধ্যেই বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামাতে কষ্ট হচ্ছে। দেওয়ালে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'দেখবেন যেন না লাগে।' ছেলেগুলো আমার দিকে তাকাল, মনে হল ওদের ঠোঁটে একচিলতে হাসির ভাঁজ।

নিচে খাটিয়া ধূপকাঠি জ্বালা হয়ে গেছে। বিজনবাবুকে শুইয়ে দিলাম আমরা। ওরা ফুল ছড়িয়ে দিল বুকে। একটি ছেলে দড়ি দিয়ে বাঁধতে যাচ্ছিল বিজনবাবুকে খাটিয়ার সঙ্গে, আমি বললাম, 'না বাঁধলেই নয়?'

ও বলল, 'লাশ পড়ে যাবে না হলে।'

ডুকরে-ওঠা কান্নাটা ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছে। বিজনবাবুর স্ত্রী-কে কয়েকজন মহিলা জড়িয়ে ধরেছেন। সেই ছোট মেয়েটি বোবা হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, 'তোমার বাবা?' সে ঘাড় নাড়ল, তারপর হঠাৎ বাবা বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাইলাম---সে পাগলের মতো ছটফট করছিল। খানিক বাদে ওরা বিজনবাবুকে তুলে হাঁটতে শুরু করল।

একজন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চলুন দাদা, নইলে ফিরতে ভোর হয়ে যাবে।'

নিজের অজান্তেই ওদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলাম। একহাতে যে আমার বিজনবাবুর প্যান্টের প্যাকেট সেটা আর খেয়াল নেই। এরা কোথায় যাবে? কোন শ্মশানে? আমি জানি না। ছেলেগুলো ভালো, চিৎকার-চেঁচামেচি করছে না মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময়। বরং বড্ড বেশি চুপচাপ। এভাবে বিজনবাবুকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমি চাপাগলায় বললাম, 'হরিবোল!' ওরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, চাপাগলায় জানান দিল, 'হরিবোল।'

আমার খুব ভালো লাগল। এত বাস-ট্রাম জনতার মধ্যে দিয়ে আমরা বিজনবাবুর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেওয়ার মতো করে চাপাগলায় হরিবোল বলছি বুকভরে। রাস্তার দু-পাশে মানুযজন বিজনবাবুকে দু-হাত তুলে নমস্কার করছে। আমার ভালো লাগছে। একটা চৌমাথার মোড়ে লালবাতি জ্বলছিল। ওপাশের রাস্তা দিয়ে দ্রুত ট্রাফিক ছুটছে। আমাদের দেখে পুলিশ হাত বাড়িয়ে সব থামিয়ে দিল। সম্রাটের মতো বিজনবাবুরা রাস্তা পেরিয়ে গেলেন। আমার ভালো লাগল।

হঠাৎ মনে হল পেছনের ছেলেটি বোধ হয় কাঁধে ভার রাখতে পারছে না। ছুটে গিয়ে তাকে বললাম, 'অসুবিধে হচ্ছে?'

সে ঘাড় নাড়ল, 'যা ভারী!' আমি তার মুখ দেখলাম, বেশ ঘেমে গেছে। ছেলেটি বলল, 'একটু নেবেন?' আমি কিছু বলার আগেই সে বিজনবাবুকে সামান্য তুলে ধরল। আমি কাঁধ দিলাম। একহাতে বিজনবাবুর খাটিয়া অন্য হাতে তাঁর প্যান্ট। হরিধ্বনি চলছে। চলার বেগ বেড়েছে। আমি তাল রাখতে পারছি না। বিজনবাবুর মুখটা ঝাঁকুনিতে আমার দিকে ঘোরানো। চোখ বন্ধ। মনে পড়ল একদিন ওঁর প্যান্টটা পরে দেখেছিলাম আমার হয় কিনা। ওঁকে লিখেওছিলাম যে কোমরের কাছটা একদম ফিট করে গেছে। উনি লিখেছিলেন, 'তাহলে আপনি ডুপ্লিকেট বিজন হতে পারেন।'

এখন এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী চণ্ডীগড়ে বসে টিভি দেখছেন, আবার দশ বছরের মেয়ে পরীক্ষার পড়া করছে। আর আমি এখন খাটিয়ায় দুলতে-দুলতে যাচ্ছি। বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ মশাই, আমি ডুপ্লিকেট বিজন হয়ে যেতে পারি যে-কোনও মুহূর্তেই। পারি কেন, হয়েই গেছি। শুধু শ্মশানের পথটাই জানি না।

ওই একটি জায়গায় যেতে যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় মশাই।



জিয়োনো মাছ

চা চুরির জন্য চাকরিটা চলে গেল বংশীর। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়, সবাই চুরি করে, কেউ সাধু নয়। মেয়েগুলোর সুবিধে একটু বেশি, আংরার তলায় পুঁটলি বেঁধে বেশ নিয়ে যায়, চৌকিদার শালা তখন চোখ বুজে থাকে। পোয়াতি মেয়েদের তো পোয়াবারো, তলপেটের সঙ্গে সাইজ মিলিয়ে ওপরপেটে চা বেঁধে নেয়। বিরাট গুদামে পাহাড় করা চায়ের পাতা, কাঠি বাছাই চলছে দিনরাত। গাদা-গাদা কামিন আর বুড়ো কুলিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। চারধার টাটকা চায়ের গন্ধে ম-ম করছে। বাছাই চায়ের প্যাকিং চলছে একধারে। ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে পেরেকের। মাঝে-মাঝে গুদামবাবু টহল দিয়ে যাচ্ছে মশমশ করে পাতা ডিঙিয়ে। কামিনদের কাঁখের বাচ্চাগুলো পা ছড়িয়ে সেই চায়ের ওপর গু-মুত ছড়াচ্ছে---তার বেলা কিছু নয়, শুধু বংশী যখন আর না পেরে কয় মুঠো পাতা চা কোঁচরে ভরে ছুটির ভোঁ বাজলে যেই বেরুতে গেল সঙ্গে-সঙ্গে চৌকিদার শালা ওর পেট ধরল খামচে! এ্যাদ্দিন পাতা তুলত বংশী। পিঠে ঝুড়ি নিয়ে ট্রাকে চেপে চলে যেত খুঁটিমারী ডিমডিমার পারে। সারাদিন পাতা তুলে সন্ধেয় ফিরে আসত গুদামে। পাতিবাবু ওজন করে পাতা নিত দেখেশুনে। ব্যস ছুটি। সেই কাঁচা পাতা কি করে চেহারা পালটে ম-ম গন্ধ ছড়ানো চা হয়ে যায়, কোনওদিন দেখার সুযোগ হয়নি। তাগড়া জোয়ানদের গুদামের কাজে নেওয়া হয় না। কিন্তু সেদিন আংরাভাসার গায়ে চা-পাতা তুলতে গিয়ে সেই শালা গোলাপটা এমন চোট দিল পায়ে যে তিনমাস হাসপাতালে ওষুধ গিলতে হল ওকে। বেরিয়ে আসার পর হাঁটতে গেলে খোঁড়াতে হয়। দগদগে ঘা শুকিয়ে গেলেও পা-টা হয়ে আছে কাঠির মতোন লিকলিকে। শরীরে তাগদ বলতে কিছু নেই। কোনওরকমে গুদামে কাজ মিলল ওর আরামের চাকরি। হপ্তা গেলে পেটভরতি ভাতের টাকা মেলে, সুরজপ্রসাদের ভাঁটিখানায় এক বোতল করে হাঁড়িয়াও কুলিয়ে যায়। তিন নম্বর কুলি লাইনের শেষ ঘরটায় সারারাত নেশা করে শুয়ে থাকে বংশী। বউটা ছেলের বয়সি একটা মিস্ত্রির সঙ্গে ভেগে গেছে বিনাগুড়ি। বেশি দূর নয়, ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটাই হয় না। বউটা এ্যাদ্দিন ছিল বাঁজা, গতর টসকায়নি। উড়ো খবর আসে, এবার নাকি বিয়োবে। যারা খবর দেয় তারা বংশীর দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসে। ভাবখানা এমন, তোমার কেরামতি ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু সেসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না বংশী। মেয়েছেলের জাত পোষ মানে না কখনও। পুরুষমানুষ যদি পেট আর দিলে সুখ রাখতে পারে—চাই কি আর! পেট ভরলেই তো দিল ভরে। কিন্তু শালা সোনিরাম মুদি লোভ দেখাল, 'ওরে বংশী, শুনলাম গুদামে কাজ করছিস, নিয়ে আয় চা মুঠি কতক দশ টাকা কিলো দেব।' ব্যস, লোভ শালা হেলে সাপের মতো লিকলিকিয়ে উঠল সারা গায়ে। মাত্র তিন মুঠো চায়ের জন্য চাকরি খতম করে দিল গুদামবাবু। এক বোতল হাঁড়িয়ার দাম হতো চা-টায়। কপালে যা বাঁধা তার বেশি চাইতে গেলেই ফেঁসে যেতে হয়—কেউ যদি এ খবরটা আগে বলে দিত!

ধরা পড়ার পরই হয়ে গেল কেচ্ছাটা। চৌকিদার তো ওর কোঁচরে হাত রেখে চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে, ছাড়াবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল বংশী। গেটের সামনেই নালি—সোজা চলে গেছে আংরাভাসায়। নালির ওপর সিমেন্টের বাঁকানো সাঁকোর ওপর চলছিল ধস্তাধস্তি। দৃশ্যটা দেখে

আশেপাশের লোকজন ছুটে আসছে। মদেশিয়া কুলিকামিনের দল ভিড় করে মজা দেখছে। দাঁত বের করে মেয়েগুলো ঢলে পড়ছে। গুদামবাবু আর অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজারকে এদিকে আসতে দেখে পেটের গিঁট খুলে দিল বংশী। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝুর-ঝুর করে পাতাগুলো পড়ল নালিতে, পড়ে ভেসে চলল। যদি ডুবে যেত তলায় তাহলে গুদামবাবু দেখতে পেত না, প্রমাণ থাকত না কিছু। সঙ্গে-সঙ্গে নাম কাটা গেল খাতা থেকে। ছিঁচকেমির ব্যাপার বলে দশ মাইল দূরের থানায় খবরটা দিল না কেউ। ভিড় হালকা হয়ে গেলে বংশী দেখল বাবুরা ছুটি পেয়ে দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কুলিকামিন চা-বাগানের হাঁটা পথে ফিরে যাচ্ছে লাইনে। আর সামনের শিরিষগাছের একটা নিচু ডালে বসে বুক ফুলিয়ে একটা ঘুঘু ওর দিকে তাকিয়ে শেষবার ডেকে নিচ্ছে।

সারাদিন ঘরে শুয়ে বসে কাটাল বংশী। সেই ভোরে ভোঁ বাজতেই লাইন খালি করে মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে গেছে কাজে। হাসপাতালে থাকতে এত কষ্ট হয়নি, আজ মটকা মেরে পড়ে থাকতে যেমনটা হয়েছিল। এই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। আজ নয় কাল ওরা ছেড়ে দিতে বলবেই। বাগানে যারা কাজ করবে তাদের জন্য ঘর দেওয়া হয়। একবেলা রাঁধে লাইনের সবাই। রাত্তিরবেলায় গরম-গরম ভাত খেয়ে বাকিটা জলিয়ে পরদিন কাজে নিয়ে যায়। কিন্তু কাল রান্না হয়নি কিছু। মেজাজ ছিল না। দু-একজন এসেছিল উপায় বাতলাতে, ম্যানেজার কিংবা বড়বাবুর কাছে ধরাধরি করতে। একটা ইউনিয়ন আছে ওদের, কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়া চুরির কেস নিয়ে কিছু করবে না ইউনিয়ন।

ঠা-ঠা দুপুরে ঘরের বাইরে এল বংশী। বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলে পায়ের ব্যথাটা বাড়ে। হাঁটাচলার মধ্যে থাকলে ঠিক হয়ে যায়। খালিগায়ে একটু জ্বরো-জ্বরো ভাব লাগছে। টানাটানিতে ধুতিটা কাল ফেঁসে-ফেঁসে গিয়েছিল। পাতি তোলার সময় যে ঢলঢলে খাঁকি হাফপ্যান্টটা পরত সেটাই গলিয়ে নিয়েছে এখন। প্যান্টে সুখ হয় না ওর। সুখ যে ছাই কীসে হয়, শুধু খাওয়া ছাড়া! গলাভরতি ভাতগুলো যখন পেটের মধ্যে বিজুর কাটে তখনই সুখ হয় জব্বর। খাওয়ার কথা মনে পড়তেই কষ্ট হল বংশীর। পেটের চামড়াটা শালা পিঠে লেগে যাবার ধান্দায় আছে! চাউল আছে ঘরে সেরখানেক, খেয়ে নিলেই তো শেষ হয়ে গেল। তিনদিন বাদে হপ্তা। বংশী শেষ পর্যন্ত উনুন ধরাবে বলে ঠিক করল। চারধার চুপচাপ, শুধু মাঝে গলা ছেড়ে মোরগগুলো চেঁচাচ্ছে। ওখানে সব ঘরেই মুরগির দঙ্গল। বংশীর বউ এককালে মুরগি পুষত। বউ পালাতে বংশী সেগুলোকে রোজ রাত্রে একটা-একটা করে কেটে খেয়েছে। আঃ, সেই দিনগুলোয় খাওয়াটা ছিল কী সুখের! মেয়েছেলের শরীরের চেয়ে মুরগির মাংস স্বাদে জিভ জুড়িয়ে দেয়।

আনমনে হাঁটছিল বংশী। একদম ন্যাংটাপোঁদা বাচ্চা আর থুত্থুরে বুড়োবুড়ি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। লাইনের শেষ প্রান্তে এসে খুঁটিমারী জঙ্গলের দিকে তাকাল ও। ঘন জঙ্গলটা ক্রমশ নিচ থেকে আরও নিচে নেমে গিয়েছে। একটু এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল বংশী। তেমাথা বুড়ো সিরিন গুলতি হাতে বসে। নড়বড়ে মুঠোয় গুলতির বাঁট নিয়ে পানসে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। বংশী ওর সামনে উবু হয়ে দাঁড়াতে বুড়ো চোখ তুলল, তারপর চিনতে পেরে বলল, 'নোকরি গেলাক রে তুর?'

'হুঁ।' বংশী ওর হাত ধরে আস্তে-আস্তে বলল, 'কা করতিস রে?'

বসে-বসে বুড়ো মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিল বোধ হয়, বংশীকে পেয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বুড়োর যখন ষাট বছর বয়স তখন চামুর্চির এক বিধবাকে বিয়ে করে। প্রায় তিরিশ বছরের ছোট বউটাকে বিয়ে করার কারণ বুড়োর ছেলেরা সব বাপকে ছেড়ে আলাদা, বউ এসে বাগানে কাজ করে স্বামীকে খাওয়াবে। তা বলতে নেই বউটা বুড়োকে দেখাশুনা করছে ঠিকমতন। মাঝে-মাঝে একবেলার জন্য চামুর্চিতে গিয়ে সৎ-মেয়েকে দেখে আসে এই পর্যন্ত। লোকে বলে অনেকের সঙ্গে নাকি ফস্টিনস্টি করে বউটা, চাঁদনী রাতে কেউ-কেউ চা-বাগানের মধ্যে দেখেছে

পুরুষের সঙ্গে। তা কোন মেয়েটা এই লাইনের সতী হয়ে আছে বল? শুধু ফেঁসে না গেলেই হল আর বুড়োকে তো কোনও অযত্ন করছে না—কারোর কিছু বলার নেই। তা সেই বউ আজ দু-দিন যেতে পারেনি কাজে। ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে। আজ জ্বর নেই বটে কিন্তু শরীর কাহিল। সকাল থেকে মাংস- মাংস করছে। গুলতি দিয়ে বুড়োকে বলেছে একটা ঘুঘু মেরে আনতে। শুকনো ধানখেতে ঘুঘুরা ভিড় করে ভরদুপুরে। জোয়ান বয়স হলে বুড়ো দশটা ঘুঘু মেরে দিত কিন্তু এখন ঢোঙাগুলো হাত ফসকে এদিক-ওদিক চলে যায় যে।

ঘরের দরজায় এসে বুড়োর যেন সম্বিৎ এল। বংশী যত ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে চায় ও ঘাড় নাড়ে। খড়ের ছাউনি অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, ভেতরে ঢুকতে একটু হেঁট হতে হয়। ভেতরের খাটিয়ায় মচমচ শব্দ হয়, তারপর বুড়ো সিরিনের বউ-এর আংরার তলা দেখা যায়। বংশী বোঝে খালিহাতে বুড়ো ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। বুড়োর বউ-এর সঙ্গে ওর কথাবার্তা তেমন নেই। বউ পালাবার আগে মাঝেমধ্যে ওর ঘরে অবশ্য গেছে। বংশীর সন্দেহ, এরই পাল্লায় পড়ে বউটার মন বিগড়েছে। না হলে এ মদেশিয়া মেয়ে হয়ে হিন্দি কথা বলে। চামুর্চিতে একটা হিন্দি সিনেমা হয় শুনেছে বংশী, তা বলে এত ঢং কীসের। আজকাল ওদের বাগানে মাসে দুমাসে একটা করে পিকচার দেখানো হয় বড়সাহেবের কুঠির সামনে—সিরিনের বউ-এর ঠাট-ঠমক সেইরকম।

'ভাগ গেলাক সব চিড়িয়া—না রে!' সিরিনের বউ পাশে এসে দাঁড়াল। চুলগুলো রুক্ষ, চেহারাটা থমথমে। হঠাৎ বংশীর মনে হল সিরিনবুড়ো সত্যিই বুড়ো! স্বামী না হয়ে বড়া-বাপ হতে পারত সহজেই। হঠাৎ যেন বংশীকে দেখে বউটা চোখ কপালে তুলল, 'নোকরী খতম, মরদ হজম' বলে হাসল।

প্রথম কথাটার মানে বুঝলেও পরেরটা কেমন রহস্য হয়ে থাকল বংশীর।

'তুম জোয়ান আদমি, তুমারা ডর কিয়া, বোলো!' বউ ঠোঁট টিপে বলল।

'যা বুড়া ঘর যা।' বংশী সিরিনের কাঁধে টোকা দিতে বুড়ো সিঁধিয়ে গেল ঘরে।

রুক্ষ চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বউ বলল, 'কা কাম করতিসে রে?'

'কুছ না,' বংশী গুলতিটা নিয়ে হাত বোলাল।

'দো চিড়িয়া মার দে, তুম ভি খায়গা হামরা ঘর মে।' বউ বলল।

'ঠিক হ্যায়।' বলে বংশী পা চালাল। এই মেয়েটার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। কেমন টিপটিপ করে বুক।

বেছে-বেছে অনেকগুলো ঢোঙা পকেটে পুরে লাইন ছাড়িয়ে নিচে নামল বংশী। যেখানটায় চাল শুকুতে দেওয়া হয় সেখানে কয়েকটা কাক ছাড়া কিছু নেই। ফ্যাক্টরির সামনে গেলে নিশ্চয়ই কয়েকটা পাওয়া যেত কিন্তু ওদিকে যেতে মন চাইছে না। লাইন ছাড়িয়ে যেতেই জঙ্গলের শুরু। বাঁদিকের হাঁটা-পথ ধরে খানিকটা গেলেই আংরাভাসা নদী। এই ভরদুপুরে খাঁ-খাঁ করছে চারধার। নদী ধরে কয়েক পা হাঁটতেই ঘুঘু পাওয়া যাবে। এখন বড়জোর হাঁটু অবধি জল। জঙ্গলের পথ ধরতেই বংশী দেখল একটা মদেশিয়ার সঙ্গে বাবুমতো লোক এদিকে আসছে। মদেশিয়াটা হাত নেড়ে ওকে থামতে বলছে। অবাক হল বংশী। বাবুটাকে ও জীবনে দ্যাখেনি। মদেশিয়াটাকে চেনাচেনা মনে হলেও ঠিক বুঝতে পারছে না কোথায় দেখেছে। গুলতি হাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের কাছে আসতে দেখল বংশী। বাবুটা মদেশিয়াকে ফিসফিসিয়ে কি বলতে সে সম্মতি জানাল ঘাড় নেড়ে। বাবুটা বলল, 'তোমার নাম বংশী?'

ঘাড় নাড়ল সে।

'কাল নোকরি চলা গিয়া তুমারা?'

'হাঁ।'

'লেও সিগারেট পিয়ো।' একটা দেশলাই আর হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট ওর দিকে

এগিয়ে দিল বাবুটা। বিড়ি খুব কম খায় বংশী, খইনি চলে। সিগারেট খাওয়ার পয়সা কোথায়? কিছু না বুঝে হাত বাড়িয়ে ওগুলো ধরল বংশী। ব্যাপারটা কী?

'ঘাবড়াও মৎ, হামারা বাত শোন', বাবুটা হাসল, 'তুম রুপিয়া মাঙতা হ্যায়?'

এ আবার কীরকম প্রশ্ন। টাকা কে না চায়? মুখে বলল, 'জি বাবু, পেটকে লিয়ে রুপিয়া জরুরত হ্যায়।'

'ঠিক বাত। খানেকে লিয়ে, আচ্ছা কাপড়াকে লিয়ে, ডেইলি হাঁড়িয়াকে লিয়ে সব কইকো রুপিয়া চাহিয়ে। মগর বংশী, তুমারা নোকরি তো খতম কর দিয়া সাহেব, আভি কেয়া করেগা?' বাবুটা বলল।

'শোচা নেহি বাবু।' বংশী ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

'ঠিক হ্যায়, হাম শুনা তোমারা বাত। উ সাহেব লোককা দিল দেখ, মুঠিভর পাতি নেহি ছোড়নে সেকতা। থুঃ!' ঘেন্নায় থুতু ছড়াল বাবুটা, 'এইসা বাগানমে তুম কাম মৎ করো। তুম হামারা কামমে লাগো।'

'আপকা কাম?' একটা বাবু ওকে যেচে চাকরি দিচ্ছে ভাবা যায় না।

'আরে ভাই হামারা চার পেটি পাতা চা চাহিয়ে। ও দারোয়ান শালা পয়চান্তা নেহি। তুম চলো, কোনঠু পাতা চা ও বাক্স ইয়ে হামারা আদমিকো বাতা দেও। সিরেফ চার পেটি, ব্যস।'

'কাঁহা? ফ্যাক্টরি পর?' অবাক হয়ে গেল বংশী।

'দুসরা কাঁহা মিলেগা ভাই!' দশ টাকার একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিল বাবু, 'কোই ডর নেহি। আজ রাত দো বাজে ইহা চলা আনা, হামারা ইয়ে আদমি তুমকো সাথ লে যায়গা। কাম খতম হোনেসে আউর চালিস রুপিয়া মিলেগা। আরে দারোয়ান ভি রুপিয়া লিয়া—কুছ নেহি বোলেগা।'

'আরি বাপু, হাম মর যায়েগা।' ঠকঠক করতে লাগল বংশী।

'আরে কুছ ডর নেহি। উনলোক তুমকো ভাগায়া দিয়া আউর তুম লেড়কিকা মাফিক বাত করতা। আরে বদলা লেও। যাদা কুছ করনে নেহি পড়েগা তুমকো। ব্যস, জবান পাক্কা? শুন, ইয়ে বাত দুসরা কিসিকো মত বাতানা। বেইমানকো হাম জিন্দা নেহি রাখতা।' কেমন রক্ত ঠান্ডা করা গলায় কথাটা বলে চলে গেল বাবুটা সঙ্গীকে নিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ধাতটা ফিরে এল তখন বংশীর খেয়াল হল ওর হাতে সিগারেট আর দেশলাই এবং টাকাটা রয়ে গেছে। আজ রাতে ওরা চুরি করবে পেটি-পেটি চা। নিয়ে যাবে কীসে? নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই চা-বাগানে এতকাল কাজ করে শেষপর্যন্ত ও এই কাজ করবে? মনের মধ্যে দুটো লোক অনেকক্ষণ পাঞ্জা কষে শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল বংশী। দারোয়ান যখন ওদের দলে, কেউ টের পাচ্ছে না যে বংশী এর মধ্যে আছে, ওরা যখন ফাঁকতালে কিছু টাকা ওকে পাইয়ে দিতে চায়—ও নেবে না কেন? শুধু তো পেটিগুলো চিনিয়ে দেওয়া—গুঁড়ো চা থেকে পাতা চা আলাদা করে দেওয়া—এটা এমন কি অপরাধ! আর নোকরি যখন খতম করে দিয়েছে ওর এটা করলে তেমন পাপ হবে না। অনেকটা হালকা হয়ে পকেটে সিগারেট আর টাকা রেখে দিয়ে ও সামনের দিকে হেঁটে গেল। কুল-কুল করে অল্প জলের স্রোত বইছে। নদীর ওপারে ঝুঁকে আসা একটা শালগাছের ডালে বুক চিতিয়ে বসে আছে একজোড়া ঘুঘু। চকিতে ঢোঙা পরিয়ে গুলতিটা টিপ করল বংশী। ডানহাতে রবারটা কানের কাছে টেনে এনে ফট করে ছেড়ে দিতেই ঝটপট শব্দ হল গাছটায়। বংশী চেয়ে দেখল মাদি ঘুঘুটা একপাক খেয়ে আংরাভাসার জলে গিয়ে পড়ল ধপাস করে। সাধ্যের বাইরে দ্রুত হেঁটে জলের মধ্যে নেমে পড়ল বংশী। যা স্রোত, দেড় ঠ্যাঙে হাঁটা মুশকিল। কোনওরকমে পাখিটাকে ধরে ফেলল ও। জলে ডানা ভিজে গেলেও বুকের কাছটা কী গরম, ধোঁয়া ওঠা ভাতের মতো।

ঘুঘুটাকে একটা পাথরের ওপর ছুড়ে ফেলে শুকনো জায়গায় বসল বংশী। চারধারে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। পাকা কাঁঠালের গন্ধ আসছে যেন। এই বনের ধারে কয়েকটা গাছ আছে কাঁঠাল, আমের। মানুষের ফেলা আঁটিতে গজিয়ে গেছে। পেটজুড়ে খিদেটা চনমনিয়ে গেছে। শালা বনে ফল আছে পাখি আছে—ঠিকই চলে যাবে। আর আজ রাত্রে ধরা পড়লে নির্ঘাত সদবে পাঠাবে। দারোয়ানটার মুখ মনে পড়ল বংশীর। রামজিকে গানা করে দারোয়ান। রামজি কে? কে জানে! না, এই চুরি ঠিক চুরি না। ফোকটে পঞ্চাশ টাকা পকেটে এসে যাবে। আর এসে গেলেই পঁচিশ সের চাউল কিনে রাখবে ও। একমাস নিশ্চিন্ত। না, তাতেই সব টাকা শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিশ সের চাউল আর দশ বোতল হাঁড়িয়া। ব্যস, আর কি চাই! মনের সুখে চোখ বন্ধ করে সরুপায়ে হাত বোলাতে লাগল বংশী।

খুঁটিমারী রেঞ্জের এই জঙ্গলটা চলে গেছে নাথুয়া ডিঙিয়ে ভুটানের পাহাড়ের তলায়। এদিকে জঙ্গলের ঘনত্ব কম। পায়ে-হাঁটা পথে ফালি-ফালি করে জঙ্গল ছিঁড়েছে। হাতি ছাড়া ভয়ের কিছু জানোয়ার এদিকে আসে না। আর হাতি এলে খবর ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের মুখে-মুখে। নিশ্চিন্তে বসে বংশী পাখির ডাক শুনছিল। আংরাভাসার জলের শব্দের সঙ্গে পাখির ডাকগুলো কেমন মিলে মিশে যায়। আজ রাত্রে যদি ও কাজটা করে তবে কাল একবার বিনাগুড়ি গেলে কেমন হয়। পেট হওয়া বউটাকে দেখে আসবে। বউটার সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাঁটি হয়নি কোনওদিন, অথচ না বলেকয়ে ফট করে কেমন চলে গেল। শুধু বউটাকে বাচ্চা দিতে পারল না বলে ভেগে গেল? কিন্তু ওর শরীর তো ঠিকঠাক কাজ করে। শরীরের মেশিনটায় ভগবান যদি জং ধরায় তাহলে ও কি করবে? গুলতিটা হাতে তুলে নিল বংশী। কি আশ্চর্য, আবার ওই শালগাছটার ডালে ঘুঘু এসে বসেছে। অন্য ঘুঘুরা কি একে খবরটা দেয়নি? গুলতিতে টিপ করে ঢোঙা ছাড়ল বংশী। তড়াক করে ঘুঘুটা চেষ্টা করেই বোঁটা খসা আমের মতো নিচের জলে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের আওয়াজ পেল ও। বুঝতে-না-বুঝতে একটা শরীর তিরের মতো ওর পাশ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনওরকমে জল হাতড়ে ঘুঘুটাকে ধরে ওর দিকে ফিরে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে হাসল। ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে বংশী। সিরিন বুড়োর বউ। ও এল কখন? 'কা দেখিস রে?' দু-হাতে ঘুঘুটাকে ধরে ওপরে উঠে এল সে। নিচের আংরাটা ভিজে গেছে একদম, ওপরের ব্লাউজে জলের ছাপ। জলে ভিজে বুক যেন আরও ফুলে উঠেছে।

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল বংশী। বউটা কাছে এসে আর একটা ঘুঘু দেখতে পেয়ে ঠোঁট ওলটাল, 'মোটে দুটা? হামারা চারটো চাহিয়ে।'

বংশী বলল, 'তুমারা বোখার হুয়া, পানিমে মৎ নামো।'

'কিঁউ?' চোখ তুলল বউটা, 'বোখার ঠান্ডা হো যাবেক!' তুম একদম বুদ্ধু, এতনা তুমারা ঘরমে হাম গিয়া তুম হামকো নেহি দেখা। মেরা নাম জানতা?'

ঘাড় নাড়ল বংশী। সিরিন বুড়োর বউ বলে কি!

'সে-রা'। টেনে-টেনে উচ্চারণ করল বউটা, 'সেরা মেরা নাম। প্যার করনা কাম।' বলেই কপট ঘাড় নাড়ল, 'সবকো সাথ নেহি।'

'তু ঘর যা।' বংশী বলল।

'কিঁউ।' ভ্রু তুলল সেরা 'তুমারা পসন্দ নেহি হোতা?'

উঠে দাঁড়াল বংশী। মেয়েটার মতলব খারাপ।

সেরা হাসল, 'ও বুড়া মরবেক। এতনা ডর উসকো, থুঃ, তুম মরদ নেহি!'

'এ্যাই!' বংশী ধমকে উঠল।

চোখে চোখ রেখে এগিয়ে এল সেরা। হাতের ঘুঘুটাকে ছুড়ে দিল অন্যটার পাশে। তারপর বুকের জামার সেফটিপিন টুক করে খুলে বংশীর হাত টেনে নিল সেখানে, 'দেখো হামকো, ক্যায়সা

মরদ তুম?' ঘুঘুর বুক কিংবা গরম ভাতের চেয়ে উষ্ণ দুটো তামাটে পাহাড় ছুঁয়ে দেখতে-দেখতে মাথা ঘুরে গেল বংশীর। মেয়েছেলের শরীর এত নরম হয়! ওর বউটার শরীরে এসব তো এমন করে ছিল না! কোমরে হাত রাখলে তো হাত এমন ডুবে যেত না! চুমু খাবার সময় জিভ দিয়ে টোকা মারলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সুখটা তো জানা ছিল না! শেষপর্যন্ত সমস্ত শরীর নিংড়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বংশী।

অনেক পরে সেরা নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে হাসল, 'তুহার বহুটা ঝুট কথা বলে। তুম বৃহৎ তেজী মরদ হ্যায়। লাও, একঠু সিগারেট পিলাও।'

চমকে উঠে বসল বংশী। হঠাৎ নেমে আসা শ্রান্তিটা চট করে চলে গেল। ওর কাছে সিগারেট আছে জানল কী করে সেরা! কিছু না বলে প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে চোখের দিকে তাকাল বংশী। নিপুণ হাতে দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা ওর দিকে বাড়িয়ে নিজেরটা টানতে লাগল সেরা। ওর জিভের রসে ভেজা সিগারেটে টান দিতে-দিতে বংশী শুনল, 'তুম হামকো শাদি করেগা?'

চমকে তাকাল বংশী, 'হাম?'

'হাঁ। আজ রাতমে চল চামুর্চি, নেহি, হাসিমারা। উঁহা তুমারা কাম মিল যায়গা।'

'সিরিন—!' বংশী বলল।

'ও বুড্ডা মর যায়গা আজকাল। হাম ইঁহা নেহি রহেগা।'

'কিঁউ।'

হাসল সেরা, 'মেরা পেটমে বাচ্চা আ গিয়া। দোসরা আদমিকে বাচ্চা। লাইনকা আদমিলোক হামকো মার ডালেগা।'

হাঁ হয়ে গেল বংশী। সেরার পেটে বাচ্চা আছে! তবু ওর সঙ্গে এমন মজা করল! নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে ফেঁসে গিয়েছে, আর এখন ওকে শাদি করতে বলছে বাঁচবার জন্যে? বংশী বলল, 'হাম নেহি যায়েগা।'

'কিঁউ, তুমকো সুখ নেহি দিয়া হাম?' আদুরে গলায় বলল সেরা।

'দুসরা আদমিকা বাচ্চা—' বলতে গিয়ে থেমে গেল বংশী। খিলখিল করে হাসল সেরা, 'তো কেয়া! আরে বুদ্ধু, জেনানালোক বাতানেসে তব তো মরদলোক সমঝতা বাচ্চা উসকো হ্যায়। সমঝ লেও ইয়ে তুমারা বাচ্চা, ব্যস! তুমারা বহুকো উপর বদলা লে লেও।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বংশী বউটার কথা ভাবল। সেরা যা বলছে তা করলে বউটা জব্দ হয়ে যাবে। কিন্তু সিরিন বুড়ো—

'আজ রাতকো কাম খতম করকে পুলকা পাস চলা আও। হাম সামান লেকে উঁহা খাড়া রহেগা।' উঠে দাঁড়াল সেরা।

'রাতকো কাম?' অবশ হয়ে গেল বংশী। রাতের কাজের কথা এ জানল কী করে? উঠে দাঁড়াল ও।

'পঞ্চাশ রুপিয়ামে রফা হুয়া না? হাম সব শুনা। আরে ডরতা কিঁউ, হাম কিসিকো নেহি বাতায়গা। তুম্ মেরা বাচ্চাকো বাপ হ্যায়।' বলে বংশীর চিবুক একহাতে নেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল লাইনের দিকে। খানিকটা গিয়ে আবার ও ঘুরে দাঁড়াল, 'ইয়াদ রাখনা, পুলকা পাস হাম খাড়া রহেগা দো বাজে মে।' তারপর রানীর মতো হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল আড়ালে। হঠাৎ বংশী টের পেল ওর ভালো পা-টা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে আর সরু পায়ে ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে উঠছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর। একটা হিম-ভয় বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে। সেরা নিশ্চয়ই ওর পেছনে-পেছনে এসেছিল। তারপর আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবুটার কথা সব শুনেছে। শালা! মেয়েছেলেটো সাক্ষী থেকে গেল ব্যাপারটার। ফাঁস করে দিলে আর রক্ষে থাকবে না। পা-দুটো যদি ভালো থাকত তবে থোড়াই কেয়ার করত বংশী। এখন ওর কথা না শুনলে। বংশীর কান্না পেয়ে গেল। কার

সঙ্গে মজা লুটে ফেঁসে গিয়ে ওর ওপর ভর করতে চাইছে সেরা। এমনিতে মেয়েছেলেটা এমন জিনিস কোনওদিন টের পায়নি ও, তা বলে অন্য একটা বাচ্চার বাবা সেজে ওকে চলতে হবে? এও তো শালা এক ধরনের চুরি। চামুর্চি কিংবা হাসিমারা যেখানেই থাক, এই চুরিটাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। বসে পড়ল বংশী। ঘুঘু দুটো নিয়ে যায়নি সেরা! কাঠ হয়ে পড়ে আছে সে দুটো। হঠাৎ ওর মনে হল সেরাকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে তো একদিন ভেগে পড়তে পারে। সব যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কে আর সেরাকে বিশ্বাস করবে? নিজের বউ-এর ওপর বদলা নেওয়া হল, চাকরি খতমের বদলা হল, আবার সেরাকেও টাইট দেওয়া হল। একটু খুশি-খুশি মন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের ব্যথাটা কমে গেল বংশীর। সামনের দিকে তাকাতে ও আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্যাপার কী! ঘুঘুগুলোর কি আজ মরতে ইচ্ছে করছে নাকি! না হলে শালগাছের সেই নিচু ডালটায় আবার একটা এসে বসেছে কেন? আর বসে অমন বুকই চিতায় কেন? গুলতিতে ঢোঙা পুরে টিপ করল বংশী।

চার-চারটে ঘুঘু কাঠের আগুনে ঝলসাচ্ছিল। গর্ত খুঁড়ে তিন ইটের উনুনের ওপর ছাল ছাড়ানো পাখিগুলোকে চেনা যাচ্ছিল না। লকলকে আগুনের তাতে সাবধানী হাতে ঝলসে নিচ্ছে সেরা। একটা পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। আগুনের রং লেগেছে মেয়েছেলেটার গালে। বুড়া সিরিন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর দুটো পা ভাঁজ করে হাঁটু ওপরে তোলা। মাথার কাছে বসে বংশী দেখছিল সেরাকে। বুড়োর ঠ্যাং দুটোর মাঝখান দিয়ে সেরাকে দেখছে ও। ঠ্যাং দুটোকে হঠাৎ গুলতির বাঁটের মতো মনে হল ওর। ও নিজে যেন ঢোঙা, এক্ষুনি সাঁই করে ছুটে যাবে সামনে ওই আগুনে গাল লাল হওয়া ঘুঘুটার দিকে। খুক-খুক করে হাসল বংশী। একটু-একটু নেশা হয়েছে। সেরা ঘুঘু চারটে পেয়ে লুকোনো বোতল বের করেছিল। নিজে খায়নি এক ফোঁটা। বুড়ো তো আধ বোতল খেয়ে চিৎ হয়ে গেছে। শালী ভাগবার জন্য বুড়োকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সন্ধে থেকে। চোখে রং লাগছে বংশীর। মাথা নেড়ে নিজেকে ঠিক করল ও। মাথা সাফ রাখতে হবে। রাতের কাজটা গোলমাল না হয়।

আজ সন্ধেবেলায় সব মুশকিল হয়ে গেল। জঙ্গল থেকে আসবার সময় লাইনের লোকজন যারা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে দেখা। সবাই ওকে দেখে হই-হই করে উঠল। অবাক বংশী শুনল ইউনিয়ন থেকে গিয়েছিল বড়সাহেবের কাছে। এক কথায় বড়সাহেব নাকি বংশীকে চাকরি ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তবে গুদামে নয়, হাসপাতালের কাজে। কাল সকালে যেন বংশী ডাকদারবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কী করবে বুঝতে পারছিল না বংশী। দেড় ঠ্যাঙে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল। চাকরি আছে তার, এই বাগান এই কুলি লাইন ওই পাতির গন্ধ, যা সে ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসছে সেখানেই সে রাজার মতো থাকতে পারবে। আঃ! তারপর একটু একলা হয়ে চারটে ঘুঘু ঝুলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সবটুকু আনন্দধারায় মনটা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল ভুস করে। আজ রাত্রে পেটি-পেটি চা চুরি করে ওকে সেরার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে। ইস, যদি কয়েক ঘণ্টা আগে খবরটা সে জানত! বাবুটা বলে গেছে বেইমানি করলে লাশ ফেলে দেবে। কী করবে ও?

নেশার চোখে সবকিছু সুন্দর লাগে। গুলতির বাঁটের মধ্যে দিয়ে ও সেরাকে দেখল। কি নির্লিপ্তের মতো নুন-মরিচ ছড়াচ্ছে মাংসের ওপর। এখন গন্ধটা বেরুচ্ছে দারুণ। এই সেরা আর জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে থাকা সেরার মধ্যে কোনও মিল নেই—এইরকম যখন ভাবতে শুরু করেছিল ও, ঠিক তখনই একটা কলাইকরা থালার ওপর মাংসগুলো রেখে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সেরা। ওর চাকরি ফিরে পাবার কথা শুনেছে সেরা। বংশী সিরিন বুড়োকে খবরটা দেবার সময় ওকে শুনিয়েছিল। বুড়ো খুশি হয়েছিল। কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সেরা।

রান্না হয়ে গেলে দু-হাতে বুড়োকে ঝাঁকাল সেরা, 'ওঠ্ ওঠ্ এ বুড়া, ওঠ্।' অনেক ঝাঁকুনির পর সিরিন চোখ খুলে ঢুলতে লাগল। উঠে বসে। মাংসের থালাটা সামনে ধরতে দু-একবার মুখ থুবড়ে তার মধ্যে পড়ে যেতে সেরা এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে বুড়োর মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। বুড়ো কয়েকবার সেটাকে চিবোতে চেষ্টা করল। মাড়িতে জোর পাচ্ছে না, স্-স্ করে রস টানছে, কপালের রগগুলো তির-তির করে কাঁপছে, চোয়াল নড়ছে না ইচ্ছেমতো। শেষপর্যন্ত প্রায় আস্ত মাংসটা মাটিতে থু-থু করে ফেলে দিয়ে নেশার ঘোরে কাঁদতে লাগল বুড়ো। তারপরই বংশী একটা আজব ব্যাপার দেখল। সেরা আর একটা মাংস ছিঁড়ে নিজের মুখে পুরে সেটাকে চিবিয়ে-চিবিয়ে কাদা করে আবার মুখ থেকে বের করে সেই কাদাটা বুড়োর মুখে গুঁজে দিল। চিবোতে হল না বুড়োকে, জিভ দিয়ে সেটাকে নেড়েচেড়ে কপাৎ করে গিলে ফেলল বুড়ো। আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়ল একটা হাত বালিশ করে। মাংস খাওয়া হয়ে গেল বুড়োর।

মাংসের থালিটা সামনে রেখে সেরা বংশীর কাছে এসে বসল। দূরে সেই বটগাছটার তলায় কারা মাদল বাজাচ্ছে—ডিম ডিমা, ডিম, ডিম ডিম—তালটা এ ঘরে সোজা যেন চলে আসছে। 'খালে মাংস!' সেরা বলল।

বোতল শেষ হয়ে গিয়েছিল বংশীর। মাংস খাওয়ার সময় ওরা কোনও কথা বলল না। শব্দ করে পাখির নরম হাড় চুষছিল সেরা। খাওয়ার সময় মেয়েদের চেহারায় কোনও গরমি থাকে না। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে পা ছড়িয়ে বসল বংশী। ক'টা বাজে? একটার সময় গিয়ে দাঁড়াতে হবে লোকটার জন্যে। ও দেখল থালা সরিয়ে সেরা আর একটা বোতল বার করছে। বাঃ, মেয়েটার কাছে তো বেশ লুকোনো মাল থাকে! সেরা বলল, 'লে মৌজ কর।'

ঘাড় নাড়ল বংশী, 'না। নেশা হো যাবেক।'

'হোনে দে।' সেরা সামনে এসে বসল আবার। বলে কি মেয়েটা? গুদামে অত বড় কাজ আছে, তারপর হেঁটে আজ রাত্রে চলে যেতে হবে হাসিমারার দিকে, নেশা করলে চলবে কী করে? ওর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেই সেরা হাসল, 'তুম আদমিটু সাচ্চা হ্যায়। শুন, আজ রাতমে নেহি যানে পড়েগা তুমকো।'

'কিঁউ।' থ হয়ে গেল বংশী।

'পহেলে দেখি তুম ক্যায়সা মরদ হো। দো মাস বাদ হামলোগ যা শেকতা—বাকি ইসকা অন্দর তুমারা বাচ্চা হামারা ইঁহা আয়ে তো!' বলে নিজের পেট দেখিয়ে হাসল সেরা।

হাসপাতালে থাকতেও শরীর এত অবশ হয়নি বংশীর। হাঁ হয়ে ব্যাপারটা শুনল ও। সেরা তখন স্রেফ মজাকি করেছে। ওর পেটে বাচ্চাটাচ্চা আসেনি। আজ অবধি কখনওই আসেনি। আগের স্বামী আর এইটে—দুটোই ক্ষমতা হারাবার পর বিয়ে করেছে। বংশীর ওপর ওর নজর ছিল। বংশীকে যাচাই করবার জন্য ও মিথ্যে বানিয়ে বলেছে। বলে দেখেছে বংশী সাচ্চা আদমি। এখন বংশীকে দুইমাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর মধ্যে বাচ্চা আসে তবে দুই নম্বর থালি চাঁদের দিন ওরা পালিয়ে যাবে।

ফট্ করে যেন আর একটা গিঁট খুলে গেল বংশীর। কিন্তু মুক্তির আনন্দের চেয়ে অন্য একটা সুখের লোভ ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে ফেলল সহসা। আঃ! একটা হাতে সেরার হাত ধরে বসে থাকল বংশী। সিরিন বুড়োর নাক ডাকছে সমানে।

হঠাৎ সেরা বলল, 'তুম আজ গুদামমে মৎ যাও।'

এখন সত্যি আর যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। এতগুলো সুখের খবর একসঙ্গে পেয়ে আর ভালো লাগছে না বিপদের মধ্যে পা বাড়াতে। বংশী বলল, 'উ শালা মার ডালেগা।'

কী ভাবল সেরা। তারপর বলল, 'লে দম ভর পি লে হাঁড়িয়া। উসকা বাদ যা। মাতোয়ালা আদমিসে উনলোক কাম নেহি করায়গা।'

*

দমভর খেয়ে যখন বংশী বাইরে বেরুল তখন ওর পায়ের ব্যথাটা কখন হাওয়া হয়ে গেছে। খোলা জায়গায় আসতেই ওর হঠাৎ মনে হল ঘর-বাড়ি-আকাশ কেমন উলটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে সেগুলোকে ঠিক করল ও। ডিম ডিমা ডিম মাদল বাজছে। চোখে কেমন ঝাপসা লাগছে সব। চোখ তুলে ও সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। খুঁটিমারীর জঙ্গলটা যেন ক্যালেন্ডারে দেখা শিব ঠাকুরের মতো বসে আছে মাথায় একটা চাঁদ ঝুলিয়ে। আহা কী রূপ! দু-হাত জড়ো করে প্রণাম করার চেষ্টা করল বংশী। চোঁয়া জ্যোৎস্নায় চারধারে হালকা সাদা ছড়াচ্ছে। টলতে-টলতে বংশী মোড়ের দিকে এগোল। তামাম কুলি লাইন নিস্তব্ধ। শুধু মাদলটা বাজছে—ধেউসির তো বৃহৎ দেরি।

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বংশী আর দাঁড়াতে পারল না। সবে হিম পড়া ঘাসে বসে পড়ে আশেপাশে তাকাল। জঙ্গল থেকে দলে-দলে জোনাকি এসে ছড়িয়ে পড়ছে মাঠে। ফিনিক-ফিনিক টিপ পরাচ্ছে অন্ধকারের গায়ে। ক'টা বাজে এখন? এখন সব ঠিকঠাক, চাকরি হল, সেরার মতো মেয়েছেলে ওর বাচ্চা পেটে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, আর ওকে এখন চুরি করতে যেতে হবে। কান্নাটা হঠাৎই এসে গেল ওর।

অনেকক্ষণ পর সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পেয়ে তাকাল বংশী। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে কেউ সাইকেলে চেপে আসছে। ঠিক ওর সামনে এসে ওর মুখে আলো ফেলল লোকটা। তারপরই আচমকা পেটে একটা লাথি খেল বংশী। 'ই শালা কুত্তাকা বাচ্চা—ফিন নোকরি মিলা তুমারা, আঁ?' সেই মদেশিয়াটা।

হু-হু করে কেঁদে ফেলল বংশী, 'মু না জানলেক কুছ, সাচ্, কিরায়া।'

লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, 'লে দশ রূপায়া ঘুমাকে দে।'

পকেট থেকে টাকাটা বের করে বংশী ওর দিকে তাকাল, 'কাম?'

ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে লোকটা আবার সাইকেলে চাপল, 'শালা দারোয়ান ফাঁসায় দেলেক। বেইমান! জানসে খতম হোগা ও।' বলে পাঁই-পাঁই করে চলে গেল সাইকেলটা।

পাঁজরে অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু মনে লক্ষ-লক্ষ চাঁদ ফুটে উঠল বংশীর। আঃ বেঁচে গেছে—ও বেঁচে গেছে। প্রচণ্ড একটা ভয়ের সাপ এতক্ষণ যেন জড়িয়ে রেখেছিল ওকে, হঠাৎ স্নান করে ওঠার মতো হালকা হয়ে গেছে যেন। আনন্দে ডিগবাজি খেতে গিয়ে টলে পড়ল বংশী। শালা মাতোয়ালা হো গিয়া।

লাফাতে-লাফাতে হাঁটছিল বংশী। চাঁদ আর জোনাকিগুলো যেন মিছিল করে ওর সঙ্গে আসছে। আর দুমাস—ব্যস! তারপর রাজা হো যায়গা। থালিচাঁদকো রাত আ যাও পেয়ারে।

হাঁটতে-হাঁটতে কখন ও পুলের ওপর এসে পড়েছে বুঝতে পারেনি। এখানেই দু-মাস পর সেরা আসবে।

হঠাৎ আর একটা চিন্তা মাথায় এল ওর। যদি নিজের বউটার মতো সেরার পেটেও ওর বাচ্চা না আসে? যদি ওর শরীরের ভিতর বাচ্চা আনার যন্ত্রটা খারাপ থাকে? নিজের বউটার তো বাচ্চা হবে এখন। প্রচণ্ড একটা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল বংশী। তাহলে তো সেরা আসবে না। বরং ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যালনা হাসি হাসবে। সারাজীবন এখানে চোরের মতো থাকতে হবে। পুলের বাঁশটা দু-হাতে ধরে ওপরদিকে তাকাল ও। হঠাৎ পায়ের যন্ত্রণাটা ফিরে এল বংশীর। নেশাটা কেটে যাচ্ছে। ওপরদিকে তাকিয়ে চাঁদটাকে দেখতে-দেখতে হাঁ করল ও। আয় চাঁদ—মেরা অন্তরমে আ যা। গলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নাকে গিলতে চেষ্টা করছিল বংশী। একটু-একটু করে সমস্ত চাঁদকে সারা শরীরে পুরে নিয়ে ওর মনে হল ও নিজেই থালি চাঁদ হয়ে গিয়েছে। শরীরটা হয়ে উঠেছে ফুলের মতো। কী আরাম—আঃ! কিন্তু থালি চাঁদ হয়ে গেলেই তো বিপদ, আস্তে-আস্তে আবার

ক্ষয়ে যেতে হয়—পনেরোদিন পর একদম শেষ। তখন শুধু অন্ধকার। তখন শুধু কোনওরকমে জিইয়ে রাখা নিজেকে।

দ্রুত পা চালাল বংশী। নিজের কাছে চাঁদটাকে রাখা বড় বিপদ, বরং সেরার কাছে জমা করে দিলেই ভালো। রোজ-রোজ যদি জমা করে দেয় তাহলে হারাবার ভয় থাকে না। দু-মাসটাও যে একদিন করে বেড়ে-বেড়ে যায়। চাঁদটাকে উগরে দেওয়ার জন্য ঢোঙার মতো ছুটতে লাগল বংশী।



আশ্চর্য প্রদীপ

ঠা-ঠা রোদ্দুরে ছেলেটা হাঁটছিল। শামবাটির খাল পেরিয়ে রাস্তাটা দু-দিকে চিরে গেছে। লাল ধুলো এখন উড়ছে না, এইসময় বাতাস বড় দুর্বল থাকে। তেলে গন্ধ-ওঠা গামছাটা মাথা থেকে খুলে ও শরীরের ঘাম মুছল। এটা ও কখনই করতে চায় না, কারণ শরীরের ঘাম কাপড়ে মুছলে সেটা কালো হবেই আর ঘামে শরীরের রং থাকে। বাবুদের বেলায় ঠিক উলটোটা হয়। ওর এক-এক সময় ইচ্ছে করে এই গামছায় কোনও বাবু তার গায়ের ঘাম মুছুক, এটা খানিক ফরসা হোক। কিন্তু যা গন্ধ, বাবুরা নেবে কেন? মা বলে বাবুদের গায়ে নাকি ফুলের সুবাস থাকে, বোতলে বিক্রি হয়।

এক হাতে টিনের ক্যানটা নিয়ে অন্য হাতে কপাল ঘষতে-ঘষতে সে মোড়টায় এসে দাঁড়াল। কোন দিকে ওরা? আজ সকালে মা-কে বাপ বলেছিল যে ট্যুরিস্ট লজে শুটিং পার্টি এসেছে, জোর পান বিক্রি হচ্ছে। তারা নাকি এদিকটায় মাঠঘাটে শুটিং করে বেড়াচ্ছে। এর আগে একবার পৌষালির সামনে শুটিং দেখেছিল সে মায়ের সঙ্গে। ফরসা-ফরসা বাবুরা মেয়েদের সঙ্গে কেমন কথা বলছিল আর সেসব কথা ক্যামেরা দিয়ে লোকজন ছবি করে নিচ্ছিল। মা বলে, সেগুলোন নাকি সিনেমা হলে বই হয়ে আসবে। মা-র সিনেমা দেখার বড় শখ, বাপ পয়সা দিতে চায় না। বলে মেয়েছেলের হাতে পয়সা দিলেই সংসারে সব্বোনাশ হয়। মা বলে, তার বাকিটা কি থাকল—কোনওরকমে দু-বেলা ভাত গেলা ছাড়া এ সংসারে আর নতুন কিছু হল না। বাপ বলে, তাই পায় ক'জন! এই যে আমি ঘরে বসে ফুর্তি করি তা কি নিজের পয়সায়? তালতোড়ের গগনখুড়ো দেয় বলেই তো খাই! খেয়ে ঘরে থাকি! মা বলে, ছেলে পাশ দিয়ে দুই কেলাসে উঠল—তার বইটই কেনো অন্তত। বাপ বলে, কত বড় মানুষ কিনতে পারছে না আমি তো ছার। ছাপা নেই বই—ছাপা হয় যেখানে সেখানে হরতাল। তা তোমার ছেলে একা নাকি—দুনিয়াসুদ্ধু পড়াশুনা হবে না এখন।

তাই ও বালাই নেই। পড়তে ভালোও লাগে না তার। তার চেয়ে শামবাটির পুকুরে মাছ ধরা ভালো কিংবা ডিয়ার পার্কে ঘুরে বেড়ানো। এখন তাই মোড়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি উঁচু করে ও দু-পাশে তাকাল। শুটিং পার্টি গেল কোথায়! তারা মানেই তো ভিড় আর একটা গাড়ি। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না তো। বাপটা সত্যি বলল তো? ডানদিকে প্রান্তিকের রাস্তাটা ধরলেই হয়, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় জমি বেশ উঁচু, আশেপাশের অনেকটা তল্লাট দেখা যায়। চোখ আড়াল করে সূর্যটা দেখল ও। তিনটের পর গগনখুড়ো আর ভাঁটিতে থাকে না। তখন যাওয়া মানে শূন্য হাতে ফিরে আসা। ক্যান খালি মানে বাপ বাখারি ভাঙবে তার পিঠে—আর কী কী হবে ভাবতে

গিয়ে শিউরে উঠে ও সোজা বাঁদিকের রাস্তাটা ধরল। মদ না খেলে বাপটা মাইরি দুঃশাসন হয়ে যায়। যাত্রায় দেখেছে সে, বোলপুরের গণেশ মুদি খুব ভালো দুঃশাসন সাজে, ইয়া বড় গোঁফ। বাপটার অবশ্য গোঁফ নেই, এই যা।

গোয়ালপাড়ার পথটা ধরে এগিয়ে চলল সে। খালি গা, দড়ি দিয়ে হাফপ্যান্ট বাঁধা, হাতে টিনের ক্যান। লাল ধুলো পথ ছেড়ে হাঁটু অবধি রাঙিয়ে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে ইটখোলায় লরি যায় এ পথ দিয়ে। তখন বাতাস দেখে পালাও, পালাও। লাল মেঘ হাত-পা নেড়ে তেড়ে আসে যেন। ডানদিকে ধেনো জমির ফাটল দিয়ে গরম নিশ্বাস উঠছে। মা-লক্ষ্মী পাতালে বন্দি হয়ে কাঁদছেন এখন। শুখনো মাটি শুধু ফাটছে আর ফাটছে। ভুলেও কেউ জমি মাড়ায় না এখন, একটা দেশলাই কম করে জ্বেলে দাও আর সঙ্গে-সঙ্গে খরগোশের মতো আগুনটা চারধারে শুখনো ঘাস বেয়ে দৌড় মারবে। বাঁ দিকে বাবলাগাছ আর বাঁজা তালের সরু ছায়া। ছেলেটা রোদে পুড়তে-পুড়তে হাঁটছিল। পুজোর সময় বাপের মেজাজ ছিল রুক্ষ। শালা ভাটিখানা ভেসে গিয়েছিল জলে। কোপাইটার কি গর্জন তখন। ওরা সব শামবাটির মুখটায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে দেখেছিল। এই গোয়ালপাড়া, তালতোড়, প্রান্তিক, ওই সর্পলেহনা—সব জলের তলায়। হুস-হুস করে জল উঠছে—এইসব ধুলোগুলোন তখন কোথায় হাওয়া। জলের কথায় সে রাস্তার ধারে সরে এল। তারপর একহাতে প্যান্ট সরিয়ে জলত্যাগ শুরু করল। যাঃ বাবা, এখন মাটির খাই দ্যাখ, হাঘরের মতো সব শুষে নিচ্ছে—একটুও কাদা হতে দিচ্ছে না। শেষ হয়ে গেলে সেখানটায় একটা ভেজা দাগ রয়ে গেল। সে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়াতেই দূরে ধুলোর ঝড় দেখতে পেল।

পথ থেকে নেমে দাঁড়াতে হ্যাট-হ্যাট করে গরুর গাড়িটা সামনে এসে পড়ল। খালি গাড়ি যাচ্ছে বোলপুরে। গাড়োয়ানকে মুখে চেনে, চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'শুটিং পার্টি কোথায়?' গাড়োয়ান রা কাড়ল না, হাতের লাঠি মাঠের দিকে উঁচিয়ে ধরল। ছেলেটা সেদিক লক্ষ করে দেখল বুনো গাছ আর তালতোড় গ্রামের ঘরবাড়ির চাল ধানখেত শেষ হলে উঁকি মারছে। তাহলে কি শুটিংটা তালতোড়ে হচ্ছে? দ্রুত পা চালাল সে গোয়ালপাড়ার পথে।

জলে এই গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। যেসব দেওয়াল সামান্য পলকা আর বয়সে পুরোনো সেগুলো ধুয়ে গিয়েছে। ঘর উঠেছে নতুন। এখন শধু গাছের ডাল দেখলে বোঝা যায় জল কীরকম ছিল। শুকনো চালের খড়গুলো গাছের ডালে লটকে দোল খাচ্ছে। ছেলেটা গ্রামে ঢুকল। একটা লাথি মার ব্যস সব শরীর লাল—এইসান ধুলো। সামনের চায়ের দোকান এখন বন্ধ। বাঁদিকে একটা দাওয়ায় বসে হরি হাজাম গাল কামাচ্ছে একজনের। বাড়িঘরের মধ্যে দিয়ে ও ডান পাশে ঘুরল। এক দাওয়ায় তালপাতার ওপর বুঁদে, তেলেভাজা আর শুকনো লেডিকেনি বিকোচ্ছে একটা বুড়ো। ছেলেট' বাঁ পকেটে হাত দিল, পাঁচটা পয়সা মায়ের কাছ থেকে এনেছে সে। এখন খাবে কি খাবে না দোটানায় পড়ল সে। তিনটে মোটকা মাছি এসে বুঁদেগুলো চেটে খেল একবার। বুড়ো হাত নাড়তেই লেডিকেনিতে বসল। ইস্, যদি মাছি হওয়া যেত—ছেলেটা জুলজুল করে সেদিকে চাইতেই বুড়ো খনখনিয়ে বলে উঠল, 'ট্যাকে দশটা পয়সা আছে?' ঘাড় নাড়ল সে, না। 'যা ভাগ্, মাল নেগে যা।' বুড়ো ভাগিয়ে দিল হাত নেড়ে। দশ পয়সা, দশ পয়সা আনতে হবে—তা সেটা পেলে এখানে আসবে কেন? বোলপুর বাজারে কত কী পাওয়া যায়। একবার মুখ ভেংচে সে হাঁটা দিল।

গ্রামের যেখানে প্রায় শেষ সেখানেই ভাটিখানা। একটা ড্রামের তলায় গনগনে উনুন জ্বলছে সবসময়। দূর থেকেই গন্ধে মালুম হয়। প্রথম-প্রথম বমি আসত ওর, এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে, মা-র হয়নি। ওই একটা জায়গায় বাবা হার মানে। মদ খেলে বাপ ঘরে ঢুকতে পায় না। দাওয়ায় খাটিয়া পেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। মা বলে মদের গন্ধ নাকি পেটের নাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। ওর অতটা মনে হয় না তবে ঝাঁঝ লাগে বড়। উনুনের পাশেই চালাঘর। চালচুলো নেই লোকগুলো ভাঁড় নিয়ে মুখোমুখি বসে গিলছে তার তলায়। ওপাশে সিমেন্টের দাওয়া, তাতে ভদ্রলোক বসে।

একপাশে তেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে জোর। ওকে দেখে দাওয়া থেকে চিৎকারটা ভেসে এল, 'এই যে রামচন্দ্র, বড্ড দেরি করে ফেললে আজ।' গগনখুড়ো ডাকছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন ঠা-ঠা করে হেসে উঠল, 'যা কয়েছেন। দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। সত্য-সত্য-সত্য।' তার গলা শুনে ছেলেটা বুঝল এর নেশা হয়েছে। গগনখুড়োকে আজ অবধি নেশা করতে দ্যাখেনি সে। চুপচাপ বসে থাকেন আর লোকে টাকা চাইলে কাগজে সই নিয়ে দুই টাকা দিয়ে দেন। ওকে দেখলেই তিনি রামচন্দ্র বলে ডাকবেন। তার নাম মোটেই রাম নয়। কিন্তু ডাকটা শুনতে খারাপ লাগে না ওর।

'দাও হে জগু, চার ভাঁড় ঢেলে দাও রামচন্দ্রের কমন্ডুলুতে। গগনখুড়ো বলতেই জগুশুঁড়ি ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। মোদো মাতালদের পাশ কাটিয়ে সে তার কাছে এগিয়ে যেতে একটা মাতাল চালাঘরে পা ছড়িয়ে বসে বলে উঠল, 'একিরে বাবা, দুধের ছেলেও মাল খায়! কলিকালে কী যে হল!'

জগুশুঁড়ি ধমক দিল, 'এ্যাই চোপ!'

চার ভাঁড় দিয়ে ক্যানের মুখটা বন্ধ করে দিতেই গগনখুড়ো ওকে ডাকল। ক্যানটা এখন ভারী হয়েছে বেশ। ও পায়ে-পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে গগনখুড়ো তার সরু কাঠি-কাঠি আঙুল দিয়ে ওর গালটা টিপে দিল। রোজই দেয়—বিশ্রী লাগে তখন। টিপে-টিপে গগনখুড়ো বলল, 'দশরথকে বলবি, আজকের মালটা ভালো ছিল না। আমার সঙ্গে ফোরটুয়েন্টি করলে কি আর লাভ হবে! আমি তো আর মালে জল দিই না, কি বল জগু? তোর হল জলের নেশা আমার শুকনো নেশা। শহর থেকে আমদানি হয় বলেই তোকে খাতির করি। বলবি কিন্তু—আমি কাল দেখা করব।'

ও ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে চলে আসছিল, এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'ও খুড়ো, হিরোইনকে কেমন দেখলে? শুটিং হচ্ছে শুনলাম তোমার গাঁয়ে!'

'হিরোইন!' গগনখুড়ো নাক ঝাড়লেন, 'একটা পাঁচিদাসীকে জুটিয়ে এনেছে—ও আবার হিরোইন নাকি! বুক পিঠ সব এক। হ্যাঁ সে ছিল কাননবালা—লীলা দেশাই, রাতে ঘুম আসত না।'

তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। তালতোড়ে শুটিং হচ্ছে তাহলে! এখন কোন পথে যায় সে? সেই শামবাটি হয়ে ঘুরে যেতে অনেকটা পথ। তার চেয়ে ডানদিকের কোপাই পেরিয়ে মাঠ ভেঙে ইটখোলার পাশ দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে না। ও আর দেরি করল না।

কোপাই তখন শুকিয়ে মনে গুটিয়ে গিয়েছে। খানিকটা চড়া ফেলে একপাশে হাঁটুর তলায় জল নিয়ে কুলকুল করে বইছে। কে চিনবে পুজোর সময়কার নদীটাকে। জলে নামল সে। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা—শরীর জুড়োয়। মজা করতে ও ক্যানের তলাটা জলের ওপর রাখতেই সেটাকে স্রোত সামান্য টানল। চট করে তুলে ধরল সে। বাপের মুখটা মনে পড়ল।

ভালো করে পা-হাত ধুয়ে এপারে উঠল ছেলেটা। আল ধরে হাঁটা ঠিক নয় এখন। তেনারা সব গরম সহ্য করতে না পেরে আলের পাশে ঘাসের নিচে শরীর লুকোন। একটু শব্দ পেলেই অন্ধের মতো ছোবল ছুড়বেন রাগে। রাগটা যার ওপরই হোক ছোবল খেলেই শুয়ে পড়তে হবে। বরং শুকনো মাঠ দেখে হাঁটা ভালো। একটা মরা গাছের ডাল ভেঙে নিল সে। তারপর একহাতে ক্যান ধরে ডালটাকে মাটিতে হাঁকড়াতে-হাঁকড়াতে চলল সে তালতোড়ের দিকে।

অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে সে উঁচু ডাঙাটায় উঠে এল। ওই তো তালতোড় গ্রাম। সামনে একগাদা বাবলা গাছের জঙ্গল, সেটা পেরোলেই হল। এই বিকেলের রোদ্দুরে কেউ বের হয়নি মাঠে। শুটিং পার্টির বাবুদের রোদ লাগে না? অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল সে, হঠাৎ ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে চমকে গেল পা-দুটো। সামনেই একটা বাবলা গাছের তলায় তিনি। তিনি নয়, ঠাওর করে বুঝল তেনারা। দুটিতে জড়িয়ে-জড়িয়ে এক হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কী শব্দ, বাস। যেন রাগে এ ওকে খায়। কিন্তু খাচ্ছে না তো। চট করে তার মনে পড়ল সাপে যখন লীলা করে তখন এরকমটাই

হয়। সে দৃশ্য নাকি পৃথিবী আর ভগবান দেখে। মানুষের পাপ চোখে নাকি এসব পড়ে না। তবে যদি কেউ সত্যি-সত্যি দেখে ফেলে তবে একটা নতুন কাপড় পেতে দিতে হয় তেনাদের জন্য। সেই কাপড়ে যদি তেনারা একবার গড়াগড়ি খান তাহলেই হয়ে গেল। যার কাপড় সে রাজা হয়ে যাবে। মাকে এ গল্প করেছে তার ঠাকমা। ঠাকমার বাপ নাকি বড় ওঝা ছিল। কিন্তু এখন নতুন কাপড় পাবে কোথায়? সে অসহায়ভাবে চারপাশে তাকাল। এখন দৌড়ে তালতোড়ে গিয়ে কারও কাছ থেকে চেয়ে এনে যদি দ্যাখে এনারা নেই, তবে? আর দৌড়োতে গেলে পেছন তাড়া করতে পারেন বিরক্ত হয়ে। কীকরবে সে? একহাত দিয়ে মাথা চুলকোতে গিয়ে আঙুলে গামছা ঠেকল। সঙ্গে-সঙ্গে গামছা খুলে নিল ও। কাপড় বলতে আছে প্যান্ট আর এই গামছা। দুটোই ময়লা কালো। প্যান্টটা বাসি আর গামছা সকালে জলকাচা হয়েছিল। এটাই পেতে দিই তেনাদের জন্য—কিছু তো উপকার হবে। তুলসীজল ছিটিয়ে দিতে বলবে না-হয় মা-কে। ক্যানটা মাটিতে সন্তর্পণে রেখে সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সাপ দুটো নিথর হয়ে গেল। বুকের মধ্যে চুকচুক করছে, পা ভারী, কোনওরকমে ওদের পাশে গামছা বিছিয়ে সে পায়ে-পায়ে সরে এল ক্যানের কাছে। সাপদুটো চুপচাপ ওকে দেখছে, ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। দূরে সরে এসে বুক হালকা করে ও বাতাস ছাড়ল। রাগ কোরো না মা মনসা, আমার মনে কোনও অন্যায় নাই—বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল সে। কাজ হল যেন, সাপদুটো আবার নড়ছে। ল্যাজদুটো পরস্পরকে আঘাত করে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে এখন। আর একটু হেল—আর একটু হেল—যাঃ, সরে গেল। গামছাটার কাছ ঘেঁষে এসেও সরে গেল সাপদুটো। ও মা মনসা, রাজা করে দাও গো, ও মা মনসা। চোখ বন্ধ করে সে মনসাকে ডাকতে লাগল। এক মিনিট পার করে দিয়ে সে চোখ খুলতেই স্থির হয়ে গেল। তেনারা একদম গামছার মধ্যিখানে এসে গেছেন। মা মনসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলল।

তারপর একসময় তেনাদের লীলা শেষ হয়ে যেতেই তেনারা দৌড়ে যে-যার থানে চলে গেলেন। চুপচাপ চারধার, শুধু একটা ঘুঘু কোথাও ডাকছে। সে রোমাঞ্চিত শরীর টেনে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে গামছাটা তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। আঃ, সে রাজা হয়ে যাবে এবার। রাজা না হোক, নতুন কাপড় নয় যখন তখন গগনখুড়োর মতো টাকা হবে নিশ্চয়ই। এটাকে এখন কোথায় রাখে! মাথায় রাখলে তো ঘাম লাগবে। তার চেয়ে শক্ত করে কোমরেই বাঁধা যাক। নিশ্চিন্তে ক্যানটা নিয়ে সে তালতোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। পায়ের তলায় এখন যেন গরম গালচে বিছানো।

তালতোড়ের মুখটাতেই শ'লোকের ভিড়। সেই যেখানে বাইশটা তালগাছ গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে ছায়া ফেলে রেখেছে জমিতে সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেশ জোরে-জোরে পা ফেলে সে রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল। গাঁয়ের লোক একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার মধ্যে এবং ওপাশে কয়েকটা প্যান্ট-পরা লোক মাথায় টোকা চাপিয়ে হাত-পা নেড়ে কীসব বলাবলি করছে। ওদের পেছনে কালো কাপড়ে মোড়া একটা যন্ত্র, তার পেছনে একটা মানুষ মাথা মুড়ে এক-একবার কী দেখছে আর বেরিয়ে আসছে।

বড়-বড় চোখ মেলে সে রাস্তাটা পেরিয়ে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন কাট-কাট বলে চিৎকারটা উঠল। 'আঃ, যতীন, তোমায় বললাম রাস্তাটা গার্ড দাও, দিলে নষ্ট করে!' সে অবাক হয়ে দেখলে কালো কাপড় থেকে মুখ বের করে একজন চেঁচামেচি করতে লাগল।

সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই একজন এসে তার হাত ধরল ছুটে, 'এ্যাই ছোঁড়া, সরে যা সরে যা। খবরদার রাস্তা ক্রশ করবি না।'

ঠিক সেই সময় ও একটা মোটা গলা শুনল, 'যতীন, ওকে নিয়ে এসো তো এখানে।' কথাটা শেষ হতেই লোকটা ওর হাত ধরে টানতে-টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল।

সেখানে যিনি একহাতে খাতা আর মাথায় টোকা পরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ভালো করে ওকে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বললেন, 'গুড, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সুনীলবাবু

যখন গরুর গাড়িতে করে গ্রামে ঢুকলেন তখন এ, ধরা যাক গ্রামের ছেলে, গরুর গাড়ির পেছনটা ধরে দৌড়ে আসতে থাকবে। একদম ন্যাচারাল হবে, কি বলো?'

সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে দারুণ-দারুণ বলতে লাগল। হাতে-খাতা ভদ্রলোক ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। 'এ্যাই, তোর নাম কী?'

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ—।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে তিনি হো-হো করে খানিকটা হেসে নিলেন, 'আরে বাস, শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে আর্টিস্ট হিসেবে পেয়ে গেলাম, বুঝলে হে! এইসব চাইল্ড ট্যালেন্টকে ট্রেইন্ড করাই হচ্ছে অ্যাকচুয়েল এফিসিয়েন্সি। কোন ক্লাশে পড়িস? পড়িস তো?'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তার, কোনওরকমে বলল, 'টু।'

'হুঁ। অ্যাকটিং করবি সিনেমায়? তোর বাড়ি কোথায়?'

'সেন্ট্রাল অফিসের কাছে।'

'দৌড়োতে পারবি?'

সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সে। এটুকু ও বুঝতে পারছিল, সিনেমার যে ছবি এখন ইনারা তুলবেন সেখানে তার ছবি থাকবে। তাকে দৌড়োতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে সে খালিহাতে গামছাটা চেপে ধরল। আঃ মা গো, তুমি যদি দেখতে! ততক্ষণে কোথা থেকে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়েছে সামনে। তাতে একজন সুন্দর চেহারার পুরুষ বসে আছেন। গাড়োয়ানকে বলা হল গাড়িটা জোরে চালাতে আর তাকে ওরা বলল, গাড়ির পেছনটা ধরে সেই তালে ছুটতে। এটা তো একটা মজার খেলা, ওরা কত করে আর তখন গাড়োয়ানরা কি চেঁচায়! একহাতে ক্যানটা নিয়ে সে গাড়ির পেছনটা ধরতেই কয়েকজন হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এল, 'এই এটা রেখে দে, এটা নিয়ে ছুটবি কি রে!' একজন এসে প্রায় জোর করে তার হাত থেকে ক্যানটা ছিনিয়ে নিল, কী আছে এতে?

'মদ।' কোনওরকমে বলল সে।

'মদ! কে খায়—কার মদ?'

'বাপ খায়—গোয়ালপাড়ার ভাঁটিখানা থেকে আনলাম।'

'আরে বাস। ও যতীনদা, বাপের জন্য ছেলে এই রোদ্দুরে মদ নিয়ে যাচ্ছে। এরকম তো বাপের জন্মে শুনিনি দাদা। আঃ, বেশ গন্ধ তো! এ্যাই, ঠিক কথা বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ। আমি রোজ আনি। গগনখুড়ো বিনি পয়সায় দেয়।' প্রায় কেঁদে ফেলল সে।

'বিনি পয়সায় মদ দেয়। তোর বাপ করে কী?'

'পানের দোকান আছে—টুরিস্ট লজের সামনে।'

'ওরে শালা, ওই বুড়োটা তোর বাপ?'

এমন সময় খাতা-হাতে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'রেডি, মনিটর।'

সঙ্গে-সঙ্গে যতীন বলে মানুষটা বলল, 'নে ছোঁড়া, এটা আমার কাছে থাকল, ভয় নেই। যা-যা ছোট।'

অগত্যা সে ছুটল। গাড়িটা হেট-হেট করে ছুটতেই সেই সুন্দরমতো পুরুষ শুয়ে পড়লেন। কী গায়ের রং তার, যেন সকালবেলার সূর্য। চোখ ভরে দেখতে-দেখতে খানিক দৌড়োল কারণ কিছুদূরে যেতেই পেছন থেকে চিৎকার করে তাদের থামতে বলা হল। এরপর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে ওদের ছুটে যেতে বলা হল। গাড়িও ছুটছে, সেও। ওকে বারবার করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছিল, তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে দেখল না। কিন্তু এবার থামতেই ও পেছনে সেই কালো যন্ত্রটার দিকে তাকাল। নির্ঘাত ওখানে ছবি উঠছে তার।

কাছাকাছি ফিরে আসতেই একটা লোক ওর দিকে দুটো টাকা এগিয়ে ধরল, 'নে অ্যাকটিং করলি, তার ফি।' প্রায় জড়ভরতের মতো সে টাকাটা ধরল। আরে বাপ, শুধু সিনেমায় ছবিই উঠবে

না আবার ওকে তারা টাকাও দিল! ও বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই সেই খাতা-হাতে লোকটা ওপাশের গাঁয়ের লোকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমাদের কাজ শেষ। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ! এখানে যদি ছবিটা আসে অবশ্যই দেখবেন। ছবিটার নাম—'এর নাম সংসার'। আপনাদের গাঁয়ের নাম ছবিতে থাকবে।'

গাঁয়ের লোকেরা খুশি হল। ছেলেটা দেখল সেই সুবেশ পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে মোটরগাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। তিনি যখন ওর পাশ দিয়ে হাঁটছেন তখন যেন নাক বন্ধ হয় গেল ওর। মনে হল উত্তরায়ণে যখন গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা ফোটে তখনও এত সুন্দর সুবাস ছড়ায় না। ভীষণ লোভীর মতো বার বার নিশ্বাস নিল সে—আঃ, বুক ভরে যায় যেন।

জিনিসপত্র গোটানো হয়ে গেলে সেই যতীন নামের লোকটা ওকে ক্যান ফিরিয়ে দিল। হাতে নিতে ও চমকে উঠল, বড় খালি-খালি ঠেকে! ক্যানের ঢাকনা খুলতেই ওর সামনের গাঁটা যেন ঘুরে গেল আচমকা, ক্যানটা খালি! মুখ তুলে সে দেখল যতীন মুচকি-মুচকি হাসছে, চোখাচোখি হতেই একটা হাত আকাশে তুলে বলল, 'যা ভাগ!'

'মদ কোথায় মদ?' চিৎকার করে উঠল সে।

'আবার চেঁচায়?' ধমকে উঠল যতীন।

'আপনি আমার মদ নেছো—দেন, ফিরায় দেন।'

প্রায় কেঁদে ফেলল ও। সঙ্গে-সঙ্গে ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। খাতা-হাতে লোকটা এবার এগিয়ে এল, 'কী হয়েছে'

কে একজন বলল, 'মদ নিয়ে যাচ্ছিল ছোঁড়া, যতীন ফেলে দিয়েছে।'

'মদ? তুই মদ নিয়ে যাচ্ছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কার জন্যে?'

'বাপের জন্য। বাপ আমার চামড়া খুলে নেবে—এঁ এঁ এঁ।' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ছেলেটা।

খাতা-হাতে লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা, 'কীরকম বাপ ভাই, ছেলেকে এই রোদে মদ আনতে পাঠায়!'

'আমার মদ দেন—দেন বলছি। আপনার টাকা ফিরায় নেন।' প্রায় পাগলের মতো চিৎকার করে যাচ্ছিল সে।

এমন সময় সেই সুন্দর পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে এল, 'কী হয়েছে?'

খাতা-হাতে লোকটা ঘটনাটা বলে শেষ করল, 'যতীন মদটা ফেলে দিয়েছে। অবশ্যই ঠিক করেনি কিন্তু আমি ভাবছি কতখানি পাষণ্ড হলে বাপ নিজের ছেলেকে মদ আনতে পাঠায়। অদ্ভুত ব্যাপার!'

সুবেশ পুরুষ বলল, 'কিন্তু এটা ঠিক হয়নি! লোকাল লোককে চটিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারব না। ওকে বরং মদের দামটা দিয়ে দিন।'

খাতা-হাতে লোকটা যতীনকে বলল, 'এই, ওকে দশটা টাকা দিয়ে দাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল ছেলেটা, 'না, আমায় মদ দেন, টাকা নিয়ে কী করব! গগনখুড়ো না-হলে টাকা দিলেও আমায় মদ বেচবে না জগুশুঁড়ি।' ঘ্যানর-ঘ্যানর কান্নায় ওরা ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এদিকে ব্যাপার দেখতে দূরে দাঁড়ানো গাঁয়ের লোক ক্রমশ ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে খাতা-হাতে লোকটা ঘাবড়ে গেছে। সুন্দর পুরুষ ওর কাছে আসতেই ছেলেটা কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে নাক টেনে গন্ধটা নিচ্ছিল সেটা সবাই নজর করেছিল।

সুন্দর পুরুষ ওর খালি কাঁধে হাত রাখল, 'মদ যখন ফেলেই দিয়েছে তখন আর কি করবি,

দশটা টাকা দিচ্ছে সেটা রাখ, বাপকে আমার নাম করে দিবি, বুঝলি?'

ছেলেটা আবার নাক টানল। তাই দেখে পুরুষটি বলল, 'গন্ধটা পছন্দ হয়েছে? নিবি তুই?'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটায় সব গোলমাল হয়ে গেল ছেলেটার। গন্ধটা তাকে দেবে বলছে। মা'র মুখটা মনে পড়ে যেতেই সে আস্তে-আস্তে ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার ইন্টিমেটটা এনে দাও তো।'

হুকুমটা হতেই একজন গাড়ি থেকে একটা বাক্স বের করে তা থেকে সুন্দর শিশি এনে তার হাতে দিল। পুরুষটি সেই শিশি ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, 'খুশি তো?' এর মধ্যে কে যেন দশটা টাকা গুঁজে দিয়েছে হাতে। সে দেখল যেন বিরাট ফাঁড়া কেটে গেছে, এরকম ভঙ্গিতে ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে গেল জায়গাটা ছেড়ে। ছেলেটা এবার এগিয়ে আসা গাঁয়ের লোকদের দেখে কেমন থতমত হয়ে বুঝতে পারল এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। টাকাগুলো ক্যানের মধ্যে ফেলে অন্য হাতে শিশিটাকে নিয়ে সে শামবাটির দিকে দৌড়োতে লাগল।

পেছনের চিৎকার, হাসি দ্রুতপায়ে এড়িয়ে সে খালটার পাশে এসে দাঁড়াল। এখনও দূরের আকাশে ছুটে যাওয়া গাড়ি থেকে ওঠা ধুলোর ঝড় পাক খাচ্ছে। সে সন্তর্পণে হাতের মুঠো খুলল, একটা ছোট শিশির ভেতরে রঙিন তেল টলমল করছে। হাতটা মুখের কাছে নিয়ে এসে গন্ধটা নাক দিয়ে টানল সে—আঃ! কীসের সঙ্গে মেলে এটা। গোলাপ, জুঁই—উঁহু! বোতলের মুখটা শক্ত করে সাদা ছিপিতে আঁটা, তার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো। কৌতূহলী আঙুলে ছিপিটার মুখে জোরে চাপ দিতেই তিরের মতো সাদা ধোঁয়া আকাশের দিকে ছিটকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী যেন সেই অপরূপ গন্ধে ভুরভুর করতে লাগল। এরকমটা হবে জানা ছিল না, ভয়ে চট করে সে হাত সরিয়ে নিতেই শিশিটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে সেই গন্ধটা শরীরে মাখতে চাইল। আঃ। এখন এই মুহূর্তে ওর সামনে থেকে শেষ হয়ে আসা সূর্যটা, রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকা খোয়াই যেন মুছে গেছে। সমস্ত চরাচরে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

শামবাটি পেরিয়ে গামছাটায় শিশিটা আচ্ছা করে বেঁধে সে হাঁটছিল। ডানদিকে উত্তরায়ণ-শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তা, ওকে বাঁ-দিকের পথটায় যেতে হবে। হাঁটতে-হাঁটতে সে লক্ষ করছে যারাই ওর পাশ দিয়ে হাঁটছে তারাই অবাক হয়ে নাক টানছে। কিন্তু কেউ যেন অনুমান করতে পারছে না তার শরীর থেকেই গন্ধটা আসছে। ভীষণ মজা লাগছিল ওর, ঠিক লুকোচুরি খেলার মতন।

বাখারির দরজা ঠেলে সে যখন উঠোনে ঢুকল তখন সন্ধে হব-হব। ওদের ঘরের দাওয়ায় খাটিয়াটা শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেদিকে তাকিয়েই ওর পেটটা কেমন চিনচিন করে উঠল। আটটা বাজলেই বাপ আসবে, এসে ওই খাটিয়ায় শোবে। হাতের ক্যানটার দিকে তাকাল সে। এতক্ষণ সেই শিশিটা হাতে পাবার পর থেকে যে ভয়টা উবে গিয়েছিল, সেটা যেন তাড়কা রাক্ষসীর মতো হা-হা করে ফিরে এল। মদ না পেলে বাপ বাখারি ধরবেই—এখন কী হবে?

মাটিতে পা ঘষে-ঘষে সাহস আনতে চাইল সে। মা মনসা তাকে যদি রাজা করে দেন, না-হোক গগনখুড়োর মতো টাকা দেন, তাহলে দিনরাত ভরপেট মদ খাওয়াবে সে বাপকে। তোমার আর পানের দোকান দিতে হবে না বাপ, ঘরে বসে দিনভরে মদ খাও। এই কথাটা সে কী করে বাপকে বোঝাবে?

এই সময় সে মা-কে দেখতে পেল। ঘর থেকে বাইরে পা দিয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, 'এ্যাই, কী হল তোর? মদ আনতে গিয়ে খেয়ে এলি নাকি? যেমন বাপ তেমন বেটা হবে না? আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল।'

সে তবু নড়ে না। বাপ একবার মা-র গায়ে হাত তুলেছিল, তারপর তিনদিন ঘরে আসেনি। মা গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মা কি তার কথা শুনবে? ও অন্য কোনও উপায় পেল না, এক-পা এগিয়ে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, মা-র চোখ ঘুরছে।

'কী ব্যাপার রে, অমন চোরের মতো তাকাস কেন?' মা-র গলায় সন্দেহ। তারপর উঠোনে নেমে পড়ে তার দিকে দ্রুত আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে নাক টেনে ঘ্রাণ নিল, 'কীসের গন্ধ রে, কী মদ এটা?'

'মদ নয়।' শুকনো গলা থেকে আওয়াজটা কোনওরকমে বের হল।

ততক্ষণে মা কাছে এসে পড়েছে। দ্রুত নাকটা টানছে মা, 'তোর শরীর থেকে বের হয় যে—কী মেখেছিস—কোথায় পেলি?' আলতো করে তার হাত ধরল মা।

'শুটিং পার্টি দিল।'

'শুটিং পার্টি? তুই সেইসব দেখতে গেছিলি?'

'হুঁ। আমাকেও ছবিতে দেখা যাবে। ওরা আমার দৌড়োনোর ছবি তুলেছে।'

ছেলেটা কথা শেষ করতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরল, 'সত্যি?'

মায়ের শরীরের কাছে বসে ও পুটুর-পুটুর করে সমস্ত ঘটনাটা বলল। সেই মা মনসার সাপদুটো তার গামছায় লীলা করেছে আর সুনীলবাবু নামে সুন্দর পুরুষটা তাকে শিশি দিয়েছে, সেই সঙ্গে বারো টাকা। 'বাপ আমাকে মেরে ফেলবে মা—মদ না পেলে বাপ—।'

তার কথা থামিয়ে মা চিৎকার করে উঠল, 'চুপ কর। মদ খেয়ে সে তো নর্দমা হয়ে পড়ে থাকে—এরকম গন্ধ সে বাপের জন্মে এ বাড়িতে এনেছে? হ্যাঁরে, বইটার নাম কী?'

ওরা বলল, 'এর নাম সংসার। লোকটা কী সুন্দর দেখতে!'

'এর নাম সংসার।' মনে-মনে যেন মুখস্থ করল মা, তারপর বলল, 'তেনার ছবি দেখিছি রাস্তায়। তুই আমার রাজা হবি রে—তোর ছবি কত লোক দেখবে।' ওকে জড়িয়ে ধরে মা যেন কী করবে বুঝতে পারছিল না।

গামছাটা খুলে সে মায়ের হাতে দিল। শিশিটা এখন তার হাতে। মা চোখ বন্ধ করে গামছাটা মাথায় ঠেকিয়ে দ্রুত উঠে গিয়ে ঘরে রেখে এল, 'দেখি-দেখি শিশিটা।'

ও মাটিতে বসে মায়ের দিকে তাকাল। শিশিটা হাতে নিয়ে মা-র মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চোখের সামনে শিশিটা নিয়ে দেখছে। তারপর কাঁপা-কাঁপা হাতে সামান্য উপুড় করে দেখল তেলটা বের হয় কিনা। শেষে হতাশ হয়ে ছেলের দিকে তাকাল। সে হেসে ফেলল। এখন কায়দাটা তার জানা। মায়ের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে সে ফুটোটা মায়ের দিকে করে ছিপিতে চাপ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ধোঁয়াটা ছিটকে গেল মায়ের শরীরে, আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে মা উলটে পড়ে যাচ্ছিল, তার শুকনো মুখে এখন অপ্রস্তুত ভাব। সে আঙুল সরাতে ধোঁয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। মা উঠে এসে জোরে-জোরে নিজের শরীরের ঘ্রাণ নিতে-নিতে বলল, 'আঃ, দ্যাখ কী সুন্দর! অ রবি, তোকে পেটে ধরেছিলাম বলে এটা পেলাম রে!' পাগলের মতো দুটো হাত মুখে ঘষতে লাগল মা।

ততক্ষণে ক্যানটার দিকে নজর গেল ছেলেটার। খুব সন্তর্পণে সে ক্যানের ঢাকনাটা খুলল। তলায় নোটদুটো পড়ে আছে। আঙুল দিয়ে সে দুটোকে তুলতেই দেখল গা-মাখা মদে নোট ভিজে একসা হয়ে আছে। মা-র নজর পড়েছিল এদিকে, হাত বাড়িয়ে ক্যানটা নিয়ে দেখল একটু তলানি রয়ে গেছে এখন। গন্ধটা যেন বমি এনে দিল মা-র, একটানে ছুড়ে দিল মা সেটাকে উঠোনের একপাশে। থু-থু-থু! নোট থেকেও গন্ধ বের হচ্ছে মদের। মা সেটাকে হাতে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না প্রথমটায়। 'দশ টাকা আর দু'টাকা—বারো টাকা। কাউকে দিবি না, ওই বইটা এলে তোতে আমাতে দেখব, বুঝলি?'

মা-র কথা শেষ হতেই সে বলল, 'কিন্তু বড় মদের গন্ধ ছাড়ে যে!'

সঙ্গে-সঙ্গে মা চিন্তা করে ফেলল, তারপর নোটদুটো দুই আঙুলে সামনে ধরে বলল, 'ওই গন্ধের ধোঁয়াটা এর ওপর ছাড় তো, মোদো গন্ধটা ঠিক পালিয়ে যাবে—ছাড়!'

শক্ত করে শিশিটা হাতে ধরে ফুটোটা সেদিকে তাক করে সে ছিপিতে চাপ দিল। পিচকারির

মতো ধোঁয়াটা একরাশ গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা নিয়ে নোটদুটো ভিজিয়ে দিল। মা-র মুখটা কী মিষ্টি দেখাচ্ছে এখন! মাকে এমন সুন্দর করে হাসতে সে জন্ম থেকে দ্যাখেনি।

হঠাৎ তার খেয়াল হল ধোঁয়াটা যত বের হচ্ছে তত শিশির তেল কমে আসছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সে আঙুলটা সরিয়ে নিল, তারপর শিশিটা দেখে নিয়ে মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'মা, এটা শেষ হয়ে গেলে আর গন্ধ বের হবে না যে।'

হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে মা বলল, 'অর্ধেকটা আছে, তোর বাপের গায়ে একটুস না হয় দিয়ে দিস। বাপের জন্মে সে এসব দ্যাখেনি তো!'



শিকার কাহিনি

আঠারো বছরের এই বাড়িটার মালিক পাণ্ডেজি। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। কথা বলেন সুন্দর হিন্দিতে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। বছর চল্লিশের মধ্যেই বয়স কিন্তু কথাবার্তায় এমন ভদ্রলোক আজকাল দেখা যায় না। লোকে বলে ওঁর বাবাও নাকি ওইরকম বিনয়ী ছিলেন। মাথা ঠান্ডা, একটুতে উত্তেজিত হওয়ার লোক নন বলে কানপুর থেকে কলকাতায় এসে এরকম তিনখানা বাড়ির মালিক হয়েছেন। খিদিরপুরের এই মহল্লায় ওঁর তিনটে বাড়ির মধ্যে এই বাড়িটাই বড়, ঘর অনেক, ভাড়াটে বেশি। তাই ভেতরে ঢোকার মুখেই যে ঘরটি তা কাউকে ভাড়া দেননি পাণ্ডেজি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাড়ির যদি কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহলে ভাড়াটেরা মতলব আঁটবেই। বরং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটাও বাবার কাছ থেকেই শেখা। তাই ওই ঘরে রোজ বিকেলে মজলিশ বসে। বাড়ির ভেতরে যারা যায় আসে, তাদের ওপর নজর রাখা যায়। বাইরের উটকো লোক হলে এই ঘরে বসতে হবে প্রথমে।

আঠারো ঘরের এই বাড়ির ভাড়াটেরা সুনির্বাচিত। নিজে উত্তরপ্রদেশের মানুষ বলে উত্তরপ্রদেশীয়রাই সংখ্যায় ভারী। দু-ঘর বিহারি আর বাঙালি আছে। বাঙালিকে রাখা নিয়ে আপত্তি ছিল পাণ্ডেজির। কিন্তু বাবা এ-ব্যাপারেও তাকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এই শহরটা যেহেতু বাংলাদেশে তাই আমাদের হাবভাবে বাঙালি ছাপটা রাখা দরকার। একজন বাঙালি ভাড়াটে থাকলে তার সঙ্গে কথা বললে সেই ছাপটা আসবেই। তাছাড়া কোনওদিন বাঙালি অবাঙালি ঝামেলা হলে সে-ই তোমাকে বাঁচাবে। তবে হ্যাঁ, এমন লোককে ভাড়াটে হিসাবে নির্বাচন করো যে মেরুদণ্ড সোজা করতে পারে না, একশ'টা ঝামেলায় অষ্টপ্রহর জড়িয়ে আছে। পাণ্ডেজির এই বাঙালি ভাড়াটেটি একটি স্কুলে পিওনের চাকরি করে, পাঁচটি কন্যাসন্তানের জনক, সবসময় মাটির সঙ্গে মিশে আছে। তার সঙ্গে দেখা হলে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসা করেন তিনি। লোকটি বিগলিত হয়। দু-বেলা হাত তুলে নমস্কার করে তাকে। অন্য ভাড়াটেদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন বাঙালিটির সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার না করে। সাধারণত জল-কল-পায়খানা নিয়েই তো ওদের ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। সে ব্যাপারে পাণ্ডেজির কাছে সমস্যা হলেই আসতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে।

যেহেতু উত্তরপ্রদেশের এবং বিহারের মানুষজন এখানে শান্তিতে থাকতে চায় তাই পরদাপ্রথা সবাই সঙ্গত বিবেচনা করে। আঠারোজনের কোনও দর্শনপ্রার্থী এলে তার হুট করে ভেতরে যাওয়ার নিয়ম নেই। পাণ্ডেজি তাকে হাসিমুখে আপ্যায়ন করেন, ভাড়াটেকে খবর দেন। সে এসে যদি প্রয়োজন

মনে করে তবে নিজের দায়িত্বে অতিথিকে ভেতরে নিয়ে যাবে। কারণ, এই বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করা একটি পবিত্র কর্তব্য।

পাণ্ডেজির আর একটি নিয়ম সবাইকে মানতে হয়। আঠারো ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে সতেরজনের আয় অত্যন্ত সীমিত। বেশির ভাগই আশেপাশের কলকারখানার শ্রমিক। ক্লাস থ্রির বেশি বিদ্যে নেই কারও। দেশে চিঠি লিখতে হলে পাণ্ডেজির সামনে এসে উবু হয়ে বসতে হয়' তা এই ধরনের মানুষ নেশা করে, ঝামেলায় ফেলে সবাইকে। খিদিরপুরে নেশা করার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু পাণ্ডেজির হুকুম নেশা করে কেউ হল্লা করতে পারবে না। যদি তেমন হয় তাহলে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কোনও নিয়ম দীর্ঘকাল চালু থাকলে তা সহজে কেউ ভাঙতে চায় না। নেশা করে আসা মানুষ চুপচাপ শুয়ে থাকে ঘরে।

পাণ্ডেজি এই সতেরজন সম্পর্কে অত্যন্ত নিশ্চিত। এরা ধর্মপ্রাণ এবং তাঁর অত্যন্ত বশংবদ। উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণজাত সবাই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এই বাড়িতে সবাইকে আত্মীয়ের মতো থাকতে হবে। সদরে একটি বারোয়ারি পাপোসে পা মুছে সবাইকে ঢুকতে হবে। স্ত্রীলোকেরা যখন কলঘর ব্যবহার করবে তখন পুরুষরা সেদিকটা সম্মানের সঙ্গে পরিহার করবে। কিন্তু আঠারোতম ভাড়াটেটিকে নিয়ে ইদানীং দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পাণ্ডেজি।

লোকটি উত্তরপ্রদেশের নয়, বিহারের সমস্তিপুর জেলার মানুষ। মাত্র বিশ-বত্রিশ বছর বয়স। দুই কন্যার জনক। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। নাম নাগেশ্বর।

এ বাড়ির এই একটিমাত্র লোক প্যান্ট-সার্ট পরে। টেরিকটের মোজাসহ জুতো পায়ে দেয়। ঘরে বড় আয়না ছাড়া দুটো চেয়ার এবং টেবিল আছে। সমস্তিপুর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। ধর্মতলার একটি কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে বাবু চাকরি করে। এ বাড়ির গোত্রছাড়া ভাড়াটে। পাণ্ডেজি এই একটি ব্যাপারে বাবাকে সমর্থন করে না। তিনিই মৃত্যুর আগে এই ভাড়াটেটিকে মাত্র ষাট টাকায় বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য দু-খেপে পাণ্ডেজি আশি টাকায় সেই ভাড়াকে তুলে এনেছেন। কিন্তু মনে শান্তি আসেনি। অন্যান্য ভাড়াটেরা নাগেশ্বর স্পর্কে অত্যন্ত ঈর্ষা পোষণ করে এ তিনি জানেন। নাগেশ্বরের স্ত্রী খুবই সাদামাটা মেয়েছেলে, কোনও পুরুষ আজও তাকে ঘোমটার আড়ালে দেখতে পায়নি। কিন্তু ওই পরিবার অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, এমনকী বাচ্চাগুলোও ঘরেই থাকে সবসময়। প্রথম প্রথম এটাকে অহঙ্কার বলে মনে করত সবাই। একবার কাউকে অহঙ্কারী মনে হলে তাকে সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এ বাড়ির মেয়েদের ইন্ধনে পুরুষেরা নাগেশ্বরকে তাই এড়িয়ে চলত। সে বি. এ. পাশ জানা সত্ত্বেও কেউ তার কাছে চিঠি লেখাতে আসত না। কিন্তু ক্রমশ সবাই বুঝতে পারল নাগেশ্বর লোকটা নিরীহ প্রকৃতির, একমাত্র স্ত্রীকে শাসন করার সময়েই তার পৌরুষ প্রকাশ পায়। এতে বৈরীভাবটা কমে এলেও ঈর্ষা গেল না। নাগেশ্বরের ঘরে খুব নিচু স্বরে রেডিও বাজে, পুজোর আগে রকমারি জামাকাপড় কিনে তারা দেশে যায়। কখনও-সখনও যখন নাগেশ্বরের মা দেশ থেকে আসে তখন জমিজমার গল্প শোনায়। তার ওপরে খুব সম্প্রতি নাগেশ্বর তার এগারো বছরের বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়ে এসেছে সমস্তিপুরে গিয়ে। ঈর্ষা তো হাওয়া পাবেই।

পাণ্ডেজি খবর নিয়েছেন। নাগেশ্বর যে অফিসে কাজ করে সেখানে ভালো উপরির ব্যবস্থা আছে। যদিও নাগেশ্বরের চাকরি সামান্যই তবু সেই উপরির খুদকুঁড়ো তার হাতে আসে। পাণ্ডেজি এ ধরনের ভাড়াটেকে পছন্দ করতে পারছিলেন না। কোনও ভাড়াটেকেই তিনি বাড়িভাড়ার রসিদ দেন না, কেউ চায়ও না। সম্প্রতি নাগেশ্বরের অফিসে প্রয়োজন হওয়ায় সে পাণ্ডেজিকে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'একটা রসিদ যদি দেন তাহলে আমার উপকার হয়।'

পাণ্ডেজি অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না, বললেন 'অবশ্যই দেব, ক'মাসের চাই বলুন?'

নাগেশ্বর বলল, 'গতমাসেরটা হলেই কাজ চলবে।' পাণ্ডেজি তাকে রসিদ দিয়ে স্থির করলেন নাগেশ্বরকে এখান থেকে সরাতে হবে। সরাতে হলে একটা যুক্তি চাই। নাগেশ্বর সেই সুযোগ দিচ্ছে না। দেবদ্বিজে তার খুব ভক্তি, প্রায়ই ঘরে পুজো করে। কন্যার বিবাহ দেওয়ার আগে যে পুজো করেছিল তার প্রসাদ দিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডেজিকে। অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশন করেছিল সে। খেয়ে তৃপ্ত হলেও মন খুঁতখুঁত করেছিল।

বড়মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাগেশ্বর স্ত্রীকে রেখে এল দেশে। উপরি থাকলেও তার আয় খুব বেশি নয়। ফলে তাকে কর্জ করতে হয়েছিল অনেক। ঋণগ্রস্ত নাগেশ্বর স্থির করল কলকাতায় সে একা থাকবে। তার স্ত্রী স্বভাবতই দেশে থাকতে চায় না। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তার। কলকাতায় বেশির ভাগ ঘরে থাকলেও সে এখানে স্বাধীনভাবেই থাকে। মাঝেমধ্যে নাগেশ্বর তাকে কোনও ভগবানের বায়োস্কোপ অথবা কালীঘাটের মন্দিরে নিয়ে যায়। দেশে থাকলে তাকে বন্দিদশায় কাটাতে হবে। কারণ সেখানে পরদাপ্রথা অত্যন্ত কড়া। এমনকী নাগেশ্বরের সঙ্গেও রাত না হলে ওখানে সে কথা বলতে পারে না। তার ওপর বিরাট সংসারের হাজারটা কাজ সামলাতে হয় তাকে। যেহেতু সে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় থাকে, তাই দেশের বাড়ির লোক সেখানে গেলে এই চাপ দিয়ে বেশ সুখ পায়। তাই সে মেয়ের বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু নাগেশ্বর রাজি হয়নি। সে কলকাতায় একা থাকলে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে এবং কর্জ শোধ করতে সুবিধে হবে। স্ত্রী-যুক্তি শোনার মানসিকতা যেহেতু বিহারি পুরুষদের নেই তাই নাগেশ্বরের চলে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

পাণ্ডেজির এই বাড়িতে কোনও অবিবাহিত পুরুষের স্থান নেই। নাগেশ্বর যখন এবার একা ফিরে এল তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন। যদিও নাগেশ্বর কোনওদিকে মুখ তুলে তাকায় না তবু স্ত্রীহীন হয়ে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে থাকাটা শোভন হচ্ছে না। কিন্তু সে অবিবাহিত নয়, স্ত্রীও প্রয়োজনে দেশে যেতে পারে। একটা বিহিত করার জন্যে সুযোগ খুঁজছিলেন পাণ্ডেজি।

এই প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে কলকাতায় আছে নাগেশ্বর। প্রথম-প্রথম তার খুব মন খারাপ হত। রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী তার পাদোদক পান করত। সে সময় চোখ বুজে থাকত নাগেশ্বর, নিজেকে খুব দামি বলে মনে হত। স্নান-খাওয়ার শেষে যখন অফিসে বেরুত তখন স্ত্রীর প্রণাম নিতে হত। অনেক দিন তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে এসে এই কারণে আবার ফিরে যেতে হয়েছে। সন্ধে হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে আসে নাগেশ্বর। রাত আটটার মধ্যেই স্ত্রীর পাশে না শুলে তার খুব মন খারাপ লাগে। শুয়ে-শুয়ে অফিসের বাঙালিদের গল্প বলে সে। মনেপ্রাণে বাঙালিদের অনেক কিছু সে অনুসরণ করতে চায়। ভাঙা বাংলা বলে। কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা মানতে পারে না। স্ত্রীকে সে অফিসের মেয়েছেলেদের নানান কেচ্ছার কথা শোনায়। আর স্ত্রীর কাছে এ বাড়ির মেয়েদের গল্প শোনে। দু-একজন যাদের সে ভালো করে কখনও দ্যাখেনি, একটু-আধটু ফস্টিনস্টি করার বাতিক আছে। নাগেশ্বর বউকে সতর্ক করে দেয়, ভুলেও যেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে।

এখন সেই ঘরে একা শুয়ে-শুয়ে নাগেশ্বরের বড় কষ্ট হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাতে-ভাত রান্না করে অফিসে যেতে হয়। হোটেলে খেলে খরচ বাড়বে বলে সন্ধেবেলায় আবার স্টোভ ধরাতে হয়। এ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা নেই তার। কিন্তু অফিসে সে নিশ্চিত। বাঙালিদের মন খুব উদার হয়। বউ থাকলেও বেশ্যাদের গল্প বেশ সহজেই করে ওরা।

সেদিন সকালে সে ভাত খেতে বসেছে এমন সময় একটা বাচ্চা হাতে বাটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। বিস্মিত নাগেশ্বর শুধোল, 'কী চাই?'

এমন সময় পেছন থেকে আর একটি গলা ভেসে এল, 'রোজ-রোজ হাত পুড়িয়ে খান, তাই একটু সবজি দিলাম।'

নাগেশ্বর আঁতকে উঠল, 'না, না, আমার কিছু লাগবে না।'

'একি কথা! দিদি থাকলে কি এত কষ্ট করতে হত।'

একথা শোনার পর না নিয়ে পারেনি নাগেশ্বর। খেয়ে দেখল তার স্ত্রীর চেয়ে অনেক ভালো রান্না। বাচ্চাটি দাঁড়িয়েছিল, এঁটো বাটি ধুয়ে তাতে কিছু বাতাসা দিয়ে ফেরত দিল নাগেশ্বর।

স্ত্রীলোকেরা কখনওই অন্য স্ত্রীলোককে সুখী দেখতে পারে না। নাগেশ্বরের স্ত্রী চলে যাওয়ার পর এই বাড়ির স্ত্রীলোকরা যেন স্বস্তি পেল। তাদের মনে হল নাগেশ্বরের এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। শরীরের গড়ন হালকা হওয়ায় তাকে খুবই তরুণ দেখায়। অল্পবয়সি স্ত্রীহীন যুবকের প্রতি স্ত্রীলোকদের এক ধরনের মমতা জন্মায়। ক্রমশ অন্যান্য ঘর থেকে খাবার আসতে লাগল নাগেশ্বরের কাছে। নাগেশ্বর প্রথমে বিব্রত হলেও শেষ পর্যন্ত বেশ উপভোগ করতে লাগল। এত অন্তঃপুরবাসিনীদের সে চোখে দেখে না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাদের নরম স্পর্শ অনুভব করে। উনুনে আগুন দিলে ধোঁয়া আকাশে ছড়াবেই। বাড়ির তিন-চারজন পুরুষ ওর সঙ্গে হেসে কথা বলতে শুরু করল। তারা নাগেশ্বরের ঘরে এসে বসতে লাগল। নাগেশ্বরের ট্রাঞ্জিস্টার রেডিও তাদেব প্রধান আকর্ষণ। আড়ালে আবডালে তারা নাগেশ্বরের কাছে দু-পাঁচ টাকা কর্জ করা শুরু করে দিল। নাগেশ্বর ওই সামান্য অর্থ তাদের দিতে পেরে যেন বেঁচে গেল। বিনাপয়সায় প্রতিদিন খাবার খেতে তার মন স্বস্তি পেত না তাই ঋণ দিয়ে কখনওই তাগাদা করেনি সে। ফলে ভাড়াটাদের একাংশের মধ্যে তার খাতির বেড়ে গেল খুব।

স্নেহপ্রদর্শনের কালে স্ত্রীলোকেরা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারে না। নাগেশ্বর প্রত্যেক রান্নাই ভালো বলে, কোনও রমণীর মুখের দিকে তাকায় না। এতে তাদের মন ভরে না। প্রত্যেকেই চায় তার ভূমিকা অধিকতর উজ্জ্বল হোক। ফলে দু-একজন একটু-একটু করে সাহসী হল। তারা অনেক সন্তানের জননী হলেও কঠিন পরদাপ্রথায় বিশ্বাসী। কিন্তু এখন নাগেশ্বরকে অসহায় তরুণ বলে ভাবতে কারও কষ্ট হল না। কথাবার্তা এতকাল কোনও শিশুর মাধ্যমে চলত, এখন সেই দু-একজনের সঙ্গে সরাসরি হয়। তারা ভগ্নীস্নেহ প্রকাশ করে। এতে নাগেশ্বর কৃতার্থ হয় এবং সেই রমণীরা অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের অধিকতর মূল্যবান মনে করতে থাকে। বোঝা যায়, নাগেশ্বরের সঙ্গে এই মেলামেশার জন্যে তাদের স্বামীরা কোনওরকম বিরাগ পোষণ করে না।

সেদিন সন্ধের একটু আগে ঘরে ফিরেছিল নাগেশ্বর। বাইরের ঘরে পাণ্ডেজিদের আসর জমজমাট। আগামীকাল মোহনবাগানের খেলা, কথাবার্তার বিষয় সেটাই। নাগেশ্বরকে দেখে পাণ্ডেজি বললেন, 'আইয়ে মাহাতোজি, আপনি তো এ ঘরে আসেনই না। কি যে অপরাধ করেছি আমরা!'

নাগেশ্বর দু-হাত জোড় করে বলল, 'নমস্তে। ছি ছি, একথা বলছেন কেন! আসলে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না।'

পাণ্ডেজি বললেন, 'একি কথা! আপনার মতো শরিফ আদমি এলে আমরা বিব্রত হব? এ বাড়ির সব মেয়েপুরুষ যখন আপনাকে আত্মীয় করে নিয়েছে।' কথাটা শেষ না করে হাসলেন পাণ্ডেজি। নাগেশ্বর দেখল উপস্থিত অন্যান্যদের মুখ বেশ গম্ভীর। ওইসব পুরুষরা তার ঘরে যাতায়াত করে না। নাগেশ্বর বসল।

পাণ্ডেজি বললেন, 'আমি খুব প্রবলেমে পড়েছি, আপনাদের সাহায্য দরকার। কর্পোরেশন বাড়ির ট্যাক্স বাড়িয়েছে, ইলেকট্রিক কোম্পানিও চার্জ ডাবল করেছে। এই অবস্থায় আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি নিজে আপনাদের বাড়িভাড়া বাড়াতে পারতাম কিন্তু তা করব না। কারণ আমি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। আপনারাই নিজেরা ঠিক করে দিন কত ভাড়া বেশি দিতে পারবেন যাতে আমার ওপর চাপ না পড়ে। আপনি বি. এ. পাশ শিক্ষিত লোক, এখানে আছেন, আমাদের গর্ব, আপনি সবার সঙ্গে কথা বলুন।'

নাগেশ্বর বলল, 'আপনি খুব সহৃদয় মানুষ। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আর কি বলব। আমি

কী পাশ করেছি তা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, আমি এনাদের মতো একজন ভাড়াটে মাত্র, এটাই আমার পরিচয়। তাই সবাই যা ঠিক করবে তাই আমি মানব।'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়লেন, 'খুব ভালো, খুব ভালো। তা স্ত্রী না থাকায় আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

নাগেশ্বর মাথা নাড়ল, 'একা লোকের আর অসুবিধে কি!' তারপর সে উঠে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনারা কি কালকের খেলা দেখতে চান?'

পাণ্ডেজি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জরুর! কিন্তু—?'

নাগেশ্বর সেদিন অফিসে উপরি হিসেবে পাওনা একটা টিকিট পকেট থেকে বের করে পাণ্ডেজির সামনে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এরকম মহার্ঘ্য টিকিট যে এককথায় কেউ বের করে দিতে পারে এটা কল্পনার বাইরে। এ বাড়ির অনেকে টিকিটটাই প্রথমে চোখে দেখল। পাণ্ডেজি হাসলেন। চাপ দিলে পাথর থেকেও জল বের হয়, তা নাগেশ্বর তো ছেলেমানুষ!

ইদানীং কলঘরে যাওয়ার সময় দু-একটি রমণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তারা ঠোঁট টিপে হাসে। এই হাসি দেখে নাগেশ্বর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ঘরে ফিরে এসেই সে সতর্ক করে নিজেকে। যে রমণী পরপুরুষের দিকে অমন ভঙ্গিতে হাসতে পারে সে চরিত্রহীনা—তার প্রতি কোনওরকম আকর্ষণ বোধ করা মানে নিজের স্ত্রীকে অপমান করা। একথা ভাবতেই নিজের স্ত্রীর জন্যে তার খুব মন কেমন করতে লাগল। এই ভরযৌবনে স্ত্রীহীন হয়ে রাত কাটানো বড়ই কষ্টকর। যদিও মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর তার ছাব্বিশ বছরের স্ত্রী আবেদন করেছে যাতে কোনও কারণেই সে যেন পুনরায় গর্ভবতী না হয় সে দায়িত্ব নাগেশ্বরকে নিতে হবে। তাহলে একুশ বছরের জামাই-এর সামনে মুখ দেখাতে পারবে না সে। নাগেশ্বর ভেবেছিল বলবে, তাদের সংসারে শাশুড়ি কখনই জামাই-এর সামনে দাঁড়ায় না, অতএব মুখ দেখানোর সমস্যাই নেই। কিন্তু লজ্জাবোধ হওয়ায় সেকথা বলেনি সে।

ঘরে মৃদু শব্দ হল। নাগেশ্বর খাটে শুয়ে ছিল, চোখ মেলে দেখল খাবারের বাটি নিয়ে একজন ঢুকছে। সে দ্রুত উঠে বসতেই রমণীটি ঘোমটা সরিয়ে হাসল। একে আগেও দেখেছে নাগেশ্বর। অন্তত চল্লিশ বছর বয়স এবং সন্তানহীনা। বোধহয় সেই কারণেই শরীর অটুট। রমণীটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে নীরব থাকতে বলল। তারপর ঘরের দরজা ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলল, 'কাল রাত্রে আমার স্বামী থাকবে না। আমার যাতে ছেলে হয় সেইজন্য তারকেশ্বরে জল দিতে যাবে। ওসবে কিছু হয় না আমি জানি। কিন্তু সে জানুক ওতেই কাজ হল।'

নাগেশ্বর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি কী করব?'

রমণী চোখে বিদ্যুতের চমক এনে বলল, 'ঢং, জানেন না যেন! নাকি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না? আপনার বউ চলে যাওয়ার পর থেকেই এই ফন্দিটা আমি এঁটেছি। কাল রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি আসব। দরজাটা খোলা রাখবেন।' যেমন এসেছিল তেমন নিঃশব্দে চলে গেল সে।

বজ্রাহতের মতো বসে থাকল নাগেশ্বর। একি কথা শুনল সে! এই রমণীকে এই ক'দিন সে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণা বয়স্কা দিদির মতো দেখেছে। এত কঠোর পরদাপ্রথার মধ্যে বাস করেও এইরকম কামনা কেউ পোষণ করে বিন্দুমাত্র না জানতে দিয়ে! সে তো বয়সে অনেক ছোট। মহাভারতে নাকি এমন ঘটনার কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন রমণীরা শক্ত খোলের আড়ালে নিজেকে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে, কিন্তু একমুহূর্তেই সেই আড়াল খুলে দিতে দ্বিধাও করে না। তবে মুশকিল হল, সেই মুহূর্ত কখন আসবে তা তারা নিজেরাও জানে না। এই ঘটনাই তার চিরসত্যতা প্রমাণ করে। এই ব্রাহ্মণপত্নী তাকে কী পাপে নিয়ে যাচ্ছে! নাগেশ্বরের মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনার কথা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু অধিক রাতে ওই নিঃসন্তান রমণীর কথা চিন্তা করতে-করতে একটি গোপন ঢেউ তাকে প্লাবিত করল। একটি সুঠাম শরীর চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দিচ্ছিল।

পরের দিন অফিসে কোনও কাজে মন দিতে পারছিল না নাগেশ্বর। বিকেল হতে না হতেই

তাকে চুম্বকের মতো বাড়িটা টানছিল। সে অবশ শরীরে যখন ঘরে ফিরল তখন পাণ্ডেজির মজলিশ সরগরম। হয়তো খেলার জন্যই এই অবস্থা। কিন্তু তাকে দেখামাত্রই সমস্ত কথাবার্তা নিঃশব্দ হয়ে গেল। নাগেশ্বর দেখল সবকটি চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এবং মুখের অভিব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর। ধক্ করে উঠল বুক। আজকের খবর কি এরা কোনওভাবে জেনে গেছে! হিমবুক নিয়ে সে দেঁতো হাসল, 'নমস্তে পাণ্ডেজি। আপনি খেলা দেখতে যাননি?'

পাণ্ডেজি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেউ কথা বলছে না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নাগেশ্বর ভেতরে যাওয়ার জন্য বারোয়ারি পাপোসে পা মুছতে যেতেই একজন চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, ওতে তুমি পা দেবে না।'

এবার আর একটা শীতল স্রোত নাগেশ্বরের দিকে ধেয়ে এল। সে লোকটির দিকে তাকাতে পাণ্ডেজি উঠে ওর সামনে এল। নাগেশ্বর কোনওমতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

পাণ্ডেজি বললেন, 'তোমার জামাই-এর বাপ এসেছিল দুপুরে।'

নাগেশ্বর থতমত হল, বেয়াই আসবে সে তো জানে না।

পাণ্ডেজি আবার বললেন, 'তাঁর কাছে তোমাদের সব খবর পেলাম!'

নাগেশ্বর বলল, 'কী খবর?'

পাণ্ডেজি বললেন, 'তোমরা নিচু জাত।'

সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন?'

পাণ্ডেজি বললেন, 'আমি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। সবাই যা বলবে আমি তাই করব। আগামীকাল সকালে মিটিং আছে, তুমি উপস্থিত থাকবে। এ বিষয়ে সবাই আলোচনা করবে।'

নাগেশ্বর বলল, 'ওসব আপনার ব্যাপার। আমি নিয়মিত ভাড়া দিই, কারও সাতেপাঁচে থাকি না। আমি যেমন আছি তেমনি থাকব।'

পাপোস না ছুঁয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আসবার সময় সে লক্ষ করল পথের পাশে কেউ নেই। এমনকী বাচ্চাগুলোও সামনে আসছে না। মুখহাত ধুতে কলঘরে যেতে দেখল সবাই আড়ালে সরে যাচ্ছে। এই সময় একটা বুড়ি কাকস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, 'এই জল আমি খাব কী করে!'

কেউ একজন বলল, 'আস্তে বলো, ও শুনতে পাবে।'

'শুনুক।' বুড়ির গলা তীব্রতম হল, 'খুব নেচেছিলি তোরা। খুব সবজি খাওয়াতিস। হায়-হায়!'

কোনওরকমে ঘরে ফিরে এসে ঝিম মেরে গেল নাগেশ্বর। একদিনের মধ্যেই সে এদের কাছে অন্ত্যজ হয়ে গেল। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। অফিসের বাঙালিরা এ কথা শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ক্রমশ ভয় করতে লাগল তার। আজ কেউ সবজির বাটি দিয়ে গেল না। বাইরে পুরুষরা উত্তেজিত গলায় তর্ক করছে। বিষয়টি যে সে-ই তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। মেয়েমহল একদম নিঃসাড়। সমস্তিপুরে এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি নাগেশ্বরের। ছাপরার দিকে এ ব্যাপারটা খুব জোরাল তবে উত্তরপ্রদেশের মতো নয়। খাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে গেল, স্টোভ ধরাল না নাগেশ্বর। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল ওরা কী করতে পারে। নিশ্চয়ই তাকে মারধোর করার সাহস পাবে না ওরা। তা না হলে সে এই বাড়ি কিছুতেই ছাড়বে না। ওর প্রতি এমনিতেই সবাই ঈর্ষান্বিত ভালো চাকরি করে বলেই, এটি অতিরিক্ত। সে ভাড়া দিচ্ছে মাথা উঁচু করে থাকবে। এখন কলকাতা শহরে এত অল্প পয়সায় বাড়িভাড়া মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। তাই ছেড়ে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

আজকের রাতটার কথা মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল পাণ্ডেজির সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই। এখন খেয়াল হতে সে নিশ্চিত হল। ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে বলল, না, কোনও চান্স নেই। কেউ এ ঘরে আসবে না।

কিন্তু অনেক রাত্রে যখন দরজাটা খুলেই চট করে বন্ধ হয়ে গেল তখন চমকে উঠল সে। রমণীটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আলো নেভা থাকলেও জানলা দিয়ে ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য ঘরে আসায় সে রমণীটিকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। খুব মৃদুস্বরে রমণীটি বলল, 'জেগে আছেন আপনি?'

নাগেশ্বরের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ঘাড় নাড়ল।

রমণীটি বলল, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।' বলে হাসল।

নাগেশ্বর কোনওরকমে বলল, 'আপনি চলে যান।'

'কেন?'

'আমি পারব না।'

'কেন?'

'আমি, আমি নিচু জাতের লোক, শোনেননি?'

'শুনেছি। কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ। আপনার সন্তান আছে।'

'আমাকে ঘেন্না হচ্ছে না? আপনি ব্রাহ্মণের বউ!'

'ভগবান তো এইজন্যে রাত দিয়েছেন। রাতে সব ঢেকে রাখা যায়।'

'আপনি ক্ষমা করুন।'

'না, আমি যখন একবার লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েছি তখন ফললাভ করবই। তবে আপনি এখান থেকে কালই চলে যান। ওরা আপনার ক্ষতি করবেই। সেটা আমার লাভ। দিনের বেলায় আপনাকে দেখতে হবে না।'

রমণীটি তার খাটের দিকে এগিয়ে আসতেই নাগেশ্বর বলে উঠল, 'আপনি চলে যান। আপনি ভ্রষ্টা, দ্বিচারিণী।'

রমণীটি যেন বেত্রাঘাত পেল। তার ঠোঁট স্ফীত হয়ে বেঁকে উঠল একবার, চোখ জ্বলছে। দ্রুত নিশ্বাসের তালে বুকের উত্থান-পতন সমুদ্রকে হার মানায়। কিন্তু সেটা কয়েক পলক মাত্র। নাগেশ্বর দেখল সে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল নিঃশব্দে।

তারপর সব চুপচাপ। নাগেশ্বরের রক্তচলাচল ঈষৎ শান্ত হলে সে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় ফিরে এল। রমণীটির দুঃসাহস এবং স্পর্ধায় সে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তার জাতের কথা জানার পরও প্রস্তাবের কোনও হেরফের হল না কেন? এ অবস্থায় ধরা পড়লে রমণীটির তো মারাত্মক ক্ষতি হত তবু এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহসী হল? নাগেশ্বর নিজের দিকটা ভাবতে লাগল। কেন সে দরজাটা ভালো করে বন্ধ রাখেনি? এত ঘটনার পরেও কি সে গোপনে রমণীটির জন্যে অপেক্ষা করছিল? তাহলে এখন গ্রহণ করতে পারল না কেন? এই রকম হাজার চিন্তা মাথায় পাক খেলে কারও ঘুম আসে না। ওরা নাগেশ্বরের ক্ষতি করবে। কী ক্ষতি!

ঠিক এইসময় বাড়ি কেঁপে উঠল তীক্ষ্ণ চিৎকারে। যারা নিদ্রিত ছিল তাদের অনুভূতি সেই শব্দের প্রতিঘাতে ছিন্ন হল। সতেরো ঘরের বাসিন্দারা চিৎকারের কারণ সন্ধানে সশব্দে দরজা খুলতে লাগল। চমকে উঠেছিল নাগেশ্বরও। সে দ্রুত দরজা খুলতে যেতেই রমণী-কণ্ঠস্বর ডুকরে উঠল, 'হায় ভগবান, এ কিয়া হো গয়া।'

নাগেশ্বরের কণ্ঠস্বরটি পরিচিত বোধ হওয়াতে কানখাড়া করে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল। সতেরো বাসিন্দা একসঙ্গে প্রশ্ন করছে, কী হয়েছে? চিৎকার এবং কান্নার কারণ কী? রমণীটি প্রথমে নিজের স্বামীকে দায়ী করল তার ভাগ্যের জন্যে। কি দরকার ছিল এই বয়সে সন্তানের আশায় তারকেশ্বরে যাওয়ার? সে যদি ঘরে থাকত তাহলে কি ওই লোকটা এই সাহস পেত?

এতক্ষণে দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে নাগেশ্বরের কাছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মহাভারতে আছে, প্রত্যাখ্যাতা স্ত্রীলোক সাপের চেয়ে হিংস্র হয়। এখন কী হবে!

পুতিগন্ধের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র যেমন শকুনেরা ডানায় জোর পায় তেমনি সতেরো বাসিন্দারা

নানাবিধ প্রশ্নে সত্য জেনে নিল। এই একটু আগে রমণীটি কলঘরে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল, এমন সময় কেউ তার হাত ধরে টানে। ভয় পেয়ে চিৎকার করতেই লোকটি যখন তাকে ছেড়ে ছুটে যায় তখন সে চিনতে পারে। এতদিন সে যাকে নিজের ভাই-এর মতো দেখে এসেছে সেই লোকটা তার ইজ্জত নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে গঙ্গা মাইয়ার বুকে গিয়ে শুয়ে থাকলে তবেই এ অপমানের জ্বালা দূর হবে। পাগলের মতো করছিল রমণীটি। অন্যান্য রমণীরা তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। উত্তেজিত পুরুষকণ্ঠ তখন পাণ্ডেজিকে খুঁজছে।

একটু পরেই পাণ্ডেজির গলা পাওয়া গেল। তাঁকে অনেকে মিলে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করতেই তিনি বললেন, 'কে সে নরাধম, এই বাড়ির কেউ কি যে পরস্ত্রীর শরীরে হাত দেওয়ার হিম্মত রাখে?'

পুরুষরা আবার রমণীটির শরণাপন্ন হল। সে তখনও ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সেই অবস্থাতে জানাল, 'ওর চোখের নজর আমার খারাপ লাগত। কিন্তু ভাবতাম আমার ভাইয়ের মতন। অন্য সবাই যেমন সবজি তৈরি করে ওকে দিত আমিও দিতাম। ওর বউটা তো ভারি সুন্দর ছিল। কিন্তু আজ দুপুরে যখন শুনলাম—তখন থেকে বুক জ্বলে যাচ্ছিল। মাঝরাতেও মনে হচ্ছিল আমি ভাই বলছি আর সে নিজের পরিচয় লুকিয়ে আমাদের ঠকিয়েছে? অমনি তাই মনে হল স্নান করলে পবিত্র হব। তা যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি যে সে খপ করে হাত ধরবে তা কে জানত!'

সমুদ্রগর্জনকেও এই শব্দ হার মানায়। মারো শালাকে, কেটে ফেলো, ঘর জ্বালিয়ে দাও—ইত্যাদি বাক্য বাঁশ ফাটার মতো বাজতে আবম্ভ করল। পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাগেশ্বর। হে ভগবান, একী করলে! মেয়েছেলেটা এতবড় মিথ্যে বলছে? সে দ্রুত দরজার ছিটকিনিটাও বন্ধ করে জানালার পাল্লাও আটকে দিল। ওরা কি দরজা ভেঙে ঢুকবে? না, সেটা সহজ নয়। তার চেয়ে সে যদি এখনই বেরিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মেয়েটিকে? সব কথা ফাঁস করে দেয়? তবে? সঙ্গে-সঙ্গে ওর মন বলল, কেউ বিশ্বাস করবে না। ওরা বিশ্বাস না করার জন্যে মুখিয়ে আছে। তাহলে?'

দ্রুত পায়ের আওয়াজ তার বারান্দায় উঠে আসা মাত্র পাণ্ডেজির গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'এ্যাই হুঁশিয়ার, কেউ দরজায় হাত দেবে না। ওটা আমার দরজা।'

লোকগুলো বলল একসঙ্গে, 'কিন্তু ও শালাকে এখনই ছিঁড়ে ফেলতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।'

পাণ্ডেজি বললেন, 'এটা তো আমারও লজ্জা। কিন্তু আমি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। হুট করে কিছু করলে পরে আপশোস হয়। প্রথমে ঠিক হোক, নাগেশ্বর শিউশরণের জেনানার গায়ে হাত দিয়েছিল কিনা। কোনও প্রমাণ আছে।'

ঘরের মধ্যে ইঁদুরের বুক নিয়ে দাঁড়ানো নাগেশ্বরের মনে হল পাণ্ডেজির মতো মানুষকে চেনা যায় না প্রথমে। সে মনে-মনে পাণ্ডেজির পায়ে লুটিয়ে পড়ল। একজন বলল, 'এতরাত্রে কে দেখবে? শিউশরণের বউ যখন বলছে তখন সত্যিকথাই বলছে। কোনও মেয়েছেলে ফালতু নিজের বদনাম দেবে না!'

পাণ্ডেজি বললেন, 'জরুর। তবে কিনা একটু প্রমাণ চাই। আমি বলি কি, শিউশরণের বউ যদি তার স্বামী—ও, স্বামী তো এখন তারকেশ্বরে, তাহলে স্বামীর জামা ছুঁয়ে হলফ করে বলুক যে সে যা বলছে সত্য। স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় হল স্বামী, এ কথা মনে রেখে সে যেন কথা বলে।'

হই-চই পড়ে গেল শিউশরণের জামা আনবার জন্য। সবাই এখন চুপচাপ। তারপরেই কান্নাজড়ানো গলা শোনা গেল, 'যা বলেছি সব সত্যি।'

সঙ্গে-সঙ্গে গর্জনটা দ্বিগুণ হল। তারপরেই পাণ্ডেজির গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠল, 'আপনারা কী চান? এই লোকটা এখানে থাকুক না চলে যাক!'

'ওর খুন চাই' 'ওকে মেরে ফেলো', ইত্যাদি চিৎকার উঠল।

পাণ্ডেজি বললেন, 'না, তা হয় না। আমার বাড়িতে খুন হোক এটা আমি চাই না। পুলিশ

তোমাদের ছেড়ে দেবে না। তার চেয়ে ওকে চলে যেতে বলাই ভালো।'

নাগেশ্বর দরজায় প্রথম আঘাত শুনল, 'নাগেশ্বরজি, দরজা খোল।' গলা শুকিয়ে গিয়েছিল নাগেশ্বরের। বাইরে উত্তেজিত সংলাপ চলছে। পাণ্ডেজির প্রস্তাব কেউ মানতে পারছে না। সাড়া দিল না নাগেশ্বর। কয়েকবার ডাকাডাকির পর পাণ্ডেজি উত্তেজিত হলেন, 'আরে নাগেশ্বরজি, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? আমরা তো সবাই জানি তুমি ঘরেই আছ!'

এবার প্রাণপণে চিৎকার করল নাগেশ্বর, 'ও যা বলছে সব মিথ্যে কথা। আমি সন্ধে থেকে ঘরের বাইরেই যাইনি।'

পাণ্ডেজি বললেন, 'তাহলে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? বাইরে বেরিয়ে এসো।'

ঠিক সেই সময় একটা লাঠি জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসতেই নাগেশ্বর তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল। অবিরাম দরজায় শব্দ হচ্ছে, মচমচ করছে পাল্লা। যে কোনও মুহূর্তেই ভেঙে পড়তে পারে সেটা। তার ঘরের চারপাশে উত্তেজিত শব্দ পাক খাচ্ছে।

নাগেশ্বরের সমস্ত শরীর এখন ঘামে জবজবে। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো তার শরীর কুঁকড়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু সে অনুভব করছিল এই দরজা বা জানলা মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়ির বাইরে যে কলকাতা শহর সেটা একদম আলাদা। সেখানে কেউ জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদি একবার সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়, তাহলে—।

নাগেশ্বর উঠে দাঁড়াল। পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল। নানারকম শলাপরামর্শ চলছে বাইরে। সে নিঃশব্দে ছিটকিনি এবং খিল সরাল। তারপর আচমকা দরজা খুলে তিরের মতো বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাগেশ্বর সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে হই-চই উঠল, 'ভাগতা হ্যায়, ভাগতা হ্যায়!'

সেই গভীর রাতে একদল মানুষ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে লাঠিসোটা হাতে কলকাতার রাজপথে ছুটে যাচ্ছিল শিকারে। যে শিকার সে তখন উন্মত্তের মতো দৌড়ে যাচ্ছে সম্মুখে। ওদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছিল। যেহেতু কলকাতা সারারাত জাগ্রত থাকে তাই পথের বাসিন্দারাও এই উত্তেজনায় অংশ নিল। এই মানুষ-শিকার পর্ব শেষ পর্যন্ত কারণ পালটাতে-পালটাতে একটা সাদাসাপটা চেহারা নিয়ে ফেলল। নাগেশ্বর জানত না উত্তরপ্রদেশ কিংবা ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গার সঙ্গে কলকাতার তফাত এখানেই। নগ্নতা ঢেকে একটা মানানসই পোশাক চাপালে লোকে অন্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে এখানে, যুক্তির প্রয়োজন হয় না। পাণ্ডেজি সেকথা জানতেন। সমস্যাটাকে ঘরের বাইরে দিয়ে তাই তিনি নিশ্চিন্ত।



দিয়ে যাওয়া

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া বিজনের একদম অভ্যেস নেই, গায়েপিঠে খুব বেদনা হয়ে যায়। অথচ এই ঘরে যে ছোট ডিভানটা রয়েছে তাতে দুজনের কুলোবে না। আর একটা খাট কিনতে হবে, বাইরের লোকজন এলে মুশকিলে পড়তে হয়। অবশ্য এর আগে এমন কেউ আসেনি যে নিজেদের শোয়ার খাট ছেড়ে দিয়ে ওদের বাইরের ঘরের মেঝেতে শুতে হয়েছে। বিজন মুখ ফিরিয়ে দীপাকে দেখল, শোয়ার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। যেন এইরকম

শক্ত মেঝেতে শুতে ও আজন্ম অভ্যস্ত। দীপা কি অদ্ভুতভাবে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারে! ওর বিয়ের আগের স্বাচ্ছন্দ্য আর এখনকার অভাবটভাবগুলোর মধ্যে যেন কোনও ফাঁকা জায়গা নেই। যেসব মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করে তাদের মনের জোর বোধ হয় খুব জোরালো হয়ে যায়।

এতদিন যে কথাটা মনে হয়নি, ওদের এই দু-ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে এখন। মাত্র বছর দেড়েক ওদের বিয়ে হয়েছে, এখনও ভালো করে ঘরদোর সাজানো হয়নি। জিনিসপত্রে ঘর জুড়ে আছে, কিন্তু তবু সেই দেশলাই বাক্সের উপমাটাই বার বার মনে আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠল বিজন, বড্ড গরম হচ্ছে। এ-ঘরে ফ্যান নেই। ওদের যাবতীয় সম্পত্তি পাশের ঘরে, ওদের শোয়ার ঘরে। আলো না জ্বেলে ভেতরের বারান্দায় এল ও। দরজা খোলার সময় শব্দ বাঁচাতে গিয়েও জোর শব্দ হল। মাঝরাত্রে শব্দগুলোর প্রাণশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে যায়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে-খেতে মনে হল পাশের ঘরেও ফ্যান ঘুরছে না। চিরকাল হাতপাখা চালিয়ে ফ্যানের হাওয়া দাদুর একদম সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় দেখেছে, ঘুমোতে-ঘুমোতে দাদুর একটা হাত পাখাটাকে ঠিক নেড়ে যেত। কী মনে হল, বিজন ওদের শোয়ার ঘরে উঁকি দিল। দরজা বন্ধ করেননি দাদু। পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরটা বেশ দেখা যায়। ও-পাশের জানলা দিয়ে ফিকে চাঁদের আলো ওদের খাটের বাজুতে এসে পড়েছে। সাদা ধপধপে বিছানায় দুই পা সোজা করে দাদু শুয়ে আছেন। দাদুর গায়ের রং অসম্ভব ফরসা, এই নব্বুই বছরেও রঙটা মরেনি। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে কি রূপময় লাগছে এই মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এল বিজন। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ও বুঝতে পারল দীপা জেগে আছে। বিজন বলল, 'ঘুমোওনি?'

পাশ ফিরে শুয়ে দীপা বলল, 'বড্ড গরম, ঘাড় গলা একদম জবজব করছে।'

বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতড়ে একটা সিগারেট বের করলে বিজন। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে চট করে ঘুম আসতে চায় না। এই সময় সিগারেট খেতে মন্দ লাগে না। দেশলাইটা জ্বালতেই অন্ধকার ছিটকে সরে গিয়ে আবার ছুটে এল। শুয়ে-শুয়ে সিগারেটের টান দিয়ে বিজন বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'ধুৎ, দাদুর জন্যে তো আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না। প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এখন দেখছি একদম মাটির মানুষ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আদুরে গলায় বলল, এই, আমাকে একটা টান দাও।'

হাত সরিয়ে নিল বিজন, 'না, তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। বাঙালি মেয়ের সিগারেট খাওয়া কি।' তারপর আবার কী ভেবে দীপার হাতে সিগারেটটা দিয়ে দিল ও। মাঝে-মাঝে দীপার মাথায় এরকম ভূত চাপে। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যেতে বললে নিজেই ধরিয়ে এনে দেয়। এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে বিজন। ব্যাপারটা সবটাই মজা দীপার কাছে। দীপার কাছ থেকে ফেরত নিতে নিতে বিজন বলল, 'এসময় তোমার পেটে নিকোটিন যাওয়া ঠিক নয়, বুঝলে?'

'কেন?'

'পেটের ভিতর যিনি আছেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন!'

সঙ্গে-সঙ্গে বিজনের কোমরে প্রচণ্ড চিমটি কাটল দীপা। প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল বিজন, দীপা চাপা গলায় বলল, 'বদমাস!'

খানিকবাদে দীপা বলল, 'আমাদের এই সতুবদ্যিটা একদম বোগাস, সামান্য কাটা ঘায়ের জন্যে ইঞ্জেকশন দিতে চায়, বোঝো!' ওদের পাড়ার ডাক্তার এস. কে. রায়কে দীপা ঠাট্টা করে সতুবদ্যি বলে। সামান্য জ্বরজারি হলেও ইঞ্জেকশন ছাড়া কথা বলে না। অল্প পয়সায় চট করে অসুখ সেরে যায় বলে রুগি উপচে পড়ে। বেশির ভাগই গরিব গেরস্ত মানুষ। সেই সতুবদ্যির কাছে দাদুকে নিয়ে গিয়েছিল দীপা। দিন সাতেক আগে দাদুর বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ঘা-টাকে আবিষ্কার করেছিল

ও। দাদু বলেছেন, বেশ ক'দিন থেকেই ওটা হয়েছে, সারছে না কিছুতেই। দীপা দু-একটা মলম দিয়ে কমাতে না পেরে আজ সতুবদ্যির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সতুবদ্যি সব দেখেশুনে একটা ইঞ্জেকশানের কোর্স কমপ্লিট করতে বলেছিল। দীপা আপত্তি করায় একজন স্কিন স্পেশালিস্টকে দেখাতে বলেছে। বিজন অবশ্য এতটা গুরুত্ব দিতে রাজি নয় ব্যাপারটাকে। কিন্তু দীপার আবার ডাক্তার দেখানো ব্যারাম আছে। সামান্যতেই ফটফট করে। ও-ই ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ডক্টর নাগের সঙ্গে। চাঁদনিতে বসেন ভদ্রলোক, দীপার বাবার বন্ধু, ফিসটিস কম নেবেন বোধ হয়। অবশ্য দাদুর জন্য খরচা করতে ও পিছু-পা নয়। উনি এসেছেন আজ ন'দিন হল। প্রথমদিন বাজারে গিয়ে ও খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। এমনিতে ওদের সংসারে আলু পেঁয়াজ আর আড়াইশো মাছ কিনলে দিব্যি চলে যায়। বেশি রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে চায় না দীপা। কলকাতার মেয়েরা বিয়ের আগে বড় একটা হেঁসেলের ধারে ঘেঁষেও না। দাদু আসছেন খবর পেয়ে তো ওর নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। অবশ্য দাদু মাছ মাংস ডিম খান না। এই নব্বুই বছর বয়সে ওঁর গলার খাদ্যনালি ছোট হয়ে এসেছে। শক্ত কিছু খেতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। একদম গলানো ভাত ডাল আর একটা সেদ্ধ হলেই চলে যায়, তবে দুধটা চাই। ছেলেবেলায় দাদুকে রোজ শীতকালে এক জামবাটি পায়েস খেতে দেখেছে বিজন। এখানে অবশ্য জামবাটি নেই। শ্যামবাজার থেকে কিনে আনা কাচের বাটিতে পাতলা করে পায়েস রেঁধে দেয় দীপা বিজনের কথামতো, খেয়ে বুড়োর কি ফূর্তি।

এই সময়ে দীপার এতটা খাটুনি উচিত নয়। কিন্তু দাদু যখন নিজে থেকেই এখানে আসার কথা লিখলেন তখন দীপাই যেন বেশি খুশি হয়েছিল। ওদের এই বিয়েটা বিজনের বাড়ির লোক সহজ চোখে নেননি। এমনকী বিজনের বাবাও অমত করেছিলেন প্রথমটায়। একমাত্র এই ঠাকুরদার চাপে সবাইকে মেনে নিতে হয়েছে। মেনে নেননি কেউ, নিলে ছেলের সংসার গুছিয়ে দিতে কেউ না কেউ আসতই। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতটুকু? কিন্তু এই দেড় বছরে ওরা কেউ আসেননি বিজনের কাছে। মনে-মনে একটা দুঃখ ছিল ওর। বোধ হয় দীপা ব্যাপারটার জন্যে নিজেকে দায়ী করত, মুখ ফুটে বিজনকে অবশ্য বলেনি। তা সেই দাদু আসছেন শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল ওরা। ওদের এই কলকাতার বাড়িতে দাদুর আসা মানে ওদের সব অভাব পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এই ফ্ল্যাটটা দোতলায়। যোগাযোগ ছিল বলে খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল বিজন। দক্ষিণ খোলা এই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। মোটামুটি ওদের পক্ষে স্বর্গই বলা যায়। দাদু যেদিন কলকাতায় এলেন বিজন একাই যেতে চেয়েছিল স্টেশনে। দীপা বাড়িতে থাকলে দাদুর খাবার-দাবার জল গরম রাখতে পারবে। কিন্তু দীপা শোনেনি সে কথা। জোর করে সেই ভোররাত্রে প্রায় প্রথম ট্রাম ধরে স্টেশনে ছুটেছিল। অত ভোরে কখনও বেরনো হয় না। বেশ লাগছিল ট্রামে যেতে-যেতে। কলকাতার চেহারাটা ভোরবেলায় একদম অন্যরকম হয়ে যায়। যদিও বিজন দাদুর চিঠিতে জেনেছিল উনি একাই আসছেন তবু ঠিক বিশ্বাস করেনি। এখন শিলিগুড়ি থেকে এক রাত্রেই কলকাতা চলে আসা যায়—কিন্তু দাদুর এই বয়সে একা আসাটা ভাবা যায় না। ট্রেনটা যখন এল প্ল্যাটফর্মে ঠিক তখনি ওরা দাদুকে দেখতে পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন ওদের দেখে। বয়সে শরীর প্রায় কুঁজো হয়ে এসেছে কিন্তু ট্রেন থামামাত্রই যেভাবে নেমে এলেন তাতে বয়সটাকে বোঝা যায় না। ওরা প্রণাম করতেই দুই হাত বাড়িয়ে ওদের আঁকড়ে ধরলেন দাদু, তারপর চোখ বন্ধ করে বুক ভরতি বাতাসটাকে ছেড়ে দিলেন আরামে। দাদু একা এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল বিজন, তার আগেই দাদু বললেন, 'জোর করে চলে এলাম দিদিমণি, তুমি আমাকে দুটো ভাতেভাত খাওয়াতে পারবে তো?' তারপর বিজনের দিকে বুড়ো আঙুল নেড়ে দীপাকে বললেন, 'একে আমার বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না বাপু!' বিজন দাদুর কাঁধ থেকে কাপড়ের

ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। পরে দেখেছে গোটা তিনেক কাপড় আর দুটো লংক্লথের পাঞ্জাবি, দুটো গেঞ্জি, একটা ব্রাহ্মী তেল, একটা চিরুনি নিয়ে দাদু সটান চলে এসেছেন। এতক্ষণ লাঠিটা কনুইতে ঝোলানো ছিল, এবার এক হাতে লাঠি অন্য হাতে বিজনকে ধরে উনি স্টেশন পেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, 'তোমাদের কলকাতার যা গল্প শুনি—আমি থাকতে পারব তো?' তারপর হেসে বললেন, 'তা তোমাদের ঘরের মধ্যে তো আর কলকাতা ঢোকেনি—কি বলো?'

দীপা বড়-বড় চোখ মেলে দাদুকে দেখছিল। বিয়ের পর ওরা যখন বউভাতে শিলিগুড়ি গিয়েছিল তখন দাদুর সঙ্গে খুব বেশি কথা হয়নি। ওদের শিলিগুড়ির বাড়িতে দাদুর সঙ্গে কাকারা থাকেন। বিজনের বাবা দাদুর বড় ছেলে, সারাজীবন রেলে চাকরি করে যাচ্ছেন। এখন রিটায়ার করার মুখে গৌহাটিতে পোস্টেড। ছেলের বউভাতে বিজনের মাকে নিয়ে যেন ক'দিন শিলিগুড়িতে বেড়িয়ে গেলেন। যা কিছু আয়োজন সব দাদুই ভার নিয়েছিলেন। দাদু রিটায়ার করেছেন প্রায় তিরিশ বছর হল। সারাজীবন চাকরি করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা তিরিশ বছর থাকতে পারে না। কিছু শেয়ার কেনা ছিল চা-বাগানে—তার সামান্য ডিভিডেন্ড আর শ'খানেক পেন্সনের টাকায় দাদুর চলতে হয়। কাকারাই সংসার চালান কিন্তু বিজন দেখেছে ওর কিছু ব্যাপার হলে দাদু কোথা থেকে টাকা এনে দরাজহাতে খরচ করেন। প্রায় চার বছর বয়সে দাদুর সঙ্গে শিলিগুড়ির নতুন বাড়িতে চলে আসে ও। বাবা-মাকে ছেড়ে সেই চার বছর বয়স থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর মানসিকতায় দাদু জড়িয়ে ছিলেন। নিজের ছেলেদের বদলির চাকরির জন্যে বোর্ডিং-এ রেখে মানুষ করেছেন কিন্তু নাতিকে কখনও চোখের আড়াল হতে দেননি। বউভাতের দিন সবার সামনে দীপাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কখনও বোকা হবে না, ওকে চোখে চোখে রাখবে, যেমন আমি রেখেছিলাম। এখন থেকে বিজুর দায়িত্ব তোমার ওপর।'

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দাদু বললেন, 'ওরে বাবা, তোমরা দোতলায় থাক নাকি! আমার যে উঠতে বড় অসুবিধে হবে।'

দীপা বলেছিল, 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে ধরে-ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

দাদু বললেন, 'তা ধরো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার নিজের শরীরেই তো রক্ত নেই বাপু। মেয়েমানুষের শরীরে রক্ত না থাকলে সন্তান জড়ভরত হয়ে যায়।' লজ্জায় মাথা নিচু করেছিল দীপা. আড়চোখে বিজনের দিকে তাকিয়েছিল, দাদুর চোখ কি এর মধ্যেই ও ধরা পড়ে গেছে। বিজন দাদুকে দেখছিল। ঠিক সেইরকম আছেন। একটুও পালটাননি। সোজা কথা একদম মুখের ওপর সোজা বলে দেওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মানুষটি বড় অপ্রিয়।

দোতলায় উঠতে বেশ কয়েকবার দাঁড়াতে হল। ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপা দাদুকে শোয়ারঘরে নিয়ে গেল, 'আপনি আগে বিশ্রাম করুন, তারপর জামাকাপড় ছাড়বেন।'

শোয়ারঘরে ঢুকে দাদু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেওয়ালে বিজনের ছোটবেলার একটা ছবি ছিল। দাদুর হাত ধরে হাঁটছে। ছবিটা দেখে দাদু চোখ বড় করলেন, 'ওরে বাবা, আমার ছবি দেখছি এখানে!' তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'দ্যাখো দিদিমণি, বিজুর মুখটা কেমন পালটে গেছে, আমি কিন্তু একই রকম আছি—কি বলো?' ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিজন কথাটা শুনে। হঠাৎ, কি সহজে, সেই ছেলেবেলাটা ওর বুকের মধ্যে একছুটে চলে এসে সমস্ত শরীরে একটা কান্নার কাঁপুনি ছড়িয়ে দিল। বিজন পা টিপে-টিপে বসার ঘরে চলে এসেছিল।

মাঝরাত্তিরে অন্ধকার বেশ চোখ-সওয়া হয়ে যায়। যদিও এ-ঘরে চাঁদের আলো এখনও আসেনি তবু মুখ ঘুরিয়ে বিজন দীপার মুখ দেখতে পেল। এর মধ্যে কোন ফাঁকে ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। বেচারার খুব খাটুনি যাচ্ছে। এখন দুপুরবেলায় একদম ঘুমোয় না, শুধু দাদুর সঙ্গে বকবক করবে। বুড়োদের এমনিতে ঘুমটুম কম হয় কিন্তু এ-সময় দীপার তো ঘুমনো উচিত। অবশ্য হিসেবমতো এখনও প্রায় সাড়ে চার মাস দেরি আছে। এর মধ্যে দুবার চেক-আপ করিয়ে এনেছে বিজন। সব

ঠিক আছে, শুধু রক্তাল্পতার অভিযোগ। একগাদা ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার, খেলে তো কাজ হবে! বিজন আর ওকে ডাকল না। আর ক'ঘণ্টা পরেই তো ভোর হবে। তখন এমনিতেই বেচারার ঘুম ভেঙে যাবে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের দরজায় শব্দ করেন দাদু! আজন্ম দেখে আসছে ও ব্যাপারটা। ছেলেবেলায় ভোররাত্রে দাদু ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলতেন। ঘুমে চোখ এঁটে থাকত, তাতেই জলের ঝাপটা দিতে বলতেন। শীত-গ্রীষ্ম বলে কিছু ছিল না। প্রচণ্ড শীতের ভোরে মাথায় বাঁদুরে-টুপি সারা শরীর পশমে জড়িয়ে দাদুর হাত ধরে ওকে দৌড়তে হত। দাদু এত জোরে হাঁটতেন যে না দৌড়লে তাল রাখতে পারত না বিজন। তখনও আবছা অন্ধকার জড়ো হয়ে থাকত গাছের মাথায়। মহানন্দার ধার দিয়ে দাদু ওকে নিয়ে চলে যেতেন সেই পিলখানা অবধি। সেই সূর্য উঠল, আকাশ সোনায়-সোনায় ভরে গেল, ব্যস, দাদু থেমে গেলেন। দু'হাত জড়ো করে তিনবার জয়গুরু বলে প্রণাম করতেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে নদী দেখত বিজন। সেই ভোরবেলায় ঠান্ডা বাতাসে নদীর ওপর দিয়ে একরাশ মায়াময় কুয়াশা গড়িয়ে-গড়িয়ে যেত। সূর্যের আলো পড়তেই জলের শরীর থেকে ধোঁয়ার সুতো মাথা চাড়া দিয়ে যেন আকাশটাকে ধরতে চাইত। সমস্ত বাল্যকাল এইভাবে সকালগুলো কেটেছে। যেদিন বৃষ্টি হত সেদিন খুব খুশি হত বিজন। বৃষ্টির ভোরে দাদু তাকে ডাকতেন না। বিরাট ছাতাটা মাথায় নিয়ে গামবুট পরে একাই বেরিয়ে পড়তেন উনি। সূর্য ওঠার আগেই যদি বৃষ্টি থেমে যায়! আর মনে-মনে প্রার্থনা করত বিজন যেন রোজ-রোজ ভোরে বৃষ্টি হয়।

কলকাতায় এসে প্রথম ভোরেই এইসব স্মৃতি বিজনের মনে পড়ে গেল। ভোরবেলায় দরজায় শব্দ শুনে দীপার ঘুম ভেঙেছিল আগে। বিজনকে ঠেলে তুলতে ও দরজা খুলে দেখল দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। সাজগোজ হয়ে গেছে, হাতে লাঠিটা। দীপা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় যাচ্ছেন দাদু?'

'একটু বেড়িয়ে আসি ভাই। দরজা খোলা থাকবে কিনা, তোমাদের ঘুম ভাঙাতে হল।'

বিজন বলল, 'এখানে তো কাছেপিঠে নদী নেই, গঙ্গা তো অনেকটা দূর।'

'নদীর কি দরকার হয় সবসময়?' দাদু হাসলেন।

'না, তবে আপনি কি একা-একা হাঁটতে পারবেন, রাস্তাঘাট খোঁড়া, গাড়িঘোড়া আছে।' বিজনের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না কলকাতায় দাদুর এই মর্নিং-ওয়াকের ব্যাপারটা। কিন্তু এর মধ্যেই দীপা চট করে শাড়ি পালটে চলে এসেছে, এসে দাদুর হাত ধরল, 'চলুন, আমরা ঘুরে আসি।'

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'হুম, আমার চেয়ে তোমার এতে উপকার হবে বেশি, বুঝলে?'

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় অন্ধকারে ঠুকঠুক করে দাদুকে নিয়ে নামতে-নামতে ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ দীপা চেঁচিয়ে বলল, 'এই, হিটারে জল গরম করে রেখো, আমি এসে চা করব।'

কথাটা কানে আসতেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল বিজন। এমনিতে এটা কিছু নয়। সংসারের অনেক কাজে ও দীপাকে সাহায্য করে। কিন্তু দাদুর সামনে একথা দীপা না বললেই পারত। বেচারা জানে না ওদের বাল্যকালে বাড়ির পুরুষরা এইসব কাজ করলে তাদের স্ত্রৈণ বলা হত। বিস্ময়ে বিজন দেখল, কথাটা শুনেও দাদু পিছন ফিরে ওকে দেখলেন না। বরং দীপার সঙ্গে গল্প করতে-করতে নেমে গেলেন। লজ্জা পাওয়ার জন্য নিজেকে নির্বোধ বলে মনে হল বিজনের এবার।

এখন প্রতিদিন ভোরে দীপা দাদুর সঙ্গে মর্নিংওয়াকে যাচ্ছে। ভোর পাঁচটায় দাদু এসে দরজায় শব্দ করলেই দীপা তড়াক করে উঠে পড়ে। ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করে বিজন। কিন্তু একা-একা শুয়ে ঘুমোনোর অভ্যেসটা এই দেড় বছরে কেমন করে যে চলে গেছে—কিছুতেই ঘুম আসে না। আশ্চর্য, দাদু এখন ওকে মর্নিং ওয়াকে সঙ্গী হতে বলেন না।

পরদিন অফিসে যাওয়ার আগে দাদুকে ডাক্তার নাগের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে দীপার সঙ্গে কথা বলে নিল বিজন। ওর অফিস ধর্মতলায়। সেখান থেকে এত দূরে ফিরে এসে আবার চাঁদনিতে

ফিরে যেতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। তার চাইতে বরং দীপা যদি ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যায় তাহলে বিজন অফিস থেকে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে সরাসরি চেম্বারে চলে যেতে পারে। অন্যসময় হলে দীপা রাগ করত। বলত, সব ঝক্কি বিজন ওর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ঝগড়াঝাঁটির সময় বলেই ফেলে, 'তুমি খুব স্বার্থপর।' কিন্তু এখন প্রস্তাবে ও দ্বিমত করল না। ঠিক হল ডাক্তারের কাছ হয়ে ওরা কালীঘাট মন্দিরে যাবে। দাদুকে টুকটাক করে কলকাতা দেখানো হচ্ছে। আজ এই সুযোগে কালীঘাট হয়ে যাবে। আর এখন বিজন হঠাৎ আবিষ্কার করল, এত বছর ও কলকাতায় আছে, কখনও কালীঘাট যাওয়ার কথা মনে আসেনি। মানুষ নিজের হাতের তালুর দিকে সবচেয়ে কম সময় তাকায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বিজন চৌরঙ্গিটা হেঁটে এল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দূরত্বটা এত সামান্য যে মিনিট দশেকের মধ্যে ও চাঁদনিতে পৌঁছে গেল। জায়গাটায় ভিড়ভাট্টা বেশি। ফলওয়ালাগুলো রাস্তা জুড়ে চিৎকার করছে। হকারদের জ্বালায় নিশ্চিন্তে ফুটপাথ ধরে হাঁটা মুশকিল। নম্বর মিলিয়ে একটা গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ও। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির পাশে অনেকগুলো মেনপ্লেটের মধ্যে ডক্টর নাগের নাম দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল বিজন। দীপারা নিশ্চয়ই এখনও আসেনি। ট্যাক্সি পেলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই অবশ্য আসার কথা। বিজন সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে সতর্ক চোখ রেখে সিগারেট ধরাল। সারাগায়ে অদ্ভুত ধরনের পাঁচড়ার মতো ঘা নিয়ে এক ভদ্রলোক আস্তে-আস্তে ওপরে উঠে গেলেন। নিশ্চয়ই ডক্টর নাগের কাছে এসেছেন। হঠাৎ ও খুব বিরক্ত হয়ে পড়ল দীপার ওপর। খামোকা একটা বুড়ো লোককে নিয়ে এইসব চর্মরোগগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে বসাতে চাইছে দীপা! রোগ-রোগ বাতিকটা বোধ হয় ওর মা ওকে দিয়েছেন। শাশুড়ির কথা মনে করলেই নিম্নাঙ্গে বাত, পেটে আমাশা, উইস্ড এবং অম্বল, রক্তচাপের হ্রাসবৃদ্ধি মনে পড়ে। বিজন নিজে ডাক্তারদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। কিন্তু ও দেখেছে, এই কলকাতার সবরকম বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে চেনে এমন লোকের অভাব নেই। সেখানে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে শুনতে হয়, সেকি, ডক্টর মিত্রকে চেনেন না! কলকাতায় ওর চেয়ে বড় গাইনি কেউ নেই।' অথবা, 'ডাঃ সেনের নাম শোনেননি? কি বললেন ইন্ডিয়ার টপ হার্ট স্পেশালিস্ট। মেয়েলি কোনও অসুখ অথবা বুকের ব্যামো না থাকলে কেন যে ওদের চিনতে হবে বুঝতে পারে না বিজন। এই ব্যাপারে দীপা অবশ্য খবরাখবর রাখে। টপাটপ ডাক্তারদের নাম বলে দিতে পারে।

খানিকবাদেই ওরা এসে গেল। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে দিয়ে দাদুর হাত ধরে বিজন গাড়িবারান্দার তলায় চলে এল। চারপাশে এত লোকের চিৎকার, দ্রুত চলাফেরা, রিকশাওয়ালাদের ঘণ্টির শব্দ— দাদু কেমন বোকা হয়ে গেছেন। দীপা বলল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

বিজন বলল, 'মিনিট পাঁচেক। তুমি ওই সিঁড়িটা দিয়ে এগিয়ে যাও, আমি দাদুকে নিয়ে আসছি।'

সিঁড়িটা প্রায় খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। এক পা করে উঠে দাদুকে দাঁড়াতে হচ্ছে। উঠতে-উঠতে বললেন, 'এইসব বাড়িগুলো কবেকার বিজু?'

সিমেন্টওঠা সিঁড়ির ধাপে চোখ রেখে বিজন হাসল, 'ক্লাইভের আমলের হবে!'

'কিন্তু দেখছ কি শক্ত গাঁথুনি! এরা সিঁড়িতে আলো দেয় না কেন?' দাদু এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে অন্য হাতে বিজনকে নিয়ে উঠেছিলেন। বিজন উত্তর দিল না। কলকাতায় অনেক কিছু স্বাভাবিক ঘটনা আছে যা প্রথম চোখে মেনে নেওয়া যায় না। কলকাতায় প্রথম পড়তে এসে হোস্টেলের ঘরে ছয়জনকে শুতে হবে ভেবে ওর কান্না এসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ির স্বাচ্ছন্দের জীবনে এরকম অভ্যাস ওর ছিল না। এখন তো এটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ওপরে উঠে বিরাট চাতাল, তাকে ঘিরে ইউ-শেপে ঘরগুলো সাজানো। ডক্টর নাগের চেম্বারটা দেখতে পেল বিজন। বেশ ভিড় এই সন্ধেবেলায়। ওদের দেখে দীপা এগিয়ে এল, 'আপনি একটু বসুন দাদু। একজন পেসেন্ট ভেতরে আছেন, তারপরেই আপনাকে ডাকবে।'

বিজন দেখল বসার ঘরটা বেশ বড়। অনেক চেয়ার ছড়ানো। মাঝখানে একটা কাঠের গোল

টেবিলে কিছু ইংরেজি হিন্দি পত্রিকা রাখা আছে। কাগজের রং দেখে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকমাস আগে ছাপা হয়েছে। ভিজিটার্স তো রোজ পালটাচ্ছে তাই পত্রিকাগুলো পুরোনো হয় না।

একটা সোফার অর্ধেকটা খালি পেয়ে দাদুকে নিয়ে বসল বিজন। ভেতরে ডাক্তারের চেম্বার। সুইং ডোরটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীপা। আর কেউ ঢোকার আগেই ও চান্স নেবে। আশেপাশে তাকিয়ে বিজনের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। এই ঘরের অর্ধেক মানুষ সুস্থ নয়। গায়ের চামড়ায় নানারকম রোগ কিলবিল করছে। ওর সামনের চেয়ারে এক ভদ্রলোক মুখ নামিয়ে কাগজ পড়ছেন। বিজন লক্ষ করল ভদ্রলোকের ঘাড়, গলা কাঁঠালের মতো উঁচু-উঁচু হয়ে আছে। অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়তে লাগল বিজনের। এই সব স্কিন ডিজিস কি সংক্রামক নয়? এই যে চেয়ারে ও বসছে সেখানে একটু আগে যদি এই ধরনের রোগগ্রস্ত কেউ বসে থাকেন তবে বিজনের তো তা হতে পারে।

হঠাৎ দাদু বললেন, 'বিজু, তুমি ডাক্তার হলে পারতে।'

অন্যমনস্ক ছিল বিজন, ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছেন?'

সেইসময় ভেতরের দরজা খুলে এক মহিলা আর পুরুষ বেরিয়ে এলেন। দীপা বলল, 'এসো।' বলে কাউকে কিছু না বলতে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটু গুঞ্জন উঠল ঘরে, হয়তো যাঁরা আগে এসেছেন তাঁরাই বিরক্ত হলেন। বিজনের অস্বস্তি হচ্ছিল, দীপা মাঝে-মাঝে এমন সব ব্যাপার করে ফেলে। অবশ্য এখানে যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা দাদুর মতো নব্বুই পেরোননি। সে হিসেবে নিশ্চয়ই দাদুকে ওঁরা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

চেম্বারে ঢুকে বিজন ডক্টর নাগকে দেখতে পেল। বয়স হয়েছে নিশ্চয়ই সত্তরের কাছাকাছি। সাদা হাফ হাতা জামা, মুখটা হাসি-হাসি। দীপা এগিয়ে এসে দাদুকে ধরে চেয়ারে বসাল, মুখোমুখি। দু'পাশে আরও দুটো চেয়ারে বিজনরা বসল। দীপা বলল, 'আমাদের দাদু।'

ডক্টর নাগ হাতজোড় করে নমস্কার করতে দাদু ঝুঁকে পড়ে সেটার সম্মান দিলেন। এই একটা ব্যাপারে দেখেছে বিজন, মাঝে-মাঝে ওর বিরক্তিও লেগেছে, সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, দাদু কোনও সম্মানীয় মানুষ অথবা ব্রাহ্মণ কেউ হলে তা তার বয়স যাই হোক না কেন নমস্কার করার সময় প্রায় ঝুঁকে পড়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এক সময় মনে হত এটা একধরনের ক্রীতদাস-মনোবৃত্তি। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ রাজত্বে থেকে চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এখন ডক্টর নাগকে প্রায় প্রণামের ধরনে নমস্কার করাটা ওর ভালো লাগল না। ডক্টর নাগ বললেন, 'বলুন কী হয়েছে আপনার?' কথা বলার সময় এক ধরনের স্নেহ ঝরে পড়ে, কানে বেশ আরাম দেয়।

দাদু হাতটা সামনে গিয়ে এলেন। বিজন এইবার দেখল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দীপা ব্যান্ডেজ দিয়ে আঙুলের ফাঁকটা ঢেকে দিয়েছে। ডক্টর দাগ দীপাকে ইঙ্গিত করতে দীপা হাতটা টেনে নিয়ে ব্যান্ডেজটা খুব সতর্ক হাতে খুলে নিল। টেবিলল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে আলোটা হাতের ওপর ফেললেন ডক্টর নাগ। তারপর মনোযোগ দিয়ে দুই আঙুলের মাঝেখানের ঘা-টা দেখতে লাগলেন। বিজন এই চড়া আলোয় দাদুর হাতের চামড়া-শিরা দেখছিল। পোস্ট অফিসের সিলের মতো সময় তার চিহ্ন দিয়ে ঘিরে ফেলেছে দাদুকে। হঠাৎ ডক্টর নাগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত বয়স হল আপনার?'

দাদু বললেন, 'এইট্টিন এইট্টিফোরে জন্ম আমার।'

মুখ তুলে তাকালেন ডক্টর নাগ, 'শরীর তো দেখছি বেশ ভালো।' তারপর একটা লম্বাটে বাক্স খুলে সুঁচের মতো জিনিস বের করলেন 'হাতটাকে ছড়িয়ে দিন তো, আঙুলগুলো স্প্রেড করুন—হ্যাঁ!' তারপর সেই সূচটাকে ঘায়ের কাছাকাছি চামড়ার ওপর ফোটাতে লাগলেন, 'লাগছে?'

দাদু চোখ বন্ধ করে কিছুটা ভেবে বললেন, 'না তো!'

আরও জোরে বিদ্ধ করে প্রায় ফিসফিসিয়ে ডক্টর নাগ বললেন, 'এবার!'

দাদুর হাতটা সামান্য নড়ে উঠল, 'এবার যেন লাগছে, কিন্তু আরও লাগা উচিত ছিল।' ডক্টর নাগ সোজা হয়ে বসে দাদুর মুখের দিকে তাকালেন খানিক, তারপর উঠে এসে টেবিলল্যাম্পটাকে

দাদুর মুখের ওপর ঘুরিয়ে দিলেন। বিজনের হঠাৎ মনে হল, কোনও নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে যেন লাইটম্যান ফোকাস ফেলল। ডক্টর নাগ দাদুর জিভ দেখলেন, ঝুঁকে পড়ে নাক আর কান দেখলেন। তারপর দাদুর অজান্তে কানের লতিতে সেই সূঁচটা সামান্য ফুটিয়ে দিলেন। বিজন দেখল দাদুর শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না।

পাশের বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ডক্টর নাগ সিগারেট ধরালেন। এবার টেবিলল্যাম্পটা তাঁর সামনে মুখ ফেরানো। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেন ডক্টর নাগ। বিজনের মনে হল ওঁকে কেমন অন্যরকম লাগছে। দীপার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন ভদ্রলোক। তারপর প্রেসক্রিপশন-প্যাডটা টেনে নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে লিখে গেলেন। বিজন লক্ষ করেনি দীপা কখন ব্যাগ থেকে টাকা বের করে হাতে রেখেছিল, এখন ও টাকাটা টেবিলের ওপর রেখে একটা পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে দিল। ডক্টর নাগের হাবভাবে বিজন একদম স্বস্তি পাচ্ছিল না। দাদুর দিকে ও তাকাল। ও দেখল দাদু মুখ তুলে দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রেসক্রিপশনটা দীপার দিকে ভাঁজ করে এগিয়ে দিয়ে ডক্টর নাগ বললেন, 'অফ হ্যান্ড বলা মুশকিল, আপনারা ওঁকে ইমিডিয়েটলি একবার ট্রপিক্যালে নিয়ে যান। ওরা কারেক্ট ডায়োগনিসিস করবে। তবে আমার মনে হয় ওরা আমাকেই সমর্থন করবে।' তারপর দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো বাইরে থাকেন, না? তা যে ওষুধ ইঞ্জেকশন দিলাম এগুলো নিয়মিত ব্যবহার করুন, ঠিক হয়ে যাবে। তবে কলকাতায় আর বেশিদিন থাকা বোধহয় উচিত হবে না। বাইরের জলহাওয়া শরীরকে অনেকখানি হেল্প করবে।'

হঠাৎ বিজন দেখল দীপার হাত থরথর করে কাঁপছে। ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে হঠাৎ, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ও, নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। দাদুও লক্ষ করছেন ব্যাপারটা। বিজন কিছু বলার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে দিদিমণি?'

হঠাৎ দীপা একদম শান্ত হয়ে গেল, বিজনের দিকে একবার তাকিয়ে দাদুকে বলল, 'কিছু না, আপনি এবার চলুন, অনেকে অপেক্ষা করছে।'

ওরা উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কী হয়েছে?' ডাক্তার কী বললেন?'

'তেমন কিছু নয়।' দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল।

নিচের ফুটপাথে আসতেই ওরা আকস্মিকভাবে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। কোনও পেসেন্ট হয়তো এইমাত্র এল ট্যাক্সিটায়। দাদুকে নিয়ে দীপা পেছনে বসল, বিজন সামনে। ট্যাক্সিওয়ালা কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় দাদু বলল, 'বাড়ি ফিরে চল বিজু, কালীঘাট না হয় অন্যদিন হবে।'

বিজন ঘুরে বসে হাত বাড়াল দীপার দিকে, 'প্রেসক্রিপশনটা দাও।' ব্যাগ খুলে প্রেসক্রিপশনটা নিস্পৃহের মতো এগিয়ে দিল দীপা। বিজন সামনের দিকে ফিরে বসে ড্যাশবোর্ডের আলোয় কাগজের ভাঁজ খুলে ধরল। ডাক্তাররা যে কেন হাতের লেখাগুলো ভালো করে না! ও আজ অবধি যত হাতের লেখা দেখেছে তার মধ্যে বোধহয় ডক্টর নাগের হাতের লেখাই সবচেয়ে খারাপ। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে ও মুখ তুলে তাকাতেই বোম্বাইয়ের একজন নায়িকাকে খুব লাস্য মাখানো চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখল। সিনেমা হলের সামনে লোক গিজগিজ করছে। সামনে সারিবদ্ধ গাড়ি। সিনেমা হলের আলোয় প্রেসক্রিপশনটা পড়তে লাগল বিজন।

মুহূর্তে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল ওর। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা হিমস্রোত চলকে-চলকে উঠল যেন। শব্দ দুটোর ওপর চোখ রেখে ওর চোখ ফেটে জল এসে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বিজন পাথরের মতো বসে রইল। এখন ট্যাক্সিটা চলছে। ধর্মতলা স্ট্রিটের দু-পাশের জনতা দোকানপাট বিজনের চোখে কোনও কিছুর ছায়া পড়ছিল না। শুধু বুকের মধ্যে শব্দ দুটো ক্রমশ ওজন বাড়িয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। প্রেসক্রিপশনটা আবার একবার দেখে ভাঁজ করে ফেলল বিজন।

ডক্টর নাগ তাঁর স্নেহময় গলায় শব্দ দুটো কিভাবে উচ্চারণ করতেন? কেমন লাগত শুনতে—ড্রাই লেপ্রসি।

এই সময় দাদুর গলা শুনতে পেল বিজন, 'প্রেসক্রিপশনে কী লিখেছে বিজু?' বিজন মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। ড্রাইভারের সামনে রাখা আয়নায় ও হঠাৎ দাদুকে দেখতে পেল। দুটো হাতে লাঠিটা মুঠোয় ধরে তার ওপর গাল চেপে দাদু আয়নাটার দিকে চেয়ে বিজনের মুখ দেখছেন। চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল বিজন। দাদু বললেন, 'কুষ্ঠ হলে শুনেছি শরীরের সাড় চলে যায়, তবে কি আমার কুষ্ঠ হয়েছে?'

দাদুর গলার স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল, বিজন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চা ছেলের মতো হু-হু করে কেঁদে ফেলল ও।

অনেকক্ষণ দাদু কিছু কথা বললেন না। কান্না একটু সামলালে বিজন শুনতে পেল, 'দিদিমণি, আমার কান নাক কি ফুলে গেছে মনে হচ্ছে, লালচে-লালচে লাগছে?'

কোনওরকমে দীপা বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে না।'

শরীরটা সিটের ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দাদু আপনমনে বললেন, 'এই এতগুলো বছর বেঁচে থাকলাম কি এই জন্যে।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিজন দেখল দাদু বেশ সোজা হয়ে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। পেছনে দীপা। এর আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অন্তত উনি দীপার হাত ধরতেন, নইলে হাঁটু কাঁপে, কিন্তু এখন তাঁকে আরও শক্ত মনে হল।

ওপরে এসে বিজন শোওয়ার ঘরে ঢুকল না। দীপা এসে বলল, 'দাদু একটু একা থাকতে চাইছেন। আর রাত্রে শুধু দুধ খেতে চাইছেন।'

বিজন কিছু বলল না। দীপা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাথরুমে চলে গেল। ওর যাওয়ার ধরনটা ভালো লাগল না বিজনের।

বিজন জানালার পাশে বসে সিগারেট ধরাল। এখান থেকে সামনের পার্কের একটা কোণ দেখা যায়। ইলেকট্রিক আলোর তলায় বসে একটা ফুচকাওয়ালা ভিড় জমিয়ে বিক্রি করে যাচ্ছে। কয়েকজন পরিচিতমুখ বৃদ্ধ বেঞ্চিতে বসে। বাচ্চারা যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। পার্কটা এখন একদম শান্ত, চুপচাপ। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় ঝাঁপসা হয়ে গেল পার্কটা, ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল লাঠি হাতে দাদু দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন আর সাত বছরের ছোট্ট বিজন দৌড়ে-দৌড়ে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে চাইছে। দাদুর কথা মনে হলেই এই ছবিটা ওর সামনে চলে আসে। আরও ছোটবেলায় দাদুর গায়ের গন্ধ না পেলে ওর ঘুম আসত না। মানুষ তার ছেলেবেলার কোন সময় অবধি স্মৃতিতে রাখতে পারে? বিজন খুব ঝাপসাভাবে একটা দৃশ্য দেখে, সে দাদুর কোলে বসে আছে, সামনে থালায় অনেক কিছু সাজানো। দাদু হেসে উঠে বললেন, 'ও কলম ধরেছে, তার মানে লেখক হবে, রবিঠাকুর হবে।' ওটা কি ওর অন্নপ্রাশনের ঘটনা? তা কি মনে রাখা যায়? কিন্তু ও জানে দাদুর সামনে দাঁড়ালে দাদু ওর মনের প্রত্যেকটা স্তর চিনতে পারেন। যেমন চোখ বন্ধ করে কোনও রাজমিস্ত্রি নিজের হাতে গড়া চারতলা বাড়ির প্রতিটি ইট চিনে নিতে পারবে। দীপাকে বিয়ে করার সময় এই মানুষটি তার বিরাট হাত দিয়ে সমস্ত বাধা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।

কুষ্ঠ হলে মানুষ মারা যায়? নিশ্চয়ই যেত কখনও। কিন্তু এখন, এখন তো কত ওষুধ বেরিয়েছে। ওর মনে আছে একবার দাদুর সঙ্গে বর্ষাকালে তিস্তা পেরুচ্ছিল বিজন। নৌকোয় গাদাগাদি করে মানুষ বসে। মাথার ওপর বর্ষার মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে হাওয়ার দাপটে ছুটন্ত ঢেউগুলোর ফাঁক দিয়ে নৌকো নিয়ে যাচ্ছিল মাঝি। যাত্রীরা কেউ কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে বুড়ো হালের মাঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠছিল, 'তিস্তা মাইকি জয়!' টলমলে নৌকোয় দাদুর কোমর জড়িয়ে বসেছিল বিজন। বুকের মধ্যে শিরশিরানি ভয়। হঠাৎ নৌকোটা খুব বড় একটা ঢেউ-

এর মাথায় চড়ে বসে প্রায় কাত হয়ে পড়ল। অনেকখানি জল ছিটকে এল ওদের গায়ে। গেল-গেল চিৎকারের সঙ্গে বিজন দেখল একটা লোক তাদের পিছন থেকে ঝুপ করে জলে পড়ে গেল, আর একটু হলেই নৌকোর তলায় চলে যেত সে, দাদু চকিতে হাত বাড়িয়ে তার জামা ধরে ফেললেন। তারপর অনেক কষ্টে যখন তাকে ওপরে টেনে আনলেন দাদু, তখন শিউরে উঠেছিল বিজন। লোকটার নাক কান গলে গেছে। মাথায় চুল নেই। আঙুল না থাকায় নৌকো ধরে বসতে পারেনি। ওর মনে পড়ল নৌকোতে ওঠার সময় সে ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। বোধ হয় কাউকে নিজের চেহারা দেখাতে চায়নি। আর দাদু যখন তাকে টেনে তুলেছিলেন তখন কেউ তার সাহায্যে হাত বাড়াতে চায়নি। তিস্তার জলে হাত ধুয়ে দাদু বলেছিলেন, 'মহাপাপের ফল কি এত তাড়াতাড়ি মেটানো যায়!'

কথাটার মানে তখন বোঝেনি বিজন। এখন এই সন্ধেবেলায় পার্কের ওপাশে বাড়িগুলোর মাথায় আসা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেই লোকটাকে পরিষ্কার মনে পড়ে গেল। এখন ও জানে কুষ্ঠ কোনও মহাপাপের ফল নয়। কিন্তু দাদু তখন কথাটা কী বিশ্বাসে বলেছিলেন? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা শরীর নিয়ে যারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে না তারা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী। কিন্তু যে কোনও ব্যতিক্রমের পেছনেই তো কারণ থাকে। দাদু কি তাকেই মহাপাপ বলেছিলেন? ও হঠাৎ দেখতে পেল দাদু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাদুর দিকে তাকিয়ে ও চোখ দু'হাতে ঢেকে ফেলছে। ওঁর নাক নেই, কান নেই, হাতের আঙুল খসে গেছে। ঠোঁটের আড়াল না থাকায় দাঁতগুলো বীভৎস লাগছে, দাদু বলছেন, 'চলো হে, সূর্যপ্রণাম করে আসি।'

খুট করে আলোটা জ্বলে উঠতে চমকে উঠল বিজন। দীপা ঘরে এসেছে কখন, 'অন্ধকারে বসে আছ?'

বিজন দেখল, দীপার চেহারাটা একদম পালটে গেছে এই কয় ঘণ্টায়। এবং এতক্ষণ পরে এই প্রথম দীপার পেটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাড়া খেল ও। ডক্টর নাগ প্রেসক্রিপশনে আন্ডারলাইন করে লিখেছেন, 'একদম সংক্রামক নয়'। কিন্তু—। কিছু কি বলা যায়?

খুব আস্তে-আস্তে বিজন বলল, 'কি যে হয়ে গেল!'

দীপা বলল, 'একা বসে থেকো না। দাদু না চাইলেও তোমার ও-ঘরে যাওয়া উচিত। আমি ওঁর দুধ নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিজেকে শক্ত করো।'

দীপা চলে গেলে বিজন দাদুর ঘরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল জানালার ধারে চেয়ারে দাদু বসে আছেন। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, 'কে বিজু, এসো। না, না বিজু তুমি খাটে বসো না।'

প্রায় একটা চাপা আর্তনাদ করল বিজন, 'দাদু!'

'আমি চলে গেলে এই ঘর হোয়াইটওয়াশ করে নিলে ভালো করবে। বিছানার চাদর-টাদরগুলো ফেলে দিলে ভালোই, নইলে লাইজলে ধুয়ে নিও। ধোপার বাড়ি দিও না। আর কাল সকালে গিয়ে শিলিগুড়ির টিকিট কিনে এনো। ট্রেনে না পাও প্লেনে। আমি টাকা দেব।' দাদু খুব স্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলে গেলেন।

'কালই চলে যাবেন?' কথাটা বলতে গিয়ে বিজন চমকে উঠল। ও কি মনে-মনে দাদুর চলে যাওয়া চাইছে? নইলে প্রশ্নটা করার সময় হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি চলকে উঠল কেন ওর মনে? নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ ছোট মনে হল ওর।

দাদু ওর মুখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমার শিলিগুড়িতে যাওয়া প্রয়োজন।'

'কিন্তু ডাক্তার তো আপনাকে ট্রপিক্যালে দেখাতে বলেছে। ওখানে দেখানোর আগে আপনার অসুখটা সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।' বিজন বলল।

দাদু হাসলেন, 'ধরো তোমার ট্রপিক্যাল পরীক্ষা করে বলল এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের লেপ্রসি, ভীষণ সংক্রামক, তুমি কী করবে?'

বিজন কোনও উত্তর দিল না। দাদু আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। এই কয়েক ঘণ্টায় মানুষটার চেহারা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। ওদের বংশে নাকি এত দীর্ঘ সময় কেউ বাঁচেনি। বোটানিকসের সেই গাছটার মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। মূল শেকড় থেকে যে কাণ্ড বেরুল তার অজস্র শাখা এবং তা থেকে প্রশাখা—সবই মাটিতে শিকড় নামিয়ে দিয়ে মজবুত হল। এখন মূল শেকড়ে যখন ঘুণ ধরল, শুকিয়ে গেল, তখন তাকে চেনা গেল না, প্রয়োজন হল না।

হঠাৎ দাদু বললেন, 'বিজু, আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

উত্তর দিতে পারল না বিজন। এ কথা জোর করে চেঁচিয়ে বলা যায় না।

'দ্যাখো, আমার এই শরীরটার বয়স তো অনেকদিন নব্বুই পেরিয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি আমার শরীরটার কত রকম চেহারা দেখলাম। নিজের শরীরের জন্য এক সময় ভীষণ মায়া হত। তারপর রোদ জল ঝড়ে এই শরীরটার ওপর শ্যাওলা পড়তে দেখলাম। তা সেটা বোধ হয় যাট বছর বয়স হবে। দেখলাম শরীরের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। হাতের গলিগুলো কেমন ঢিলে হয়ে গেল। তখন তুমি সেই চার বছরের বিজু। কচি-কচি হাত-পা, গাল টিপলেই রক্ত ছুটে আসে। তোমাকে বুকে নিয়ে যখন ঘুমোতাম তখন নিজের শরীরটার কথা মনে থাকত না আর। তোমাকে আমি একটু-একটু বড় করে তুললাম। নিজের কথা মনে থাকল না আর। অতীতের কথা ভাবলেই তো বর্তমানের জন্য কষ্ট হয়। আমার নিজের দশ-বারো বছরের চেহারাটার কথা মনে এলেই তোমার দিকে তাকাতাম। তুমি তো আমার শরীরের আদল পেয়েছ। আমার আপশোস থাকত না। শুনেছি সাধক যাঁরা, তাঁরা নিজের শরীর ছেড়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে ঘুড়ে বেড়ান। আমার তো সে ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু মনে-মনে তোমার যৌবনকে আমার বলে ভাবতে একটুও কষ্ট হত না। এটা যে কি ধরনের তৃপ্তি তুমি বুঝবে না। এখন এই শরীরের জন্য আমার একটুও কষ্ট নেই। আমি তো বড়জোর দু'তিন বছর বাঁচতাম। এই জীর্ণ শরীরটায় কুষ্ঠ হোক আর নাই হোক কি এসে যায় তাতে! তুমি তো সুস্থ হয়ে বেঁচে আছ, বিজু তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা।' একনাগাড়ে বলা কথাগুলো শেষদিকে যেন ভারী হয়ে আসতে লাগল। দাদু যেন ওজন বইতে না পেরে হাঁপাচ্ছিলেন। তারপর আবার বললেন, 'মনে করে কাল টিকিট নিয়ে এসো। শিলিগুড়িতে না গেলে আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না।' বিজন দেখল দীপা এক গ্লাস দুধ আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল না বিজন।

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া কোনও ব্যাপার নয়, বিজন মড়ার মতো পড়েছিল। আজ রাত্রে ওর খাওয়া হয়নি তেমন, খাওয়ার ইচ্ছেটাই শরীরে ছিল না। দীপা কী করছে কে জানে। এখন রাত অনেকটা হবে। দীপা ওর দিকে পাশ ফিরে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। বিজন জানে দীপা ঘুমোয়নি। দাদুর ব্যাপার নিয়ে দীপা কোনও কথা বলছে না। অবশ্য আলাদা করে বলার মতো সময়ও পায়নি। বেচারা যে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে এটা বোঝা যায়। আজ রাত্রে দাদুর ঘা-টা ড্রেস করে মলম লাগিয়ে দেওয়া হল না। রোজ দীপাই করত। এমনিতেই ওর ঘেন্নাপিত্তি কম। আজ কি ওর খেয়াল হয়নি না সাহস পায়নি!

হঠাৎ দীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কী হবে?'

বিজন এইরকম প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল, 'ধ্যুৎ, একটা ডাক্তার কোনও টেস্ট না করেই বলে দিল লেপ্রসি আর সত্যি হয়ে গেল—এটা কি সম্ভব! কত পরীক্ষা করে তবে বোঝা যায়, ডাক্তারটাকে আমার ভালো লাগছে না!'

'কিন্তু দাদু তো একদম নার্ভাস হলেন না। এমনকী আবার পরীক্ষা করাবার কোনও আগ্রহ নেই। আমার হঠাৎ মনে হল উনি জানতেন।' দীপা বলল।

'কি যা-তা বলছ?' বিজন প্রতিবাদ করল, 'জেনে-শুনে কি উনি আমার কাছে আসবেন!'

দীপা কোনও উত্তর দিল না প্রথমটায়, তারপর বলল, 'আমার বাড়ির লোকেরা কী ভাববে কে জানে! ডাক্তার নাগ কি না বলে ছাড়বেন!'

এই ব্যাপারটা ভাবেনি বিজন। দীপার আত্মীয়স্বজন এমনকী বিজনের নিজের বাড়ির লোকেদের কী প্রতিক্রিয়া হবে? দাদুকে কি কাকারা একঘরে করে দেবে? নাকি কোনও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে?'

বিজন বলল, 'ডাক্তার তো বলেছে সংক্রামক নয়।'

'কেউ বিশ্বাস করে!' চট করে জবাব দিল দীপা, 'আমার জন্যে নয়, এই পেটেরটার জন্যে ভয় হচ্ছে গো।'

'তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে, এত ভয় পাও কেন?' বিজন নিজের সঙ্গে যেন কথা বলল।

'নিজের জন্যে আমি ভয় পাই না।'

'দাদু কালই চলে যেতে চাইছেন।'

'আমি আর পারছি না।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এ বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও, এখানে থাকার সাহস আমার নেই।'

বিজন এক হাত বাড়িয়ে দীপাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন ঠান্ডা দীপার শরীর।

'দীপা, তুমি খুব ভালো মেয়ে, প্লিজ, দাদু যেন না বুঝতে পারেন কিছু!'

হঠাৎ দীপা বলল 'আচ্ছা, দাদু এটাকে এত স্বাভাবিকভাবে নিলেন কেন?'

বিজন বলল, 'একটা বয়সে এলে মানুষ সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে নেয়।'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল দীপা, 'আমার মনে হল দাদু যেন জানতেন। কিছু মনে করো না, তোমাদের বংশে কি কারও কখনও এরকম হয়েছিল?'

'আমাদের বংশে?' কথাটা বলে পাথরের মতো হয়ে গেল বিজন। সমস্ত শরীর নিরক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। দীপা কি এটাকে বংশানুক্রমিক রোগ বলে ভাবছে? কোনওদিন কারও মুখে তো এই রোগের কথা শোনেনি? এই রোগ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে? দীপার পেটে যে এসেছে তার কথা এই জন্যে ভাবছে দীপা?

'বিজু, তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা।' কথাটা হঠাৎ মনের মধ্যে ছুটে এল। বাড়ির লোকে বলত দাদুর সব কিছু নাকি ও পেয়েছে। সব কিছু?'

দীপার শরীরের ওপর নিঃসাড়ে পড়ে থাকা হাতটা সরিয়ে আনল বিজন। তারপর জানালা দিয়ে চুঁইয়ে আসা জ্যোৎস্নায় চোখ রেখে বলল 'আমি জানি না।' তারপর জুড়ে দিল, 'এই প্রথম শুনলাম।'

চুপচাপ শুয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় টের বুঝল দীপা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্যে খুব কষ্ট হল বিজনের। বেচারা এখনও ছেলেমানুষ। এই অবস্থায় পড়লে হয়তো বিজনও একই প্রশ্ন করত। কাল দাদু চলে গেলে ঘরদোর লাইজলে ধুয়ে নিতে হবে। হেসে ফেলল বিজন, মানুষের মন কীভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করা যায়!

শেষ পর্যন্ত ঘুম এল না ওর। বিজন জানালায় উঠে বসে সিগারেট ধরাল। জ্যোৎস্নার রং ফিকে হয়ে আসছে। সামনের পার্কটায় একটা ভিখিরি গোছের লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এখন কোথাও কোনও শব্দ নেই। কলকাতা মাঝে-মাঝে কেমন শান্ত হয়ে যায়। দীপার দিকে তাকাল ও। ঝাপসা অন্ধকারে ওকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। ঘুম এল না বিজনের। দীপার সমস্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ গায়ে মেখে-মেখে হাওয়ারা এবার বিজনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া আসা শুরু করল।

মাঝরাত্রি পেরোলে শব্দরা বড় শক্তিশালী হয়। খুট শব্দটা যত সতর্কেই হোক না কেন, বিজনের

কান এড়াল না। কিন্তু এখন তো ঠিক মাঝরাত্তির নয়। বসে-বসে ঢুলুনি এসেছিল বিজনের, শব্দটা শুনে চটকা ভেঙে বাইরে তাকাল। আকাশের চেহারাটা দু'হাতের মুঠোয় আদর করে ধরে রাখার মতন। দীপা এখনও ঘুমোচ্ছে সেই একই ভঙ্গিমায়। বিজন উঠে সন্তর্পণে দরজা খুলল। চোর-ফোর আসতে পারে।

বাইরে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল ও। পাশের ঘরের দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করছেন দাদু। এই ঝাপসা অন্ধকারেও ওঁর সাদা পাঞ্জাবি দেখা যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতেই বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওঁর। লাঠিটা মাটি থেকে সামান্য ওপরে তুলে এগিয়ে এলেন কয়েক পা, 'তোমার এখানে লাস্ট মর্নিং ওয়াকটা করেই আসি, কি বলো?'

বিজন ভাবতে পারেনি আজ, কালকের ওই ঘটনার পর দাদু এত সহজে মর্নিং ওয়াক করতে বেরুতে পারেন। ও অবাক হয়ে তাকাতে গিয়ে লাস্ট শব্দটার কথা ভাবল। দাদু আজ চলে যাবেন বলে কি লাস্ট মর্নিং ওয়াকের কথা বললেন? নাকি আত্মহত্যার—নিজেকে শেষ করে দেবেন বলে এমন চোরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিলেন!

বিজন বলল, 'এখনও তো ভোর হয়নি!'

'দেরিও নেই। তুমি আমাকে রাত চিনিও না।' বাইরের দরজার কাছে এগিয়ে দাঁড়ালেন দাদু, 'দিদিমণিকে আজ আর কষ্ট দিও না। আমি একাই ঘুরে আসি।'

দাদুকে দরজা খুলে সিঁড়ি দাঁড়াতে দেখে বিজন বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে থেকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'সে কি! দরজা খোলা রইল, দিদিমণি একা থাকতে—'

'কিছু হবে না।'

'তা ছাড়া তোমার অভ্যেস নেই—।'

'চলুন।' দাদুর কনুই ধরল বিজন।

এখন সিঁড়িতে বেশ অন্ধকার। অত্যন্ত সাবধানে পায়ে-পায়ে দাদুকে নিচে নামিয়ে আনল বিজন।

রাস্তায় এখন ঠান্ডা হাওয়া বইছে। চারধারের বাড়িগুলো ভীষণরকম চুপচাপ। পার্কের ঘাসে ইলেকট্রিক আলো ক্যাটকেটে হলদে নিয়ে মুখথুবড়ে আছে। এত ভোরে অনেকদিন ওঠা অভ্যেস নেই ওর। অবশ্য আজকে ঠিক ওঠা বলা যায় না।

দাদু বললেন, 'এসো, এই রাস্তায় পায়চারি করি।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বিজন, 'দাদু, আজ নদীর ধারে যাব।'

'নদী!' বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকালেন, 'সে কত দূর?'

'বেশিদূর না। আমি অবশ্য কোনওদিন যাইনি।' বিজন দাদুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পালাপার্বণের দিন এই রাস্তা দিয়ে মেয়েদের গঙ্গাস্নানে যেতে দেখেছে ও।

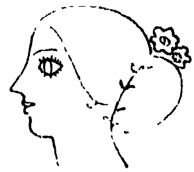
বিজন সামনে হেঁটে যাচ্ছে, পেছনে লাঠি হাতে দাদু। ফুটপাথে লাঠির শব্দ উঠছে। এই নির্জন শেষরাত্রে শব্দটা শুনতে-শুনতে বিজন হাঁটছিল। বড় রাস্তায় এসে একটা রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেল বিজন। কেমন হেলতে-দুলতে যাচ্ছে। যাওয়া-আসার কড়ারে ওর রিকশা নিল ও। বাড়ি ফিরে ভাড়া দেবে।

দিনের প্রথম সওয়ারি নিয়ে রিকশা ছুটছিল গঙ্গার দিকে। রাস্তায় এখন দু-একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের চুবড়িটা এখনও উপুড় করা। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিজনের বুকের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই আকাশটাকে অনেকদিন দেখেনি ও। সেই বাল্যকালে অথবা কৈশোরে মহানন্দার ধার দিয়ে দাদুর পেছন-পেছন ছুটে যেতে-যেতে ওই আকাশটাকে দেখতে পেত ও।

গঙ্গার পাড়ে এসে ওরা রিকশা থেকে নামল। দাদু বললেন, 'বাঃ।' একবুক শান্তির মতো এপার-ওপার জুড়ে থাকা জলেরা ঢেউ তুলে-তুলে যায়। বিজন দেখল দাদু বেশ শক্ত মানুষের মতো লাঠি দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন নদীর পাড় ধরে। বিজন তাল রাখতে পারছিল না। সেই ছোটবেলায় যেমনটি হত। আকাশ রং পালটে যাচ্ছে এখন। পুবদিকটা সদ্য জন্মানো বাচ্চার মতো লাল হাতের মুঠো খুলছে। খানিক বাদেই মুঠো-মুঠো সোনা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেবে আকাশময়। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে দাদু দাঁড়িয়ে গেলেন পুবমুখো। বিজন জানে এখন সূর্যস্তোত্র পাঠ করবেন তিনি।

বিজন দেখল, 'নদীর শরীর থেকে এখন ধোঁয়ারা সুতোর মতো উঠে যাচ্ছে না আকাশের দিকে, যেমনটি মহানন্দায় হত। হয়তো সব নদীর চরিত্র সমান নয় অথবা এখন সেই ঋতু নয়। হঠাৎ ও শুনল দাদু ডাকছেন, 'বিজু!' দু'হাতের মুঠোয় লাঠিটাকে ধরে দাদু বললেন, 'দেখছ, রাতটা কেমন খসে-খসে পড়ছে! আমরা বলি ভোর হচ্ছে। আমার শরীর যদি খসে-খসে পড়ে তখন তুমি কী বলবে বিজু! বড় ভার জমে যাচ্ছে ভাই। এই এতগুলো বছরের ভার। তবু তো অভিজ্ঞতার শেষ হয় না। তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি, আমার এতগুলো বছর শুধু তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমায় তো কেউ দেয়নি।'

সোনার কড়াইটার এখন উপুড় হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। জলের ওপর কাঁচ কলাপাতার ছায়া মাখামাখি হতে শুরু হল। দাদু বললেন, 'গায়েমুখে রোদ মাখো বিজু, এই রোদে কখনও ঘাম হয় না।



বদরক্ত

দিনরাত ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি তবু মানুষের আসা বন্ধ হচ্ছে না। সাক্ষাৎ পাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, ভক্তরা সেকথা জানেন, তবু অসময়েও আসা চাই।

দোতলার বারান্দা থেকে ওদের আসতে দেখেছিলেন রমলা। নিচের বারান্দা ভরতি হয়ে গিয়েছে, সামনের মাঠের ত্রিপলের তলায় এতক্ষণে নিশ্চয়ই জায়গা নেই। এত মানুষ আসছে শুধু মাকে একবার চোখে দেখবে বলে। ভারতবর্ষের যেখানেই মা যান সেখানেই এই দৃশ্য। অথচ প্রত্যেকেই তো একটা আশা নিয়ে আসে। তাদের পার্থিব কোনও দুঃখ দূর করতে মায়ের আশীর্বাদ চায় ওরা। কোনও মানুষকে অকারণে দু-বার আসতে দ্যাখেননি রমলা। ঠিক ত্রিশবছর মায়ের সঙ্গে ঘুরছেন তিনি। কানপুরের আশ্রমে আর ক'টা দিন থাকা হয়! টইটই করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে ওই আশি বছরের মহিলার কোনও ক্লান্তি নেই।

এইসময় একজন এসে খবর দিল, 'মা ডাকছেন।'

রমলা দ্রুতপায়ে ঘর পেরিয়ে মায়ের কাছে এলেন। মা তখন পা ছড়িয়ে বসে অন্নদাকে কিছু বলছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ না তুলে বললেন, 'কোথায় থাকিস? তোকে না দেখলে কিছু ভালো লাগে না!'

রমলা থমকে গেলেন। ত্রিশ বছরের সাহচর্য বলে দেয় এ সবই ভণিতা। আসল কথা আসবার আগে মা এইরকম বলেন। রমলা বললেন, 'তোমার ভক্তদের দেখছিলাম।'

'কী দেখলি?'

'বৃষ্টি উপেক্ষা করেও সব আসছে তোমাকে দেখবে বলে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কেউ অবশ্য স্বার্থ ছাড়া আসে না।'

'ওমা, তা হবে কেন? তুই কি স্বার্থ নিয়ে এসেছিস? ত্রিশ বছর ধরে তোকে দেখছি, কই কিছু চাইতে তো শুনলাম না!' মা হাসলেন।

রমলা এইসব মুহূর্তে অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু তবু প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করলেন, 'চাই না মাকে? প্রতি মুহূর্তেই তো চাইছি। তোমার সঙ্গে থাকতে চাওয়াটাই কি কম!' এইরকম কথা একমাত্র রমলাই বলতে পারেন। আশ্রমের পুরুষ এবং নারীরা কেউ মায়ের কাছে রমলার মতো স্বাধীনতা পাননি। মায়ের মুখের ওপর অপ্রিয় কথা বলার ক্ষমতা একমাত্র রমলারই আছে।

মা বললেন, 'তুই আমার ছবি আঁকলি না?'

রমলা মাথা নাড়লেন, 'পারব না। তোমার ছবি আঁকার ক্ষমতা আমার নেই।'

'পাগল! আমি একটা রক্তমাংসের মানুষ, রোগজরায় ভুগছি। আসলে আমার ছবি আঁকলে সেটা সুন্দর হবে না, তাই আঁকছিস না। ঠিক আছে, তাহলে তোর নিজের ছবি আঁক, এঁকে দেখা।' মা ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন। বেঁটেখাটো বৃদ্ধা রমলার চিবুকের কাছাকাছি। কিন্তু ওঁর চোখের দিকে তাকালেই দৃষ্টি নামাতে হয়। সারা শরীরের চামড়া এখন মালার মতো জড়িয়ে আছে হাড়ে অথচ গায়ের রং এখনও ভোরের আলোর মতো। বয়সের দাঁত মুখেও ছাপ ফেলেছে কিন্তু চুল কুচকুচে কালো। তাকালেই বুক ভরে যায়।

রমলা বিস্মিত, 'আমার ছবি?'

'হুঁ। তোরটা আঁকতে পারলেই আমারটা আঁকা হয়ে যাবে।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই সমস্ত শরীরে শিহরণ এল। রমলা বুঝতে পারছিলেন তাঁর দু-গাল বেয়ে পলকেই জলের ধারা নেমেছে। অথচ মায়ের হাত শরীরে এলেই পৃথিবীটা শান্ত, 'দ্যাখো পাগলির কাণ্ড! চোখের জল খুব সস্তা, নারে!' তারপরই গলা পালটে বললেন, 'এয়োস্ত্রীর চোখের জল স্বামীর অকল্যাণ করে। মুছে ফেল।'

মা চলে গেলেন। আজ সারাটা সকাল ভক্তদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে ওঁকে। প্রথম-প্রথম এই সময় মায়ের সঙ্গে থাকতেন রমলা। আর মায়ের ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে যেতেন। মা আমার স্বামীর অসুখ সারিয়ে দাও, মা আমার ছেলেকে সারিয়ে দাও, অমুক যেন চাকরি পায় তুমি দেখো— এইরকম হাজারটা বায়না। মায়ের জবাব, ভালো ডাক্তার দেখাও রোগ সেরে যাবে, মন দিয়ে খোঁজ তাহলে নিশ্চয়ই কাজ জুটবে। ভক্তরা এতে সন্তুষ্ট হয় না। তাদের নিশ্চয় করে বলতে হবে। মা মুখ ফুটে যদি বলে সেরে যাবে তো ডাক্তার না দেখালেও সারবে। এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি। একথা শুনে মা একদিন বলেছিলেন, 'ওকথা বলছিস কেন? মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখন অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে কিছুই করতে পারি না এও তো ওরা বুঝবে না। তাই বলি, যাঁকে ডাকলে সব হবে তাঁকে ডাকো, তিনিই সব। আমি কে?'

রমলা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তবু আবার আসে কেন?'

মা মিটিমিটি হেসেছিলেন, 'মজুররা তো মালিকের দেখা পায় না তাই সর্দারকে এসে ধরে। আমাকে বোধহয় সর্দার ঠাউরেছে।'

না, মা কোনও ম্যাজিক করেন না। গায়ে হাত বুলিয়ে রোগ সারান না, গরিবকে বড়লোক করে দেন না। তবু রিক্সাওয়ালা থেকে অধ্যাপক কেউ না এসে পারে না মায়ের কাছে। রমলা নিজেও তো একই বাঁধনে বাঁধা। মায়ের কাছে এলে, মাকে চোখে দেখলে বুক ভরে যায়। যেন অফুরন্ত শক্তির উৎস মা, যারা আসে তারা সেই শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে ফিরে যায়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মানুষের ব্যবহার পালটে যাচ্ছে। এই যেমন আজ হল।

মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দর্শনের জন্যে। বিশেষ একটা মঞ্চ করা হয়েছিল যাতে ভক্তরা

দেখতে পায় মাকে। স্বেচ্ছাসেবীরা মাকে ঘিরে রেখেছিল যাতে ভিড়ের ঢেউ গায়ে না লাগে। মাকে দেখা মাত্র এক মুহূর্তে সবাই পাথর। তারপরই একজন কেঁদে উঠল, 'মাগো, ওঁর ক্যান্সার হয়েছে, তুমি সারিয়ে দাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার বিভিন্ন চাওয়া সোচ্চার হল। চিৎকারে কান পাতা দায়।

সবাই এবার মায়ের কাছে আসতে চাইছে। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রাণপণে সেই চাপ সামলাতে চেষ্টা করছে। মা সবাইকে শান্ত হতে বলছেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেউ যেন ফুল ছুঁড়ল মায়ের উদ্দেশ্যে। তাই দেখে যারা ফুল এনেছিল মাকে দেওয়ার জন্যে তারা সেগুলোকে সজোরে ছুঁড়তে লাগল মায়ের গায়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমলা দেখলেন মায়ের শরীরে সেগুলো এসে আঘাত করছে। ফুলের আঘাত যে এত তীব্র হয় ধারণা ছিল না। মা দু'হাতে মুখে ঢাকছেন। রমলা ছুটে নিচে নেমে এলেন। স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা কী করছেন, মাকে ভেতরে নিয়ে আসুন।'

ততক্ষণে ফুল বোধহয় ফুরিয়ে গেছে কিন্তু কিছু একটা ছুঁড়তে হবে বলেই ঢিল ফুলের জায়গা নিল। স্বেচ্ছাসেবকরা কোনওরকমে মাকে যখন ভেতরে নিয়ে এল তখন মায়ের কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে। রমলা ছুটে কাছে এসে নিজের আঁচল চেপে ধরলেন কপালে। না, ক্ষত তেমন বড় নয়।

ওষুধ লাগিয়ে যখন মাকে ওপরের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল তখন পুলিশ এসে গিয়েছে। তারা জোর করে সরিয়ে দিচ্ছে উগ্র ভক্তদের। একটু শান্ত হলে রমলা মায়ের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কখনও আসবে এখানে?'

মা বললেন, 'বাঃ, কেন আসব না। ও, ওরা ওরকম করল বলে বলছিস। তা সবাই তো করেনি, কেউ-কেউ করেছে।' তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'আজকের চিঠিগুলো পড়।'

হ্যাঁ, এটাই এখন রমলার অন্যতম কাজ। সারা পৃথিবীর ভক্তরা মাকে প্রতিদিন চিঠি লেখেন। রমলা সেগুলো মাকে পড়ে শোনায়। যাকে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন, তাকে কী লিখতে হবে মা বলে দেন।

চিঠির ঝাঁপি নিয়ে আসা হলে রমলার চোখ স্থির হল। ওরে ব্বাস, আজ বোধহয় শ'দুই হবে! অভ্যস্ত হাতে একটার পর একটা চিঠি পড়ে যাচ্ছেন রমলা। প্রত্যেকেই দুঃখের কথা জানিয়েছে। মাঝেমধ্যে এক আধজনের ভালো খবর। একজনের পেটের অসুখ সারছে না জেনে মা বললেন, 'লিখে দে ভেলোরে গিয়ে দেখাতে।' আর একজন মৃত্যুকামনা করে লিখেছে যে এই পৃথিবীর জ্বালা দূর করে ঈশ্বরের কাছে মা যেন যেতে তাকে সাহায্য করেন। শুনে মা বললেন, 'ওকে বল আর যেন আমাকে চিঠি না লেখে। যারা কাজ ফেলে পালিয়ে যেতে চায় তাদের আমি পছন্দ করি না।'

এইরকম একটার পর একটা চিঠি, যাতে জাগতিক দুঃখ-বেদনা মাখামাখি—মাকে পড়ে শোনাতে হয় এবং মায়ের জবাব তাদের লিখে পাঠাতে হয়। রমলা জানেন এইরকম দু-তিন লাইনের উত্তর পেলেই ভক্তরা কৃতার্থ হন। আজকের চিঠি শেষ হওয়ার মুখে একটা খাম খুলে থমকে পড়লেন রমলা। মাঝেমধ্যে এই খামটি আসে। আর সেটা হাতে নিলেই বুকের মধ্যে কেমন নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। খুবই নির্লিপ্ত হওয়ার ভান করে চিঠিটি পড়তে হয় তাঁকে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয় মায়ের কানে যেন তাঁর গলা অন্যরকম না শোনায়। তারপর অনেক রাত্তিরে যখন একা থাকেন নিজের এই পরিবর্তনটার কথা ভাবলেই তাঁর হাসি পায়।

আজ চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরোটা পড়ব?'

মা শুয়েছিলেন চোখ বুঁজে, বললেন, 'কে লিখেছে?'

'ভবানীপুরের চাটার্জিদের বাড়ি থেকে।'

এক মুহূর্ত সময় লাগল বোধহয় চিনে নিতে, মা বললেন, 'পড়।'

রমলা পড়ে গেলেন। প্রথমেই একটা সুখবর। বড়মেয়ে শোভা ডাক্তারি পাশ করেছে। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া তা সম্ভব হত না। শোভা বিদেশে যেতে চায় উচ্চশিক্ষার্থে, এ ব্যাপারে মায়ের কী মত? মা যদি অনুমতি দেন তাহলে সামনের মাসে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের নিয়ে কাশীতে তিনি যেতে চান প্রণাম করতে।

রমলা দেখলেন চিঠিটি কাশীর ঠিকানায় লেখা, সেখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে মানুষটার হাতের লেখা একই রকম রয়ে গেছে। পঁচিশ বছরের প্রতিটি মাস নিয়মিত মোটা টাকা পাঠান উনি, প্রতিমাসে নিজের সংসারের খবরাখবর দেন। না, আজ অবধি কোনও খারাপ খবর ওর চিঠিতে পাননি রমলা। কিন্তু এত অনুরক্ত তবু পঁচিশ বছরে একবারও মাকে দর্শন কবতে আসেননি। মায়েরই নির্দেশ মেনে। সেই মানুষ আজ হঠাৎ দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন কেন?

মা তেমনি চোখ বুঁজে শুয়ে শুধোলেন, 'কত বছর হল?'

রমলা বুঝতে পারছিলেন ওঁর মাথা নেমে আসছে, 'পঁচিশ।'

'লিখে দে, এবার আসতে পারে। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। তবে কানপুরে নয়, এখানেই।' মায়ের কণ্ঠে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।

'চিঠি পৌঁছতে-পৌঁছতে আমরা বোধহয় এখানে থাকব না মা!'

'ও। তাই তো। তাহলে কাউকে দিয়ে খবর পাঠা।' মায়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। ইনিও ভক্ত, মা আহত হয়েছেন জেনে ছুটে এসেছেন।

নিচে ততক্ষণে পুলিশের বড়কর্তারা এসে গেছে। মাকে ঢিল ছুঁড়ে মারা হয়েছে, এ খবর পৌঁছে গেছে মন্ত্রিমহলে। বড়-বড় অফিসাররা এসে গেছেন মায়ের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে। এখন আশ্রমের কর্তারা এঁদের সামলাবেন। রমলা উঠে এলেন বাইরে। ভিড় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। আকাশ ঘষা শ্লেটের মতো মন খারাপ করা। রমলা ধীরপায়ে নিচের অফিসঘরে এলেন। সেখানেও জটলা, সকালের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে। রমলাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। ইদানীং এই হয়েছে। অহর্নিশ মায়ের সঙ্গে থাকার ফলে এদেরও বোধহয় ধারণা হয়েছে ইনিও শক্তিময়ী। রমলা একজনকে ডেকে বললেন, 'এখনই ভবানীপুরের এই ঠিকানায় চলে যাও। গিয়ে বলবে মা এঁদের সবাইকে আজ সন্ধেবেলায় আসতে বলেছেন।'

ছেলেটি খুব তৎপরতায় সঙ্গে ঠিকানাটা লিখে নিল খামের ওপর থেকে। রমলা বললেন, 'যাওয়ার সময় ভাড়াটা চেয়ে নিয়ে যেও।'

ওপরে গিয়ে চিঠির জবাব লিখতে বসে বারে বারে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন রমলা। অথচ এই পঁচিশ বছর মা তাঁকে দিব্যি ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে আজ কেন এমন হচ্ছে? মানুষটা সশরীরে আসছেন বলেই? অস্বীকার করবেন না, পঁচিশ বছর আগের প্রথম ক'দিন ব্যাপারটা ভাবলেই বেশ হাসি পেত। মায়ের আদেশ পালন করেছি এই বোধটাই তখন বড় ছিল। কিন্তু এখন এই পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে গত কয়েকমাস ধরে ওই চিঠিটা খুলতে গেলেই শরীরে কাঁপুনি আসছে। প্রথম-প্রথম মনে হত মাকে বলবেন এই অনুভূতির কথা। কিন্তু বলতে লজ্জা করত। অথচ আজ তাঁর জীবনে মা ছাড়া আর কে আছে? ইংরেজিতে বি এ পাশ করে ধনী বাবার কাছ থেকে এক কথায় চলে এসেছিলেন মায়ের কাছে তিরিশ বছর আগে। বাবা বাধা দেননি! মা-মরা মেয়েটি যদি এতেই শান্তি পায় তো পাক, এইরকম ইচ্ছে ছিল তাঁর। বাবা বেঁচে থাকতে প্রতিবছর দিন পনেরোর জন্যে গিয়ে থাকতেন তাঁর কাছে। তিনি চলে যাওয়ার পর সে পাটও চুকেছে।

সেবার কানপুরেই ঘটল ব্যাপারটা। মায়ের শরীর একটু খারাপ ছিল ক'দিন থেকে। রমলারা তখন মায়ের কাছে সর্বক্ষণ থাকার অনুমতি পেতেন না। মাঝে মাঝে মা ডেকে পাঠাতেন, দু-একটা কথা বলতেন, তাই যথেষ্ট ছিল। অসুস্থ মাকে দিদিরাই সেবাযত্ন করতেন। রমলার খুব ইচ্ছে হত

মায়ের পাশে থাকতে। এবং সেই ইচ্ছেটা মা একদিন টের পেয়ে গেলেন। তখন রমলাকে পায় কে! এক আত্মীয়ের অনুনয়ে মা ওদের এক মিনিটের জন্য দর্শন দিতে রাজি হয়েছেন অসুস্থ অবস্থায়। ছেলেটি অল্প ক'দিনের মধ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানি চলে যাবে, এও একটা কারণ ছিল।

ওরা এল। এত সুন্দর জুটি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটির স্বাস্থ্যের সঙ্গে লাবণ্য মিশে তাকে আরও সুন্দর করেছে। মেয়েটিকে দেখেই মনে হয় বড় শান্ত। গায়ের রং একটু চাপা কিন্তু চোখদুটো বড় লক্ষ্মীময়ী। ওদের দেখে মা উঠে বসলেন। রমলা মায়ের পেছনে দুটো বালিশ সাজিয়ে দিলেন একটু আরাম দেওয়ার জন্যে। ওরা প্রণাম করতে এগোতে মা দু-হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন, 'না, না, পায়ে হাত দিতে হবে না।'

সচরাচর মা কাউকে পায়ে হাত দিতে দেন না। ওরা দূর থেকে প্রণাম করে মাটিতে বসল পাশাপাশি। রমলার খুব সুন্দর লাগছিল ওদের দেখতে। মা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দিন বিয়ে হয়েছে?'

ওরা চকিতে নিজেদের দেখে নিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল মুখে রক্ত জমেছে ওদের।

নিচু গলায় ছেলেটি জবাব দিল, 'দশ দিন।'

'কবে বিদেশ যাচ্ছ?'

'সামনের মাসের তিন তারিখ।'

রমলা দেখলেন মায়ের চোখ অসম্ভব স্থির হয়ে গেছে। সমাধি হওয়ার আগে মায়ের এমন অবস্থা হয়। কয়েকবার দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে রমলার। তখন মায়ের কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মা মেয়েটিকে ডাকলেন, 'তুমি একটু আমার কাছে এসো তো!'

মেয়েটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে এল। এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল। মা ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ঠিকুজিকুষ্ঠি নেই?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল মেয়েটি, 'না।'

মা তার গায়ে হাত বোলালেন, তারপর বললেন, 'এবার যাও। কিন্তু কাল সকালে আবার এসো। খুব জরুরি।'

ওরা চলে যাওয়ার পর মা অস্থির হয়ে পড়লেন যেন। প্রশ্ন করলেও কিছু বলেন না। বারংবার তাঁর এক কথা, আহা কী সুন্দর ছেলেটি! সন্ধেবেলায় ওদের সেই আত্মীয়াটি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখেই মায়ের মুখ গম্ভীর। এক ঘর লোকের সামনে বলে বসলেন, 'তোমরা কী, অ্যাঁ? ছেলের বিয়ে দিয়েছ আর কুষ্ঠি মিলিয়ে দ্যাখোনি?'

আত্মীয়াটি বিব্রত গলায় বললেন, 'না, মানে ওসব এরা কেউ—।'

'মেয়েটির ভাগ্যে বৈধব্যযোগ আছে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই সে বিধবা হবে। আহা, অমন ছেলেটি চলে যাবে ভাবলেই মন কেমন করে উঠছে।' মা তখন বেশ উত্তেজিত।

আত্মীয়াটি কথাটা শুনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। দু'হাত জোড়া করে মায়ের সামনে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন, 'মা তুমি বাঁচাও।'

'আমি বাঁচাবার কে? যিনি পারবেন তাঁকে ডাকো। আমি কি ম্যাজিক জানি? যা কপালে লেখা আছে, তা মানতেই হবে। শুধু ওই ছেলেটার মুখের দিকে তাকালে—।' মায়ের গলার স্বর অন্যরকম শোনাচ্ছিল।

কথাটা শুনে রমলার বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠেছিল। অত সুন্দর, সপ্রতিভ ছেলেটির আয়ু নেই? মা কখনও কাউকে এমন কথা বলেন না। ভবিষ্যতের কথা মায়ের মুখ থেকে অনেক চেষ্টা করেও কেউ বের করতে পারে না! কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখার পর থেকেই মা ছটফট করছেন। সারাদিন সুস্থির হতে পারেননি।

রমলার তখন পঁচিশও হয়নি। গুণ বলতে ওইটুকু, সেতার বাজাতে পারেন। রাত্তিরে সব

যখন চুপচাপ তখন সেতার নিয়ে বসতেন তিনি। সে রাত্রে মায়ের পায়ের কাছে বসে রইল। মা বললেন, 'কিরে, ভগবানকে ডাকবি না?'

'আজ ইচ্ছে করছে না মা।'

'তা কি হয়! রোজ রাত্রে ডাকিস আর আজ বাদ যাবে কেন?'

অদ্ভুত ব্যাপার, তাঁর সেতার বাজানোর কথা জানতে পেরে মা বলেছিলেন, 'সুর হচ্ছে এমন একটা সিঁড়ি যা দিয়ে তাঁর কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যায়। আর যে বাজায় সে যেমন তাঁর আশীর্বাদ পায় যারা সেই বাজনা শোনে তাদের মনও পবিত্র হয়ে যায়।'

'আমার আজ বাজাতে ভালো লাগছে না। তুমিও তো ভালো নেই মা।'

মায়ের একজন প্রিয় শিষ্যা মাথার কাছে বসে হাওয়া করছিলেন।

মা বললেন, 'রাখ তো পাখা, তোরা আমায় খামোকা রোগি বানাচ্ছিস।'

'তুমি সত্যিই অত ভাবছ মা ওদের জন্যে?'

মা তাঁর দিকে তাকালেন, 'দ্যাখ, ছেলেটির কোনও দোষ নেই। মেয়েটিরও নয়। অথচ মেয়েটির কপালে বৈধব্যের যোগ এত প্রবল যে ছেলেটিকে যেতে হচ্ছে। সেই যে বলে না দুধও ভালো, লেবুও ভালো, কিন্তু যেই এক করো অমনি ছানা হয়ে যাবে। এসব দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন করে। সবই তাঁর ইচ্ছে বলে মানতে চায় না মন।'

রমলা বললেন, 'কিছু করা যায় না মা?'

মা বললেন, 'যায়, কিন্তু কে রাজি হবে?'

রমলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করতে হবে?'

'ছেলেটিকে এমন কারও সঙ্গে বিবাহ দেওয়া দরকার যার বৈধব্যযোগ নেই আমৃত্যু। শুধু তার ভাগ্যের জোরে এই বিধিলিপি খণ্ডাতে পারে। যা তোরা যা, আমাকে একটু ঘুমুতে দে।'

কিন্তু রমলা জানেন মা সেই রাত্রে ঘুমুতে পারেননি। আর কি আশ্চর্য, রমলাও চেষ্টা করে দু'চোখের পাতা জুড়তে পারেননি। ভোরবেলায় মা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ছাদে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়েছিলেন মা, রমলা গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই হাসলেন, 'হ্যাঁরে, তোর সংসারী হয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে আছে?' রমলা অবাক হয়ে গেলেন! একি প্রশ্ন! তিনি তো সব ছেড়ে এসেছেন মায়ের কাছে। কারও প্রতি কোনও অভিমান নয়, কোনও দুঃখ বা জ্বালা তাঁকে এখানে নিয়ে আসেনি। স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন চাইলেই তো তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়ে এই জীবন তাঁকে টেনেছে বেশি। দুবেলা উপাসনা আর মায়ের সান্নিধ্যের চেয়ে কাম্য তাঁর কাছে কিছু নেই। আর এসব কথা তো মা জানেন। তাহলে? রমলা বললেন, 'তুমি তো জানো, তাহলে এই প্রশ্ন কেন করছ?'

মা বললেন, 'ভেবে দ্যাখ, পরে যদি আপশোস হয়?'

রমলা বললেন, 'আমার আপশোস হবে কিনা তা তুমি জানো না?'

মা বললেন, 'মন না মতি! কেউ কি কখনও তার গতি বুঝতে পারে?'

'পারে। অন্তত তুমি পারো। মা, আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

মা ভোরের আকাশের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু আমি যদি তোকে বিয়ে করতে বলি?'

'মা!' এবার চমকে উঠলেন রমলা।

'কাউকে জীবন দেওয়ার মতো বড় কাজ আর কি আছে। কেউ যদি হিমালয়ে পঞ্চাশ বছর সাধনা করে, তার থেকে যে প্রতিদিন অসুস্থ মানুষের মুখে ওষুধ তুলে দিয়ে বাঁচায় সে বেশি পুণ্যবান। তুই না হয় সেই ওষুধটাই দিলি।' ততক্ষণে রমলা বুঝতে পেরেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঝরঝর করে জল নামল গালে। মা হাসলেন, 'বোকা মেয়ে, কাঁদছিস কেন? কাউকে জীবন দিতে পারলে তুই খুশি হবি না?'

রমলা বললেন, 'কিন্তু আমার কী হবে?'

'কিছুই হবে না। যেমন আছিস আমার কাছে তেমন থাকবি। ধর্মের অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলেই সে চলে যাবে। তুই ভাববি একটা উপোস করলি মাত্র। সারাজীবন সিঁদুর পরতে হবে, শাঁখা থাকবে হাতে। এটুকুই যা ভার। তাছাড়া তুই যেমন আছিস তেমন থাকবি।'

সন্ধেবেলায় বিয়েটা হয়ে গেল। বাইরের কেউ ছিল না। আশ্রমের সবাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন। ওরা এসেছিল সকালে। আত্মীয়ের মুখে গতরাত্রেই খবর পেয়ে এখন উন্মাদের মতো অবস্থা। মেয়েটি এসে পাগলের মতো স্বামীর জীবন ভিক্ষে চাইছিল। ছেলেটি থম ধরে বসে। কোনও কথা বলছে না অথচ বোঝা যাচ্ছে ওর ভেতরে ঝড় চলছে। মা যখন বললেন, 'যদি একজনের বৈধ্যবযোগ আর একজনের অভিশাপ হয়, তাহলে আর একজনের দীর্ঘ সধবা জীবন তার কাছে বর হয়ে দাঁড়াবে! তোমাকে পুনর্বিবাহ করতে হবে। সেই মেয়ের ভাগ্যে এই দুর্ভাগ্য কাটবে। তবে শর্ত হল একটাই, তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে তুমি আজীবন কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবে না, কোনও যোগাযোগ যেন না থাকে। কারণ একটি সংসারী নয় এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তাকে জড়িও না। আর মা তুমি দুঃখ পেয়ো না। সতীন নিয়ে তোমাকে কোনওদিন ঘর করতে হবে না।'

ওরা রাজি হয়ে গেল। এসব কথা পরে শুনেছেন রমলা। সে সময় তিনি অন্যঘরে বসে কাজকর্ম করছিলেন। এমন সময় সেই বউটি এসে দাঁড়াল সামনে। তারপর হঠাৎ তার পায়ের কাছে মাথা রেখে ডুকরে উঠল, 'আপনি আমার স্বামীর জীবন দিলেন, আমি—আমি—।' বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না মেয়েটি। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন রমলা, কেন তা তিনি জানেন না।

বিয়ের সময় বা পরে একটিও কথা হয়নি। সব কাজ চুকিয়ে সন্ধেনাগাদ ওরা চলে গেলে মা রমলাকে কাছে ডাকলেন, 'তুই আজ থেকে এয়োতি। ওই সিঁদুর আর শাঁখার অমর্যাদা করিস না কখনও। আর যদি পারিস আজকের কথা ভুলে যা।'

এখন মনে হয়, 'সত্যি কি ভুলতে পেরেছিলেন তিনি? প্রথম দিকে কি বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করত না? এমনকী আজ মনে পড়ে, মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মায়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ হত। একজনের জীবন বাঁচাতে আর একজনের জীবন কেন উৎসর্গ করতে বললেন? কিন্তু পরদিন সকালে মায়ের দিকে তাকাতেই লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গেল। জীবন তো একবারেই উৎসর্গ করেছেন মায়ের কাছে। সেদিন যে ঘটনা ঘটল তাতে তাঁর কি! মা যা ভালো বুঝেছেন তাই করেছেন। তাঁর তো অন্য কোনও কামনা ছিল না যে তা হচ্ছে না বলে আপশোস করতে হবে! তিনি যেমন আছেন তেমনি আছেন। হয়তো মা তাঁকে একসময় ভুলিয়ে দেবেন সব। ধীরে-ধীরে বয়স বাড়ল। এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে আর কোনও কামনা নেই। মায়ের কাছে গেলে অথবা পুজোয় বসলে রমলা সেই স্বাদ পান। এখন একটাই বোধ, এই রক্তমাংসের শরীরটাকে বয়ে বেড়াতে হয় বলেই বহন করতে হচ্ছে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় তাঁর পায়ে। প্রতিদিন একটু-একটু করে মা তাঁকে এই শান্তি দিয়েছেন, এই আনন্দ।

তাহলে আজ এই অস্থিরতা কেন? এতবছর ধরে ওঁদের কাউকে তিনি চোখে দেখেননি। চিঠি আসত, ওঁরা ভালো আছেন—জেনে কোনও প্রতিক্রিয়া হত না। মায়ের আদেশ পালন করেছেন ভদ্রলোক। একবারের জন্যেও এখানে আসেননি, কোনও চিঠিতে বিবাহ সম্পর্কিত কোনও ইঙ্গিতও থাকত না। অথচ প্রথম ক'দিন কি তাঁর এই আশঙ্কা হয়নি যে যদি লোকটি এসে দাবির হাত বাড়ায় তাহলে কোন আইনে তিনি তা ঠেকাবেন! এখন লজ্জা হয়। ভদ্রলোক প্রায় পঁচিশ বছর নীরবে থেকে গেলেন। এইসব ভাবনা আজ হচ্ছে কেন? এখন তো তাঁর শরীরে যৌবন নেই, চুলের রং সাদাটে, মুখে হাঁসের পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের প্রৌঢ়ত্বের কাল শেষ

হতে চলেছে। এখন কোনওরকম আশঙ্কার কাল নেই। তবে? এক সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকা ছাড়া তো সত্যিকারের কোনও সম্পর্ক নেই। তাহলে?

রমলা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। অথচ জিভ যেন ঘুরেফিরে সেই ক্ষতেই ফিরে আসে। সেই ঘটনার পর অনেক কথাই কানে আসত। আড়ালে আবডালে মেয়েরা কম বলেনি। মা এটা কী করলেন! একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করা হল! ইত্যাদি। তখন হাসি পেত এসব শুনলে। মায়ের ইচ্ছায় ওই একটি সন্ধ্যা যে তাঁর জীবনে কোনও ঢেউ তোলেনি এটা সূর্যের মতো সত্য ছিল। নাহলে জীবনের বাকি পঁচিশটা বছর এত স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যেত না। কিন্তু এতদিন বাদে ওদের কেন আসবার ইচ্ছে হল আর মা-ই বা কেন অনুমতি দিলেন এটা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না রমলা। রমলার হাসি পেল, আশ্চর্য, এতসব মাথামুণ্ডু তিনি ভাবছেনই বা কেন? ভদ্রলোকের মুখটাও তাঁর স্মরণে নেই। শুভদৃষ্টির সময় যে এক পলক দেখা তা হাজার মুখের ছাপে কখন চাপা পড়ে গেছে।

সেদিনের চিঠি পড়ে এবং মায়ের জবান জেনে নিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছেন তখন মা বললেন, 'আমার শরীর ভালো লাগছে না।'

রমলা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'কী হয়েছে?'

'এমনি, এমন কিছু নয়।'

মা বললেন বটে, কিন্তু রমলার বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। সচরাচর মা এমন কথা বলেন না। খুব কঠিন অসুখও মা একবার চেপে ছিলেন অনেকদিন। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়েন রমলা।

ভারতবর্ষের এত জায়গায় জড়িয়ে থাকা আশ্রমগুলো চলছে মায়ের মুখ চেয়ে। যতই মায়ের বাণী এবং নির্দেশ তাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করুক না কেন, মায়ের অনুপস্থিতিতে সব এলোমেলো হয়ে যেতে পারেই। রমলা জানেন মা চলে গেলে তাঁর দাঁড়াবার জায়গাও চলে যাবে। তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না, না।'

'শোনো, তুমি আজ বিশ্রাম নাও, কারও সঙ্গে দেখা করো না।'

'পাগল! কি বাড়াবাড়ি করছিস!'

কিন্তু মায়ের কাছ থেকে উঠে এসেও মনের ভার নামল না। ঠাকুরের সামনে গিয়ে চোখ বুঁজে বসলেন। বারংবার প্রার্থনা করতে লাগলেন, মা যেন অসুস্থ না হন। জরা কিংবা রোগ যেন মাকে দখল না করতে পারে। মায়ের বেঁচে থাকা দরকার আমাদের সবার প্রয়োজনে। আর এইসব ভাবতে-ভাবতে অন্য চিন্তা-ভাবনা কখন মাথা থেকে সরে গেল রমলা জানেন না। মা বলেন, মনটাকে স্থির কর, মনটাকে শূন্য কর, দেখবি তার চেয়ে শান্তি আর কিছুই নেই। পঁচিশ বছরে একটু-একটু করে রমলা ওই চেষ্টাটাকে ফলবতী করেছেন, এখন প্রার্থনায় বসলে চিত্ত শূন্য হয়ে যায়।

আজও সারাদিন মানুষের অবিরাম আনাগোনা। একবার সবাই মায়ের দর্শন চায়। মাকে মাঝে-মাঝেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। খুব প্রয়োজন এবং মায়ের অনুমতি ছাড়া কাউকে ওপরে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। রমলা লক্ষ রাখছিলেন মায়ের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা। কিন্তু নিজেই যিনি অনন্ত রহস্য তাঁর কিনারা করতে পারবেন রমলার এমন সাধ্য কি! এইসময় সিঁড়িতে সামান্য গোলমাল হল। একজন কর্মী উঠে এসে বললেন, 'দিদি, এক ভদ্রলোক ওপরে আসতে চাইছেন, মাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

রমলা বললেন, 'অন্যদিন আসতে বলো ভাই।'

'বলেছি, কিন্তু শুনছেন না।'

'কী দরকার?'

'বলছেন না। শুধু বললেন, মা জানেন।'

এবং এতক্ষণে রমলার মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কি একা এসেছেন?'

'না, পুরো ফ্যামিলি।'

'ও। হ্যাঁ, মা ওঁদের আসতে বলেছেন। নিয়ে এসো।'

নিজের অজান্তেই পা দুটো ভারী হয়ে গেল রমলার। তিনি কি সরে যাবেন—অন্যঘরে, অন্য কোথাও? কিন্তু তাঁর যে এখন মায়ের কাছে থাকার কথা। হঠাৎ ওঁর খেয়াল হল কেন উনি খামোকা লজ্জা পাচ্ছেন? কারণ লজ্জা তাঁর একার পাওয়ার কথা নয়। দ্রুত পা চালিয়ে মায়ের ঘরে বসলেন। সেখানে মায়ের সামনে বেশ কয়েকজন বসে। মা খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, দু-একটা কথা শুনছেন। ওঁকে দেখে বললেন, 'কোথায় ছিলি?'

উত্তর না দিয়ে ওপাশে গিয়ে বসলেন রমলা। মায়ের চোখ ঘুরে ফিরে তাঁর ওপর পড়ছে। একটু আড়ালে আবডালে রাখবেন নিজেকে এমন ভেবেছিলেন, হল না।

একটু বাদেই ওঁরা এলেন। দরজার কাছে এসেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন যে ভদ্রলোক তিনি বেশ স্থূলকায় মাথায় বিশাল টাক কিন্তু মুখে একটা শ্রী আছে। ওঁর পাশে যিনি হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছেন তাঁর শরীর খুব ক্ষীণা, কিন্তু মুখচোখে সুখের মোহর বসানো। কিছুটা অবাক হয়ে রমলা এঁদের দেখছিলেন। সেই অল্পবয়সি দম্পতিটিকে সময় আজ কী করে দিয়েছে! ওঁদের পেছনে যারা দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। মেয়েটি স্পষ্ট মায়ের অল্প-বয়সটার প্রতিচ্ছবি আর ছেলেটি বোধহয় বাবার। ওরা বেশ অবাক দৃষ্টিতে ঘরের মাঝখানে বসা মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের মা নিচু গলায় কিছু বলতে ওরা এবার দূর থেকে প্রণাম করল।

রমলা দেখলেন মা ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, 'আমি সুবোধ।'

'বুঝেছি। কেমন আছ তোমরা?'

'আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। এই আমার মেয়ে, কমলা। ও বিদেশ যেতে চাইছে পড়াশুনার জন্যে। আপনি যদি—।' রমলা দেখলেন কথা শেষ না করে ভদ্রলোকের চোখ চকিতে ঘরের চারপাশে ঘুরে গেল। একটু শক্ত হলেন রমলা; না, চোখ স্থির হল না। পঁচিশ বছরে তিনি নিজে কতটা পালটেছেন? প্রতিদিন আয়নায় মুখ দেখলে কি তা বোঝা যায়? কিন্তু চুলগুলো তো রং পালটে ফেলছে; শাড়ি পরার ধরনও তো বদলে গেছে। দ্রুত ওঠানামা করলে বুকে হাঁপ ধরে।

মা বললেন, 'বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো! তুমি এসো আমার কাছে।' মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এল, এসে সোজাসুজি তাকাল। মা হাসলেন, 'বেশ মেয়ে। খুব ভালো! বড় ডাক্তার হয়ো। মানুষের বড় কষ্ট, তুমি তাদের আরাম দিও।'

মেয়েটি ঝুঁকে মাকে প্রণাম করতে গেলে মা চকিতে সরে বসলেন, 'না, না, পায়ে হাত দিতে হবে না। এমনি করেছ তাই ভালো।'

মেয়েটি ফিরে গেলে ভদ্রলোক বললেন, 'মা, আমার আর একটা প্রার্থনা আছে।'

'প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে। কী বলতে চাইছ বলো!'

'আমরা দীক্ষা নিতে চাই।'

'বেশ তো নেবে, ভালো গুরু পেলে নেবে।'

'মা, আপনি ছাড়া আমি কিছু জানি না।'

মা হাসলেন, 'আমার কাছে তোমার দীক্ষা অনেক আগেই তো হয়ে গেছে। নতুন করে আর কী নেবে বাবা!'

'তবু—।'

'রোজ একবার ভগবানকে ডাকো, তাহলেই হবে। তুমি অশেষ ভাগ্যবান। আর ভাগ্যবানের

বোঝা তো ভগবানই বয়।'

কিছুক্ষণ মাকে দর্শনের পর ওঁরা প্রণাম করে উঠলেন। রমলার চোখ বারংবার ছেলেটির মুখের ওপর আটকে যাচ্ছিল। চুপচাপ ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখলেন। তিনি এ ঘরে আছেন একথা ওঁবা জানলেন না। মা যে প্রসঙ্গটি তোলেননি এই জন্যে কৃতজ্ঞ। মা অকারণে কাউকে লজ্জায় ফেলেন না।

একটু বাদে আশ্রমেরই একটি মেয়ে নিঃশব্দে এসে রমলার কানের কাছে কিছু বলল। সঙ্গে -সঙ্গে ওঁর মেরুদণ্ড সোজা। কী করবেন এখন? মায়ের দিকে তাকালেন। মা নির্বিকার মুখে আর একজনের কথা শুনছেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি। সাক্ষাৎ করতে চাইছেন ওঁরা। কেন? মায়ের অনুমতি ছাড়া তিনি এ কাজ করতে পারেন? কেন পারেন না? কোন্‌টা ভালো কোনটা মন্দ তিনি কি বোঝেন না? এতদিন মায়ের কাছে থেকেও যদি তা না বুঝতে পারেন তাহলে বৃথাই তাঁর শিক্ষা।

রমলা ধীরপায়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক নেই। ওঁকে দেখা মাত্র মহিলা এগিয়ে এসে নত হতে গেলেন, ঝট করে দু-পা সরে গেলেন রমলা, 'একী করছেন আপনি?'

'আপনি আমার প্রণাম নেওয়ার যোগ্য, তাই—।'

'কেন?'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, চিনেছি। আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন। এরা বুঝি ছেলেমেয়ে? বাঃ, বেশ ভালো।' রমলা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

মহিলা ছেলেমেয়েদের বললেন, 'প্রণাম কর।'

রমলা বাধা দিলেন, 'না, এখানে আমরা একজনকেই প্রণাম করি।'

মহিলা বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছে হত আপনার সঙ্গে দেখা করি, কথা বলি। উনি নিষেধ করতেন। বলতেন, এতে আপনাকে যন্ত্রণা দেওয়া হবে।'

রমলার গলার স্বর কি কেঁপে গেল, 'কেন?'

হঠাৎ মহিলা কেঁদে উঠলেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে উঠছিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হয়ে গেলেন রমলা। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'কাঁদছেন কেন?'

'আমি তো সব পেয়েছি, সব। কিন্তু আপনি না থাকলে তো কিছুই পেতাম না। অথচ আপনি—।' মহিলার গলা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'আপনি অযথা উতলা হচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, এদের কথা ভাবুন এখন। উনি কোথায়?' রমলা জানেন না কী করে তিনি এত স্বাভাবিক হলেন।

'উনি এলেন না, বললেন আপনার সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই।'

'ছিঃ। পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা ক'জন দিতে পারে। আচ্ছা এবার আপানারা আসুন, আমাকে যেতে হবে।'

ওরা নিচে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মাকে কিছু বলে সটান তাঁর কাছে চলে এল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'বলো।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, কারও জন্যে কারও আয়ু ফুরিয়ে যায় এবং সেই আয়ু আর একজন ফিরিয়ে দিতে পারে?'

রমলা হাসলেন, 'তুমি বিশ্বাস শব্দটা উচ্চারণ করলে, বিশ্বাসের কাছে সমস্ত যুক্তি হার মানে, তাই না?'

'কিন্তু আমি মানি না। বিজ্ঞান মানবে না।'

'হয়তো। তাতে কী এসে যায়!'

'কিন্তু ওদের এই অন্ধবিশ্বাসের কাছে নিজেকে বলি দিলেন কেন আপনি?'

খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন রমলা। তারপর কঠিন গলায় বললেন, 'তুমি তো ডাক্তারি পড়েছ, মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করো, মৃত মানুষের বুকে ছুরি বসাও যখন, তখন কি সেটাকে খুন করা বলে? সেই কাটাছেঁড়া কি জীবিত মানুষের কাজে লাগে না? আমি মায়ের কাছে উৎসর্গিত, তাই ওসবে আমার কিছু এসে যায় না। তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন যাও।'

রমলা বিস্মিত মেয়েটির চোখের সামনে থেকে নিজেই সরে এলেন। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন তিনি, মৃতদেহ—এই শরীর মন যদি তাঁর পায়ে সমর্পিত হয় তাহলে স্থূল ভাবনা আর শরীরটা তো মৃতই হয়ে যায়।

নিজের অজান্তেই যে তিনি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল ছিল না। রমলা দেখলেন ওরা চারজন হেঁটে যাচ্ছে। একটি সুখী পরিবার। কর্তা আগে আগে, ছেলেমেয়েরা মাঝখানে, গিন্নি পেছনে।

হঠাৎ রমলার মনে হল ওদের এই হেঁটে যাওয়া, ওই গাড়িতে চড়া, পৃথিবীতে বেঁচে-বর্তে সুখ ভোগ করা এসবই তাঁর জন্যে। ওই মহিলা শুধু শরীর দিয়েছেন ভদ্রলোককে, শরীর তো সবাই দিতে পারে, কিন্তু সেইসঙ্গে পঁচিশটা বছর আতঙ্কের সুচের ডগায় থাকতে হয়েছে তাঁকে। যদি ভাগীদার হাত বাড়ায়! তাই আজ কেঁদে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। ওই পুরুষ বিবেকে জ্বলছেন নিয়ত, তাই আজ মুখোমুখি হতে ভয় পান।

আর তিনি, শরীরের স্থূলতায় নয়, ওদের হাঁটতে চলতে ফিরতে দিচ্ছেন নিজের জীবনের শক্তিতে। ওই পুরুষটির প্রতিটি মুহূর্ত তাই তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত, ওই সংসারের প্রতিটি সুখ তাঁর হাত থেকে পাওয়া। যা কোনওদিন ওই ভদ্রমহিলা দিতে পারবেন না। বিজ্ঞানের যুক্তি তুলে ওই অল্পবয়সি মেয়েটি তা গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে, আহাম্মক! দ্রুত মায়ের কাছে চললেন রমলা। অন্যমনস্ক পা চৌকাঠে আঘাত করতেই মুখ থেকে বেদনার স্বর বের হল। সবাই চকিত এদিকে তাকিয়ে। রমলা দেখলেন বুড়ো আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে টনটন করে। একজন ছুটে যাচ্ছিল ব্যান্ডেজ ওষুধ আনতে। মা বাধা দিলেন। বললেন, 'থাক আনতে হবে না। রক্তটা বেরিয়ে যাক। বদরক্ত।'



বড় পাপ হে

দু চোখ কুঁচকে সে দূর মাঠের দিকে তাকাল। এখন ভর দুপুর। সেই সকাল থেকে মাছ ধরার চেষ্টায় সময়টা গেছে ফালতু। শুধু চুনোপুঁটি আর পাথরঠোকরা! ক'দিন থেকে তক্কে-তক্কে ছিল সেই মোটকা বাণমাছটাকে ধরবেই, হারামিটা আজও সটকে গেল। ওটা নিয়ে ধোউয়ালির হাটে গেলে এক কিলো চাল হয়ে যেত নিশ্চয়। গরম-গরম কিলোটাক ভাতের সঙ্গে মাছ, আজ সকাল থেকে সে খুব মৌজে ছিল। এখন এই খানিক আগে চুনোগুলোকে বাটিতে পুরে উনুনে চাপিয়ে দিয়েছে ও। নামাবার সময় একটু নুন আর তেলের ছিটে দিলেই হবে। মাছের এই হাল দেখে ভেবে রেখেছে রোদ একটু মিয়োলেই বেরিয়ে পড়বে। নিচে খুঁটিমারির জঙ্গলের ধারটায় যে বাঁশঝাড়গুলো, শালা ঘুঘু পাখির বাগান হয়ে আছে। কালকে অবশ্যি অদ্দূরে যেতে হয়নি, নাথুয়ার রাস্তায় পেয়ে

গিয়েছিল বাপধনকে। বুক চিতিয়ে দেখছিল শালা। সাঁই করে গুলতি ছুঁড়তেই কেলিয়ে গেল। উনুন বলতে তো তিন পাথরের বুকে গোঁজা জঙ্গুলে কাঠ। তাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকে নিয়েছিল পাখিটাকে। নুন মেখে এই দাওয়ায় বসে রাত্তিরবেলা চাঁদ দেখতে-দেখতে ভুট্টা খাওয়ার মতো খেয়ে নিয়েছিল ও। খেয়েদেয়ে বলেছিল, বড় পাপ হে, বিচার করো। কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে আজকাল, কিছু একটা কাজ করলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ওই কথাগুলো।

নোনা রায় তো ওকে আজকাল সহ্য করতে পারে না। যখন ধান কাটাতে আর লাগাতে লোকজন নিয়ে এখানে আসে ওকে বলে সামনে না আসতে। কী মুশকিল! তা নোনা রায়কে তো বেশি আসতে হয় না এখানে। এক ফসলের জমি। ধানও তেমন হয় না। এবার নাকি মকাই লাগাবে ও। এইসব জোতজমি নোনার।

আবার ভালো করে নজর করল সে। কারা যেন আসছে। কে আসবে? এখন তো ধান-ফানের সময় নয়। নাথুয়ার রাস্তাটা আর ফাঁকা মাঠ। লোকজনের মুখ দেখতে হলে চলে যাও ধোউয়ালির হাট। পারতপক্ষে যেতে চায় না ও। খুব যদি দরকার হয়, এই তেলটা নুনটা কিংবা মোটকা কোনও মাছ-ফাছ যদি পেয়ে যায় সকাল সকাল। পেলেই লোকজন ওর দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। প্রথম প্রথম কয়েকজন ভিড় করে আসত। মেয়েছেলেগুলোন রস-রস করে তাকাত। সে তিন-চার বছর আগের কথা। ধান কাটতে এসেছিল নোনা রায় ছয়-সাতজন মদেশিয়া নিয়ে। মেয়ে মদ্দ। তাদের কেউ-কেউ দেখেছে মাঝ রাতে সে নাকি বলেছে, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।' দলের একটা মেয়ে নাকি পনেরো বছরের বাঁজা ছিল। ফিরে গিয়েই সে পেটের দড়ি আলগা করেছে। ব্যস, রটে গেল চারধার। হাট থেকে ঘুরে এসে নোনা রায় কাতলা মাছের মুখ করে বলল, 'খবরদার, মেয়েছেলের দিকে নজর দিয়েছ কী মেরে ছাল ছাড়াব হারামজাদা। তোর বাপের তো কুষ্ঠ ছিল, তোরও একদিন হবে। তা আমি বলে দয়া করে থাকতে দিচ্ছি, চার মাস পঁচিশটা করে টাকা দিই, হ্যা।' তারপর হিকহিক করে হেসে বলেছিল, 'ভালো-ভালো, ভূত-প্রেতের সঙ্গে কথা বলিস, লোকজন আর এদিকে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।'

নোনা রায়ের বাড়ি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে কাঠভাঙায়। ওই চার মাস আনাগোনা করে। বাকি আট মাস ধু-ধু সব। এই চালা ঘরটায় থাকে ও। প্রথম-প্রথম পাহারা দিত ও জায়গা-জমি। এখন জানে তার দরকার নেই। লোকজন আসেই না ভয়ে! বাপটা অবশ্যি সত্যি মরেছিল মাংস পচে খসে। সেই সময় গাঁয়ের লোক, নোনা রায়ের গাঁ, একঘরে করে দিয়েছিল ওদের। মরার আগে বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে—বিচার করো।' তারপর থেকে কিছু করলেই ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে কথাগুলো। তা নোনা রায়ের কথা শুনে ও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। আজ অবধি কোনও মেয়েছেলে বলতে পারবে না যে নজর খারাপ করেছে। সেসব দিকে ভয় নেই। শুধু পরদিন সকাল থেকে একটা অভ্যেস হয়ে গেল ওর। চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোয় হাত-পা লক্ষ করে ও। টিপে-টিপে কান-নাক দেখে। বাপের শালা প্রথম কান-নাক ফুলেছিল লাল হয়ে। বলত সাড় নেই। ওর তো নিজের কানে চিমটি কাটলে জোর ব্যথা লাগে। তার মানে সেইদিনটা ও বাপ হয়ে যায়নি। বড় পাপ হে, বিচার করো।

এই জঙ্গুলে জায়গাটায় ওর একরকম চলে যায়। মোটমাট একশো টাকা বছরে পায় ও নোনার কাছ থেকে। শর্ত, হাতি এলে তাড়াতে হবে। গত বছর কলাগাছ লাগিয়েছে নোনা। কোনও খবরাখবর হলে ধোউয়ালির হরেন মুদিকে খবর দিলেই নোনা পেয়ে যাবে। শালা ওকে একমুঠো ধানও দিয়ে যায় না। তা না দিক। পেট তো ওরই চাকর। আঙরাভাসায় মাছ আছে আর ঘুঘু ডাহুক চখা এরা আছে। চলে যায় কোনওরকম। এখন কলা পাকছে। চিনিকলা। নোনা ওকে অবশ্য খেতে বলেনি, মানাও করেনি। ভালো করে পাকলে খেয়ে দেখবে একদিন।

সত্যি লোক আসছে। ভালো করে ঠাওর করল ও। মাথার ওপরে সূর্য, যারা আসছে তাদের

ছায়া পায়ের তলায়। একটার হাতে লাঠি, অন্য দুজন হাত ধরাধরি করে আসছে। মেয়েছেলে। তিন পা হাঁটে তো হাঁ করে বাতাস নেয়। এ-শালার বুড়িরা এখানে কী করতে এল। থু করে থুতু ফেলল ও। মানুষজন দেখলেই আজকাল গা শিরশির করে। তারপর এরা তো শালা বুড়ি। দুপুরবেলা ঘুঘুর মতো গলা হেঁকড়েই চলবে। কিন্তু পাঠালে কে, কোন শত্রু! চট করে সামনে থেকে সরে এল ও। আড়াল থেকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে মতলবটা কী।

॥ দুই ॥

তিন বুড়ি ঠুকুর-ঠুকুর করে কোনওরকমে চালাঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা ডাহুক আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। মাথার ওপর করকরে রোদ, মুখ হাত কিন্তু ঘামেনি কারো। তিনজনের যে বড় তার গায়ের চামড়া মালার মতো শরীরে জড়ানো। ময়লাটে শাড়ি তিনজনের অঙ্গে। যদিও দ্বিতীয়জন বাতগ্রস্ত তবু তার শাড়ি প্রথমজনের মতো অগোছালো নয়। হাঁটতে তার কষ্ট হয়েছে খুব। তৃতীয়জন বয়সে ওদের চেয়ে ছোট। কাঁচাপাকা চুল। অন্যদের মতো খালি গা নয়। তবে জামাও ওকে বলা যায় না ঠিক, কারণ পিঠের দিকটা কোনওরকমে গিট বাঁধা। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেকদিন তবু পাছাটাছাগুলো ভার-ভার। মিলেব মধ্যে তিনজনেরই গালের ওপর মেচেতার দাগ ঘন।

ধপাস করে ওরা চালাঘরটার দাওয়ায় বসে পড়ে নিশ্বাস সইয়ে নিচ্ছিল। ছোটজন বলল, 'এলাম গো শেষ পর্যন্ত। গলাটা এখনও মরেনি, ধাক্কা খায় না কোথাও।

দ্বিতীয়জন বলল, 'মানুষজন কাউকে দেখি না কেন?' গলার স্বর খনখনে।

প্রথমজন দুই হাতের মুঠোয় লাঠি নিয়ে গাল চেপে বসেছিল, 'একটা লোক থাকে বলল যে, সে ব্যাটা কোথায়?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওরা উঠল। তৃতীয়জন উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরের মধ্যে তাকাল। আগে শুধু দাওয়াটা আর মাথার ওপর চালা ছিল একটা। এখন চাটাই দিয়ে চারটে দেওয়াল দেওয়া হয়েছে। দরজাও আছে একটা। 'কেউ নেই মনে হয়।' বলে তৃতীয়জন ঘরে ঢুকে পড়ল। একটু বাদেই তার গলা শোনা গেল, 'অ দিদি, লোক আছে গো। উনুন জ্বলে তাতে গাদা খানেক মাছ সেদ্ধ হয় দেখি।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'মাছ? আহা—কী মাছ রে!'

বড়জন চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'দুটো নিয়ে আয় দেখি।'

ছোটজন বেরিয়ে এল খালি হাতে। 'নিয়ে আসব যে, অন্য লোকের মাছ না?'

বড়জন হি-হি করে হাসল খানিক, 'তাতে কী! ব্যাটাছেলেরা তো আমাদের ছেলের মতো।' আশেপাশে কেউ থাকলে শুনতে পাবে এমন জোরে বলল কথাগুলো।

খিল খিল করে হাসতে চেষ্টা করল তৃতীয়জন, 'যে-সে লোক নয় গো, ভূত নামায়। রাতবিরেতে কথা বলে তাঁদের সঙ্গে, হ্যাঁ।'

দ্বিতীয়জন জোগান দিল. 'আবার বাঁজা মেয়ের সাধ খাওয়ার ব্যবস্থা জানে।'

তিনজনেই হো-হো করে হাসল। বড়জন জোরে, দ্বিতীয় চেপে চেপে, ছোট রসিয়ে রসিয়ে। ছোটর নজর পড়ল কলাগাছে কলা হয়েছে। একটা কাঁদিতে বস্তা জড়ানো। তার ফাঁক দিয়ে পেকে যাওয়া নাদুসনুদুস এক ছড়া বেরিয়ে এসেছে।

'বোতাম ছিঁড়েছে গো, আহা।' ঘাড় দোলাল সে।

দ্বিতীয়জন বুঝতে পারেনি প্রথমটা। শেষ পর্যন্ত কলা লক্ষ করে খরখরে জিভটা জলে ধুয়ে নিল, 'যা না ভাই, হাত বাড়ালেই পাবি, যা না, পেট আমার অম্বুবাচী করা মেয়েছেলের মতন হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'যা না মাগি, খিদে লাগেনি তোর?'

গড়িমসি করে ছোটজন উঠল। ওপাশে কুয়ো আছে একখান। তার গা দিয়েই কলাগাছের ঝাড়। শরীর এখন ভারী, মনের চাকর নয়। হাত বাড়লেই নাগাল হয় না। লাফাবে এমন সাহস নেই। কোথায় কোন জন শত্রুতা করার জন্য বসে আছে বলা যায় না। লম্বা শরীরের আঁকশি পেলে হত। একটা ছোট্ট কঞ্চি পড়ে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছে এমন সময় একটা ধমক শুনতে পেল ছোটজন, 'কলা পাড়া নিষেধ আছে।'

দাওয়ায় বসে বড়জন বলল, 'কে রে?'

দুপদাপ পা ফেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনেই অবাক চোখে ওকে দেখছিল। ও বাবা, এ যে দেখছি বেশ মদ্দ মানুষ। দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে এমন, বয়স বোঝা মুশকিল। চুল বেশ বাবরি হয়ে আছে। হাঁটু অবধি ধুতি গোটানো, উদোম গা। হাত-পা ফাটা-ফাটা। বেশ রেগে গেছে দেখলেই বোঝা যায়, 'কী মনে করে এখানে? কী চাই?'

'চাই? না-না, কিছু চাই না। এই বয়সে আর চাইব কি বাপ। তা তুমিই বুঝি সেই।' বড়জন মাথা দুলিয়ে বলল।

'সেই মানে?' লোকটা তিন বুড়িকে দেখে নিল।

'ওই যে ভূতের সঙ্গে কথা বলে মেয়েছেলের বাচ্চা করে দেয়, শুনলাম যে, ধোউয়ালির হাটুরেরা বলছিল।'

ছোটজন সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে লোকটার শরীর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, 'নাঃ, অ দিদি, পাপটাপ তো ঢোকার জায়গা পায়নি মনে হয়। পেটটেট তো দেখি এখনও এয়ো হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'তা পায়ের গোড়ালি দেখেছিস? কানের লতি? নাকের পাটা? ঠিকঠাক বলিস বাপু, আমি আবার পানসে দেখি আজকাল।'

এতক্ষণে কথা বলল মেজ, 'না গো, ছোট ঠিকই বলেছে।' লোকটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল গতিক দেখে, শেষ পর্যন্ত সামলে নিল, 'কে পাঠিয়েছে এখানে?'

'হাটের লোকজন।' ছোটজন বলল, 'থাকার জায়গা খুঁজছিলাম, তা বলল সবাই তোমার গুণের কথা, দেখতে এলাম।'

মেজ ধমকে উঠল এবার, 'আঃ কাজের কথাটা বল না আগে। এই যে বাছা, খিদে লেগেছে বড়, মাছ রাঁধছ শুনলাম, দুটো ভাত চাপিয়ে দাও আমাদের জন্য।'

'ইস!' ভেংচে উঠল লোকটা, 'আমার কে রে! এক ফোঁটা চাল নেই ঘরে উনি খাবেন ভাত। এখানে থাকা-টাকা হবে না। একটাই ঘর।'

'তাতে কী! আমরা তো ঘাটের মড়া। ফেলিস না বাপ।' বড়জন বলল। 'ভূত দেখার বড় সাধ।' ছোটজন পিনিক কাটল।

'নোনা রায় শুনলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার।' লোকটা চোখ বড়-বড় করে ভয় দেখাতে গিয়ে দেখল ছোট হাসছে। 'কোন নোনা? কাঠভাঙার সেই মিনসে। গোঁফ না উঠতেই আমার ঘরে এসেছিল গো। কী ছেলে, বুঝলে দিদি, সেদিনই আবার ওর বাপের আসার কথা। কোনওরকমে সামলে সুমলে ফেরত পাঠাই। বাপটা ছিল কসাই। ছিবড়ে করে ফেলত যেন। তা সেই নোনা নাকি! বাঃ-বাঃ।'

লোকটা হাঁ হয়ে শুনছিল কথাগুলো। ছোট থামতেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।'

মেজ যেন ভূত দেখল সামনে, 'আঁ! বলে কি গো।'

ছোটজন চোখ ঠারল, 'পাপ, পাপ করেছে গো বিচার চায়।'

বড় মাথা দোলাল, 'শুনব, সব শুনব। আগে খেতেটেতে দাও। বুঝলে বাপ, পেট হল সবচেয়ে বড় পুণ্যি। সেটা মিটালে পাপের কথায় জিভে স্বাদ লাগবে।'

'এখানে খাবারটাবার নেই। চাষ-বাস হয় যার খাবার তার কাছে। আমি মাছ-মাংস ধরে খাই, তোমরা বিধবা মানুষ—' লোকটা মিনমিনে গলায় বলতে চেষ্টা করল। ওদিকে উনুনে চাপানো বাটি থেকে গন্ধ উঠছে জোর। এবার নামানো দরকার।

বড়জন শিরাঝোলা হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বলল, 'ও বাপ, বিধবা বোলো না গো। হাজার-হাজার ভাতার ছিল আমার, মরে হেজে গেলেও কেউ-কেউ তো এখনো দিব্যি ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা বিধবা হলাম কী করে!'

লোকটা টক করে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হায় হায়, আর একটু দেরি হলেই হয়েছিল আর কী! জল শুকিয়ে তলা ধরব-ধরব করছে। নুন তেল ছিটিয়ে নামাতে-নামাতে ও বাইরের দিকে তাকাল। ছোটজনের ছেঁড়া জামার গিট দেখা যাচ্ছে; পেছন ফিরে আছে। আর দুজন চোখের আড়ালে। তাই নিজের মনেই যেন বলল 'ও, হাজার ভাতার তো বেবুশ্যেদের হয়।'

মেজজন বলল, 'ছেলের দেখি বুদ্ধি আছে খুব। ঠিক ধরে ফেলেছে।'

কথাটা শুনেই লোকটা কাঠ হয়ে গেল। অ্যাঁ! এই তিন বুড়ি বেবুশ্যে! ধোউয়ালির লোকজন এখানে পাঠিয়ে দিল কেন? ওকে পরীক্ষা করতে? মেয়েছেলের কাছে গেলে শরীর নষ্ট হয়, বাপ বলত। বাপেরও শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই। তা এদের কি মেয়েছেলে বলা যায়? দুজন তো শুকিয়ে আমসি, হাড়গুলো পটাং-পটাং করে। ছোটজন, যার শরীর একটু ভারী, সেও তো এখন আভাঙা কুঁজোর মতো, মুখটাই সরু, তলায় মস্ত ফাঁক—জল ধরে না। তা এদের কি আর মেয়েছেলে বলা যায়? এর আগে মেলায় ও বেবুশ্যে দেখেছে। তা তাদের ঠাটঠমক আলাদা, বাপের কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে ভয়টা টনটনাতো। এরা কিন্তু সে জাতের নয়। এককালে হয়তো ছিল, লোকটা ভাবল, এখন তো গাঁয়ের পাঁচ পুরুষ দেখা হরিবালার মতো চেহারা সব। মাসি বলে ডাকা যায়। পরক্ষণেই নিজেকে ধমকে উঠল সে, কোথাকার কে, আদিখ্যেতা দেখানো মানে নিজের বাঁশ নিজে নেওয়া। মেয়েছেলে হোক না হোক, তিনটে পেট তো! ওগুলো ভরাবে কে? ঘর থেকে হাঁক ছাড়ল ও, 'এখানে সুবিধে হবে না, চলে যাওয়া হোক।'

'তাই নাকি!' ছোটজন বলল।

'রাতবিরেতে জায়গা ভালো নয়, আর কিছু না হোক, হাতি নামে জঙ্গল থেকে।' লোকটা যেন ভয় দেখাল।

'কত হাতি মোষ দেখলাম সারাজীবন!' ঠেস লাগল গলায়।

'তারপর নোনা রায় আছে। বড় রাগি মানুষ।' লোকটা যেন অনুনয় করছিল এবার।

'নোনার তলপেটে একটা আধুলির মতো আঁচুল আছে, ও কিছু বলবে না, কী ভিতুই ছিল না দিদি কি বলব।' ছোটজনের উদাস গলা।

যাঃ শালা। লোকটা অসহায় চোখে বাটির দিকে তাকাল। নোনা রায়ের বেবুশ্যে এরা। আবার নোনার বাপেরও। অথচ এদের কথা কোনওদিন শোনেনি ও। ওর বাপ কি এদের—। খুব কৌতূহল হল ওর, 'তা এ তল্লাটে আগে দেখিনি কেন?'

'দশ বছর ছিলাম না গো, তীর্থ সারতে গিয়েছিলাম। তা দেখলাম সেখানেও এক ব্যাপার। প্রথম-প্রথম ছোটটার দিকে লোকে তাকাত। তারপর তো আমরা পুঁটলি। তাই ফিরে এলাম এখানে। জায়গাটা চিনি, মানুষজন জানি। তা বলো, এই কুড়ি ত্রিশ ক্রোশের সব বুড়োমানুষই আমাদের চেনে, হে-হে।' বড়জন গলা কাঁপিয়ে কথাগুলো বলল।

খুব ভয়ে-ভয়ে গোপন খবর নিচ্ছে এমন গলায় সে বলল, 'আচ্ছা, কাঠভাঙার আর কেউ, লম্বামতন, বাবরি চুল, গলায় কম্বল ছিল।

মেজজনের গলা শুনতে পেল সে, 'গলকম্বল—ও দিদি সেই লোকটা গো, তোমার কাছে একরাত বাকি রেখে গিয়েছিল, মনে পড়ছে, বাবরি চুল!'

চট করেই প্রথমজন যেন মনে করতে পারল, 'সেই কেষ্ট ঠাকুর। বাকি রেখেছে আর শোধ করেনি। তা আমাদের পয়সা মারলে নিস্তার আছে বাপ। শুনেছি কুষ্ঠ হয়ে মরেছে। চেন নাকি বাপ? কেউ হয়টয় নাকি?'

বাটি হাতে নিয়ে লোকটা কুঁকড়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'আমার বাপ।'

॥ তিন ॥

সন্ধে থেকেই খুঁটিমারি জঙ্গলের নিশ্বাসের মতো একদল বাতাস আনাগোনা করছিল। এখন আকাশে মেঘ নেই। বুকে বাঁধিয়ে রাখার মতো আকাশটার তলায় দাঁড়ালে শরীর শিরশির করে। এ জায়গাটায় দিনে যতই গরম হোক রাত পড়লে কেমন শীত-শীত ভাব। যেদিকে তাকাও আলোর দেখা পাওয়া যায় না। শুধু ফাঁকা মাঠের ওপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা জোনাকিরা কিলবিল করে।

কলাগাছের ঝোপের ওপাশে একটা বড় পাথরে লোকটা বসেছিল। ওর ঠিক মাথার ওপর ছাতির মতো চাঁদ ঝুলছে। লোকটা অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আছে। ওর পেছনে চালাঘরটায় তিন বুড়ি কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে। তিন-তিনটে পেটে আধচেবানো ঘুঘুর মাংস পড়েছে রাত হলেই। রোদ মরলে ও চলে গিয়েছিল সেই বাঁশঝাড়ে, ঘণ্টাখানেক লাগেনি, গোটা চারেক ঘুঘু হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আজ পোড়ানো হয়নি সেগুলো, ছোটজন ভাঙা হাঁড়িতে সেগুলো সেদ্ধ করেছে। এ অন্যরকম স্বাদ। আজ সারাদিনটাই অন্যরকম গেল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে লোকটা বাপের মুখ মনে করতে চাইল। তারই মতো বাবরি চুল ছিল বাপের। লোকে বলত বাপ-বেটা দেখতে একরকম। বাপ, তুমি বাকি রেখেছিলে কেন হে বেবুশ্যেদের কাছে? আমার কিছু পয়সা আছে ঘরের নিচে পোঁতা, তোমার ধার শোধ করে দেব। অভ্যেসে লোকটার একটা হাত চলে গেল কানের লতিতে। টেনেটুনে দেখল। প্রথমে ছিল অন্যমনস্ক, চট করে খেয়াল হতেই অন্য লতিতে হাত দিল। সাড় নেই নাকি! না, ঠিকই আছে, বেশ ব্যথা করে একটা। অন্যটার—মাথা ঝাঁকাল সে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।' জল এসে গেল চোখে।

'আমরা এসেছি বাপ!'

চমকে ফিরে তাকাল সে। প্রথমটা ঝাপসা দেখল ও। তিনটে বাঁকা আধবাঁকা শরীর ওর ঠিক পেছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় তাদের সেই তেনাদের মতো দেখাচ্ছে। হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল ও। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। তারপর চোখ বড়-বড় করে দেখল তিন বুড়ি ওর দিকে কেমন মোহিনী মুখে তাকিয়ে আছে।

'কথাবার্তায় বিঘ্ন করলাম না তো!' বড়জন ফিসফিস করে বলল, 'উনারা রাগ করবেন না তো, ক্ষমা চেয়ে নাও বাপ। তুমি তো আমার ছেলে।'

মেজজন বলল, 'এই শুনেই এসেছি গো তোমার কাছে। হাটুরেরা বলেছে, তোমার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে, স্বচক্ষে দেখলাম আজ।'

ছোটজন মাথা নিচু করে বলল, 'নইলে কেউ একা-একা এই বাদাড়ে থাকতে পারে।'

ওরা তিনজন পাশাপাশি মাটিতে উবু হয়ে বসল, ওদের সামনে লোকটা হাঁ-করে দাঁড়িয়ে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। বড়জন তেমনি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরা এখানে থাকতে আসিনি বাপ। কাল ভোর-ভোর চলে যাব। তোমাকে একটা কাজ করে দিতেই হবে।'

খসখসে গলায় লোকটা বলল, 'কী!'

মেজজন বলল, 'তুমি কোনও মেয়েছেলের সঙ্গে শুয়েছ গো?'

চমকে উঠল লোকটা, 'না, না। কক্ষনো না। মেয়েছেলে শরীর নষ্ট করে দেয়।'

ছোটজন বলল, 'মেয়েছেলে নিয়ে কোনও কুচিন্তা—।'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না-না।'

মাথা দোলাল তিনজন। বড়জন বলল, 'অঙ্গ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই তো উনারা তোমাকে বেছে নিয়েছেন। তা আমাদের অনুরোধ রাখো এবার। আমরা তিনজন তো ঘাটের মড়া, পা বাড়িয়ে বসে আছি। সারা জীবন বেবুশ্যে ছিলাম, মরতে গেলেও বেবুশ্যে। অনেক তীর্থ করলাম, লোকে যেই শোনে বেবুশ্যে চোরা চাহনি চালায়। ছোটর যৌবন গেলেও খোলসটা যে ছাই যায়নি। তা তোমার কথা শুনে এখানে এসে তোমাকে দেখলাম। তা বাপ, মরার পর সব তো যাবে আগুনে, যদি শ্যাল কুকুরে না খায়, পাপগুলোর গতিটা কী হবে! তুমি বাপ আমাদের বিচার করো। না বোলো না বাপ। পিতৃঋণ না হয় শোধ করো।

তিনজন ভিখিরির মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকল এবার। থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে লোকটা বসে পড়ল পাথরটার ওপর। সামনে তিন বুড়ি মাটিতে বসে। চাঁদের আলোয় সব পড়েছে জব্বর। অজান্তে হাতের আঙুল চলে গেল লতিতে। কুঁকড়ে গেল ও, হায় বাপ, এটাতেও ব্যথা লাগে না কেন? ফিসফিস করে সে বলল, 'বড় পাপ হে—!'

'বলি তা হলে বাপ,' প্রথমজন বলল, বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। না, মিছে কথা না, কেউ আমাকে বেবুশ্যে করেনি। স্বামী মারা যাওয়ার আগে স্বাদ পেয়েছিলাম রক্তে। তার টানে-টানে চলে এলাম গো। না, আপশোস করি না। ত্রিশ বছর কাজ করেছি আমি। হাজার-হাজার মানুষ দেখলাম। সব একরকম। ঘরে ঢোকার পর অবশ্য চেহারা থাকে আলাদা। এর জন্যে বিচার চাই না। আমি তো পাপ করিনি কিছু। লোককে আনন্দ দেওয়া কি পাপ? কিন্তু আমার কি হত জানো? যেই কোনও লোককে ঘরে তুলতাম, ভাবতাম আমার স্বামী এসেছে। সেই স্বামী, যে বারো বছর বয়সটাকে সামলে দিয়ে চলে গেছে। এখন মনে হয় বাপ, আমি অন্যায় করেছি। সেই লোকটার আত্মাটাকে কষ্ট দিয়েছি। এটাই তো পাপ, তুমি বিচার করো বাপ, সে কী বলে জিগ্যেস করো।'

বড়জন থামতেই চারধার হঠাৎ নির্জন হয়ে গেল। লোকটার দুটো পা মাটিতে যেন আটকে গেছে। ও নড়তে পারছিল না। এই বুড়ি মেয়েছেলেটার সঙ্গে চুরি করে রাত কাটাত ওর বাপ। এই বুড়ি ওর বাপের শরীর নষ্ট করেছে। কিন্তু বাপ কেন বাকি রেখেছিল এর কাছে। ওর মা, যে নাকি ওকে জন্ম দিয়েই কার সঙ্গে কোথায় চলে গিয়েছে, সে কি বাপকে সুখ দেয়নি। ফিসফিস করে ও বলল, 'মা মা—।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমজন টলমল গলায় বলে উঠল, 'জোরে বল বাপ, আঃ, আঃ, কি শান্তি। হু-হু করে কেঁদে ফেলল বুড়ি।

নড়েচড়ে বসল দ্বিতীয়জন, 'আমার ঠাকুরপো আমাকে রাস্তায় এনেছিল। রাস্তা থেকে নিজেই ঘরে এলাম। তা দিদির মতো আমার দুঃখ হয় না বলব না, হয়। সংসারের জন্যে আগে কষ্ট হত। এই কুকুরের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। কপাল এমন, তিন-তিনবার ছেলে বিয়োবার চেষ্টা করেছি, জন্মাবার সময় কে যেন ফাঁস টেনে মেরে ফেলেছে তাদের। রাজপুত্র না হোক, আমার ছেলে হত তো বেঁচে থাকলে। দিদি বলত, আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল তারা, তাই নাড়ি পৈতের মতো গলায় আটকে যেত তাদের। তাতে আমি কি পেলাম বল। এসব সুখদুঃখ তো আছেই। একদিন দেখলাম শরীর জ্বলছে। কাউকে বললাম না। এক সন্ন্যাসীর কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কোনও সাধুর গল্প বললেন। মন সায় দিচ্ছিল না, তবু ভাবলাম হয়তো এটা পরীক্ষা। রাত্তিরবেলা শরীর দিয়ে তার পুজো করলাম। বললেন এবার ছেলে বাঁচবে। তা ভোর রাতেই মনে হল অস্বস্তি হচ্ছে। সন্ন্যাসী চলে গেলে টের পেলাম পরে, বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। রাগ হয়ে গেল খুব। মায়া নেই মমতা নেই। ডাক্তার দেখালাম না, এক মাস ধরে মানুষের শরীরে সেই বিষ ছড়াতে

লাগলাম। এখন মনে হয় কী পাপই করেছি আমি। কত মানুষ অন্ধ হল, কত সংসার ভেসে গেল, সব আমার হিংসের জন্য, পাপের জন্য। এখন আমি কী জবাব দেব?'

চার ধার আবার চুপচাপ। শুধু বড়জন এখনও ফুঁপিয়ে যাচ্ছে। একটা রাতের পাখি শব্দ করে ডেকে উঠল কোথাও। জোছনার সর ক্রমশ হলদে হয়ে আসছে। লোকটার মনে পড়ল বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে।' যেন বালতিতে জল ভরা আছে, লোকেরা এসে মগে করে তুলে তুলে নিয়ে যায়।

'কিছু বলো গো, আমার বুক জ্বলে যায় পাপে!' মেজজন যেন থাকতে পারছিল না আর।

'লোকটা বলল, আমি জানি না, কিছু জানি না।'

'তোমাকে বলতেই হবে বাপ। যা শাস্তি হয়—। তোমার মায়ের দিব্যি।'

চমকে উঠল লোকটা। মায়ের দিব্যি! মা কেমন দেখতে? কোনও ছবি নেই ওর মায়ের। বাপ বলত কালোকেলে ছিল না। সামনে তাকাল ও। মেজজনের মুখ দেখল। মাংস নেই একরত্তি। বুড়ো হলে কি কঙ্কাল শুকিয়ে যায়? সব মানুষের কঙ্কাল তো একই রকম দেখতে। মাংস আর চামড়ার হেরফেরে চেহারা আলাদা-আলাদা হয়। মায়ের বয়স এখন কি এর মতো হবে? মা এখন কোথায়? যার সঙ্গে চলে গেছে মা সে কি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে? ফিসফিস করে বলল সে, 'মা গো, মা—।'

সঙ্গে-সঙ্গে দুই বুড়ি দুজনকে আঁকড়ে ধরল। লোকটা দুজনের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। ছোটজন মুখ নিচু করে বসে একধারে। বড় দুজন পরস্পরকে ধরে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা কান্না নিয়ে মাখামাখি করতে-করতে চালাঘরটার দিকে কেমন আবিষ্টের মতো চলে গেল। লোকটা দেখল, বড়জন লাঠিটা মাটিতে ফেলে রেখে গিয়েছে। ফিসফিস করে বলল সে, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।'

খুব মৃদু কান্নার শব্দ আসছে ঘর থেকে। চাঁদ এখন ছায়া ফেলেছে লম্বা লম্বা। ডাহুকগুলো এত রাত্রে চেঁচায় কেন? ছোটজন নড়েচড়ে বসল। তারপর সামনের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি কোনও পাপ করিনি।'

কথাটা একদম আশা করেনি লোকটা। প্রতিদিন ও নিজে কত পাপ করে তার কি শেষ আছে! এই মাছগুলোকে যখন মারে তখন মনে হয় পাপ করলাম। ঘুঘুপাখিগুলো যখন খাবি খায় তখন মনে হয় পাপ করলাম। তবে? ছোটজন বলল, 'আমার মা ছিল এই লাইনেই, আমিও তাই করেছি। লোকে বলত আমি নাকি উর্বশীর চেয়ে সুন্দর, রম্ভার চেয়ে আমার যৌবন বেশি। লাইন পড়ত আমার ঘরের সামনে। সেসব যা দিন গেছে, আঃ। দু-হাতে টাকা উড়িয়েছি, একদম আপশোস নেই এখন, কি দেখতে ছিলাম! তুমি এমন মেয়েছেলে দেখেছ যার গায়ের রং গমের মতো, চুল খুললে শাড়ি পরতে হয় না, ভেতরের জামা পরেনি দেখে এই সেদিনও লোকে হাঁ হয়ে চেয়ে-চেয়ে থাকত, হাঁটলে পরে ছেলেবুড়োর জিভ শুকিয়ে যেত, দেখেছ?' মুখ কাত করে প্রশ্ন করল ছোটজন।

ঘাড় নাড়ল লোকটা। 'না, না।'

'তাহলে আর কী দেখেছ? ভোর হওয়ার আগে আকাশ দেখেছ কিংবা সন্ধে হব-হব আকাশ? দ্যাখোনি, তা হলে কী দেখেছ। আমি সেই রকম ছিলাম। কিন্তু আস্তে-আস্তে যেমন রাত হয়ে যায়, এ আমার তেমন হল যে। সব যে চলে যায়, যৌবনটা চোখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে গেল। অথচ মন আমার মানতে চায় না কেন? কেন ইচ্ছে করে একটা পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ভিতরে-ভিতরে কাঁপুক। কেন ইচ্ছে করে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষকে ধরে রেখে থরথর করে কাঁপি? কিন্তু আমার যে কিছুই নেই আর। শরীরের কোথাও সাড় পাই না আজকাল। মনে হয়, এটা আমার দেহ নয়। কেন যৌবন চলে গেল, শরীর থেকে

তো মন বয়স গেল না?' গোখরো সাপের মতো ফণা তুলে ছোটজন ওর দিকে তাকাল।

'আমি জানি না।' অসহায়ের মতো বলল লোকটা। বলতে-বলতে আঙুল দিয়ে দু-কানের লতি স্পর্শ করল। ব্যথা লাগে না কেন? চট করে নাক ধরল ও। কী ঠান্ডা নাক!

'জানো না! তোমার মনের মধ্যে এমন হয় না? সত্যি বল? শরীরের সবকিছু তোমার বশ?' উঠে দাঁড়াল ছোটজন।

'জানি না।' দু-হাতে মুখ ঢাকল লোকটা।

'জানো না। ছি-ছি-ছি। তুমি আবার পুরুষমানুষ নাকি? সাড় নেই যার শরীরে তার আবার যৌবন কীসের। আমার মনে সাড় আছে, তোমার তো তাও নেই। হায় কপাল, কার কাছে বিচার চাইতে এল ওরা। তোমার সারা শরীরে কুষ্ঠ, দগদগে ঘা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, তাই তোমার সাড় নেই শরীরে। ওয়াক, থু।' এক দলা থুতু মাটিতে ছিটিয়ে ছোটজন দুপদাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলে গেল। ভয়ে কুঁকড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে লোকটা দেখল হাঁটার তালে-তালে ছোটজনের অহংকারী শরীর কেঁপে-কেঁপে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারা শরীরে কোথাও যেন জল নেই, হাত পায়ে কানের লতিতে সাড় নেই একদম। বাপ বলেছিল কুষ্ঠ হলে সাড় চলে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে ও নিজের বাপকে হিংসে করতে শুরু করল। মিথ্যে কথা।

ছোটজনের শরীর এখনও দেখা যাচ্ছে। নেতানো জ্যোৎস্না মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে।

হঠাৎ মুখের সামনে একটা হাত নেড়ে কিছু একটা সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হটো বাপ।'

নিজের সঙ্গে খেলা



কাল সারারাত ওরা বৃষ্টিতে ভিজেছে। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চিরুনির দাঁতের মতো হাওয়া বইছিল সন্ধে থেকে। বৃষ্টি শুরু হলে তার চেহারা গেল বদলে। জলো বাতাসের তীব্র শাসানি আর কনে বউ-এর সিঁদুর-টিপের মতো বৃষ্টির ফোঁটা মাথার ওপরে বড়-বড় গাছের পাতা গলে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। গঙ্গাচরণের বুকের ওপর লেপটে মোহিনী দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল।

দিনের বেলায় যা ছিল একরকম, সূর্যি ডুবলে তা হল আর এক। বিকেলে যখন ছায়া ঘনাল, মাথার ওপরে বড়-বড় শাল সেগুন গাছে অজস্র পাখি আর বাঁদরেরা যখন বিচিত্র শব্দের আওয়াজ তুলছিল তখনও চোখের সামনের জগৎটা ছিল পরিষ্কার। মোহিনীকে নিয়ে গাছের ওপরে ওঠা যায় না, তাই গঙ্গাচরণ অনেক দেখেশুনে যে বিরাট শালগাছের গুঁড়িটা বেছে নিয়েছিল রাত কাটাবার জন্যে সেটা তখন মনে হয়েছিল অনেক নিরাপদ। তারপর টুকুস করে রাত নামল। চোখের পাতা বন্ধ করলেও এত কালো হয় না আঁধার। এক সময় উত্তরের ভুটান পাহাড় থেকে এল হাওয়া আর বৃষ্টি।

'ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু নয়'—গঙ্গাচরণ একটা হাত মোহিনীর ভেজা চুলে রেখে বলল ফিসফিসিয়ে। এখন কথা বলতে ভয় হয়। জঙ্গলের আনাচে-কানাচে কি বিচিত্র সব শব্দ বাজছে, এ জঙ্গলে কি বাঘ আছে? তেমন তো শোনা যায় না। দু-একটা বড় জন্তু অবশ্যি আসে—তা তারা

আসে শীতকালে। ভয় বলতে তাকে, রাত্রে যার নাম করতে নেই। সে আসুক, কাছে তো ঘেঁষতে পাবে না। এখানে বসার আগে গঙ্গাচরণ একশো আটবার অস্তিমুনির নাম নিয়ে গণ্ডি কেটে রেখেছে গোল করে। সে গণ্ডি পেরিয়ে আসবে কারও সাধ্যি নেই। সে যত বড়ই লতা হোক। কিন্তু এভাবে বসে ভেজা, সারা শরীর দিয়ে জল গড়াচ্ছে, একটা ছাউনি দরকার। অন্তত মাথা বাঁচানোর একটা আড়াল। গায়ের মধ্যে শীত যেন র‍্যাঁদা মারছে। তবু ভরসা হয় না, এই অন্ধকারের জঙ্গলে এই বৃষ্টির বাতাসে দু-পা বাড়াতে। দিনমান হলে হত, রাতে কোথায় খুঁজবে গঙ্গাচরণ।

অথচ মোহিনী বাঁশের পাতার মতো কাঁপছে, দাঁতে-দাঁতে শব্দ হচ্ছে ওর, দশ আঙুলে কাঁকড়ার মতো ধরে রেখেছে পাঁজরার হাড়, গঙ্গাচরণের কেমন কষ্ট হল। মোহিনীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। গলার কাছে গরম নিশ্বাসের স্পর্শ লাগছে। গঙ্গাচরণ একবার হাত বোলাল মোহিনীর মুখে। কি নরম, মাটির চেয়ে নরম মুখের জমি। এই অন্ধকারে চোখ বুজে আঙুলের ডগার স্পর্শে গঙ্গাচরণ বলে দিতে পারে মোহিনীর কপালের কোন জায়গাটা একটু ঢালু, ধনুকের মতো দুটো ভ্রূ কতটা ঘন, চোখের পাতার আড়ালে যে দুটো দিঘি তা কতটা গভীর, নাকের পাটায় কাঁপা-কাঁপা ছোট্ট ফুল, টিপে থাকা দুটো ঠোঁট কতটা রক্তে গোলাপ তার চিবুকের পাশে যে ছোট্ট টোল পড়ে ঠোঁট খুললেই—গঙ্গাচরণ যেখানে ক-ফোঁটা চোখের জল স্বচ্ছন্দে রেখে দিতে পারে। এ সবকিছু বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়।

অথচ মোহিনীকে কোনওদিন স্পর্শ করার সুযোগ হয়নি গঙ্গাচরণের। খুঁটিমারীর কাঠকাটাদের গাঁয়ের বউ মোহিনীর গায়ে হাত দেবে গঙ্গাচরণের এত বড় বুকের পাটা ছিল না। মোহিনীদের ঘরের দাওয়ায় যে লম্বা কাটারিটা ঝোলানো থাকত, যেটা নিয়ে মোহিনীর স্বামী কামাখ্যা দু-বেলা বেরুত সেটার ওপর ভয় ছিল গাঁসুদ্ধু সবার। তবু বাদা অঞ্চলের মানুষ গঙ্গাচরণ ঘুরতে-ঘুরতে যখন এসে পড়েছিল খুঁটিমারীতে তখনই নজর কেড়েছিল মোহিনী। বৈরাগীর ভেক নিয়ে এসেছিল গঙ্গাচরণ। এতে অন্ন পাওয়ার সুবিধে হয়। গানের গলাটাও ছিল ভালো। মানুষজন আপন করে নিতে দেরি করত না। তা খুঁটিমারীতে এসে আর পা সরে না। মোহিনী তার গানের সুরের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল আচমকা। আর সেই সুরের টানে-টানে কখন মোহিনী কাছাকাছি এসেছে, কখন তার বুকের মধ্যে হাঁপর উঠেছে টের পায়নি কেউ। মোহিনীর বাড়ির সামনে ছোট্ট ভিড় জমিয়ে গঙ্গাচরণ একদম নিজের মনের কথা, সারাজীবনে সে যা ভেবেছে সেই কথাগুলো বলত, সুখ কেউ পায় না গো, সুখের ভান করে সবাই। সুখ কি বাজারের আলুবেগুন, পয়সা দিয়েই কেনা যায়? সুখ কি তোমার বাঁধা গরু যে মন্ত্র দিয়েই বাঁধা যায়! নাকি সুখ তোমার গায়ের জোরে কাটারির তলায় ঘাড় পেতে বসে রইবে! বলত আর আড়চোখে মোহিনীর দাওয়ার দিকে তাকাত। সেখানে কামাখ্যা পা ঝুলিয়ে কথার তালে মাথা দোলাত। তাই দেখে গা জ্বলত গঙ্গাচরণের। গলা ছেড়ে গান ধরত, 'আমার দুঃখ বড় ভালো, সে যে সঙ্গ ছাড়ে না...।'

মাথা গোঁজার আস্তানা জুটে গিয়েছিল একটা, জুটে যায়। বিধাতার এটাই নিয়ম। বুকের মধ্যে ঘর আছে সবার, শুধু দরজা খুলে দেওয়ার মন্ত্রটা জেনে নিলেই হল। সে মন্ত্রের নাম ভালোবাসা, তাই গান হয়ে, ফুল হয়ে, আকাশ হয়ে, তাই দুঃখ হয়ে ঝুরু-ঝুরু করে। গঙ্গাচরণের মুখে হাসি, গলার সুরে দুঃখের সঙ্গে চিরকালের মিতালি। তাই যখন শুধু চোখে-চোখে চাওয়ার টানে মোহিনী ঘন বিকেলের ছায়ায় চলে এল ওর কাছে তখন বুকের মধ্যে কেমন একটা দুঃখ চলকে উঠেছিল গঙ্গাচরণের। এত কাছে, এই নিরালা বনের ধারে মোহিনী পানের পাতার মতো মুখ তুলে যখন বলল, 'আমি এলাম, আমাকে নিয়ে চলো,' তখন বুকটা থম ধরেছিল।

'কোথায়?'

'তোমার দুঃখের কাছে।'

'কেন, সুখ চাও না? তোমার তো সুখের শরীর।' গঙ্গাচরণ হেসেছিল।

হাত ধরেছিল মোহিনী, 'সুখের সুখ তো পেলাম, এবার দুঃখের সুখ চাই।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গাচরণের শরীরের শিরায়-শিরায় শরীরের সমস্ত ঘরের দরজা-জানলাগুলো হঠাৎ ওঠা ঝড়ের দমকে উথালপাথাল।

'তোমার ভয় হয় না?'

'না।'

'ঠিক আছে। তাই হোক।'

'আমি রাত্তিরে আসব। জেগে থেকো।'

'জেগে থাকব।' গঙ্গাচরণের মন বলল, আমি তো জীবনভর জেগেই আছি গো! জেগে-জেগেই আমার রাত গেল, দিন এলে চোখ বন্ধ হয় না। মুখে বলল, 'এখন নয় কেন?'

'বাঃ উঠোনটা নিকিয়ে দিয়ে আসি, বাসনগুলো ময়লা—ধুতে হবে না? স্মৃতিগুলো রেখে দিয়ে আসব।'

অথচ কেমন করে কী হল, গ্রামসুদ্ধ লোক চড়াও হল সন্ধে পেরোতে কুপ ডাকা কন্ট্রাকটরের বারান্দায়। সেটাই গঙ্গাচরণের আস্তানা। পা ঝুলিয়ে আকাশ দেখছিল সে, একটা তারা টুক করে পড়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। এমন সময় লোকগুলো এসে হাজির একরাশ অন্ধকারের মতো। সবার সামনে লকলকে আগুনের মতো কাটারি হাতে কামাখ্যা, মোহিনীর স্বামী। তার গলাটাই চড়া, 'এই শালা বাউণ্ডুলে, ওঠ!'

আর দুজন এসে হাত ধরল।

'ঘরের বউ-এর সঙ্গে পিরিত! শালা ফুসলে নেওয়ার মতলব!'

'শালাকে আমি কেটেই ফেলব। আমার বউ আমার মুখের ওপর বলে এর সঙ্গে ঘর ছাড়ব। ডুবে ডুবে জল খাওয়া!'

'দুঃখ-দুঃখ করে ভড়ং দেখানো।'

লোকগুলো কেমন করে গোল হয়ে গেল। সব হাতগুলো মিলেমিশে একটা বর্শা হয়ে গঙ্গাচরণের পাঁজরার হাড়ে মাথার খুলিতে খোঁচা মারতে লাগল। দু-চোখ ঢেকে যায় যে, এর নাম রক্ত, আঃ!

ওরা ওকে নিয়ে এল গাঁয়ের ধারে, যেখানে জঙ্গলের শুরু। যে জঙ্গলের তিনপাশে পাহাড় আর পাহাড় আর একদিকে এই কাঠ কাটাদের গ্রাম। কে যেন হাঁকল, 'যা শালা জঙ্গলে। এ গ্রামে আবার যদি দেখি চামড়া খুলে ঢাক বানাব।'

হইচইটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল। গঙ্গাচরণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। জঙ্গল থেকে বেতের ফুলের গন্ধ আসছে। এত মাবল ওরা, কই কান্না নেই কেন? কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কান্না আসছে না কেন? মোহিনী কোথায়? তাকেও কি ওরা মেরেছে? হঠাৎ খুব ভালো লাগল গঙ্গাচরণের, খুব ভালো মেয়ে, সোজা কথা সোজা মনে বলে দিল কামাখ্যার মুখের ওপর। গঙ্গাচরণ ঝরনার জলে মুখ ধুলো। আর তারপরেই পাতার শব্দ পায়ের চাপে কানে বাজল। চোখ তুলতেই সে।

'এলাম।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, ওরা তোমাকে মেরেছে, আমাকে পারেনি। অন্ধকারে-অন্ধকারে এলাম। সোজা পথ নেই যে!'

'এখন কী হবে?' গঙ্গাচরণ গাঁয়ের দিকে তাকাল। সেখানে হইচই বেশ জোরদার। আর হ্যারিকেন নয়, এবার মশাল জ্বলছে।

'পালিয়ে চলো। যত তাড়াতাড়ি। ওরা আমাদের একসঙ্গে পেলে—।'

'কোথায় যাব?'

'জঙ্গলের ভিতরে, ওই পাহাড় পেরিয়ে কোথাও, সেখানেও তো মানুষ আছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।'

'মানুষ আছে। হ্যাঁ, চেনা মানুষের চেয়ে অচেনা মানুষ ভালো। কিন্তু এই জঙ্গলে হাঁটতে পারবে?

'তুমি আছ।' মোহিনী হাসল।

এরপর আর কথা নয়, থাকতে পারে না। হাত ধরল ওরা। অন্ধকারে বেতগাছের পাশ কাটিয়ে, পাতা মাড়িয়ে বনের অনেকটা দূর চলে এল। এখন বন অনেকটা ঘন। হাঁটা যাচ্ছে না। গা ছড়ে যাচ্ছে। ওরা অনেক ভৌতিক শব্দ শুনল, মাথার ওপর পাখি আর বাঁদরের চিৎকার। মাঝে-মাঝে অন্ধকারে কী যেন জ্বলে। মোহিনী আর হাঁটতে পারছিল না। গঙ্গাচরণের মুঠোয় ধরা মোহিনীর নরম হাত ভিজে-ভিজে একাকার। তারপর এক সময় সকাল হল। বড়-বড় গাছের মাথা ছুঁইয়ে রোদ এল, মাটিতে সেই বুনো গন্ধ আর পাখির ডানার ঝাপটানি শুনতে-শুনতে মোহিনী হাসল। গঙ্গাচরণ মুগ্ধ হয়ে দেখল।

'ওরা আর আমাদের পাবে না।' গঙ্গাচরণ বলল।

'বলা যায় না। এখান থেকেও তো কাঠ কাটা হয়। দেখছ, সামনে গাছ কাটা আছে, নম্বর দেওয়া।' মোহিনী দেখাল।

হ্যাঁ, এখানেও মানুষের পায়ের চিহ্ন আছে। গঙ্গাচরণ দেখল, সারারাত না ঘুমিয়ে মোহিনীর চুল রুক্ষ, মুখের ওপর ধুলোর প্রলেপ।

এখন দিনের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার। চোখ মেলতেই আকাশ। শ্যাওলা-মাখা গাছের সারি। তবু কী আশ্চর্য, ওই ঠাসবোনা পাতার লুকোচুরির ফাঁকে খেলে কিছু রোদ চুঁইয়ে পড়েছে মাটিতে। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল ওদের। সকাল হতেই গাঁ-সুদ্ধ কাঠকাটারা এদিকে চলে আসতে পারে, প্রতিটি ডাল সরিয়ে খুঁজবে ওদের। নাকি কামাখ্যা সব ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকবে? মেয়ের তো অভাব নেই আশেপাশে। রোদ উঠলে, আলোর মুখ দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত। গায়ে হাতে একটু লাগছে এই পর্যন্ত। ফুলে-ফুলে গিয়েছে মুখ হাত। রাগলে মানুষ মানুষ থাকে না। এই যে কাল রাত্তিরে কামাখ্যা ওকে বেধড়ক মারল, কী লাভ হল? না, একটা উল্লাস পূর্ণ হল, ব্যস। তার বেশি কিছু তো নয়। তারপর বাড়ি ফিরে যখন দেখবে মোহিনী নেই, তখন ওর কেমন খারাপ লাগবে? নিজেকে খাটো লাগবে না? হেরে যেতে লজ্জা করবে না? করবে। করবে বলেই ও খুঁজবে খুঁটিমারীর ওপাশের বসতি অঞ্চলে, বিনাগুড়ির স্টেশনে, যেখানে মানুষ ঘর বেঁধে ভালোবাসা কৃপণের মতো রোজ একটু-একটু খরচ করে। ওর খেয়ালই হবে না হয়তো, এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে একটা মজা আছে। কপালটা টনটন করছে, গঙ্গাচরণ হাত দিল মুখে। মোহিনীর নজর পড়েছিল। গঙ্গাচরণ দেখল, একটা সরু নরম আঙুল হারমোনিয়ামের রিডের মতো তার মুখের ওপর সুর তুলছে। গঙ্গাচরণের চোখ বুজে এল।

ওরা তেমনি চুপচাপ বসে রইল খানিক। তারপর আলোর তেজ বাড়তে তারা হাঁটা শুরু করল। এখন চারধারে গাছ, গাছের দেওয়াল। একটা বনজ শব্দ ছাড়া কোথাও কারও অস্তিত্ব নেই। মোহিনী আগে-আগে চলছিল। জঙ্গল বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে তবু মেয়েদের চলায় চটক কত। চিবুক কাঁধের কাছে এনে টোল দেখিয়ে হাসছিল মোহিনী।

'হাসছ কেন?'

'দেখছি তোমাকে, তুমি কেমন পুরুষমানুষ।' মাথার ওপরে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর দেখতে-দেখতে বলল মোহিনী।

অবাক হল গঙ্গাচরণ, 'কেন?'

'কাল রাত থেকে তোমার সঙ্গে আছি, এই বনের মধ্যে একসঙ্গে, তবু তুমি ছুঁয়ে দেখলে

না ভালো করে, পুরুষ তো গো।' খিলখিল শব্দটা চমকে দিয়ে গেল কিছু পাখিকে। ওরা শব্দ তুলল।

হাসল গঙ্গাচরণ, 'আগে নিজের করে পাই।'

চট করে সরে এল মোহিনী, 'আর কীভাবে পাবে বলো?' তারপর একবারে গঙ্গাচরণের শরীরের সাথে মিশে যেতে-যেতে বলল, 'দাও না, দাও না।'

মোহিনীর নরম, গরম শরীরটাকে কোনওরকমে খাড়া রেখে গঙ্গাচরণ বলল, 'কী?'

'ভালোবাসলে সব পাওয়া যায়?'

'যায়।'

'সব?'

'হুঁ।'

'ছেলে?'

'ছেলে!'

'হুঁ! সে লোকটা আমাকে দিতে পারেনি। তুমি দাও। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো। আমার নাকি হবে না কোনওকালে। শোনো কথা! তুমি তো বলো ভালোবাসলে সব হয়, হয় না?'

'হয়।'

'তবে?'

'আমি তো আছি।'

'তাতে কী?'

'ভালোবাসলে কি কোনও ফাঁক থাকে! মানুষের বুকের মধ্যে ছোট-ছোট কয়েকটা ঘর আছে। একটা স্বামীর জন্যে, একটা সন্তানের জন্যে একটা মা-বাবার জন্যে, এইসব—কাউকে ভালোবাসলে সব ঘর পূর্ণ হয়ে যায় না? তখন আলাদা-আলাদা কেউ নয়, সব মিলিয়ে এক আর তার জন্যেই সব, বুঝলে?'

'উঁহু, আমি রক্তমাংসের মানুষ চাই। আমার পেটে থাকবে, আমাকে ব্যথা দেবে যে, আমি তার জন্যে রক্ত দেব, যে আমাকে রক্ত দেবে, আমি মরে গেলে সে বেঁচে থাকবে, আমার রক্ত থাকবে। বলো দেবে?'

গঙ্গাচরণ দু-চোখ মেলে দেখল মোহিনীকে। তারপর ভাবল, রোদ লেগে চোখ অন্ধ হয়, বাজ পড়লে কেউ কালা হয়ে যায় আবার ফুল ফুটলে মনে আনন্দ হয় যখন তখন ভালোবাসলে -! মোহিনীর অনুর্বর শরীরের দিকে হাত বাড়িয়ে গঙ্গাচরণ ফিসফিসিয়ে বলল, 'দেব।'

ওরা সেই পাহাড়টার দিকে চোখ রেখে হাঁটছিল। এভাবে হাঁটা যায় না, যাওয়া সহজ নয়। জঙ্গলের পায়ে চলা পথগুলো ভীষণরকম প্যাঁচালো অথচ সময়গুলো কী দ্রুত লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে! এখন যত জলদি হোক ওই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছানো যায় ততই মঙ্গল। ওইসব পাহাড়িয়া মানুষগুলোকে বিশ্বাস করা যায়।

মোহিনীর নজর পড়েছিল, এধারটায় বাঁদরের ভিড় বেশি। পায়ের তলায় আধখাওয়া পচা ফল পড়ে রয়েছে। হঠাৎই নজরে পড়ল কয়েকটা পেয়ারা গাছের মতো গাছ গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। তার অঙ্গে-অঙ্গে ফল। এ ফল কোনওদিন দেখেনি মোহিনী। গঙ্গাচরণও না। গঙ্গাচরণ বাঁদরদের তাড়িয়ে কোনওরকমে তার কয়েকটা পেড়ে আনতে মোহিনী জিগ্যেস করল, 'কী ফল?'

'জানি না, বাঁদরগুলো তো খাচ্ছে! বিধাতার জিনিস, খাও।'

তারপর এক সময় ছায়া জমা হল পাতায়-পাতায়। শেষপর্যন্ত বিরাট গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল ওরা। গঙ্গাচরণ গুনগুন করে গাইছিল, 'সুখ নামে সেই ফিচেল পাখি ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ

ওড়ে—।' গায়ে গা লাগিয়ে দুলে-দুলে গান শুনছিল মোহিনী। আর সেই সময় একরাশ বাতাস আরও কিছু অন্ধকার ছুঁড়ে দিল জঙ্গলের ভিতরে, বিরাট-বিরাট গাছের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে তেড়ে এল। আর তার কাঁধে চেপে এল বাতাসের মতো ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি। শেষপর্যন্ত কাঁপুনি ধরল গঙ্গাচরণের। কানের কাছে সুড়সুড়ি লাগছিল, হাত দিতে কী একটা পোকা উঠে এল। টান মেরে ছুঁড়ে দিল সেটাকে। একটা উঁচুমতো জায়গা পেলে হত, মাটির ওপর বসা ঠিক হয়নি। মোহিনী থরথর করে কাঁপছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আমার শীত করছে গো।'

মোহিনীর শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। স্নো মেখেছিল হয়তো, খুঁটিমারীর বাজারে পাওয়া যায় সব। হঠাৎ মেঘ ডাকল জোরসে। সমস্ত জঙ্গলটা মুহূর্তের জন্যে সাদা হয়ে আবার নিবে গেল আচমকা। মোহিনীর শরীর কেমন গরম হয়ে উঠেছে! আর হঠাৎ একদম ছেলেমানুষের মতো গঙ্গাচরণ দু-হাতে মোহিনীর মুখটা তুলে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। মোহিনীর গরম নিশ্বাস লাগছে মুখে। কী নরম ঠোঁট মোহিনীর! ভেজা-ভেজা একটু টক গন্ধ। তবু কী ভালো লাগল গঙ্গাচরণের। মনের মধ্যে একটা বলের মতো গড়িয়ে গেল ভালোলাগা।

হঠাৎ চুপচাপ চারধার। শুধু গাছের পাতায় জমে থাকা জল টুপটাপ ঝরছে। বৃষ্টিটা আচমকা থেমে গেল। গঙ্গাচরণ বুকের ওপর একটা গরম তেতে ওঠা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল। দু-হাত দিয়ে মোহিনীকে আবার স্পর্শ করতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল মন, মোহিনীর শরীর পুড়ছে, তেতে উঠছে গা। ভেজা চুল জামা-কাপড়ে যে জলের ঠান্ডা সেটা যেন আর হাতে লাগছে না। গঙ্গাচরণ ফিসফিস করে বলল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

অনেক দূর থেকে যেন মোহিনী কথা বলল, 'হুঁ।'

এখন কী করবে গঙ্গাচরণ? যদি জ্বর বাড়ে, তাহলে? শরীর তোমার সুখের, দুঃখ তোমার সইবে কেন? গঙ্গাচরণ হাসল। হাঁটাচলা হলেই ঠিক হয়ে যাবে। মনের জোর থাকলে কি না হয়।

তারপর যখন আলো ফুটল, গাছের ভেজা পাতা চুঁইয়ে যখন আলো পড়ল মাটিতে তখন গঙ্গাচরণ চমকে উঠল। জবাফুলের মতো টকটকে চোখ, মুখখানা কেমন বিবর্ণ, গায়ে হাত-পোড়ানো তাপ। দুবার ডাকতে মোহিনী চোখ মেলল। গঙ্গাচরণের চেহারা দেখে হাসল। দু-হাতে দিয়ে মোহিনীকে ধরে দাঁড় করাল ও, 'হাঁটতে পারবে?'

কয়েক পা হাঁটল মোহিনী, তারপর টলতে লাগল। না, এভাবে ওকে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। প্রথমটায় কী করবে ভেবে পেল না ও। মোহিনীর জ্বর এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে কেন? ভেজা মাটিতে বসিয়ে দিতে মোহিনী একটা কাপড়ের পুঁটলির মতো মাথা গুঁজে রইল। এ মোহিনীকে গঙ্গাচরণ কোনওদিন দ্যাখেনি। বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে।

একটা ভালো জায়গা দরকার, যেখানে মোহিনীকে শুইয়ে দেওয়া যায়। কয়েক পা হাঁটল গঙ্গাচরণ। ভালো করে এপাশ-ওপাশ দেখল। তারপর নজরে পড়ে গেল। বিরাট একটা ঝোপড়া গাছের নিচটা বেশ পরিষ্কার, আর আশ্চর্য, গাছের গোড়াটা বেশ শুকনো খটখটে। কাল রাতের বৃষ্টিতেও তলার মাটি ভেজেনি। গঙ্গাচরণ মোহিনীকে দু-হাতে কোলে তুলে নিয়ে গাছটার তলায় শুইয়ে দিল। একদম পাখির মতো হালকা মোহিনী লাল চোখ মেলে শুধু একবার দেখল, কোনও কথা বলল না।

সারাটা দিন গঙ্গাচরণ আচ্ছন্নের মতো মোহিনীর মাথার কাছে বসে রইল। এর মধ্যে দুবার বমি করেছে মোহিনী। কালকের গোগ্রাসে খাওয়া ফলগুলো বেরিয়ে এসেছে। হজম হয়নি একদম। বেলা যত পড়তে শুরু করল গঙ্গাচরণের বুকের মধ্যে তত ভয় জমছিল। একবার ছুটে গিয়ে গাঁয়ে খবর দেবে নাকি? ওগো তোমরা এসো, তোমাদের গাঁয়ের বউ-এর ভারি অসুখ। আর দেখতে হবে না, শান দেওয়া কাটারিগুলো উড়ে আসবে সঙ্গে-সঙ্গে। কী দরকার, একসঙ্গে জোট বেঁধেছি, একসঙ্গেই থাকব। দুঃখের সুখ দেখবে যে ও। মাথাটা তুলে নিল গঙ্গাচরণ। চোখ বন্ধ মোহিনীর।

স্থির হয়ে শুয়ে আছে সেই থেকে। গরম কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে গঙ্গাচরণ শুনল মোহিনীর নরম বুকে যেন একশো হাঁপড়ের শব্দ। মোহিনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল গঙ্গাচরণ। আহা, ঘুমোক একটু। বড় সুখের মেয়ে আমার। এত কষ্ট সইবে কেন? কত জল ঝড় গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। চোখের ওপর আলতো আঙুল রাখল ও। চোখের পাতা খুলতেই টইটুম্বর দিঘি। যখন গাইত গঙ্গাচরণ সেই দিঘিতে সকালের রোদ পড়ত যেন। আহা একটু আড়াল থাক দিঘিটা। একটু নিজের মধ্যে ভরে থাক। আসলে সুখের মেয়েগুলোই বড় দুঃখী হয়। একটু সোহাগ পেলে একটু প্রাণের কথা শুনলে ছটফটিয়ে ওঠে। মোহিনীর শুয়ে থাকা শরীরটার দিকে তাকাল গঙ্গাচরণ। অঙ্গে-অঙ্গে এত রূপ দেখে মনে হয় মরে যাই। বুকের ভিতরটা ভরাট হয়ে যায়। পাঁচ হাতির বল আসে। গুনগুনিয়ে গান গাইল গঙ্গাচরণ— 'আমার দুঃখ বড় ভালো, সে যে সঙ্গ ছাড়ে না, সে যে বুকের মাঝে উথালপাতাল সঙ্গ ছাড়ে না।'

গঙ্গাচরণের কেমন একটা ঘোর লাগছিল। মুখ-চোখ এত ভার কেন? এত ব্যথা কেন? হেসে ফেলল ও, কেমন দেখাচ্ছে এখন নিজেকে? সারারাত ভিজে শরীরে রস জমেছে নাকি? চোখে এত ছায়া পড়ে কেন? চোখে-মুখে হাত বোলালো নিজের। কেমন গরম-গরম! ঠিক মোহিনীর মতন। হ্যাঁগো, আমাকে ঠান্ডা থাকতে দিলে না নাকি? শরীর গরম হলে মন যে অস্থির হয়।

সারাটা দিন একভাবে বসে রইল গঙ্গাচরণ। শরীরে কী একটা অস্বস্তি। মোহিনীর মাথা তার কোলে। চুলগুলো ফুলেফেঁপে একরাশি মেঘ। দুপুরের দিকে মোহিনী একবার তাকিয়েছিল। তারপর আবার চুপচাপ আছে। গঙ্গাচরণের খেয়াল নেই কী করে দিনটা কেটে গেল। মোহিনীর শরীরের তাপ কমছে। বিকেল হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলের ওপর নজর বুলিয়ে গঙ্গাচরণ খুশি হল। তার নিজের হাত বেশ গরম। মোহিনীর ঠান্ডা হয়ে আসা শরীরটা ধরে রাখতে কি আরাম লাগছে। এই তো নিয়ম, একজনের শুরু অন্যজনের শেষ। একসঙ্গে দুজনের হলে চলবে কেন?

তারপর রাত এল। জঙ্গলের ওপর বাচ্চা মেয়ের মতো ত্রয়োদশীর চাঁদটা লাফিয়ে উঠে বসল। সমস্ত জঙ্গলে এখন অজস্র শব্দে কান পাতা দায়। আঃ! চোখ কুঁচকে তাকাল গঙ্গাচরণ। এই হতচ্ছাড়া পাখিগুলো এমন চিৎকার করছে যেন ঘর কারোর নেই। নাকি কাল রাত্রে ঝড়ে ওদের ঘর ভেঙেছে। বাহারে বাহা! অত চিৎকারের কি আছে, আবার ঘর বাঁধো। আমার ঘরও নেই, চিৎকারও নেই। তোরা যদি এত চিৎকার করিস, আমার সুখের মেয়ের ঘুম ভেঙে যাবে যে।

নিরিবিলি জ্যোৎস্নায় অন্ধকার আজ তেমন জমজমাট নয়। প্রথম রাতে কি মেঘ ছিল? দ্বিতীয় রাতে ঝড় উঠল। আর আজ দুধ টলটলে জ্যোৎস্না। এখন ভারি ইচ্ছে করে দুজনে হাত ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার জঙ্গলে হাঁটি, আমার সুখের মেয়ে গান গাইতে পারে না? আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুনগুন করুক। থাক বাবা, অত সুখে কাজ নেই। ও আর একটু ঘুমিয়ে নিক। আচ্ছা এত শক্ত হয়ে ঘুমিয়ে কেন? এত আড়ষ্ট! কি ভীতু মেয়ে আমার।

কতক্ষণ ঝিম ধরেছিল খেয়াল নেই, কীসের একটা সর সর শব্দে লাল চোখ মেলে তাকাল গঙ্গাচরণ। একদম সামনে প্রায় মোহিনীর পায়ের তলায় যে দাঁড়িয়ে তার চোখ জ্বলছে। শেয়াল নাকি? না, শেয়ালের চেয়ে বড় এটা। চোখের দৃষ্টি কি ধারালো। একটা হাত তুলে চাপা গলায় শব্দ করল গঙ্গাচরণ। কয়েক পা সরে গেল জন্তুটা, তারপর কিছুদূরে গিয়ে মোহিনীর দিকে তাকাল ও। আঃ পিঁপড়েগুলো উঠে আসছে কেন আবার? জ্বালাতন! সরিয়ে দিল আলতো করে যাতে মেয়ের ঘুম না ভাঙে। গঙ্গাচরণের বুকের মধ্যে ইচ্ছে করছে প্রাণভর জড়িয়ে ধরতে। বড় হিম ঠান্ডা মেয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠল গঙ্গাচরণ। কে যেন হাসছে, সারা বন কাঁপিয়ে হাসিটা ছড়াচ্ছে। সেই জন্তুটা সামনে নেই, কিন্তু দূরে তার চোখ জ্বলছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গঙ্গাচরণ। হায়না নাকি।

ভোর হয়ে গেছে কখন, কখন বেলা গড়িয়েছে টের পায়নি, মোহিনীর মুখের ওপর মুখ রেখে ঝিম ধরে পড়েছিল। হঠাৎ ঝিম ভাঙতেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল। পেটের ভিতরটা কেমন

করছে। ক্ষিদে পেয়েছে নাকি! ওই ফলগুলো আনলে কেমন হয়। গাছটা তো বেশি দূরে নয়। সুখের মেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে যে। উঠলেই খেতে চাইবে তো। শীত করছে বোধহয়, তাই শরীর এত ঠান্ডা। পেটে কিছু পড়লে গরম হবে। আলতো করে মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। একবারে পারল না, শরীর টলছে, পায়ে জোর নেই, হাঁটু দুটো বড় আলগা মনে হয়। একা রেখে যাব? মোহিনীর দিকে তাকাল গঙ্গাচরণ। যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে দেখবে সে নেই। কী হবে! গঙ্গাচরণ ভাবল খুব দ্রুত ফিরে আসবে। খাবার দরকার। ও টলতে-টলতে হাঁটতে লাগল। আহা শরীরটা এমন করে কেন? এমন অবাধ্য?

বেশ কিছুটা দূরে গিয়েও গাছটাকে খুঁজে পেল না গঙ্গাচরণ। হঠাৎ ও কান খাড়া করে দাঁড়াল। মানুষজনের গলা না? হ্যাঁ, তাই তো। চেঁচাচে-চেঁচাতে আসছে। ওদের খুঁজতে নাকি? গঙ্গাচরণ হঠাৎই কোমর উঁচু বুনো ঘাসের মধ্যে বসে পড়ল। মোহিনী এখন কী করছে? ওর কি ঘুম ভেঙে গেছে? যদি ওকে লোকজন পেয়ে যায়? না পাবে না, যা ঝাপড়া গাছটা। কিছুতেই মোহিনীকে খুঁজে পাবে না। মানুষগুলোর গলা ক্রমশ স্পষ্ট হল। কাউকেই চিনতে পারছিল না গঙ্গাচরণ। ওরা কি খুব রেগে আছে? মানুষ এত অল্পে রাগে কেন?

অনেকক্ষণ ওই ঘাসের বনে পড়েছিল গঙ্গাচরণ। ঘোর কাটতেই উঠে দাঁড়াল হুড়মুড় করে। না, কারোর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। লোকগুলো তাহলে চলে গেছে? বাঃ! টলতে-টলতে আবার ফিরে এল গঙ্গাচরণ। ফল আনা হয়নি। ইস্! আবার যেতে ইচ্ছে করছিল না। শরীর এত টানছে কেন?

ঝাপড়া গাছটার তলায় এসে অবাক হল সে। মোহিনী নেই! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল চারধার, কোথাও মোহিনী নেই। যাঃ, মেয়ের ঘুম তাহলে ভেঙে গেছে এরই মধ্যে। কোথায় গেল? নিশ্চয় খুঁজছে এখন তাকে। মেয়ে যা ভীতু। খুব রাগ হল নিজের ওপর গঙ্গাচরণের। কেন এতক্ষণ দেরি করল সে? ও একবার চেঁচিয়ে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরুতে চাইছে না ভালো করে। বুকের মধ্যে একটা কান্না এসে গেল হঠাৎ। মোহিনী কোথায় গেল? টলতে-টলতে খুঁজতে বেরুল গঙ্গাচরণ। ঘন জঙ্গলের এপাশে-ওপাশে কোথাও মোহিনী নেই। তবে কি সেই ফলগাছটার কাছে গেছে? না, সেখানেও নেই। খোঁজার টানে-টানে ফিরে-ফিরে যাচ্ছিল গঙ্গাচরণ গাঁয়ের দিকে। এই তো আর একটু পেরোলেই গাঁ। মাথার ওপর শকুন ওড়ে কেন? চোখ আড়াল করে আকাশ দেখল সে। রোদ নেই এখন। বিকেলের ছায়া বেশ ঘন।

আচ্ছা, মোহিনী কি আবার গাঁয়ে ফিরে গেছে? যা, তা কি হয়? সুখের মুখ দেখেছে মেয়ে, এবার দুঃখের মুখ দেখবে যে! তাই তো বুকের ভিতরটা এত ভরাট লাগে ও মেয়েকে দেখলে। না, ও ফিরতেই পারে না।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ। কিন্তু সমানতালে পা পড়ছে না গঙ্গাচরণের। পা দুটো যেন নিজের নয়, দুধের শিশুর মতো হাঁটছে যেন। হাসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ মুখে হাত দিল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ির গোড়ায় যে যজ্ঞিবাড়ির উনুন জ্বলছে। মাথার চুলে ভাতের ফ্যানের আঠা। আঃ, একটু শুলে কেমন হয়, হাত পা ছড়িয়ে? মোহিনী কোথায় গেল? ও এলে ওর কোলে মাথা রেখে শুলে শরীর শীতল হবে। গঙ্গাচরণ চোখ তুলে তাকাল। না, মোহিনী নেই কেন? আকাশ দেখল সে! আরে বাবা, আকাশটা নাগরদোলার মতো ঘোরে কেন?

জঙ্গলের কিনারে আসতে আসতে রাত ঘন হয়ে গেল। দুধের সরের মতো জ্যোৎস্না জঙ্গলের গায়ে মাখানো। সবকিছু সাফসুফ দেখছিল গঙ্গাচরণ। পেটের ভিতর মোচড় দিচ্ছে সমানে। গঙ্গাচরণ নিজেকে উৎসাহ দিচ্ছিল, এত দুর্বল কেন হে তুমি, মোহিনীর কথা একটু ভাব দেখি যে তোমাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গেল!

জঙ্গল সরিয়ে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল গঙ্গাচরণ। আরে ওটা কী? কাঠকাটাদের গাঁ আর জঙ্গলের ওপাশে যে ঝরনা তার গায়ে বসে দলবেঁধে ওরা করে কী? আগুন

জ্বলছে যেন? আগুনটাকে ঘিরে বসেছে নাকি সবাই? যাচ্চলে! এই গরমকালে কেউ আগুন পোয়ায়? লোকগুলোর মুখ ঠিক বুঝতে পারছিল না সে। আর একটু এগিয়ে গেল। বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। ওই তো কামাখ্যা বসে, হাতে কাটারি আছে নাকি! অন্ধকারে লুকিয়ে দেখতে লাগল গঙ্গাচরণ। না, ওদের মধ্যে মোহিনী নেই। তাহলে গাঁয়েও নেই। গাঁয়ে থাকলে কামাখ্যা এখানে বসে থাকত না। আচ্ছা, কামাখ্যার মুখটা যেন কেমন। অত গম্ভীর কেন? বড় দুঃখী-দুঃখী মনে হয়!

বেশ খানিক বাদে ওরা ফিরে গেল গাঁয়ে। গঙ্গাচরণ দেখল আগুনটা নিভে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নেভেনি। আরে আগুন না নিভিয়ে ওরা চলে গেল কেন? কেউ নেই কাছাকাছি। গঙ্গাচরণ পায়ে-পায়ে এগোল। একদম কাছাকাছি আসতেই একটা কটু গন্ধ নাকে এল ওর। প্রায় নিভে আসা আধপোড়া কয়েকটা কাঠের চারপাশে ঘুরল ও। ধুস শালা। এই লোকগুলো করলটা কী? জড়ো হয়ে আগুন জ্বালালো, আগুনটাকে পুড়তে দেখল, তারপর ভালো করে না নিভিয়ে ফিরে গেল। মানুষ বড় তাজ্জব জীব!

তারপর হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল মোহিনী তো এতক্ষণে সেই গাছতলায় ফিরে আসতে পারে। এসে দু-চোখ ভরে কাঁদতে পারে। তা ছাড়া তার তো আর কোথাও যাওয়ার নেই। বুকের ভিতরে একটা ছটফটানি শুরু হল গঙ্গাচরণের। ও টলতে টলতে হাঁটতে লাগল জঙ্গলের দিকে। মোহিনীকে একটা মজার গল্প বলতে হবে। লোকগুলো এল, আগুন জ্বালালো, চলে গেল। মানুষ যে কী করে, কোনও মানে হয় না মানুষের।

গঙ্গাচরণ হোঁচট খেতে খেতে হাঁটছিল আর ওর প্রিয় গানটা গুন গুন করছিল মনের মধ্যে— 'আমার দুঃখ বড় ভালো...।'

হঠাৎ তার খেয়াল হল মোহিনীকে বলতে হবে, কামাখ্যাকে দেখে এলাম। মনটা খুব নরম নিশ্চয়, নইলে অমন দুঃখু-দুঃখু মুখ করে কেউ বসে থাকতে পারে?

গঙ্গাচরণ আর হাঁটতে পারছিল না। দু-চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ওর। আর আশ্চর্য কাণ্ড, গঙ্গাচরণ দেখল ওর চোখের দুই পাতায় মোহিনীর হাসি-হাসি মুখ, ওর বুকের মধ্যে মোহিনী হেঁটে যাচ্ছে।

চোরের মতন দুঃখ ভুলে সুখের আশায় নিজের বুক জড়িয়ে ধরল গঙ্গাচরণ।



ঠাকুর, থাকবি কতক্ষণ

চেয়ারে বসে দুলছিল দ্বিজদাস। সেই ভোররাত থেকে জোর খাটুনি গেছে আজ, সামনের শো-কেসগুলো ভরতি, চট করে দেখলে সাজানো বাগান মনে হয়। বাইরে তাকাল ও, বিকেল হতে একটু দেরি আছে। রোদের তেজ মরেছে। দ্বিজদাসের এই দোকান 'সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' বসে ভুটানের পাহাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায়। নড়েচড়ে বসল দ্বিজদাস। হাতলছাড়া চেয়ার, দ্বিজদাসের হাতল থাকলে বসতে অসুবিধে হয়। বড় চর্বি জমে যাচ্ছে শরীরে। আঙুল দিয়ে বুকের তলায় খাঁজ ধরে না। এই শালা মিষ্টির গন্ধে শরীর ফুলছে। কথাটা ভাবতেই নরেশের দিকে নজর পড়ল ওর। খেঁকুড়ে চেহারা, অথচ দিনরাত মিষ্টি বানাচ্ছে ও। কার যে কী হয়? খালি গা, এই শীত আসা সময়টাও গায়ে কাপড় রাখতে পারে না। ওপরের দিকে তাকাল সে। কাঠের সিলিং-এর ওপরে মৃদু পায়ের শব্দ ঘোরাফেরা করছে। সাজগোজ হচ্ছে বোধহয়। সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিকান

ঠাকুর দেখতে যাবেন। দ্বিজদাস যার কাছে হাতি—শ্বেতহস্তী। মুখঝামটা দিয়ে দু-বছর আগে যে বলত, 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে সাদা হাতি বুকে তুলব।'

সকাল থেকেই ঢাক বাজছে পুজো মণ্ডপে। বোল পালটানো দুপুর থেকে। সীতাদেবী সকন্যা গিয়েছিলেন বরণ করতে। তারপর থেকেই ঢাক বলছে, ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। একঘেয়ে বেজে যাচ্ছে ঢাকদুটো। এই স্বর্গছেঁড়ার পুরোনো ঢাকি। এখনও মাইক ঢুকতে দেয়নি শ্যামাকাকারা। আশেপাশের জায়গাগুলোর মধ্যে স্বর্গছেঁড়ার পুজোর নামডাক বেশি। পুজোটা বনেদী।

ঠিক এই সময় দ্বিজদাস দেখতে পেল হারু ঘোষ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে। সোজা হয়ে বসল ও। শালা এদিকে আবার আসে কেন? সঙ্গে-সঙ্গে শ্যামাকাকাদের মুখ মনে পড়ে গেল ওর। আজ সকালেই দল বেঁধে এসেছিল ওরা।

হারু ঘোষ এক লাফে দোকানে উঠে এল। তারপর চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে দ্বিজদাসের দিকে হাত বাড়াল, 'দেশলাইটা দিন তো।'

পা থেকে মাথা অবধি চিড়বিড় করে উঠল। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে তো আজকাল। কিন্তু ততক্ষণে ওর হাত চলে গেছে ড্রয়ারের মধ্যে। সিগারেট খায় না নিজে, কিন্তু পেছনের দেওয়ালে রাখা গণেশের সামনে দু-বেলা ধূপ জ্বালাতে হয়। দ্বিজদাসের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরাল হারু। তারপর সামনের টেবিলে একটা পা ভাঁজ করে বসল, 'আজ সকালে ওরা এসেছিল কেন?'

'কারা?' চমকে উঠল দ্বিজদাস। শালারা খবর পায় কী করে।

'শ্যামাকাকাদের গুষ্টি। আমাকে তাড়াতে বলল?'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল দ্বিজদাস, 'গেলেই তো হয়।'

'বাড়িটা কার? ভাড়া দিই কাকে? ওদের বলে দিতে কি হয়েছিল সেখানে গিয়ে কথা বলতে। সে হিম্মত তো কোনও শালার নেই।' ফুক-ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ল হারু, 'সব শালার কেচ্ছা আমি জানি। ট্যাক্সি ড্রাইভার রতনা সাক্ষী দেবে। এখন এসেছে সতীত্ব মারাতে। যাক, আপনাকে সাফ বলে দিচ্ছি, এসব ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আজ বিকেলে ওদের ঠান্ডা করব আমরা।' যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল ও। তবে এবার ভেতরদিকে। দোকানের পেছনদিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। একটু পরেই হাসির আওয়াজ শুনতে পেল দ্বিজদাস। সীতা না রমলা? রমলা সীতার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট। কিন্তু এখন গলার স্বরে পার্থক্য বোঝা যায় না। পেছন থেকে দেখলে দ্বিজদাসই মাঝে-মাঝে গুলিয়ে ফেলে। ছেলেবেলায় রমলা বলত, আমি মায়ের মেয়ে। এখন বলে সীতা ঘোষের মেয়ে। না, হাসিটা তাঁরই, রমলা না, তিনিই হাসছেন।

শ্যামাকাকা বলে গেছে হারু ঘোষকে নোটিশ দিতে। সামনের পয়লা থেকে ঘর খালি করে দেয় যেন। স্বর্গছেঁড়া তেরাস্তার মোড়ে এই দোকান, দোকানের ওপর কাঠের বাড়ি, পেছনে বাগান আর বাড়ি—দ্বিজদাসের বাবা ধর্মদাস ঘোষ করে গিয়েছিলেন। আর কি জানি কেন, করার আগে বুড়োর কি ভীমরতি হয়েছিল, ভালোবেসে বউমাকে সব লিখে দিয়ে গিয়েছেন। তখন অবশ্য বউ মাথায় ঘোমটা দিত, হারু ঘোষ আসেনি স্বর্গছেঁড়ায়।

এই স্বর্গছেঁড়ায় জন্মেছে দ্বিজদাস। জন্ম অবধি জায়গাটাকে ও একটু-একটু করে বাড়তে দেখেছে নিজের মতো। ধর্মদাসের আমলে সন্ধের পর তেরাস্তার মোড়ে আসত না কেউ। পাশে খুঁটিমারীর জঙ্গলে তো এখনও হাতি আসে, খাস টাইগার দেখা যেত তখন। রাস্তাই ছিল না বলতে গেলে। একটু-একটু করে সব হল। পাশের জঙ্গলে কাঠ কেটে তক্তা বানাতে মিল বসল, মিলিটারিদের ক্যান্টনমেন্ট বসছে কয়েক ক্রোশ জমি জুড়ে বিনাগুড়িতে। ব্যস, স্বর্গছেঁড়ায় হুড়মুড় করে লোক ঢুকতে লাগল। সেলুন, দর্জির দোকান এমনকী রেডিও সারাই। সন্ধের পর জমজমাট। আর এই তেরাস্তার মোড়ে আগে যেখানে ভবানী মাস্টারের ভাঙা ঘর ছিল সেটাই ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দোকান

করতে এল হারু ঘোষ। ফটোর দোকান। জলপাইগুড়ির ফটোর দোকানে কাজ শিখে এই প্রথম নিজে ব্যাবসা শুরু করেছে। শুনে তো অবাক দ্বিজদাস। স্বর্গছেঁড়ায় ফটো তুলবে কে? সব তো মদেশিয়া কুলিকামিন। জন্ম থেকে চা-বাগানে খাটে। তা সীতাবেদী তখন মাথায় ঘোমটা দিতেন জরিপাড়ের। অবশ্যই বাইরে বেরুলে। মা মেয়েতে ছবি তুলিয়ে এলেন প্রথম দিনই। সেই হল কাল। পেছনের বাগানঘরটা খালি পড়েছিল, মাসিক দশ টাকা ভাড়া দিয়ে চলে এল হারু ঘোষ। সেদিনটা স্পষ্ট মনে আছে দ্বিজদাসের। শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা আর একটা এয়ারব্যাগ হাতে নিয়ে দোকানে ঢুকেছিল হারু। তারপর সেগুলো মাটিতে রেখে প্রায় পেন্নাম করতে এসেছিল হাত বাড়িয়ে। 'হা-হা করছ কি?'—প্রায় ছিটকে উঠেছিল দ্বিজদাস। তখনও এত চর্বি জমেনি শরীরে।

'বউদির শরীরে বড় মায়া। ওই ছোট দোকানঘরে কি থাকা যায় বলুন। উনি তো অবাক: ও, আমার নাম হারু ঘোষ—ছবি তুলি। তা আপনাদের বাগানঘরটা বউদি আমায় ভাড়া দিয়েছেন। উনিই তো এই সীতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক—না?' কাঁচুমাচু করে বলেছিল ছোকরা।

বিস্ময়ে চোখ দুটো রসচেপা রসগোল্লা হয়ে গিয়েছিল দ্বিজদাসের। ভাড়া দিয়ে দিল ঘর আর তাকে জানাল না? তাও আবার এই লপেটা ফটোগ্রাফারকে? ততক্ষণে দশটা টাকা পকেট থেকে বের করে হারু এগিয়ে ধরেছে, 'নিন অ্যাডভান্স।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল দ্বিজদাস, 'যে ভাড়া দিয়েছে তাকেই দেবেন।'

'ও।' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সযত্নে টাকাটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল হারু। তারপর বোঁচকা দুটো দু-হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেল সটান। যেন চৌদ্দপুরুষের বিছানা এটা, হাঁটাটা এত ফুটানিমারা। হাঁক শুনেছিল দ্বিজদাস, 'বউদি এসে গেলাম, এবার চা খাব একটু।'

হারু ঘোষের বয়স পঁচিশের নিচেই। পনেরো বছর আগে দ্বিজদাস ওরকম চেহারার ছিল। ছিমছাম চেহারার দ্বিজদাস এট্টুসখানি বউ সীতাকে নিয়ে ধর্মদাস জলপাইগুড়ি থেকে ছবি তুলিয়ে বাঁধিয়ে এনেছিল। রাত্তিরবেলায় ঘরে ঢুকে দ্বিজদাস দেখে ছবির কাচের ওপর সীতার কপাল জুড়ে গোল সিঁদুরের টিপ। নিচে লাল চন্দনে লেখা পতি পরমগুরু। আর তখন রাত হত সন্ধে থেকেই। ইলেকট্রিক আসেনি তখনও স্বর্গছেঁড়ায়। সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দরজার খিল দিত সীতা। কিছুতে হ্যারিকেন নেভাবে না। তারপর সেই বছর না ঘুরতেই রমলা হয়ে গেল। রমলা এসে সীতাকে সুন্দর করে তুলেছে দিনদিন। মেয়েছেলের অমন সুন্দর উপুড় করা কড়াই-এর মতো পিঠ দেখতে চাইলে সীতাদেবীকে দেখতে হয়। ফুড ইনসপেক্টর এসে দোকানের মালিকের নাম উচ্চারণ করেছিল—সীতাদেবী। আর তারপর থেকে কখন কেমন করে সীতা দেবী হয়ে গেছে—দ্বিজদাস এখন বউকে সীতাদেবী বলে ডাকে। ডাকাডাকি চুকে গেছে অনেক দিন। কথাবার্তা হয় কি হয় না। তেমন দরকার পড়লে রমলা আসে। তবে রোজের হিসেব—মানে এই দোকানের বিক্রিবাটার টাকা রাত্তিরে গিয়ে দিয়ে আসে ও নিজেই। রাত দশটার সময় দোকান বন্ধ করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে দ্বিজদাস। রেডিওতে খবর হয় তখন। হিসেবের কাগজ আর টাকাটা গাটারে বেঁধে টেবিলের ওপর রেখে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় সে। কাঠের বাড়িতে দ্বিজদাসের পায়ের শব্দ শরীরের ভারে মচ-মচ করে। বুড়ো বাপ মরার আগে এ নিয়ম করে গিয়েছিল—'যা কিছু বিক্রি হবে তা এই বউমাকে দেবে রোজ। লক্ষ্মী বাঁধা থাক লক্ষ্মীর কাছে। খরচা রাখবে নিজের কাছে—লাভ বউমা জমা করবেন।' সীতাদেবী এসে নাকি সব কিছু সোনা করে দিয়েছে—বুড়োর এরকম ধারণা ছিল। তা একদম—কী যে সব হয়।

ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন—দশ আঙুলে টেবিলে বোল তুলল দ্বিজদাস। পেটে বায়ু হচ্ছে আজকাল। এক জায়গায় বসে থাকা, একদম নড়াচড়া নেই। বায়নার কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাল একবার। মোট দুহাজার চারশ ত্রিশ টাকার বায়না আছে। মাল নিতে আসবেন বাবুরা ঠাকুর জলে পড়লেই। আর তখন খুচরো বিক্রি অনেক সময় বায়নাকে ছাড়িয়ে যায়। নিশ্বাস

ফেলার জো থাকে না তখন। অবশ্য নরেশ দশ হাতে সব ম্যানেজ করবে নিশ্চিত। তবু শিরদাঁড়া খাড়া রাখতে হবে দ্বিজদাসকে।

রোদের তেজ কমেছে। একটু-একটু হাওয়া ছাড়ছে উত্তর দিক থেকে। শিশুর দাঁতের মতো হিম মেশানো তাতে। ভুটানের পাহাড়গুলোর মাথায়-মাথায় কুয়াশা চাঙড় বাঁধছে। নতুন জামাপরা বাচ্চাগুলো হইচই করছে মোড়ে। কিন্তু ওরা কেউ নেই এখন। ভালো করে দেখল দ্বিজদাস, হারু ঘোষের দল আজ তেমাথায় আড্ডা দিচ্ছে না। হঠাৎ একটা জিপের আওয়াজ কানে এল, দ্বিজদাস দেখল পাদানিতে একটা ঠ্যাঙ বের করে বসে বড়বাবু আসছেন। সাত মাইল দূরে হৃদয়পুরে থানা। দ্বিজদাস তাড়াতাড়িতে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা ফতুয়াটা উলটো করে পরতে পরতে সামলে নিল। শালা পেটের কাছে বোতামটা কখন ফস হয়ে গেছে। অনেকখানি সাদা চামড়া লোম নিয়ে উদোম হয়ে থাকে।

শব্দ করে জিপটা এসে থামল দোকানের সামনে। কোনওরকমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিজদাস হাতজোড় করল, 'আরে কি সৌভাগ্য, বড়বাবু যে, আসুন-আসুন।'

মাথা থেকে টুপি খুললেন বড়বাবু, তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'খবরটবর কেমন?'

একটু চুপসে গেল দ্বিজদাস। কী খবর, কীসের খবর! দোকানের পেছনে ভিয়েনের পাশেই রেশন দোকান থেকে ব্ল্যাকে আনা এক মন চিনি পড়ে আছে যে। কী আশ্চর্য, নরেশটার যদি কোনও কাণ্ডজ্ঞান হয়। মাথা দোলাল ও, 'ভালো আপনার আশীর্বাদে—।'

'কী সব মাস্তান-ফাস্তান নাকি এসেছে—তারা কোথায়? পোঁদের চামড়া তুলে ঢাক বানাব—বলে দেবেন সবকটাকে। কে এক হারু ঘোষ নাকি আছে—সে কী করে?' বড়বাবু জিপে বসেই চোখ কোঁচকালেন। পাশে শব্দ হতেই দ্বিজদাস দেখল নরেশ একটা প্লেটে চারটে আট আনা সাইজের কমলাভোগ আর চমচ নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুমো খেতে ইচ্ছে হল শুটকোটাকে, শালার বুদ্ধি রাবণের মাথার মতো মাঝে-মাঝে বেড়ে যায়। চট করে প্লেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবুর সামনের ধরল সে, 'ফটো তোলে।'

'ফটো তোলে?' নধর মিষ্টিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি বিঁধিয়ে মিষ্টি তুললেন বড়বাবু। রস টপ-টপ করে পড়ছে। কাঠির ডগায় মিষ্টিটাকে নাচিয়ে মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'লীলা করেন বলুন।' মিষ্টির জন্যে কথাগুলো জড়িয়ে গেল। প্লেট ধরে থাকল দ্বিজদাস। বড়বাবু এক-এক করে তুলে নিচ্ছিলেন এমন সময় কাণ্ডটা ঘটে গেল হঠাৎ। কোত্থেকে একটা কাক ছোঁ মেরে শেষ মিষ্টিটা তুলে নিয়ে গেল আচমকা। তার ডানার স্পর্শে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে দ্বিজদাসের হাত থেকে প্লেটটা মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে থাকল। ভয়ে-ভয়ে কাকটার দিকে তাকাল দ্বিজদাস। ওরই দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর বসে মিষ্টি ঠোকরাচ্ছে সেটা। আর তখনই একটা হইহই হাসির শব্দ কানে এল ওর। কে হাসে? কোন দোকান থেকে? কিছুই হয়নি এমন ভান করে রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে বড়বাবু বললেন, 'গলাটা কার, চেনেন?' ঘাড় নাড়ল দ্বিজদাস।

'কী চেনেন তাহলে, রাবিশ!' বলে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন বড়বাবু। সঙ্গে-সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জিপটা চলে গেল শ্যামাকাকাদের বাড়ির দিকে।

ঠিক বুঝতে পারছিল না দ্বিজদাস, বড়বাবু এলেন কেন? শালা কাকটাও শত্রুতা করার সময় পেল না। ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। বোল তুলল সে দশ আঙুলে। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করল ও। হবে হবে, আজ শালাদের চামড়া ছাড়াবে। আহা হো-হো। খুব আনন্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখল রমলা দাঁড়িয়ে সামনে। থতমত হয়ে গেল ও। মেয়েটো দোকানে কেন? বেশ লম্বা হয়েছে মেয়ে। ঠিক মায়ের মতো চুলের গোছ। 'কিছু চাই মা?' আদুরে গলায় বলল দ্বিজদাস।

মাথা নাড়ল রমলা, 'না, মা বলল দুটো টাকা বিক্রির খাতায় জমা করতে। চারটে কমলাভোগ।' বলে গটগট করে ভেতরে চলে গেল। রমলার পেছনদিকে তাকাতে কেমন কান্না পেয়ে গেল দ্বিজদাসের।

টুকটাক গোলমাল চলছিল অনেক দিনই। ধর্মদাস বেঁচে থাকতেই। তখন বদমায়েশি করত অন্যভাবে। রাত্তিরে হিসেব চুকিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঘরে গিয়ে দেখত সীতাদেবী শুয়ে আছেন। গরমকালে এখানে বেশ গরম পড়ে। ছোট রমলা মায়ের গা ঘেঁষে শুতো। জায়গা কম বলে পাশের খাটে দ্বিজদাস। বড় গরম সীতাদেবীর। রাত্তিরবেলা শোওয়ার সময় শুধু তলার জামা পড়ে শুতো। কুতুকুতু চোখে দেখত নিজের খাটে শুয়ে দ্বিজদাস। হ্যারিকেন জ্বলতো ঘরে। তারপর একসময় উঠে গিয়ে চুপিচুপি সীতাদেবীর পাসে বসত। শরীর তখন মোটা হতে আরম্ভ করেছে। উত্তেজনায় হাঁপ ধরত বুকে। ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকত সীতাদেবী। কোনওরকমে হাতটা ছোট জামার ওপরে রেখেছে কি না রেখেছে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল রমলা। চিমটি কেটে মেয়েকে তুলে দিত সীতাদেবী। তারপর উঠে বসে কোলে তুলে নিত মেয়েকে, 'আহা কেঁদো না, কেঁদো না—বাবা এসেছে দ্যাখো, তোমাকে আদর করবে বলে এসেছে—আহা রে--' সুর করে-করে বলত তখন। গলাটা থাকত বেশ উঁচুতে—অন্য ঘরে ধর্মদাসের কানে যেতে অসুবিধে হত না কথাগুলো। চুপচাপ ফিরে আসত দ্বিজদাস নিজের খাটে। খুব জোরজারি করলে মুখ ঝামটা দিত সীতাদেবী, 'সার্কাসে নাম লেখাইনি তো যে বুকে সাদা হাতি তুলব!'

ধর্মদাস মারা যেতে প্রায়ই জলপাইগুড়ি যেত সীতাদেবী রমলাকে নিয়ে। বাপের বাড়ি। তখন লোকজনের মুখে শুনত সে আজ রূপশ্রী কাল আলোছায়া—সীতাদেবী সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসত নতুন-নতুন সাজগোজ নিয়ে। এই স্বর্গছেঁড়ায় সীতাদেবীর মতো স্টাইলিস্ট মেয়ে একটাও নেই। বড়বাবু একবার পুজোর সময় দেখে দ্বিজদাসকে বলেছিলেন, 'আপনার ওয়াইফ তো বেশ মডার্ন।' আর তখন থেকে খোঁজ নিতে শুরু করেছিল ও আসল ব্যাপারটা কী? নিশ্চয় কেউ আছে পেছনে, সীতাদেবী যাকে নিয়ে মজেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কারও হদিস পায়নি ও। চরিত্রের এই দিকটা পুজোর বাসনের মতো পরিষ্কার সীতাদেবীর। তখন একদিন, ধরে বলেছিল ও, 'কেন এমন করছ—আমি কী করেছি তোমার?' মুখঝামটা দিয়েছিল সীতাদেবী, 'আঃ, প্লে করো না তো! আমার কাছে একদম ভিড়বে না বলে দিচ্ছি। ক্ষ্যামতা না থাকলে পুরুষমানুষ ভেড়ার যুগ্যি—মাথায় কি শিঙাড়ার পুর পোরা যে বোঝো না!' আর তখন মনে-মনে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল দ্বিজদাস। শরীরটা যত মেদে ভরে যাচ্ছে ততই সব কিছুতেই হাঁপ ধরে যায়। সীতাদেবীর কথাটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে—চর্বি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধুতির তলায় আন্ডারওয়ার পড়ার দরকার হয় না আজকাল। অবশ্য দোকানে ওর সাইজ কিনতেও পাওয়া যায় না ছাই।

শেষপর্যন্ত ওই হারু ঘোষ এল। যেন এর আসার জন্যে সীতাদেবী এত বছর ধরে এত সব কাণ্ড করেছে। এর আসার জন্যেই ছিপছিপে দ্বিজদাসের এখন হাঁটতে কষ্ট হয়। সব কানে আসে ওর—তেমাথায় দোকান, কান খাড়া রাখলেই সব সেঁদোয়। প্রথম-প্রথম ছোকরাগুলো বলত রমলা নাকি হারু ঘোষের লভে পড়েছে। হারুকে ঘরজামাই করবে সীতাদেবী। তারপর শোনা গেল সীতাদেবী স্বয়ং নাকি জলপাইগুড়িতে গিয়ে হারু ঘোষের সঙ্গে একা সিনেমা দেখেছেন। রমলা ছিল না সঙ্গে। দুপুরে রমলা যখন ইস্কুলে যায়, দোকান বন্ধ করে খেতে আসে হারু ঘোষ। খেয়ে সীতাদেবীর বিছানায় গড়ায়। আর এইসব কথা যত ছড়াতে লাগল ভেতরে-ভেতরে তত খুশি হল দ্বিজদাস। এইবার লোকে থুথু দেবে সীতাদেবীর মুখে। আঙুল তুলে দেখাবে, পুজোমণ্ডপের কাজ করতে দেবে না—বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে না কেউ। এককালে স্বর্গছেঁড়ায় এসব নিয়ম ছিল। আর তখন এই দ্বিজদাসের পা ধরে কাঁদতে হবে সীতাদেবীকে—সে দৃশ্য বুকের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল দ্বিজদাস। কিন্তু এই চেনা স্বর্গছেঁড়াটা কখন যে এমন পালটে গেছে এটা জানা ছিল না ওর। বাইরে থেকে

হু-হু করে আসা লোকজন এই কথাগুলো ক'দিন আচার খাওয়ার মতো ভোগ করল। বেমালুম চাপা পড়ে গেল সব। কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সীতাদেবী সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে— হাসে সবাই। এখন কালেভদ্রে হারুর সঙ্গে দেখা হয়। অথচ দুজনেই একই বাড়িতে আছে।

ক'দিন আগে যখন ফটোর দোকানে কেচ্ছাটা হয়ে গেল তখন দ্বিজদাস ভেবেছিল এবার সীতাদেবীর ছানি কাটবে। বানারহাটের দুটো মেয়ে নাকি এসেছিল ছবি তুলতে। দোকানে বসে দ্বিজদাস তাদের দেখেনি। ছবি তোলার সময় হারু ঘোষ ওদের গায়ে হাত দিয়েছে—সেই নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি। কিন্তু সবার চেয়ে হারু ঘোষের গলা ছিল ওপরে। মেয়ে দুটো যত চেঁচায় হারু তার চেয়েও বেশি। শেষপর্যন্ত পাঁচজন গিয়ে থামিয়ে দিল। এই পাঁচ জন আবার হারুদেরই সাকরেদ। রাত্রে বাড়ি এলে সীতাদেবী হারুকে বলেছিল, 'মেয়ে দুটোর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কি চিজ— একটু ভালো রকম শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল।'

কুয়োর জলে মুখ ধুতে ধুতে নিজের কানে শুনেছে দ্বিজদাস। শুনে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়েছে। ইদানিং যত উঠতি মেয়ের দল ভিড় জমায় ফটোর দোকানে। শাড়ি পরব-পরব—কি ছবি তোলা চাই। তাজমহল আঁকা পরদার সামনে বসিয়ে হারু নাকি ছবি তোলে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ ঠিক করে দেয়। এই শ্যামাকাকার ছেলে নতুন বিয়ে করে বউকে নিয়ে ছবি তুলতে গিয়েছিল ওখানে, তখন নাকি দুবার শাটার টিপেছিল হারু। শ্যামাকাকার সন্দেহ দুবার ছবি তুলেছে ও, প্রথমবার দুজনের, দ্বিতীয়বার ছেলেকে বাদ দিয়ে শুধু বউয়ের—বুঝতে দেয়নি ছেলেকে।

দোকানে ভিড় বাড়ছে। মিষ্টি বিক্রি শুরু হয়ে গেল। ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং ড্যাং—বানারহাটের ঠাকুর লরিতে চেপে এসে গেল। রাস্তায় নেমে পড়েছে লোকজন। ভাসানের ঘাটে চলেছে সবাই। বিরাট মেলা বসে ঘাটে। ভেঁপু বাজিয়ে তেচাকার সাইকেল রিকশাগুলো ছুটোছুটি করছে এখন। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর এখনও মণ্ডপে—ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঠাকুর যাবি বিসর্জন। মাথার ওপরে কোনও শব্দ নেই কেন? সাজগোজ হয়ে গেলে তো এবার বেরিয়ে পড়ার কথা। কাঠের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে একবার বিক্রির পয়সা গুনতে লাগল দ্বিজদাস। 'হাত চালাও হে নরেশ, বিসর্জন হল বলে!' চেঁচিয়ে বলল ও, যেন ওপরের ঘরে তেনার কানে যায়। শ্যামাকাকারা আজ তৈরি। এই স্বর্গছেঁড়া নিজেদের হাতে করে গড়েছেন শ্যামাকাকারা। সেখানে এইসব ভুঁইফোঁড় ছোকরারা যা ইচ্ছে করবে তা হতে দেওয়া যায় না। সকালে শ্যামাকাকা বলেছিলেন রেঞ্জারসাহেবের মেয়ে আর পোস্ট আফিসের একটা ছোকরাকে নিয়ে হারু গিয়েছিল খুঁটিমারীর জঙ্গলে ছবি তুলতে। কয়েকটা মদেশিয়া নাকি দেখেছে। বিশ্রী-বিশ্রী ছবি সব সিনেমার মতো। আজ রাতে হারুর দোকান তল্লাসি হবে।

এইটে শোনার পর কেমন ভালো লাগছিল না দ্বিজদাসের। সে জানে ছোকরার ডার্করুমে তার কী ছবি আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়। রেঞ্জারসাহেব এসেছিলেন শ্যামাকাকার সঙ্গে। পোস্ট অফিসের ছোকরাকেও আজ ছাড়া হবে না। গত বছর ভাসানের দিন ওরা মদ খেয়ে মেলায় কার গায়ে হাত দিয়েছিল। এবার সেই রকম একটা কিছু করলেই হয়। হবে, কারণ কাল হারু এক বেলা সামচি গিয়েছিল এয়ারব্যাগ নিয়ে। সামচিতে মদের কারখানায় সস্তায় সব পাওয়া যায়—এ খবর পেয়ে গেছেন শ্যামাকাকারা।

নড়েচড়ে বসল দ্বিজদাস। ঢাক বাজছে জোরে। স্বর্গছেঁড়ার ঠাকুর মণ্ডপ ছেড়ে বের হল। ডাকের সাজ—মা-মা আবার এসো। মনে-মনে বলল দ্বিজদাস। তেমাথায় এসে গেল ঠাকুর। মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয়। সবার সামনে শ্যামকাকারা হেঁটে যাচ্ছেন। ঠাকুর যাবি বিসর্জন—মা দুর্গা যেন ছলছল চোখ করে দ্বিজদাসকে দেখে গেলেন। পেছন-পেছন ঢাকি চলে যেতেই তেমাথা চুপচাপ হয়ে গেল। রাজ্যের লোক গিয়েছে ভাসানের ঘাটে। এখনও ঠাকুর আসছে আশেপাশের বাগানগুলো থেকে।

এই সময় দ্বিজদাস উঠে দাঁড়াল। ওপরে সাড়া শব্দ নেই কেন? যাবে না নাকি? এরকম

তো হয় না। বুকের ভেতর ছটফট করছে দ্বিজদাসের। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। আহা, ভাসানের ঘাটে যদি ও থাকতে পারত! কিন্তু এখন এই দোকান ছেড়ে যাবে কি করে ও?

সময় চলে যাচ্ছে। ভুটানের পাহাড়গুলো আকাশের নীলে মিশে গেছে এখন। সন্ধের অন্ধকার আসতে না আসতেই জলঢাকা থেকে আসা বিদ্যুৎ রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময় সেই পার্থিব শব্দ কানে এল দ্বিজদাসের। ভাসানের ঘাটে হইহই শব্দ। কী হল? উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে ওর। দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল অনেকে ছুটে আসছে। কী হয়েছে হে? চিৎকার করল দ্বিজদাস। মারামারি—জোর মারামারি বেঁধে গেছে। বড়বাবুর জিপটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, সাঁ করে মোড় ঘুরে ঘাটের দিকে চলে গেল। ছেলে বুড়ো বাচ্চা মেয়ে সব পালিয়ে আসছে ঘাট থেকে। ফণী পিওনকে দেখে কাছে ডাকল দ্বিজদাস, 'কী ব্যাপার হে?'

'শ্যামাবাবুর মাথা ফেটেছে। ওদের তিনজন শুয়েছে। একটা লাঠি আছে আপনার কাছে, লাঠি?' উত্তেজনায় কাঁপছিল ফণী পিওন।

আর তারপরেই দেখতে পেল দ্বিজদাস। বিরাট একটা ভিড় এগিয়ে আসছে তেমাথার দিকে। ভিড়টার মধ্যিখানে বড়বাবুর জিপ। সেই সঙ্গে চিৎকার চলছে সমানে। ভিড়ের মুখগুলো দেখল ও—আঃ, সব চেনামুখ। হারু ঘোষ অ্যান্ড পার্টির কেউ নেই এর মধ্যে। ওই তো রেঞ্জারসাহেব, দাশু রায়, স্কুলের মাস্টারমশাইরা। জিপটা ঠিক তেমাথায় এসে দাঁড়াতেই শ্যামাকাকা নেমে দাঁড়ালেন। দ্বিজদাস দেখল কপালে ছেঁড়া কাপড় ব্যান্ডেজ করে বাঁধা। তার একটা পাশ লাল হয়ে আছে। শ্যামাকাকা পাশের একজনকে কী বলতে সে ছুটে গেল রিকশা স্ট্যান্ডে। সমস্ত তেমাথায় গিজ-গিজ করছে লোক। এমনকী ওর এই মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতেও লোক দাঁড়িয়ে। বৃত্তের মতো ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই জিপটাকে লক্ষ করছে। একটা রিকশাকে টানতে-টানতে হাজির করা হল জিপটার পাশে। সবাই চুপচাপ দেখছে। আশেপাশের চা-বাগানের যারা ভাসানে এসেছিল তারাও আছে ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ শ্যামাকাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিপে বসা বড়বাবুর দিকে জোড়হাত করলেন, 'হুজুর, সমবেত স্বর্গছেঁড়ার মানুষজনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আবেদন করছি, হারামজাদাটাকে একবার রিকশার ওপরে দাঁড়াতে দিন। সবাই একটু দেখুক।' বড়বাবু কী বলতে শ্যামাকাকা নিচু গলায় উত্তর দিলেন। তারপর হঠাৎ দেখা গেল হারু ঘোষ জিপের পেছন থেকে নেমে আসছে। উত্তেজনায় টান-টান হয়ে দ্বিজদাস দেখল হারু ঘোষের জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। গেঞ্জি ছিঁড়ে পেট দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল উসকোখুসকো। একটা চোখ ফুলে ঢেকে গেছে। কিন্তু শালা হাঁটছে দ্যাখো—যেন শাজাহান। কারও দিকে না তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে এসে রিকশায় উঠে দাঁড়াল হারু ঘোষ আর কী আশ্চর্য, রিকশায় উঠেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একমুখ।

আর সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত জনতা হইহই করে উঠল। অথচ কিছুই হয়নি এমন ভাব করে সিগারেট টানতে লাগল হারু। হ্যা-হ্যা করে হাসছে অন্য বাগানের লোক। দাশু রায় আর পারলেন না, ছুটে গিয়ে চড় মারলেন হারুর গালে। রিকশায় দাঁড়িয়েছিল বলে মাথাটা সরিয়ে নিল ও সময়মতো। চড়টা কাজে লাগল না বলে আর একজন এগিয়ে এল। কে যেন চিৎকার করল 'বেচন হাজামকে ডেকে ওর মাথা কামিয়ে দিন।' ওদিকে হারুর ওপর অনেকগুলো হাত নামা-ওঠা করছে। ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ—ঢাকের বোলের তালে-তালে শরীর দুলিয়ে দ্বিজদাস কী মনে হতেই হাত বাড়িয়ে নরেশকে ডাকল। নরেশ আসতেই দ্বিজদাস উত্তেজনায় দুলতে-দুলতে ফিসফিস করে বলল, 'ছুটে যা, গিয়ে শালাকে এক থাপ্পড় মারবি বাঁ-চোখে। ওটা ফোলেনি।'

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল নরেশ। তারপর কাঠের দোতলার দিকে দেখল। 'যা, আমি তোর মনিব আমি বলছি।' বুকে হঠাৎ সাহস এসে গেল দ্বিজদাসের। দাবড়ানি দিয়ে ঠেলে পাঠাল নরেশকে। শুঁটকো শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটে গেল নরেশ রিকশার দিকে। 'মার-মার'—মনে-মনে চেঁচাচ্ছিল

দ্বিজদাস। হাতের নাগাল পাচ্ছে না নরেশ। শালা যা বেঁটে। দু-হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে হারু। সমানে কিলচড় পড়ছে, কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। লাফিয়ে-লাফিয়ে বুড়ো নরেশ হাত চালাল, কিন্তু নাগাল পেল না। সারা শরীর দুলিয়ে হা-হা করে উঠল দ্বিজদাস। যেন ও নিজেই মারতে পারছে না।

কী করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে চলে এ নরেশ, 'হাত পাচ্ছি না, দাদাবাবু যে বড় লম্বা।'

'দাদাবাবু!' সারা শরীর জ্বলে গেল দ্বিজদাসের। বাঁ-পায়ের ছেঁড়া চটিটাকে ছুঁড়ে দিল ও। 'নে শালাকে জুতোপেটা কর, আমার জুতো দিয়ে, আমি দেখব। না পারলে তোর একদিন কি আমার!' বেচন হাজামকে কে যেন ধরে আনছে। চোঁ-চোঁ করে ছুটে গেল নরেশ। রিকশার কাছে ভিড়ের ফাঁক গলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্বিজদাসের—আহা! হাত তুলল জুতো নিয়ে নরেশ, এই পড়ল হারুর গালে, ওকি, ধরে ফেলেছে যে শালা! জুতোসুদ্ধ হাত ধরে ফেলেছে! ততক্ষণে ওকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে বেচন হাজামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল।

খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটে এল নরেশ, 'ধরে ফেলল, ধরে ফেলল যে হাতটা। আমি কী করব।' কাঁদো-কাঁদো হল নরেশ।

'আমার জুতো, জুতো কোথায় ফেললি হারামজাদা, নিয়ে আয়, আমার জুতো নিয়ে আয়—যা।' চিৎকার করে উঠল দ্বিজদাস।

আর সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ করে ওপরের জানলা খুলে গেল। নরেশের ঘাড় ধরেছিল দ্বিজদাস, থমকে গেল। জানলা খোলার শব্দ হতেই আচমকা চুপ মেরে গেল তেমাথা। সবাই মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে ওপরে। দ্বিজদাসের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই গলাটা কানে এল, 'নরেশবাবুকে বলো ছেঁড়া জুতো আর আনতে হবে না। তুমি ভেতরে এসো।' শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা। সঙ্গে-সঙ্গে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল নরেশ। গিয়ে শো কেসের পেছনে বসে হাঁপাতে লাগল।

অসহায়ের মতো দ্বিজদাস দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর পা টেনে-টেনে ভেতরে এল। সারা শরীরে কুল-কুল করে ঘাম দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তেমাথার জনতা এখন হারু ঘোষকে নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিজদাস চোখ তুলে দেখল পেছনের দরজার সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া পা, হাঁটু, কোমর বুক শেষে মুখ নেমে এল। সীতাদেবীর মাথায় জড়ির পাড়। মুখ নিচু করতে-করতে দ্বিজদাস শুনতে পেল, 'এই বয়েসে এত উত্তেজনা তোমার মানায়—ছিঃ!'

ভাসানের ঘাটে দুর্গাঠাকুর এতক্ষণে জলে নামলেন।



অন্নপ্রাশন

ফুলের বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে উমাপদ, এমন ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল। না, একটা কুটো কোথাও পড়ে নেই। শালারা চেটেপুটে নিয়ে গেছে। এখন এই এত বড় উঠোনটা হাতের তালুর চেয়ে পরিষ্কার। উঠোনের একপাশে ওর বাবার তৈরি ছোট ইঁটের লুডোর ছক্কার মতো বাড়ি, বাকি তিনটে দিকে দু-মানুষ লম্বা কাঁটাতারের বেড়া লোহার বিম ফুঁড়ে চলে গেছে টানটান। বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে যে ছোট্ট রকটা যার ওপর শুয়ে উমাপদের বাবা ভুঁড়িতে তেল মাখাতেন, তার সরাসরি সামনে চা-বাগানের এক সাহেবের কাছ থেকে কিনে আনা বিলিতি লোহার গেট কাঁটাতারের দেওয়ালের ফাঁকে বসানো। গেটটা এখন বন্ধ।

এক ইঁট ভিতের ওপর সমানভাবে সিমেন্ট বুলিয়ে উঠোনটা তৈরি, জল দাঁড়ায় না। উমাপদ উঠোনের মধ্যিখানে গম্বুজগুলোর চারপাশে একটা পাক দিয়ে নিল। প্রত্যেকটা গম্বুজের গা বেয়ে লোহার সিঁড়ি ওপরে চলে গেছে। লম্বায় হাত বারো, গম্বুজগুলোর মাথায় হাওয়া ঢুকতে পারে এরকম ছাউনি, বৃষ্টির জল ঢোকার কোনও সুযোগ নেই। লোহার সিঁড়ির মুখটা ছাউনির তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এ তল্লাটে এরকম গম্বুজ আর কারও নেই। উমাপদর বাবা যত নতুনরকম ফন্দি করতে ভালোবাসতেন। চোর-ডাকাতের উৎপাত হয়নি কখনও। একবার তিস্তা নদীর বুকে এক গুলিতে জলপাইগুলির এক দাগি গুণ্ডাকে মেরে ফেলেছিলেন উনি। বাড়িতে সেই বন্দুকটা ছিল। সেটাও চা-বাগানের সাহেবের কাছ থেকে কেনা। বিলিতি।

উমাপদকে অবশ্য কখনও বন্দুক চালাতে কেউ দেখেনি। তার কোনও দরকারও হয়নি। ওই লোহার গেট পেরিয়ে সন্ধের পর যে এই উঠোনে ঢুকবে সে কোনও মাতৃগর্ভে বাস করেনি। মাথা তুলে উমাপদ আকাশ দেখল। পাঁকের মতো লাগছে মেঘগুলোকে। থম ধরে আছে চারধার, যদিও এ-বাড়িতে কোনও গাছপালা নেই, তবু বোঝা যায়, বুঝতে পারে উমাপদ। নবকেষ্ট বলেছিল তিস্তার শরীরটাও সুবিধের নয়। আর এই সময়ে হিম বাতাসের স্পর্শ পেল ও। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি নেমেছে।—অসময়ের বৃষ্টি।

উঠোন জুড়ে মরা আমপাতার মতো যে আলোটা ছিল এতক্ষণ, তিরতিরিয়ে সেটাও টুক করে সরে গেল। উমাপদ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতেই চাপা গলা শুনতে পেল। হঠাৎ শুনলে মনে হয় বুঝি কয়েকটা রাগি অজগর ফুঁসছে। বাড়ির গায়ে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা লোহার খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াতেই যেন ভিতরে ঝড় বয়ে গেল। জন্তু দুটো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একসা। উমাপদ ছাড়া আর কেউ এই খাঁচার সামনে আসে না। খাঁচার দরজায় হাত দেওয়ার সাধ্য নেই কারও। লম্বায় দুটোয় প্রায় সাড়ে চার ফুট, দাঁড়ালে উমাপদর থাই-এর কাছে চলে আসে। লেজ দুটো প্রায় মুড়িয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে ছেলেবেলায়। একফোঁটা চর্বি লেগে নেই গায়ে, বরং মাংসের অভাবই মনে হয়। মুখটা থ্যাবড়া, একটা জামবাটির মতো। শুকনো জিভ সড়াৎ-সড়াৎ করে টানে লোক দেখলেই। চোখের দিকে তাকালেই বুক হিম হয়ে যাওয়া যথেষ্ট। এই দুটো জীব যেমন হিংস্র তেমনি এদের শক্তি। এ দুটোকেও চা-বাগানের সাহেবের কাছ থেকে কেনা। এদের মা-বাবা নাকি একটা নেকড়ে বাঘের পেছনে দু-মাইল দৌড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল। উমাপদ মাথা দুলিয়ে ওদের তারিফ করল। ওরা আর ফুঁসছে না এখন, মেঘ ডাকার মতো আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। ওপরের বালতিতে রাখা কাঁচা মাংসের একটা টুকরো হাতে নিয়ে নাচাল উমাপদ। কুকুর দুটো সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ উমাপদর হাতের ওপর, শরীর টানটান। সারাদিন ওদের খেতে দেওয়া হয় না। সন্ধের সময় একতাল মাংস ছুঁড়ে ওদের বের করে দেয় খাঁচা থেকে। মুহূর্তেই সেটা শেষ করে দেয় ওরা। সেই সুযোগে ভিতরে ঢুকে যায় উমাপদ। তারপর সারারাত রাক্ষসের মতো কুকুর দুটো ঘুরতে থাকে উঠোনে। তখন তাদের সামনে যে পড়বে সেই টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। এমনকী উমাপদরও সাহস হয় না যেতে। খিদের চোটে হিংস্র হয়ে থাকে কুকুর দুটো। ভোর হলে আধ বালতি মাংস নিয়ে আর লম্বা কাঁটাওয়ালা চাবুক হাতে উমাপদ খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ায়। আশ্চর্য, এই সময় ওরা কিছু করে না। মাংসগুলো খাঁচার ভেতরে ঢেলে দেওয়া মাত্র চুপচাপ ঢুকে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে আসে উমাপদ।

এক হাতে মাংস উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া, অন্য হাতে দরজার মুখ খুলে দেওয়া একই সঙ্গে সারল উমাপদ। তীরের মতো জন্তু দুটো বেরিয়ে যেতেই ও সরে এল ওখান থেকে। এই সময় কয়েক ফোঁটা জল ওর গায়ে এসে পড়ল, বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। উঠোন জুড়ে তখন বীভৎস আওয়াজ শুরু হয়েছে। ছাড়া পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে মাংস কবজা করার প্রতিযোগিতা মিলে মিশে ওদের গলার শব্দ অন্যরকম শোনাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে ভেতরে এল উমাপদ। এখন স্নান করে এক গ্লাস লেবুর জল খাবে প্রথমে। বড়-বড় হ্যারিকেনগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়ে গেছে এরইমধ্যে। বেশি তেল পুড়োবার একটা বাতিক আছে শিবানীর, একটুও অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। বললেও শোনে না। বাঁজা মেয়েছেলেকে নিয়ে এই বিপদ। ভীষণ একরোখা হয়।

'এই রকম ম্লেচ্ছপনা ক'দিন চলবে?' উমাপদ জামা খুলতে গিয়ে দেখল শিবানী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিকেলে গা ধুয়ে চুল বাঁধলে ওকে এখনও বেশ টাটকা দেখায়। যদিও গায়ে-গতরে খুব ভারী হয়ে গেছে ইদানীং। পাছা কোমর পেছন থেকে দেখলে চোখ হোঁচট খায়, বাচ্চাকাচ্চা না হলে শরীরের ক্ষয়টা হবে কোত্থেকে। আজকাল আর ওদের মধ্যে শারীরিক যোগাযোগ তেমন হয়টয় না। খুব যদি এক-আধদিন দুম করে ইচ্ছে হল তো হল। বারো-তেরো বছর ঘর করার পর এখন এসব মাথায় আসেও না। তা ছাড়া যে জিনিসে রহস্য নেই, যদি কিছু হয়ে যায় মার্কা উদ্দীপনা নেই, সেই ব্যাপারগুলো মানুষকে দীর্ঘদিন টেনে রাখতে পারে না। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে ইসবগুলের ভুষি খায় উমাপদ, তাতেও যখন মাঝে-মাঝে কাজ হয় না তখন দোমহনী থেকে সন্তোষ ডাক্তারের ট্যাবলেট আনিয়ে নেয়। সেই রকম ব্যাপার এটা।

'কী ব্যাপার?' উমাপদ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

'মাংস ছুঁড়ে-ছুঁড়ে উঠোনময় সকড়ি করছ, তোমার একটু খেয়াল হয় না? ও দুটোকে বিদায় করে দিলেই বাঁচি।' শিবানী গজগজ করল।

হাসল উমাপদ, 'ওরা আমার হাতের বাহু। বাম বাহু আর ডান বাহু।'

'মরণ!' চলে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শিবানী, 'দু-মুঠো চাল দিয়ে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত?'

প্রথমটা বুঝতে পারেনি উমাপদ, ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে ছিল কথাটা শুনে। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, 'এতই যখন দরদ তখন তাড়ালে কেন? তা কাল নিয়ে আসতে বলি, পারবে তো পালতে?'

চুপচাপ খানিক তাকিয়ে থাকল শিবানী। এই উমাপদকে ও চেনে। বিয়ের পর এতদিন ঘর করে এইসব ভঙ্গিগুলো রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সরে এল ও, ব্যাপারটা ভাবলেই গা গুলিয়ে যায়।

স্নানটান করে লেবুর জলটা খেল উমাপদ। দু-মুঠো চাল দিয়ে দিলেই হত, ইল্লি আর কি! যেন লঙ্গরখানা খুলে বসে আছে ও! যে আসবে তাকেই গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে দিতে হবে। জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে বিবিসাহেবের দুঃখ উথলে উঠল। শিবানীর এই জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকাটা ইদানিং ওর একদম পছন্দ হচ্ছে না। উঠোন জুড়ে লোকগুলো কাজকর্ম করে। রোদ্দুরে হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে বসে কেউ-কেউ। সেদিকে নজর যেতে কতক্ষণ! আর উমাপদর যে একটা বাঁজা বউ আছে সেটা জানতে কারই বা বাকি আছে। জানলাটা বন্ধ করে দিতে হবে। বেলা তিনটে নাগাদ উঠোনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তদারকি করছিল উমাপদ। ঢেঁকিতে ধান ভেঙে চালগুলো ঝাড়াই করছিল ওরা। কালানোনিয়া ধান—ফার্স্ট ক্লাস গন্ধ ছড়ায়। আরও কয়েক মণ হয়ে গেলে গয়েরকাটার বা ধূপগুড়ির হাটে পাঠিয়ে দেবে। দুটো গম্বুজ ভরতি রয়েছে ধান, আর একটায় চাল বোঝাই করা হচ্ছে একে একে। সরকারকে ন্যায্যটুকু দিয়ে-থুয়ে মন্দ থাকে না। তবে আজকাল খরচ পোষাচ্ছে না। জমির পেছনে ব্যয়টা বেড়ে গেছে হঠাৎই। এখনও বিঘে আটেক জমিতে ধান পাকব-পাকব হয়ে আছে। টিপটিপ বৃষ্টি হলে ক্ষতি নেই, তেজি হাওয়া উঠলেই জলের ধার ছুরির মতো হয়ে যায়। ভয় সেখানেই। তা এবছর আকাশ বিট্রে করেনি এখনও। উমাপদ নিশ্চিন্ত। আর সাতটা দিন কেটে গেলেই হয়। জোত ল্যাংটো করে দেওয়া যাবে।

তিন-চারটে লোক সমানে কাজ করে চলেছে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। চালের অবস্থা দেখার জন্যে গম্বুজের গায়ে লাগানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হাঁক দিল সে, 'হাত চালা

রে—আকাশ ফুটো হলেই চিত্তির আর কি!' আর এই সময়েই ও দেখতে পেল। লোহার গেটটা খুলে সে আসছে। ময়লা চিরকুটে খাকি শার্টটা যেন কাঁধের দুই হ্যাঙারে ঝোলানো। লোকটা কেমন চোরের মতো তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। বুকের ওপর ডান হাতে জড়িয়ে রেখেছে খ্যাঙরা কাঠি হয়ে আসা বাচ্চাকে। লোকটা একটু ইতস্তত করে সামনের দিকে এগিয়ে এল। উমাপদর বাপের আমলের মানুষ হরিহর ফোঁকলা মুখে বিড়-বিড় করে উঠল চাল বাছা থামিয়ে, 'আজ মর, ইটারে আবার নিয়ে এল কেন, ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার!'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিল উমাপদ। লোকটাকে ও অনেকদিন বাদে দেখল। আচ্ছা সাহস তো। উমাপদর ভীষণ রেগে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু একটা চোরা ভয় এবং সেই সঙ্গে খানিক কৌতূহলের মিশেলে ও টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটা উঠোনের ঠিক মধ্যিখানে এসে হরিহরের দিকে মিটমিটে চাইল, তারপর পেতল বাঁধানো একটা দাঁত বের করে হাসবার চেষ্টা করল, 'বাবু হ্যায়?' হরিহরের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে এবার উমাপদকে দেখতে পেল। দেখে ছেলেটাকে ফুলের তোড়ার মতো বুকে ধরে কয়েক পা এগোল।

'কী চাই?' লোকটা কিছু বলার আগে উমাপদ হুঙ্কার দিল। ওর মুখ দেখে উমাপদর এককালে হাসি পেত। কুলের বিচির সাইজের একটা আঁচিল নাকের বাঁদিকে হরদম নাচছে। মুখচোখ পাথরের মতো—মনের ভাব ঠাউর করা মুশকিল। কিন্তু ওর বউও তো নেপালি—মুখচোখে বুকের কথাটা চকচক করত। আর এখন এই যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, কী ভাবছে ব্যাটা?

'চাউল!' ঘসঘসে একটা স্বর বেরুল গলা দিয়ে।

'চাল? চাল কোথায় পাব?' হকচকিয়ে গিয়ে গম্বুজে হাত রাখল উমাপদ। এ আবার ন্যাকড়াবাজি!

'দো দিন ভুখা হ্যাঁয় বাবুজি, কুছ খানেকো নেহি মিলা—এ বাচ্চা মর যায়গা।' লোকটা প্রায় ককিয়ে উঠল। এবার বাচ্চাটাকে দেখল উমাপদ। দিব্যি ছটফট করছে—মরবার কোনও লক্ষণ নেই। বাচ্চার মুখ চোখ দেখতে-দেখতে উমাপদর মনে হল লোকটা ইচ্ছে করেই ওকে খোঁচাতে এসেছে। এই তো সেদিন, ঠিক বছরখানেক আগে হরিহরের হাত দিয়ে ওর বউকে দুশো টাকা ধার দিয়েছিল শিবানী। মদ খেয়ে বউকে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছিল সেদিন। বউকে চাকরি ছাড়িয়ে দিলে খাবে কী—চিৎকার করে বলেছিল। হাতে খোলা ভোজালি। যদিও বউটা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে কুকুরের খাঁচার দিকে নজর রাখছিল। মেয়েমানুষটার পেট দখেলে বোঝা যেত না বাচ্চা আছে কিনা। টাকাটা দেওয়ার সময় যদিও শিবানী ধার শব্দটা বলেছিল, তবু বলার মধ্যে তেমন জোর ছিল না।

উমাপদ চিৎকার করল, 'ওসব চালফাল এখানে হবে না। এটা কি লঙ্গরখানা, হ্যাঁ। বেরোও—নিকালো।'

লোকটা যেন মরিয়া হয়ে গেল, 'ই বাচ্চা মর যায়েগা বাবুজি।'

'কেন, এটা দুধ খায় না?' বেফাঁস কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেলে জিভ কাটল উমাপদ। কী দরকার খায় কি না খায় জিজ্ঞাসা করার।

'কাঁহা মিলেগা!' যেন উত্তরটা দেওয়ার দায়িত্ব উমাপদর। ইল্লি আর কি! মায়ের বুকে দুধ নেই, অমন পাকা বেলে বাজ পড়েছে নাকি! শালা!

'ওসব হবেটবে না। তুমি বেরোও বাড়ি থেকে। নিকালো!' তরতর করে নেমে এল উমাপদ। আর এই সময় খাঁচার মধ্যে বসে দুটো কুকুর চাপা গর্জন করে উঠল। লোকটার গায়ের গন্ধ বোধহয় ওরা ঠিক ঠিক চিনতে পারছে না।

মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক ঝটকায় বাচ্চাটাকে কাঁধ বদলি করে লোকটা আবার গেটের দিকে হাঁটতে লাগল গম্বুজ তিনটেকে চোখ দিয়ে চাটতে-চাটতে। শালার হাঁটার ভঙ্গি কি!

যেন চ্যাম্পিয়নশিপের কাপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই ও সতর্ক হয়ে গেল। কাজ থামিয়ে সবাই ব্যাপারটা দেখছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল উমাপদ, 'কী হল, অ্যাঁ! হাতে পোকা ধরেছে নাকি? আমার গুষ্টির পিণ্ডি হবে বৃষ্টি নামলে? নে-নে বাবা হাত চালা।'

পার্শেমাছের ঝোল আর কালানোনিয়া চালের ভাত খেতে-খেতে বৃষ্টি নামল। বেশ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। কুকুর দুটো দুবার চিৎকার করে ডেকে উঠে চুপ মেরে গেল। গম্বুজের গায়ে দাঁড়ালে বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না—ব্যাটারা জানে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই গুমগুম শব্দ শুনতে পেল উমাপদ। প্রথমটা অন্যমনস্ক ছিল, তারপর কথাটা মনে হতেই শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল। সকড়ি তুলছিল শিবানী, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও!' বলে উমাপদ দ্রুতপায়ে চিলেকোঠার ঘরে চলে এল। শব্দটা খারাপ, খুব খারাপ, বুড়ি তিস্তার বুকে যখন এই রকম শব্দ ওঠে তখনই বান হয়। ছেলেবেলো থেকে শুনে আসছে কথাটা—ওর বাপও বলত। তা বছর দশেক এরকম শব্দ শোনেনি ও। এখন ওই মণ্ডলঘাট থেকে জলপাইগুড়ির মুখ অবধি এতো উঁচু বাঁধ বেঁধে দিয়েছে সরকার, শালার নদীর সাধ্যি নেই ট্যা-ফ্যাঁ করে। কিন্তু শব্দটা হল কেন? চিলেকোঠার ঘরটা ছাদের খানিকটা আড়াল করে রেখেছে। অন্ধকারে ওপরে উঠে এল। ওঃ, জোর হাওয়া বইছে! মোটা-মোটা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পাথরের মতো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছে। একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই ও দেখল আকাশটা শালা মড়াখেকো কাকের মতো কালো। চাপা একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেল উমাপদ। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। তিস্তার বুক থেকে আসছে। ওর লোহার গেট ছাড়িয়ে দুশো গজ গেলেই তিন মানুষ উঁচু পাথরের বাঁধ। শাসানিটা যেন বাঁধে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে-ছিটকে ওপরে উঠে আসছে। মনের মধ্যে কু গাইতে লাগল ওর, না, ভালো ঠেকছে না লক্ষণটা। শালার জোতভরতি ধান—রাতভোর এই হাওয়া চললেই যে বেগুনটুলির গলির মেয়েছেলেদের মতো হাঁটু ভেঙে পড়ে থাকবে। বুকের মধ্যে হি-হি করে উঠল ওর। নিচে নেমে দেখল খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে শিবানী খাটের ওপর বসে সেলাই করছে লাল নীল সুতোয়—'পতি পরম গুরু'। এই রকম ভয়-ভয় মনখারাপ হলেই উমাপদ বউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। সাহস বাড়ে তাতে।

দোল দোল দোল। অদ্ভুত মজাদার একটা স্বপ্ন দেখছিল উমাপদ। শিবানীর হাতের ঠেলায় ধড়মড় করে উঠে বসল। বসেই মনে হল খাটটা যেন দুলছে। ব্যাপারটা কী হল!

বুড়ি বেড়ালের মতো ফ্যাঁসফেসে গলায় কেঁদে উঠল শিবানী, 'হ্যাঁগা, জল সেঁদিয়েছে ঘরে।'

তাই তো! উমাপদ দেখল কাঠের জলচৌকির ওপর রাখা হ্যারিকেন চাঁদের মতো এপাশ-ওপাশ ভাসাভাসি করছে। পাকা ঘরে সাপের মতো খলবলে ঢেউগুলো ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তুলছে। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে উমাপদ চমকে উঠল হঠাৎ। জল—জল এল কোত্থেকে? তাহলে কি তিস্তার বাঁধ ভেঙেছে! ওপাশে জলপাইগুড়ি এদিকে দোহমনী—বাঁধটা তো দু-দিকেই মজবুত—ভাঙবে বলে মনে হয় না। কিন্তু না ভাঙলে জল আসবে কেন? কয়েক মুহূর্তের অসহায় অবস্থায় ও দেখল শিবানী প্রায় জড়িয়ে ধরেছে ওকে, 'হ্যাঁগা—জল যে বাড়ছে!'

তড়াক করে জলে নেমে পড়ল উমাপদ। উঃ, কী ঠান্ডা। পায়ের পাতায় বরফ ঘষে যায় যেন! প্রায় হাঁটু অবধি ডুবে গেল ওর। না, আর এ-ঘরে থাকা যায় না। ঘরভরতি সংসারে নানা জিনিসের দিকে তাকাল ও। এগুলো কী হবে? কোনওরকমে আলমারি খুলে লোহার হাতসিন্দুকটা বের করল, করে শিবানীর হাত ধরল, 'চলে এসো—চলে এসো।'

'কোথায়?' ফ্যালফ্যাল করে তাকাল শিবানী।

'ছাদে। জল যদি বাড়ে তাহলে এখানে থাকলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে!'

অধৈর্য হয়ে উমাপদ ওর হাত ধরে টানল। চট করে শিবানী বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, আমার শাড়ি—আমার গয়না—আমার ঠাকুর—ওগুলো নেবে না?'

'নেব নেব! আগে জান বাঁচাও। তারপর ওসব নেব। আর সোনার গয়না জলে নষ্ট হয় না।'

প্রায় হিঁচড়ে ওকে জলে নামল উমাপদ। পায়ে জল লাগতেই শিবানী চেঁচিয়ে উঠল, 'মা গো!'

দরজা ভিতর থেকে আগল-বন্ধ করে শুয়েছিল ওরা। উমাপদ দেখল লোহার মতো ভারী হয়ে গেছে পাল্লা দুটো। অনেক চেষ্টা করে এক হাতে টেনে খুলতেই ঘরের জল হাঁটু ছাড়িয়ে গেল। আই বাপ্! অন্ধকারে চোখ যায় না বেশি দূর—শুধু জলের শব্দ আর জলের শব্দ। মাথায় নামছে জল, পায়ে খেলছে জল। বারান্দা দিয়ে জল ভেঙে উমাপদ শিবানীকে নিয়ে চিলেকোঠার দরজায় এসে দাঁড়াল। আর এখানে এসে ওর মনে পড়ল দরজায় ও তালা দিয়ে রেখেছিল। ছাদের ওঠার সিঁড়িতে তিন বস্তা সিমেন্ট রাখা আছে, লোহা-লক্কড় আছে, বলা যায় না কিছু, কুলিকামিনদের মতিভ্রম হতে পারে। এখন চাবি আনতে যাবে কে? ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিবানী নাকে কেঁদে উঠল, 'মরণ আমার, সবতাতে সন্দেহ, তালা দিয়ে রাখি, বেড়া দিয়ে রাখি, মর এখন এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে!'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল উমাপদর, বউ-এর দিকে একবার তাকিয়ে পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে কাঁধের ধাক্কা দিল দরজার গায়ে! নড়ে উঠল সেটা, এই পর্যন্ত। জলের স্রোতে টান বাড়ছে। এখন প্রায় ওদের থাই ছাড়িয়ে যায় আর কি। শিবানীর শরীরের সঙ্গে শাড়ি ন্যাতার মতো লেপ্টে আছে। এক পলক দেখে চোখ সরিয়ে নিল উমাপদ, এত মাংস হয় কী করে মেয়েছেলের গায়ে!

দড়াম করে আবার ধাক্কা দিল উমাপদ। শেষপর্যন্ত বারবার। জল এখন প্রায় কোমরের কাছে। শরীরের তেজ কমে আসছে। শিবানীর মনে হল নাভির তলায় হিমজল কেমন শিরশিরানি তুলছে। কোনওদিন পেটে বাচ্চা আসেনি ওর, আট-নয় মাস হয়ে গেলে নাকি তারা লাথি মারে পেটে শুয়ে।

শেষপর্যন্ত কড়া দুটো খুলে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে জলের টানে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। এতক্ষণ এক হাতে লোহার হাতবাক্স আঁকড়ে ধরেছিল উমাপদ। একবারও শিবানীকে ওটা দেওয়ার কথা মনে হয়নি। পড়তে পড়তে টাল সামলে দেখল শিবানীও জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াচ্ছে। এমনিতেই বৃষ্টির জলে সারা শরীর ভেজা। এখন শীত-শীত বোধ হচ্ছে।

কয়েক পা হেঁটেই শুকনো সিঁড়ি। আঃ, কি আরাম! ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। মাথার ওপর চিলেকোঠার ছাদে বৃষ্টির জলের শব্দ হচ্ছে। ছাদের ওপর দরজার সামনে টিনের ছাউনি আছে এক চিলতে। ওরা ওখানে এসে দাঁড়াতেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে আসা শব্দটাকে মানুষের আর্তনাদ বলে ঠিক চেনা যাচ্ছে। প্রাণপণে চিৎকার করছে কারা, হয়তো সাহায্যের জন্যে ডাকছে। হঠাৎ আকাশ জুড়ে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতেই বুক হিম হয়ে গেল। তিস্তা নদীটা যেন ওর বাড়ির গায়ে উঠে এসেছে। মুহূর্তের আলোয় যা দেখা গেল তা শুধু ঢেউ আর ঢেউ। দূরে মোষের পিঠের মতো বাঁধটা জলের ওপর জেগে আছে কি না আছে!

দরজার কাছে থপ করে বসে পড়ল শিবানী। বসার শব্দে বোঝা গেল ও ভেঙে পড়েছে। একটা হ্যারিকেন সঙ্গে আনলে হত। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কী করে উঠে এল ওরা! উমাপদ ঘাড় নাড়ল।

'আমার সব গেল, জামাকাপড়, গয়না, টাকা—সংসার সব গেল—' বিড়বিড় করছিল শিবানী।

'আঃ চুপ করো।' খেঁকিয়ে উঠল উমাপদ, 'প্রাণে বেঁচে আছ এই ঢের। আর কার কোঠাবাড়ির ছাদ আছে এই তল্লাটে—হ্যাঁ?'

একটু উষ্ণ আরাম বোধ করল উমাপদ। এই তল্লাটে একমাত্র তার বাড়িতেই পাকা ঢালাইয়ের ছাদ আছে আর তাই ওরা নিরাপদ। জল যেরকম বাড়ছে, সব তো ধুয়েমুছে যাবে। এরকম জল

বাপের জন্মে দ্যাখেনি ও। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর মাঠের কথা মনে পড়ে গেল। মাঠভরতি পেকে আসা ধানগুলো মুখিয়ে আছে গোলায় ওঠার জন্যে। আর আছে! এই জল কি আর সেগুলোকে জ্যান্ত রাখবে। হু-হু করে উঠল বুকের ভিতরটা। হঠাৎ নিজের অজান্তে ডুকরে কেঁদে উঠল উমাপদ। চারপাশে খোলা আকাশ আর হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল।

শিবানী বলল, 'সব গেল, সব গেল—এত পাপ—।'

কাঁদতে-কাঁদতে কথাটা শুনল উমাপদ। পাপ! কার পাপ? কি বলে মেয়েছেলেটা? ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা চড় মারলে কেমন হয়। অন্ধকারে ওর মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। উমাপদ শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে দেখল বৃষ্টিটা কমে আসছে।

আস্তে-আস্তে ছাদের মধ্যিখানে চলে এল ও। এক হাতে লোহার হাতবাক্স এখন মাদুলির মতো ভারহীন হয়ে গেছে। তিস্তার দিকটা অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কার্নিশের ধারে এসে চমকে উঠল ও। ওটা কী? কি যেন ভেসে যাচ্ছে! ভাসছে কী করে? জল এখন এতটা ওপরে উঠে এসেছে নাকি! মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল ওর। ছাদের কার্নিশের নিচে জল প্রচণ্ড স্রোতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড়জোর এক হাত নিচে।

উঠোনের দিকে তাকিয়ে ও প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না। জলের টানে কার্নিশের গায়ে যেটা ঠোকর খেয়ে বেরিয়ে গেল সেটা গরু বা মোষ হবে। আর হঠাৎ ওর মনে হল কুকুর দুটো তো ডাকছে না! কোথায় গেল ওগুলো? বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ও দুটো না থাকলে এই বাড়িটায় থাকার কথা ভাবা যায় না। ভেসে গেল—সব ভেসে গেল—উমাপদর মনে হল ওর দুটো হাত শরীরের সঙ্গে লেগে নেই। এত বড় উঠোনটায় জায়গা নেবে কুকুর দুটো এমন কোনও উপায় নেই। আর এরকম স্রোতের টানে হাতি অবধি ভেসে যাবে তো কুকুর! আর এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় গম্বুজ তিনটের মাথা চট করে দেখতে পেল ও। ওপরের সিঁড়ির মুখে কী যেন ছটফট করছে। কুকুরটা নাকি। সিঁড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়। কিন্তু জল যে গম্বুজ ছুঁল। সঙ্গে-সঙ্গে উমাপদর মনে হল বত্রিশফলা ছুরি দিয়ে কে যেন ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি টেনে-টেনে বের করছে। জল যে গম্বুজ তিনটেকে গিলে ফেলল বলে। উত্তেজিত হলে পেটে ব্যথা হয়—উমাপদ এক হাতে পেট ধরে চিৎকার করে উঠল।

পাথরের মতো বসেছিল শিবানী, মুখ না তুলে বলল, 'পাগল!'

কথাটা শুনে দৌড়ে এল উমাপদ, 'অ্যাই চোপ! আমি পাগল, না? ওই ধানচালগুলো ডুবে গেলে খাবে কী? গয়নাশাড়ি আসবে কোত্থেকে, অ্যাঁ?'

কিন্তু পাগলের মতোই ছাদময় দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল উমাপদ। এখন বৃষ্টি প্রায় নেই। আকাশের রঙটা ফিকে মেরে এসেছে। কিন্তু এত জল কোত্থেকে আসে? গেরুয়া রঙের জলের স্রোত গাছপালা গরুবাছুর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওর বাড়িটাকে মধ্যিখানে রেখে। এরই নাম কি প্রলয়? ছাদের উলটোদিকে চলে এল ও। ওপারে ফরেস্ট কোয়ার্টার আর নেপালি বস্তি। না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল ওর। একটা ডাঁসা বেঁটেখাটো শরীর আর তার হাজাররকম রহস্যের কথা—পাকা বেলের মতো বুক, শিবানীকে লুকিয়ে-চুরিয়ে একটু জুত করে নেওয়া—এইসব ব্যাপার মনে পড়ে যায় কেন? কিন্তু জলের তোড়ে বোধহয় সব ভেসে গেল। ওখানে ওই বস্তিতে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। হঠাৎ মনে হল, ভালোই হল। কেমন একটা তৃপ্তি লাগছে মুক্তির।

এক সময় উমাপদর মনে হল বেঁচে থেকে অনেক সুখ ছিল। অথচ সে সুখগুলোকে ও পুরোপুরি জানল না। চিলেকোঠার দরজার গায়ে শিবানী ওর একটা হাত জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। শিবানীর গায়ে জলপাইগুড়ি থেকে আনা পাউডারটার গন্ধ কি করে যে মিশে থাকে এই জলে ভিজে!

অদ্ভুত উদাস চোখে ও ফিকে অন্ধকারে চারধারে তাকাল। বৃষ্টি হচ্ছে না, মেঘ ডাকছে না, আকাশের নীল হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু নড়ার উপায় নেই আর, পৃথিবীটার কোনও জায়গা আর বাকি নেই বোধহয়। রে-রে করে ডাকাতের মতো ঢেউগুলো ছাদের ওপর উঠে এসেছে খানিক আগে। জল এখন হাঁটুর গায়ে। চারধার থইথই। এভাবে জল বেড়ে গেলে মরে যেতে হবে। আর মরে গেলে কিছুই করার থাকবে না। মরে গেলে জোতের ধানগুলো কে বিক্রি করবে? গম্বুজের চালগুলো? এই বাড়ি—এইসব। ও গেলে শিবানীও যাবে। আসবে কেউ না কেউ নিশ্চয়। ওর এক খুড়তুতো ভাই আছে মালবাজারে—সে ছুটে আসবে দখল নিতে। অদ্ভুত ঠান্ডা এই জলস্রোতে দাঁড়িয়ে থেকেও একটু পরে শিবানীকে জড়িয়ে ধরল। জলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শিবানীর শরীর কাহিল হয়েছিল—উমাপদর এই উষ্ণতা ওকে খানিকটা আরাম দিল।

জল যদি আরও বাড়ে, যদি গলা পর্যন্ত এসে যায় তবে যাওয়ার জায়গা যে একদম নেই তা নয়—মাথার ওপর টিনের ছাদ আছে চিলেকোঠার। কোনওরকমে কসরত করে উঠে যেতে পারে হয়তো। কিন্তু শিবানীকে নিয়ে ওঠা অসম্ভব। যদি তাই হয়, তাহলে ও কী করবে? শিবানী যদি ভেসে যায়—ভাসতে দিতে হয়—তাহলে ও কী করবে? এমন যদি হত, ওর একটা বাচ্চা ছেলে থাকত, তবে তাকে অনায়াসে ওপরে তুলে দিতে পারত ও, নিজেরা ভেসে গেলেও বাচ্চাটা হয়ত থেকে যেত ওপরে বেঁচেবর্তে, অনেক বছর ধরে বলত আমার বাবার নাম উমাপদ। আর একটা ঢেউ এসে ওদের দুলিয়ে যেতেই উমাপদ শিবানীকে জোরে জড়িয়ে ধরল। আর এই সময় এই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এই প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ওর মনে হল, ওর আলিঙ্গনের মধ্যে শিবানীর মোটা শরীরটায় কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। এতদিন অনায়াসে সবকিছু পেয়ে-পেয়ে উমাপদর মনে হল, মূল্য দিয়ে কিছু পাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

এতক্ষণ যেটা ছিল না, জল কমার পর সেটা শুরু হয়ে গেল। ভোরের দিকে চমৎকার টাটকা সূর্য উঠল। তিন-তিনটে মন্দ পার করে দিয়ে বেগুনটুলির গলরি মেয়ে যেমন ঘোমটা টেনে বলে আমি ভদ্দরঘরের মেয়ে—এরকম রোদ্দুর ছিল। আর এক সময় পুরু পলিমাটি ছাদে ঢেলে দিয়ে জল টুপুস করে নেমে গেল নিচে। উমাপদ পায়ে-পায়ে কয়েক পা হাঁটল। এই সারারাত মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আর কোনও শক্তি শিবানীর ছিল না, কাদা জমা ছাদেই পাছা লেপটে বসে পড়েছে ও। এখন চারধারে অদ্ভুত একটা দৃশ্য তৈরি হয়েছিল। দূরের বাড়ি-ঘরগুলো ভাঙা-ভাঙা, কোত্থেকে গাছপালা বয়ে নিয়ে এসেছে জলস্রোত—এখানে-ওখানে আটকে আছে। তিস্তাকে দেখা যাচ্ছে বাঁধের ওপাশে, বাঁধটা শিখণ্ডীর মতো দাঁড়িয়ে, অথচ এপাশেও তিস্তা।

উঠোনের গম্বুজগুলো অনেকটা উঠে এসেছে জল থেকে। বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু শুরু হয়ে গেল উমাপদর। জলের দাগ প্রায় গম্বুজের ওপর-দরজার কানায়-কানায়। জল যদি ঢুকে থাকে তো মন কেমন করা গন্ধের কালানোনিয়া চাল-ভাত বয়ে কেলিয়ে আছে। আর তাহলেই—মাথা গরম হয়ে গেল ওর। এখন ভাবা যায় না আর। কাল রাত্রে মরে গেলে কোনও কথা ছিল না। আজ বেঁচে থেকে এগুলোকে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেওয়া মানে নিজের শরীরের মাংসগুলো কেটে কেটে কাউকে খেতে দেওয়া—একই ব্যাপার। অথচ চারপাশের মানুষজনের কোনও পাত্তাই নেই। কোথাও কে নড়ছে না। এমনকী কাকগুলো অবধি।

জল যখন কোমরের নিচে এল তখন আর পারল না উমাপদ। প্রায় উদোম হয়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। বসে-বসে শিবানী বলল, 'কেন যাও?'

উমাপদ বলল, 'ফুর্তি মারতে?'

বারান্দায় জল এখন হাঁটুতে। কিন্তু পায়ের তলায় হড়হড়ে। পিছলে-পিছলে যাচ্ছে। উঠোনে

নামল ও সাবধানে। জল চলে এল কোমরে। কুকুর দুটোর কোনও অস্তিত্ব নেই আর। খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে এগোচ্ছিল উমাপদ। চারপাশে তাকিয়ে দেখল একবার। কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে অজস্র ডালপালা জড়িয়ে গিয়ে আর একটা দেওয়াল হয়ে গিয়েছে। ওটা কী? জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও দেখতে পেল একটা পেটফোলা গরু ভাসাভাসি করছে।

কোনওরকমে চালের গম্বুজের কাছে এল উমাপদ। আর সেই সময় আকাশ থেকে শিবানীর চিনচিনে গলা কানে এল, 'যক্ষ, যক্ষ, মরে গিয়েও লোভ যাবে না।' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শিবানী কার্নিশের গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে উমাপদর লোহার বাক্সটা নামবার সময় যেটা ও রেখে এসেছিল যত্নে। কথার জবাব দিল না আর, চালগুলো যদি ভিজে ঢোল হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? শুকতে দেওয়ার জায়গা কোথায়—আর লোকজনই বা কোথায় পাবে এসময়? কিন্তু জল তো নাও ঢুকতে পারে গম্বুজে। আশায়-আশায় পা টেনে ও সিঁড়ির কাছে চলে এল।

লোহার সিঁড়িতে হাত রেখে ওপরে মুখ তুলতেই চমকে উঠল উমাপদ। সিঁড়ির ফাঁকে লটকে থেকে দুটো দেহ ঝুলছে। একটা কুকুরের, অন্যটি মানুষের। মানুষটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না ও। জলের মধ্যে তার অনেকটাই ডোবা, কুকুরটার দাঁত ওর থাই-এর হাড়ে আটকে গেছে। হলের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মরেছে সেটা। এখন কামড়ে থাকা অবস্থায় ওর চোখ দুটো খোলা। লোকটা কে? চোরটোর নয় তো? জলের সুযোগে এসেছিল। মরা কুকুরটার গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছে হল ওর। সাবাস!

সিঁড়িতে উঠে পা দিয়ে জোরে ঠেলতেই দুটো শরীর ঝপাস করে জলে পড়ে গেল। উমাপদ আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। একপা-একপা করে যত ওপরে চলে আসে বুকের মধ্যে তত বাতাস বন্ধ হয়। শেষপর্যন্ত ছাঁউনির তলায় চলে এল ও।

বেশ ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। কেমন পুজো-পুজো রোদ্দুর। আস্তে-আস্তে মাথা ঢোকাল ও। ঢোকাতেই ওর মনে হল ভগবান আছেন। না হলে কাল ও বেঁচে যেত না, না হলে এই চালগুলো জল ছুঁই-ছুঁই করেও জল মাখল না। আনন্দে ও হাততালি দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ওটা কী? ভেতরে ঢুকে চালের ওপর বাবু হয়ে বসে উমাপদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সেই খ্যাংড়াকাঠি হয়ে আসা বাচ্চাটা!

বাচ্চাটা কি নড়ছে? কী করে এল এটা এখানে? মাথা ঘুরিয়ে নিচে জলে ভেসে থাকা দেহটাকে ও দেখল একবার। মুহূর্তেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

দুটো হাতে বাচ্চাটাকে নিয়ে দোলাতে লাগল উমাপদ। বেঁচে আছে কিনা বুঝতে পারছে না। চোখ মেলছে না, কেমন নেতিয়ে আছে। ছাদের দিকে তাকাল ও। শিবানী বোধহয় দেখতে পেয়েছে। হাত নেড়ে কিছু বলছে যেন।

হঠাৎ নজরে এল চালগুলো এক জায়গায় ভেজা-ভেজা। নির্ঘাত এটা পেচ্ছাপ করেছিল খানিক আগে। মাথায় রক্ত উঠতে-উঠতে সামলে নিল উমাপদ। তারপর নিজের কড়ে আঙুল বাচ্চাটার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে আলতো করে নাড়তে লাগল। মাড়ি বেশ শক্ত হয়ে গেছে এর মধ্যে, দাঁত বেরোবার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কুটুস করে একটা কামড়ের অপেক্ষায় বসে থাকল উমাপদ।

হঠাৎ কি মনে হতে ভিজে চালগুলো থেকে দুই আঙুলে দুটো নরম দানা তুলে নিল ও এক সময়। কেমন গলে-গলে এসেছে এর মধ্যে। আঙুলের চাপে চটকে-চটকে মাড়ির ভেতর গুঁজে দিল ও। উমাপদর মনে হল, জিভটা এবার নড়ে উঠবে, যে-কোনও মুহূর্তেই।

খিদে পেলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে।



রাজার খেলা

হিপপকেট থেকে ছোট্ট হলদে বইটা বের করল সুজয়। ফন্ কোম্পানির রেসবুক। একটা ঘোড়ার মুখ মলাটে আঁকা। ছবিটাকে দেখলেই কানু মিত্তিরের মুখ মনে পড়ে যায় ওর। কানু মিত্তির বলত, 'রেসের আগে এটাকে দেখায় টপমোস্টের মতো আর রেস শেষ হয়ে গেলে এ শালা হয়ে যায় পাউসিকি।' প্রথমটা ভারতবর্ষের সব সেরা ঘোড়ার নাম, দ্বিতীয়টা ছ্যাকড়া গাড়ি টানবার বদলে ছিটকে ঢুকছে রেস-মাঠে। কানু মিত্তির বলত, 'বেশি দিন ঘোড়া খেললে মানুষের মুখ, বুঝলে, ঘোড়ার শেপ নিয়ে নেয়। পাকা রেসুড়ে যে সে মুখ দেখলেই চিনবে।' হেরে গেলে মুখ-চোখ কেমন হয়ে যেত কানু মিত্তিরের, বলত, 'আমি শালা পাউসিকি হয়ে গেছি।' সেই কানু মিত্তিরকে আজকাল দেখাই যায় না মাঠে। কলকাতার সিজন যখন থাকত না তখন ব্যাঙ্গালোর বোম্বাই করত কানু মিত্তির। মাঠে না থাকলে কেমন ফাঁকা লাগে। সেই কানু মিত্তির এখন একদম ডুব। মাঠের আলাপে বাড়ির ঠিকানা দেয় না কেউ। কানু মিত্তির অবশ্য বলত, 'যেদিন দেখবে আমি অ্যাবসেন্ট জানবে আমি টেঁসেছি।'

প্রথম পাতা খুলল সুজয়। কেমন একটা আদুরে গন্ধ। আজ নটা রেস। বাপ্স। নয়-নয়বার আজ তুমি চান্স পাবে টাকা বানাবার। লুটে নাও—শালা কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়ছে। নয়-নয়বার। প্রথম রেস একটা তিরিশে, আটটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। সুজয় নামগুলো পড়ল। অদ্ভুত সব নাম। নিজের ছেলের নামও এত যত্নে কেউ রাখে না। এক নম্বর ঘোড়ার নাম 'ব্ল্যাক প্রিন্স', ওজন ষাট কেজি, জকি—ই জেনিংস। খাস অস্ট্রেলিয়ার লোক, দারুন রাইড করে। দু-নম্বর—'মাই ফরচুন,' ওজন সাতান্ন কেজি, জকি—পি লয়েড। লয়েড সবে এসেছে বিলেত থেকে, এখনও কলকাতার মাটি চেনেনি। যে ঘোড়া যত ভালো দৌড়ায় তাকে তত বাড়তি ওজন বইতে হয়। ফলে অন্য ঘোড়াগুলো পাল্লা দিতে পারে সমানে। যদিও এটা বি-ক্লাসের বাজি, তবু সুজয়ের মনে হল ব্ল্যাক প্রিন্সই জিতবে।

মাঠে এখনও তেমন ভিড় হয়নি। ঘড়ি দেখল সুজয়, এখন পঁচিশ মিনিট বাকি রেস শুরু হতে। বুকিদের কাউন্টারের পাশ দিয়ে বারের ভিতর চলে এল ও। সুন্দর করে সাজানো টেবিলগুলো এখনও ফাঁকা। দুটো ফিরিঙ্গি মেয়ে কোকাকোলার বোতল নিয়ে চুপচাপ ভেজা কাকের মতো বসে। কোণার দিকের একটা চেয়ার টেনে সুজয় বসল। এখান থেকে বেটিং গ্রাউন্ডটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড় ঘোরাতেই বারের আয়নায় চোখ পড়ল। না, এখনও হর্সফেস হয়নি তার। এই নিয়ে তিনটে সিজন চলে গেল, টোটাল লস তিন হাজার। ভাবাই যায় না। একসঙ্গে টাকাটার কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে বল ড্রপ খেতে শুরু করে। প্রথম দিন ওকে যে নিয়ে এসেছিল সেই নরেন চাকলাদার রেস ছেড়েছে কবে—কিন্তু আসব না আসব না করেও সুজয়ের তিন সিজন চলে গেল। এত লস্—চোয়াল শক্ত করে আয়নার দিকে তাকাল সুজয়—আজকে জিততেই হবে।

টাকার দরকার, ভীষণ টাকার দরকার। হেসে ফেলল সুজয়, টাকার দরকার নেই এমন রামকেষ্ট কে আছে আজ! কিন্তু মুশকিলটা হল, চারদিকের পৃথিবীটায় অনেক সুখকর জিনিস আছে যা কিছু মানুষ চুটিয়ে ভোগ করছে। মোটামুটি হিসেব করেছে সে একটা লোকের হাত-পা খেলিয়ে থাকতে

হলে মাসে পাঁচ হাজার দরকার। কেউ দেবে না তাকে মুখ দেখে। ওর মাইনের দশগুণ। এক পেগ ব্ল্যাক-নাইটের দাম আট টাকা। অথচ সুজয় জানে, জানে বলেই অবাক লাগে, ওর সহকর্মীরা কেমন ওই সামান্য টাকায় বেঁচে-বর্তে আছে। ওরা কেউ সুজয়ের মতো তিন প্যাকেট ক্যাপস্টেন ডেইলি কেনে না, আকাশে রোদ জমলে ট্যাকসি চড়ে না, মেয়েছেলের কথা ভাবতেই পারে না ওরা। রেসবুকটার দিকে তাকাল ও, এই বইটা কোনও বাঙালির ড্রইংরুমে গো-মাংসের মতো নিষিদ্ধ। ওই যে মেয়েটা তার পাশ দিয়ে চলে গেল ওর গায়ের ইন্টিমেটের গন্ধটার দাম চল্লিশ টাকা। বেলবটমের কাপড়টা জাহাজি। এসব দেখেশুনে আপস করতে ইচ্ছে হয় কারও? অথচ কোনও রাস্তা নেই—গ্যাম্বিলিং ছাড়া। সুন্দর রাস্তা টু বি বড়লোক। কানু মিত্তির বলত।

পরপর দু-দিন দারুণ হেরে গেছে সুজয়। একদম দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মাসের মাঝামাঝি অথচ পকেটে শেষ সম্বল একশো টাকার একটা নোট। বাকি ক'দিন চালানোই মুশকিল। প্রভিডেন্ড ফান্ড নিল, কো-অপারেটিভে ধার—শালা ভাবাই যায় না। এই রেসে মাঠে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে সুজয়। একটার-পর-একটা রেস হেরে গিয়ে মানুষের মনে দারুণ একটা জেদ চেপে যায়। তারপর হারতে-হারতে রেস শেষ হয়ে গেলে চিনেবাদাম চিবুতে-চিবুতে বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে কেমন ক্লান্ত লাগে, ফিনিশ শব্দটা আঁটো গেঞ্জির মতো বুকটাকে জড়িয়ে ধরে।

এই ক'দিন ও ক্যালকুলেশন করে খেলেছে, ঘোড়ার ঠিকুজি দেখেছে, একদম গোপন সূত্রে খবরে টাকা লাগিয়েছে—কিন্তু কিছুই হয়নি। সুজয়ের ঘোড়াগুলো জিততে-জিততে উইনিং পোস্টের কাছে মার খেয়ে যায়। রেসে বোধহয় কেউ জিততে পারে না—এরকম ধারণা ও যখন প্রায় করে ফেলেছিল ঠিক তখনই নজরে পড়ল মেয়েটাকে। ঠিক মেয়ে বললে ভুল হবে। অবশ্য মেয়ে এবং মহিলার পার্থক্য এখন লাইন টেনে করা যায় না। বিশেষ করে এইসব বিয়ার-ঘাটারে বেড়ে ওঠা মেয়েদের। চল্লিশ আর চব্বিশ রুপোর টাকার এপিঠ-ওপিঠ। লক্ষ করেছিল ক'দিন ধরে। মেয়েটি রেস দেখতে গ্যালারির দিকে যায় না। চুপচাপ বারের চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে থাকে। বিরাট গোগো চশমার রঙিন কাচে মুখের অর্ধেক ঢাকা। এমন কিছু আহামরি নয় সে মুখ, কিন্তু শরীরের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটায় কী যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে যায়। তারপর সারাদিনে দুবার ওকে চেয়ার ছেড়ে বুকিদের কাউন্টারে উঠে যেতে দেখেছে সুজয়। একবার বললে ভুল হবে, দুবার মেয়েটি চেয়ার ছাড়ে। দ্বিতীয়বার ও যায় টাকা আনতে। টাকার বান্ডিলটা প্রায় না গুনে সাপের চামড়ার বাহারি ব্যাগটায় পুরে কোনওদিকে না তাকিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যায় তৎক্ষণাৎ। তারপরের রেসগুলোর জন্যে বসে থাকে না। একটাই রেস খেলতে আসে ও, খেলে, জেতে এবং চলে যায়। এই গ্র্যান্ড এনক্লোজারে ওর চেয়ে সুন্দর বা অসুন্দর বিচিত্র পোশাকের অনেক মেয়ে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে যাদের সঙ্গে এক বা একাধিক সঙ্গীকে দেখা যাবেই—কিন্তু এর সঙ্গে কাউকে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না সুজয়। অতএব রেসে কেউ-কেউ জেতে। চুপচাপ জিতে চলে যায়। আজ তাই কোনওরকম প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে আসেনি সুজয়। এমনকী ঘোড়ার নামগুলো অবধি আগে থেকে আজ ও দ্যাখেনি। আজ ওকে জিততেই হবে। সতর্ক চোখে মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল ও। টাকার দরকার, ভীষণ টাকার দরকার।

একটু-একটু করে লোক জমছে। বুকিদের কাউন্টারের সামনে ছোট-ছোট জটলা। বেশ একটা উৎসবের মেজাজ এখন। বিকেলে এটা হয়ে যাবে শ্মশানের মতো। অজস্র বাতিল টিকিটে ছেয়ে যাবে মাঠ। মানুষের হাড়ের মতো। শুধু বুকিরা দাঁত বের করে হাসবে। তবু লোকে টাকা দিয়ে ঢুকছে মাঠে। টাকায় টাকা আনে।

প্যাডকের দিকে তাকাল ও। সহিসরা এক-একটা নম্বর দেওয়া ঘোড়ার লাগাম ধরে প্যাডকে ঘুরছে। দৌড় শুরু হওয়ার আগে দেখিয়ে দেওয়া হয় ঘোড়াগুলোকে। জহুরি যে সে ঠিক চিনে নেবে

কোন ঘোড়াটা ফিট। হুমড়ি খেয়ে দেখছে সবাই। সুজয় প্যাডকে গেল না আজ। ঘোড়া দেখে কিছু বোঝে না ও।

বারের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সুজয়। মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। এবার ঘোড়াগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে যাবে। কেতাদুরস্ত নিয়ম-কানুন। রাজার খেলা। বুকিদের কাউন্টারে উত্তাপ বাড়ছে। টোটে এক নম্বর ফেবারিট। বোর্ডে কাঁটা প্রায় ইভন মানি ছাড়িয়ে গেছে। অথচ বুকিদের কাউন্টারে দু-নম্বর হট ফেবারিট। দশ টাকায় ন'টাকা প্লাস ট্যাক্স। মরিয়া হয়ে লোকে মারামারি করে একশো হাজার লাগাচ্ছে। ক্রমশ বোর্ডে দু-নম্বর ফেবারিট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই টালা টু টালিগঞ্জ খবর হয়ে গিয়েছে ঘোড়াটার মৃত্যু নেই। জকি-ওনার-ট্রেনার অল কনসার্ন লাগাই হচ্ছে নিশ্চয়ই। একজন সিনেমা স্টারকে নিতম্ব দুলিয়ে চলে যেতে দেখল সুজয়। কিন্তু না, সেই মেয়েটি কোথাও নেই। মেইন গেট দিয়ে জনস্রোতের মতো যারা ঢুকছে তাদের মধ্যেও মেয়েটিকে পেল না ও। এখনও এল না কেন? পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছল সুজয়। একটা কুইনেলা খেললে কেমন হয়। দশ টাকা মাত্র রিস্ক। এক-দুই। এ দুটোর মধ্যেই রেস। কিন্তু না, নিজেকে সতর্ক করল ও, আজ আর হারতে আসনি তুমি। মেয়েটাকে দেখার আগে কোনও রিস্ক নয়। এই রকম ভেবে নিয়ে না খেলে বেশ হালকা লাগল ওর। তিন বছরে এই প্রথম ও মাঠে আছে এবং একটা রেস হতে যাচ্ছে অথচ ও টাকা লাগাচ্ছে না। আঃ!

সারা মাঠ জুড়ে চিৎকার, প্রথম বাজি শুরু হয়েছে। যে যার পছন্দমতো ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। ঘোড়াগুলো এখন বাঁক নিচ্ছে। জকিরা টানটান। এখনও প্রায় দশ গজ দূরে ওরা। দু-নম্বর ঘোড়ার নাম শুনতে পেল সুজয়। মাইকে রিলে হচ্ছে। একটা হেঁড়ে গলা চেঁচিয়ে উঠল, মাই ফরচুন ইন এ ও-য়া-ক্। কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? ঘোড়াগুলো প্রায় এসে গিয়েছে। মাইক স্তব্ধ। গোড়ালি উঁচু করে সুজয় দেখল একটা ঘোড়া সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় জকি প্রায় শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ওপর। আশ্চর্য, কেউ ঘোড়াটার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে না। উল্লাস নেই কোথাও। সমর্থন ছাড়াই ঘোড়াটা জিতে গেল। আট নম্বর ঘোড়া। বই খুলে ঘোড়াটার নাম দেখতে গিয়ে চমকে উঠল সুজয়। পাউসিকি, থার্টি টু ওয়ান বোর্ডে। কেন যেন বলল, চুরি—এ নির্ঘাত চুরি। শালা বি ক্লাসের বাজি খেলাই মুশকিল। কানু মিস্ত্রিরের কথা মনে পড়ে গেল ওর। পাউসিকিও বাজি জেতে—রেসে কি না হয় কানুদা। তুমি দেখলে না।

এখন একটা আলস্য চারধাবে। কেমন একটা থিতিয়ে যাওয়া ভাব। যে যার হেরে যাওয়া টিকিট কার্ড দুমড়ে-মুচড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে মাঠে। এক-একটা দশটাকা একশো টাকার কাগজ সব। হঠাৎ বাতিল হয়ে গেছে যেন। ঘোড়া জিতলে এর মূল্য হয়ে যেত অনেক গুণ। এক মুহূর্তেই দাম কেমন পালটে যায়।

আবার বারের কাছে ফিরে এল ও। না, এখনও সেই মেয়েটি আসেনি। পাড়ার এক বয়স্কজন সুজয়কে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। রেসের মাঠে কেউ সহজে ধরা দিতে চায় না।

পায়চারি করতে-করতে গ্যালারির দিকে এল সুজয়। ঠাসবোনা সোয়েটারের মতো গ্যালারি। কিন্তু মেয়েটা কোথাও নেই। ও অবশ্য গ্যালারিতে আসে না—তবু। তাহলে কি আজ আসবে না? নাকি অসুখ-বিসুখ হল কিছু? ভাবাই যায় না। একটা মেয়ে, একদম চকচকে তরতাজা একটা মেয়ের অসুখ করেছে, বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে ভাবাই যায় না। সুজয়ের ধারণা, সুন্দরী মেয়েদের অসুখ কম করে, করেই না বলা যায়। আর যদি একবার করে তবে তাকে ফিরে পাওয়া বড় মুশকিল।

একটা বুড়ো নিগ্রোর ওপর চোখ পড়ল। সাদা গ্যালারির নিচে বসে ঝকঝকে দাঁতে হাসছে। নিগ্রোটার কোল ঘেঁষে একটা ফিরিঙ্গি যুবতী যার পরনে মিনিস্কার্ট আর নাইলনের স্লিভলেশ আঁটো

গেঞ্জি, ঝুঁকে পড়ে রেসবুকে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছে। বয়স হলেও নিগ্রোটি খুব স্মার্ট, সাদা ধবধবে কোঁকড়া চুলগুলো অলঙ্কারের মতো। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে আকাশের দিকে মুখ করে চুমু খেল। সুজয় দেখল মেয়েটা হেসে টাকাটা নিয়ে তরতর করে গ্যালারি থেকে নেমে প্যাসেজ দিয়ে বুকিদের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোয়েন্দার মতো পা চালাল সুজয়। নিশ্চয় কোনও খবর পেয়েছে মেয়েটা। এইসব বিলাসিনীদের ঘরে জকিদের টাউটর যাওয়া-আসা করে। মেয়েটির পেছন-পেছন সুজয় চলে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি টোট কাউন্টারের বা বুকিদের কাছে না গিয়ে একটু ঘুরে প্যাডকের পাশে বড় গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সুজয় দেখল একটা অ্যাংলো ছোকরা এগিয়ে এল চোরের মতো মেয়েটির কাছে।

'হুইচ ওয়ান য়ু টোল্ড? নাম্বার টেন?'

সুরেলা গলায় মেয়েটি জবাব দিল, 'ইয়েস।'

'গুড।' প্রফুল্ল মুখে পকেট থেকে একটা বেটিং কার্ড বের করে কী লিখল ছেলেটি! 'নাউ শো হিম দি কার্ড। টেন টু ওয়ান প্রাইজ।'

সুজয়ের মনে হল মেয়েটি দারুণ রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কার্ডটা হাতে নিয়ে বলল, 'বাট ডার্লিং—।'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে দাঁত বার করে বলল ছেলেটি, 'ওঃ বি স্টেডি, উই মাস্ট টেক দি চান্স।'

একটা জাল বেটিং কার্ড নিয়ে ফিরে যেতে দেখল মেয়েটাকে ও। ভীষণ অবাক হয়ে গেল সুজয়। বুড়ো নিগ্রোটার জন্যে কেমন দুঃখ হল ওর। আচ্ছা দশ নম্বর এই বাজিতে যদি জিতে যায় তাহলে মেয়েটি কী করবে। নিগ্রোটা নিশ্চয় টাকা আনতে বলবে ওকে। কিন্তু তা হল না, দ্বিতীয় বাজিতে দশ নম্বরকে খুঁজেই পেল না সুজয়। জিতল হট ফেবারিট চার নম্বর।

উই মাস্ট টেক দি চান্স। সবাই চান্স নিচ্ছে। হয় হেড নয় টেল। চান্স না নিলে বেঁচে থাকাই যায় না। হয় তোমার পকেটের একশো টাকা খতম, নয় টেন টু ওয়ানে হাজার, হাজার থেকে লক্ষ, তারপর অনেক লক্ষ, চেকগুলো পকেটে পুরে যখন তুমি বাইরে পা রাখবে তখন খিদিরপুর রোডে দশ ইঞ্চি পুরু গালচে বিছানো, লন্ডন প্যারিস কলকাতার খুশি ঘরগুলোর মালিক তোমাকে সেবা করছে—উই আর অ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার।

বারের টেবিলে ফিরে এল সুজয়। গমগম করছে বার। তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। একটা চেয়ার খালি হতেই সুড়ুৎ করে সুজয় বসে পড়ল। তিনটে পার্শি বুড়ি গুলতানি করছে টেবিলে। সুজয়ের ডানদিকে একটা মাদ্রাজি বুড়ো, চোখ মুখ গলায় বয়স বাচ্চা ছেলের সিকনির মতো ঝুলে আছে। চোখের পাতা সাদা হয় এই প্রথম দেখল সে। ওকে দেখে খুকখুক করে কাশল বুড়োটা। তারপর দক্ষিণী সুরে ইংরেজি বলল, 'লস অর গেইন?'

সুজয় ঘাড় নাড়ল। কী বুঝল কে জানে, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আই অ্যাম ফিনিশড। বেইট ফাইভ হান্ড্রেড—নো ডিভিডেন্ড।' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের থুতু মুছল লোকটা, 'ইউ উইল নেভার উইন।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল সুজয়। শালা ঘাটের মড়া আর দিব্যজ্ঞান ছড়াবার জায়গা পেলে না।

ঠিক সেই সময় সুজয়ের বুক টইটুম্বর হয়ে গেল। বুকিদের কাউন্টারের পাশ দিয়ে একটা স্বপ্নের মতো মেয়েটি আসছে। প্রথমটায় একটু ধন্দ লেগেছিল সুজয়ের। না, বেলবটম বা স্কার্ট পরেনি ও। হালকা ঘিয়ে রঙা একটা শাড়ি লতানো গাছের মতো ওর শরীর আঁকড়ে আছে। মেয়েটি ক্রমশ সামনে এগিয়ে এল। যেন চোখ আড়াল করা সমুদ্র তার অনেক ঢেউ নিয়ে দুলছে। সুজয়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে বারের মধ্যিখানে দাঁড়াল সে। একটা মিষ্টি ঝিমঝিমে গন্ধ নাকে এল সুজয়ের। বারের সবাই দেখছে মেয়েটাকে। অনেকের চোখ চকচক করছে এখন। সুজয় হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই

মেয়েটি ঘুরে ওর দিকে তাকাল। সুজয়ের মনে হল ওর পায়ের পাতা সিরসির করছে, 'প্লিজ বি সিটেড।'

মেয়েটি আলতো পায়ে এগিয়ে এল, যেন এই চেয়ারটা ওর জন্যেই ছিল এমন ভঙ্গি। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য সাপের চামড়ার ব্যাগটা রাখতেই মাদ্রাজি বুড়ো নাক কোঁচকাল একবার। বোধহয় ঝিমঝিমে গন্ধ সহ্য হয় না বুড়োর। চেয়ারের পাশ থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে উঠে পড়ল বুড়ো। যাওয়ার সময় সুজয়কে খসখসে গলায় বলে গেল, 'প্লিজ বি সিটেড।'

পারলে একটা চুমু খেয়ে ফেলত সুজয় মাদ্রাজিটাকে, কিন্তু ও মুখ চোখ স্বাভাবিক করে বসে পড়ল। আর তখনই সেই ঠান্ডা বরফের মতো ধারালো গন্ধ ওর সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়ল। সুজয় দেখল মেয়েটি সামান্য মুখ তুলে বারের দেওয়ালে রাখা টেলিভিশন সেট দেখছে। কয়েকটা ঘোড়াকে পর্দায় দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি বসেছে ঈষৎ ঝুঁকে। সুজয় মেয়েটির খোলা পেটের দিকে চোখ রাখল। অনেকখানি, একটা মুখ চেপে ধরলেও অনেকখানি জায়গা পড়ে থাকবে এমনি এমনি। পালিশ করা চামড়ায় কী মোলায়েম ভাব ছড়ানো। কিন্তু একটা দুটো মৃদু ঢেউ ছাড়া সেখানে কোনও আলোড়ন নেই। বুকের দিকে তাকিয়ে একটু থতমত খেয়ে গেল সুজয়। এরকম গলাঢাকা ব্লাউজ আজকাল কেউ পরে!

মেয়েটি সাপের চামড়ার মুখ খুলল। একটা ছোট্ট ডায়েরির পাতায় কী দেখল। নিশ্চয়ই ঘোড়ার নাম। সেই বিশেষ ঘোড়াটি যে হারবে না। সুজয়ের ইচ্ছে হল ডায়েরিটা কেড়ে নেয়—নামটা দ্যাখে। মেয়েটা ঘুরে সুজয়ের দিকে তাকাতেই ও হেসে ফেলল। সেই পরিষ্কার মাপা হাসি, 'ইউ আর লেট টুডে।'

মেয়েটার ঠোঁটের কোণে একটু ভাঁজ পড়ল, 'বিরক্তির? তারপর খুব পরিষ্কার এবং প্রতিটি শব্দ যেন বাস্কেটবল খেলছে এমন ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

গলার কাছে কী একটা হয়ে গেল যেন, সুজয় কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। মেয়েটি বাঙালি! আশ্চর্য! অথচ অ্যাংলো সিন্ধ্রী গুজরাটি যা কিছু ভাবা যায় মেয়েটিকে। তারপর বলল, 'আজ আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।'

'কারণ? আপনাকে তো আমি চিনি না।' কৌতুক না কৌতূহল বোঝা গেল না।

'আমিও না। তবে—কিছু খাবেন?' সুজয় এখন প্রস্তুত।

'না।' ঘাড় ঘুরিয়ে বলল মেয়েটি। তারপর বুকিদের কাউন্টারের ওপর চোখ রাখল। হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড চিৎকার, বুকিদের ছোটাছুটি। বারের কিছু লোক দৌড়ে গ্যালারির দিকে চলে গেল। আর একটা রেস হচ্ছে। কে জিতল, উদ্‌গ্রীব হল সুজয়। কিন্তু মেয়েটি নির্লিপ্ত—যেন তেতলা বাড়ির জানলা থেকে রাস্তা দেখছে।

'মাফ করবেন, রেসের মাঠে বসে আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না।' মেয়েটি মুখ ঘোরাল।

'জানি, সব জানি।' সুজয় হাসল।

তৃতীয় রেস শেষ হয়েছে। সুজয় দেখল একটা ছেলে খুব চেঁচাচ্ছে। জিতেছে বোধহয়। জিতলেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়।

খুব অবাক মেয়েটি এমন ভঙ্গি, 'তবে?'

'ইচ্ছে হল। এক-একটা ইচ্ছে হয় যার কোনও মানে থাকে না। কিন্তু ইচ্ছে হলে ভালো লাগে, তাই।' কথাটা বলে সুজয় ডায়েরির দিকে তাকাল।

মেয়েটি হাসল, 'আপনার কথা শুনে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু এখানে আমার ওপর অনেক নজর আছে, বুঝলেন?'

নজর আছে? ঠিক বুঝল না সুজয়। ওর ইচ্ছে হল মেয়েটির দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলে

আমাকে বাঁচান, আমি আজ হারতে চাই না।

সুজয় বলল, 'আজ কিছু খেলবেন না?'

মেয়েটি হাসল। চোখ বন্ধ করে কী ভাবল। তারপর ডায়েরির পাতাটা সমান করে ধরল। সুজয় দেখল সেখানে তিন নম্বর লেখা। সাদামাটা তিন। প্রায় ছিটকে পড়ল সুজয়। আঃ, তিন নম্বর! চোখের সামনে অনেক টাকা উড়ে যেতে দেখল ও। কত দর থাকবে তিন নম্বরের?

মেয়েটি কী একটা বলল। সুজয় আর অপেক্ষা করতে পারছে না। প্রায় দৌড়ে নেমে এল ও বুকিদের কাউন্টারে।

তিন নম্বর ঘোড়ার সব বেশি দর সিক্স-টু-ওয়ান। আপসেটই বলা যায়। দর আরও বাড়বে। ছয় নম্বর হট ফেবারিট। খুব খাচ্ছে বুকিরা। ওপেন বোর্ডে তিন নম্বর সেভেন টু ওয়ান। ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল সুজয়। পকেটের একশো টাকা এখন ওর হাতের মুঠোয়। ঘাম জমছে হাতে। হঠাৎ চমকে উঠল ও। একটা বুকি তিন নম্বরকে ফাইফ টু ওয়ান করে দিল। প্রায় পড়িমড়ি করে সিক্স-টু-ওয়ানে পুরো টাকা লাগিয়ে দিল ও। আশি টাকা প্লাস ট্যাক্স। জিতলে পাঁচশো যাট। ভীষণ আপসোসে মাথা ঝাঁকাল ও। আজ যদি পকেটে হাজার টাকা থাকত, ছ'হাজার কে আটকায়।

বেটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে আসতে পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাঠেই আলাপ। ভালো ক্যালকুলেশন করেন। সুজয় একগাল হেসে বলল, 'তিন নম্বর খেলুন।'

উৎসুক গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'তিন নম্বর কোন ঘোড়া?'

সুজয়ের এতক্ষণে মনে পড়ল তিন নম্বরের নামটাই সে জানে না। ওকে বই খুলতে দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, 'কি মশাই, ঘোড়ার নামই জানেন না অথচ খেলতে বলছেন, বাঃ!' চলে গেলেন ভদ্রলোক। সুজয় নামটা পড়ল 'লাকি স্টার'। ওজন সাতান্ন, জকি ইভান্স। ওর ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে ভদ্রলোককে ডাকে। ডেকে কার্ডটা দেখিয়ে বলে এই দেখুন মশাই আমি খেলেছি—আপনাকে ব্লাফ দিইনি।

গ্যালারির একটা ভালো জায়গা দেখে বসল সুজয়। এখান থেকে পুরো মাঠটা দেখা যায়। ওভাল সাইজের মাঠ। প্রচুর লোক হয়েছে আজ। জ্যাকপটের প্রথম লেগ। সারা মাঠ জুড়ে উত্তেজনা। ঘোড়াগুলো যাচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। ওই যে তিন নম্বর যাচ্ছে। দুধের মতো সাদা। এটা আট ফার্লং-এর রেস। ওপেন বোর্ডের দিকে তাকাল সুজয়। তিন নম্বরের কাঁটা নেমে এসেছে টেন-টু-ওয়ানে। বুকের মধ্যে হাঁপ ধরল সুজয়ের। নন্ ট্রাই নাকি ঘোড়াটা। কিন্তু অসম্ভব—এ ঘোড়া জিতবেই। মেয়েটিকে কখনও হারতে দ্যাখেনি সে। তারপর হঠাৎ মনে হল ব্যাপারটা। মেয়েটা ওকে তিন নম্বর বলেছে, সেটা তো এই রেসের নাও হতে পারে। এর পরের বাজির তিন নম্বর যদি হয়। মেয়েটি যেন কী বলছিল ওকে। কেমন ঠান্ডা একটা স্রোত ওর সারা শরীরে ভেসে বেড়াতে লাগল। শেষ সম্বল একশো টাকা। না, হতেই পারে না। মেয়েটি এই তিন নম্বরই বলেছে। নিজেকে বোঝাল ও। এই তিন নম্বরই।

বাঁ-দিকে যে ভদ্রলোক বসে আছে তার মুখ দেখে চমকে উঠল সে। লোকটার ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়। প্রচুর বড়লোক। স্যুটটা কি বিলেতের তৈরি? টাই পিনটা আলবাত হীরের। ভদ্রলোকের হাতে ধরা কার্ডটার দিকে তাকাল ও। ইভন মানিতে পাঁচ হাজার লাগিয়েছেন ছয় নম্বর ঘোড়ায়। ডাবল ফাইভ ফাইভের প্যাকেটের সঙ্গে আলতো ভঙ্গিতে ধরে রেখেছেন ভাবী দশ হাজারের প্রতিশ্রুতিপত্র। সুজয় হাসল, গেল তোমার টাকা। তিন নম্বর মাস্ট উইন।

রেস শুরু হল। মাইকে রিলে হচ্ছে। এক নম্বর লিড করছে। ছয় নম্বর খুব ভালো সেকেন্ড পজিশনে আছে। তিন নম্বরের নাম শুনতে পেল না সুজয়। উত্তেজনায় সমস্ত মাঠ দাঁড়িয়ে। কে যেন চেঁচাল—নাম্বার সিক্স ইন এ ওয়াক। শালা। সুজয়ের মেরুদণ্ড টনটন করছে। দাঁড়িয়ে থাকতে

পারছে না ও। বাঁক ঘুরল ঘোড়াগুলো। ছয় নম্বর এগিয়ে আসছে মেজাজে। পাশের ভদ্রলোক ডাবল ফাইভ ফাইভ ধরালেন। জ্যাকপটের প্রথম লেগের ফেবারিট ঘোড়ার কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। সুজয় দেখল একদম পেছন থেকে একটা কালো তীর সাঁ করে বেরিয়ে আসছে। আউটসাইড দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সে ছয় নম্বরকে ছুঁয়ে ফেলল। সমস্ত মাঠ বোবা হয়ে গেল। পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'অ্যানাদার আপসেট।' সুজয়ের শরীর থরথর করে কাঁপছে, সাত নম্বর ঘোড়া জিতে গেল।

মুহূর্তেই একটা সামুদ্রিক গর্জন শুরু হয়ে গেল মাঠে। কি ভীষণ ক্লান্তিতে সুজয় বসে পড়েছিল বেঞ্চিতে, এখন দেখল সমস্ত মাঠ আহত পশুর মতো চিৎকার করছে। শালা চুরি—চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। যে ঘোড়া আজ অবধি প্লেসে আসেনি সে জেতে কী করে। মানি না, সাত নম্বরকে জেতালে চলবে না! মেম্বার এনক্লোজারের ওপর ঢিল পড়ছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে অস্থিরতা। সেকেন্ড আর গ্র্যান্ড এনক্লোজার এক হয়ে গেল। কেউ কোনও বাধা মানছে না। সুজয় দেখল পুলিশ এসে গেল ঢাল নিয়ে। তাড়া করছে পুলিশ। একদল লোক রেসিং ট্র্যাকের ওপর শুয়ে পড়ল। আর রেস হতে দেবে না। মাইকে ফ্যায়ারিং-এর শব্দ হল—নাকি টিয়ার গ্যাস। মেয়েরা ভয়ে কাদা। হামলা হচ্ছে স্টুয়ার্টদের ওপর। ওরাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক। বাতাসে চোখ জ্বালা করছে। সুজয় শুনল পাশের ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন, 'যাক এ্যাদ্দিনে রাজার খেলা জনতার হয়ে গেল।' ভীষণ বিরক্তিতে হাতের কার্ড মুচড়ে ফেলে দিয়ে নেমে গেলেন ভদ্রলোক।

হুড়মুড় করে মানুষজন ছুটছে গেটের দিকে। পালাচ্ছে সবাই।

কয়েকটি উৎসাহী ছেলে বাঁশ নিয়ে তাড়া করছে বুকে ব্যাজ ঝোলানো মেম্বারদের। একজন চেঁচিয়ে বক্তৃতা করছে—আমাদের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না, চলবে না। শেষপর্যন্ত পুলিশ অ্যারেস্ট আরম্ভ করল। খেপে গেল জনতা।

নির্লিপ্তের মতো বসে-বসে দেখল সুজয়। চোখ বন্ধ করে মেয়েটার মুখটা মনে করতে চাইল। তুমি আমাকে জয়ের খবর দিলে মেয়ে—এ আমি কি জিতলাম? শেষ সম্বল একশো টাকা—সুজয়ের ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে কাঁদে।

এমন সময় মাইকে ঘোষণা হল, 'স্টুয়ার্টরা ভীষণ দুঃখের সঙ্গে মাঠের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আজকের মতো রেস ক্যানসেল করে দিচ্ছেন।'

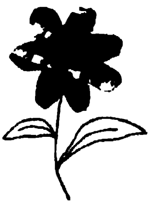
কোথায় কী! চিৎকার সমানে চলেছে। কাঠের গ্যালারির এক পাশে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আগুন লাগল বুঝি। জনতা চেঁচাচ্ছে—শুধু আজকের রেস নয়, ওই হয়ে যাওয়া রেস ক্যানসেল করতে হবে। হবে হবে হবে।

আবার কিছুক্ষণ কোলাহল। তারপর শেষপর্যন্ত মাইকে ঘোষণা হল, 'সব রকম দিক বিচার করে রেস ক্যানসেল করে দেওয়া হচ্ছে। যারা যে টিকিট ওই রেসে কেটেছেন, লাইনে দাঁড়ান টিকিট বা কার্ড দেখিয়ে দাম ফেরত নিয়ে নিন।'

মুহূর্তে একটা উল্লাস—খুশির একটা ঢেউ গড়িয়ে গেল মাঠে। সুজয়ের হঠাৎ মনে হল তার একশো টাকা যায়নি—এটা সে ফেরত পাবে। ভাগ্যিস কার্ডটা সে ফেলে দেয়নি। সুজয়ের চোখে পড়ল সারা মাঠ জুড়ে মানুষ উবু হয়ে বসে ফেলে দেওয়া এই রেসের টিকিট খুঁজছে। যারা হেরে গিয়েছে ভেবে টিকিট ফেলে দিয়েছিল তারা পাগলের মতো মাঠ হাতড়াচ্ছে। সুজয়ের চোখে পড়ল পাশের ভদ্রলোকের ফেলে দেওয়া কার্ডখানা। ভিখিরির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিল সে। হাত দিয়ে কোঁচকানো কার্ডটা সমান করল। পাঁচ হাজার। সুজয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। কাউন্টারে একটা দেখালেই সে পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে। আর একটা একশো টাকার টিকিট পেল সুজয়। ক্রমশ সুজয় মাঠের হাজার-হাজার মানুষের মতো হাঁটু গেড়ে ধুলো ঘেঁটে বাতিল টিকিট খুঁজতে শুরু করে দিল। কলকাতার মাটিতে কত টাকা—খুঁজে নিলেই হল। ওই তো একটা দশ টাকার টিকিট। বাঃ। সুজয় দেখল তার

পাশে বসা ভদ্রলোক উবু হয়ে কার্ড খুঁজতে-খুঁজতে ওপরে আসছেন। সরে এল সে। সরতেই মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল একটা ছোকরার সঙ্গে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা থাপ্পড় কষালো সুজয়। রেস মাঠের নোংরা পরিষ্কার করা ছেলের দলের একটা।

হাত দিয়ে অনুভব করছিল সুজয় পকেটের ওজন বাড়ছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে মাথা দোলাল। হাজার-হাজার কোট টাই ধুতি শাড়ি মাটিতে গড়াগড়ি করে ছুটে বেড়াচ্ছে। মানুষ বলে মনে হচ্ছে না কাউকেই। হাত প্রসারিত, পিঠ আকাশের দিকে ধনুকের মতো বাঁকানো। কেমন একটা ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ হচ্ছে। মেরুদণ্ড কি সহজে গোল হয়ে গেছে সবার। শুয়োরের মতো দেখতে লাগছে আচমকা। কিন্তু তবু সুজয়ের মনে হল, মেরুদণ্ডের এমন চমৎকার খেলা আর কেউ খেলতে পারে না।



শূকরছানা

কুকুরগুলোর খাওয়া দেখছিল ছেলেটা। তিনটে জিভ একসঙ্গে পড়ছে থালাতে, সপসপ শব্দ হচ্ছে। যে যত তাড়াতাড়ি জিভ নাড়তে পারবে তার পেটে তত বেশি খাওয়ার যাবে। ছেলেটা জুলজুল করে দেখল, কি দ্রুত খাবারগুলো শেষ হয়ে গেল। খাবার বলতে মোটা চালের ভাত ঢেঁকির শাকের চচ্চড়ি। কুকুর তিনটে একদম নেড়ি, তবে তিনটেই মদ্দা। মাদি কুকুর রাখতে চায় না লোকটা। এই তিনটের পেছন-পেছন একটা মাদি এসেছিল কদিন আগে। কোত্থেকে এল বোঝা যায়নি। কারণ মাইল দুয়েকের মধ্যে লোকবসতি বলতে কিছু নেই। তবু এসে গিয়েছিল কুকুরটা লোকটার চোখে পড়েছিল আগে। মাদিটা কেমন লাজুক-লাজুক মুখ করে এ তিনটের চারপাশে ঘুরছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি হয়নি, একটা লম্বা বাঁখারি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল লোকটা। কেঁউ-কেঁউ চিৎকার শুনেও কুকুরগুলো চুপচাপ লেজ নাড়তে লাগল। লোকটা মাদিটাকে কোথায় যেন পার করে দিয়ে এল। এসে ছেলেটার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'এসব চলবে না, আমার বাড়িতে ধাষ্টামো চলবে না, এই শুয়োরের বাচ্চা, শুনতে পাচ্ছিস?' ছেলেটি ঘাড় নেড়েছিল।

ছেলেটা সবকিছু গুছিয়ে ভাবতে পারে না। আসলে কিছু ভাবতেই ওর ইচ্ছে করে না। কিন্তু একটা জিনিস ছেলেটা দারুণ বোঝে। হাঁড়িতে যখন চাল ফোটে, নাদুস-নুদুস ভাতগুলো যখন হাঁড়িতে ওলটপালট খায় তখন ছেলেটা ওপরের দিকে মুখ তুলে বড় বড় বাতাস টানে নাক দিয়ে। তখন ওর কালো পিঠ-পেট এক হওয়া ছোট্ট শরীরটা কাঁপতে থাকে। কিন্তু লোকটার হিসেব মাপা, কুকুর তিনটে কতটা ভাত পাবে, ছেলেটা কতটা খাবে একদম হিসেব করা।

এখানে ও অবশ্য অল্প ক'দিন এসেছে। নাগর-কাটা বাজার থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল লোকটা। গাছতলায় বাজারের শেষ প্রান্তে যে ঝাঁকড়া গাছটা, তার তলায় দাঁড়িয়েছিল ও। হন-হন করে আসছিল লোকটা। কাঁধে একটা ঝুড়ি, হাতে মুরগি ঝোলানো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কাছে এসে বিকৃত শব্দ করে ঘ্যাসঘ্যাসে গলায় বলেছিল, 'অ্যাই ঘর কোথায়?' লোকটার মুখ দেখে, আঙুলগুলো দেখে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল ছেলেটার। লোকটা আবার হেঁকেছিল, 'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, বাপ আছে?' ঘাড় নেড়েছিল ছেলেটি এবার।

'মা আছে?'

আবার ঘাড় নেড়েছিল।

লোকটা কী ভাবল, তারপর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'অ্যাই, ভাত খাবি?'

ছেলেটা চলে এসেছিল পেছন-পেছন। অনেকটা পথ রোদ্দুর মাথায় করে ওরা এসেছিল। তারপর এই জঙ্গলের ধারে, এই বড়সড় বাড়িটায় ঢুকে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, 'একদম পাঁয়তাড়া করবি না। বসে-বসে গেলাতে তোকে আনিনি। সকাল থেকে উঠে ঘাস কাটবি। কুকুর আছে তিনটে, সেগুলোকে চান করাবি আর এই সব কলাগাছ, আখগাছ দেখছিস, পাহারা দিবি। সকালবেলা আর সন্ধেবেলা দুটো ভাত দেব, মন ভরে খাবি। বাবুয়ানা করলে লাথি মেরে বের করে দেব—খেয়াল থাকে যেন।' এই সময় ও কুকুরগুলোকে দেখতে পেল। লোকটার পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়ছে। কুকুরগুলো নেড়ি আর লোম ওঠা।

কুকুরগুলোর খাওয়া হয়ে গেলে ছেলেটা উঠল। কী রোদ বাপ্‌স! বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। সবটাই তালা দেওয়া। শুধু লোকটার ঘর ছাড়া। উঠোনের ওপাশে ছোট-ছোট চালাঘর আছে তিনটে। একটাতে ও থাকে আর একটায় কুকুরগুলো। ছেলেটা বাগানে এল। প্রচুর কলাগাছ। লোকটা বস্তা দিয়ে কলাগুলো বেঁধে রেখেছে। বাদুড় বসতে পারে না। পাকলেই ঝুড়ি করে লোকটা বাজারে নিয়ে যায়। বাড়িটা তো লোকটার নয়, ছেলেটা বুঝতে পারে। কারণ লোকটা কথায় কথায় অন্য একজনের কথা বলে। বাড়িটা নাকি তার।

আখগাছগুলো বেশ মোটাসোটা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছগুলো। হাত বোলাল ছেলেটা। খসখসে গা, কিন্তু ভেতরটা রসে টইটুম্বুর। একটা গাছের কোমর ধরে অনেকখানি নামিয়ে আনল ও, তারপর ছেড়ে দিতেই সটান খাড়া হয়ে গেল সেটা, দোল খেতে লাগল। লোকটা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'খবরদার, গাছের গায়ে হাত দিয়েছ কি হাত একেবারে ভেঙে ফেলব। আমার সব গোনা গাছ, হ্যাঁ।'

পাছার কাছটাতে খানিকটা ছেঁড়া, সামনের বোতামগুলো নেই, প্যান্টটা খানিক তুলে আখগাছগুলোর গায়ে পেচ্ছাপ করল ছেলেটা। করতে করতে কুকুরগুলোর কথা মনে পড়তেই একটা ঠ্যাঙ তুলে ধরল, ফিসফিস করে বলল, 'শালা!'

এই সময় লোকটার গলা শুনতে পেল ও। হাঁকডাক করছে; গলায় যেন খুশি-খুশি ব্যাপার। ছেলেটা পাথর হয়ে আখগাছের ভেজা জায়গাটা দেখল। লোকটার নজরে পড়লে খেয়ে ফেলবে। প্রথম দিন লোকটাকে দেখেছিল ও। বাজার থেকে আনা মুরগিটার গলায় খপাত করে ছুরিটা বসিয়ে ধড়টা হাতে ধরেছিল লোকটা। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছিল, মুখ-চোখে ছোপ ধরেছিল লোকটার। তারপর পটাপট পালকগুলো ছিঁড়ে- ছিঁড়ে ফেলেছিল অনায়াসে। ছাড়ানো মুরগিটাকে দেখতে একদম ন্যাংটো বাচ্চার মতন।

মুখ-চোখ ঘামে ভেজা, গায়ের ফতুয়াটা সপসপে, বিরাট দেহ নিয়ে লোকটা হাঁপাচ্ছিল। ছেলেটা বিস্ময়ে দেখল লোকটার হাতে একটা দড়ি, দড়ির প্রান্তে একটা বড়সড় পেটমোটা সারাগায়ে কাদামাখা শুয়োর দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, ডেকে-ডেকে গলা শুকিয়ে গেল, আমার এখানে নবাবি মারাতে এসেছে, আঁ!'

লোকটা রেগে গেছে জব্বর। না হলে ওকে তুই করে বলত। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে শুয়োরটার দিকে তাকাল। বেশ বড়সড় শুয়োরটা। কুতকুতে চোখে দেখছে। পেটের কাছটা বেশ ফোলা। গায়ে চাপ-চাপ কাদা শুকিয়ে আছে। এ এখানে কি খাবে? এ-বাড়িতে কাদা নেই, শুয়োরেরা যা খায় তার কিছুই নেই। তারপরই ওই কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ল। মনে হতেই ও অসহায় লোকটার দিকে তাকাল।

'অ্যাই, আজ থেকে এ এখানে থাকবে। এর সেবাযত্ন করবি। এই শুয়োরের বাচ্চা, কথা বলছিস না যে!' লোকটা খিঁচিয়ে উঠতেই ও ঘাড় নাড়ল। লোকটা খুশি হল। তারপর সামনের

বারান্দার গায়ে-গায়ে বসা তিনটে নেড়ির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটার সঙ্গে শুয়োরটাকে দেখে কুকুর তিনটে হইচই করেনি কিছু। গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল শুধু। লোকটা এগিয়ে একটার মাথায় চাপড় মারল, 'ওটার পেছনে লাগিস না, যদি দেখতে পাই, শালা, মেরে তাড়াব। খ্যাটন বন্ধ হবে।' তারপর ছেলেটাকে হেঁকে বলল, 'হাঁ করে দেখছিসটা কি, যা ওকে নিয়ে যা, কুয়োর পাড়ে নিয়ে গিয়ে বাঁধ।' ছেলেটা নিচু হয়ে লোকটার ফেলে রাখা দড়ির প্রান্ত কুড়িয়ে নিয়ে কুয়োর দিকে এগোতেই শুয়োরটা কেমন দুলকি চালে পেছন-পেছন চলে এল। কুয়োর ধারে একটা ছোট্ট খুঁটি আছে, ছেলেটা দড়ি সেখানে বাঁধতেই লোকটা বলল, 'নে এবার জল তোল, ওকে ভালো করে স্নান করা। গা থেকে বড় কটু গন্ধ বেরুচ্ছে রে। ওকে একটু ভদ্দরলোক কর।' বলে লোকটা ফতুয়া খুলে দাওয়ায় গিয়ে বসল। শুয়োরটার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা ফোঁস-ফোঁস করে কিছু বাতাস টানল নাক দিয়ে। এই আর একটা কাজ বাড়ল। বালতি নামিয়ে দিল সে কুয়োতে। জলে ওর মুখ নড়ছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল ছেলেটা। মুখ দেখলেই ওর কান্না পায়। পেটের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। অথচ লোকটা কিছু বোঝে না। বোঝে না যে ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। লোকটা, যা রান্না হয়, তার তিন ভাগ খায়। কি খায় বাপ্‌স! তরকারি না থাক, পেঁয়াজ দিয়ে কাঁচালঙ্কা দিয়ে, কমসে কম কাগজি লেবু দিয়ে গপ-গপ করে ভাতগুলো পেটের মধ্যে পুরে দেয়। আর খাওয়ার সময় বাঁ-হাতটা লোমভরতি উরুতে আদর করে বোলায়। কুকুরগুলোও কম খায় না। চোখ-কানাটার পেটে বেশি গর্ত। তবু ওদের পেট ভরে না। সপাসপ মেরে দিয়েই মুখ তুলে তাকায়। যেন আর একটু দাও, এরকম ভাব। তারপর ও নিজে যখন বসে, আঃ, ভাতগুলোকে সামনে রেখে আদর করতে ইচ্ছে করে। পাঁচ আঙুল চওড়া করে মুঠোয় ধরলে ক-বারেই শেষ— তাই ও একটা-একটা করে ভাত মুখে দেয়। অনেকক্ষণ, অ-নে-ক-ক্ষণ ধরে ভাত খাওয়া যায়। ওই সুখেই এখানে থাকা। কিন্তু এই শুয়োরটা কী খাবে, এখানে তো কেউ এঁটো ফেলে রাখে না। তবে কি লোকটা আর একটু চাল বাড়াবে? কুতকুতে চোখে তাকাল ছেলেটা।

শালা বড্ড গরম পড়েছে। বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। লোকটা ফতুয়া দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছিল। খাটো ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে একটু আরাম করে বসল ও। এ মাসে এখনও টাকা এল না। এই এক হয়েছে। তোর বাড়ি ঘর দেখব, মাসে তিরিশটা টাকা দিবি, তাও যদি সময়মতো না পাঠাস—লোকটার চোখ পড়ল ছেলেটার দিকে। কুয়োর ভিতর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, 'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, নিজের সুরত দেখছ, আঁ? জল তোল।'

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি জল তুলল ছেলেটা। তুলে বালতিটা উপুড় করে ঢেলে দিল শুয়োরের গায়ে। জল গায়ে পড়তেই হঠাৎ চমকে গিয়ে শুয়োরটা ছুটতে চেষ্টা করল। চি-চি শব্দ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু দড়িটা বড্ড ছোট। ছেলেটা আবার জল তুলল, এবার শুয়োরটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে জল নিল। বাহারে বাহা, শুয়োরটাকে বেশ ভদ্দর বলে মনে হচ্ছে। হরিশ মেথরের শুয়োর। সেই কবে কুড়িটা টাকা পেত ও, তাগাদা দিয়ে-দিয়ে হয়রান, শেষে আজ হরিশ এই শুয়োরটাকে ধরিয়ে দিল। আরও কিছু টাকা চেয়েছিল অবশ্যি, হবে-হবে বলে কাটিয়েছে। যা পাওয়া যায়। তা টাকাটার সুদ বলেও তো একটা কথা আছে। দু-মাইল জঙ্গল ঠেঙিয়ে তাগাদা দিয়ে যাওয়া—সেটা?

'এই শুয়োরের বাচ্চা, ওভাবে জল ঢাললে আমার গুষ্টির পিণ্ডি হবে। শালা মন রাখছ আমার। ভালো করে ধর শুয়োরটাকে, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ঘষে কাদাগুলো তোল—ওরকম মেয়েছেলে ব্যাপার এখানে নেহি চলেগা।' লোকটা কথাগুলো বলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সকালে রান্না করে গিয়েছে। ওর থালাভরতি ভাত ঢাকা দেওয়া—না, কেউ ছোঁয়নি। কুকুরের কৌটো খালি। ছেলেটার থালা—না, ফরসা হয়নি। তবে হাত পড়েছে। লোকটা যেরকম রেখে গিয়েছিল সেরকম নেই। শালার পেটে রাবণের চিতা। কিন্তু শুয়োরটাকে কী খেতে দেওয়া যায়। এখানে

কাদা নালা নেই। জঙ্গলের মধ্যেই ছেড়ে দেবে ওটাকে। ছেলেটাকে পিছন-পিছন রাখতে হবে, যাতে না পালায়।

উঁকি দিল লোকটা। ছেলেটা উপুড় হয়ে নারকেলের ছোবড়া ঘষছে চোখ-মুখ খিঁচিয়ে। আর শুয়োরটা, বাঃ, বেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চেহারাই পালটে গেল দেখছি। কে বলবে শালা হরিশ মেথরের ডেরায় পয়দা। এগিয়ে গেল ও, কাছে থেকে শুয়োরটাকে দেখল। স্নান করানো হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা একগাল হাসল, তারপর শুয়োরটাকে টেনে রোদ্দুরে দাঁড় করাল, 'তুই তো ভালোই স্নান করাস। আজ আমার পিঠে সাবান ঘষবি। তা যাই বলিস, শুয়োরটাকে এখন বেশ লাগছে। তোর চেয়ে ও দেখতে ভালো। তুই শালা শুয়োরের বাচ্চা, তোর গায়ের ময়লা স্নান করলেও উঠবে না।'

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা কুয়োর পারে জাবড়ে বসেছিল। কালো বিরাট লোমশ শরীরে জল চিকচিক করছিল। চোখ বুজে বসেছিল লোকটা। ভেদা ধুতি গুটিয়ে কুঁচকির ওপরে নিয়ে এসেছে। পিঠে সাবান ঘষছিল ছেলেটা।

লোকটা বলল, 'অ্যাই ভালো করে ঘষ, জোরে-জোরে। আচ্ছা এই. তুই কথা বলিস না কেন?'

ছেলেটা চুপ করে থাকল খানিক, তারপর আবার ধুঁধুঁলের ছোবড়া ঘষতে লাগল পিঠে।

'তোর তো সব সময় খিদে পায়, কিন্তু তুই হাসিস না কেন? কাঁদতে পারিস?' বলেই একটা খোঁচা দিল ছেলেটার পেটে। ক্‌ করে আওয়াজ হল মুখ দিয়ে, ছেলেটার মনে হল, পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল, চোখের সামনেটা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল ছেলেটা। শুয়োরটা মুখ তুলে এদিকে তাকাল রোদ্দুরে গা শুকোতে শুকোতে।

'হ্যাঁ, তাহলে তুই কাঁদতে জানিস। কিন্তু খবরদার, আর কান্নাকাটি নেহি চলেগা। আমাকে কোনও শালা কাঁদতে দেখেনি কখনও। মারব এক থাবড়া, চোপ!' গর্জন করে উঠল লোকটা। শরীর চমকে উঠে কেঁপে যেতে ছেলেটা চুপ করল। তারপর আবার ছোবড়া হাতে তুলে নিল।

'শুয়োরটাকে আজ একটু ভাত দিবি, বুঝলি! প্রথম দিন তো। বাড়িতে নতুন কেউ এলে তাকে কিছু দিতে হয়। তোর একটু কম পড়বে—তা হোক, প্রথম দিন, শুয়োরটা যেন না খেয়ে থাকে। অবশ্যি কাল থেকে ওকে জঙ্গলে নিয়ে গেলেই হবে। তবে দেখবি গু-ফু যেন না খায়।' সাবান মাখা হয়ে গিয়েছিল লোকটার, বালতিটা নিয়ে এবার উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটা সরে এল। কয়েক মুঠো ফুলের মতো ভাত থেকে ওই শুয়োরটাকে দিতে হবে ভাবতেই ওর পেটের ভেতর থেকে একটা চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে আসতে-আসতে লোকটার প্রায় ন্যাংটো বিশাল চেহারাটার দিকে চোখ পড়তেই গলা কাছে আটকে গেল। আটকে গিয়ে সারা শরীরে ঝুলতে লাগল।

খালি ঘরটায় শুয়োরটাকে রাখা হল। প্রথম দিন সন্ধে হতেই শুয়োরটা টানা চিৎকার শুরু করল। কান পাতা দায়। লোকটা তিনবার বাঁশ নিয়ে ঢুকল ঘরে। আওয়াজটা শুনতে পেল ছেলেটা। সন্ধের আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে ওদের। এবেলা ও আর ভাত দেয়নি শুয়োরটাকে। লোকটার আঙুলের খোঁচায় এখনও পেটের মধ্যে টনটন করছে। পেটে হাত দিয়ে ও বুঝতে পারে কতটুকু জায়গায় ভাত পড়ে আছে। শুয়োরটারও বোধহয় খিদে পেয়েছে। একটু ভাত পেটে পড়লে বোধহয় কাঁদত না। বাঁশের ঘা খেয়ে শেষপর্যন্ত চুপ করল ওটা। শব্দটা এত প্রবল যে ছেলেটার হাত-পা কেমন সিঁটিয়ে গিয়ে সে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ।

ক্রমশ শুয়োরটা ছেলেটাকে বুঝে গেল। লোকটার কাছে বড় একটা ঘেঁষত না, কিন্তু ছেলেটা যখন সকালে দড়ি ধরে জঙ্গলে নিয়ে যেত ও চুপচাপ চলে আসত। হাত দিয়ে আওয়াজ করলে কাছে আসত। খাওয়ার কথা মনে পড়তেই ছেলেটা লাঠি দিয়ে শুয়োরটার ফোলা-ফোলা পেটে খোঁচা মারত, শুয়োরটা কিছু বলত না। এক-এক সময় জঙ্গলের ভিতর শুয়োরটা যখন পেটভরতি খেয়ে

নিয়েছে তখন ওর আদর করতে ইচ্ছে করত। শুয়োরের পাশে বসে ওর গলায় পিঠে ফোলা-ফোলা নরম পেটে হাত বোলাতে ছেলেটার আরাম লাগত। শুয়োরটা কিছু বলত না। পেটে হাত পড়লেই আদুরে বেড়ালের মতো গা এগিয়ে দিত।

হঠাৎ একদিন ভোর হয়ে গেলে ছেলেটা লোকটার চিৎকার শুনতে পেল। লোকটা ওকে ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে এসে ও দেখল লোকটা শুয়োরের ঘরে। উঁকি মারল ও। তারপরে কেমন অবাক হয়ে গেল। শুয়োরটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর ওর কোল ঘেঁষে কুকুরের বাচ্চার মতো অনেকগুলো নাদুস-নাদুস শুয়োর কিলবিল করছে।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা, 'দ্যাখ রে, কতগুলোকে পয়দা করেছে একসঙ্গে। বেশ মোটাসোটা, কি বলিস! হরিশ মেথর বলেছিল পেটে বাচ্চা আছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে কে জানত! তা তুই রোজ স্নান করাতিস তাই এরকমটা হল। বেশ ভদ্দর চেহারা, অাঁ!' তারপর কি মনে পড়তেই খিঁচিয়ে উঠল, 'ম্যাজিক দেখছ শালা, শুয়োরের বাচ্চা, যা উনুন ধরা।'

দু-দিন কাটতে ছেলেটা ঠিক করল এবার পালাবে। এভাবে আর থাকা যায় না। লোকটা একটু চাল বাড়াচ্ছে না। এদিকে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে শুয়োরটা জঙ্গলে যেতে পারে না। ফলে ওকে ভাত খাওয়াতে হচ্ছে। কুকুরগুলো দিনরাত কেঁউ-কেঁউ করছে। ওর নিজের ভাত অর্ধেক। যেদিন পালাবে ঠিক সেদিন লোকটা ওকে হাঁক দিল, 'এই শুয়োরেব বাচ্চা, এদিকে আয়।' ছেলেটা গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, 'অ্যাই আমি হাটে চললাম। তুই শুয়োরটাকে জঙ্গলে নিয়ে যা। আমি এগুলোকে বিদায় করে আসি। দেখতে মোটাসোটা, চোখ ফুটে গেছে, দর ভালোই পাওয়া যাবে। বাড়িতে ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই।' বলে লোকটা বাচ্চাগুলোকে একটা ঝুড়ির মধ্যে তুলল, তারপর সেটাকে মাথায় নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল হাটের দিকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। লোকটা মাঝে-মাঝে হঠাৎ ভালো হয়ে যায়। শুয়োরটাকে জঙ্গলে নিয়ে গেল, বাচ্চাগুলো যখন বিদায় হল, তখন আর চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। হঠাৎ ভাতের কথা ভেবে ও রান্নাঘরে ঢুকল। ঢুকে অবাক হয়ে দেখল লোকটা আজ রাঁধেনি। কী ব্যাপার, ঠিক বুঝতে না পেরে ও চালের কৌটোগুলো দেখতে লাগল। নাঃ, কোথাও চাল নেই। লোকটা তাই রান্না করতে পারেনি। কখন হাট থেকে ফিরে আসবে, বাচ্চাগুলোকে বিক্রি করে চাল আনবে, রান্না করবে, কখন ভাত হবে, সেই ভাত খাবে—ছেলেটা ঠিক করল পালাবে, নির্ঘাত পালিয়ে যাবে। ওর কান্না পাচ্ছিল।

হাটে এসে লোকটা দেখল জমজমাট। ভাগ্যিস শুয়োরটাকে নিয়ে গিয়েছিল ও, নইলে তো আজ শালা হরিমটর। লোকটা শুয়োরপট্টিতে এল। আসতেই দেখল, হরিশ মেথর দাঁড়িয়ে আছে বটতলায়। ঝুড়ি নামাতেই ও এগিয়ে এল। তারপর মুখটা কেমন করে বলল, 'বিইয়েছে বুঝি!'

লোকটা ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

হরিশ বাচ্চাগুলোর গায়ে হাত বোলাল, 'বেশ হয়েছে দেখছি। এগুলো তুমি ফাউকা পেয়ে গেলে, মালটা ক'দিন পরে নিলে এগুলো আমার হত।'

লোকটা হাসল, 'কপাল, বুঝলে হরিশ! ওটা আসল আর এগুলো হচ্ছে সুদ। কত খরচা হয়ে গেল শুয়োর নিয়ে তার হিসেব রাখো!'

হরিশ একবার বলতে চেষ্টা করল টাকার কথা, লোকটা চাপা দিল চটপট। উঠে যাওয়ার সময় হরিশ বলল, 'সবক'টা বেচো না, বুঝলে। একটা রেখে দিও। নইলে মা-টা জ্বলেপুড়ে মরবে।'

কথাটা মনে ধরল লোকটার। পাইকারদের কাছে ভালো দরে একটা বাদে সব বিক্রি করে চাল ডাল কিনল ও। তারপর একটা বাচ্চা বগলে নিয়ে নি-নি দুপুরে নাগরাকাটার বাজার থেকে মাঠ ভেঙে ফিরে চলল ঝুড়ি মাথায়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে লোকটা একটু থমকে দাঁড়াল। না, সেরকম কিছু নয়। হরিশ মেথরের

কথা শুনে ও ভেবেছিল বাড়ি ফিরে দেখবে শুয়োরটা চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে। কিন্তু কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না ও। ছোকরাটা ওকে সামলালো কী করে কে জানে। ওটাকে এবার বিদায় করা দরকার। অনেক হয়েছে। কাজের বেলায় কিছু নেই, শুধু খ্যাটন আর খ্যাটন।

বাড়িতে ঢুকল ও। কেমন চুপচাপ সব। গেল কোথায়! লোকটা একবার হাঁক দিল, 'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা!' কোনও সাড়া পেল না সে। ছেলেটার ঘরে উঁকি দিল ও। না নেই এখানে। বেরিয়ে এসে আখের খেতটা দেখল। তারপর মনে পড়ল, নিশ্চয় জঙ্গলে গিয়েছে। সে-রকমটাই বলে গিয়েছিল। এখন এই বাচ্চাটাকে কোথায় রাখে। শুয়োরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজা খুলে বাচ্চাটাকে ভেতরে গলিয়ে দিল। কুঁই-কুঁই করছে বাচ্চাটা। কী মনে করে একবার উঁকি দিল ও। দিয়েই একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল প্রথমটায়। পেছন ফিরে শুয়োরটা শুয়ে আছে। কেমন মা-মা মুখ করে ঘুরে তাকাল লোকটার দিকে, বাচ্চাটা গুটগুট করে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শুয়োরটা একবার দেখল শুধু, তেমন আমল দিল না। মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

কয়েক পা এগিয়ে গেল লোকটা। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর। শুয়োরটার ওপাশে ছেলেটার ঠ্যাং দেখতে পেল ও। দেহ শুয়োরের শরীর আড়াল করে রেখেছে।

ব্যাপারটা কী। ঘুমুচ্ছে নাকি শালা! এই জঙ্গলে যাওয়া হয়েছে! মাথায় রক্ত উঠে গেল লোকটার। শুধু অন্ন ধ্বংস। মেরেই ফেলবে আজ। মানুষের বাচ্চা—শালা উকুন পোষা। এর চেয়ে শুয়োর পুষলে বছরে দু-বার বিয়োত। কয়েক পা এগিয়ে চুলের মুঠি ধরতে হাত বাড়িয়ে লোকটা কেমন কুঁকড়ে গেল। তারপর বড়-বড় চোখ মেলে নিঃশব্দে দেখল, ছেলেটা ঘুমুচ্ছে। মুখে-চোখে কেমন খুশি-খুশি ভাব। আর তার ময়লা পুরু হয়ে থাকা কালো ঠোঁটের চাপে শুয়োরের বাঁটটা তিরতির করে নড়ছে।



গুরুচণ্ডালী কথা

সেই দ্বিপ্রহরবেলা হইতে সমগ্র শহর এবং নিকটস্থ গ্রামগুলি এই নদীচরে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্থী, সারারাত্রিব্যাপী মেলা এবং প্রত্যুষে পুণ্যস্নান।

শহরটিকে মালার মতো জড়াইয়া যে বাঁধটি তৈয়ারি হইয়াছে, নদী হইতে তাহার দূরত্ব এখন প্রায় এক ক্রোশ। এই বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় কাশ এবং খড়ের জঙ্গলে শৃগাল ও খরগোশ নিরাপদে বিচরণ করিত যতদিন বর্ষার আগমন না হয়। এখন শীতকাল। শীর্ণকায় নদীর চেহারা দেখিয়া ইহার তাণ্ডব করিবার ক্ষমতা বোঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু স্রোতের তীব্রতায় বিদ্যুতের চমক আছে। এই বালুচরে প্রতি বৎসরের মতো আজও মেলা বসিয়াছে। অসংখ্য হ্যাজাক এবং লণ্ঠনের আলোয় চতুর্দিক দিনের মতো পরিষ্কার। অবশ্যই মেলার আশেপাশে যেখানে হ্যাজাকের আলো পৌঁছায় নাই সেখানে রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। বিরক্ত শৃগালেরা স্থানচ্যুত হইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া গলা খোলায় সেই রহস্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, ব্রাহ্মমুহূর্তে এই নদীর হিমশীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পাপস্খালন করিলে পরজন্মে মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষের আশা বড় মারাত্মক। যে জলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে তাহার অস্তিত্ব অনেকক্ষণ উপলব্ধি হয় না, আজ রাত্রিশেষে সেই জলে বেগুনটুলির বড় মাসি পটলদাসী পাপস্খালন করিবেন। ক্ষতের সন্ধান পাইলে যা হয়, মাছির

সংখ্যা গণনার ক্ষমতাকে দুয়ো দিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। আকাশে ঈষৎ মেঘ থাকায় তারাদের দেখা যাইতেছে না। এই অন্ধকারে দুই ব্যক্তি বাঁধের ওপর দিয়ে নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতে-করিতে আসিতেছিল। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, আলখাল্লা জাতীয় পোশাক, দীর্ঘ কেশ লাল ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ। তাহার সঙ্গী খর্বকায়, চর্বিযুক্ত এবং দেখিলেই বোঝা যায়, আরামপ্রিয় মানুষ। বাঁধটা বাঁক নিতেই তাহারা সম্মুখে মেলার আলোকরাশি দেখিতে পাইল। অনুচ্চ গলায় প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'মনে হয়, আজ যদি বিফল হও তাহলে তোমার মুখদর্শন করব না।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'গুরুদেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু যদি অপরাধ না নেন তো বলি, এত টাকার কী প্রয়োজন?'

গুরুদেব বলিল, 'গদাধর, পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিকল্প হল টাকা। ঈশ্বরের আশায় তিরিশ বছর কাটালুম, বদলে পেলুম তোমার মতো মূর্খ শিষ্য। তাই ঈশ্বরের বিকল্প যখন চাইছি তখন একটু বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করো!'

গদাধর করুণ গলায় বলিল, 'আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন তো?'

গুরুদেব বলিল, 'থাকব। তবে নিজের দোষে যদি বিপদে পড়ো তবে আমার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করো না।'

গদাধর মিনমিন করিল, 'পাপের ভয়ে বুকটা ধড়ফড় করে যে।'

গুরুদেব ধমক দিলেন, 'মূর্খ, ঈশ্বর এবং তার বিকল্প অন্বেষণে কোনও পাপ নেই। মন শক্ত করো।'

গদাধর কহিল, 'যথা আজ্ঞা।' তারপর জনস্রোতে নিজেকে মিশাইয়া দিল।

একদিনের উৎসব বলিয়া বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা নাই। তা ছাড়া এই অনুষ্ঠান ও মেলা আধা-অন্ধকারে ভালো খোলে বলিয়াই মানুষের ধারণা। গদাধর এই শহরে নবাগত, মেলায় তো বটেই। সে লক্ষ করিতেছিল তাহার আশেপাশে যাহারা হাঁটিতেছে সবাই পশ্চিমা শ্রেণির শ্রমিক সম্প্রদায়ের। ধর্মবিশ্বাস ইহাদের প্রবল। এই দরিদ্র মানুষগুলির টাকাকড়ি আত্মসাৎ করিবার সব রকম কৌশল গুরুদেব তাহাকে শিখাইয়াছেন। কিন্তু গদাধরের বাসনা মারিতে হইলে হাতি মারিবে, যদিও গুরুদেব বলিয়াছেন তাহাতে বিপদ বেশি।

বরং এইসব গরিবের ঘাড় মটকানো সহজ কাজ। কিন্তু সহজ কাজে তাহার প্রবৃত্তি নাই।

মেলায় আসিতে হইলে দীর্ঘ বালুকাপথ হাঁটিয়া আসিতে হয়। স্বভাবতই এই পথে আলো দেওয়া সম্ভব হয় নাই। লাল পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকাইয়া গদাধর জিনিসগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। এই প্রায়ান্ধকারে উহা প্রয়োগ করিলে কেমন হয়? কিন্তু মানুষজনের ব্যস্ততা এবং অন্ধকারে ইহার রূপ কেমন খুলিবে বুঝিতে না পারিয়া সে মেলার দিকে হাঁটিতে লাগিল। টায়ারের চটিতে বালি ঢুকিয়া যাইতেছে। উত্তরবঙ্গের জলকাদায় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তাহার পায়ে নব্য হাজার আগমন হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে বালি প্রবেশ করায় যন্ত্রণায় গদাধর ল্যাংচাইয়া হাঁটিতে লাগিল।

কাননবালার গান বাজিতেছে চোঙের গানে। একজন সুদেহী পুরুষ পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া সেই গানের তালে বালির ওপর নাচিয়া চানাচুর বিক্রি করিতেছে। কিছু গরিব রাজবংশি এবং বিহারি তাহাকে ঘিরিয়া আমোদ করিতেছে। জায়গাটায় ভিড় বেশি, গদাধর সরিয়া আসিল। চতুর্দিকে এখন বিভিন্ন জিনিসের দোকান। নিতান্ত সাধারণ জিনিসকে মেলায় কত আকর্ষণীয় বলিয়া বোধ হয়। বিশাল-বিশাল বপু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় নামগান করিতেছে।

মেলায় ঘুরিতে-ঘুরিতে গদাধরের ক্ষুধার উদ্রেক হইল। নদীর শরীর ছুঁইয়া এখন বাতাস বহিতে শুরু করিতেছে। ফলে শীত জব্বর বাড়িয়াছে। গদাধর তাহার লাল পাঞ্জাবির তলায় ছেঁড়া সোয়েটার এবং ওপরে র‍্যাপার চাপাইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে খাবারের দোকানের দিকে

চলিল। মাঝে-মাঝে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া মানুষজন তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। এই ঠান্ডায় সেইগুলিকে মাতৃস্নেহের চেয়ে মনোরম মনে হইতেছে।

গরম-গরম পুরি ভাজা হইতেছে দেখিয়া গদাধর দাঁড়াইয়া পড়িল। সারি-সারি খাবারের দোকান এই তল্লাটে। মানুষজন হা-ঘরের ন্যায় তাহা সাবাড় করিতেছে। গদাধর পকেটে হাত ঢুকাইয়া দুইটি আধুলির সন্ধান পাইল। অনেক ভাবিয়া দোকানিকে চারটি পুরি তরকারি দিতে বলিয়া সে আসনের দিকে তাকাইল। রাত এখন কত বোঝা যায় না। অথচ আজ এই রাত্রির মধ্যে এক হাজার টাকা তুলিতে হইবে। বিশ্বস্ত শিষ্যের ন্যায় সে গুরু-আদেশ পালন করিবে—দীক্ষার সময় এই অঙ্গীকার যখন করিয়াছে তখন আজও তাহার অন্যথা হইবে না।

গরম পুরি পেটে পড়িতে শীত কিঞ্চিৎ কমিল। গদাধরের ইচ্ছে হইল গুরুদেবকে ডাকিয়া দুই-চারিটা পুরি সেবা করায়—কিন্তু চতুর্দিকে নজর করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ তাহার নজব এক ব্যক্তির ওপর গিয়া পড়িল। দৈর্ঘ্যে মানুষটি গদাধরের সমান। তবে সামান্য কৃশ। আচার আচরণ দেখিয়া সেই সব লক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। গুরুদেব শিকারের যেসব বর্ণনা দিয়াছেন ইনি তাহার প্রথম পর্যায়ে পড়েন। গোবেচারার মতন এপাশ-ওপাশ চাহিয়া লোকটি গদাধরের পাশে দাঁড়াইয়া দোকানিকে শুধাইল, 'গরম-গরম দুটো নুচি ভাজ দিকিনি।' তারপর গদাধরকে প্রশ্ন করিল, 'হ্যাঁ মশাই, কেমন খাচ্ছেন?'

মুখভরতি খাবার থাকায় ঘাড় নাড়িয়া গদাধর খাদ্যের উৎকৃষ্টতা জানাইল। লোকটির বোধহয় মুখে জল আসিয়া গিয়াছিল দোকানিকে আর একবার তাড়া দিয়া বলিল, 'নুচি খেয়েছিলাম একবার কলকাতায়। বাগবাজারের নবীন ময়রার দোকানে, আহা!' তারপর পুরি তরকারি গলাধঃকরণ করিতে-করিতে বলিল, 'তা, মশায় কি মেলা ঘুরতে এসেছেন?'

গদাধর ঘাড় নাড়িল, 'হ্যাঁ।'

লোকটি বলিল, 'এমন কিছু মেলা নয়, বাংলাদেশের সব বড়-বড় মেলা আমি দেখেছি, এ তো নস্যি। তবে শুনছি সকালবেলায় এখানে নাকি একটা কেলো হবে—তাই আসা—হেঁ—হেঁ!'

গদাধর অবাক হইল, 'কী হবে?'

লোকটি বলিল, 'জানেন না দেখছি। আরে মশাই, এখানকার শহরে কে এক নামকরা বেবুশ্যে আছে—পটলদাসী না কি যেন—তিনি নদীর বুকে বসে তার পাপের কথা বলবেন, বুঝলেন?'

গদাধর ইহা জানিত না, শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিল।

লোকটি ফিসফিস করিল, 'তাই শুনে চলে এলাম। পটলদাসী যখন এসেছে তখন তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কি বাদ গেছে?' সন্ধে ইস্তক খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখন উত্তরদিকটা বাকি আছেন। জানেন নাকি?'

গদাধর ঘাড় নাড়িল। তাহার মাথায় ব্যাপারটি স্পষ্ট প্রবেশ করে নাই।

সে বলিল, 'নদীর বুকে বসে পাপের কথা বলবে কেন?'

লোকটি কিছু জবাব দেওয়ার পূর্বে দোকানি বেশ গর্বের সঙ্গে বলিল, 'কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে যদি কেউ পবিত্র হয়ে নিজের মন পরিষ্কার করতে পারে তবে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়।'

লোকটি বলিল, 'শুনলেন তো মশায়। জব্বর জমবে মনে হচ্ছে।' বলিয়া নিঃশব্দে শরীর নাচাইয়া হাসিতে লাগিল।

গদাধর গুরুদেবকে স্মরণ করিল। ইহার আচরণে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। লক্ষণগুলি হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। এই সব চালবাজ প্রমোদ-সন্ধানীরা উত্তম শিকার। পকেটে হাত ঢুকাইয়া গদাধর পয়সা বাহির করিল তারপর লোকটির আপত্তি সত্ত্বেও দুজনের খাবারের দাম মিটাইয়া দিল। লোকটি বলিল, 'হেঁ-হেঁ মশায়, আপনি আমাকে ঋণী করলেন। তা ভালোই হল, একা-একা

ভালো লাগছিল না, আপনার সঙ্গ পেলাম। চলুন এবার উত্তরদিকটা দেখা যাক।'

উত্তরদিকে জনসমাগম কম, মানুষজন দ্রুত হাঁটাচলা করিতেছে। একটি চুড়ির দোকানের সামনে শেষ হ্যাজাকের আলো জ্বলিতেছে। বাঁ-দিকে বেশ ঘন খড়ের জঙ্গল। শেয়ালদের ডাক মাঝে মাঝে অন্ধকারকে রহস্যময় করিয়া তুলিতেছে। বাঁ-দিকে একটা চালাঘর, সেখান হইতে প্রচণ্ড হরিনাম ভাসিয়া আসিতেছে। গদাধরেরা সেইদিকে চলিল। ওপরের চ্যাটাই-এর ছাউনি চারটি খুঁটির ওপর আচ্ছাদনের কাজ করিতেছে। তলায় অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে গোল হইয়া একদল রোগা-রোগা মানুষ খোল বাজাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া হরিনাম করিতেছে। হঠাৎ গদাধরের সঙ্গী তাহার কোমরে আঙুল দিয়া খোঁচাইল, 'আগুনের ডানদিকে নির্ঘাত পটলদাসী।'

সহসা গদাধরের নজরে পড়িল। লালপাড় গেরুয়া রঙের শাড়ি পড়িয়া একজন প্রৌঢ়া অগ্নিকুণ্ডেব পাশে টানটান হইয়া বাসিয়া আছেন। তাঁহার দুই হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে কোলের ওপর ন্যস্ত, চক্ষু মুদ্রিত, কপালে বৃহৎ সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করিতেছে। আগুনের লাল আভা তাহার গৌরাঙ্গে পড়িয়া কেমন হইয়া যাইতেছে। এই মুহূর্তে তাঁহাকে এই পৃথিবীর মানবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। যৌবন চলিয়া গেলেও সূর্যাস্তের পূর্বের রক্তাভাটুকু কি মায়ায শরীরের হিমঘরে রাখিয়াছে তাহা না দেখিলে বোঝা যায় না।

লোকটি বলিল, 'হেঁ-হেঁ মশায়, চাবুক দেখতে, যৌবনে কেমন টুসকি ছিল ভাবুন তো!'

গদাধর মাথা নাড়িল, সত্যি চক্ষু ফিরানো যায় না। তারপর কি মনে পড়িতে চট করিয়া চারধার দেখিয়া পকেটে হাত ঢুকাইল। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থরথর করিতেছে। গুরুর নির্দেশিত কর্মাদি করিতে-করিতে সে আবার সম্মুখপানে তাকাইল। সেই পবিত্র মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার হঠাৎ দুর্গা ঠাকুরের কথা মনে পড়িয়া গেল। পটলদাসী বুঝি রূপের নিরিখে দুর্গা ঠাকুরকেও টেক্কা দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া লোকটি বলিল, 'চলুন মশাই, বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ালে ধার্মিক হয়ে পড়ব!' তারপর পিছু ফিরিয়া দুই পা চলিতেই সে যেন প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন হইতে গদাধর লক্ষ করিল যে মাছ টোপ গিলিতেছে। লোকটি ঈষৎ ঝুঁকিয়া সেই দূরবর্তী হ্যাজাকের নিস্তেজ আলোয় উদ্‌গ্রীব হইয়া কিছু লক্ষ করিতে-করিতে হঠাৎ গদাধরের দিকে তাকাইল।

গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হল!'

কেমন ফ্যাসফেসে অথচ টালমাটাল গলায় লোকটি বলিল, 'দেখুন কী পড়ে আছে এখানে।'

গদাধর দ্রুত আগাইয়া বালির ওপর হইতে একটি চন্দ্রহার তুলিয়া লইল, 'আরে এ যে দেখছি সোনার হার! এখানে এল কী করে?'

লোকটি গদাধবের কাঁধের কাছে আসিয়া বলিল, 'সোনার তো?'

নিশ্চিত প্রত্যয় গদাধর হারটি দেখিতে দেখিতে বলিল, 'একশোবার সোনা। আমাকে সোনা চেনাতে আসবেন না! আমার বাবার বন্দকী কারবার ছিল। তা চার-পাঁচ ভরি হবে বটে। যার হারিয়েছে তার কি অবস্থা কে জানে! চলুন মেলা কমিটির কাছে জমা দিয়ে আসি।'

গদাধর হাঁটা শুরু করিতেই লোকটি তাহার হাত আঁকড়াইয়া ধরিল, 'আরে দাঁড়ান মশাই, এ হার কার বুঝতে পেরেছি।'

গদাধর তাহার দিকে অবাক হইয়া তাকাইতে সে ফিসফিস করিয়া বলিল, 'এ হার নির্ঘাত পটলদাসীর। ওই আখড়ায় যাওয়ার সময় এখানে কোমর থেকে পড়েছে। প্রচুর সোনাদানা নিয়ে এসেছে বোধ হয় তাই খেয়াল নেই। পাপের টাকা পুণ্যবানে পায় মশয়। তাই বলছিলাম, জমা দিলে তো পাঁচভূতে গাপ করে দেবে, তার চেয়ে আমি যখন প্রথম দেখেছি এই হারটা আমিই নিয়ে নিই।'

'হেঁ-হেঁ,' গদাধর বলিল, আপনি নেবেন মানে?'

লোকটা হঠাৎ কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিয়া উহা হইতে তিনটে একশত টাকার নোট লইয়া গদাধরের দিকে বাড়াইয়া দিল। গদাধর কিন্তু-কিন্তু করিয়া বলিল, 'চার-পাঁচ ভরি আছে, সোনার দম কত জানেন?'

লোকটি আর বাক্যময় না করিয়া আরও দুইশত টাকা যোগ করিয়া গদাধরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া হারটি প্রায় ছিনিয়া লইল, 'আমার গিন্নির মশয় চন্দ্রহারের খুব শখ। কিন্তু দিন-দিন কোমর বেড়ে যাওয়ায় গড়াতে পারছিলাম না, হেঁ-হেঁ। আপনি মশাই এই সবকথা কাউকে বলবেন না। বেশ্যার হার তো হাজার হোক।' লোকটি এক হাতে গদাধরকে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে গদাধরের শরীরে লক্ষ কদম্ব ফুল সুবাস ছড়াইতেছিল। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে নগদ পাঁচশো টাকা প্রাপ্তিতে তাহার হৃদয় ফুটবলের মতো নাচিতে লাগিল। হয়তো চাপ দিলে আরও কিছু আদায় হইত কিন্তু লোভই তো অনর্থের কারণ। এখন যত শীঘ্র এই লোকটির সঙ্গ ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল।

উত্তর দিকের খড়ের জঙ্গলের নিকটে আসিতেই মনে হইল অজস্র জোনাকি জ্বলিতেছে। কাছে আসিতে ভ্রম দূর হইল। কাহারও হাতে কুপি, কাহারও হাতে লণ্ঠন---বেগুনটুলির বাসিন্দারা মনোহর ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি বলিল, 'পেয়ে গেছি মশয়। আঃ, এরা ছাড়া মেলা জমে? হ্যারিকেনের আলোয় সেইসব রঙিন মুখগুলি তাহাদের দিকে গভীর প্রত্যাশা লইয়া তাকাইয়া আছে। লোকটি গদাধরের হাত ছাড়িতেছে না। পরিদর্শনরত কোনও সেনানায়কের মতো সে হাঁটিতে লাগিল। হঠাৎ গদাধরের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। একটি মেয়ের কপালের ওপর টুনি বাল্ব জ্বলিতেছে। কী করিয়া তাহা সম্ভব হইল, মাথার পিছনে বিরাট খোঁপার অন্তরালে কোনও ব্যাটারির অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু সেই বালবের আলো কপালে চুঁইয়া নাক মুখ বুকে আসা যাওয়া করিতে-করিতে জানাইয়া দিতেছে: ঈশ্বর ইহাকে মন দিয়া গড়িয়াছেন। লোকটি নির্ঘাত জহুরি, কাছে যাইয়া বলিল, 'কী নাম তোমার?'

ঈষৎ মোটা গলায় উত্তর হইল, 'পটল।'

লোকটি বলিল, 'সে কি! পটলদাসী তো এখানে নামগান করছে।'

মেয়েটি হাসিল, 'আজ রাতটার জন্যে আমরা সবাই পটলদাসী। আমি ভালো হরি-নাম করতে পারি, শুনবেন?'

'কত দিতে হবে?' লোকটি বলিল।

'দশ টাকা আর আমার ব্যাটারির খরচ দু'টাকা।'

লোকটি ইঙ্গিতে সায় দিতেই মেয়েটি পিছনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। গদাধর পিছাইয়া যাইতেই লোকটি তাহার হাত ধরিল, 'যাচ্ছেন কোথায়, উটি হবে না। আমি মশায় বিবাহিত লোক। একা থাকলে পাপ করে ফেলতে পারি, আপনিও চলুন, দুজনে একসঙ্গে তো পাপ হবে না। নামগান শুনব।' বলিয়া গদাধরকে টানিতে-টানিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। গদাধরের মনে হইল তাহার পকেটের পাঁচশত টাকার জলছাপ দেখিয়া লওয়া হয় নাই!

বেগুনটুলির বাসিন্দারা বাসা গাড়িতে দক্ষ। তাহা না হইলে এই খড়ের বনে বালুচরে বুদ্ধির এইরকম প্রয়োগ হইত না। একহাতে বালি খুঁড়িয়া তিন-চারিটি মানুষ শুইতে পারে এই রকম গর্ত করিয়া তাহার ওপর খড়ের ছাঁউনি দেওয়া হইয়াছে। বালির ওপর সতরঞ্চি পাতা। তাহার একাংশ ঈষৎ ভেজা। কিন্তু এই শীতের রাত্রে ভেতরের আবহাওয়া বেশ উষ্ণ, আরামপ্রদ। এককোণায় একটি ভাঙা কড়াইতে কাঠকয়লার আগুন মৌতাত ছড়াইতেছে। তাহারই আলোতে এক মায়াময় পরিবেশ তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। নিচু হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের মনে হইল, আর যাহা হউক শীতল বাতাসের হাত হইতে সাময়িক মুক্তি ঘটিল। কিন্তু এই অসভ্য পরিবেশ এবং এই লোকটির সঙ্গ ত্যাগ না করিতে পারিলে কপালে কী আছে তাহা বলা যায় না। হঠাৎ গদাধরের

কপালে সিক্ততা অনুভূত হওয়ায় সে হাত দিয়া দেখিল সেখানে ঘাম জমিতেছে—এই শীতেও।

মেয়েটি তাহাদের বসিতে বলিল। বসিবার জায়গা অবশ্যই কম, তবু লোকটির পাশে গদাধর জায়গা করিয়া লইল। পেছনের বালিতে ঠেস দিয়া মেয়েটি খোঁপা খুলিয়া ছোট ব্যাটারি এবং টুনি বালব খুলিয়া রাখিতে-রাখিতে বলিল, 'একটু খাওয়া-দাওয়া করবেন তো? ভালো জিনিস আছে।'

লোকটি বলিল, 'এখানে পাওয়া যাবে?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িতে সে গদাধরের দিকে ফিরিয়া হাসিল, 'সখী আমাদের দেখছি খুবই সংসারী। তা চলবে তো মশায়? ন. বললে শুনছিনে, হেঁ-হেঁ।' মেয়েটি ততক্ষণে কড়াই-এর পাশে বালি সরাইয়া একটি বোতল বাহির করিয়াছে। তারপর ক্লিপ দিয়া তাহার কর্ক খুলিয়া এক ঢোঁক গিলিয়া লোকটির দিকে বাড়াইয়া দিল। মেয়েটির হাবভাব কথাবার্তা দেখিয়া গদাধরের সন্দেহ হইতেছিল সে এই তল্লাটের নয়। উত্তরবঙ্গে এত চালাকচতুর কথাবার্তায় এত মার্জিত মেয়ে এই লাইনে থাকিবে ভাবা যায় না। গেলাস নাই, তাহার প্রয়োজনও বোধ হয় নাই।

লোকটি ঢকঢক করে সরাসরি গলায় ঢালিয়া প্রশ্ন করিল, 'নাম তো বললে না, দেশ কোথায়?'

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল, 'কলকাতায়।'

চোখ বড় করিয়া লোকটি তাহাকে দেখিল, 'এখানে এলে কী করতে?'

'চলে এলাম, পটলদির সঙ্গে যোগাযোগ হল।' গদাধর লক্ষ করিল কথা বলিতে-বলিতে মেয়েটি বুকের আঁচল কোলের ওপর আনিয়া ফেলিয়াছে।

লোকটি বলিল, 'তাই বলো বুঝলেন মশয়, কলকাতায় খুব সুন্দরী-সুন্দরী মেয়েছেলে পাওয়া যায়।' মেয়েটি হাসিয়া উঠিল।

গুরুদেবের কাছে মাঝে-মধ্যে কারণবারি প্রসাদ পাইয়াছে গদাধর, কিন্তু কোনও নারীর সামনে বসিয়া মদ্যপান এই প্রথম। উৎকট গন্ধ এবং তীব্র জ্বালা তাহাকে এই মদ সম্বন্ধে নিরাসক্ত করিয়া তুলিল। এক ঢোকের পর আর খাইবার স্পৃহা রহিল না। তা ছাড়া তাহার মস্তকে আরও পাঁচশত টাকা উপার্জনের চিন্তা বাদুড়ের মতো ঝুলিয়া ছিল। খুব অল্পসময়ের মধ্যে লোকটির চিন্তাশক্তি লোপ পাইল। জড়ানো গলায় সে বারবার মেয়েটিকে নামগান করিতে বলিতেছে। মেয়েটি সযত্নে শাড়ি ভাঁজ করিয়া একপাশে রাখিয়া গদাধরের দিকে তাকাইল, 'বেশিক্ষণ লাগবে না, দশ মিনিটের জন্যে ঘুরে আসুন না।'

তড়িৎস্পর্শ পাইয়া গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইতে লোকটি এক হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেল, 'না, না, যাবে না। আমরা তিনজনে নামগান করব। আমি বিবাহিত লোক, একা থাকলে—'

শেষের দিকের কথা জড়াইয়া যাইতে মেয়েটি তাহার হাত নিজের দিকে টানিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ঠিক আছে, এসো নামগান করি।' গদাধর বাহির হইয়া আসিল।

যদিও এখন রাত গভীর তবু মেলার অপর অংশ হইতে মানুষজনের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছে। বেগুনটুলির বাসিন্দাদের পাশ কাটাইয়া আসিতে-আসিতে গদাধরের কান লাল হইয়া গেল। উপোসী ছারপোকাদের মতো তাহারা বাক্যবাণে তাহাকে ঠুকরাইতেছিল। দ্রুত পা চালাইয়া গদাধর ভাবিল গুরুদেব যদি এই তল্লাটে তাহাকে দেখেন তবে রক্ষা নাই। আর যাহা হউক, মেয়েছেলের প্রতি আসক্তি তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। পাশেই পটলদাসীর ছাউনি হইতে কীর্তনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। রাত গভীর হওয়ায় স্বভাবতই গলার স্বর কিঞ্চিৎ দুর্বল। ওখানে গিয়া বসিয়া পড়িলে রাতটুকু উষ্ণতার মধ্যে কাবার হইতে পারে। কিন্তু আরও অর্থের দরকার। অর্ধপথে যাত্রাত্যাগ মূর্খতার সামিল।

হঠাৎ পেছনে ছায়ার মতো কিছু নড়িতে দেখিয়া গদাধর চমকাইয়া উঠিল। চমক খাইলে হৃদ্‌পিণ্ড বুকের মধ্যে লাফ দিয়া ওঠে, সামলানো দায় হয়। স্থির হইলে গদাধর গুরুদেবের দর্শন পাইল। তিনি প্রসন্নমুখে হাসিতেছেন। যদিও তাহার সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত, শুধু নাক চোখ উন্মুক্ত, তবু হাসি মায়াময়তা বোঝা কঠিন নয়। গুরুদেব বলিলেন, 'না গদু, তোমাকে আর মূর্খ বলা চলে না। কত বাগালে?'

গদাধর মাথা নিচু করিয়া বলিল, 'পাঁচশো।'

'চাপ দিলে আরও আসত। থাক, বেশি লোভে কাজ নেই। তা মেয়েছেলেটাকে কিছু দিয়ে আসনি তো?' গুরুদেব প্রশ্ন করিলেন।

ঘাড় নাড়িয়া গদাধর অপরাধীর গলায় বলিল, 'গুরুদেব!'

গুরুদেব আবার সেই মায়াময় হাসি হাসিলেন, 'বৎস গদু, ঈশ্বরের বিকল্প খুঁজতে এসে পথ নিয়ে চিন্তা করো না। তবে ওই মেয়েছেলেটা বেশ খেলুড়ে। সঙ্কোচ রেখো না, টাকার গায়ে কখনও নোংরা লাগে না। তা মালগুলো তোমার কাছে রাখা ঠিক হবে না, আমায় দিয়ে দাও।'

গ্লানিমুক্ত গদাধর উৎফুল্লচিত্তে পকেটে হাত দিতেই তিন-চারিটি নারীকণ্ঠে সোডা ওয়াটারের ফুৎকার শব্দ শোনা গেল। গদাধর দেখিল বেগুনটুলির বাসিন্দাদের কয়েকজন তাদের গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, পার্শ্ববর্তী জঙ্গল ও অন্ধকারে ইহাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় নাই। একটি জড়িত নারীকণ্ঠ কহিল, 'আ যাও প্যারে, এইসা রাত ফির না আউঙ্গে।'

গুরুদেব বলিলেন, 'গদু, টাকাটা বের করো না। এরা শয়তানী। তুমি বরং পটলের কাছে যাও। ওখানে ভিড় আছে, ভিড়ে যাও। সন্ধানী মন কখনও বিফল হয় না। আমি নিকটেই আছি। যাও!' শেষের দিকে গলাটি খুব দ্রুত চলিল। ফলে গদাধর আর অপেক্ষা না করিয়া পটলদাসীর ডেরার দিকে চলিল। চলিতে-চলিতে সে গুরুদেবের আর একবার দর্শন পাইবার জন্যে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। তবে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে দুইজন বেগুনটুলিনীর সঙ্গে লম্বা যে দেহটি ঢুকিয়া যাইতেছিল তাহাকে—না, মন বড় অপবিত্র হইয়া যাইতেছে—গদাধর ভাবিল। ঠিক সেই সময় শৃগালেরা উল্লসিত চিৎকার শুরু করিল।

পকেটে অর্থ থাকিলে মন বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, গদাধর কীর্তনে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশের মানুষেরা খোল-করতালের সঙ্গে শীর্ণ কণ্ঠে মিলাইতেছে। গদাধর এক প্রান্তে বসিয়া পটলদাসীকে লক্ষ করিল। দুর্গা প্রতিমার মতো চেহারা। কী মহিমা। আহা! পটলদাসীর চোখ তাহার ওপর পড়িতে গদাধর নজর ঘোরাইল। এতক্ষণ লক্ষ করে নাই, ডেরার পেছনেই নদী। তাহার তীরে বসিয়া এই রাতে কাহারা কলাগাছের পেটোয় প্রদীপ ভাসাইয়া দিতেছে। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবী হইতে স্বর্গের দুয়ার পর্যন্ত এই সকল প্রদীপ যেন কোনও বার্তা বহিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহারা প্রবেশ অধিকার পাইয়াছে কিনা বোঝা যাইতেছে না। কারণ, ঢেউগুলির গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা প্রবল। সম্মুখস্থ মানুষজনের মধ্যে মালদার কে আছে ঠাওর করিতে-করিতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। কীর্তনের সুর উচ্চগ্রামে উঠিল। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল হইতে বেগুনটুলিনীরা পটলদাসীর ডেরায় আসিতে লাগিল। যাহারা একা ছিল তাহারা তো বটেই, সঙ্গসুখ ত্যাগ করিয়া অন্যেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উপস্থিত হইলে কীর্তন থামিল, পটলদাসী একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শরীর হইতে আরও মহিমা বাহির হইতে লাগিল। সম্মুখস্থ বেগুনটুলিনীদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি ছোট্ট ভাষণ দিলেন, 'এবার আমি চানে চললাম। তোরা এবার যা খুশি কর, আমি বাধা দেবুনি। যে যত টাকা ধারিস সব ফিরি করে দিলাম। একটা কথা বলি, খপরদার পুরুষজাতটাকে রেয়াৎ

করবিনি, শালারা হারামি।' কথাগুলি বলে তৃপ্তমুখে পটলদাসী বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকে বোল উঠিল। চতুর্দিকে হইচই পড়িয়া গেল। একটি কুলায় অনেক রকম প্রদীপ এবং ধান দূর্বা ফুল লইয়া একজন সামনে আসিল। ডেরার পাশে রাখা পালকিতে পটলদাসী উঠিয়া বসিলে বাহকেরা তাহা তুলিয়া ধরিল। কুলোধারীর পিছন-পিছন পালকি চলিতে লাগিল। পালকির পিছনে যাবতীয় বেগুনটুলিনীগণ এবং দর্শক। পথ যত নদীর সন্নিকটস্থ হইল দর্শক তত বাড়িতে-বাড়িতে গণনার সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেল। গদাধর দেখিল আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। শুধু শুকতারার আভায় উত্তরাংশ দপদপ করিতেছে।

নদীর তীরে আসিয়া পালকি থামিল তবে মাটিতে নামিল না। কিছু রমনী কলার পেটোয় প্রদীপ ভাসাইয়া দিল। উহারা মালার মতো ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একজন প্রবলবেগে শঙ্খ বাজাইলে শীর্ণকায় এক পুরোহিত পালকির দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পটলদাসী বলিলেন, 'বাবা, সব ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

পুরোহিত কহিল, 'হ্যাঁ মা। ঊষা হতে আর বিলম্ব নে। ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানই বিধেয়। তবে একটা কথা জিগ্যেস করছি ধর্মের কারণে, আপনার পাপের বোঝাটা কীরকম?'

বিস্মিত পটলদাসী বলিলেন, 'কেন?'

পুরোহিত বলিল, 'শাস্ত্রে আছে অল্প পাপে অল্প স্নান, বেশি পাপে—।'

বাধা দিয়ে পটলদাসী বলিলেন, 'পায়ের নোক থেকে মাথার চুল অবধি ডুবে আছি বাবা।'

পুরোহিত বলিল, তাহলে মা আপনাকে একশো আটবার ডুব দিতে হবে।'

পটলদাসী নামিলেন। তাঁহার স্নান দেখিবার জন্যে শতশত মানুষ হাঁ করিয়া আছে। বিনা পয়সার ফিস্টি লাগিয়া গিয়াছে যেন, গদাধর ভাবিল, একটু ঢাকিয়া ঢুকিয়া স্নানটা হইলে ভালো হয় না?

পুরোহিত বলিল, 'মা, আজ অবধি যত পাপ করেছেন তার বোঝা একটু পরে হালকা হয়ে যাবে। একশো আটবার স্নান এবং তৎসহ দান ও যজ্ঞের পর স্বর্গের দরজা আপনার জন্যে খুলে যাবে। আর দেরি নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুহূর্ত আসবে, সূর্যদেব উঠবেন। আপনি জলের ধারে দাঁড়ান।'

পটলদাসী জলের ধারে আসিয়া পা ছোঁয়াইলেন, 'উঃ কী ঠান্ডা! পারব তো ঠাকুরমশায়!'

কুলায় প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহা পটলদাসীর সামনে ধরিয়া পুরোহিত বলিল, 'পারতেই হবে মা। তবেই আপনার অতীত এখন ধুয়ে মুছে সাফ হবে। এখন থেকে আপনি অন্য মানুষ। লোকে আপনাকে দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবে। খেয়াল রাখবেন আর যেন কোনওদিন পাপ না করেন। তাহলে সব নষ্ট।'

হাঁ হইয়া তাকাইলেন পটলদাসী, 'কী বলেন বাবা, আর পাপ করিতে পারবুনি?'

পুরোহিত ঘাড় নাড়িল, 'না।'

'সেকি!' প্রায় ডুকরাইয়া উঠিলেন পটলদাসী, 'তাহলে বাঁচব কী করে? অম্বল হয়ে যাবে যে!' সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত দর্শকমণ্ডলী প্রবলবেগে হাসিয়া উঠিল। পটলদাসী কহিলেন, 'যা পাপ করেছি তা আজ ধুয়ে দাও বাবা, আর প্রতি বছর যা পাপ করব প্রতি বছর নতুন করে ধুয়ে দিও, হবে না?'

পুরোহিত সবেগে ঘাড় নাড়িল, 'ওতে স্বর্গবাস হবে না। যে পুজোয় যা নিয়ম। আজকের স্নানের পরে আপনি আর কোনওদিন পাপ করতে পারবেন না, জেনে রাখুন।'

মাথা নিচু করিয়া পটলদাসী কী ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'বেশ আর পাপ করবুনি। তবে আজ শেষবার পাপ করে নিই, অনেক দিনের অভ্যেস তো! আর পাপ যখন করতেই পারবুনি তখন সাধটা মিটিয়ে ফেলি।' কথাটা বলিয়া ধীর পায়ে সামনে আগাইয়া আসিলেন। এখন তাঁহার

সম্মুখে বেশ কিছুটা জায়গা উন্মুক্ত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে গোল হইয়া মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সূর্যদেবের উঠিতে একটু বিলম্ব আছে।

পুরোহিত বলিল, 'মা, আর পাপের দরকার কী? এবার স্নানের জন্যে প্রস্তুত হন।'

পটলদাসী কহিলেন, 'জিভে এখনও নোলা লেগে আছে বাবা, শেষতক বাকি জীবন হেঁচকি তুলে মরব! তা হয় না। কিন্তু কী পাপ করি তাই ভাবছি।' চিন্তান্বিত চিত্তে পটলদাসী আরও দুই পা অগ্রসর হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিলেন। পাপ করিবার জন্যে তাঁহার সমস্ত সত্তা উদ্বেলিত। দুই হাত বুকের কাছে জোড়া করিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সারা জীবন যে পাপ করেছি তা তো এ বয়সে সম্ভব নয়। মিছে কথা বলেও ছাই সুখ হয় না। সোনাদানা টাকাকড়ি দিয়ে আর কী হবে—সে সব তো প্রচুর দেখলাম। কাউকে যে খুন করব সেটাও আর ইচ্ছে হয় না, এখন কাউকে ক্ষমা করে দিলে মনটা কেমন যেন ভালো হয়ে যায়। মরণদশা আমার।' এইমতো ভাবিতে-ভাবিতে পটলদাসী নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন। কত রজনী নিদ্রাহারা লালসার মধ্যে কাটানো শরীরটার আজ সামান্য কোনও ক্ষমতা নেই। আবছায়া আকাশটাকে ছাতির মতো মাথায় ধরিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। তাহার কোনও খামতি নেই, চিরকাল হাতে কুপি জ্বলিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

পুরোহিত কহিল, 'মা আর দেরি নেই, প্রস্তুত হন।'

শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, বেগুনটুলিনীরা উলুধ্বনি দিল, কে যেন সঙ্গে-সঙ্গে কাঁসরঘণ্টা বাজাইয়া দিল। হাত নাড়িয়া পটলদাসী তাহাদের থামাইয়া দিলেন। তারপর সমবেত জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া পিঠ হইতে কাপড় টানিয়া মাথায় ঘোমটা দিলেন। তারপর দুই হাত যুক্ত করিয়া সামান্য উচ্চস্বরে কথা আরম্ভ করিলেন, 'আমার নাম পটলদাসী। আমি ভগবানের কাছে নিজেকে ধুয়ে ফেলে শুদ্ধ হয়ে যাব চিরকালের জন্যে। কিন্তু মনে বড় সাধ শেষবার পাপ করে যাই, আর কখনও যখন করতে পারবুনি—' গলা ধরিয়া আসিল পটলদাসীর। কোথাও কোনও গোলযোগ নাই, সবাই বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করিয়া তাঁহার কথা গিলিতেছে, 'তাই বলছিলাম, আমি তো ভেবে পেলামনি, তা আপনারা যদি দয়া করে পাপের হদিশ বলে দেন তো বড় উপকার হয়।' কিছুক্ষণের জন্য যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া গেল, শুধু দূরবর্তী মাইকের আওয়াজ এবং নদীর কলতান কান বধির করিয়া তুলিল। তারপরই সমবেত জনসাধারণ গুঞ্জন করিয়া উঠিল। এ ধরনের প্রস্তাব যে আসিতে পারে তাহা স্বপ্নের অগোচরে ছিল। যে সমস্ত বয়স্ক মানুষ এককালে বেগুনটুলীর আশেপাশে ঘুরঘুর করিতেন পটলদাসীর ছায়া দেখিবার জন্য অথচ সমাজের ভয়ে ভিতরে ঢুকিতে সাহস পাইতেন না, এই মুহূর্তে মুখাভ্যন্তরে জিহ্বা সঞ্চালন করিতে গিয়া আবিষ্কার করিলেন তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। গদাধর দেখিল সবাই উসখুস করিতেছে। কেহ-কেহ পটলদাসীর দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। এখন এই বয়েসে, সূর্য অস্ত যাইবার পর পশ্চিমাকাশে যে রক্তাভাটুকু কয়েক মুহূর্তের জন্য রাখিয়া যায়, পটলদাসীর অঙ্গে-অঙ্গে তাহার বিচ্ছুরণ ক্ষণিকের জন্যও মোহ ধরাইতে পারে। হঠাৎ গদাধর লক্ষ করিল, গুরুদেব তাহার পিছনে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া আছেন। গদাধরের চিত্তে আনন্দ হইল। তাহার ইচ্ছা হইল গুরুদেবকে গিয়া বলে, তিনি তো সবই জানেন, তাই পটলদাসীকে একটা পথ বাতলাইয়া দেন। বেচারি চাতকের মতো চাহিয়া আছে। পরমুহূর্তেই তাহার স্মরণ হইল গুরুদেব উমেদারী একদম পছন্দ করেন না।

পটলদাসী করুণ কণ্ঠে কহিল, 'কই কিছু বলুন! মায়ার বাঁধন ছেঁড়ার আগে শেষবার—আচ্ছা আমি বললাম, যে আমাকে পাপের রাস্তা শেষবার দেখাতে পারবে তাকে পুরস্কার দেব। এই ধরুন, একশো টাকা।' গুঞ্জন বাড়িয়া গেল, কিন্তু কেহ আগুয়ান হইল না। এই ধরনের পুরস্কারের কথা কেউ কখনও শোনে নাই। কিন্তু ভিড় জমাট রহিল।

গদাধর শুনিল পার্শ্ববর্তী এক প্রৌঢ় তাঁহার সঙ্গীকে নিম্নস্বরে কহিতেছে, 'যা বাব্বা, আগে

পটলের কাছে গেলে পয়সায় টান পড়ত এখন ওই উলটে টাকা দিতে চাইছে!' সঙ্গী কী কহিল শোনা গেল না।

পটলদাসী একটু উষ্ণ গলায় কহিলেন, 'কী আশ্চর্য, সাহায্য করতে না পারলে সং-এর মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ঠিক আছে, পাঁচশো টাকা দিয়ে দেব। ক্ষেন্তি, তোর কাছে আমার যে টাকা আছে তা থেকে পাঁচশো আলাদা কর।' পার্শ্ববর্তী এক বর্ষীয়সী বেগুনটুলিনী ঘাড় দোলাইল।

সঙ্গে-সঙ্গে চারধারে সাড়া পড়িয়া গেল। পাপের পথ দেখাইলে পাঁচশো টাকা নগদা-নগদি। গদাধর অবাক হইয়া দেখিল ভিড় হঠাৎ পাতলা হইয়া যাইতেছে। মানুষজন যেন আশঙ্কা করিতেছে পটলদাসী টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের হঠাৎ শেষ পাপের সঙ্গী করিয়া লইতে পারে! গদাধরের হাত নিশপিশ করিতে লাগিল। গুরুদেবের নির্দেশমতো হাজার টাকার অর্ধেক তাহার পকেটে, বাকিটা যখন পটলদাসীর মন ভেজাইলে পাওয়া যায় তখন তাহা ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতার সামিল, কিন্তু কোনও পাপই সে—হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল গুরুদেব কেটে পড়া মানুষের সঙ্গ লইতেছেন। তৎক্ষণাৎ সে গুরুদেবের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল, 'গুরুদেব যাচ্ছেন কোথায়, এ সুযোগ ছাড়বেন না!'

বিহ্বল গুরুদেব বলিলেন, 'আঃ গদু, হাত ছাড়।'

উত্তেজিত গলায় গদাধর বলিল, 'আপনি চলুন, আপনি ত্রিকালজ্ঞ, সামান্য জ্ঞান দিলেই পাঁচশো টাকা চলে আসবে। আমার হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। দয়া করুন।' এই বলিয়া পাগলের মতো তাহাকে টানিতে লাগিল। গুরুদেব বিরক্ত, কুপিত এবং সব কিছু হইয়াও হাত ছাড়াইতে পারিলেন না।

গদাধরের শরীরে যেন লক্ষ হাতির শক্তি, মুখে এক বুলি, 'আর কেউ না পারুক আপনি পারবেন, গুরুদেব।'

সমবেত সজ্জনের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য উপস্থিত হইল। ঈষৎ মোটা এক ব্যক্তি লাল আলখাল্লা এবং দাড়িযুক্ত এবং এক ব্যক্তিকে হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। মেয়েছেলে এবং বোঝাই যায় দাড়িওয়ালা ব্যক্তি সন্ন্যাসী—দুই-এর সম্মিলন বড়ই উপাদেয়।

পটলদাসীর সম্মুখে গিয়া বুক ফুলাইয়া গদাধর বলিল, 'নিন, এই হলেন আমার গুরুদেব। আপনার পাপের পথ ইনি বলে দেবেন। কারণ ইনি ত্রিকালজ্ঞ।'

পটলদাসী সম্মুখে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিভরে মাথা নিচু করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি বড় হতভাগী, আমাকে দয়া করুন।'

গুরুদেব তখনও হাঁপাইতেছিলেন, চতুর্দিকে নজর করিয়া বুঝিলেন পালাইবার পথ নাই। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিলেন, 'গদু!'

গদাধর জবাব দিল, 'বলুন গুরুদেব।'

পটলদাসী হঠাৎ আপ্লুত হইয়া গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, 'বাবা দয়া করুন আমাকে।'

গুরুদেব কহিলেন, 'আমি চলিলাম।'

তাঁহার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমকাইয়া পটলদাসী মুখ তুলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা তুমি!' গদাধর দেখিল গুরুদেবের মুখ ন্যাপথলিনের মতো সাদা হইয়া গেল।

ততক্ষণে পটলদাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, 'তাই বলো, মুখ চোখ এমন জঙ্গল করে রেখেছ চিনব কি।'

গুরুদেব ফ্যাসফেসে গলায় কহিলেন, 'কী বলছেন?'

কোমরে হাত দিয়ে পটলদাসী চোখ ঘুরাইলেন, 'কী বলছি? আলখাল্লা তোলো, দেখি তোমার

হাঁটুর ওপরে সেই কাটা দাগ আছে কিনা!' সঙ্গে-সঙ্গে গুরুদেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পটলদাসী নাছোড়বান্দা, তাঁহার ইঙ্গিতে একজন আসিয়া গুরুদেবের আলখাল্লা তুলিয়া ধরিতে দুইটি শীর্ণ লোমশ পায়ের ওপরের একটিতে কাটা দাগ দেখা গেল।

হঠাৎ পটলদাসী বালিকার ন্যায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 'ভগবান আছেন গো, ভগবান আছেন। সেই যৌবনকাল থেকে তোমাকে খুঁজছি। না, আর ভণ্ডামি করো না। আবার সন্ন্যেসী হয়েছেন। মনে নেই, তেরাত্তির কাটিয়ে দশ টাকা কম দিয়ে কেটে পড়েছিলে?'

গুরুদেব চাপা গলায় কহিলেন, 'আঃ পটু!'

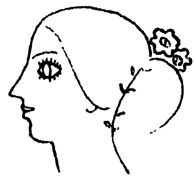
পটলদাসী উগ্র মূর্তি ধরিলেন, 'কী! আবার চোপা হচ্ছে। আমার শরীরটাকে শেষ করেছিল কে? কে আমাকে প্রথম রোগ ধরিয়ে বাঁজা করে পালিয়েছিল? থুঃ থুঃ থুঃ!' মাথা ঝাঁকাইয়া প্রবলবেগে গুরুদেবের দাড়িতে একরাশ সাদা থুথু ছিটাইয়া দিলেন পটলদাসী, তারপর ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'আমাকে মা হতে দিলে না গো এই ঘেয়োটা—।'

সমস্ত মেলা যেন বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে। গুরুদেবের শরীরে যেন রক্ত নাই। হঠাৎ যেন বামনের মতো ক্ষুদ্র দেখাইতেছে তাঁহাকে। গদাধরের মনে হইল তাহার চারধারে, মাথায় যে উষ্ণ দেওয়াল ও ছাদ ছিল তাহা খসিয়া গিয়া শীতের হিম বাতাস আসিয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ পটলদাসী চুপ করিয়া গেলেন। তারপর মাথায় কাপড় দিয়া কহিলেন, 'আর সময় নেই। শেষ পাপটা করে নিই তাহলে।' সমস্ত মেলাকে অবাক করিয়া দিয়া পটলদাসী তারপর সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম শেষ করিয়া কোনওদিকে না চাহিয়া নদীর দিকে চলিতে-চলিতে বলিলেন, 'পুরুতমশাই এবার মন্ত্র পড়ুন, আমার সাধও মিটেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে চারধারের ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাঁসি এবং উলুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত সবেগে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। পূর্বাকাশে সূর্যদেব উদিত হইতে লাগিলেন। পটলদাসীর স্নান শুরু হইল।

ভিড় হইতে নিঃশব্দে গদাধর নিজের অজান্তে নদীর ধারে চলিয়া আসিয়াছিল। এখন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে সে পায়ে-পায়ে এই হিমবরফ জলে নামিয়া পড়িল। তাহার শরীরে কোনও সাড় নাই। পটলদাসী হইতে খানিক দূরে অঙ্গ ডুবাইয়া স্নান করিতে গিয়া মনে হইল, তাহার পকেটস্থ টাকার জলছাপে জল লাগিতেছে। আর দেখিবার প্রয়োজন নাই।



বেঁচে থাকা

ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের সামনে অবনীভূষণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আশেপাশের দোকানগুলো বন্ধ হচ্ছে। যে দোকানটায় ও তড়কা রুটি খায় সেটা ঝাপ টেনে দিচ্ছে, চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর পা তুলে শোয়ানো। অতএব আজ রাত্রে খাওয়া হল না। অবনীভূষণ অবশ্য খাওয়ার জন্যে তেমন কোনও কিছু বোধ করছিল না। একটু আগেই শেষ বাসটা গড়িয়াহাটার দিকে গেছে। সেটা থেকেই নামল অবনী।

বসন্ত রায় রোড এখন চুপচাপ। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল অবনী। আর একটা দিন কাটল। কলেজ স্ট্রিট থেকে রাত দশটায় বেরিয়ে হেঁটে নন্দন রোড। তারপর এই শেষ বাস-এর ভিড়ে মিলেমিশে আসায় একটাও পয়সা খরচ হল না। অবশ্য দশ পয়সার রিস্ক ছিল। ওটা নিতেই

হয়। কাঁহাতক আর হাঁটা যায়। রাসবিহারীর মোড় থেকে এই তিনটে স্টপেজ অবশ্যই ফাউ।

আর একটা দিন কাটল, অথচ কিছুই হল না। পরমেশটার কথা বুলি হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। লাইনে নামডাক আছে। মোটরসাইকেলটা কভার করেছে সম্প্রতি। আজকের অপারেশনে পরমেশ ওকে এড়িয়ে গেল। ঠিক হ্যায়। অবনী চারমিনারটা ছুঁড়ে ফেলল। এই সময় ও কুকুরগুলোর ডাক শুনতে পেল। ক-শো কুকুর আছে এ-পাড়ায়? শালারা রোজ রাত্রে ওকে দ্যাখে, অথচ। অবনীর চারপাশে কোনও লোকজন নেই অথচ সম্মিলিত সারমেয় চিৎকার ওকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করল। এ-পাড়ায় কোনও নেড়ি কুত্তা নেই। দামি কুকুরগুলো যারা চিৎকার করছে তারা কেউ রাস্তায় বেরুবে না। কিন্তু অরুণদার কাছে রিপোর্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখানকার আস্তানা থাউজেন্ড ভোল্ট হয়ে যাবে। প্রথমদিন অরুণদা বলেছিল, 'এখানে আসতে চাও; আমার আপত্তি নেই। আমার অফিস দশটা টু আটটা। এই টাইমটা অ্যাভয়েড করবে। আর ওপরের ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা যেন কোনও কমপ্লেন না করে।' বাংলায় এম এ দেওয়ার পর অরুণদার সঙ্গে আলাপ। তখন দু-একটা গল্প লিখত অবনী। আর অরুণদা একটা কাগজ করত। ব্যাস। অরুণদার এই অফিসটা শালা মিঃ আইচ-এর টাকায় চলে। কালচারাল ব্যাপার সব। মারো গাড়ু। অরুণদা অবশ্য ওকে স্নেহ-টেহ করে। এম এ-র পর তিনটে বছর ফিউজ হয়ে গেল। অরুণদা কি চেষ্টা করলে একটা চাকরি দিতে পারত না? আজ দেড়মাস এখানে আছে, অরুণদার সঙ্গে দেখাই হয় না। অবশ্য এখন আর চাকরির জন্যে ওর কোনও নোলা নেই। কারণ বয়েসটা থাউজেন্ড হর্স পাওয়ার নিয়ে ছুটছে। এজ লিমিট বার।

অরুণদার অফিসের সামনে ছোট্ট বাগান। লম্বা লোহার গেট। ওপর বাড়িওয়ালার ফ্ল্যাট। অবনী দেখল গেট বন্ধ। দশটায় তালা পড়ে। একবার চারপাশে চোখ বোলালো ও, কোনও মানুষ বা রাউন্ডের পুলিশের মুখ দেখতে পেল না। খাঁজে-খাঁজে পা রেখে ও লোহার গেটটার ওপর উঠতেই বাড়িওয়ালার কুকুরটা হাউমাউ করে উঠল। অবনী ধীরেসুস্থে নেমে বাগানটা পেরিয়ে অরুণদার দেওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অফিসের দরজা খুলল। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির আলো নেবানো। এ-পাড়ার লোকগুলো তাড়াতাড়ি বিছানায় যায়, আর তিন প্রহর রাত্রে যারা ফেরে তাদের গাড়ি আছে।

বিরাট হলঘর। দেওয়ালে দামি-দামি ছবি। এসব ছবির মানে বুঝতে পারে কী করে লোকে অবনীর বোধগম্য হয় না। ডিম লাইটটা জ্বালালো ও। অনেকগুলো ঘর। সব ঘরেই ছবি, ম্যাগাজিন। অবনী জামাপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে গেল। সারাদিন ধরে হাঁটাহাঁটি। গেঞ্জি আন্ডারওয়ারে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে। দারুন বাথরুম। মোজায়েক করা, শাওয়ার বাথটব সব আছে। অবনী বিবস্ত্র হয়ে শাওয়ার খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অরুণদার মার্গো সোপ দিয়ে গেঞ্জি আন্ডারওয়ার কাচতে শুরু করল।

এখন রাত একটা। মেঝেতে শব্দ হচ্ছে গেঞ্জি কাচার। সাবানটায় ভালো ফেনা হয় না। শব্দটা একটু আস্তে-আস্তে করার চেষ্টা করল সে। দারুণ ফোর্সে শাওয়ার থেকে জল পড়ে। আগে যে মেসটায় ছিল সে সেখানে কল দিয়ে বাচ্চা ছেলের পেচ্ছাপের থেকেও সরু জল পড়ত। বড়লোকদের কেতাই আলাদা।

স্নানটান সেরে অফিসঘরে এসে দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে স্টোররুমের কোণায় গোঁজা বিছানাটা নিয়ে এসে ভালো করে পাতল। এখন একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে। অবনী আর একটা চারমিনার ধরাল। ধরিয়ে অরুণদার বসার ঘরটায় ঢুকল। দারুণ সাজানো। এই ঘরটা রাস্তার দিকে। কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢোকে। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা চিরকুট। অবনী পড়ল, 'টেলিফোনটা অফিসের জন্যে।' তার মানে? এটা কি অবনীকে উদ্দেশ্য করে? কী বলতে চায় অরুণদা? শালা ফরেন মানি নিয়ে অফিস, তার ফুটুনি। খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠল অবনী।

একবার ভাবল অরুণদার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে, এভাবে ইনসাল্ট করার কারণটা কী? ও রিসিভার তুলে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে ওপাশে। কেউ ধরছে না। এখন রাত ক'টা? দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল অবনী, একটা কুড়ি। নিশ্চয়ই অরুণদা ঘুমোচ্ছে। ওর বউটা যা মুটকি। রিং হচ্ছে। অবনী চারমিনার টানতে-টানতে শুনল ওপাশে কেউ এসে রিসিভার তুলল। মেয়েলি গলা। ঘুম-জড়ানো। 'হ্যালো-হ্যালো!'

অবনী দু-বার হ্যালো শুনে বলল, 'কাল সকালেই যেন মালটা আসে, বুঝলেন?'

'মাল! কীসের মাল?' ভদ্রমহিলার অবাক গলা।

'রসগোল্লা। এটা কি কে সি দাসের দোকান নয়?'

'রং নাম্বার।' বলে ঘটাং করে লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা। অবনী প্রাণখুলে কিছুক্ষণ হাসল, তারপর আবার রিসিভার তুলল। কাকে ডায়াল করা যায়! কোনও নাম না পেয়ে এমনি কয়েকটা নাম্বার ঘোরালো ও। এবার বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটা হেঁড়ে গলা ধরল, 'হ্যালো।'

অবনী বলল, 'ইয়েস, আপনার স্ত্রী কোথায়?'

ওপারের গলায় বিস্ময়, 'স্ত্রী কেন বলুন তো?'

'দরকার, জরুরি দরকার। লালবাজার থেকে বলছি।'

'লালবাজার? ও-ও তো বাপের বাড়িতে।'

'না, সেখানে নেই।'

'নেই মানে?

'আপনি ইমিডিয়েটলি ডাফরিন হসপিটালে চলে যান। সিরিয়াস অবস্থা। হারি প্লিজ।' অবনী ফোনটা কেটে দিল। অবনী আন্দাজ করল, লোকটা এখনই ডাফরিনে ছুটবে। এবং গিয়ে দেখবে ওটা একটা বাচ্চা হওয়ার হাসপাতাল। লোকটার মুখের চেহারা তখন কেমন হবে? হো-হো করে হাসতে-হাসতে অবনী উঠতেই টেলিফোন বেজে উঠল। একি হল। অবনীর দু-চোখে বিস্ময়। এত রাতে কোনওদিন ফোন আসে না তো। কি ওর মতো কোনও পার্টি মজাকি করছে। রিসিভার তুলল ও, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, আপনি কি করছেন?' কড়া গলার স্বর।

'মানে?'

'মানে এত রাত্রে মেঝেতে কি আওয়াজ করছেন। আপনার মনে রাখা উচিত এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, আমি কমপ্লেন করব।' ওধারে গলা উত্তেজিত।

শালা বাড়িওয়ালা। অবনী একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর কাটা-কাটা গলায় বলল, 'আপনি কি ড্রাঙ্ক?'

'মানে?'

'রং নাম্বার।' ফোনটা নামিয়ে রেখে পা টিপে-টিপে এসে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল অবনী। আঃ, আরাম! আর একটা দিন কাটল অবনীভূষণের। আগামীকাল কিছু বিজনেস আছে। নাটে-নাটে লাগলে বাড়িওয়ালার থোড়াই কেয়ার। মনে-মনে গুনগুন করতে লাগল, 'শালার চামড়ায় বানানো ঢাক, তেরে কেটে তাক।' অবনীভূষণ ঘুমিয়ে পড়ল।

উল্টোডাঙায় তিন নম্বর লাল বাড়িটার পরমেশকে পেয়ে গেল অবনী। কাল রাত্রে খাওয়া হয়নি কিছু। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্নানটান সেরে বেরিয়ে পড়েছে। বেরোবার সময় গেটে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। লেক থেকে চেনবাঁধা কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছেন। অবনী মুখোমুখি হতেই হেসে বলল, 'ভালো আছেন মেসোমশাই!' ভদ্রলোক দুটো ভ্রূ কুঁচকে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

অবনী মনে মনে একটা সুন্দর খিস্তি করে নিল। তারপর পাঞ্জাবির দোকানটা থেকে পেটপুরে খেয়ে উল্টোডাঙ্গায় চলে এল পরমেশকে ধরতে। এখন ওর পকেট খালি। পরমেশকে এখানে পেয়ে গেল।

পরমেশ টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে লিখছিল, অবনীকে দেখে সরিয়ে নিল কাগজপত্র। এই বাড়িটার মালিক মাড়োয়াড়ি। বহুত ব্যবসা আছে। নিচে কাঠের আড়ত। পরমেশ ওকে দেখে বাঁ-চোখ কুঁচকে কী ভাবল, তারপর বলল, 'যাক ভালোই হয়েছে তুই এসে পড়েছিস।'

অবনী একটা চেয়ার টেনে নিল, 'কালকে তুই শালা আমাকে বাতেলা দিলি কেন?'

'বাতেলা? তোকে! ধ্যুৎ, ধ্যুৎ, ওসব ফালতু কাজ তুই করবি কেন? আমি তো তোকে জানি।' পরমেশ হাসল।

'কাজটা কী ছিল?'

'ওই আর কী! থ্রি-বি রুটের একটা স্টেট হাম্পু করতে হল।'

'কত মাল ছেড়েছে?'

'দুই। পাঁচটা সাকরেদ ছিল। হাতে কিছু থাকে না দিয়ে-থুয়ে।' পরমেশ নির্বিকার। মনে মনে অবনী পরমেশকে জরিপ করল। হাতে কিছু না রাখার মাল পরমেশ নয়। শালা। কোনও রিস্ক ছিল না কাজটায়। আলিপুরের মোড়ে বাস থামিয়ে দুটো আওয়াজ দিলেই প্যাসেঞ্জাররা পালাবে। তারপর টিনটা উপুড় করে ট্যাঙ্কের মুখটা খুলে দিয়ে দেশলাই ছুঁড়ে দেওয়া। ব্যস। সিংজি নগদ পেমেন্ট করে। পার স্টেট বাস দু-হাজার। পুলিশ আসার আগেই পরমেশ নিশ্চয়ই পার্ক স্ট্রিটে বসে বিয়ার টানছিল। একটা স্টেট বাস পুড়লে দু-হাজার খরচ, আসবে হাজার গুণ। আরও একটা প্রাইভেটের পারমিট পাবে সিংজি। শালা। দেখল টেবিলের ওপর খবরের কাগজের ফার্স্ট পেজে পোড়া বাসের ছবি।

অবনী বলল, 'আছিস ভালো। কিছু ছাড়ো এবার।'

'কত।'

'পাঁচ।'

'অসম্ভব। দুশো দিতে পারি। অ্যাডভান্স।' পকেট থেকে টাকা বের করল পরমেশ।

'অ্যাডভান্স কেন?'

'আজকের অপারেশনটার জন্যে। ভালো দাঁও আছে। আমি ভেবে দেখলাম তোকে নিয়েই করব। তেওয়ারিকে ও মাল আমি নিতে দেব না।' অবনীর সামনে দুটো একশো টাকার নোট রাখল পরমেশ।

'কাজটা কী?' অবনী টাকাটা পকেটে রাখল।

'তেওয়ারি তিন নম্বরের লাইনে আজ রাত্রে যাবে। কেন যাবে খবর পাইনি। এমনি যাওয়ার মাল ও নয়। এসব ব্যাপার লিক হলে অবনী—।' পরমেশ থমল হঠাৎ।

'বলতে হবে না।' হাসল অবনী, 'ওয়াগনের ব্যাপার নাকি গুরু!'

'না, ওসব ব্যাপার না। তুই এক কাজ কর। একটা মাল ডেলিভারি আছে। আমিই যেতাম, তুই এসেছিস, ভালো হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক দশটায় গ্লোবের সামনে যাবি। তেওয়ারির লোক থাকবে ওখানে। বাঁ-হাতে রুমাল জড়ানো। তোকে দেখে রুমালটা খুলবে আর বাঁধবে। মালটা দিয়ে চলে আসবি।'

'তেওয়ারির লোক?'

'হ্যাঁ বস। তেওয়ারি আমার বহুদিনের দোস্ত।' বলে পরমেশ টেবিলের নিচ থেকে ছোট এয়ারব্যাগটা বের করে অবনীর সামনে রাখল। 'বিকেল সাড়ে পাঁচটা পাঁচমাথার মোড়ে কফি হাউসের সামনে চলে আসিস।'

এয়ার ব্যাগটা নিয়ে অবনী ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় গ্লোবের সামনে পৌঁছোল। এখন এদিকটায় বেশি লোজন নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে ও গ্লোবের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ ভারী ব্যাগটা। ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে ও খুলে দেখেছে অন্তত গোটা কুড়ি গ্রেনেড আছে। কোথা থেকে যে পায় পরমেশ। আর এইসব অস্ত্র ও তেওয়ারির হাতে তুলে দিচ্ছে, যে তেওয়ারিকে আজ রাত্রে প্রয়োজন হলেই হাপিস করে দেবে পরমেশ। তাজ্জব ব্যাপার সব। এইজন্যেই পরমেশকে গুরু বলতে ইচ্ছে করে।

অবনী চোখ রাখছিল রুমাল বাঁধা হাতে কেউ আসছে কিনা। মিনিট তিনেক কাটল। শালা এ অবস্থায় যদি পুলিশ ধরে নির্ঘাত তিন বছরের জেল। 'মারাত্মক অস্ত্রসহ সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার' কাগজের হেডিং হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তো পরমেশই ওকে এখন ধরিয়ে দিতে পারে। একটু ঘাম জমল ওর শরীরে। ঠিক এই সময় ওর চোখে পড়ল একটা ডাঁসা মেয়ে গ্লোবের ভেতরে ঢুকল। বাঁ-হাতের কবজিতে রুমাল বাঁধা। ও একটু অবাক হল। এই মেয়েটা কি তেওয়ারির লোক? ইম্পসিবল, হতেই পারে না। মেয়েটা রুমাল খুলছে আর বাঁধছে। এক-একবার এদিক-ওদিক দেখছে। তেওয়ারির, রিক্রুট তো দারুণ জিনিস। অবনী এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'চলুন।'

কপালে ভাঁজ ফেলল মেয়েটি, 'মানে?'

'তেওয়ারি?' অবনী আস্তে করে কথাটা ছেড়ে দিল।

মেয়েটি হাসল, 'হ্যাঁ. দিন।'

'এখানেই নেবেন? চলুন না কোথাও বসা যাক।' অবনী উদার হল।

মেয়েটি হাসল, 'আমার শুধু নিয়ে যাওয়ার কথাই ছিল কিন্তু।'

'আমার শুধু দেওয়ার। একটু অবাধ্য হই না, আপত্তি আছে?'

'বেশ চলুন। কোথায় বসবেন?'

অবনী মেয়েটিকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকল, সলিড স্বাস্থ্য মেয়েটির। কথাবার্তা চটপটে। অবনীর পাশে বসল ও। অবনী একটা হাত মেয়েটির পেছনে চেয়ারের হাতলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'দ্দিন লাইনে?'

'লাইনে?' মেয়েটি চোখ তুলে দেখল অবনীকে, 'ও তিন মাস।'

সব শালাই তাই বলে। মনে-মনে ভাবল অবনী।

'ভালো লাগে?' অবনী গাঢ় করতে চাইল গলার স্বর।

'এই আরম্ভ করলাম তো। সেদিন এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পেছন ঘুরে আলাপ করলেন। শুরুতেই আমি বললাম, দেখুন আমি কিন্তু প্রফেসনাল। শুনেই ভদ্রলোক চম্পট।'

'বাঃ, তিন মাসেই বেশ কথা শিখে গেছেন তো। এরপর কত মাস কত হাজার মাস চলে যাবে দেখতে-দেখতে।'

'মোটেই না। আমি বেশিদিন এ কাজ করব না।'

'কী নাম?'

'বীথি।'

'আসল নামটা!'

'বীথি।'

অবনী একটা হাত এবার বীথির কাঁধে রাখল। বীথি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

অবনী হেসে পরদা সরিয়ে বেয়ারাকে ডাকল, খাবার দিতে বলল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পরমেশ।'

'ও আপনি?' মেয়েটি চোখ চকচকে হল, 'আপনার কথা তেওয়ারির কাছে শুনেছি।'

অবনীর হাত মেয়েটির গলায় নেমে এল। টগবগে স্বাস্থ্য মেয়েটির। অবনীর খুব ইচ্ছে হল মেয়েটার বুক ছুঁয়ে দ্যাখে।

'তুমি প্রফেসনাল, না!'

'কেন?' মেয়েটি হাসল।

'কত নাও?'

'কেন, যাবেন?'

'যদি যাই?'

'বেশ তো, মালটা ডেলিভারি দিয়েই আমি ফ্রি।'

একটু আদর করল অবনী, 'কত নাও?'

'পঁচিশ, আর ঘরভাড়া পনেরো। পুলিশের ঝামেলা নেই। যাবেন?'

'উম্‌ম্ আগে একটু গরম হই।'

'বাব্বা!'

'থাকো কোথায়?'

'টালিগঞ্জে। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে।'

'আবার পাকিস্তান কেন, উম্‌ম্! বাবা আছে?'

'হুঁ!' মেয়েটি অবনীর কোলের কাছে সিঁটিয়ে এল। গদগদে ভাব। অবনীর মনে হচ্ছিল ও মরে যাবে।

'তোমার মা দারুণ দেখতে, না?'

'অ্যাঁ। আবার মেয়েকে ছেড়ে মাকে কেন?'

'উম্‌ম্, তোমাকে দেখে। দারুণ দেখতে তুমি। দারুণ জিনিস। উম্‌ম্, তোমার বাবা আছে তাহলে। কী করেন? উম্‌ম্।'

'বাবা!' মেয়েটি হাসল, 'বাবা রাস্তায়-রাস্তায় হাঁকে—চা-ই-ই সি-ট্ কা-পড় চা-ই-ই। প্রায় অবিকল বৃদ্ধের গলা নকল করে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। থতমত খেয়ে গেল অবনী। বেয়ারাটা ছুটে এসে পরদা ফাঁক করে দেখে সরে গেল। আর অবনীর পা থেকে মাথা অবধি চিৎকারটা পাক খেতে লাগল। ওর মনে হল একজন বৃদ্ধ কাঁধে সস্তা ছিট কাপড় ফেলে হাতে একটা লোহার সিক নিয়ে রোদজ্বলা দুপুরে গলিতে-গলিতে ঘুরছে আর কুঁজো শরীর বেঁকিয়ে চিৎকার করছে, ছিট কাপড় চাই। আর তার মেয়ে ওর পাশে বসে গদগদে শরীরে বলছে, 'চাই, মাংস চাই?'

মেয়েটির চোখে বিস্ময়, 'কী হল!'

'কিছু না!' অবনী বলল, 'কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত শরীর গুটিয়ে আসছিল, হঠাৎ ও বলল, 'চলুন উঠে পড়ি।'

'কেন, খাবেন না?'

'না, ভালো লাগছে না।'

'আমার সঙ্গে যাবেন তো!'

'আজ থাক।' অবনী হাসল, 'আজ বোধহয় আর গরম হব না।'

মেয়েটি অবাক চোখে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর ব্যাগটা তুলে নিল। অবনী বলল, 'সাবধানে যাবেন। ওতে কি আছে জানেন না বোধহয়।' মেয়েটি কোনও কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল। অবনী বেয়ারাটাকে দুটো টাকা গুজে দিয়ে, দেখল মেয়েটি ব্যাগ দোলাতে-দোলাতে এমনভাবে যাচ্ছে যাতে যে-কোনও মুহূর্তেই কারওর সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগে যেতে পারে। আর তারপরেই—অবনী কিছুক্ষণ বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখল। হঠাৎ তার মনে হল ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল। তার ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না। শালা সব

মানুষই তো ফেরিওয়ালা। তা নিয়ে ন্যাকামো করার কি আছে। অবনী দু-চোখ দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। অবনীর খুব আফসোস হল, নিজেকে জুতোতে ইচ্ছে করল ওর।

সোদপুরের একটু আগে যেখানে রেললাইনটা বাঁক নিয়েছে সেখানটায় মোটর সাইকেল থামাল পরমেশ। সারাটা রাস্তা পরমেশ সমানে খিস্তি করেছে অবনীকে। বহুত দেরি করে এসেছে ও কফি হাউসে। অবনী বোঝাতে চেয়েছে ওর কোনও দোষ নেই। দুপুর থেকে সারা কলকাতা জুড়ে বোমাবাজি। বাস-ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সি আসতে চায় না। কিন্তু পরমেশ অবনীর মুখে হুইস্কির গন্ধ পেয়েই খিস্তি করতে শুরু করল। বলেছে, 'শালা, তোকে টাকা দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে।' শেষপর্যন্ত অবনী স্বীকার করেছে, হ্যাঁ আজ দুপুরে ও চার পেগ মাত্র খেয়েছে ব্লু ফক্সে বসে। সেটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু পরমেশ এখনও গরম। বি টি রোড ধরে আসতে-আসতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। খুব জোরে চালাচ্ছিল পরমেশ। পেছনের সিটে বসে ঘাম ছুটে গিয়েছিল অবনীর। পরমেশ টাইট প্যান্ট আর গেঞ্জি শার্ট পরেছে। দুটোই কালো। ভালো মানিয়েছে। সেন্ট মেখেছে নাকি! দারুণ গন্ধ ছাড়ছে। গলায় সোনার চেনটা চিকচক করছে। শালা!

এখান থেকে স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে। ঠিক স্টেশনে নয়। তার আগেই ইয়ার্ড। লম্বা কয়েকটা মালগাড়ি সব সময়েই সেখানে পড়ে থাকে। এসব জায়গা ওদের জানা। মোটর সাইকেল একটা দোকানের সামনে রেখে পরমেশ দোকানদারকে কী যেন বলল ফিসফিস করে। তারপর ওরা হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়ে পরমেশ পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে অবনীকে দিল, 'এটা রেখে দে। দরকার না হলে ইউজ করিস না।' অবনী গ্রেনেডটা পকেটে রেখে দিল। ওরা নিঃশব্দে হাঁটছিল। ছোট একটা কালভার্ট পেরিয়ে এল এরা। এদিকে জনবসতি নেই বললেই হয়। ওরা রেললাইন থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছিল। পরমেশ কথা বলছে না এখন। মাঝে-মাঝে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে চারধারে। এদিকটায় ছোট জঙ্গল মতন। এরপরেই ইয়ার্ড। ওরা একটা বড় নর্দমা পেরিয়ে এল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগল এবার। দারুণ জোনাকি জ্বলছে চারধারে। অন্ধকারটা তাই একটু পাতলা। হাওয়া দিচ্ছে মৃদু-মৃদু। পরমেশ দাঁড়াল একটা ঢালু জায়গা দেখে। তারপর বলল, 'অবনী, তুই এখানে শুয়ে পড়। শিষ দিলে গুঁড়ি মেরে উঠে আসবি।' বলে ও রেললাইনের পাশ ঘেঁষে অন্ধকারে চলে গেল। আসবার সময় পাখি-পড়া করে ও অবনীকে বুঝিয়েছে কী-কী করতে হবে। মোটা টাকার ব্যাপার। অবনী শুয়ে পড়ল খোয়াবিছানো মাটিতে।

পকেটে অবনী গ্রেনেডটার অস্তিত্ব অনুভব করল। একটা মাত্র গ্রেনেড ওর সঙ্গে। পরমেশ ইচ্ছে করেই ওকে বোধহয় বেশি কিছু দিতে চায়নি। পরমেশের কাছে রিভলভারটা নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় শালা বেইমানি। একটা আলাদা দল করবে যে পরমেশকে ছেড়ে তারও উপায় নেই। পার্টির ব্যানারে না গেলে আজকাল লাইন বন্ধ। এম-এ পাশ করার পর বেকারির দিনগুলোতে পরমেশ তাকে হাত ধরে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। তবু শালা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তেওয়ারির সঙ্গে পরমেশের দোস্তি আছে এ কথা সবাই জানে। তেওয়ারির পেটো গ্রেনেড সাপ্লাই করে। ওর স্টক শর্ট পড়ে গিয়েছিল বলে পরমেশের কাছ থেকে কিছু মাল কিনল ও। তেওয়ারিটা শালা এক নম্বরের হারামি।

অবনী চিত হয়ে শুল। আকাশভরা তারা। উঃ কত যে তারা আকাশে! দারুণ লাগে দেখতে। অবনীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় তমলুকে ওদের বাড়ির উঠোনে বসে ও তারা গুনবার চেষ্টা করত। বাবার কথা মনে পড়ল। তিন মাস আগে চিঠি পেয়েছিল, 'এম-এ পাশ করিয়া এখন অবধি একটি চাকুরি জোটাইতে পারিলা না!'

অবনী হাসল।

পরপর দুটো লোকাল ট্রেন চলে গেল। মাটিতে কাঁপন অনুভব করল সে। ঠিক সময় শিষ শুনতে পেল অবনী। মাথা তুলে দেখল। সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার। গুঁড়ি মেরে জঙ্গলটার পাশে গিয়ে বসল ও। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। একটা মাত্র গ্রেনেড। ছোট-ছোট কয়েকটা ঝোপ এখানে। পরমেশের গলা শুনতে পেল ও। ফিসফিস করে ডাকছে, 'এদিকে আয় বাঁ-দিকে।'

অবনী বাঁ-দিকে সরে এল। পরমেশ হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন দেখছে। অবনী দেখবার চেষ্টা করল। সামনে ফাঁকা রেললাইন। ইয়ার্ডে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখল সে। মূর্তি দুটো স্পষ্ট হল। আর একটু পরে ও বুঝতে পারল ওদের মধ্যে একজন তেওয়ারি। ওরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পরমেশ চাপা স্বরে কী একটা বলল। তারপর এগিয়ে গেল গুঁড়ি মেরে। এখন অবনীকে একটু বাঁ-দিক দিয়ে পরমেশকে ফলো করতে হবে। পরমেশ আচমকা ফায়ার করবে। করে মাল হাতাবে। থলিটা নিয়েই অবনীকে দেবে। অবনী সেই মাল নিয়ে বাঁ-দিক দিয়ে ছুটবে। পরমেশ ডানদিক দিয়ে ঘুরে মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে যাবে। অবনী যেমন করেই হোক মালটা নিয়ে ডানলপ ব্রিজের তলায় পরমেশের জন্যে ঘণ্টাখানেক বাদে অপেক্ষা করবে। এই নির্দেশ। কিন্তু মালটা কী হতে পারে? পরমেশ খবর পায়নি বললেও অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস পরমেশ সব নাড়িনক্ষত্র জানে। অবনী আরও কয়েক পা এগোল। তেওয়ারিরা মালগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। একটা টর্চ জ্বললো দূর অন্ধকারে। সম্ভবত রেল পুলিশ।

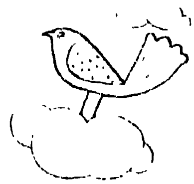
পরমেশ এগিয়ে যাচ্ছিল গুঁড়ি মেরে। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খান-খান করে পর-পর তিনটে ফায়ারিং হল। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো গ্রেনেড অবনী ডানদিকে ফাটাল। জায়গাটা মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল। অন্ধকারটা যেন ঝলসে গেল। আর সেই স্বল্প আলোয় অবনী দেখল পরমেশ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। দূরে স্টেশনের দিকে হইচই শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। কারা যেন দুপদাপ করে ছুটে বেরিয়ে গেল অবনীর পাশ ঘেঁষে। অবনী হতভম্ব হয়ে পড়েছিল প্রথমটায়। তারপর দৌড়ে পরমেশের দিকে এগিয়ে গেল। রেললাইনের ওপরে পরমেশ পড়ে আছে। বাঁ-হাতটা উড়ে গেছে। প্যান্টটা পুড়ে গেছে। ফিকে জোনাকির আলোয় অবনী দেখল পরমেশের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। আচমকা গুলি এবং গ্রেনেড খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবনী হাঁটুগেড়ে বসে পরমেশকে চিত করে শুইয়ে দিল। পরমেশের ঠোঁট কাঁপছে। বুকে হাত দিল অবনী। ভিজে গরম রক্ত তাতে। অবনী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওকে এখান থেকে কী করে সরানো যায়। পরমেশকে বাঁচানো দরকার। অবনীর কান্না পাচ্ছিল।

স্টেশনের দিকে চিৎকারটা বাড়ছে। মুহুর্মুহু টর্চ জ্বলছে। পরমেশ গোঙাচ্ছে। কানটা মুখের কাছে নিয়ে গেল অবনী। 'শা-লা-সা-জা-নো—বেইমানি—।' অবনী শুনল। অবনীর বলতে ইচ্ছে করল' গুরু আমি আছি, তেওয়ারিকে আমি জবাব দেব।' অবনী পরমেশকে তুলতে চেষ্টা করল। অসম্ভব ভারী। এত ভারী শরীর নিয়ে অবনী এক পা হাঁটতে পারবে না। কারা যেন সম্ভবত রেল পুলিশের দল টর্চ জ্বালিয়ে ছুটে আসছে দেখতে পেল অবনী। দু-তিনবার রাইফেলের আওয়াজ করল পুলিশগুলো। ওরা এগিয়ে আসছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ—অবনী উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে পরমেশকে শেষবার দেখল। আর সেই সময় ওর নজরে পড়ল পরমেশের গলার সোনার চেন চিকচিক করছে অন্ধকারে। অবনী পরমেশের মাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় ছিঁড়ে নিল হারটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ছেঁড়ার সময় পরমেশের মাথাটা ঝাঁকুনি খেল। অবনী পরমেশের খোলা চোখের সাদা মণি অন্ধকারেও দেখতে পেল।

পুলিশগুলোও প্রায় এগিয়ে এসেছে। অবনী ছুটতে আরম্ভ করল এবার। তিন-চারটে রাইফেলের গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হল পরমেশটা যদি না মরে যায়, ও যদি হাসপাতালে চাঙ্গা হয়ে যায় ও সব ফাঁস করে দেয়—অবনীর নাম-টাও! বেইমান

কাকে বলল? অবনীকে? হার ছেঁড়ার সময় পরমেশের চোখ খোলা ছিল। অবনী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে পরমেশের দেওয়া গ্রেনেডটা বের করে পরমেশের রক্তাক্ত শরীরটা যে দিকে শুয়ে আছে সেইদিকে ছুঁড়ে দিল। প্রচণ্ড শব্দে গ্রেনেডটা ফাটল। অবনীর শব্দটা ভালো লাগল।

অবনী আবার দৌড়তে লাগল। পুলিশগুলো এগিয়ে আসছে। ফায়ারিং হচ্ছে। ও সেই বিরাট নর্দমার কাছে এসে পড়ল। রক্তাক্ত হারটা কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে মুখে পুরে নিয়ে অবনী নর্দমার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। নর্দমার পচা স্রোতে অবনী ভেসে যাচ্ছিল। এই পাঁক এবং পূতিগন্ধে অবনী এক সেকেন্ডেও থাকতে পারত না, কিন্তু পরমেশের রক্তমাখা হারের নোনতা স্বাদ ওর জিভ মুখ শরীরকে একটা আলাদা জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে দারুণ লোভে অবনী বুঝতে পেরেছিল যে এই নর্দমার স্রোতেই ও সবচেয়ে নিরাপদ।



বর্ণপরিচয়

তারাপদ বিশ্বাস, হৃদয়পুরের তারাপদ বিশ্বাসের মাথায় ব্যাপারটা কিছুতেই ঢোকে না যে, এইসব মিছিল-টিছিল করে কার কী লাভ! সেরেফ চেল্লানি, রাস্তা জুড়ে শাহেনশা ঠাটে পা ফেলা, ট্রাম-বাস জ্যাম করে একটা মাতব্বরি দেখানো, তারাপদ বিশ্বাস মনে-মনে এই কথাই বলে। বেশ কিছুকাল থেকেই ওর একটা ধারণা ছিল, যতসব মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলেদের নিয়ে কিছু উঠতি নেতা-গোছের লোক শিয়ালদা থেকে রিফ্যুজি জুটিয়ে এইসব মিছিল-টিছিল করে। অবশ্য অফিসে এসে তারাপদর ধারণাটা একটু মোড় নিয়েছিল, ব্যাপারটা ও সাজিয়েছিল এই রকম, এরা যখন কথায়-কথায় মিছিল, টিফিনে গরম বক্তৃতা হেই করেঙ্গা সেই করেঙ্গা করছে তখন এটা এদের কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। মদ খাওয়ার মতো মিছিলে শ্লোগান দেওয়া একটা জব্বর রবরবা নেশা। লোকগুলো খোলা মাঠে যাত্রা করতে পারে। কোথায় ভিয়েতনামে কী হচ্ছে, কোথায় মালয়েশিয়ায় কারা মরল, চলো ময়দান। তারাপদ নিশ্চিত, মনুমেন্টটা একদিন পুরো নীল হয়ে যাবে বিষে। আর হ্যাঁ, রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে শ্লোগানে গলা মেলানো ফুটপাত ভরতি লোকের সামনে, আর লোকগুলো যেমন ড্যাবডেবে চোখে গেলে, কেমন লাগে তারাপদর। ফুটপাতের লোকগুলো যেন সার্কাস দেখে। প্রতিক্ষণেই মনে হয় এই কেউ দেখে ফেলল। বলবে, কেরানি তারাপদটা মিছিল করছিল। মরে গেলেও লাশ পাঠাব না মিছিলে। এই তো সেদিন একটা বড়বাজারি লোককে সে বলতে শুনেছিল, 'নোকরলোক যাতা হ্যায়।' এসব কথা যে কারও সঙ্গে ক্লিয়ার করে বলবে তার উপায় নেই। কানে কানে খানখান হবে যে তারাপদ বিশ্বেসটা দালাল। অথচ কালই তারাপদর সঙ্গে ঘাটে পা রাখা বুড়োটার দেখা হয়েছিল। পুব বাংলার ঘি-হাতের গন্ধ বয়ে বেড়ানো একটি নিঃস্ব, রুগ্ন না খেতে পাওয়া বৃদ্ধ ট্যাক থেকে একটা টাকা বের করে দাঁতহীন মাড়িতে হেসেছিল। প্রত্যেক মিছিলে ওর আয় একটা টাকা। গ্রাম থেকে ময়দান। এক-একদিন দুটো কি তিনটে মিছিলেও গেছে লোকটা।

অথচ অফিসে কারওর সঙ্গে খোলামনে কথা বলা যাবে না। খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে দিনগুলো। এর চেয়ে ইংরেজ আমল ভালো ছিল। ভাবতে চেষ্টা করল তারাপদ। ম্যাট্রিক পাশ

করে অফিসে ঢুকেছিল সে। এখন সরকার তাকে যা দেয়, কোন ম্যাট্রিক পাশ তা পায়! বাড়িতে তিনটে গাই আছে, ভালো দুধ দেয়। শাকসবজির বাগান আছে, ধানভূমি আছে হৃদয়বিলের গা ঘেঁষে। বাজারে যেতে হয় কদাচিৎ। আর বাবুরা এদিকে গণ্ডাগণ্ডা বায়োস্কোপ দেখবেন, টাকাটা না খসিয়ে টিফিন হয় না, টেরিলিনের চেকনাই আছে ষোলো আনা। আবার এদিকে মাগ্‌গি ভাতা বাড়াও বলে চেল্লানি!

আজ অফিসে ঢোকার সময় তারাপদ দেখেছে দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে, 'নূন্যতম মাগ্‌গি ভাতার দাবীতে আগামী দশই ধর্মঘট।' তারাপদ দেওয়ালঘড়ি দেখল, তিনটে বেজে কুড়ি। বিয়েতে পাওয়া ঘড়িটা বউয়ের সুটকেসে রেখে দিয়েছে সে। শালা যাঁ শহর, ছিনতাই তো জলভাত। তারাপদ সিট ছেড়ে উঠল। একটু বাদেই গেটে লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর একটি মাছিকেও গলতে হচ্ছে না। যেন গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায় মনুমেন্টে বাঁধতে। বিকেল চারটে দুই-এর ট্রেনটা ধরতে পা চালাল তারাপদ। ডালহৌসি থেকে পায়ে হেঁটে শ্যালদা।

বড়বাবুটা বেবুনের জাত, নইলে তারাপদকে আজ দশ বছর রিসিভিং সেকশনে ফেলে রাখবে কেন? সেই চিঠি রিসিভ করে খাতায় এন্ট্রি করা—অবশ্য তারাপদর এটা খারাপ লাগে না। মাথা ঘামানোর তো দরকার নেই এতে। অবশ্য ওর জুনিয়রগুলো রিসিভিং থেকে সেকশনে, সেখান থেকে ইন্সপেক্টর হয়ে যাচ্ছে দুমদাম করে। এইখানটায় ওর একটু খারাপ লাগে। সার্ভিস বুক দ্যাখো, তারাপদ বিশ্বাস লেট হয়নি একদিনও, কাজুয়েল্ লিভ পচেছে তবু কামাই কড়ে আঙুলে গোনা যায়। অফিসে একটু কমই কথাবার্তা বলে সে। নতুন ছোঁড়াগুলো সিনেমা আর পলিটিক্স নিয়ে যে রকম মস্তানি করে তারাপদর প্রবৃত্তি হয় না কথা বলতে। অফিস কাঁপিয়ে ট্রানজিস্টার বাজিয়ে ক্রিকেট-রিলে শুনছে—কেউ কিছু বলার নেই। অথচ ওরা যখন ঢুকেছিল? তারাপদ এখনও সিট ছেড়ে ওঠে না পারতপক্ষে। বাড়ির চিঁড়েভেজানো নলেনগুড়ের টিফিনেই শেষ দশটা বছর কাটিয়ে দিল। আজ অবধি প্যান্টের চোঙায় পা গলায়নি সে। শার্ট ধুতিতেই সে অভ্যস্ত। শ্যালদা থেকে ডালহৌসি আসে হেঁটে। ট্রামের খরচা বাঁচে। আর যা ভিড়। তারাপদর বায়ু কুপিত হয় ট্রামে উঠলে। একেই বেশি বয়সে বিয়েটা করল সে। মা নেহাত পায়ের হাজার কষ্ট পাচ্ছে ইদানীং, তাই। তেলেনিপাড়ার মেয়ে। বয়স তারাপদর অর্ধেক, সতেরো হবে, কথা বলে চটপটির মতো। স্বাস্থ্য জব্বর। বিয়ের সময় তারাপদ শুনেছিল, কনের বন্ধুরা বলছে, 'ওমা, এ যে কাঠ কয়লা-গো—শুটকি মাছ!' তা বলুক! তারাপদর দিদিমা বলতেন, 'হীরের আংটি বাঁকা, শোনো কথা!'

কলকাতা থেকে মিনিট পঁয়তাল্লিশের রাস্তা হৃদয়পুর। স্টেশন থেকেই তারাপদর বাড়ির লম্বা সুপরিগাছের মাথাটা দেখা যায়। খুব অস্বস্তি নিয়েই ফিরল তারাপদ। ধর্মঘট যত এগিয়ে আসছে অস্বস্তিটা তত বাড়ছে। আজ কর্তৃপক্ষ সার্কুলার দিয়েছে, ধর্মঘটে যে যোগ দেবে, সরকার তার চাকরির নিশ্চয়তা দেবে না। আবার এদিকে ইউনিয়ন থেকে ইস্তাহার এসেছে, 'কমরেড, আমরা প্রাণ থাকতে কোনও দালালকে অফিসে ঢুকতে দেব না। এ লড়াই বাঁচার লড়াই।' জলে কুমির ডাঙায় বাঘ—তারাপদ থুথু ফেলল।

ঘরে ঢুকতেই নতুন বউ একগাল হাসল—'এত তাড়াতাড়ি এলে যে।'

'এলাম।' তারাপদ বলল।

'বাব্বা, কি সৌভাগ্য!' নতুন বউ হাত ঘুরিয়ে খোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে বলল, 'জানো, আজ বাবার চিঠি এসেছে।'

'কী লিখেছেন?' তারাপদ শার্ট খুলছিল।

'এইসব বাড়ির কথা আর কী। আর হ্যাঁ, সতু ছাড়া পেয়েছে।'

'সতু কে?' তারাপদ অবাক হল।

'সতু গো। আমাদের পাশের বাড়ির ব্রজ মাস্টারের ছেলে। বিয়ের সময় আমার পিঁড়ি ধরেছিল, দ্যাখোনি!'

তারাপদ মনে করতে পারল না সঠিক। 'কী হয়েছিল তার?'

'বাঃ তোমাকে বললাম না সেদিন। ধর্মঘটের দিন পুলিশ যখন গুলি করছিল, সতুরা সব ওদের কারখানার সামনে ইনকিলাব জিন্দাবাদ করছিল। সে কি মারামারি! সতুর মাথা ফেটে গেল। কী রক্ত! বাবা দেখেছে। তা পুলিশ ওদের সবাইকে ধরে চালান দিয়েছিল।'

তারাপদ গম্ভীর হল শুনে। তারপর নিজের মনেই যেন বলল, 'তা ওরা ওসব মাতব্বরি করতে গিয়েছিলই বা কেন?'

নতুন বউ যেন অবাক হল, 'ইস্, কেন করবে না! ওদের বেশি খাটিয়ে কারখানায় কম মাইনে দিত যে!'

তারাপদ বেরিয়ে এল। খুব বিরক্তি লাগছিল তার। বাড়িতেও যদি এসব কথাবার্তা শুনতে হয়, তাহলে—। তারাপদ মনে-মনে ঠিক করে নিল, বউকে পারতপক্ষে তেলেনিপাড়ায় পাঠাবে না।

ধর্মঘটের জোর প্রস্তুতি চলছে। তারাপদ অফিসে ক'দিন গুম হয়ে রইল। বাড়িতে অর্ধসাপ্তাহিক একটা খবরের কাগজ আসে ওদের অনেকদিন থেকে। তাতে ফলাও করে ধর্মঘটের কথা লিখেছে। পড়ে বউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারাপদ এড়িয়ে গেছে।

ধর্মঘটের আগের দিন সকালে তারাপদ অনেকক্ষণ ঘুমোল। বউ অনেকবার ডেকে ফিরে গেল। বেলায় তারাপদ ছুটি-ছুটি মুখ করে উঠল। উঠে বলল, 'আজ অফিসে যাচ্ছি না।'

নতুন বউ অবাক হল। তার বিয়ের পর সে কোনওদিন তারাপদকে কামাই করতে দ্যাখেনি। 'কেন?'

'বাঃ, কাল ধর্মঘট না?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আশ্চর্য!' তারাপদ হাসল, 'তুমি তেলেনিপাড়ার মেয়ে হয়ে জানো না?'

তারপর খুব গাঢ় স্বরে বলল, 'কাউকে বলো না যেন, আমরা আজ রাত জাগব। অফিসে একটা ভলান্টিয়ার পার্টি হয়েছে। আজ রাত থেকে কাল বিকেল অবধি আমরা অফিসে পাহারা দেব যাতে কেউ অফিসে না ঢুকতে পারে।'

নতুন বউ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথমটায়, তারপর সারা মুখে ঝরনা ঝরাল, 'ওমা তুমি ভলান্টিয়ার হবে নাকি, কি মজা!' তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'হ্যাঁগো, গোলমাল হবে না তো?'

ঠোঁট ওলটালো তারাপদ, 'কী জানি!'

'পুলিশ-টুলিশ দেখলে সামনে যেও না, লক্ষ্মীটি!'

তারাপদ ভারিক্কী গলায় হাসল, 'ক্ষেপেছ! তবে বুঝলে কিনা, নেতা হয়ে আর পিছিয়ে থাকি কী করে! অবিচার দেখলে আমি আবার কেমন হয়ে যাই।'

সন্ধের কিছু পরে তারাপদ ট্রেন থেকে নামল। শীতের রাত। সন্ধেতেই রাতটা যেন অনেক দূর গড়িয়ে এসেছে মনে হয়। আর শীতটাও যেন কলকাতায় জম্পেশ করে নেমেছে। তারাপদ ওর লাল আলোয়ানটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে বাঁ-হাতে টিফিন কেরিয়ার ভরতি লুচি তরকারি নিয়ে ট্রামে উঠল। তারাপদের হাতটা বড় ঘামছিল। এবং এই প্রথম সে ট্রামে উঠল অফিসের পথে।

অফিসের আগের স্টপেজে তারাপদ নেমে পড়ল। দোকানগুলো বন্ধ হচ্ছে সে দেখতে পেল। হ্যারিসন রোড ধরে এগিয়ে এসে স্ট্র্যান্ড রোডের মুখে একটা বিড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। ফুটপাথের এককোণে আগুন জ্বেলে

গোল হয়ে কতগুলো দিনমজুর হাত-পা সেঁকছে। তারাপদ একটু এগিয়ে তাদের অফিস দেখতে পেল। অফিসে সামনেটা ফাঁকা। একটা ভাঁড়ের চায়ের দোকান ছিল অফিসের গায়ে—সেটাও বন্ধ। ব্রেবোর্ন রোডের মুখে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল সে। কোনও পরিচিত বা সন্দেহজনক মুখ তার চোখে পড়ল না। একটু বাদেই পাশের পুলিশ আউটপোস্টে ন'টা বাজার ঘণ্টা শুনতে পেল। তারাপদর এই ঠান্ডাতেও কপালে ঘাম হচ্ছিল। তারাপদর একবার মনে হল ফিরে যায়। এখনও হৃদয়পুরে যাওয়ার ট্রেন আছে কয়েকখানা। পরমুহূর্তেই পা ভারী হল তার।

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে তারাপদ অফিসের পেছনের দরজায় এল। তারপর চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওদের অফিস ছ-তলায়। লিফটে যাওয়া-আসা অভ্যেস, এখন সিঁড়ি ভাঙতে হবে। অন্ধকার বাড়িটায় কোনও শব্দ নেই। তারাপদ খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে পা টিপে-টিপে ওপরে উঠতে লাগল। এই অন্ধকারে তারাপদ যেন তার বুকের ড্রামে কে যেন দ্রুত ঘা মেরে চলেছে টের পেল। অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে চলল এগিয়ে। তার নিজের পায়ের শব্দ যেন দেওয়ালে-দেওয়ালে মারামারি করে চতুর্গুণ হয়ে তার কানে ফিরে এসে তাকে চমকে দিচ্ছিল। ছ-তলায় উঠে সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়াল তারাপদ। সে ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শীতেও তার বেশ গরম হচ্ছিল। অফিসের লম্বা করিডোর অন্ধকার। কেউ নেই কোথাও। তারাপদ ধীরে-ধীরে এগোল। ওদের অফিসঘরটার কোলাপসিবল গেটে তালা মারা। করিডোরটার এক প্রান্তে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এত কালো অন্ধকারে তারাপদ কখনও দাঁড়ায়নি। ওর হঠাৎ ভয়-ভয় করছিল। সামনেই গঙ্গা, ওপারে হাওড়া স্টেশন। দারুণ হাওয়া আসছে। করিডোরের অপর প্রান্তের গঙ্গার দিকের জানলাটা দারোয়ানটা হয়তো ভুল করে বন্ধ করেনি। হাওয়ার ঝাপটায় জানলার পাল্লাটা দড়াম-দড়াম করে শব্দ করছে। তারাপদ প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। এখন তার শীত করতে লাগল। তারাপদ একটু-একটু করে এগোল। অন্ধকারটা ক্রমে-ক্রমে চোখ সওয়া হয়ে আসছিল ওর। করিডোরের অন্য প্রান্তে এসে তারাপদ চমকে উঠল। একটা হিম-হিম স্পর্শ যেন তার রক্তে ছুঁয়ে যেতে লাগল। তারাপদর হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল। সে মুখ ফেরাল কোনও মতে। করিডোরের কোণায় একটা ঘুপচি মতন জায়গায় যেখানে এতদিন পুরোনো ফর্ম এবং বাজে কাগজের তাড়া জমা থাকত, তারাপদ দেখেছে সেখানে একটা আগুনের ফুলকিকে সে জোনাকির মতো দেখতে পেয়ে কিছু চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এই সময় তারাপদ খকখক শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা সামান্য বিরতি দিয়ে হতে লাগল। তারাপদ সমস্ত লোমকূপগুলো পদ্মকাঁটার চেহারা নিল। সে কিছুতেই কোনও ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করতে পারল না। আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই আগুনের ফুলকিটা ঝলকে উঠেই ছোট হয়ে গেল। এবং হঠাৎ তারাপদ সেই ফুলকির আলোয় একটি নাক মুখ চোখ দেখতে পেয়ে পাথর হল। সয়ে যাওয়া অন্ধকারে তারাপদ ক্রমশ একটা মানুষের আদল দেখতে পেল। কাশিটা যে ওখান থেকেই আসছে তারাপদ বুঝতে পারল। তারাপদ দৃষ্টি ফেরাচ্ছিল না। হঠাৎ আলোর ফুলকিটা মাটিতে মিলিয়ে গেল। এবং তার কয়েক মুহূর্ত বাদে পায়ের ওপর কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তারাপদ আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল।

'বাবু, আমি বাবু!' একটা মিনমিনে গলার স্বরে কাকুতি ফুটল।

তারাপদ স্থির হল। গলার স্বরটা যেন চেনাচেনা, 'কে?'

'আমি বংশী!'

'বংশী!'

'হ্যাঁ, বাবু। দয়া করে ধরিয়ে দেবেন না বাবু। আপনার পায়ে পড়ছি। কাল অফিসে না এলে একদম না খেতে পেয়ে মারা যাব বাবু।' বংশীর গলার স্বর ডুকরে উঠল।

তারাপদ এক পা এগিয়ে নিচু হয়ে দেখল বংশী হাতজোড় করে বসে আছে। বংশীর সঙ্গে কেউ সচরাচর কথাবার্তা বলে না। রোগগ্রস্ত লোক। সর্বক্ষণ মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। আজীবন তৈলহীন চুলে উকুনের বাসা আছে। এক পা খুঁড়িয়ে হাঁটে। জেনারেল সেকশনের বেয়ারা বংশীচরণ সামনের বছর রিটায়ার করবে। এক্সটেনশনের কোনও আশা নেই। অফিসে আছে এই পর্যন্ত। তারাপদ বুঝল বংশীচরণ তার মতোই রাত থেকেই অফিসে চলে এসেছে। কালকে ধর্মঘট ভয়ংকর।

তারাপদ বসল বংশীচরণের পাশে। বংশী অবাক হল। এভাবে অনেক দিন অফিসের কেউ তার কাছাকাছি আসেনি। তারাপদকে চিনতে পারল সে, পেয়ে হাসল।

তারাপদ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর কেউ, ইউনিয়নের কেউ আসেনি তো?' বংশী ঘাড় নাড়ল। না। পোড়া বিড়িটা কানে গুঁজল সে।

দারুণ হাওয়া দিচ্ছিল। এতক্ষণের পরিশ্রমের পর শীত লাগছিল জোর। গঙ্গার বাতাসের দাপট বেশ। তারাপদ এবং বংশীচরণ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

'তোমার কয় ছেলে-মেয়ে বংশীচরণ?' তারাপদ আস্তে-আস্তে শুধাল।

'দশটাই মেয়ে। মাগী আবার বিয়োবে। ভগবানের হাত, আমি কী করব বলুন! তা এদের খাওয়াতে হবে তো। ধর্মঘটে চাকরি গেলে পেনসনটাও যে পাব না এটা কাকে বোঝাই বাবু!'

তারাপদ ঘাড় নাড়ল, 'এর চেয়ে ইংরেজ আমল ভালো ছিল।'

'ছিলই তো।' বংশীচরণ নড়েচড়ে বসল, 'পাকিস্তান হওয়ার আগে আমাদের কোন অভাবটা ছিল বলুন। আমরা তেরো ভাই। দুবেলা পাতে দুধ পড়ত। তা বাবুরা তো এসব কথা কিছু বোঝেন না। ধর্মঘটের ডাক দিয়েই খালাস।'

বংশীচরণ খুব দ্রুত অথচ ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থাকা বাড়ির দেওয়ালগুলো কথাগুলোকে সজোরে ফিরিয়ে দিচ্ছিল যেন। ওরা ক্রমশ জোরে কথা বলতে ভয় পেল। তারাপদ দেখল হাওয়ার দাপটে শীত করছে বংশীর। হঠাৎ চাদরের এক প্রান্ত খুলে সে বলল, 'নাও, একটু জড়িয়ে নাও হে, ঠান্ডাটা কমবে।'

বিব্রত হাতে বংশী জড়িয়ে নিল চাদরের কোণটা, 'শালা হাওয়া না তো, নতুন বিয়ানো গাই চাট মারছে—হি-হি— বাবা।'

ওরা দুজনে গায়ে গা দিয়ে এক চাদরের তলায় কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারাপদর এই মুহূর্তে বংশীচরণকে খুব নিজের লোক বলে মনে হচ্ছিল। তারাপদ বলল, 'কাল সকালে কোনও গোলমাল হবে না তো!'

'কী আর হবে। লোকে দুটো কুকথা বলবে, ছি-ছি করবে এই তো! তা চাকরি গেলে তো আর কেউ মাগ-বাচ্চার মুখে গ্রাস তুলতে আসবে না! অবশ্য, আমাদের দেখতে পেলে তো।' বংশী নির্বিকার।

তারাপদ গাঢ় গলায় বলল, 'তাহলে কাল রাতেই বেরুব, বুঝেছ। আমার সঙ্গে তিরিশটা লুচি আছে। খাবার কোনও ভয় নেই।'

বংশীচরণ যেন আমোদেই এবার খকখক করে কাশল। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে দিল, 'নিন ধরান। এক টানেই শীতকে মায়ের পেটে লুকোতে হবে।'

তারাপদ বিড়িটা ধরাল। আজন্ম সে কোনও নেশা করেনি কখনও। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বিড়িটা ধরাল। প্রবল কাশিতে বুক ফেটে গেলেও শব্দের ভয়ে তার মুখ থেকে একটা খকখক শব্দ বেরুল। অন্ধকারে দুটো আগুনের ফুলকি পরম আত্মীয়ের মতো জ্বলছিল আর নিবছিল।

কখন পুবের আকাশ ঘোর লেগেছে, হাওড়া স্টেশনের মাথায় মণির মতো জ্বলা নিওন আলোগুলো ফ্যাকাশে হয়েছে আর একটু-একটু করে অফিসবাড়িটার ছ-তলার অন্ধকার চোরের

মতো পালিয়েছে তারাপদরা টের পায়নি। ছ'তলার নিচে ট্রাম লাইনের শব্দ হচ্ছে। মানুষজনের কথাবার্তা, গঙ্গায় স্টিমারের ভোঁ, ঘুমভাঙা মহানগরীর আড়মোড়া ভাঙা এই সময়টায় ওরা আচ্ছন্নের মতো বসে রইল খানিক। তারপর যত বেলা বাড়তে লাগল তারাপদর বুকের ভেতর ছটফটানিটা তত বেড়ে যেতে লাগল। কাল সারারাত সে ঘুমোয়নি। বংশীচরণ হাঁটুতে মুখ গুঁজে রাত কাবার করলেও তারাপদ বড়বাজার পুলিশ আউটপোস্টের ঘণ্টা শুনে রাত কাটিয়েছে। এখন সে উঠল। চোরের মতো ইতিউতি দেখতে-দেখতে বাথরুমের কালো জলে মুখ ধুলো। না, এখন কেউ আসবে না। নিদেনপক্ষে দারোয়ানরাও নয়। অফিসাররা যে-যার ঘরের চাবি নিয়ে গেছে।

সময়ের হিসেব নেই। তবু রোদের রং দেখে বুঝল অফিস বসার সময় হয়েছে। অথচ কেউ নেই—কোথাও নেই। এর মধ্যে বংশীচরণ দুবার বলেছে, 'এবার বাবু বাক্সটা খোলেন, দুটো চড়িয়ে দিই।' খিদে তারাপদরও পেয়েছিল। এখন একটা টেবিলে টিফিন কেরিয়ারটা খুলে সমান লুচি ভাগ করে নিল সে। বেশ মিষ্টি গন্ধ। তরকারিটায় একটু টক গন্ধ ধরেছে। তারাপদ দেখল বংশীর বাটি শেষ। পনেরোটা লুচি যেন নস্যি। তারাপদর নিজের খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও গোটাচারেক মুখে তোলার পর শরীর গোলাতে লাগল।

দশটা বাজার খানিক পরেই অফিসাররা এল। তারাপদ সেই ঘুপচিতেই বংশীকে নিয়ে লুকিয়ে থাকল। মিত্তিরসাহেব সব ঘরগুলো খুললেন। অন্য অফিসাররাও সঙ্গে আছেন। বংশী বলল, 'শুনছেন।'

অবাক হয়ে তারাপদ শুনল, মিত্তিরসাহেব গলা খুলে হিন্দি গান গাইতে গাইতে দরজা খুললেন। যে মিত্তিরসাহেব দু-দিন আগে অর্ডিন্যান্স দেখিয়ে বলেছিলেন, 'দিস স্ট্রাইক ইজ ইল্‌লিগাল। যাঁরা আসবেন না, তাঁদের দায়িত্ব তারা নিজেরা নেবেন আর যাঁরা আসবেন, তাঁদের দায়িত্ব আমরা নেব।'

অফিসঘর খুলে দিয়ে অফিসাররা মিত্তিরসাহেবের ঘরে জমায়েত হলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল আজ আর কাজকর্ম কিছু হবে না। তারাপদ বংশীচরণের পিছুপিছু অফিসঘরে ঢুকল। সামনে বড়বাবুর টেবিল। টেবিলের ওপর ফোন, অ্যাটেন্ডেন্স খাতা সাজানো। অতবড় হলঘরটার সবক'টি টেবিল খাঁ-খাঁ করছে। বংশী অ্যাটেন্ডেন্স খাতাটা খুলতেই তারাপদর গা ছমছম করে উঠল। তারাপদ নামটা দেখলে পেল। জ্বলজ্বল করছে। বংশী বলল, 'সই করে দেন বাবু।'

তারাপদর কেমন যেন সাহস হচ্ছিল না। সই করলে কাল যদি ওরা দেখে ফেলে। তারাপদ দেখল, পিওনদের পাতাটা বের করে বংশী সই করল কায়দায়। করে খাতাটা তারাপদর দিকে এগিয়ে দিল। ঠিক এই সময় ফোনটা বেজে উঠল ফাঁকা ঘরে ঝনঝনিয়ে। ডাইরেক্ট লাইন। রিসিভার ধরতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল সে। কার ফোন কে জানে! আজ অবধি তারাপদর কোনও ফোন আসেনি কখনও। যদি ওরা করে! যাচাই করতে চায় উড়ো ফোন করে কে-কে অফিসে এসেছে জানতে। ফোন বেজে চলেছে। তিনবার চারবার—বারবার। বংশী ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ফোনটার দিকে চেয়ে আছে। পায়ের শব্দ পেল তারাপদ। তারপর দেখল দরজায় মিত্তিরসাহেব। রিং হচ্ছে দেখে ছুটে এসেছেন। এদের দেখেই থমকে দাঁড়ালেন যেন। তারপর গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো, স্পিকিং।' তারাপদ নিশ্বাস চেপে শুনলেন, 'আই অ্যাম মিঃ মিত্র, হুম ডু য়ু ওয়ান্ট?'

'কে এসেছে না এসেছে দ্যাটস নট ইওর বিজনেস!' বলে ঘটাং করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন মিত্তির সাহেব।'

'আপনারা!'

'আজ্ঞে।' তারাপদ হাত কচলাল।

হঠাৎ বংশীচরণ ঝপাং করে মিত্তিরসাহেবের পায়ের ওপর পড়ল, 'আমাকে বাঁচান স্যার।

চাকরি গেলে একদম সপরিবারে...' একটি গোঙানি দিয়ে কথাটা শেষ হল।

'কখন এলেন?' মিত্তিরসাহেব তারাপদকে জিজ্ঞাস করলেন।

'আমরা স্যার লয়াল সারভেন্ট। কাল রাত থেকেই আছি। আপনি আসতে বলেছিলেন...।' তারাপদ হাতজোড় করল।

'সই করেছেন?'

'না স্যার। ওরা যদি দেখে ফেলে—পরে করলে হয় না স্যার? মানে গোলমাল মিটে গেলে...।' সঙ্কুচিত তারাপদ।

'যা ভালো মনে করেন করুন, আমার কী বলার আছে!' বলে মেজাজি চালে বেরিয়ে গেলেন, তিনি।

কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল তারাপদ। এই যে মিত্তিরসাহেব সেদিন ঘরে ডেকে বললে 'ধর্মঘট না করলে সবরকম প্রোটেকশন দেওয়া হবে তার কী হল! তারাপদ স্থির করল, ক'দিন যাক, সাহেব তো দেখে গেলেন, তারপর একদিন সইটা করে দিলেই হবে।

এই সময় নিচে কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে বুঝতে পারল ওরা। স্লোগান চলছে সমানে। তারাপদরও ইচ্ছে হল একবার দ্যাখে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। কিন্তু যদি ওরা দেখে ফেলে। ভাবতেই হাত পা যেন শরীরের মধ্যে গুটিয়ে যায়। শ্লোগান আরও জোর হল। কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না সে। পায়ে-পায়ে জানলায় এসে দাঁড়াল। খড়খড়িটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মারল। ট্রামের তার ছাড়া ছ-তলার ওপর থেকে প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। বংশীর কৌতূহল যেন মাত্রা ছাড়িয়েছিল। ত্রস্তে ওর হাতটা সরিয়ে নিল তারাপদ, 'অ্যাই খবরদার, দেখে ফেলবে যে!'

কিছু বাদে তারাপদ আবার মুখ বাড়াল কিছুটা। হ্যাঁ এবার খুব দ্রুত তারাপদ দেখে নিল। অফিসের সামনে প্রচুর পুলিশ, পুলিশ ভ্যান, আর ওপাশের ফুটপাথে জনাদশেক ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার। তাদের অফিসের কয়েকজনকে দেখতে পেল সে। হাত নেড়ে স্লোগান দিচ্ছে, 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই।' কে যেন মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাতেই চকিতে মুখটা সরিয়ে নিল তারাপদ।

একটু বাদে খুব জোরে শব্দ হচ্ছে বুঝতে পারল ওরা। সম্ভবত টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটছে। হইচই চিৎকার স্লোগান ইত্যাদি শুনতে-শুনতে ওরা সমস্ত দুপুরটা কাটালো চোরের মতো সেই ঘুপচিতে। যেখানে কাল সারারাত কেটেছে। বিকেলে অফিসাররা আবার তালা লাগিয়ে নিচে নেমে যেতেই বংশী বলল, 'চলেন।'

খপ করে হাত ধরল তারাপদ, 'দাঁড়াও রাত হোক আগে, সবাই চলে যাক।'

রাত গড়াল, আবার হু-হু হাওয়া আসছে গঙ্গা থেকে উঠে। ওরা নামল পায়ে-পায়ে। এখনও বাতাসে চোখ জ্বালা করা ভাব আছে, সমস্ত তল্লাট ফাঁকা।

লাস্ট ট্রেন ধরে হৃদয়পুরে নামল তারাপদ। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না উঠেছে। বাঁশবন আর আশশ্যাওড়ার ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তারাপদ ক্লান্তি বোধ করল এই প্রথম। আকাশটায় রূপোর ঝাঁপি কে উপুড় করে দিয়েছে যেন। দূর থেকে দেখল সে, বাড়ির ছাদের আলসেতে নতুন বউয়ের চুল জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। নতুন বউও তাকে দেখতে পেয়েছিল, ছুটে এল নিচে, 'এত দেরি হল কেন গো, কিছু হয়নি তো, আমি যে চিন্তায় মরে যাই।'

তারাপদ হাসল, 'তা গোলমাল একটু হয়েছিল বইকি। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছিল।'

'সেকি! কে যেন বলল রেডিওতে বলেছে কলকাতায় খুব গোলমাল হচ্ছে। আর আমি এদিকে ঠায় দাঁড়িয়ে, মানুষটা সেই গতরাতে যে গেল এখনও এল না কেন? মা তো ঘরবার

করছে।' নতুন বউ পরম তৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলো বলছিল, 'তারপর কী হল?'

দাওয়ায় বসল তারাপদ, 'তা কাল রাত থেকে তো আমরা ঠায় জেগে। কাউকে ঢুকতে দেব না। পারেওনি কেউ। তা সকালবেলায় দেখি দু-একজন আসছে ইতি উতি তাকাতে-তাকাতে। তা আমাদের দেখেই যেন তুলসিপাতা। বলে ধর্মঘট দেখতে বেরিয়েছি। হুজ্জতটা বাধল দুপুরে। একজন বলল যাবেই, আমরা বললাম, কখনও না। ব্যস পুলিশ চালাল কাঁদানে গ্যাস।

নতুন বউ বড়-বড় চোখ করে শুনছিল। তারপর স্বামীর বুকের কাছে লেপটে বলল, 'কিছু মনে করো না গো, আমি ভাবতুম তুমি লোকটা কীরকম। সতু কেমন ভালো-ভালো কথা বলে, সবার হয়ে কথা বলে আর তুমি শুধু অন্য কথা বলো। আজ আমার খুব লজ্জা হচ্ছে গো। চলো ভেতরে চলো। মা বসে আছে।'

তারাপদ উঠল। তারপর আলেকজান্ডারের মতো ঘরে ঢুকল।

পরদিন খুব ভয়ে-ভয়ে অফিসে ঢুকল সে। কিন্তু একটু বাদেই বুঝতে পারল ভয়ের কিছু নেই। অফিসের সবাই ধর্মঘট নিয়েই ব্যস্ত। কোথায় সফল হয়েছে কোথায় হয়নি। পুলিশ কালকে ধর্মঘট ভাঙতে চেয়েছিল, পারেনি ইত্যাদি। টিফিনের সময় ইউনিয়নের নেতারা এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল, বলল, প্রস্তুত থাকতে যে-কোনও দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। ন্যূনতম ভাতা দিতেই হবে। তারাপদকে একজন নেতা সামনাসামনি দেখে কাঁধে হাত রেখে বলে গেল, 'অভিনন্দন কমরেড।' এবং তারপরই আজ সবার সঙ্গে সে আলোচনা করতে লাগল যেচে-যেচে। কোন কাগজ কী লিখেছে। কথা উঠল, কেউ অফিসে এসেছে কিনা। কাল নাকি একজন ঢুকতে চেয়েছিল, তাকে নিয়ে গোলমাল, পুলিশ টিয়ার গ্যাস চার্জ করেছিল। দালালটা আজ আসেনি। যা হোক, সরকারের মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যেকে যতই চেঁচাক, বুকের ভিতর একটা ভয় ওৎ পেতে বসে আছে যেন সবার।

সেদিন একটু বেশি কাজ করল তারাপদ। পাঁচটার অনেক পরে বেরুল সে। তখন অফিস ফাঁকা। করিডোরে আসতেই একটু থমকে গেল, মিস্টার মিত্তিরের ঘরের সামনে উবু হয়ে বসে আছে বংশীচরণ। ফুলে-ফুলে কাঁদছে। চোরের মতো সরে এল সে। আজ সারাদিন সে বংশীচরণের সঙ্গে কথা বলেনি। চেনেই না সে। এখন তার নিজেরই অবাক লাগছিল, কীভাবে একটা রাত একটা দিন ওই ঘেয়ো রোগগ্রস্ত লোকটার সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু শালা বুড়োটা কাঁদছে কেন? একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল তারাপদর মনে। কেউ কিছু শোনেনি তো আজ দিনভোর। শালা বেইমানি করবে না তো!

অত বড় লিফটে ও একাই নিচে নামল। বিকেল গড়িয়ে না যেতেই সন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কলকাতার রাস্তায়। শীতের বেলা যৌবনের চাইতেও দ্রুত চলে যায়। এখন হেঁটে শ্যালদা। ওঃ অনেকদিন বাদে একটু ভালো করে ঘুম হবে আজ, তারাপদ ভাবল, কাল রোববার।

ব্রেবোর্ন রোডের মুখে দাঁড়াতেই তারাপদ দেখতে পেল। ইউনিয়নের কয়েকজন নিচের দিকের কর্মী পানের দোকানটার পাশে জটলা করছে। তারাপদ লক্ষ করল, ওকে দেখেই সব চুপ মেরে গেল। কেন? তারাপদর পায়ের তলা ঘামছিল, তবু হাসল সে, 'সব ভালো তো?'

'এই আর কি! তারপর খবর কী?' নতুন ঢোকা একটা ছেলে বলল।

'চলে যাচ্ছে। আমার আবার খবর! ধর্মঘট মিটল!' তারাপদ সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'না, একটু বাকি আছে।' বলে লোকটি এগিয়ে এসে তারাপদের সাদা শার্টের কলার চেপে দাঁতে দাঁত ঘষল, 'শালা দালাল!' সন্ধের আকাশটা যেন ঝুপ করে তারাপদকে ঘিরে ফেলল, আর সে অনুভব করছিল যেন কয়েক লক্ষ রয়েল বেঙ্গল টাইগার তার মাংস খুবলে-খুবলে খাচ্ছে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

অনেক রাত্রে, গতকালের মতো শেষ ট্রেন ধরে তারাপদ হৃদয়পুরে নামল। কালকের চেয়ে

আজ যেন জ্যোৎস্নার রং পাকা হয়েছে। স্টেশনের পাশে কাঁঠালিচাঁপা গাছটা বড় সুবাস ছড়াচ্ছিল বাতাসে। নির্জন স্টেশনে কেউ নেই। তারাপদ অনেক কষ্টে পা টেনে-টেনে হাঁটছিল। শার্ট, ধুতি ছেঁড়া, মুখ ক্ষত-বিক্ষত, সর্বাঙ্গে রক্তের ছাপ ছড়ানো। সেই বাঁশঝাড় আর আশশ্যাওড়া ঝোপের মধ্যেকার পথ দিয়ে হাঁটতে তার বড় কষ্ট হচ্ছিল। তার মাথার চুলে রক্তে আঠার মতো চটচট করছে, একটা রাতের পোকা ওপর থেকে মাথায় পড়ে বুঝি আটকে গেল সেখানে। ওরাই ওকে শিয়ালদায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। শীতের শেষ ট্রেনে লোক ছিল না বিশেষ। যারা ছিল তাদের ওরা বলে গিয়েছিল, দালালটাকে হৃদয়পুরে নামিয়ে দেবেন। কামরার লোকগুলো কিছু জানতে চায়নি, কথাও বলেনি।

এই দারুন জ্যোৎস্নায় তারাপদর সর্বাঙ্গের লাল ছোপগুলো যেন জ্বলছিলই। আরও কয়েক পা যেতে তারাপদ ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে পড়া একটা আবছা মূর্তি পেল। নতুন বউ দূর থেকেই তারাপদকে দেখতে পেয়ে থ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রচণ্ড চিৎকার করে নিচে নেমে দৌড়ে তারাপদকে ধরল। সেই নির্জন রাত্রে গ্রামের সমস্ত স্তব্ধতা চৌচির হল নতুন বউয়ের চিৎকারে—'ও মাগো, তোমার এ কি হল গো, পুলিশগুলোর কি একটু দয়ামায়া নেই গো, তুমি কেন গেলে পুলিশের সামনে?' আশেপাশের সবাই এই মাঝরাত্তিরে ঘুম ছেড়ে ছুটে এল। নতুন বউ মাটিতে বসে তারাপদকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছিল আর ডুকরে-ডুকরে কাঁদছিল। তারাপদদের ঘিরে একটা জটলা পুলিশের অত্যাচারের গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে। পাড়ার যুবকরা জমায়েত হচ্ছিল। তারাপদ কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। নতুন বউ-এর কান্নাভেজা গলায় যেন একটা গর্বের সুর। কারণ তাদের ঘিরে জনতা বেশ বেড়ে গেছে।

আর তারাপদ, হৃদয়পুরের তারাপদ বিশ্বাস ক্রমশ চেতনা হারাতে-হারাতে একটা ঘোরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, ব্যাঙাচির মতো টুক করে লেজটা খসিয়ে ফেলল।



জননী

তিন-তিনটে শকুন মাথার ওপর পাক খেয়ে গেল। খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা, ডানায় শব্দ তুলে ওপরে উঠে গেল, অনেকটা ওপরে। জলে পা ডুবিয়ে ভেজা বালিতে আধা শোয়া বিন্দু দেখল ডানা টানটান করে মুখ ঝুঁকিয়ে ওরা ওকে লক্ষ করছে।

আকাশটা আজ সকাল থেকেই এইরকম। আধপোড়া কাঠের মতো চেহারা। নামছে না একটা ফোঁটাও অথচ আলো বলতে যেটুকু মরা মাছের চোখেও বুঝি তার চাইতে বেশি চটক। কেমন থম ধরে আছে চারদিক। তিন-তিনটি দিন কাঁদিয়ে ভাসিয়ে আজ এ কেমন ধারা গো।

নদীটার অবস্থাও হয়েছে তেমনি। বুড়ো সাপের মতো গতর। মতলব বোঝে কার সাধ্যি। বৃষ্টি নামার আগে বিন্দুরা দল বেঁধে সাঁতরাতো। দলেরই কেউ হয়তো দেখেছে, হুই যে কালো মুখ উঁকি মারে জল সরিয়ে, দাও ঝাঁপ দাও ঝাঁপা পলকে ক'টা শরীর জলে পড়ে শব্দ করে। চালাকি চলবে না বাপু, বুঝেসুঝে হাত বাড়াও। একটু জোর খাটিয়েছ কি মারবে এমন থাপ্পড় যে দেখবে তুমি এই চত্বরের কোথাও নেই। বেয়াদপি করতে গিয়েছিল হারান সেনের ছোট ছেলেটা, ওর হাড়মাংসগুলো পাওয়া গেল কিং-সাহেবের ঘাট ছাড়িয়ে কাশবনের চড়ায়। অতএব জলের

যেদিকে মতি সেদিকেই চলো, মাছের মতো তারই মধ্যে একটু এপাশ ওপাশ হও, দেখবে বুড়ি তিস্তা তোমাকে নিয়ে যাবে সেইখানে যেখানে কালোমুখ নৃত্য করে। যার সাহস বেশি, বুড়ি তিস্তা যাকে একটু দয়া করবে, সেই দেবে হাত। তারপর শক্ত হাতে হাল হয়ে স্রোত ধরে চলো ওটাকে নিয়ে, এক সময় ঠিক চড়ার গিয়ে ঠেকবে। সঙ্গে যারা এল গেল, তারা জলে চোখ জবা করে ফিরে যাবে আধ মাইল উজানে। আর যে পেল সে তো মহাখুশি। এখন শুকোক এ কাঠের গুঁড়ি। রোদ্দুর খাক দিনভোর। কোপ বসাও মনমতন, টাকায় দশ কিলো তো চোখ বুজে বিক্রি। সেই সক্কাল থেকে আসে মেয়েগুলো, খ্যানপাড়ার যত রাজবংশী মেয়ের ঝাঁক ওত পেতে থাকে।

আজ তিন-তিনটে দিন জব্বর বৃষ্টি। এই যে বিরাট বালির চরটা, এখানে কেউ পা রাখবে বুকের পাটা কার! বুড়ি তিস্তা খেপলে তার নিশ্বাসের সামনে কে আসবে গো! এই যে বুড়োর দাড়ির মতো কাশফুলগুলো, একটারও ঘাড়ে মাথা নেই। এই তিন দিন তিন রাত সব্বাই যে-যার ঘরে। আজ সকালে যখন আকাশটা কেমন চুপচাপ, বিন্দু একাই দৌড়ে এল বাঁধের ওপরে। আর এসেই শরীর হিম হল ওর। হা মা বুড়ি তিস্তা, তোমার এ কি চেহারা গো। মাটি খেয়ে-খেয়ে জলের রং এত কালো হয়। আই বাপ বুকে ভয় লাগে। আর কী মোটা হয়ে গেল নদীটা। নদীটারে বুড়ি কে বলবে এখন? স্রোতে কী ছোবল তার? ভর-বয়সের বিয়ের জল-খোঁজা ছুঁড়ির মতো চনমনে।

আর তারপরেই চোখ পড়ল। এই তিন দিন ধরে বিন্দু ভাবছিল। বুড়ি তিস্তার যেখানে জন্ম, সেই পাহাড়ে তো এখন রাম-রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চয়ই। হায় কত গাছ ভাঙল, কত মাঠ ভেসে গেল। আর এখন বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়েই ওর নজর গেল, স্রোতের টানে হাবুডুবু খেতে-খেতে চলেছে কালো মানিকের ঝাঁক। বিন্দু বাঁধ থেকে নেমে ছুটল। ভেজা বালিতে পা টানছে। ন-হাতি কাপড়টা সামলে ও হাঁপাতে-হাঁপাতে এসেছিল নদীর ধারে। বৃষ্টির আগে এর ডবল পথ হাঁটতে হত। কিন্তু কাছে এসে জলের গায়ে দাঁড়িয়ে বুকে থম ধরল বিন্দুর।

ও মাগো। বিন্দু বুকে হাত দিল। কী পাগলপারা ঢেউ গো। সেই সেবার রাক্ষুসী যখন চলে এসেছিল বাঁধ কেটে ওদের দাওয়ায়, সেবার চেহারা এমনতর ছিল। এটা কি বলে ফেলল ও, রাক্ষুসী কেন বলল? হেই মা, হেই বুড়ি মা, তিন-তিনবার গড় করল বিন্দু। তুমি আমাদের খেতে দাও পরতে দাও জননী গো, পাপ নিও না মা। বিন্দু মনে-মনে বড়ঠাকুরের পা ছুঁয়ে নিল একবার।

কিন্তু এ জলে নামবে কে? এই শোঁ-শোঁ শব্দ, উথালপাথাল ঢেউ। বিন্দু নদীর ওপর দিয়ে তাকাল। ওপারে যেখানে বার্নিশ ঘাটের দোকানগুলো আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিন্দুর চোখ বড় হল, বাপ্, কি বড়-বড় কাঠের গুঁড়ি ঠিক মধ্যিখান দিয়ে যাচ্ছে গো। হাত-কামড়ানো কপাল-চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এদিকে ধারের জলের টান কম। গাছের বাকল, ভাঙা ডাল ঘুরপাক খাচ্ছে এদিকটায়। বিন্দু শাড়ি পেঁচিয়ে জলে নামল। বুড়ি মাগো, এক বুক যাব, তার বেশি নয়।

বুড়ি তিস্তার জল এমনিতেই মাঘ মাসের হাওয়ার মতো, কিন্তু আজ এত শীতল কেন? হাড়মাস কেটে নিচ্ছে গো। কামটের মতো। জলের তলায় টুক করে আঙুল কেটে নিয়ে গেল, তুমি টেরও পেলে না। কাশফুলের মতো হালকা শরীর বিন্দুর, কোমর জলে ভাসালো। পাশের তলায় বালির গায়ে পলির সর জমছে, হাঁটবে সাধ্যি কি। আর সেই থেকে টুকরো কাঠ আর বাকল ধরেছে কোমরজলে দাঁড়িয়ে আর জমা করেছে ভাঙা কাশ গাছের গোড়ায়। তা এই করতে-করতে দু-প্রহর বেলা গেল গড়িয়ে, আকাশ দেখে বুঝবেটা কে? কাঠ জমেনি এমন কিছু। শেষপর্যন্ত হাঁপিয়ে গেল বিন্দু। চিত হয়ে শুয়ে রইল ভেজা বালির ওপর নিথর হয়ে। শুয়ে আকাশ দেখল। তিন-তিনটে শকুন চক্কর কাটছে। হিম বাতাস বইছে এখন। ভেজা শাড়ি, অঙ্গজুড়ে রাজ্যির শীত

আনছে। বিন্দু ভাবল, আর নয়, এবার ফিরতে হবে। খ্যানপাড়ার কোনও মেয়ে আজ আর আসেনি। এই জলে নামবে হিম্মত আছে কার? বাতাসে বিন্দুর শরীরে কাঁটা ফুটছিল। বিন্দু দেখল, খুব কাছাকাছি নেমে এসেছিল শকুনগুলো ডানার শব্দ তুলে, আবার ওপরে উঠে গেল।

আর এই সময়েই ওর চোখে পড়ল। পড়তেই তড়াক করে উঠে বসল ও। বেশ লম্বা, তা হাত দশেক হবে, বিন্দু আন্দাজ করল, একটা কাঠের গুঁড়ি এদিকে আসছে। আয়-আয় বাবা, এদিকে আয়। উত্তেজনায় বিন্দু উঠে দাঁড়াল, 'পাঁচ পয়সার বাতাসা মা, ও মাগো বুড়ি, মানত রইল, ঠেইলে দাও এদিকে, ঠেইলে দাও।' গুঁড়িটা ঢেউ-এর তালে দুলতে দুলতে, কি আশ্চর্য, অল্প জলে চলে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিল বিন্দু। জল টেনে টেনে গা ভাসাল খানিক। গুঁড়িটা আর এদিকে আসছে না। অনেকটা দূর চলে এসেছে বিন্দু। সমান্তরাল হয়ে চলছে গুঁড়িটার সঙ্গে। হেই মা বুড়ি, একি লোভ দেখালে মা, আমি ফিরব কেমন করে? এখনও অবশ্য বড় ঢেউ অনেক দূর। গুঁড়িটা এখটু এগিয়ে এসেছে। আহা বেশ মোটা গো। বিশ কিলো, না মণটাক তো হবেই। হাত বাড়াল ও। বুকের কাপড় খুলছে ঢেউ। পাক খেলো পেটের তলায় আঁচলটা। টানের চোটে গুঁড়িটা একটু সরে এলো। না, হল না। মুখ দিয়ে জল ছিটোল বিন্দু। বুকভরে বাতাস নিল। তারপর মরিয়া হয়ে আর একটু এগোল ও। এই-এই, ব্যস! হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। গুঁড়ি থেকে বেরুনো একটা ডাল এখন বিন্দুর মুঠোর ভিতরে। কী আরাম! বিন্দু চোখ বুজল। তারপর ডান হাতে জল কাটতে লাগল ও। একটু-একটু করে স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে-চলতে পায়ে বালি এল হঠাৎ। আঃ, বিন্দু দু-হাতে গুঁড়িটাকে টানতে লাগল। হেই বাপ, যা ভেবেছিলাম তা তো নয়। বিরাট বড়, সেই স্কুলবাড়ির গাছটার মতো গাছ হে। জল বলে টানা যায়। কিন্তু এখন এই যে চরে লেগে গেল তলাটা, এখন যে আর ওঠে না। প্রাণপণে শরীর বেঁকিয়ে কাদা মেখে খানিকটা ওপরে আনল বিন্দু। অর্ধেকের বেশি এখন জলে। বেশ গোটা গাছ। বিন্দু বালিতে উঠে এল। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে তাকাতেই বিন্দু লাফিয়ে একমানুষ দূরে ছিটকে পড়ল। হাইবাপ। কালসাপ গো। বিন্দুর বুকটায় কোনও বাতাস নেই যেন। ফ্যাল-ফ্যাল করে ও দেখল হেলতে-দুলতে একটা কালো গোখরো গাছের পাতা সরিয়ে সরসর করে বালিতে নামল। তারপর ফণা তুলে বিন্দুকে একবার দেখল। শেষপর্যন্ত হেলতে-দুলতে বালির ওপর দিয়ে ভাঙা কাশফুলের জঙ্গলে ঢুকে গেল সাপটা।

বেশ কিছুক্ষণ বিন্দু পাথর হয়ে রইল। তারপর একটু ধাতস্থ হতে পায়ে-পায়ে গাছটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর মনে হচ্ছিল সাপটার নিশ্চয়ই একটা সঙ্গী আছে। কয়েকবার তালি বাজাল। মনসা গো, হেই মা মনসা, অস্তি, অস্তি— চেঁচাল বিন্দু। একটা সাহস পেয়ে কয়েক মুঠো বালি ছুঁড়ে দেখল কিছু নড়ে কিনা। যা পাতা গাছটার।

এখন হবেটা কি! এই গাছ ফেলে যাবেই বা কী করে! কমসে কম এক কুড়ি টাকার গাছ। সেই গেঁজেলটাকে একবার ডাকবে নাকি! বলবে নাকি, পোয়া ভাগ দাম দেব, একটু হাত লাগাও। না, সে গেঁজেল আসবে না। ঘরের উনুন জ্বলবে না? কেন, বিন্দু কোথায়। পরনে কাপড় চাই? বিন্দুরে বল। গাঁজার পয়সা?—ও বিন্দু, বিন্দুমতি। কানের লতি গরম হয়ে গেল ওর। পুরুষমানুষ, জমি নেই, লাঙল নেই, কিন্তু তাই বলে গতরও কি থাকতে নেই। মোষের মতো তো চেহারা, গাঁজা খাবে আর ঝিমুবে। দুটো পাঁচটা কাজ বলো, ফেরিঘাটে মোট বইতে বলো, সে দূরের কথা, গতর থাকলে কি এই আট বছরে বিন্দুকে বাঁজা থাকতে হয়! মরণ-মরণ। হেই বুড়ি তিস্তা, তুমি তো সর্বখাকী, ওটারে—। চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা আক্রোশের বশে ও গাছটাকে নিয়ে টানাটানি করল খানিক। আর সেই সময়েই ওর নজর পড়ল।

নজর পড়তেই ও একদম সিধে, কলাগাছের মতো কাঁপন শরীরে। একি হল, হেই মা, এটা কি দিলে। বিন্দু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।ও ভয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে

উঠল। এখন টিপ- টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিরাট তিস্তার চরটা জনমানব শূন্য। বিন্দুর গলার শব্দ বালির ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল। তিস্তার বুকে রাগী মোষের মতো অজস্র ঢেউ-এর গোঁ-গোঁ দাপানি। বিন্দু চোখ বড় করে দেখল, কেউ নেই। জলপাইগুড়ি শহরের গা ছুঁয়ে এলাকা ওদের, খ্যানপাড়ায় মানুষ নেই নাকি। একটু বাদে, বুকের শব্দটা কমে এলে ও জলে নামল। কোমরজলে যেতে হল না, তার আগেই ও পরিষ্কার দেখতে পেল। ঢেউ-এর তালে-তালে শরীরটা এখন দুলছে না। শরীরটা নয়, শরীর দুটো। একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে মিশে রয়েছে। বিরাট গাছটার ডালপালায় শরীর দুটো ঢাকা। পুরুষটার দুটো হাতের মুঠিতে গাছের ডাল ধরা। মুখ বুকের ওপর গোঁজা। পুরুষটার শরীর ধরে ঝুলছে মেয়েছেলেটা, মুখ হাঁ করে। পুরুষটার বউ নাকি! বেঁচে আছে নাকি।

দাঁতে দাঁত চেপে বিন্দু পুরুষটার হাতের মুঠো গাছের ডাল থেকে টেনে ছাড়িয়ে আনল। কি শক্ত বাঁধন। হায় গো। তারপর জলের ওপর দিয়ে টানতে লাগল ও। পুরুষটাকে জড়িয়ে ধরেছে যে মেয়েটা তার হাতের বাঁধন একটুও আলগা হল না। বউটার মুখ জলে গোঁজা। কচুরিপানার শেকড়ের মতো রাশরাশ চুল ভাসছে। পুরুষটাকে টানতে বউটাও উঠে আসছিল চরের দিকে, বিন্দুর বুকটা কেমন করছিল।

বালির ওপর ওদের এনে বিন্দু লাফিয়ে চলে এল পুরুষটার মাথার কাছে। তারপর ঝুঁকে পড়ে হাত নিয়ে এল পুরুষটার নাকের কাছে। না, বাতাস নেই। শরীরটা ফুলে ঢাক। জামাকাপড়ে মাংস চেপে বসেছে। ক'দিনের মড়া কে জানে। বউটার মুখ বালির ওপর পাশ ফিরে আছে। উপুড় হয়ে শোয়া। বউটার বয়স কম, সুন্দরই। বিন্দুর থেকে তো কম নিশ্চয়ই। মুখ চোখ দেখে তো সুন্দরই লাগে। বিন্দু দেখল, বউটার বাঁ-নাকের পাটায় ফুটো, আর তাতে একটা সুতো জড়ানো। অজান্তে নাকে হাত দিল বিন্দু। না, তার নাক সে ফুটোতে দেয়নি। এই নিয়ে মায়ের কি রাগারাগি। আট বছরের বিন্দু গোঁ ধরেছিল, না, আগে নাকছাবি এনে দাও তবে নাক ফুটোব। হলুদ সুতো পরব না। এখন এই বউটার জন্যে হঠাৎ মায়া হল। আহা বেচারি।

পুরুষটার হাত ধরে টানতে লাগল বিন্দু। হেই বাপ্, কি ভারী শরীর। জলে বোঝা যায়নি। জলে শরীর খেয়ে নেয় যে। বিন্দু প্রায় ঝুঁকে পড়ে পুরুষটাকে টানতে লাগল। বলা যায় না, যদি সত্যি না মরে থাকে। সেই সেবার কাকে যেন মড়া বলে জলে ফেলা হল, সাত বছর পরে সেই আবার বিড়ি ফুঁকতে- ফুঁকতে ফিরে এল। কথায় বলে জলের মড়া না মাটির সরা। মাটিকে জল দাও গলে যাবে। কিন্তু মাটির সরায় প্রাণভর জল খাও, থাকবে। এও তেমন। জলে-জলে জীবন পায়। গোড়ালি বালিতে বসে যাচ্ছে বিন্দুর, কপালে ঘাম জমেছিল। বালিমাখা শরীর কাদাখোঁচা পাখির মতো কাঁপছিল। টানতে-টানতে ওদের অনেকটা উঁচুতে, প্রায় কাশফুলের জঙ্গলের গায়ে এনে ফেলল ও। বউটার হাতের বাঁধন একটুও আলগা হয়নি। বালির ওপর দুটো শরীর লাঙলের মতো মোটা দাগ কেটে এসেছে। বিন্দু হাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্রমশ ওর কেমন ভয় করতে লাগল। এই নির্জন নদীতীরে দুটো মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ও কেমন একা বোধ করতে লাগল। অথচ এই এতক্ষণ, জল থেকে ওদের টেনে তোলার সময় ওর মধ্যে এই ভয়টা ছিল না। বিন্দু মুখের কাছে দু-হাত মেলে দেখল। না, লেগে নেই। ওর শরীর হঠাৎ শিরশির করে উঠল। আর তারই দমকে বিন্দু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বাঁধের দিকে, বাঁধের পেছনে একহাঁটু কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা খ্যানপাড়ার দিকে। নদীর বুক থেকে একরাশ ভিজে হাওয়া বিন্দুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল যেন, বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

পাড়ার ভেতর এসে বিন্দু থমকে দাঁড়াল। বাইরে কেউ কোথাও নেই। বৃষ্টির জোর বাড়ছে। কাকে বলবে ও। সুরেন সেন পাড়ার মাথা। লোকটার চোখ সব সময় বিন্দুকে দেখলেই চকচক করে। নুলো হ। এখন তো সব যে-যার ঘরে। একবার চেঁচাবে নাকি? বিন্দুর চকিতে গাছের গুঁড়িটার

কথা মনে পড়ে গেল। ভিড় জমলে তো আর পাঁচটা হাত গাছে পড়বে না। ক-জনকে সামলাবে ও। এই তিনদিন তো সবাই বেকার। মাছ জল ছেড়ে উঠে এসেছে। পাঁড়ার একহাঁটু কাদা ঠেঙিয়েও সবাই ছুটবে। না, চেঁচানো চলবে না।

বিন্দু কাপড় সামলে নিজের দাওয়ায় উঠে এল। বুড়ি শাশুড়ি তেমাথা হয়ে কোণায় বসে। বিন্দু দেখেও দেখল না। সোজা ঘরে ঢুকে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'হেই, উঠ উঠ উঠ না কেন।' বিন্দু হাত ধরে ঝাঁকাল। বিন্দুর স্বামী হাঁ করে কী ভাবছিল, থতমত খেয়ে বউকে দেখল। তারপর কাদাবালি মাখা ভেজা শাড়ি জড়ানো অদ্ভুত চেহারাটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে মুখটাকে ছুঁচলো করল।

'আঃ, মরণ আমার। একবার নদীর ধারে চল কেন।' বিন্দু ছটফট করছিল।

'বিরাট গাছ ধরেছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ ! মড়া।'

'মড়া? মড়া তুই পালি কোথা?' এবার লোকটা উঠে বসল।

'ওই গাছের সঙ্গে ছিল যে।'

বিন্দু দেখল গেঁজেলটা কি ভাবল খানিক। তাকপর 'চল' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এত সহজে ওকে ঘর থেকে আনতে পারবে, ভাবেনি বিন্দু। লোকটা এবার বৃষ্টি দেখল তারপর মাটিতে নামল। বিন্দু চকিত দেওয়ালে গোঁজা দা-টা টেনে নিয়ে স্বামীর পেছন ধরল। গাছটাকে কেটে-কেটে ছোট করতে হবে।

ওরা দুজন প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছিল। যদিও পাড়ার কেউ বাইরে নেই, তবু বিন্দুর সঙ্গে ওর স্বামীকে হেঁটে যেতে দেখলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। এ দৃশ্য খুবই অচেনা সবার। ওরা বাঁধের ওপরে উঠে এলে বিন্দু দৌড় লাগাল। বাতাসে ওর চুল কাপড় উড়ছিল। ওর তর সইছিল না। বৃষ্টি মাথায় করে ও ছুটছিল নদীর দিকে ভেজা বালি মাড়িয়ে। ওর স্বামী দৌড়বার চেষ্টা করল না। মুখ বেঁকিয়ে দাঁত চেপে গজরাল, 'হেই বাঁজা মেয়েমানুষটা, দৌড়াস কেন রে, ফূর্তির পোকা মাথায়, অ্যাঁ!'

বিন্দুর কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। দৌড়ে ও যতই নদীর কাছাকাছি আসছিল ততই ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নদীর গায়ে এসে ও থপ করে বালিতে এসে পড়ল। না। গাছের গুঁড়িটা নেই। জল বেড়েছে, বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। হেই মা বুড়ি তিস্তা, এটা কীরকম বিচার মা। পাঁচ পয়সার বাতাসা মানত দিলাম তোমারে। বিন্দু আশেপাশের জলে গাছটাকে খুঁজে পেল না। স্রোত কখন এসে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

অবসন্ন হয়ে বিন্দু দেখল অনেক দূরে বালির ওপর দিয়ে ওর স্বামী আসছে। ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। এই গেঁজেলটা ওর যম, ওর অপয়া। বিন্দু রাগে একদলা থুথু ফেলল বালিতে। তারপর মুখ তুলে দেখল মড়া দুটো কাশফুলের গোড়ায় তেমনি পড়ে আছে। আর হ্যাঁ, শকুন তিনটে খানিক দূরে, যেন ওকে দেখেই সরে দাঁড়াল।

খানিক বাদে গেঁজেলটা এসে গেল। এসে কোমরে হাত রেখে মড়া দুটোকে দেখল। তারপর বলল, 'বাহা, বেশ ডাগর বউ হে! শরীরখানা জব্বর।' সঙ্গে-সঙ্গে বিন্দুর মাথাটা ঘুরে গেল। যেন চৈত্তির মাসের ভরদুপুরে উনুনে হাত রাখল সে, দাঁতে ঠোঁট চাপল ও। মেয়েছেলের ন্যাংটো বুক দেখে নোলা ঝরছে। বিন্দুর হাতের মুঠো দা-এর বাঁটে শক্ত করে বসল।

জরিপ করছিল লোকটা। তারপর বলল, 'কী করবি লাশ দুটো নিয়ে, হ্যাঁ?'

বিন্দু কোনও জবাব দিল না।

গেঁজেলটা ঠোঁট ছুঁচলো করে একবার চুকচুক শব্দ করল। তারপর চার পাশ দেখে নিয়ে এক গাল হাসল, 'তোর কাঠ কই, অ্যাঁ!'

বিন্দুর বুকের মধ্যে যেন পোড়া কাঠের ছেঁকা লাগছিল। ওর হাতের মুঠোয় ধরা দা-টা

এখন কাঁপছে তিরতির করে।

গেঁজেলটা এবার মড়া দুটোর চারপাশে একবার চক্কর মেরে নিল। তারপর হাঁটু গেড়ে পুরুষটার পাশে বসে টেনে হিঁচড়ে বউটার হাতের বাঁধন খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল। পুরুষটা একটু কাত হয়ে গিয়েছিল। জলে ভিজে শ্যাওলা রঙের শরীর কেমন নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে, বেঢপ হয়ে। গেঁজেলটা এবার চটপট হাতে পুরুষটার জামা ধরে টানাটানি করতে-করতে কলার খোলার মতো শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর বিন্দুর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এর আর জামার কি দরকার বল। প্রাণ উড়ে গেলে শরীর মাটি হয়।' বলে কোমরের কসি কাদামাখা খুলে ধুতিটাও সরসর করে খুলে নিল। ফুলে যাওয়া শরীর থেকে কী করে জামাকাপড় খুলে নিল গেঁজেলটা, বিন্দু চোখ চেয়েও বুঝতে পারল না।

একদম উদোম হয়ে পড়ে রয়েছে পুরুষটা। জল খেয়েছে জব্বর। জলে শরীর যেন শুষে নিয়েছে। গেঁজেলটার লোভ সারা অঙ্গে। বিন্দু দা হাতে উঠে দাঁড়াল। এই সুযোগ, কেউ নেই, ব্যাপারটার সাক্ষী কেউ নেই। হেই মা তিস্তা, পাপ নিও না গো।

জামাকাপড় থেকে ভালো করে জল নিংড়ে কাঁধে ফেলে বউটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল গেঁজেলটা। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বউটা। বুকের পাশে খুলে যাওয়া আঁচলটা তুলে গেঁজেলটা বলল, 'আই বাপ, নতুন কাপড় হে।' বলে হিড়-হিড় করে টান দিল, যেন নৌকোর গুণ টানছে। বিন্দু দেখল বউটার শরীর কয়েক পাক সরিয়ে কাপড়টা খুলে এল।

কাদামাখা শাড়িটা নিয়ে গেঁজেলটা দু-পা এগিয়ে এল, 'নে ধর, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীর মতো দেখায় যে তোরে। নে-নে পরে নে ক্যান।' তারপর গোপন কিছু বলছে এমন মুখ করে বলল, 'শুনিস নাই, মৈথুন সাপের অঙ্গছোঁয়া বস্ত্র খুব পয়মন্ত। এরাও তো সাপের মতো। জলে ভেসে এল যে।' বিন্দুর দিকে শাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বাঁধের দিকে কয়েক পা হেঁটে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'লাশ দুটো জলে ফেলে দে রে, ভেসে যাক। শালা জবাব দিতে-দিতে প্রাণ ভোর হয়ে যাবে কিন্তু।

কী বলল গেঁজেলটা? মৈথুন সাপের কথা বলল কেন? বিন্দু হতভম্ব হয়ে পড়ল। সত্যি নাকি? বিন্দু ভাবতে পারছিল না কিছু। যেভাবে ওরা জড়িয়ে ছিল—হে মা মনসা, তাই কি তুমি গাছ থেকে নেমে এলে? বিন্দু ক্রমশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

শাড়িটা দেখল। নতুন শাড়ি। জলে ভিজে কেমন আঁশটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্ষার দিয়ে কেচে নিলেই হবে। এই মুহূর্তে কাঠ হারাবার দুঃখও ভুলে গেল।

লাস দুটো পরে আছে। বিন্দু পুরুষটার পা ধরে আবার টানতে লাগল। টানতে-টানতে এক সময় বালির ওপর থেকে নামিয়ে তিস্তার জলে ফেলল ও। এখন শরীরের দিকে তাকানো যায় না। ঘেন্না ঠিক নয়, কেমন লজ্জাই করে যেন। একবার যখন বউ-এর বাঁধম খুলেছে তখন আর কেন। পা দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দূরে চলে গেল লাসটা। তারপর স্রোতের টানে ঘুরপাক খেয়ে পলকে উধাও।

এত ভারী কেন বউটা। পুরুষটার চাইতে ভার বেশি। জল খেয়েছে খুব। বউটার শরীর ধরে বিন্দু এবার টানছিল। ওর কপালে সদ্য জাগা ঘাম বৃষ্টির জলে মুছে যাচ্ছে। খুব কষ্ট হল ওর বউটাকে জলের কাছে আনতে। একটা হ্যাঁচকা টানে বউটাকে ও জলে নামিয়ে দিল। টানের চোটে ঘুরে গেল শরীরটা, ঘুরে চিত হল। আর তখনই বিন্দুর সারা শরীর থেকে একটা চিৎকার ছিটকে বেরিয়ে এল। মুখে আঙুল দিয়ে ও কাঁপতে-কাঁপতে ঝুঁকে পড়ল। এতক্ষণ ও বুঝতে পারেনি, ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। উপুড় হয়ে ছিল বলে নজরে আসেনি। এখন চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়,. ভর-মাসের পেট। হেই মা গো!

ওটা কি। বিন্দু দেখল নাইয়ের পাশে বউটার চামড়া টানটান, পেটটার একটা দিক খোঁচা

হয়ে উঠে আছে। ভেতর থেকে সেটা ঠেলছে নাকি। বিন্দুর শরীরে লক্ষ কদমফুল চনবনিয়ে উঠল এবার, ওর কেমন ঝিমুনি এসে গেল। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতল বিন্দু, যদি কোনও শব্দ হয়। না, নিথর একদম নিথর। বড়-বড় চোখে বিন্দু দেখল, নাই থেকে একটা কালো রেখা নিচে চলে গিয়েছে সোজা। এর মানে ছেলে হবে। পেটের ভেতর বন্দি থাকা সেই মাণিকটার এখন কি করে! হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল ও।

তারপর বিন্দু যখন এক সময় হাত সরিয়ে নিল তখন বউটার শরীর দুলতে-দুলতে জলের তালে সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই তিনটে শকুন যেন নাচতে-নাচতে বালির ওপর দিয়ে এগোচ্ছে পাখা ফুলিয়ে। তারপর তিনজনেই আলতো উড়ে গেঁজেলটার মতো একটা চক্কর কেটে বউটার শরীরে গিয়ে বসল।

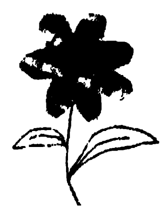
বিন্দু চিৎকার করে উঠল। এখনই ঠোকরাবে গো। হেই বুড়ি তিস্তা, ওরে ডুবায়ে দাও, জননী গো। হাঁটুজলে নেমে মুঠোয় ধরা কাপড়টা ছুঁড়ে মারল বিন্দু। ওই গেঁজেলটা—আমার পাপ। আবরণটা থাকত, একটু আড়াল। না, বিন্দু দেখল, শাড়িটা বউটার শরীর পর্যন্ত পৌঁছল না।

শকুন তিনটে দেখছে এক চোখে। জলের কিনার ধরে বিন্দু দা-টা মাথার ওপর তুলে হেই-হেই শব্দ করে ছুটছিল। বউটার নাই-এর পাশে বসেছিল যেটা, আলতো করে এবার ঠোকর বসাল। আর বিন্দু তখন তীব্র চিৎকার তুলে হাতের দা-টা ছুঁড়ে মারল শকুনগুলোর দিকে। শনশন শব্দ তুলে হাওয়া কেটে বউটার পেটে গিয়ে বিঁধল সেটা। আচমকা আক্রমণে শকুনগুলো লাশ ছেড়ে উঠল ওপরে। উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল।

দা-টা বিঁধে যেতেই বিন্দুর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। টানটান পেটে দা-টা কি সহজে ঢুকে গিয়ে অনেকখানি চামড়া চিরে ফেলেছিল। আর তার ফাঁক দিয়ে সেই খোঁচা হয়া জায়গাটা যেন লাফিয়ে বেড়িয়ে এল। বিন্দু দেখল একটা প্রায় পুরুষ্ট হাত সোজা পেট থেকে উঠে এসেছে। তার মুঠো যেন আকাশের দিকে বাড়ানো।

বউটার শরীর এবার স্রোতের টান পেল। সেই নির্মল হাতটার দিকে বিন্দু লোভীর মতো তাকাল। শকুন তিনটে ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একটা গাছের গুঁড়ির মতো সেই নির্জনে নদীতীরে দাঁড়িয়ে বিন্দু দেখল, একটা নরম নিটোল হাত আকাশটাকে মুঠোয় করে কী গভীর সুখে বউটাকে পালের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল।



আঙরাভাসা

তারপরে এক সময় দিনটাও ফুরিয়ে গেল। আমাদের বাড়িব সামনে পাতাবাহারের গাছগুলোর ওপর নেতিয়া পড়া হলদে রোদটা টুক করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আরও দূরে, আঙরাভাসা নদীর শরীর ছুঁয়ে যে বিরাট খুঁটিমারির জঙ্গলটা দিনরাত গুম হয়ে বসে থাকে তার মাথা ছুঁয়ে লাল বলের মতো সূর্যটা, যাকে আমি আজ সকাল থেকে বুকের ভেতরে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, কেমন করে ব্যাডমিন্টনের ককের মতো চোখের আড়ালে ঝুলে পড়ল, একরাশ অন্ধকার ছড়িয়ে দিল আমাদের বাড়ির চারপাশে। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল।

এই রাত, শীতের এই ছোট্ট রাতটা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে

হবে। দাদুর চিঠি এসেছে শহর থেকে। আমার স্কুল খুলছে। পরীক্ষা এসে গেল বলে। আমার প্রাইভেট মাস্টারমশাই শ্রীশবাবু রোজ-রোজ এসে ফিরে যাচ্ছেন। ওখানে সেই ভোর চারটের সময় ঘুম-চোখে উঠে কম্ফর্টার জড়িয়ে দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যেতে হবে, ফিরে এসেই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়া, তারপর স্কুল, স্কুল থেকে ফিরলেই শ্রীশবাবু নস্যির ডিবে নিয়ে আসবেন, আবার পড়া, আমি মরে যাব।

আজ আমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। উঠে বাড়ির পেছনে শিউলিগাছ ঝাঁকিয়ে সাজি ভরে ফুল কুড়িয়েছি। টাটকা শিউলি ফুলের গন্ধ সকালের বাতাসে আমার দারুন লাগে। এসব তো আর কাল পাব না। গালচের মতো সবুজ চা-পাতার বনে সারাটা সকাল ঘুরেছি। কী ভীষণ ভালো লাগে! আর মাকে লুকিয়ে আঙরাভাসা নদীতে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছি। ছোট নুড়িবিছানো হাঁটুজলের নদী। নদীর কোথায় কী পাথর আছে না আছে তা আমি জানি। সেই হলদে রঙের বড় পাথরটার নিচে লাল-লাল চিংড়িগুলো গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, হাত বাড়ালেই হল। হায়, কাল থেকে আমি আর চিংড়ি ধরতে পারব না। পুজোর ছুটিটা কেমন দ্রুত, মুখের ভেতর নরম চকলেটের মতো দ্রুত গলে মিলিয়ে গেল। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ।

আমাদের এই বাংলোটা বেশ বড়, অনেকগুলো ঘর। এই বাংলোর আনাচে-কানাচে কী আছে আমি সব জানি। কিন্তু জেনে আর কি হবে। কাল থেকে তো আর আমি থাকছি না। আমার বই-এর ব্যাগটা ড্রেসিং টেবিলের পাশের তাকে রয়েছে যেদিন ছুটিতে প্রথম আমি এখানে আসি সেদিন থেকেই। ও ব্যাগ খোলা হয়নি একদিনও। বাবা খুব রাগারাগি করতেন কিন্তু মা কিছু বলতেন না, আমারও ইচ্ছে করত না।

রাত আরও গভীর হলে, সাঁওতাল লাইনে মাদলের শব্দ উঠলে হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় বাংলোর কাঠের দেওয়ালে আমার ছায়া কাঁপতে দেখে আমার মনে হল আমার বাবা খুব খারাপ লোক, আমার মা-র মনে একটু দয়া নেই, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আমাকে আবার ইংরেজি পড়তে হবে। শ্রীশবাবু রাত্তিরে অঙ্ক করাতে-করাতে কান মলবেন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আর পাশের ঘর থেকে বাংলা খবর শুনতে- শুনতে মাঝে-মাঝে দাদু চেঁচিয়ে বলবেন, 'প্রশ্রয় দেবেন না মাস্টারমশাই, মারুন, ভালো করে মারুন, শাসন না করলে আসন পাবে না বড় হলে।' আমি এবার ক্লাস ফাইভে উঠব।

মা আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন, আমি বুঝতে পারি। সেই মাকে আমি আজ সকাল থেকে বোঝাতে পারিনি, রাজি করাতে পারিনি। অতএব কাল আমাকে চলে যেতেই হবে। আমার চোখের সামনে মা আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলেন। কাল সকালে বাবা আমাকে বাসে তুলে দেবেন ঠিক ছিল। সেই বাস আমাকে এই চা-বাগান, ফরেস্ট, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি পেরিয়ে তিস্তা নদীর বার্নিশঘাটে পৌঁছে দিত। কিন্তু আজ খবর পাওয়া গেছে তিস্তা নদী নাকি ফুলে-ফেঁপে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আজ দুপুরে বাবা বলছিলেন মাকে। একটু হলেই নাকি একটা নৌকা ডুবে যেত। তারপর নৌকা চলাচল বন্ধ। এখন ওদিকে যাওয়ার তো কোনও কথাই উঠতে পারে না। শুনে আমার যা আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু না, বাবা অন্য ব্যবস্থা করেছেন। কাল সকালে বাজারের ব্রজেন ডাক্তার শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। এখান থেকে সাত মাইল দূরে বানারহাট স্টেশন। ওখান থেকে ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি। ব্রজেন ডাক্তার আমাকে জলপাইগুড়ির ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে যাবে। আর দাদু আমাকে জলপাইগুড়িতে সেই ট্রেন থেকে নামিয়ে নেবেন। অর্থাৎ আমাকে যেতেই হবে।

রাত্তিরে মায়ের কাছে, মায়ের বুক লেপটে শুয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, একবার আমার পায়ে নতুন জুতোয় ফোস্কা পড়েছিল বলে পরদিন আমি আর জুতো পরতে পারিনি। আর তখন বাবা বলেছিলেন খবরদার, ছোটলোকের মতো খালিপায়ে বাইরে বেরুবে না। আচ্ছা, এখন যদি আমার পা কেটে যায়, যদি আমি জুতো পরতে না পারি, তাহলে তো আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে

যাবে। পা কাটলে জুতো পরবই বা কী করে। ভীষণ ভালো লাগল উপায়টা বের করে। আমি নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে আমার পেন্সিল কাটার ব্লেডটা খুঁজে বের করলাম। তারপর বিছানায় ফিরে এসে মায়ের দিকে পেছন ফিরে বসলাম। পেন্সিলে ব্লেড ছোঁয়ানো মা পছন্দ করে না। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো বেশ কচকচ করে কাটে। এখন অনেক রাত। মা ঘুমুচ্ছে! সাঁওতাল লাইনে মাদলের শব্দ আর অস্পষ্ট গানের সুর ছাড়া আর কিছুই আমি শুনতে পেলাম না। আমি ব্লেডটা পায়ের ওপর বোলাতে-বোলাতে জোরে চেপে ধরলাম। একটু চিনচিন করে উঠল। আমি আঙ্গুলে চটচটে রক্ত অনুভব করলাম। কেটে গেলে ব্যথা লাগবে—এ বোধ একবারও মাথায় আসেনি। বরং এখন আমার বেশ ভালো লাগল। আমার পা কেটে গেছে, আমি জুতো পরতে পারব না, তাই আমার যাওয়াও হবে না। একটা নিশ্চিন্ত খুশি নিয়ে সাঁওতালদের মাদলবাজনা শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে, খুব ভোর সকালে ঘুম ভাঙতেই আমার মনের মধ্যে ছটফটানি শুরু হল, আমাকে যেতে হবে। আমার পাশে শোয়া ঘুমন্ত মায়ের মুখ দেখতে-দেখতে আমার মনে পড়ে গেল আমার পা কেটে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলাম। আমার খুব রোমাঞ্চ হচ্ছিল। আমি উত্তেজিত হয়ে মাকে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকতে লাগলাম। মা অবাক হয়ে চোখ মেলতেই আমি হুমড়ি খেয়ে বললাম, 'দ্যাখো- দ্যাখো মা, আমার পা কি ভীষণ কেটে গেছে দ্যাখো, কী ব্যথা, আমি জুতো পরব কি করে!'

মা ধড়মড় করে উঠে বসে আমার ডান পা-টা তুলে ধরলেন, ধরে জিগ্যাসা করলেন, 'কই, কোথায়?'

আমি উপুড় হয়ে দেখাতে লাগলাম। সরু চুলের মতো একটা দাগ। অল্প লালচে আভা তার চারপাশে। মা বললেন, 'কাটল কি করে?' আমি তখন বিছানার চাদরের আশেপাশে খুঁজছিলাম অনেক রক্তের দাগ, গাদা-গাদা রক্ত। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও একটু চিহ্ন অবধি নেই। আঙুলে পা টিপলেন মা, আমার একটুও ব্যথা লাগল না। আর অবাক কাণ্ড, সরু চুলের মতো কাটা দাগটা যেখানে, যে দাগটাকে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখা ব্লেডটা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে দিলেও আমার আক্রোশ যেত না, সেই দাগটা পায়ের যেখানে সেখান অবধি আমার জুতো পৌঁছায় না। বোধহয় আমার মুখের অবস্থা দেখেই মা হেসে উঠলেন শব্দ করে আর আমি, আমার চোখ ফেটে জল এল।

মা আমাকে ভালো করে খাইয়ে দিলেন। আমার ছোট্ট সুটকেসটা যেটা আমি সহজেই বইতে পারি সেটাকে ভালো করে গুছিয়ে দিলেন। প্রথমে কথা ছিল দাদুর জন্যে বাড়ির পুরোনো গাছের ভালো রসের এক বস্তা কাঁঠাল সঙ্গে দেওয়া হবে। কিন্তু বাবা কী ভেবে সেটাকে বাতিল করলেন। ব্রজেন ডাক্তার এসে গেছেন। বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে তাঁর গলা পাচ্ছি। আমার কিছুই বলার নেই। এরা কেউ চায় না যে আমি এখানে থাকি। জুতো জামা পরে ভিতরের উঠোনে নেমে এলাম। ছোট মজঃসলপুরী লিচুর ঝাড়, বুড়ো কাঁঠাল গাছ, গোয়াল থেকে কালীগাই হাম্বা-হাম্বা ডাকছে—আমি যাব বলে মা ওর দিকে নজর দেওয়ার সময় পাননি, আর বাড়ির পেছনে আমার খেলার নদী আঙরাভাসা—কী ভীষণ মায়ায় আমি চেখে-চেখে দেখলাম। তারপর আমি যেমনটি ঠিক করে রেখেছিলাম, পেয়ারাগাছের তলায় যেখানটায় ছেলেবেলা থেকে আমি এক্কা-দোক্কা খেলতাম সেই জায়গা থেকে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে আমার ছোট্ট রুমালে ভালো করে বেঁধে পকেটে রাখলাম। শহরে গিয়ে দাদুর বাড়িতে একটা ভালো জায়গায় মাটিটা রেখে দেব। আর রোজ সকালে একবার করে যখন মাটিটাকে দেখব তখন এই চা-বাগান, এই আঙরাভাসা, এই চেনামাটির গন্ধটাকে আমি অনুভব করতে পারব। ওরা আমাকে কেউ চলে যেতে বলেনি তো!

বারান্দা থেকে মা আমায় ডাকছিলেন। কাছে যেতেই বললেন, 'চল, তোর দেরি হচ্ছে

যে।' বলে আদর করে আমার পকেটে দুটো টাকা দিয়ে দিলেন, 'রোজ একটা করে লজেন্স খাবি, কেমন!' আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর ফুলহাতা কমলা রঙের নতুন সোয়েটারটা পরে ছোট্ট স্যুটকেসটা নিয়ে আমি যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন চারদিকে বেশ মিষ্টি রোদ উঠেছে, বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বাতাবি লেবুর গাছটায় রাশি-রাশি বাতাবি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দেওদার গাছ থেকে চাঁপা গাছ অবধি টানা এরিয়ালের তারে, বসে একটা রোমশ পাখি বিদ্‌ঘুটে স্বরে ডেকে উঠল, ক্যাঁ ক্কো। ব্রজেন ডাক্তার আমার হাত ধরলেন, 'চলো।'

ব্রজেন ডাক্তার আমার হাত ধরে হাঁটছিলেন। ব্রজেন ডাক্তারের পাশে বাবা। বেশ মোটাসোটা মানুষ উনি, মাথায় বাবার কাঁধের সমান। নাকটা টিয়াপাখির মতো বাঁকানো। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মাকে দেখছিলাম। বাড়ির বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে। আশেপাশের বাড়িতে আমার চা-বাগানের বন্ধুরা খোকন, বাচ্চু, শুভ—কাউকেই আমার চোখে পড়ল না। মাঠ পেরিয়ে আমরা পাকা সড়কটায় উঠে এলাম। রাস্তার দু-পাশে দেওদার, পাইন গাছ সাজানো। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাদের বাড়িটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাচ্ছি। ক্রমশ আমার মায়ের চোখ-মুখ ম্লান হয়ে এল আমার চোখে। তারপর হঠাৎই আমাদের বাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। সঙ্গে-সঙ্গে বাবা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন। ব্রজেন ডাক্তার একটা হাত আমার মাথায় বুলিয়ে মিহি গলায় বললেন, 'অ্যাঁ, কাঁদছ কেন, অ-খোকা, কাঁদছ কেন?'

আমাদের কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে যে চওড়া কালো পিচের রাস্তাটা আসাম অবধি চলে গিয়েছে সেইটে ধরে আমরা হাঁটছিলাম। বেনু চক্কোত্তির কাঠের গোলা, হারাধনকাকুর মিষ্টির দোকান পেরোলেই বাসস্টপ। এর আগে আমি একবার বাবার সঙ্গে বানারহাট গিয়েছিলাম। আমি কোনওদিন রেলগাড়িতে চড়িনি। বানারহাটের স্টেশনে আমি রেলগাড়ি দেখেছিলাম। ছবির মতো। সেই প্রথম। ব্রজেন ডাক্তার আমাকে নিয়ে বাসে উঠলেন। আমরা যেরকম বাসে চেপে জলপাইগুড়ি শহরে যাই তার চেয়ে অনেক ছোট বাস। বাবা নিচে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন। আমি ভীষণ লোভীর মতো, আচার খাওয়ার মতো সবকিছু চেখে-চেখে দেখছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল মাংরা আসছে। পা টেনে-টেনে ঘাড় গুঁজে হাঁটছে। আমি জানি, ও সেই কুলি লাইন থেকে রাস্তার পাশ ঘেঁষে এই রকম পা টেনে-টেনে হেঁটে এসে হারাধনকাকুর মিষ্টির দোকানে বসবে। আমি ওকে সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। ওর সামনে গিয়ে আমি চেঁচিয়ে বলি, 'এই মাংরা, আমি কে বল তো?' ও মুখ কুঁচকে ঘাড় গুঁজে একটু ভাববে, তারপর লাল-লাল দাঁত বের করে হাসবে, 'বা-ব-লু-উ-উ।' কী ভীষণ ভালো লাগে তখন। বছরে তো দুবার মোটে এখানে আসি, তাতেই যে কী করে ও আমার গলা মনে রাখে। জন্ম থেকেই ও দেখতে পায় না। দুটো চোখই সাদা। মণিগুলো ডিমের মতো। আমার খুব ইচ্ছে করছিল মাংরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'আমি কে বলো তো?' হারাধনকাকু ওকে ভাঁড়ে করে চা দিল, রোজই দেয়। আর তখুনি বাসটা ছেড়ে দিল। সাঁওতালি আর ওঁরাও কুলিতে ভরতি সেই ছোট্ট বাসটা বিকট শব্দ করে ছুটতে শুরু করল বিনাগুড়ি বানারহাটের পথ ধরে। আমার চোখের সামনে থেকে আস্তে-আস্তে সব চেনা-চেনা ছবিগুলো সরে সরে গেল।

সবুজ গালচের মতো দু-পাশে চা-বাগান, তেলিপাড়া এরোড্রোম বিনাগুড়ির মোড়—এসব আমি চিনি। এই তো সেদিন, ফ্যাক্টরির ট্রাকে করে বাগানের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আশেপাশের চা-বাগানগুলোতে দুর্গা ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি এই পথ ধরে। ব্রজেন ডাক্তার ফোঁস-ফোঁস করে নস্যি নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী—মন খারাপ লাগছে?' আমি কোনও কথা বললাম না।

বানারহাট স্টেশনে সামনে আমরা বাস থেকে নামলাম। ড্রাইভার লোক প্রত্যেকের কাছ থেকে ভাড়া নিচ্ছিল। আমাদের কাছে নিল না। বরং বলল, 'সালাম ডাকদারবাবু।' ব্রজেন ডাক্তার

কোনও কথা বললেন না। আমরা প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে এলাম। চারধার খাঁ-খাঁ করছে। কুচকুচে কালো দুটো লোহার লাইন নুড়ি বিছানা পথ দিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। বাবা বলেছিলেন আসামের দিকে। আর উলটো দিকটা? ওইদিকে আমরা যাব। শিলিগুড়ির দিকে। আমাদের গাড়ি কখন আসবে? আমি কখনও রেলগাড়িতে চড়িনি। ব্রজেন ডাক্তার একটা বেঞ্চিতে আমাকে বসিয়ে বললেন, 'বসো, আমি টিকিট নিয়ে আসি।'

ব্রজেন ডাক্তার চলে গেলে আমার খুব একা লাগতে লাগল। একটু-একটু করে আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি বাড়ির সবাইয়ের থেকে আলাদা।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন বেশি নেই। হঠাৎ আমি সেই নেপালি লোকটাকে দেখতে পেলাম। বাবার সঙ্গে যখন এখানে এসেছিলাম তখন বাবার এক বন্ধুর দোকানে আমরা গিয়েছিলাম। এই লোকটা, হ্যাঁ এই লোকটাই ওখানে কাজ করে। আমাকে ও একটা লজেন্স দিয়েছিল। কী নাম যেন, মনে পড়ছে, খড়্গ বাহাদুর। খ-ড়-গ। হাসি পায়। কিন্তু লোকটা আমায় চিনতেই পারল না। আমার একমাত্র চেনা লোক, ব্রজেন ডাক্তার ছাড়া, ও আমাকে চিনতেই পারল না। আমার পাশ দিয়ে সোজা হনহন করে চলে গেল। কী কাণ্ড।

একটু পরেই দেখতে পেলাম প্ল্যাটফর্মে সোরগোল পড়ে গেল। তারপরে আমাদের দিকটায় কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে প্রচণ্ড হুইস্‌ল দিতে-দিতে একটা ইঞ্জিন উঁকি দিল। আমাদের গাড়ি এসে গেছে, এটা আমি বুঝতে পারলাম। ক্রমশ দুলকি চালে পুরো রেলগাড়িটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ব্রজেন ডাক্তারকে খুঁজছিলাম। সবাই গাড়িতে উঠে পড়ছে। আমরা উঠছি না কেন? সমস্ত ব্যাপারটা মানে এই রেলগাড়ি, গাড়ির চলার ভঙ্গি আমার কাছে খুব লোভজনক বোধ হচ্ছিল। গাড়িটা দুবার হুইসল দিল টং-টং করে কোথায় যেন ঘণ্টা পড়ল। এই সময় আমি ব্রজেন ডাক্তারকে দেখতে পেলাম। একটা সাদা প্যান্ট আর কালো কোট, মাথায় কেমন যেন টুপি আর বগলে সবুজ পতাকা নিয়ে লোকটার সঙ্গে হেসে গল্প করতে-করতে আসছিলেন। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। যদি এখন রেলগাড়ি ছেড়ে দেয়! ব্রজেন ডাক্তার বলছিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, আমি আজই আপনার পোলাটারে দেইখ্যা আসুম। বাবুপাড়া যাইতে আর ক'মিনিট।' উর্দিপরা লোকটা লাল দাঁত বের করে হাসল। ব্রজেন ডাক্তার আমার হাত ধরে সামনের গাড়িটায় উঠতেই লোকটা পকেট থেকে হুইসল বের করে রেফারির মতো বাজালো আর প্রাণপণে হাতের সবুজ পতাকাটা নাড়তে লাগল। ব্রজেন ডাক্তার আর আমি জানলার কাছে বসতেই ট্রেনটা দুলে উঠল। আমাদের গাড়ি চলছে।

আমাদের কামরায় লোকজন কম। আমি জানলা দিয়ে দেখছিলাম বানারহাট চা-বাগান ঘরবাড়ি গাছপালা টেলিগ্রামের পোস্টগুলো কী দ্রুত উলটোদিকে ছুটে যাচ্ছে। আমার বেশ মজা লাগছিল। কেমন দোল খাচ্ছে গাড়িটা। আচ্ছা, চাকা দুটো যদি লোহার লাইন থেকে পড়ে যায়। হঠাৎ চারধার খুব গুমগুম করে উঠল। আমি দেখলাম আমরা একটা নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি। রূপোলি বালি আর নুড়ি পাথরে ভরতি নদীর বুকের এক পাশে শীর্ণ জলের স্রোত। আমি মুখ বাড়িয়ে নিচে কোনও পুল দেখতে পেলাম না। ব্রজেন ডাক্তার বললেন, 'আঃ ঝুঁকো না। জানো ইটা কি নদী? ডায়না। বর্ষাকালে কূল পাইবা না। ফেরোসাস্‌।' ডায়না! নামটা আমি শুনেছি। ট্রেনটার গতি কমে এল হঠাৎ। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম কুলিরা কোদাল কাঁধে চা-বাগানে ঢুকছে। দূরে বাগানের ভিতর ফ্যাক্টরির চুল্লি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল-গল করে। স্টেশনের নাম পড়লাম চা-ল-সা। ব্রজেন ডাক্তার উঠে কয়েক পা হেঁটে পাশের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। কোথায় গেল। ট্রেনটা থেমে আছে। আমার ভারি ইচ্ছে করছিল নেমে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে একটু হাঁটি। স্টেশন পেরিয়েই বোধহয় বাবুদের কোয়ার্টার—চা-বাগানের শরীর ঘেঁষে খেলার মাঠ। আমার মতো অনেক ছেলে দেখতে পেলাম। আঃ, ওদের কী মজা! একটা লোক, বুড়ো মতন, প্ল্যাটফর্ম ধরে

গাড়িগুলো দেখতে- দেখতে আসছিল। লোকটার পরনে কালো কোট হাতে বই। লোকটা আমাদের গাড়িতে উঠে এল। তারপর সামনে-বসা কুলিটাকে বলল, 'এই টিকিট দে।' আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, লোকটা ঘষঘষ করে পান চিবুচ্ছে। কুলিটা চুপ করে বসেছিল। লোকটা আবার খেঁকিয়ে উঠল, 'দে-দে নবাবপুত্তুর, গাড়িতে ওঠা হয়েছে!' এবার কুলিটা ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে লোকটার হাতে দিতেই লোকটা চট করে গাড়িটা দেখে নিল। তারপর আমার সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী খোকা, টিকিট আছে?' আমি হাঁ করে শুনছিলাম। টিকিট, আমার কাছে তো টিকিট নেই। 'তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?' লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করল। আমার হঠাৎ খেয়াল হল আমার পকেটে দুটো টাকা আছে, মা দিয়েছিল, ওটি দিয়ে দিই।

এমন সময় দরজা খুলে ব্রজেন ডাক্তার প্যান্টের বোতাম আঁটতে-আঁটতে বেরুলেন। লোকটাকে আমার সামনে দেখেই ব্রজেন ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে গার্ড কিছু বলেনি? আমি গয়েরকাটার ব্রজেন ডাক্তার?

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে বলল, 'ওহো, আমি ঠিক—ঠিক আছে ঠিক আছে।' বলেই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

ব্রজেন ডাক্তার বসতে-বসতে বললেন, 'জ্বালাতন।' ট্রেনটা চলতে শুরু করল আবার।

তারপর অনেক পাহাড়, নদী, মালবাজার, বাগারাকোট সেবক ব্রিজ দেখতে-দেখতে আমি কেমন মোহিত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা ভীষণ ভালো লাগছিল। ক্রমশ দিন সরে-সরে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, ব্রজেন ডাক্তার মালবাজারে আমাকে দুটো বিস্কুট খেতে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে উনি ঢুলছিলেন। এক সময় সন্ধে-সন্ধে মুখে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। ব্রজেন ডাক্তার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'নামো-নামো, আইস্যা গেছে, উফ্ কি জার্নি।' আমরা প্ল্যাটফর্মে নামলাম। নামতেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত আলো ঝলমল, এত ভিড়, এত রেলগাড়ি আমি কখনও দেখিনি।

ব্রজেনকাকুর পেছন-পেছন হাঁটছিলাম। আমার সুটকেসটা অল্প একটু ভারী, কিন্তু আমার বয়ে নিয়ে যেতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। মাথার ওপর কেমন দিনের মতো আলো, চারধারে ইঞ্জিনের শব্দ, ফেরিওয়ালার চিৎকার, আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। আমার পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক বাক্সবিছানা নিয়ে হনহন করে ছুটে গেল, ঘোমটা মাথায় একটি বউ হঠাৎ হোঁচট খেল, কারা যেন মাইকে চিৎকার করছিল, আসামের ট্রেন এখনই ছাড়বে। আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছিল, কী কাণ্ড!

ব্রজেনকাকুর পেছন-পেছন আমি সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে একটা পুলের ওপর উঠে এলাম। এখান থেকে নিচে প্ল্যাটফর্মের ছাদ, রেললাইন, একটা ইঞ্জিন কী জোর আলো জ্বালিয়ে ছুটে গেল স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ভালো করে যে সব দেখব তার উপায় নেই, ব্রজেনকাকু একটুও দাঁড়াচ্ছিলেন না। আমরা আবাব সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। এটা অন্য একটা প্ল্যাটফর্ম। বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোকজন ভিড় করে উঠছে। দুটো ছোট, আমার মতো ছোট, গায়ের রং কী সাদা, সাহেবের ছেলেকে দেখলাম জানলা দিয়ে মুখ বের করে হাসছে। আমরা ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। আবার মাইকে কে যেন বলল, 'দিল্লির ট্রেন এইমাত্র ছাড়ছে।' আর তারপরেই ট্রেনটা কেমন দুলে উঠল। উঠে গুটি-গুটি করে এগিয়ে যেতে লাগল খুব জোরে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে। দিল্লি। এই ট্রেনটা তাহলে দিল্লি যাচ্ছে। আকবর বাদশার রাজধানী। আমি নতুন ইতিহাস বইতে পড়েছি যে। কি মজা লোকগুলোর। আমার খুব অবাক লাগছিল। মাঝে-মাঝে আকাশ থেকে কে যেন বলছে এই ট্রেনটা দিল্লি যাবে, এই ট্রেনটা আসাম যাবে, ব্যস সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেনগুলো চলে যাচ্ছে, কি কাণ্ড।

ব্রজেনকাকু আমাকে একটা বেঞ্চিতে বসালেন। নিজের ব্যাগটা আমার পাশে রেখে ডিবে

খুলে শব্দ করে নস্যি নিলেন নাকে। আমার সামনে ফাঁকা রেললাইন। রেললাইনের ওপাশটায় কেমন অন্ধকার। ব্রজেনকাকু ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। তারপর একজন কালো কোটপরা লোককে ডেকে কী যেন জিগ্যেস করলেন। তারপর আমার পাশে এসে বসে বললেন, 'তোমার ট্রেনের তো অনেক দেরি, বুঝলা' ব্রজেনকাকু মাঝে-মাঝে বুঝলা, খাইলা এই রকম ভাষায় কথা বলেন। আমরা, মানে আমি মা-বাবা দাদু কেউ ওই ভাষায় কথা বলি না।

'খোকনের বয়স কত?' ব্রজেনকাকু জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার বয়স? নয় বছর।' আমি বললাম।

'বাঃ, তুমি তো বেশ বড়ই হইয়া গেছ। আমারে আবার গার্ডের পোলাটাকে দেখতে যাওন লাগব! খুব অসুখ, বোঝলা, এত কাজ, আর পারি না, বোঝলা!' ব্রজেনকাকু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'খুব অসুখ?'

'হ্যাঁ। তা তোমারে এখানে রাইখ্যা যাই কেমনে। এখানেই গাড়ি আসব তোমার। জলপাইগুড়ির গাড়ি শুধু এইখানেই আসে। তা তুমি তো একা-একা গাড়িতে উঠতে পারবা না। যাই কেমনে।'

'জলপাইগুড়ির ট্রেন এখানে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি উঠতে পারব। এখানেই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার সামনেই খালি কামরা দেখবা। বাঃ তাহলে তো ভালোই হইল। তুমি ভয় পাইবা না তো?'

'আমি ঘাড় নাড়লাম। ভয় কিসের। এখান থেকে টুক করে উঠে পড়ব। সেই রেলের গার্ডটার ছেলের ভীষণ অসুখ। ব্রজেনকাকু দেখতে যাবে। আচ্ছা, এখানে কি আর কোনও ডাক্তার নেই? কি জানি। ব্রজেনকাকুকে আড়ালে অনেকে ঘোড়ার ডাক্তার বলে। আমাদের সব চা-বাগানের সাহেবের ঘোড়ার অসুখ একবার নাকি উনি সারিয়ে দিয়েছিলেন।

ব্রজেনকাকু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর আবার ঘড়ি দেখে আমার মাথায় একটু হাত বোলালেন। মাথায় হাত বোলালে আমার খুব রাগ হয়, কিন্তু আমি কিছু বললাম না। ব্রজেনকাকু নিজের ব্যাগটা টেনে বললেন, 'তুমি তাহলে যাইতে পারবা তো!'

আমি ঘাড় নাড়লাম। ব্রজেনকাকু উঠে দাঁড়ালেন এবার। তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে হেসে বললেন, 'তোমার বাবারে কিছু কওনের দরকার নাই, বুঝলা।'

আমি কিছু বুঝতে না পেরেই ঘাড় নাড়লাম। ব্রজেনকাকু হেলতে দুলতে ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে লাগলেন।

এবার আমার কেমন যেন লাগতে শুরু করল। আমার হঠাৎ গা ছমছম করে উঠল। আমার মনে হল আমার শেষ চেনা লোকটাও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানে এত লোক, অথচ আমি কাউকেও চিনি না। অনেক দূরে প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে অনেক লোকের মাঝে একটুখানির জন্যে ব্রজেনকাকুর পেছনটা আমি দেখতে পেলাম। তারপর ব্রজেনকাকু হারিয়ে গেল।

চুপ করে বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। আমার আশেপাশে অনেক লোক, চারিদিকে চিৎকার, রেলগাড়ির শব্দ, তবু আমার কেমন লাগছিল। আমার ট্রেন কখন আসবে? আকাশ থেকে মাইকে বলবে তো? আমি কান খাড়া করে থাকলাম।

আমার একটু-একটু খিদে পাচ্ছিল। সেই কখন খেয়েছি। ব্রজেনকাকু অবশ্য দুটো বিস্কুট দিয়েছিল। মা বলে, আমার পেটে নাকি খিদে ঘুমিয়ে থাকে। আমি চারধারে দেখতে লাগলাম। আমার চোখে পড়ল, আমার ঠিক একটু পেছনে দু-তিনটে লোক দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। দোকানের মতো কাচের বাক্সে কেক বিস্কুট সাজিয়ে দোকানদার বিক্রি করছে। একটা সুন্দর কাগজে মোড়া

কেক আমি এখান থেকেই দেখতে পেলাম। আমার খুব ইচ্ছে করছিল কেকটাকে খেতে। আমার কাছে দুটো টাকা আছে। আমি স্যুটকেসটা নিয়ে উঠে পড়লাম বেঞ্চি থেকে। মা বলেছেন কখনও স্যুটকেশটা হাতছাড়া করবি না। আমি সেই ছোট্ট দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকানটা ঠিক প্ল্যাটফর্মের মধ্যিখানে। আমার মাথার ওপরে কাচের বাক্স। তাতে অনেক কেক বিস্কুট মিষ্টি সাজানো। আমি সেই কেকটাকে এখন গুলিয়ে ফেললাম। আসলে সবগুলোই আমার ভালো লাগছিল। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছিলাম না কোনটাকে খাওয়া যায়।

পকেট থেকে টাকাটা বের করে আমি শেষপর্যন্ত বললাম, 'আমাকে একটা কেক দাও।' চার-পাঁচজন লোক শো-কেসের এপাশে-ওপাশে দাঁড়িয়েছিল, দোকানদার তাদের নিয়েই ব্যস্ত, আমার কথা শুনতেই পেল না। শো-কেসটা এত উঁচু যে, সেটা ছাড়িয়ে আমি শুধু দোকানদারের মাথার একটা অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আরও দু'বার চাইলাম, তবু দোকানদার আমাকে দেখল না। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। এই প্রথম হাতে টাকা নিয়ে অচেনা জায়গায় আমি কিছু কিনছি, আমার মনে খুব একটা সাহসও ছিল না।

এই সময় আমি তাকে দেখতে পেলাম। বাঁ-হাতের চেটোয় ডিশ রেখে ডান হাতে কাপের হ্যান্ডেলটা ধরে সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে চুমুক দিচ্ছিলেন আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। খুব লম্বা, আমার যেকোনও চেনা লোকের চেয়ে অনেক লম্বা, লিকলিকে রোগা চেহারা, মেয়েদের মতো ঘাড় অবধি চুল, গায়ের রং আমার চেয়েও ফরসা। পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। উনি আমাকে দেখে হাসছিলেন বলেই আমার আরও রাগ হয়ে গেল। আমি এবার চেঁচিয়ে দোকানদারের কাছে কেক চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই উনি বললেন, 'কি হে, শুনতে পাচ্ছ না নাকি! কতক্ষণ থেকে ছেলেটা একটা কেক চাইছে, দাও।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'একটা না দুটো?'

'একটা।' আমি গম্ভীর হয়ে বললাম।

'একটা দাও। আহা, খিদের জ্বালায় মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে গো। দাও—দাও।' দোকানদার একটা প্লেটে কেক দিতেই উনি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'নাও, খেয়ে নাও।'

আমি কেকটা তুলে নিলাম। ফুলের মতো কেকটা। কি মিষ্টি গন্ধ। আমি কেকে একটা কামড় বসিয়েই দেখলাম উনি পকেট থেকে পয়সা বের করে দোকানদারকে দাম দিয়ে দিলেন। উনি কি আমার দামটা দিয়ে দিলেন? তা কেন হবে?

ওঁর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি ওঁকে দেখছিলাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন, 'কোথায় যাবে?'

'জলপাইগুড়ি।'

'তাই নাকি! আমিও যাব।'

'আপনি যাবেন?'

'হ্যাঁ, তোমার বাবা কোথায়?' উনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিলেন। যা লম্বা উনি।

'বাবা?'

'যিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন!'

'যাঃ উনি আমার বাবা হবেন কেন? উনি তো ব্রজেনকাকু, বাজারের ব্রজেন ডাক্তার।'

'বাজারের?'

'বাঃ, আমাদের চা-বাগানের পাশে যে বাজার আছে।'

'অ। তা উনি চলে গেলেন তোমাকে একা ফেলে?'

'উনি তো ডাক্তার, তাই একজনকে দেখতে গিয়েছেন, খুব অসুখ।'

আমরা কথা বলতে-বলতে আবার বেঞ্চিতে এসে বসলাম। বসবার সময় দেখলাম ওর কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ। আর ব্যাগের ভেতর থেকে তিনটে বাঁশি উঁকি মারছে। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। উনি কি তাহলে বাঁশি বাজান। আমি আজ অবধি কাউকে বাঁশি বাজাতে দেখিনি। আমাদের বাড়িতে একটা ছবি আছে। শ্রীকৃষ্ণ গরুর পিঠে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। উনিও কি শ্রীকৃষ্ণের মতো বাঁশি বাজাতে পারেন? বাঃ কী মজা।

'আপনি বাঁশি বাজাতে পারেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

উনি হঠাৎ চমকে উঠলেন, তারপব বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'বাঁশিতে কী বাজান? জনগনমন, হও ধরমেতে ধীর?'

'দ্যুৎ, ওসব কেন। রাগরাগিনী বাজাই, বেহাগ মালকোষ এই সব।'

আমি অবাক চোখে ওঁকে দেখতে লাগলাম। আমার কাছে সবকিছুই যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

'তুমি এর আগে এখানে এসেছ?' উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।' আমি ঘাড় নাড়লাম।

'সেকি। তুমি এই স্টেশনটা আগে দ্যাখোনি। কত কি দেখার আছে এখানে। কত ট্রেন এখান দিয়ে যায় অনেক দূর-দূর। এটা তো জংশন স্টেশন। কত লোকজন এখানে দেখেছ তো।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল স্টেশনটা ঘুরে-ঘুরে দেখি। আমাদের আঙরাভাসা নদীর গায়ে মাঝে-মাঝে সাঁওতালদের মেলা বসে! আমি একা ঘুরে-ঘুরে তার সবটা দেখে উঠতে পারিনি। মেলাটা যেখানে বসে সে জায়গায় আঙরাভাসা নদী কেমন যেন পেট ফুলে ফেঁপে খুব বড়, বিরাট হয়ে গেছে। অনেক জল তার সেখানে। আমি কোনওদিন সেই জলে নামিনি, আমার ভয় করে। আমাদের বাড়ির পেছনে ছোট্ট আঙরাভাসা নদী, যা আমার খুব চেনা। কিন্তু ওখানে গেলে আমি আর তাকে চিনতে পারি না। সেই সাঁওতালদের মেলার চেয়েও যেন এই স্টেশনটা আরও জমজমাট। আরও বড়। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

'আপনি আমাকে নিয়ে বেড়াবেন?' আমি উৎসুক হলাম।

'বেড়াবে? তা তোমার ট্রেনেব অবশ্য দেরি আছে। বেশ চলো।' উনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি এক হাতে স্যুটকেশ নিয়ে ওঁর হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম প্ল্যাটফর্ম ধরে। কী শক্ত ওঁর হাত।

চারধারে লোকজন গিজগিজ করছে। মাইকে বলল, সবাইকে টিকিট কিনে ট্রেনে উঠতে। একটা বিরাট ট্রেনের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। উনি বললেন, 'এই ট্রেনটি যাবে কোথায় জানো? কলকাতা।'

কলকাতা। কলিকাতা। আমি বইতে পড়েছি। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

'তুমি কখনও কলকাতায় গিয়েছ?'

'না।' আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি যে কোথাও যাইনি।

'ওঃ খুব ভালো জায়গা। ট্রাম, বাস, সিনেমা, থিয়েটার, তুমি তো আর দ্যাখোনি, তোমাকে আর কী বলব—'

'গড়ের মাঠ, কালীঘাট এসব আছে না?' আমি বইয়ে যেসব ছবি দেখেছি তা মনে করতে-করতে বললাম। ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। কী মজা ওই লোকগুলোর যারা কলকাতায় যাচ্ছে।

এমন সময় ছোট, খেলার গাড়ির মতো ছোট্ট একটা ট্রেন হুস হুস করে স্টেশনে ঢুকল। আমার খুব মজা লাগছিল দেখতে। বড় ট্রেনগুলোর পাশে এটা নেহাতই খেলনা। উনি বললেন,

'এটা হচ্ছে দার্জিলিং-এর ট্রেন। তুমি দার্জিলিং গিয়েছ?'

'না।' আমি বললাম।

'ওঃ দারুণ জায়গা। পাহাড়, কুয়াশা, কত হোটেল, যাবে?'

'এখন?' আমি থতমত খেয়ে বললাম।

উনি হো-হো করে হাসলেন খানিক, তারপর বললেন, 'আহা এখন কেন! বড় হয়ে যাবে, কি বলো?'

আমরা গল্প করতে-করতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় চলে এলাম। দোতলার বারান্দায় ভীষণ ভিড়। অনেক মেয়েপুরুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে শুয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে। তাদের মালপত্রে হাঁটা যায় না ভালো করে। কেমন শীর্ণ চেহারা সব। 'চলো ঘরে বসি গিয়ে।' উনি আমার হাত ধরে একটা ঘরের সামনে এলেন। দরজায় কীসব সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। বড়-বড় কয়েকটা ডেকচেয়ার, ছোট চেয়ার, দেওয়াল আয়না রয়েছে ঘরটায়। মেঝেতে দুটো বুড়ি বিছানা করে শুয়ে।

'এঃ, এখানেও শালারা সেঁধিয়েছে। এইসব রিফিউজিদের জন্যে মাইরি কোথাও যাওয়া যাবে না।' উনি একটা ডেকচেয়ারে বসতে-বসতে বললেন। উনি মাইরি, শালা বললেন? শালা তো ছোটলোকেরা বলে। মাইরি বলতে মা মানা করেছেন, বললে মা নাকি মরে যাবে। ইস। আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

উনি আমাকে ওঁর কোলের ওপর টেনে নিয়ে বসালেন। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। উনি আমার হাত নিয়ে খেলা করছিলেন। একটা হাত নিয়ে উনি হাঁটুর ওপর ঘষছিলেন। ক্রমশ আমার খুব রাগ হচ্ছিল। অন্য সময় হলে আমি চিৎকার করতাম। কিন্তু এখন আমার যেন কোনও শক্তি ছিল না। আমি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

বেশ খানিকটা বাদে উনি হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'ইস্ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ট্রেনটা এখন পেলে হয়। খুব ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে। এখন চলো, তাড়াতাড়ি চলো।' আমি কোনও কথা বলছিলাম না। আমার খুব খারাপ লাগছিল। এই লোকটা ভালো নয়—একদম নয়। আমাকে কেউ এত খারাপ করে আদর করেনি কখনও। আমি ওঁর সঙ্গে ছুটছিলাম। উনি আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। আমরা আবার নিচে এসে একটা ট্রেনে উঠে পড়লাম। উনি জানলার ধারে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। আমি সুটকেসটা বেঞ্চিতে রেখে ওঁর পাশে বসলাম। উনি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে। 'বোকা ছেলে। মুখ একদম শুকিয়ে গেছে, অ্যাঁ?' বলে জানলা দিয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগলেন।

আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাব! আমি যে কিছুই চিনি না। কাউকে না।

একটু পরেই ট্রেনটা দুলে উঠল। খুব জোরে-জোরে হুইসিল পড়ল, দুবার। আমার কামরায় লোকজন কম। দুজন লোক চাপা গলায় বর্ডার, পাকিস্তান বলছে শুনতে পেলাম। জানলা দিয়ে মুখ সরিয়ে হাসতে- হাসতে উনি আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন।

'এই ট্রেনটা জলপাইগুড়ি যাবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ। বেলাকোবা, আমবাড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে পাকিস্তান বর্ডার।' উনি বললেন। ট্রেনটা যখন প্রায় চলতে শুরু করেছে ঠিক তখন দেখলাম দরজা দিয়ে একজন মোটা মতন বউ উঠে এল। উঠে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে ওকে সোজা হয়ে বসতে দেখলাম। তারপর চাপা গলায় ডাকলেন, 'এই যে এদিকে।'

বউটা আমাদের দেখল এক পলক। বেশ মোটা চেহারা। ট্রেনের এই অল্প আলোতেও আমি বুঝতে পারছিলাম ও খুব পাউডার মেখেছে। থিয়েটারে, আমি স্কুলের থিয়েটারে এরকম পাউডার মাখতে দেখেছি অনেককে। আমার মায়ের চাইতেও ও বড়। কেমন যেন।

আমাদের দিকে এগিয়ে এল ও, 'কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটি কে?'

উনি হাসছিলেন। তারপর হঠাৎ আমি দেখলাম উনি একটা চোখ কুঁচকে কি যেন ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বউটার মুখ থমথমে হয়ে গেল।

উনি হাসতে-হাসতে উঠে বউটাকে নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। উনি চোখ কুঁচকে কী বললেন। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি ওদের লক্ষ করছিলাম। ওরা ফিসফিস করে কী সব বলছে। ট্রেন এখন খুব জোরে চলছে। বাইরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি জানলা দিয়ে অনেক দূরে একটু-একটু আলো, অস্পষ্ট গাছপালা আর একরাশ জোনাকি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না।

বউটা খুব হাসছিল। উনি নিশ্চয় খুব হাসির কথা বলছেন। ক্রমশ আমার খুব হিংসে করতে লাগল। আমি এখানে একা বসে আছি আর উনি ওই বউটার সঙ্গে হাসির কথা বলছেন কেন?

একটু বাদে ট্রেনটার গতি আস্তে-আস্তে কমে গেল। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একটা ভীষণ নির্জন স্টেশনে ট্রেনটা চলে এল। প্ল্যাটফর্মের খুব কম আলোয় আমি দু-একজন লোককে চলাফেরা করতে দেখলাম। এখানে কোনও দোকান নেই। আমাদের কামরা থেকে কয়েকজন লোক নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। স্টেশনের নাম পড়লাম বে-লা-কো-বা। আমার চোখে পড়ল বেশ কয়েকজন পুলিশ বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে।

আমি কামরায় চোখ ফেরালাম। অবাক কাণ্ড, উনি নেই। বউটা একা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ঝুঁকে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছুটে ভেতরে চলে এল। এসে আমায় দেখেই আমার পাশে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরল দু-হাতে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বউটার মোটা শরীরে আমার নাক-মুখ গুঁজে যাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি ছটফট করে উঠতেই বউটা খিঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, চোপ। তেড়িবেড়ি করলেই গলা টিপে ফেলে রেখে যাব।'

কী ভীষণ গলা বউটার। আমার শরীর হিম হয়ে গেল যেন। হঠাৎ খটখট করে কয়েকজন পুলিশকে উঠে আসতে দেখলাম। কামরায় আলো থাকা সত্ত্বেও ওরা টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে প্রত্যেকের মুখ দেখছে। আমাদের মুখের ওপর আলো পড়তেই একজন এগিয়ে এল, 'এই যে শ্রীমতী স্যাঙাত কোথায়?'

বউটা জবাব দিল না।

'কী, কিছু জানো না যে। বাক্যি ছাড়ো।' লোকটা কড়কড়ে গলায় বলল।

বউটা কিছু বলল না এবারও।

'ওষুধ দিতে হবে নাকি, অ্যাঁ।'

'আমি কিছু জানি না।' বউটা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল এবার।

'জানো না? এটি কে?'

'ছেলে।'

'ছেলে? বাঃ ভদ্রলোকের মতো ছেলে তো।' বলে লোকটা হাসল হো-হো করে। ওর সঙ্গীরা কিছু বলতেই উনি সরে গেলেন দরজার দিকে। তারপর হুড়মুড় করে পুলিশগুলো নেমে গেল আমাদের কামরা থেকে।

পুলিশগুলো নেমে যেতেই বউটা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল ও। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'খুব ভালো ছেলে তুমি। কী নাম?'

নাম বললাম। আমাকে এবার আলতো করে ধরে রেখেছে বউটা। ওর গা থেকে পাউডারের গন্ধ পাচ্ছি আমি।

'কোথায় যাবে?'

'জলপাইগুড়ি।'

'শিলিগুড়ি থাকো?'

'না। চা-বাগানে।'

'পড়ো।'

'হ্যাঁ।'

'মা আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মাকে ছেড়ে থাকতে পারো?' আমার চুলে হাত বোলাল বউটা। আর হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি চোখ বুজে দেখলাম মা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ব্রজেন ডাক্তারের সঙ্গে চলে আসার সময় মায়ের চোখ ছলছল করছিল। আমাকে কাঁদতে দেখে বউটা আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'বোকা ছেলে, কাঁদছ কেন? এখানে মা নেই তো কি হয়েছে, আমি আছি।'

আমি কোনও কথা বললাম না। আমি ওর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলাম। পুলিশদের কাছে ও বলেছে আমি ওর ছেলে। মিথ্যে কথা। আমার মা পাউডার মাখে না। তবু আমার এখন খারাপ লাগছিল না।

'তোমার ছেলে নেই?'

'না, না গো!' বউটা হাসল। 'তুমিই তো আমার ছেলে। ওই যে বললাম।'

আমরা অনেকক্ষণ কোনও কথা বললাম না। বউটা গুনগুন করে গান গাইছিল। আমি ওর গায়ে লেপটে পড়ে ট্রেনের আওয়াজ শুনছিলাম। চাকায়-চাকায় অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। বোকা-ছেলে, বোকা-ছেলে, আমার মনে হল শব্দটা যেন বলছে।

'তুমি আমাকে বকলে কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি বকেছি? আর বকব না।' বউটা বলল।

'উনি কোথায় গেলেন?'

'কে? ও! জানি না তো। ওর সঙ্গে আর কথা বলবে না, বুঝলে! ও খুব খারাপ লোক।' বউটা হাসল। তারপর আমার বুকপকেটে হাত দিল, 'এমা, তোমার পকেটে টাকা কেন গো। এইটুকুন ছেলের কাছে টাকা রাখতে নেই।'

'মা দিয়েছিল যে।' আমি বললাম। সত্যিই তো দাদু একদিন বলেছিলেন বাচ্চাদের কাছে টাকা রাখতে নেই।

'আমি রেখে দিই আমার কাছে?' বউটা বলল।

'দাও।' আমি বললাম। আমার খুব ভালো লাগছিল।

একটু বাদেই ট্রেনটা আবার ধীরে-ধীরে চলতে লাগল। বউটা মুখ বাড়িয়ে কি দেখল। তারপর বলল, 'এবার ওঠ, তোমার জলপাইগুড়ি এসে গেছে।'

জলপাইগুড়ি! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। দাদু নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে। বাব্বা, এতক্ষণে আসা গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নামবে না?'

বউটা বলল, 'না। আমি অ-নে-ক দূর যাব।'

আমার হাত ধরে বউটা দরজায় এল, 'তোমার স্যুটকেসে কি আছে?'

'স্যুটকেসে? আমার জামা আর বই।' আমি বললাম।

ট্রেনটা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। নিচে লোকজন চলছে।

বউটা ঝুঁকে পড়ে আমাকে আদর করল। তারপর আমার প্যান্টের পকেটে হাত দিল, 'পকেটটা এত ফুলে আছে কেন গো!'

পকেটটা? আমার মনে পড়ল পকেটে আমার রুমাল আছে। বউটা ততক্ষণে রুমালটা বের করে নিয়েছে।

'কী আছে এতে? কী বেঁধেছ?' বউটা গিঁট খুলতে চেষ্টা করছিল।

আমি ছটফট করছিলাম, 'না খুলবে না, ওটা আমার।'

'খুলব না?' বউটা আমাকে ভেঙাল। 'কী আছে বলো?'

'আছে, আমি বলব না। দাও, আমাকে দাও, তুমি নেবে না।' আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি কেড়ে নিলাম রুমালটা।

কিন্তু বউটা আমাকে অবলীলাক্রমে দু-হাতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিল। টান মেরে স্যুটকেসটা নিচে আমার পাশে ফেলে দিয়ে হাসতে লাগল, 'ইস, খুব জোর গায়ে, না?'

বউটা রুমালের গিঁট খুলতে পারছিল না। আমি প্রাণপণে চিৎকার করছিলাম। আমি বউটাকে মেরে ফেলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমি কিছুতেই করতে পারলাম না। ট্রেনটা আবার দুলে উঠে আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করল।

আমি প্ল্যাটফর্ম ধার ছুটছিলাম। বউটা তখনও রুমালের গিঁট খুলতে পারেনি। আস্তে-আস্তে ট্রেনটা আমার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল।

আমি মাটিতে বসে পা ছড়িয়ে কাঁদলাম। আমাকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে যাচ্ছিল। আমার বুকের মধ্যে একটা ভীষণ কষ্ট ছটফট করছিল। আমার চা-বাগান, খেলার মাঠ, খুঁটিমারীর জঙ্গল আর খেলার নদী আঙরাভাসা কখন যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। ভাসানের পর একদিন আমি জলে ডোবা দুর্গাঠাকুর দেখেছিলাম, ঠিক সেইরকম।



বেনোজল

স্টেশনটা পেরিয়ে শানবাঁধানো রিকশার চত্বরটায় পা দিতেই চমক লেগেছিল। কেমন একটা রুপোর স্রোত বইছে চারপাশে। একটা নিস্তরঙ্গ অথচ মৃদু নেশার ঘোর লাগা জগতে যেন হঠাৎই পা দিয়ে ফেললাম আমরা। এটা এমন একটা সময় যখন পৃথিবীর শেষতম বেরসিক লোককেও মাথা তুলে তাকাতে হয়। ভুলে যেতে হয় নিজেকে। আর একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে তখন হুঁসিয়ার মনটাকে। ঘাড় নামিয়ে সোমা হাসল, 'এই, চাঁদনিকে দ্যাখো।'

আর এখন আমরা যখন রাস্তায় নেমেছি হোটেল ছেড়ে, তখন বাতাসে ঈষৎ গা-কনকনে ভাব, অন্ধকার ডালপালা মেলেছে গাছের মাথায় আর বুকে হাজার-হাজার তারার মেডেল আঁটা অধিকারীর মতো বুড়ো আকাশটা দোহার গাইছে রসের নাগরসাজা চাঁদের তালে-তালে। সমস্ত আকাশটা জুড়ে যেন আজ যাত্রাগানের আসর জমজমাট। বাইরে বেরিয়ে সোমার ফুরতির বাঁধটা দু-টুকরো হল। গলগলিয়ে উঠল ও, 'এই চলো, সমুদ্র দেখে আসি আগে। আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি গো।'

'বেশ তো চলো না।'

'এই রাস্তা দিয়ে গেলে হবে? তুমি তো আসনি আগে!' সোমা ভ্রূকুটি করল।

'বাঃ হোটেলের ম্যানেজার বলল শুনলে না, নাক-বরাবর চলে যান। গেলেই সমুদ্র। ভাবলাম

বলি, নাক-বরাবর গেলে একটা জিনিসই পাব, অবশ্যি তাকেও সমুদ্র বলা যেতে পারে নাকি!'

'অসভ্য!' নাক ফোলাল সোমা। কি বুঝল কে জানে। তবে নাক ফোলালে ওকে বেশ ভালো লাগে। পুতুল-পুতুল দেখায়। 'এই, আমার না ভীষণ ভালো লাগছে, জানো?'

'কি আমাকে? না এই রাতটাকে।' বললাম আমি।

'নিজেকে।' আমার হাতটা টেনে নিল সোমা। দু-পাশের প্রাচীর ছোটবড় মন্দিরগুলোর গা বাঁচিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। শঙ্খ বাজছে মন্দিরে-মন্দিরে, আরতির প্রসন্ন পরিবেশের স্পর্শ পাচ্ছিলাম আমরা। সোমার মুখচোখে কোথাও ট্রেন-জার্নির ক্লান্তি নেই। 'এই, কাল সকালে এইসব মন্দিরগুলো দেখব, হ্যাঁ। আজ শুধু সমুদ্র।'

রাস্তাটা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর যখন আরতির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছিল না, খোলকরতাল বাজিয়ে নামসংকীর্তনের সুর যখন আর কেউ মুঠো-মুঠো করে ছুঁড়ে দিচ্ছিল না বাতাসে, তখন সোমা গুনগুনিয়ে গান ধরল, 'যাবে না যাবে না ঘরে।' পূর্ণচাঁদের আলোয় সামনের পথটা কোন স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে যখন আমাদের বুকের ভেতর মিশে যেতে চাইছে তখন, ঠিক তখন সেই প্রাণ-কাঁপানো ডাকটা শুনতে পেলাম। আমার হাতটা শক্ত মুঠোয় ধরে সেই ডাকের আকস্মিকতায় থরথর করে কেঁপে উঠল সোমা, 'কি গো!'

ডাকটা আসছিল সামনের দিক থেকে যেখানে পথটা ঘোড়ার নালের মতো বাঁক নিয়েছে। আমরা কয়েক পা এগোতেই ডাকটা বিভিন্ন কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াতেই সোমা অস্ফুট গলায় কি যেন বলে আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে দু-পাশের আধভাঙা প্রাচীর ঘেরা পথটা। আর সেই পথের দু-ধারে সার দিয়ে বসে শুয়ে গোঙাচ্ছে কয়েকজন নারী পুরুষ। জ্যোৎস্না পড়েছে তাদের সর্বাঙ্গে। আলোর সঙ্গে যেন মাখামাখি হয়ে গেছে তাদের ক্ষত বাঁধা ময়লা কাপড়, খসে যাওয়া চোখমুখ। হঠাৎ মনে হল, এই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না যেন ওরা সহ্য করতে পারছে না। ওদের শরীর যেন জ্যোৎস্নায় জ্বলছে আর সেই জ্বলুনিতেই তাদের এই যন্ত্রণার চিৎকার। তারা সমস্বরে গোঙাচ্ছে। সেই গোঙানির স্বরে তারা করুণাময়ের নামে পথচারীর কাছে করুণার প্রত্যাশা করছে। আমাদের চোখের সামনে কোনও অদৃশ্য চিত্রকরের আঁকা ছবির মতো এই ছায়াছায়া শরীরগুলোর দিকে কেউ-কেউ পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে আর মুহূর্তে ভীষণ চিৎকার কী ভীষণ হিংস্রতায় মারামারি করে পয়সা কুড়াচ্ছে তারা। এই দারুণ জ্যোৎস্নার রাত্রে, যখন বাতাসে ঈষৎ শীতলতা মাখানো তখন সমুদ্রে যাওয়ার এই পথটার দু-ধারে সার দিয়ে শুয়ে বসে থাকা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মানুষগুলোকে কোনও প্রেতলোকের বাসিন্দা বলে মনে হতে লাগল আমার। এই ভয়ঙ্কর গা-ছমছমে পরিবেশে চোখের ভেতর দিয়ে একটা সিরসিরে ঘৃণা মনের ভেতরে এসে কিলবিল করতে লাগল।

'ওগো, ফিরে চলো, আমার ভীষণ ভয় করছে।' সোমার শরীর হিম।

আমি জোরে পা চালাতে চাইলাম। সোমার হাত ধরে দু-পাশে কুষ্ঠরোগীদের রেখে হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, 'ধ্যুৎ সব তো ভিখিরি, ভয় কী।'

সোমা আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁটছিল, 'কুষ্ঠ?'

'হ্যাঁ!' শুনে সোমার হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল যেন।

বস্তুত এই সময় আমি প্রচণ্ড ঘৃণা-ভয়ের মধ্যে যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল তা মুঠোয় আগলে রাখতে চাইছিলাম। সোমা হাঁটবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, বুঝতে পারছি আমার হাত ধরে একটা ঘোরের মধ্যে ও এগোচ্ছে। আমাদের দেখে দু-পাশের ছায়াগুলো নড়ে-নড়ে উঠল, ওদের আর্তনাদের স্বরে মনে হল আমরা যেন কোনও বিষাক্ত ক্ষুধার্ত সাপের গা বাঁচিয়ে হাঁটছি। আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা কিছু প্রত্যাশা করছে এবং আমাদের উদাসীন হয়ে হাঁটতে দেখে ওরা ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওদের অশ্লীল হাসি আর গালাগাল শুনতে শুনতে আমরা এগোচ্ছিলাম। এই সময় আমরা কেউ

কোনও কথা বলছিলাম না। আমার রোমকূপে একটা ক্লেদের শিহরণ পাক খাচ্ছিল।

শেষপর্যন্ত আমরা বালির ওপর পা রাখলাম। আমাকে দাঁড়াতে দেখে সোমা সামনের দিকে চোখ মেলল। সামনে এই বালির জমাট ঢেউগুলো পেরোলেই আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত সমুদ্র। দূরে, বহুদূরে সাগরের জল যেন জ্যোৎস্নায় ভর করে আকাশে উঠে গেছে। চকচকে বালি পেরিয়ে এসে আমরা পা-ঢেউ জলে রাখলাম। টলমলে জ্যোৎস্নায় পাক খাওয়া ঢেউয়ের ফসফরাসে কোনও অদৃশ্য বাজিকর যেন চটপটি জ্বালাচ্ছে। আমাদের সমস্ত শরীরে বিলি কাটছে বাতাসের-পর-বাতাস। এই মুহূর্তে, এই ভীষণ সুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনের ঘরে কোনও অন্ধকার ছিল না। সোমা এতক্ষণ নেতিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ শুনলাম ও বলছে, 'সুন্দর।' আমার ভালো লাগছিল। এই মুহূর্তে নিজেকে ভীষণ সুখী বলে মনে হল। এক-একটা ঢেউ আমাদের নিয়ে এসে গর্জনে ফেটে পড়ছে। আমি জ্যোৎস্না দেখছিলাম না, সমুদ্র দেখছিলাম না। এই ঢেউয়ে পা ডুবিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে কৃপনের মতো পরম সুখের স্বাদ নিচ্ছিলাম একটু-একটু করে। সোমা আমার পিঠে মাথা রেখে বসেছিল। কথা বলতে ভীষণ ভালো লাগছিল আমাদের।

ক্রমশ বুড়ির চাঁদে টানে-টানে ঢেউগুলো যখন এগিয়ে আসতে লাগল শরীরের কাছে তখন সোমা উঠে দাঁড়াল। অলস চোখে তাকালাম সামনের বালিয়াড়ির দিকে। বেলাভূমি ফাঁকা হয়ে গেছে কখন, খেয়াল ছিল না। এই নির্জনে গা-ছমছম করা চাঁদের আলোয় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

বাঁ-হাতে চটি নিয়ে ডান হাতে শাড়ি সামলে বুড়ো আঙুল দিয়ে বালি ছিটিয়ে-ছিটিয়ে সোমা হাঁটছিল। 'তোমার সন্ধেটা একদম মাটি করে দিলাম, না?' নিচু স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলল সোমা।

আমি প্রথমে কিছু বললাম না। সোমা একটু হাসল, 'আমার ভাগ্যটাই এইরকম।'

এবার খুব দামি কথা বলার ভঙ্গিতে বললাম, 'শাস্ত্রে আছে, দেবদর্শন করতে হলে সৃষ্টির কুশ্রী দিকটা দেখে নেওয়া দরকার। এই জ্যোৎস্নায় সমুদ্র দেখা সার্থক হত না যদি না ওদের আমরা দেখতাম।'

মুহূর্তে আশ্চর্যজনকভাবে সহজ হয়ে গেল সোমা। উজ্জ্বল খুশিতে তাকাল, 'এই ছুটব?'

'ছুটব মানে?' আমি অবাক।

'এই চকচকে বালির ওপর দিয়ে দৌড়োতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। কতকাল দৌড়াই না!'

বাচ্চা মেয়ের মতো গাল ফোলাল সোমা।

হেসে বললাম, 'বেশ তুমি এগোও, আমি তোমাকে ধরছি।'

বলামাত্র আঁচল কোমরে গুঁজে বালির ওপর দিয়ে ছোট-ছোট পা ফেলে সোমা ছুটতে শুরু করল। পায়ের চাপে-চাপে বালি বসে যাচ্ছিল, চুল উড়ছিল বাতাসে। সোমাকে এই দারুণ জ্যোৎস্নায় কোনও সুরকোলের বাসিন্দা বলে ভাবতে ইচ্ছে করছিল! বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সোমা ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার করে আমাকে ডাকল, 'এই এসো না!' আর ঠিক তখনি এত দূর থেকে আমি ওকে পড়ে যেতে দেখলাম। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে মারামারি করে একটা আর্ত চিৎকার ছুটে এল আমার কানে। সেই নরম বালিয়াড়ি ভেঙে প্রাণপণে সোমার কাছে এসে দাঁড়াতেই ও বিস্ফোরিত চোখ তুলে তাকাল। শরীর থরথর করে কাঁপছে ওর, ভীষণ ভয়ে মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

'কী হল, এই সোমা, কী হয়েছে তোমার?' আমি ঝুঁকে বসে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। দুটো চোখ বন্ধ করে কী ভীষণ ঘৃণায় মুখ বিকৃতি করে সোমা বাঁ-হাত দিয়ে পা দেখাল। মুহূর্তে আমার রক্তে একটা শীতলতা টোকা দিয়ে গেল। ছোপ-ছোপ রক্ত আর পুঁজে বীভৎস হওয়া এক ফালি কাপড় জড়িয়ে ধরেছে সোমার মসৃণ পায়ে। হোঁচট খেয়ে পড়েছে ও। সোমার পায়ে ছাপ

পড়েছে পুঁজ ও রক্তের।

হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম সেটাকে, সঙ্গে-সঙ্গে সোমা ফুঁসে উঠল, 'না, কক্ষনো না, তুমি ছোঁবে না।' চকিতে সোমা হাত দিয়ে ব্যান্ডেজটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল এক পাশে। আমি দেখলাম, সোমার হাত বীভৎস হয়ে উঠল, ভূত দেখার মতো চোখ তুলে দুটো হাত মুখের সামনে এনে দেখল সোমা। তারপর সমস্ত শরীরের শক্তি দু-পায়ে নিয়ে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল ও।

দু-পায়ে এগিয়ে গিয়ে সোমা হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে উঠল। এই মুহূর্তে আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওপাশে সমুদ্রের জোয়ারলাগা ঢেউ-এর গর্জন আর জ্যোৎস্না মাখা দূরন্ত বাতাস আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। দু-হাতে মুখ গুঁজে সোমা কাঁদছিল। আমি এগিয়ে গেলাম, 'এই লক্ষ্মীটি, ছেলেমানুষি করো না। তোমার কিছু হয়নি, কাঁদছ কেন? এই সোমা—।'

হঠাৎ সোমার কান্না থেমে গেল। চোখ বন্ধ করে ভাবল কিছু একটা। তারপর যেন কয়েক যোজন দূর থেকে কথা বলছে এমনি গলায় বলল, 'কুষ্ঠ, না?'

আমি স্বাভাবিক হতে চাইলাম প্রাণপণে, 'তাতে কি হয়েছে, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।'

সোমা কিছু বলল না প্রথমে, তারপর কেমন একটা আর্তস্বরে ডুকরে উঠল, 'আমার কি হবে!'

'কি হবে মানে? কিছু হবে না, চলো হোটেলে গিয়ে কার্বলিক সোপে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নেবে। আমি ওর কাঁধে হাত রাখতে চাইলাম।

চকিতে প্রচণ্ড চিৎকার করে সোমা ঘুরে দাঁড়াল, 'না। আমাকে ছোঁবে না তুমি। কুষ্ঠ ভয়ানক ছোঁয়াচে। আমি জানি, আমার মেজদাদুর হয়েছিল?'

সোমার চোখমুখে এমন একটা ছবি দ্রুত আঁকা হয়ে গেল যে তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, 'তোমার মেজদাদুর হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ঠাকুরদা ভয় পেয়ে তাকে কুষ্ঠ আশ্রমে দিয়ে এসেছিলেন। ছোঁয়াচে যে!'

'তোমার ঠাকুরদার কুষ্ঠ হয়েছিল?'

'একথা তুমি আগে কখনও বলনি তো।'

'বলিনি, এমনিই বলিনি, লক্ষ্মীটি আমি কখনও মেজদাদুকে ছুঁইনি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি—তুমি যদি আমাকে ভুল বোঝো, আমি ভয় পেয়েছিলাম গো।'

'তোমাদের বংশে কুষ্ঠ হয়েছিল!' ছোট ছেলে যেমন করে টেনিস বল লোফালফি করে তেমনি ভঙ্গিতে বললাম আমি।

'নাগো...আমাদের বংশে নয়, শুধু মেজদাদুর হয়েছিল—আমি তোমাকে ঠকাইনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো...।'

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো চোখ-মুখ হয়েছিল সোমার। আর আমার মাথার ভেতর অজস্র সিম্ফনির ঢাক একসঙ্গে বেজে উঠল। আজ সন্ধেবেলায় কুষ্ঠরোগী দেখার পর সোমার মানসিক পরিবর্তন একটু-একটু করে আমার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। আমি আমার শুভবুদ্ধির ওপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছিলাম।

হঠাৎ লক্ষ করলাম সোমা পায়ে-পায়ে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ওর শাড়ি বিস্রস্ত। চুল উড়ছে। চকিতে বুকের ভেতরে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দৌড়ে সোমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

সোমা কোনও কথা না বলে হাঁটতে লাগল। ওর চলার ভঙ্গি দেখে একটা ভয় আমার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করল। আমার মনে হল সোমা একটা ভয়ানক কিছু করতে যাচ্ছে। আমরা জেলেডিঙি পেরিয়ে জলের ধারে এসে পড়েছিলাম। আমি ত্রস্তে সোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভাঙা এবং তীক্ষ্ণ স্বরে সোমার গলা সামুদ্রিক গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। খবরদার—ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না।' তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'তোমার কিছু হলে আমি সহ্য করতে পারব না। আমাকে বাধা দিও না, আমি স্নান করব।

এই নির্জন সমুদ্রতীরে তখন অসংখ্য ঝিনুক বালির রুপোয় মুখ ডুবিয়ে পড়েছিল, সমুদ্রের গভীরে কোনও বিশাল শঙ্খের বুকে ঢেউ লেগে কেউ প্রলয়ের ডাক তুলেছিল হয়তো, নাম না জানা কোনও সামুদ্রিক দল ছাড়া পাখি ওই বিস্তীর্ণ জলের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে নিচের ফসফরাস জ্বলা ঢেউগুলোকে আগুনের বিছেহার ভেবে চন্দাহত বিবশ হয়ে ঢলে পড়ছিল জলের বুকে পরম তৃষ্ণায়, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আমার হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সোমাকে বহুযোজন দূরবর্তী এক অচেনা মানুষের মুখোশ পরে নিতে দেখলাম এই রাতে, চাঁদের রাতে, সমুদ্রের রাতে।

এই নিশীথবেলায় সমুদ্রতীরে কোনও মানুষ ছিল না জেগে। চন্দ্রালোকে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তারই আঁচ লেগেছে সমুদ্রের বুকে। ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে সে ঢেউগুলোকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছিল বালির গায়ে। অবাক হয়ে দেখলাম, শুকনো বালির ওপর শাড়ি খুলে রেখে সোমা সমুদ্রের জলে পা দিল। ঠিক এই মুহূর্তে আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই জোয়ারের সমুদ্রে স্নান কবার কথা ভেবে আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল। পা-ঢেউ-জলে দাঁড়িয়ে আমি ওকে ধরতে চাইছিলাম, ছিনিয়ে নিলাম হাত, 'কী পাগলামি করছে সোমা। এখন রাত কত খেয়াল আছে? এই জোয়ারের সমুদ্রে, কেউ কখনও কোনওদিন স্নান করেছে? চলো, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।'

তেমনি শান্ত গলায় সোমা বলল 'আমাকে বাধা দিও না।'

আমি সোমার পাশাপাশি জলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম, 'সোমা ফিরে চলো।' আমার মেরুদণ্ডে একটা শীতল অনুভূতি ছটফট করছিল। আমার ভয় করছিল। আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছিল। এই মুহূর্তে আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি সোমা। কিন্তু ক্রমশ এগিয়ে যেতে-যেতে সোমা বলল, 'না, সমুদ্রে স্নান না করলে আমার শান্তি হবে না।'

আমরা প্রায় কোমরজলে চলে এসেছি। বিরাট দু-মানুষ সমান ঢেউ একটার-পর-একটা আসছে পৃথিবী কাঁপিয়ে। আমি সোমার হাত ধরলাম, ও তাকাল কিছু বলল না এবার। বিরাট একটা ঢেউ এসে মাথার ওপর থেকে চাঁদের আকাশটাকে যেন হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমরা ডুব দিলাম।

জানি না কতক্ষণ ধরে স্নান করেছি আমরা। রুপোলি ঢেউ আর রূপকথার মতো সামুদ্রিক রাত আমাকে বিবশ করে রেখেছিল। এক সময় আমি ক্লান্ত অবসন্ন সোমাকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে চললাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, অস্পষ্ট চোখে দেখলাম একটা ছায়াশরীর শুকনো বালি ভেঙে দ্রুত পাশের ঝাউবনে ঢুকে গেল। আমার প্রচণ্ড শীত করছিল। জল ছেড়ে উঠতেই বাতাসের চেহারা মুহূর্তেই কসাই হয়ে গেল। হঠাৎ সোমার চিৎকার কানে এল, 'আমার শাড়ি।'

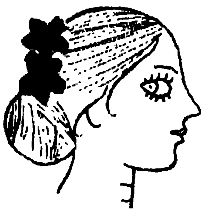
শীতে থরথর করে কাঁপছে সোমা। দু-হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরা, অন্তর থেকে জল ঝরছে টপটপ করে। আমার দিকে চোখ তুলে সোমা আবার বলল, 'আমার শাড়ি।' কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি তো, শাড়িটা কোথায় গেল? চোখ বোলালাম বালির চরে, কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ সেই ছায়াশরীরের কথা মনে পড়তেই চকিতে একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিল। আমি ঝাউবনের দিকে ছুটলাম।

বালির ঢেউগুলো ভেঙে ঝাউবনের কাছে যেতেই একটা কলকলে হাসি কানে এল। কয়েক পা এগিয়ে পা বাড়াতেই ঝাউবনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ছবি আমি দেখতে পেলাম। কয়েক হাত

বালির চত্বরে জ্যোৎস্নায় একটি মেয়ে কি ভীষণ খুশিতে হাসছে। মেয়েটার সর্বাঙ্গে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, একটা ঠোঁট খসে গেছে, চুলহীন মাথায় বড়-বড় ঘা। সোমার শাড়িটাকে পরবার চেষ্টা করছে সে ক্ষতবিক্ষত শরীরে জড়িয়ে-জড়িয়ে, আর তার সামনে উঁচু হয়ে বসে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত একটি লোক, যার একটি কান নেই, সমস্ত শরীরে সাদা চাকা-চাকা দাগ, যেন মুগ্ধ নয়নে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর জিনিসকে তারিফ করছে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে। চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে গেছে তাদের অঙ্গে।

সন্ধেবেলায় রাস্তায় বসে থাকা এই কুষ্ঠরোগী দুটোকে এখন আমার অন্য গ্রহের মানুষ বলে মনে হল। পৃথিবীর চারদেওয়ালের বাইরে খুঁটিয়ে তৈরি করা এই জগতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না আমি। হঠাৎ একটা শীতল স্পর্শ পেলাম কাঁধে। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সোমা ইঙ্গিতে নিষেধ করল। আমরা চোরের মতন ঝাউবন থেকে নেমে এলাম। সেই নির্জন জ্যোৎস্নারাতে সমুদ্রের বালির ওপর দিয়ে আমাদের দুটো শরীরকে পেছনের ঝাউবন থেকে ভেসে আসা একটা দারুণ খুশির হাসি তাড়া করে বড় রাস্তার দিকে পাঠিয়ে দিল।

চোখ তুলে তাকালে হয়তো দেখতাম বাতাসের দাপট বুঝি থমকে গেছে, মৃত মাছের চোখের চেহারা নিয়েছে জ্যোৎস্না আর বুড়ি চাঁদের মুখটাকে বিবর্ণ করে একটা দারুণ হাসি ভীষণ অহঙ্কারে চৌচির হয়ে বলছে, 'এই আমাকে দ্যাখো, এই আমাকে দ্যাখো।'



তৃতীয় নয়ন

পলাশপুরে আমার বাবা কাজ করতেন। ও-অঞ্চলের সমস্ত চা-বাগানগুলোর মধ্যে পলাশপুরের বেশ নামডাক ছিল তখন। উৎপাদন ও আয়তনের প্রখ্যাতি ছাড়াও পলাশপুর চা-বাগানের বাবুদের কোয়ার্টারেই প্রথম বিজালিবাতি জ্বলেছিল। ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আঙরাভাসা ঝরনার তীব্র স্রোতে হুইল বসিয়ে ডায়নামো চালিয়ে অ্যাটকিন্স সাহেব এই বিজালিবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা পাঁশুটে আলো জ্বলত কোয়ার্টারগুলোতে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে তার আয়ু যেত দপ করে ফুরিয়ে। তবু তার জন্যে আশপাশের চা-বাগানগুলো ঈর্ষা করত পলাশপুরকে। আমার বাবা ওই ফ্যাক্টরি দেখাশোনা করতেন।

জলপাইগুড়িতে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আমার ঠাকুরদা পলাশপুর থেকে রিটায়ার করে ওখানে বাড়ি করেছিলেন। আমি আর দিদিভাই ঠাকুরদার কাছেই থাকতাম। দিদিভাই সেকেন্ড ক্লাসে পড়ত বলে ঠাকুরদা কালীপুজোর ঠিক একদিন আগে আমাদের পলাশপুরে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। ঠাকুরদা ছিলেন বেশ রাশভারী। চাকুরিকালে তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। তিনি বলতেন ম্যাট্রিক পাশ করলেই দিদিভাইকে বিদায় করে দেবেন।

বিরাট তিস্তার চরটা ঠাকুরদার প্রকাণ্ড ছাতির তলায় মাথা গুঁজে হাঁটতে-হাঁটতে পেরিয়ে আসতাম আমি আর দিদিভাই। পেছনে স্যুটকেস কাঁধে লাটুকাকু। অনেকদিনের পুরোনো চাকর বলে ওকে আমরা কাকু বলতাম। তখন তিস্তার জল নেই বললেই চলে। মাঝে একটা পা পাতা-ডোবানো জলের শীর্ণ স্রোত বইলেও রুপোলি বালির চরটা ধু-ধু করত। মাঝে-মাঝে কাশবনের মধ্যে দিয়ে পথ হয়ে গেছে হেঁটে-হেঁটে। আর বিকট শব্দ করে বার্নিশ-কাছারি যাতায়াত করত

ভাঙাচোরা ট্যাক্সিগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে। কেন জানি না, ওগুলোকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হত না। ঠাকুরদা ওগুলোকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, 'হেঁটে গেলে স্বাস্থ্য ভালো হয়।'

বার্নিশে এসে ঠাকুরদা আমাদের বাসে উঠিয়ে দিতেন। বাসে ওঠার আগে আমরা তাঁকে প্রণাম করতাম। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে কি একটা মন্ত্র যেন তিনি পড়তেন। বাস ছাড়ার আগে ঠাকুরদা কন্ডাক্টরকে বারবার করে বলে দিতেন, কোথায় আমাদের নামিয়ে দিতে হবে। বাস ছাড়ার পর স্পষ্ট দেখতাম তাঁর চোখ ছলছল করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতাম, আমরা যতক্ষণ না চোখের আড়ালে যাচ্ছি ততক্ষণ উনি দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে বিমর্ষ মুখে লাটুকাকু।

দু-ধারে শাল দেওদার আর আম-কাঁঠালের সারির মধ্যে কালো ফিতের মতো তেলতেলে পিচের রাস্তাটা ধরে বাস ছুটত। দিদিভাই বসে থাকত খুব গম্ভীরভাবে। আর মাঝে-মাঝে আমাকে বলত, 'বাইরে হাত রেখো না অন্তু।' গাড়ি থামলেই কন্ডাক্টর চেঁচাত, ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা-বীরপাড়া। আর আমি সময় দেখতাম। পলাশপুর পৌঁছতে কত দেরি।

সবুজ গালিচার মতো ছাঁটা চা-গাছগুলোর মধ্যে নীল রঙের জমিতে সাদা রঙে 'পলাশপুর টি এস্টেট' লেখা সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠত। চেঁচিয়ে বাসটা থামাতেই চোখে পড়ত মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। পিচের রাস্তাটা, যেটা আসাম অবধি গিয়েছে, সেখান থেকে আমাদের কোয়ার্টারের বারান্দা প্রায় আধ ফার্লং। আমি স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে, দিদিভাইকে পেছনে ফেলে এক লাফে একটা পাথরের সিঁড়ি টপকে দু-পাশের পাতাবাহার গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে মাকে প্রণাম করতাম। আমার হাঁপানো দেখে মা যখন হেসে বলতেন, 'বোকা ছেলে, দৌড়ে আসতে হয়?'—তখন মায়ের বুকে মুখ ডুবিয়ে থাকতে ভীষণ ভালো লাগত। অথচ দিদিভাই আসত মৃদু পায়ে। মাকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করত, 'চিঠি পেয়েছিলে আমার?' সেকেন্ড ক্লাসে উঠতে আমার তখন দু-বছর বাকি ছিল।

আর ঠিক তখনই ওদের দেখতে পেতাম। বাস থামতেই ওরা ছুটে এসেছে। আমার বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ পাক দিয়ে উঠত। দিদিভাই বলত, 'এখন যেও না অন্তু, হাতমুখ ধোবে চলো।' করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকাতাম। মা তখন কী সুন্দর করে হাসতেন। দিদিভাই-এর চাইতে মাকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগত। দিদিভাইটা যে কবে ম্যাট্রিক পাশ করবে।

দল বেঁধে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা মাঠের মধ্যিখানে চলে এলাম। সেই ঝাঁকড়া চাঁপাফুলের গাছটার তলায় টিনের ছাউনি দিয়ে মণ্ডপ করা হয়ে গেছে। তিনদিকের অর্ধেক টিন দিয়ে ঘিরে দিয়ে গেছে বাগানের কুলি। বুড়িমাংরার মা তখন মণ্ডপের মাটি গোবর দিয়ে নিকোচ্ছিল। মাঝখানে ইট আর লাল মাটিতে ঠাকুর বসাবার বেদির জায়গা করা হয়েছে। একটা মাটিতে গোবরে মেশা গন্ধ আসছিল নাকে আর সেইসঙ্গে মিষ্টি চাঁপার বাস। ওপরের গাছটায় ডালগুলো সোনা হয়ে গেছে ফুলে।

'ঠাকুর গড়া হয়ে গেছে রে?' আমি মণ্ডপটা দেখতে-দেখতে বললাম।'

'ধুস্!' মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা সবে এখন মাথা লাগাচ্ছে।'

'ডাকিনী-যোগিনী?' আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

'ওদের মাথা লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদা নাকি বদমাশ, সেই কবে মাটি লেপে গিয়েছিল আর আজ এসেছে মাথা লাগাতে। মাথা ছাড়া ঠাকুরকে দেখতে কী খারাপই না লাগছিল?' হাঁটতে-হাঁটতে বিশু বলল।

আমরা এই চা-বাগানের ছেলেরা সোনাদের কোয়ার্টারের দিকে হাঁটছিলাম। শ্রীচরণদা ওখানে

প্রতিমা গড়ছেন। সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে এক ফালি জমিতে চালাঘর করে শ্রীচরণদা প্রতিমা তৈরি করেন।

'তোরা এতক্ষণ ওখানে ছিলি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ রে। তোকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তো গেলাম। জানিস, সোনা বলছিল যে তুই এবার আসবি না।' ঝুনু বলল।

'কেন আসব না কেন?' আমি তো অবাক!

'তুই নাকি জলপাইগুড়িতে থেকে খুব ভালো ছেলে হয়ে গেছিস, এবারে ফার্স্ট হবি। তা আমি বললাম, অন্তু না এসে পারেই না। তাহলে আরতি দেবে কে?'

ঝুনুর কথা শুনে আমার এত আনন্দ হল যে আমি 'এই রেডি গেট সেট গো' বলে দৌড়াতে লাগলাম।

সবার আগে সোনাদের কোয়ার্টারের তারের বেড়াটার সামনে গিয়ে দেখলাম শ্রীচরণদা একটা চ্যাপ্টা কাঠি দিয়ে ঠাকুরের গলার ভাঁজ ঠিক করছেন একটা লম্বা টুলে চড়ে। জিভ লাগানো হয়ে গেছে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনী-যোগিনীর তদারকে ব্যস্ত ছিল। প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো পেরিয়ে শ্রীচরণদা আমাদের চা-বাগানে আসেন। সোনাদের বাড়ির সামনে এই একচিলতে উঠোনে টিনের চালাঘর করে পোয়াল দড়ি দিয়ে ঠাকুর বানাতে বসে যান। হোক না যেদিন ইচ্ছে বাবুদের কালীপুজো কমিটির মিটিং, শ্রীচরণদা জানেন বায়না তাঁর বাঁধা। এক-একদিন এক-এক বাড়িতে খেয়ে শ্রীচরণদা আপন অধিকার নিজেই জাহির করে বেড়ান বাগানময়। ডিউটিতে যাওয়ার সময় বাবুরা সাইকেল থামিয়ে হয়তো বলে যান, 'শ্রীচরণ, এবার যেন ঠাকুরের চোখ সুন্দর হয়, গতবারটা যা টেড়া করেছিলে!' সঙ্গে-সঙ্গে মাটিমাখা হাত দুটো কপালে তুলে জিভ কাটেন শ্রীচরণদা, 'তা কখনও হতি পারে না বাবুমশায়, মা আমার পাপ দেবেন গো!' তারপর প্রতিমাকে মাটি মাখিয়ে শ্রীচরণদা সেই যে উধাও হলেন আর দেখাই নেই। সমস্ত চা-বাগানের মানুষকে দারুণ উদ্বিগ্ন করে রেখে শ্রীচরণদা তখন আশেপাশের বাগানগুলোর প্রতিমা গড়ছেন। আর কালীপুজোর আগের দিন সকালে এসে একগাল হেসে হলদে ছোপ ধরা দাঁতগুলো বের করে বললেন, 'এলাম গো।'

ওদের আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই চা-বাগানের সব ছোট ছেলেমেয়ে আর মহিলারা টুলে বেঞ্চিতে বসে আছে। সোনাদের কোয়ার্টারের এই বারান্দাটা এখন সাময়িকভাবে সবার আকর্ষণ। আতর মাসিমা, সোনার মা বসেছিলেন একটা বেতের চেয়ারে। আমাকে দেখেই ডাকলেন, 'আয় অন্তু, ভেতরে আয়। তোর ঠাকুরমার বাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।' বলে তারের গেটটা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

'এই যে, ছোট কত্তা এসে গেছেন দেখছি।' আমাকে দেখে শ্রীচরণদা হাত থামালেন। 'বড় কত্তার শরীর ভালো তো?' উত্তরে আমি ঘাড় নাড়লাম। শ্রীচরণদা যেবার প্রথম ঠাকুর গড়ার বায়না পান সেবার ঠাকুরদা ছিলেন পুজো কমিটির সেক্রেটারি। ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে সেবারই আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল। শ্রীচরণদা ঠাকুরদাকে বলতেন, 'বড় কত্তা,' আর সেই সুবাদে আমি ছোট কত্তা।

আসলে আমার এখন কী যে ভালোই না লাগছিল! এই চেনা পরিবেশে, জন্ম-ইস্কুল যা আমি দেখে আসছি, জলপাইগুড়ি থেকে এখানে এসে এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বুকের ভেতর একটা আনন্দ চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ছিল। প্রতি বছরের মতো সোনাদের কালো রঙের লম্বা কানওয়ালা কুকুরটা গন্ধরাজ গাছটার তলায় বাঁধা আছে। আমাকে দেখে লেজ নাড়ছে সেটা। কানে এল,

আতরমাসিমা ঝুনুর মাকে বলছেন, 'ছোঁড়াটা বড় হলে ওর বাপের মতো লম্বা হবে।' ঝুনুমাসিমা জবাবে যেন বললেন, 'শহরে থেকে খুব শান্ত হয়ে গেছে, বেশ মিষ্টি মুখটা।'

কথাগুলো শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। বিশু, ঝুনু, মন্টুদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমার মনে হল, গতবার জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় আমি কৌটোতে করে এক মুঠো মাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। জলপাইগুড়ির বাড়ির উঠোনে সেই মাটি রেখে দিয়ে রোজ একবার করে দেখতাম আর চা-বাগানের কথা ভাবতাম। তখন মনে হত আমি বিশুদের কাছেই আছি। এক রাত্রে এমন বৃষ্টি হল যে পরদিন সেই মাটিটাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি আর।

বারান্দার এক কোণে মোড়ায় একটা খয়েরি ফ্রক পরে দুই বিনুনি ঝুলিয়ে সোনা বসেছিল। হাতের চেটোয় গাল রেখে। ড্যাবডেবে চোখে আমাকে দেখছিল ও। সোনার গাল দুটো যেমন ফরসা তেমনি ফোলা। আমরা ওকে একা পেলেই 'রসগোল্লা, রসগোল্লা' বলে খ্যাপাতাম। আর ও কিছুক্ষণ রেগে-মেগে শেষে ভ্যাঁ করে গলা ছেড়ে কাঁদত।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে কখন হল বুঝতে পারিনি। সোনাদের বারান্দার একধারে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে তারের শিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চালাঘরের এদিকে কোনও লাইন নেই ইলেকট্রিকের। সাইকেলের ঘণ্টাগুলো তখন বাজতে শুরু করেছে আধো অন্ধকার মাঠের মধ্যে। বাবুরা সব অফিস থেকে ফিরতে শুরু করেছেন। ফ্যাক্টরিটা আমাদের কোয়ার্টারগুলো থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে। আমরা এতক্ষণ উবু হয়ে বসে ঠাকুরগড়া দেখছিলাম। মাটির কাজ শেষ। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই দূরে মাঠের ওপাশে চা-বাগানের রাস্তায় পাতলা অন্ধকারে সাইকেলের লাইট জ্বেলে বাবাকে আসতে দেখে আমি তারের গেটটা খুলে ছুটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। এতক্ষণে আমার শীত-শীত করছিল। গরম জামা গায়ে না দেখলে বাবা ভীষণ রাগ করবেন মায়ের ওপর।

বাবা বাড়িতে একটা ছোটখাটো পোলট্রি ফার্ম করেছিলেন। ভালোজাতের কয়েকটা লেগহর্ন মুরগি ছাড়াও কাঁঠালগাছের তলায় হাঁসের ঘর ছিল, বাড়ির পেছনে আঙরাভাসা ঝরনার ধারে আমাদের খড়ের ছাউনি দেওয়া গোয়ালঘরে চারটে ভাগলপুরী গরু সারা বছর ধরে দুধ দিত। কালীপুজোর আগের দিন সেই দুধ জমিয়ে এক কড়াই ভরতি নলেনগুড়ের পায়েস হত। লালরঙা সেই পায়েস থেকে অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ বেরত। বাড়ি ফিরেই দেখতাম, মা আর দিদিভাই উঠোনের তুলসীতলায়, বারান্দায়, কাঁঠালতলায়, খিড়কি দুয়ারে চৌদ্দপিদিম দিচ্ছেন। চৌদ্দপিদিম দিলে ভূতপেত্নি আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পাবে না। তারপর মা আমাদের বাটিভরতি করে পায়েস খাওয়াতেন। শীতকালে সেই প্রথম আমাদের পায়েস খাওয়া।

বাবার গলা পেলেই আমার বুক দুরুদুরু করে উঠত। যা ভয় করতাম ঠিক তাই। বাবা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। এই সময়টাই ছিল সব চাইতে মারাত্মক। বাবা আমাকে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করে যেতেন। কেন গত পরীক্ষায় আমি অঙ্কে নম্বর কম পেয়েছি, কেন ঠাকুমাকে বিরক্ত করি, কেন সন্ধের আগে বাড়ি ফিরি না—এই সব। কোনও উত্তর দিতে না পেরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর দিদিভাই তখন বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ জোগান দিত। বাবার সঙ্গে দিদিভাই-এর ব্যবহার ছিল সহজ। মাকেই বরং ও ভয় করত। আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উলটো। বাবার প্রশ্নে আমি যখন নাজেহাল হয়ে পড়েছি তখনই রান্নাঘর থেকে মা আমাকে পায়েস খেতে ডাকতেন। ডাকটা আমার কানে অমৃত বর্ষণ করত।

একটু বাদেই সোনাদের কোয়ার্টারের সামনে থেকে কাঁসর বাজার শব্দ আসত। ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ইচ্ছে হত মণ্ডপে ছুটে যেতে। তাই পা টিপে-টিপে, বাইরের ঘরে রেডিও-র পাশে সোফায় বসে কাগজপঠনরত বাবার সামনে দিয়ে মুখটাকে খুব নিরীহ করে, যেন বাড়ির বারান্দায় একটু দাঁড়াচ্ছি এমনি ভঙ্গি করে যেই হাঁটতাম অমনি বাবার গম্ভীর গলা

কানে আসত, 'ফুলহাতা সোয়েটারটা পরে যাও। পায়ে মোজা নেই কেন? ঠান্ডা না লাগালে আর চলছে না?'

একটা লম্বা টুলে হ্যাজাকটা রাখায় মণ্ডপটা কেমন ঝলমল করছে। বেদিতে ঠাকুরকে বসানো হয়েছে। কী বিশ্রী লাগছিল হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় ঠাকুরকে দেখতে। ভাঁজে-ভাঁজে মাটিতে যেন ফাটল ধরেছে একটু। ঠাকুরের গায়ে কোথায় রং নেই একটুও। মন্টু বলল, 'শ্রীচরণদা না এইমাত্র আমাদের বাড়িতে খেতে গেল!'

সোনাকে নিয়ে আতরমাসিমা এইমাত্র এলেন। এ চা-বাগানের একমাত্র পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েদের নেতৃত্ব করেন আতরমাসিমা। সোনাকে দেখলাম একটা ভারী শাল গায়ে জড়িয়ে এসেছে। দেখেই বুঝতে পারছিলাম ওটা আতরমাসিমার শাল। মণ্ডপের তিনদিকের অর্ধেক খোলা জায়গাগুলোতে সুনীতদারা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিল যাতে ঠান্ডা হাওয়া না আসে। আজ সারারাত জেগে সুনীতদারা মণ্ডপ সাজাবে। বিনু মাস্টার একটা কাগজে ডেকোরেশনের একটা প্ল্যান এঁকে বাদলদাকে বোঝাচ্ছিলেন। বিনু মাস্টার এখানকার জুনিয়ার স্কুলে সংস্কৃত পড়ান, সেইসঙ্গে ড্রয়িংও। অনেকগুলো বাঁশ আর লাল নীল কাগজ আনা হয়েছে মণ্ডপে। বড়রা, মানে এই বাগানের ডাক্তারবাবু, টাইপবাবু, পাতিবাবু, মালবাবুরা সব গলাবন্ধ সোয়েটার অথচ চাদর আর মাথায় বাঁদরটুপি পরে গল্প করছিলেন একধারে। ঝুনুর বাবা, এই বাগানের ডাক্তারবাবু, পুজোর দিন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। উনি বলেন, সারা জীবনে এক কোপে উনি একশো আটাশটা পাঁঠা বলি দিয়েছেন। এক কোপে না কাটলে নাকি মা অসন্তুষ্ট হন। মন্টুর বাবা বললেন, 'আপনি মশাই রক্ষক, আবার ভক্ষকও। ডাক্তারি করে মানুষ বাঁচান আবার এক কোপে পাঁঠাও বলি দেন।' ঝুনুর বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন। লোকে বলে, উনি নাকি শক্তি সাধনা, না কী বলে, করেন। এর মধ্যে দিদিভাইকে নিয়ে মা একবার ঘুরে গেছেন। মাকে লালপেড়ে শাড়িটা পরায় কী সুন্দর লাগছিল। দিদিভাই এসেছিল মুখে রুজ মেখে সাদা রঙের ওপর কালো নকশা তোলা কার্ডিগান পরে। দিদিভাইকে এখানে ঠিক মানাচ্ছিল না। কেমন শহুরে-শহুরে লাগছিল ওকে। ও বোধহয় তাই চেয়েছিল। চা-বাগানের অন্যান্য মেয়েরা দিদিভাইকে কেমন চোখে যেন দেখছিল। সুনীতদার সব কাজ থামিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম দিদিভাই-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। দিদিভাই এখানে বেশ ডাঁট নিয়ে থাকে। এখানকার কারোর সঙ্গে মিশতে চায় না। মা আমাকে ডেকে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। বাবার নাকি আজ নাইটডিউটি আছে। একটু বাদে মা আর দিদিভাই টর্চ জ্বেলে বাড়ি চলে গেলেন। সুনীতদা গেল মা-দের পৌঁছে দিয়ে আসতে। সুনীতদা কলকাতায় কলেজে পড়ে।

আমরা, মানে আমি, বিশু, মন্টু, খোকন, ঝুনু, ঠাকুরের সামনে একটা সতরঞ্চিতে বসেছিলাম। সোনাও আমাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। ও বলল, 'জানিস, এখনও সন্দেশ কেনা হয়নি পুজোর।'

আমি বললাম, 'তোর তো সন্দেশ খাওয়ার জন্য লাল পড়ছে।'

মুখ ভেঙচে সোনা বলল, 'ইস, তুই তো অঞ্জলি দেওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে সন্দেশ চুরি করিস থালা থেকে, আমি দেখেছি!'

'হ্যাঁ তুই দেখেছিস!'

আমার খুব খারাপ লাগল কথাটা। মন্টু বলল, 'জানিস, আমার না কেমন ম্যাজিক লাগে। এই এখন দেখে যাচ্ছি এইরকম, আর সকালে এসে দেখব ঠাকুর কেমন সুন্দর প্রতিমা হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'সুনীতদাদের কি মজা, না? ওরা কেমন রাত জেগে ডেকোরেশন করতে-করতে ঠাকুরের প্রতিমা হয়ে যাওয়া দ্যাখে।'

ঝুনু বলল, 'ইস্, আমরা যে কবে বড় হয়ে ডেকোরেশন করব!'

আমরা আমাদের বড় না হওয়া নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আপশোস করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এল, 'এই আজ রাত্রে ঠাকুর রং করা দেখবি?'

ঝুনু মুখ বেঁকাল, 'কি করে দেখব? মা তো আসতেই দেবে না।'

মন্টু বলল, 'বাবা বলবে, সামনে পরীক্ষা—অসুখ করবে।'

বোঝা গেল আমাদের কাউকেই বাড়ি থেকে ছাড়বে না। একমাত্র আসা যায় ভোরে। তখন শিউলি ফুল কুড়োবার নাম করে বেরোনো যায়। অবশ্য এই ব্যাপারটা যদিও মেয়েদের একচেটিয়া, তবুও। লক্ষ্মীপুজো আর কালীপুজোর দিন অন্ধকার থাকতেই চা-বাগানের সব মেয়েরা, আঠারো থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চা অবধি মাঠের চারটে শিউলি গাছের তলায় বসে যায় সাজি ভরে শিউলি ফুল কুড়োতে। এমন সময় বিশু কি ভেবে হঠাৎ বলল, ও আজ রাত্রে আসবেই। রাত ঠিক বারোটার সময় ও লুকিয়ে-লুকিয়ে এসে বড় শিউলি গাছটার সামনে দাঁড়াবে। আমি বললাম, আমিও আসব। আজ রাত্রে ঠাকুর রং করা দেখবই। আমার মাথায় তখন ঘুরছিল, বাবা আজ নাইটডিউটি দিতে যাবেন।

রাত দশটা নাগাদ বাবা গরম অলেস্টার, মাথায় উলের টুপি, হাঁটু অবধি মোজা পরে ডিউটিতে গেলেন সাইকেলে চড়ে তিন ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে। মা একটা ফ্লাস্কে কফি তৈরি করে দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এখন মা লণ্ঠন জ্বেলে রেখেছেন। একটু আগে ঠিক দশটা বাজতেই ইলেকট্রিক আলোটা নিবে গিয়েছে। বাবা চলে যেতেই আমি খাট থেকে নেমে মায়ের খাটে উঠে এলাম। আমাকে বাবার সঙ্গে শুতে হত, দিদিভাইকে মায়ের সঙ্গে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কিরে ভয় লাগছে বুঝি?'

আমি ঘাড় নেড়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়লাম। মা তখন লণ্ঠনের আলোয় গল্পের বই পড়ছিলেন। একটু বাদে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'মা, আমি ঠাকুরগড়া দেখতে যাব।'

মা পড়তে-পড়তে বললেন, 'ঠাকুর তো হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'না রং করা হয়নি। আমি কখনও রঙ করা দেখিনি। ওরা সবাই আসবে। তুমি একবার বলো মা!'

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, তোমাকে যেতে দেব না। এখন বাইরে হিম পড়ছে। তোমার ঠান্ডা লাগবে। তোমার বাবা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

কিন্তু আমি মাকে ছাড়লাম না। বারংবার কাকুতিমিনতি করতে শুরু করলাম। ভাগ্যিস দিদিভাই এখন মড়ার মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। যখন অনেক নাকিকান্না কেঁদে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি আর বিশুর কাছে মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গেছি তখন হঠাৎ মা বললেন, 'ঠিক আছে, যাও তুমি। তবে তোমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে।'

'কী কথা, বলো?' আমি ঝলমলে মুখে বললাম।

'তোমাকে পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করতে হবে, প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটা করে চিঠি দেবে আর একদম ঠান্ডা লাগাবে না।'

এ তো সামান্য, মা যদি আমাকে তিনদিন ভাত না খেতে বলতেন তবে তাতেই আমি রাজি হয়ে যেতাম। মা বললেন, 'এবার তুমি ঘুমোও। বারোটার সময় আমি তোমাকে তুলে দেব।' মড়ার মতো ঘুমের ভান করে শুয়েছিলাম, বড় ঘড়িতে ঢংঢং করে বারোটা বাজতেই লাফিয়ে উঠলাম, মা তখনও বই পড়ছিলেন। আমাকে উঠতে দেখে হেসে বললেন, 'এই ঘুম হচ্ছিল তোমার?'

গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপর চাদর জড়িয়ে, মাফলারে কান ঢেকে ছোট টর্চটা নিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন মনে হল আমার রক্ত বোধহয় জমে যাবে। এক-একটা হাওয়ার ঝাপটা

লাগছে আর দাঁতগুলো ঠকঠক করে আওয়াজ তুলছে। বাইরে কী ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ির সামনে বড় শিউলি গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। বিশু এখনও আসেনি। শিউলি গাছের তলায় ঘাসগুলো সাদা চাদর পরেছে যেন। শিউলি ফুলগুলো গালিচার মতো ছড়িয়ে আছে। মাথার ওপর টুপটুপ করে শিউলি ঝরছিল। কান পাতলে শিশিরের শব্দ শোনা যায় পাতায়-পাতায়। মাঠের ওপাশে বড় রাস্তার ওঁধারে মাড়োয়ারি দোকানটা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। পিচের রাস্তাটা যেটা আসাম অবধি গিয়েছে, সেখানে মাঝে-মাঝে এক-একটা লড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছিল। গাড়ির হেডলাইটে সমস্ত জায়গাটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে পরক্ষণেই অন্ধকারের গাঢ়ত্ব তুলছিল। দূরে মাঠের মধ্যিখানে মণ্ডপ থেকে একটুখানি আলো বাইরে পড়েছিল আর মাঝে-মাঝে ওঁদের কথাবার্তা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। এদিকে সবক'টি কোয়ার্টার অন্ধকারে ডালপালা মেলে দিয়েছে। পাতাবাহার গাছগুলোর ওপাশে একটা বিরাট দেওদার গাছ আছে। ঝুনু বলেছিল, গাছে নাকি একটা সাহেব-ভূত বিরাট পা ঝুলিয়ে বসে-বসে চুরুট খায়। মাঠের মধ্যে এত ঝাঁক-ঝাঁক জ্বলন্ত জোনাকি দেখে আমার সেই চুরুটের কথা যেই মনে পড়ল অমনি গা-টা ছমছম করে উঠল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে। ধেউদির গান তৈরি হচ্ছে লাইনে-লাইনে। ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের গান খুব অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকারটা একটু চোখ-সাওয়া হয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ দেখলাম কে যেন মাঠের পাশ ধরে দৌড়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই টর্চ জ্বালাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে টর্চটা নিবিয়ে ফেলে একবার ভাবলাম, তারপরে টর্চ জ্বেলে কাছে যেতেই সোনা এগিয়ে এল।

'তুই?' আমি ধাক্কাটা সামলাচ্ছিলাম, 'কী করে এলি?'

'কেন? মা-রা তো পাশের ঘরে শোয়, দিদা ঘুমোতেই আমি পা টিপে-টিপে চলে এলাম।' সোনা নির্বিকার।

'আতরমাসিমা ভীষণ রাগ করবেন!' আমি ওকে বোঝাতে চাইছিলাম যেন।

'ইস্, জানতেই পারবে না। আমার দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি? তোরা একাই মজা করে দেখবি, না?' সোনার গলায় অভিযোগ।

হঠাৎ লক্ষ করলাম সোনার গায়ে গরম কাপড়ের নামমাত্র নেই। ফুলহাতা একটা গরমের ফ্রক পরেছে ও। তাড়াতাড়িতে হয়তো পরে আসতে পারেনি কিছু।

আমি বললাম, 'সোনা, তোর ঠান্ডা লাগছে?'

সোনা ঘাড় নেড়ে না করলেও বুঝতে পারছি ঠান্ডা ওর লাগছেই।

'বিশুটা এখনও এল না।' আমি বললাম।

'দাঁড়া, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে বিশু এল না তখন আমরা দুজন আস্তে-আস্তে মাঠের মধ্যে দিয়ে শিশিরে পা ডুবিয়ে এগোতে লাগলাম মণ্ডপের দিকে। একটু এগোতেই গ্রামাফোনের সুর শুনতে পেলাম। রেকর্ড বাজছে, 'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে।' এই রাত্রে, নির্জন রাত্রে গানের সুর অতিরিক্ত আওয়াজ আনছিল। রাত জাগতে হলে নাকি গ্রামাফোন বাজানো দরকার। কিন্তু কোনও বাড়ি থেকে রেকর্ড দিতে চায় না বলেই এই রেকর্ডটা সুনীতদাদা আমাদের বাড়ি থেকে প্রতিবছর নিয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, এই নিশুতি চতুর্দশীর রাত্রে যখন চা-বাগানের ছোট্ট পৃথিবীটা অথৈ ঘুমে সুপ্ত, যখন জোনাকিগুলো বিরাট মাঠের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত, তখন মণ্ডপের ক্ষীণ আলো এত দূরে অন্ধকারে দাঁড়ানো আমার চোখে গহন সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের মতো কাজ করছিল। দূরে সাঁওতাল লাইনে মাদল বাজছে আর সম্মিলিত সুরে গানের ধুয়ো অন্ধকারকে চিরে এই মাঠের বুকে এসে গানের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আমাদের কানে কনসার্টের মতন বাজছিল। পায়ে-পায়ে আমরা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কে রে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?' বিনু মাস্টার হাঁক দিলেন।

গলাটা শুনেই পাতাবাহার গাছগুলোর পাশে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। এখন আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় ভয় সঞ্চারিত হল। ওরা যদি আমাদের ওপর খুব রেগে যায়। সোনা সিঁটিয়ে আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে আমাদের ওরা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। একঝলক বাতাস মণ্ডপের ওপরের রাশ-রাশ চাঁপাফুলের গন্ধ আমাদের মাখিয়ে গেল।

'আরে সাড়া দিচ্ছে না কেন? সুনীত, দ্যাখ তো কে দাঁড়িয়ে আছে।' বিনু মাস্টার মণ্ডপের ভেতরে বাখরি চাঁচাতে-চাঁচাতে বললেন।

সুনীতদারা সারা মণ্ডপে বাঁশের ফ্রেম করে কাগজে আটা মাখাচ্ছিল। বিনু মাস্টারের কথায়, 'ভূতটুত হবে বাবা' বলে মণ্ডপের সামনে এসে চিৎকার করে ডাকল, 'কে বাবা, সাড়া দাও, নইলে বাঁশ ছুঁড়ে মারব।'

কথাটা শোনামাত্রই আমার মুখ দিয়ে বের হল, 'আমি।'

'আমিটা কে?'

'আমি, আমি অন্তু।'

ততক্ষণে সুনীতদা, বাদলদা আমার কাছে এসে পড়েছে, 'আরে তোবা? তোরা কী করছিস এখানে? দ্যাখো বিনুদা—।'

আমাদের টানতে-টানতে সুনীতদা মণ্ডপের ভেতরে নিয়ে এল। বিনুমাস্টার আমাদের দেখে চোখ কপালে তুললেন, 'কী কাণ্ড! তোরা এখানে এত রাত্রে! বদমায়েস ছেলেরা সব, যাও-যাও।'

আর ততক্ষণে আমাদের নিয়ে মণ্ডপের দাদাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ছোঁড়াটার জলপাইগুড়ি গিয়ে বড্ড বোলচাল বেড়ে গিয়েছে। এমন অবাধ্য সব। আজকালকার ছেলেগুলো কাউকে মানতেই চায় না। আচ্ছা বাড়ি থেকেই বা ছাড়ল কী করতে। বাবা-মা-র দায়িত্বজ্ঞান কীরকম। নিশ্চয় পালিয়ে এসেছে। ইত্যাদি-ইত্যাদি। বিনুমাস্টার বললেন, 'যাও সুনীত, ওদের বাড়ি পৌঁছে দাও। তুমি সঙ্গে যাও।'

সোনা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কথাটা শুনেই ডানহাতটা দিয়ে চোখ রগড়ে ভ্যাঁ করে কান্না শুরু করল।

সোনার কান্না শুনে শ্রীচরণদা পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন, 'আহা, কাঁদ কেনে মা ঠাকুরুন। আহা, তোমরা আবার বকতিছ কেনে? আসিই যখন পড়িছে তবে থাকুক কেনে হেথায়।'

সোনার কান্না আরও বেড়ে গেল। বিনুমাস্টার আমাদের কিছুক্ষণ দেখে শেষে বললেন, 'আচ্ছা থাক, আর কাঁদতে হবে না। যাও ওই কোনায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকো। একটিবার গণ্ডগোল করলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

আমরা সুড়সুড় করে টিনের বেড়ার কাছে সতরঞ্চির ওপর গিয়ে বসলাম। ওরা আবার কাজে আড্ডায় মশগুল হয়ে গেল। ঠাকুরের গায়ে সাদা রং বোলানো হয়ে গেছে। কী বিশ্রীই না লাগছে ঠাকুরকে দেখতে। বিনুমাস্টারের বাঁশ কাটার শব্দ আসছিল মণ্ডপের সামনে থেকে। একটু বাদে আমার কানের কাছে সোনা ফিসফিসিয়ে বলল, 'কেমন বোকা বানিয়ে দিলাম বল তো! না কাঁদলে ঠিক বাড়ি পাঠিয়ে দিত।'

ঠাকুরের পেছনে গ্রামাফোনে তখন বাজছিল, 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।'

শ্রীচরণদা নীল রং গুলছিলেন একটা বড় বালতিতে। রঙের গন্ধ আসছিল নাকে। শ্রীচরণদার কুঁজো সাকরেদটা ঠাকুরের পায়ের নিচে শোয়া শিবের গায়ে সাদা রং বোলাচ্ছিল। ডাকিনী-যোগিনীকে দুটো সাদা পেত্নির মতো লাগছিল দেখতে। ডেকরেশন চলছে। একটা মন্দির হবে। ঠাকুরের বেদিটা মন্দিরের ঠিক মাঝখানে থাকে। সুনীতদা কাগজ কেটে দিচ্ছিল, বাদলদারা আঠা মাখাচ্ছিল এখন। হঠাৎ সুনীতদা উঠে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। হাঁটুগেড়ে আমাদের সামনে

বসে আমার কানটা মলে দিয়ে বলল, 'আগে থেকে প্ল্যান করে আসা হয়েছে না? খুব পেকেছ তুমি!' তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর সোনামণি, মাকে বলে দেবে না তো সুনীতদা সিগারেট খায়!' সোনা মাথা নেড়ে না বলল। সুনীতদা ডান হাতে সোনার ফোলা-ফোলা গাল দুটো টিপে বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে।'

সুনীতদা চলে যেতেই সোনা মুখ লাল করে বলল, 'অ-সো-ভ্য!' আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল সুনীতদার ওপর।

মাথার ওপর টিনের চালে চাঁপাগাছের পাতা চুঁইয়ে শিশির পড়ছিল টপটপ করে। সোনা আমার কাছে বসেছিল। 'তোর শীত লাগছে সোনা।' জিজ্ঞাসা করতেই ও ঘাড় নাড়ল 'হ্যাঁ'। 'আমার চাদরটা নে তুই' বলে চাদরটা খুলে এক প্রান্ত ওর পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা প্রান্ত আমার গায়ে জড়িয়ে দুটো মুখ সামনে এনে পায়ের তলায় গুঁজে দিলাম। একটু বাদেই চাদরের মধ্যে বেশ একটা ওম্ হল। সোনার কাঁধের সঙ্গে আমার কাঁধ জুড়ে গিয়ে ঠান্ডা আর লাগছিল না।

বাদলদা বলছিল, 'শালা আমাদের বাগানে একটাই তো পুজো, তবু ডেকরেশনের বেলায় কী কিপ্টেমি। মাল না ছাড়লে ডেকরেশন হয়।'

বিনুমাস্টার বলল, 'সবাই পুজোর পর গান্ডেপিন্ডে গিলতে চায় তো কি হবে!' ঠাকুরের গায়ে নীল রং বোলানো হল। কুঁজো সাকরেদটা ডাকিনী-যোগিনীকে নীল রং না বুলিয়ে মেটে রং করতে আরম্ভ করল। নীল রঙের পোঁচাটা পড়ায় ঠাকুরকে কেমন যেন লাগছিল। একটা বড় তুলি রঙের বালতিতে ডুবিয়ে শ্রীচরণদা বড়-বড় পোঁচ টানছিলেন ঠাকুরের গায়ে। মাথাটা এখনও নেড়া বলে মুখটা বিশ্রি লাগছিল। সোনা আর কাঁপছিল না। ওর আঙুল আমি ধরেছিলাম, কী ঠান্ডা ওর হাতটা।

'ঠাকুরের গায়ে রং কি বল তো?' সোনা জিজ্ঞাসা করল।

'কেন, ঠাকুরের গায়ে রং তো নীল।' আমি বললাম।

'নীল রং হয়ে গেছে। মা বলত কালোও হয়। তাই তো নাম কালী।'

'এখনও জামা পরায়নি।'

'ধ্যাত ঠাকুর জামা পরে নাকি! মা বলেছে যুদ্ধ করে মানুষের হাত কেটে ঠাকুর জামা করে পরেছে।'

'শিবের বাঘছালটা কিন্তু এখনও হয়নি। ভুলে যাবে না তো।'

এখন ঠাকুরের হাতের চেটোতে, জিবে, পায়ে লাল রং বোলালেন শ্রীচরণদা। সুনীতদারা লাল নীল কাগজে সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে মন্দির করে ফেলেছে। এখন আর গ্রামোফোন বাজছে না। বিনুমাস্টার রং তুলি সাজাচ্ছিল। শ্রীচরণদা যখন ঠাকুরের বুকের কাছে খয়েরি রং বোলাচ্ছেন তখন পেছন থেকে কে যেন জিভে করে চক্‌চক্ শব্দ করল। শ্রীচরণদা একবার তুলিটা থামিয়ে আবার রং করতে লাগলেন। সুনীতদা ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে সিগারেট টানতে-টানতে বলল, 'শালা, শ্রীচরণদার এলেম আছে মাইরি। তুলির টানে-টানে মায়ের সুরত খুলে যাচ্ছে।'

সামনে থেকে বিনুমাস্টার ধমকে উঠল, 'এই সুনতে, মাকে শালা বলছিস কোন আক্কেলে রে?'

সুনীতদা বলল, 'এক্সকিউজ মি বিনুদা। তবে মা তো এখনও কমপ্লিট হয়নি। না আঁকা হলে তো আবার লাইফ আসে না।'

সোনা আমার হাঁটুর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠাকুর রং করা দেখছিল। আমার এখন ঠাকুরকে দেখতে খুব খারাপ লাগছিল। শ্রীচরণদা যত রং বোলাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে ঠাকুর কেমন ন্যাংটো-

ন্যাংটো। সাধনদা উঠে এসে সুনীতদার পাশে দাঁড়াল, ‘শালা কী করেছে মাইরি।’

সুনীতদা বলল, ‘চেহারা দেখেছিস!’

বাদলদা কী যেন দেখে বলল, ‘অবস্যার্ড।’

ওরা খুব চাপা গলায় কথা বলছিল যাতে বিনুমাস্টার না শুনতে পায়। বাদলদা একসময় বলল, ‘আমাদের বাগানটা মাইরি একদম সাহারা। একটাও নেই যার দিকে তাকানো যায়।’

সাধনদা বলল, ‘কেন, অন্তর দিদি!’

সঙ্গে-সঙ্গে সুনীতদা ধমকে উঠল, ‘অ্যাই!’ তারপর নিচু গলায় বলল, ‘সোনাটা মাইরি ফিউচারে—’। বলে চোখ টিপল।

‘এই, আস্তে।’ বাদলদা কথাটা বলে আমাদের দিকে তাকাল।

আমার খুব অবাক লাগছিল ওদের কথা শুনে। কেমন রহস্যজনক লাগছিল আমার। আমি বুঝতে পারছিলাম না। সোনার দিকে তাকালাম। ওর নাক দিয়ে জল গড়াতেই ও টেনে নিল সেটা। সাধনদা একবার বলেছিল ‘কী[illegible]প্‌।’ মানে কী আদল?—আদল মানে, আকৃতি? ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সাধনদা কথাগুলো বলেছিল। তারপর সোনার দিকে। সোনাকে ঠাকুরের মতো কল্পনা করে আমার খুব হাসি পেল।

সোনা বলল, ‘এই হাসছিস যে!’

‘এমনি।’ আমি বললাম।

‘সুনীতদাটা না খুব অসভ্যো।’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর দিদির সঙ্গে ভাব আছে। চিঠি দেয়।’

‘যাঃ।’

‘হ্যাঁরে! আমি জানি।’ সোনা কথাটা বলতেই সুনীতদার ওপরে ভীষণ রাগ হতে লাগল।

‘এই সোনা, তুই না বড় হলে—’

‘অ্যাই!’ সোনা আমাকে চিমটি কাটল রেগে।

শ্রীচরণদা ঠাকুরের মাথায় চুল লাগালেন আঠা দিয়ে। পেছনে একটা স্টোভ জ্বলছিল বলে সোঁ-সোঁ আওয়াজ আসছে। বোধহয় চা হচ্ছে। এখন বোধহয় শেষ রাত। অন্ধকারে জোনাকি জ্বলা থেমেছে। দূরের সাঁওতাল লাইনের মাদলের শব্দ থেমে গেছে। চারপাশ কী আশ্চর্য থমথমে। শুধু মাথার ওপরে টিনের চালে শিশির পড়ছিল।

ডাকিনী-যোগিনী, সাপ, শিব, শেয়াল সব রং করা হয়ে গেছে। সাপটাকে কী চকচকে লাগছিল। যেন জীবন্ত। বিনুমাস্টার মন্দিরের দেওয়ালের ছবি আঁকছেন, একটা মেয়ে পুজোর থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

সুনীতদারা সবাই ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরকে দেখতে-দেখতে আমার ভেতরটা কেমন করছিল। এখনও চোখ আঁকা হয়নি বলে অন্ধ লাগছিল ঠাকুরকে। সোনার হাতটা চেপে ধরে বললাম, ‘তোর হাতটা কী নরম।’

সোনা বলল, ‘তোরটাও। ছেলেদের হাত এত নরম হয় না।’

‘ইস্‌। ব্যাডমিন্টন খেলে-খেলে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে বলে।’

‘এখন ঠাকুরের চোখ আঁকবে।’ সোনা কথাটা বলে ড্যাবডাবে চোখে ঠাকুরের দিকে তাকাল।

সুনীতদা একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে হ্যাজাকটা তুলে ধরল। বিনুমাস্টার বলল, ‘এখন কেউ ডিসটার্ব করিস না যেন, চোখ আঁকায় খুব মনোযোগ দরকার হয়।’

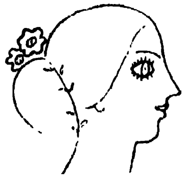
আলোটা ওপরে তোলায় ঠাকুরের সারা গায়ে আলো ঝলমল করছিল। মুখটা খুব ভয়ঙ্কর লাগছিল না আমার। বুকের কাছটায় চোখ যেতেই আমার মনে পড়ল জিভের সেই চকচক শব্দটা।

আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করছিল। সোনা বড় হলে কি কালীমার মতো হবে। সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কালীর মুখ মেলাতে চাইলাম, 'এই সোনা জিভ বের কর তো।' সোনা অবাক হয়ে জিভ বার করতেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। না, সোনাকে ওরকম দেখাচ্ছে না।

শ্রীচরণদা খুব ধরে-ধরে দুটো চোখ আঁকলেন। সুন্দর চোখ দুটো। এবার কপালের চোখ। বিনুমাস্টার বলল, 'এবার কেউ আওয়াজ করবে না, তৃতীয় নয়ন আঁকা হবে। জ্ঞানচক্ষু। ঠাকুরের প্রাণ আসবে। সাধন শঙ্খ বাজাবে আঁকা হলেই।' ওরা সবাই শঙ্খ, কাঁসর নিয়ে তৈরি হল। সুনীতদা হ্যাজাকটা একটু ওপরে তুলে নিল।

শ্রীচরণদার আড়ালে ঠাকুরের মুখটা ঢাকা পড়েছিল। সোনা আমার গায়ের ওপর ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করছিল। আমি এখান থেকে শুধু ঠাকুরের বুক [illegible]র উরু দেখতে পাচ্ছিলাম। আলো পড়ে চকচক করছে। দেখতে-দেখতে আমার মাথার মধ্যে [illegible]করতে লাগল। কান দুটো গরম হয়ে উঠল। আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, শুধু [illegible] শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আর কখনও, যখন ঠাকুরকে [illegible] হয়নি বা সকালে যখন প্রতিমা-হয়ে-যাওয়া ঠাকুরকে দেখেছি তখনও এসব কোনওদিন মনে হয়নি। আমি মা কালীর বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সম্মোহিতের মতো, সোনা মা কালী হয়ে গেছে কিনা দেখবার জন্যে ডান হাতটা সোনার বুকের কাছে নিয়ে গেলাম। সোনার প্রায় সমতল বুকের ওপর যখন আমার হাত তখন আচম্বিতে সোনা শব্দ করে উঠে কেঁদে ফেলল। আর তৎক্ষণাৎ শাঁখ আর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ উঠল। কপালের চোখ আঁকা গেছে তখন।

সোনার চিৎকারে ওরা সব ছুটে এল, 'আরে কাঁদছিস কেন, এই, এই সোনা, ভয় পেয়েছিস!' সোনা কাঁদতে-কাঁদতে বাঁ-হাত দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিল। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল হঠাৎ। একবার সোনার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলাম মা কালী খাঁড়া হাতে লাল জিভ বার করে যেন তেড়ে আসছে। আমার মেরুদণ্ডে একটা শীতলতা জীবনে প্রথমবার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে আমি হঠাৎ সেই ভোর হয়ে আসা অন্ধকারে, আলোকিত পুজোমণ্ডপ ছেড়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর কালীমূর্তির চোখ এড়াতে প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম। সমস্ত মাঠ জুড়ে থাকা ফিকে অন্ধকার যেন হঠাৎ জমাট হয়ে মা-কালীর জিভের মতো আমার চোখের সামনে ঝুলছিল। কোথায় আমি পালাব।



অন্তর আত্মা

বেশ কিছুক্ষণ হল আমার ঘুম ভেঙেছে এবং আমি এই সময়টুকু সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তেমাথা বুড়ির মতো, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিলাম। আচার খাওয়ার পর জিভটাকে চকচক শব্দে নাড়াচাড়া করতে যেমনটি লাগে।

এখন এই কাল মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে আমি সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, একটা মাটির ভাঁড়ে উপচে-পড়া সিগারেটের টুকরো ও আমার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা-হওয়া একপাটি জুতো আবিষ্কার করে ঈষৎ বিরক্ত হলাম। এবার আমি উঠব। রাত্রে নগ্ন হয়ে শোওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করায় এখন লেপের আড়ালে প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারের মতো টুথব্রাশ

মুখে পুরে একতলায় নামব। দরজা খোলার আগে আমার দশ ইঞ্চি এবং প্রায় অস্বচ্ছ আয়নায় মুখটা একবার বুলিয়ে চোখের শ্রী ফিরিয়ে নেব। কারণ আমি জানি, এ সময়ে নিচে কলতলায় কয়েকটি মেয়ে ব্যস্ত থাকবেই। এ-বাড়ির বাসিন্দে মেয়েরা সুন্দরী কি! হলেও তাদের প্রতি কোনও দুর্বলতা আমার নেই; তথাপি পিচুটি-চোখে কোনও মহিলার মুখোমুখি হওয়া আমি 'ক্রাইম্' মনে করি। কলতলায় নামলেই চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মতো কল আঁকড়ে থাকা মেয়েগুলো আলগা হবে এবং ইত্যবসরে আমি সুড়ুৎ করে কর্মটি সেরে নিই। এই সময় নিয়মিত দুটি বাক্য শ্রবণ করি—'আজ বড় তাড়াতাড়ি উঠলেন যে!' অথবা 'আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু।' এক টুকরো প্রণামি হাসি চটকাতে-চটকাতে যখন ওপরে উঠে আসি তখন তলপেটে ঈষৎ চাপ অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও কোনও বাথরুম খালি না থাকায় আমাকে জামা গলিয়ে 'ভালো আছেন মাসিমা' গোছের মুখ করে পাড়ার চায়ের দোকানে ছুটতে হয়। আমার প্রাত্যহিক খরচের একটা বাজেট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সেটি মেনে চললেও প্রায়শই তা অতিক্রম করে যাই। কারণ যে-কোনও সময় যে-কোনও মহিলার সঙ্গে আলাপ হলে ইত্যাদির জন্যে কিছু খরচ আমার হয়ই। আমি একটি সরকারি অফিসে মাঝারি চাকরি করলেও কর্তৃপক্ষ আমার ইতিহাসে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত। যদিচ তাঁরা সন্দেহের কাঁটাকে লালন করতে বদ্ধপরিকর এবং আমি নিশ্চিন্তে আনন্দে নিয়মিত মাইনে নিয়ে যাচ্ছি।

সম্পূর্ণ টিপটপ না হয়ে পথে বের হই না আমি। আমার টেরি থেকে জুতোর টো পর্যন্ত আমার ঝকঝকে থাকবেই। দু'খানেকের ব্যবধানে সিগারেট কেনার সময় পানের দোকানের আয়নায় কোদাল চালানোর মতো চুলে কয়েকটা কোপ মারি চিরুনি দিয়ে। দ্বিতীয়টির জন্য আমাকে ট্রামবাসে উঠতে হয়। কারণ, প্রকাশ্যে পকেটের রুমালে জুতোর টো মোছা—সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। ট্রামে উঠে ইচ্ছে করে রুমালটাকে পায়ের কাঠে ফেলে দিই। এবং সেটাকে ওঠাবার ভঙ্গি করে নিপুণ হাতে টো পালিশ করে নিই। রুমালটির দুটো ভাঁজ আছে। একটিতে মুখ মুছি অন্যটিতে জুতো।

যেদিন প্রথম ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলাম সেদিন খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিলাম। কারণ জেনেছিলাম যে, আমার অফিসাররাও আমার ডিগ্রির কাছাকাছি যাননি। বস্তুত 'এম-এ পাশ' শব্দ দুটো কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি নেওয়ার মতো আমার কাছে আরামদায়ক ছিল। আমার পাশের সহকর্মী আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল আমার ডিগ্রির খবর পেয়ে। 'দাদা এখানে আর ক'দিন থাকবেন!' ইত্যাদি স্তুতি সে করেছে প্রচুর। কিন্তু যেদিন শুনল আমার এম-এ-র সাবজেক্ট কি ছিল সেদিন থেকেই লোকটা ইয়ার-দোস্তের মতো 'আরে শালা' বলতে শুরু করল। আমার খুব সন্দেহ, লোকটা কলেজেই ঢোকেনি। ফলত এখন আমি নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলি পরিচয়-প্রসঙ্গে। বাংলায় এম-এ বলা মানে দেশি আয়নায় নিজের তিন রকম মুখ দেখা এ সত্য জেনেছি মজ্জায়-মজ্জায়।

অত্যন্ত দ্রুত স্নান সেরে নিই। কারণ এই বারোয়ারি স্নানঘরটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। মেয়েদের মাথার চুল থেকে সাবানের ফেনা সর্বদা জলে ভাসে। বেশিক্ষণ গায়ে জল না ঢাললে আরশোলার আদর খেতে হবে সর্বাঙ্গে। এই গা-ঘিনঘিন ভাবটা এড়াবার জন্যে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে স্নান শুরু করি। শুকনো গামছা দিয়ে মাঝে-মাঝে কয়েকটা টান দিই। অনেকটা ট্রলি গাড়ির বেগ কমে এলে পেছন থেকে ঠেলার মতন।

সকাল বেলায় আমি খুব অসহায় বোধ করি। কারণ এখন কোনও বন্ধুকে পাওয়া যাবে না। যে যার বস-এর কাছে বশংবদ। তবু চৌরাস্তায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম প্রাত্যহিক অভ্যাসে। এখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বত্রিশ দাঁতে পান চিবুনোর মতো

ডাঁটোগুলোকে দেখি। কতক মুখ আমার চেনা হয়ে গেছে। এবং একসময় হঠাৎ বাসে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েদের পেছনে হাঁটার উত্তাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে আমি এক বন্ধুর দোকানে ঢুকে পড়লাম। সুহৃদ টেবিল বাজাচ্ছিল। ওর বাবার দোকান এটা। রেডিও-র। ভদ্রলোক বারোটার পর নামেন। এ সময়টা সুহৃদ সম্রাট। টালিগঞ্জ পাড়ায় একদা ঘোরাঘুরি করেছিল, বাবার হুকুমে সেটা স্থগিত থাকলেও বর্তমানে নবনাট্য করছে। নাটক মঞ্চস্থ হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু রিহার্সাল দিয়ে চলেছে। ফলত সদস্যরা অনিয়মিত হচ্ছে নিয়মিত। আমাকে দেখেই সুহৃদ ওদের কানা দারোয়ানটাকে এক ভাঁড় চায়ের হুকুম দিয়েই পাশ থেকে এক দিস্তে কাগজ টেনে আনল, 'বুঝলি অনিমেষ, এখানটায় যা ট্রিটমেন্ট করেছি না—অনেকটা পিকচারাইজড্। জাম্প শট বুঝিস? ফিল্মে আছে—নাটকেও তাই আনছি। আই অ্যাম দ্যা ফার্স্ট ম্যান, ফার্স্ট অ্যাক্টিং-এর সঙ্গে—'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা বিরাট হাই তুলে বললাম, 'ওটা গর্ডন ক্রেগ করেছে।'

চোয়াল ঝুলিয়ে ঘসঘসে গলায় সুহৃদ বলল, 'গর্ডন করেছে!' যেন গর্ড আমাদেরই আর এক বন্ধু। ওর হাতটা যেভাবে মুঠো হল তাতে গর্ডন ক্রেগ সামনে থাকলে একটা কিছু হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম—'রবার্ট ল্যুইস তো সেইরকমই লিখেছেন। বুঝলি সুহৃদ, এই নাটক-ফাটক করে কিস্যু হবে না। তার চেয়ে ফিল্মের দিকে—!' আসলে সুহৃদকে বধ করতে হলে এইসব নাম বলতে হবে এটা আমি জানতাম। এসব নিয়ে ও পড়াশুনা করে তা আমি জানি। নাম দুটো আমার মুখে শোনার পর ও একটা ফিল্টার টিপ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাঃ, ডকুমেন্টারি করব। হাজার দুয়ের মামলা তো। ষোলো মিনিটে ট্যালেন্ট দেখিয়ে দেব। বিন্দুতে সিন্ধু।'

'ডকুমেন্টারির চেয়ে ফিচার ফিল্ম বেটার। তবে নেহাতই যদি করিস ইন্দিরা গান্ধীর ওপর কর। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম দে। গর্ভমেন্ট কিনে নেবে।'

এবং আমরা এইসব কথাবার্তা বলে গেলাম বারোটা অবধি। এবং গত দু-বছরের মতো আমাদের আলোচনার কোনও সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা যখন কথা বলি, সুহৃদ ও আমি একটা ছবি করব, সিরিয়াস হয়েই বলি। সেই মুহূর্তে আমরা কেউ স্মরণে আনি না যে নাটকের জন্যে একজন অভিনেত্রী পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এবং তা সাধ্যাতীত ছিল বলে আমরা রিহার্সাল বন্ধ রেখেছি। এই সময় চলচ্চিত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এক সময় আমি উঠে পড়লাম। আমি ও সুহৃদ কেউই আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

এই সময় আমি দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে সাধারণত পাঞ্জাবি দোকানই আমার পছন্দ। কারণ বাঙালি পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভাত ছ-আনা ডাল দু-আনা ইত্যাদি দ্রুত নামতার মতো কানের কাছে চেঁচানো হয় বলে আহার গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে।

এসব ব্যাপারের বাইরে আমি নিভৃতে পকেটের সঙ্গে বোঝাপড়ি করি। অল্প পয়সায় রুটি সহযোগে তড়কা অত্যন্ত উপাদেয়—পাঞ্জাবি হোটেলে ঢোকার পেছনে এ আমার অন্যতম যুক্তি। বস্তুত পেঁয়াজ ও লেবু সহযোগে তড়কা খেতে আমি মাংসের আঘ্রাণ পাই। অবশ্যই স্বীকার করব দিনের মধ্যে দু-বার খাওয়ার সময়, বহু যোজন দূরে অবস্থানকারী আমার পিতামাতার মুখ স্মরণ হয়। অন্যথায় আমি নিজেকে ভালোবাসি বা 'আত্মকেন্দ্রিক' এই বিশেষণ অস্বীকার করি না। তা ছাড়া বিচিত্র হিন্দি ভাষা শেখার অন্যতম জায়গা পাঞ্জাবি হোটেল এবং স্বীকারে লজ্জা নেই, আমি শিক্ষানবিশ।

বেশ কয়েকটা পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে আমি ট্রামে উঠলাম। সাধারণত যেসব ট্রামের পেছন

দিকের দরজা থাকে সেগুলো আমি পরিহার করি। স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকা যায় না। বরং পেট-কাটা ট্রামের দরজায় দাঁড়ানো বেশ আরামদায়ক। জয়ন্ত, আমার এক বিরাটাকায় বন্ধু পেশ করেছিল, প্রথমটি পুরুষ ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী ট্রাম। এবং আমার পক্ষে স্ত্রী জাতির প্রতি অনুরাগ দেখানো স্বাভাবিক। ট্রামে উঠেই আমার চোখ উজ্জ্বল হল। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় নজর দিতেই দ্বিধামুক্ত হলাম। যদিও ওর চোখে কালো চশমা, কিন্তু ফাঁপানো চুল আর খাটো ব্লাউজের সঙ্গে সাদা ঝোলানো ব্যাগটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই মেয়েটার সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি একলা নই। ক্রমশ স্থির করে ফেললাম আজ আলাপ করবই। এবং কীভাবে কথা বলব তার একটা ফর্মুলা আমার আছে। যেমন মেয়েটির সামনে গিয়েই একটু অবাক ও চিন্তিত চোখে বলব, 'মাফ করবেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে—কোথায় থাকেন বলুন তো? সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে যে-কোনও মেয়েই বলবে, 'কেন, আপনার কি দরকার?' তখন কাঁধ দুটো বেশ প্রস্তুত করে ঈষৎ লজ্জা এবং বিব্রত ভঙ্গিতে বলতে হবে, 'না, তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি খুব চেনা। অবশ্য মানুষেরই ভুল হয়।' এর পরে চোখ রাখতে হবে মেয়েটির চোখে। প্রশ্রয়ের আভাস পেলে ভরা পালে কথার নৌকো ছুটবে। নইলে সেটা দুরস্ত ইংরেজি ভদ্রতা।

নিউ সিনেমার সামনে মেয়েটি নামতেই আমি ট্রাম ছেড়ে দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটা আশঙ্কা ছিল—হয়তো এর কোনও ব্যক্তিগত বন্ধু অপেক্ষা করছে কোথাও। মেয়েটি মার্কেটের রাস্তায় এগোতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সহসা, ত্বরিতে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে নির্জনতম জায়গায় দাঁড়ালাম। মেয়েটি অন্যমনে হাঁটছে। হাঁটবার সময় ঊর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের আন্দোলন আমার শিরায়-শিরায় রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই এগিয়ে গেলাম, মাথাটা বেঁকিয়ে ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে (সম্প্রতি কোনও ছবিতে নায়ককে এভাবে হাঁটতে দেখেছিলাম)। হঠাৎই সব এলোমেলো হয়ে গেল এবং আমি আমার ফর্মুলা ভুলে দু-হাত জোড় করে ঈষৎ হেসে বললাম, 'নমস্কার, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এবং দীর্ঘ নরম ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখল, তারপর আলতো করে উচ্চারণ, 'কেন বলুন তো?'

এ প্রশ্নটাই মারাত্মক। আমি চোখ বুজে পরক্ষণেই হেসে ছোট্ট শ্রাগ করে বললাম, 'আলাপ করতে ইচ্ছে হল খুব।'

'কি হবে আলাপ করে?' মেয়েটি দৃষ্টি আমাকে মাপছে।

আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বললাম, 'জানি না, তবে এক-একটা ইচ্ছেকে চেপে রাখা যায় না তাই!'

'ও।'

'আমি নিখিল রায়। কাস্টমসে আছি।' এখান থেকেই আমার ফর্মুলায় এসে গেলাম। কখনওই আসল নাম ও অফিস আমি কাউকে বলি না। 'আপনি তো এদিকেই যাবেন?'

মেয়েটি হাসল, 'হ্যাঁ।' আমরা এগুলাম। কথা নেই কিছু। অস্বস্তি হচ্ছে। মেয়েটির পরিচিত কেউ এসে পড়লে অপ্রীতিকর হবে। গলায় কৌতুক নিয়ে বললাম, 'কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বুঝি?'

'আছে। টেলারের সঙ্গে। আমার কয়েকটা জামা ফিট করতে দিয়েছি, আজ ট্রায়াল ডেট।'

এর পর আমরা কথা বললাম। যে কেউ এ মুহূর্তে আমাদের অন্তরঙ্গ ভাববে। অফ্ ডিউটিতে সিনেমা দেখার উদ্দেশ্যে এ পাড়ায় আমার আগমন—জানালাম। আসলে মেয়েটি সিনেমায় আসুক

এ আমি চাইছিলাম।

'এই যে আমার শপ।' মেয়েটি বাঁ-চোখে আমাকে দেখল।

তাড়াতাড়ি জোড়া দিলাম, 'আমি অপেক্ষা করব?'

ভেতরে ঢোকার আগে মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা।'

এটি একটি ফরাসি দরজির দোকান। বিরাট-বিরাট গাড়িতে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা আসছে অনবরত। তাদের ব্লাউজের চেহারা দেখে আবার জয়ন্তকে মনে পড়ল। মার্কেটে ঘুরতে-ঘুরতে একদা ক্রিসমাসে জয়ন্ত বলেছিল, বালিসের ঢাকনা, লেপের ওয়াড় যেমন আছে, বুঝলি এই ব্লাউজগুলো তেমনি অন্তর্বাস ঢাকনা। মাপে-মাপে তৈরি।

তিনটে সিগারেট শেষ হলে মেয়েটি বেরুল। পাশাপাশি কয়েক পা হেঁটে সমস্যায় পড়া গেছে, এমন ভঙ্গিতে বললাম, 'অথ গন্তব্য কোথায়?'

মণিবন্ধে বাঁধা চৌকো বড় ঘড়িটা দেখল সে, 'আমাকে তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।'

অর্থাৎ এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আমি পাব। কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলি, 'ওঃ অনেক দেরি আছে। চলুন কোথাও জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক। 'জমিয়ে আড্ডা' শব্দ দুটো আমি ইচ্ছে করেই বললাম। কারণ এতে আমার সরলতা আর নির্লোভতা প্রকাশ পাবে। তা ছাড়া মেয়েটি যদি কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রী হয়, তাহলে আমার মেজাজের সঙ্গে একটা সাধর্ম্য খুঁজে পেয়ে খুশি হবে। কফিহাউসে অনেক মেয়েকে শব্দ দুটো ব্যবহার করতে শুনেছি।

'কোথায় আড্ডা দেবেন। যা রোদ্দুর।' আকাশ দেখল।

'চলুন কোথাও বসা যাক।' আমি দরাজ হলাম। ক্রমশ আমি একটি করে রেস্তোরাঁর নাম বলে গেলাম এবং সে নাকচ করে গেল। হয় তার কোনও আত্মীয় নিয়মিত সেখানে আসেন অথবা পরিচিত। শেষপর্যন্ত যে দোকানে আমরা প্রবেশ করলাম, সেটি সাহেবপাড়ার অত্যন্ত দামি এবং আমার দীর্ঘকালের বাসনায় ছিল। সেই স্বল্পালোক শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সজ্জিত কক্ষের কোণায় সোফায় বসে মেনু হাতড়ে-হাতড়ে যে পানীয়র হুকুম দিলাম, তার বিনিময়ে আমার চারবেলার মিল খাওয়া হয়ে যেত। 'বেশি কিছু খেতে পারব না, এই মাত্র লাঞ্চ সেরেছি আমি, আপনি?' বলার সময় তড়কার ঢেঁকুর উঠল যেন। আমি জানতাম, যে-কোনও মেয়েই একবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে মুখ ফুটে অন্য খাবার চাইবে না। এবং এই সময় মনে-মনে এই বাড়তি খরচটুকু আগামী সাত দিনের বাজেট থেকে কীভাবে পুষিয়ে নেব, তার একটা খসড়া করে নিলাম অতি দ্রুত।

এখনও পর্যন্ত মেয়েটির নাম আমি জানতে চাইনি, কারণ আমি চেয়েছিলাম, মেয়েটি বুঝুক, আমি ঠিক লাইনের ছেলে নই। 'লাইন' বলতে আমি লোভী কামুক এবং ইতর কিছু মানুষ যে পদ্ধতিতে আনাগোনা করে, সেই পদ্ধতির কথাই বলছি। এছাড়া আরও একটা কারণ, এই যে মেয়েটির বিরাট চ্যাপটা সাদা চামড়ার ঝোলানো ব্যাগটার গায়ের খোপে বসানো সাদা কাগজে লেটারিং করা নাম 'দয়ামন্তী গুপ্ত' বি-এ (অনার্স) দেখতে পেয়েছিলাম। এবং এই বিশ্ব-চরাচরে প্রথম কোনও স্ত্রীলোককে হাত-ব্যাগের শরীরে নিজের নাম ও ডিগ্রির খবর লিখতে দেখে পুলকিত হলাম।

সোফায় মাথা এলিয়ে মেয়েটি বসেছিল। আমি ওর স্ফীত ঊর্ধ্বাঙ্গে ইচ্ছে করেই চোখ রাখছিলাম না। কারণ আমি জানি, মেয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং আমাকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখলে সে ক্রমশ আমার ওপর আস্থাশীল হবে।

'রেস্টুরেন্টটা খুব ডেকোরেটিভ।' মেয়েটি দেওয়াল দেখছিল।

'সাহেবপাড়ার সঙ্গে আমাদের উত্তর কলকাতার পার্থক্য এইখানেই।' সুন্দর করে বললাম আমি।

দুটো ভ্রূ এক করে মেয়েটি বলল, 'আপনি নর্থে থাকেন?'

'শ্যামবাজারে।'

'আচ্ছা—।' এমন আলতো স্বরে সে উচ্চারণ করল যে ওর ঠোঁট একটুও কাঁপল না, 'আমি বিডন স্ট্রিটে।'

'তাহলে বেথুনে পড়েছেন?' আমরা ক্রমশ সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মতো ধাপে-ধাপে নামছিলাম। আমি খুব কাছাকাছি বসে আইসক্রিম খেতে-খেতে মেয়েটির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলাম। আমার অনেক কিছু শখ হচ্ছিল, কিন্তু আমি কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম না। হঠাৎ লক্ষ করলাম আমাদের বিপরীত কোণে দুটি মাড়োয়াড়ি ছেলে মেয়েটির সম্পর্কে আলোচনা করছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। আমি উত্তেজিত হলাম। মাথা নিচু করে মেয়েটির কানের কাছে মৃদু স্বরে বললাম, 'ওই কোণের ছোকরাগুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

স্প্রিংয়ের মতো মাথা ঘুরিয়ে কোণের দিকে তাকাল মেয়েটি। তারপর ক্রমশ মুখের পেশি শিথিল করে লাফিয়ে উঠল, 'হ্যালো ম্যান, হা ডু য়ু ডু?' লাট্টুর মতো শরীর ঘুরিয়ে মারোয়ারি-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত নির্বিকারভাবে দর্শন করলাম। বিলটা পে করতেই বাঁ-চোখে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি ডাকল, 'ওঁকে চেনেন না? ওমপ্রকাশ—টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন! উঃ, ক'দ্দিন পরে তোমার সাইট পেলাম প্রকাশ!'

ওরা আমাকে লক্ষ করছিল না। পায়ে-পায়ে কখন দরজার কাছাকাছি চলে এসেছি নিজেই টের পাইনি। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের বাইরে এসে এক ঝলক আগুনের তাপ নিলাম সর্বাঙ্গে। সেয়ানে-সেয়ানে পাঞ্জা কষে পরাজিত সম্রাটের মতো প্রচণ্ড রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মনে হল, 'লক্ষ-লক্ষ সিসিফাস তো জন্মাচ্ছে, তবু সূর্যের তেজ একটুও কমছে না। শালা!'

কয়েকশো টাকা বাজি হেরে যাওয়ার মতো মেজাজ নিয়ে হাঁটছিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। যদিও শেষ দিন কথা বলার সময় আমি ভেবেছিলাম আর আসব না। ইনি বাংলাদেশের তথাকথিত সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তি। এঁকে দেখে আমার মিশরের প্রাক্তন রাজা ফারুকের চেহারা মনে পড়ে। আমার কর্তৃপক্ষ যে রাজনীতির গন্ধে আমার ইতিহাসে পাচ্ছেন বলে শুনেছি, তার সঙ্গে চোদ্দ পুরুষের আমার সম্পর্ক ছিল না। অতএব এই মিথ্যে অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করতে আমাকে লাট্টুর মতো ঘুরতে হচ্ছে। আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি সৎ। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি বলা যায়—'ওহে বাপু, তুমি প্রমাণ করো দেখি, দশরথ তোমার বাপ কিনা।' তবে ভদ্রলোকের সমস্যা নিশ্চয়ই আমার চাইতে নেহাত কম হত না। ঈশ্বরের তৃতীয় নয়নের মতো সর্বদুয়ারের অদৃশ্য চাবিকাঠি এই ফারুক ভদ্রলোকের হস্তগত। অতএব আমাকে তার সামনে লেজ নাড়াতে হচ্ছে সমানে।

লালদীঘির কাছাকাছি আসতেই শুনলাম কে যেন চেঁচিয়ে আমাকে ডাকছে। সেই ঘড়িওয়ালা গির্জার সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মল্লিকদা হাত নাড়ছেন। মল্লিকদাকে দেখেই আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। সুরার পাত্রে মল্লিকদা আমার গুরুদেব। পনেরো পেগেও ভদ্রলোক যথাযথ। এক টেবিলে বসে একদিন বিল মেটাতে গেছিলাম চক্ষুলজ্জায়। ফোঁস করে উঠেছিলেন মল্লিকদা, 'বয়েস কত? আমাকে যেদিন বয়সে টপকাবে সেদিন বিল পে করতে এসো। অর্ডাসিটি। হতচ্ছাড়া, ওই বয়গুলোকে টিপস্ দিতেই ফতুর হয়ে যাবে যে।' মল্লিকদার অবস্থা কীরকম জানতাম না। তবে কখনও পকেট খালি দেখেনি। মল্লিকদা বিবাহিত, দুটি সন্তানের জননী তাঁর স্ত্রী। ষোলো পেগের ঝোঁকে একদিন বলে ফেলেছিলেন, 'তোমার বউদির বাচ্চা দুটো আমার নয়। ওর পূর্ব প্রেমিকের। প্র্যাক্টিক্যালি

ওকে বিয়ে করে এসব শুনে আর টর্চ করার ইচ্ছে জাগেনি।' আর তাই দার্জিলিং-এর নেপালি মেয়ে লীনার মায়ের কাছে কুশলবার্তা নিয়ে যান মল্লিকদা। ডরোথির বুড়ো বাপকে লাঠি কিনে দিয়ে আসেন ডক্টর লেনে গিয়ে। গহন রাত্রে টেম্পল বা ঈশাকে বসে লক্ষ রাখেন দশ পেগ পেরিয়ে গিয়েও ডরোথি লীনারা খদ্দেরের চাপে হুইস্কি খাচ্ছে কিনা।

'কোথায় চললে?' মল্লিকদা নাক কোঁচকালেন, 'চল! লীনার কাকা এসেছে দার্জিলিং থেকে। বেশ মজার লোক।'

'অল রাইট। রাত সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঈশাকে এসো।' এক মুহূর্ত আর অপব্যয় করলেন না মল্লিকদা। ট্যাক্সির জন্যে হাত তুলে ছুটলেন রাস্তার ওধারে।

সিংহদুয়ারে অনেক কথা খরচ করে অনুমতি যদিও মিলল ভেতরে যাওয়ার, মধ্যদুয়ার একপ্রস্থ তদারকিতে কঠোর হল। ক্রমশ যখন সেই আকাঙ্ক্ষিত দেবতাটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, ঠিক তখনই লাল আলো জ্বলে উঠল। শুনলাম এইমাত্র একজন বিখ্যাত মহিলা অন্দরবর্তী হয়েছেন। তাকিয়ে দেখলাম অপেক্ষা করার ছোট্ট ঘরে তিনজন পুরুষ ও জন-ছয়েক মহিলা কাগজ পড়ছেন। একটি অজস্র ছাপার ভুল ও কালি চুপসানো খবরের কাগজ টেনে নিয়ে সোফায় বসতেই কানে সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো আরামদায়ক কিছু সংলাপ ভেসে এল, 'আমি সাধারণত স্লিভলেস পরি না, তবে যেখানে যেমন—শুনেছি ইনি অত্যন্ত আপ-টু-ডেট।' সঙ্গে-সঙ্গে সোডার বোতল খোলার শব্দ হল। 'ইয়ং ম্যান অব সেভেনটি। আমাকে এখনও 'এসো খুকি' বলেন। ওঁর একটা লাইসেন্স আজ দেবেন বলেছেন। আফটার অল ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। মুহূর্তে আমার মনে হল, আমি দেবদর্শনে এসেছি এবং অপ্সরাবৃন্দের কাকলি শুনছি।

অনেক অপেক্ষার পর শেষে মুখোমুখি হলাম। দু-পা টেবিলের নিচে চালান করে স্ফীত ভুঁড়ি দামি সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ঢেকে শ্রীফারুক বসে আছেন। ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া অসম্ভব রকমের ফরসা। পেছনের দেওয়ালে সর্বাঙ্গ জুড়ে জনকের পার্ক-স্ট্রিটীয় ছবি আছে। নীল পরদা দিয়ে ঘরের একটি দিক ঘেরা। ওখানে ইনি বিশ্রাম করেন। একটা টাইপ-করা চিঠি হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে তাকালেন তিনি, 'চাকরিটা এখনও আছে?'

গলায় আমার এত কফ ছিল জানতাম না। কোনও মতে বললাম, 'হ্যাঁ, তবে ওয়ার্নিং দিয়েছে। আমাকে স্যার আপনি বাঁচান। আমি কোনওদিন রাজনীতি করিনি। স্যার এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ। আমার ঠাকুরদাকে তো আপনি চেনেন। মানে সেই লিয়াকত আলির আমলে, যখন উত্তর বাংলার সাঁওতাল শ্রমিকদের উনি মুসলমান বলে প্রচার করেছিলেন। তখন আপনাকে আমার ঠাকুরদা ওই ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমরা কেউ রাজনীতি করিনি স্যার।'

আমার কথায় কোনও আঁচড় পড়ল না মেদগঠিত ফারুকের মুখে। বাঁ-হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে অপারেটরকে বললেন, 'হোম ডিপার্টমেন্টে লাইনটা দিতে।' আমার শিরদাঁড়ায় একটা আনন্দ ছটফট করছিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে কয়েকটা সাদা কাগজ তুলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। নাকটা কুঁচকে শ্রীফারুক বললেন, 'এর কেসটা নিয়ে একটা কিছু করার জন্য হোম ডিপার্টমেন্টে ফোন করছি। কি বলো?'

'কী কেস স্যার?'

'রাজনীতি করেছে বলে চাকরি যাচ্ছে, আমার ডিস্ট্রিক্টের ছেলে।'

'সে কী স্যার! আপনি ডিপার্টমেন্টে ফোন কেন করবেন? আপনার একটা স্ট্যাটাস আছে তো? আপনি বরং এর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত নিয়ে হোম মিনিস্টারকে ফরোয়ার্ড করে দিতে পারেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ-হাতটা রিসিভারে তুলে আনল এবং শ্রীফারুক অপারেটারকে জানিয়ে দিলেন হোম ডিপার্টমেন্টকে দরকার নেই। তারপর টেবিলে রাখা প্রতীক্ষিতদের ভিজিট কার্ডগুলো তুলে নিয়ে বাছতে-বাছতে বললেন, 'তাহলে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও। আমি ফরওয়ার্ড করে দেব। আচ্ছা—।'

ভদ্রলোকের ঘাড় নাড়ার পর আমার দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু আমার হঠাৎ ইচ্ছে করল ভদ্রলোককে প্রণাম করতে। ছেলেবেলায় প্রথম ঠাকুর বিসর্জন দেখে গুরুজনদের প্রণাম করার জন্যে যেমন একটা ইচ্ছের আবেগ বুকে ছটফট করত ঠিক তেমনি। বিরাট চন্দ্রাকার টেবিলের তলায় পা দুটো খুঁজতে লাগলাম ব্যাকুল দৃষ্টিতে। শ্রীফারুক তাকাতেই বলে ফেললাম গাঢ় স্বরে, 'আপনাকে স্যার প্রণাম করব।'

'ঠিক আছে যান।' পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক ভেটকি মাছের মতন মুখ করে আমার ইচ্ছেটাকে চুরমার করে দিলেন। পায়ে-পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আঃ, কী হালকা লাগছে নিজেকে। বিরাট ঐতিহাসিক বারান্দা, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, প্রেস রিপোর্টার, পুলিশ ইত্যাদিকে আদৌ লক্ষ না করে আমি জুতোর টো-তে হাঁটতে-হাঁটতে কয়েকটা শিস দিয়ে নিলাম। আপাতত পৃথিবীতে কোনও সমস্যা নেই।

বাইরে প্রচুর আলো। দুপুর গড়িয়ে চলেছে, ডালহৌসির ছুটি হতে বেশি দেরি নেই। গর্ভবতী মেয়ের নরম প্রহরের অস্বস্তি ভাব চারদিকে। এবার আমার সময় রুটিনে বাঁধা। ট্রামে ঝুলে সোজা এলাম কলেজ স্ট্রিট বাজারের সেই বই-এর দোকানে। সুবোধদা এবং পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন কয়েকজন নানা বয়সি মানুষ রোজ দোকানটার পেছনদিকে জমা হই। দু-ঘণ্টা ধরে টানা সাহিত্য চলে। আমি কনিষ্ঠতম। কথা বলার অধিকার তাই কম। সুবোধদাই বলেন। বিখ্যাত এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত উনি, বাকি সবাই এপাশে-ওপাশে লেখেন।

আমাকে দেখেই সুবোধদা চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে নিয়েই আকর্ণ হেসে মাথা দোলালেন, 'তোমার গল্পটা পড়লাম। সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে নজর দাও। কথা বলা আর লেখা এক জিনিস নয়।'

এসব কথায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। এবং সব চেয়ে বাঁচোয়া যে, কোনও বিষয়ের আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এখানে সুবোধদাই সমালোচক, আমরা তাঁর কথায় ডিটো দিই। আসলে আমাদের মধ্যে একটা রেষারেষি আছে সুবোধদার করুণা পাওয়ার, সেই বিখ্যাত লেখা ছাপাবার রাস্তাটা আয়াসসাধ্য। সুবোধদার করুণাপ্রাপ্তির লোভ আমাদের আছে।

সন্ধে ঘন হওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের চলাফেরা, এই ভিড় দেখে আমার ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছিল। এখন আমি এক জায়গায় ফোন করতে পারি, আমার সমস্ত পাপ ও পাপহীনতার একমাত্র শরিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি।

'আমি বলছি।'

'কলেজ স্ট্রিট থেকে করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ডান হাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা সিগারেট খেয়েছ?'

'জানি না।'

'তুমি আমার কথা একটুও শোনো না, কিছু বলছ না যে।'

'কি বলব?'

'বেশি সিগারেট খাবে না, বেশি ঘুরবে না; কেমন?'

'আচ্ছা।'

'কাল ফোন করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পরশু?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে তোমাকে—'

'রাখছি।'

'কাল করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

একটা ফোঁপানোর শব্দ কানে আসতে-না-আসতেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ঠিক এই ক'টি মুহূর্তে সারাদিনের এই সময়টুকু আমি সৎ, আমার বুকের ভেতর কোনও ছলনা নেই, ফর্মূলা নেই। আসলে মুখোশের তলায় দগদগে ঘা-ভরা-মুখে ওযুধ লাগাবার সময় এটা। প্রতিদিনের ফোনের সময় আমার শান্তির সময়। একটা বাইশ বছরের যৌবন ওদিকে সর্বাঙ্গ শুকিয়ে বিছানায় লেপটে আছে, থাকবে সারা জীবন, শুধু দুটো হাত আর মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ নিথর। ক্রমশ হয়তো ফুরিয়ে যাবে সেটুকু, আর কোনও হাত প্রতিদিন হয়তো অপেক্ষা করবে না রিসিভারটা তুলে নিতে এবং আমি গির্জায় স্বীকারোক্তির পরে তৃপ্তির স্বাদ আর পাব না। আমার ভালোবাসা, আমার কান্না, আমার শান্তি—এই সময়টুকুতে—কয়েকটি সংলাপের উদ্যানে।

দরজা ঠেলতেই মনে হল আমি নরকে এলাম। বিরাট হলঘরে অগুন্তি টেবিল ঘিরে অসংখ্য নারী-পুরুষ, মদের গেলাস, সিগারেটের ধোঁয়া। আর চিৎকারের মধ্যে পথ করে সেই ব্যালকনিতে উঠেই মল্লিকদাকে দেখতে পেলাম। সর্বাঙ্গ চেয়ার এলিয়ে বসে রয়েছেন। টেবিলে গ্লাসের তলায় চাপা দেওয়া বিলের সংখ্যায় বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। যদিও নিচে মেয়েদের অশ্লীল হাসি আর তাদের শরীর জড়িয়ে ধরে মাতাল পুরুষদের চিৎকার এখানে আসে। সেসব দৃশ্যও স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে কিন্তু ওপরে ওদের ভিড় কম।

'এত দেরি হল যে।' মল্লিকদার গলার স্বর বেশ জড়ানো।

উত্তরে হাসলাম, 'লক্ষ রাখো তো, ওই নিচের কোণার থামটার পাশে নিগ্রোটার সঙ্গে বসেছে ডরোথি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি খাচ্ছে ও? রাম না হুইস্কি?'

এখান থেকে সাদা চোখেই বোঝা মুশকিল। তবু গ্লাসের আয়তনে বোঝা গেল বিয়ার। শুনেই মল্লিকদা লাল ছোপ ধরা দাঁতে হাসলেন, 'গুড্। জানো, ডরোথি খুব ভালো মেয়ে। ওর বাবা বললেন, ও নাকি স্কুলে ফার্স্ট হত। কি খাবে?'

'আজ থাক।'

'না, কিছু বলি। কেন খাবে না?'

'এমনি।'

মল্লিকদা একবার একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে হাসলেন। 'গুড্। জানো, তোমার বউদিকে আজ দেখে বুঝলাম দ্যাট ম্যান ইজ গোয়িং স্ট্রং!'

'মানে?'

'শী ইজ এক্সপেক্টিং হার থার্ড ইস্যু।'

বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না। মল্লিকদা গেলাসটা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন, 'লেটস্ গো। ব—য়!'

মল্লিকদার পেছন-পেছন নিচে নামছিলাম। সিঁড়ির মুখটায় প্রচণ্ড হইহই হচ্ছে। একটা ছাইমাখা মাগুর মাছের মতো মেয়ে দুই বুকের মধ্যে একটা টইটুম্বর পেগ গ্লাস নিয়ে মাথাটা পেছনে অনেকটা বেঁকিয়ে দ্রুততালে নাচছে। ওর সামনে একটা অ্যাংলো টেকো, প্রচণ্ড মোটা বুড়ো ছুঁচোর মতো মুখ করে গ্লাস থেকে চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করছে সমস্ত শরীর দুলিয়ে। কয়েকটা অ্যাংলো ছোকরা রক্ত গরম করা সুর বাজাচ্ছে উৎসাহ দিতে। ভিড়ের মধ্যে একটু দাঁড়াতেই দেখলাম টেকো ঠোঁট দিয়ে গেলাসটা তুলে নিয়েছে এবং মেয়েটাকে একটা লম্বা গ্লাসভরতি বিয়ার ছুটে এনে দিল। সবাই চিৎকার করে উঠল আনন্দে। মেয়েটি বিয়ার দেখে কান-ফাটানো খিস্তি করল বুড়োটার উদ্দেশ্যে। আমরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎই মেয়েটি খিস্তি থামিয়ে গ্লাসভরতি বিয়ার ছুঁড়ে দিল আমার শরীরে। এবং দোলের দিনের শিশুসুলভ চাপল্যে হাততালি দিতে লাগল দাঁত বের করে। আচমকা সমস্ত শরীর বিয়ারে ভিজে যেতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। সমবেত জনতার উল্লাসের মধ্যে মল্লিকদা আমায় বাইরে টেনে এসে ফিসফিসিয়ে বললেন। 'ডোন্ট ওরি। এখানে এসে না খেয়ে বেরোনোটা অত্যন্ত অভদ্রতা। ভগবান তাই তোমার শরীরে কিছু চালান করিয়ে দিলেন, থ্যাঙ্কস্।'

পাড়ার কাছাকাছি আসতেই ওদের সঙ্গে দেখা হল। আড্ডা শেষ করে ফিরছে। আমি কাছে যেতেই সুহৃদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ক'পেগ টেনেছ গুরু। দেশি না জাহাজি?'

জয়ন্ত আমার মুখ বুক শুঁকে চাপা আপসোশের যেন ফেটে পড়ল, 'সুখে আছিস রে! রেগুলার মাল টানছিস। আর আমি শালা তিন হপ্তা—।' এবং আমি হঠাৎ এইসব কথা শুনতে-শুনতে মাতালের মতো কথা বলতে শুরু করলাম। ওদের সিদ্ধান্ত সঠিক রাখতে এই গভীর রাত্রে কয়েকটি যুবকের বুকে ঈর্ষা ঢুকিয়ে ইচ্ছে করে বেতালে হাঁটতে শুরু করলাম। আহা কী আনন্দ!

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। এখন গভীর রাত। চোরের মতো পা টিপে-টিপে, একটুও শব্দ না করে তালা খুললাম। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হল না। আমি এখন এসেছি এটা এ-বাড়ির কাউকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। এই রাত্রে যখন এ-বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে অচেতন, যখন অন্ধকার-চোয়ানো বাতাসে বেশ একটা ঠান্ডা আমেজ আসছে তখন আমার জামা থেকে উপচে পড়া বিয়ারের গন্ধে মাথা ভার-ভার করতে লাগল। জামা খুলতে গিয়ে মনে হল কিছু একটা পড়ে গেল পকেট থেকে, অথচ আলো জ্বালাব ইচ্ছে হচ্ছিল না কিছুতেই। এই অন্ধকার মেঝেয় পাতা বিছানায় শরীর এলিয়ে এবার ঘুম---সারা রাতের জন্য ঘুম।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে অস্বস্তি ভাবটা কাটল না। আমার পাশ থেকে বিয়ারের গন্ধ আসছে। অথচ জামাটা আমি ওই কোনায় ছুঁড়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আলো জ্বালালাম। পোস্টকার্ডটা কুড়িয়ে নিতেই আমার সমস্ত শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল। গতকাল থেকেই বুক পকেটে পোস্টকার্ডটা ছিল। এখন আমার হাতে ধরা পোস্টকার্ড থেকে ভুরভুর করে বিয়ারের গন্ধ আসছে। সম্পূর্ণ ভেজা। চিঠিটা লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে—পড়া যাচ্ছে না কোনও শব্দ। অথচ কোন অলৌকিকতায় শেষ শব্দগুলো বেঁচে থেকে আমার সকল ইচ্ছাকে এক ভাঁড়ের পোশাক পরিয়ে দিল জানি না, কিন্তু দু-চোখ বন্ধ করলে এই বুক কী ভরাট মনে হয়, শব্দগুলো বাজে ঃ 'ভালো থেকো। ইতি আশীর্বাদিকা, তোমার মা।'

জায়গা নেই

নিচে নেমে এল নিখিলেশ।

সন্ধের পর শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে আজ। হোস্টেলে ফিরে চুপচাপ আলোয়ান জড়িয়ে শুয়েছিল ও, দারোয়ান খবর দিতে শেষপর্যন্ত নিচে নামল। ওর রুমমেট সুধাংশু চোখ বড়-বড় করে বলেছিল, 'কি কপাল করেছ গুরু—বিকেলের রজনীগন্ধা, রাত্রের হাসনুহানা, তুমি লাইন দাও আমি ছাদ থেকে দেখছি।' ওদের হোস্টেলের ছাদ থেকে নিচের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়।

বাইরে এসে নিখিলেশ দেখল সামনেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। দারোয়ান বলেছিল ট্যাক্সিতে করে এক জেনানা তাকে ডাকতে এসেছে। নিখিলেশ আস্তে-আস্তে ট্যাক্সির পাশে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। সাদা হলুদ পাড়ের শাড়ি, ঈষৎ মোটা এক মহিলা বসে আছেন একা, যাঁর হাতে বেশ মোটা মকরমুখী সোনার বালা।

'আমায় খুঁজছেন?' নিখিলেশ কথা বলার সময় ধীরে-ধীরে বলে, ফলে গলাটা খুব নরম এবং রোমান্টিক শোনায়।

'আপনি নিখিলেশ রায়?' বেশ শক্ত গলা মহিলার, কোনও জড়তা নেই, কথাগুলো সোজা আছড়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে—' নিখিলেশ দেখল ট্যাক্সির দরজা খুলে যাচ্ছে। ও একটু সরে দাঁড়াতেই ভেতরে আলো জ্বলে উঠল, দরজা খোলা।

'ভেতরে উঠে আসুন।' গলার স্বর একটুও কাঁপল না।

কী ব্যাপার বুঝতে পারছিল না, তবে মহিলাকে দেখে খুবই ঘরোয়া মনে হচ্ছে ওর। হয়তো কোনও কথা আছে যা বলতে সময় নেবে, নিখিলেশ মাথা নিচু করে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ভদ্রমহিলা ঝুঁকে দরজা বন্ধ করেই সুন্দর হিন্দিতে বললেন, 'চলিয়ে সর্দারজি, জাঁহাসে আয়া।'

'কী করছেন কি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নিখিলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

'চুপ করে বসে থাকুন।' প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন মহিলা।

বলার মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যে নিখিলেশ মুখ ঘুরিয়ে মহিলার দিকে তাকাল। ট্যাক্সির ভেতরে আলো কম। তবু এঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। ও বুঝতে পারছিল না কি ব্যাপার।

'কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না, জানি না। আপনার প্রয়োজনটা কি যদি না বলেন আমি নেমে যাচ্ছি।' নিখিলেশ এবার উত্তেজিত।

'চিনবেন! ব্যস্ত কেন? মেয়েদের পেছনে ঘোরা ছাড়া তো আর কোনও কাজ নেই আপনার। আর নেমে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমি চিৎকার করব।' কেটে-কেটে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন মহিলা।

বিস্ময়ে নিখিলেশের মুখ দিয়ে প্রথমে কথা বেরুল না। মহিলাদের পেছনে-পেছন ঘোরা—উনি কি বলতে চাইছেন? কোন মহিলা—ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসে ও শীত লাগা দোকানপাট দেখল।

কোথাও গোলমাল হয়ে গিয়েছে—এ হতেই পারে না। শ্যামবাজার পাঁচমাথায় লাল সংকেত পেয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। এখন যদি ও চট করে দরজা খুলে নেমে যায় তাহলে সত্যি কি মহিলা চিৎকার করবেন? আর ও যদি সবাইকে ডেকে বলে এই মহিলা তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন—হেসে ফেলল ও। লোকে ওকে পাগল ভাববে। একজন চল্লিশ পার হওয়া মহিলাকে এইসব অপবাদ দেওয়া যায়?

বেলগেছিয়া ব্রিজের ওপর ট্যাক্সিটা উঠলে মহিলা বললেন, 'আমি গোপার পিসিমা।'

গোপা? কে গোপা? চট করে ও কিছু মনে করতে পারল না প্রথমটায়। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুকপকেটেই কলম আবিষ্কার করার মতো মুখ করে ফেলল নিখিলেশ। এই মহিলা গোপার পিসিমা? কি যেন উপাধি বলেছিল, আঃ, মিত্র বোধহয়। মাথা ঝাঁকাল ও।

এক-একটা মুখ আছে যার দিকে তাকালে মনে হয় বুকের মধ্যে কোথাও কিছু খালি জায়গা পড়ে আছে, গোপাকে দেখলে এইরকম মনে হয়। ওদের থেকে অনেক জুনিয়র মেয়ে, সবে ঢুকেছে। ক'দিন আগে অ্যাডমিশন হয়ে যেতেই নতুন ছেলেমেয়েরা এসে গেল, গোপাও এল। বসন্ত কেবিনে বসে রুনু বলেছিল, 'নতুন একটা মেয়ে এসেছে দারুন দেখতে।'

নিখিলেশ বলেছিল, 'ভ্যাট, তোর যত নভিস ব্যাপার।'

মৃন্ময় মাথা নেড়ে জিগ্যেস করেছিল, 'কার কথা বলছিস, ওই কমলা রঙের শাড়ি, থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ!'

'ঝালর দেওয়া।' বাকিটা শুধরে দিয়েছিল রুনু, 'নভিস নয় ভাই, দেখলেই সূর্যমুখী ফুল মনে পড়বে, সূর্য খুঁজছে।

আজ নিখিলেশ দেখল ওকে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং বিকেলের রোদের মতো। হাঁটার সময় চিবুক গলার কাছে নামিয়ে রাখে। দেখলেই কোনওরকম দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হয় না।

তারপব ওরা বাজি ধবল নিজেদের মধ্যে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে হবে, খানিকটা দূর হাঁটতে হবে অথবা বসন্ত কেবিনে এসে চা খেতে হবে। যেন কিছুই নয়, এইভাবে নিখিলেশ এগিয়ে গেল, মেয়েটি তখন বাসস্টপে।

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। অনেক দূরে একটা টেম্পো আসছে দেখা যাচ্ছে, বাস-ট্রাম নেই। দু-হাত জড়ো করে নিখিলেশ ওর নিজস্ব হাসিটা হাসল, 'আমি নিখিলেশ, আমরা অরুণবাবুর ছাত্র, আপনি ও আমি, তাই আলাপ করতে এলাম।'

কেমন কেঁপে উঠল মেয়েটি। রুমাল দিয়ে চিবুক মুছল। তারপর মাটির দিকে তাকাল। 'মাফ করবেন, আপনি কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন, খুব গম্ভীর আপনি না?'

ঘাড় নাড়ল ও, 'না।'

'যাঃ হতেই পারে না, তাহলে বলতেন।' নিখিলেশ হাসল।

কিছু বলল না মেয়েটি, খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নিখিলেশ বলল, 'চলি, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে নিজেকে ভিলেন-ভিলেন মনে হবে।'

মেয়েটি হেসে ফেলল। তারপর টুকরো-টুকরো কথা ওরা বলেছিল। নিখিলেশই বেশি। অনেকক্ষণ বাস না আসায় ওরা একটু এগিয়ে গেল শ্যামবাজারের দিকে। মেয়েটি নাম বলেছিল, নিখিলেশ নিজের ঠিকানা। বলেছিল, যদি কোনও সাহায্য দরকার হয় ওকে স্মরণ করতে। তারপর একটা বাস কোনওমতে এসে দাঁড়ালে নিখিলেশ ভিড় সরিয়ে গোপাকে তুলে দিয়েছিল।

সেই গোপার এরকম জাঁদরেল পিসিমা আছে? আর থাকলেও ওর হোস্টেলে হানা দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে এসে ট্যাক্সি দাঁড় করালেন মহিলা। ভাড়া মিটিয়ে ওকে বললেন, 'আসুন।'

এতক্ষণে ওর খেয়াল হল ও পাজামা আর আলোয়ান পরে এসেছে। গোপার কথা ভেবে কেমন লজ্জা করতে লাগল ওর। ওকে নিয়ে মহিলা হলুদ বাড়ির দরজায় এসে কলিং বেল টিপলেন। ছোট্ট একটা বাচ্চা চাকর দরজা খুলে দিলে ওরা ভেতরে এল।

'বসুন।' সামনের সোফার দিকে আঙুল বাড়াল মহিলা। ঘরটা দেখল নিখিলেশ, বেশ ছিমছাম, রুচিটুচি আছে। সবুজ ঢাকনা দেওয়া সোফায় বসল ও, সামনেরটায় মহিলা।

'আপনার সঙ্গে গোপার কতদিনের আলাপ?' চোখে চোখ রেখে খুব বেশি মহিলা কথা বলতে পারে না, ইনি পারেন।

'আজই।' নিখিলেশ সুরটা ধরতে পারছিল না।

'ক'দিন ধরে ঘুরছেন?'

'কি যা-তা বলছেন?'

'কেন আলাপ করতে গেলেন? বলুন আপনার কি উদ্দেশ্যে? আমি ওর গার্জেন, আমি জানতে চাই!' বেশ উত্তেজিত মহিলা।

'এসব কথা তো আমার হোস্টেলের সামনেই বলতে পারতেন। এখানে আসার কি দরকার ছিল?' নিখিলেশ বলল।

'গোপা আমার কাছে আছে। আপনি এ কি করলেন! আমি ওর মা-বাবার কাছে মুখ দেখাব কী করে?' ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

'কী হয়েছে, আমি তো কিছু করিনি!' বিস্ময়ে নিখিলের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল।

'দেখুন মেয়েকে আমি চিনি। রোজ চারটের সময় বাড়ি আসে। আজ এসেছে সন্ধে পেরিয়ে। এক পা ধুলো। খেতে দিলাম, ভালো করে খেল না। তখন থেকে বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক কষ্টে বের করতে পারলাম ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে, ওকে ঠিকানা দিয়েছেন। দেখুন, আপনার কাছে আমার অনুরোধ ওকে আর বিরক্ত করবেন না। ওর বাবা-মার ইচ্ছে ছিল না কো-এডুকেশনে পড়ে—আমি জোর করে—'

ঠিক এই সময় বাইরের ভেজানো দরজা খুলে গেল। নিখিলেশ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। স্পষ্ট বোঝা যায় ওঁর পা টলছে। পুরোদস্তুর সাহেবি চেহারা, হাতে সুন্দর কাজ করা লাঠি, ছাইরঙা স্যুট পরনে, শরীর হালকা।

ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক বললেন, 'গিয়েছিলে?'

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ। এর নাম নিখিলেশ।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলেন ভদ্রলোক, তারপর জড়ানো গলায় বললেন, 'ইউ...।'

নিখিলেশ বুঝতে পারছিল না ও কি করবে। শেষপর্যন্ত নমস্কার করল। লাঠিটা শূন্যে ঘুরিয়ে নমস্কারটা গায়ে ক্রশ মেরে দিলেন উনি, 'তুমি আমার ভাইঝির সঙ্গে প্রেম করতে চাও?'

ঘাড় নাড়ল নিখিলেশ, 'না, আপনাদের ভুল হয়েছে। আমরা বাজি ধরেছিলাম—'

'বাজি!' কি যা-তা বলছ—', ধমকে ওঠেন মহিলা।

'এসব কথা শুনলে ও লজ্জা পায়। শোনো, বাজিটাজির ব্যাপার গোপার সঙ্গে নয়। একদম ওর ছায়ার বাইরে থাকবে, বুঝলে? তোমার বাবা কী করেন?' টলতে-টলতে সামনে এসে বসেন ভদ্রলোক। বসে সিগারেটের প্যাকেট খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

'ডাক্তার।' নিখিলেশ বলল, 'আমি হেলপ করব?'

'গুড। ম্যানার্স জানো দেখছি। আমি তখনই বলেছিলাম, ছেলেটি যদি ভালো হয় চলে আসবে। অবশ্য তুমি একটু রিস্ক নিয়েছিলে।' কথাগুলো মহিলার দিকে তাকিয়ে বলা।

হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ওপরের পাতলা কাগজ ছিঁড়ে সিগারেট বের করে দিল নিখিলেশ।

'আরে তুমি নাও একটা।' চোখ বন্ধ করে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে-সঙ্গে হাতজোড় করল নিখিলেশ, 'আমি খাই না।'

'রিয়েলি? খুব ভালো, খুব ভালো। তাহলে তুমি ওকে চা খাওয়ায়, আমি ভেতরে যাচ্ছি। বাজিটাজি ধরার মধ্যে একটা থ্রিলিং আছে, বুঝলে—' বিড়বিড় করতে-করতে ভেতরে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

উঠে দাঁড়াল নিখিলেশ, 'এবার আমি যেতে পারি?'

মাথা নিচু করলেন মহিলা, তারপর বললেন, 'বসো, এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না বাইরের ঘরে ছিটকে এল। নড়ে উঠলেন যেন মহিলা, এবার নিখিলেশকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।' দ্রুত পায়ে উনি ভেতরে চলে যেতেই নিখিলেশের মনে হল ওর এবার চলে যাওয়া উচিত। মেয়েলি গলায় কে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। ভীষণ কৌতূহলে ও ভেতর-দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোপার পিসিমার গলা পেল নিখিলেশ, 'কী হয়েছে তোর, এই গোপা, আঃ, কাঁদছিস কেন?'

ডুকরে উঠল গোপা। তারপর কান্নার দমকে-দমকে বলল, 'তোমরা ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছ কেন? ওকে তাড়িয়ে দিতে পারছ না? আমি তো তাই তোমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ইস্, কাল আমি ক্লাসে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে! ও মা—।'

এমন এক-একটা কণ্ঠ আছে যা শুনলে মনে হয়, বুকের ভেতর কোথাও কিছু খালি জায়গা নেই, এক বিন্দুও না।

